জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৬৬

ঊনবিংশ বর্ষ: জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(কেডারেশন হল)
কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৬

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন ১৯৬৬

চিত্র সূচী

বিবিধ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৬৬

ঊনবিংশ বর্ষঃ জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(ফেডারেশন হল)
কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৬৬

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর ১৯৬৬

চিত্রসূচী

বিবিধ

৩৫১ জ্ঞান ও বিজ্ঞান

উনবিংশ বর্ষ | জানুয়ারী, ১৯৬৬ | প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আজ উনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের প্রেরণায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আঠারো বৎসর পূর্বে ১৯৪৮ সালে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল—বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্যাদির প্রচার করা। সেই সুমহান উদ্দেশ্য সফলতার দিকে চলিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার সময় আসে নাই।

"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' আঠারো বৎসরের জীবনে বহু বাধা-বিঘ্ন আসিয়াছে। একমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা সম্বল করিয়া এত দীর্ঘকাল স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকার পক্ষে যে কিরূপ সুকঠিন ব্যাপার, আশা করি তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সহজে উপলব্ধি করিবেন। তবে আনন্দের কথা এই যে, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এই প্রাথমিক অনিশ্চয়তা জয় করিয়া আপন অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে। নিছক তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' যাহাতে সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সহায়তা করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের বিবিধ তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কিত প্রবন্ধাদি এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও গবেষণালব্ধ তথ্যাদি প্রকাশে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সততই আগ্রহশীল।

আমাদের দীর্ঘ আঠারো বৎসরের লেখকসূচী পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এই পর্যন্ত অনেক লেখক-লেখিকাকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তথাপি প্রয়োজনের তুলনায় তাঁহাদের সংখ্যা যথেষ্ট নহে। আশা করি, আরও অনেক লেখক-লেখিকা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহিত হইবেন এবং উপযুক্ত রচনাসম্ভারে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-কে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিবেন।

কেবল মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশই যথেষ্ট নহে, উহার পর্যাপ্ত প্রচারও আবশ্যক। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর প্রচার-সংখ্যা যদিও কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য, কিন্তু আজও তাহা আশানুরূপ লক্ষ্যে পৌঁছায় নাই। প্রতিটি শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিবারে বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যাদির প্রচার ত্বরান্বিত করিতে পারিলে নিঃসন্দেহে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ দ্রুততর হইবে।

মাতৃভাষায়ই যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার সুমহান কর্তব্য স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া নিয়াছে সত্য, কিন্তু এই কর্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে সকলের ঐকান্তিক সাহায্য, সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সমর্থন অপরিহার্য। যাঁহাদের মূল্যবান উপদেশ ও পরিচালনায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' তাহার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে, যাঁহাদের অনুগ্রহ ও পৃষ্ঠ-পোষকতা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র যাত্রাপথের পাথেয়, আজ ঊনবিংশ বর্ষের শুভ সূচনায় তাঁহাদিগকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই।

গ্রহের জন্মকথা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ

গ্রহ-জন্মের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে প্রথমে সার জেমস জীন্‌সের মতবাদ জ্যোতির্বিদগণ সাদরে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বে বিজ্ঞানের নিকষ-পাথরে টাইড্যাল থিওরীর (Tidal Theory) ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লো। কাজেই জীন্‌সের মতবাদ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

গ্রহ-জন্মের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আবার নতুন করে চিন্তাধারা আরম্ভ হলো। এবার আর চেম্বারলেন-মুল্টন এবং জীন্‌সের কল্পনানুযায়ী অন্য কোনও বিরাট নক্ষত্রের সূর্যের সন্নিধানে আগমন নয়। এবারকার চিন্তাধারা প্রবাহিত হলো ক্যান্ট-লাপ্লাসের নীহারিকাবাদের অনুরূপ পথে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল ফন উইৎ-সেকার (Carl von Weitzsacker) বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তি অবলম্বনে প্রচার করলেন—সূর্য-সৃষ্টির আদিম যুগে গ্যাস ও ধূলিকণা মিশ্রিত যে মেঘপুঞ্জ তার দেহলগ্ন হয়ে চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত ছিল, সেই গ্যাস ও ধূলিকণা থেকে গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। অনুরূপ মতবাদ নাকি রুশীয় বিজ্ঞানী অটো স্মিথও (Otto Schmidt) ঠিক ঐ সময়েই প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তখন মহাযুদ্ধের সময়ে সংবাদটি বিশ্বের দরবারে পৌঁছুতে পারে নি।

পার্থিব বস্তুর বিশ্লেষণে দেখা যায়—অক্সিজেন, সিলিকন, লৌহ ও অল্প পরিমাণ অন্যান্য ভারী মৌলিক পদার্থ এবং তাদের সংশ্লেষণে সৃষ্ট যৌগিক পদার্থ পৃথিবী-গঠনের প্রধান উপাদান। হাইড্রো-জেন, হিলিয়াম প্রভৃতি হাল্কা গ্যাস এখানে কমই আছে এবং নিয়ন, আর্গন প্রভৃতিও যৎসামান্য। পৃথিবী-গঠনের প্রধান উপাদানগুলিকে আমরা সংক্ষেপে পার্থিব কণা বা পার্থিব পদার্থ বলতে পারি।

যেহেতু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করেছিলেন যে, সূর্য থেকেই পৃথিবীর উৎপত্তি, সেহেতু তাঁরা ভেবেছিলেন যে, সূর্যে এবং অন্যান্য নক্ষত্রেও ঐ সব উপকরণেরই প্রাচুর্য। কিন্তু পরে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ঐ সকল পদার্থের পরিমাণ সূর্যদেহে মাত্র শতকরা একভাগ, অবশিষ্ট নিরানব্বই শতাংশ প্রায় সবই হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। শুধু সূর্য নয়, অন্যান্য নক্ষত্রেও শতকরা নিরানব্বই ভাগ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম, বাকী একভাগ মাত্র ঐ সব পার্থিব পদার্থ। বর্তমানে জানা গেছে যে, সমগ্র নক্ষত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে যে বিরাট দূরত্বের ব্যবধান, সে স্থানও একেবারে শূন্য নয়—সেখানেও আছে সূক্ষ্ম ধূলিকণা মিশ্রিত গ্যাস অতি বিরলভাবে অবস্থিত—এত বিরল যে, দশ লক্ষ ঘন-মাইলের বস্তুর ওজন গড়ে মাত্র এক মিলিগ্র্যাম। লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরস্থিত নক্ষত্রের বর্ণালী পরীক্ষার সময়ে তার রশ্মি এই সূক্ষ্ম ধূলিমিশ্রিত গ্যাস ভেদ করে আসে। তাতে দেখা যায়—এই ধূলিমিশ্রিত গ্যাসেও ঠিক নক্ষত্রের উপাদনের মত শতকরা একভাগ পার্থিব পদার্থ এবং অবশিষ্ট সব হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম।

মহাশূন্য সম্পর্কে উক্ত লব্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করে জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল ফন উইৎসেকার গ্রহগুলির জন্মবৃত্তান্ত অনুমান করেন। গ্যাস ও ধূলি মেঘ-পুঞ্জের মধ্যে সূর্য যখন প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল, তখন প্রাকৃতিক নিয়মেই ঐ মেঘপুঞ্জের একটা বিরাট অংশ সূর্যের বহিরাবরণস্বরূপ তাকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। বর্তমানে সমুদয় গ্রহ-

উপগ্রহে সর্বযোগে যে পরিমাণ বস্তু আছে, ঐ বহিরাবরণে হয়তো তার শতগুণ বস্তু ছিল। ঐ ঘূর্ণ্যমান বহিরাবরণে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও অন্যান্য গ্যাস যেমন ছিল, তেমনি সেই গ্যাস-সমুদ্রে মগ্ন পার্থিব পদার্থের সূক্ষ্মকণা অর্থাৎ লৌহভস্ম (Iron oxide), লৌহ, সিলিকেট, জলীয় বাষ্প প্রভৃতিও ছিল। এই সকল পার্থিব কণাই ক্রমে ক্রমে একত্রিত হয়ে সৌরজগতের জ্যোতিষ্কসমূহের সৃষ্টি করেছে। গ্রহ-উপগ্রহগুলির গড়ে উঠতে হয়তো দশ কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে।

অনুমান-ভিত্তিক হলেও এভাবে সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহাদির জন্মের সম্ভাব্যতা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহ। গ্রহ-জন্মের কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়, তাই বিজ্ঞানসম্মত অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, যদি এই প্রণালীতে গ্রহাদির জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিটি নক্ষত্রেরই এইরূপ এক-একটি গ্রহ-জগৎ থাকা সম্ভব। সুতরাং আমাদের এই ছায়াপথ-দ্বীপজগতেই অন্ততঃ দশ হাজার কোটি গ্রহ-জগৎ বর্তমান। কিন্তু গ্রহ কখনই নক্ষত্রের মত বিরাট আকৃতির নয়, আর তারা নক্ষত্রের আলো প্রতিফলিত করতে পারে, নিজেরা কিন্তু নিষ্প্রভ। এই কারণে আজ পর্যন্ত দূরবীক্ষণের সাহায্যে সম্ভাব্য ঐ বিপুল সংখ্যক গ্রহের একটিরও অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নি।

অধুনা পাশ্চাত্যের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন যে, মহাশূন্যে গ্যাসের মেঘলোকে সঞ্চরমান ধূলিকণা থেকে গ্রহগুলির জন্ম হয়েছে। কিন্তু জন্মের প্রণালী সম্বন্ধে একাধিক মতবাদ গড়ে উঠেছে। উইৎসেকার, হুইপ্‌ল্ (Whipple), কুইপার (Kuiper), ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা গ্রহ-জন্মের প্রণালী সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যাখ্যাই অবশ্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক, কিন্তু প্রতিটি খুঁটিনাটির সমাধান কোনও প্রণালীতেই নেই।

বর্তমানে দুটি মতবাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়; যথা—(১) উল্কা মতবাদ ও (২) বলয় মতবাদ।

(১) উল্কা মতবাদ (Meteorite Theory)

ধূলিমিশ্রিত গ্যাস-সমুদ্রের মধ্যে সূর্য নিমগ্ন ছিল। তার বহির্ভাগে অবস্থিত গ্যাসরাশি সূর্যদেহ কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে আবর্তন আরম্ভ করলো। সূর্যের বহিরাবরণরূপী এই ঘূর্ণ্যমান গ্যাসলোকে ধূলিকণাগুলি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল এবং কোনটিই এক বিশেষ স্থানে নিবদ্ধ ছিল না। মহাকর্ষের প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী এই জড় ধূলিকণাগুলি প্রত্যেকে আপন আপন বৃত্তাভাস পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছিল।

কিন্তু ধূলিকণাগুলি কি এবং কোথা থেকে এল?

যাবতীয় মৌলিক পদার্থের পরমাণুই ঐ গ্যাস-লোকে গ্যাসীয় অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। পদার্থের স্বভাবই এই যে, তারা অতিরিক্ত তাপমাত্রায় গ্যাসে পরিণত হয় এবং অত্যধিক শীতল হলে ক্রমে ক্রমে তরল ও কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। কিন্তু সকল পদার্থ একই তাপমাত্রায় গ্যাস হয় না বা একই তাপমাত্রায় তরল কিংবা কঠিনও হয় না। প্রত্যেকেরই এই প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্তির তাপমাত্রা বিভিন্ন। আবার যথাযোগ্য তাপমাত্রা ও উপযুক্ত পরিবেশে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একটি মৌলিক পরমাণু অন্য এক বা একাধিক পরমাণুর সঙ্গে মিলে যৌগিক পদার্থের অণু সৃষ্টি করে; যেমন—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে জল বা নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন মিলে অ্যামোনিয়াম গ্যাস, কার্বন ও অক্সিজেন মিলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন ও হাইড্রোজেন মিলে মিথেন গ্যাস, লৌহ ও অক্সিজেন মিলে লৌহভস্ম, সোডিয়াম, সিলিকন ও অক্সিজেন মিশেল সোডিয়াম সিলিকেট প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। গ্যাসপুঞ্জ যখন অত্যন্ত উত্তপ্ত তখন তথাকার সকল মৌলিক বা যৌগিক

পদার্থই গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। বিকিরণের ফলে গ্যাসগুলোকে তাপ ক্রমে কমতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় খুবই স্বাভাবিক যে, যেরূপ তাপমাত্রায় যে সকল গ্যাসীয় অণু কঠিন বা তরল পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে, তারা ঐ গ্যাস-রাশির মধ্যেও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছিল। এরাই গ্যাস-সমুদ্রের জড় ধূলিকণা।

ধূলিকণার সংখ্যা অগণিত এবং তাদের সূর্য-পরিক্রমার পথও অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন আকারের বৃত্তাভাস। কিন্তু এই সকল বৃত্তাভাস ভ্রমণকক্ষ এক সমতলে অবস্থিত নয় (চিত্র-১)। এর ফলে কক্ষগুলি বহুক্ষেত্রেই একে অন্যকে ছেদ করতে বাধ্য। প্রচণ্ডবেগে ধাবমান বিপুল সংখ্যক পথচারীদের মধ্যে এই অবস্থায় মুহুর্মুহু সংঘর্ষ অনিবার্য। দুটি ক্ষুদ্র কণায় সংঘর্ষ ঘটলে তারা উভয়েই ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। যে তাপের সৃষ্টি হবে, তাতে হয়তো তারা গ্যাসে পরিণত হবে এবং পরে আবার যখন ঠাণ্ডা হবে, তখন এক বা একাধিক জড়কণায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। একটি বড় কণার সঙ্গে একটি ছোট কণার সংঘর্ষ ঘটলে তার ফল হবে অন্যরূপ। বড়টির সঙ্গে ছোটটি সংলগ্ন হয়ে থাকবে কিংবা বড়টির দেহাভ্যন্তরে ছোটটি প্রবেশ করে যাবে। তার ফলে বড়টির আয়তন আরও একটু বাড়বে। এই ভাবে একটু একটু করে বড় হয়ে কালক্রমে এমন একটা জড়পিণ্ড গড়ে উঠবে যে, সন্নিহিত অঞ্চলে স্বীয় মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবে। তখন নিকটস্থ সঞ্চরমান ক্ষুদ্র কণাগুলিকে আকর্ষণ করে নিয়ে আপন কলেবর বৃদ্ধি করতে থাকবে (চিত্র-২)।

নবগঠিত সূর্যদেহের সর্বাংশ ঘিরে ধূলিময় গ্যাসের যে পুরু বহিরাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল, অসংবদ্ধ ঐ গ্যাসরাশি এমন অবস্থায় স্থায়ীভাবে থাকতে পারে না। ধূলিময় ঐ গ্যাস ক্রমে ক্রমে সূর্যের বিষুববৃত্তের সমতলে এসে পাশের দিকে বিস্তৃত হয়ে (চিত্র ১) এক নাতিস্থূল বলয়ের আকার প্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে গ্যাসের পরিণতি কি? ধূলিকণারই বা পরিণতি কি?
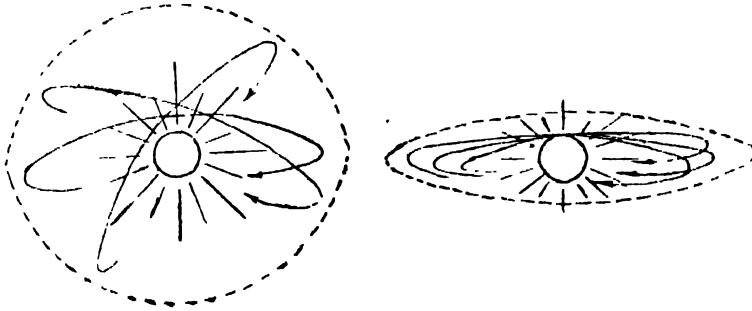
১নং চিত্র

বামে—বিভিন্ন সমতলে ভ্রাম্যমান ধূলিকণা, ডানে—গ্যাস ও ধূলিকণা ধীরে ধীরে সূর্যের বিষুববৃত্তের সমতলে এসে উপস্থিত হলো।

চ্যাপ্টা বলয়টি আবর্তনশীল সূর্যের সঙ্গেই ঘূর্ণ্যমান। এই কারণে বলয়ের বহিঃপ্রান্তের গতিবেগ এত বেশী হয়ে দাঁড়ায় যে, তথাকার গ্যাসরাশি সূর্যের আকর্ষণ অতিক্রম করে শূন্যে মিলিয়ে যেতে আরম্ভ করে। অন্তঃপ্রান্তের গ্যাস ক্রমে ক্রমে সূর্যদেহে বিলীন হয়। আবার যে সব স্থানে গ্যাসের তাপমাত্রা কমে যাচ্ছিল, সে সকল জায়গায় নতুন নতুন জড়কণার আবির্ভাবও সম্ভব হচ্ছিল।

গ্যাসরাশিতে এসব পরিবর্তন ঘটলেও

ধূলিকণার জীবনে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আসে নি। পূর্বে যেমন একটু একটু করে তাদের দেহবৃদ্ধি হচ্ছিল অর্থাৎ ভর (Mass) বাড়ছিল, সূর্যের বিষুববৃত্তের সমতলে এসেও অনুরূপভাবেই তাদের ভর বাড়ছিল এবং নিকটে বা দূরে যে যেখানে ছিল, সেখান থেকেই বৃত্তাভাস পথে সূর্য-পরিক্রমা করছিল। ভর যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, পিণ্ডগুলির মহাকর্ষের ভূমিও তত প্রসারিত হচ্ছিল এবং তার ফলে ক্রমান্বয়ে একত্র সমষ্টিবদ্ধ হয়ে পৃথক পৃথক অঞ্চলে এক-একটা সুবৃহৎ পিণ্ডে পরিণত হলো। এরাই গ্রহ নামে অভিহিত হয়েছে।

এই গ্রহগুলি আবার একত্রে সম্মিলিত একটিমাত্র অতিবৃহৎ জ্যোতিষ্কে পরিণত না হয়ে পৃথক পৃথক অস্তিত্বের অধিকারী হলো কেন—এই প্রশ্ন উঠতে পারে। উইৎসেকার এরও বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরে কুইপার, চন্দ্রশেখর, টের হার (Ter Herr) প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ তাঁদের
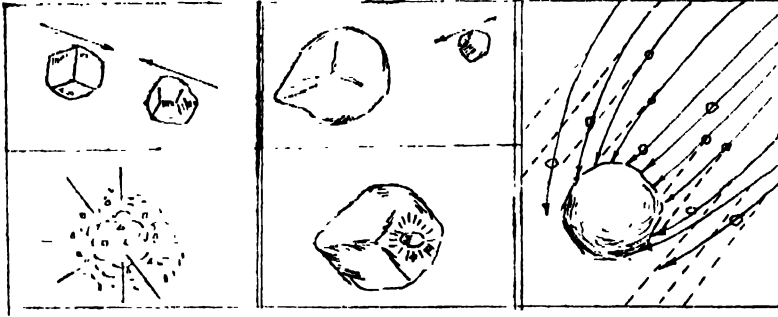
২নং চিত্র

বামে—ছোট কণাগুলির সংঘর্ষ; মধ্যে—বড় কণার সঙ্গে ছোট কণার সংঘর্ষ, ডানে—পিণ্ডদ্বারা আকৃষ্ট ছোট কণা।

দূরস্থিত ক্ষুদ্রতর পিণ্ড ও জড়কণাগুলিকে স্বদেহে আকর্ষণ করে নিয়ে নিজেদের আয়তন বৃহত্তর করছিল। এভাবে তাদের দেহের বেধ ক্রমে এক সেণ্টিমিটার, দুই সেণ্টিমিটার, এক মিটার, এক কিলোমিটার, এক মাইল, দশ মাইল, শত মাইল এবং ধীরে ধীরে আরও বেশী হয়ে দাঁড়ালো। ধূলিকণা এবং ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পিণ্ড প্রত্যেককেই গ্যাসরাশি ভেদ করে অর্থাৎ গ্যাসের বাধা অতিক্রম করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে হচ্ছিল। এর ফলে তাদের বৃত্তাভাস কক্ষ ক্রমে বৃত্তাকার হয়ে উঠলো। বহু কণা একত্র সন্নিবিষ্ট হচ্ছিল বলে ভ্রমণ-কক্ষের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে কমে এলো। অবশেষে ঐ সব নাতিবৃহৎ পিণ্ড, যাদের ভ্রমণ-কক্ষ একে অন্যের সমীপবর্তী ছিল, তারা সকলে মহাকর্ষের দ্বারা গবেষণালব্ধ ফলের উপর নির্ভর করে প্রমাণ করেছেন যে, এরূপ অবস্থায় ঐ প্রকার কতকগুলি পৃথক গ্রহের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁরা আরও বলেছেন—একটি গ্রহ থেকে সূর্য যতটা দূরে, পরবর্তী গ্রহের দূরত্ব সূর্য থেকে হবে তার দ্বিগুণ। বস্তুতঃ দেখা যায়, সামান্য কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও সূর্য থেকে গ্রহগুলির দূরত্ব মোটামুটি এই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত। দীর্ঘকাল পূর্বে গ্রহগুলির পারস্পরিক দূরত্ব সম্পর্কে বোড্‌স্ (Bodes) যে সংখ্যা-প্রণালী ধার্য করেছিলেন, বর্তমান উক্ত গাণিতিক নিয়মের সঙ্গে তার খুব বেশী গরমিল নেই।

সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলির প্রদক্ষিণ-পথ ছোট; সুতরাং তাদের স্বল্প পরিসর স্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হয়েছিল। স্বল্প পরিসরে পার্থিব কণা কম

এবং গ্যাসও কম, তাই গ্রহগুলি ছোট। সূর্যের নিকটস্থ বলে এখানে ভারী কণারই বেশী প্রাচুর্য। এজন্যে তাদের সম্মিলিত ভরে সৃষ্ট এই গ্রহগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও গুরুভার। সূর্যের প্রান্তের নিকটবর্তী বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল ও গ্রহাণুপুঞ্জ—সকলেই আয়তনে ক্ষুদ্র। সৌরজগতের অপর প্রান্তে প্লুটো সুবৃহৎ পরিসরের মধ্যে গঠিত হলেও সেখানে পার্থিব কণা কম ও গ্যাসের পরিমাণ বেশী থাকায় গ্রহটি বৃহদায়তনের হতে পারে নি। অধিকাংশ গ্যাসই শূন্যে মিলিয়ে গেছে—ক্ষুদ্র প্লুটোর সামান্য মাধ্যাকর্ষণ তাদের বন্দী করে রাখতে পারে নি। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন সৌরজগতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত; সে জন্যে তারা আকারেও বৃহৎ। তাদের কেন্দ্রে আছে দৃঢ়বদ্ধ পার্থিব কণা, বহির্ভাগে হাজার হাজার মাইলব্যাপী তরল পদার্থ ও গ্যাস-রাশির আবরণ।

গ্রহগুলির জন্মের পর তাদের চারদিকের আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হয় নি। ধূলিময় গ্যাস ও এতকাল ধরে যে সব ছোট-বড় জড়পিণ্ড সৌরসীমানার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, সূর্যের মহাকর্ষ অতিক্রম করে গ্রহগুলি তাদের অনেককে আপন আপন দেহ-সংলগ্ন করতে পারে নি। সূর্য এবং গ্রহ—উভয়েই আকর্ষণের লক্ষ্যে তারা গ্রহদিগকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করে। সূর্য প্রদক্ষিণ করতে করতে যে ভাবে গ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল, গ্রহ-প্রদক্ষিণ করতে করতে তেমনি করেই আবার উপগ্রহের জন্ম হলো। গ্রহগুলির ভর অনুসারেই তাদের উপগ্রহদের আয়তন ও সংখ্যা। বুধ ও শুক্রের উপগ্রহ নেই। পৃথিবীর আছে চন্দ্র, মঙ্গলের আছে দুটি উপগ্রহ, তারপরের গ্রহটি ভেঙ্গে গেছে, বৃহস্পতির বারোটি উপগ্রহ, শনির নয়টি, ইউরেনাসের পাঁচটি, নেপচুনের দুইটি এবং প্লুটোর কোনও উপগ্রহ নেই।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আমরা যে উল্কা দেখতে পাই, সেগুলি বস্তুতঃ ভূপৃষ্ঠের দিকে ধাবমান বহিরাকাশের পার্থিব কণা ও জড়পিণ্ড। এদেরই সমাবেশে গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি বলে এই মতবাদকে উল্কা মতবাদ (Meteorite Theory) বলা হয়।

ক্ষুদ্র ধূলিকণাসমূহের সংহতির আরম্ভ থেকে সুরু করে গ্রহগুলির সৃষ্টি হতে অন্ততঃ দশ কোটি বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছিল।

(২) **বলয় মতবাদ** (Disc Theory)

উল্কা মতবাদে গ্রহ-জন্মের সকল সমস্যা মেটে নি, ত্রুটি রয়ে গেছে। কণাগুলি একত্র সংলগ্ন হয়ে পিণ্ড হলো, পিণ্ডগুলি একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বড় বড় পিণ্ডের সৃষ্টি করলো, এরূপে ক্রমে বৃহত্তর পিণ্ড হতে হতে শেষ পর্যন্ত হলো গ্রহ। কিন্তু ওরা এভাবে একত্র সংলগ্ন থেকে গেল কেন? দ্রুতবেগের আবর্তন ছিল, আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পথ-পরিক্রমা ছিল—তবুও ওরা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো না কেন? এর উত্তর চাই।

দ্বিতীয়তঃ, সূর্যের যে ভর, তাতে তার আবর্তনের গতিবেগ অনেক দ্রুত হওয়া উচিত ছিল—হিসেব মত বারো ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসা উচিত। অথচ দেখা যাচ্ছে, দীর্ঘ ছাব্বিশ দিনে মাত্র একবার ঘোরে। এই মন্থর গতির জন্যে সৌরজগতের গ্রহগুলিই নিশ্চয় দায়ী কিন্তু কি ভাবে? এরও উত্তর চাই।

প্রশ্নগুলির সমাধানকল্পে ফ্রেড হয়েল (Fred Hoyle) যে মতবাদ রচনা করেছেন, তাকে বলয় মতবাদ (Disc Theory) নাম দেওয়া যেতে পারে।

সূর্য জন্ম নিয়েছিল এক বিশাল গ্যাস-স্তূপ থেকে। স্তূপটির বেধ ছিল দশ লক্ষ কোটি মাইল, আর তথায় গ্যাস ছিল অত্যন্ত বিরলভাবে অবস্থিত। আভ্যন্তরীণ কোনও অস্থিরতার দরুণ স্তূপটি ধীরে ধীরে আবর্তন করছিল। আবর্তনের ফলে স্তূপটি ক্রমে সঙ্কুচিত হচ্ছিল। সঙ্কোচনের

ফলে আবার স্তূপের আবর্তন-বেগ যেমন বাড়ছিল, তাপমাত্রাও তেমনি বাড়ছিল। স্তূপটি ক্রমে বর্তুলাকার প্রাপ্ত হলো। এইটিই আদিম সূর্য। আবর্তন যত বৃদ্ধি পেল, আদিম সূর্যের মেরুদ্বয় তত্তই চেপ্টে যেতে লাগলো, যার ফলে তার বিষুবরুত্ত স্ফীত হয়ে উঠে একটি চাকৃতি বা বলয় সৃষ্টি করলো। (চিত্র-৩)। আদিম সূর্য এই বলয়ে আপন আবর্তন-বেগ সঞ্চালিত করে দিচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে বলয়টিকে দূরেও ঠেলে ফেলছিল। একদিকে ঘূর্ণ্যমান বলয়টিকে দূরে অপসারণ, অন্য দিকে সূর্য-দেহের আবর্তনজনিত সঙ্কোচন—একই সময়ে এই যুগ্মক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো এই যে, বলয়টি সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো, উভয়ের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি হলো।

কিন্তু সূর্যের বিষুবরুত্তে এমন একটা বলয় সৃষ্টি কি সম্ভব? সম্ভব, যদি সূর্যের আবর্তন-বেগ বেশী হয়। সৌরজগতে বর্তমানে সর্বযোগে যে বস্তু আছে, তার ভর ৪৫০টি পৃথিবীর সমান। সূর্যে যদি এখন এই সমস্ত বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার আবর্তন-বেগ বৃদ্ধি পেয়ে বিষুবরুত্ত কিছুটা স্ফীত হয়ে উঠবে এই মাত্র—বেগ এতটা বাড়বে না, যাতে সেই বিষুবরুত্তে একটা বলয় সৃষ্টি হতে পারে। সূর্যের আবর্তন বাড়িয়ে তার বিষুবরুত্তে একটি বলয় সৃষ্টি করতে হলে অন্ততঃ তিন হাজার পৃথিবীর সমপরিমাণ ভর সূর্যদেহে যোগ করা দরকার। কাজেই বলয় মতবাদের সমর্থনে এই যুক্তির প্রয়োজন যে, সূর্যে এক কালে ঐ পরিমাণ বস্তুই ছিল। পরে বলয়রূপে বেরিয়ে এসে গ্রহ-উপগ্রহাদির জন্মের পর সেই বস্তুর অবশিষ্টাংশ মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। বিজ্ঞানী এই তথ্যের সমর্থনে অনেক যুক্তি দেখিয়েছেন। উক্ত অব-শিষ্টাংশ প্রধানতঃ হাইড্রোজেন গ্যাস। গ্রহ-উপগ্রহ গঠনের বস্তুসমূহ ত্যাগ করে সৌর-জগতের সুদূর প্রান্তে উপনীত গ্যাসরাশিকে সূর্য তার মহাকর্ষ দিয়ে আর ধরে রাখতে পারে নি—বহির্ভাগ থেকে গ্যাস সৌরজগতের সীমানা পেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলো। সৌরজগৎ থেকে গ্যাসরাশির বিলোপের পক্ষে মহাকর্ষীয় দুর্বলতাই একমাত্র কারণ নাও হতে পারে, সেই সঙ্গে হয়তো অন্যান্য কারণও বিদ্যমান ছিল। যেমন—ভ্রাম্যমান অপর কোনও নক্ষত্রের সামীপ্য ঘটলে ঐ গ্যাস সৌর সীমানার বাইরে সেই দিকেই আকৃষ্ট হবে।

৩নং চিত্র

আদিম সূর্যের আবর্তনের ফলে ক্রমে তার সঙ্কোচন ও বিষুবরুত্তে বলয়ের সৃষ্টি.

উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে সূর্যপৃষ্ঠে একটি বলয়ের আবির্ভাব বিজ্ঞানীদের মতে অসম্ভব নয়। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঐ বলয় হয়েছিল এবং সূর্যদেহের সঙ্গে তার একটা ব্যবধানও সৃষ্টি হয়েছিল। সূর্যদেহ থেকে বিচ্যুত বলয়টি এখন আর সূর্যের আবর্তন-বেগের সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না—গতি মন্থর হয়ে পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু যতটা পিছানো উচিত ততটা

পিছোবে না। তার কারণ, সূর্যের মহাকর্ষ ছাড়া এস্থলে আর একটি শক্তি সক্রিয় ছিল। সেটি হচ্ছে বলয়ের গ্যাসরাশি ও সূর্যদেহের মধ্যে অবস্থিত চৌম্বক শক্তি। যে কোন চাকার নাভি বা কেন্দ্র (Hub) কতকগুলি দৃঢ় শলাকা বা অর-এর (Spokes) দ্বারা তার বেড়ের (Rim) সঙ্গে যুক্ত। ফলে চক্র-কেন্দ্র ও চক্র-বেড় একই গতিতে চলে—তাদের পারস্পরিক গতিবেগে তারতম্য হবার উপায় নেই। বলয় ও সূর্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখা। স্থিতিস্থাপক রজ্জুর অবস্থা চিত্রে দেখানো হয়েছে। সূর্য দ্রুত ঘুরতে চায়, কিন্তু বলয়ের সঙ্গে তার ভাগ্য বাঁধা। রজ্জু প্রসারিত হয় সত্য, কিন্তু দ্রুতগামী সূর্যে পড়ে তার পিছু টান হয়; ফলে সূর্যের আবর্তন-বেগে মন্থরতা আসে। আবার বলয়ের গতি ধীর হতে চায়, কিন্তু সূর্যসংলগ্ন রজ্জু তাকে দ্রুত করে তোলে। এই ভাবে সূর্যের গতি ক্রমে মন্থর হবার ফলে তার আবর্তন-কাল শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো ছাব্বিশ দিনে একবার।
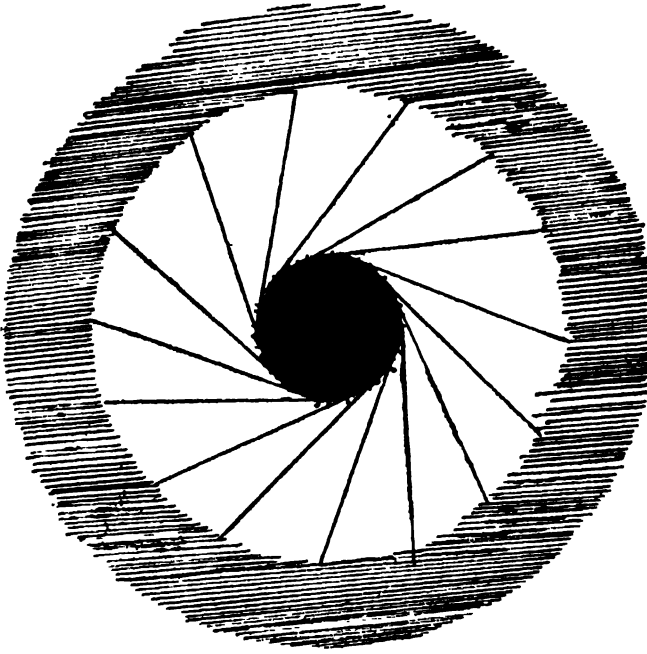
৪নং চিত্র

সূর্য ও গ্যাস বলয়ের মধ্যে চৌম্বক বন্ধন।

এমন কোনও অর না থাকলেও আছে অদৃশ্য চৌম্বক শক্তি। এই শক্তিকে অদৃশ্য স্থিতিস্থাপক রজ্জুর বন্ধনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে (চিত্র-৪)। চিত্রে সূর্য যেন চক্র-কেন্দ্র ও বলয় যেন চক্র-বেড়। মধ্যেকার ফাঁকা স্থানে আছে চৌম্বক ক্ষেত্র, যার কাজ উভয়কে অদৃশ্য রজ্জুবন্ধনে এক্ষেত্রে আরও লক্ষণীয় যে, সূর্যের আবর্তন-বেগ যত কমলো, বলয়টিরও তত দূরে সরে যাওয়া সম্ভব হলো।

যত দূরে যাবে, বলয়টির উপর সূর্যের মহাকর্ষের প্রভাবও তত কমবে; সুতরাং বলয়টি আরও দূরে অপসৃত হবে। এভাবে বলয়টি ক্রমে দূর থেকে

দূরান্তরে চলে যেতে লাগলো। জলন্ত অগ্নিগোলক সূর্য থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব হেতু বলয়ের তাপমাত্রাও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকলো।

যাবতীয় মৌলিক পদার্থ ও তাদের রাসায়নিক সম্মিলনে উৎপন্ন বিবিধ যৌগিক পদার্থ উত্তপ্ত বলয়টির মধ্যে গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। সূর্যের নিকট থেকে দূরে সরে যেতে যেতে বলয়ের তাপমাত্রা যত কমলো, উচ্চ-স্ফুটনাঙ্কের (High boiling point) বস্তু থেকে আরম্ভ করে ক্রমে নিম্নতর স্ফুটনাঙ্কের বস্তুসমূহ ততই ঐ গ্যাস-বলয়ের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে কঠিন ও তরল পদার্থে রূপান্তরিত হতে থাকলো। উচ্চ-তাপে যে সকল অণু ঘনীভূত হতে পারে, সূর্য-সন্নিহিত স্থানে তারাই সর্বপ্রথম কঠিন ও তরল পদার্থে পরিণত হলো। এদের মধ্যে প্রধান হলো লৌহ ও অন্য কতকগুলি ধাতু, সিলিকন, ধাতব অক্সাইড এবং ধাতব সিলিকেটজাতীয় পাথর, ভারী হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি। সূর্যের নিকটস্থ বুধগ্রহ থেকে আরম্ভ করে মঙ্গলগ্রহ পেরিয়ে আরও কিছুদূর পর্যন্ত এই সব বস্তু ঘনীভূত হয়েছিল। প্রাচুর্য ছিল লৌহ এবং পাথরের। এজন্যে এই স্থানকে লৌহ-শিলা অঞ্চল বলা যেতে পারে। অবশ্য লৌহ-শিলার গণ্ডী শুধু এই অঞ্চলটিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সকল স্থানেই সর্ববিধ বস্তু অল্প-বিস্তর বর্তমান থাকা সম্ভব। যে অঞ্চলে যে জাতীয় বস্তুর পরিমাণ বেশী, সেই অঞ্চলকে সেই নামে অভিহিত করা হয়। পূর্বোল্লিখিত চৌম্বক শক্তির সম্পর্ক বিশেষ করে গ্যাসরাশির সঙ্গে, তরল বা কঠিন পদার্থের সঙ্গে ততটা নয়। এজন্যে লৌহ-পাথর প্রভৃতি পদার্থগুলিকে ঐ অঞ্চলেই ত্যাগ করে গ্যাস-বলয়টি বহির্মুখে ভেসে চললো। এভাবে তাপমাত্রা ক্রমশঃ কমতে থাকায় যখন যে অঞ্চলে যে সব কঠিন ও তরল পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে, তাদের সে স্থানে রেখেই গ্যাসরাশি আরও দূরে সরে গেছে। লৌহ-শিলা অঞ্চলের পরবর্তী স্থানে তেল, জল, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি দ্রব্য অধিক পরিমাণে ঘনীভূত হয়েছিল। তার পরের অঞ্চলে নিয়ন ও মিথেনের প্রাচুর্য। অবশেষে গ্যাসরাশিতে অবশিষ্ট থাকলো প্রধানতঃ হাইড্রোজেন। সৌর-জগতে এখন আর সেই অবশিষ্টাংশের অস্তিত্ব নেই, মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। কি করে হাই-ড্রোজেনের এরূপ বিলুপ্তি সম্ভব হলো, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রণালীর বিষয় অনুমান করেছেন। এখানে সে আলোচনার আবশ্যক নেই।

উক্ত ক্রম-অনুযায়ী সৌরজগতে সূর্য-সন্নিহিত স্থানে সৃষ্টি হয়েছে প্রধানতঃ লৌহ ও পাথর দিয়ে গড়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল ও গ্রহাণুপুঞ্জের। এদের সীমানা ছাড়িয়ে সৃষ্টি হয়েছে তেল-জল-অ্যামোনিয়া-প্রধান বৃহস্পতি ও শনির। তার পরের গ্রহদ্বয় ইউরেনাস ও নেপচুনের প্রধান উপাদান নিয়ন ও মিথেন গ্যাস।

গ্যাসীয় অবস্থা থেকে ঘনীভূত হয়ে কঠিন ও তরল পদার্থসমূহ প্রথমে ক্ষুদ্র কণা বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহত্তর পিণ্ডরূপে আবির্ভূত হবে। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রত্যেকেই তারা বৃত্তাভাস পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য। সঙ্কীর্ণ স্থানে এরূপ অগণিত পথচারীর ভিড়ে কেউ গা বাঁচিয়ে চলতে পারে না। উল্কাবাদে প্রদর্শিত ঘটনাপঞ্জীর মত এখানেও ক্ষুদ্রকণা এবং জড়পিণ্ডগুলির মধ্যে সংঘর্ষ ও সংহতি অবশ্যই ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড গতিবেগ সত্ত্বেও তারা সমষ্টিবদ্ধ থাকলো কি করে? আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো না কেন? অধিকন্তু পুঞ্জীভূত হয়ে ক্রমান্বয়ে বৃহদাকার ধারণ করতে থাকলো। কিন্তু কেন? বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, নিশ্চয়ই কোনও আঠালো বস্তু বর্তমান ছিল, যা গায়ে লেগে থাকলে সংঘর্ষের পর আর ওরা পৃথক হয়ে যেতে পারে না। লৌহ-শিলা অঞ্চলে ভারী হাইড্রোকার্বন জাতীয় দ্রব্য ঘনীভূত হয়ে তৈল উৎপাদন করা সম্ভব। কণা ও

পিণ্ডগুলির গায়ে এই তেল লেগে থাকলে অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় পিচ্ জাতীয় আঠালো পদার্থে পরিণত হবে। এই অবস্থায় সংঘর্ষ ঘটলেও কণা বা পিণ্ডগুলির আর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার সম্ভাবনা থাকে না, ক্রমে ক্রমে একতাবদ্ধ হয়ে আকারে বড় হয়ে উঠবে। তারপর মহাকর্ষের প্রভাবই ওদের আর বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না বরং নিকটস্থ ক্ষুদ্রদের আত্মসাৎ করে নিয়ে দেহ বৃদ্ধি করবে। (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)।

গ্যাস-বলয়টি লৌহ-শিলার সীমানা পেরিয়ে এলে জল ও অ্যামোনিয়া ঘনীভূত হলো। এই অঞ্চলের গ্রহদ্বয় বৃহস্পতি ও শনি। সম্ভবতঃ জল ও অ্যামোনিয়া একত্রিত হয়ে এই গ্রহদ্বয়ের গোড়াপত্তন করেছিল। গ্যাস-বলয়ে লৌহ ও শিলার তুলনায় জল ও অ্যামোনিয়া অনেক বেশী ছিল; সে কারণে পূর্ববর্তী গ্রহচতুষ্টয় অপেক্ষা বৃহস্পতি ও শনি আয়তনে অনেক বড় হলো। তথাপি শুধু আঞ্চলিক জল ও অ্যামোনিয়ার দ্বারা গঠিত হলে এই গ্রহ দুটি এত বৃহদাকারের হতে পারে না। তাই অনুমিত হয়, গ্যাস-সমুদ্রে নিমজ্জিত অবস্থায় গ্রহদ্বয় প্রচুর হাইড্রোজেন ও অন্যান্য গ্যাস মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা নিজেদের দেহপৃষ্ঠে আবদ্ধ করে রেখেছে। এদের পরবর্তী অঞ্চলে সৃষ্ট হয়েছে ইউরেনাস ও নেপচুন। তখন গ্যাস-বলয়ে জল ও অ্যামোনিয়া আর বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না। কাজেই সম্ভবতঃ কোনও হাল্কা হাইড্রোকার্বন থেকে এই গ্রহদ্বয়ের জন্মের সূত্রপাত হয় এবং পরে অন্যান্য পদার্থ যুক্ত হয়ে এদের দেহবৃদ্ধি ঘটাতে থাকে। এদের মহাকর্ষ প্রবল হবার আগেই হাইড্রোজেন এই অঞ্চল থেকে বিদায় নিয়েছে, নতুবা এদের পৃষ্ঠদেশে হাইড্রোজেনের আবরণ অবশ্যম্ভাবী হতো। নিয়ন ও মিথেন গ্যাস হাইড্রোজেনের মত সৌরজগৎ ত্যাগ করে যেতে পারে নি। এজন্যে মহাকর্ষের দ্বারা ইউরেনাস ও নেপচুন প্রভূত পরিমাণ নিয়ন ও মিথেন গ্যাস আপন আপন দেহে বন্দী করে রেখেছে।

লৌহ-শিলা অঞ্চলে হাইড্রোজেন থাকাকালে কোনও আঠালো পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে না। তাই হাইড্রোজেন সে অঞ্চল থেকে দূরে সরে গেলে পর তথাকার গ্রহগুলির জন্ম শুরু হয়। কণা থেকে আরম্ভ করে ক্রমে পিণ্ড, বড় পিণ্ড ও গ্রহের আকারে আসতে যে সময় অতিবাহিত হয়, ততদিনে বলয়ের গ্যাসের অতি সামান্য অংশই এই স্থানে অবশিষ্ট ছিল। এজন্যে কোনও গভীর গ্যাসীয় আবরণ অর্থাৎ আবহমণ্ডল তাদের পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ হতে পারে নি। বুধের তো কোনই আবহমণ্ডল নেই, পৃথিবী ও মঙ্গলের পৃষ্ঠে আবহমণ্ডল আছে, কিন্তু বৃহস্পতির তুলনায় একেবারেই নগণ্য।

বহু ছোট ছোট জড়পিণ্ড ক্রমান্বয়ে একত্রিত হয়ে একটি গ্রহের উদ্ভব হলো—নাকি ছোট পিণ্ডগুলি প্রথমে গুটিকয়েক বড় পিণ্ড হলো ও পরে কয়েকটি বড় পিণ্ডের যোগে একটি গ্রহ হয়ে দাঁড়ালো? এসব প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নি। তবে মনে হয় উভয়ই সম্ভব। যে সব গ্রহের মেরু তাদের ভ্রমণ-কক্ষের উপর খাড়াভাবে অর্থাৎ সমকোণে বা প্রায় সমকোণে অবস্থিত, সেগুলি বোধ হয় ছোট ছোট পিণ্ডের সমষ্টি। আর যাদের মেরু ভ্রমণ-কক্ষের সঙ্গে অনেকটা হেলানো, সেগুলি বোধ হয় একাধিক বড় পিণ্ডের সংযোগে গঠিত।

তারপর উপগ্রহ হলো কিভাবে? যে সব বৃহৎ পিণ্ড নিকটস্থ বৃহত্তর পিণ্ডের অর্থাৎ গ্রহের সঙ্গে মিশে যেতে না পেরে সূর্য এবং গ্রহ উভয়ের মহাকর্ষের প্রভাবের মধ্যে দোটানায় পড়ে গেল, সেগুলিই উপগ্রহ হয়ে রইলো। উপগ্রহের সৃষ্টি সম্বন্ধে এরকম উত্তর দেওয়া চলে, কিন্তু তাতেও প্রশ্ন থেকে যায়। পৃথিবীর উপগ্রহ একমাত্র চাঁদ

কেন? আরও কয়েকটা কেন নয়? বৃহস্পতির উপগ্রহ বারোটা কেন? আরও কম কিংবা বেশী কেন নয়?—ইত্যাদি। এসব প্রশ্নেরও মীমাংসা হয় নি।

সূর্যের নিকটস্থ বুধগ্রহ থেকে আরম্ভ করে মঙ্গল পেরিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত লৌহ-শিলার ক্ষেত্র বিস্তৃত। দুই সীমানায় অবস্থিত বুধ ও মঙ্গল খুব বেশী লৌহ এবং পাথর সংগ্রহ করবার সুযোগ পেতে পারে না, তাই তারা ক্ষুদ্রায়তন। মধ্যস্থলে অবস্থিত শুক্র এবং পৃথিবী প্রচুর লৌহ ও শিলা সঞ্চয় করে আকারে অনেকটা বড় হয়েছে। মঙ্গল পেরিয়ে গ্রহাণুপুঞ্জে যে তিন সহস্রাধিক ক্ষুদ্র-বৃহৎ জড়পিণ্ড অর্থাৎ অণু-গ্রহ আছে, তারা একত্র যুক্ত হলেও বড়জোর চন্দ্রের সমায়তন হতো।

উপগ্রহগুলির ঘনত্ব পর্যালোচনা করলে বলয় মতবাদের যুক্তিপূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। যে গ্রহ সূর্য থেকে যত দূরে, তাদের উপগ্রহগুলির ঘনত্বও তত কম। কিছু কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও এটাই সাধারণ নিয়ম। চন্দ্র লৌহ-শিলা অঞ্চলে গঠিত। বৃহস্পতির উপগ্রহ আইয়ো ও ইউরোপার গঠন উপাদান সম্ভবতঃ গ্রহাণুপুঞ্জের ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। বৃহস্পতির অপর দুইটি বিরাটাকার উপগ্রহ গ্যানিমিড ও ক্যালিষ্টোতে কম ঘনত্বের উপাদান বেশী। সে উপাদান সম্ভবতঃ জল। শনির উপগ্রহগুলিতে বোধ হয় জল ও অ্যামোনিয়ার প্রাচুর্য।

উল্কাবাদ ও বলয়বাদ দুইটি মত-ই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এখনও বহু প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

ভারত-হিতৈষী তথা মানব-হিতৈষী হ্যাফ্‌কিন

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

ওয়াল্ডেমারমর্ডিকেই উল্‌ফ্‌ হ্যাফ্‌কিন (রুশীয় প্রাক্তন নাম ভ্লাদিমির অ্যারনোভিচ্‌ চ্যাভকিন) রুশদেশের অন্তর্গত অডেসা শহরে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ একটি ইহুদী বণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ও মায়ের নাম ছিল যথাক্রমে অ্যারোন ও রোজ্যালী চ্যাভ্‌কিন। দশ বছর বয়সে তিনি স্থানীয় একটি স্কুলে ভর্তি হন এবং দু-বছর পরে বার্ডিয়ানস্ক (Berdiansk) নামক স্থানের স্কুলে তৎকালীন জার্মান ও রুশীয় মিশ্র-পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করেন। তৎকালে তিনি শুধু বুদ্ধিমান ছাত্র হিসেবেই পরিচিত ছিলেন না, খেলাধূলায়ও তাঁর প্রভূত খ্যাতি ছিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নভোরসিক (বর্তমান অডেসা) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ডিগ্রী লাভ করেন এবং তৎপরে অডেসার জুওলজিক্যাল মিউজিয়ামে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞরূপে ১৮৮৩ সাল থেকে ১৮৮৮ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। সেখান থেকে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে যান এবং জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার অধ্যাপক মরিস শিফের (Morris Schiff) সহকারীরূপে মেডিক্যাল স্কুলে যোগ দেন। হ্যাফ্‌কিন জেনেভাতে মাত্র এক বছর ছিলেন, কারণ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে তাঁর পূর্বতন শিক্ষক মেচ্‌নিকফের উপস্থিতি এবং বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের অভূতপূর্ব গবেষণাগুলি তাঁকে ঐ প্রসিদ্ধ গবেষণাগারে টেনে নিয়ে এল।

কিছুকাল আগেই প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কক্‌ ভারতবর্ষে এসে কলেরা রোগের

জীবাণু 'কমা-ব্যাসিলাস' আবিষ্কার করেন। হ্যাফ্‌কিন পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে কলেরা রোগ সম্বন্ধে আগ্রহভরে নানরূপ গবেষণা আরম্ভ করেন এবং কলেরা-জীবাণুকে নানাভাবে নির্জীবনের পর তা দিয়ে কলেরার ভ্যাকসিন তৈরি করে নিজেই ঐ টিকা গ্রহণ করেন এবং বন্ধুদেরও তা দেন। তখন যে সকল স্থানে সদাসর্বদা কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়, সে সকল স্থানে ঐ টিকার ফলাফল পরীক্ষার জন্যে তিনি প্রথমতঃ সুদূর প্রচ্যের শ্যামদেশে যেতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা হয়ে ওঠে নি। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের প্রাক্তন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন প্যারিসে ব্রিটিশ রাজদূত ছিলেন। কতকটা তাঁরই আগ্রহপূর্ণ ব্যবস্থায় এবং কতকটা একজন ইংরেজ বন্ধু ও পরবর্তীকালে গবেষণাকার্যে সাহায্যকারী, কলকাতার চীফ স্যানিটারী অফিসার উইলিয়াম সিমসনের সাহায্যে তিনি তাঁর কলেরা সম্বন্ধীয় গবেষণাকার্য চালনার জন্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন। কিন্তু যত সহজে এক কথায় বলা হলো, তত সহজে তিনি তাঁর আজীবনের কর্মস্থল ভারতবর্ষে আসতে পারেন নি। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁর লণ্ডন থেকে যাত্রা করবার কথা ছিল। প্রথমে বাধা-বিপত্তির জন্যে ঐ যাত্রাকে একপক্ষকাল, তার পরে এক মাস এবং তার পরেও আরো দু-সপ্তাহ পিছিয়ে দিতে হলো। এরূপ বার বার বাধ্যতামূলক যাত্রা স্থগিতের জন্যে তিনি মনে অত্যন্ত উদ্বেগ ও ক্ষোভ অনুভব করতে লাগলেন। তার কারণ অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, লণ্ডনের রুশীয় দূতাবাসের জিজ্ঞাসাই নাকি ঐরূপ বিলম্বের কারণ। এখানেও যদি সেন্ট-পিটার্সবার্গের সরকারী কেউ আবার তার পেছনে লাগে, তাহলেই তো সর্বনাশ! ১৮৯৩ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে রুশীয় দূতাবাসে দেখা করবার জন্যে তিনি এক আমন্ত্রণ পেলেন। রুশ দেশ ছেড়ে চলে আসবার পর পাঁচ-পাঁচটি বছর তিনি সে দেশের জারশাসিত সরকারের সঙ্গে কোন সংশ্রবই রাখেন নি। সে কারণে তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, এই আমন্ত্রণজনিত সাক্ষাৎকার কখনই প্রীতিপ্রদ হবে না, কিন্তু যখন তাঁকে রুশীয় রাজদূত ব্যারন ডি ষ্টীলের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো, তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, রাজদূত আগেই তামাদি হয়ে যাওয়া তাঁর পাশপোর্টের অবৈধতার এবং তাঁর অতীত কয়েকটি বছরের কোন উল্লেখ তো করলেনই না, বরং তাঁর মত একজন প্রসিদ্ধ জীবাণুতত্ত্ব-বিদ্‌কে পেয়ে রুশীয় বিজ্ঞান যে গর্বিত এবং লণ্ডনে মহান রুশ সম্রাটের রাজদূতরূপে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে রুশ নাগরিক হ্যাফ্‌কিন ভারতবর্ষে গিয়ে অতি প্রশংসনীয় মানবিক ধর্মই পালন করছেন, এরূপ কথাও জানিয়ে দিবেন, বললেন!

রুশীয় রাজদূতের এরূপ কথাবার্তা ও অপ্রত্যাশিত ব্যবহার বুঝতে হলে তৎকালীন ইংরেজ-রুশ সম্পর্কের কথার উল্লেখ না করলে চলে না। যখন লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলিতে হ্যাফ্‌কিন এবং তাঁর উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন সম্বন্ধে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তখন ব্যারন ডি ষ্টীল কূটনৈতিক অনুসন্ধান সূত্রে এই রুশ নাগরিকের অতীত জীবন সম্বন্ধে অবহিত হন। তৎকালে ব্রিটিশ-রুশ সম্পর্ক খুব বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। সে কারণে হ্যাফ্‌কিনের সম্বন্ধে রুশীয় দূতাবাসের এরূপ অনুসন্ধানে ব্রিটিশ সরকার বিব্রত বোধ করছিলেন এবং তাদের মনে কিছুটা সন্দেহও ছিল যে, হ্যাফ্‌কিনের এরূপ ভারতবর্ষে যাওয়ার মূলে হয়তো বা কোন রাজনৈতিক কারণই প্রচ্ছন্ন আছে, বিশেষতঃ যখন রুশ দেশেরই কোন কোন অংশে কলেরার প্রাদুর্ভাব কখনো সখনো দেখা যায়, তখন হ্যাফ্‌কিন কেন তার পরিবর্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতবর্ষে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে ইচ্ছা করেন? রুশীয় রাজদূতও এই বিষয়ে বেশ

একটু বেকায়দায় পড়েছিলেন; তাই তিনি সেন্টপিটার্সবার্গের সুস্পষ্ট নির্দেশ চেয়ে পাঠালেন। অনেক জল্পনা-কল্পনার পর সেখান থেকে রাজদূতকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, হাফ্‌কিনের প্রতি যেন সৌজন্যমূলক অনুকূল ভাব দেখানো হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাঁর জন্যে সুপারিশ করা হয়। রুশীয় দূতাবাসের সুর ও ব্যবহার এভাবে উল্টে যাওয়ার কারণ হলো তাই।

হাফ্‌কিন কলকাতায় এসে বন্ধু সিমসনের সংযোগিতায় ছোট্ট একটি লেবরেটরীতে নিজের কাজ আরম্ভ করলেন অদম্য উৎসাহের সঙ্গে। ঐ সময়ে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব কলকাতায় বছরের সব সময়েই কলেরা লেগে থাকতো, শুধু দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়াম এবং চৌরঙ্গী ও পার্ক স্ট্রীটের সন্নিহিত শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত পাড়াগুলি মাত্র ছিল তার ব্যতিক্রম। শুধু মহামারীর সময়েই নয়, বছরের প্রায় সব সময়েই কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা ছিল অগণিত। দীর্ঘ দুটি বছর দেখে দেখে এবং শুনে শুনে হাফ্‌কিনের দরদী মন অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠলো—কি করে তা ঠেকানো যায়? এমন সময়ে খবর এলো কলকাতার সন্নিহিত কাঠালবাগান নামে একটি পল্লীতে কলেরা মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছে। হাফ্‌কিন এত দিন লক্ষ্য করে এসেছেন যে, বাংলা দেশে কলেরার মহামারী কোন নিয়মের অনুশাসন মানে না। এর প্রকৃতি অনেকটা মানুষ-খেকো বাঘের মত, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ওৎ পেতে থাকে কোন ঘরের বাইরে; তারপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই বা ততোধিক লোকের মৃত্যুর কারণ হয়। তারপর হয়তো বা কয়েক সপ্তাহ ধরে কিংবা সময়ে সময়ে মাসাবধি-কালও তা চুপ করে থাকে, আবার যথাসময়ে ব্যাঘ্র-ঝম্পন দেবার জন্যে। সুতরাং পরবর্তী আক্রমণকে প্রতিহত করতে নিপুণ শিকারীর মত হাফ্‌কিন, চৌধুরী, চাটার্জি, দত্ত ও গোস—এই চারজন ডাক্তার সহকারী ও কয়েক জন অধস্তন সহকারীসহ টিকা দেবার যন্ত্রপাতি সঙ্গে একটি ঘোড়ার গাড়ীতে ত্বরায় অকুস্থানে রওনা হলেন। ডাক্তার সিমসন তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন—এই কয়জন "ধীমান ও সহানুভূতিসম্পন্ন" ডাক্তার হাফ্‌কিনকে সত্যসত্যই ভালবাসতেন এবং তাঁর সকল কাজে সর্বান্তঃকরণে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যেতেন। প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার আহ্বান আসা মাত্র সেই মার্চ মাসের ভোর বেলায় তাঁরা সকলে সৈনিকের নিষ্ঠার সঙ্গে ভ্যাকসিনের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করে উপযুক্ত ইন্‌জেকশনের যন্ত্রপাতিসহ ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হলেন তাঁদের সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে। তখনো তাঁরা কেউ ভাবতেও পারেন নি যে, কলেরার সঙ্গে বিজ্ঞানের এই সর্বপ্রথম যুদ্ধে তাঁদের শুধু বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানেরই পরীক্ষা হবে না, ব্যক্তিগত সাহসেরও পরীক্ষা দিতে হবে ভালভাবেই।

কাঠালবাগান পল্লী কয়েকটি খড়ের ঘরের সমষ্টি মাত্র। একটি চালাঘরের নীচে দুটি রোগী কাৎরাচ্ছিল। হাফ্‌কিন ও তাঁর সঙ্গীরা দেখা মাত্র তাদের রোগ নির্ণয় করলেন মাত্র, তাদের জন্যে আর কিছুই করবার ছিল না। পাশেই একটি মন্দির ছিল, তারই কাছে ফাঁকা খানিকটা জমিতে এসে জড়ো হয়েছিল গাঁয়ের যত চাষাভুষা লোক। একজন ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে তাদের কাছে কলেরার প্রতিষেধক টিকার কথা বললেন, কিন্তু তারা সে কথা কানেই তুললো না। তাদের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল, "মারে হরি রাখে কে?" শ্বেতকায় ইংরেজ (?) ডাক্তারকে কেউ তো ডাকলেই না বরং আঙ্গুলে পথ দেখিয়ে বলে দিলে "যত শীগগির পার বেরিয়ে যাও এ-পাড়া থেকে।" বাঙালী ডাক্তারেরা তাদের শান্ত হবার জন্যে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী"। তারা হঠাৎ চীৎকার করে মারমুখো হয়ে উঠলো এবং বড় বড় পাথরের টুকরা

ছুঁড়ে মারিতে আরম্ভ করলো। তাদেরই একটার আঘাতে পরীক্ষার যন্ত্রপাতি ছিল যে কাচের বাক্সে, তা ভেঙ্গে গেল। কাচ ভাঁটার শব্দে জনতা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো এবং খুনখারাপি অবশ্যম্ভাবী বলে প্রতিভাত হলো। বেগতিক দেখে ডাক্তারেরা পলায়মান হলে হঠাৎ দেখা গেল—চেঁচামেচির মধ্যে শ্বেতকায় ডাক্তারটি নিজের গায়ের কোট, সার্ট, গেঞ্জি প্রভৃতি খুলে একেবারে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাঁর ডান হাতে ইন্‌জেকশন দিতে একজন সঙ্গীকে ইশারা করলেন। নিমেষের মধ্যে সকলের বিস্মিত চোখের উপর সঙ্গীটি তাঁর হাতে সিরিঞ্জের মধ্যে ভ্যাক্‌সিনসহ সূচটি ফুটিয়ে দিলেন। কিসে যেন কি হয়ে গেল! মারমুখী জনতা যেন কোন যাদুমন্ত্রের বলে হঠাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলো! সেই অবস্থায় সকলের চোখের সামনে হ্যাফ্‌কিন তাঁর সঙ্গের সকল লোকদের নিজেই ইন্‌জেকশন দিতে লাগলেন। কোথায় গেল সে বিরূপতা, তার বদলে সকলের চোখে ফুটে উঠলো এক অনির্বচনীয় বিস্ময়! উদ্যত ফণা সাপের মাথায় মন্ত্রপূত ধূলি পড়লে যেমনটি হয়, ঠিক তেমনটিই যেন হয়ে গেল। বিরূপতার পরিবর্তে তাদের চোখে ফুটে উঠলো যেন অদম্য বিস্ময় মিশ্রিত কৌতূহল। এই সুযোগে ডাক্তার দত্ত হ্যাফ্‌কিনের একটি ছোটখাটো বক্তৃতার তরজমা করে শোনালেন উৎসুক জনতাকে এবং বললেন যে, তারা ভুল করেছে, সঙ্গী সাহেব ডাক্তার ইংরেজ নন, একজন রুশীয়। তারপরই কয়েক জন স্বেচ্ছায় এগিয়ে এল কলেরার আক্রমণকে প্রতিহত করবার জন্যে সূচ ফুটানোর ব্যথা বরণ করতে। কিছু সময়ের মধ্যেই কাঠালবাগানের দু-শ' অধিবাসীর মধ্যে এক-শ' ষোল জন কলেরার প্রতিষেধক টিকা নিয়ে নিল। পরে খবর করে জানা গেল যে, যদিও সে গ্রামে কলেরা রোগে আরো নয়টি মৃত্যু ঘটেছে, তবুও যারা প্রতিষেধক টিকা নিয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউই মারা যায় নি।

তৎকালীন ভারতবর্ষে লোকসংখ্যার শতকরা আশি জনই ছিল নিরক্ষর; সুতরাং সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টের মাধ্যমে নয়, লোকের মুখে মুখে কলেরা-রাক্ষসীর প্রতিষেধক অস্ত্রের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল অনতিবিলম্বে দেশের সর্বত্র। কলকাতার স্বাস্থ্য বিভাগায় ঐ ক্ষুদ্র লেবরেটরীতে সাহায্যের জন্যে প্রতিদিনই শত শত অনুরোধ এসে পৌঁছাচ্ছিল। ঐরূপ অত্যাবশ্যক উপস্থিতির অনুরোধ পালন করতে হ্যাফ্‌কিন প্রথমেই ছুটলেন উত্তর বিহারে এবং তৎপরে ছোটনাগপুরের একটি খনিঅঞ্চলে। এই প্রায় আড়াই বছর ধরে কখনো ট্রেনে, কখনো ষ্টীমারে, কখনো বা নৌকায়, কখনো গরুর গাড়ীতে, কখনো অশ্বারোহণে আবার কখনো বা পদব্রজেই চললো সমাজসেবক হ্যাফ্‌কিনের উত্তর ভারতের সর্বত্র, শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক কথায়—কাননে-কান্তারে-শৈলে, দিগ্বিদিকে ভারত পরিক্রমা। বঙ্গ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, সিন্ধু, কাশ্মীর—এমন কি, বেলুচিস্থান পর্যন্ত দেশের কোন অংশই বাদ পড়লো না এই মৃত্যুঞ্জয়ী অভিযানে। কিন্তু হ্যাফকিনের উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীর সংশয়ী মন কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছিল না, কলেরার টিকা যে সংশয়াতীতভাবে সফল, তার জন্যে তার চাই আরো বহুকাল ধরে অগুণ্‌তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এভাবে ২৫,০০০ লোককে টিকা দেবার পর (তার মধ্যে প্রায় ষোল হাজার লোককে দু-দুবার করে), টিকা যে সত্যসত্যই সার্থক এবং সকল সময়ে, বিশেষতঃ মহামারীর কালেও টিকা নিলে যে, রোগের হাত থেকে মৃত্যু এড়ানো যায়, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন।

লক্ষ্ণৌ শহরে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে এবং শহরবাসীর মধ্যেও কলেরা ব্যাপক-

ভাবে মহামারীর আকারে দেখা দিলে কেবল হ্যাফ্‌কিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে টিকার ব্যবস্থার ফলেই তার ব্যাপক প্রসার ও মারাত্মকতা প্রতিরুত হয়েছিল। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ লক্ষ্ণৌ ও আলিগড়ের জনসাধারণ তাঁর হাতে একটি রূপার কাপ ও পনেরো হাজার টাকা তুলে দেন। দেশের সর্বত্র—এমন কি, সুদূর গ্রামাঞ্চলেও তাঁর পুণ্যশ্লোক নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকে এবং দেশের আপামর জনসাধারণ তাঁর নামকরণ করে মহান শ্বেত ভিষকাচার্য (The great white healer), কিন্তু তা সত্ত্বেও, যেমন সকল যুগেই হয়ে থাকে, মহামানবেরও শত্রুর অভাব থাকে না, তেমনি হ্যাফ্‌কিনের জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। তৎকালীন বিশ্বাসযোগ্য একটি দলিলে দেখতে পাওয়া যায় যে, পূর্ববঙ্গের কোন একটি গ্রামে বিরোধী মুসলমানেরা হ্যাফ্‌কিন ও তাঁর সঙ্গীদের উপর বিষ প্রয়োগের চেষ্টাও নাকি করেছিল। তারা ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁদের উপর সাপের বিষ-মাখানো চাদর ফেলে যাতে মশার কামড়ের সঙ্গে ঐ বিষ ঢুকে তাঁদের রক্তকে দূষিত করে মৃত্যু ঘটায়, তার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিল। খুব সম্ভব চেকোভ সুভোরিনের নিকট লিখিত পত্রে এই ঘটনারই উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু হ্যাফ্‌কিন ছিলেন নিরলস, নিষ্কাম, নির্বাক এবং শান্ত সমাহিত সাধক. কখনো তিনি কারো কাছে নিজে এরূপ দু'একটি অশোভন প্রতিকূলাচরণ সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্য কিংবা ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। অনেক ক্ষেত্রে মহামারীর সময় যখন লোকেরা স্বেচ্ছায় এসে টিকা নিতো না, তখন নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়েও তাদের টিকা নিতে সম্মত করাতেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হ্যাফ্‌কিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সার্থকতার যে রিপোর্ট বের হয় তাতে দেখা গেল, ৪২,০০০ হাজার লোকের মধ্যে ২৮,০০০ হাজার লোককে দু-বার এবং ১৪ হাজার লোককে একবার মাত্র টিকা দেওয়া হয়েছিল। টিকার চার দিন পরেই তাদের রক্তে কলেরার প্রতিষেধক শক্তি জন্মেছিল এবং শতকরা ৭২ জন লোকের মৃত্যু প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিল। টিকাগ্রহণকারীদের মধ্যে মৃত্যুর হার ছিল শতকরা তিন মাত্র, কিন্তু যারা টিকা নেয় নি, এমনি এক হাজার লোকের মধ্যে ১১০ জন অর্থাৎ শতকরা ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল ঐ রোগে। কিন্তু ভারতবর্ষের বাইরে, বিশেষতঃ জার্মেনীতে কক্ এবং ফেইফারের (Koch and Pfeiffer) মত প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা নিজে পরীক্ষা না করে এসম্বন্ধে হ্যাফ্‌কিনের সাফল্যকে পুরাপুরি মেনে নিতে চান নি। নিজেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে তাঁরা ভারতবর্ষে ঐ ভ্যাকসিন চেয়ে পাঠালেন এবং পাওয়া মাত্র বার্লিনের ডাক্তার ও ছাত্রদের টিকা দিয়ে তাদের দেহ থেকে প্রতিষেধক বস্তুসমন্বিত সিরাম নিয়ে দেখতে পেলেন যে, যাদের ঐ ভাবে টিকা দেওয়া হয় নি, তাদের সিরামের তুলনায় প্রথমোক্তটি কলেরা জীবাণু ধ্বংসে প্রায় দু'শ গুণ অধিক কার্যকরী, তখন তাঁরাও নিঃশঙ্কচিত্তে হ্যাফ্‌কিনকে অভিনন্দন জানালেন। লণ্ডনের 'টাইম্‌স্' ও দেশ-বিদেশের বহু সংবাদপত্র ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পত্রিকাগুলি হ্যাফকিনের জয়-জয়কারে মুখর হয়ে উঠলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই পৃথিবীজোড়া প্রশস্তির কিছুই হ্যাফ্‌কিনের কানে পৌঁছালো না—কেন না, তখন (অগাষ্ট, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি কলকাতার একটি হোটেলে তাঁর নিজের কামরার মধ্যে রোগশয্যায় প্রায় অচৈতন্য। একটি রাক্ষসীর হাত থেকে অসংখ্য লোকের জীবনরক্ষায় রত হ্যাফকিন আসামের অস্বাস্থ্যকর বনবাদাড়ে ভ্রমণরত অবস্থায় আর একটি রাক্ষসী ম্যালেরিয়ার শিকার হয়ে পড়লেন। অগাষ্ট গেল, সেপ্টেম্বর এল, নিয়মিত সবিরামভাবে ম্যালেরিয়া জ্বর হতে

লাগলো। তাই ভগ্নস্বাস্থ্য হাফ্‌কিনকে তাঁর কর্মস্থল ছেড়ে সাময়িকভাবে ইউরোপের অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে পালিয়ে যেতে হলো।

প্রায় ছয় মাস পরে হৃতস্বাস্থ্য কতকটা পুনরুদ্ধারের পর তিনি আবার তাঁর কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলেন (মার্চ, ১৮৯৬)। কলেরার টিকা অপ্রতিহত গতিতে চলতে লাগলো এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আরো ৩০,০০০ হাজার লোকের প্রতিষেধক টিকা গ্রহণের পর হাফ্‌কিনের মনে ঐ টিকার সার্থকতা সম্বন্ধে আর কোন সংশয় বা দ্বিধাই রইলো না।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর হাফ্‌কিনকে ভারত সরকার আমন্ত্রণ জানালেন। সে সময়ে স্ফোটকসহ যে প্লেগ রোগ (Bubonic plague) বোম্বাইতে মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে, তার কারণ অনুসন্ধানের জন্যে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর বোম্বাইয়ে পৌঁছে তিনি গ্র্যাণ্ট মেডিক্যাল কলেজের একটি কক্ষে নিজের পরীক্ষাগার স্থাপন করলেন। তিনি ঐ মারাত্মক রোগেরও প্রতিষেধক ভ্যাকসিন তৈরি করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে তিনি তা প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তিনি নিজেই ঐ ভ্যাকসিনের টিকা নিলেন। প্লেগের প্রতিষেধক ভ্যাকসিনের জন্যে দেশের নানা স্থান থেকে অচিরেই অনুরোধ আসতে লাগলো। ঐ অপরিসর ও অপ্রশস্ত লেবরেটরী কিছুতেই সে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারছিল না। কয়েক মাস পরে মহামান্য আগা খাঁ এই সদুদ্দেশ্যে তাঁর সুপ্রশস্ত বাংলোটি ছেড়ে দিলে হাফ্‌কিন সেখানে তাঁর লেবরেটরীটি সরিয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু তাও লেবরেটরীর পক্ষে অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল হওয়াতে প্যারেলে গবর্ণরের প্রাক্তন বাসভবনে তা স্থানান্তরিত হলো। তৎকালীন গবর্ণর লর্ড স্যাণ্ডহার্ষ্ট সেখানে "প্লেগ রিসার্চ লেবরেটরী"র প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন করলেন এবং হাফ্‌কিন তাঁর প্রথম ও মুখ্য ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন।

নতুন ভবনে স্থানান্তরের পর হাফ্‌কিন পূর্ণ উদ্যমে নিজের মনোমত কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ঐ সময়ে তাঁর নেতৃত্বে পাঁচজন ইউরোপীয় ও আটচল্লিশ জন ভারতীয় কর্মী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী মেজর বেনারম্যান (Major W. B. Bennerman) রয়্যাল সোসাইটির অধিবেশনে হাফ্‌কিনের আবিষ্কৃত প্লেগ-ভ্যাকসিনের অব্যর্থ উপকারিতা ও প্লেগ রিসার্চ লেবরেটরীতে তাঁর অন্যান্য সার্থক গবেষণার প্রশস্তিমূলক রিপোর্ট পেশ করলেন।

যখন দেশ-বিদেশে হাফ্‌কিনের সুনাম এভাবে নিয়তই প্রসারিত হয়ে চলেছে, ঠিক এমনি সময়ে নিয়তির পরিহাসে আবার বিপত্তি ঘটলো। পাঞ্জাবের অন্তর্গত মালকাওয়াল নামক স্থানে প্লেগের প্রাদুর্ভাবে যে ১০৭ জন প্লেগের টিকা নিয়েছিল, তাদের মধ্যে উনিশ জন ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। ভারত সরকার এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে যে কমিশন নিযুক্ত করলেন, তাঁরা রিপোর্ট দিলেন যে, যথাস্থানে ভ্যাকসিনের শিশিগুলি খোলবার আগেই তারা টিটেনাস জীবাণু-সংস্পৃষ্ট হয়েছিল। হাফ্‌কিন যথাসাধ্য প্রমাণ সহকারে তার প্রতিবাদ করলেও কমিশন তা মেনে নিলেন না; ফলে অসতর্কতা দোষে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। ভারত সরকারের পুরাপুরি সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় এভাবে হৃতমান হাফ্‌কিন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল এক বছরের ছুটি নিয়ে বোম্বাই পরিত্যাগ করলেন এবং লেবরেটরীর মুখ্য ডিরেক্টরের পদ থেকেও তিনি অপসৃত হলেন।

পরবর্তী তিন বছর তিনি ইউরোপের নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে গবেষণাগারগুলির কাজকর্ম দেখে

বেড়ালেন। ভারত সরকার কিন্তু বহু অনুসন্ধানের পরও হ্যাফ্‌কিনের বিরুদ্ধে দোষারোপের কোন কারণই খুঁজে পেলেন না। ওদিকে লণ্ডনে লর্ড লিষ্টার ও রাইট (Lord Lister and Wright) এবং কলকাতায় বন্ধু সিমসনের অক্লান্ত চেষ্টায় ভারত সরকার আবার তাঁকে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের জন্যে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁর স্বাভাবিক আশাবাদী কর্মপ্রচেষ্টার পরিবর্তে এক দারুণ হতাশার ভাব। এভাবেই ইংরেজ সরকারের অযথা প্রতিকূল আচরণে যে প্রদীপটি উজ্জল হয়ে চারদিকে আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করেছিল অতীতে, তাই আবার মিটিমিটি মাত্র জলতে লাগলো, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ঐ বছরে তিনি কর্ম থেকে অবসর নিয়ে চলে গেলেন ইউরোপে এবং লোকচক্ষুর অগোচরে একরকম নিরালায় জীবনযাপন করতে লাগলেন। তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয় সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত লসেনে এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর তাঁর বহুমূল্য জীবন-দীপটি চিরতরে নির্বাপিত হয়ে যায়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত হ্যাফ্‌কিনও চিরকুমার ছিলেন। তিনি অতি শান্ত প্রকৃতির, অমায়িক এবং অতি ভদ্র ছিলেন। নিজের সম্বন্ধে কখনো তাঁর মনে শ্লাঘার ভাব ছিল না এবং যারা তাঁর প্রতি শত্রুতার ভাব পোষণ করতো কিংবা প্রতিকূল আচরণ করতো, তাদের প্রতিও তিনি কোন বিদ্বেষভাব মনে স্থান দিতেন না। এক কথায়, তিনি ছিলেন নিরলস সত্যানুসন্ধানী, বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সেবক এবং সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি।

ভারতবাসী অকৃতজ্ঞ নয়। হ্যাফ্‌কিন বহুকাল আগে এদেশ থেকে চলে গেলেও ভারতবাসী তাঁকে ভোলে নি। হ্যাফ্‌কিনের মত অকৃত্রিম মানবদরদী বন্ধুর প্রশংসনীয় অবদানের স্বীকৃতি ও তাঁর অমূল্য স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করবার জন্যে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন মহারাষ্ট্র সরকার প্লেগ রিসার্চ লেবরেটরীর নতুন নামকরণ করেন "হ্যাফ্‌কিন ইনষ্টিটিউট"। বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে তাঁর মত একজন মহাপ্রাণ বিজ্ঞানীকেও অকুণ্ঠ প্রশংসার পরিবর্তে যেটুকু অপমান ও নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছিল, বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরকাল তা ইংরেজের কলঙ্ক-স্বরূপ চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আজ স্বাধীন ভারতে সেদিন এসেছে, যেদিন ভারতবর্ষের অতি দুর্দিনে লেবেডফ্‌ থেকে হ্যাফ্‌কিন পর্যন্ত রুশ সন্তানদের কাছ থেকে কি সাংস্কৃতিক বিষয়ে, কি বিজ্ঞানে যে সাহায্য পেয়েছে, তা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা উচিত। বিপদের দিনে যে বন্ধু, সেই প্রকৃত বন্ধু। সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত আমরা মহান সোভিয়েট দেশ থেকে যে একনিষ্ঠ বন্ধুত্বের পরিচয় পেয়ে এসেছি, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা কমই দেখতে পাওয়া যায়। তাই আজ একজন মহান রুশসন্তানের জীবনী পর্যালোচনা করে আমরা তাঁর অমর আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি।

প্রোটিন

সন্দীপকুমার বসু

আজ থেকে এক-শ' বছর আগেই বিজ্ঞানী-মহলে প্রোটিন বস্তুটি প্রাণের অন্যতম প্রধান উপাদানরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। ওলন্দাজ রসায়নবিদ্ মুল্ডার প্রোটিন শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। তাঁর ভাষায়—"উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে একটি বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বস্তুটি অত্যন্ত জটিল। নিঃসন্দেহে এটি সজীব পদার্থের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান এবং মনে হয় এর অভাবে জীবন সম্ভব নয়। এই বস্তুটিকে প্রোটিন আখ্যা দেওয়া হয়েছে।"

পরবর্তী শতাব্দীকালের গবেষণা প্রোটিনের গুরুত্ব সম্বন্ধে মুল্ডারের ধারণার যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছে। জানা গেছে যে, প্রোটিন হলো এক নির্দিষ্ট শ্রেণীর পদার্থ—একটিমাত্র যৌগ নয়। বস্তুতঃ গঠন ও কার্যকারিতায় প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের বৈচিত্র্যই প্রোটিনজাতীয় পদার্থের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। সজীব পদার্থের শক্তি যে সব জৈব অনুঘটক বা এন্‌জাইমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ও পরস্পর-সম্বন্ধভাবে পরিচালিত হয়, সেগুলি সব প্রোটিন। মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত থেকে দেহকলায় অক্সিজেন পরিবহনে নিযুক্ত হিমোগ্লোবিন সঞ্চালিত রক্তের আয়তনের স্থিরতারক্ষক ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র অণুর বাহক সিরাম অ্যালবুমিন—উভয়েই প্রোটিন। উচ্চতর প্রাণী-দেহে সংক্রমণ নিরোধের জন্যে যে সব অ্যান্টি-বডি তৈরি হয়, সেগুলিও প্রোটিন পরিবারভুক্ত। জীবকোষ ও কলার গঠন-সৌকর্যের জন্যে যে তন্তুজাতীয় পদার্থ প্রয়োজনীয়, সে সবই প্রোটিন-জাতীয়; যেমন—কেশ, শিং এবং পশমের কেরাটিন, কণ্ডরা (Tendon), সংযোজক কলা (Connective tissue) এবং অস্থির কোলাজেন ইত্যাদি। মাংসপেশীতে অবস্থিত মায়োসিন ও অ্যাক্টিন নামক দণ্ডাকার প্রোটিনদ্বয়ই পেশীর গঠন-ঐক্যের মূলাধার। মায়োসিন আবার একটি এন্‌জাইমও বটে, যেটি পেশী সঞ্চালনের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহকারী বিক্রিয়া ঘটায়। প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়া-নিয়ন্ত্রক বহু হর্মোনও প্রোটিনজাতীয়। চেতন-অচেতনের মধ্যসীমায় অবস্থিত ভাইরাসের অন্যতম প্রধান উপাদান প্রোটিন। আলোচিত দৃষ্টান্তগুলি জীবজগতে প্রোটিনের বিচিত্র ভূমিকার এক সামান্য অংশ মাত্র; কিন্তু এথেকেই তাদের গুরুত্বের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

সব রকম প্রোটিনের আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে অ্যামিনো অ্যাসিড নামক এক ধরণের সরল যৌগ পাওয়া যায়। উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবাণুতে যে অসংখ্য কোটি বিভিন্ন প্রোটিন আছে, তাদের আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন পরিমাণে প্রায় ২৫টি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। এর মধ্যে কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিড অপেক্ষাকৃত বিরল এবং বিশেষ বিশেষ কলার প্রোটিনে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ—আয়োডিন সমন্বিত থাইরক্সিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডটি কেবল থাইরয়েড গ্রন্থির থাইরোগ্লোবিউলিন নামক প্রোটিনে দেখা যায়। তবে অধিকাংশ প্রোটিন থেকে বিভিন্ন পরিমাণে প্রায় ২০টি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড প্রায় সর্বদাই পাওয়া যায়। রসায়নাগারে অন্যান্য বহু অ্যামিনো অ্যাসিড সংশ্লেষিত হয়েছে; কিন্তু সেগুলির

কোনটিই প্রোটিনের উপাদানরূপে দেখা যায় নি। প্রোটিন সৃষ্টির জন্যে প্রকৃতিদেবী মাত্র ২০ থেকে ২৫টি নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার করেন। কিন্তু কেন? বর্তমান অজ্ঞানতার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে জীবন-রহস্যের গভীরে প্রবেশ করতে পারলে এই আপাত স্বৈর প্রাকৃতিক নির্বাচনের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি প্রোটিনের মূল উপাদান হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনে এছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক মূলকের অবস্থিতিও লক্ষণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ অক্সিজেনবাহক প্রোটিন হিমোগ্লোবিনের আয়রন সমন্বিত হিম্ (Heme) মূলকগুলি অক্সিজেন সংযোজনের কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহের দ্বারা গঠিত প্রোটিন অংশটিও হিমোগ্লোবিনের জৈব তৎপরতার জন্যে অপরিহার্য। হিম্-মূলক সমন্বিত অন্যান্য কয়েকটি যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু উচ্চচাপে অক্সিজেন গ্রহণ এবং চাপ হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সেই অক্সিজেন ত্যাগের নির্দিষ্ট ধর্মটি একমাত্র হিমোগ্লোবিনেরই বৈশিষ্ট্য; অর্থাৎ হিম্-মূলকের সঙ্গে যুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির নির্দিষ্ট সজ্জাই যেন আয়রন সমন্বিত এই সক্রিয় কেন্দ্রগুলিকে উভমুখীভাবে অক্সিজেন গ্রহণ ও বর্জনের নির্দেশ দেয়।

প্রোটিনের গঠনের মূল একক হলো অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহের পরস্পর সংযোজনের ফলে উৎপন্ন পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খল। একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যামিনো মূলকটি প্রতিবেশী অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বক্সিল মূলকের সঙ্গে যুক্ত হলে এক অণু জল অপসারিত হয়ে যে পেপ্‌টাইড-যোজকটির সৃষ্টি হয়, তাতে হাইড্রোজেন সমন্বিত একটি নাইট্রোজেন পরমাণু এবং অক্সিজেন সমন্বিত একটি কার্বন পরমাণুর প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধিত হয়। রাসায়নিক পরিভাষায় পেপ্‌টাইড-যোজককে —(ONH)—রূপে লেখা যেতে পারে। অধিকাংশ পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খলের এক প্রান্তে একটি মুক্ত অ্যামিনো মূলক ও অপর প্রান্তে একটি মুক্ত কার্বক্সিল মূলক থাকে এবং মধ্যবর্তী অংশে বহুসংখ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড পেপ্‌টাইড-যোজকের দ্বারা মালার মত গ্রথিত থাকে। এই ধরণের পেপ্‌টাইডগুলিকে মুক্ত-শৃঙ্খল পেপ্‌টাইড বলা যায়। অনেক সময় আবার প্রান্তিক অ্যামিনো ও কার্বক্সিল মূলকগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে বদ্ধ বৃত্তাকার পেপ্‌টাইড গঠন করে। অবশ্য এই ধরণের বৃত্তাকার পেপ্‌টাইড অপেক্ষাকৃত বিরল।

প্রাকৃতিক পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন রকম হতে পারে। সাধারণতঃ অন্ততঃ ৩০টি পেপ্‌টাইড-যোজক সমন্বিত যৌগকে প্রোটিন বলা হয়। কয়েকটি পেপ্‌টাইড-হর্মোনের দৈর্ঘ্য এর চেয়ে কম। উদাহরণস্বরূপ পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অক্সিটোসিন ও ভ্যাসোপ্রেসিন হর্মোন দুটিতে মাত্র আটটি পেপ্‌টাইড-যোজক বর্তমান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, রাসায়নিক উপায়ে অক্সিটোসিন সংশ্লেষণ সম্ভব এবং সংশ্লেষিত যৌগটির সঙ্গে পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অক্সিটোসিনের কোন পার্থক্য নেই। মার্কিন প্রাণরসায়নবিদ্ দ্যু ভিনিয় প্রথম এই সংশ্লেষণ ঘটান। এজন্যে ১৯৫৫ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খলের উচ্চতর কোন দৈর্ঘ্যসীমা জানা নেই। সিরাম অ্যালবুমিন নামক প্রোটিনে ৫৭০টি অ্যামিনো অ্যাসিড মূলক একটিমাত্র পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বর্তমানে জ্ঞাত পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খলগুলির মধ্যে এটিই দীর্ঘতম।

অনেক প্রোটিনে আবার বিভিন্ন ধরণের যোজকের দ্বারা পরস্পর গ্রথিত একাধিক

পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খল দেখা যায়। গো-অগ্ন্যাশয় (Pancreas) থেকে প্রস্তুত হর্মোন ইন্‌সুলিন এরূপ দুটি শৃঙ্খলের দ্বারা গঠিত। একটির দৈর্ঘ্য ৩০ একক, অপরটির ২১ একক। দুটি ডাই-সালফাইড (Disulphide,-S-S-) যোজকের দ্বারা শৃঙ্খল দুটি যুক্ত থাকে। সিস্টাইন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডটি এই ধরণের বন্ধনের সৃষ্টি করে। ডাইসালফাইড যোজক শুধু বিভিন্ন শৃঙ্খলকেই যুক্ত করে না, একই শৃঙ্খলের বিভিন্ন অংশের মধ্যেও সংযোগ সাধন করতে পারে। একটিমাত্র পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খল সমন্বিত প্রোটিন সিরাম অ্যালবুমিনে এরূপ প্রায় ১৮টি যোজক আছে। প্রোটিন অণুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ডাইসালফাইড যোজকের দ্বারা সংযোগ সাধিত হলে তার অঙ্গবিন্যাসে বেশ একটু দৃঢ়তা সঞ্চারিত হয়। বিভিন্ন পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খল অবশ্য অন্যান্য দুর্বলতর যোজকের দ্বারাও গ্রথিত থাকতে পারে। হিমোগ্লোবিন অণুতে চারটি পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খল আছে। প্রত্যেকটি শৃঙ্খলে একটি করে হিম্‌-মূলক এবং প্রায় ১৫০টি অ্যামিনো অ্যাসিড মূলক থাকে। এই চারটি শৃঙ্খল একটি বেশ দৃঢ়সংবদ্ধ এককরূপে বহুদিন ধরে রক্তধারায় সংবাহিত হতে থাকে। অথচ এই শৃঙ্খল-চতুষ্টয়ের পরস্পর সংযোজনের জন্যে কোন ডাইসালফাইড যোজক নেই। বস্তুতঃ হিমো-গ্লোবিন দ্রবণে ঘন ইউরিয়া দ্রবণ যোগ করলে অণুগুলি ক্ষুদ্রতর এককে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

এই সব জটিল পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খলের অ্যামিনো অ্যাসিড সজ্জাক্রম নির্ধারণের উপায় মাত্র গত ২০ বছরের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। ঊনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের আদিযুগের প্রোটিন রাসায়নিকদের অনুসন্ধিৎসা মুখ্যতঃ প্রোটিনের সম্পূর্ণ আর্দ্রবিশ্লেষণের ফলে উৎপন্ন মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড পৃথকীকরণ ও সনাক্তকরণে সীমিত ছিল। ১৯৪০ সালে মার্টিন ও সিঞ্জ অ্যামিনো অ্যাসিড মিশ্রণ পৃথকীকরণের অত্যন্ত সরল ও কার্যকরী এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিটির নাম পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি। প্রোটিন-রসায়নে এক বিপ্লবাত্মক প্রগতি এনেছে এই পদ্ধতি। বস্তুতঃ এই আবিষ্কারের প্রভাব আজকের রসায়নশাস্ত্রের সমস্ত বিভাগেই ছড়িয়ে পড়েছে।

১৯৪৫ সালে ফ্রেডারিক স্যাঙ্গার ইনসুলিনের রাসায়নিক গঠন নিরূপণে ব্যাপৃত হন। ফ্লোরো-ডাইনাইট্রোবেঞ্জিন নামক একটি পদার্থের সাহায্যে পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খলের প্রান্তিক অ্যামিনো মূলকটিকে চিহ্নিত করবার একটি পদ্ধতি তিনি নির্ধারণ করেন। অসামান্য দক্ষতা ও নিরলস শ্রম সহকারে তিনি দীর্ঘ পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খলগুলির আংশিক ভাঙ্গনের উপায় স্থির করে উৎপন্ন ক্ষুদ্রতর এককগুলির বিশ্লেষণ করেন। এই সব ক্ষুদ্রতর এককগুলির অ্যামিনো অ্যাসিড সংযুতি ও সজ্জাক্রম থেকে ধীরে ধীরে ইনসুলিন অণুর রাসায়নিক গঠনের এক পরিষ্কার চিত্র গড়ে উঠতে থাকে। অবশেষে দীর্ঘ ৮ বছরের অক্লান্ত শ্রমের পর ১৯৫৩ সালে স্যাঙ্গার ইনসুলিন অণুর ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড মূলকের প্রত্যেকটির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করেন। আগেই বলা হয়েছে যে, ইনসুলিন অণুতে দুটি পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খল আছে। যে দুটি ডাইসালফাইড যোজকের দ্বারা এই শৃঙ্খল দুটি পরস্পর গ্রথিত, তাদের প্রকৃতি ও অবস্থানও তিনি স্থির করেন। দুটি শৃঙ্খলের ক্ষুদ্রতরটিতে যে তৃতীয় একটি ডাই-সালফাইড যোজক একটি লুপের সৃষ্টি করেছে, তাও তিনি প্রমাণ করেন।

গো-ইনসুলিন নিয়ে স্যাঙ্গার প্রথম কাজ সুরু করেন। পরে তিনি অশ্ব, শূকর, মেষ ও তিমির ইনসুলিনের গঠনও নিরূপণ করেছেন। এই সব বিভিন্ন প্রজাতির ইনসুলিনের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড সজ্জাক্রমের আশ্চর্য সাদৃশ্য

আছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ৩০টি অ্যামিনো অ্যাসিড সম্বলিত বৃহত্তর শৃঙ্খলটির গঠন এক। অন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড যোজকের জন্যে ক্ষুদ্রতর শৃঙ্খলে যে লুপের সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যবর্তী তিনটি অ্যামিনো অ্যাসিডেই উপরিউক্ত বিভিন্ন ইনসুলিনের গঠন-পার্থক্য নিহিত। গো-ইনসুলিনে এই সজ্জাক্রমটি অ্যালানিন-সেরিন-ভ্যালিন, অশ্বের ইনসুলিনে থ্রিয়োনিন-গ্লাইসিন-আইসোলিউসিন, শূকরের ইনসুলিনে থ্রিয়োনিন-সেরিন-লিউসিন, মেষের ইনসুলিনে অ্যালানিন-গ্লাইসিন-ভ্যালিন এবং তিমির ইনসুলিনে থ্রিয়োনিন-সেরিন-আইসোলিউসিন। এই ধরণের গবেষণা এক নতুন ধরণের তুলনামূলক জীববিদ্যার সূচনা করেছে, বিভিন্ন প্রজাতির একই উদ্দেশ্যসাধক প্রোটিনসমূহের আণবিক স্তরে তুলনামূলক আলোচনা যার বিষয়। এর ফলে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে ঐক্য ও পার্থক্যের এক গভীরতর ধারণা সম্ভব হবে, যা অভিব্যক্তির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধতর করবে। স্যাঙ্গারের গবেষণা জীববিদ্যায় যে নতুন দিগন্তের সংবাদ এনেছে, তারই স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৮ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ইনসুলিনের গঠন নিরূপণে স্যাঙ্গার প্রধানতঃ পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি ও পেপার ইলেক্‌ট্রোফোরেসিস্ পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে স্টাইন ও মুর অ্যামিনো অ্যাসিড ও পেপ্‌টাইডসমূহের মিশ্রণ পৃথকীকরণের জন্যে আরও কার্যকরী কৌশল আবিষ্কার করেছেন। আয়ন-বিনিময় প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়ে তাঁরা এক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নির্মাণ করেছেন, যার সাহায্যে খুব সামান্য পরিশ্রমে অল্প সময়ে এই দুরূহ পৃথকীকরণ সম্ভব। আজ এই স্বয়ংক্রিয় অ্যামিনো অ্যাসিড বিশ্লেষক (Automatic amino acid analyzer) যন্ত্রটি প্রত্যেক প্রোটিন-রসায়নাগারের অপরিহার্য অঙ্গ।

স্টাইন, মুর এবং হার্স এই উন্নত প্রয়োগ-কৌশলের সাহায্য নিয়ে ইনসুলিনের চেয়ে অনেকগুণ জটিলতর রাইবোনিউক্লিয়েজ নামক এনজাইমের গঠন নির্ণয় করেছেন। রাইবোনিউক্লিয়েজ এনজাইমটি জীবকোষের অপরিহার্য উপাদান রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের ভাঙ্গন ঘটায়। ১২৪টি অ্যামিনো অ্যাসিড মূলক সমন্বিত একটিমাত্র পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খলের দ্বারা গঠিত এই অণুটিতে চারটি ডাইসালফাইড যোজকের দ্বারা অনেকগুলি লুপ সৃষ্টি হয়েছে। স্টাইন, মুর ও তাঁদের সহকর্মীরা শুধু যে রাইবোনিউক্লিয়েজ অণুটির অ্যামিনো অ্যাসিড সজ্জাক্রম নির্ণয় করেছেন তা নয়, উপরিউক্ত ডাইসালফাইড যোজক চতুষ্টয়ের সঠিক অবস্থানও নিরূপণ করেছেন। এঁদের গবেষণা থেকেই সর্বপ্রথম একটি এনজাইমের রাসায়নিক সঙ্কেত (Formula) জানা গেছে। স্যাঙ্গার, স্টাইন ও মুর উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড সজ্জাক্রম নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে; যেমন —তিমির মায়োগ্লোবিন, মানুষের হিমোগ্লোবিন, টোব্যাকো মোজেইক ভাইরাসের প্রোটিন, সাইটোক্রোম-সি ইত্যাদি।

প্রোটিন রসায়নের এই অভাবনীয় প্রগতি কিন্তু বিজ্ঞানীমনের কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটায় নি। এখনো আমরা জানি না—কেন রাইবোনিউক্লিয়েজ এনজাইমটি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের ভাঙ্গন ঘটায়। এর সম্পূর্ণ দ্বিমাত্রিক সঙ্কেতটি জানা গেছে, কিন্তু প্রকৃত ত্রিমাত্রিক অঙ্গবিন্যাস এখনো অজানা। রাইবোনিউক্লিয়েজ স্ফটিকের এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন প্যাটার্ণ থেকে এর ত্রিমাত্রিক অঙ্গবিন্যাস নির্ধারণের চেষ্টা চলছে। এই প্রসঙ্গে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ডস্-এর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। ব্যাসিলাস সাবটিলিস নামক জীবাণু থেকে প্রস্তুত সাবটিলিসিন নামক

এনজাইম রাইবোনিউক্লিয়েজ অণুর একটিমাত্র পেপ্‌টাইড-যোজককে বিচ্ছিন্ন করে অণুটিকে ছুটি অসমান ভাগে ভাগ করে। একটির দৈর্ঘ্য ২০ একক, অপরটির ১০৪ একক। মধ্যবর্তী পেপ্‌টাইড-যোজকটি বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও অণুটির উপরিউক্ত ছুটি অংশ কিন্তু স্বতঃই পৃথক হয় না। বস্তুতঃ এই অংশ ছুটি বেশ দৃঢ়ভাবেই যুক্ত থাকে এবং এনজাইমটির এনজাইম-ধর্মও অবিকৃত থাকে। ট্রাইক্লোরোঅ্যাসেটিক অ্যাসিডের সাহায্যে অংশ ছুটিকে পৃথক করা যায়। কিন্তু প্রশমিত জলীয় দ্রবণে পৃথকীকৃত অংশ ছুটিকে মিশ্রিত করলে আবার তারা যুক্ত হয় এবং এই পুনর্বার যুক্ত সমবায়টিও রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডকে ভাঙ্গতে পারে। এককভাবে পৃথকীকৃত অংশ ছুটির অবশ্য উপরিউক্ত এনজাইম-ধর্ম নেই। স্পষ্টতঃই ছুটি অংশের মধ্যে পারস্পরিক পূরক সম্পর্কই এই অসাধারণ আসক্তির কারণ। কিভাবে এই ঘটনাটা ঘটে, তা জানতে হলে অণুটির ত্রিমাত্রিক অঙ্গবিন্যাস জানা একান্ত প্রয়োজন।

রিচার্ডস্‌-এর কৌশলে যে পেপ্‌টাইডটি বাদ দেওয়া যায়, সেটি রাইবোনিউক্লিয়েজ অণুর অ্যামিনো প্রান্তে অবস্থিত এবং তাঁর গবেষণা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই প্রান্তিক অংশ এনজাইমটির সক্রিয়তার জন্যে অবশ্য প্রয়োজন। অ্যানফিনসেন ও অন্যান্য কয়েক জন অণুটির অপর প্রান্তের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাজ করেছেন। কার্বক্সিপেপ্‌টিডেজ নামক এনজাইমটি অণুটির কার্বক্সিল প্রান্ত থেকে একটির পর একটি অ্যামিনো অ্যাসিড বিচ্ছিন্ন করতে পারে। এনজাইম-ধর্মের কোন হানি না ঘটিয়ে এর সাহায্যে তিনটি পর্যন্ত অ্যামিনো অ্যাসিড বাদ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই প্রান্তের চতুর্থ অ্যামিনো অ্যাসিড মূলকটি মূল শৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই অণুটির রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড ভাঙ্গনের ক্ষমতা অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে লোপ পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এনজাইম-ধর্মের জন্যে রাইবোনিউক্লিয়েজ অণুর ছুই প্রান্তের নিকটবর্তী অংশগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। অণুটির ত্রিমাত্রিক অঙ্গবিন্যাস অজানা হলেও উপরিউক্ত তথ্যগুলির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এক্ষেত্রে পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খলটি এমনভাবে ভাঁজ হয়ে থাকে, যাতে তার ছুটি প্রান্ত বেশ কাছাকাছি এসে পড়ে এবং এর ফলে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড ভাঙ্গনে ছুটি প্রান্তেরই প্রয়োজনীয় ভূমিকা থাকে।

বর্তমানে কোন এনজাইমের সম্পূর্ণ ত্রিমাত্রিক অঙ্গবিন্যাস জানা নেই। তবে মায়োগ্লোবিন ও হিমোগ্লোবিন নামক ছুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিম্‌-প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক অঙ্গবিন্যাস জানা গেছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ কেন্‌ড্রু প্রায় ১৫ বছর গবেষণান্তে স্পার্ম তিমির পেশীকলার মায়োগ্লোবিন অণুর ত্রিমাত্রিক অঙ্গবিন্যাস নির্ণয় করেছেন। মায়োগ্লোবিন রক্ত থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে প্রয়োজনমত পেশীকলায় সরবরাহ করে। অণুটি একটি হিম্‌-মূলক সমন্বিত ১৫১ একক দীর্ঘ একটি পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খল। পেপ্‌টাইড শৃঙ্খলটি অবিশ্বাস্য রকম জটিল ধরণে ভাঁজ হয়ে থাকে। অবশ্য এই জটিলতা শুধু মায়োগ্লোবিন অণুর বৈশিষ্ট্য নয়। দীর্ঘ ২০ বছর গবেষণার পর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ম্যাক্স পেরুৎজ সম্প্রতি অশ্বের রক্তের হিমোগ্লোবিনের ত্রিমাত্রিক অঙ্গবিন্যাস নির্ণয়ে সফল হয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে যে, হিমোগ্লোবিন অণুটি চারটি ক্ষুদ্রতর এককের সমবায়ে গঠিত। প্রত্যেকটি এককে থাকে একটি করে হিম্‌-মূলক ও প্রায় ১৫০টি অ্যামিনো অ্যাসিড মূলক সমন্বিত একটি পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খল। হিমোগ্লোবিন অণুর এই চারটি ক্ষুদ্রতর এককের সঙ্গে মায়োগ্লোবিনের ত্রিমাত্রিক অঙ্গবিন্যাসগত সাদৃশ্য বেশ সুস্পষ্ট। এই কাজের ফলে জানা গেছে, কিভাবে

হিমোগ্লোবিনের চারটি পেপ্‌টাইড-শৃঙ্খল ভাঁজ হয়ে একটিমাত্র একক গঠন করে। হিম্‌-মূলক-চতুষ্টয়ের অবস্থান, পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব এবং কিভাবে তারা অক্সিজেন গ্রহণ করে, তাও নির্ণীত হয়েছে। হিমোগ্লোবিন ও মায়োগ্লোবিনের ত্রিমাত্রিক অণুবিন্যাস নির্ণয় সাম্প্রতিককালের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বসমূহের অন্যতম। আশা করা যায়, উত্তরকালে এই ধরণের গবেষণা বিস্তারের ফলে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিনের প্রকৃত আণবিক গঠন জানা যাবে। এই জ্ঞান জীবনের আশ্চর্য প্রকাশের সম্যক ধারণার জন্যে অত্যাবশ্যক।

ধূমকেতু

শ্রীকামিনীকুমার দে

আকাশে কোন ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটিলে সাধারণ লোকেম মনে ধূমকেতু সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ দেখা যায়। সম্প্রতি জাপানের দুইজন সৌখীন আকাশ-পর্যবেক্ষক কাওরু ইকেয়া (Kaoru Ikeya) এবং ৎসুতোম সেকি (Tsutom Seki) একটি নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছেন। যে কেহ প্রথম কোন ধূমকেতু আবিষ্কার করেন, তাঁহার নামানুসারে ঐ ধূমকেতুর নাম দেওয়া হয়। এই কারণে এই নূতন ধূমকেতুটির নাম 'ইকেয়া-সেকি'। জাপানে এক মানমন্দির হইতে একদিন (২১শে অক্টোবর '৬৫ ভারতীয় সময় ১০ঘ. ৩৪মি. সময়ে) দেখা গেল ইহা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেই পশ্চিম জাপান হইতে অন্যতম আবিষ্কর্তা সেকি এবং অপর দুইজন পর্যবেক্ষক ২৫ মিনিট ধরিয়া এই ধূমকেতুর পুচ্ছ দেখিতে পান। ২৯শে অক্টোবর হইতে আরম্ভ করিয়া ৮ই নভেম্বর পর্যন্ত শেষরাত্রে কলিকাতার আকাশে ইহার দীর্ঘপুচ্ছ (প্রায় ২০°) দেখা গিয়াছে; পুচ্ছের মধ্যভাগ বেশী উজ্জ্বল ছিল, ইহার মস্তক স্পষ্ট ছিল না। মনে হয় বিদীর্ণ হইবার ফলে মস্তকের ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে। ইহাকে মাদ্রাজ এবং বোম্বাই হইতেও দেখা গিয়াছিল।

রাত্রির আকাশে কখনও কখনও হঠাৎ একটা জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে। অস্পষ্টতা হইতে কিছুদিনের মধ্যে ইহার রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠে, আবার ক্রমশঃ ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এই রকম জ্যোতিষ্কের নাম ধূমকেতু। বড় ধূমকেতুই খালি চোখে দেখা যায়। ইহার একটা উজ্জ্বল পিণ্ড থাকে, যাহাকে বলা হয় মস্তক। মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যের বিপরীত অভিমুখে একটা পুচ্ছ থাকে। ধূমকেতু সূর্যের নিকটবর্তী হইবার কালে পুচ্ছ গঠিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃই ইহা দীর্ঘতর হয়। ধূমকেতু সূর্যের নিকটতম হইবার পর আবার যখন সূর্য হইতে দূরের দিকে চলিয়া যাইতে থাকে, তখন পুচ্ছ হ্রাস পাইতে থাকে এবং পরিশেষে লোপ পায়। কখনও কখনও একাধিক পুচ্ছও হইয়া থাকে। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে ধূমকেতুর মস্তকের কেন্দ্রস্থলকে একটি তারার মত দেখায়। ইহাকে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র-পিণ্ড বলে। নিউক্লিয়াসকে ঘিরিয়া একটি গ্যাসীয়

মণ্ডল থাকে, যাহাকে 'কোমা' * বলে। ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়কণা ও কঠিন বস্তুখণ্ড লইয়া গঠিত। ইহাদের আয়তনের তুলনায় পরস্পরে মধ্যে দূরত্ব খুব বেশী। ফলে ধূমকেতু যদি পৃথিবী ও কোন তারার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া সমসূত্রে অবস্থান করে, তখন তারাটি ঢাকা পড়ে না। সূর্যের নিকটবর্তী হইলেই ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্যের আলো এবং তাপ ধূমকেতুর উপাদান কণাসমূহকে উত্তেজিত করিয়া দীপ্তিমান করে, কিছু আলো প্রতিফলিত হইয়াও আসে। ধূমকেতু সূর্যের নিকটতম হইলে উজ্জ্বলতম হয়। সুতরাং সূর্যোদয়ের আগে পূর্বাকাশে অথবা সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে ইহাকে দেখা যায়। সূর্যের বিপরীত-পুচ্ছ তখন ঊর্ধ্বমুখী আলোকশিখার মত দেখায়। প্রথম ক্ষেত্রে সূর্যোদয়ের পর সূর্যের উজ্জ্বল আলোকে ইহা ঢাকা পড়ে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সূর্যাস্তের কিছু পরে উহা অস্তমিত হয়।

সৌরজগতের অধিবাসীদের মধ্যে ধূমকেতুর আয়তন সর্ববৃহৎ, কিন্তু ইহার ভর নগণ্য। মস্তকের ব্যাস ২৯০০০ কিলোমিটার (১৮,০০০ মাইল) হইতে ১৮½ লক্ষ কিলোমিটার (১১½ লক্ষ মাইল)। কোন কোন ধূমকেতুর পুচ্ছ ১৬ কোটি কিলোমিটারেরও অধিক। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে একটি ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছিল। এক সময়ে ইহার পুচ্ছের দৈর্ঘ্য ৩২ কোটি কিলোমিটারে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিউক্লিয়াসের ব্যাস পাঁচশত কিলোমিটার হইতে দুই কিলোমিটারের মধ্যে। ধূমকেতুর উজ্জ্বল মনোহর পুচ্ছের জন্যই ইহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পুচ্ছ না থাকিলে ইহার আসা-যাওয়াকে সাধারণ লোক লক্ষ্যই করিত না। ধূমকেতু যখন সূর্যের নিকটবর্তী হইতে থাকে, তখন সূর্যের বিপরীতমুখী পুচ্ছ থাকে পশ্চাতে, আর যখন সূর্য হইতে দূরের দিকে যাইতে থাকে, তখন পুচ্ছ চলে সম্মুখে।

সূর্যের তাপে ধূমকেতুর কেন্দ্রপিণ্ড হইতে গ্যাস ও বস্তুকণা ছিট্‌কাইয়া পড়ে, তখন কোমার আয়তন বৃদ্ধি পায়। সূর্যালোকের চাপে কোমা হইতে গ্যাস ও অতিসূক্ষ্ম জড়কণা সূর্যের বিপরীত দিকে গিয়া পুচ্ছের সৃষ্টি করে। পুচ্ছ হ্রাস পাইবার কালে ইহার কিছু উপাদান ধূমকেতু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মহাকাশে ছড়াইয়া পড়ে। এই কারণে ধূমকেতু তাহার সামান্য পরিমাণ ভর হারাইয়া ফেলে।

প্রাচীন কালে ধূমকেতুর আবির্ভাবকে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা দুর্ভিক্ষ, মহামারীর পূর্বাভাস বলিয়া মনে করা হইত। ৭০ খৃষ্টাব্দে জেরুজালেমের ধ্বংস, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্মানদের ইংল্যাণ্ড বিজয়, ১৪৫৩ সালে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপোলের পতন ইত্যাদি ঘটনার পূর্বে ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছিল। নিউটনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হ্যালি সর্বপ্রথম ধূমকেতুর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। তাঁহার গবেষণার ফলে জানিতে পারা যায় যে, ধূমকেতু সৌরজগতেরই অধিবাসী এবং গ্রহগুলির মত নিউটনের গতির নিয়ম মানিয়া ইহাদের গতিবিধি চলিয়া থাকে। ইহাদের আবির্ভাবের সঙ্গে জগতের অকল্যাণের কোন সম্পর্ক নাই। পরে আর এক রকমের আশঙ্কা অনেকের মনে উদিত হইয়াছিল যে, ধূমকেতুর সঙ্গে যদি পৃথিবীর

---

* কোমা (Coma) শব্দের অর্থ মাথার চুল। Comet বা ধূমকেতু হইল 'কেশযুক্ত তারা'। তখনকার দিনে ধূমকেতু সম্বন্ধে ধারণা হোমার ও মিল্টনের লেখা হইতে বুঝা যাইবে—

The red star, that from his flaming hair
Shakes down diseases, pestilence and war (Homer-Iliad)

......like a comet burned
That fires the length of Ophiuchus huge
In th' arctic sky, and from his horrid hair
Shakes pestilence and war (Milton—Paradise Lost).

সংঘর্ষ ঘটে, তাহা হইলে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে। অধুনা বুঝিতে পারা গিয়াছে—এই আশঙ্কারও কোন হেতু নাই। ধূমকেতুর আয়তন প্রকাণ্ড হইলেও ইহার ভর অর্থাৎ বস্তুমান সামান্য। এই পর্যন্ত ধূমকেতুর প্রভাবে কোন গ্রহ বা উপ-গ্রহের গতিপথের পরিবর্তন সাধিত হইতে দেখা যায় নাই। সূর্য বা বড় গ্রহ বৃহস্পতির অত্যধিক নিকটস্থ হইলে ধূমকেতু বিদীর্ণ হইয়া যায়—এমন কি, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। বিচূর্ণ ধূমকেতুর উপাদান জড়কণা এবং বস্তুপিণ্ডসমূহ কক্ষপথে সম্মুখে-পশ্চাতে ছড়াইয়া পড়ে। পৃথিবী যদি এই কক্ষপথ অতিক্রম করে, তখন প্রচুর উল্কাপাত হয়। এরূপ কয়েকটি লুপ্ত ধূমকেতুর গতিপথে পৃথিবী প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া উল্কাবৃষ্টির সম্মুখীন হয়। পৃথিবীর সঙ্গে ধূমকেতুর সংঘর্ষ দেড় কোটি বৎসরের মধ্যে হয়তো বা একবার ঘটিতে পারে। যদি বাস্তবিকই এই রকম কোন সংঘর্ষ ঘটে, উহা তেমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার হইতে পারে না। ধূমকেতুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিণ্ড বেগে উল্কার ঝাঁকের মত পৃথিবীপৃষ্ঠে আসিয়া পড়িবে। পৃথিবীর যে অংশে ইহা ঘটিবে, সেখানে ইহা খুব পীড়াদায়ক হইবে, কিন্তু ইহাতে জীব-বসতি লোপ পাইবে না। পৃথিবী তাহার চলিবার পথ হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হইবে না। তারপর হইতে ধূমকেতুটিকে মহাকাশে আর কখনও দেখা যাইবে না, তখন ইহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ধূমকেতুর পুচ্ছ নিতান্ত হাল্কা—বাতাসের লক্ষাংশ ইহার ঘনাঙ্ক, অর্থাৎ এক লিটার বাতাসের ভর ইহার এক লক্ষ লিটারের ভরের সমান। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত একটি ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর দিয়া পৃথিবী চলিয়া গিয়াছিল এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতুর শেষ প্রান্তের ভিতর দিয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর উ.র ইহাদের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। ধূমকেতুর পুচ্ছে বিষাক্ত গ্যাসও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার অণু-সমূহ এত দূরে দূরে অবস্থিত যে, তাহার অস্তিত্ব কোন ক্ষতির কারণ হয় না।

ধূমকেতু সূর্যের আকর্ষণে থাকিয়া তাহার চারিদিকে উপবৃত্তাকার পথে (Elliptical orbit) ভ্রমণ করে। বড় গ্রহের কাছে আসিয়া পড়িলে তাহার প্রভাবে গতিবেগ বর্ধিত হইয়া ইহা অধি-বৃত্তাকার (Parabolic) বা পরাবৃত্তাকার (Hyperbolic) পথেও চলিয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ ধূমকেতুর উপবৃত্তাকার পথের উৎ-কেন্দ্রিকতা বেশী। ফলে ইহা যখন সূর্যের নিকটতম হয়, তখন যদি দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্বের সমান হয়, যখন সূর্য হইতে দূরতম অবস্থানে যায়, তখন দূরত্ব ইহার সহস্রগুণ বা ততোধিকও হইতে পারে। ধূমকেতুর সূর্য-পরিক্রমণের কাল ৩·৩ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র বর্ষ বা ততোধিক হইতে পারে। অধিকাংশ ধূমকেতুই দীর্ঘকাল পরে ফিরিয়া আসে বলিয়া ইহাদের কাহাকেও একাধিক বার দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর গতিপথের সহিত গ্রহগুলির গতিপথের নতি সামান্য, কিন্তু ধূমকেতুর গতিপথের যে কোন নতি হইতে পারে। প্লুটো ব্যতীত কোন গ্রহ রাশিচক্রের বাহিরে যায় না, কিন্তু ধূমকেতু আকাশের যে কোন স্থানেই থাকিতে পারে; তবে তখন ইহারা সাধারণতঃ খালি চোখের গোচরীভূত হইতে পারে না। যে সকল ধূমকেতুর গতিপথের নতি কম, তাহাদের সূর্য-পরিক্রমার কাল সাধারণতঃ একশত বৎসরের কম। গ্রহগুলি সূর্য-পরিক্রমণ করে পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে, কিন্তু ধূমকেতুগুলির প্রায় অর্ধাংশ বিপরীত মুখে সূর্য-পরিক্রমণ করে।

সৌরজগতে প্রায় আড়াই লক্ষ ধূমকেতু আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহাদের মধ্যে প্রায় এক সহস্র এই পর্যন্ত দেখা গিয়াছে বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় পাঁচটি

ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের মধ্যে শতকরা আশিরও বেশী দুরবীক্ষণে দৃষ্ট। এই হারে যদি প্রতি বৎসর ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে, তাহা হইলে সৌরজগতে যে উক্ত সংখ্যক ধূমকেতু আছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পৃথিবীর ভর প্রায় শত কোটি বড় ধূমকেতুর ভরের সমান। সৌরজগতের সমস্ত ধূমকেতুকে একত্র করিলেও তাহাদের সম্মিলিত ভর চন্দ্রের ভর হইতে খুব বেশী হইবে না।

ধূমকেতুর মধ্যে হ্যালির ধূমকেতু নানা কারণে প্রসিদ্ধ। খালি চোখের গোচরীভূত ধূমকেতুর সূর্য-পরিক্রমাকাল সাধারণতঃ একশত বৎসরের বেশী, কিন্তু হ্যালির ধূমকেতুর পরিক্রমাকাল ৭৬ বৎসর মাত্র। আবির্ভাবের পর ইহা কয়েক মাস ধরিয়া দৃষ্টি-গোচর থাকে। ইহার পুচ্ছ সুদীর্ঘ ও উজ্জ্বল। ১৫৩১, ১৬০৭ এবং ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে দৃষ্ট ধূমকেতুর গতিপথ পর্যালোচনা করিয়া হ্যালি সিদ্ধান্ত করেন যে, ইহারা পৃথক ধূমকেতু নহে, একই ধূমকেতু উপবৃত্তাকার পথে ঘুরিয়া ৭৬ বৎসর অন্তর ফিরিয়া আসিতেছে। তিনি ১৩০৫,১৩৮০ এবং ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে দৃষ্ট ধূমকেতুরও উল্লেখ দেখিতে পান। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, এই ধূমকেতু আবার ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষে কিংবা ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আবির্ভূত হইবে। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর ইহার পুনরাবির্ভাব দৃষ্ট হয় এবং কয়েক মাস পরে ইহা সূর্যের নিকটতম হইয়া স্বীয় কক্ষপথ ধরিয়া চলিয়া যায় এবং অবশেষে অদৃশ্য হয়। তারপর ১৮৩৫ এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহাকে আবার দেখা যাইবে। বরণীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম স্মরণীয় করিবার জন্য ইহাকে 'হ্যালির ধূমকেতু' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পরে অন্য দুই জন জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রাচীন পুঁথি-পত্র পর্যালোচনা করিয়া ২৪০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে দৃষ্ট ধূমকেতুও এই একই ধূমকেতু বলিয়া নির্ণয় করেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১০ সাল পর্যন্ত ২৮ বার ইহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সূর্য হইতে হ্যালির ধূমকেতুর ন্যূনতম দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্বের অর্ধেক আর উচ্চতম দূরত্ব ৩৫ গুণ। ইহার গতি পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সূর্যের সহিত হ্যালির ধূমকেতুর সংযোগ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ইহা পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী হয়; কিন্তু অতি শক্তিশালী দুরবীক্ষণ দিয়াও সূর্যপৃষ্ঠে ইহার কোন ছায়া দেখা যায় নাই। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ধূমকেতু নিতান্ত লঘু এবং ধূমকেতুর উপাদান কণাগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব খুব বেশী। এই সময়ে ইহার পুচ্ছ পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

চব্বিশ বা ততোধিক ধূমকেতু আছে, সূর্য হইতে যাহাদের সর্বাধিক দূরত্ব বৃহস্পতির গতিপথের কাছে গিয়া পৌঁছায়। ইহাদের সূর্য-পরিক্রমাকাল ন্যূনাধিক ছয় বৎসর। এই ধূমকেতুগুলি বৃহস্পতির ধূমকেতু পরিবার বলিয়া পরিচিত। সম্ভবতঃ দীর্ঘপথযাত্রী ধূমকেতু বৃহস্পতির নিকট দিয়া যাইবার কালে বৃহস্পতির আকর্ষণে পূর্বপথ হইতে সরিয়া আসিয়া স্বল্প পর্যায়কালের ধূমকেতুতে পরিণত হইয়াছে।

এই পরিবারের একটি ধূমকেতু 'এঙ্কির ধূমকেতু' নামে পরিচিত। ইহার সূর্য-পরিক্রমাকাল ৩.৩ বৎসর। এত কম পর্যায়কালবিশিষ্ট আর কোন ধূমকেতু দেখা যায় নাই। অনুকূল অবস্থায় খালি চোখে ইহাকে একটি ক্ষীণপ্রভ তারার ন্যায় দেখা যাইতে পারে।

এই পরিবারের আর একটি হইল 'বায়েলার ধূমকেতু'। ইহা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮২৬ সালে। ইহার সূর্য-পরিক্রমার কাল ছিল ৬.৬ বৎসর। ১৮৪৬ সালে ইহাকে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। বিচ্ছিন্ন অংশ দুইটিকে ১৮৫২ সালের আবির্ভাব সময়ে দেখা যায়, কিন্তু এই বার তাহাদের মধ্যে ব্যবধান অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার পর এই অংশ দুইটির কোনটিকেই আর ফিরিয়া

আসিতে দেখা যায় নাই। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে যখন পৃথিবী এই লুপ্ত ধূমকেতুর গতিপথ অতিক্রম করিতেছিল, তখন পৃথিবীর উপর উল্কাবৃষ্টি হয়। ইহার পরেও দুই বার ১৮৮৫ এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। তারপর হইতে এই উল্কাপাত আর দৃষ্ট হয় নাই।

যে সকল ধূমকেতুর পূর্ব আবির্ভাব জানা নাই, যাহাদের পর্যায়কাল নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই—তাহাদিগকে দীর্ঘ পর্যায়কালবিশিষ্ট ধূমকেতু বলা হয়। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে (অক্টোবর-নভেম্বর) এই শ্রেণীর একটি উজ্জ্বল ধূমকেতুকে অনেকেই দেখিয়াছেন। সূর্য হইতে ইহার ন্যূনতম দূরত্ব ছিল পৃথিবীর দূরত্বের ½ মাত্র (সূর্যের নিকটতম গ্রহের দূরত্বের ⅔)।

ধূমকেতু সৌরজগতের নিতান্ত নিরীহ অধিবাসী। অতি সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাকে চলিতে হয়। মানুষ তাহার আকস্মিক ও মনোহর আবির্ভাবকে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছে, কিন্তু এই আবির্ভাবকে অমঙ্গলের পূর্বাভাস মনে করিয়া উদ্বেগে, আশঙ্কায় কাল কাটাইয়াছে। অদ্যাবধি এরূপ অমূলক আশঙ্কার সম্পূর্ণ নিরসন হইয়াছে বলা যায় না। অথচ প্রায় প্রতি বৎসরই পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে খালি চোখের গোচরীভূত একটা ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—১৯২৭ হইতে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুড়ি বৎসরের মধ্যে ১৫টি এরূপ উজ্জ্বল ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়াছে। আর দুর্ভিক্ষ মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব, জলপ্লাবন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রতি বৎসরই পৃথিবীর কোন না কোন অংশে ঘটিয়া থাকে। এই জন্য নিরীহ ধূমকেতুকে কেহ দায়ী করিবেন কি?

সঞ্চয়ন

চাঁদের অদৃশ্য দিকের রহস্য উন্মোচন

'জোন্দ-৩' স্বয়ংক্রিয় মহাকাশচারী ষ্টেশন ২০শে জুলাই, ১৯৬৫ তারিখে চাঁদের অদৃশ্য দিকের যেসব ছবি তুলে টেলিভিশন যোগে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, সেগুলি খুব স্পষ্ট ও খুঁটিনাটি বিবরণ সম্বলিত। এর সাহায্যে বিজ্ঞানীরা এখন সম্পূর্ণ চন্দ্রগোলকের এক মানচিত্র তৈরি করতে সক্ষম।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও তাঁর ছোট্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির সাহায্যে দীর্ঘকালের পরিশ্রমের ফলে অতি যত্ন সহকারে চাঁদের দৃশ্যমান অংশের যে রেখাচিত্র এঁকেছিলেন, সেটাই হলো চাঁদের প্রথম মানচিত্র। তারপর থেকে চাঁদের মানচিত্রকে নিখুঁত করে তোলবার চেষ্টায় বিজ্ঞানীদের সাধনা অব্যাহত রয়েছে।

সপ্তদশ শতকের মধ্যেই বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী চাঁদের অনেকগুলি মানচিত্র আঁকেন, তাঁর জমির বর্ণনা দেন এবং সেই সঙ্গে চাঁদের জমির বিভিন্ন অংশের নামকরণও হতে থাকে। চাঁদের পাহাড়গুলি আল্পস্, ককেশাস, আপেনিন প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। চাঁদের ঢালু, নীচু ছায়াঘেরা জায়গাগুলি (যাদের আমরা 'চাঁদের

কলঙ্ক' বলি), সেগুলির নামকরণ করা হয়েছে —বর্ষণসাগর, ঝটিকাসাগর, প্রশান্তসাগর, ইত্যাদি। চাঁদের জ্বালামুখগুলির নামকরণ করা হয়েছে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই সব নামকে সুনির্দিষ্ট ও সর্বদেশীয় করবার জন্যে ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল ইউনিয়ন কাজ সুরু করেন এবং ২০ বছর ধরে কাজ করবার পর ১৯২৮ সালে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা কংগ্রেসে সর্বসম্মতভাবে সেগুলি গৃহীত হয়। চাঁদের দৃশ্যমান অংশের চমৎকার মানচিত্র নানা দেশে প্রকাশিত হয়।

কিন্তু বলা বাহুল্য, চাঁদের মানচিত্রকে আরও নিখুঁত ও সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ-সম্বলিত করবার কাজ মোটেই শেষ হয় নি। অতি শক্তিশালী দুরবীক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কৃত চাঁদের এই সব ছোট ছোট স্থানের সংখ্যা ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়েছে ৩৫ হাজার। এগুলিকে চাঁদের মানচিত্রে ঠিক মত নির্ধারণ করবার জন্যে ৭ মিটার লম্বা ও চওড়া মানচিত্রের দরকার।

চাঁদের জমির প্রথম ফটোগ্রাফ গৃহীত হয় ১৮৪০ সালে। কিঞ্চিদধিক ১০০ বছর আগে তোলা চাঁদের একটি আলোকচিত্র সেন্ট পিটার্স-বার্গ (বর্তমান লেনিনগ্রাড থেকে প্রকাশিত “ইলুস্ত্রাৎসিয়া” পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ছবির পরিচয়ে বলা হয়—আমরা চিরকাল শুধু চাঁদের একটি দিকই দেখে আসছি। অপর দিকটি কোন দিনই দেখতে পাবো না।

কিন্তু চাঁদের সেই অপর দিক দেখা সম্ভব হয় ১৯৫৯ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে, যখন সোভিয়েট আন্তগ্র্হচারী ষ্টেশন “লুনা-৩” প্রথম চাঁদের অদৃশ্য পিঠের ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠায়। জ্যোতির্বিদ্যা ও মহাকাশচারণের ইতিহাসে সে এক চিরস্মরণীয় দিন। লুনা-৩ কর্তৃক প্রেরিত ওই আলোকচিত্রগুলি থেকে চাঁদের অপর দিকের জমির ৪৯৮টি অঞ্চলকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় এবং সম্পূর্ণ চন্দ্রগোলকের ৩ ভাগের ২ ভাগেরই মানচিত্র তৈরি করা হয়। ঐ ফটোগ্রাফগুলির ভিত্তিতে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা যে চন্দ্রগোলক বা লুনার গ্লোব তৈরি করেন, তার এক তৃতীয়াংশের মত জায়গা অনির্ধারিত ছিল।

মার্কিন মহাকাশচারী ষ্টেশন রেঞ্জার-৭, -৮ ও রেঞ্জার-৯ চাঁদের বেশ কাছাকাছি জায়গা থেকে চাঁদের জমির অনেকগুলি খুব ভাল আলোকচিত্র তুলে পাঠায়। কিন্তু সেগুলি সবই হলো চাঁদের দৃশ্যমান অংশের ফটোগ্রাফ। এই পর্যন্ত চাঁদের অদৃশ্য গোলকার্ধের আলোকচিত্র তোলবার কাজে একমাত্র সোভিয়েট বিজ্ঞানীরাই সক্ষম হয়েছেন লুনা-৩-এর পর জোন্দ-৩-এর সাহায্যে।

চাঁদের অপর দিকের যে অংশগুলির ছবি লুনা-৩ তুলে পাঠাতে পারে নি, সেই জায়গাগুলির আলোকচিত্র ও জোন্দ-৩-এর সাহায্যে তোলা সম্ভব হয়েছে। এদিক থেকে জোন্দ-৩-এর কাজ হলো লুনা-৩ এর কাজের পরিপুরক। জোন্দ-৩ কর্তৃক প্রেরিত ছবিগুলি এত খুঁটিনাটি বিবরণ সম্বলিত যে, তাতে ৫ কিলোমিটার ব্যাসের জ্বালামুখগুলিও চিহ্নিত হয়েছে।

এই সাম্প্রতিক নতুন ফটোগ্রাফগুলির ভিত্তিতে চাঁদের যে শুধু সম্পূর্ণ মানচিত্র রচনার কাজই সম্ভব হতে চলেছে তাই নয়, এগুলি চাঁদের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য দিক মিলিয়ে সম্পূর্ণ জমির প্রকৃতি ও গঠন সম্বন্ধেও সঠিক ধারণা করতে সাহায্য করছে। যেমন—চাঁদের 'আমাদের দিকের জমি'র উত্তরাঞ্চল প্রধানতঃ সাগর আর সমতল জমি এবং সেই জমিরই বিস্তার অদৃশ্য দিকে উত্তরাঞ্চল পরিণত হয়েছে চাঁদের মূল ভূমিখণ্ডে।

লুনা-৩-এর চেয়ে আরও অনেক কাছাকাছি জায়গা থেকে জোন্দ-৩ এই আলোকচিত্রগুলি

গ্রহণ করেছে—যার ফলে ঢের বেশী বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। জোন্দ-৩ কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফগুলি ১০ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে নেওয়া। এর প্রায় ৬ গুণ দূর থেকে লুনা-৩ চাঁদের অদৃশ্য দিকের প্রথম ছবিগুলি তুলে পাঠিয়েছিল। বর্তমানে রাশিয়ার হাতে আছে চাঁদের জমির ৫০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকার ছবি।

জোন্দ-৩ চাঁদের অদৃশ্য দিকের যেসব ছবি তুলে পাঠিয়েছে, সেগুলির কয়েকটার কথা এখানে বলা যেতে পারে। যেগুলি থেকে ওই অদৃশ্য চন্দ্র-গোলকার্ধের নানা জায়গার বেশ বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে; যেমন—পৃথিবী থেকে যে 'পূর্ব সাগরে'র প্রান্তরেখাটুকু মাত্র দেখা যায়, চাঁদের অদৃশ্য দিকে সেই সাগরের বিস্তার অনেকখানি। এর অনেকটা অঞ্চল ঘেরা রয়েছে কর্ডিলেরা ও রোকা পর্বতমালার দ্বারা। এই দুটি পর্বতমালার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, 'হেমন্ত সাগর' আর 'বসন্ত সাগর' দুটির ছায়াচ্ছন্ন অংশ। চাঁদের দৃশ্যমান অংশের উত্তর সীমান্ত ছাড়িয়ে অদৃশ্য দিকের অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসন্ত সাগরের বিস্তার।

চাঁদের অদৃশ্য গোলকার্ধের যে বিশাল দেশ-খণ্ডের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তার আয়তন দৃশ্য অংশের অ্যান্টিপোড বা দক্ষিণ মহাদেশের চেয়ে ঢের বড়। অদৃশ্য অংশের এই মহাদেশটির বিরাট নীচু অংশগুলিতে রয়েছে বহু সমারোপিত (সুপারইম্পোজড) জ্বালামুখ। এই অংশের গঠনপ্রকৃতিও ভিন্নরূপ।

অদৃশ্য দিকের জমির একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এই সব সমারোপিত জ্বালামুখের সংখ্যা-বাহুল্য। ঐ অংশের ৫০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার জুড়ে রয়েছে ২০০ কিলোমিটার ব্যাসের ৪টি জ্বালামুখ, ১০০ থেকে ২০০ কিলোমিটার ব্যাসের প্রায় ২০টি, ৫০ থেকে ১০০ কিলোমিটার ব্যাসের ৬০টি, ২০ থেকে ৫০ কিলোমিটার ব্যাসের ১০০টি এবং ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার ব্যাসের ৪ শতাধিক জ্বালামুখ। কতকগুলি ছবিতে জ্বালামুখগুলির রৌদ্রোজ্জ্বল বেড় ও কেন্দ্রীয় শীর্ষদেশ চমৎকার-ভাবে লক্ষণীয়।

এই অদৃশ্য গোলকার্ধের আরেকটি খুব উল্লেখ-যোগ্য বৈশিষ্ট হলো—শত শত কিলোমিটার একটানা রেখা জুড়ে মালার মত সাজানো ছোট-বড় জ্বালামুখের সারি—যে জিনিষটা চাঁদের আমাদের দিকের অংশে দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে একটি মূল জ্বালামুখের মালা থেকে যেন শাখা-প্রশাখায় বেরিয়ে এসেছে অন্যান্য জ্বালামুখের সারি।

চাঁদের দৃশ্যমান অংশের সঙ্গে তার অদৃশ্য অংশের চেহারার অমিলটুকুর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—অদৃশ্য অংশে 'সাগরের' সংখ্যা অনেক কম। মোটের উপর তা বেশী উজ্জ্বল ও বেশী পর্বতসঙ্কুল।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, পৃথিবীর দুই গোলার্ধের মধ্যেও প্রায় একই ধরণের গঠনগত অমিল রয়েছে—পৃথিবীর পশ্চিম গোলার্ধের অর্ধেকের বেশী জায়গা জুড়ে রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর, যার গভীরতম অংশটি ১০ কিলো-মিটারের বেশী গভীর এবং গড় গভীরতা হলো ৪ কিলোমিটার। পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে স্থলভাগ অপেক্ষাকৃত বেশী, উঁচু ভূখণ্ড ও পর্বতমালার সংখ্যাও বেশী।

মোট ৬৮ মিনিট ধরে জোন্দ-৩ চাঁদের অদৃশ্য দিকের আলোকচিত্র গ্রহণ করে ও বেতারযোগে পৃথিবীতে পাঠায়। প্রথম ছবিটি তোলে, যখন সে চাঁদের জমি থেকে ১১.৬ হাজার কিলোমিটার দূরে ছিল। ১০ হাজার কিলোমিটারের কিছু কম দূরত্বে সে চাঁদের সবচেয়ে কাছে আসে। এখান থেকে আবার কিছু দূরে সরে যাওয়া পর্যন্ত সে ছবি তুলে যেতে থাকে। ওই সময়ের মধ্যে চাঁদের সঙ্গে তার আপেক্ষিক অবস্থান-বিন্দুর

পরিবর্তন ঘটে দ্রাঘিমা বরাবর ৬০ ডিগ্রি এবং অক্ষাংশ বরাবর ১২ ডিগ্রি।

টেলিভিশন যোগে জোন্দ-৩ ওই সব ছবি পৃথিবীতে পাঠাতে সুরু করে (২৯শে জুলাই, ১৯৬৫)। ২২ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে-যখন এরিয়েলের সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের দিক থেকে জোন্দ-৩ এবং পৃথিবীস্থিত স্টেশনের পারস্পরিক অবস্থান ছিল সবচেয়ে অনুকূল। এদিক থেকে জোন্দ-৩-এর কার্যসূচী এত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে যে, ভবিষ্যতে আরও ঢের বেশী দূরত্ব থেকে বেতার-যোগে ছবি পাঠানো সম্ভব হবে।

জোন্দ-৩ কর্তৃক প্রেরিত এই ছবিগুলি যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ, তা বলাই বাহুল্য। এর ফলে চাঁদের অদৃশ্য গোলার্ধকে আড়াল করে রাখা অজ্ঞাত রহস্যের যবনিকাটি মানুষের চোখের সামনে থেকে চিরতরে সরে গেল। এখন থেকে সুরু হলো উন্মোচিত সেই দৃশ্যটিকে আরও খুঁটিয়ে দেখবার পালা।

ট্রম্বের সার-কারখানা

কৃষির উন্নতিতে রাসায়নিক সারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গাছপালার বৃদ্ধির জন্যে যোলটি মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। এগুলির মধ্যে তিনটি—কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আসে বায়ু ও জল থেকে। অবশিষ্ট তেরোটি পাওয়া যায় মাটির মধ্যে। এই তেরোটি পদার্থের মধ্যে গাছের পক্ষে প্রধান পুষ্টিকারক হলো নাইট্রোজেন, ফস-ফরাস ও পটাসিয়াম। সকল প্রকার পূর্ণাঙ্গ সারের মধ্যে এগুলির অস্তিত্ব আছে। গাছের বৃদ্ধির পক্ষে গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান পাবে ক্যাল-সিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও গন্ধক। গাছের বৃদ্ধির পক্ষে এগুলির প্রয়োজন খুবই বেশী। অবশিষ্ট মৌলিক পদার্থগুলি খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে রয়েছে দস্তা, বোরোন, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডিনাম ও ক্লোরিন।

প্রতিদিন প্রতিটি গাছের এই যোলটি মৌলিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। তবে গাছ-বিশেষে এগুলির অনুপাত ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কাজেই ঠিকমত সার প্রয়োগ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন, যে মাটিতে গাছ রোপন করা হবে, সেই মাটির রাসায়নিক পরীক্ষা করা। এতে সুবিধা হবে এই যে, ঐ জমিতে যে সব বস্তুর অভাব রয়েছে, তা পূরণ করা যাবে যথোপযুক্ত সার দিয়ে।

ভারতের জমিতে নাইট্রোজেনের অভাব ব্যাপক। আমাদের জমির শতকরা ৭৫ ভাগে ফস্‌ফরাস ও শতকরা ২৫ ভাগে পটাসের অভাব রয়েছে। আমাদের সমস্যা শুধু জমির উর্বরতা বজায় রাখাই নয়—জমির উর্বরতাকে সমৃদ্ধ করে তোলাও আমাদের কাজ।

পৃথিবীর সর্বত্র হাজার হাজার বছর ধরে জমির পুষ্টিকারক শক্তির ক্ষয় হচ্ছে। ভারতেও জমির উর্বরাশক্তি ক্রমে যে শুধু নষ্টই হচ্ছে তা নয়, এই নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা অন্য দেশে যে রকম হয়, ভারতে তার চেয়ে অনেক কম হয়। ভারতে প্রতি একর আবাদী জমিতে এক কিলোগ্র্যাম সার ব্যবহার করা হয়। এর সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনা করলে দেখা যায়, ফ্রান্সে একর প্রতি জমিতে ২১.১১ কিলোগ্র্যাম, পশ্চিম জার্মেনীতে ৬৫ কিলোগ্র্যাম, নেদারল্যাণ্ডসে ৮২.২৪ কিলোগ্র্যাম, জাপানে ৯৪.৬১ কিলোগ্র্যাম—এমন কি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যেখানে চার-শ' বছরেরও কম সময় চাষ-আবাদ হওয়ায় জমির ক্ষয় হয়েছে অনেক কম, সেখানেও একর প্রতি ৬.৭৪ কিলোগ্র্যাম সার ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় কৃষকেরা কেন যে এত কম সার ব্যবহার করে, তার তিনটি প্রধান কারণ আছে।

বর্তমান কৃষি-পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত মোটামুটি সেই চিরাচরিত প্রথাতেই চলে আসছে। কৃষকেরা রাসায়নিক সারের সুবিধার কথা জানে না। আর তা জানলেও রাসায়নিক সারের অভাব যেমন রয়েছে, তেমনি তা আবার ব্যয়সাধ্যও বটে। ভারতে সারের উৎপাদন যথেষ্ট নয়। তাই প্রচুর পরিমাণ সার বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। সার কারখানার জন্যে যে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন. তাও বেশীর ভাগ আমদানী করতে হয় এবং তাও অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সার উৎপাদন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কিন্তু অপর দিকে সার উৎপাদন না করে খাদ্য ও সার বাইরে থেকে আমদানীকরা আরও খারাপ।

বর্তমানে ভারতে প্রায় ৩৮ কোটি ৪৬ লক্ষ একর জমিতে চাষ-আবাদ হয়। এর মধ্যে ৭ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করা হয়। এই সুবিস্তীর্ণ আবাদী জমিতে যেখানে ৪০ লক্ষ টন সার প্রয়োজন, সেখানে আমরা মাত্র ৮ লক্ষ টন সার ব্যবহার করছি। এই ৮ লক্ষ টনেরও অধিকাংশ বিদেশ থেকে আমদানী করা হয়।

এই বিরাট ঘাট্‌তি পূরণের জন্যে একটা পরিকল্পনা খুব দ্রুততার সঙ্গে কার্যকরী করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৬৮ সালের মধ্যে ৬টি নতুন সার কারখানা নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে। ভারতে ইতিমধ্যেই ৫টি সার কারখানা চালু আছে। ৬টি নতুন কারখানার মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম সার-কারখানাটি হচ্ছে ৩১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ট্রম্বের সার-কারখানা।

এই কারখানাটি বোম্বাই সহর থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে অবস্থিত। এস্‌সো এবং বার্মা-সেল তৈল শোধনাগার রয়েছে এর খুব কাছেই। এরা ট্রম্বের এই সার-উৎপাদন কারখানায় ন্যাপ্‌থা ও তৈল শোধন করবার গ্যাস সরবরাহ করবে। ৩৩,·০ টন নাইট্রো-ফস্‌ফেট এবং ৯৯০·০ টন ইউরিয়া সার তৈরির জন্যে এখানে বছরে ৯০০০০ টন নাইট্রোজেন ও ৪৫০০০ টন ফস্‌ফেট উৎপাদন করা হবে। নাইট্রোফস্‌ফেট সারে আছে শতকরা ১২·৯ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ১২·৯ ভাগ ফস্‌ফেট। আর ইউরিয়া সারে আছে শতকরা ৪৬ ভাগ নাইট্রোজেন।

একটি মাত্র ইউনিট হিসাবে নাইট্রোফস্‌ফেট উৎপাদনের এত বড় কারখানা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ট্রম্বের কারখানাটির পাঁচটি অংশ।

১। অ্যামোনিয়া উৎপাদনের কারখানায় প্রতিদিন ৩৫০ টন তরল অ্যানহাইড্রাস অ্যামোনিয়া, ২। ইউরিয়া উৎপাদন কারখায় ৩০০ টন ইউরিয়া সার, ৩। নাইট্রিক অ্যাসিডের কারখানায় ৩২০ টন নাইট্রি অ্যাসিড এবং ৪। সালফিউরিক অ্যাসিডের কারখানায় ২০০ টন সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়ে থাকে; আর ৫। নাইট্রোফস্‌ফেট কারখানায় প্রতিদিন নাইট্রোফস্‌ফেট সার উৎপাদন করা হয় ১১০০ টন।

এই কারখানা নির্মাণে বৈদেশিক মুদ্রার খরচ মেটাবার জন্যে মার্কিন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ডলার দিয়ে সাহায্য করেছে। এছাড়া স্থানীয় খরচ মেটাবার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৪৮০নং সরকারী আইন অনুসারে মার্কিন কৃষিপণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকেও দিয়েছে ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

মেথানল উৎপাদনের কারখানাসহ ট্রম্বের সার-উৎপাদন কারখানাটি শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই কারখানা নির্মাণের ভার দেওয়া হয়েছে মার্কিন ও ভারতীয় বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান-সমূহের উপর। কিন্তু এই পরিকল্পনার কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রণের ভার রয়েছে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া নামে একটি সরকারী সংস্থার উপর।

হিসাব করে দেখা গেছে, এক টন সার

প্রয়োগ করলে দশ টন বেশী ফসল পাওয়া যায়। ট্রম্বের কারখানায় যে সার উৎপন্ন হবে, তার সবটাই মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রয়োগ করলে এই রাজ্যের ফসল উৎপাদনের পরিমাণ ১৩,৫০,০০০ টন বেড়ে যাবে।

ট্রম্বে কারখানায় বছরে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের মেথানল ও আরগন গ্যাস এবং ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের সার উৎপাদন করা হবে।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে বিদেশ থেকে কৃষিসার ও মেথানল আমদানী বাবদ ভারতের ১৫ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

ভারতবর্ষে ধানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল

ডাঃ জি. ভি. চল্ম্ এই সম্বন্ধে লিখেছেন—ভারতে ধানের নিত্য অভাব মেটাবার জন্যে 'তাইচুং দেশী—১নং' জাতটি অনায়াসে এই কাজের উপযোগী হতে পারে।

যখন পরীক্ষামূলকভাবে উড়িষ্যায় এই প্রকারের ধান জন্মানো হয়, তখন অল্প পরিমাণের সার প্রয়োগ করেই কটকে এথেকে হেক্টার প্রতি ৮৯৬০ কেজি এবং সাক্ষীগোপালে ৫৬০০ কেজি ফলন পাওয়া যায়। আমাদের প্রধান ধান-উৎপাদক রাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশে এর ফলন পাওয়া যায় রাজেন্দ্র নগরে হেক্টার প্রতি ৮৫১২ কেজি এবং মরুতেরুতে ৮২৮৮ কেজি। এই সব জায়গায়ই স্থানীয় সবচেয়ে ভাল রকমের প্রায় দ্বিগুণ ফলন পাওয়া যায়।

তাইচুং দেশী—১নং, যেটা তাইওয়ান থেকে আনা হয়েছে, তার প্রধান গুণ মনে হয়, এর আকৃতির খর্বতা, যার ফলে মাথায় প্রচুর ধানের ভার নিয়েও এরা সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বিভিন্ন প্রকারের ভারতীয় ধান গাছের মধ্যে যেগুলি সাধারণতঃ লম্বা এবং লিকলিকে হয়ে থাকে, সেগুলি ধান পাকবার সময় ভেঙ্গে পড়ে, যার ফলে অনেক দানা নষ্ট হয়ে যায়। তাইচুং দেশী—১নং-এর প্রচুর পরিমাণে গুছি বেরোয় এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগে বিভিন্ন প্রকারের ভারতীয় ধানের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ বেশী সাড়া দিয়ে থাকে।

যখন তাইচুং দেশী—১নং-এর কার্যকারীতার খবর স্থানীয় পত্রিকায় ছাপানো হয়, তখন অন্ধ্র-প্রদেশের কৃষকদের কাছ থেকে অভাবিত সাড়া পাওয়া যায়।

কোন কোন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই প্রকারের ধানের সম্বন্ধে একটু বেশী সাবধান; কারণ জানা গেছে যে, এরা ব্যাক্টিরীয় ধসা-রোগ সংবেদনশীল। কিন্তু আন্তর্জাতিক ধান্য-গবেষণা সংস্থা, ম্যানিলা-ফিলিপাইনের অধিবর্তা ডাঃ চ্যাণ্ডলার বলেন যে, ধসা-রোগ সত্ত্বেও তাইচুং দেশী-১নং বরাবর তার সংস্থায় হেক্টার প্রতি ৮৯৬০ কেজি ফলন দিয়েছে। তিনি একথাও বলেছেন যে, এর ঋতুর সম্বন্ধে অনুভূতিশীলতা অনেক কম, যার অর্থ হচ্ছে এই যে, একে সারা বছর ধরেই জন্মানো যাবে।

ভারতে তাইচুং দেশী-১নং চালু করবার ব্যাপারে আমি ভাগ্যবান কেন না—আমি আন্তর্জাতিক ধান্য-গবেষণা সংস্থার ডাঃ চ্যাণ্ডলার এবং ডাঃ বিচেলের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। এছাড়াও ভারতীয় কৃষি-অনুসন্ধান পরিষদের ভূতপূর্ব উপসভাপতি এ. ডি. পণ্ডিত ও অন্ধ্র-প্রদেশের এককালীন কৃষি-অধিকর্তা ডি. ভি. রেড্ডি এবং উড়িষ্যার ভূতপূর্ব মুখ্যসচিবের সাহায্য পেয়েছি এবং তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত রক্ষণাবেক্ষণে পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন। ভারতস্থিত

রকফেলার ফাউণ্ডেশান এই সাহসিক কার্যকে সাহায্য করেছেন, ম্যানিলা থেকে বিমানযোগে ১ টন বীজ আনিয়ে দিয়ে।

প্রারম্ভে প্রায় ৬১ হেক্টারে এই প্রকারের ধান বপন করা হয়েছিল। এথেকে যে বীজ পাওয়া যাবে, আশা করা যায় তা দিয়ে অন্ধ্র-প্রদেশ এবং উড়িষ্যায় দ্বিতীয় ফসলের প্রায় ১২,১৪০ হেক্টারে চাষ করা যাবে এবং ১৯৬৬ সালের খরিফ খন্দে ৮ লক্ষ হেক্টারে জমি চাষ করা সম্ভব হবে।

চাষীর জমিতে এই প্রকার ধানের দ্রুত পরিবর্ধনের চেষ্টা বৈজ্ঞানিকদের নিকট নিয়ম-মাফিক নাও মনে হতে পারে। কিন্তু সাহসের সঙ্গে এইভাবে না এগিয়ে গেলে কোন কাজে সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। অনাগত মাসগুলি আমাদের নানাবিধ দুশ্চিন্তা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে, যার উপর আমাদের এই কার্যসূচী নির্ভরশীল। যদি এই পরীক্ষাগুলি আশাপ্রদ হয়, তাহলে ধান উৎপাদনের ব্যাপারে আমাদের দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার পথ খুঁজে পাবে।

সংশ্লেষণ-রসায়নের জাদুকর উডওয়ার্ড

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬৫ সালে রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত রসায়নবিদ্ ডঃ রবার্ট বার্নস উডওয়ার্ডকে। অ্যান্টিবায়োটিক ভেষজ ও চেতননাশক রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ভাবনে তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতিতে তাঁকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে।

সংশ্লেষণ-রসায়নে অসামান্য অবদানের জন্যে ডঃ উডওয়ার্ডের বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তাঁকে সংশ্লেষণ রসায়নের জাদুকর বললে অত্যুক্তি হয় না। ১৯৪২ সালে তিনি যখন রসায়ন-বিজ্ঞানের এই ক্ষেত্রটিতে প্রবেশ করেন, তখন যুদ্ধের দরুন কুইনাইনের বিশেষ অভাব দেখা দেয়। কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করা যায় কিনা তা গবেষণা করে দেখবার জন্যে ডঃ উডওয়ার্ডের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৪ মাস ব্যাপক গবেষণার পর তিনি এবং তাঁর সহকর্মী ডঃ উইলিয়াম ই. ডোরিং বেনজালডিহাইড থেকে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। ১৯৪৫ সালে কৃত্রিম কুইনাইন প্রস্তুতের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এরপর থেকেই উডওয়ার্ড একের পর এক কৃত্রিম কর্টিসন, কোলেস্টেরল, অন্যান্য স্টেরয়েড, স্ট্রিকনিন ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করেন।

পরবর্তী ৫ বছরকালে উডওয়ার্ড উপক্ষার এবং অতিকায় অণু সম্পর্কিত কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। স্ট্রিকনিন এবং সেমপারভিরিনের গঠনবৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন (বায়োজেনেসিস) পদ্ধতি তিনি ব্যাখ্যা করেন। অ্যানহাইড্রো-কার্বক্সি অ্যামিনো অ্যাসিডের পলিমারিজেশনের দ্বারা পলিপেপ্টাইড সংশ্লেষণের কার্যকর পন্থা তিনি প্রদর্শন করেন। এই সময় তিনি প্যাটুলিন (Patulin) নামক ছত্রাক দ্রব্যের গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও গবেষণা করেন এবং সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে এই গঠনশৈলী প্রতিষ্ঠিতও করেন।

উডওয়ার্ডের এই অবদান প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল—‘প্রকৃতিতে বিকাশ ও বৃদ্ধির যে প্রক্রিয়া

রয়েছে, উডওয়ার্ড তা প্রায় অনুকরণ করেছেন।' তাঁর আগে আর কেউ এই কাজ করতে পারেন নি। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে উডওয়ার্ড এই বৃহৎ অণুগুলি সৃষ্টি করেন সেই প্রক্রিয়া রাসায়নিক শিল্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। ও কৃত্রিম তন্তু নির্মাণে, অ্যান্টিবায়োটিক গবেষণায় এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণায়, বিশেষতঃ মানব-দেহে প্রোটিন গ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায় উড-ওয়ার্ডের প্রক্রিয়াটি ব্যবহৃত হয়।

১৯৫১ সালে উডওয়ার্ড এমন আর একটি আবিষ্কার করেন, যা রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসে অন্যতম বৃহত্তম আবিষ্কার বলে অভিহিত হয়ে থাকে। স্টেরয়েডের মধ্যে যে প্রচুর সহজলভ্য উপাদান রয়েছে, তিনিই সর্বপ্রথম তার পুরাপুরি

ডঃ উডওয়ার্ড।

সংশ্লেষণ করেন। ষ্টেরয়েড সেই রাসায়নিক পদার্থগোষ্ঠীর অন্যতম, যার মধ্যে অন্যান্য অনেক কিছু ছাড়াও রয়েছে—কর্টিসন, ডিজিটেলিস, ভিটামিন-ডি এবং হর্মোনসমূহ।

১৯৫৪ সালে ষ্ট্রিকনিন, ১৯৫৬ সালে রেসারপিন এবং ১৯৬০ সালে ক্লোরোফিলের সম্পূর্ণ সংশ্লেষণ উডওয়ার্ডের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। বিংশ শতকে সংশ্লেষণ-রসায়নের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ ক্লোরোফিলের সংশ্লেষণকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যাত করা যায়। আমরা জানি, ক্লোরোফিল হচ্ছে সবুজ বর্ণের পদার্থ, যার দরুণ গাছের পাতার রং সবুজ হয়। রাসায়নিক দিক থেকে ক্লোরোফিল হচ্ছে অতিকায় জটিল অণু। এই অণুর সাহায্যে সালোক-সংশ্লেষণের মাধ্যমে গাছপালা জল ও বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইডকে জৈব বস্তুতে পরিণত করে।

ক্লোরোফিলের সংশ্লেষণ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত, কারণ বাস্তব বা আর্থিক দিক থেকে কৃত্রিম উপায়ে ক্লোরোফিল প্রস্তুতের কোন সার্থকতা নেই। তবে এর গঠন অনুধাবন করলে ক্লোরোফিল গাছপালার মধ্যে কিভাবে কাজ করে, তা ভালভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং পুষ্টির দিক থেকে এর একটা তাৎপর্য হয়তো ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

ডঃ উডওয়ার্ড সম্প্রতি গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক বিষজনিত (টক্সিন) পদার্থসমূহ প্রস্তুত করেছেন। এছাড়া তিনি অ্যান্টিবায়োটিক ও চেতনানাশক রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের ত্রিমাত্রিক গঠন-বৈচিত্র্য উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর এই কাজের ফলে কৃত্রিম উপায়ে এমন অ্যান্টিবায়োটিক ও চেতনানাশক পদার্থ প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে, যা কোন কোন ক্ষেত্রে অনুরূপ স্বাভাবিক উপাদানের চেয়েও বেশী কার্যকর।

শুধু সংশ্লেষণ-রসায়নের ক্ষেত্রেই নয়, তত্ত্বীয় রসায়নেও উডওয়ার্ডের অবদান অসামান্য। তাঁর কাজের মধ্যে তত্ত্বীয় দূরদৃষ্টি ও পরীক্ষাগত প্রতিভার এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের গঠন-বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় আলট্রাভায়োলেট এবং ইনফ্রারেড অঞ্চলে বর্ণালিবীক্ষণ প্রয়োগের সম্ভাব্যতা তিনিই প্রথম দেখান। তাঁর এই পথ প্রদর্শনের ফলে ইনফ্রারেড বর্ণালিবীক্ষণ পদ্ধতি জৈব রসায়নের ক্ষেত্রে একটি মস্ত বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রসায়ন-বিজ্ঞানে উডওয়ার্ডের এই সমস্ত অমূল্য অবদানের জন্যে অনেকে মনে করেন, রসায়নের এই 'জাদুকর'কে বহু পূর্বেই নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করা উচিত ছিল।

সমকালীন ইস্রেল

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইস্রেল একটি ছোট্ট দেশ। এর আয়তন হচ্ছে মাত্র ৮০০০ বর্গমাইল, আর এর লোকসংখ্যা হচ্ছে ২৫ লক্ষ, কলকাতার লোকসংখ্যার অর্ধেক। এই ছোট্ট দেশটি কিন্তু আজ পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার নানা প্রচেষ্টার অকল্পনীয় সাফল্যের দ্বারা। ১৯৪৮ সালে ইস্রেল রাষ্ট্রের পত্তন হবার সঙ্গে সঙ্গে ইস্রেলের চারদিক ঘিরে যে আরব রাজ্যগুলি আছে, তারা ইস্রেলকে আক্রমণ করে। নয়া রাষ্ট্র ইস্রেল শক্তিশালী আরব রাজ্যগুলিকে পরাজিত করে অসীম আত্মত্যাগের দ্বারা।

একটি ধারণা চল্‌তি আছে যে, ইহুদিরা ১৯৪৮ সাল থেকে অর্থাৎ নতুন ইহুদি রাষ্ট্র পত্তনের সময় থেকেই প্যালেষ্টাইনে বসবাস সুরু করেছে। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। তাদের আদিম জন্মভূমি প্যালেষ্টাইনে ইহুদিরা বরবরই বসবাস করে এসেছে। প্যালেষ্টাইনেই তাদের ধর্মের প্রধান তীর্থগুলি। তাই ধর্মপ্রাণ ইহুদিরা পৃথিবীর নানা দেশ থেকে এসে এখানে বাস করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ও ৮৫,০০০ ইহুদি প্যালেষ্টাইনে বাস করছিলেন। ১৯৪৮ সালে মে মাসে ইস্রেল রাষ্ট্র-পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ইহুদি ইয়োরোপের নানা দেশ থেকে ইস্রেলে চলে আসেন। ফ্যাসিস্ট নিপীড়িত জার্মেনী ও মধ্য ইয়োরোপের দেশগুলি থেকে ইহুদিরা ইস্রেলে এসে নতুন জীবনযাত্রা সুরু করেন। ইয়োরোপে ফ্যাসিস্ট বর্বরতা যদি না ঘটতো তাহলে ইহুদিদের রাষ্ট্র হিসাবে ইস্রেল প্রতিষ্ঠিত হতো কিনা সন্দেহ।

১৮৯০ সালে একদল ইহুদি ইয়োরোপ থেকে এসে প্যালেষ্টাইনে বসবাস সুরু করেন। জমির মালিকানা ব্যক্তিগত হলেও উৎপন্ন শস্যের বিক্রয়, ফলের রপ্তানী প্রভৃতি সবই সমবায় পদ্ধতিতে চলতো। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে যে সব ইহুদি প্যালেষ্টাইনে এলেন, তাঁরা পুরাপুরি সমবায়ের নীতি অনুসারে পল্লীজীবন গঠন সুরু করে দিলেন। সমবায় পদ্ধতিতে পল্লী-প্রতিষ্ঠানকে 'পিবুৎস্‌' বলা হয়। প্রথম পিবুৎস্‌ 'দেগানিয়া' ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পিবুৎস্‌-এর জমির মালিকানা কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়। জমির মালিকানা প্রতিষ্ঠানের। পিবুৎস্‌-এর বাসিন্দাদের সকলকে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতে হয়, তার জন্যে তাঁরা মজুরী পান না। তাঁদের যা কিছু প্রয়োজন সবই সরবরাহ করা হয়। পিবুৎস্‌-এর পরিচালক সমিতি উৎপাদন, বন্টন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সবকিছুরই ব্যবস্থা করেন। এই রকম ২২৫টি পিবুৎস্‌ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজ পর্যন্ত। এইগুলিতে ৯০ হাজার লোক বাস করে ও ইস্রেলের মোট কৃষিজাত উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ উৎপাদন করে এরা। আর এক ধরণের পল্লী-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ইস্রেলে। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে 'মোশাভ' বলে। মোশাভের বাসিন্দারা তাদের নিজস্ব জমিতে চাষ করে, কিন্তু সেই জমির ফসল সব দিয়ে দিতে হয় সমবায়-সংস্থাকে। সমবায়-সংস্থা তাঁদের ফসল বেচে তাদের প্রত্যেকের নামে টাকা জমা করে দেয় ও তাদের প্রয়োজন অনুসারে সবকিছু কিনে দেয়—ব্যবস্থা করে দেয়। মোশাভ-এর সংখ্যা হচ্ছে ৩০০। মোশাভ আর পিবুৎস্‌ এই দুই প্রতিষ্ঠান মিলে ইস্রেলের মোট কৃষিজাত উৎপাদনের শতকরা ৬৫ ভাগ উৎপাদন করে।

'হিস্‌তাদ্রুৎ' হচ্ছে ইস্রেলের একটি আশ্চর্য

সংগঠন। এটি এখনকার শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। ১৯২০ সালে এই ফেডারেশনের পত্তন হয়। এর সভ্যসংখ্যা হচ্ছে ৯ লক্ষ। কৃষি ও শিল্পে যে সব শ্রমিক কাজ করে, তাদের শতকরা ৯০ জন হিস্তাদ্রুৎ-এর সভ্য। হিস্তাদ্রুৎ কুপাত্‌হোলিম নামে যে স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে তার সভ্য হচ্ছে ১৮ লক্ষ লোক; অর্থাৎ ইস্রেলের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০ জন। এই স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠান পল্লী এবং শহরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে, দেশজুড়ে হাসপাতাল খুলেছে এবং গ্রাম ও শহরের মজুরদের জন্যে নানা জায়গায় স্বাস্থ্যনিবাস তৈরি করেছে। তাছাড়া ইস্রেলের বৃহত্তম ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠান ও নারী-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে হিস্তাদ্রুৎ। হিস্তাদ্রুতের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কিন্তু এইগুলির সৃষ্টি নয়। তার বড় কৃতিত্ব এই যে, পৃথিবীর মধ্যে হিস্তাদ্রুৎই হচ্ছে একমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান, যা তার নিজস্ব শিল্পের পত্তন করেছে। ইস্রেলের মোট শিল্পের শতকরা পঁচিশটির মালিক হচ্ছে হিস্তাদ্রুৎ। হিস্তাদ্রুৎ পরিচালিত বত্রিশটি শিল্প ইস্রেলের মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ উৎপাদন করে। তাছাড়া ইস্রেলের পরিবহন-ব্যবস্থা ও গৃহনির্মাণ-ব্যবস্থা প্রায় পুরাপুরি হিস্তাদ্রুতের হাতে। হিস্তাদ্রুৎ-পরিচালিত শিল্পে শ্রমিক প্রতিনিধি ও ম্যানেজমেণ্টের লোক নিয়ে যুক্ত কমিটি গঠন করে ফ্যাক্টরী চালাবার পরীক্ষা সুরু করা হয়েছে। এই সবই নিঃসন্দেহে সোসালিজমের দিকে ইস্রেলবাসীদের সুনিশ্চিত ও দৃঢ় পদক্ষেপ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

ইস্রেলের সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হচ্ছে—জলের সমস্যা। ইস্রেলের ৮০০০ বর্গমাইল আয়তনের ৩৮০০ বর্গমাইল হচ্ছে মরুভূমি। ইস্রেলের জলসঞ্চয় এত কম যে, এর কৃষিজমির শতকরা ৪০ ভাগ মাত্র এই জল দিয়ে চাষ করা যেতে পারে। উত্তরে গ্যালিলিতে বৃষ্টিপাত হয় বছরে ৫০ ইঞ্চি, মরুভূমি অঞ্চলে ৮ ইঞ্চি। আরও দক্ষিণে এলিয়াট অঞ্চলে ১½ ইঞ্চি। তাই জলের সমস্যার সমাধান হচ্ছে ইস্রেলের পক্ষে জীবন-মরণের প্রশ্ন। এই সমস্যা সমাধান করবার জন্যে National Water Project রচিত হয়েছে জর্ডন নদীকে কেন্দ্র করে। গ্যালিলি প্রদেশেই হচ্ছে জলের উৎস। তিনটি নদী মিলে জর্ডন নদীর সৃষ্টি। লেবানন থেকে হাসবানি, সিরিয়া থেকে বানিয়াস ও ইস্রেলের নদী ডান—এই তিনটি নদীর ধারা মিলে জর্ডনকে সৃষ্টি করেছে। এই জর্ডন নদীর জল গ্যালিলি থেকে দক্ষিণে মরুভূমি এলাকায় পাইপ লাইন দিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা ইস্রেল করেছে। এখন একটি সঙ্কট দেখা দিয়েছে। লেবানন, হাস্‌বানি নদীর ধারা বাঁধ দিয়ে বন্ধ করে যাতে সেই ধারা গিয়ে ইস্রেলের জর্ডন নদীতে না পৌঁছয়, তার ব্যবস্থা করছে। সিরিয়াও চেষ্টা করছে, বানিয়াস নদীতে বাঁধ বেঁধে তার জলের ধারার মুখ ঘুরিয়ে দিতে ইস্রেল থেকে অন্য দিকে। এই উপায়ে আরব দেশগুলি জর্ডন নদীর জলের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে ইস্রেলের কৃষি-ব্যবস্থাকে বানচাল করে দেবার জন্যে মরিয়া হয়ে লেগেছে। ইস্রেল ১৯৪৯ সাল থেকে তার প্রতিবেশী—লেবানন, সিরিয়া ও জর্ডন—এই তিনটি আরব রাজ্যকে বারবার জানিয়েছে যে, এই নদীগুলির জল যাতে ইস্রেল ও এই তিনটি আরব রাজ্য ভাগাভাগি করে তাদের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারে তার একটি ব্যবস্থা করা দরকার। তারা রাজী হয় নি। তারা ইস্রেলকে ধ্বংস করবার জন্যেই মত্ত হয়ে আছে। আন্তর্জাতিক বিধি অনুযায়ী নদীর জল বণ্টন করবার যে ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছে, সেই ব্যবস্থা মেনে নিতে আরব দেশগুলি রাজী নয়। ইস্রেলের জল-পরিকল্পনা আরব দেশগুলি তো অগ্রাহ্য করলো, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে জর্ডন রাষ্ট্র তার

জল-পরিকল্পনা তৈরি করে ইয়ারমুখ নদীর জল তার নিজের দেশের জন্যে লাগাতে বাঁধ তৈরি করে বেঁধে দিল। জল নিয়ে আরব দেশগুলির সঙ্গে ইস্রেলের সংঘর্ষ আশঙ্কা করে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার অ্যামবাসেডর জনষ্টনকে পাঠিয়ে দিলেন মধ্য-পূর্ব এশিয়ায় একটি জল বণ্টনের পরিকল্পনা তৈরি করে আরব দেশগুলি ও ইস্রেলকে সেই পরিকল্পনায় সম্মত করাবার জন্যে। দীর্ঘ তিন বছর অবিশ্রান্ত চেষ্টা করে জনষ্টন একটি 'Unified water plan' তৈরি করলেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নদীগুলির শতকরা ৬০ ভাগ জল পাবে আরব দেশগুলি, আর ৪০ ভাগ পাবে ইস্রেল। এই প্ল্যানের জলবিভাগ-নীতি আরব দেশগুলি গোড়ায় মেনে নিয়েছিল। তার পর নাসের ও আরব লীগের প্ররোচনায় রাজনৈতিক কারণে প্ল্যানটি মেনে নিতে অস্বীকার করলো। প্ল্যানটি মেনে নিলে ইস্রেলকে মেনে নিতে হয়; তাই ইস্রেলকে ধ্বংস করবার জন্যে উন্মুখ আরব দেশগুলি এই প্ল্যান বাতিল করে দিল। আরব লীগ প্ল্যান করেছে সিরিয়া ও লেবাননের নদী দুটির জল যাতে ইস্রেলের জর্ডন নদীতে না পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করবার। সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে এই সর্বনেশে পরিকল্পনা করেছে আরব লীগ। ইস্রেলের সরকার পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা এই জল বন্ধ করে দেবার পরিকল্পনা কার্যকরী হতে দেবেন না। মধ্য-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এই জল-বণ্টন সমস্যা নিয়ে। সমস্ত গণতান্ত্রিক শান্তিকামী দেশগুলির কর্তব্য হচ্ছে, আরব লীগের এই দুরভিসন্ধিকে বাধা দেওয়া ও একটি জলবণ্টনের ব্যবস্থা করা এবং ইস্রেল, লেবানন, সিরিয়া ও জর্ডন—এই চারটি রাষ্ট্রকে দিয়ে তা মানিয়ে নেওয়া।

সংখ্যালঘু সমস্যা ইস্রেলের একটি মস্ত সমস্যা ইস্রেলের ২৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ২ লক্ষের উপর হচ্ছে আরব। এই দুই লক্ষের উপর ইস্রেল-বাসী আরব একটি কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে—ইস্রেলের নিরাপত্তা সম্বন্ধে ও আরব দেশগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে। হাইফা থেকে ১৬ মাইল দূরে তাম্‌রা নামক একটি আরব গ্রামে আমি গিয়েছিলুম। এই গ্রামের আরব মাতব্বরদের সঙ্গে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছিলুম ইস্রেলের আরবদের অবস্থা সম্বন্ধে। নাসেরের রেডিওর প্রচারের কথা উল্লেখ করে আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করেছিলুম যে, সংযুক্ত আরব রিপাব্লিকের বেতার-কেন্দ্র ইস্রেলবাসী আরবদের অসীম দুঃখের কথা রোজ প্রচার করছে—সেই প্রচার ইস্রেল সরকার আপনাদের শোনবার সব সুযোগ দিয়েছেন। আমি জানতে চাই আপনাদের কি মত সেই প্রচার সম্বন্ধে। তাম্‌রার বিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাম্‌রার পল্লীর প্রধান—যাঁকে ইস্রেলে মেয়র বলা হয়, তিনি ও একজন আরব ডাক্তার আমাদের বললেন, নাসেরের রেডিওর অপপ্রচারে কি হবে? আপনি তো স্বচক্ষে দেখছেন আমাদের গ্রামের অবস্থা। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হয়েছে, ইলেক্‌ট্রিসিটি আসছে, ট্রাক্টর দিয়ে চাষের ব্যবস্থা হয়েছে, নতুন বাড়ী রাস্তার দু-ধারে তৈরি হচ্ছে, বাড়ীতে বাড়ীতে রেডিও ও টেলিভিসন সেট বসেছে—এর পরেও যদি কেউ বলে যে, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়, তাহলে তাকে কি বলবো আমরা তা জানি না।

আমি দ্রুজ্‌দের গ্রামে গিয়েছিলুম। ইস্রেলে প্রায় ২১,০০০ দ্রুজ্‌দের বাস। গ্রামটির নাম গিউলিস্। আশ্চর্য সুন্দর এই দ্রুজ্ জাতি। এত সুন্দর পুরুষ আর নারী আমি কোথাও দেখি নি। দ্রুজ্‌দের প্রধান পুরোহিত আমিন তারিফ আমাকে বললেন, তুর্কীর শাসন যখন ছিল এই অঞ্চলে, তখন কি অকথ্য অত্যাচারে তাঁদের বাস করতে হয়েছে! এখন নয়। ইস্রেলে তাঁরা

পরম সুখে আছেন। তাঁদের ধর্মে, তাঁদের জাতির বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না। আরব দেশগুলি যখন ইস্রেলকে আক্রমণ করেছিল, তখন দ্রুজ্‌রা ইস্রেলের ইহুদিদের পাশে দাঁড়িয়ে আরবদের বিরুদ্ধে লড়েছিল ও বহু হতাহত হয়েছিল। আমি বেদুইনদের গ্রামাঞ্চলেও গিয়েছিলুম। ইতিহাসে এই প্রথম বেদুইনরা তাদের যাযাবরত্ব ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে একজায়গায় বসবাস করতে সুরু করেছে। বেদুইনরা থাকতো তাঁবুতে, এখন তারা বাড়ীতে বাস করছে। অবশ্য এও শুনলুম যে, কখনো কখনো তারা নতুন বাড়ীগুলিতে তাদের গরু-ভেড়া রেখে নিজেরা তাঁবুতে বাস করছে। হাজার হাজার বছরের অভ্যাস রক্তের মধ্যে তাদের বাসা বেঁধেছে। তাকে কি সহজে উচ্ছেদ করা যায়? বেদুইন গ্রামেও ট্র্যাক্টর চলছে দেখলুম। বেদুইনরা কলে কাজ করছে, বেদুইন ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ছে। ইস্রেলে মুস্লিম সংখ্যালঘুদের জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে তা অভাবনীয়। শুধু অর্থনৈতিক দিকেই যে পরিবর্তন ঘটেছে তা নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে ও নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রেও আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে। ইস্রেলবাসী মুসলমান একটির বেশী বিয়ে করতে পারে না। ভারতবর্ষের সরকার ইস্রেল সরকারের কাছ থেকে নৈতিক ব্যাপারে এই দৃঢ়তা ও ঋজুতা শিক্ষা করলে মন্দ হয় না। আশেপাশের আরব দেশগুলির আরবদের চেয়ে ইস্রেলের আরবরা অনেক উন্নততর অবস্থায় পৌঁচেছে।

একদিকে কিন্তু ইস্রেলের আরবদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। আরব গ্রামগুলি মিলিটারী শাসনের অধীন। গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলে মিলিটারী শাসকের অনুমতি নিতে হয়। Identity Card নিয়ে তাদের চলাফেরা করতে হয়। ব্যক্তি-স্বাধীনতার দিক থেকে বিচার করে দেখলে ইস্রেলের আরবদের যে পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা নেই, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। এই অবস্থার জন্যে দায়ী কিন্তু ইস্রেলের আরবরাই। আরব রাষ্ট্রগুলি যখন ১৯৪৮ সাল থেকে ইস্রেলকে আক্রমণ করেছিল, তখন সীমানার আরব গ্রামগুলির আরবেরা আরব রাজ্যগুলির সঙ্গেই যোগ দিয়েছিল ইস্রেলের বিরুদ্ধে। আজও ইস্রেলের মধ্যে আরব রাজ্যগুলির নাশকতামূলক কার্য চলেছে। ইস্রেলের আরবরা যে এই দুষ্কৃতকারীদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইস্রেলে বহু লোকের সঙ্গে আমি আলাপ করেছি এই সম্বন্ধে। তাঁরা প্রায় সকলেই আরব গ্রামগুলিতে যে মিলিটারী শাসন চলছে, তার বিরুদ্ধে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যেখানে ইস্রেলকে ধ্বংস করবার জন্যে চারদিকের আরবরাজ্যগুলি প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করছে, তখন ইস্রেলী আরবদের মধ্যে যে পঞ্চম বাহিনী মনোবৃত্তি রয়েছে, তাকে শাসনে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

ইস্রেল ও আরব দেশগুলির মধ্যে যে সংঘর্ষ রয়েছে, তাকে জীইয়ে রেখেছে ইস্রেল থেকে চলে-যাওয়া আরব বাস্তুহারার দল। আগেই বলেছি যে, ১৯৪৮ সালে ইস্রেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের আরব রাষ্ট্রগুলি ইস্রেলকে ধ্বংস করবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। তখন ইস্রেলের সীমান্তে যে সব আরব গ্রামগুলি ছিল, সেই গ্রামগুলির বাসিন্দারা আরব রাজ্যগুলির প্ররোচনায় তাদের গ্রামগুলি ছেড়ে আরব সৈন্যবাহিনীর পথ খোলাসা করে দেয় ইস্রেলকে আক্রমণের জন্যে। তারা চলে যায় পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলিতে। তাদের কল্পনা ছিল যে, আরব সৈন্যদল জয়ী হলে তারা ইস্রেলে ফিরে এসে সব দখল করে বসবে। ভাগ্য তাদের বিড়ম্বিত করলো। আরব সৈন্যদল পরাজিত হয়ে ইস্রেল ছেড়ে পালালো। ইস্রেলী আরব— যারা আরব সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল,

তাদের আর ফেরা হলো না ইস্রেলে। প্রায় পাঁচ লক্ষ আরব ইস্রেল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এই পাঁচ লক্ষ আরবের এই আঠারো বছর ধরে সমস্ত ব্যয় বহন করছে U. N, O.-র Relief সংস্থা। আরব রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছা করেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে নি। তা না হলে আঠারো বছরে পাঁচ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে খুবই সহজ ছিল। এদের ব্যবস্থা না করে দেবার কারণ হচ্ছে, ইস্রেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুবিধা হয় এই সব আরব বাস্তুহারাদের দুর্দশার কথা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে। এই পাঁচ লক্ষের ভিতর এক লক্ষ বাস্তুহারা তাদের নিজেদের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আরব দেশগুলির তরফ থেকে দাবী করা হচ্ছে যে, এই আরব বাস্তুহারাদের এক্ষুনি জায়গা করে দিতে হবে ইস্রেলে। ইস্রেল সরকার বলছেন আরব রাষ্ট্রগুলিকে—তোমরা আমাদের সঙ্গে শান্তির চুক্তি কর। আমরা এই আরব বাস্তুহারাদের তখন গ্রহণ করবো ইস্রেলে। আরব দেশগুলি শান্তির চুক্তি করতে তো রাজী নয়ই, উল্টে তারা ইস্রেলকে ধ্বংস করবো—এই কথাই অহরহ ঘোষণা করছে। এই চার লক্ষ আরব বাস্তুহারাদের যদি ইস্রেলে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, তাহলে ইস্রেলবাসী আরবদের সংখ্যা হবে ৬ লক্ষ, ২৯ লক্ষ মোট জনসংখ্যার ভিতরে।

এই ৬ লক্ষ পঞ্চমবাহিনী ইস্রেলকে ধ্বংস করবার কাজে লেগে যাবে। এই জন্যেই ইস্রেল সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় এই চার লক্ষ উদ্বাস্তুদের গ্রহণ করা, যতক্ষণ না আরব দেশগুলি ইস্রেলের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করছে।

ইস্রেল রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হলো ১৯৪৮ সালে, তখন এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার। ১৯৬৪ সালে সেটা দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষে। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চলছে পাঁচ বছর থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত—সেটি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। জেরুসালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২৫ সালে—Mount Scopious অঞ্চলে। ওখানেই বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। তার পরে জর্ডন রাষ্ট্রের সঙ্গে গণ্ডগোলের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থানান্তরিত করা হয় জেরুসালেমের Givat Ram অঞ্চলে। এখানে কলা, বিজ্ঞান, ফলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি নিয়ে যেমন উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা ও অধ্যাপনা চলছে, তেমনি চলছে পশুপালন, কৃষি, উদ্ভিদ-সংরক্ষণ, শুষ্ক-অঞ্চলীয় শস্য প্রভৃতি সম্পর্কিত অনুসন্ধান। এখানে Faculty of Humanities and Science, Faculty of Law, Faculty of Social Science & Economics, Medical School, School of Chemistry, Einstein Institute of Mathematics and Physics, Institute of Jewish Studies প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা রয়েছে। Rehovot নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Faculty of Agriculture ; সেই সঙ্গে সেখানে Soil Science, Animal Husbandary, Department of Plant Protection, Agricultural Economics প্রভৃতি নিয়েও গবেষণা চলছে। Peersheba-তে Institute of Aerid ? Zone Research প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫৬ সালে। সেখানে ১২০ জন গবেষণা-কর্মী মরুভূমির শুকনো আবহাওয়ায় কি কি গাছপালা জন্মাতে পারে, তা নিয়ে গভীর গবেষণা করছেন। গবাদি পশুর খোরাকের জন্যে কি ধরণের খাদ্য তৈরি করা যায়, তা নিয়েও গবেষণা চলছে। Hydrophoenix প্রথাতে কি ভাবে মৃত্তিকাবিহীন কৃষি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যায়, তা এঁরা পরীক্ষা করে দেখছেন—সেই সঙ্গে অনুসন্ধান করছেন, সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করে তাকে কৃষিকার্যে প্রয়োগ করা যায় কি না। সূর্যের উত্তাপের নানারকম সম্ভাব্য প্রয়োগ নিয়েও

তাঁরা বহু রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এখানে ১৮টি গবেষণা ইউনিট চালু হয়েছে—Applied Physics, Biochemistry, Biodynamics, Biophysics, Electronics প্রভৃতি। Haifa শহরে Technicon নামে Institute of Technology প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে কারিগরী, স্থাপত্য, উড্ডয়নবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই অল্প দিনের ভিতরে ইস্রেল সাধারণ শিক্ষা এবং গবেষণায় পৃথিবীর সব দেশগুলির ভিতর অন্যতম শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। তাছাড়াও যে সমস্ত আরবরা শিক্ষার ধার দিয়েও যেত না, তাদেরও শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে টেনে নিতে পেরেছে ইস্রেল। ২ লক্ষ ইস্রেলী আরবদের ভিতর ৪৮ হাজার আরব ছাত্র-ছাত্রী আজ পড়াশুনা করছে। কি করে একটি দেশের জনসাধারণকে সব দিক থেকে উন্নত করে তোলা যায় তার ব্যবস্থা ইস্রেল করেছে।

সয়াবিন

বর্তমানে পৃথিবীর ৩২০০ মিলিয়ন লোকসংখ্যার মধ্যে দুই হাজার মিলিয়ন লোক—অর্থাৎ পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য পায় না। পরিষ্কার বোঝা যায়—জনসংখ্যা যত বাড়বে (জনসংখ্যা প্রতি বছর পৃথিবীতে ৫০ মিলিয়নেরও বেশী বাড়ছে), ক্ষুধার্তের সংখ্যাও ততই বাড়বে। আজকের পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ অর্ধাহারী ব্যক্তিদের জন্যে শুধু নয়, প্রতি বছর প্রতিদিন পৃথিবীর কোথায়ও না কোথায়ও যে বিপুল সংখ্যক শিশু জন্মগ্রহণ করছে (প্রতি বছর প্রতিদিন শিশু-জন্মের সংখ্যা ১৬০,০০০), তাদের জন্যেও খাদ্যের সংস্থান করতে হবে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা হিসাব করে দেখেছেন—বর্তমানের তুলনায় খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ১৯৮০ সালের মধ্যে দ্বিগুণ এবং ২০০০ সালের মধ্যে তিনগুণ বৃদ্ধি না করলে মানুষের অনাহারে মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং মানুষের আশু করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ওয়াইজম্যান ইনষ্টিটিউটের জৈব পদার্থবিদ্‌গণ ভয়াবহ অপুষ্টিজনিত সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

সুপুষ্টির অর্থ হচ্ছে, গুণ ও পরিমাণে সুষম খাদ্য। আমাদের শরীরের জন্যে প্রচুর ক্যালোরি দরকার; তাছাড়া বাঁচতে গেলে আমাদের প্রোটিন, ফ্যাট, খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিনের প্রয়োজন। পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষুধার্ত লোকের সবচেয়ে বেশী অভাব কোন্‌টির? বিভিন্ন বয়সের মানুষের জন্যে অনুমোদিত খাদ্যতালিকা পরীক্ষা করলে দেখা যায় —দশ বছর বয়সের উর্ধ্বে বালক-বালিকাদের প্রতিদিন ৬০-৮০ গ্র্যাম প্রোটিন প্রয়োজন। এর মধ্যে ৩০ গ্র্যাম অবশ্যই জান্তব প্রোটিন হওয়া চাই এবং বাকী ৫০ গ্র্যাম উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হলেও চলে। জান্তব প্রোটিনের উপর গুরুত্ব দেবার বিশেষ কারণ আছে। সব প্রোটিনই শরীরের তন্তু-গঠন এবং ক্ষয়িত তন্তুর স্থান পূরণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জান্তব প্রোটিনের রাসায়নিক উপাদান অর্থাৎ তাতে যে অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, তার সঙ্গে মানব-শরীরের তন্তুর রাসায়নিক উপাদানের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উদ্ভিজ্জ প্রোটিন থেকে মানব-শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় না।

বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ মাত্র দৈনিক প্রয়োজনীয় জান্তব প্রোটিন পায়। পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মানুষ পায় দৈনিক ১৫-৩০ গ্র্যাম, আর শতকরা ৫৮ ভাগ পায় তারও কম পরিমাণ। সচরাচর এটা দেখা যায় যে, যারা যথেষ্ট পরিমাণে জান্তব প্রোটিন পায় না, তারা উপযুক্ত পরিমাণে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনও পায় না।

মানুষের প্রোটিন সরবরাহের প্রধান উৎস হচ্ছে—গরু ও মুরগী। ৫-১০ কিলোগ্র্যাম উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গরুকে খাওয়ালে তাথেকে ১ কিলোগ্র্যাম জান্তব প্রোটিন পাওয়া যেতে পারে। হিসাবে দেখা যায়, এক একর চাষ-করা জমির উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, সমপরিমাণ জমির খাদ্যপুষ্ট গরু থেকে প্রাপ্ত জান্তব প্রোটিনের দ্বারা ৫ থেকে ১০ গুণ বেশী লোককে সরবরাহ করা যায়। পৃথিবীর ৩০০০ থেকে ৪০০০ মিলিয়ন লোককে যথোপযুক্ত জান্তব প্রোটিন সরবরাহ করা অসম্ভব ব্যাপার। এজন্যে শীঘ্রই আমাদের নিরামিষভোজী হতে হবে এবং আমিষ ভোজনের সংস্কার ভুলতে হবে।

সয়াবিন থেকে সুলভে উৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ প্রোটিন আমরা পেতে পারি। সয়াবিন বীজের শুক্‌নো অংশের ৪০% হচ্ছে প্রোটিন। একে বিভিন্ন পর্যায়ে আরও ঘনীভূত করা যায়—প্রথমে শুক্‌নো বীজ থেকে তেল (শুক্‌নো অবস্থায় ওজনের ২০%) বের করে নেবার পর চিনি (Carbohydrates) দূরীভূত করে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশুদ্ধ প্রোটিন পৃথক করা হয়। এভাবে সয়াবিন থেকে শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত প্রোটিন পাওয়া যেতে পারে। খাদ্য-রসায়নবিদ্‌গণ ঘনীভূত সয়াবিন থেকে মাংসের মত একরকম আঁশালো পদার্থ তৈরি করেছেন—যা স্বাদে, বর্ণে ও গন্ধে হাঁস-মুরগীর মাংসের মত (সূক্ষ্ম স্বাদানুভূতি ছাড়া এটা যে হাঁস-মুরগীর মাংস নয়, তা বোঝাই যায় না)। তেল দূরীভূত হবার পর প্রথমে যে পদার্থটি পাওয়া যায়—তা হচ্ছে খোল (Oilseed Cake)। পৃথিবীতে আজ বার্ষিক ১০ মিলিয়ন টনেরও বেশী সয়াবিনের খোল উৎপন্ন হচ্ছে। পৃথিবীর বৃহত্তর অংশে এই খোল পশু-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মানুষের পক্ষে সয়াবিনের ব্যবহার এখনও সীমাবদ্ধ।

অন্যান্য তৈলবীজের প্রোটিনের মত সয়াবিনের প্রোটিনেও পরিপাকক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকর পদার্থ আছে—এর কিছুটা অংশ আবার বিষাক্ত। সয়াবিনের ক্ষতিকর প্রভাব দূর না করে মানুষের খাওয়া মোটেই উচিত নয়। সয়াবিন-প্রোটিনের পরিষ্করণ, তাজা অবস্থায় সংরক্ষণ এবং উন্নতিবিধান খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। এক পাউণ্ড অপরিশোধিত প্রোটিনে খরচ পড়ে ১০ সেন্ট (প্রতি কিলোগ্র্যামে ২০ সেন্ট) এবং মানুষের খাদ্যোপযোগী এক পাউণ্ড প্রোটিন উৎপাদনে খরচ পড়ে এর প্রায় চারগুণ।

সম্প্রতি প্রোটিন সম্পর্কিত গবেষণার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। প্রধানতঃ প্রাণী, ব্যাক্টিরিয়া ও ভাইরাসের প্রোটিন ব্যবহার করে প্রোটিনের রাসায়নিক, ভৌতিক, জৈব ধর্ম, সঠিক রাসায়নিক উপাদান, আণবিক গঠন সহজবোধ্য করবার উন্নত পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

প্রায় বছর চার আগে ওয়াইজম্যান ইনষ্টিটিউটের বায়োফিজিক্স বিভাগের অধ্যাপক ই. ক্যাটারচ্যালস্কির পরিচালনায় (ডাঃ এইচ. লিস, ডাঃ এন. শ্যারন এবং প্রবন্ধের লেখকসহ) একদল গবেষক সয়াবিনের প্রোটিন সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন এবং তাঁদের গবেষণার ফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সয়াবিনের তেলের খোলে প্রাপ্ত বিভিন্ন নন-প্রোটিন উপাদান থেকে এবং প্রোটিনের বিভিন্ন উপাদান পৃথক করে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে সয়াবিন প্রোটিনের গুণ ও আচরণ অনুশীলন করা হয়। সয়াবিন খোলের বিশিষ্ট প্রকৃতিসম্পন্ন প্রোটিন পৃথকীকরণের সমস্যা

সমাধানের জন্যে সম্প্রতি উদ্ভাবিত কয়েকটি নির্বাচনমূলক (Selective) বিভক্তিকরণের পদ্ধতি ইনষ্টিটিউটের গবেষকগণ প্রয়োগ করে দেখছেন। জটিল গঠনের প্রোটিন (অর্থাৎ যে প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিড ছাড়া নন-প্রোটিন পদার্থ আছে) পৃথকীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। পৃথকীকৃত এই সব নন-প্রোটিন ভেজালের উপস্থিতি বিশুদ্ধ প্রোটিনের স্বাদ, গন্ধ এবং উপাদেয়তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

শীঘ্রই বোঝা গেল—পৃথকীকৃত প্রোটিন অংশের কিছুটা নন-প্রোটিন পদার্থ, বিশেষ করে চিনির সঙ্গে সংযুক্ত। কিছুদিন থেকেই জানা গিয়েছে—রাসায়নিকভাবে পরিমিত চিনিযুক্ত প্রোটিন-তন্তুর প্রাণীদেহে অবস্থিতির কথা। অধিকাংশ রক্তের প্রোটিন (Blood protein) এই গ্রুপের অন্তর্গত—যাকে বলা হয় গ্লাইকোপ্রোটিন (Glycoprotein)। যাহোক, উদ্ভিদদেহে গ্লাইকোপ্রোটিনের অবস্থিতি সম্বন্ধে সামান্যই জানা গেছে। বর্তমানে ইনষ্টিটিউটের গবেষকগণ এই প্রথম প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, গ্লাইকোপ্রোটিনগুলি উদ্ভিদদেহেও আছে। অণুর চিনির অংশ এবং অ্যামিনো অ্যাসিড-শৃঙ্খলের মধ্যে রাসায়নিক বাঁধন প্রদর্শন এবং সয়াবিনের খোল থেকে চিনিযুক্ত প্রোটিন আলাদা করে তাঁরা উদ্ভিদদেহে গ্লাইকোপ্রোটিনের অবস্থিতি প্রমাণ করেন। এই প্রোটিনের আর একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—এটি লাল রক্তকণিকাগুলিকে জমাট বাঁধায়। মানুষের পক্ষে সয়াবিনের যে সব ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায়—এটি তার মধ্যে অন্যতম। সয়াবিন থেকে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যেও এই ক্ষতিকর প্রভাব আছে।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সম্বন্ধে ওয়াইজম্যান ইনষ্টিটিউটের গবেষণা এখনও সীমাবদ্ধ অবস্থায় আছে। কিন্তু এই ইনষ্টিটিউট এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গবেষণাগারে সয়াবিন সম্বন্ধে যে গবেষণা চলছে, তার সুফল একদিন পুরাপুরিই পাওয়া যাবে। একদিন হয়তো এই গবেষণায় মানুষের দেহ-পুষ্টির জন্যে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে সার্থকভাবে ব্যবহার করবার নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হবে এবং তার ফলে বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক অনেকটা দূরীভূত হবে।*

---

* "News from Israel"—September 15, 1965. Vol XII. No ; 18 থেকে ডাঃ ন্যাথান স্যারন কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ। অনুবাদক—দিগেন চৌধুরী

শিক্ষা

শ্রীমহাদেব দত্ত

[কয়েক মাস আগে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আহ্বানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষকদের এক আলোচনা বৈঠক বসে। শিক্ষা (বিশেষভাবে বিজ্ঞান-শিক্ষা) সম্বন্ধে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' নিয়মিত আলোচনার প্রস্তাব ঐ বৈঠকে অনেক বক্তা করেন। পরিষদের কর্মকর্তাদের কেউ কেউ অনুরূপ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতেন। বৈঠকের পর তাঁরা এই প্রস্তাব কাজে পরিণত করবার জন্যে আগ্রহী হন। ঐ বৈঠকেই শিক্ষা ও বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধের জন্যে উপস্থিত শিক্ষকদের অনেককেই অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু এপর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও প্রবন্ধ পাওয়া যায় নি। এই প্রস্তাব কার্যকরী করবার জন্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান-শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার

উপকরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য এই সকল প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব, পরিষদের সরকারী মতামত নয়। আর এসব মতামত বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। আশা আছে, বিজ্ঞান-শিক্ষকেরা এই সকল প্রবন্ধ সমালোচনা করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত সংক্ষেপে চিঠি বা প্রবন্ধের আকারে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশের জন্যে পাঠাবেন। এভাবেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র শিক্ষা বিভাগের প্রস্তাব সার্থক রূপ পাবে।

যদিও বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হয়, তবুও শিক্ষা খণ্ডিত নয়। শিক্ষার সামগ্রিক রূপ চোখের সামনে না রেখে শিক্ষার কোন স্তরের বা কোন দিকের আলোচনা একদেশদর্শী হবার আশঙ্কা আছে। এরূপ আলোচনা সুসঙ্গত, সফল ও সার্থক হবার সম্ভাবনা কম। এজন্যে এই প্রবন্ধে ও পরের কয়েকটিতে শিক্ষার বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা থাকবে। —কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ]

সভ্য মানুষের খাবার, পোশাক ও বাসস্থানের মতই শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই শিক্ষা বলতে ঠিক কি বুঝায়? সাধারণ লোক শিক্ষার মানে পরজীবনে বেঁচে থাকা ও সম্ভবমত অবস্থার উন্নতির জন্যে তৈরি হওয়া বোঝেন। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী-গুণী, যাঁরা শিক্ষা-বিজ্ঞানী, দার্শনিক, তাঁরা শিক্ষার এই সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞায় সন্তুষ্ট হন নি। শিক্ষার স্বরূপ, শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে যুগে যুগে অনেক আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। দেশে দেশে, কালে কালে যেমন জীবনদর্শন, সমাজের লক্ষ্য ও রূপ বদ্‌লায়, জীবনের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ শিক্ষার স্বরূপের ধারণা এবং শিক্ষাদর্শনও বদ্‌লায়। এযুগের অনেক মনীষীর মতে সেটাই হচ্ছে শিক্ষা। যা দিয়ে—মানুষের মধ্যে যা কিছু ভাল, সৎ, কল্যাণকর বৃত্তি আছে, তার সম্যক বিকাশ হয়, আর যে সকল বৃত্তি অসৎ, অকল্যাণকর সে সব সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, উদ্গত হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেন—শিক্ষা বলতে আমি বুঝি শিশুর শরীর, মন, অন্তরের যা কিছু ভাল, তার সুসঙ্গত বিকাশ (By education, I mean the all-round drawing out of the best in the child, body, mind or spirit)। রাধাকৃষ্ণণ রিপোর্টে দেখা যায়—"মানুষ ও বস্তুর এই বাস্তব জগতে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি আছে, তার উদ্বোধন সম্যক পরিচালনা করাই শিক্ষা।" (The function of education is the guidance of this adventure to the realisation of the potentialities of each individual in the face of actual world of men or things)। কোন কোনও মনীষীর মতে, উন্নততর জীবনধারণের অভ্যাসই শিক্ষা। অবশ্য কি সৎ কিবা অসৎ, কি ভাল কি মন্দ, কি কল্যাণ আর কি বা অকল্যাণকর নির্ণয় করতে গেলে শিক্ষার্থী, তার পরিবেশ (সমাজ ও প্রকৃতি) ও পরস্পরের সম্বন্ধ বিবেচনা করতে হয়। এজন্যেই দেশের, কালের, সমাজের সঙ্গে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, কল্যাণ-অকল্যাণের ধারণা ও তার সঙ্গে শিক্ষার ধারণা বদ্‌লায়। এই প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

এপর্যন্ত শিক্ষা সম্বন্ধে যা বলা হলো, সবই ব্যষ্টির দৃষ্টি কোণ থেকে, অবশ্য সমষ্টির (সমাজ বা রাষ্ট্র) কথা এসেছে কেবল প্রসঙ্গতঃ। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র বা সমাজের কর্মপ্রচেষ্টায় শিক্ষার ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এখন দেখা যাক, সমষ্টির (সমাজ বা রাষ্ট্রের) দৃষ্টিকোণে শিক্ষা কি? রাজতান্ত্রিক বা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজা বা সামন্তরাজেরা শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন বা শিক্ষা-প্রসারের সাহায্য করতেন প্রজাদের হিতকামনায়, তাঁর বা তাঁদের শিক্ষা বা সংস্কৃতির অনুরাগে শিক্ষার ব্যবস্থা করা পুণ্য

কাজের অঙ্গ ছিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষা-ব্যবস্থা করা হয় একদিকে যেমন রাষ্ট্রের একক প্রত্যেক নাগরিককে পূর্ণ বিকাশের সাহায্য করতে, অপর দিকে এই রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের লক্ষ্য সমাজের পরস্পরের মধ্যে ন্যায়বিচার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতি মূল ভাবগুলি নাগরিকদের চরিত্রগত করতে। শিক্ষার অভাবে গণতন্ত্র সফল হয় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বা সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যে যেমন দেশের সমস্ত সম্পদ যথাযথভাবে সফলতার সঙ্গে নিয়োগ করা হয়, ঠিক সেই ভাবেই প্রত্যেক মানুষকে সাক্ষাৎরূপে নিয়োগ করা হয়। এযুগের রাষ্ট্রে মানুষ সম্পদ বা শক্তি। সম্যক ব্যবহারের জন্যে যেমন বনজ বা আকরিক সম্পদ ঠিকমত শোধনাদি করতে হয়, ঠিক তেমনি মানুষকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হয়। পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরকার শিল্প বা কৃষির চেয়ে কম নয়। এজন্যেই উন্নতিশীল বা উন্নত সমাজে বা রাষ্ট্রে শিক্ষা-ব্যবস্থা সরকারী কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এদেশে একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষিত অভিভাবকেরাও শিক্ষাকে ছাত্রের বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি ভাল চাকুরী পাওয়ার প্রস্তুতিমাত্র দেখেন, অপর দিকে সরকার তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থা করে নিজ দলের উৎকর্ষ ও ঔদার্যের পরিচয় দিচ্ছেন মনে করেন ও প্রতিদানে নির্বাচকদের সরকারী দলের প্রতি সমর্থন আশা করেন। এর জন্যেই শিশুকে যথাসম্ভব কম বয়সে পাঠানো হয়, যতদূর আগে সম্ভব ইংরেজী বুলি শেখাবার চেষ্টা হয়, আর শিক্ষার চেয়ে যে কোন রকমে পরীক্ষায় পাশ করে ছেলে কিভাবে 'স্মার্ট' হয় তার সবিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। অবশ্য যে পর্যন্ত সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা না বদ্‌লায় সে পর্যন্ত এই মনোভাব বদ্‌লাবার সম্ভবনা খুবই কম। বিভিন্ন পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ও যেভাবে তাদের রূপ দেওয়া হচ্ছে, তা দেখে মনে হয় এসকলের উদ্দেশ্য শিক্ষা বাদে অন্য কিছু। বর্তমানে এদেশে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থায় সবচেয়ে পরিতাপের দিক প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর, লক্ষ্য বিষয়ে সচেতন তার অভাব। লক্ষ্য স্থির না থাকলে সফলতার আশা কোথায়? কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় শিক্ষার চেয়ে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীদের চেয়ে আর অতি আবশ্যিক উপকরণের চেয়ে কর্তৃপক্ষেরা বেশী গুরুত্ব দেন গৃহ ও তার আশেপাশের বাগান-বাগিচা, আসবাব-পত্রের আড়ম্বরে আর শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক শূন্য অধিকারীকদের। মাঝে মাঝে, অদরকারী আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থাদি দেখে মনে হয় কবিগুরুর "তোতা কাহিনী"। এই শ্লেষাত্মক রূপটি সেযুগের চেয়ে এযুগে আরও বেশী উপযোগী।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা চলে অবিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত জীবন ধরে। মনীষীদের মতে শিক্ষার সিকিভাগ পাওয়া যায় শিক্ষকদের কাছে, সিকিভাগ নিজ মেধায় ও চেষ্টায়, সিকিভাগ সতীর্থদের কাছে, বাকী সিকিভাগ সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতায়। সুতরাং যে পর্যন্ত না মানুষ আদর্শমত উন্নত জীবনের সুযোগ পাচ্ছে, সে পর্যন্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। আদর্শভ্রষ্ট দুর্নীতিপূর্ণ সমাজে কেবল আইন করে, বক্তৃতা দিয়ে, ছাত্র ও শিক্ষকদের দোষী করে শিক্ষা সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ যখন শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়, তখন শিক্ষকদের কাছে ছাত্রেরা একত্রিত হয়ে যে শিক্ষালাভ করে, সেই শিক্ষার কথা বুঝানো হয়। এই শিক্ষা দেওয়া হয় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। বস্তুতঃ এই শিক্ষা 'সম্পূর্ণ প্রকৃত শিক্ষার' অংশমাত্র, গান্ধীজীর ভাষায় 'উপায়মাত্র'। স্কুল-কলেজের

শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে তার পরিবেশ অর্থাৎ প্রকৃতি ও সমাজের সম্বন্ধে যথাসম্ভব বিস্তারিত তথ্যাদি দিয়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় ও তার নিজ বৃত্তির সম্বন্ধে সচেতন করা হয়। প্রকৃতির সম্বন্ধে পরিচয় আসে বিজ্ঞান-শিক্ষায়, সমাজ সম্বন্ধে ইতিহাস, পৌরনীতি ও অর্থনীতি শিক্ষায়, নিজ বৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন হয় সাহিত্য, দর্শন, নীতিকথা ও ধর্ম প্রভৃতি শিক্ষায়। এযুগে সমাজের প্রগতি বিজ্ঞানের উপর সবচেয়ে নির্ভর করে। সুতরাং বর্তমান সমাজকে ভালভাবে বোঝবার জন্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার আবশ্যক। এমন কি, নিজের বৃত্তি সম্বন্ধে ভালভাবে ধারণা করতে গেলে শারীর-বিজ্ঞানের, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের, মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষ সহায়ক। সুতরাং বর্তমান স্কুল-কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান-শিক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। অবশ্য ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, পৌর-নীতি ও সাহিত্য সম্ভবমত শিক্ষাও আবশ্যক। তবে এদেশে ছাত্রদের, সময় ও সামর্থ্য ভাষা শিক্ষায় এত বেশী ব্যয় হয়ে যায় যে, অপরাপর আবশ্যিক বিষয়গুলি শিক্ষার অবকাশ পরিত্যক্ত হয় বা অল্পবয়স্ক ছাত্রদের উপর সমস্ত তাড়াতাড়ি শেখানোর চেষ্টা করে অত্যাচার করা হয়। স্কুলের কর্মসূচী (Routine) ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সমস্ত সময়ের শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ ভাষা শেখানো হয়। নেতাজী কংগ্রেস সভাপতি থাকাকালে জওরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্রভৃতিকে নিয়ে যে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি গঠিত হয়, সেই সমিতি স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম আট বৎসর প্রাথমিক (অবশ্য 'বেসিক') স্তর ধরেন। গান্ধীজীর মতে, সে সময়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মান থেকে বাদ দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান হওয়া উচিত। স্কুলের শিক্ষার প্রথম আট বৎসর কেবল মাতৃভাষা শিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে অনেক আবশ্যিক কিছু শেখানো সম্ভব। যে ছাত্রেরা পরবর্তী জীবনে প্রধানতঃ নিজ প্রদেশেই কৃষি বা শিক্ষার কাজে কাটাবে, তার সময় ও শক্তি অযথা বিদেশী ভাষা শিক্ষার চেষ্টায় অপচয় করবার কি সার্থকতা? যাঁরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করবেন, যাঁদের কর্মক্ষেত্র প্রদেশান্তরে বা দেশান্তরে বিস্তৃত, তাঁদের মাধ্যমিক (অর্থাৎ স্কুল-শিক্ষার নবম থেকে একাদশ বছর) নিষ্ঠার সঙ্গে অপর একটি ভাষা (ইংরেজী বা হিন্দী বা অন্য কোন ভাষা) শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাতৃভাষার ব্যাকরণ ও রচনা-কৌশল ভালভাবে আয়ত্ত করবার পর অপর একটি ভাষার ব্যাকরণ ও রচনা কৌশল ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টায় সুন্দরভাবে আয়ত্ত করতে পারবে। যাঁরা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবেন (অর্থাৎ সসম্মানে স্নাতক হতে চাইবে), তাঁরা কলেজে অন্ততঃ আর একটি ভাষা শিখবে। গবেষণার জন্যে আরও ভাষা শিক্ষার দরকার হতে পারে ও এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্য সমস্ত শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হবে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানগুরু সত্যেন্দ্রনাথ মাতৃভাষার মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা করবার অনেক ব্যর্থ আবেদন করেছেন। তাঁদের আড়ম্বরের সঙ্গে পূজার বা সম্মানিত করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের এই আবেদন না-মঞ্জুর রয়ে গেছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অনেক কর্মী নিজ নিজ অভিজ্ঞতা থেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, সর্বস্তরের শিক্ষাই মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র 'রাজশেখর বসু স্মারক' সংখ্যায় ও অপর একটি সংখ্যায় সক্রিয় বিজ্ঞানীদের গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ করে দেখানো গিয়েছে যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে গবেষণা-প্রবন্ধও লেখা সম্ভব।

যেমন শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষায় হওয়া উচিত, তেমনি বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রভৃতির তত্ত্বের দৃষ্টান্তও যতদূর সম্ভব শিক্ষার্থীর পরিবেশ—যা

প্রতিনিয়ত দেখতে পাওয়া যায়, তাথেকে নেওয়া উচিত। এতে ছাত্রের বিষয়বস্তুতে সম্যক প্রবেশ হবে। অবশ্যই দরকারী অপরাপর তথ্য বা প্রক্রিয়া বা পর্যবেক্ষণ আলোচনা করা হবে। তবে যথাসম্ভব ছাত্রের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া উচিত। এই বিষয়ে অধুনা প্রকাশিত ইউ-রোপে, বিশেষ করে রাশিয়ার (ইংরেজী অনুবাদ ভারতে পাওয়া যায়) বই শিক্ষকেরা দেখলে ও অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে ভাল হয়। পাঠ্যসূচী প্রণয়নেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এইরূপ পঠন-পাঠনে উপকরণের বাহুল্য ও আড়ম্বর বেশ কিছু কমানো যাবে। ছাত্রদের যা পড়ানো হলো, তা যতদূর সম্ভব করে দেখতে উৎসাহিত করতে হবে. ছাত্রদের কোন বিষয়বস্তু বুঝাবার সময় সম্ভব স্থলে ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা আলোচনা করা উচিত। অনেক মনীষীর মতে—এতে বিষয়টি চিত্তাকর্ষক হয় ও ছাত্রদের ঔৎসুক্য জাগায়। এসব দিকে এদেশে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় না। উপরন্তু ছাত্রদের স্বাভাবিক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যে ছাত্র প্রশ্ন করলো, তার দ্বারা এসব জানা বা বুঝা সম্ভব নয়—এই ধারণা জন্মিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। এরূপে ছাত্রের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করা হয়। এটি বিশেষ ক্ষতিকর। আত্মবিশ্বাসী ছাত্র নিজ অধ্যবসায় ও চেষ্টায় ঐ বিষয় আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু আত্ম-বিশ্বাস নষ্ট হলে কখনই সে বিষয় শিখতে পারবে না, বরং এর প্রতিক্রিয়া তার অন্যদিকেও ক্ষতি করবে। শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে অপরাপর উন্নত দেশের মত কিছু কিছু বিশেষ ব্যবস্থা করবার কথা ভাবা উচিত। বিভিন্ন বিষয়ে ‘ওলিম্পিয়া পরীক্ষা’ বা বিশেষ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশ্য এসব বিদ্যালয় বা পরীক্ষার ব্যবস্থা শিক্ষাসচিব বা কোন প্রশাসনিক আধি-কারীকের খেয়ালমত করতে না দিয়ে প্রকৃত জ্ঞানী, গুণী শিক্ষাবিদের উপর দেওয়া উচিত।

ছাত্রদের শিক্ষায় পিতামাতা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রভাব বেশী। যদি পিতামাতা ও আত্মীয়েরা মানুষের মত বাঁচতে না পায়, শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি যথাযোগ্য মর্যাদা ও অর্থ না পান, তবে শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। এঁদের কাছেই ছাত্র-ছাত্রীরা আদর্শ-মত জীবনধারণের শিক্ষা পাবে। ছাত্রদের সঙ্গেও যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। আদর্শহীন দুর্নীতিপরায়ণ সমাজে শিক্ষক ও ছাত্রদের কেবলমাত্র আইন ও শাসানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষা সম্পূর্ণ করা যাবে না। শিক্ষকের যথোচিত মর্যাদা ও অবস্থার উন্নতি ছাত্রদের শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

বায়ুর চাপে ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে ট্রেন

রেল লাইন ছাড়াই অতি দ্রুত গতিতে ছুটে চলবে—অদূর ভবিষ্যতে এই ধরণের ট্রেন চালাবার একটা চিন্তা দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি হোভারক্রাফ্‌টের মত যানগুলিই বিনা পাখায় অথবা বিনা চাকায় দ্রুতগতিতে চলবার ক্ষমতা পেয়েছে —এগুলি গ্লাইড করে চলে বায়ুর চাপে। হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ এখন সমুদ্রের উপর দিয়েও যাত্রী বহনের কাজে নিযুক্ত হচ্ছে। এখন আবার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্থলেও যাত্রী বহন করবার চিন্তা করা হচ্ছে—যাত্রী বহনের এই কাজ করবে হোভারট্রেন।

পরিকল্পনা থেকে জানা যায়, প্রথম হোভারট্রেনগুলি দেয়ালের মত কংক্রিটের পথের ঠিক উপর দিয়ে ছুটবে এবং এগুলির গতিবেগ দু' বছরের মধ্যে হবে ঘণ্টায় ১০০ মাইল পর্যন্ত।

হোভারক্র্যাফ্‌টের উদ্ভাবক মিঃ ক্রিস্টোফার ককরেল বলেছেন যে, আগামী ১০ বছরের মধ্যে এমন এক হোভারট্রেনের পরিকল্পনা করা যাবে, যার গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ২৫০ মাইল।

বিশ্বের প্রথম হোভারট্রেনের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্যে দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত সাদাম্পটনের কাছে অব্যবহৃত পাঁচ মাইল লম্বা একটি রেলপথ স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছে। এটিকে হোভারট্র্যাকে পরিণত করা হবে। হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর (এরা এই সম্পর্কে কাজ আরম্ভ করবেন) হেডকোয়ার্টার্সের খুব কাছেই হলো এই রেলপথটি।

প্রথম দিকে হোভারট্রেনের হয়তো চাকা থাকবে, তবে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, এই চাকা পরে একেবারে দূর করা যাবে। ভবিষ্যতের হোভারট্রেনগুলি চলবে সম্পূর্ণভাবে শূন্যের উপর।

ওয়েস্টল্যাণ্ড এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ লিমিটেড নামে একটি বৃটিশ ফার্ম বৃটেনে এবং বিদেশে ব্যবহারের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন নানা রকমের ব্যবসায়ভিত্তিক হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ নির্মাণ করেছেন এবং এখনও করছেন। এদের তৈরি হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ সম্পর্কে যে সব দেশ ইতিমধ্যে আগ্রহ দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মেনী, নরওয়ে ও জাপান। সুইডিস লয়েড ষ্টীমশিপ কোম্পানী এই ফার্ম থেকেই বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ফেরি সার্ভিস প্রবর্তনের জন্যে হোভারক্র্যাফ্‌ট্‌ ক্রয় করতে যাচ্ছেন।

সম্পূর্ণ তাজা অবস্থায় বীজ সংরক্ষণের প্রয়াস

বীজকে বছরের পর বছর অঙ্কুরোদ্‌গমের সমস্ত গুণসমেত তাজা অবস্থায় সংরক্ষণ করা সম্ভব। বীজ শুষ্ক করা, মজুদ করা এবং প্যাক করার নতুন পদ্ধতি এই ব্যাপারটিকে সম্ভব করেছে।

এই পদ্ধতির উদ্ভাবক হলেন লণ্ডনের কাছে রেডিং-এ অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান সাটন অ্যাণ্ড সন্স। এর পেছনে বহু বছরের গবেষণা রয়েছে। এজন্যে কম করেও ১৮০০০ বার লেবরেটরি টেষ্ট ও ৬,০০০ বার উৎপাদন পরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছে এবং এজন্যে ব্যয় হয়েছে মোট ৮৭,০০০ পাউণ্ড।

এই পদ্ধতিতে বীজকে এখন একেবারে তাজা অবস্থায় রাখা সম্ভব হবে। বীজ-সংরক্ষণ সম্পর্কে একটা প্রধান কথা হলো এই যে, এজন্যে বীজের

আভ্যন্তরীণ আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজন। সাটন প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের ফুল ও সব্জির বীজের এই আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। বীজের আভ্যন্তরীণ আর্দ্রতা এক শতাংশ হ্রাস করবার অর্থ হলো গুদামে আয়ুষ্কাল দ্বিগুণ করা।

শুষ্ক বীজ বছরের পর বছর অঙ্কুরোদ্গমের সমস্ত ক্ষমতা বজায় রেখে গুদামজাত করা যেতে পারে, এতে তার স্বাভাবিক গুণের কোন পরিবর্তনই ঘটবে না। ক্ষতি হবারও কোন আশঙ্কা নেই, কারণ শুষ্ক গুদামে কোন রকম কীট বা ক্ষুদ্র প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না।

ছোট ছোট প্যাকেটে তাজা অবস্থায় বীজ-সংরক্ষণের জন্যে সাটন প্রতিষ্ঠানটি প্যাকেজিং উপকরণ নির্মাণকারী বিভিন্ন কার্মের সহযোগিতায় আর্দ্রতা প্রতিরোধক পাত (Laminates) উদ্ভাবন করেছেন। প্রতি প্যাকেটে আছে সামান্য পরিমাণ শুষ্ক বায়ু, যা বীজকে সমস্ত রকম গুণসমেত রক্ষা করতে সাহায্য করে।

হাওয়া থেকে বিদ্যুৎ

বায়ুপ্রবাহের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তা থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা আজ পৃথিবীর নানা দেশে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে যেমন থার্ম্যাল পাওয়ার ষ্টেশন, জলশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে হাইড্রো-পাওয়ার ষ্টেশন, তেমনি বায়ুপ্রবাহের শক্তি থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টির জন্যে আজ উইণ্ড পাওয়ার ষ্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে। সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়াররা হিসেব করে দেখেছেন, তাইগা অঞ্চলের প্রবল বায়ুপ্রবাহ সহ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে যে বাতাস প্রবাহিত হয়ে থাকে. তার মোট শক্তির হাজার ভাগের মাত্র এক ভাগকে কাজে লাগালেও অতি সস্তায় ৩৫ থেকে ৪০ হাজার কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। বায়ুর শক্তি আজ তাই বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক প্রধান উৎস বলে গণ্য হচ্ছে।

এই কাজে সবচেয়ে বড় যে বাধাকে জয় করতে হবে, সেটা হলো বাতাসের গতিবেগ ও দিকের পরিবর্তনশীলতা। বর্তমানে বায়ুগতি-বিদ্যার (এরোডিন্যামিক্স) অতি দ্রুত উন্নতি, পৃথিবীর আবহমণ্ডল সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা ও নিয়ন্ত্রিত গতির জেনারেটর নির্মাণের অভিজ্ঞতা—ইত্যাদির ফলে বায়ুচালিত বিদ্যুৎ-ষ্টেশনকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর ঊর্ধ্বস্তরের প্রবল বায়ুপ্রবাহকে কাজে লাগানোটাই হলো বায়বীয় বিদ্যুৎ উৎ-পাদনের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে ট্রোপোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বতর প্রান্তে নিরবচ্ছিন্ন প্রবল বায়ুপ্রবাহের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে এই বায়ুর বেগ হলো সেকেণ্ডে ৭০ থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত। সেখানে বায়ুপ্রবাহের শক্তির সমাহরণ (কনসেন্ট্রেশন) ভূপৃষ্ঠের বায়ুপ্রবাহের চেয়ে ২৫ গুণ বেশী। ভূপৃষ্ঠের উপরে (নিরক্ষরেখা ছাড়া অন্যান্য স্থানে) বায়ুপ্রবাহের বেগ হলো গড়ে সেকেণ্ডে ২০ থেকে ৩০ মিটার।

একদল সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ার ট্রোপোস্ফিয়ারের বায়বীয় শক্তির ওই অফুরন্ত উৎসকে কাজে লাগাবার চেষ্টায় পাঁচ বছর ধরে অক্লান্ত গবেষণার ফলে একটি হাই অলটিচ্যুড উইণ্ড-পাওয়ার ষ্টেশনের কার্যকরী নক্সা তৈরি করেছেন। ১০ কিলো-মিটার উঁচু এই ষ্টেশনের কাঠামো তৈরির বদলে তাঁরা বিশেষ ধরণের উইণ্ড টার্বাইনযুক্ত জেনা-রেটরসহ কতকগুলি বৃহৎ বেলুনের ডিজাইন করেছেন। খুব শক্ত ধাতুর দড়িতে আটকানো এক বিশেষ ব্যবস্থায় এক নতুন ধরণের পলিমার উপকরণে তৈরি এই বেলুনগুলি ঊর্ধ্বাকাশে নিজ নিজ জায়গায় স্থির হয়ে থাকবে—বাতাসের ধাক্কায় হেলবে না। প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই বেলুনবাহিত জেনারেটর ৮০ শতাংশ পর্যন্ত বায়বীয় শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করতে পারবে। এই ট্রোপোস্ফিয়ার উইণ্ড-পাওয়ার ষ্টেশনের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে বছরে এক কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টারও বেশী।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জানুয়ারী—১৯৬৬

১৯শ বর্ষ : প্রথম সংখ্যা

ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি হইতে ৪ঠা ডিসেম্বর টাইটান-২ রকেটের সাহায্যে জেমিনি-৭ মহাকাশযানটির উৎক্ষেপণের দৃশ্য।

করে দেখ

উত্তাপ না দিয়ে জল ফোটানো

তোমরা অনেকেই হয়তো বেদেদের যাদুর খেলা দেখে থাকবে। তারা যেখানে-সেখানে খোলা জায়গায় নানা রকম যাদুর খেলার সঙ্গে দু-একটি বৈজ্ঞানিক খেলাও দেখিয়ে থাকে। সেগুলিকেও তারা অবশ্য যাদুবিদ্যা বলেই প্রকাশ করে। আজ তোমাদের কাছে এই রকমের একটা খেলার কথাই বলছি।

যাদুকর প্রথমে একটা কাচের গ্লাসের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জলে ভর্তি করে গ্লাসের মুখে একটা ভিজা রুমাল ঢাকা দিয়ে দেয়। তারপর সেই রুমালের মাঝখানটা আঙুল দিয়ে চেপে চেপে বাটির মত একটা গর্ত করে। রুমালের মধ্যস্থল গ্লাসের জলের

সঙ্গে লেগে গিয়ে বাটির মতই গোলাকার হয়ে থাকে। এই অবস্থায় সে গ্লাসটাকে উল্টে নিয়ে তার ডান হাতের উপর রাখে। উল্টে দিলেও রুমালটা কিন্তু তখনও বাতাসের চাপে বেলুনের মত উপর দিকেই ফুলে থাকে। এবার রুমালের ধারগুলি গ্লাসের গলার দিকে গুটিয়ে নিয়ে—ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক সেভাবে—বাঁ-হাতে ধরে দর্শকদের বলে—যেই মাত্র আমি গ্লাসটার উপর আঙুল ঠেকাবো, যাদুবিদ্যার বলে তৎক্ষণাৎ গ্লাসের জল ফুটতে সুরু করবে।

উত্তাপ প্রয়োগে জল ফোটবার পূর্বমুহূর্তে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ উঠতে থাকে, গ্লাসের উপর আঙুল ঠেকানো মাত্রই গ্লাসের জলে সেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বুদ্বুদ উঠতে দেখা যায়।

কেমন করে এটা হয়? ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়—গ্লাসের উপর আঙ্গুলের চাপ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বাঁ-হাতে ধরা ভিজা রুমালটা গ্লাসের গায়ে পিছলে গিয়ে উপরের দিকে ওঠবার ফলে, অর্থাৎ গ্লাসটা ধরা জায়গার কিছুটা নীচে নামবার ফলে গ্লাসের মধ্যে রুমালের বেলুনাকৃতির জায়গাটা ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে আসে। কাজেই গ্লাসের মধ্যে আংশিক শূণ্যতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে রুমালের সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বাতাস প্রবেশ করে' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদের সৃষ্টি করে। দেখে ঠিক জল ফোটবার মতই মনে হয়।

—গ—

কোকোর কথা

কোকো আর চকোলেট তোমরা অনেকেই খেয়েছ। কিন্তু এই দুটি জিনিষ কেমন করে পাওয়া যায় তা কি তোমরা জান? কোকো গাছের (Theobroma Cacao) বীজ থেকে কোকো আর চকোলেট প্রস্তুত হয়। অ্যামাজন নদীর অববাহিকা, মধ্য আমেরিকার বনাঞ্চল হচ্ছে কোকো গাছের আদি বাসভূমি। এছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশেও কোকো গাছ উৎপন্ন হয়। মেক্সিকোতে শত শত বছর যাবৎ কোকো গাছের চাষ হচ্ছে।

প্রাচীন অ্যাজটেকরা (Aztecs) কোকো পান করতে ভালবাসতো। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনীয় অভিযাত্রীরা ইউরোপে কোকো পানের অভ্যাস চালু করে। এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চকোলেট এবং পানীয় হিসাবে কোকো চালু হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এখন লাভজনক ব্যবসায় হিসাবে কোকোর চাষ হচ্ছে।

তাপ এবং বৃষ্টির জল বেশী পাওয়া যায়—এমন জায়গাতেই কোকো গাছ ভালভাবে জন্মায়। প্রবল বাতাসে কোকো গাছের কোন ক্ষতি না হয় এবং ছায়া পাওয়া যায়—এই রকম স্থানই কোকো-চাষের জন্যে নির্বাচন করা দরকার। সাধারণতঃ বনের বড় বড় গাছের নীচেই কোকো গাছ জন্মায়; ফলে, ঝড়-ঝাপটার বেগ বড় বড় গাছে প্রতিহত হয় এবং ছায়াও পাওয়া যায়। অনেক স্থানে নারিকেল গাছ এবং রবার গাছের নীচে কোকো গাছ জন্মায়। কোকো গাছ ২০ থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। গাছের গুঁড়ি ৬।৭ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। ৬-৭টা প্রধান শাখা বেরোয়।

বীজ অথবা কাটিং থেকে কোকো গাছ জন্মানো হয়। সাধারণতঃ কোকো গাছের বীজ থেকে চাষ করে ব্যাপকভাবে কোকো গাছ উৎপাদন করা হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী ৬ থেকে ১৫ ফুট দূরে দূরে গাছগুলিকে রোপণ করা হয়ে থাকে। গাছে

ফল ধরতে চার থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। নানা জাতের কোকো গাছ আছে। ব্রেজিলে বড় বড় কোকো চাষের ক্ষেত আছে।

গাছ থেকে কোকোর ফল কাটা হচ্ছে।

পরিণত অবস্থায় কোকো গাছের গুঁড়ি ও শাখায় ফুল ফোটে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই ফল ধরে। ফলগুলির আকার অনেকটা শশার মত এবং রং হলদে। ফলের মধ্যে বীজগুলি কড়াইশুঁটির দানার মত পরপর সাজানো থাকে। বীজগুলি বাদামী রঙের এবং দেখতে অনেকটা বাদামের মত। প্রতিটি ফলে ৪০টা পর্যন্ত দানা থাকতে

পারে। প্রতিটি গাছে বছরে কুড়ি থেকে ত্রিশটি ফল হয়। ফল পাকবার পর সেগুলিকে কেটে দানা সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি গাছ থেকে একবারে দুই পাউণ্ডের মত শুক্‌নো দানা পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে গাঢ় বাদামী রঙের শাঁস থাকে। দানাগুলিকে গাঁজাবার (Fermentation) জন্যে স্তূপীকৃত করে পাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। আবার অনেক সময় বাক্সের মধ্যে ঢাক্‌না বন্ধ করে অথবা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে রেখে দেওয়া হয়। এর ফলে বীজগুলি গেঁজে ওঠে। গাঁজবার পর বীজ থেকে চকোলেটের গন্ধ নির্গত হয়।
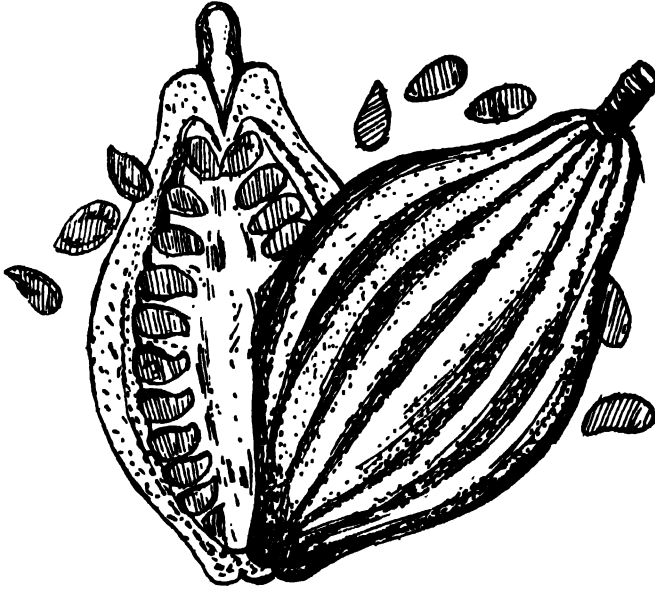
কোকোর দানা।

গেঁজে যাবার পর রোদে দিয়ে অথবা ঘরের মধ্যে উত্তপ্ত বাতাস প্রবাহিত করে বীজগুলিকে শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকাবার পর বীজের রং চকোলেটের মত হয়ে যায়। বিভিন্ন জাতীয় পোকা এবং ছত্রাক কোকোর খুবই ক্ষতি করে; কাজেই যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার দরকার হয়।

কারখানাতে বীজগুলিকে ভালভাবে বেছে নিয়ে পরিষ্কার করে ঘণ্টাখানেক প্রায় ২৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপে সেদ্ধ করা হয়। টাট্‌কা বীজের তুলনায় সেদ্ধ বীজের ওজন হয় প্রায় অর্ধেক। বীজের খোসাগুলি ভেঙে নিয়ে সেগুলিকে বাদ দেওয়া হয়। সেদ্ধ দানার চূর্ণকে বলা হয় নিব (Nib)।

সেদ্ধ বীজগুলিকে পেষাই করে একরকম থক্‌থকে তরল পদার্থ পাওয়া যায়। সেই তরল পদার্থকে হাইড্রলিক প্রেসে চাপ দিলে যে জিনিষ বেরিয়ে আসে, সেটা

কোকো-মাখন (Cocoa butter) নামে পরিচিত। কোকো-মাখন বেরোবার পর ছিব্ড়ার মত যে পদার্থ পড়ে থাকে, তাকে গুঁড়া করে মিহি চালুনীতে ছেঁকে যা পাওয়া যায়—তাই কোকো হিসাবে বাজারে বিক্রয় করা হয়।

কোকো-চূর্ণের সঙ্গে চিনি এবং কোকো-মাখন মিশিয়ে শক্ত করবার জন্যে ছাঁচে ঢালা হয়। এগুলিই হলো চকোলেট। সময়ে সময়ে স্বাদ বাড়াবার জন্যে জমাট দুধ চকোলেটে মেশানো হয়ে থাকে।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিসুভিয়াস

পৃথিবীতে যে সব আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার কথা শোনা যায়, তাদের মধ্যে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির নামই সবচেয়ে বেশী পরিচিত। ইটালির নেপল্‌স্ নগরীর সাত মাইল দক্ষিণ-পূর্বে নেপল্‌স্ উপসাগরের কাছে ভিসুভিয়াস অবস্থিত। ভিসুভিয়াসের ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ইটালীর দুটি শহর পম্পেই এবং হারকিউ-লেনিয়াম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে ৭৯ খৃষ্টাব্দে। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনী (ছোট) এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলার বিবরণ লিখে গেছেন।

রোমানদের আমলে ভিসুভিয়াসকে 'মৃত' অর্থাৎ আর কোন দিন এথেকে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা নেই—এরকম ভাবা হতো। খৃষ্টাব্দ গণনা আরম্ভ হবার প্রথম দিকে একজন অভিযাত্রী ভিসুভিয়াসের চূড়ায় আরোহণ করেন। তিনি ফিরে এসে বলেন যে, এর জ্বালামুখ আর কোন দিনই সক্রিয় হবে না এবং সেখানে প্রচুর আঙ্গুর লতা জন্মেছে। প্রাচীনেরা ভিসুভিয়াসের বর্ণনা দিয়েছেন যে, এটির গঠন মোচার মত এবং উপরটা সমতল, পার্শ্বদেশ খাড়া। পাহাড়ের উপরে আঙ্গুর লতা এবং তৃণাচ্ছাদিত একটি গোলাকার উপত্যকা আছে। ভিসুভিয়াসের পাদদেশের কাছাকাছি সমুদ্রের নিকটে পম্পেই ও হারকিউলেনিয়াম নামক দুটি সমৃদ্ধশালী নগরী গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া কাছাকাছি অনেক গ্রামও ছিল।

৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অগাষ্ট বেলা একটার সময় হঠাৎ দেখা গেল—আঙ্গুর লতায় আচ্ছাদিত শান্ত ভিসুভিয়াসের জ্বালামুখ থেকে ভীষণ কালো ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়ায় চারদিক এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেল যে, মনে হলো যেন দিনের বেলায় রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে—এর সঙ্গে সুরু হলো প্রচণ্ড ভূমিকম্প। ঘরবাড়ী, মাটি—সবকিছু সাংঘাতিকভাবে কাঁপতে লাগলো। সমুদ্রের জলরাশি ক্রুদ্ধ

গর্জনে ওঠা-নামা করে তীব্রবেগে তটভূমিকে আঘাত করতে লাগলো। জ্বালামুখ থেকে নির্গত ধোঁয়া ও বাষ্পে পর্বতের শীর্ষদেশ অদৃশ্য হয়ে গেল। সমুদ্রের ভীষণ গর্জন এবং পর্বতের বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর শব্দ আশেপাশের গ্রাম ও নগর থেকে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে পাথরের টুক্‌রা উৎক্ষিপ্ত হয়ে চারপাশে পড়তে লাগলো এবং মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত আগুনের ঝল্‌কানিতে কালো আকাশ
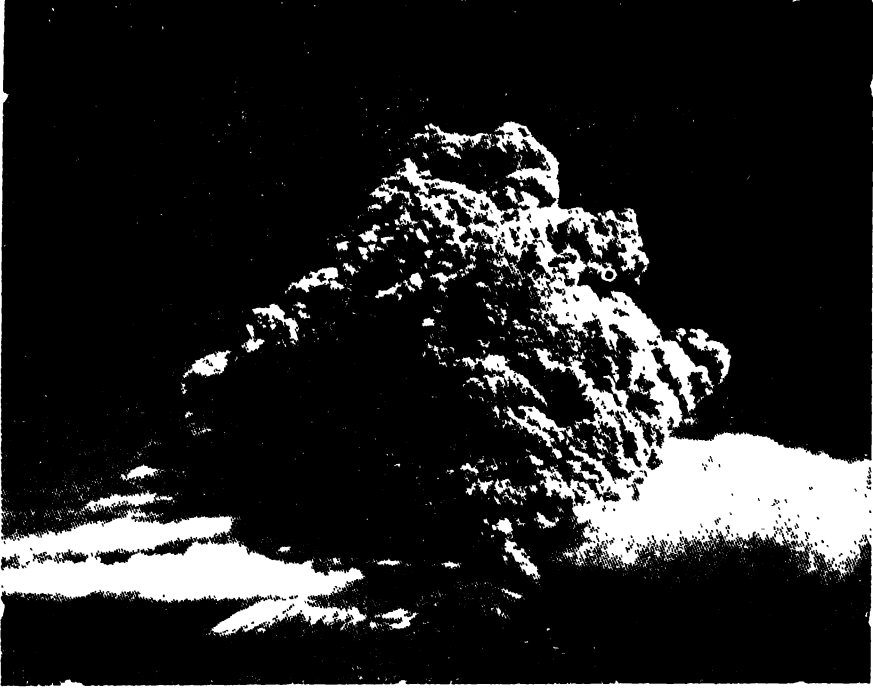
১৯৪৪ সালে মার্চ মাসে ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের দৃশ্য।

লাল হয়ে উঠলো। মাঝে মাঝে উত্তপ্ত জমাট লাভার বড় বড় চাঁই সজোরে গড়িয়ে পড়তে লাগলো আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ভস্মরাশি উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হতে লাগলো। ভিসুভিয়াসের সমুদ্রতটবর্তী অংশটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেল।

আট দিন ও আট রাত্রি ধরে ভিসুভিয়াসের এই ধ্বংসের তাণ্ডব চলে। আশেপাশের গ্রামবাসী ও সহরবাসীরা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অনেকে বাড়ীর বাইরে এসে খোলা জায়গায় আশ্রয় নেয়, আবার কেউ কেউ বাড়ীকেই অধিকতর নিরাপদ ভেবে সেখানেই থেকে যায়। কিন্তু ভিসুভিয়াসের প্রচণ্ড কোপ থেকে প্রায় কেউই রক্ষা পায় নি। ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি হতে থাকে আর এই বৃষ্টির তীব্র জলস্রোত পর্বতের গা বেয়ে ঢালু দিকে প্রবাহিত হবার সময় রাশি রাশি পাথর, ছাই, বালি বহন

করে আনে। এই সব জিনিষ জলস্রোতে মিশে গিয়ে ভীষণ কর্দমের সৃষ্টি করে। এই কর্দমস্রোত তার গতিপথের সব জায়গা ডুবিয়ে দেয়—অর্থাৎ সবকিছুই কর্দমে ঢাকা পড়ে যায়। ভিসুভিয়াস থেকে ছয় মাইল দূরবর্তী স্থানও ছাই, বালি ও পাথর মিশ্রিত কর্দম এবং উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরসমূহের আক্রমণ থেকে রেহাই পায় নি এবং সে সব জায়গা মনুষ্যাবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে যায়। পম্পেই এবং হারকিউলেনিয়াম আগেই ভিসুভিয়াস থেকে উৎক্ষিপ্ত বালি, ছাই, পাথরের টুক্‌রায় ঢাকা পড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত প্রবল কর্দমস্রোতে সম্পূর্ণরূপে সমাধি লাভ করে।

আশ্চর্যের বিষয়, ৭৯ খৃষ্টাব্দের এই ঐতিহাসিক অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভিসুভিয়াসের জ্বালামুখ থেকে উত্তপ্ত তরল লাভাস্রোত প্রবাহিত হয় নি। কিন্তু পরবর্তী অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রচুর উত্তপ্ত তরল লাভাস্রোত ভিসুভিয়াস থেকে নির্গত হয়েছিল। ৪৭২ খৃষ্টাব্দের আর একটি ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে তার ছাই, বালি, পাথর, লাভাস্রোত এই দুটি সহরের ধ্বংসস্তূপের উপর জমা হয়েছিল।

১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তও হারকিউলেনিয়াম সহর ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত হয় নি। অনেকে এই ধ্বংসস্তূপ থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে পাথর সংগ্রহ করতো। এর ফলে কয়েকটি মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এর পর তৃতীয় চার্লস্ ধ্বংসস্তূপ খননের আদেশ দেন। খননের ফলে প্রথমেই আবিষ্কৃত একটি রঙ্গশালা, হারকিউলিস ও ক্লিওপেট্রার মূর্তি এবং একটি গ্রন্থাগারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।

হারকিউলেনিয়াম আবিষ্কৃত হবার চল্লিশ বছর পরে পম্পেই নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। এখানেও অ্যাম্ফিথিয়েটার ও অট্টালিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষের উপর তরল প্লাষ্টার ঢেলে তার ছাঁচ তোলা হয়েছে। অনেক মানুষের বিভিন্ন অবস্থার নিখুঁত ছাপ তোলা সম্ভব হয়েছে। অনেককে দেখা গেছে, মাথায় বালিশ চাপা দিয়ে আছে—ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথরের আঘাত থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে।

১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরিতে পুনরায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। সে সময় এর জ্বালামুখ দিয়ে সাতটি লাভাস্রোত প্রবাহিত হয়ে আশেপাশের অনেক গ্রাম ধ্বংস করে এবং ১৮০০০ লোক মারা যায়। ১৯০৬ সালে আবার ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ১৮ দিন যাবৎ অগ্ন্যুৎপাত চলে এবং উত্তপ্ত গলিত লাভাস্রোত প্রবলবেগে নির্গত হতে থাকে। ছাই, ধোঁয়া ও বাষ্প ছয় থেকে আট মাইল পর্যন্ত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ভিসুভিয়াসের আর একটি প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়।

১৯৪৪ সালের ১৮ই মার্চ আবার ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত সুরু হয়। ২০শে

মার্চ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে উত্তপ্ত ছাই, ভস্মরাশি, পাথরের টুক্‌রা, বড় বড় লাভার চাঁই ভীষণ জোরে উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়। গলিত লাভাস্রোতও জ্বালামুখ থেকে প্রবাহিত হতে থাকে। ছাই, পাথর, গলিত লাভাস্রোতে আশেপাশের অঞ্চলসমূহ সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইলা সেনগুপ্ত

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার গত নভেম্বর '৬৫ সংখ্যায় 'প্লাজ্‌মা—পদার্থের চতুর্থ অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়েছি। পদার্থের আরো কি কোন অবস্থা থাকা সম্ভব?

পঞ্চানন পাত্র

উত্তর: তত্ত্বগতভাবে পদার্থের আরো একটি অবস্থা থাকতে পারে—এর পঞ্চম ও শেষ অবস্থা।

আমাদের জানা আছে, পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে, যাকে বলা চলে এর অন্দরমহল, সেখানে একটি নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক থাকে। পরমাণুর বহির্মহল এক বা একাধিক ইলেকট্রন নিয়ে গঠিত। এই সব ইলেকট্রন স্বভাবতঃই অন্দরমহলের চতুর্দিকে নিয়মিত পরিক্রমারত। পরমাণুর মধ্যে যখন ভাঙ্গন ধরে ও পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্ধনমুক্ত অবস্থায় পজিটিভ আয়নের সঙ্গে সহাবস্থান করে, তখন পদার্থের যে অবস্থা, তাই হলো প্লাজ্‌মা।

কিন্তু পরমাণু-কেন্দ্রকও একেবারে যে অবিচ্ছিন্ন, তা নয়। এর ভিতর প্রোটন ও নিউট্রন নামক যে মৌলিক কণিকাগুলি থাকে, সেগুলি যদি কেন্দ্রক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করে, তখন দেখা দেবে পদার্থের পঞ্চম অবস্থা। তবে কেন্দ্রকের বন্ধনশক্তি, যা প্রোটন ও নিউট্রন কণিকাগুলিকে একত্রে ধরে রাখে, তা অত্যন্ত উচ্চ মাত্রার হওয়ায় পদার্থের এই পঞ্চম অবস্থা সম্ভব হতে হলে পদার্থের মধ্যে বিপুল শক্তি সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক। কঠিন থেকে তরল বা তরল থেকে বাষ্পে পদার্থের রূপান্তরের জন্যে যেখানে কণিকা প্রতি গড়ে প্রায় $১০^{-২}$ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তির প্রয়োজন, প্লাজ্‌মায় রূপান্তরের জন্যে প্রয়োজন ১ থেকে ৩০ ইলেকট্রন ভোল্ট, সেখানে পদার্থের পঞ্চম অবস্থায় রূপান্তরের জন্যে আবশ্যক হবে ৮০ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট (একটি ইলেকট্রনকে এক ভোল্ট বিদ্যুৎ-চাপ অতিক্রম করতে যে শক্তি ব্যয় করতে হয়,

তার পরিমাপ হলো এক ইলেকট্রন ভোল্ট)। যে তাপমাত্রায় পদার্থ তার পঞ্চম অবস্থায় রূপান্তরিত হতে পারে, তা হলো কয়েক হাজার কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

বাস্তব ক্ষেত্রে পদার্থের পঞ্চম অবস্থার অস্তিত্বের এখনো কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

জয়ন্ত বসু

প্রশ্ন : ১। আমাদের সৌরজগতের মত আরও কয়টা সৌরজগত আছে ?

প্রশ্ন : ২। পৃথিবীর বাইরে ব্রহ্মাণ্ডের আর কোথাও মানুষ আছে কি ?

প্রশ্ন : ৩। শুক্রগ্রহের আবহাওয়া কি মনুষ্য-বাসের উপযোগী ?

প্রশ্ন : ৪। সব নক্ষত্র আকাশে দিক পরিবর্তন করে, ধ্রুবতারা করে না কেন ?

কুমারী সুজাতা মুখার্জী

১। উত্তর : রাত্রির আকাশে যেসব নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের সূর্যও তাদেরই মত একটি সাধারণ নক্ষত্র-বিশেষ। নক্ষত্রগুলির কোনটি সূর্যের চেয়ে বড়, কোনটি সূর্যের চেয়ে ছোট, তবে সকলেই এক একটি সূর্য—অনেক দূরে আছে বলে অত ছোট দেখায়। তাই আমাদের সূর্যের চারদিকে যেমন গ্রহ, উপগ্রহ ঘুরে বেড়ায়, ঐ সব নক্ষত্রের চারদিকেও গ্রহ, উপগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন নক্ষত্রের ক্ষেত্রে গ্রহের সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। আবার কোন কোনটির ক্ষেত্রে একেবারেই কোন গ্রহ, উপগ্রহ নাও থাকতে পারে। তবে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক নক্ষত্রের সঙ্গে যে সৌরজগৎ রয়েছে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি।

২। উত্তর : ১নং প্রশ্নের উত্তর থেকে বোঝা যাবে যে, বিভিন্ন নক্ষত্রের সঙ্গে হয়তো গ্রহ, উপগ্রহ রয়েছে। আমাদের ছায়াপথ ছাড়াও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য ছায়াপথ (গ্যালাক্সি)। তাদের প্রত্যেকের মধ্যে আবার রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্র। এই সব নক্ষত্রসমূহের মধ্যেও অনেকেরই সঙ্গে আমাদের মত সৌরজগৎ থাকা স্বাভাবিক। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ব্রহ্মাণ্ডের বহু জায়গায়ই হয়তো গ্রহ, উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এখন মানুষ পৃথিবীতে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় নি। যুগ যুগ ধরে জীবজগতের বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীতে আজ আমরা মানুষ দেখতে পাচ্ছি। এর জন্যে দরকার বিশেষ ধরণের আবহাওয়ার—যেখানে থাকবে জল, অক্সিজেন, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্রহ, উপগ্রহের কোথাও যদি এই জাতীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে সেখানে মানুষের অস্তিত্ব থাকাও খুবই স্বাভাবিক। মানুষ পর্যায়ে না আসলেও অন্যান্য প্রাণী থাকতে পারে—এমন কি, মনুষ্যের চেয়ে উন্নত ধরণের প্রাণীও থাকা সম্ভব। বৈজ্ঞানিকেরা এর খোঁজে আছেন। তবে কোন সঠিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি।

৩। উত্তর : শুক্রগ্রহকে চারদিকে ঘিরে রেখেছে বেশ পুরু মেঘ, অনেকটা ঘোমটার মত। এই কারণে শুক্রের অভ্যন্তর ভাগ খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় নি।

মানুষ কেন, যে কোন প্রকার জীব থাকতে হলেই প্রথমে দরকার অক্সিজেন ও জলের। এই অক্সিজেন ও জল শুক্রে আছে কিনা বা থাকলেও কি পরিমাণ আছে—সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনও এক মত হতে পারেন নি। যে সব পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তাথেকে এই সিদ্ধান্ত মোটামুটিভাবে করা যেতে পারে যে, মানুষ শুক্রগ্রহে নেই। সেখানে সম্ভবতঃ প্রাণের সঞ্চার সবে সুরু হয়েছে; অর্থাৎ প্রোটোপ্লাজম জাতীয় জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে। এই থেকে যদি উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ হতে থাকে, তবে শুক্রের কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ক্রমশঃ কমে তার স্থান নেবে অক্সিজেন। তারপর স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলে সেখানে নানা জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে। একদিন হয়তো মানুষও দেখতে পাওয়া যাবে। তবে তা ঘটতে এখনও অনেক দেরী।

৪। উত্তর: সব নক্ষত্র আকাশে কেন দিক পরিবর্তন করে, সেটা আগে জানা দরকার। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আকাশের সকল জ্যোতিষ্কই পূর্বদিকে উদিত হয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। এর কারণ হলো, জ্যোতিষ্কগুলি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে রয়েছে এবং যদিও তাদের নিজস্ব হয়তো কিছু গতিবিধি আছে, কিন্তু পৃথিবী থেকে আমরা তাদের স্থির বলে ধরে নিতে পারি। পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরছে বলে ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে দর্শকের কাছে মনে হয়—দূরের স্থির নক্ষত্রগুলি পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। রেল গাড়িতে বসে যেমন আমরা মনে করি—বাইরের স্থির গাছপালা ও লাইট পোষ্টগুলি প্রচণ্ড বেগে উল্টো দিকে ছুটে চলছে। এখন ধ্রুবতারা রয়েছে পৃথিবীর ঠিক অক্ষের বরাবর উপরের আকাশে। তাই পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকেই লক্ষ্য করা যাক না কেন, পৃথিবীর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর অবস্থানের কোন পরিবর্তন দেখা যাবে না। সব সময়েই একে আকাশের একই জায়গায় স্থির দেখা যাবে। দক্ষিণ মেরু থেকে অবশ্য ধ্রুবতারাকে স্বাভাবিক কারণেই দেখতে পাওয়া যায় না।

দীপক বসু

বিবিধ

পঞ্চম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মারক' বক্তৃতা

গত ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর (১৯৬৫) অপরাহ্ণ ৫টায় ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজস্থিত সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বক্তৃতা-গৃহে পঞ্চম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মারক' বক্তৃতা দেন অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে 'মেঘ ও বিদ্যুৎ' এবং 'বিদ্যুৎপাত ও তজ্জনিত বৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তন'। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

মার্কিন বিজ্ঞান চলচ্চিত্র উৎসব

২৯শে নভেম্বর কলকাতার অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর প্রেক্ষাগৃহে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মার্কিন বিজ্ঞান চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সংস্থা এবং মার্কিন তথ্য বিভাগের যুক্ত উদ্যোগে এই বিজ্ঞান চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজিত হয়।

উদ্বোধনী ভাষণে অধ্যাপক বসু এই আশা প্রকাশ করেন যে, ধ্বংসাত্মক কাজে বর্তমানে যে সব সম্পদ ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলি যাতে কল্যাণকর ও গঠনমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়, তার জন্যে বিশ্বে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও মনীষীরা মনোনিবেশ করবেন। তিনি বলেন, এক শ্রেণীর লোক মনে করেন, মহাকাশ গবেষণায় যে প্রভূত অর্থব্যয় করা হচ্ছে, তা যদি আফ্রো-এশিয়ার দেশসমূহের অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্যে ব্যয়িত হতো তাহলে সে দেশের মানুষের পক্ষে পরম আশীর্বাদস্বরূপ হতো।

বিজ্ঞান চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন—এই চলচ্চিত্র উৎসব ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ছাত্রদের

মার্কিন চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করছেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

কাছে মার্কিন বিজ্ঞানীদের কর্মকৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভের একটা সুযোগ এনে দেবে।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কলকাতাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়ম কে. হিচ্‌কক সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সংস্থার পক্ষ থেকে ডাঃ শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায় পাঁচজন বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানী—যাঁরা এই উপলক্ষে ভারতে এসেছেন তাঁদের পরিচিতি প্রদান করেন। তাঁরা হচ্ছেন মার্কিন নৌবিভাগের চিকিৎসা শাখার ডাঃ এডওয়ার্ড বার্ড, ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের সহ-অধ্যাপক ডাঃ জেম্‌স্‌ কোয়েভিং, মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সহ-ডীন ডাঃ উইলিয়াম ম্যাঙ্গস্টার; পেনসিলভেনিয়া রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ডাঃ জন সেম্প এবং পূর্ব পেনসিলভেনিয়া সাইকাট্রিক ইনষ্টিটিউটের চলচ্চিত্র শিল্পী ডাঃ জ্যাকুয়েস ভল্‌ক।

বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বসু বিজ্ঞান মন্দির এবং অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর প্রেক্ষাগৃহে ৩০শে নভেম্বর থেকে চারদিন পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, যন্ত্র-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত সম্পর্কিত একাধিক মনোজ্ঞ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

মহাকাশে জেমিনি-৬ ও ৭-এর মিলন

কেপ কেনেডি, ফ্লোরিডা—জেমিনি ৬ ও ৭-এর মহাকাশচারীগণের ১৫ই ডিসেম্বর মহাকাশে এক নাটকীয় ও ঐতিহাসিক মিলন ঘটে। এই মিলনস্থল হলো প্রশান্ত মহাসাগরের উর্ধ্বাকাশ। মানুষ এযাবৎ যে সব দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে, এটি তাদের অন্যতম।

১০০ ফুটের ব্যবধানে এই দুই মহাকাশযানের সাফল্যজনক মিলনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চন্দ্রলোক যাত্রার পথ আরও সুগম করে দিল। জেমিনি-৬-এর নভশ্চারী টমাস পি. ষ্ট্যাফোর্ডকে শান্ত কণ্ঠস্বরে বলতে শোনা যায়—আমরা ১২০ ফুটের ব্যবধানে রয়েছি।”

এই দুই মহাকাশযানের ঐতিহাসিক মিলনস্থল হলো ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রায় ১৮৫ মাইল উপরে।

মহাকাশে দুটি মহাকাশযানের মিলন ঘটাবার চূড়ান্ত পর্যায়ে জেমিনি-৬-এর নভশ্চারীযুগল জেমিনি-৭-এর দৃষ্টিপথের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার উপর দিয়ে যাবার সময় জেটযন্ত্র সঞ্চালন করেন। চতুর্থবার ভূ-প্রদক্ষিণের সময় জেমিনি-৬ জেমিনি-৭-এর কক্ষপথের দিকে নেমে আসতে সুরু করে। ওদিকে জেমিনি-৭-এর মহাকাশচারীদ্বয় ফ্রাঙ্ক বরম্যান ও জেমস লোভেল (জুনিয়র) তাকে স্বাগত জানাবার জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকে।

মহাকাশে এক লক্ষ তিন হাজার মাইল উড়ে গিয়ে চতুর্থবার পৃথিবী প্রদক্ষিণের কালে শিরা ও ষ্ট্যাফোর্ড জেমিনি-৭-এর খুব কাছে পৌঁছায়। তারপর ছয় ঘণ্টা তারা পাশাপাশি থেকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেব।

১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত্রি আটটা উনষাট মিনিটে (গ্রীনউইচ সময় বিকাল তিনটা উনত্রিশ) অর্থাৎ কাঁটায় কাঁটায় পূর্বনির্ধারিত সময়ে জেমিনি-৬ মহাকাশ থেকে আটলাণ্টিকে অবতরণ করে। ১৮ই ডিসেম্বর জেমিনি-৭ও নিরাপদে যথাসময়ে ফিরে আসে।

ভ্রম সংশোধন

‘জ্ঞান ও বিজ্ঞানে’ (ডিসেম্বর ’৬৫) প্রকাশিত “মানুষের ভাগ্যলিপির রাসায়নিক ভিত্তি” প্রবন্ধের —১০৮ পৃঃ ২ (ক) নং চিত্রের তলায় ১ম লাইনে, ১০৯ পৃঃ ২য় স্তম্ভের উপর থেকে ১২ পংক্তিতে, ২ (খ) নং চিত্রের তলায়, ১০৮ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভের শেষের পংক্তির উপর পংক্তিতে, ১১০ পৃঃ ২য় স্তম্ভের উপর থেকে ৬ষ্ঠ পংক্তিতে ‘থায়ামিনের’ (Thiamine)-এর স্থলে ‘থাইমিন’ (Thymine) হবে; ১১২ পৃঃ ২য় স্তম্ভের ৩য় পংক্তিতে ‘DNA-এ’র স্থলে ‘DNA-এর’ হবে; ১১৪ পৃঃ ১নং চিত্রের তলায় হবে ‘১নং চিত্র—উ = Uracil (ইউরাসিল)।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনবিংশ বর্ষ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ দ্বিতীয় সংখ্যা

লেসার ও আলোর বিচিত্র অনুরণন

জিষ্ণু দে

গান শুনতে কে না ভালবাসে! কত গলা, কত যন্ত্রের বাজনা শোনা যায়—কোনটা কোন বিশেষ জনের পছন্দ। একই গান একজনের গলায় মুগ্ধ করে, আবার আরেক জনের গলায় মানায় না। আমরা জানি, শব্দের সুর হচ্ছে বাতাসের কম্পন। টিউনিং ফর্ক কিংবা হেল্‌ম্‌-হোলৎস্‌ রেজোনেটরই সবচেয়ে খাঁটি অবিকৃত সুর তোলে। কোন বিশেষ কম্পনাঙ্ক W-তে কাঁপতে থাকলে $Sin\ (Wt-kx)$ বা $Cos\ (Wt-kx)$ জাতীয় সমতলীয় ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়। এখানে W কম্পনের দ্যোতক আর x-অক্ষ তরঙ্গের বিস্তারের দিক বোঝাচ্ছে। যখন W=২৫৬ বা ৫১২ তখম আমরা সাধারণতঃ বলি—C-তে সুর বাজছে। কিন্তু এই বিশুদ্ধ C শুনতে ভাল লাগে না। যখন কাছের পঞ্চম বা আগে বা পরের গান্ধার ইত্যাদি আরো কয়েক সুর সা-এর সঙ্গে অল্প অল্প থাকে, তখনই আমরা পাই গলার বা যন্ত্রের বিশেষ স্বরপরিচয়—যাকে ইংরেজীতে বলে Timbre। এ শুনেই আমরা বলি এটা বেহালা, ওটা বাঁশী। যদি বাড়ীর রেডিও সেকেলে হয়, তাহলে অনেক সময় বাঁশী-বেহালার তফাৎ পড়বে ঢাকা—কারণ বাঁশীতে সুরের সঙ্গে যে উঁচু পর্দার সঙ্গীসুর বা Harmonic বাজে, তা রেডিও দেয় কেটে।

আলোও তো তরঙ্গ। পূর্বের বিজ্ঞানীরা ভাবতেন, এই তরঙ্গ উঠছে ঈথারে। ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল আলো-কে এক বিশেষ বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ বলে বুঝিয়েছেন। তাহলে আলোক-

তরঙ্গেও তো এক রঙের অনুরণন উঠতে পারে, এক রঙের তরঙ্গ শব্দের মত অন্য রঙের আমেজ তুলতে পারে বিভিন্ন স্ফটিক দ্রব্যে। বিজ্ঞানীদের মনে হয়তো এরকম প্রশ্ন জাগতো, কারণ দেখছি ১৯৬০ সালে মায়মান (Maiman) অপ্টিক্যাল মেসার বা লেসার করবার পরেই দেখা গেল, অনেক কেলাসিত পদার্থে আলোর অনুরণন অর্থাৎ দেখা গেল এক রঙের তীব্র রশ্মি পাঠিয়ে অন্য রঙের আমেজ উঠছে। তীব্রতা হিসেবে প্রধান রঙের হাজার ভাগের একভাগ হলেও লেসার রশ্মি পাঠিয়ে এই অনুরণন ধরা পড়লো এবং নানা রকমের অনুরণনের মধ্য দিয়ে কেলাসের স্বকীয়ত্ব ধরা পড়লো ; যেমন—শব্দতরঙ্গের বেলায় সেতার-বেহালাদের স্বকীয়ত্ব ধরা পড়ে যন্ত্রের বিভিন্ন অনুরণনবৈশিষ্ট্যে।

লেসার বা Laser অর্থে আমরা বুঝি এমন এক উপায়, যাতে উৎসকে উত্তেজিত করে আলোকের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলে দেওয়া যায়। লেসারের আলো সাধারণ আলো থেকে স্বতন্ত্র, এর আলোকশক্তি এক বিশেষ কম্পনাঙ্কে সংহত ও বিভিন্ন আলোক তরঙ্গ একই পর্যায়ে বা দশায় (In phase) একই কম্পনতলে (In the same state of polarisation) নির্দিষ্ট। এরকম রশ্মি কি করে তৈরি করা যায়, তার নানা খবর বিদেশ থেকে এসে পৌঁছেছে।

লেসার রশ্মি তৈরি করতে প্রধান যে দুটি জিনিষ লাগে, তা হচ্ছে (১) একটা অনুনাদক কুহর বা Resonant cavity যা ভরা থাকবে (২) একটা বিশেষ ধরণের সক্রিয় পদার্থ দিয়ে। অনুনাদকটি গঠিত দুটি নিখুঁত সমান্তরাল সমতল প্রতিফলক দিয়ে। এই প্রতিফলক দুটির মধ্যে ব্যবধান ঐ লেসার রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পূর্ণ-সংখ্যক গুণ। ফলে ঐ দুই প্রতিফলকের মধ্য দিয়ে ঐ বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সমান্তরালভাবে গেলে তার প্রতিফলনে রশ্মির শক্তিবৃদ্ধি ঘটে ও অন্য সব রশ্মির চেয়ে তা জোরালো হয়ে ওঠে। এই কারণে ঐ সমস্ত রশ্মি একই পর্যায়ে থাকে।

পদার্থবিদ্যার যে কোন আধুনিক শাখাতেই বোধহয় একবার না একবার আইনষ্টাইন ও নীল বোরকে স্মরণ না করে উপায় নেই। আইনষ্টাইন পঞ্চাশ বছর আগে বলে গিয়েছিলেন যে, এক বিশেষ আলোকতরঙ্গ-সমষ্টি বা আলোককণা অর্থাৎ ফোটন যখন উপস্থিত থাকে, তখন ঐ ধরণেরই স্বজাতীয় আর এক কণার জন্মের সম্ভাবনা বিজাতীয় কণার জন্মের সম্ভাবনার চেয়ে বেশী। আজ বসু পরিসংখ্যান ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে এই ফোর্সড এমিশন থিওরী বা উত্তেজিত বিকিরণ তত্ত্ব ভালই বোঝা গেছে।

এখানে অবশ্য পরিষ্কার বলা উচিত যে, তরঙ্গ বা কণা, যে কোন হিসেবে আলো-কে দেখা চলে। নীল বোর প্রথম বোঝান, কিভাবে একটা পরমাণু উত্তেজিত অবস্থা থেকে সাধারণ অবস্থায় আসবার সময় আলোককণার জন্ম হয়। আমরা সক্রিয় যে মাধ্যমের কথা বলেছি, তার মধ্যে একটা এমন পরমাণু থাকতে হবে, যার একটা দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজিত অবস্থা বা মেটাষ্টেবল ষ্টেট আছে। এই ধরণের অবস্থায় পরমাণুর বেশীক্ষণ থাকবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী যদিও অবশ্য দৈনিক ঘড়ির কাঁটায় একে আমরা ভীষণ কম সময় বলে চালাবো।

এই উত্তেজিত অবস্থার আপেক্ষিক দীর্ঘ স্থায়িত্বের সুযোগ নিয়ে এবং আইনষ্টাইন আবিষ্কৃত উত্তেজিত বিকিরণের সাহায্যে অনুনাদকে আমরা পদার্থটির অনেক পরমাণুকে তুলে নিয়ে যেতে পারি তাদের উত্তেজিত অবস্থায়। তখন এমন অবস্থা দেখা যাবে যে, সাধারণ অবস্থা থেকে উত্তেজিত অবস্থা-তেই বেশী পরমাণুর সাক্ষাৎ মিলছে। একে বলে Population inversion, যাকে আমার এক বন্ধু বাংলা করতে চেয়েছিল কলেবর বিপর্যয়। যাহোক, এ অবস্থা থেকে একটা সময়ে সমস্ত

পরমাণু একযোগে নেমে আসবে এবং এক বিশেষ শক্তির তথা কম্পনাঙ্কের অজস্র ফোটন-কণা সমপর্যায়ে জন্ম দেবে লেসার রশ্মির।

অবশ্যই এখানে বলে নেওয়া উচিত যে, বিশেষ পদার্থটির এই ফোটন শোষণে উদাসীন হওয়া চাই, অর্থাৎ ঐ বিশেষ রশ্মির বিষয়ে বস্তুটি স্বচ্ছ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রুবি লেসারে সক্রিয় পদার্থটি হচ্ছে চুনি পাথর। এতে ক্রোমিয়াম পরমাণু আছে যাদের 6943 Å অর্থাৎ লাল আলোক তরঙ্গের শক্তির সমান ব্যবধানের একটা উত্তেজিত স্তর আছে। যেহেতু লাল চুনি এ রশ্মি শোষে না, অতএব এই দিয়ে লেসার বানানো চলে। এছাড়া গ্যাস ডিস্‌চার্জ, তরল পদার্থিক ও সেমিকণ্ডাক্টর লেসারও হয়েছে। চুনিকে নিওন আর্ক আলো দিয়ে উত্তেজিত করা হয়। শক্তি শোষণ করে পরমাণুদের অনেকে উত্তেজিত অবস্থায় উঠে যেতে থাকে। তারপর হঠাৎ সবাই নেমে আসে একটা বিশেষ অবস্থার মুখে (Threshold)। ফলে রশ্মি অবিচ্ছিন্ন স্রোতে পাওয়া যায় না। একদিকের প্রতিফলকে আংশিক স্বচ্ছতা থাকে বলেই রশ্মি বেরিয়ে আসে। গ্যাসের ক্ষেত্রে অন্য কোন গ্যাস দিয়ে বেশী শক্তি শোষণ করিয়ে লেসার স্রোত পাওয়া যায়। তরলে লেসার দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করে রামন এফেক্টের বা প্রক্রিয়ার সাহায্যে নানাবিধ রশ্মি পাওয়া যায়।

লেসার এত শক্তিশালী যে, লৌহপাত বা হীরক ইত্যাদিতে সূক্ষ্ম ছিদ্র করবার কাজে ব্যবহার করা চলে। একে সহজে ফোকাস বা লক্ষ্যধৃত করা যায়। প্রাথমিক লেসার রশ্মি সমান্তরাল। এজন্যে সঙ্কেতে খবর পাঠানো ও কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ে এর যথেষ্ট ব্যবহার হয়। এর প্রচণ্ড তেজের জন্যে সরকারী প্রতিরক্ষা দপ্তরে এর চাহিদা খুব।

একই ধরণের দুই লেসারকে দুই তাপাঙ্কে রেখে বিভিন্ন রশ্মি ও তাদের সমন্বয় পাওয়া যায়। এভাবে নাকি ২৮০ থেকে ১০,০০০,০০০ মেগাসাইক্‌ল্ / সেকেণ্ড অবধি সব রকম রশ্মিই মিলেছে। লেসারের আগে অদৃশ্য মাইক্রো-তরঙ্গে এ জাতীয় তরঙ্গ পাওয়া গিয়েছিল ১৯৫৩/৫৪ সালে। আমেরিকায় মেরিল্যাণ্ডের J. Weder ও কলম্বিয়ার C. H. Townes এবং রাশিয়ায় N. G. Basov ও A. M. Prokhorov প্রথম মেসার করেন। শেষ তিনজন এজন্যে ১৯৬৩ সালে নোবেল প্রাইজ পান। ১৯৬০ সালে মায়মান হাগ্‌স্ রিসার্চ লেবরেটরীতে প্রথম দৃশ্য মেসার তৈরি করেন।

এবার আমরা আলোক অনুরণনে ফিরে আসি। এর জন্যে সামান্য কিছু অঙ্কের অবতারণা প্রয়োজন। এখন একটি ইলেকট্রিক ক্ষেত্র E যখন আলোক হিসাবে ক্রিস্টালে প্রযুক্ত হয়, তখন ক্রিস্টালে বা কেলাসের অণুদের বিদ্যুৎ কণাগুলির মধ্যে ব্যবধান দেখা যায়। একে বলে পোলারাইজেশন P। দেখা যায় P ও E এভাবে যুক্ত :—

$$P = X E (1+a_1E+a_2E^2+\ldots)$$

যেখানে x, a_1, a_2 ইত্যাদি ধ্রুবক। কাচ ইত্যাদিতে a_1, a_2 শূন্য এবং এখানে অনুরণনের প্রশ্ন নেই। কিন্তু যখনই কোন কেলাসে a_1, a_2 শূন্য নয়, তখনই অনুরণন দেখা যাবে। যদি মনে রাখি, আলোক-এর ইলেকট্রিক ক্ষেত্র কম্পনশীল $E = E_0 \, Sin \, (Wt-kx)$ তখনই পোলারাইজেশনে $xa_1 \; E_0^2 \; Sin^2 \, (Wt-kx)$

$$xa_1 \left(\frac{E_0^2}{2}\right) \left[1 - Cos^2 \, (Wt-kx)\right]$$

কম্পন দেখা দেবে। এর জন্যে W কম্পনের আলোকের জন্ম হয়।

এই নতুন কম্পন তার স্বাভাবিক প্রতিসরণাঙ্ক μ_2 ধরে এগিয়ে যাবে। তার সরণাঙ্ক $k' = \frac{2\pi\mu_2}{\lambda}$ যেখানে λ_0 লেসার রশ্মির অবিকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্য। তাহলে এই রশ্মিকে Cos

$(2wt-k'x)$ লেখা যেতে পারে। কোন বিন্দুতে এই রশ্মি ও নতুন অনুরণিত রশ্মি অর্থাৎ $\text{Cos}\ 2\ (Wt-kx),\ k=\frac{2\pi\mu_1}{\lambda_0}$ এই দুই-এর সংযোগে অর্থাৎ Interference-এ এদের তীব্রতার তারতম্য ঘটবে :—

$$\text{Cos}\left(2Wt-2\frac{2\pi\mu_1 x}{\lambda_0}\right)+\text{Cos}\left(2wt-\frac{2\pi\mu_2 x}{\lambda_0}\right)-\text{Sin}\frac{2\pi\ (\mu_2-2\mu_1)\ x}{\lambda_0}\ \text{Sin}\left[2Wt-\frac{2\pi\ (\mu_2+2\mu)}{2\lambda_0}x\right]$$

এই তীব্রতা বেশী হবে যখন $\text{Sin}\ \frac{2\pi\ (\mu_2-2\mu_1)}{\lambda_0}x=1$

অর্থাৎ যখন $\frac{n}{4}=\frac{(\mu_2-2\mu_1)}{\lambda_0}x,$

যেখানে পূর্ণসংখ্যা। যখন এরকম হবে অর্থাৎ x-এর এই বিশেষ মানে আমরা অনুরণন দেখতে পাবো। প্রকৃত পরীক্ষায় দেখা যায়, একটা কেলাসকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানারকম তীব্রতা দেখা যায় এবং যে অবস্থায় $x=\frac{n\lambda_0}{4\ (\mu_2-2\mu_1)}$ তখনই রশ্মির তীব্রতা বেশী।

অবশ্যই উপরের অঙ্ক খুব সরলীকৃত এবং আসল ঘটনার মধ্যে কেলাস গঠনের সমস্ত তত্ত্ব এসে যায়। কেউ যদি উৎসাহিত হন সে তত্ত্ব সম্বন্ধে তবেই এই অবতারণা সার্থক

স্ত্রী-পুরুষ নির্ধারণ বা লিঙ্গ-নির্ণয়

রমেন দেবনাথ

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মা-বাবা, মাসী-পিসিদের মধ্যে কলগুঞ্জন সুরু হয়ে যায়—সকলের মনেই এক প্রশ্ন—কি হলো, ছেলে না মেয়ে? পুত্রকামী মা-বাবার কন্যাসন্তান হলে যেমন তাদের মন খারাপ হয়ে যায়, তেমনি কন্যাকামী মা-বাবার পুত্রসন্তান হলে তাদের মনেরও ঠিক একই অবস্থা হয়। কৃত্রিম উপায়ে ছেলে অথবা মেয়ের জন্ম নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলেছে, কিন্তু ইচ্ছানুযায়ী ছেলে অথবা মেয়ের জন্মের পরীক্ষা কিছুতেই সার্থক হচ্ছে না; গবাদি পশুর ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু কিছু সম্ভব হচ্ছে।

সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে, তা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার বহু আগে—যখন শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর মিলন ঘটে, তখনই নির্ধারিত হয়ে যায়। জীববিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, স্ত্রী-পুরুষের এই ভেদাভেদের মূলে রয়েছে ক্রোমোসোম, অর্থাৎ ক্রোমোসোম থিওরীর সাহায্যেই স্ত্রী-পুরুষ নির্ধারণ করা হয়। ক্রোমোসোম থিওরীর কথা বলবার আগে ক্রোমোসোমের কথা কিছু বলা দরকার।

জীবদেহ অসংখ্য কোষের সমষ্টি। প্রত্যেকটি কোষের কেন্দ্রস্থলে একটি গোলাকার পদার্থ আছে। একে কেন্দ্রিন (Nucleus) বলা হয়। কেন্দ্রিনের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূতার মত একপ্রকার পদার্থ থাকে—সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তাদের দেখা যায় না। এক একটি $\frac{১}{৫০০০}$ ইঞ্চির চেয়েও ক্ষুদ্র। এই সূক্ষ্ম সূত্রবৎ আণুবীক্ষণিক জৈব পদার্থের নামই ক্রোমোসোম। ক্রোমোসোমের মধ্যে ডি. এন. এ. (D. N. A—Desoxy ribonucleic Acid) নামক একটি রসায়নিক পদার্থ থাকে। মাতা-পিতার গুণাবলী এদের মাধ্যমেই সন্তান-সন্ততিতে বর্তায়। ক্রোমোসোমের কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্ম হলো—

(১) একই প্রজাতির (Species) প্রাণীদের মধ্যে ক্রোমোসোমের সংখ্যা সমান এবং নির্দিষ্ট থাকে; যেমন—মানুষের ক্রোমোসোম সংখ্যা ৪৬ এবং ড্রসোফিলার ক্রোমোসোম সংখ্যা ৮।

(২) ক্রোমোসোম জোড়ায় জোড়ায় অবস্থিত থাকে। যেমন—মানুষের ২৩ জোড়া এবং ড্রসোফিলার ৪ জোড়া।

(৩) ক্রোমোসোমের বিভাজন-ক্ষমতা আছে এবং একটি থেকে আর একটি তৈরি হয়।

(৪) ক্রোমোসোম-বিভাজন দুই প্রকারের—মাইটোসিস (Mitosis) এবং মিওসিস (Meiosis)। মাইটোসিসের ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা সমান থাকে, কিন্তু মিওসিসের ফলে ক্রোমোসোমের সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়। এই বিভাজনের ফলে মানুষের ৪৬ অর্থাৎ ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে শুধু ২৩টি ক্রোমোসোমে এসে দাঁড়ায়। মিওসিস কেবল মাত্র বীজকোষে (Germ-cell) দেখা যায় এবং শুক্র (Spermatozoa) ও ডিম্বাণুর (Ovum) জন্ম এই বিভাজনের ফলেই হয়ে থাকে। এরা অর্ধ-সংখক (Haploid) ক্রোমোসোম বহন করে। এদের মিলনের ফলে যে নিষিক্ত কোষ তৈরি হয়, তাতে পূর্ণসংখ্যক ক্রোমোসোম (Diploid) ফিরে আসে। ক্রোমোসোমের জোড়া-বাঁধা অবস্থা এরই ফলে উদ্ভূত। এক জোড়ার একটি ক্রোমোসোম আসে মায়ের কাছ থেকে ডিম্বাণুর মাধ্যমে এবং একটি আসে বাবার কাছ থেকে শুক্রের মাধ্যমে।

এবারে লিঙ্গ-নির্ধারণের ক্রোমোসোম থিওরীতে ফেরা যাক। ক্রোমোসোমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) অযৌন (Autosome) বা শারীরিক —যেখানে এরা জোড়ায় জোড়ায় থাকে, (খ) যৌন ক্রোমোসোম (Sex-Chromosome)—এরা এক লিঙ্গে জোড়াবদ্ধ এবং বিপরীত লিঙ্গে বেজোড় অবস্থায় থাকে। মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের প্রথম ২২ জোড়া হলো অযৌন ক্রোমোসোম এবং স্ত্রী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই এরা জোড়াবদ্ধ থাকে, কিন্তু ২৩ নম্বর ক্রোমোসোম জোড়া স্ত্রী ও পুরুষে ভিন্ন রকমের। পুরুষের ক্ষেত্রে এই ক্রোমোসোম দুইটি অসমান এবং বেজোড়। বড়টিকে X এবং ছোটটিকে Y ক্রোমোসোম বলা হয়। স্ত্রীর বেলায় এই জোড়ার দুইটি ক্রোমোসোমই সমান এবং দুইটিকেই X ক্রোমোসোম বলা হয়। সুতরাং পুরুষের বেলায় ২২ জোড়া অযৌন ক্রোমোসোম এবং X, Y—এই দুইটি বেজোড় যৌন ক্রোমোসোম থাকে অর্থাৎ ৪৪ + (X + Y) = ৪৬; স্ত্রীর ক্ষেত্রে থাকে ২২ জোড়া অযৌন ক্রোমোসোম এবং X,X—এই এক জোড়া যৌন ক্রোমোসোম, অর্থাৎ ৪৪ + (X + X) = ৪৬। পুরুষকে আমরা X Y দ্বারা এবং স্ত্রীকে X X দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি। পূর্বে বলা হয়েছে যে, বীজকোষ গঠনের সময় মিওসিসের ফলে ক্রোমোসোম-সংখ্যা অর্ধেক হয়ে যায়, তাই স্ত্রীর প্রত্যেকটি ডিম্বাণুতে একটি করে X ক্রোমোসোম থাকে অর্থাৎ প্রত্যেকটি ডিম্বাণু একই রকম ক্রোমোসোম বহন করে। কিন্তু পুরুষের যৌনকোষ বা শুক্র দুই রকমের ক্রোমোসোম বহন করে—একটিতে X ক্রোমোসোম, অন্যটিতে Y ক্রোমোসোম থাকে। সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে হবে,—তা নির্ভর করে মিলনকামী শুক্র এবং ডিম্বাণু কি ধরণের ক্রোমোসোম বহন করে, তার উপর। ১নং চিত্রে তা দেখানো হয়েছে।

যেহেতু অর্ধেক শুক্র X এবং অর্ধেক Y ক্রোমোসোম বহন করে, সেহেতু নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে উদ্ভূত স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা হবে সমান সমান; অর্থাৎ অর্ধেক পুরুষ হলে অর্ধেক স্ত্রী হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ছেলের

সংখ্যা মেয়ের চেয়ে অর্ধেক। এর ব্যাখ্যা এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, Y ক্রোমোসোম বহনকারী শুক্র X ক্রোমোসোম বহনকারী শুক্রের চেয়ে হাল্কা। তাই দ্বিতীয়োক্ত শুক্রের চেয়ে প্রথমোক্ত শুক্র তাড়াতাড়ি চলতে পারে এবং বেশীর ভাগ ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারে। তাই ছেলের জন্ম বেশী হয়।

১নং চিত্র

অনেক বংশানুক্রমিক রোগ এই যৌন ক্রোমোসোমের সঙ্গে জড়িত এবং এর মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

ক্রোমোসোমের সাহায্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্ধারণের এই যে প্রক্রিয়া, তা মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। জীববিজ্ঞানের প্রায় সব গবেষণাই প্রথমে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের নিয়ে করা হয়েছে এবং মূল্যবান নতুন কিছু আবিষ্কৃত হলে উন্নত স্তরের প্রাণীদের উপর প্রয়োগ করা হয়। হেনকিং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে একটি পতঙ্গকে পরীক্ষা করে সর্বপ্রথম X ক্রোমোসোম আবিষ্কার করেন, কিন্তু তিনি এর উপর কোন গুরুত্ব দেন নি। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ম্যাক ক্লাং গঙ্গাফড়িং-এ X ক্রোমোসোম দেখতে পান এবং তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন যে, এই X ক্রোমোসোম লিঙ্গ-নির্ধারণের সঙ্গে জড়িত। ক্রোমোসোমের সাহায্যে লিঙ্গ-নির্ধারণের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় শ্রীমতী এন. এম. ষ্টিভেন্স-এর গবেষণা থেকে। তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ফল-মক্ষিকা ড্রসোফিলার উপর গবেষণা করে এই মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। এই ফল-মক্ষিকা বা ড্রসোফিলা প্রজনন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। এদের নিয়ে গবেষণা করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছে এবং অনেকে নোবেল পুরস্কার লাভে সম্মানিত হয়েছেন।

ড্রসোফিলার ৪ জোড়া ক্রোমোসোম। এদের মধ্যে প্রথম দুই জোড়া ইংরেজী অক্ষর 'V'-এর আকৃতিবিশিষ্ট এবং তৃতীয় জোড়াটি বিন্দুবৎ (২নং

চিত্র)। উপরিউক্ত তিন জোড়া ক্রোমোসোম স্ত্রী-পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই এক রকম, কিন্তু চতুর্থ জোড়াটি দুই লিঙ্গে দুই রকমের। পুরুষ ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে এই জোড়ার একটি ক্রোমোসোম রডের মত সোজা এবং অন্যটি বক্র। সোজাটিকে X এবং বক্রটিকে Y ক্রোমোসোম বলা হয়। স্ত্রী ড্রসোফিলার ক্ষেত্রে চতুর্থ জোড়ার দুটিই সোজা অর্থাৎ X X।

উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়া মানুষ এবং মনুষ্যেতর অনেক প্রাণীর বেলায় প্রযোজ্য, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। সেখানে পুরুষ X X এবং স্ত্রী X Y ক্রোমোসোম বহন করে।

ত্বের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে দেখেছেন যে, ঐ ধরণের প্রাণী প্রথমে স্ত্রী হিসাবেই (অর্থাৎ X X ক্রোমোসোম বহনকারী) জন্ম নেয়, কিন্তু পরে কোষ-বিভাজনের সময় একটি X ক্রোমোসোম হারিয়ে যায় বা বিনষ্ট হয়ে যায়। ফলে X X-বিশিষ্ট ক্ষেত্রে স্ত্রীর আকৃতি-প্রকৃতি এবং শুধু X-বিশিষ্ট ক্ষেত্রে পুরুষের আকৃতি-প্রকৃতি প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ প্রাণীটির দেহের একপাশে পুরুষের গুণাবলী এবং অপর পাশে স্ত্রীর গুণাবলী প্রকাশ পায় (৩য় চিত্র)।
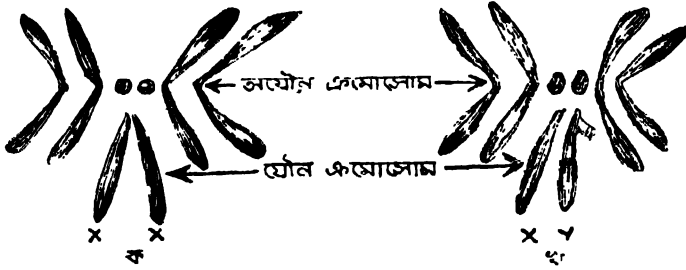
২নং চিত্র

লিঙ্গ-নির্ধারণের সাধারণ প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণিত হলো। এবারে লিঙ্গ-নির্ধারণ সংক্রান্ত কয়েকটি বিচিত্র উদাহরণের কথা আলোচনা করা যাক।

একদেহে স্ত্রী-পুরুষ (Gynandromorph)

আমরা হরপার্বতীর মূর্তির কথা জানি, যাঁর শরীরের একদিকে শিব অর্থাৎ পুরুষের অংশ, অন্যদিকে পাবতী বা স্ত্রীর অংশ থাকে। প্রাণী-জগতে কিন্তু অনেক হর-পার্বতীর (?) উদাহরণ পাওয়া যায় (ড্রসোফিলা, মৌমাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি), যেখানে শরীরের ডানদিক পুরুষধর্মী হলে, বাঁ দিক স্ত্রীধর্মী হবে। মর্গ্যান এবং অন্যান্য জীববিজ্ঞানীরা এই ধরণের অদ্ভুত উভয় লিঙ্গ-

পরিবেশের মাধ্যমে লিঙ্গ-নির্ধারণ

ক্রোমোসোমের সাহায্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্ণয়ের পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বনেলিয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ণীত হয় পরিবেশের সাহায্যে।

স্ত্রী-বনেলিয়া আকারে পুরুষের চেয়ে অনেক বড়। তার একটি শোষণাঙ্গ (Proboscis) আছে। পুরুষ বনেলিয়ার এসব কিছু নেই—সে স্ত্রী বনেলিয়ার জননতন্ত্রে পরজীবী হিসেবে বাস করে। স্ত্রী-বনেলিয়ার নিষিক্ত ডিম থেকে জাত কীড়াগুলি দেখতে একই রকমের—না পুরুষ, না স্ত্রী। এই কীড়া পূর্ণাবস্থায় স্ত্রী হবে, না পুরুষ হবে, তা নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের উপর। কীড়াগুলিকে যদি সমুদ্রের জলে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ঐগুলি স্ত্রী বনেলিয়ায়

রূপান্তরিত হবে, আবার যদি কীড়াগুলিকে স্ত্রী-বনেলিয়ার শোষণাঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ঐগুলি পুরুষ বনেলিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং স্ত্রী-বনেলিয়ার জননতন্ত্রে পরজীবী হয়ে বাস করে। জীববিজ্ঞানের মতে, বনেলিয়ার স্ত্রী-পুরুষ নির্ধারণের মূলে আছে শোষণাঙ্গের অভ্যন্তরস্থ পরিবেশ এবং সমুদ্রের জলের পরিবেশের পার্থক্য। বিজ্ঞানীরা মনে করেন—শোষণাঙ্গের পরিবেশ কীড়ার উপর পুরুষালী প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে শোষণাঙ্গে ছেড়ে-দেওয়া কীড়া পুরুষ বনেলিয়ার রূপান্তরিত হয় (৪র্থ চিত্র)।

৩নং চিত্র

হর্মোনের সাহায্যে লিঙ্গ-নির্ধারণ

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসের নাম হর্মোন। রক্তের সাহায্যে এই রস শরীরের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর যৌন লক্ষণাদি (Secondary sexual characters) যথা—গলার আওয়াজ, দাঁড়ি, গোঁফ ইত্যাদি এই হর্মোনের সাহায্যেই স্ত্রী-পুরুষে প্রকাশ পায়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে (যেমন গরু) যে, মুখ্য যৌন লক্ষণাদিও (Primary sexual characters) হর্মোনের সাহায্যে স্থিরীকৃত হয়, অর্থাৎ প্রাণীটি স্ত্রী হবে, না পুরুষ হবে, তার নির্ধারক হলো হর্মোন। গাভীর অসদৃশ যমজ (Non-identical twins) সন্তানের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ পাওয়া যায়। (যমজ সন্তান দুই রকমের—অসদৃশ যমজ সব সময়েই ভিন্ন লিঙ্গের হয়, অর্থাৎ যমজের একটি ছেলে হলে অন্যটি মেয়ে হবে, কিন্তু সদৃশ যমজ সব সময়েই এক লিঙ্গ—অর্থাৎ দুইটি ছেলে অথবা দুইটি-ই মেয়ে। সদৃশ যমজ আকৃতি প্রকৃতিতেও এক)।

গাভীর অসদৃশ যমজ বাছুরের জন্ম হলে প্রায়ই দেখা যায় যে, একটি বাছুর স্বাভাবিক পুরুষ বাছুরে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু অন্যটি স্ত্রী ও

পুরুষের মাঝামাঝি অর্থাৎ বন্ধ্যা (Sterile) বা ক্লীব বাছুরে রূপান্তরিত হয়। এই ধরণের বন্ধ্যা বাছুরকে ফ্রি মার্টিন (Free Martin) বলা হয়। বহিরাকৃতিতে ফ্রি মার্টিন বাছুরকে (Faetal membrane) মধ্যে থাকে, তখন একই রক্ত দুই যমজের মধ্যে বাহিত হয় এবং সেই সঙ্গে হর্মোনও। বিজ্ঞানীদের মতে, পুরুষধর্মী হর্মোন প্রথম তৈরি হয় এবং তা দুইটি
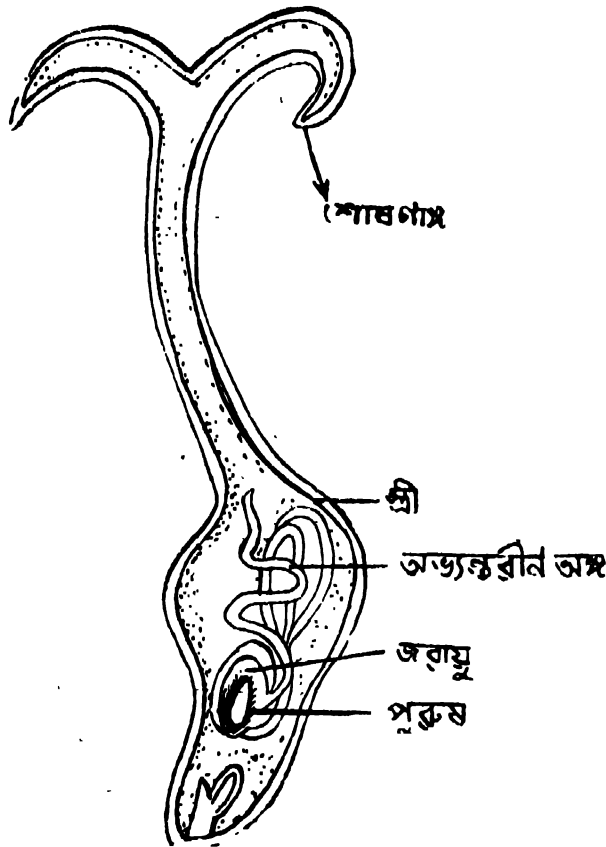
৪নং চিত্র

মনে হবে স্ত্রী বাছুর (কারণ কিছু কিছু স্ত্রী-লিঙ্গের লক্ষণ বহিরঙ্গে দেখা যায়), কিন্তু দেহাভ্যন্তরস্থ লক্ষণাদি পুরুষের। এর কারণস্বরূপ বিজ্ঞানীরা বলেন যে, হর্মোনের প্রভাবই এর জন্যে দায়ী। ভ্রূণাবস্থায় যমজ বাছুর যখন একই ভ্রূণাবরণীর বাছুরের মধ্যেই প্রবাহিত হয় এবং পুরুষের লক্ষণাদি প্রকাশ করে। ফ্রি মার্টিনের ক্ষেত্রে ঐ পুরুষধর্মী হর্মোনের মধ্যে স্ত্রীধর্মী হর্মোন সম্পূর্ণ কার্যকরী হতে পারে না ; ফলে না-পুরুষ না-স্ত্রী—এই মাঝামাঝি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

চণ্ডীগড়ে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশনের (১৯৬৬) মূল ও শাখা-সভাপতিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

মূল সভাপতি

প্রোফেসর বি. এন. প্রসাদ এম. এস-সি. (বেনারস), পি-এইচ. ডি (লিভারপুল), ডাঃ এস সায়েন্স [(Dr. es Sc) (প্যারিস)], এফ. এন. আই, এফ. এন. এ. সায়েন্স, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার

প্রোফেসর বি. এন. প্রসাদ

প্রসংশনীয় অবদানের জন্য ১৯৬৩ সালে তাঁহাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিদানে সম্মানিত করা হয়। ১৯৬৪ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক 'রাজ্য সভার' সদস্য মনোনীত হন।

অধ্যাপক প্রসাদ ১৮৯৯ সালের ১২ই জানুয়ারী উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার মহম্মদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি এলাহাবাদ, পাটনা ও অন্যান্য স্থানে শিক্ষালাভ করেন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অন্যান্য লোভনীয় বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি গণিত-শাস্ত্রের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এক বৎসর গবেষকছাত্ররূপে কাজ করিবার পর ১৯২২ সালে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯ ৪ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধানরূপে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর তিনি মাত্র দুই বৎসরেরও কম সময়ের জন্য পাটনা সায়েন্স কলেজে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৯২৯ সালে অধ্যাপক প্রসাদ ইউরোপে যান। কয়েক মাস এডিনবরায় সার ই. টি হুইটেকারের সঙ্গে কাজ করিবার পর তিনি লিভারপুলে অধ্যাপক ই সি টিটমারস, এফ আর. এস-এর সঙ্গে কাজে প্রবৃত্ত হন। সেখানে দেড় বৎসর কাজ করিবার পর ১৯৩১ সালে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ইহার পর তিনি প্যারিসে যান এবং ডি এস-সি. ডিগ্রির জন্য কাজ করেন এবং ১৯৩২ সালে সেখানকার ষ্টেট ডি এস-সি. ডিগ্রির দ্বারা পুরস্কৃত হন। বৃটিশ, জার্মেন, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান এবং আমেরিকান প্রভৃতি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় গণিত বিষয়ক তাঁহার অনেক গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩২ সালে দেশে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি এলাহাবাদেই

স্থায়ীভাবে থাকিয়া গবেষণার কাজ প্রবর্তন এবং পরিচালনের ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করেন। ক্রমশঃ বিভিন্ন স্থান হইতে মেধাবী ছাত্রেরা ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের জন্য তাঁহার অধীনে গবেষণার কাজে যোগদান করিতে থাকে। বলিতে গেলে এইভাবে তিনি তাঁহার অধীনে গবেষণাকারী এক ছাত্র-পরিমণ্ডলী গড়িয়া তোলেন।

অধ্যাপক প্রসাদ দেশ ও বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৈজ্ঞানিক সংস্থার সহিত জড়িত আছেন। ১৯৪৫ সালে তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের গণিত ও পরিসংখ্যান শাখার সভাপতি এবং ১৯৫২-৫৫ এবং ১৯৫৮-৬১—এই দুই বারের জন্য সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞান কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি, কাউন্সিল এবং অন্যান্য কমিটিতে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করিয়াছেন।

অধ্যাপক আর. এস. মিশ্র
গণিত শাখার সভাপতি

অধ্যাপক মিশ্র এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান, ডীন অব ফ্যাকালটি অব সায়েন্স ও গণিতের অধ্যাপক। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক এবং গণিত বিভাগের প্রধান ছিলেন। তিনি দিল্লী এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়েও উপাধ্যায় এবং পরে রীডাররূপে গণিত শিক্ষা দিতেন এবং ইহা ছাড়া ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লুমিংটনের (ইউ. এস এ) ভিজিটিং প্রোফেসার ছিলেন।

প্রোফেঃ. মিশ্র ১৯৪৩ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৭ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি. এবং ১৯৫২ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনিই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পি-এইচ. ডি. এবং লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ডি এস-সি.। তিনি ব্লুমিংটনের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রোফেসার ডি. লাভাটির নিকট শিক্ষাগ্রহণ এবং তাঁহার কাজে সহযোগিতা করেন। দুইবার তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং মহাদেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ডেটন, ওহিওর রাইট প্যাটারসন এয়ার ফিল্ড বেস-এর পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। ডিফার‍্যান্সিয়াল জিওমেট্রি, রিলেটিভিটি, ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী, ফ্লুইড মিকানিক্স এবং ম্যাগনেটহাইড্রোডিনামিক্স সম্পর্কে তিনি প্রচুর কাজ করিয়াছেন এবং এই সকল বিভিন্ন বিষয়ে এই পর্যন্ত ৯০-টিরও বেশী নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট, গ্র্যাজুয়েট এবং গবেষক ছাত্রদের জন্য গণিতের কতকগুলি টেক্সট্ বুক রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পরিচালনাধীনে ১৬ জনেরও বেশী ছাত্র ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করিয়াছেন।
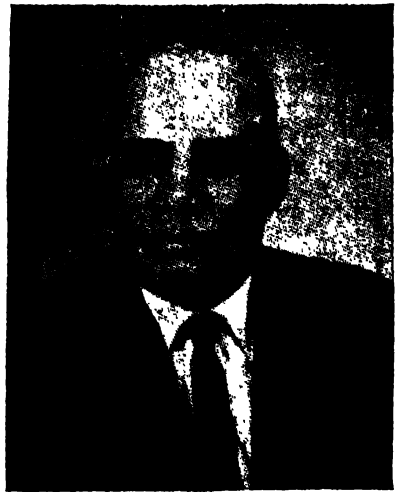
প্রোফেসর আর এস. মিশ্র

ডাঃ মিশ্র 'টেনসর' নামক গণিত বিষয়ক আন্তর্জাতিক জার্নালের সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্য। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিজ্ঞান

সমিতির সদস্য ছাড়াও তিনি ইণ্ডিয়ান ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটির কাউন্সিল, ভারত গণিত পরিষদ, ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া এবং ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো। তিনি ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেসের ১৯৬৫-৬৬ সালের যোধপুর অধিবেশনে পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

প্রোফেঃ এন. এম. ভাট
পরিসংখ্যান শাখার সভাপতি

প্রোফেঃ. ভাট ১৯০৯ সালের ২৮শে মার্চ ভবনগর স্টেটের (গুজরাট) জানক্সার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে বি. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৯-৩০
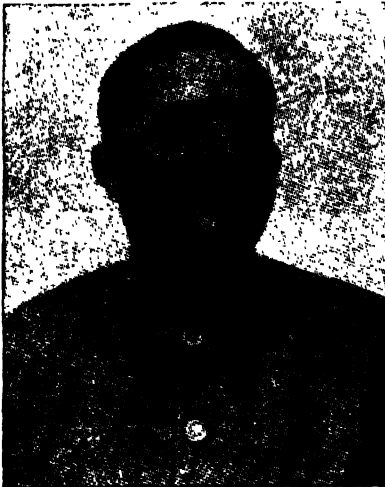
প্রোফেঃ এন. এম. ভাট

সালে তিনি গুজরাট কলেজের দক্ষিনা ফেলো ছিলেন। ফলিত গণিত অধ্যয়নের নিমিত্ত ১৯৩২ সালে তিনি পুনার ফার্গুসন কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯৩২ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। বরোদা ষ্টেটের বৃত্তি লাভ করিয়া ১৯৪৬ সালে তিনি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯৪৮ সালে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। প্রোফেঃ ভাট বিগত ৩৩ বৎসর যাবৎ পরিসংখ্যান ও গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেছেন। ১৯৪৯ সালে বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় হইতে প্রোফেঃ ভাট সেখানকার পরিসংখান বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। ১৯৫৪ সাল হইতে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত মহারাজা সয়াজীরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্যরূপে এবং ১৯৫৪ সাল হইতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ফ্যাকালটি অব সয়েন্সের ডীনরূপে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রম-উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

প্রোফেসর ভাট ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশ-বিদেশের বহু বিদ্বজ্জন-সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। বর্তমানে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের (বেম্বাই) ভাইস প্রেসিডেন্ট, কলিকাতা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসোসিয়েসনের ভাইস প্রেসিডেন্ট, বরোদার সয়াজীরাও বিশ্ববিদ্যালয় জার্নালের সম্পাদক, ইউ. এস. এ-র ইনস্টিটিউট অব ম্যাথেমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স-এর সদস্য এবং লণ্ডনের রয়্যাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল সোসাইটির ফেলো।

প্রোফেসর এন. এম বৈদ্য
পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি

প্রোফেসর বৈদ্য ১৯১০ সালের ১২ই নভেম্বর ওয়ার্ধার নিকটবর্তী হিঙ্গনঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। হিরারে বাল্য-শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি নাগপুর বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯২৫ সালে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্র্যাজুয়েট হইবার পর তিনি ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। লণ্ডনে

তিনি পরলোকগত অধ্যাপক এ. ফাউলার, এফ. আর. এস-এর অধীনে গবেষণার কাজে প্রবৃত্ত হন এবং পি-এইচ ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। পি-এইচ. ডি. সম্পর্কে গবেষণার কাজের সময় তিনি হাইড্রোকার্বন শিখার মধ্যে এক নূতন বর্ণালী ব্যাণ্ড সিষ্টেম আবিষ্কার করেন, যাহা তাঁহার নামানুসারে 'বৈদ্য ব্যাণ্ড' নামে পরিচিত। এই সম্বন্ধে তিনি রয়্যাল সোসাইটির প্রোসিডিংসে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। হাইড্রোকার্বন শিখার বর্ণালী ব্যাণ্ড সম্বন্ধে তাঁহার সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি বহু বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

প্রোফেঃ এন. এম বৈদ্য

ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীর অপটিক্স বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের পদে যোগদান করিয়া তিনি রেলওয়ে সিগ্ন্যাল গ্লাসের অনেক উন্নতিসাধন করেন। ১৯৬৪ সালে নভেম্বরে তিনি ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন।

প্রোফেসর এস. এম

রসায়ন-শাখার সভাপতি

প্রোফেসর মুখার্জি ১৯১৫ সালে বিক্রমপুর পরগণার মধ্যপাড়া (পূর্ব পাকিস্তান) নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৌহাটির কটন কলেজ হইতে ১৯৩৫ সালে রসায়নশাস্ত্রে অনার্স-সহ গ্র্যাজুয়েট হন। ১৯৩৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ হইতে রসায়নশাস্ত্রে এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রৌপ্যপদক ও অন্যান্য পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৩৯ সালে তিনি পালিত রিসার্চ স্কলার রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন এবং টার্পিনয়েডস ও স্টেরয়েডস্ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ১৯৪৪ সালে

প্রোফেঃ এস. এম. মুখার্জি

ডি. এস-সি. ডিগ্রি অর্জন করেন। বিদেশযাত্রার জন্য সরকারী বৃত্তি পাইয়া উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে ইংল্যাণ্ডে যান এবং প্রায় দুই বৎসর বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং এক বৎসর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইসন পেরিন্স্ লেবরেটরিতে প্রোফেসর সার রবার্ট রবিনসন, ও. এম., এফ. আর. এস., এন. এল. এবং প্রোফেসর এ. জে.

বার্চ, এফ. আর. এস.-এর সহিত 'বার্চ রিডাকসন' প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। বিদেশে অবস্থান করিবার সময় প্রোফেসর মুখার্জি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস্, সুইডেন, ডেনমার্ক, ইটালী ও সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন।

দেশে ফিরিয়া আসিবার পর ১৯৪৯ সালে তিনি কলিকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের জৈব রসায়ন বিভাগের প্রধানরূপে যোগদান করেন। তিনি এই বিভাগকে গবেষণা-কার্যের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলেন। এখানে পি-এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য বহুসংখ্যক গবেষক ছাত্র তাঁহার তত্ত্বাবধানে কাজ করিতেছেন।

১৯৫১ সালে প্রোফেসর মুখার্জি চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধানরূপে কাজে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধানের পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হন। তিন বৎসরের জন্য তিনি ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের ডীন ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ৪ বৎসরের মধ্যে অতি সাধারণ অবস্থা হইতে এই বিভাগের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। এই বিভাগে ইতিমধ্যেই বহুসংখ্যক ছাত্র যোগদান করিয়া গবেষণা-কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। প্রোফেসর মুখার্জি প্রায় ৭০টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচালনাধীনে প্রায় ডজনখানেক ছাত্র পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের ফেলো এবং ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালের অবৈতনিক সম্পাদক।

প্রোফেসর এস. পি. নৌটিয়াল
ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার সভাপতি

প্রোফেসর নৌটিয়াল ১৯১৬ সালে উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল-হিমালয়ের প্রান্তবর্তী এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রশংসনীয় যোগ্যতার সহিত শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৯৩৯ সালে উপাধ্যায়রূপে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে আলমোড়ার গ্র্যানিট এবং মেটামরফিক অরোল সম্বন্ধে তাঁহার নিবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর ভারতীয় ভূতাত্ত্বিকেরা কুমায়ুন-হিমালয়ের বিষয় অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত হন। ১৯৪১ সালে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায় যোগদান করেন। জিওলজিক্যাল সার্ভেতে যোগদানের পর প্রথম দিকেই তিনি কুমায়ুন-হিমালয়ের মানচিত্র প্রস্তুতি ও খনিজ পদার্থ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন।
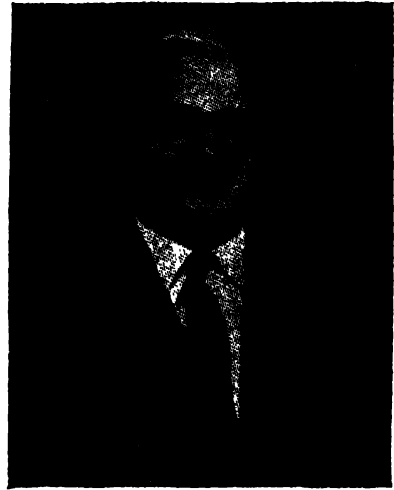
প্রোফেসর এস. পি. নৌটিয়াল

তিনি অতি উৎকৃষ্ট ম্যাগ্নেসাইট, তামা, সীসা, লাইমষ্টোন, ডলোমাইট প্রভৃতি খনিজ পদার্থের বহু বিস্তৃত সঞ্চয়ের অবস্থান-স্থলের সন্ধান প্রদান করেন এবং নৈনিতাল-তরাই এলাকার ভূগর্ভস্থ

জলের অবস্থান নির্ণয় করেন, যার ফলে বর্তমানে বহু বিস্তৃত ক্ষেত-খামারের সেচের ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। তিনি মারোরা বাঁধ, রিহাণ্ড বাঁধ এবং উত্তর প্রদেশের রামগঙ্গা পরিকল্পনার ভূতত্ত্ব বিষয়ক অনুসন্ধানের ব্যাপারে আবাসিক ভূতাত্ত্বিক ছিলেন। ভাকরা বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারেও তিনি কার্যকরী পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি নেপালের কোশি বাঁধ পরিকল্পনার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রস্তুত এবং খনিজ সম্পদের বিষয় অনুসন্ধান-কার্য প্রবর্তনের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫২ সালে তিনি নেপালে প্রেরিত হন। ১৯৫৫ সালে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায় পেট্রোলজিষ্ট নিযুক্ত হন। বর্তমানে তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার পশ্চিম অঞ্চলের ইনচার্জ। তাঁহার অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি অনেকগুলি ভূতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট আছেন।

প্রোফেসর টি. এস মহাবালে

উদ্ভিদবিদ্যা শাখার সভাপতি

পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ টি. এস. মহাবালে ১৯০৯ সালে আমেদনগরে জন্মগ্রহণ করেন। আমেদনগর ও নাসিকে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া পুনার ফার্গুসন কলেজ হইতে গ্র্যাজুয়েট হন এবং ১৯৩৫ সালে মাষ্টারস্ ডিগ্রি ও ১৯৩৯ সালে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে সংগৃহীত কয়েক জাতীয় লিভারওয়ার্ট, ফার্ন ও ফার্নের মত উদ্ভিদ এবং তাহাদের প্রোথেলাসের উপর তিনি কাজ করেন। অপুষ্পক উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণায় অনেক ছাত্র লইয়া তিনি গবেষক-গোষ্ঠী গড়িয়া তোলেন।

বি. জে. মেডিক্যাল স্কুল, পুনার ফার্গুসন কলেজ, গুজরাট কলেজ (আমেদাবাদ) এবং বোম্বাই-এর সায়েন্স ইনস্টিটিউটে তিনি উপাধ্যায়ের কাজ করেন। নিউ দিল্লী হইতে সি. এস আই. আর. কর্তৃক প্রকাশিত 'The Wealth of India' নামক পুস্তকের সহকারী সম্পাদক হিসাবে তিনি ১৯৪৬-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কাজ করিয়াছিলেন। তিনি ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস ব্যাঙ্গালোর এবং ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সেস-এর ফেলো। ১৯৫৩ সাল হইতে তিনি পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক এবং উক্ত-বিভাগের প্রধানরূপে কাজ করিতেছেন। তিনি
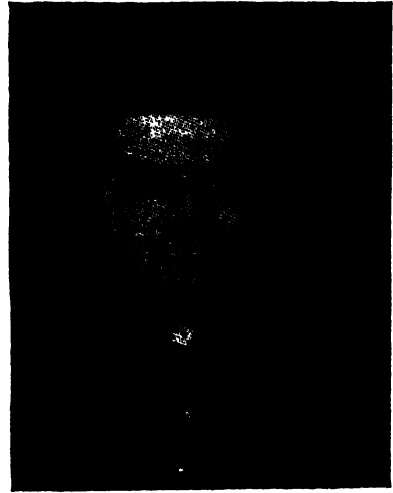
প্রোফেঃ টি. এস. মহাবালে

ক্রিপ্‌টোগ্যামিক এবং পেলিওবটানীর এক গবেষকগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছেন।

১৯৫৪ সালে তিনি প্যারিসে অনুষ্ঠিত ৮ম আন্তর্জাতিক বটানীক্যাল কংগ্রেসের পেলিওবটানী বিভাগের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং দক্ষিণ-গোলার্ধের টার্সিয়ারী ফ্লোরা সম্পর্কিত সিমপোজিয়ামে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯৫৯ সালে মন্ট্রিলের আন্তর্জাতিক

বটানিক্যাল কংগ্রেস এবং ১৯৬৪ সালে এডিনবরায় ভারতের টার্সিয়ারী এবং ট্রিয়াসিক যুগের উদ্ভিদের উপর তাঁহার নিজস্ব কাজ সম্পর্কে বিশেষ বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

তিনি এক শতেরও বেশী বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কতকগুলি বিজ্ঞান-সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন।

ডাঃ জি. পি. শর্মা

প্রাণিবিদ্যা ও কীটবিদ্যা শাখার সভাপতি

ডাঃ শর্মা ১৯১৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে আম্বালা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজ হইতে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া বি. এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী বৎসরেই প্রাণিবিদ্যা

ডাঃ জি. পি. শর্মা

সম্পর্কে তাঁহার গবেষণার ফলাফল 'থিসিসে'-এর আকারে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইহা গৃহীত হয় এবং ইহার উপরেই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যায় তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর এম.এস-সি ডিগ্রী প্রদান করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি গবেষণার কাজ চালাইয়া যান। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আর একটি 'থিসিস' দাখিল করেন। এই 'থিসিসে'-এর উপরেই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে প্রাণিবিজ্ঞানে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি প্রদান করিয়া সম্মানিত করে। ইহার অব্যবহিত পরেই এডিনবরার ইনস্টিটিউট অব অ্যানিমল জেনেটিক্সে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভারত সরকার তাঁহাকে বিদেশযাত্রার বৃত্তি প্রদান করেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুনরায় পি-এইচ.ডি. ডিগ্রী লইয়া দুই বৎসর পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরিবার পর প্রথমেই তিনি ইজ্জতনগরের ভেটারিনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সহকারী রিসার্চ অফিসারের (জেনেটিক্স) পদে নিযুক্ত হন। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ক্লাস-১-এ উন্নীত হন এবং পাঞ্জাব সরকারের অ্যানিমল জেনেটিসিষ্ট রূপে হিসাবে প্রেরিত হন। দেশ বিভাগের পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় যখন পুনর্বিন্যস্ত হইতেছিল, তখন তিনি তাহার প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগে প্রাণি-বিজ্ঞানের রীডাররূপে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি এই বিভাগের অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি চণ্ডীগড়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধানরূপে কাজ করিতেছেন। তিনি সাইটোলজি (নিউক্লিয়ার এবং সাইটোপ্লাজ্‌মিক) ও জেনেটিক্সে বিশেষজ্ঞ। ভারত এবং বৈদেশিক জার্ণালে তিনি প্রায় ৮০টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি ইউরোপের প্রায় সকল দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউটগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। দেশ-বিদেশের বহু প্রাণিবিজ্ঞান সংস্থার তিনি সদস্য এবং বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন।

প্রোফেসর জি. এস. রায়

অ্যানথ্রোপোলজি ও আর্কিওলজি শাখার সভাপতি

শ্রীগৌতমশঙ্কর রায় ১৯১৯ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার হেয়ার স্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ (কলিকাতা) হইতে গ্র্যাজুয়েট হন। ১৯৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নৃতত্ত্বে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ এবং ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট কর্তৃক যুগ্মভাবে পরিচালিত 'বেঙ্গল ফেমিন সার্ভে'-তে গবেষণা-কর্মীরূপে যোগদান করেন। ইহার পর তিনি পরলোকগত নৃতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক কে. পি. চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক এবং উত্তর বঙ্গের সাঁওতালদের সোসিও-ইকোনমিক সার্ভের গবেষণা-

প্রোফেসর জি. এস. রায়

কর্মী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৬ সাল হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে উপাধ্যায়রূপে কাজ করিতেছেন। তিনি ভারতের বহুসংখ্যক উপজাতীয় লোকের মধ্যে গিয়া তাহাদের বিষয় অনুসন্ধান করেন এবং পূর্ব ভারতের প্রাগৈতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি নিজেও কতকগুলি প্রাগৈতিহাসিক স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত 'A Physical Survey of the Kadars of Kerala' নামক মনোগ্রাফের তিনি একজন 'জয়েন্ট অথার'। তিনি কিছুসংখ্যক গবেষণা-নিবন্ধও প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রোফেসর পি. সি. সেনগুপ্ত

চিকিৎসা এবং পশু-চিকিৎসা শাখার সভাপতি

ডাঃ প্রতাপচন্দ্র সেনগুপ্ত ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু স্কুল এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম. বি. বি. এস. ডিগ্রি লাভ করেন। তাহার পর

প্রোফেসর পি. সি. সেনগুপ্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৩৬ সালে কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ যোগদান করিয়া বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ তিনি চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা এবং পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট টিচিং-এ ব্যাপৃত রহিয়াছেন। বর্তমানে তিনি প্যাথোলজির অধ্যাপক-পদে অধিষ্ঠিত আছেন। প্রোফেসর সেনগুপ্ত একজন

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা-কর্মী। লিস-ম্যানিয়্যাল রোগ সম্বন্ধে তাঁহার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিমাটোলজি, প্ল্যান্ট প্যাথোলজি, সেরোলজি, প্যারাসিটোলজি, হিষ্টোপ্যাথোলজি, হিষ্টোকেমিষ্ট্রি এবং এক্সপেরিমেন্ট্যাল প্যাথোলজিতেও তিনি উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন। ১৯৪৮ সালে ডাঃ সেনগুপ্ত ট্রপিক্যাল ডিজিজ এবং ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের প্রোটোজোয়াঘটিত রোগ বিভাগের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি কালাজ্বর সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ উপস্থাপিত করেন। তিনি ঐ কংগ্রেসের লিসবন অধিবেশন (১৯৫৮) এবং রাইও ডি জেনিরোতে ৭ম অধিবেশনে (১৯৬৩) 'Rapporteur' নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি রোমে কয়েকবার এবং লণ্ডনে আন্তর্জাতিক সংস্থার অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গত ৭ বৎসরে চিকিৎসা সম্পর্কিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে কোট্‌স্ মেডাল দানে সম্মানিত করে।

ডাঃ এস. পি. রায়চৌধুরী

কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতি

ডাঃ এস পি. রায়চৌধুরী ১৯১৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা এবং দিল্লীতে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভিদবিদ্যায় এম. এস-সি ও ডি. ফিল. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ভারতে ও বিদেশে কয়েকজন প্রখ্যাত উদ্ভিদবিদ্ ও উদ্ভিদরোগ-বিশেষজ্ঞের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে গবেগণার কাজ করিয়াছেন। নয়া দিল্লীতে তিনি ডাঃ জি. ওয়াট্‌স্ প্যাড্‌উইকের ছাত্র ছিলেন এবং ঢাকায় প্রোফেসর পি মাহেশ্বরী, এফ. আর. এস., পুনার ডাঃ বি. এন. উপ্পল এবং নয়া দিল্লীতে প্রোফেসর জে. এফ. দস্তুরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে গবেষণার কাজ করিয়াছেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট গবেষণা-কার্যের স্বীকৃতিতে ১৯৫০ সালে নিউ ইয়র্কের রকফেলার ইনস্টিটিউট তাঁহাকে ভিজিটিং বৈজ্ঞানিকের পদ গ্রহণে আমন্ত্রণ জানায়। সেখানে তিনি কয়েক জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সহিত গবেগণার কাজ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আই এ. আর. আই-তে শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের ভাইরাস সম্পর্কিত কয়েকটি রিসার্চ প্রোজেক্টের কাজ করেন। ১৯৫৬ সালে

ডাঃ এস. পি. রায়চৌধুরী

তিনি ইষ্টার্ন জোন প্ল্যান্ট ভাইরাস রিসার্চ সাবষ্টেসনের ভাইরাস প্যাথোলজিষ্ট ইনচার্জ হন এবং ১৯৬১ সালে তিনি প্ল্যান্ট প্যাথোলজির অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬: সালে তিনি আই. এ. আর. আই-তে মাইকোলজি ও প্ল্যান্ট প্যাথোলজি বিভাগের প্রধানের পদে যোগদান করেন।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্, ইউরোপের যুক্তরাজ্য এবং প্রাচ্যের কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া তাহাদের শিক্ষা প্রণালী এবং বিশেষ করিয়া

ভাইরোলজি সম্পর্কিত গবেষণা-কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ১৯৬৪ সালে তাঁহাকে রকফেলার ফাউণ্ডেসন পরিভ্রমণ-বৃত্তি প্রদান করে। ডাঃ রায়চৌধুরী ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া, লণ্ডনের লিনিয়ান সোসাইটি এবং ভারতীয় ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির নির্বাচিত ফেলো। তিনি কয়েক বৎসরের জন্য ভারতীয় ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির সেক্রেটারী-ট্রেজারার ছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজি এবং ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অব মাইক্রোবায়োলজির সম্পাদকীয় বোর্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ডাঃ রায়চৌধুরী দেশ ও বিদেশের জার্নালে ৮০টিরও বেশী বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশক করিয়াছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ভাইরোলজির এক শক্তিশালী গবেষক-গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিবার কাজে ব্যাপৃত আছেন।

প্রোফেসর বি. কে. আনন্দ্

শারীরবৃত্ত শাখার সভাপতি

প্রোফেসর বি. কে. আনন্দ্ ১৯১৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাবে শিক্ষালাভ করেন এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. বি. বি. এস. ও এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। মেডিক্যাল রিসার্চের জন্য তিনি ১৯৫৫ সালে কর্নেল আমিরচাঁদ পুরস্কার, ১৯৬১ সালে ওয়াটমল মেমোরিয়্যাল পুরস্কার এবং ১৯৬২ সালে সিনিয়ার কর্নেল আমিরচাঁদ পুরস্কার লাভ করেন।

ডাঃ আনন্দ্ ১৯৪৩ সালে শারীরবৃত্তের ডিমন্‌স্ট্রেটররূপে অমৃতসর মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেন, পরে ঐ কলেজেরই সহকারী প্রোফেসর হন। ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫২-৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি নয়া দিল্লীর লেডী হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে শারীরবৃত্তের অধ্যাপকের পদে কাজ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি নয়া দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সের ফিজিওলজির প্রোফেসারের পদে নিযুক্ত হন এবং এখনও সেই পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। ডাঃ আনন্দ্ অনেকগুলি মেডিক্যাল

প্রোফেসর বি. কে. আনন্দ্

গবেষণা-সংস্থা, কমিটি ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসাদি সংক্রান্ত বহু আন্তর্জাতিক কংগ্রেস, কনফারেন্স ও সিম্পোসিয়ামে যোগদান করিয়াছেন।

প্রোফেসর দুর্গানন্দ্ সিংহ

মনস্তত্ত্ব শাখার সভাপতি

দুর্গানন্দ্ সিংহ ১৯২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে তিনি সাইকোলজির রিসার্চ স্কলার হিসাবে কাজ করেন, পরে রিসার্চ ফেলো হন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি

সাইকোলজিতে এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং ডাঃ ডি. রাসেল ডেভিস ও প্রোফেসর সার ফ্রেড্রিক সি. বার্টলেট, এফ. আর. এস.-এর পরিচালনাধীনে সাইকোলজিতে গবেষণা করেন।

১৯৫১ সালে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা-প্রতিষ্ঠান এবং সার্ভিসে লেকচারারের পদে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়েটিং ডিরেক্টর হন। ১৯৫৮ সালে প্রোফেসর সিংহ খড়্গপুরের

প্রোফেসর দুর্গানন্দ্ সিংহ

টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে হিউম্যানিটিজ ও সোস্থাল সায়েন্সেস-এর সহ-প্রোফেসরের পদে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে সাইকোলজি বিভাগের প্রোফেসর এবং প্রধানরূপে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

প্রোফেসর সিংহ দেশ ও বিদেশের জার্নালে প্রায় ৬৫টিরও বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দুইখানি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন

প্রোফেসর অনন্তকুমার সেনগুপ্ত
ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান শাখার সভাপতি

প্রোফেসর সেনগুপ্ত ১৯০৬ সালে বরিশাল জেলার (পূর্ব পাকিস্থান) বারাইকরন গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ফলিত পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

গবেষণা-কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পর ১৯৪৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি. ডিগ্রি
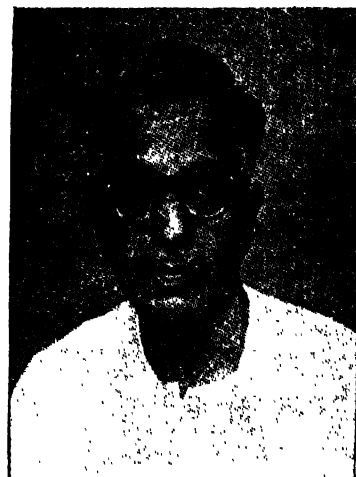
প্রোফেসর অনন্তকুমার সেনগুপ্ত

লাভ করেন। ১৯৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে গ্রিফিথ মেমোরিয়াল রিসার্চ প্রাইজ দানে পুরস্কৃত করে। ১৯৩৫ সালে প্রোফেসর সেনগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যার সহ-লেকচারের পদে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সাল হইতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যার সার আর বি. ঘোষ প্রোফেসাররূপে কাজ করিতেছেন। প্রোফেসর সেনগুপ্ত ১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্য পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানে তিনি একটি নূতন বিষয়ে গবেষণায় প্রতি আকৃষ্ট হন।

বিষয়টি হইল—বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে টেনসরের প্রয়োগ। ভারতে এই বিষয়ে গবেষণা-কার্যে তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক। এই বিষয়ে তাঁহার সহিত গবেষণা করিবার জন্য তিনি এক গবেষণা-কর্মীদল গঠন করিয়াছেন। তিনি ও তাঁহার সহকর্মীগণ ভারত ও বিভিন্ন বিদেশী জার্নালে ৫০টিরও বেশী গবেষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটির ফেলো, লণ্ডন ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারস্ ইনস্টিটিউশনের কর্পোরেট মেম্বার এবং ভারতের ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এরও মেম্বার। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য।

প্রবন্ধের ছবির ব্লকগুলি 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচারে'র সৌজন্যে প্রাপ্ত। সঃ

পলিথিন

মিহিরকুমার কুণ্ডু

বিজ্ঞানের এক উল্লেখযোগ্য অবদান পলিথিন। পলিথিনের আবিষ্কার প্লাষ্টিক-জগতে এক আলোড়ন এনেছে। এর মধ্যে অনেক অসাধারণ ধর্মের সমন্বয় ঘটেছে। এর রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তা, দৃঢ়তা, আবার ক্ষেত্রবিশেষে নমনীয়তা, তড়িৎ কুপরিবাহিতা, লঘুতা, জলীয় বাষ্প অভেদ্যতা প্রভৃতি এই পদার্থটি ব্যবহারের পরিধি সুবিস্তৃত করেছে। তাছাড়া পলিথিন আজকাল অনেক সহজে ও সুলভে পাওয়া যায় এবং স্বভাবতঃই এর ব্যবহার ক্রম-প্রসারমান।

পলিথিনের তড়িৎ-রোধাঙ্ক (Specific resistance) খুব বেশী, প্রায় $১০^{১৫}$ ওম-সেমি; ফলে বিদ্যুৎ-পরিবাহী তার আবৃত করতে এর ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত। অত্যন্ত লঘু হওয়ায় এর আবরণ-ক্ষমতা খুব বেশী। এক পাউণ্ড পলিথিন থেকে এক মিলিমিটার পুরু প্রায় ৩০,০০০ বর্গ-ইঞ্চি বিশিষ্ট পলিথিনের আস্তরণ তৈরি করা যায়। খাদ্যদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি আবৃত করতে এটি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার দরুণ ধাতুর আবরণরূপেও এটি ব্যবহৃত হয়। এর ফলে মরচে-পড়া থেকে ধাতু রক্ষা পায়। ধাতুর প্রতিরোধ-ক্ষমতা এবং আয়ুষ্কালও লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। বহু বিক্রিয়া-পাত্রের অন্তস্তল পলিথিনের আস্তরণ দিয়ে আবৃত করা হয়। এর ফলে অনেক রাসায়নিক দ্রব্য সুষ্ঠুভাবে তৈরি সম্ভব। রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তা এবং দৃঢ়তা অথচ নমনীয়তার জন্যে পলিথিন আজকাল ধাতব পাইপকে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপিত করেছে। কৃষিকার্যে, গৃহস্থালীতে ও শিল্পে জল সরবরাহের জন্যে পলিথিন পাইপের ব্যবহার বহুদেশে প্রচলিত। ধাতব পাইপ অপেক্ষা পলিথিন পাইপ অনেক কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এক দিক দিয়ে পলিথিন পাইপ কিছুটা অসুবিধা-জনক। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে এর স্থায়িত্ব হ্রাস পায়, ফলে এর মধ্য দিয়ে গরম জল সরবরাহ করা যায় না। রেডারের উন্নতি সাধনেও পলিথিনের অবদান অনস্বীকার্য।

বিজ্ঞানী ক্যারোথার দেখিয়েছেন, দুই বা ততোধিক অসম্পৃক্ত বন্ধনীবিশিষ্ট যৌগ, যেমন—R.CH=CH.R′ অনুকূল পরিবেশে বহুসংখ্যক এককের (Monomer) সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে একটি নতুন যৌগ তৈরি করতে পারে। এদের বলা হয় পলিমার।

$$n\,\begin{matrix} R & R' \\ | & | \\ C & = C \\ | & | \\ H & H \end{matrix} \rightarrow \cdots -\begin{matrix} R & R' & R & R' \\ | & | & | & | \\ C- & C- & C- & C \\ | & | & | & | \\ H & H & H & H \end{matrix} - \cdots\cdots \text{ বা } \left[\begin{matrix} R & R' \\ | & | \\ -C- & C- \\ | & | \\ H & H \end{matrix}\right]_{n'}$$

মনোমার পলিমার
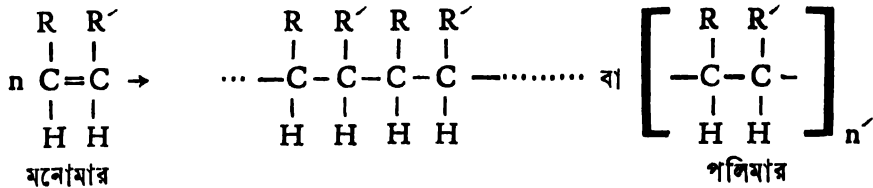
পলিমারের সংকেত থেকে বোঝা যায়,

পলিমারের অণুভার = (মনোমারের অণুভার) × (মনোমারের সংখ্যা)

এখানে R = অ্যালকাইল পুঞ্জ

$R = R' = H$ হলে, মনোমারটি ইথিলীন এবং পলিমারটি পলিথিলীন হবে।

$$n\,\begin{matrix} H & H \\ | & | \\ C & = C \\ | & | \\ H & H \end{matrix} \rightarrow \cdots -\begin{matrix} H & H & H & H \\ | & | & | & | \\ C- & C- & C- & C \\ | & | & | & | \\ H & H & H & H \end{matrix} - \cdots\cdots \text{ বা } \left[\begin{matrix} H & H \\ | & | \\ -C- & C- \\ | & | \\ H & H \end{matrix}\right]_{n}$$

ইথিলীন পলিথিলীন
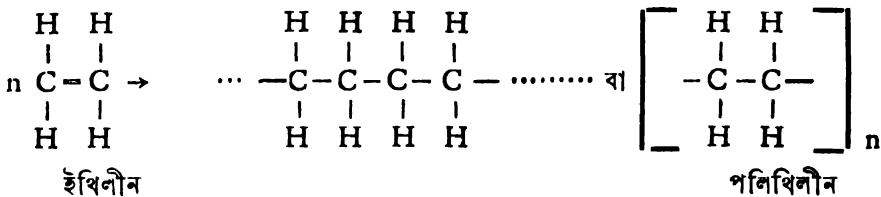
পলিথিলীনের প্রচলিত নাম পলিথিন। বৃটেনে এটি অ্যালথালিন নামে খ্যাত।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার—সংযুক্ত মনোমারের শৃঙ্খলটি সম্পূর্ণ সরলরৈখিক নাও হতে পারে। মধ্যে মধ্যে শৃঙ্খলশাখা বেরোনো বিচিত্র নয়—

$$\cdots CH_2 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - CH_2 - CH_2 - \underset{\underset{C_2H_5}{|}}{CH} - CH_2 - CH_2 \cdots$$
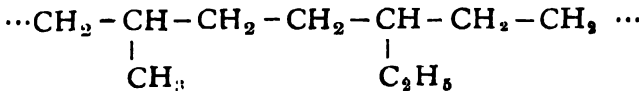
এদের ঝুলন্ত মিথাইল ($-CH_3$) বা ইথাইল পুঞ্জ ($-C_2H_5$) বলা হয়। এই ধরণের যৌগগুলি প্লাষ্টিক গুণসম্পন্ন হয়। উত্তাপ প্রয়োগে এরা নমনীয়, কিন্তু শৈত্য প্রয়োগে শক্ত হয়। এই প্রক্রিয়াটি অসংখ্য বার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে :

$$\text{অনমনীয়} \underset{\text{শৈত্য}}{\overset{\text{উত্তাপ}}{\rightleftharpoons}} \text{নমনীয়}$$
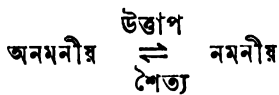
এই ধরণের যৌগগুলিকে থার্মোপ্লাষ্টিক যৌগ বলা হয়; সুতরাং পলিথিন একটি থার্মোপ্লাষ্টিক যৌগ।

পলিথিন আবিষ্কারের ইতিহাস

পলিথিন আবিষ্কারের সূচনা বলতে গেলে ১৯৩২ সালে। এই সময় Cheshire-এর অন্তর্গত Northwich-এ ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিস-এর অ্যালকালি বিভাগে কর্মরত M. W. Perrin ও J. C Suallow ইথিলীনের উপর উচ্চ চাপের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখবার এক প্রস্তাব দেন। ইথিলীন আববিষ্কারের প্রকৃত ইতিহাস কয়েকটি সুস্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১৯৩১-'৩৫ : ইথিলীনের উপর অত্যুচ্চ চাপের প্রভাব পরীক্ষা করা হয়; ফলে পলিথিনের আবিষ্কার সম্ভব হয়।

১৯৩৫-'৩৯ : পলিথিন তৈরির শিল্প-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় এবং এর ধর্মাবলীর সম্যক ব্যবহারের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে।

১৯৩৯-'৪৫ : রেডারের উন্নতি সাধনে এবং যুদ্ধের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পলিথিন ব্যবহারের জন্যে আমেরিকায় ও বৃটেনে অনলস গবেষণা আরম্ভ হয়। এর ফলে পলিথিনের ব্যবহারের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

১৯৪৫ থেকে আজ পর্যন্ত : বর্তমানে পলিথিন একটি অপরিহার্য প্লাষ্টিক। এর ব্যবহারের পরিধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এখনো সম্প্রসরমান।

পলিথিন তৈরির শিল্প-পদ্ধতি

বর্তমানে পলিথিন তৈরির চারটি শিল্প-পদ্ধতি প্রচলিত। নিম্নে পদ্ধতিগুলির একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

পদ্ধতি	উচ্চ চাপ পদ্ধতি I.C.I.	নিম্ন চাপ পদ্ধতি Ziegler	Phillips	Standard Oil Co.
১। চাপ পাউণ্ড/বর্গইঞ্চি	১৫,০০০—৩০,০০০	১৫—১০০	১০০—৫০০	৮০০—১০০০
২। তাপমাত্রা (°C)	১৫০—৩০০	৬০—৭৫	১৩০—১৭০	২৩০—২৭০
৩। প্রভাবক	অক্সিজেন	অ্যালুমিনিয়াম ট্রাই-অ্যালকাইল এবং টাইটে-নিয়াম টেট্রা-ক্লোরাইড থেকে উৎপন্ন কলয়ডীয় জটিল যৌগ	সিলিকা-অ্যালু-মিনা অবলম্বনের উপর অনুদ্দীপিত ক্রোমিক অক্সাইড	অ্যালুমিনা বা চারকোল অব-লম্বনের উপর নিকেল,কোবাল্ট, বা মলিবডিনাম। লিথিয়াম অ্যালু-মিনাম হাই-ড্রাইড, বোরন প্রভৃতি উদ্দী-পকরূপে কাজ করে।
৪। বিক্রিয়ার প্রকৃতি	গ্যাসীয় অবস্থায় বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।	উৎপন্ন পলিমার অধঃক্ষিপ্ত হয়	পলিমার দ্রবণ অবস্থায় উৎপন্ন হয়।	পলিমার দ্রবণ অবস্থায় উৎপন্ন হয়।
৫। হাইড্রোকার্বন মাধ্যমের কার্য	—	প্রভাবক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থ ভাসমান রাখা	প্রভাবক অদ্রব-নীয়, পলিমার দ্রবণীয়	প্রভাবক অদ্রব-নীয়, পলিমার দ্রবণীয়
৬। ঘনত্ব (গ্রাম/মিলি-লিটার)	০·৯১—০·৯২	০·৯২—০·৯৫	০·৯১ – ০·৯৬৫	০·৯১৮—০·৯৬৫
৭। কেলাসনীয়তা%	৬৪	৮৭	৯৩	৮৩
৮। শাখা শৃঙ্খল (প্রতি ১০০০ C- পরমাণু অন্তর CH_3-পুঞ্জ)	২১·৫	৩	—	—
৯। গলনাঙ্ক °C	১০৮—১১৬	১২৮—১৩০	১২৬—১৩৫	:৩৫
১০। রোধাঙ্ক, ০ (ওম/সেমি)	$>$১০[১৫]	$>$১০[১৫]	$>$১০[১৫]	—

পলিথিন প্রস্তুতি কয়েকটি পর্যায়ে সংঘটিত হয় :

(১) ইথিলীন তৈরি
(২) ইথিলীন বিশুদ্ধীকরণ
(৩) ইথিলীন থেকে পলিথিন তৈরি
(৪) পলিথিন পৃথকীকরণ

ইথিলীন তৈরির অন্ততঃ ৮টি সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি আছে। এর মধ্যে কয়েকটি হলো :

(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে প্রাপ্ত ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেনের উচ্চ তাপ বিশ্লেষণ

(খ) Pd প্রভাবকের উপস্থিতিতে ২০০°C-এ অ্যাসিটিলিনের আংশিক হাইড্রোজেন সংযুক্তি

(গ ৩৫০°C-এ ইথানল বাষ্প উত্তপ্ত অ্যালুমিনার উপর দিয়ে প্রবাহিত করালে তা নির্জলিত হয়ে ইথিলীন তৈরি করে।

উচ্চ চাপ ও উষ্ণতার সাহায্যে অন্যান্য গ্যাস থেকে ইথিলীন পৃথক করা হয়।

পলিথিন তৈরির দুটি পদ্ধতি এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হলো।

I. C. I পদ্ধতি :

অতি বিশুদ্ধ ইথিলীন ০·০২—০·০৮% অক্সিজেন প্রভাবকের সঙ্গে মেশানো হয়। মিশ্রণটি এরপর ১৫০-৩০০°C-এ উত্তপ্ত করে অনেকগুলি পর্যায়ে চাপ দেওয়া হয়। শেষ পর্যায়ে চাপের পরিমাণ ১০০ থেকে ২০০ বায়ুচাপ হয়। এরপর পাম্পের সাহায্যে মিশ্রণটি বিক্রিয়া-পাত্রে পাঠানো হয়। বিক্রিয়া-পাত্রটি নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের তৈরি—এর ব্যাস ০·৫ ইঞ্চি এবং এটি বহির্ভাগ দিয়ে উত্তপ্ত করবার ব্যবস্থা-সমন্বিত। বিক্রিয়াশেষে তরলিত পলিথিলীন ও অ[illegible] ইথিলীন একটি পাত্রে পাঠানো হয়। এখানে উচ্চ চাপ এক বায়ুচাপে সংনমিত করা হয়। এই অবস্থায় ইথিলীন গ্যাসীয়, কিন্তু পলিথিলীন তরল। সুতরাং পলিথিন সহজেই পৃথক করা যায়। অবিকৃত ইথিলীন নবাগত ইথিলীনের সঙ্গে মিশিয়ে পুনরায় কাজে লা[illegible]না হয়।

চাপ, তাপমাত্রা এবং প্রভাবকের তারতম্য ঘটিয়ে পলিথিনের অণুভার পরিবর্তিত করা যায়। ইথিলীন যত বিশুদ্ধ এবং চাপ যত বেশী হবে, পলিথিনের অণুভার ও গলনাংক ততই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ ও তাপমাত্রা যত বৃদ্ধি পাবে, বিক্রিয়াটি তত তীব্র হবে এবং অণুভার তত কমবে।

Ziegler পদ্ধতি :

এই পদ্ধতির সাহায্যে পলিথিন সুলভে ও অল্প চাপে তৈরি করা যায়। এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবনের ফলে I. C. I. পদ্ধতির জনপ্রিয়তা অনেক হ্রাস পেয়েছে। পদ্ধতিটি কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।

(১) প্রভাবক তৈরি : ট্রাই ইথাইল অ্যালুমিনিয়াম ও টাইটেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটানো হয়। Ti^{+4} নিম্নতর যোজ্যতায়, বিশেষতঃ Ti^{+3} ($TiCl_3$)-এ বিজারিত হয়। বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলি পলিথিন প্রস্তুতিতে প্রভাবকরূপে কাজ করে।

(২) পলিথিন প্রস্তুতি : বিক্রিয়াটি নিষ্ক্রিয় হাইড্রোকার্বনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। হাইড্রোকার্বনটি এমন হওয়া আবশ্যক যেন এতে $TiCl_3$ অদ্রবণীয়, কিন্তু ইথিলীন গ্যাস উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দ্রবণীয় হয়। বিক্রিয়াকালে তাপমাত্রা ও চাপ যথাক্রমে ৬০°-৭৫°C ও ১৫-১০০ পাউণ্ড বঃ ইঃ থাকে। উৎপন্ন পলিথিন হাইড্রোকার্বন দ্রাবকে অদ্রবণীয় এবং ইতস্ততঃ ভাসমান থাকে।

(৩) পলিথিন বিশোধণ : হাইড্রোকার্বন দ্রাবককে প্রথমতঃ পরিস্রবণের সাহায্যে পৃথক করা হয়। অতঃপর অ্যালকোহল দিয়ে প্রভাবক বিয়োজিত করে পলিথিন পৃথক করা হয়। এবার ব্যবহারোপযোগী করবার জন্যে পলিথিন প্রয়োজনীয় রঞ্জক দ্রব্য ও অজারকের (Anti-oxidant)-এর সঙ্গে মিশিয়ে কয়েকটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে পরিশেষে পলিথিন ব্যবহারোপযোগী হয়ে ওঠে।

সহজ ও সুলভ হওয়ায় আজকাল Ziegler পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সঞ্চয়ন

মঙ্গলগ্রহে খাল আছে কি ?

১৮৭৭ সাল থেকেই মঙ্গলগ্রহে খালের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়ে আসছে। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীই অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, মঙ্গলগ্রহে কৃত্রিম উপায়ে কাটা কোন খালের অস্তিত্ব নেই। তবে এই বিষয়ে অনেকেরই মনে সন্দেহ রয়েছে। চতুর্থ মেরিনার মঙ্গল-গ্রহের যে সব ছবি পাঠিয়েছে, তাতে হয়তো এর কিছু সমাধান মিলতে পারে।

৮৮ বছর আগে জিওভানি শিয়াপেরেলি নামে একজন বিশিষ্ট ইটালীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি মঙ্গলগ্রহে খাল দেখতে পেয়েছেন। তারপর থেকে এপর্যন্ত আরও বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এই ধরণের খাল দেখার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

মঙ্গলগ্রহে কৃত্রিম খালের অস্তিত্ব নিয়ে যে এত সোরগোল হয়েছিল, তার একটা সাধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যা এই দেওয়া হয় যে, মঙ্গলগ্রহে সেচ ইঞ্জিনীয়ারদের বসতি আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অন্যতম বিশিষ্ট জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী পার্সিভাল লোয়েল জোরের সঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, মঙ্গলগ্রহের খালগুলি কৃত্রিম জলপথ। গ্রহটি ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে বলে সেখানে সেচের জন্যে এই খালগুলির সৃষ্টি করা হয়েছে।

অবশ্য মঙ্গলগ্রহ নিয়ে গবেষণারত বহু বিজ্ঞানী ও পর্যবেক্ষকই এই ধরণের কোন খালের চিহ্ন মঙ্গলগ্রহে দেখেন নি—সে খাল কৃত্রিমই হোক, আর প্রাকৃতিকই হোক।

চতুর্থ মেরিনারের আলোকচিত্রগুলি থেকে যদি এই সমস্যার কোন সমাধান না হয়, তাহলে এই দশকের শেষ দিকে বা পরবর্তী দশকের প্রথম দিকের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র এমন কতকগুলি উন্নত ধরণের পরিকল্পনা করেছে, যা এই বিষয়ের সমাধান সম্ভব করবে।

প্রথম যুগের পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষকেরা চাঁদের অন্ধকার অঞ্চলগুলির কোনটার নাম দিয়েছিলেন সাগর, কোনটার বা উপসাগর অথবা সমুদ্র। যদিও এসব নামকরণ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, চাঁদে জলের অস্তিত্বের কথা তাঁরা বিশ্বাস করতেন—তথাপি এই রকম নাম দেওয়া এক বৈজ্ঞানিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই রীতি অনুসরণ করেই মঙ্গলগ্রহের পর্যবেক্ষকেরাও এই সব নাম দিয়েছেন।

মিলান মানমন্দিরের পরিচালক শিয়াপেরেলি এগুলির নাম দিয়েছিলেন 'ক্যানালি'। ইংল্যাণ্ডে যে ধরণের সঙ্কীর্ণ চ্যানেল আছে, তার কথা মনে করেই সম্ভবতঃ তিনি এই নাম দিয়েছিলেন।

'ক্যানালি' শব্দের অর্থও কৃত্রিম খাল, অর্থাৎ তা মানুষের তৈরি সেচের খাল। শিয়াপেরেলির ব্যাখ্যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে বেশ সোরগোল দেখা দিল।

যারা উত্তেজনা ছড়াতে চায়, তাদের কৃপায় মঙ্গলগ্রহে সহসা দেখা দিল বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ, পৃথিবীর অনুরূপ সেচের ব্যবস্থা, উন্নত কৃষি আর উন্নত সভ্যতা।

অধিকাংশ বিজ্ঞানী উত্তেজনা প্রচার করা ঘৃণা করেন। প্রবৃত্তির দিক থেকেই তাঁরা এই ধরণের কাহিনীতে কান দেন না। এমন কি, উত্তেজনা প্রচারকারী বিজ্ঞানীকে তাঁরা ত্যাগ করেন পর্যন্ত।

শিয়াপেরেলি বিজ্ঞানী সমাজের অসন্তোষ এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। তিনি অনেকবার এই সব খালের চিহ্ন দেখেন এবং মঙ্গলগ্রহ ও খালগুলির উন্নততর ছবি ও মানচিত্র প্রকাশের জন্যে চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর সবচেয়ে বিস্তারিত মানচিত্রটি এখনও অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানচিত্রে বলে বিবেচিত হয়।

১৯১৬ সালে মৃত্যুর পূর্বে লোয়েল প্রায় ৭০০টি খালের অস্তিত্ব মানচিত্রে দেখিয়েছিলেন। অ্যারিজোনায় তাঁর নামে একটি মানমন্দির আছে। এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি নিজেই। ব্যাপক অনুসন্ধানের পর তিনি প্রকাশ্যে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, এই খালগুলি কোন বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের হাতে কাটা। অনেকে তাঁর গবেষণা-পদ্ধতিতে আপত্তিও জানিয়েছিলেন। যাহোক, পৃথিবীতে যে সব দূরবীক্ষণ যন্ত্র রয়েছে, তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কাজেই এমন কোন তথ্য এখন পর্যন্তও তাঁরা পান নি, যাতে তাঁরা এই বিষয়ে একমত হতে পারেন।

পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহকে খুব ছোট দেখায়। পৃথিবীর প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে দেখতে হয় বলে পর্যবেক্ষণের কাজ জটিল হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন মাত্রার উত্তাপ ও ঘনত্বের জন্যে বায়ুস্তরের অবিরাম স্থান পরিবর্তন ঘটে। এতে আলোকের পথে বাধার সৃষ্টি হয়, ফলে মঙ্গলগ্রহের রূপ অস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে। যে সব আলোকচিত্রের জন্যে দীর্ঘকাল এক্সপোজার দেওয়া প্রয়োজন হয়, সেই সব ছবি স্বভাবতঃই খুব স্পষ্ট হয় না। এই কারণেই মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশের সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি তোলা সম্ভব হয় নি।

বায়ুমণ্ডলের এই পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্যে খুব অল্প সময় পাওয়া যায়, যখন এই গ্রহের বিশদ বিবরণ সম্বলিত ছবি তোলা সম্ভব হয়। কিন্তু এই মুহূর্তটি কখন আসবে, তা কেউ বলতে পারে না। এই মুহূর্তটি স্থায়ী হয় মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। ঠিক এই মুহূর্তটিতে দূরবীক্ষণ দিয়ে দেখলে গ্রহের স্পষ্ট ছবি দেখা যায়। শিয়াপেরেলি ও লোয়েল কেবল চোখে দেখেছিলেন বলে স্মৃতিশক্তির উপর অনেকখানি নির্ভর করেছিলেন। পরে আঁকবার সময় এই স্মৃতির সাহায্যে তাঁরা অনেকখানি অভাব পূরণ করেছিলেন। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, চোখে পর্যবেক্ষণের একটা অসুবিধা এই যে, মন এমন অনেক কিছু দেখে, যা চোখ দেখতে পায় না।

হাতে আঁকা মানচিত্রে মঙ্গলগ্রহের যে সব খাল দেখা যায়, তাতে গোলযোগ দেখা দেয় এইখানে যে, কতকগুলি খাল সমান্তরাল, আর কতকগুলি একটা কেন্দ্র থেকে বেরিয়েছে, লক্ষ্য করা যায়।

প্রকৃতিতে যে সব ফাটল দেখা যায়, যেমন—শুক্‌নো নদীবক্ষের মাটির ফাটল, মৃৎপাত্রে ফাটল, আলকাত্‌রা বা পিচের ফাটল—যাদের ক্ষেত্রে এক একটি কেন্দ্র থেকে সাধারণতঃ তিনটি স্পষ্টতর রেখা বাইরের দিকে বেরিয়ে যায়, কখনও বা চারটি। কিন্তু প্রাকৃতিক ফাটলে পাঁচটি বা তার বেশী ফাটলের রেখা একটি কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় না।

কৃত্রিম ক্ষেত্রে কিন্তু একটি কেন্দ্র থেকে পাঁচটি বা তারও বেশী ফাটল দেখা যায়।

শিয়াপেরেলি ও লোয়েলের আঁকা মঙ্গলগ্রহের মানচিত্রে একটি কেন্দ্র থেকে আটটি পর্যন্ত খালের রেখা দেখা যায়।

সাম্প্রতিককালে অনেক বিজ্ঞানী বলছেন যে, মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু তা খুবই নগণ্য, হয়তো শুধুমাত্র সাধারণ উদ্ভিদের অস্তিত্বই আছে। এটা সত্য হলেও তাতে হাতে কাটা খালের অস্তিত্বের ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না। যদি বহু খালের অস্তিত্ব থাকে, তাতে এটা

অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, একটা প্রাচীন সভ্যতা এগুলি সৃষ্টি করেছিল। এই সভ্যতা দীর্ঘদিন আগে বিলুপ্ত হয়েছে।

মঙ্গলগ্রহের খাল সম্পর্কে বিতর্কের অবসান হতে চলেছে। কয়েক মাসের মধ্যে না হলেও কয়েক বছরের মধ্যে তা সম্ভব হবে।

চাঁদ ও জীবাণু

চাঁদে যখন কোন সন্ধানী রকেট পাঠানো হয় (যেমন ১৯৫৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে একটি সোভিয়েট রকেট চাঁদের জমির উপরে গিয়ে অবতরণ করে), তখন সেই রকেটের ভিতরকার সমস্ত যন্ত্রপাতিসহ পুরা রকেটটিকেই খুব সাবধানে সম্পূর্ণ নির্বীজিত করে পাঠানো হয়। পৃথিবীর একটিও জীবাণু বা ব্যাক্টিরিয়া যাতে চাঁদে গিয়ে না পৌঁছায়, তার জন্যে কড়া নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথম দৃষ্টিতে এই সাবধানতা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে—কারণ, চাঁদের ভৌত অবস্থার সঙ্গে পৃথিবীর অবস্থার বিরাট পার্থক্য। যেমন—চাঁদের অভিকর্ষ পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র; চাঁদের আবহমণ্ডল না থাকায় সেখানে দিনের তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডেরও বেশী ওঠে এবং রাত্রে তা নেমে আসে শূন্যাঙ্কের নীচে প্রায় ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। এরকম অবস্থায় সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব একরকম অসম্ভব।

কিন্তু তবু এরূপ অবস্থাতেও বেশ কয়েক শ্রেণীর মাইক্রো-অর্গ্যানিজম বা জীবাণু টিকে থাকতে পারে। অক্সিজেনশূন্য অবস্থায় তীব্র তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মধ্যে ফুটন্ত তরল পদার্থে আর শূন্যাঙ্কের নীচে কয়েক শত ডিগ্রি তাপাঙ্কে কয়েক ধরণের জীবাণু দিব্যি বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলে। তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থের মধ্যে এবং প্রচণ্ড চাপের নীচে ভূগর্ভে জীবাণু পাওয়া গেছে।

সবচেয়ে বড় কথা, দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে এরা চমৎকার খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তার কারণ, অসম্ভব দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি ঘটে বলে এসব জীবাণুর বংশানুক্রমিক-ভাবে অভ্যস্ত কোন পরিবেশগত ধারা নেই। একপুরুষ অনায়াসেই পূর্বপুরুষের পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয়। কিছুকাল আগে ফরাসী পদার্থবিদেরা একটি অ্যাটমিক রিয়্যাক্টরের মধ্যে তীব্র তেজস্ক্রিয় এলাকায় ব্যাক্টিরিয়ার একটি উপনিবেশ আবিষ্কার করে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান।

সুতরাং পার্থিব জীবাণু যে চাঁদে গিয়ে সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়ে অচিরকালে চাঁদের দেহ ছেয়ে ফেলবে, এরকম ধরে নেওয়াটা যুক্তিসঙ্গত। ফলে, ভবিষ্যতে মানুষ যখন চাঁদে যাবে কিংবা চাঁদের জমির নমুনা পৃথিবীতে এনে সে সম্পর্কে সরাসরি গবেষণা করবে, তখন কোন্ ব্যাক্টিরিয়াটি চাঁদে আগে থেকেই ছিল এবং কোন্‌টা পৃথিবী থেকে গিয়ে সেখানে উপনিবেশ গড়ে তুলেছে, তা নির্ণয় করা অসম্ভব হবে। পক্ষান্তরে, চাঁদে নিজস্ব মাইক্রো-অর্গ্যানিজম থাকাটা মোটেই অসম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীরা বহুকাল থেকেই লক্ষ্য করে আসছেন যে, পালাক্রমে চাঁদের কোন কোন এলাকার রং বদ্‌লায়—যেটাকে উদ্ভিদের মরশুমী জন্মমৃত্যুর সঙ্গেও যুক্ত করা যেতে পারে। চাঁদের জমির যে বিরাট গহ্বর-সদৃশ অংশটাকে বলা হয় "প্রশান্তির সাগর" (সী অব সেরিনিটি), তার মাঝখানে পূর্ণিমার সময়ে খুব হাল্কা কুয়াশার মত ধূসর-সবুজ রং লক্ষ্য করা যায়।

চাঁদের জমির আরেক জায়গায় আংটির মত "অ্যারিস্টারকাস" ও "হেরোডেটাস" পাহাড় দুটির উত্তর-পশ্চিম অংশে বহু মাইল জায়গা জুড়ে পূর্ণিমার সময়ে হলুদ-সবুজ রং দেখা যায় এবং সেটা বেশ স্পষ্ট চড়া রং—"প্রশান্তির সাগরে"র মত আবছা রং নয়। তারপর শুক্লপক্ষের চতুর্থী ও দ্বাদশীর কাছাকাছি সময়ে চন্দ্রগোলকের কেন্দ্রের কাছে বেশ বড় একটা আব্‌ছা কালো জায়গা দেখা যায়। এই কালো জায়গাটার প্রান্ত থেকে অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন হয়ে মাঝখানে গভীর অন্ধকার—যার জন্যে এটাকে কোন কিছুর ছায়া বলে মনে করা যায় না। এই জায়গাটার অল্প দূরে, উত্তর দিকে আরও একটি হলুদ-সবুজ রঙের ছোট এলাকা রয়েছে।

চাঁদের দেহে এই রঙের আবির্ভাবের রহস্য এখনও পর্যন্ত ঠিকমত আবিষ্কার করা হয়ে ওঠে নি। এই রঙের কোনটাই স্থায়ী নয়—চাঁদের তিথি আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসব রঙের আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটে এবং গাঢ়তা বাড়ে ও কমে। চাঁদের দিগন্ত থেকে সূর্যের উচ্চতা হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে এই ব্যাপারটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্যণীয়। চাঁদের জমিতে সূর্যের আলোর ব্যাপ্তি ও তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে তা সম্পর্কিত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনেকের মতে (এঁদের মধ্যে সোভিয়েট চন্দ্র-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নিকোলাই বারাবাশফও আছেন), ব্যাপারটা হলো: খুব হাল্কা একটা তুষারের আস্তরণ জমা হওয়া ও গলে যাওয়া গোছের কিছু। কিন্তু সে ক্ষেত্রে চাঁদে আবহমণ্ডলের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এই বিজ্ঞানীর মতে, চাঁদের আবহাওয়া আছে, তবে তা এত ক্ষীণ ও তনুকৃত যে, বর্ণালী-বিশ্লেষণ বা অন্য কোন সূক্ষ্ম উপায়ে পৃথিবী থেকে তা প্রমাণ করা কঠিন।

বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীই অবশ্য উদ্ভিদের আবির্ভাব বা ওই ধরণের কোন জৈব প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই ব্যাপারটার সম্পর্ক মানতে রাজী নন। কিন্তু তবু পৃথিবীর অ্যানিরোবিক ব্যাক্টিরিয়ার মত খুব আদিম স্তরের জীবাণুর অস্তিত্ব যে চাঁদে থাকা সম্ভব—সে কথাটা তাঁরা আজ একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছেন না। কারণ, আরেক জন সোভিয়েট চন্দ্র-বিশেষজ্ঞ নিকোলাই কোজিরেফ সম্প্রতি চাঁদের জমি থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন উত্থিত হওয়ার ঘটনা সন্দেহাতীত-ভাবে প্রমাণ করেছেন।

অধ্যাপক কোজিরেফ এর জন্যে বর্ণালী-বিশ্লেষণ পদ্ধতির বদলে, আধুনিকতম বেতার-শোষণ (রেডিও অ্যাবজর্পশন) পদ্ধতিকে কাজে লাগান। চাঁদের গিরিগহ্বরগুলির তলদেশের ফাটল থেকে অনবরত এই গ্যাস বেরিয়ে আসছে—যদিও খুব ক্ষীণ ধারায়। সরন্ধ্র চাঁদের জমিতে মাইক্রো-অর্গ্যানিজমের জীবনের অনুকূল পরিবেশ থাকা মোটেই অসম্ভব নয় এবং সেই সঙ্গে এই তথ্যটিও মনে রাখা দরকার যে, হাইড্রোজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ও অক্সিজেনে পরিণত হতে পারে। গোর্কি মানমন্দিরের পর্যবেক্ষকেরা সম্প্রতি প্রমাণ করেছেন যে, চাঁদের জমির নীচে যত গভীরে যাওয়া যাবে, ততই তাপাঙ্ক বাড়বে। সে ক্ষেত্রে জীবাণুর পক্ষে দীর্ঘ চান্দ্র রাত্রির প্রচণ্ড শীতকে প্রতিরোধ করে বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়!

চাঁদ সম্পর্কে এসব নতুন তথ্য থেকে অন্ততঃ এই কথাটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হচ্ছে যে, চাঁদকে এতদিন পর্যন্ত যতটা মৃত একটা আকাশচারী বস্তু বলে মনে করে আসা হয়েছে, ততটা মৃত সে মোটেই নয়।

ট্র্যাকোমার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নূতন টীকার ব্যাপক পরীক্ষা

[নীচের এই বিবৃতি থেকে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা কি ভাবে ট্র্যাকোমার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তার একটি আভাস পাওয়া যাবে। ভারতেও এই রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তা আজ চিকিৎসকদের কাছে একটা বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতে দু-বছর আগে জাতীয় ট্র্যাকোমা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী নিয়ে কাজ আরম্ভ হয়েছে।]

এই সম্বন্ধে জন নিওয়েল লিখেছেন—বিশ্বে এখন প্রায় ৪০০,০০০,০০০ লোক ট্র্যাকোমা রোগে ভুগছে। এই রোগের বিরুদ্ধে বৃটিশ বিজ্ঞানীদের সংগ্রাম-প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লণ্ডনে লিষ্টার ইনষ্টিটিউটের ট্র্যাকোমার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে যে পরীক্ষা-নির্ভর টীকা উদ্ভাবিত হয়েছে, তার ব্যাপক 'ফিল্ড ট্রায়াল' এখন চলেছে মধ্যপ্রাচ্যে। এই মধ্য প্রাচ্য অঞ্চলটি আরও কয়েকটি অঞ্চলের মত এই বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্যে কুখ্যাত। এই পরীক্ষার ফল যথারীতি বুঝে নিতে প্রায় দু-বছর আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কিন্তু যে সব খবর এখন পর্যন্ত জানা গেছে, তাথেকে মনে হয়-এমন একটা টীকা উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে, যা ট্র্যাকোমা রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।

জেরুজালেমের অপ্‌থ্যালমিক হস্পিটাল অব দি অর্ডার অব সেন্ট জন-এর জন্যে কয়েক মাস আগে লণ্ডনে ১,০০০,০০০ পাউণ্ড তহবিল সংগ্রহের এক আবেদন প্রচার করা হয়। এর উদ্দেশ্য—হাসপাতালটিকে ট্র্যাকোমা বিরোধী অভিযানের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা। এপর্যন্ত ২০০,০০০ পাউণ্ড সংগৃহীত হয়েছে; এর মধ্যে বৃটেনে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী।

জেরুজালেমের এই হাসপাতালের ডিরেক্টর—যাঁকে এখানে বলা হয় হস্পিটেলার—তিনি হলেন সার ষ্টুয়ার্ট ডিউক এল্ডার। ইনি লণ্ডনের একজন বিশিষ্ট চক্ষু-চিকিৎসক এবং লণ্ডন ইনষ্টিটিউট অব অপথ্যালমোলজির ডিরেক্টর। মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করবার সময় ইনি সার্জন হিসাবে ট্র্যাকোমার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। লণ্ডন ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর হিসাবেও ইনি দীর্ঘকাল ধরে গবেষণাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকেন। এই গবেষণার ফলেই উদ্ভাবিত হয় নতুন টীকা, যা নিয়ে আজ এই পরীক্ষা চলছে।

ট্র্যাকোমা সংক্রান্ত গবেষণায় প্রথম সত্যকারের ফললাভ হয় ১৯৫৭ সালে, যখন একজন চীনা বিজ্ঞানী ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী পিকিং থেকে খবর দেন যে, তাঁরা চীনে ট্র্যাকোমা রোগাক্রান্ত রোগীর শরীর থেকে তিন রকমের ভাইরাস স্বতন্ত্র করতে পেরেছেন। লিষ্টার ইনষ্টিটিউটের ডাঃ লেস্‌লি কোলিয়ার এই তিন রকমের ভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং সেগুলির 'কালচার' করবার ব্যবস্থা করেন। ডাঃ কোলিয়ার গাম্বিয়ার রোগীদের শরীরেও এই একই রকমের ভাইরাসের অস্তিত্বের সন্ধান পান। এখানে বলা প্রয়োজন, গাম্বিয়ায় বৃটিশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের একটি গবেষণা-কেন্দ্র আছে। যাহোক, এই ভাবে ট্র্যাকোমার কারণ যে কি, তা শেষ পর্যন্ত জানা যায়। কিন্তু কারণগুলিকে সঠিক প্রমাণ করবার জন্যে দেখানো প্রয়োজন যে, 'কালচার'-করা ভাইরাস মানুষের শরীরে ট্র্যাকোমার লক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে।

লণ্ডন ইনষ্টিটিউট অব অপ্‌থ্যালমোলজিতে ১৯৫৮ সালে ডাঃ ব্যারি জোন্স একটি রোগীর অক্ষি-গহ্বরের (রোগী দু-চোখই হারিয়েছিল) চার পাশের টিস্যুর মধ্যে ভাইরাস সঞ্চারিত করে দেন। রোগী নিজেই এই পরীক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করে।

সে বলে - নিজের কিছুই হলো না, এখন যদি অন্তের উপকারে এই ভাবে আসতে পারি, তাহলে আমার পক্ষে তা প্রকৃতই আনন্দের বিষয় হবে। ট্র্যাকোমার লক্ষণ এর পর প্রকাশ পায় এবং অন্য স্বেচ্ছাকর্মীরা এর ফল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে সাহায্য করে।

এর পর যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ততটা সহজ হয় নি। যে ভাইরাস ট্র্যাকোমার কারণ বলে জানা গেল, তা বহুল পরিমাণে জন্মিয়ে মানুষের শরীরে সঞ্চারিত করবার ব্যবস্থা করা হলো। অন্য সব টীকার মত এই টীকাও ভবিষ্যৎ সংক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষের শরীরে একটা প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে—এমন একটা আশা করা গেল।

গাম্বিয়ার মারাকিসা গ্রামে এবং অন্যত্র এই টীকা নিয়ে ইতিমধ্যে ছোটখাটো পরীক্ষা হয়ে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে এখন যে পরীক্ষা চলছে, তা অনেক ব্যাপক। প্রায় ৬০০ শিশু ইতিমধ্যে টীকা গ্রহণ করেছে। এই এলাকায় শতকরা ৯০ জন শিশু এক বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই ট্র্যাকোমা রোগে কম বেশী ভুগে থাকে এবং যখন তাদের বয়স দু-বছর হয়, শতকরা ১০০ জন শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়। সেই কারণেই এই পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবার জন্যে অন্ততঃ দু-বছর আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কিন্তু এরপরেই যে কাজ শেষ হয়ে যাবে তা নয়, অনেক কাজ বাকী থেকে যাবে। টীকা পুরাপুরি গ্রহণ করবার ব্যাপারে টীকার 'ডোজ' সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে এবং জানতে হবে, ঠিক কি পরিমাণ টীকা গ্রহণ করলে ফল সবচেয়ে ভাল হবে।

এসব অসুবিধার কথা মনে রেখেই এদিকের কাজকর্ম এখনও চলছে। ট্র্যাকোমার বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ একটা টীকা যেমন করেই হোক বের করতে হবে, কারণ টীকা ছাড়া আর কিছুই এই সংগ্রামকে জোরদার করতে পারবে বলে মনে হয় না। সার স্টুয়ার্ট ডিউক-এল্ডার জেরুজালেমে যে ধরণের সব ইউনিট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন, সেই ধরণের সব ইউনিট এলাকার সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করে তিনি তাঁর টীকা দানের ব্যবস্থা আরও যতদূর সম্ভব সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন।

সৌরজগতের উৎপত্তিঃ দুর্ঘটনা-বাদ এবং এদের পতনের কারণ

অত্রি মুখোপাধ্যায়

দুর্ঘটনা বাদ বলতে আমরা সেই বিশেষ মতবাদগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করতে চাইছি, যেগুলি সৌরজগতের আবির্ভাবকে সূর্যের একটি আকস্মিক ঘটনা বলে আখ্যাত করেছে। বিভিন্ন মতবাদে এই দুর্ঘটনা বিভিন্ন রূপে চিত্রিত হলেও প্রত্যেকেই তার মূল বক্তব্যে মিলিত: দুর্ঘটনার ফলাফল সূর্যের বা সূর্যের কাছাকাছি এসে পড়া কোন জ্যোতিষ্কের ভাঙন এবং ক্ষত বা অক্ষত নিরপেক্ষ কিছু ভগ্নাংশ সূর্য কর্তৃক আত্মসাৎ, যাকে সে তার নিজের চতুর্দিকে ঘোরাতে বাধ্য করেছে। এই উপাদানেরই ক্রমবিকাশ গ্রহগুলির উৎপত্তির জন্যে দায়ী থাকছে।

সূর্য এই জগতের মধ্যমণি, এই তথ্য কিছু সংখ্যক জোতির্বেত্তাকে খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ধারণায় বিশ্বাসী করে তুলেছে যে, সূর্যই এই গ্রহজগৎ তথা সৌরজগতের উৎপাদক। এরই ভিত্তিতে বিভিন্ন মতবাদের স্বতন্ত্র এবং গোষ্ঠীবদ্ধ দুর্বলতা ধারণাটিকে বাতিল করেছে এবং স্বভাবতঃই অন্য ধারণার সূত্রপাত করেছে। পক্ষান্তরে সেই মতবাদগুলিও দুর্ঘটনা-বাদী এবং ত্রুটিদুষ্ট।

প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে উপেক্ষা না করে সৌরজগতের বৈশিষ্ট্যের কতখানি এদের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, এরই বিচারে মতবাদগুলির প্রতি অনাস্থা ঘোষণা করা এবং এদের ব্যর্থতার কারণগুলি যতখানি সম্ভব বিশ্লেষণ করে সৌরজগতের সম্ভাব্য উৎপত্তির বিষয় নির্দেশ করা বর্তমান এবং পরবর্তী প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সমীক্ষাগুলির প্রয়োজনে সৌরজগতের মূলগত বৈশিষ্ট্যগুলি ১৯৪৮ সালে তের হারের ছকটি অনুসরণ করে উপস্থাপিত করছি।

প্রথমতঃ সূর্যের প্রায় বিষুবরৈখিক সমতলে অবস্থিত গ্রহগুলির কক্ষপথ সবই একরকম—মোটামুটি উপবৃত্তাকার। তাদের গতি এবং অক্ষোপরি আবর্তনের দিক প্রত্যেকেরই সেই দিকে, যে দিকে সূর্যও নিজের মেরুদণ্ডের উপর ধীরে ধীরে ঘুরছে।

দ্বিতীয়তঃ মহাশূন্যে গ্রহগুলি সূর্যের চারপাশে নিখুঁতভাবে অভিনিবিষ্ট। মনে হয় সূর্য থেকে এদের দূরত্ব কোন বিশেষ নিয়মাধীন।

তৃতীয়তঃ প্রধানতঃ যে দুই শ্রেণীতে গ্রহগুলিকে ভাগ করা যায়, তাদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশ্চর্য সামঞ্জস্য বর্তমান। প্রথম শ্রেণীতে সূর্যের কাছাকাছি গ্রহগুলি—এরা আকারে ছোট হলেও এদের ঘনত্ব বেশ বেশী, আবর্তন শ্লথ এবং স্বল্প সংখ্যক উপগ্রহবিশিষ্ট। অন্যধারে দ্বিতীয় বিভাগের গ্রহেরা আকারে বৃহৎ হলেও ঘনত্বে হাল্কা উপগ্রহে সুসমৃদ্ধ এবং নিজের অক্ষের চারপাশে অধীর গতিসম্পন্ন।

চতুর্থতঃ সমগ্র সৌরজগতের নিরানব্বই ভাগ অংশ সূর্যের ভিতর অভিনিবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও শতকরা দু'ভাগ মাত্র কৌণিক ভরবেগ সূর্যের ভাগে পড়েছে। বাকী আটানব্বই ভাগ গ্রহগুলির মধ্যে বণ্টিত।

প্রকৃতি নিজেও কয়েকটি বিশেষ নিয়ম মেনে চলে। শক্তিকে না যায় ধ্বংস করা, না যায় সৃষ্টি করা—শক্তি পরিমাণগতভাবে শাশ্বত। তেমনি ঘূর্ণায়মান

বস্তুপিণ্ডের কৌণিক ভরবেগের মোট পরিমাণকে না যাবে কমানো, না যাবে বাড়ানো। এই মৌলিক নিয়মগুলি প্রত্যেক মতবাদই মেনে চলতে বাধ্য।

আলোচনার সুসংবদ্ধতার প্রয়োজনে 'সূর্য থেকে গ্রহ' মতবাদগুলিকে দুর্ঘটনার ধরণ অনুযায়ী মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: এক—জোয়ার মতবার; দুই—সংঘর্ষ মতবাদ।

জোয়ার মতবাদের প্রথম অবদান খুব সম্ভব কেম্‌ব্রিজ গণিতবেত্তা সেজউইকের। ১৮৯৮ সালের এই মতবাদ পরবর্তীকালের (১৯০১'১৬) আচার্য জীন্‌সের বক্তব্যের পূর্ববর্তী। এই দুই কালের মধ্যে আর একটি মতবাদ যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছিল। এর রচয়িতা ছিলেন দুই জন মার্কিন অধ্যাপক—মাউলটন এবং চেম্বারলিন।

সূর্যেতিহাসের যে বিশিষ্ট অধ্যায়ে সৌর-জগতের সৃষ্টি বলে এঁদের অনুমান, তাতে সূর্য একটি একাকী স্থির এবং বিক্ষুব্ধ মহাকাশচারী বলে চিত্রিত; তার দেহের উপরিতলে আজকের চেয়ে বৃহত্তর আকারের সৌরশিখাসমূহ নিরন্তর উল্লম্ফমান। এই অবস্থায় সূর্যের কাছ দিয়ে যদি কোন নক্ষত্র অকস্মাৎ চলে যায়, তাহলে সূর্যে এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, সঙ্গে সঙ্গে সূর্যও এই নক্ষত্রটির গায়ে জোয়ারের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নক্ষত্রটি যদি এর পর আর নিকটবর্তী না হয়ে দূরে সরে যেতে আরম্ভ করে, তাহলে পরস্পর সান্নিধ্যজাত জোয়ার-ভাটার সান্দ্রতাজাত শক্তির প্রভাবে আপনা আপনিই শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কৃপাপূর্বক ভ্রাম্যমান নক্ষত্রটি যদি সূর্যের আরো কাছে চলে আসে, তবে সূর্যদেহে আরো বৃহত্তর আকারের ঢেউ-এর সৃষ্টি হতে বাধ্য! মাউলটন এবং চেম্বারলিন অনুমান করেছেন যে, নক্ষত্রটি যদি আরো সন্নিকটবর্তী হয়, তবে সূর্যের সামনে এবং পেছন থেকে কয়েক ক্ষেপ বস্তু উৎক্ষিপ্ত হবে এবং সামনে থেকে উৎক্ষিপ্ত বস্তু-পিণ্ডগুলির আকার পেছনের অপেক্ষা অনেক বড় হবে।

এই ধরণের উৎক্ষেপণ যদি সম্ভব হয়, তাহলে দ্বিতীয় অনুমানটি সম্পর্কে বিশেষ কোন সন্দেহ ওঠে না, কিন্তু সূর্যে বস্তু উৎক্ষিপ্ত করবার মত শক্তি বর্তমান থাকবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এরূপ উৎক্ষেপণী শক্তির কারণ সৌরবিকিরণের প্রচাপ, কিন্তু এই প্রচাপের মূল্য এত উচ্চ নয়, যাতে বৃহদাকারের বস্তুখণ্ড সূর্য আপন দেহ থেকে সজোরে ছুঁড়ে দিতে পারে। এই প্রচাপ বড়জোর আণবিক আয়তনের কণাগুলিকে উৎক্ষিপ্ত করতে পারবে বলে মনে হয়।

ধরা যাক এই ভুল সংশোধন-সাপেক্ষ। তাহলে সূর্যবহির্ভূত হবার অব্যবহিত কাল পরে এই সকল বস্তুপিণ্ড তরলীভূত হবে এবং এঁদের অনুমান, তার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বস্তুখণ্ডের আবির্ভাব ঘটবে। তারও কিছু পরে এগুলি ঘনীভূত হয়ে পরবর্তী কালের 'গ্রহ-কেন্দ্র' সৃষ্টি করবে। এঁদের অনুমান, সূর্যের বিপরীত পার্শ্ব থেকে উৎক্ষিপ্ত বস্তুগুলি ক্ষুদ্র গ্রহের জনক এবং সম্মুখভাগের গুলি দৈত্যাকার গ্রহগুলির পূর্বাকার।

মতবাদটির পরবর্তী পদক্ষেপ আবার সমালোচনার আওতায় চলে আসে। এঁদের মতে, এই সব ক্ষুদ্র বস্তুটুকরাগুলির পরবর্তীকালের বিবর্তনের ফলে গ্রহগুলি তৈরি হয়েছে, অথচ তাদের মধ্যে সংঘর্ষের রূপ 'স্থিতিস্থাপক'—এই চিত্রণ-এরূপ সমষ্টিভবনের সম্ভাবনাকে নির্মূল করে দিচ্ছে। অধিকন্তু যে প্রক্রিয়ায় সূর্যদেহসম্ভূত বস্তুকণা সমষ্টির রূপ ধারণ করেছে বলে এঁদের অনুমান, কণারূপ ধারণ করবার পক্ষে তা যথেষ্ট শক্তিশালী কারণ কিনা, সে হিসাবে বিষয়টি ভাববার অবকাশ আছে। আবার গ্রহসম্ভব যে পরিমাণের সূর্যকেন্দ্রিক কৌণিক

ভরবেগ নিয়ে মহাকাশে বিচরণ করছে, মাউলটন এবং চেম্বারলিন পরিকল্পিত পন্থায় তার সম্যক সৃষ্টি অসম্ভব।

এভাবে প্রাথমিক কেন্দ্রগুলির দ্বারা সৃষ্ট অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের খণ্ডগুলি কণাসমষ্টির মধ্যস্থিত গৌণ কণা-কেন্দ্রগুলির সবই আত্মসাৎ করবে না। এই শেষোক্ত কেন্দ্রগুলির যদি যথেষ্ট পরিমাণ সৌরকেন্দ্রিক গতিবেগ থেকে থাকে, তাহলে মুখ্য কেন্দ্রগুলি ওদের আত্মসাৎ করবার পরিবর্তে নিজের চারপাশে ঘুরতে বাধ্য করাবে। এঁদের ধারণা, এই গৌণ কণাগুলি ভবিষ্যৎ উপগ্রহগুলির পূর্বরূপ।

সূর্যদেহ থেকে উৎক্ষিপ্ত বস্তু-সমষ্টির কিছু অংশ সূর্যের আকর্ষণে সূর্যেই প্রত্যাবর্তিত হবে। স্বভাবতঃই বস্তু-সমষ্টির মহতী আবর্তনের দিকে কিছু কৌণিক ভরবেগ এই ভাবে সূর্যে সঞ্চালিত হবে। ফলতঃ গ্রহগুলির আবর্তনের দিকে সূর্যও আবর্তিত হতে সুরু করবে। গ্রহগুলির অক্ষোপরি আবর্তনের কারণ তাঁরা অনেকটা এভাবেই নির্দেশ করেছেন।

পূর্বেই বলেছি যে, সূর্যে যে ধরণের উৎক্ষেপণী শক্তির ভূমিকা মাউলটন ও চেম্বারলিনের মতবাদে অপরিহার্য, তা ত্রুটিযুক্ত। সত্য সত্যই যদি কোন বহির্নক্ষত্রের প্রভাবই সূর্যের উপাদান বহির্গত হবার কারণ হয়, তাহলে সূর্য অপেক্ষা তার গতিপথ যথাযথভাবে পরিবর্তিত করে দিতে পারলে এই সৌরচন্দ্রিকা উপেক্ষা করেও শুধুমাত্র অতিথি নক্ষত্রটির সূর্যগাত্রে জোয়ারের প্রভাবকে সৌর উপাদান বহির্গত হবার সম্পূর্ণ কারণ হিসাবে নির্দেশ করা সম্ভব।

এই রকম ধারণা ১৯০১ সাল থেকেই জীন্‌স্ পোষণ করে আসছিলেন, ১৯১৬ সালে তার গাণিতিক রূপ প্রকাশ পেল। সৌর শিখাগুলির ভূমিকা অগ্রাহ্য করে শুধুমাত্র জোয়ারের অভাবকে সম্পূর্ণ কারণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে যে বিশেষ অবস্থার অবতারণা করা প্রয়োজন, তাতে অতিথি নক্ষত্রটিকে সূর্য থেকে তিন-চার সৌর ব্যাসার্ধের মধ্যে প্রবেশ করতে হচ্ছে এবং ন্যূনতম ক্ষেত্রে নক্ষত্রটির ভর হতে হবে সূর্যের সমান।

অতিথি নক্ষত্রটি সূর্যের নিকটবর্তী হতে সুরু করলে উভয়ের দেহেই জোয়ার উপস্থিত হবে। প্রথম প্রথম সূর্যের সম্মুখভাগে ঢেউ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে, কিন্তু নক্ষত্রটি যতই সূর্যের দিকে এগিয়ে আসবে, ততই এর পরিপুষ্টি ত্বরান্বিত হবে এবং চরম আকার ধারণ করবে তখনই যখন নক্ষত্রটি সূর্যের সবচেয়ে কাছে চলে আসবে। এর পর আবার যখন নক্ষত্রটি এবং সূর্যের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকবে, এই প্রক্রিয়ার বেগও ধীরে ধীরে কমে আসবে; কিন্তু চরম নিকটবর্তী হবার সময় ভ্রাম্যমান নক্ষত্রটি সূর্যে যে দোল দিয়ে যাবে, তার দরুণ এই ঢেউ সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসবে এবং এর আকার হবে অনেকটা পিঠের মত, যার সূক্ষ্ম প্রান্ত দুটির একটি অতিথি নক্ষত্রটির এবং অপরটি সূর্যের দিকে মুখ করে থাকবে। ধরা যাক, এর নাম 'টানা সুতা'

জীন্‌সের অনুমান, এই বহির্গত অংশের পরবর্তী বিবর্তন মুখ্যতঃ একে একাধিক ভাগে ভেঙ্গে ফেলেছে এবং প্রত্যেকটি টুকরাই হয়েছে পরবর্তীকালে গ্রহগুলির পূর্বরূপ। এই ভাঙ্গনের মুখ্য কারণ হিসাবে জীন্‌স্ আভিকর্ষিক অসংরক্ষণকে দায়ী করেছেন; অর্থাৎ অসম ঘনত্বের এই অংশটুকুর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ঘন বস্তুর চারপাশে ঘনীভবনের পালা সুরু করে দেবার প্রবণতা অংশটির একক সত্তা বিনষ্ট করে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে দেবে। এরূপ ভাঙ্গন আরো দাবী করে যে, এই বহির্গত অংশটির দৈর্ঘ্য হবে বেধের অনেক গুণ বেশী। সুতরাং বলা বাহুল্য, পিঠের আকারের এই উপাদান সূর্য্যদেহ থেকে বের হবার অব্যবহিত পরেই ভেঙ্গে পড়বে।

খুব স্বাভাবিক, এই বিভক্ত টুক্‌রাগুলি প্রথম প্রথম সূর্য এবং নক্ষত্রটির যুগ্ম মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিল কক্ষপথে পরিভ্রমণ করবে, কিন্তু সূর্য থেকে নক্ষত্রটির দূরত্ব যতই বাড়তে থাকবে, এই কক্ষপথগুলি ততই উচ্চ উৎ-কেন্দ্রীকতাবিশিষ্ট উপবৃত্তে রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করবে।

জীন্‌সের মতবাদে উপগ্রহগুলির সৃষ্টি এই উচ্চ উৎকেন্দ্রীকতার কক্ষপথ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এগুলিকে ব্যবহার করেছেন এই ভাবে: গ্রহগুলি তাদের অনুসূরকালে সূর্যের জোয়ারের প্রভাবে পুনর্বার ভেঙ্গে পড়েছে, দ্বিতীয়বার সূর্য এবং অতিথি নক্ষত্রটির মধ্যে সেই ঘটনাটিই ছোট খাটো রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে এবং ফলতঃ উপগ্রহগুলি আবির্ভূত হয়েছে। ঘনীভবনের বিভিন্ন পর্যায় অনু-সারে গ্রহগুলি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় ভেঙ্গে পড়ে। যারা ছোট অর্থাৎ যারা পিঠের দুই প্রান্তসীমা থেকে উদ্ভূত, তারা অতিদ্রুত তরলীভূত বা ঘনীভূত হয়ে পড়লেও মাঝের বৃহদাকার গ্রহগুলি তখনো গ্যাসীয় অবস্থায়ই থাকবে। গণিত এই রকম নির্দেশ দিয়েছে যে, জোয়ারের প্রভাব গ্যাসীয় বস্তুখণ্ড-গুলিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি সংখ্যায় ভাগ করবে, কিন্তু তরলীভূত খণ্ডগুলির ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত ঘটনা ঘটবে। সুতরাং বৃহদাকার গ্রহগুলির অবস্থান থেকে একবার সূর্যের দিকে আর একবার সূর্য থেকে দূরে চোখ মেললে এই দেখবো বলে আশা করা উচিত। প্রথম পর্যায়ে পড়বে একাধিক গ্রহ যাদের অল্পসংখ্যক বড় বড় উপগ্রহ রয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়বে দু-একটি গ্রহ, যাদের ছোট ছোট বহু উপগ্রহ রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই তাত্ত্বিক ভবিষ্যৎ-বাণীর সঙ্গে তথ্যের সঙ্গতি সহজেই চোখে পড়ে। গ্রহপরিবারের সাধারণ ব্যতিক্রম হিসেবে মঙ্গল এবং ইউরেনাসকে ধরা যায়। গ্রহ দুটি ওদের দু-পাশের গ্রহগুলির তুলনায় অস্বাভাবিক রকমের ছোট। জীন্‌সের অনুমান—এরা জন্মাবস্থায় আকারে অন্যান্য দৈত্যাকার গ্রহগুলির চেয়ে কিছু ছোট, কিন্তু ক্ষুদ্রাকার গ্রহগুলি অপেক্ষা বৃহৎ ছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে গ্যাসীয় অবস্থায় কাটিয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতি বা শনির মত অত বৃহদাকার না থাকার দরুণ বেশ কিছুকাল এদের উপরিতল থেকে পরমাণুসমূহ বিবাগী হয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এই ক্ষতির দরুণ এরা শেষ পর্যন্ত আজকের ক্ষুদ্রাকারে এসে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উপগ্রহ সৃষ্টির খাতিরে এই উপবৃত্তাকার কক্ষপথগুলির প্রয়োজন অপরিহার্য, কিন্তু কি ভাবে এই উপবৃত্তাকার পথগুলি আজকের উৎকেন্দ্রিকতায় এসে পৌঁচেছে?

হেতু নির্দেশ করা হয়েছে সী-পরিকল্পিত এক বাধাদানকারী মাধ্যমের ভূমিকার অবতারণা করে। বিভক্ত টুক্‌রাগুলির জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের চারপাশে যে বিশালকায় ধূলিগ্যাসের ব্যূহ রচিত হবে, তার ভিতর দিয়ে গ্রহগুলির পরিক্রমা-কালে দুটি পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে বাধ্য। প্রথমতঃ এই ধূলিগ্যাস আত্মসাৎ-জনিত নিজেদের ভর ও আকার বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ এই মাধ্যমের প্রতিরোধের ফলস্বরূপ স্বতন্ত্র কক্ষপথগুলির উৎকেন্দ্রিকতার হ্রাস মূল্যায়ন।

কিন্তু নোলকে এই দুটি ঘটনার যে পারস্পরিক গাণিতিক সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন, তাতে আশঙ্কা হয়, কোন কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতা ০·৫ থেকে ০·১ মূল্যে নেমে আসতে গেলে সেই কক্ষপথস্থিত গ্রহকে তার ভরের পাঁচ গুণ উপাদান প্রতিরোধ মাধ্যম থেকে আত্মসাৎ করতে হবে। অর্থাৎ কোন কক্ষপথের উৎকেন্দ্রিকতার বেশ কিছু পরিসংক্ষেপন সাধিত হচ্ছে এরূপ প্রতিরোধ মাধ্যমের সাহায্যে—এই ধারণা প্রতিরোধ মাধ্যমের পরিবর্তে পিঠের আকারের সূর্যের উপাদান থেকে গ্রহগুলি সৃষ্ট—এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে পরোক্ষে খণ্ডিত করছে।

গ্রহ-পরিবারের যাদের যাদের ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত বেশ পরিমাণ উপবৃত্তাকার পথ রয়ে গেছে, তারা হলো প্লুটো, বুধ এবং মঙ্গল। বৃহস্পতি ও শনির কয়েকটি উপগ্রহও এই দলে পড়ছে। প্লুটোর কক্ষপথ উপবৃত্তাকারই থাকবে—এরূপ অনুমান কিছু কিছু জিন্‌সের মতবাদ থেকে করা যায়; কেন না, যে দূরত্বে এর অবস্থিতি, সেখানে এই প্রতিরোধ-মাধ্যমের ঘনত্ব অত্যল্প হওয়া স্বাভাবিক। আর আর ছোট গ্রহ বা উপগ্রহগুলির বেলায় জেফ্রীজের কারণটি উপস্থাপিত করা যেতে পারে: বৃহদাকারের গ্রহ বা উপগ্রহগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ মাধ্যম-উপাদান সংগ্রহ করতে পারায় তাদের আকার-বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত বেশী ঘটেছে। সুতরাং এই বৃহদাকারের গ্রহগুলির সঙ্গে মাধ্যমের যতখানি ক্রিয়া হবে—যার লব্ধি হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতার মূল্য হ্রাস। অপেক্ষাকৃত ছোটগুলির বেলায় ততটা হবে না, বরং তার চেয়ে কম হবে। ফলে ছোটদের চেয়ে বড়রা, তুলনামূলকভাবে দেখলে, বেশী তাড়াতাড়ি তাদের উৎকেন্দ্রিকতা কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে

সৌরজগতের আরো একটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা জীন্‌সের মতবাদ উপস্থাপিত করতে পারে। গ্রহগুলি যে তলে সূর্য পরিক্রমা করছে, তা মোটা-মুটিভাবে সূর্যের নিরক্ষীয় তলদেশে অবস্থিত হলেও ঠিক সেই তলেই নেই। এদের অধিকাংশ যে তলে অবস্থিত, তা সূর্যের নিরক্ষীয় তলদেশের সঙ্গে ৫।৬ ডিগ্রীর মত ব্যবধানে রয়েছে। জীন্‌সের অনুমান, গ্রহগুলির এই তলেই সূর্য এবং নক্ষত্রটির ৩০০ কোটি বছর আগে সংস্থান ঘটেছিল।

গ্রহগুলির ঘূর্ণন, মতবাদটির পক্ষে একটি সমস্যা হিসেবে প্রতীত হয়েছে। কেন না, কোন বাহ্যিক বস্তুর সরাসরি আকর্ষণের ফলে ঘূর্ণন উদ্ভূত হতে পারে না। অধিকন্তু কোন বায়বীয় বস্তুতে আবর্তের সৃষ্টি হয় সমচাপের, কিন্তু বিভিন্ন ঘনত্বের পৃষ্ঠ অথবা সীয়ারড্ (Sheared) পরিসীমা থেকে ব্যাপনের দাবী করে। গঠন অথবা তাপমাত্রার প্রভেদে প্রথম ঘটনাটি ঘটা যদিও অস্বাভাবিক নয়, তথাপি সেই দিকেই তেমনি একটি বস্তুর সামগ্রিক ঘূর্ণনের জন্ম দেওয়াও অসম্ভব।

জীন্‌সের পূর্বেকার ধারণা এই যে, সূর্যদেহ থেকে যে পিণ্ড বের হয়ে এসেছিল, তার কিছু সূর্যেই প্রত্যাবর্তিত হয়েছে এবং এভাবে সূর্যকে নক্ষত্রটির অপসরণের দিকে ঘোরাতে বাধ্য করেছে। ঠিক এই ভাবে গ্রহগুলিরও ঘূর্ণন ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করা হলে দেখা যাবে, এর জন্যে বাইরের গ্রহগুলিকে এত বেশী বস্তু ফিরে পেতে হচ্ছে, যার পরিমাণ তার নিজস্ব উপগ্রহ-গুলির সম্মিলিত ভরের বহু বহু গুণ বেশী (বৃহস্পতির ক্ষেত্রে ১/১৫ ভাগ নিজের ভর = ৪০০ গুণ উপগ্রহের ভর)। 'টানা সুতার' এতখানি অংশ যদি ঘূর্ণনের প্রয়োজনেই লেগে যায়, তাহলে উপগ্রহ তৈরির জন্যে অবিশ্বাস্য রকমের কম উপাদানই অবশিষ্ট থাকছে

সূর্যের কয়েক ব্যাসার্ধের মধ্য দিয়ে অতিথি নক্ষত্র শুধু মাত্র জোয়ার জাগিয়ে না দিয়ে যদি সূর্যের সঙ্গে কানঘেঁষা একটি সংঘর্ষ বাধিয়ে বসে, তাহলেও অবস্থার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। তবে সংঘর্ষের রূপ যদি এই দুটার কোনটাই না হয়ে মাঝামাঝি রকমের হয়—দেখা যাক, সে অবস্থায় কি ঘটনা ঘটতে পারে।

কেম্ব্রিজ গণিতবেত্তা জেফ্রীজ এরূপ ঘটনাটির গাণিতিক আলোচনা করেছেন। তিনি বললেন, এই সংঘর্ষের উচিত যথেষ্ট পরিমাণে তির্যক (Tangential) হওয়া, যাতে দুটি তারারই ভারী কেন্দ্র দুটির মধ্যে ধাক্কাটা কোন রকমে রক্ষা হয়। পারিপাট্য রক্ষা করে উভয় ঘটনা দুটি সম্ভবতঃ এই রকম হবে—সূর্য এবং নক্ষত্র পরস্পর

সেকেণ্ডে কয়েক শত মাইল আপেক্ষিক গতিতে এই সংঘর্ষের মুখে পড়লে তারাযুগ্মের উভয়েরই সম্মুখ-স্তরটির একাংশ পরস্পর মিশ্রিত, নিদারুণ-ভাবে নিষ্পেষিত, উত্তপ্ত এবং আলোড়িত হবে এবং এর পরমুহূর্তেই অতিথি নক্ষত্রটি অধিবৃত্তাকার পথে দূরে চলে যাবার সময় Shearing motion-এর দরুণ এই স্তরটিকে প্রচণ্ডভাবে ঘুরিয়ে দিয়ে যাবে এবং তারাটি যত দূরে চলে যাবে, স্তরটি সূর্য থেকে গতিশীল নক্ষত্রটির দিকে মুখ করে প্রসারিত হয়ে পড়লে এরই ক্রমবিকাশ যে সব গ্রহের জন্ম দেবে, তাদের পরিমাণগত এবং ধর্মগত ঘূর্ণন, দুই তথ্যের সঙ্গে হয়তো পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করতে পারবে। অধিকন্তু, গ্রহসৃষ্টির জন্যে উপাদানের পরিমাণগত সঠিক নির্দেশও এই মতবাদ থেকে পাওয়া সম্ভব।

জীন্‌স্ এবং জেফ্রীজের মতবাদ দুটি গোষ্ঠীবদ্ধ-ভাবে এবার আলোচনা করা যাক। প্রথমেই যে 'টানা সুতা'র ভূমিকা মতবাদ দুটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তাকে নিয়েই আলোচনা করবো।

প্রথম পর্যায়ে, সূর্য এবং অন্য একটি তারকা কাছাকাছি এসে পড়ুক অথবা যে কোন ধরণের সংঘর্ষের মুখেই পড়ুক না কেন, এই 'টানা সুতা' আদৌ সৃষ্টি হতে পারে কি না, সে সম্পর্কে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতবেত্তা পি. এল. ভাটনাগর গাণিতিক পর্যালোচনা করে নিরাশ হয়েছেন যে, এই ভাবে 'টানা সুতা'র জন্ম অসম্ভব।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখবো, যদি এ-ধরণের 'টানা সুতা'র সৃষ্টি আদৌ সম্ভব হয়, তাহলে তার বিবর্তন গ্রহগুলির সত্য সত্যই জন্ম দিতে পারে কি না। প্রথমতঃ, যেহেতু জীন্‌সের মতবাদে এই 'টানা সুতা'র উপাদান সূর্যের অপেক্ষাকৃত গভীর তল-দেশ-সম্ভূত হবার সম্ভাবনা ক্রমশঃ জোরালো হয়ে উঠছে এবং যখন জেফ্রীজের 'টানা সুতা' অত্যন্ত উত্তপ্ত (প্রায় এক কোটি ডিগ্রীর মত তাপমাত্রা) অঞ্চল-সম্ভূত অস্বচ্ছ, সেহেতু আশঙ্কা হয়, এই 'টানা সুতা' মহাশূন্যে বের হয়ে ঘনীভবনের পরিপন্থী কোন ঘটনার সম্মুখীন হবে কিনা। জীন্‌স্ তাঁর 'টানা সুতা' বিভক্তিভবনের জন্যে যে আভিকর্ষিক অসংরক্ষণকে দায়ী করেছেন, তার জন্যে এই 'টানা সুতা'কে ভারসাম্য বজায় রাখতেই হবে, কিন্তু অত উচ্চ তাপাঙ্কে এই ভারসাম্য বজায় থাকা অসম্ভব। জেফ্রীজও এই 'টানা সুতা'র বিবর্তন নিয়ে পরে আলোচনা করে দেখেছেন। যদিও মহাশূন্যে নির্গত হবার পর 'টানা সুতা' জাড্যতার প্রভাব ছাড়াও যে ভাবে সম্প্রসারিত হতে সুরু করবে, তার মধ্যে হঠাৎ শীতলীভবন কিছু তরলের সৃষ্টি করলেও করতে পারে। কিন্তু ডাঃ স্পিট্‌জার এই তরলীভবনের সম্ভাবনাও নির্মূল করে দিয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্তে এই 'টানা সুতা'র সম্পূর্ণভাবে মহাশূন্যে বিকিরিত হয়ে পড়া ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নেই।

এতদসত্ত্বেও যদি ধরে নিই, 'টানা সুতা'র জন্ম সম্ভব, তাহলে দেখবো আমাদের অন্য বিরোধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কেন না 'টানা সুতা' সূর্যদেহ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় নিশ্চয়ই সঙ্গে করে শতকরা ৯০ ভাগ হাইড্রোজেন নিয়ে আসবে। জেফ্রীজ বললেন, তার চারপাশের মাধ্যমের সান্দ্রতা তার কিছু অংশকে সূর্যেই ফেরৎ পাঠাবে এবং বাকী অংশটুকু প্রতিরোধ-মাধ্যম হিসেবে সূর্যের চারপাশে থেকে যাবে। কিন্তু গভীরতর পর্যালোচনায় ধরা পড়লো, এদের ভাগ্যে একমাত্র সূর্যে ফেরৎ যাওয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নেই। ধরা যাক, মাধ্যমের ভর বৃহস্পতির কয়েক গুণ। এই বিরাট পরিমাণের ধূলিগ্যাস যদি সূর্য আত্মসাৎ করে থাকে, তাহলে আজকের চেয়ে সে নিশ্চয়ই আরো বেগে নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরতে থাকতো। অন্য ধারেও নয় ধরাই গেল, এর কিছু অংশ প্রতিরোধ-মাধ্যম গঠন করেছে। কিন্তু তাকেও তো দেখতে পাওয়া উচিত! আগে মনে

করা হতো, ভোর বেলায় সূর্য ওঠবার আগে পূর্বাকাশে এবং সন্ধ্যাবেলায় গোধূলির উত্তর কালে পশ্চিমাকাশে যে হেলানো আলোর ঝাঁটা দেখতে পাওয়া যায়, তার কারণ এই অবশিষ্ট মাধ্যম। কিন্তু আধুনিক নিরীক্ষা নির্দেশ করেছে, এই আলোর কারণ আণবিক হাইড্রোজেন নয়, বরং খুব ছোট ছোট ধূলিকণার জন্যে সেগুলি ঘটছে। অতএব?

স্পষ্টতঃই 'টানা সুতা' থেকে গ্রহগুলির তথা সৌরজগতের সৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে।

বিরোধ আরও আছে। জীন্স্ এবং জেফ্রীজ যে তাত্ত্বিক সৌরজগৎ উপস্থাপিত করছেন, তা দৃষ্ট সৌরজগতের ব্যাপ্তির তুলনায় যথেষ্ট ছোট, অর্থাৎ সৌরজগতের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বাদ সাধছে। এ-রকম যে ঘটবে, সে বিষয়ে জীন্স্ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। কেন না, গ্রহসৃষ্টির যুগে সূর্য যদি আজকের মত সঙ্কুচিত অবস্থায় থেকে থাকে, তাহলে জোয়ার কেন, কোন শক্তিই সৌর উপাদানকে প্লুটোর কক্ষপথ অবধি ছুঁড়ে দিতে পারে না। জীন্স্‌কে এই জন্যে অনুমান করতে হয়েছে যে, সূর্য তখন সবেমাত্র ভান্তঃপ্রদেশীয় উপাদান থেকে জন্ম নিচ্ছে। সুতরাং তার আকারও তখন আজকের চেয়ে অনেক বড় হবে এবং এই বিরোধ ঘটবে না। কিন্তু সূর্য ৩০০ কোটি বছর আগে আজকের চেয়ে খুব একটা অবস্থান্তরে থাকতে পারে, এই মর্মে কোন অনুমান সূর্যের ইতিহাস অন্ততঃ মেনে নেবে না। কৌণিক ভরবেগের দিক থেকে হেনরি রাসেল এবং পারিজস্কির বিচারে মতবাদ দুটির কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়

শেষতঃ এঁদের পরিকল্পিত অবস্থার সম্ভাবনা এই বিশ্বে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। সূর্য সবেমাত্র ভান্তঃ-প্রদেশীয় উপাদান থেকে জন্মগ্রহণ করলেও ৫ কোটি তারার মধ্যে একটির ক্ষেত্রেই এরূপ সঙ্কীর্ণ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, যা জীন্স্ পরিকল্পনা করেছেন। সূর্য যদি সেই সময় আজকের মত সঙ্কুচিত অবস্থায় থেকে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই, সম্ভাবনা আরো সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। জেফ্রীজ পরিকল্পিত অবস্থার সম্ভাবনা এর চেয়েও কম।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'সূর্য থেকে গ্রহগুলির জন্ম'—এই ধারণাভিত্তিক মতবাদ বিভিন্ন দিক থেকে বর্জনীয়। 'টানা সুতা'র প্রসঙ্গ থেকে আরও একটি ক্ষীণ প্রতিবাদের আভাস এই মর্মে উঁকি মারে যে, শুধু সূর্য কেন, কোন তারার দেহ থেকেই সৌরজগতের সৃষ্টি হয়তো সম্ভব নয়, তবে তা ক্ষীণ—এই পর্যন্ত।

* * *

রাসেল তখন অন্য কথা বললেন। তিনি বললেন, যদি মনে করা যায়, সূর্য অতীতে একটি জুড়ি-তারা ছিল, আর এই জুটিটির সঙ্গেই কোন পথচারী তারার সংঘর্ষ বাধে, তাহলে? তাহলে জুটি তারাটি কতকগুলি সংখ্যায় ভেঙ্গে পড়তে পারে এবং এথেকে গ্রহগুলির জন্ম অসম্ভব নাও হতে পারে! তবে এর জন্যে আরও বিশেষ অবস্থার উত্থাপন অপরিহার্য। জুটি তারাটিকে সূর্যের চেয়ে ছোট, জুটি তারা আর সূর্য পরস্পর সূর্য থেকে দৈত্যাকার গ্রহগুলির দূরত্বের সমতুল দূরত্বে একে অপরকে আবর্তন করছে—ইত্যাদি বিশেষ অবস্থায় পরিকল্পনা করেও জুটি তারার এই রূপ আয়নন খুব সাফল্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা যা তার থেকে শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্রাকার গ্রহগুলির জন্ম নির্দেশ করা রাসেলের নিজের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অতঃপর লিটল্‌টন এই তিন বস্তুর সমান ভরের কল্পনা করে এই আয়নন প্রণালীর আরো বিশদ গাণিতিক আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন, এর থেকে সৃষ্ট গ্রহগুলি বর্তমান ঘূর্ণন বেগ এবং কৌণিক ভরবেগের পরিমাণগত সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে। কিন্তু এর জন্যে আরও বিশেষ অবস্থার দাবী উঠছে—কেন না, সূর্যের জুটি তারাটির সূর্য-

কেন্দ্রিক তল এবং অপরিচিত গ্রহটির পথের তল যদি কিছুটা সমান্তরাল না হয়, তাহলে এক সমতলস্থিত গ্রহগুলির সৃষ্টি অসম্ভব।

লিটেন এবং হিলের সমীক্ষায় লিটলটনের আরও কিছু ত্রুটি নজরে আসে। প্রথমতঃ তাঁর চিত্রণে গ্রহসৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় গতিশক্তি অত্যন্ত বেশী হওয়া উচিত এবং তিনি যে অবস্থার অবতারণা করেছেন, তাতে পথিক তারাটিকে জুটি তারাটি থেকে অনেক দূরে থাকতে থাকতেই সূর্য অপেক্ষা প্রায় ১০০ কি. মি./সেকেণ্ড বেগযুক্ত হতে হবে, যে রকম ঘটনা এই বিশ্বে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। দ্বিতীয়তঃ লিটলটনের ধারণা, 'টানা সুতা'র সমগ্র অংশটিই সূর্যের আওতায় চলে আসা সম্ভব, কিন্তু গণনার নির্দেশে 'টানা সুতা'টির দৈর্ঘ্যের শতকরা মাত্র ৬% সূর্যের মহাকর্ষণে আটকা পড়বে।

এই সব কারণ লিটলটনের সূত্রকে অচল বলে প্রমাণিত করতে চললো। অতিথি নক্ষত্রটির অত্যুচ্চ গতিবেগের দাবীকে অগ্রাহ্য করবার জন্যে তিনি প্রতিটি নক্ষত্রকে সূর্যের চেয়ে বেশী ভারী কল্পনা করে আর একটি মতবাদ গঠন করলেও লিটেনের সমালোচনায় তা পুনরায় নস্যাৎ হয়ে গেছে। লিটেনের আশঙ্কা এই মর্মে আত্মপ্রকাশ করলো যে, সূর্য নিজে অতিথি নক্ষত্রটির দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে 'টানা সুতা'র কিছুই আত্মসাৎ করতে পারে না এবং আত্মসাতের যথেষ্ট সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সূর্যকে কিছুক্ষণ 'টানা সুতা'র সমান্তরালে ছুটতে হবে এবং তৃতীয় নক্ষত্রটির হয় খুব কাছ দিয়ে ওর যাওয়া, না হয় ওর সঙ্গে ধাক্কা লাগানো অবশ্যম্ভাবী

আবারো লিটলটনের অনুমান, এই দুর্ঘটনা নিরপেক্ষ ভাবে সূর্য থেকে তার জুটিটির পারস্পরিক দূরত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাঁর 'ভেকটর ছবি' লিটেনের মতে, কল্পনাদুষ্ট।

লিটেন এবং হিলের এই সমীক্ষাগুলির গাণিতিক অসম্পূর্ণতা ভাটনাগরকে এই অবস্থার সম্পূর্ণ পর্যালোচনা করতে উৎসাহিত করেছে। বলা বাহুল্য পূর্ণ গাণিতিক সমীক্ষার রায় লিটলটনের মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধে লিটেনের অনুকূলে গেছে।

* * *

এরপরেও লিটলটন অন্যভাবে গ্রহগুলির উৎপত্তির ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু একাধিক কারণে সেগুলিও বাতিল হয়ে গেছে। এই মতবাদে তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল এই যে, বাহ্যিক কোন বিক্ষোভ নিরপেক্ষভাবেও এই সৌরজগতের আবির্ভাব সম্ভব। তাঁর ধারণা, সূর্য এক সময়ে তিন-তারা ছিল, যার দু'পাশে খুব কাছাকাছি অন্য জুটি দুটি থাকবে। তিনি দেখাচ্ছেন, এই জুটি দুটি যদি হঠাৎ আকস্মিক-ভাবে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, তবে এদের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কৌণিক ভরবেগ আপনা আপনি এদের অনেক-গুলি স্বতন্ত্র ভাগে ভেঙ্গে ফেলবে। এই ভগ্ন তারা দুটি উভয়েই সূর্যের কাছে একটা পাতলা গ্যাসের অংশমাত্র ফেলে রেখে অনেক দূরে সরে যেতে পারে। সূর্য এই অবশিষ্টাংশকে সংগ্রহ করেছে এবং গ্রহগুলির জন্ম এখোেই। এই ধরণের আকস্মিক সঙ্কোচন তারাগুলির অন্তঃ-প্রদেশীয় উপাদান সংগ্রহের জন্য হওয়া সম্ভব— হয়েল ও লিটলটন স্বতন্ত্রভাবে কতকগুলি মৌলিক নিবন্ধে এই ধরণের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। গ্রহগুলির প্রাথমিক উচ্চ তাপাঙ্ক ছাড়া এই মতবাদের বিরুদ্ধে পরিমাণগত কোন অভিযোগ নেই।

'তিন-তারা' মতবাদের ভিত্তিতে একথা মনে হতে পারে যে, ভগ্নাংশের আবর্তন-তলে গ্রহ-সঙ্ঘও ঘুরবে এবং গ্রহগুলির অক্ষের 'ঝুঁকি'র বিভিন্নতা আপত্তির কারণ হিসেবে প্রতীত হতে পারে। লিটলটন উত্তর দেবেন, সৃষ্টির দীর্ঘ উত্তর-কালে এই 'ঝুঁকি'র অনেকখানি পরিবর্তন

সাধিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু জেফ্রীজের আপত্তি, এই পরিবর্তন কৃষ্ণতলের ঝুঁকির অনেকখানি পরিবর্তনের ফল এবং শেষোক্ত পরিবর্তনের কোন নির্দেশ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

যুগ্ম-তারার মতবাদকে এরপরেও একটু অন্যভাবে হয়েল এবং ভ্যান আল্‌বাদা প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। হয়েল সাম্প্রতিক-কালে তাঁর মতবাদটিকে পরিবর্জন করেছেন। এঁদের বক্তব্যের সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডে সৌরজগতের অস্তিত্ব বহুল বলে ঘোষণা করেছেন। আধুনিক কালে কিছু তারার সঙ্গে 'গ্রহের ধরণের কিছু বস্তু'র আবিষ্কার হয়তো এঁদের মূল বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে। হয়েলের সংশোধিত মতবাদটি প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা যেতে পারে।

উপরিউক্ত মতবাদগুলির সাধারণ দুর্বলতা এইখানে। এদের ভিত্তিতে সৌরজগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুখণ্ডের জন্ম কি ভাবে সম্ভব হতে পারে, তা বোঝা মুস্কিল।

* * *

অতএব এই আলোচনার ভিত্তিতে এই কথাই শেষ পর্যন্ত বলতে পারা যায় যে, আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা এবং সেই সঙ্গে কোন নাক্ষত্রীয় উপাদান নিখুঁতভাবে দৃষ্ট সৌরজগতের বৈশিষ্ট্য-গুলি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নয়। অধিকন্তু প্রতি-রোধ-মাধ্যম সম্পর্কে নোল্‌কের পর্যালোচনা অস্পষ্টভাবে একটি সম্ভাবনার দিকে আমাদের এগিয়ে দিয়েছে—সেটি হলো গ্রহগুলির জন্ম সূর্যকেন্দ্রিক কিন্তু সূর্য-বহির্ভূত কোন পাতলা বস্তু থেকে হতে পারে।

নলকূপ নির্মাণের কৌশল

শ্রীকরুণানিধান চট্টোপাধ্যায়

নলকূপ করিবার কৌশল সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে প্রথমতঃ মনে হইবে, জলের মান কিরূপ হইবে এবং দ্বিতীয়ত: জলের পরিমাণ কতখানি হইবে? জলের মানের উন্নতিবিধান করিবার জন্য নানারকমের রাসায়নিক পদ্ধতি আছে, তবে নলকূপ খনন করিবার পূর্বে সে সম্বন্ধে কিছু করা সম্ভব নহে। জলের রাসায়নিক গুণাগুণ জানিবার জন্য জলের নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং রাসায়নিক পরীক্ষাও করা দরকার। জলের রসায়নিক মানের উপর নলকূপ খননকারীদের কোনও হাত নাই। যাহা হউক, পূর্বে যদি আপনার এলাকায় নলকূপ বসান হইয়া থাকে, তবে আপনি জলের রাসায়নিক গুণাগুণ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিবেন। অন্যথায় আপনি স্থানীয় জনস্বাস্থ্য দপ্তর বা ভূতত্ত্ব দপ্তর (Geological Survey Office) হইতে আপনার এলাকার জলের রাসায়নিক গুণাগুণ ও পরিমাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এইভাবে যদি আপনি নলকূপ খনন করিবার পূর্বে পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে আপনার নলকূপ শুধু ভালই হইবে না, দীর্ঘস্থায়ীও হইবে।

নলকূপ খনন করিবার পূর্বে আপনার কি পরিমাণ জলের প্রয়োজন, তাহা নলকূপ খনন-কারীদের জানান দরকার। জলের প্রয়োজন নির্ভর করিতেছে জল কি জন্য ব্যবহার করিবেন, তাহার উপর। যেমন—হাসপাতালের জন্য জলের প্রয়োজন একরূপ হইবে আবার বিদ্যালয়ের জন্য জলের প্রয়োজন অন্যরূপ হইবে এবং আপনার

নিজের বাড়ীর জন্য জল সরবরাহের পরিমাণও ভিন্নরূপ হইবে। ইহা ছাড়াও জলের প্রয়োজন আরও কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে; যথা—(১) আপনার জীবনধারণের মানের উপর, (২) দৈনিক, সপ্তাহিক ও মাসিক জল ব্যবহারের পরিবর্তনের উপর। কারণ, গ্রীষ্মকালে জল ব্যবহারের পরিমাণ একরূপ হইবে, আবার উৎসব উপলক্ষ্যে জল ব্যবহার বেশী হইবে এবং (৩) অদূর ভবিষ্যতে আপনার কি পরিমাণ জলের প্রয়োজন হইবে—ইত্যাদি। ইহা ছাড়া জলের চাপ, জলের মান ও জলের স্বচ্ছলতার উপরও জল ব্যবহারের পরিমাণ নির্ভর করে। বিভিন্ন কাজের জন্য কি প্রকারে জলের হিসাব করা উচিত, নিম্নে তাহা দেওয়া হইল।

(১)	আবাসিক বিদ্যালয়	৭৫ গ্যালন, মানুষপ্রতি প্রতিদিনে।	
(২)	মহাবিদ্যালয় (College)	২৫	„ „ „
(৩)	হাসপাতাল	১০০	
(৪)	জেল	১০	
(৫)	কারখানা	৩০	প্রতিদিন কর্মচারী প্রতি
(৬)	বাজার	৫	প্রতিদিন প্রতি ১০০ বর্গফুটের জন্য
(৭)	হোটেল	১২৫	প্রতিদিন প্রতি ঘরের জন্য
(৮)	অফিস	২৫	প্রতিদিন কর্মচারী প্রতি

এইভাবে আপনার কাজের জন্য দৈনিক কি পরিমাণ জল লাগিবে, তাহা স্থির করিতে হইবে। দৈনিক কি পরিমাণ জল লাগিবে, তাহা স্থির হইয়া গেলে আপনাকে স্থির করিতে হইবে যে, যে নলকূপ আপনি বসাইবেন, তাহার উৎপাদন-ক্ষমতা ঘণ্টায় কত হওয়া উচিত। আপনি দৈনিক কত ঘণ্টা পাম্প চালাইবেন, ইহা আবার তাহার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ দৈনিক ১২ ঘণ্টা পাম্প চালান হইয়া থাকে এবং এই হিসাবেই নলকূপের উৎপাদন-ক্ষমতার হিসাব করা হইয়া থাকে। তবে কোন ক্ষেত্রেই ১৮ ঘণ্টার বেশী পাম্প চালান উচিত নহে; কারণ তাহাতে বৈদ্যুতিক ব্যয় বেশী হইবে ও অল্প দিনের মধ্যেই পাম্প খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে। সাধারণতঃ দৈনিক যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন, তাহার দ্বিগুণ দৈনিক উৎপাদন-ক্ষমতাসম্পন্ন নলকূপ আপনার বসান উচিত। আবার দৈনিক উৎপাদন-ক্ষমতাকে ২৪ ঘণ্টা দিয়া ভাগ করিলেই ঘণ্টায় উৎপাদন-ক্ষমতা পাইবেন।

ইহার পর আপনাকে হিসাব করিয়া বাহির করিতে হইবে যে, উক্ত জলের প্রয়োজনের জন্য আপনার কত ব্যাসের নলকূপের প্রয়োজন হইবে। নলকূপের ব্যাস আবার ঘণ্টায় কত গ্যালন জল পাম্প করিতে হইবে, তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। ইহা ছাড়া স্থানীয় ভূস্তরের উপরেও ইহা নির্ভর করে। পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে একটি সূত্র আবিষ্কার করা হইয়াছে তাহা হইতেছে—

$$\text{নকূলপের ব্যাস, ফুটে} = \sqrt{\frac{\text{প}}{১০০০}} \text{ ফুট}$$

যেখানে “প” হইতেছে প্রতি মিনিটে জল সরবরাহের পরিমাণ। নিম্নে একটি উদাহরণের দ্বারা বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইল—ধরুন, ৫০০ শত শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতালের জন্য একটি

নলকূপ বসাইতে হইবে। তাহা হইলে নলকূপের ব্যাস কত ইঞ্চি হইবে ?-

দৈনিক জল সরবরাহের পরিমাণ = ৫০ × ১০০০ গ্যালন = ৫০,০০০ গ্যালন হওয়া প্রয়োজন। পূর্বে ইহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। তাহা হইলে নলকূপের দৈনিক উৎপাদন-ক্ষমতার পরিমাণ ইহার দ্বিগুণ হইবে, অর্থাৎ ২ × ৫০,০০০ = ১,০০,০০০ গ্যালন। সুতরাং নলকূপের ব্যাস হইবে

$$= \sqrt{\frac{১,০০,০০০}{১০০০ \times ৬০ \times ২৪}} = ৩{\cdot}২১ \text{ ফুট};$$

অর্থাৎ নলকূপটির ব্যাস ৪ ইঞ্চি হইবে।

নলকূপের দৈনিক জল উৎপাদন-ক্ষমতার পরিমাণ কত হইলে কত ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপ বসাইতে হইবে, তাহার একটি তলিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১নং তালিকা

নলকূপের দৈনিক জল উৎপাদন-ক্ষমতার পরিমাণ	নলকূপের ব্যাস
৫০,০০০ গ্যালন অবধি	৩ ইঞ্চি
৫০,০০০ „ হইতে ১,০০,০০০ গ্যালন অবধি	৪ „
১,০০,০০০ „ „ ৩,০০,০০০ „ „	৬ „
৩,০০,০০০ „ „ ৫,০০,০০০ „ „	৮ „
৫,০০,০০০ „ „ ১২,০০,০০০ „ „	১০ „

পাম্প বসাইবার সুবিধার জন্য নলকূপের ব্যাস ভূমি হইতে ৬০ ফুট গভীর পর্যন্ত আরও ৪ ইঞ্চি পরিমাণ বাড়াইতে হইবে ; অর্থাৎ ৪ ইঞ্চি ব্যাসের নলকূপের জন্য জমি হইতে ৬০ ফুট গভীর পর্যন্ত নলকূপের ব্যাস করিতে হইবে—৪ ইঞ্চি + ৪ ইঞ্চি = ৮ ইঞ্চি। কারণ পাম্পের ক্ষমতাও নলকূপের প্রতি ঘণ্টায় উৎপাদন-ক্ষমতার সমান হইতে হইবে।

নলকূপের দৈনিক উৎপাদন-ক্ষমতা আবার নলকূপের ছাঁকুনীর দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। যত বেশী দৈর্ঘ্যের ছাঁকুনী নলকূপে লাগান সম্ভব হইবে, নলকূপের উৎপাদন-ক্ষমতা ততই বৃদ্ধি পাইবে। নলকূপের ছাঁকুনী সাধারণতঃ ১০০ গ্যালন প্রতি ঘণ্টায় প্রতি বর্গফুট ছাঁকুনী আয়তক্ষেত্র ধরিয়া নির্মাণ করা হইয়া থাকে। তাহা হইলে নলকূপের ছাঁকুনীর দৈর্ঘ্যের সূত্র হইবে—

$$দ = \frac{প}{২৪} \times \frac{১}{\pi \times ১০০ \times ব}$$

যেখানে, দ = নলকূপের ছাঁকুনীর দৈর্ঘ্য, ফুট হিসাবে।

প = নলকূপের দৈনিক উৎপাদন-ক্ষমতা, গ্যালন হিসাবে

ব = নলকূপের ব্যাস, ফুট হিসাবে।

π = পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত = ৩·১৪

নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া হইল :—

ধরুন, একটি নলকূপ নির্মাণ করিতে হইবে, যাহার দৈনিক উৎপাদন-ক্ষমতা হইবে ৩,০০,০০০ গ্যালন। তাহা হইলে ১নং তালিকা হইতে পাওয়া যায় যে, কলকূপের ব্যাস হওয়া উচিত ৬ ইঞ্চি।

$$\text{সুতরাং } দ = \frac{৩,০০,০০০}{২৪} \times \frac{১}{\pi \times ১০০ \times \frac{৬}{১২}}$$

= ৮০ ফুট বলা যাইতে পারে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যদি একটি ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ও ৮০ ফুট দৈর্ঘ্যের ছাঁকুনী দেওয়া যায়, তবে নলকূপটি দৈনিক ৩,০০,০০০ গ্যালন জল উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। পাম্প বসাইবার সুবিধার জন্য ভূমি হইতে ৬০ ফুট গভীর পর্যন্ত নলকূপের ব্যাস হইবে ৬ ইঞ্চি + ৪ ইঞ্চি — ১০ ইঞ্চি।

তবে ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যাইতে পারে যে, ৮০ ফুট দৈর্ঘ্যের ছাঁকুনী কোন বিশেষ ভূস্তরে বসাইবার উপায় নাই, কারণ জলবাহী বালুকাস্তরের গভীরতা ৮০ ফুটের কম। সে ক্ষেত্রে নলকূপের ব্যাস আরও বাড়াইয়া পুনরায় দৈর্ঘ্য গণনা করিয়া দেখিতে হইবে অথবা দৈর্ঘ্য ভূস্তরের গভীরতা অনুযায়ী স্থির করিয়া নবকূপের ব্যাস গণনা করিয়া দেখিতে হইবে।

ব্যাক্টিরিয়া

শ্রীরঘুনাথ দাস

পৃথিবীতে এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব আছে, যাদের আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, অথচ তারা সমগ্র জীবজগতে ছড়িয়ে আছে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষে তাদের অবাধ বিচরণ। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীদেহের তারা গোপন শত্রু—তাদের নিরন্তর আক্রমণের বিরুদ্ধে মানুষকে তাই অহরহ লড়তে হচ্ছে। এই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীগুলিকে আমরা বলি ব্যাক্টিরিয়া বা জীবাণু। গ্রীক শব্দ Micros (ক্ষুদ্র) থেকে এদের নামকরণ হয়েছে Microbes। যে যন্ত্রের সাহায্যে এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, তার নাম তাই Microscope। এই সব জীবাণুর বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। দেহগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এইরূপ এক ধরণের লম্বা জীবাণুর নাম ব্যাক্টিরিয়া (গ্রীক শব্দ Bactron অর্থে লম্বা)

ব্যাক্টিরিয়া সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা বেশী দিনের নয়—মাত্র গত শতাব্দীতে এদের অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান অবশ্য এই সব বিষয়ে তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ। কিন্তু প্রায় দু-হাজার বছর আগেও মানুষের ধারণা ছিল যে, জলা জায়গায় একপ্রকার প্রাণী নিশ্চয়ই আছে, যারা অদৃশ্যভাবে মানুষের ক্ষতি করে থাকে। এই প্রাণীগুলি শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে জীবদেহে প্রবেশ করে' নানারকম ব্যাধির সৃষ্টি করে। কিন্তু এই ধারণা কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি, কারণ এগুলি এত ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে দেখা সম্ভব নয় এবং মাইক্রোস্কোপ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র তখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

প্রায় ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে একজন চশমা-নির্মাতা একখণ্ড পুরু লেন্সের মধ্য দিয়ে দেখবার সময় কতকটা আকস্মিকভাবেই জলের মধ্যে কতকগুলি চলন্ত জীবদেহের সন্ধান পান। এই সংবাদ বৈজ্ঞানিক মহলে পৌঁছাবার পর নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে তাঁরা এই চলন্ত প্রাণীদের কতকগুলি রেখাচিত্র অঙ্কন করেন। আধুনিক যুগের ফটোগ্রাফির সাহায্যে যে সব ছবি নেওয়া হয়েছে, তাদের সঙ্গে সেই যুগের জীবাণুগুলির ছবির হুবহু মিল পাওয়া গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই সব আবিষ্কার তখন মানুষের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তাই এই সম্বন্ধে গভীরতর আলোচনা বা গবেষণা তখন সম্ভব

হয় নি। এই ভাবে প্রায় দু-শ' বছর কেটে গেল।

বিগত শতাব্দীতে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ব্যাক্টিরিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং তিনি কতকগুলি বস্তুর উপর এগুলির বৃদ্ধি লক্ষ্য করেন। এই সব জীবাণু ধুলিকণার সঙ্গে লেগে থাকে এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা এগুলিকে অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ বলে মনে করতেন। কিন্তু ব্যাক্টিরিয়া সম্বন্ধে মানুষের ধারণা তখনও সুস্পষ্ট হয় নি। তাঁরা মনে করতেন—এই সব জীবাণু ব্যাধির ফলস্বরূপ, অর্থাৎ কোন প্রাণীদেহে পচন বা রোগ সংক্রমণ হলে এই জীবাণুর জন্ম হয়। যখন বিখ্যাত বিজ্ঞানী রবার্ট কক্ প্রকাশ করলেন যে, যে-কোন রোগসৃষ্টি বা পচনের মূল কারণ এই জীবাণু, তখন এই ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয় এবং পূর্ববর্তী ধারণাকে বদ্‌লে দিয়ে তিনি বললেন—রোগসৃষ্টির কারণ এই জীবাণু, অর্থাৎ প্রাণীদেহে এগুলি আগে বাসা বাঁধে, তারপর ধীরে ধীরে একে রোগাক্রান্ত করে। এসম্বন্ধে আধুনিক মতও এই। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানীমহলে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং এর উপর ভিত্তি করেই আধুনিক জীবাণু-বিজ্ঞান রচিত হয়েছে

কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, এক একটা ধুলিকণার গায়ে বিভিন্ন ধরণের জীবাণু লেগে থাকে। তাই কোন একটা বিশেষ ধরণের জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করা খুবই কঠিন। কক্ এই অসুবিধা দূর করেন এক অভিনব উপায়ে। তিনি বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার করে পরীক্ষা করে দেখলেন যাতে এক একটা বিশেষ ধরণের জীবাণু সেই সেই পদার্থে জমা হয়। যেমন—আলুতে যে জীবাণু জমা হয়, জিলাটিনে সে ধরণের জীবাণু জমা হয় না। আবার জিলাটিনে যে জীবাণু জমা হয়, মাংসে সেগুলি দেখা যায় না। এই-ভাবে তিনি বিভিন্ন রকমের জীবাণু আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করে বিভিন্ন রোগের কারণ নির্ণয় করেন।

ব্যাক্টিরিয়া আবিষ্কারের কয়েক বছরের মধ্যেই মানুষ এবিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করেছে এবং একে কেন্দ্র করেই বিজ্ঞানের আর একটা নতুন শাখা গড়ে উঠেছে। এর নাম জীবাণু-বিজ্ঞান (Bacteriology)। ব্যাক্টিরিয়া আজকাল কেবল মাত্র অসুখের কারণ নির্ধারণের ব্যাপারেই ব্যবহৃত হয় না, রোগ প্রতিষেধক হিসাবেও এর দান কম নয়। তাছাড়া মানুষ একে কাজে লাগিয়ে তার দৈনন্দিন জীবনের অনেক প্রয়োজনও মিটিয়ে থাকে; যেমন—চামড়া পাকানো (Tanning), তামাক সংরক্ষণ এবং মাখন, ভিনিগার ইত্যাদি তৈরি করবার জন্যে আজকাল ব্যাক্টিরিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তবে কয়েক রকমের ব্যাক্টিরিয়ার প্রভাব জীবজগতে খুবই ক্ষতিকর। অধিকাংশ রোগের মূলীভূত কারণ এই সব ব্যাক্টিরিয়া। শরীরের কোন স্থান কেটে গেলে বা পুড়ে গেলে ধুলাবালি প্রভৃতির সঙ্গে এগুলি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে ক্ষতস্থান বিষাক্ত করে তোলে। তাই ক্ষতস্থান সব সময় পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ করে রাখা দরকার, যাতে সে স্থান কোন রকমে ধুলাবালি বা বাতাসের সংস্পর্শে না আসে।

ব্যাক্টিরিয়ার জন্ম সাধারণতঃ মাটিতে। মাটি থেকেই এর উৎপত্তি। সূর্যতাপ বা অন্য কোন কারণে মাটি যখন সূক্ষ্ম ধুলায় পরিণত হয়, তখন সেগুলি বাতাসে ভেসে বেড়ায়। শ্বাসগ্রহণের সময় সেগুলি বায়ুবাহিত হয়ে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং ক্রমে তাকে সংক্রামিত করে। তাহলে স্বভাবতঃই মনে হতে পারে, তবে কি সমগ্র বায়ুমণ্ডলই দূষিত? না তা নয়। তার কারণ, বাতাসের জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এই জীবাণুযুক্ত ধুলিকণাগুলি ভারী হয়ে যায় এবং তার ফলে পুনরায় মাটিতে নেমে আসে। এভাবে বায়ুমণ্ডল জীবাণু-

মুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বাড়ীঘর ইত্যাদি ঝাঁট দেবার সময় বা বাতাসের ঝাপ্‌টায় ধূলিকণাগুলি পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। তাই সেই স্থানের বায়ুমণ্ডল আবার দূষিত হয়ে ওঠে। এজন্যেই বড় বড় সহরে আজকাল উন্নততর পদ্ধতিতে পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ঝাঁটার পরিবর্তে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার (Vacuum cleaner) অথবা শোষক যন্ত্র (Absorbent mops) ব্যবহার করা হচ্ছে।

ফলমূল বা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ব্যাপারে সর্বাগ্রে ব্যাক্টিরিয়া নিধন করা দরকার। ব্যাক্টিরিয়াই খাদ্যদ্রব্য পচনের জন্যে দায়ী। বাতাসের সংস্পর্শে খাদ্যদ্রব্যাদির উপর একপ্রকার সূক্ষ্ম ছত্রাক আবরণ বা ছাতা জন্মায়। এগুলিই ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে ফেলে। দুধ, মাখন, মাছ, মাংস এবং সর্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও ফল-মূল পচে যাওয়া ও নষ্ট হওয়ার মূল কারণ এই জীবাণু বা ব্যাক্টিরিয়া।

দুগ্ধ দোহনের সময় তাতে ব্যাক্টিরিয়া প্রায় থাকে না বললেই চলে। কিন্তু দোহনের পরে বাতাস এবং পাত্র প্রভৃতি নানা জায়গা থেকে ব্যাক্টিরিয়া এতে জমা হয়। অধিকন্তু দুধ পুষ্টিকর খাদ্য বলে ব্যাক্টিরিয়াগুলি এতে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দুধ তাড়াতাড়ি টকে যায়। ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা প্রাথমিক অবস্থায় যত বেশী হয়, তত তাড়াতাড়ি দুধ নষ্ট হয়ে যায়। ঠাণ্ডা দুধের চেয়ে গরম দুধ শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায়। তার কারণ ঐ একই। দুধ সংরক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি হলো—দুধকে সর্বপ্রকারে ব্যাক্টিরিয়া মুক্ত-করা। দুধ ফুটিয়ে নিলে বেশীর ভাগ ব্যাক্টিরিয়াই মরে যায়। তাই ফুটন্ত দুধই স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণে দুধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নষ্ট হয়ে যায় বলে একে ১৪০°—১৬০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখা হয়। এই পদ্ধতিতে দুধ সংরক্ষণ করবার নাম পাস্তুরীকরণ (Pasteurization); কারণ পাস্তুরকেই জীবাণু-বিজ্ঞানের জনক বলা যায়। এই উষ্ণতায় দুধ ব্যাক্টিরিয়া মুক্ত হয় এবং স্বাদও অক্ষুণ্ণ থাকে।

আগেই বলা হয়েছে যে, জীবজগতে ব্যাক্টিরিয়ার প্রভাব অপরিসীম এবং উপরের দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যাবে যে, এগুলি প্রাণীদেহের প্রধান শত্রু এবং মানুষ সর্বদাই এদের এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মানুষ আবার ব্যাক্টিরিয়াকে আপন কাজে নিয়োজিত করেছে। গাছপালা পচিয়ে সার তৈরি করবার অর্থই হলো—জমিকে ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা সমৃদ্ধ করা। উর্বর জমির মাটিতে লক্ষ লক্ষ ব্যাক্টিরিয়া বাঁসা বেঁধে থাকে। এগুলি উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মটর, শিম, বরবটি প্রভৃতি উদ্ভিদের শিকড়ে একরকম ব্যাক্টিরিয়া জন্মায়, যেগুলি উদ্ভিদকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন যোগায় এবং উদ্ভিদের পরিত্যক্ত জিনিষগুলি গ্রহণ করে নিজেরা বেঁচে থাকে। কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়া অন্য ভাবেও মনুষ্যসমাজের কল্যাণ সাধন করে থাকে। বড় বড় সহরের ময়লা, আবর্জনা, গাছ-পালা প্রভৃতিকে মাটিতে পরিণত করে একদিকে যেমন নাইট্রোজেনঘটিত সারের যোগান দিচ্ছে, অন্য দিকে তেমনি আবার কতকগুলি ব্যাধির হাত থেকে মনুষ্যসমাজকে রক্ষা করে চলেছে। মানুষের সমাজ-জীবনের পক্ষে ব্যাক্টিরিয়ার প্রয়োজনীয়তা তাই আজ সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। যদিও মানুষ আজ অনেক কিছু বিষয়ে জ্ঞান আহরণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তথাপি অনেক কিছু সম্বন্ধে এখনও আলোকপাত করা সম্ভব হয় নি। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ একে কাজে লাগিয়ে সমাজ উন্নয়নের পথ অধিকতর সুগম করে তুলবে।

ইটের কাজ

শ্রীফাল্গুনি মুখোপাধ্যায়

ঘরবাড়ী তৈরির জন্যেই প্রধানতঃ ইটের প্রয়োজন। অবশ্য একটিমাত্র ইটের সাহায্যেই কোন কিছু কাজ করা সম্ভব নয়, অথচ একের পর এক ইট সাজিয়ে আমরা অনায়াসেই বড় বড় ইমারৎ গড়ে তুলতে পারি। সুতরাং ইট সাজাবার পদ্ধতি সম্পর্কেই এস্থলে আলোচনা করবো।

এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই শৃঙ্খলিত ইটের (Brick Bond) কথা এসে পড়ে। শৃঙ্খলিত ইট বলতে আমরা বুঝি—ইট সাজাবার পদ্ধতি, যার ফলে ইটগুলি পরস্পর আবদ্ধ থাকে এবং কঠিন পদার্থে পরিণতি লাভ করে সংসক্তি বজায় রাখে। অপর দিকে ইটগুলি যদি অনিয়মিত এবং অসতর্কভাবে সাজানো হয়, তাহলে দেয়ালের সংসক্তি থাকে না এবং ভার চাপালে দেয়াল তা বহনে সক্ষম হয় না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে, যে পদ্ধতিতে অধিক সংখ্যক 'স্ট্রেচার' ব্যবহৃত হয় সে সব ক্ষেত্রে দেয়াল লম্বালম্বিভাবে বেশী শক্ত হয়, আর যে ক্ষেত্রে বেশী করে 'হেডার' ব্যবহৃত হয়, সে সব কাজ অধিকতর তির্যক শক্তি লাভ করে।

ইট সাজাবার যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

একমাত্র ভালভাবে পোড়ানো সুষম আকৃতি-বিশিষ্ট এবং নির্ধারিত মানের মাটিতে প্রস্তুত ইট ব্যবহার করা দরকার। ইট সাজাবার জন্যে প্রয়োজন ভিন্ন প্রচলিত মাপের চেয়ে ছোট ইট ব্যবহার করা চলবে না। ব্যবহার করবার আগে ইট জলে ভিজিয়ে নিতে হবে। জল থেকে যখন বুদ্বুদ ওঠা বন্ধ হবে, তখনই বুঝতে হবে যে, ইটকে আর জলে ভিজিয়ে রাখবার প্রয়োজন নেই।

শৃংখলিত ইটের প্রয়োজনীতা

১নং চিত্র

আমরা প্রধানতঃ ইট সাজাবার যে সব পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত, সে প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে ইংলিশ বণ্ডের কথা। এই পদ্ধতিতে কাজ সুরু হয় 'হেডার' দিয়ে। এরপর দিতে হবে ১০"×২২"×৩" মাপের একখানা 'ক্লোজার' বা আধলা ইট। তারপর এই একই সারিতে পর পর হেডার দিতে হবে আর ঠিক উপরের সারিতে পর পর স্ট্রেচার সাজিয়ে যেতে হবে। এভাবে ৫" পুরু দেয়ালের গাঁথুনিতে যখন শুধুমাত্র স্ট্রেচার ব্যবহৃত হয়,

তখন এর নাম হয় 'স্ট্রেচিং বণ্ড', আর বক্র-অংশে যেখানে শুধুমাত্র হেডার ব্যবহৃত হয়, তখন এর নাম হয় 'হেডিং বণ্ড'।

এই প্রসঙ্গে একটা জিনিষ লক্ষণীয় এই যে, ১০", ২০" বা ৩০" ইঞ্চি পুরু দেয়ালের সামনে হেডার থাকলে পিছনেও হেডার থাকবে, স্ট্রেচার থাকলে পিছনেও স্ট্রেচার থাকবে। অপর পক্ষে, ১৫", ২৫" বা ৩৫" ইঞ্চি পুরু দেয়ালের সামনে হেডার বা স্ট্রেচার থাকলে পিছনে ঠিক এর উল্টোটা দেখা যাবে। খুব পুরু দেয়ালের মাঝখানে স্ট্রেচারের সংখ্যা কমিয়ে বেশী হেডার ব্যবহার করে উল্লম্ব গ্রন্থির (Vertical joint) সৃষ্টি রোধ করা হয়। এর ফলে দেয়ালের শক্তি লম্বালম্বিভাবে হ্রাস পায় এবং কৌণিকভাবে ইট সাজিয়ে এই দুর্বলতা রোধ করা হয়।

(ক) ২০" পুরু ইংলিশ এবং (খ) ২০" পুরু ফ্লেমিশ বণ্ড

২নং চিত্র

এরপরে আসে 'ফ্লেমিশ বণ্ড'-এর কথা। ফ্লেণ্ডার্সরাই প্রথমে এই পদ্ধতির প্রচলন করে। তাই এই পদ্ধতির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। ফ্লেমিশ বণ্ডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

এই পদ্ধতিতে একই সারিতে পর পর হেডার এবং স্ট্রেচার সাজানো হয়ে থাকে। প্রত্যেক দ্বিতীয় সারির প্রথমে থাকে হেডার এবং তারপরই ইংলিশ বণ্ড-এর মত একখানা ক্লোজার বা আধলা ইট ব্যবহৃত হয়। আধলার পর থাকবে একখানা স্ট্রেচার এবং তার পর পর হেডার ও স্ট্রেচার সাজিয়ে যেতে হবে।

এই পদ্ধতিতে কাজ করলে দেয়ালের ভিতরের অংশে উল্লম্ব গ্রন্থির সৃষ্টি হয়, খুব বেশী শক্ত হয় না এই পদ্ধতি ভারতে খুব প্রচলিত নয়। বৃটেন এবং ইউরোপের অনেকাংশে তীক্ষ্ণাগ্র বহির্ভাগ নির্মাণে এই পদ্ধতি বহুলভাবে প্রচলিত।

সাধারণতঃ এটা দাবী করা হয়ে থাকে যে, ইংলিশ বণ্ডের বদলে ফ্লেমিশ বণ্ডের পদ্ধতিতে কাজ করলে দেয়াল অধিকতর সুন্দর দেখায়। তাই প্রধানতঃ সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করে পুরু দেয়ালের সামনে থাকে ফ্লেমিশ বণ্ডের গাঁথুনি আর ভিতরের অংশে ইংলিশ বণ্ড পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে দেয়ালকে শক্ত করা হয়।

দেয়ালের মাত্র একদিকে ফ্লেমিশ বণ্ড ব্যবহার করলে এর নাম হয় সরল ফ্লেমিশ বণ্ড, আর দুদিকেই এই পদ্ধতিতে কাজ করলে তাকে আমরা বলি জোড়া ফ্লেমিশ বণ্ড।

এছাড়াও আছে 'গার্ডেন বণ্ড' নামে আর এক রকমের ইট সাজাবার পদ্ধতি। আজকাল এর ব্যবহার আদৌ নেই বললেই চলে—অথচ পূর্বে এককালে প্রচলিত ছিল। আগে বাড়ীর দেয়াল এবং বাগানের চারদিক ঘেরবার জন্যে এই পদ্ধতি খুবই কাজে লাগানো হতো। তাই এর নাম হয়েছে গার্ডেন বণ্ড। আসলে গার্ডেন

বণ্ড ইংলিশ বা ফ্লেমিশ বণ্ডের একটু রকমফের মাত্র। ইংলিশ গার্ডেন বণ্ডে পর পর কয়েকটি স্ট্রেচার সারির পরে একটি করে হেডারের সারি ব্যবহার করা হয়, আর ফ্লেমিশ গার্ডেন বণ্ডে একই সারিতে পর পর তিনটি স্ট্রেচারের পর একটি করে হেডার ব্যবহৃত হয়।

৪৫° ডিগ্রি কোণ করে ইট না সাজিয়ে মাঝখানে আবার বিপরীত দিক থেকে ৪৫° ডিগ্রি কোণ করে হেলানো হয়। গাঁথুনিটা দেখতে হয় হেরিং মাছের কঙ্কালের মত, তাই এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে 'হেরিং-বোন বণ্ড'।

এছাড়া আরও কতকগুলি পদ্ধতি আছে,

(ক) ইংলিশ গারডেন বণ্ড এবং (খ) ফ্লেমিশ গারডেন বণ্ড
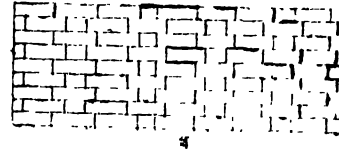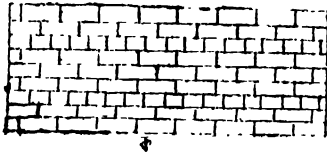
৩নং চিত্র

তারপর আসে 'র‍্যাকিং বণ্ড'-এর কথা। এই পদ্ধতিতে ইটগুলি হেলানো থাকে। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, খুব পুরু দেয়ালের মাঝখানের ইটগুলি সোজাসুজিভাবে সাজানো হয় না—কৌণিকভাবে সাজানো হয়। কারণ এতে দেয়াল অধিকতর শক্ত হয়। এটা প্রধানতঃ দু-ভাবে করা হয়ে থাকে—'ডায়গোন্যাল বণ্ড' এবং

যা প্রধানতঃ ইংলিশ বণ্ড বা ফ্লেমিশ বণ্ডের অনুসরণে গঠিত। তাই আর পৃথক আলোচনা বাহুল্য।

সর্বশেষে একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, আধুনিক স্থাপত্য শিল্পে ইটের স্থান ধীরে ধীরে কমে আসছে। আর এর পরিবর্তে রিইনফোর্স্‌ড কংক্রীট, অ্যালুমিনিয়াম, দীর্ঘস্থায়ী স্বচ্ছ কাচ ইটের স্থান দখল করে নিচ্ছে। এমন

"ডায়াগোনাল বণ্ড"

"হেরিং বোন বণ্ড"
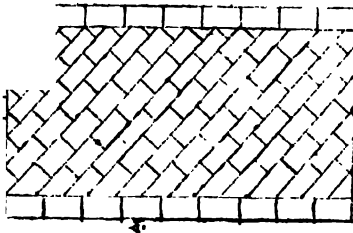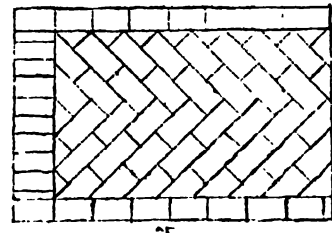
৪নং চিত্র

'হেরিং-বোন্ বণ্ড' পদ্ধতিতে। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে পর পর কয়েক সারি ইট সাধারণভাবে সাজাবার পর এক সারি ৪৫° ডিগ্রি কোণ করে সাজানো হয়। আবার কোন কোন সময় সম্পূর্ণ অংশে

দিন হয়তো আসবে, যখন ঘর-বাড়ীর প্রত্যেকটি অংশ কারখানায় ব্যাপক হারে উৎপাদিত হবে, আর আমরা আমাদের প্রয়োজনমত এনে কাজে লাগাতে পারবো।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর

শ্রীমহাদেব দত্ত

'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি'। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা চলে সমস্ত জীবন। তবে সাধারণ-ভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কাছে যা শেখা হয়, তাকে শিক্ষা হিসাবে উল্লেখ করা হয়। উদ্দেশ্যের দিক থেকে, বাবস্থাপনার সুবিধার দিক থেকে এই 'শিক্ষাকে' বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়। প্রধানতঃ প্রাথমিক বা বুনিয়াদী, মাধ্যমিক বা বৃত্তিমূলক, বিশ্ববিদ্যালয়ী উচ্চ কারিগরী শিক্ষার বিভিন্ন স্তর। এছাড়াও নানা দেশে সমাজের প্রয়োজনে প্রাক্ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার কোন কোন দেশে তিনটি ভাগ আছে, যথা—স্নাতক শিক্ষা, স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা। বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষাকে সাধারণতঃ উচ্চ শিক্ষারূপে উল্লেখ করা হয়।

এদেশে ও অন্যান্য দেশে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। এই শিক্ষা সাধারণতঃ তিন বছর (৩+) থেকে ছয় বছরের শিশুদের জন্যে। সাধারণতঃ বিত্তশালী পরিবারের মাতা-পিতা দুজনকেই অর্থোপার্জনের জন্যে দিনের বেশীর ভাগ সময় বাইরে কাটাতে হয়, সে সব পরিবারের শিশুদের জন্যে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। এখানে শিশুরা নিজেদের দৈনন্দিন ছোট ছোট কাজগুলি নিজেরাই করতে পারে, আর ছোট ছোট গোষ্ঠীজীবনে বাস করতে শিক্ষা পায়। নানারকম খেলনা ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে খেলার মধ্য দিয়ে তার শারীরিক ও মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়। এখানে শিশুকে আক্ষরিক করবার চেষ্টা না থাকা বাঞ্ছনীয়। নানা কারণে যে সব শিশুরা দিনের বেশীর ভাগ সময়ই মাতাপিতা বা স্নেহশীল আত্মীয়স্বজনের সাহচর্য পায় না, তাদের এরূপ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠাবার সার্থকতা আছে। অন্য ক্ষেত্রে শিশু যাতে বাড়ীতেই এই সকল শিক্ষা পায়, সে দিকে যত্নশীল হওয়া উচিত। বর্তমানে আমাদের দেশে শিশুকে একটি সাহেবী ধরণের নার্শারী স্কুলে পাঠাবার বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। এটা আভিজাত্যের অত্যাবশ্যক অঙ্গ মনে করা হয়। শিশু কিছু ইংরেজি চালচলন, কিছু ইংরেজি কথাবার্তা বা ছড়া শিখলেই পিতামাতারা বিশেষ আত্মপ্রসাদ পান। যে সকল পরিবারের চালচলন সাহেবী ধরণের নয়, বাড়ীতে ইংরেজিতে কথাবার্তা হয় না, সে সকল পরিবারের শিশুদের মনে বাড়ী ও স্কুলের বিরোধী পরিবেশ এক সংঘাত ও বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। এই সকল স্কুলে শিশুরা ইউরোপীয় বুক্‌নী ও পোষাকে অভ্যস্ত হয়, কিন্তু ওদেশের সৌজন্য, সামা-জিকতা শেখে না; আর এদেশের সৌজন্য ও সামাজিকতার সঙ্গে পরিচয়ই হয় না। আবার আমাদের দেশের অনেক পিতামাতা (অর্থনৈতিক কারণে) চান, এ-সময়েই শিশুরা আক্ষরিক হয়ে উঠুক। সাধারণভাবে এই চেষ্টা মঙ্গলজনক নয়। মনে রাখা উচিত, শিশুর মন কাদার তাল নয়, যে ভাবে ইচ্ছা যে কোন সময় মনোমত রূপ দেওয়া যাবে! বাড়ীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাতৃভাষায় সব শিক্ষা হওয়া সর্বাধিক মঙ্গলজনক।

প্রাথমিক বা বুনিয়াদী শিক্ষায় ছাত্রসমাজে সাধারণভাবে বাঁচতে হলে যা যা জানা প্রয়োজন, তাই শিক্ষার লক্ষ্য। বিভিন্ন দেশে এই

স্তরের শিক্ষাকাল আট বছর। সাধারণতঃ ছয় শোনা যায়, বর্তমানে রাশিয়ায় আট বছর থেকে এই শিক্ষা সুরু হবার কথা। নেতাজী সংগঠিত জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ পণ্ডিতজীর সভাপতিত্বে আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। আমাদের জাতীয় লক্ষ্যও অনুরূপ। তবে বর্তমানে চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। এই স্তরের শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা সর্বজনস্বীকৃত। এই স্তরে বিজ্ঞান-শিক্ষার গুরুত্ব যথেষ্ট।

উন্নত দেশে প্রাথমিক শিক্ষার পর যারা উচ্চ শিক্ষা বা উচ্চ কারিগরী শিক্ষা লাভ করতে বা শিক্ষকতা করতে ইচ্ছুক, তারা মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণ করে, অন্যেরা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে। এই স্তরের শিক্ষার কাল তিন বা চার বছর। মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ সাধারণ বা কারিগরী শিক্ষার সেতু। সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে ছাত্রকে ধীরে ধীরে কলা, দর্শন ও বিশেষ শিক্ষার জন্যে প্রস্তুত করা হয়। আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী তিনটির উদ্দেশ্যও এই। তবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ও সামাজিক মর্যাদা না থাকায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্ভব নয়। আরও নানাবিধ ত্রুটি আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষায় রয়ে গেছে। এই স্তরের শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা আজ স্বীকৃত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্ স্নাতক শিক্ষার লক্ষ্য ভবিষ্যৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা বা উচ্চ শিক্ষার জন্যে ছাত্রকে প্রস্তুত করা। বহু উন্নত দেশে শিক্ষক-শিক্ষণের পৃথক ব্যবস্থা এখানেই করা হয় এবং সে জন্যে উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতির ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠুভাবে সম্ভব হয়েছে। আর যারা কারিগরী শিক্ষালাভে ইচ্ছুক, তাদের জন্যে কারিগরী প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ থাকে। এই স্তরে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণায় ছাত্র যে বিশেষ বিষয় নির্বাচন করতে ইচ্ছুক, সেই বিষয় ও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকে। এই স্তরের শিক্ষাকাল সাধারণতঃ তিন বছর। শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়াই কাম্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরে বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতি বিশেষভাবে শিক্ষা দিবার জন্যে বিভিন্ন বিভাগ থাকে। এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য (প্রধানতঃ) প্রাক্ স্নাতক স্তরের শিক্ষকতা ও গবেষণার প্রস্তুতি। এর কাল সাধারণতঃ দু-বছর। অবশ্য ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা কাল মোট পাঁচ বছর, কোন ভাগ নেই। এই স্তরের মাধ্যমও মাতৃভাষা হওয়া উচিত। অবশ্য এই বিষয়ে অনেক শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রবন্ধান্তরে এই বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

গবেষণায় বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতির যে কোন একটির বিশেষ শাখা বেছে নিয়ে তার কোন কোন সমস্যা সমাধানে সমস্ত শক্তি ও সময় নিয়োগ করা হয়। অবশ্য প্রয়োজনমত সংশ্লিষ্ট বিষয় পড়ে নিতে হয়। স্নাতকোত্তর স্তরের প্রত্যেক শিক্ষকেরই কিছু কিছু গবেষণা করা উচিত। কারণ তা না হলে আধুনিক ধারার সঙ্গে সম্যক পরিচয় হয় না; আর নিজের গবেষণার অভিজ্ঞতা না থাকলে গবেষণার জন্যে ছাত্রদের প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। অপর দিকে প্রত্যেক গবেষকের অন্ততঃ আংশিকভাবে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত থাকা উচিত, নইলে নিজের গবেষণার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকলেও সাধারণতঃ জ্ঞানের বিস্তৃতি কমে যায়।

পরলোকে প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী

গত ১০ই জানুয়ারী তাসখন্দে রাত্রি ১টা ৩২ মিনিটের সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। স্থানীয় সময় ৩টায় ভারতীয় সময় আড়াইটা, মঙ্গলবার) তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ সরকারীভাবে সমর্থন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬১ বৎসর। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাস হইতে তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

'মাতৃভূমি হইতে বহুদূরে প্রায় অর্ধশত কোটি মানুষের নেতা চিরবিদায় লইয়া গেলেন। এই নিদারুণ শোকে জাতি আজ মুহ্যমান। নূতন বৎসরের সূচনায় শাস্ত্রীজী তাসখন্দে যাত্রা করিয়াছিলেন। সে দিন কে জানিত, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আর আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন না! সোমবার (১০ই জানুয়ারী) বিকালে তিনি যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর সঙ্গে যৌথ ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর করিতেছিলেন, তখন কে জানিত যে, দুই দেশের প্রায় ৬০ কোটি মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এই হইবে তাঁহার শেষ প্রয়াস! আমাদের শোকের আরও কারণ এই যে, যিনি নিজের জীবনের শেষ কয়েকটি দিন শান্তির জন্য নিবেদন করিয়া গেলেন, নূতন দিন দেখিবার জন্য তিনি আর আমাদের মধ্যে রহিলেন না। বিদেশে শীতার্ত রাত্রির মধ্যপ্রহরের অন্ধকারে তিনি একাকী চলিয়া গেলেন, আর আমাদের জন্য রাখিয়া গেলেন উজ্জ্বল নূতন প্রভাত। মনে হয়, যেন তাঁহার প্রারব্ধ কর্মের সার্থক সমাপ্তির জন্যই তিনি এই পর্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছিলেন এবং সেই কর্ম সমাপ্তির পর জীবনের গৌরবময় শিখর হইতে বিদায় লইয়া গেলেন। আমাদের দুঃখ এই যে, এই কৃতিত্বের জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের মধ্যে অভিনন্দন জানাইতে পারিলাম না। দুই দেশের মধ্যে শান্তি ও সৌহৃদ্যের যে নূতন আশা জাগ্রত হইয়াছে, সেই আশাকে তিনি রূপায়িত হইতে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। দেড় বৎসর পূর্বে এক পরম দুর্যোগের মুহূর্তে জাতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাইয়াছিল, দেশে-বিদেশে অনেকেই তখন এই অপেক্ষাকৃত অপরিচিত মানুষটির নির্বাচনে বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন—জাতি উপযুক্ত পাত্রেই আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। নেহরুর যাদুময় নেতৃত্বের দিনগুলির অবসানের পর শাস্ত্রীজী ভারতের ইতিহাসে মৃদু অথচ দৃঢ় নেতৃত্বের নূতন যুগের পত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই উত্তরাধিকার পরবর্তী কালের জন্য পাথেয় হইয়া রহিল। ভারতের সংহতি এবং সার্বভৌমত্ব পরিপূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে—ইহাই ছিল শাস্ত্রীজীর বাণী।

দেশের চরম বিপদের দিনে শাস্ত্রীজী দেশকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন'। আজ সেই মহান নেতার আকস্মিক তিরোধানে আমরা শোকাভিভূত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

লালবাহাদুর শাস্ত্রী

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

করে দেখ

টিনের চোঙের প্ল্যানেটেরিয়াম

ঘরের দেয়াল বা সিলিং-এর উপর আলোকপাত করে প্ল্যানেটেরিয়ামের মত অতি সুন্দরভাবে নক্ষত্রমণ্ডলের ছবি দেখানো যেতে পারে। খুব সহজেই এই ব্যবস্থা করা যায়।

রাতের আকাশে তোমরা হয়তো কালপুরুষ, সপ্তর্ষি প্রভৃতি নানারকম নক্ষত্রমণ্ডল দেখে থাকবে। এই সব নক্ষত্রমণ্ডলের ছবি অনেক বইতে দেখতে পাবে। তাথেকে যে কোন একটা নক্ষত্রমণ্ডলের ছবি পাত্‌লা কাগজে কপি করে নাও। এবার কার্ডবোর্ড বা টিনের তৈরি একটা মগ যোগাড় কর। মগের তলার দিকটায় ঐ ছবি আঁকা কাগজখানা উল্টো করে লাগিয়ে দাও। কাগজখানা উল্টো করে লাগালেও আঁকা

চিহ্নগুলি পরিষ্কার দেখা যাবে। তারপর পাঞ্চের সাহায্যে প্রত্যেকটি তারকা-চিহ্নের দাগে দাগে গর্ত করে দাও। আলোকপাত করলে এই গর্তগুলিই দর্পণে প্রতিফলিত চিত্রের মত দেয়ালের গায়ে নক্ষত্রমণ্ডলের সজ্জার আলোক-চিহ্ন ফুটিয়ে তুলবে।

এবার ছিদ্র-করা টিনের মগটিকে অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে তার খোলা মুখের ভিতর দিয়ে একটি টর্চ জ্বালিয়ে দাও। টর্চটাকে একটু হেলানোভাবে ধরতে হবে, যাতে আলোকরশ্মি গর্তগুলির ঠিক বরাবর না পড়ে' চোঙের ভিতরের
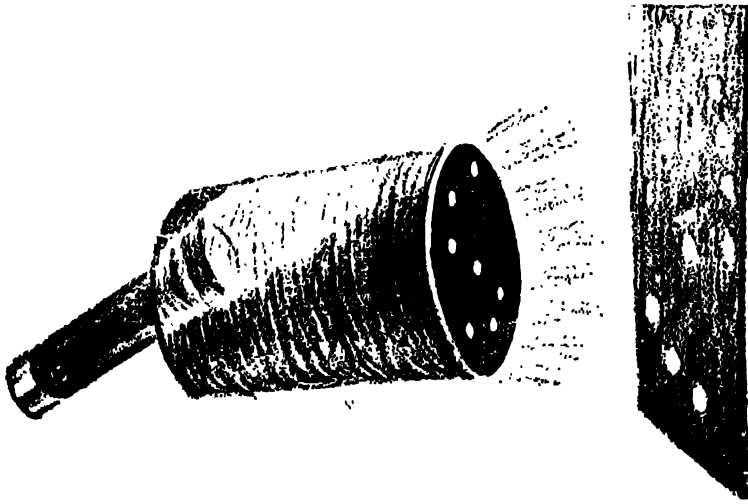
দেয়ালের গায়ে পড়ে। এর ফলে গর্তের ভিতর দিয়ে নক্ষত্রমণ্ডলের পরিবর্ধিত চিত্র ঠিক স্বাভাবিক ছবির মতই দেয়ালের গায়ে পড়বে। চোঙটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন অবস্থানে নক্ষত্রমণ্ডলটিকে কিরূপ দেখায়, তা সহজেই বুঝতে পারবে।

—গ—

চাঁদের কথা

আকাশে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা প্রভৃতি অনেক কিছুই আছে, কিন্তু এদের মধ্যে সৌরজগতের বাসিন্দা হচ্ছে শুধু গ্রহ আর উপগ্রহ। উপগ্রহগুলি হচ্ছে গ্রহগুলির চাঁদ। আমাদের পৃথিবীর আছে একটিমাত্র চাঁদ এবং সেটিই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। এই চাঁদটি সর্বদাই পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে; পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে তার যাবার যো নেই। তাই সে আমাদের পৃথিবীর চাঁদ। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকে, আর চাঁদ প্রদক্ষিণ করছে পৃথিবীকে।

চাঁদ আমাদের প্রতিবেশী হবার ফলে আমরা চাঁদের সংবাদই সবচেয়ে বেশী জানি। আমরা জানি, আমাদের চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই—তাতে বাতাস বা জল কিছুই নেই। অক্সিজেন নেই, কাজেই জীবন অর্থাৎ জীবজন্তু, গাছপালা কিছুই নেই—আছে শুধু মাটি আর পাথর। সূর্যের আলোয় সে আলোকিত হয়ে থাকে

বিজ্ঞানীরা চাঁদকে যতদূর সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁরা এর মানচিত্র এঁকেছেন, এর পাহাড়-পর্বত, খানাখন্দের নাম দিয়েছেন। নীচু জায়গাগুলি হচ্ছে চাঁদের সাগর—যদিও সে সব সাগরে জল বলে কিছুই নেই। চাঁদে আর একটি বস্তু আছে, সেটি হলো বৃত্তাকার পর্বতশ্রেণী। একটি বৃত্তরেখা ধরে ছোট-বড় পাহাড় আর মাঝখানটিতে আর একটি ছোট পাহাড় যেন তার কেন্দ্রবিন্দু। এই বৃত্তাকার পর্বতশ্রেণীর সৃষ্টি চাঁদে কি করে হয়েছিল, বিজ্ঞানীদের কাছে তা আজও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। আজও তাঁরা তার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করতে পারেন নি।

পৃথিবীর দুটি গতি আছে—একটি আহ্নিক ও একটি বার্ষিক; অর্থাৎ প্রতিদিন পৃথিবী তার অক্ষরেখার উপর দিয়ে ঘুরছে এবং এরূপে ঘোরবার সময় তার দিন ও রাত্রি হচ্ছে। আবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরে আসছে, যে যাত্রা শেষ করতে তার সময় লাগে এক বছর। চাঁদও পৃথিবীর চার দিকে অমনি ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। তবে তার আহ্নিক গতি নেই, কেবল পৃথিবী প্রদক্ষিণের গতি আছে। সেটি হচ্ছে মাসিক—যেহেতু পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে ২৮ দিন। চাঁদ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবার সময় ঘূর্ণিত হয় না, তার একটা দিক সর্বদাই পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে। তাই তার সেই দিককার সংবাদই আমরা জানি, আর অপর দিকের সংবাদ জানি না। অপর দিকটা সর্বদাই অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

সূর্যের গ্রহগুলির মধ্যে প্রথম চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর, একটি মাত্র—বুধ ও শুক্রের কোন চাঁদ নেই।

মঙ্গলের চাঁদ হচ্ছে দুটি। পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাদের নাম দিয়েছেন ডিমস্ (Demos) ও ফোবস্ (Phobos)। এরা আকারে অতিশয় ক্ষুদ্র, আমাদের পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে অনেক ছোট। এদের আবার চলবার গতিপথের একটি বিশেষত্ব আছে, যা সৌরজগতের আর কোন উপগ্রহেরই নেই। সৌরজগতে সবই একটা নিয়ম মেনে চলে, সবগুলি গ্রহ একদিক দিয়েই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, সমস্ত চাঁদও একদিক দিয়েই গ্রহগুলিকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু মঙ্গলের চাঁদ দুটি মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে দুই বিভিন্ন দিক দিয়ে—একটি যায় ডান দিক থেকে বাঁয়ে আর একটি যায় বাঁ-দিক থেকে ডানে। সে জন্যে তারা দুটিতে এক বার করে একে অন্যকে অতিক্রম করে।

মঙ্গলের পরে দূরস্থিত গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি। বৃহস্পতিই গ্রহগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। তার চাঁদের সংখ্যা বারোটি। তার মধ্যে বৃহত্তর এবং উজ্জ্বলতর চাঁদগুলির নাম যথাক্রমে আয়ো (Io), ইউরোপা (Europa), গানিমিড এবং ক্যালিষ্টো। এই চারটিকে গ্যালিলিও তাঁর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতেই তিনি সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলির পরিক্রমার ধারণা করেন। এদের মধ্যে সর্ববৃহৎটি আকারে আমাদের পৃথিবীর চেয়েও কিছুটা বড় এবং অন্যান্যগুলিও প্রায় পৃথিবীর সমান। বাকী আটটি অবশ্য অনেক ছোট;

বৃহস্পতির পরের গ্রহ শনি। আকারেও সে বৃহস্পতির পরেই। শনির চন্দ্র নয়টি। তাদের বৃহত্তর পাঁচটির নাম টাইটাস, আয়াপেটাস, ড়িয়া (Rhea), টেথিস ও ডিয়ন।

শনির পরই ইউরেনাস এবং ইউরেনাসের পর নেপচুন। ইউরেনাসের চাঁদ পাঁচটি ও নেপচুনের দুটি।

এদের পরের গ্রহ প্লুটো। এই প্লুটো এত দূরে ও এত ছোট যে, ঐ গ্রহ সম্বন্ধেই মানুষের জ্ঞান এখনও অতি সামান্য। তার চাঁদ আছে কি নেই, সে খবর এখনও জানা যায় নি।

তাহলে সৌরজগতে সর্বসাকুল্যে চাঁদ হলো ৩১টি—পৃথিবীর এক, মঙ্গলের দুই, বৃহস্পতির বারো, শনির নয়, ইউরেনাসের পাঁচ এবং নেপচুনের দুই। গ্রহগুলি সূর্যের আর এই চাঁদগুলি গ্রহগুলির প্রজাস্বরূপ।

বিনায়ক সেনগুপ্ত

রক্তের শ্রেণীবিভাগ

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রতিক যুদ্ধে ভারত সরকার সৈন্যবাহিনীর আহত সৈন্যদের জন্যে ভারতীয় নাগরিকদের নিকট রক্তদানের আহ্বান জানিয়েছেন। নিশ্চয়ই তোমাদের অনেকেরই মনে হয়েছে—আমার রক্ত কি যে কোন সৈনিকের কাজে লাগবে, না কোন বিশেষ সৈনিকের কাজে লাগবে? তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ বা শুনেছ যে, রক্তদান করবার পর প্রত্যেক দাতার রক্ত পৃথক পৃথকভাবে রাখা হয়। কেন? তাহলে রক্তের কি কোন শ্রেণীবিভাগ আছে?

আমাদের শরীরের মধ্যে কতকগুলি কোষ আছে; যেমন—লিম্ফয়েড টিস্যুর লিম্ফোসাইট প্রভৃতি, যেগুলি একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতে পারে। এই পদার্থটি ধর্মে রক্তের প্লাজ্‌মার প্রোটিনের মত এবং কোন নির্দিষ্ট জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে। রোগ-উৎপাদক জীবাণু ধ্বংস করতে পারে বলে ঐ পদার্থকে অ্যান্টিবডি বলা হয়। অনেক রকম অ্যান্টিবডি আছে; যেমন—অ্যান্টিটক্সিন, সাইটোলাইসিন প্রভৃতি। যখন কোন বাইরের বস্তু শরীরে প্রবেশ করে সেখানে টিস্যু-কোষগুলিকে উত্তেজিত করে, তখন এই অ্যান্টিবডি নামে রাসায়নিক বস্তু তৈরি হয়। ঐ বহিরাগত বস্তুকে অ্যান্টিজেন বলা হয়। এগুলি প্রোটিনজাতীয় এবং অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডিরূপেই বিক্রিয়া ঘটায় (যেমন—Tetanus, Agglutinogen প্রভৃতি)।

তাহলে বুঝা যাচ্ছে, কেন সবার রক্ত সবাইকে দেওয়া যায় না। যেমন—রামের রক্ত শ্যামকে দেওয়া হলো। ধরা যাক, রামের রক্তকোষে (Blood Cell) এ-অ্যাগ্লুটিনোজেন (A-Agglutinogen) ছিল। ঐ অ্যাগ্লুটিনোজেন একটা অ্যান্টিজেন। সুতরাং শ্যামের শরীরে গিয়ে সেগুলি একপ্রকার অ্যান্টিবডি তৈরি করবে। ঐ অ্যান্টিবডিই অ্যাগ্লুটিনিন। অ্যাগ্লুটিনোজেন ও অ্যাগ্লুটিনিন পরস্পর বিপরীতধর্মী।*

* উপাদান হিসাবে রক্তকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) Blood Plasma, (খ) Blood Cell। Blood Plasma-তে Agglutinin জাতীয় একরকম পদার্থ আছে। Blood Cell-এ Agglutinogen জাতীয় একরকম পদার্থ আছে। এরা পরস্পর বিপরীতধর্মী। রক্তের মধ্যে Blood Cell কিন্তু সেই রক্তের Blood Plasma-র সঙ্গে কোনরূপ বিক্রিয়া ঘটায় না। তাহলে মানুষ বাঁচতো না। সে জন্যে মানুষের Blood Cell-এ A জাতীয় Agglutinogen থাকলে তার Blood Plasma-য় B জাতীয় Agglutinin থাকবে। আবার যদি মানুষের শরীরে Blood Cell-এ AB—এই দুই জাতীয় Agglutinogen থাকে, তাহলে তার Blood Plasma-য় কোন অ্যাগ্লুটিনিন থাকবে না। ঠিক এইভাবে মানুষের শরীরে Agglutinogen ও Agglutinin সাজানো আছে।

তাহলে অ্যাগ্লুটিনোজেন শ্যামের শরীরে গিয়ে যে অ্যান্টিবডি তৈরি করেছে, সেটা অ্যান্টি এ-অ্যাগ্লুটিনোজেন (Anti A-Agglutinogen)। এখন যদি শ্যামের শরীরে বি-অ্যাগ্লুটিনিন (B-Agglutinin) থাকে, তাহলে কোনরূপ বিক্রিয়া ঘটবে না। কিন্তু যদি শ্যামের শরীরে এ-অ্যাগ্লুটিনিন বা এ বি-অ্যাগ্লুটিনিন (A-Agglutinin বা AB-Agglutinin) থাকে, তাহলে তারা পরস্পর বিক্রিয়া ঘটিয়ে দেবে। এই পদ্ধতিকে অ্যাগ্লুটিনেশন বলা হয়; অর্থাৎ Agglutinogen + Agglutinin = Agglutination.

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তোমার রক্তের কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ না করে যদি কোন সৈনিককে দেওয়া হয়, তাহলে তোমার রক্তের কোষগুলি সৈনিকের শরীরে গিয়ে অ্যাগ্লুটিনেশন পদ্ধতির দ্বারা বিক্রিয়া ঘটিয়ে Clump তৈরি করবে। ঐ Clump ছোট ছোট শিরা বা ধমনীকে বন্ধ করে দেবে। পরে সেগুলি ভেঙ্গে গিয়ে হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) বের করে দেবে। ঐ হিমোগ্লোবিন বৃক্কের ইউরিনারী নালিকাগুলিকে (Kidiney's urinary tubules) বন্ধ করে দেবে। তখন রোগীর আর মূত্র-ক্ষরণ হবে না। এখন তাহলে দেখা যাক, কোন্ রক্ত কোন্ রক্তের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায় :—

দাতার রক্ত	গ্রাহকের রক্ত (Agglutinin আছে)			
(Agglutinogen আছে)	A	B	AB	O
A	+	–	+	–
B	–	+	+	–
AB	+	+	+	–
O	–	–	–	–

+ = বিক্রিয়া ঘটায়

– = বিক্রিয়া ঘটায় না

তোমার রক্ত যদি 'O' শ্রেণীতে হয়, তাহলে তুমি সবাইকে রক্ত দিতে পার, কিন্তু 'AB' শ্রেণীর রক্ত হলে কাউকে রক্ত দিতে পারবে না। এছাড়া অবশ্য রক্তের আরও কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আছে।

শ্রীমিনতি চট্টোপাধ্যায়

অঙ্কের কৌতুক

সবচেয়ে বড় মূল সংখ্যা (Prime Number) কি, বলতে পার? মূল সংখ্যা বলতে বুঝায়, যে সংখ্যার কোন গুণনীয়ক (Factor) হয় না; অর্থাৎ তাকে যে কোন সংখ্যা দিয়েই ভাগ করা যাক না কেন, সামান্য কিছু ভাগশেষ নিশ্চয়ই অবশিষ্ট থাকবে। এড্‌ওয়ার্ড লুকাস ১৮৭৭ সালে এই রকম একটা বিরাট রাশি আবিষ্কার করেন। সেটা হচ্ছে—১৭০,১৪১,১৮৩,৪৬০,৪৬৯,২৩১,৭৩১,৬৮৭,৩০৩,৭১৫,৮৮৪,১০৫,৭২৭। রাশিটিকে স্মরণ রাখতে হলে শুধু $২^{১২৭}$-১—এটুকু মনে রাখলেই চলবে। এপর্যন্ত এর কোন গুণনীয়ক বের করা সম্ভব হয় নি।

মনে কর, তোমার বইয়ের তাকে ১৫খানি পুস্তক আছে। এই পুস্তকগুলিকে আগে পরে নিয়ে তুমি কত রকম ভাবে সাজাতে পার? যদি প্রতি মিনিটে একবার করেও নতুন ভাবে সাজানো হয়, তাহলেও তোমার ২৪৮৭৯৯৬ বছর সময় লেগে যাবে!

এবার একটি গাণিতিক গল্প বলবো। দাবা খেলার ছকে ৬৪টি ঘর আছে—এটা বোধ হয় তোমরা সকলেই জান। শোনা যায়, এক রাজা দাবা-বড়ের নানারকম বিচিত্র সব চালচলন দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে এই খেলার আবিষ্কর্তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। তাঁর আদেশে আবিষ্কারককে অবিলম্বে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলো। রাজা তাকে নিজের ইচ্ছামত যে কোন পুরস্কার চেয়ে নিতে বললেন। সে একটু ভেবে বললো, দাবা-বড়ের ছকের প্রথম ঘরের জন্যে একটি মাত্র গমের দানা, দ্বিতীয় ঘরের জন্যে দুটি দানা, তৃতীয় ঘরের জন্যে ৪টি দানা —এভাবে ৬৪টি ঘর অবধি গমের দানা প্রদান করলেই তার অন্তরের আকাঙ্খা পরিপূর্ণ হবে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে ঠিক সেই রকম ভাবে গমের দানা প্রদান করতে মন্ত্রীকে আদেশ করলেন। এক দিন পরে, মন্ত্রী মহাশয় বিশেষ চিন্তিত মুখে এসে রাজাকে জানালেন যে, এই রকম প্রস্তাবমত গমের দানা দিতে গেলে যত গম লাগবে, তত গম রাজভাণ্ডারে নেই। রাজা তখন জানতে চাইলেন সঠিক সংখ্যা কত হতে পারে। মন্ত্রী বললেন ঠিক ঐ রকমভাবে (১+২+৪+৮+১৬+৩২+৬৪+১২৮+২৫৬) গুণে দেখলে এই ক্রমবর্ধমান সংখ্যা হবে ১৮৪৪৬৭৪৪০৭৩৭০৯৫৫১৬১৫। শুনে রাজার তো চক্ষু স্থির!

এখন একটা মজার অঙ্কের কথা বলছি। তোমার বন্ধুকে ৩-এর বেশী কোন একটি মূল সংখ্যা (Prime Number) ভাবতে বল। তারপর তাকে তা দিয়েই

গুণ করতে বল। এরপর তাতে ১৭ যোগ করে ১২ দিয়ে ভাগ করতে বল। এবার আর কোন প্রশ্ন না করেই দৃঢ়কণ্ঠে বলে দাও, ভাগশেষ অবশ্যই ৬ হয়েছে। সে খুবই অবাক হয়ে যাবে। উদাহরণ—$(৭ \times ৭ + ১৭) \div ১২ = ৫\frac{৬}{১২}$

কোন দর্শককে এক হাতে এক নয়া পয়সা ও অন্য হাতে পাঁচ নয়া পয়সা নিতে বল। এরপর তাকে বল বাঁ হাতে যত নয়া পয়সা আছে, তাকে ১৯ দিয়ে গুণ করতে, আর ডান হাতে যত নয়া পয়সা আছে তাকেও ১৯ দিয়ে গুণ করতে। ইত্যবসরে তার মুখের ভাব তুমি খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করতে থাকবে। যে হাতের বেলায় গুণ করতে তার বেশী সময় লাগবে, সেই হাতে নিশ্চয়ই পাঁচ নয়া পয়সা আছে, আর তাহলে অপর হাতে অবশ্যই এক নয়া পয়সা থাকবার কথা। ১-কে ১৯ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই গুণ করা যায়, কিন্তু ৫-কে ১৯ দিয়ে মনে মনে গুণ করতে হলে একটু সময় লাগে। সুতরাং ঐ গুণ ফল দুটি এক সঙ্গে বলে দেবার পর দর্শককে আর কোন রকম প্রশ্ন না করেই তুমি অনায়াসে বলে দিতে পারবে তার কোন হাতে কি মুদ্রা লুকানো আছে। এটা একটা খুব সুন্দর অথচ সহজ থট রিডিং-এর খেলা, হঠাৎ দেখে কিন্তু সবাই অবাক হয়ে যায়।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। রকেট প্রথম কোথায় এবং কে আবিষ্কার করে?

প্রঃ ২। ভারতবর্ষে কোন দিন রকেট তৈরি হয়েছে কি?

প্রঃ ৩। আগের দিনে রকেট কি কি কাজে ব্যবহার করা হতো?

কুমারী দেবিকা চক্রবর্তী

১ উঃ। রকেট আবিষ্কারের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, কোন একজন লোককে এর জন্যে দায়ী করা চলে না। বারুদ আবিষ্কারের সঙ্গে রকেট আবিষ্কার কিছুটা রহস্যজনকভাবে জড়িত। আমরা জানি, বারুদ আবিষ্কারের গৌরব চীন দেশের প্রাপ্য। রকেটের ক্ষেত্রেও তাই। রকেটও প্রথম চীন দেশেই আবিষ্কৃত হয়। তখন এর নাম ছিল উড়ন্ত অগ্নিশলাকা। এই রকেট অবশ্য এখনকার দিনের মত এত উন্নত ধরণের ছিল না। সেগুলি ছিল অনেকটা হাউই বাজীর মত। চীনারা প্রধানতঃ যুদ্ধের কাজেই এগুলিকে ব্যবহার করতো।

২ উঃ। একথা অনেকেই জানেন না বা ভুলে গেছেন যে, ভারতবর্ষে এক সময়ে

রকেট তৈরি হয়েছে। চীনাদের কাছ থেকেই ভারতবাসীরা রকেটের কথা জানতে পারে এবং ভারতবর্ষেও তখন রকেটের প্রচলন হয়। ভারতবাসীরাও প্রধানতঃ যুদ্ধের কাজেই রকেট ব্যবহার করতো। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় টিপু সুলতানের অধীনে ভারতীয় সৈন্যেরা মহীশূরে রকেট ব্যবহার করেছিল। পাশ্চাত্য দেশ রকেটের সম্বন্ধে তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত এই রকেট ইংরেজবাহিনীকে প্রথম দিকে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করেছিল। ইংরেজেরা এই নতুন ধরণের অস্ত্র দেখে এত চমৎকৃত হয়েছিল যে, ১৮০১ সালে উইলিয়াম কংগ্রেভ নামক জনৈক ইংরেজ অফিসার নিজে তখনকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রকেট নির্মাণের ভার গ্রহণ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ইংরেজেরা পরবর্তীকালে বিদেশের কয়েকটি যুদ্ধে সফলতার সঙ্গে রকেট ব্যবহার করে। সেই থেকে দেড়'শ বছর পরে আবার সেই মহীশূরেই আধুনিক কালের রকেটও নিক্ষেপ করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালের ৩রা নভেম্বর মহীশূরে ইণ্ডিয়ান অ্যাষ্ট্রোনটিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে দুই অংশ সমন্বিত একটি রকেট ৩৫০০ ফুট পর্যন্ত ঊর্ধ্বে উঠেছিল। এছাড়া অবশ্য পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও রকেট উৎক্ষেপ করা হয়েছে।

৩ উঃ। যদিও তখনকার দিনে প্রধানতঃ যুদ্ধের কাজেই রকেট ব্যবহার করা হতো, তথাপি তার অন্যান্য ব্যবহারও দেখা গেছে; যেমন—রকেট-চালিত গাড়ী, বরফের উপর চলবার জন্যে এক ধরণের নৌকা ইত্যাদি। এছাড়া রকেটের আরও অভিনব ব্যবহার ছিল; যেমন—এক স্থান থেকে অপর স্থানে ডাক বহন করে নিয়ে যাওয়া, সমুদ্রের উপকূলবর্তী কোন বিপন্ন জলযানে রকেটের সাহায্যে দড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আরোহীদের জীবন রক্ষা করা ইত্যাদি। এসব কাজে জার্মানরাই সর্বাপেক্ষা অগ্রবর্তী ছিলেন। জার্মানদের তৈরি ছোট ছোট রকেট এত শক্তিশালী ছিল যে, তখনকার দৈনন্দিন জীবনযাপনের পক্ষে সেগুলি অপরিহার্য বিবেচিত হতো—বিশেষ করে ডাক বহন করবার ব্যাপারে। তখন আজকের মত সুবিধাজনক কোন যানবাহন তৈরি হয় নি। সুউচ্চ পর্বত বা দুর্গম অরণ্যে ডাক পাঠাবার জন্যে রকেটই ছিল জার্মানদের একমাত্র সহায়।

দীপক বসু

প্রঃ ১। ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ে প্রকৃতপক্ষে কটি বলয় আছে?

প্রঃ ২। এই বলয়গুলি কি জাতীয় বিদ্যুৎকণা দ্বারা গঠিত?

প্রঃ ৩। এই সব কণিকা আসে কোথা থেকে?

কণক মিত্র

১ উঃ। এখনও পর্যন্ত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পরীক্ষার দ্বারা যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তাথেকে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন—ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ে দুটি

বলয় আছে। এদের মধ্যে প্রথমটি রয়েছে অপেক্ষাকৃত কাছে—কেন্দ্র থেকে মোটামুটি ১৩,০০০ কিঃ মিঃ দূরে। এর নাম অন্তর্বলয়। দ্বিতীয়টি ২৫,০০০ কিঃ মিঃ দূরে। এর নাম বহির্বলয়। উভয় বলয়েরই আকৃতি তৃতীয়ার চাঁদের মত। তবে কেউ কেউ মনে করেন—এই দুটি ছাড়া আরও দূরে হয়তো তৃতীয় ও চতুর্থ বলয়েরও অস্তিত্ব আছে। আবার অনেকে বলেছেন—একটিই বলয় কয়েক অংশে ভাগ হয়ে আছে। এসব সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা চলছে। আমরা এখন মোটামুটি ধরে নিতে পারি—উপরিউক্ত দুটি বলয় নিয়েই ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয় গঠিত।

২ উঃ। অন্তর্বলয়টি প্রধানতঃ প্রোটিন কণিকার দ্বারা গঠিত। বহির্বলয়টিতে রয়েছে প্রধানতঃ ইলেকট্রন কণিকা। উভয় বলয়েই অবশ্য দুই প্রকার মূল কণিকা ছাড়া কিছু কিছু অন্য জাতীয় বিদ্যুৎ-কণিকার অস্তিত্বও দেখা যায়।

৩ উঃ। বিদ্যুৎ-কণিকাগুলির উৎস সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও একমত নন। মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়েছে, বহির্বলয়ের কণিকাগুলির উৎস হলো সূর্য এবং অন্তর্বলয়ের কণিকাগুলি আসে বেশীর ভাগ মহাজাগতিক রশ্মি থেকে। আগত কণিকাগুলি পৃথিবীর কাছে এসে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের ফাঁদে পড়ে আট্‌কে গিয়ে যথাক্রমে ভ্যান অ্যালেনের বহির্বলয় ও অন্তর্বলয় গঠন করে।

দীপক বসু

বিবিধ

মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় ডাঃ ভাবা নিহত

২৪শে জানুয়ারী; জেনেভার খবরে প্রকাশ—এয়ার ইণ্ডিয়ার বোয়িং-৭০৭ বিমান 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ১১৭ জন যাত্রী লইয়া জেনেভা যাত্রার পথে হঠাৎ রেডারের পর্দা হইতে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং পরমুহূর্তেই আল্‌স্‌ পর্বতমালার মণ্ট ব্ল্যাঙ্কের শীর্ষে তুষারাচ্ছন্ন পর্বতগাত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়। এই বিমানের যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ভারতীয় পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান বিশ্ববিখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানী ডাঃ এইচ. জে. ভাবা। ২২শে জানুয়ারী তাঁহার যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি শেষ মুহূর্তে তাঁহার যাত্রা একদিনের জন্য স্থগিত রাখেন। কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া দুর্ঘটনা-স্থলের খুব নীচু দিয়া উড়িয়া ফরাসী হেলিকপ্টারের বৈমানিক জানান যে, দুর্ঘটনা কবলিত যাত্রীদের মধ্যে কাহারও বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ পশ্চিম ইউ-রোপের উচ্চতম পর্বতশীর্ষের অনেক দূরে বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়াইয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। ডাঃ ভাবা এই বিমানে আন্তর্জাতিক শান্তি কমিশনের বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য ভিয়েনা যাইতেছিলেন। তিনি ছিলেন আমাদের কৃতী বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম। তাঁহার তিরোধানে বিজ্ঞান-জগৎ এবং আমাদের দেশের

যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ করা সম্ভব নহে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

অবিশ্বাস্য কিন্তু ..

কেপ কেনেডি, ২২শে ডিসেম্বর—গতকাল টাইটান-৩ রকেটের সহায়তায় চারটি কৃত্রিম উপগ্রহকে যুগপৎ পৃথিবীর চতুর্দিকের কক্ষপথে স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, আনাড়ি হাতের তৈরি—যাতে ব্যয় হয়েছে মাত্র দুই শত ডলার—'অস্কার-৪' কৃত্রিম উপগ্রহটি আজও মহাকাশ থেকে সঙ্কেত পাঠিয়ে চলেছে।

দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ, যা সুদক্ষ, অভিজ্ঞ ও নামজাদা বিজ্ঞানী এবং যন্ত্রকুশলীদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে এবং যেগুলিকে সামরিক বার্তা আদান-প্রদানের কাজে ব্যবহার করা হবে বলে স্থির করা হয়েছিল, সেগুলি এখন পৃথিবীর চতুর্দিকে অনিশ্চিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের কাছ থেকে সঙ্কেত পাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সৌর-বিকিরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে যে আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয়েছিল, তার কোন সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। মহাকাশের বিশালতায় সে কোথায় যে হারিয়ে গেছে, কেউ তা বলতে পারে না।

কিন্তু বিজ্ঞান যাদের পেশা নয়, নেশা মাত্র—এমন একজন শেয়ার বাজারের দালাল, একজন ডেন্টিষ্ট এবং একজন ডাক্তারের চেষ্টায় যে কৃত্রিম উপগ্রহটি তৈরি হয়েছে, সেটি শুধু বেতার-সঙ্কেতই পাঠায় নি, তার মাধ্যমে কেপ কেনেডির হাম-রেডিও-ওয়ালারা অরল্যাণ্ডোর এমেচার বিজ্ঞানী-দের সঙ্গে কথাবার্তাও চালিয়েছেন।

হাম-রেডিও—বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি বিদ্যার জটিল ব্যাপারে যাঁরা নেই, এমন সব লোকেরা আমেরিকার সর্বত্র ছড়িয়ে আছেন—তাঁরা খেয়াল-খুসীমত বেতার সীম যন্ত্র তৈরি করেন এবং নিজেদের মধ্যে সে সব যন্ত্রের মাধ্যমে কথাবার্তা চালিয়ে থাকেন। এইটি অভাবনীয় সাফল্যের আনন্দে আজ তাঁরা উৎফুল্ল—পেশাদার বিজ্ঞানীদের তৈরি তিনটি উপগ্রহই অকেজো হয়ে গেল—শুধু রইলো তাঁদেরটি এবং সে রীতিমতই সঙ্কেত পাঠিয়ে চলছে।

বৃহদাকারের দূরবীক্ষণ

ভারতের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার সভাপতি ডাঃ এইচ. জে. ভাবা কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন, ভারতে শীঘ্রই একটি বৃহদায়তনের দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহারের জন্যে পাওয়া যাবে। বৃটেনের জড্রেল ব্যাঙ্ক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের তুলনায় এর কর্মক্ষমতা হবে পাঁচ গুণ বেশী।

উটকামণ্ডে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি বসানো হবে। দু-বছরের মধ্যে যন্ত্রটির কাজ সুরু হবে।

টাটা গবেষণা-কেন্দ্রে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে এক আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করে ডাঃ ভাবা বলেছিলেন, মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে গবেষণা করবার জন্যে শীঘ্রই রকেট তৈরি করা হবে।

বিচিত্র বটিকা

মানুষ কি করে মনে রাখে—সে সম্পর্কে গবেষণা চলছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা করা হলে শেখবার, ভুলে যাবার ও মনে রাখবার পিল তৈরি করা সম্ভব হতে পারে।

রয়টারের খবরে প্রকাশ, আজ ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলিতে বিজ্ঞান সম্পর্কিত এক আলোচনা চক্রে শিকাগোর এক চিকিৎসক বলেন, ইঁদুরের মনে রাখার ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে চিকিৎসকেরা তাঁদের একটি ওষুধ খাওয়াচ্ছেন। ওই ওষুধটির নাম 'ম্যাগ্নেসিয়াম পেমোলাইন'।

মানুষ ১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে

মানুষ স্বাভাবিক কর্মশক্তির সঙ্গে ১২০-১৫০ বছর বাঁচতে পারে—সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। ট্রান্স ককেসীয় সম্মেলনে টিবিলিসিতে মানুষের আয়ু সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তাতে বহু বিজ্ঞানী এই সিদ্ধান্তে এসেছেন।

বার্ধক্যের কারণ এবং তার পদ্ধতি সম্পর্কে ২০০-এর অধিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়।

ট্রান্স ককেসিয়ায় প্রায় ছয় হাজার শতবর্ষ বয়স্ক লোক আছেন। সর্বজ্যেষ্ঠ সোভিয়েট নাগরিকের বয়স ১৬০ বছর। তাঁর নাম সিরালি মুসলিমভ। একজন স্ত্রীলোকের বয়স ১৩০ বছর।

চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অবতরণের চেষ্টা ব্যর্থ

মস্কো, ৭ই ডিসেম্বর—চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে অবতরণের রাশিয়ার চেষ্টা আজ ব্যর্থ হয়েছে। এই নিয়ে রাশিয়ার চতুর্থ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

'টাস' জানিয়েছে যে, মহাকাশযানের ধীরে ধীরে অবতরণের যন্ত্রটির শেষ পর্যায় ছাড়া সকল পর্যায় স্বাভাবিকভাবে কাজ করেছে। লুনা-৮ আজ মস্কো সময়ের রাত্রি ১২টা ৫১ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে চাঁদের পৃষ্ঠদেশে গিয়ে পৌঁছায়। লুনা-৮ মস্কো সময়ের রাত্রি ১২টা ৫০ মিনিটে চাঁদে অবতরণ করবে বলে 'টাস' ইতিপূর্বেই জানিয়েছিল। গত শুক্রবার মহাকাশযানটি উৎক্ষেপ করা হয়।

'টাসে'র ঘোষণায় জানানো হয়েছে যে, সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ ধীরে ধীরে অবতরণের পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। বৈজ্ঞানিকদের সাফল্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁরা প্যারাসুটের সাহায্য ছাড়াই ১৫৫২ কিলোগ্রাম ওজনের মহাকাশযানের অবতরণ-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। কারণ বায়ুশূন্য চন্দ্রপৃষ্ঠে প্যারাসুট কোন কাজেই লাগবে না।

সার হিসাবে চুলের ব্যবহার

নয়া দিল্লীর ৭ই ডিসেম্বরের খবরে প্রকাশ—মানুষের মাথার চুল সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই খবরটি বের হয়েছিল একটি সংবাদ-পত্রে। সহকারী কৃষিমন্ত্রী শা নেওয়াজ খানও লোকসভায় একই কথা বলেছেন।

সেলুন থেকে সংগৃহীত চুলে শতকরা বারো ভাগ নাইট্রোজেন থাকতে পারে। কিন্তু নাইট্রোজেন সেখানে রয়েছে মিশ্র রাসায়নিক পদার্থের আকারে। এর ফলে মাটিতে তা সহজে গলে না, কাজেই গাছপালার খুব একটা উপকার হয় না।

শা নেওয়াজ খান বলেন, এই সমস্যা সমাধানের উপায় বের করা হয়েছে ভারতীয় কৃষি গবেষণা-কেন্দ্রে। হরদৈয়ে চুল সংগ্রহের অভিযানও সুরু হয়ে গেছে।

তবে অসুবিধা হচ্ছে এই যে, চুল বেশী পাওয়া যাচ্ছে না, আর সংগ্রহের খরচও বেশী পড়ে যাচ্ছে।

অমরতার প্রান্তে

নোভোসতি প্রেস এজেন্সির সংবাদে জানা গেছে যে, সোভিয়েট জীব-বিজ্ঞানীদের মতে, প্রাণীর পক্ষে মৃত্যু আকস্মিক ব্যাপার মাত্র, প্রয়োজনীয় বস্তু নয়।

অ্যাকাডেমিসিয়ান ভি. কুপরিয়েরিক কোমসোমোলকায়া প্রাভদায় 'অমরতার প্রান্তে' নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—'মৃত্যু মানবপ্রকৃতির বিরোধী। সেই জন্যেই আমরা ঔষধের সাহায্যে মৃত্যুর সঙ্গে সর্বদা লড়াই করে চলেছি।

বার্ধক্যকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কোষসমূহ এবং স্নায়ুজালের পুনরুজ্জীবনও সম্ভব করে তোলা হবে এবং প্রকৃতপক্ষে মানুষ অমরতা লাভ করবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

উনবিংশ বর্ষ | মার্চ, ১৯৬৬ | তৃতীয় সংখ্যা

জৈববিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

সত্যেন বোস

জৈববিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার জন্যে এ বছর (১৯৬৫) ফ্রান্সের তিনজন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ—আদ্রেঁ লুয়ফ (Andre' Lwoff) জন্মেছেন ১৯০২ সালে। জ্যাক মনো (Jacques Monod) বয়সে এখন পঞ্চাশ পার হয়েছেন। সর্বকনিষ্ঠ ফ্রাঁসোয়া জ্যাকবের (Francois Jacob) বয়স মাত্র ৪৫।

লুয়ফের পিতা রুশদেশ থেকে এসে ফ্রান্সে বসতি করেছিলেন। তিনি ছিলেন মানসিক বিকারের চিকিৎসক। পুত্র আদ্রেঁ যথারীতি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করে ১৯২১ সালে পাস্তুর ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছিলেন। জীবাণু, ছত্রাক ইত্যাদি প্রাথমিক স্তরের প্রাণী, যাদের প্রাণবৃত্তি ও বংশবৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও সরল ভাবে সম্পন্ন হচ্ছে, তারাই হলো লুয়ফের গবেষণার বস্তু। অণুবীক্ষণ ছাড়া এই জগতের খবর পাওয়া যায় না। তাছাড় ব্যাক্টিরিয়ার শত্রু ফাজ্ নিয়েও অনেক কাজ আছে লুয়ফের। জীবাণুর বৃদ্ধি, পুষ্টি ও বিনাশ নিয়েই এযাবৎ নানাবিধ পরীক্ষার ফলে লুয়ফ অনেক মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করে যশস্বী হয়েছেন। প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি বুঝতে বিজ্ঞানীদের কাছে এককোষী জীবাণুর দাম অসামান্য। প্রাণের প্রয়োজনীয় সব প্রক্রিয়াই এদের অণুকোষের মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে। উচ্চাঙ্গের প্রাণীর শরীরও অগণিত জীবকোষের সমষ্টি। তিনজন ফরাসী বিজ্ঞানীর পরীক্ষার বস্তু বেশীর ভাগ সময় এক প্রকার জীবাণু—(Coli bacillus) হলেও তাঁরা প্রাণের অভিব্যক্তির বিষয়ে যে

সব মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, অতিকায় প্রাণীদের শারীরতত্ত্ব বুঝতেও সেগুলি বিশেষ কার্যকরী হবে।

১৯৩০ সালের মধ্যেই লুয়ফ যশস্বী হয়েছিলেন আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের পরিপাক সম্পর্কিত কয়েকটি আবিষ্কারে। আজকাল আমরা উচ্চাঙ্গের প্রাণীর পুষ্টি ও বৃদ্ধির ব্যাপারে নানাবিধ খাদ্যপ্রাণের (Vitamin) একান্ত প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছি। খাদ্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও অনেক সময় জীব তার খাদ্যের সম্যক পরিপাক ও ব্যবহার করতে পারে না এদের অভাবে। কণা-প্রমাণ ভিটামিনের অভাবে আমরা অনেক সময় নানাবিধ রোগের কবলে পড়ি, সে তথ্যও আজকাল প্রায় সকলেই বুঝেছি। লুয়ফের কৃতিত্ব ছিল—বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্যে জীবাণুদের খাদ্য ছাড়াও যে এরূপ অতি প্রয়োজনীয় কণা-প্রমাণ নানা দ্রব্যের আবশ্যক আছে, তা হৃদয়ঙ্গম ও সপ্রমাণ করা। নানাবিধ পরীক্ষা করে তিনি দেখিয়েছিলেন, খাদ্যকে পরিপাক করে শরীরের উপযোগী বস্তুতে রূপান্তরিত করতে যে সব বিশেষ বিশেষ অনুঘটক (Catalyst) বা জারকের (Enzyme) আবশ্যক, জীবাণুকোষ সেগুলি তৈরি করতে সক্ষম হলেও তাদের গুণ ও শক্তিবর্ধক কতকগুলি সহকারী বস্তুর অভাব পড়লে জীবাণুর স্বাভাবিক প্রাণ-বৃত্তি বা বংশবৃদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে। অনুসন্ধানের ফলে লুয়ফ স্থির করলেন, যেগুলিকে জীবকোষ নিজে তৈরি করতে পারে না, সেগুলিকে খাদ্যরসের সঙ্গে বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এদের অভাবে খাদ্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও জীবাণুকোষগুলির দ্রুত বধন বা প্রজনন হয় না। যখন ভাবা যায় উচ্চশ্রেণীর প্রাণীর পক্ষে ভিটামিনের গুণবোধ ১৯৩০ সালে সবেমাত্র উন্মেষ হতে সুরু হয়েছে বিজ্ঞানীমহলে, তখন লুয়ফের এই আবিষ্কার আমাদের সত্যই বিস্মিত করে।

জ্যাক মনো ১৯৪৫ সালে পাস্তুর ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছিলেন। এর আগে ১৯৪১ সালে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি থিসিস উপস্থাপিত করেছিলেন—সংক্রামিত মাধ্যমে আণুবীক্ষণিক মাইক্রোবের পালন, তাদের পরিপাকক্রিয়া ও পুষ্টিই ছিল তাঁর এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। আণুবীক্ষণিক প্রাণীর জীবন কথা সাধারণ মানুষের কৌতূহল উদ্রেক করতে পারে না—এই ছিল সেই সময় তাঁর পরীক্ষক পণ্ডিতগণের অভিমত। কিন্তু আজকাল যাঁরাই জৈবরসায়ন ও বংশধারা সংরক্ষণ সংক্রান্ত নানা গবেষণার কাজে নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের কাছে মনোর এই আদি থিসিসটি অতি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞানের ভাণ্ডার ও বিচিত্র পরীক্ষা-পদ্ধতির নির্দেশক হিসাবে সমাদৃত হচ্ছে।

ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব হচ্ছেন মূলতঃ প্রজননবিদ্যার গবেষক। কি ভাবে জীবাণুদের বিশেষ ধর্ম বংশানুক্রমে সংরক্ষিত হচ্ছে জীবাণুদের সঙ্গমের ফলে, কিভাবে বংশধরদের প্রকৃতির অদল-বদল হচ্ছে—এই নিয়েই তিনি বরাবর অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। ইনি পাস্তুর ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছেন ১৯৫০ সালে। এই তিনজন বিজ্ঞানীর প্রাথমিক চিন্তা দৃশ্যতঃ ভিন্নধর্মী হলেও তাঁদের মধ্যে মূলগত ঐক্য রয়েছে। তাঁদের যৌথ কাজ ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ফলে জীবকোষ, তার ধর্ম ও আচরণের বিষয়ে আমরা অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছি।

এঁদের অনুসন্ধানের তাৎপর্য আলোচনা করবার আগে জৈববিজ্ঞানের কতকগুলি মৌলিক কথা স্মরণ করা দরকার। প্রত্যেক জীবকোষের বাইরের প্রাকারের মধ্যে রয়েছে Cytoplasm, আবার তারই মধ্যে কোন একদেশে ভাসমান রয়েছে ক্ষুদ্রকায় নিউক্লিয়াস। গঠনে ও ধর্মে এটি Cytoplasm থেকে পৃথক। বিজ্ঞানী নানারূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা কোষের ভিতরের নিউক্লিয়াসের

ও তার গঠনবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

এমন সব রঞ্জক পদার্থ আছে, যা জীবাণু সংক্রামিত মাধ্যমের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে তার রং নিউক্লিয়াসকেই দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে, ফলে অণুবীক্ষণের নীচে প্রকাশিত হয়ে পড়ে নিউক্লিয়াস ও তার মধ্যের ক্রোমোজোমগুলি (Chromosome)। জীবকোষের নানা অবস্থা অণুবীক্ষণে দেখা যায়। কোষ পুষ্ট হয়ে বিশেষ অবস্থায় উপনীত হলে প্রত্যেক কোষ বিভক্ত হয়ে প্রথমে নতুন ২টি কোষ, পরে নতুন কোষের প্রত্যেকটি আবার ওই ভাবেই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। এই ভাবে তা-থেকে ২-৪-৮-১৬ ইত্যাদি করে বহু নতুন কোষের উদ্ভব হয়। জ্যামিতিক হারে বেড়ে যায় কোষসংখ্যা ও সংক্রামিত মাধ্যমের স্থানে স্থানে গড়ে ওঠে জীবাণুর উপনিবেশ। জীবাণু-জড়িত মাধ্যম অণুবীক্ষণের তলায় রাখলে কোষ-বিভাজনের নানা অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। প্রত্যেক কোষ-বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াস ও তার মধ্যে দৃশ্যতঃ তন্তুপ্রায় কতকগুলি জিনিসের (Chromosome) বিভাজনও হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে। পূর্ব-কোষ থেকে উত্থিত উত্তর-কোষ দুটিতেই এই Chromosome-সূত্রগুলি সমানভাবে পরিবেশিত হয়।

বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে প্রমাণ করেছেন, প্রাণশক্তির উৎসস্বরূপ এই Chromosome। জীবের বংশগত বৃত্তি ও ধর্ম এই Chromosome-গুলিতেই নিবদ্ধ রয়েছে। এই কথা যে শুধু এককোষী জীবাণুর বেলায়ই খাটবে তা নয়, সব প্রাণীর দেহের কোষেরই এই সাধারণ ধর্ম। উচ্চ শ্রেণীর জীবের দেহের সর্বত্র এই ভাবে কোষের বৃদ্ধি, পুষ্টি ও বিভাজন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি অঙ্গের বিবর্ধন ও বয়সের সঙ্গে জীবের গঠন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়।

আমরা আজকাল জেনেছি, ক্ষুদ্রাকার নানারকম জীবাণু সময় সময় মানব বা অন্য প্রাণীর দেহে শত্রুরূপে প্রবেশ করে সেখানে নানা রোগের সৃষ্টি করে এবং পরিশেষে তার নিধন ঘটায়। এরাই ব্যাক্টিরিয়া।

মানুষের নানা রোগের নিদান যে ব্যাক্টিরিয়া, একথা অধুনা চিকিৎসাবিজ্ঞান সন্দেহাতীত-ভাবে প্রমাণ করেছে এবং ব্যাক্টিরিয়া থেকে আত্মরক্ষা করবার নানারূপ উপায়ও নিত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে।

তবে প্রকৃতির রাজ্যে ব্যাক্টিরিয়ারও সহজ শত্রু বর্তমান রয়েছে। যে মাধ্যমে ব্যাক্টিরিয়া জীবাণু অনায়াসে বেঁচে থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে, কিছু দিন বাদে কোন কারণে সেই মাধ্যমই ব্যাক্টিরিয়ার জীবনযাত্রার পরিপন্থী হয়ে ওঠে। তাদের উপনিবেশগুলি কোন অজ্ঞাত প্রভাবে বিগলিত ও অন্তর্হিত হতে সুরু করে। ওই দূষিত মাধ্যমের নির্যাস টাট্‌কা জীবাণু-সংক্রামিত মাধ্যমে মিশালে সেখানেও জীবাণুর মড়ক সুরু হয়। এই ভাবেই রহস্যময় Bacteriophage-এর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে বিজ্ঞানীর প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। পরে ফাজের আকৃতি ইলেকট্রন-মাইক্রস্কোপের (Electron microscope) সাহায্যে জানতে পারা গেছে।

জীবাণু-কোষ থেকে অনেক ক্ষুদ্র এর মুণ্ডটি এবং সঙ্গে সরু লম্বা পুচ্ছ। ওরই সাহায্যে ব্যাক্টিরিয়ার গায়ে এরা সংলগ্ন হয়ে যায়। তখন ফাজের বস্তু পুচ্ছ বেয়ে ব্যাক্টিরিয়ার দেহে প্রবেশ করে। ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে বাইরের প্রাকার ভেঙ্গে পড়ে ব্যাক্টি-রিয়ার অস্তিত্ব লোপ পায় ও তার বদলে মাধ্যমে বহু সংখ্যক নতুন ফাজ-কণার সৃষ্টি হয়। ফাজের আক্রমণে এভাবে মাধ্যমের ব্যাক্টিরিয়াসমূহের দ্রুত বিলোপ সাধিত হলেও মধ্যে মধ্যে কয়েকটি বীজাণু হয়তো ওই দূষিত মাধ্যমের মধ্যেও টিকে থাকে। তাদের উঠিয়ে নিয়ে আবার নতুন মাধ্যমের মধ্যে ছেড়ে দিলে তারা স্বাভাবিকভাবে পুষ্ট ও পুনঃ পুনঃ

বিভক্ত হয়ে এক নতুন জীবাণু-বংশ সৃষ্টি করে, যারা ফাজের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা কোন অজ্ঞাত উপায়ে অর্জন করেছে বলে মনে হয়।

কেউ কেউ ভাবতেন, এই নতুন ধারার সন্তান-জীবাণুগুলি এক হিসাবে পূর্ব-জীবাণু থেকে পৃথকধর্মী, কারণ এদের প্রত্যেকটির মধ্যেই ফাজ কোন একরূপে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কোন কারণে জীবাণুর ফাজ-প্রতিরোধক ক্ষমতা হ্রাস পেলে লুকনো ফাজ আবার বলবান হয়ে সেই জীবাণুকে ধ্বংস করে' বিপুলভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এইরূপ প্রচ্ছন্ন ফাজ—প্রো-ফাজ (Prophage)-এর সম্ভাবনা কল্পনা করেছিলেন বর্দে (Bordet') ১৯২১ সালে এবং তার স্বপক্ষে যুক্তিও দিয়েছিলেন বারনেট (Burnet) ১৯২৯ সালে। সকল বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই প্রো-ফাজ বিশ্বাস করতেন না এবং বহু বছর এই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলেছিল। লুয়ফ এই বিষয়ে বহু রকমের পরীক্ষা করে ১৯৫০ সালে প্রবন্ধ ছাপালেন। নব উদ্ভাবিত সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেকটি জীবাণুকে পৃথক করতে সক্ষম হলেন—সেগুলিকে আবার পুষ্ট ও পালন করে তাদের সন্ততিদের পুনঃ পৃথক করে পরীক্ষা করে চললেন। এই ভাবে তিনি প্রমাণ করলেন যে, প্রত্যেকটি জীবাণুর মধ্যে প্রো-ফাজ সত্যই অবস্থান করছে এবং কোষ-বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রো-ফাজও নবজাত কোষাণুতে গোপনে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁর যুক্তিধারা মোটামুটি এইরূপ—মাধ্যমের মধ্যে কখনও কখনও কোন একটি জীবকোষ লুপ্ত হয়ে বিমুক্ত ফাজ সৃষ্টি করে। আবার মাধ্যমকে সযত্নে পরিশুদ্ধ করে নিলেও রঞ্জেন রশ্মি, অতিবেগুনী আলো বা রাসায়নিক নানা দ্রব্যের সংস্পর্শে আনলে প্রত্যেকটি কোষের মধ্যেই ফাজের প্রাদুর্ভাব ঘটানো যায়—যার ফল হয় জীবাণুর বিনাশ ও প্রচুর ফাজের পুনঃ প্রকাশ। লুয়ফ এইভাবে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলেন, নববংশে ব্যাক্টিরিয়ার শরীরে প্রো-ফাজ গোপন থাকতে পারে। এর পরে প্রো-ফাজ বস্তুতঃ কি—তাই নিয়ে নানা অনুসন্ধান চলতে লাগলো। চেজ (Chase), লেডরমান (Ledermann) প্রমুখ বহু বিজ্ঞানী নানা পরীক্ষা করে স্থির করলেন—প্রো-ফাজ একটি বিশেষ ধরণের D.N.A. (Desoxy Ribonucleic Acid) molecule। এই জাতীয় D.N.A. বিজ্ঞানীরা Chromosome-এর জিনের অভ্যন্তরে ইতিমধ্যে নানা স্থানে আবিষ্কার করেছেন। প্রত্যেক Chromosome-সূত্রের মধ্যে সারি সারি নানা Gene-এর সমাবেশ, প্রত্যেক Gene কোষের বিশিষ্ট জাতি-ধর্মের কারণ ও তার জীবনযাত্রার নানা কার্য নিয়ন্ত্রণ করছে—এটি বর্তমানে সকল বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন। সারি সারি সজ্জিত জিনগুলির (Genes) প্রত্যেকটির অভ্যন্তরে নানা ভাবে গঠিত D. N. A.। পূর্ববর্ণিত ব্যাক্টিরিয়ার কোন একটি বিশেষ জিনের মধ্যে প্রো-ফাজ-এর D. N. A. সংলগ্ন হয়ে গেছে। কোষ-বিভাজনের সময় যে ভাবে অন্যান্য D. N. A. কণা বিভক্ত হয়ে পরে প্রাণক্রিয়ার প্রভাবে পূর্ণাঙ্গ হয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে' প্রোটিন-প্রস্তুতি নিয়ন্ত্রণ করে সন্তান-জীবাণু-কণায়—সেইরূপ প্রো-ফাজের D. N. A. বিভক্ত হয়ে আবার নব নব কোষ সন্ততির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ হয়ে বিরাজ করে। ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব ও তাঁর সহকর্মী নানা ভাবের পরীক্ষা করে Coli ব্যাসিলাসের Chromosome-এর ঠিক কোন্ স্থানে এই প্রো-ফাজ অবস্থান করছে, তাও প্রায় নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছেন। Coli-bacillus-এর মাত্র একটি Chromosome-সূত্র—তাই নানা পরীক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রজননবিদ্ জ্যাকবের কাজ এই ভাবে অগ্রসর হতে লাগলো। তবে যে প্রশ্নের সদুত্তর তখনও পাওয়া যায় নি, সেটি এই—যদি প্রো-ফাজের D. N. A. সময়মত পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে ব্যাক্টিরিয়ার প্রাকার ভেঙ্গে গলিয়ে

ফেলে আবার কোষের সেই সব মশলা নিয়ে ফাজের আবরণ তৈরি করে পূর্ণ ফাজের প্রকাশে কৃতকার্য হয়, তবে তারা কোষের মধ্যে সাধারণ D.N.A.-এর মত সব সময়ে সেই ক্রিয়াকলাপ প্রকট করে না কেন ?

লুয়ফ London-এ Royal Society-র সামনে বক্তৃতার সময় বললেন—কোন এক নিরোধক বস্তু রয়েছে প্রো-ফাজ-দুষ্ট কোষগুলির মধ্যে ; তারই প্রভাবে প্রো-ফাজের সর্বনাশা ক্রিয়া স্থগিত থাকছে। যদি সেটি না থাকতো তাহলে কোষ-গুলি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হতো। জ্যাকবের সুচিন্তিত পরীক্ষাগুলি লুয়ফের মতের সমর্থন করলো। Coli bacillus-এর মধ্যে জনক ও স্ত্রী-ধর্মী দুই রকমের কোষই বর্তমান আছে। তাদের সঙ্গম হলে জনকের Chromosome-সূত্র (Coli-এ মাত্র একটি সূত্র বর্তমান) আস্তে আস্তে স্ত্রী-কোষের শরীরে প্রবিষ্ট হয়—পূর্ণ-প্রবেশ ঘটতে লাগে প্রায় ২ ঘণ্টা—ওর মধ্যে যে কোন মুহূর্তে সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে কোষ দুটিকে তফাৎ করা যায়—তখনও হয়তো পুং-Chromosome-এর সবটি স্ত্রী-কোষের মধ্যে চলে যায় নি। নানাভাবে সঙ্গম স্থগিত করে এই ভাবে পরীক্ষা চালিয়ে জ্যাকব দেখাতে পারলেন, Chromosome-এর কোন এক বিশেষ স্থানে প্রো-ফাজ আশ্রয় করে আছে। আবার সঙ্গত-স্ত্রীকোষ কখনও কখনও প্রো-ফাজ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায়—আবার কখনও বা শরীরের মধ্যে পূর্ব থেকেই প্রো-ফাজ-D.N.A. থাকলে স্ত্রীকোষ পুং-Chromosome-কে ধারণ করে সাধারণভাবে পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হয়ে সন্তান-কোষরাশির জন্ম দিতে পারে। শেষোক্ত ঘটনা লুয়ফের কল্পনাকে সমর্থন করছে বলা যায়। সঙ্গমের ফল ভিন্ন হবার কারণ—স্ত্রীকোষে যখন নিরোধক বস্তু থাকে না, তখন তার বিনাশ ঘটে। পক্ষান্তরে প্রো-ফাজ নিঃসন্দেহে অবস্থান করলে ওই ধরণের সঙ্গমে স্ত্রীকোষ বিলুপ্ত হয়ে যায় না, কারণ তার শরীরে আগে থেকেই নিরোধক বস্তু বিরাজ করছিল।

এর কয়েক বছর আগে থেকেই জ্যাক মনো কোষের খাদ্য পরিপাক ও পুষ্টি নিয়ে কতকগুলি পরীক্ষা করছিলেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধেই উল্লেখ আছে যে, Coli ব্যাসিলাসের পুষ্টির মাধ্যমে একযোগে গ্লুকোস (Glucose) ও ল্যাক্টোস (Lactose), শর্করা জাতীয় এই দুই জিনিষ মিশিয়ে দিলে Coli-এর বংশবৃদ্ধি হতে থাকে, কলেবরের প্রোটিন ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। গ্লুকোস পরিপাক হয়ে যায়, তবে Lactose-এর কোন পরিবর্তন হয় না। এভাবে কিছুক্ষণ চললে মাধ্যমের গ্লুকোস একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখন কিছুক্ষণ স্থগিত থাকে বৃদ্ধি ও জীবাণুর উপনিবেশের প্রাণ-তৎপরতা। পরে আবার ল্যাক্টোসের (Lactose) পরিপাক সুরু হয় এবং বংশবৃদ্ধি ও পালনের কাজও অবাধে পুনঃপ্রবর্তিত হয়। এই রহস্যের মর্মকথা মনো প্রথমে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন, কোষের মধ্যে কতকগুলি জারক (Enzyme) প্রথম থেকেই অবস্থান করে, আবার কতকগুলি অবস্থা অনুযায়ী নতুন করে তৈরি হয়। গ্লুকোস-জারক (Enzyme) সব কোষের মধ্যেই আছে, কিন্তু গ্লুকোসের অভাবে পুষ্টির তাগিদে নতুন এক ধরণের জারক কোষের মধ্যে তৈরি হতে পারে, যা প্রথমে কোষের মধ্যে বর্তমান ছিল না। শুধু ল্যাক্টোস মাধ্যমে বর্তমান থাকায় এই নতুন জারকের সৃষ্টি করে জীবকোষ তার প্রাণবৃত্তির প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করলো। কোষে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব এবং তার ফলে নতুন ধরণের প্রোটিন সৃষ্টি হতে পারে, যা প্রথমে কোষ-শরীরে বর্তমান থাকে না। তার উদাহরণস্বরূপ এক রকমের পরীক্ষা ও তার ফলের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক ধরণের বন্য E. Coli ব্যাসিলাস পাওয়া যায়, যার

মধ্যে জারক β-Galactosidase খুব অল্প মাত্রায় বর্তমান। শর্করা জাতীয় Lactose-এর জারকটি মূলতঃ একটি প্রোটিন, যার মৌল তৌল ১৩৫,০০০। বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় যে, ওই ধরণের বন্য E. Coli-র পালনে মাধ্যমে কার্যকরী কোন বস্তু বাইরে থেকে না মিশালে গণনায় প্রতি কোষের অনুপাতে এই বিশেষ জারকের একটি অণুও আছে কিনা সন্দেহ। যদি Lactose কিংবা ওই ধরণের জিনিষ মাধ্যমে মিশিয়ে ওই বিশেষ জারকের চাহিদা বৃদ্ধি করা যায়, তবে দেখা যাবে ওই জারকের পরিমাণ প্রায় ১০০০ গুণ বেড়ে গিয়েছে; অর্থাৎ এই প্রোটিনটি আবশ্যক মত সৃষ্টি হয়ে পড়লো কোষের রসায়নাগারে। আবার যখন প্রয়োজন অন্তর্হিত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে জারকও মাধ্যম থেকে তাড়াতাড়ি অন্তর্হিত হয়ে যায়। অন্যান্য জিনিষ নিয়ে এই ধরণের পরীক্ষা অন্য জীবাণু নিয়ে করে অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়েছে। আবার এর পাল্টা খবরও রয়েছে। জারকের সাহায্যে খাদ্যবস্তু থেকে যে ধরণের প্রোটিন তৈরি হয়, তা যদি প্রথম থেকেই মাধ্যমে উপযুক্ত পরিমাণে মেশানো যায়, তবে কার্যকরী বিশেষ জারকের (Enzyme) সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে এবং প্রাথমিক মশলা মিশলেও খাদ্যবস্তু অব্যবহৃত ও অপরিবর্তিত থাকবে।

Azoto-bacter-কে (এক ধরণের ব্যাক্টিরিয়া) নানাস্থানে পাওয়া যায়। যে মাধ্যমে নাইট্রোজেন-ঘটিত কোন যৌগিক পদার্থ বর্তমান নেই, সেখানে Azoto-bacter বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে যৌগিক পদার্থে আবদ্ধ করে রাখে। আবার সেই শ্রেণীর Azoto-bacter-কে যদি এমন মাধ্যমে পালন করা যায়, যেখানে প্রথম থেকেই নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ বর্তমান, তাহলে তাদের বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করবার প্রবৃত্তি বন্ধ থাকবে। বহু বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের ফলে উদ্ঘাটিত জীবাণু-লোকের এই প্রকার অদ্ভুত চর্যাবৃত্তি আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে। বিশেষ বিশেষ অবস্থার সঙ্গে মিল রেখে নিজের প্রাণশক্তি পরিমিত ব্যয় করে জীবকোষ কিভাবে বৃদ্ধি, পুষ্টি ও বংশরক্ষার চাহিদা মেটায়, সেটি সত্যই গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। নিউক্লিয়াস, ক্রোমোজোম ও জিনের কথা দিয়ে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। তবে কোষ পূর্ণ করে যে জেলীপ্রায় Cytoplasm রয়েছে, তার মধ্যেই পরিপাক ও নতুন প্রোটিনের সৃষ্টি চলছে—তা আমাদের ভুললে চলবে না। জীবন-বৃত্তির জন্যে প্রতিপদে কোষের নানা জারকের (Enzyme) দরকার হয়, তাদের সাহায্যেই খাদ্যরসকে রূপান্তরিত করে কোষদেহের পুষ্টি সাধিত হয়। এই জারক বস্তুগুলি বিশেষ বিশেষ ধরণের প্রোটিন।

জীবনবৃত্তির বিশ্লেষণ করে আমরা শেষ অবধি বুঝেছি, কয়েকটি প্রধান অ্যামিনো অম্ল (Amino acid) থেকে নানাভাবে সংযোজন করে ভিন্ন ভিন্ন কার্যের উপযোগী প্রোটিন সৃষ্টিই কোষের প্রধান কাজ। হর-রকমের প্রোটিনকে রাসায়নিক প্রথায় ভেঙ্গেচুরে আমরা প্রায় ২০টি মুখ্য অ্যামিনো অম্ল (Amino acid) পেয়ে থাকি। সব রকমের জীবদেহে বিভিন্ন প্রকার প্রোটিনের আদিম উপাদান এই ন্যূনাধিক বিশটি অ্যামিনো অম্ল। সব জীবের দেহের মধ্যেই এরা রয়েছে। সংযোজন সজ্জার অদল-বদল করে এই বিশটি আদিম উপাদান থেকে অসংখ্য প্রকারের প্রোটিনবস্তু তৈরি হতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ প্রকারের প্রোটিন বিশেষ জীবাণুর দেহের উপাদান এবং কোন এক প্রকারের জীবদেহে এই সব বিশেষ ধরণের প্রোটিন তৈরি হয়ে যায় বংশপরম্পরায় অভিন্নভাবে। জাতির ঐতিহ্য নিহিত রয়েছে এর মধ্যে। যদিও রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে থাকে Cytoplasm-এর নানাস্থানে, তবু তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে Chromosome-এর

মধ্যের জিনগুলি—মূলতঃ এই কথা মেনে নিয়েই আমরা বংশরীতির সংরক্ষণ-প্রণালী বুঝতে পারি। জিনগুলিই যে সৃষ্টির নিয়ামক, নানাভাবের পরীক্ষার ফলে আমরা এই ধারণায় উপনীত হয়েছি। যদি কোন উপায়ে জিনকে প্রভাবিত করে তাদের উপাদান বা গঠন-বৈচিত্র্যে আমরা রূপান্তর ঘটাতে পারি, তবে তার ফল প্রকাশ পায় জীববংশের বাহ্যিক আকৃতিভেদে (যেমন Drosophila বা Neurospora-র মধ্যে লক্ষ্য করেছি)। তাই বিজ্ঞানীরা এখন স্থির করেছেন যে, বিশেষ বিশেষ জিন বিশেস বিশেষ রকমের জারক সৃষ্টির মূলে রয়েছে। জারকগুলি কিন্তু কোষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উদ্ভূত হয়ে থাকে। জিনগুলি সেই সব প্রক্রিয়াকে কিভাবে স্ববশে রাখতে পারে—এইটিই কোষ-ধর্ম আলোচনার প্রধান সমস্যা। পর পর ২টি প্রধান আবিষ্কার আমাদের এই সমস্যার মর্ম উদ্ঘাটন করতে সাহায্য করেছে। প্রথম Watson ও Crick দেখালেন—জিনের D. N. A -গুলির মধ্যে এক বিশেষ রকমের রচনা রয়েছে, যাকে ভাবা যায় প্রোটিন সৃষ্টির সঙ্কেতবাণী। Guanine, Adenine, Uracil বা Thymine ও Cytosine যেভাবে D. N. A.-এতে সজ্জিত রয়েছে, তার মধ্যেই এই সঙ্কেতবাণী খুঁজতে হবে।

এর পরে মনো ও জ্যাকব দেখালেন যে, D. N. A. যৌগ দ্বিত্ব হয়ে একভাবে R.N. A. উপাদানের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে একটি নতুন ধরণের বস্তু তৈরি করতে পারে, যাকে মনে করা যেতে পারে জিন থেকে Cytoplasm-এ বিশেষ স্থানে অবস্থিত রসায়নাগারের একটি বিশেষ আদেশের বার্তাবহ।

এই আদেশ এসে পৌঁছে গেলে—যে ছাঁচ দূত বহন করে নিয়ে এলো—সেই মত অ্যামিনো অম্লের সজ্জা নিয়ন্ত্রণ করে এক বিশেষ ধরণের প্রোটিনের সৃষ্টি হলো। বিশেষ ধরণের বস্তুর সৃষ্টি এই ভাবে চলতে লাগলো। Cytoplasm-এর কার্যকলাপ Chromosome-এর জিনগুলির দ্বারা এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই দৌত্যকার্যে ব্রতী R.N A.-এর (Messenger) অস্তিত্ব প্রমাণ ও প্রকাশ করে জ্যাকব ও মনো যশস্বী হয়েছেন। Chromosome-এর মধ্যে অবস্থিত জিনগুলি শুধু যে ছাঁচ তৈরি করবার জন্যে বর্তমান তা নয়, বিশেষ বিশেষ জিনসংলগ্ন Chromosome-এর মধ্যে এমন কেন্দ্রস্থানের মনো ও জ্যাকব কল্পনা করেছেন, যারা আদেশ দিলেই তবে ছাঁচ তৈরির কাজ সন্নিহিত জিনগুলির মধ্যে চলতে পারে। এরাই জ্যাকব ও মনোর কল্পিত Operon। আবার Operon-এর আদেশবাণীতে প্রেরণকার্য বন্ধ হয়ে থাকে নিরোধক বস্তুর প্রভাবে।

এই নিরোধক বস্তু যেন Operon-এর আদেশ নির্গমনের পথ অর্গলবদ্ধ করে রেখেছে। বস্তুর অভাব পড়লেই এই নিরোধকের প্রভাব নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তখনই আদেশবাণী নির্গত হয়ে জিনগুলিকে প্রবৃত্ত করে তাদের নির্দিষ্ট কর্মে। আবার অভাব পূর্ণ হয়ে গেলে সৃষ্ট প্রোটিনের বাহুল্য ঘটলেই নিরোধকের প্রভাব পুনঃ প্রকটিত হয়ে পড়ে, তখন আদেশবাণী আর নিঃসৃত হতে পারে না এবং জিনগুলির তৎপরতা তখন বন্ধ হয়ে যায়।

লুয়ফ যে নিরোধক বস্তুর কল্পনা করে প্রো-ফাজের সর্বনাশা প্রবৃত্তির সংযম সম্ভব ভেবেছিলেন, ফাজ-দুষ্ট জীবকোষসমূহে জ্যাকব ও মনো নানাবিধ পরীক্ষা করে দেখালেন, অন্যান্য জিনের D.N.A.-র কাজ স্তম্ভিত রাখতে ঠিক একই ধরণের নিরোধক বস্তুর কল্পনা করতে হয়। মনো, জ্যাকব ও লুয়ফের কল্পনা নানাবিধ পরীক্ষার ফলে সমর্থিত হয়েছে। জীবকোষের প্রাণবৃত্তিকে এখন এক স্বয়ংক্রিয় কারুশালার সঙ্গে তুলনা করা চলে। বর্তমান যুগে এমন সব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে,

যাদের সুষ্ঠু তৎপরতা মানবকর্মীর উপর নির্ভর করে না। বিশেষ কোন কর্মপদ্ধতির উপযুক্ত যন্ত্র উদ্ভাবিত হলে নানা জটিল পরিস্থিতির মধ্যে যন্ত্রই নিজের ক্রিয়াকলাপ সুপথে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে অল্প সময়ের মধ্যে এমন ফলপ্রসূ হতে পারে, যা মানুষ সাধারণ হাতিয়ার ও নিজেদের কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করলে বহু দিন, মাস বা বছর পরিশ্রমের পর অনুরূপ ফল হস্তগত করতে পারতো।

Chromosome-এর মধ্যে জিনসমূহের বিষয় আমরা এতদিন ভেবে এসেছি যে, সেগুলি জীবের বিশেষ বিশেষ চরিত্র বা কর্মপদ্ধতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে। লুয়ফ, মনো ও জ্যাকব প্রমাণ করেছেন যে, জিনগুলির মধ্যে এমন সব সত্ত্বাও রয়েছে, যারা অন্য জিনসমূহের প্রবৃত্তি বা কার্যকলাপ উদ্রেক বা প্রতিরোধ করে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রচালিত কারখানার চাবি-ঘরের (Switch-board) মত তাদের তাঁরা Operon বলেছেন। নিউক্লিয়াসের মধ্যে যেন এক বিদ্যুৎ-চালিত কৃত্রিম মস্তিষ্ক বর্তমান রয়েছে! সেখান থেকে আদেশমত বস্তু-সৃষ্টি সুরু হয় বা স্থগিত থাকে—ওই সব বস্তু-সৃষ্টিই কোষের জীবনযাত্রায় একান্ত প্রয়োজন। কোষ-দেহের স্থানে স্থানে সে সবের প্রস্তুতি চলেছে। তবে নিউক্লিয়াসই নির্দেশক, সে আদেশ পাঠাবে কোষের Cytoplasm-এ স্থিত কারখানে—বস্তুর অভাব পড়লে কাজ সুরু করতে বা যখন বস্তু উপযুক্ত পরিমাণে তৈরি হয়ে রইলো, তখন তারই আদেশে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

এই ভাবে কোষের কার্যকলাপের রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটিত করে ফরাসী বিজ্ঞানীত্রয় প্রমাণ করেছেন, প্রকৃতি যে ভাবে কাজ করছেন কোষের মধ্যে, আমাদের সমাজের অর্থনীতিবিদ বা পথ-নির্দেশকেরা সেগুলিকে অধ্যয়ন করে কি ভাবে প্রয়োজন-মত বস্তুর সৃষ্টি ও তার ব্যবহারের মধ্যে সমীচীন সাম্য আনা যায়, তারই পথ-নির্দেশ পাবেন। এই সব সত্য আবিষ্কারের জন্যে লুয়ফ, মনো ও জ্যাকব নোবেল পুরস্কাররূপ জয়মাল্যে ভূষিত হয়েছেন। স্টকহল্মের বিচারকেরা বলেছেন—প্রোফেসর মনো, জ্যাকব ও লুয়ফ প্রাণশক্তি কিভাবে সর্বত্র কাজ করছে, সে বিষয়ে নানা আবিষ্কার করে আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার বিশেষ-ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রাণ কিভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলে, বংশরক্ষা করে বা প্রগতির পথে চলে, তাঁদের অনুসন্ধানের ফলে আমরা আজ অনেকখানি বোঝবার পথে এগিয়ে গিয়েছি।

বহু বছর বাদে ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা নোবেল পুরস্কার অর্জন করলেন। ১৯৩৫ সালে ফ্রেডরিক জোলিওর পর অনেক দিন ফ্রান্সের ঘরে এই পুরস্কার আসে নি। দ্যগল নাকি একবার বলেছিলেন, বহু অনুসন্ধানশালা তো চলছে, কিন্তু তার চাক্ষুষ ফল কই? পাশের ছবিতে তিন বন্ধুকে দেখা যাচ্ছে—পুরস্কারের খবর পেয়ে তাঁরা আনন্দ করছেন। সারা দেশ তাঁদের চেনে এবং এই খবরে ফরাসী মাত্রেই আনন্দিত হয়েছেন। বর্তমান যুগে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত নানা অনুসন্ধানাগারের তুলনায় পাস্তুর-ইনস্টিটিউটের যন্ত্র ও অর্থ-সামর্থ্য খুবই সাধারণ। তবু উজ্জ্বল মনস্বিতা ও ঐকান্তিক সাধনার ফলেই এই অসাধ্য সাধন সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া রাজনৈতিক মতবাদে ভিন্ন দিকে ঝুঁকলেও (মনোকে বামপন্থী বলা চলে) আমেরিকা থেকে এই কয়েক বছর অনুসন্ধানের জন্যে তাঁরা যে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন, ফরাসী বিজ্ঞানীরা এও মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

আঁদ্রে লুয়ফ   জ্যাক মনো   ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব

বিজলি-মেঘে বিদ্যুতের সমাবেশ

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

বিজলি-ঝড়ের প্রাক্কালে মেঘপুঞ্জে ধন ও ঋণ-বিদ্যুতের সমাবেশ সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ যে সব তথ্য আমাদের আজ পর্যন্ত জানা আছে—তত্ত্বের দিক থেকে তার ব্যাখ্যা বহু বছর থেকেই চলে এসেছে। আমরা জানি, কখনও কখনও মেঘপুঞ্জের প্রায় সব স্থানেই ঋণ-বিদ্যুতের নিদর্শন পাওয়া যায়। একথাও অবিদিত নয় যে, অনেক ক্ষেত্রেই আবার মেঘের উপরের দিকে ধন-বিদ্যুৎ আর মাঝামাঝি ও নীচের দিকে ঋণ-বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে। ক্বচিৎ কখনও মেঘের নিম্নাংশে কিছু স্থান জুড়ে অল্প পরিমাণে ধন-বিদ্যুতের সন্ধান পাওয়া যায়। মেঘপুঞ্জের নিম্ন স্তরের এই যৎকিঞ্চিৎ ধন-বিদ্যুতের কথা যদি আমরা না ধরি, তবে মেঘের ঊর্ধ্বাংশে ধন-বিদ্যুৎ আর মধ্য ও নিম্নাংশে ঋণ-বিদ্যুৎ—সাধারণতঃ এইরূপ দ্বি-মেরুবিশিষ্ট মেঘখণ্ডের পরিকল্পনা পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা বলা যায়। কি প্রক্রিয়ায় মেঘপুঞ্জে এরকম ধন ও ঋণ-বিদ্যুৎ পৃথকভাবে সৃষ্ট হয়—বহু বছর থেকেই বিজ্ঞানীরা তার কারণ নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। তথ্য থেকেই তত্ত্বের উৎপত্তি। এই প্রবন্ধে মেঘ-পুঞ্জে ধন ও ঋণ-বিদ্যুতের পৃথকীকরণ সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা হয়েছে, তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাবে। কতকগুলি ব্যাখ্যা হয়তো তত্ত্বের পর্যায়ে ফেলা যায় না—পরিকল্পনা মাত্র বলা যেতে পারে।

১। এলষ্টার ও গাইটেলের (Elster and Geitel) পরিকল্পনা (১৮৮৫-১৯১৩)

পরীক্ষায় জানা যায় যে, উত্তম আবহাওয়ায় ভূতলের ঠিক উপরে এক ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল বর্তমান থাকে। এই বৈদ্যুতিক বলের ফলে কোনও ধন-বিদ্যুৎ উপর থেকে নীচে নেমে আসে, অথবা কোনও ঋণ-বিদ্যুৎ নীচ থেকে উপরে উঠে যায়। একেই বলা হয় উত্তম আবহাওয়ায় পৃথিবীর উপর পজিটিভ বৈদ্যুতিক বল। পরীক্ষালব্ধ এই পজিটিভ বৈদ্যুতিক বল যদি মেনে নেওয়া যায়, তবে বলতেই হয় যে, বায়ুর উচ্চস্তরে কিছু পরিমাণ ধন-বিদ্যুৎ সঞ্চিত আছে এবং এই একই পরিমাণ ঋণ-বিদ্যুৎ ভূতলে আবিষ্ট থাকে।

মনে করা যাক, একটি নাতিবৃহৎ বিদ্যুৎ-বিহীন জলের বিন্দু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ফলে ভূতলের দিকে নেমে আসছে। ঊর্ধ্বাধঃ পজিটিভ বৈদ্যুতিক বলের জন্যে গোলাকার জলবিন্দুটির উপরিভাগ ঋণ-বিদ্যুতে এবং নিম্নভাগ ধন-বিদ্যুতে আবিষ্ট হবে সন্দেহ নেই। এই জলবিন্দু যখন ভূতলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, তখন তার তলদেশে অনেক ছোট ছোট জলকণা বা তুষারকণার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে এই কণাগুলি জলবিন্দুটির নিম্নভাগের মুক্ত ধন-বিদ্যুতের কিছু অংশ গ্রহণ করে। সমধর্মী বিদ্যুতে-বিদ্যুতে বিকর্ষণের ফলে ছোট ছোট কণাগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে উপরের দিকে উত্থিত হয়। নাতিবৃহৎ জলবিন্দুটি যতই নীচে নামে, ততই তার তলদেশ আরো অনেক ছোট ছোট কণার সংঘর্ষে আসে। সংঘর্ষের ফলে ক্ষুদ্র কণাগুলি জলবিন্দুটির নিম্নভাগের ধন-বিদ্যুতের অংশ গ্রহণ করায়, জলবিন্দুটির নিম্নভাগের ধন-বিদ্যুৎ ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত জলবিন্দুটির উপরিভাগের ঋণ-বিদ্যুৎ জলবিন্দুটির বহির্ভাগের

সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং এই সম্পূর্ণ ঋণ-বিদ্যুৎ-সম্পন্ন জলবিন্দু ভূতলে এসে নামে। পূর্বেই বলা হয়েছে, কি ভাবে ছোট ছোট কণা নাতিবৃহৎ জলবিন্দুটিকে এড়িয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। বেগবিশিষ্ট ছোট ও বড় জলকণা একই বা বিপরীত দিকে যেতে যেতে যখন একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায়, তখন ছোট কণাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বড় কণার সঙ্গে মিলে যায়। এই
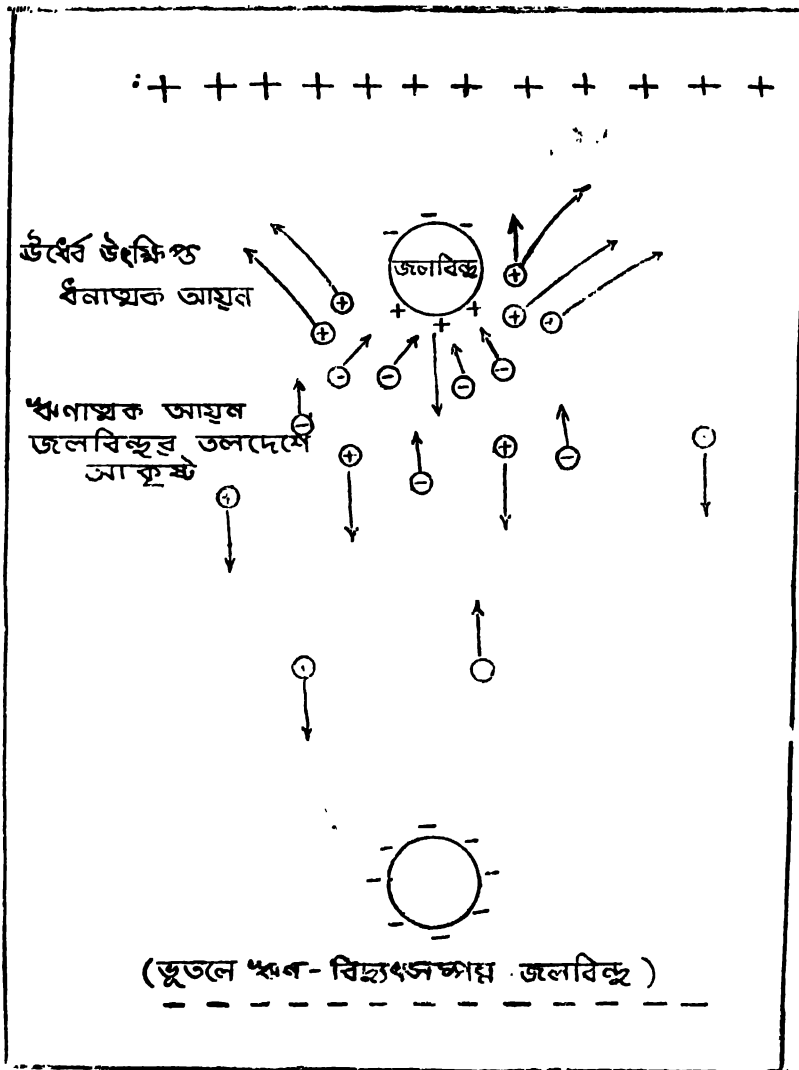
১নং চিত্র।

উইলসনের তত্ত্ব

এই ভাবেই উচ্চ বায়ুস্তরে ধন-বিদ্যুৎ ও ভূতলে ঋণ-বিদ্যুৎ দেখা যায়।

পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে যে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। বিভিন্ন মিলে যাওয়া (যাকে ইংরেজিতে Coalescenee বলা হয়) এলস্টার-গাইটেলের পরিকল্পনায় ধরাই হয় নি। কাজেই তাঁদের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

২। সি. টি. আর. উইলসনের (C. T. R. Wilson) তত্ত্ব (১৯২৯)

ভাল আবহাওয়ায় পৃথিবীর উপর যে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল দেখা যায়—সি. টি. আর. উইলসনের তত্ত্বের গোড়াকার কথাও এই বৈদ্যুতিক বল। মেঘের ভিতরে বিদ্যুৎক্ষরণের পর বড় বড় বিদ্যুৎবিহীন জলবিন্দু ও ছোট ছোট ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন (Ion) বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে। ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের ক্ষেত্রে বড় জলবিন্দুটির উপরিভাগ ঋণ-বিদ্যুতে ও নিম্নভাগ ধন-বিদ্যুতে আবিষ্ট হয় এবং এই দ্বি-মেরুবিশিষ্ট জলবিন্দুটি মাধ্যাকর্ষণের ফলে ধীরে ধীরে ভূতলে নামতে থাকে। ধনাত্মক ছোট আয়নগুলিও এই বৈদ্যুতিক বলের ক্ষেত্রে দ্রুত নীচের দিকে নেমে আসে আর ঋণাত্মক আয়নগুলি ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে। ধনাত্মক আয়নগুলি যদি অপেক্ষাকৃত মন্থরগতি হয়, তবেই দ্রুতগামী বড় জলবিন্দুটি অতি সত্বর অগ্রগামী ধনাত্মক আয়নগুলির সন্নিকটস্থ হয়। এই অবস্থায় ধনাত্মক আয়নগুলি বড় জলবিন্দুটির তলদেশস্থ ধনবিদ্যুতের বিকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে যায়। এইভাবে উচ্চ বায়ুস্তরে ধন-বিদ্যুৎ সঞ্চিত হতে থাকে। অন্য পক্ষে ঋণাত্মক আয়নগুলি ঊর্ধ্বাধঃ পজিটিভ বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে উপরে দিকে উঠে বড় জলবিন্দুটির তলদেশের ধনবিদ্যুতে আকৃষ্ট হয়। ফলে ধন-বিদ্যুৎ ও ঋণ-বিদ্যুতে মিলে জলবিন্দুটির তলদেশস্থ ধন-বিদ্যুৎ ক্রমশঃ নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং জলবিন্দুটির উপরিভাগস্থ ঋণ-বিদ্যুৎ সমগ্র বিন্দুটিকে আচ্ছন্ন করে। এই ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন জলবিন্দুই ভূতলে নেমে ঋণ-বিদ্যুতের সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়ায় যখন ঊর্ধ্বে ধন-বিদ্যুৎ ও ভূতলে ঋণ-বিদ্যুৎ পর্যাপ্তভাবে সঞ্চিত হয়, তখনই হয় বিদ্যুৎ-ক্ষরণ বা বিদ্যুৎপাত।

উইলসনের তত্ত্বের প্রধান সর্ত এই যে, অগ্রগামী ছোট ছোট আয়নের গতিবেগ পশ্চাৎ-গামী জলবিন্দুটির তুলনায় কম হওয়া চাই। জলবিন্দুটির পতনবেগ যদি v ধরা যায় আর প্রতি সেন্টিমিটারে ১ ভোল্ট বৈদ্যুতিক বলের ক্ষেত্রে যদি ধনাত্মক আয়নগুলির গতিবেগ হয় k_+, তবে প্রতি সেন্টিমিটারে E ভোল্ট বৈদ্যুতিক বলের ক্ষেত্রে $v > k_+ . E$. জলবিন্দুটির পতনবেগ যদি সেকেণ্ডে ৮ মিটার ধরা যায় আর যদি k_+-এর যথাযথ পরিমাণ নেওয়া হয়, তবে বৈদ্যুতিক বল E অন্ততঃ পক্ষে প্রতি সেন্টিমিটারে ৫০০ ভোল্টের বেশী হওয়া উচিত নয়। বেশী হলেই উইলসনের প্রক্রিয়া কার্যকরী হবে না।

হুইপ্‌ল্ ও চামার্স (Whipple ও Chalmers, 1944) উইলসনের এই তত্ত্বের গাণিতিক রূপ দিয়েছিলেন। একথা সকলেই জানেন যে, বায়ুস্তরে যেখানে মেঘ দেখা যায়, সেখানকার শৈত্যে জল বরফে পরিণত হবারই কথা। কাজেই জলবিন্দুর কথা এই ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত নয়। চামার্স (১৯৪৭) অবশ্য দেখিয়েছেন যে, বরফকণার ক্ষেত্রেও উইলসন প্রক্রিয়া কাজ করে। সম্প্রতি আবহ-বিজ্ঞানী মেসন (Mason) পরীক্ষা ও গণনা করে বলেছেন যে, বিজলি-ঝটিকায় যে পরিমাণ ধন ও ঋণ-বিদ্যুৎ দেখা যায়, তার ভগ্নাংশও উইলসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হতে পারে না; তবে মেসন সাহেবের গণনা ও পরীক্ষায় কোনও ভুল আছে কি না, কোনও বিজ্ঞানী এখন পর্যন্ত সে সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করেন নি।

ভাল আবহাওয়ায় পৃথিবীর উপর যে ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বল দেখা যায়, তার উপর ভিত্তি করে উইলসন এবং তার আগে এলস্টার ও গাইটেল উচ্চ বায়ুস্তরে ধন-বিদ্যুৎ ও ভূতলে ঋণ-বিদ্যুতের সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই ব্যাখ্যার মূলগত একটা দোষ রয়ে গেছে। উত্তম আবহাওয়ায় ঊর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক

বলের কারণ কি? কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে, যেখানে বজ্র ও বিদ্যুত-পাত ঘটছে—দ্বিমেরু-বিশিষ্ট মেঘের নিম্নভাগ থেকে প্রচুর পরিমাণে (২০-৩০ কুলম্ব্) ঋণ-বিদ্যুৎ ভূতলে নেমে আসে এবং এরই ফলে যে সব স্থানে বাজ ও বিদ্যুৎ নেই, সেই সব স্থানেও উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের সৃষ্টি হয়। এখন যদি বিদ্যুৎপাতের আগে উচ্চ বায়ুস্তরে ধন-বিদ্যুৎ ও ভূতলে ঋণ-বিদ্যুতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উত্তম আবহাওয়ায় উর্ধ্বাধঃ বৈদ্যুতিক বলের কথা আবার পাড়া যায়, তবে তা নিতান্তই অযৌক্তিক। নিজের পরিহিত জুতার ফিতা ধরে নিজেকে উর্ধ্বে তোলবার সঙ্গে তুলনা করলেই এই যুক্তির অসঙ্গতি বোঝা যাবে।

৩। ওয়ালের (Wall) তত্ত্ব (১৯৪৮)

মেঘের ভিতরের শৈত্য বরফের চেয়েও বেশী—কাজেই সাধারণতঃ মেঘের অভ্যন্তরে তুষার-কণাই থাকে। বরফ হচ্ছে ছয়-কোণ ও ছয় তলবিশিষ্ট কেলাস (Hexagonal crystal)। ওয়ালের মতে বরফের একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক গুণ আছে, যার ফলে বরফের উপর চাপের তারতম্যে বরফের দু'পাশে পরস্পর বিপরীত বৈদ্যুতিক বিভবের সৃষ্টি হয়। এই বিদ্যুৎকেই Piezo-electricity বলে। বরফের কেলাস যখন মাধ্যাকর্ষণের ফলে নীচে নামে—কেলাসের অক্ষের দিকেই তা খাড়াভাবে নামতে থাকে। Piezo-electric গুণের জন্যে বায়ুর চাপের প্রভাবে বরফের তলদেশে ধনাত্মক বিদ্যুৎ ও উপরের দিকে ঋণাত্মক বিদ্যুতের সঞ্চার হয়। এই দ্বি-মেরুবিশিষ্ট বরফের কেলাস যখন ভূতলে নেমে আসে, উইলসন বর্ণিত একই প্রক্রিয়ায় উচ্চ বায়ুস্তরে তখন ধন-বিদ্যুৎ ও ভূতলে ঋণ-বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি মেসন (Mason) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বরফের কেলাসে এই Piezo-electric সন্ধান পান নি। সুতরাং ওয়ালের তত্ত্বটিও সন্দেহাতীত নয়।

৪। ফ্রেঙ্কেলের (Frenkel) তত্ত্ব (১৯৪৪-৪৭)

ফ্রেঙ্কেলের মতে মেঘের অভ্যন্তরে বরফের গায়ে যেখানে জল জমে, সেখানে একটা পাৎলা যুগ্মস্তরের সৃষ্টি হয়। এই যুগ্মস্তরের ভিতর জলের অসংখ্য অণুর আদান-প্রদান চলতে থাকে। জলের অণুগুলি দ্বি-মেরু গুণসম্পন্ন (Bipolar)। ফ্রেঙ্কেল প্রমাণ করেন যে, অণুগুলির পরিসংখ্যায়ন-মূলক সাম্যাবস্থায় বরফের উপরকার জলকণাগুলি ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন হয়ে যায় ও জলকণার পারি-পার্শ্বিক বায়ু ধন-বিদ্যুৎসম্পন্ন হয়। মাধ্যাকর্ষণের ফলে ভারী জলকণাগুলি দ্রুতবেগে ভূতলে নেমে আসে; কাজেই বায়ুর উচ্চস্তরে ধন-বিদ্যুৎ ও নিম্নস্তরে ঋণ-বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়। ফ্রেঙ্কেলের তত্ত্বের বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। পরবর্তী-কালে Gunn প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই বিষয় নিয়ে বহু পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান করেছেন।

৫। সিম্‌সনের (Simpson) তত্ত্ব (১৯০৯)

প্রথম নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত বিজ্ঞানী লেনার্ড-এর (Lenard) পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে কিউ (Kew) মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ সিম্‌সন মেঘপুঞ্জে বিদ্যুতের সমাবেশ সম্বন্ধে এক তত্ত্বের অবতারণা করেন। ১৮৯২ সালে লেনার্ড দেখিয়েছিলেন যে, বায়ু-প্রবাহ যদি সবেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করা হয় এবং এই বায়ু-প্রবাহ যদি কোনও জলবিন্দুর উপর গিয়ে আঘাত করে, তবে উৎক্ষিপ্ত বায়ু ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন ও আঘাত-প্রাপ্ত জলের বিন্দুটি ধন-বিদ্যুৎসম্পন্ন হয়। লেনার্ডের পরীক্ষা নানাভাবে বার বার সম্পন্ন করে সিম্‌সন কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যথা—

(১) বায়ু-প্রবাহ যদি সেকেণ্ডে ৮ মিটার বেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ৫ মি. মি. বা তার কম ব্যাসের জলবিন্দুর উপর গিয়ে পড়ে, মাধ্যাকর্ষণ সত্ত্বেও জলবিন্দু কখনই নীচে নামতে পারে না।

(২) জলবিন্দুর ব্যাস যদি ৫ মি. মি. অপেক্ষা বড় হয়, তবে তা ভেঙ্গে ছোট ছোট বিন্দুতে বিভক্ত হয়ে যায়। ৫ মি. মি. অপেক্ষা বড় ব্যাসের ফোঁটাগুলি নীচে নেমে আসে আর ছোট ফোঁটাগুলি ঊর্ধ্বেই ভাসমান থাকে।

(৩) ভাঙ্গনের ফলে বড় ফোঁটাগুলিতে ধন-বিদ্যুৎ ও ছোট ফোঁটাগুলিতে ঋণ-বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়।

মনে করা যাক, কোনও প্রাকৃতিক কারণে বায়ু-প্রবাহ হঠাৎ ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়েছে। বায়ুমণ্ডলে যদি সমধিক জলীয় বাষ্প থাকে, হঠাৎ সম্প্রসারণের ফলে তা জলবিন্দুতে পরিণত হয়। আমাদের দেশে গ্রীষ্মের ঠিক আগে জলীয় বাষ্পে পূর্ণ বায়ু হঠাৎ এমনিভাবে উপরের দিকে উঠতে দেখা যায় এবং জলীয় বাষ্প জলবিন্দুতে পরিণত হয়ে পুঞ্জমেঘের (Cumulus) সৃষ্টি করে। দ্রুত বায়ু-প্রবাহের ফলে জলের বড় ফোঁটাগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট হয়ে যায়। ছোট ফোঁটাগুলি ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন—কাজেই ঊর্ধ্বগামী বায়ু-প্রবাহে ছোট ফোঁটাগুলি যখন উপরে উঠে যায়, মেঘখণ্ডেও তখন ঋণ বিদ্যুৎ দেখা যায়। বড় ফোঁটাগুলি ধন-বিদ্যুৎসম্পন্ন—ভারী বলে সেগুলি ধন-বিদ্যুৎসম্পন্ন বৃষ্টির জল হয়ে ভূতলে পড়ে।

২নং চিত্র।
লেনার্ডের পরীক্ষা

সিম্‌সনের তত্ত্বের দোষ এই যে, তিনি মেঘের অভ্যন্তরে জলবিন্দুর কথাই কেবল আলোচনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মেঘের মধ্যে যে শৈত্য, তাতে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে জলকণা থাকা সম্ভব নয়—প্রচুর বরফকণাই সেখানে বর্তমান। নিম্নস্তরে যেখানে জলকণাই শুধু মেঘের অঙ্গ—সিম্‌সনের তত্ত্ব সেখানেই প্রযোজ্য। সুতরাং মেঘের মধ্য বা নিম্নস্তরের ঋণ-বিদ্যুতের সমাবেশ কেন দেখা যায়, তার সুন্দর ব্যাখ্যা সিম্‌সনের তত্ত্বে পাওয়া যায়। মেঘের উচ্চস্তরে কেন ধন-বিদ্যুতের সমাবেশ হয়, সিম্‌সন এবং স্ক্রেস (Simpson and Scrase, 1937) তারও ব্যাখ্যা অনেক পরে দিয়েছিলেন। এঁরা পরীক্ষা করে

দেখান যে, যদি কোনও বরফখণ্ডের উপর বায়ু-প্রবাহ সবেগে আঘাত করে, তবে বরফখণ্ডটিতে ঋণবিদ্যুৎ এবং উৎক্ষিপ্ত বায়ুতে ধন-বিদ্যুৎ দেখা যায়। এই পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে তাঁরা বলেন যে, মেঘের উচ্চস্তরে এই প্রক্রিয়ার ফলেই ধন-বিদ্যুতের সমাবেশ হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য সিম্‌সনের তত্ত্বটি শুধু পরীক্ষামূলক তথ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা একে বলা চলে না। এখানে বলা প্রয়োজন, জেলেনী (Zeleny, 1933) এবং অনেক পরে চ্যাপ্‌ম্যান (Chapman, 1950) সিম্‌সনের তত্ত্বটির সমর্থন করেন। সম্প্রতি আবহ-বিজ্ঞানী মেসন (Mason) হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, বিজলি-ঝড়ের সময় যে পরিমাণ বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, সিম্‌সনের প্রক্রিয়ায় তার ভগ্নাংশেরও উৎপত্তি সম্ভব নয়!

৬। মেসনের (Mason) প্রোটন-স্থানান্তর তত্ত্ব (১৯৬২)

মেঘপুঞ্জে বিদ্যুৎ-সমাবেশ সম্পর্কে বিজ্ঞানী মেসনের (Mason) আধুনিক তত্ত্বটি আলোচনা করে আমার বক্তব্য শেষ করা যাক। মেসনের তত্ত্বটি মোটামুটি এই:—তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে জলে বা বরফে ধনাত্মক প্রোটন (Proton H^+) ও ঋণাত্মক হাইড্রক্সিল (Hydroxyl OH^-) আয়ন বর্তমান থাকে। উষ্ণতা বেশী হলে এই দু'রকম আয়নের সংখ্যা বেড়ে যায় সত্য, কিন্তু H^+-আয়নের ব্যাপন (Diffusion) OH^--আয়নের তুলনায় অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়।
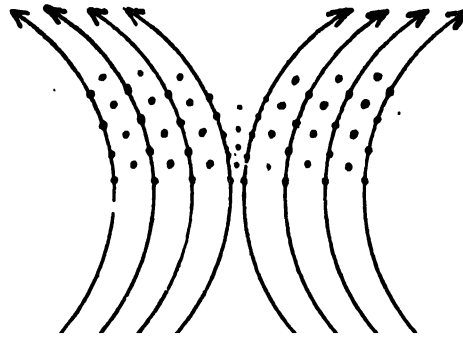
৩নং চিত্র।
ঊর্ধ্বে উত্থিত বায়ু-প্রবাহে জলীয় বাষ্পের জলবিন্দুতে পরিণতি। (সিম্‌সনের তত্ত্ব)

এখন এক খণ্ড বরফের কথা ধরা যাক। যদি কোনও কারণে এই বরফখণ্ডের মধ্যে শৈত্যের তারতম্য হয়, তবে কম-ঠাণ্ডা স্থান থেকে H^+-আয়ন, OH^--আয়নের তুলনায় অনেক অধিক সংখ্যায় বেশী-ঠাণ্ডা স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়। ফলে বেশী-ঠাণ্ডা স্থানটিতে ধন-বিদ্যুৎ এবং কম-ঠাণ্ডা স্থানটিতে ঋণ-বিদ্যুৎ সঞ্চিত হতে থাকে। এই আপেক্ষিক ব্যাপন-ক্রিয়া অল্পক্ষণ পরেই থেমে যায়, কারণ এই পরিস্থিতিতে বিপরীত দিকে একটি বৈদ্যুতিক বলের উদ্ভব হয়, যার জন্যে H^+-আয়নের গতি ব্যাহত হয় ও OH^--আয়ন ত্বরান্বিত হয়। ক্রমে এমন একটি সাম্যের অবস্থা আসে—যখন বেশী-ঠাণ্ডা স্থানটিতে স্থায়ী একটি

ধনাত্মক বিভবের ও কম-ঠাণ্ডা স্থানটিকে একটি ঋণাত্মক বিভবের সৃষ্টি হয়।

ধরা যাক, শিলাবৃষ্টির সময় কোনও একটি শিলাখণ্ডের সঙ্গে নিকটবর্তী কোনও জলবিন্দুর সংঘর্ষ হলো। আমরা জানি মেঘের অভ্যন্তরে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচেও অনেক সময় জল তরল অবস্থাতেই থাকে। একে বলা হয় 'অতি-শীতল' (Super cooled) জল। শিলাখণ্ডের বহিস্তল কিন্তু অতি-শীতল জলবিন্দুর চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম ঠাণ্ডা। শৈত্যের এই বৈষম্যের ফলে মেসনের তত্ত্বানুসারে কম-ঠাণ্ডা শিলাখণ্ড থেকে H^+-আয়ন বেশী-ঠাণ্ডা জলবিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়। ফলে সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হলে শিলাখণ্ডটি ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন ও 'অতি-শীতল' জলবিন্দুটি ধন-বিদ্যুৎসম্পন্ন হয়। শিলাখণ্ডটি জলবিন্দু অপেক্ষা বেশ ভারী বলে সত্বর ভূতলে নামে আসে এবং সেখানে ঋণ-বিদ্যুতের সঞ্চার হয়। ধন-বিদ্যুৎসম্পন্ন জলবিন্দু অবশ্য উচ্চস্তরেই ভাসমান থাকে।

মেসন (Mason) আরও একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মনে করা যাক, শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কোনও জলবিন্দু—বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে এই জলবিন্দুর বহির্ভাগ শৈত্যাধিক্যে ক্রমশঃ বরফে পরিণত হতে থাকে। ফলে জলবিন্দুটির বাইরের আবরণ জলবিন্দুর চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা হয়। বরফের আবরণটির স্তরে স্তরেও শৈত্যের ক্রম-বৈষম্য লক্ষিত হয়। এইভাবে বরফের আবরণটির স্তরে স্তরে ধন-বিদ্যুৎ এবং কেন্দ্রস্থ জলবিন্দুটিতে ঋণ-বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। তরল থেকে কঠিন অবস্থায় জল যখন বরফে পরিণত হয়, তখন যে প্রসারণ হয়, তা সব জায়গায় সমান হয় না বলে ধনাত্মক বরফের বহিরাবরণটি ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়। ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন জলবিন্দুটি ধন-বিদ্যুৎসম্পন্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ বরফকণার চেয়ে ভারী বলে ক্রমশঃ নীচে নেমে আসে। এই ভাবেই বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে ধন-বিদ্যুৎ এবং ভূতলে ঋণ-বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়।

মেসন ও তাঁর সহকর্মীরা বহু পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের এই প্রোটন-স্থানান্তর তত্ত্বটি মেঘের কোলে ধন ও ঋণ-বিদ্যুৎ সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক পরিমাণেই কার্যকরী। আমাদের বিশ্বাস, মেঘের ন্যায় এরূপ বহুল উপাদানে গঠিত জটিল বস্তু সম্পর্কে বিশেষ কোনও প্রক্রিয়াই এককভাবে কাজ করে না। বিভিন্ন তত্ত্বের বিভিন্ন প্রক্রিয়া মেঘের অভ্যন্তরে ধন ও ঋণ-বিদ্যুতের পৃথকীকরণে একই সঙ্গে যদি কাজ করে, তাতে আর আশ্চর্য কি ?

রক্ত পরীক্ষায় পিতৃত্ব নির্ণয়

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

পিতামাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে প্রকাশ হওয়া স্বাভাবিক। অনেক সময় চোখ, নাক ও মুখের গড়ন দেখে সন্তানের পিতা-মাতা নির্ধারণ করা হয়। ছেলে বা মেয়ে মার মত চোখ ও বাবার মত চুল পেয়েছে—এ রকম মন্তব্য করে সন্তান যে তাদের, তা আমরা অবচেতন মনে স্বীকার করে নিই। কিন্তু মাঝে মাঝে পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না অথবা লক্ষ্য করা গেলেও বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ অতি অস্পষ্টরূপে দেখা যায়। সন্তান ও পিতা-মাতার আকৃতির সাদৃশ্য না থাকলেও ঐ সন্তানের জন্ম বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ থাকে না। অনেক কারণেই ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট সন্তানের জন্ম হতে পারে। তবে যদি সন্দেহ করবার কোন কারণ দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে সন্তানের পিতা-মাতা নির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ 'রক্তের উত্তরাধিকার সূত্র' শীর্ষক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছিলাম। বর্তমান প্রবন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

ABO পদ্ধতিতে মানুষের রক্তকে O, A, B ও AB—এই চার প্রকার রক্তশ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যাদের রক্তে A ও B পদার্থের কোনটাই থাকে না, তাদের O, যাদের দুটির একটি পদার্থ থাকে, তাদের A অথবা B এবং যাদের রক্তে দুটি পদার্থ একসঙ্গে থাকে, তাদের AB শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ABO-এর মত MN পদ্ধতিতেও মানুষের রক্তকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যে সব মানুষের রক্তে শুধু M বা শুধু N এবং M ও N উভয় পদার্থ থাকে, তাদের যথাক্রমে M, N ও MN শ্রেণীভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। মানুষকে আবার Rh-পজিটিভ এবং Rh-নেগেটিভ রক্ত-শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। ABO, MN ও Rh রক্তশ্রেণী ছাড়া ইদানীং আরও অনেক প্রকার রক্তশ্রেণী আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব রক্তশ্রেণী বংশগতভাবে সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

শহর এলাকায় বেশীর ভাগ পরিবারের সন্তান হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে। অন্য সন্তানের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আশঙ্কায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট করে রাখবার রীতি আছে। হাসপাতালে দুটি দম্পতির ছেলেমেয়ে কোনক্রমে অদল-বদল হয়ে গেলে, দুই পক্ষই 'আমাদের ছেলে' বলে দাবী করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষায় এক পক্ষের দাবীকে অগ্রাহ্য করে অপর পক্ষকে পুত্র-সন্তানের একমাত্র অধিকারী বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধ, দাঙ্গা ও দেশবিভাগে অনেক সময় ছেলে-মেয়েদের পিতা-মাতার নিকট থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বহুদিন বাদে সন্তানের খোঁজ পাওয়া গেলে পিতা-মাতা ও সন্তানের রক্ত পরীক্ষার দ্বারা সন্তানকে সনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে।

রক্ত পরীক্ষায় অমুকের সন্তান প্রমাণ করবার চেয়ে সন্তান যে অমুকের নয়, তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা যায়। এই কারণে রক্ত পরীক্ষায় অনুমিত বা সন্দেহজনক পুরুষকে পিতৃত্বের দায় থেকে অব্যাহতি দেবার রীতি প্রায় সব

সভ্য দেশের আইনেই আছে। কিন্তু রক্ত পরীক্ষায় নির্ধারিত সন্তানের উপর পিতৃত্বের দাবীকে অনেক দেশের আইনে স্বীকার করা হয় না। যদি সন্তানের রক্তে এমন শ্রেণীর পদার্থ থাকে যা মাতার রক্তে নেই, তাহলে সেই পদার্থ নিশ্চয় পিতার রক্ত থেকে এসেছে বলে অনুমান করা হয়। যদি কোন অনুমিত পিতার রক্তে সেই পদার্থের অস্তিত্ব না থাকে, তখন সেই ব্যক্তি কখনও সন্তানের প্রকৃত পিতা হতে পারে না। মাতা O এবং সন্তান A রক্তশ্রেণীভুক্ত হলে, পিতা A রক্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অন্য কোন প্রমাণের অভাবে A শ্রেণীভুক্ত যে কোন ব্যক্তিকে সন্তানের জনক হিসাবে গণ্য করা যায় না। কিন্তু যদি অনুমিত পিতা O বা B শ্রেণীভুক্ত হয়, সে ব্যক্তি কখনও A শ্রেণীভুক্ত সন্তানের পিতা হতে পারে না। কোন পুরুষকে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাসের সন্দেহ করা হলে যদি স্ত্রীলোকটির সন্তান ও অনুমিত পুরুষের বিরুদ্ধ রক্তশ্রেণী প্রমাণ করা যায়, তাহলে অনুমিত পুরুষকে পিতৃত্বের দায় থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মাতা ও অনুমিত পিতার ABO রক্তশ্রেণী জানা থাকলে বিরুদ্ধ সন্তানের রক্তশ্রেণী কি কি হতে পারে, তা নীচের তালিকায় দেখানো হয়েছে।

	মাতার রক্তশ্রেণী	অনুমিত পিতার রক্তশ্রেণী	সন্তানের বিরুদ্ধ রক্তশ্রেণী, যা অনুমিত পিতাকে মুক্তি দেয়
(১)	O	O	A,B
(২)	,,	A	B
(৩)	,,	B	A
(৪)	,,	AB	O
(৫)	A	O	B,AB
(৬)	,,	A	B,AB
(৭)	,,	B	—
(৮)	,,	AB	O
(৯)	B	O	A,AB
(১০)	,,	A	—
(১১)	,,	B	A,AB
(১২)	,,	AB	O
(১৩)	AB	O	AB
(১৪)	,,	A	—
(১৫)	,,	B	—
(১৬)	,,	AB	—

—বিরুদ্ধ ABO রক্তশ্রেণীর সন্তান নেই।

অনুমিত পিতা যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, মাতা O হলে, সন্তান কখনও AB এবং মাতা AB হলে সন্তান কখনও O শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। যদি এ-রকম সন্তানের অভ্যুদয় ঘটে, তাহলে সন্তান যে ঐ বিশেষ মাতার, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ ঘটতে পারে। বিপরীতভাবে AB পিতার O সন্তান এবং O পিতার AB সন্তান হয় না। মাতা ও অনুমিত পিতা উভয়ের মধ্যে একজন A ও অপর জন B শ্রেণীভুক্ত হলে সব শ্রেণীর সন্তান সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। মাতা ও সন্তান উভয়েই যদি A অথবা B রক্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়, সে ক্ষেত্রে অনুমিত পিতাকে ABO রক্ত পরীক্ষায় মুক্তি দেওয়া যায় না—কেন না, O, A, B ও AB শ্রেণীর যে কোন ব্যক্তি সন্তানের পিতা হতে পারে। আবার মাতা AB এবং অনুমিত পিতা A, B অথবা AB শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলে কোন বিরুদ্ধ রক্তশ্রেণীভুক্ত সন্তানের উৎপত্তি হয় না। এই কারণে ABO রক্ত পরীক্ষায় অনেক সময় অনুমিত পিতাকে পিতৃত্বের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে সন্তানের রক্তে বিরুদ্ধ MN ও Rh রক্তশ্রেণীর অনুসন্ধান করতে হয়

সন্তানের রক্তে যদি বিরুদ্ধ MN রক্তশ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহলে অনুমিত পিতাকে সন্তানের জনক হবার অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। নীচে মাতা, অনুমিত পিতা ও বিরুদ্ধ সন্তানের MN রক্তশ্রেণী দেখানো হয়েছে।

	মাতার রক্তশ্রেণী	অনুমিত পিতার রক্তশ্রেণী	সন্তানের বিরুদ্ধ রক্তশ্রেণী, যা অনুমিত পিতাকে মুক্তি দেয়
(১)	M	M	MN
(২)	,,	N	M
(৩)	,,	MN	—
(৪)	N	M	N
(৫)	,,	N	MN
(৬)	,,	MN	—
(৭)	MN	M	N
(৮)	,,	N	M
(৯)	,,	MN	—

—বিরুদ্ধ MN রক্তশ্রেণীর সন্তান নেই।

মাতা M শ্রেণীভুক্ত হলে সন্তান কখনও N শ্রেণীভুক্ত হয় না এবং মাতা N শ্রেণীভুক্ত হলে সন্তানের M শ্রেণীভুক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না। সন্তানের রক্তে M অথবা N পদার্থ যদি অনুমিত পিতার রক্তে না থাকে, তাহলে তাকে পিতৃত্বের দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু বিরুদ্ধ রক্তশ্রেণীভুক্ত সন্তানের অভাবে MN শ্রেণীভুক্ত অনুমিত পিতার অব্যাহতি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

যেখানে ABO ও MN রক্ত পরীক্ষায় অনুমিত পিতাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয় না, সেখানে তার Rh রক্তশ্রেণী পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। Rh-নেগেটিভ মাতাপিতার সব সন্তানই Rh-নেগেটিভ হয়। এক্ষেত্রে মাতা ও অনুমিত পিতার রক্ত Rh-নেগেটিভ হলে বিরুদ্ধ সন্তানের রক্তশ্রেণী Rh-পজিটিভ হয়। যদি মাতা O,MN অনুমিত পিতা AB,N এবং সন্তান A,MN শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে ABO ও MN যৌথ পরীক্ষা পদ্ধতিতে অনুমিত পিতাকে পিতৃত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। কিন্তু মাতা ও অনুমিত পিতা উভয়ই Rh-নেগেটিভ এবং সন্তান Rh-পজিটিভ হলে, অনুমিত পিতাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব।

ABO ও Rh রক্তশ্রেণীকে আরও সূক্ষ্মতর শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এবং রক্তের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে অনুমিত পিতার মুক্তির সম্ভাবনাকে আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডেমোগ্রাফি' চর্চা

দিলীপ মালাকার

'ডেমোগ্রাফি' বা লোকসংখ্যা-বিজ্ঞান বয়সে একান্তই নবীন। ধনবিজ্ঞানের প্রথম যুগে লোক-সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা হতো। সেটা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর যুগ। লোকসংখ্যা কমতি-বাড়তির উপর অর্থনীতির প্রতিক্রিয়া তখনও বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচিত হতো না। তারপর সমাজ-বিজ্ঞানের আবির্ভাবে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ডেমোগ্রাফিকে তার মধ্যে টেনে নেওয়া হয়। প্রথমতঃ ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস মাত্র দু-শ' বছরের। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে সুরু হয় ধনবিজ্ঞানের চর্চা। আডাম স্মিথের বাজার গবেষণা, ম্যালথুসের লোক-সমস্যা, রিকার্ডোর জমি, রাজস্ব ও ভাড়ার টাকা, তারপর আর এক বিরাট পরিবর্তন আনলেন কার্ল মার্কস তাঁর শ্রমিক-সমস্যা ও শ্রমিকের আয় সম্বন্ধে নতুন তথ্য পরিবেশন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ধনবিজ্ঞানের চর্চা হতো সামগ্রিকভাবে— যার নাম দিয়েছেন একালের ধনবিজ্ঞানীরা 'মিক্রো ইকনমিক্স'। কেন্স-এর আমলে ধনবিজ্ঞানের রূপ পরিবর্তন হলো। তিনি সুরু করলেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধনবিজ্ঞানের চর্চা, যার নাম দেওয়া হয় "মাক্রো" ইকনমিক্স অর্থাৎ ছোটখাটো বিষয়ে বা আঞ্চলিকভাবে ধনবিজ্ঞানের গবেষণা চালানো। তাতে অনেক নতুন তথ্য জানা যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ধনবিজ্ঞানের চর্চা সুরু করেন ভারতে প্রথম দুজন—গোবিন্দ রানাড়ে আর রমেশ দত্ত। তারপর বিস্তৃতভাবে বিকাশ হয়েছে ধনবিজ্ঞান চর্চার।

সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা প্রথম সুরু হয় ফ্রান্সে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক দুর্খাইম তার আগে সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা চালান আর এক ফরাসী দার্শনিক অগুস্ত কঁত। অগুস্ত কঁত-এর 'পজিটিভ্ইজম' দর্শন চালু করেন সাহিত্যিক বঙ্কিম চ্যাটার্জী। আর দুর্খাইমের সমাজ-বিজ্ঞান চালু করেন বাংলা ভাষায় বিনয় সরকার।

উনবিংশ শতাব্দীর ধনবিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞানের যোগসাজসে জন্ম লাভ করে 'ডেমোগ্রাফি' বিংশ শতাব্দীতে। তখনও সে বিজ্ঞানের গোত্র লাভ করে নি। উনবিংশ শতাব্দীতে ম্যালথুসের লোকসংখ্যা-চর্চা ছিল কয়েকটি কথার মধ্যে আবদ্ধ, খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে লোকসংখ্যা বাড়ে দ্রুতগতিতে। লোকসংখ্যা কেন বাড়ে, কেন কমে? কোন্ দেশে কত হারে বাড়ছে, সে সম্বন্ধে কোন সঠিক হদিস দিতে পারেন নি ম্যালথুস। বিংশ শতাব্দীতে যখন ধনবিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, ধন-সম্পত্তি ও টাকার উঠতি-পড়তির উপর লোকসংখ্যা বাড়া-কমার অনেকখানি নির্ভর করে, তখন থেকে সুরু হলো 'ডেমোগ্রাফি' বা লোকসংখ্যা-চর্চা। ধনবিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, এক এক দেশে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির হার ভিন্নরূপ। কোন দেশে লোক সংখ্যা হঠাৎ বাড়ছে, আর কোন দেশে লোক সংখ্যা কমছে। যেমন বিংশ শতাব্দীর প্রথম ধাপে ফ্রান্সে লোকসংখ্যা কমেছে, আর জাপানে বেড়েছে।

মানুষের প্রয়োজনের খাতিরেই নতুন নতুন জিনিষের আবির্ভাব হয়। প্রয়োজনের খাতিরেই গবেষণা থেকে আবিষ্কার। একই কারণে 'ডেমো-

গ্রাফির' আবির্ভাব। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে আমাদের দেশে, তেমনি দেখা দিয়েছে আরও অনেক দেশে। চীন হলো আর এক দৃষ্টান্ত। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের এখন খাদ্যাভাব। এ-সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই এবং এই কারণেই আমাদের দেশে ডেমোগ্রাফির প্রসার হতে বাধ্য। বিজ্ঞানসম্মতভাবে লোক-সংখ্যার চর্চা সুরু করে জার্মান আর ইতালিয়ানরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে। এঁদের মধ্যে অগ্রদূত হলেন ইতালিয়ান সংখ্যাবিজ্ঞানী কররাদো জিনি। ইনি ছিলেন রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেমোগ্রাফি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। জার্মান আর ইতালিয়ানরা চর্চা সুরু করে দায়ে পড়ে। কারণ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় জার্মান আর ইতালিয়ান লোকসংখ্যা বেড়েছে সাংঘাতিকভাবে। সে সমস্যা সমাধানকল্পে তারা ডেমোগ্রাফি-চর্চার সূত্রপাত করে। ফরাসীদের সে বালাই ছিল না বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেমোগ্রাফির চর্চা তারা সুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে। তার মানে এই নয় যে, ফরাসীরা আদৌ লোকসংখ্যার চর্চা করতো না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আর বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এসম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছেন ল্য রোয়া-বলিও, হালবাখ্, ল্য ভাস্যর, বুর দঁ, মার্শ- হুব্যর, ব্যতি-যঁ ও ল্যন্দ্রি।

উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে পড়ানো হতো লোকসংখ্যা বিশ্লেষণ। তখন তার নাম ছিল ডেমোগ্রাফিক অ্যানালিসিস্, যার অপর নাম হলো 'পিউওর ডেমোগ্রাফি'। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডেমোগ্রাফিকে পাওয়া গেল ধনবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, হিউম্যান জিওগ্রাফি, ইতিহাস, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের মধ্যে। এই সব বিজ্ঞানের যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা ডেমোগ্রাফির সন্ধান রাখেন অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, ডেমোগ্রাফির চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা উপরিউক্ত বিজ্ঞানের খোঁজ রাখেন। একালে লোকসংখ্যা-বিজ্ঞানের উপর অনেক বেশী গবেষণা ও কাজ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে 'ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন স্টাডিজ' ইত্যাদির মত অসংখ্য পরিষদ। কয়েকজন মার্কিন গবেষক ও এক ফরাসী লোকবিজ্ঞানী বলেছেন যে, ডেমোগ্রাফি হলো ফলিত বিজ্ঞান (পি. এম. হাউসার এবং ও. ডি ডানকান—"দি নেচার অব ডেমোগ্রাফি", হাউসার ও ডানকান সম্পাদিত "দি ষ্টাডি অব পপুলেশন, অ্যান ইনভেন্টরি অ্যাণ্ড অ্যাব্রাইসাজ," ১৯৫৯ পৃঃ ২৯-৪৪; পিয়ের জর্জ—"ল্য ডেমোগ্রাফি, উন্ সিয়ন্স আপ্লিকে"—পপুলেশন, নং ২, ১৯৫৯, পৃঃ ৩০৫-৩১৪)।

ফরাসীদের লোকসংখ্যা পরিষদ স্থাপিত হয় ১৯৪৫ সালে প্যারিসে। এটি সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতায় পরিচালিত। ফরাসী জনস্বাস্থ্য ও লোকসংখ্যা মন্ত্রী দপ্তর এর পরিচালনা করেন। পরি-ষদের নাম "এঁ্যাস্তিত্যুৎ নাশিওনাল দেতুদ্ ডেমো-গ্রাফিক" (Institut National d'Etudes Demographiques)। প্রথম থেকেই এই পরিষদের ডিরেক্টরের পদ অলঙ্কৃত করে আসছেন অধ্যাপক আলফ্রেড সোভি। আলফ্রেড সোভি এককালে ছিলেন জাতি-সংঘের লোকসংখ্যা ও সংখ্যাবিজ্ঞানের ডিরেক্টর। তাঁরই প্রচেষ্টায় চালু হয় ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসংখ্যা পরিষদ ১৯৫৭ সালে। সেই থেকে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরু হয়েছে পুরাপুরিভাবে লোক-সংখ্যার চর্চা ও গবেষণা। প্রথমেই বলে রাখি যে, ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সেদিনও ধন-বিজ্ঞানের উপর কোন ডিগ্রী দেওয়া হতো না, তেমনি সমাজ-বিজ্ঞানের উপর। ধনবিজ্ঞানের চর্চা হতো আইন বিভাগে আর সমাজ-বিজ্ঞানের চর্চা হতো দর্শন বিভাগে। মাত্র ১৯৫৮ সালে

ধনবিজ্ঞান একটি নতুন বিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি লাভ করে। আর সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় আর একটি নতুন বিভাগ খুলে। সেটি হলো হিউম্যান সায়েন্স। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডেমোগ্রাফি পরিচালনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞান ও হিউম্যান সায়েন্স বিভাগ যুগ্মভাবে। কিন্তু ডিগ্রী দেওয়া হয় হিউম্যান সায়েন্স বিভাগের তরফ থেকে। প্যারিস ছাড়া বর্দো, লিল্, নাঁসি, কাঁ, লিয়ঁ, তুলুজ ও স্ত্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও আজকাল ডেমোগ্রাফি পড়ানো হচ্ছে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দুটি সরকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন—ইনস্টিটিউট অব ডেমোগ্রাফি ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটিসটিক্স অ্যাণ্ড ইকনমিক্স ষ্টাডিজ-এ (এই পরিষদ ফ্রান্সের আদমসুমারি, বাজারে তেজী-মন্দী গবেষণা, আমদানী-রপ্তানীর উপর গবেষণা চালায়) ডেমোগ্রাফির চর্চা হয় গবেষণা পর্যায়ে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পৌরসভা, জেলা শাসকের তরফ থেকে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালানো হয়। এর বাবদ যে খরচ হয়, তা বহন করে ওই সব প্রতিষ্ঠান। বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও কারখানা এদের কাছ থেকে 'উপদেশ' কেনে এবং বাজারের জনমত এসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তথ্য জেনে থাকে—অবশ্য নগদ মূল্যে।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেমোগ্রাফি পরিষদ থেকে দেওয়া হয় দুটি ডিগ্রী, একটি হলো ডিপ্লোমা অব জেনারেল ডেমোগ্রাফি, আর একটা হলো ডিপ্লোমা অব এক্সপার্ট ইন ডেমোগ্রাফি। এই দুটি ডিপ্লোমার জন্যে পড়াশুনা করা চলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়বার সময়ে অথবা এম. এ. পাশ করবার পর। অধিকাংশ ছাত্র ডেমোগ্রাফি ডিপ্লোমা নেয় ধনবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও ভূগোল পরিষদে পঠন কালে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি ফ্যাকাল্টির অধ্যাপক এই পরিষদে পড়িয়ে থাকেন; যেমন—ধনবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, হিউম্যান সায়েন্স অ্যাণ্ড লেটার্স। লোকসংখ্যার উপর গবেষণা শুধু ইনস্টিটিউট অব ডেমোগ্রাফিতেই হয় না, হয়ে থাকে বিভিন্ন ধনবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদে, ভূগোল পরিষদে, সংখ্যাবিজ্ঞান পরিষদে, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদে। এই সব পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক একটি অঙ্গ। তবে ডেমোগ্রাফির ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়নের সময় এক থেকে দুই বছর। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়তে হয়—জেনারেল ইকনমিক্স ও ডেমোগ্রাফি, থিওরি অব ডেমোগ্রাফি, পলিটিক্যাল ইকনমিক্স, মডার্ণ ও কন্টেম্পোরারি হিষ্ট্রি, হিউম্যান অ্যাণ্ড ইকনমিক জিওগ্রাফি, হিষ্ট্রি অব পপুলেশন, হিষ্ট্রি অব পপুলেশন ডকট্রিন, হিউম্যান অ্যাণ্ড জেনারেল ইকোলজি, বাইওমেট্রি অ্যাণ্ড পপুলেশন, জেনেটিক্স, কলেকটিভ প্যাথোলজি অ্যাণ্ড কোয়ালিটেটিভ ডেমোগ্রাফি, সোস্যাল লেজিসলেশন, জেনারেল স্ট্যাটিস্টিক্স, ডেমোগ্রাফিক স্ট্যাটিস্টিক্স।

আজকাল এরা সংখ্যাবিজ্ঞানের উপর খুব বেশী জোর দিচ্ছে। ডেমোগ্রাফিতে সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রয়োগ হলো আসল উদ্দেশ্য। তাই পরীক্ষায় অর্ধেক প্রশ্নপত্র থাকে সংখ্যাবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে। তাছাড়া হাতেকলমে কাজ করতে হয়। মানচিত্রে সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রয়োগ, চার্ট, গ্রাফ ইত্যাদি তো আছেই! আমি প্যারিসের ডেমোগ্রাফি গবেষণায় দেখেছি, এরা Regional অথবা Localised ক্ষেত্রে প্রতিটি লোকের ইতিবৃত্ত, পরিবার ও জনসমষ্টির স্বাস্থ্য, খাদ্য, আবাস, রুজি-রোজগার, রোগ-শোক, জন্ম-মৃত্যুর হার, তাদের সুবিধা-অসুবিধা, তাদের মতামতের উপর অনুসন্ধান কার্য চালায়। এথেকে অনেক অজানা তথ্য জানা যায়, যার উপর নির্ভর

করে অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আরোপ করা চলে

ডেমোগ্রাফি পরিষদে গবেষণাকালে আমি দেখেছি যে, যে কোন দেশে এবং যে কোন সময়ে লোকসংখ্যা দৌড়ঝাঁপ দিয়ে বাড়ে না। বৃদ্ধির একটি রীতি আছে, যার নাম রিদ্‌ম্। বড় দেশে এক একটি ভৌগলিক অঞ্চল যেমন ভিন্ন, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাল-চাল, ধর্ম, সংস্কৃতিও ভিন্ন। এক একটি সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভিন্নরূপ। এরা সবাই কিন্তু একই হারে বাড়ে না। প্রতিটি সম্প্রদায়ের সমষ্টি ও গোষ্ঠীর মনোবৃত্তি, শিক্ষার ধারা ও সংস্কৃতি একই নয়। যার অপর নাম দেওয়া হয়েছে টেক্‌নিক্যাল অ্যাণ্ড কালচারাল ডেভেলপমেণ্ট। টেকনো-কালচারাল প্রগতির উপর নির্ভর করে লোক-সংখ্যার ক্ষয়-বৃদ্ধি। অতি প্রাচীন বা প্রাগৈতি-হাসিক স্তরের জীবনধারণ করে যে সব সম্প্রদায়, যেমন—আদিবাসী বা আফ্রিকার জঙ্গলবাসীদের সমাজে লোকসংখ্যা লাফ দিয়ে বা হুহু করে বাড়ে না। এর পরের ধাপ হলো শিল্প-সমাজে প্রবেশ করতে সুরু করেছে কৃষি-সমাজ। তারা নীচু ধাপ থেকে যন্ত্রযুগের ধাপে যেই পৌঁছায়, তখনই তাদের মধ্যে লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে। যেমন হচ্ছে ভারতে, চীনে, ইন্দোনেশিয়ায় বা এশিয়ায় অন্যান্য জনপদে। যন্ত্রযুগে এসে যারা উচ্চ শিখরে পৌঁচেছে বা যাদের জীবনযাত্রার মান উঁচুতে উঠেছে, তাদের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারে আসে সমতা। তখন বেশী বাড়েও না আর বেশী কমেও না। যেমন দেখা যাচ্ছে একালের ইউরোপে। ভারতে এর দৃষ্টান্ত ভাল করে দেখা যায়। যেমন আদিবাসীদের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার তেমন বাড়ে নি, যেমন বেড়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক ও কলকারখানায় শ্রমিক সমাজের মধ্যে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে জনসংখ্যার হার বাড়ছেও না আবার কমছেও না। ভারতের লোকসংখ্যা সমস্যার এটাই হলো একটি দৃষ্টান্ত; অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান বাড়লেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সমতা আসে এবং তার জন্যে চাই আর্থিক উন্নতি। আর আর্থিক উন্নতি আসতে পারে একমাত্র বিজ্ঞান টেকনোলজির উন্নয়নে। কলকারখানা ও শিল্পোন্নয়নই তার একমাত্র পথ—যার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

প্যারিসের ডেমোগ্রাফি পরিষদে যাঁরা অধ্যাপনা করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অধ্যাপক আলফ্রেড সোভি (A. Sauvy), পিয়ের জর্জ (P. George), শভালিয়ের (Chevalier), রেনার্ট (Reinhardt), জিরার (A. Girard), স্টোয়েৎজেল (Stoetzel), বুকে (Buquet) ইত্যাদি। অধ্যাপক বুকের সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তক 'অপটিমাম পপুলেশন'-এ তিনি বিভিন্ন দেশের লোকসংখ্যা-বিজ্ঞানীদের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার বইয়ে তিনি ভারতের কয়েকজন ডেমোগ্রাফারের আলোচনা করেছেন—তাঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জী, অধ্যাপক বিনয় সরকার ও জ্ঞান চাঁদ।

ডেমোগ্রাফি পরিষদের দ্বৈমাসিক পত্রিকা ছাড়াও বিভিন্ন সংখ্যাবিজ্ঞান পত্রিকা, ধনবিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান ও ভূগোল পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় ডেমোগ্রাফি সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণার বিষয়বস্তু।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

জয়ন্ত বসু

(১)

ভাই বাতায়নদা,

আজ কলেজে ইলেকট্রনের বিষয় পড়াতে পড়াতে আমাদের অধ্যাপিকা সবিতাদি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কথা আমাদের বলছিলেন। সাধারণ যে সব আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র আমরা দেখেছি, ক্ষুদ্র কোন বস্তুকে তার বড় করে দেখানোর যে ক্ষমতা, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা নাকি তার চেয়ে প্রায় হাজার গুণ বেশি। অর্থাৎ, আমাদের চোখের তুলনায় আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা যতখানি বেশি আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তুলনায় আবার প্রায় ততখানিই বেশি ক্ষমতা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের। এটা সম্ভব হয়েছে, সবিতাদি বললেন, কারণ আলোক তরঙ্গের পরিবর্তে ঐ যন্ত্রে ইলেকট্রন তরঙ্গকে ব্যবহার করা হয়।

ইলেকট্রনকে তো বস্তুকণিকা বলে জানি, তার আবার তরঙ্গ কী? আর তরঙ্গ হলেই বা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা এত বেশি কেন? কী পদ্ধতিতে কাজ করে এই আশ্চর্য যন্ত্র?—মাথার মধ্যে এই সব প্রশ্ন ভিড় করে আসছিল, কিন্তু জান তো সবিতাদিকে কী ভয়ঙ্কর ভয় করি, ওঁকে জিগ্যেস করতে তাই সাহস হয় নি। সবিতাদি বলছিলেন, গত ফেব্রুয়ারী মাসে বুঝি কলকাতায় তোমাদের সায়েন্স কলেজে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ সম্পর্কে বিরাট এক অধিবেশন হয়েছিল। তোমার কথা তখনই মনে হয়েছিল, বাতায়নদা, তোমার মধ্য দিয়ে দরকার মত জ্ঞানের আলো-বাতাস পাই বলেই না তোমার ঐ নাম দেওয়া,—বাড়ি ফিরে তাই তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছি প্রশ্নগুলির উত্তর চেয়ে। ইতি—

বোলপুর ৬।৫।৬৫ — তোমার স্নেহের বোল্‌তা

(২)

কল্যাণীয়াসু,

……তুমি দেখছি, বোল্‌তা, আবার প্রশ্নের হুল ফোটাতে সুরু করেছ। শোধ নেওয়ার জন্য আমিও বিশদভাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। দেখা যাক ধৈর্য ধরে সবটা পড়তে পার কিনা।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রবর্তন করেন, যাকে এখন পুরনো কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলা হয়, সেই তত্ত্ব অনুযায়ী শক্তির রূপ দুই প্রকার—একটি তরঙ্গরূপ, এর সঙ্গেই আমরা সচরাচর পরিচিত, অন্যটি কণিকারূপ। কোন বস্তু থেকে যখন শক্তি নিঃসরিত হয় বা কোন বস্তুর দ্বারা যখন শক্তি শোষিত হয়, তখন অবিচ্ছিন্নভাবে তা হতে পারে না। কারণ বিশেষ পরিমাপের শক্তির একক অবিভাজ্য কণিকা 'কোয়ান্টাম' হিসাবে তখন দেখা দেয়। ঐ কণিকার শক্তির পরিমাণ : $E=h\nu$, h যেখানে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা, $৬\cdot৬২৪\times১০^{-২৭}$ আর্গ-সেকেণ্ড, প্লাঙ্কের ধ্রুবক বলা হয় একে, আর ν হলো শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তরঙ্গের স্পন্দন সংখ্যা।

এই শতাব্দীর বিশের দশকে দ্য ব্রগ্‌লি, শ্রডিংগার, হাইসেনবার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা যে নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রবর্তন করলেন, যাকে

ওয়েভ মেকানিক্স অর্থাৎ তরঙ্গ বলবিদ্যাও বলা হয়, সেই তত্ত্ব অনুযায়ী শক্তির যেমন দ্বৈত-রূপ, বস্তুরও আবার রূপ তেমনি দুটি—কণিকা-রূপ, যার সঙ্গে আমরা সাধারণতঃ পরিচিত আর দ্বিতীয়টি তরঙ্গরূপ। ঐ তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য $\lambda = h/mv$, m ও v যেখানে যথাক্রমে বস্তুটির ভর ও গতিবেগ।

সুতরাং বুঝছো ইলেকট্রন বস্তুর কণিকা ঠিকই, কিন্তু তার একটি তরঙ্গ-ধর্মও আছে। এবং ইলেকট্রনের গতি যত বেশি হয়, ইলেকট্রন তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য তত হ্রাস পায় ও ইলেক-ট্রনের তরঙ্গধর্মিতা তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইলেক-ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ৫০,০০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ-চাপ প্রয়োগ করলে ইলেট্রনের গতি হয় সেকেণ্ডে প্রায় ১.৩ লক্ষ কিলোমিটার ও তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৫×১০^{-10} সেন্টিমিটার বা ০.০৫ অ্যাংস্ট্রম, আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

কোন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে ক্ষুদ্রতম বৃত্তাকার বস্তুকে তার পারিপার্শ্বিক থেকে পৃথক করে দেখতে পারি, সেই বস্তুর ব্যাসের দৈর্ঘ্যকে যন্ত্রটির বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Resolving power) বলে। ধরা যাক, ঐ দৈর্ঘ্য হলো 'ব'। এখন বস্তুটিকে বড় করে দেখানোর জন্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, 'ব' তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক। দৃশ্য আলো ব্যবহৃত হলে 'ব' হয় প্রায় ২,০০০ অ্যাংস্ট্রম, আর অতি বেগুনি আলো যদি ব্যবহার করা হয়, 'ব' তাহলে প্রায় ১,০০০ অ্যাংস্ট্রম। ৫০,০০০ ভোল্টের বিদ্যুৎ-চাপে যদি ইলেকট্রনকে ত্বরান্বিত করা যায়, সেই ইলেকট্রন তরঙ্গের ক্ষেত্রে 'ব' হয় মাত্র ০.০২৫ অ্যাংস্ট্রমের মত, অর্থাৎ একটি পরমাণুর ব্যাসের থেকেও অনেক ছোট। সহজেই বোঝা যায় যে, বিদ্যুৎ-চাপকে আরও বাড়িয়ে তত্ত্বগতভাবে 'ব'-কে আরও ছোট করে ফেলা সম্ভব। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এপর্যন্ত ই-অ যন্ত্রে (ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে এখন থেকে আমি সংক্ষেপে ই-অ যন্ত্র লিখবো) ক্ষুদ্রতম যে 'ব' সম্ভব হয়েছে, তা প্রায় ২ অ্যাংস্ট্রম। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের এই বৈষম্যের জন্য ইলেকট্রন তরঙ্গ অবশ্য দায়ী নয়, দায়ী হলো দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরণের বিশেষ রকম প্রক্রিয়া ও ই-অ যন্ত্রে যে লেন্সগুলি ব্যবহৃত হয়, তাদের নানাবিধ ত্রুটি।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় এক শতাব্দী পূর্বেই র‍্যালে, হেলম্‌হোলৎজ্, আবে প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতার সীমার কথা জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু এই সীমাকে অতিক্রম করতে ইলেকট্রন সম্পর্কে, বিশেষতঃ ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য বিজ্ঞানীদের অপেক্ষা করতে হয়।

অবশ্য ই-অ যন্ত্রের আলোচনায় সব সময় যে ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপ বিবেচ্য হয়, তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন যন্ত্রে ব্যবহৃত লেন্সের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে এর কণিকারূপটি গ্রাহ্য হয় এবং তখন ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ চলে। এই যে কখনো তরঙ্গ তত্ত্বের প্রয়োগ আর কখনও ক্লাসিকাল তত্ত্বের, এতে বিজ্ঞানীদের পর্যন্ত অনেক সময় উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। এককালে তাই প্রায়ই উপহাস করে বলা হতো—সোম, বুধ ও শুক্রবার তরঙ্গ তত্ত্বের প্রয়োগ বিধেয়, আর সপ্তাহের অন্যান্য দিন ক্লাসিকাল তত্ত্বের।

যাই হোক, ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্মিতা বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করবার পর ১৯৩১।৩২ সালে বার্লিনের এক গবেষণাগারে ব্রিউখে ও জোহানসন প্রথমে ই-অ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। প্রায় একই সময়ে বার্লিনের অন্য এক গবেষণাগারে আর একটি ই-অ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন নোল ও রুস্কা। বর্তমানে যে ধরণের ই-অ যন্ত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত—যাদের নির্গমন ই-অ যন্ত্র (Trans-mission electron microscope) বলা হয়,

এইটিই (চিত্র নং ১ (ক)) সেই জাতীয় প্রথম যন্ত্র। তবে যন্ত্রের পরিবর্ধনের ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা তখন অত্যন্ত অল্প ছিল ও যন্ত্রের সাফল্যের সমস্যাও ছিল নানাপ্রকার। বহু বিজ্ঞানী ও শিল্পপতি তো এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ আশা পোষণ করতেন না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানীর অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই কেবল যন্ত্রের ক্রমশঃ উন্নতি হতে থাকে। ই-অ যন্ত্রে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয় প্রথম ১৯৩৫ সালে। রুস্কার উদ্ভাবিত যন্ত্রে ফন বোরিস ও রুস্কার সহায়তায় তাঁদের তৈরী প্রথম প্রমাণ মাফিক ই-অ যন্ত্রের (চিত্র নং ১ (খ)) ব্যবহার সুরু হয়।

আমি এই সঙ্গে যে ছবিগুলি পাঠাচ্ছি, তাদের দ্বিতীয়টি (চিত্র নং ২) দেখলে ই-অ যন্ত্র কেমনভাবে কাজ করে, তার মূল কথাগুলি বুঝতে পারবে। ছবিটিতে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে এই যন্ত্রের কার্যপ্রণালীর সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপ্রণালী নিশ্চয় জান, জান যে, বাতির
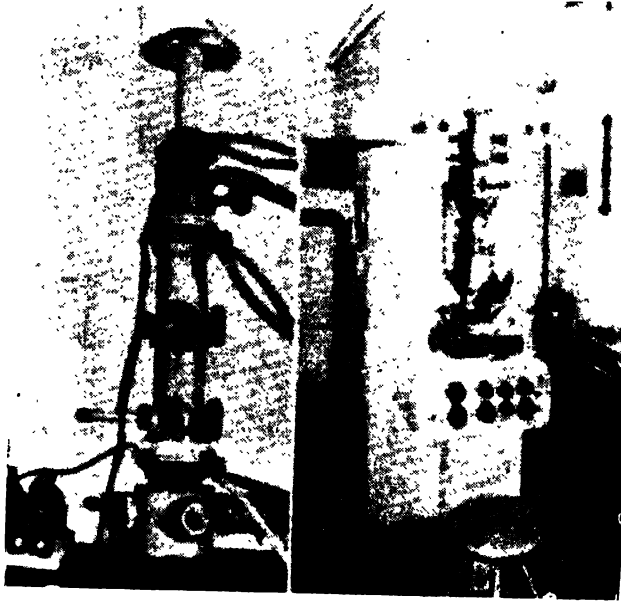
ক খ

১নং চিত্র

(ক)—প্রথম নির্গমন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

(খ)—প্রথম প্রমাণ-মাফিক ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

কাজ করে ও তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে তাতে কয়েকটি পরিবর্তন সাধন করে ড্রীষ্ট ও মিউলার এই সাফল্য লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে সীমেন্স ও হাল্‌স্কে কোম্পানী ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ই-অ যন্ত্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ও ১৯৩৯ সালে আলো ঘনীকারক (Condenser) লেন্সের সাহায্যে কেমন করে দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর সংহত হয়, বস্তুটি থেকে নির্গত আলো কেমন করে বস্তুমুখী (Objective) লেন্সের মধ্য দিয়ে গিয়ে একটি পরিবর্তিত মধ্যবর্তী প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে

এবং চক্ষু-সমীপস্থ লেন্স (Eye-piece) কেমনভাবে ঐ প্রতিবিম্বকে আরও পরিবর্ধিত করে দর্শকের দৃষ্টিগোচরে বা আলোকচিত্রের ফলকের উপর উপস্থাপিত করে।

আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যেখানে আলোক তরঙ্গের উৎস বাতি, ই-অ যন্ত্রে সেখানে ইলেকট্রন

ই-অ যন্ত্রেও ঘনীকারক ও বস্তুমুখী লেন্স আছে, আর চক্ষু-সমীপস্থ লেন্সের কাজ যে করে তার নাম প্রক্ষেপক (Projector) লেন্স। কোন লেন্সই অবশ্য এক্ষেত্রে কাচের নয়, বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক লেন্সই সব কটি। এই লেন্সগুলির যে বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্র, তাদের দ্বারা
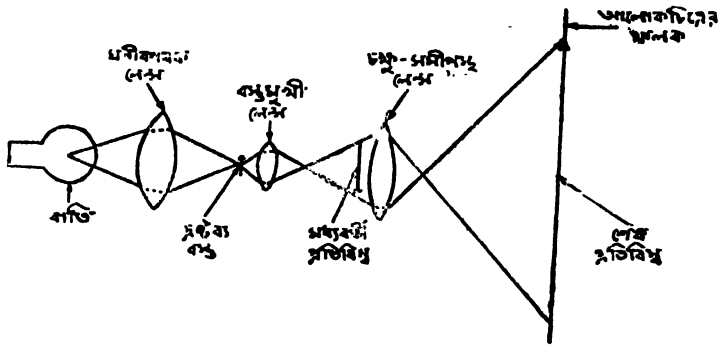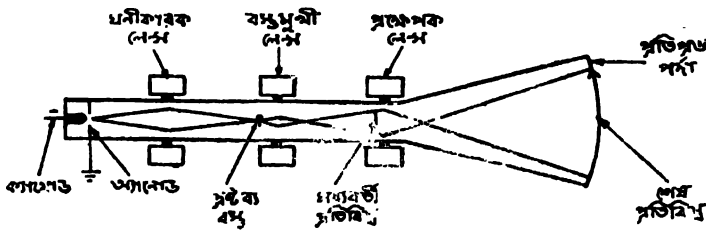
২নং চিত্র

(ক)—আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপ্রণালী।

(খ)—নির্গমন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপ্রণালী।

তরঙ্গের উৎস ইলেকট্রন গান—নেগেটিভ ক্যাথোড ও পজিটিভ অ্যানোড যার প্রধান অংশ। ঐ ইলেকট্রন গান-এর মধ্যে অত্যুত্তপ্ত টাংষ্টেনের তার থেকে যে সব ইলেকট্রন নির্গত হয়, ক্যাথোড ও অ্যানোডের মধ্যে ৫০ থেকে ১০০ হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎ-চাপ প্রয়োগ করে তাদের ত্বরান্বিত করা হয়। ফলে ইলেকট্রন গান থেকে যে ইলেকট্রনরা বেরিয়ে আসে, তারা বিশেষ দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়।

ইলেকট্রনের গতি প্রভাবান্বিত হয়।

ই-অ যন্ত্রে প্রক্ষেপক লেন্স ও দর্শকের চক্ষুর মধ্যে থাকে একটি প্রতিপ্রভ পর্দা, ইলেকট্রন এর উপর পড়লে এর থেকে আলো নিঃসরিত হয় ও দ্রষ্টব্য বস্তুর বহুগুণ পরিবর্ধিত প্রতিবিম্ব ঐ পর্দার উপর দেখতে পাওয়া যায়।

যন্ত্রের বাইরে ক্যামেরা রেখে তার সাহায্যে প্রতিবিম্বের ছবি তুলে রাখা যায়। তবে আজ-কাল সাধারণতঃ যন্ত্রের ভিতরেই আলোকচিত্রের

ফিল্ম বা ফলক রেখে ছবি তোলবার ব্যবস্থা করা হয়।

ইলেকট্রন গান থেকে প্রতিপ্রভ পর্দা পর্যন্ত যন্ত্রের দৈর্ঘ্য হয় সাধারণতঃ প্রায় চার ফুট।

আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে ই-অ যন্ত্রের কর্মপদ্ধতির একটি পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত যন্ত্রে দ্রষ্টব্য বস্তুর স্বচ্ছ অংশের মধ্য দিয়ে আলো চলে যায় বলে প্রতিবিম্বের ঐ অংশগুলি সাদা দেখায়। কিন্তু অনচ্ছ অংশগুলিতে আলো শোষিত হওয়ায় প্রতিবিম্বে ঐ সব অংশ আলোর অভাবে কালো দেখায়। ই-অ যন্ত্রে এই শোষণের স্থান নেয় বিচ্ছুরণ (Scattering)। দ্রষ্টব্য বস্তুর যে সব স্থলে পরমাণু রয়েছে, সেখান থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয়। ফলে ঐ সব বিচ্ছুরণ-কেন্দ্র না থাকলে ইলেকট্রনরা প্রতিবিম্বের যে স্থানে এসে উপস্থিত হতো, এখন সেখানে ফাঁক থেকে যায় এবং সেই সব ফাঁক থেকে বিচ্ছুরণ-কেন্দ্রের উপস্থিতি জানতে পারা যায়। বিচ্ছুরণ-কেন্দ্র যদি বড় হয় তাহলে তাই থেকে বেশি ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয় ও প্রতিবিম্বে ফাঁকটি বড় হয়ে দেখা দেয়। বিচ্ছুরণ-কেন্দ্র ছোট হলে বিচ্ছুরিত ইলেকট্রনের সংখ্যা কম হয় ও প্রতিবিম্বের ফাঁকটিও ছোট হয়। প্রতিবিম্বে এইভাবে দ্রষ্টব্য বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপটি ধরা পড়ে। এ পর্যন্ত বিচ্ছুরণ-সংক্রান্ত যা হিসাব হয়েছে, তা থেকে মনে হয় ভারী পরমাণুকে সরাসরি প্রতিবিম্বে দেখা সম্ভব; হাল্কা পরমাণুকে কিন্তু পৃথকভাবে দেখা যাবে না—যা দেখা যাবে, তা হলো হাল্কা পরমাণুর সমষ্টি বা অণু।

আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে আর একটি পার্থক্য হলো, প্রথমোক্ত যন্ত্রে বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর আপতিত আলোক রশ্মির আপতন কোণ বেশ অনেকখানি পর্যন্ত প্রশস্ত হয়, দ্বিতীয় যন্ত্রে কিন্তু এই কোণ সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ফলে, দ্বিতীয়টির ফোকাস গভীরত্ব প্রথমটির তুলনায় যথেষ্ট বেশি। তুমি তোমার দাদার ক্যামেরায় যখন ছবি তুলেছ, তখন নিশ্চয় ফোকাস-গভীরত্বের গুরুত্ব জান। এই গভীরত্ব যত বেশি হয়, তত বেশি স্থানকে এক সঙ্গে ফোকাস করা সম্ভব।
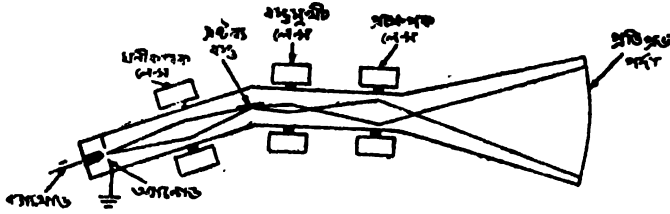
৩নং চিত্র

প্রতিফলন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

২নং চিত্রে ই-অ যন্ত্রের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রে তাতে আরও জটিল বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন। আমি এখানে কয়েকটির উল্লেখ করছি।

ইলেকট্রনদের দ্রুতগতির জন্য যে উচ্চ পরিমাণ বিদ্যুৎ-চাপ ও লেন্সগুলির জন্য যে বিদ্যুৎ-চাপ বা বিদ্যুৎ-প্রবাহ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিছুটা পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক। সেই পরিবর্তনকে স্বল্প পরিসরে রাখবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

পাম্পের সাহায্যে ই-অ যন্ত্রের ভিতরের প্রকোষ্ঠে বায়ুর চাপ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে

অনেক কমিয়ে রাখতে হয়। বায়ুমণ্ডলের ভূপৃষ্ঠে যে চাপ, তার কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগের মত এই চাপ। বায়ুর চাপ বাড়লে ইলেকট্রনদের গতি ব্যাহত হয়।

বিশেষ ব্যবস্থা থাকে, যাতে দ্রষ্টব্য বস্তু ও আলোকচিত্রের ফিল্ম বা ফলক বাইরে থেকে সহজে বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠে ঢোকানো যায় বা প্রকোষ্ঠের ভিতর থেকে সহজে বাইরে আনা যায়।

ইলেকট্রন দ্রষ্টব্য বস্তুর এক পৃষ্ঠে প্রবেশ করে অন্য পৃষ্ঠে নির্গত হয় বলে এর নাম নির্গমন (Transmission) অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এ ছাড়াও অন্যান্য রকম ই-অ যন্ত্র আছে, যথা—প্রতিফলন (Reflection), নিঃসরণ (Emission), স্ক্যানিং (Scanning) ও ছায়া (Shadow)) অণুবীক্ষণ যন্ত্র। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ চিত্র দেখলে এদের কর্মপদ্ধতি বুঝতে পারবে।

আজ এখানেই এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি। তোমার
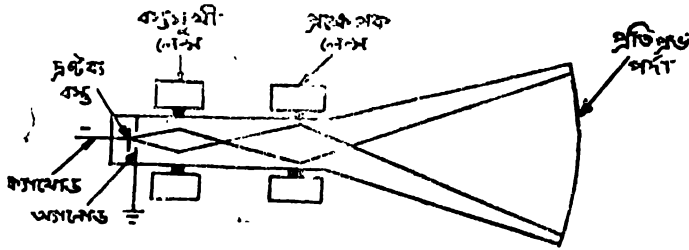
৪নং চিত্র

নিঃসরণ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

প্রতিবিম্বের পরিবর্ধনের মাত্রা বাড়ানোর অনেক সময় বস্তুমুখী ও প্রক্ষেপক লেন্সের মধ্যস্থলে একটি মধ্যবর্তী (Intermediate) লেন্স ব্যবহৃত হয়। কোন কোন যন্ত্রে আবার পরপর অনেকগুলি প্রক্ষেপক লেন্সও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রতিবিম্বের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানোর জন্য সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রগুলিতে একটি অতিরিক্ত ঘনীকারক লেন্স যোগ করা হয়; দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর যে ইলেকট্রন-গুচ্ছ এসে পড়ে, তাকে আরও ভালভাবে এতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা যায়।

দ্রষ্টব্য বস্তুর উপর যাতে কোন ময়লা না জমে, সেই উদ্দেশ্যে কয়েকটি যন্ত্রে -৮০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রক্ষিত অতি শীতল একটি প্রকোষ্ঠের দ্বারা বস্তুটিকে আবৃত রাখবার ব্যবস্থা থাকে।

এতক্ষণ যে ই-অ যন্ত্রের ক৲. বললাম, তাতে

মনে যে সব প্রশ্ন গুনগুন করে উঠবে, বোল্‌তা, সেগুলি শোনবার অপেক্ষায় রইলাম। ইতি—

কলকাতা তোমার বাতায়নদা

৫।৬।৬৫

(৩)

ভাই বাতায়নদা,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলাম। চিঠিটা পড়ে যে দুটি প্রশ্ন মাথায় এসছে, তাই জানিয়ে তোমায় উত্তর দিচ্ছি।

প্রথমতঃ তোমার ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ চিত্র দেখে কিছুই পরিষ্কার করে বুঝতে পারলাম না। তোমার এই মাথা-মোটা ছাত্রীকে একটু খোলাসা করে বুঝিয়ে দেবে কি?

দ্বিতীয়তঃ, আমি যে সব লেন্সের সঙ্গে পরিচিত, যেমন ক্যামেরা বা দূরবীন বা আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের লেন্স, সেগুলো সবই কাচের তৈরী। কিন্তু ই-অ যন্ত্রে যে লেন্স ব্যবহৃত হয়, তুমি তাদের

বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক বলেছ। ওগুলি ঠিক কী ধরণের বস্তু?…ইতি—

বোলপুর
১৫।৬।৬৫

তোমার স্নেহের
বোল্‌তা

(৪)

কল্যাণীয়াসু,

…নির্গমন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিফলন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের পার্থক্য হলো এই যে, শেষোক্ত যন্ত্রে ঘনীকারক লেন্সের দ্বারা সংহত ইলেকট্রন-গুচ্ছ দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্য দিয়ে নির্গত না হয়ে ঐ বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়ে বস্তুমুখী লেন্সের উপর পড়ে। আলো যেভাবে ধাতব পদার্থ থেকে প্রতিফলিত হয়, এই প্রতিফলন অবশ্য ঠিক সেই রকম নয়। এখানে ইলেকট্রনরা দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে একটি ছোট কোণের মধ্যে থাকে। তবে ঐ কোণটি ছোট হওয়ায় ইলেকট্রনরা বস্তুমুখী লেন্সের আওতার মধ্যেই থেকে যায়।

নিঃসরণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে ইলেকট্রনগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়, তা দ্রষ্টব্য বস্তু থেকেই নিঃসৃত হয়। এই নিঃসরণ নানাভাবে সম্ভব হতে পারে। যেমন, দ্রষ্টব্য বস্তুটি ধাতব হলে উত্তাপের সাহায্যে। অধিকাংশ ধাতুতেই কিন্তু যথেষ্ট ইলেকট্রন নিঃসরণের জন্য উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন বলে বস্তুটির উপর সাধারণতঃ বেরিয়াম বা সিজিয়ামের একটি পাত্‌লা আস্তরণ দেওয়া থাকে; কারণ অপেক্ষাকৃত অল্প তাপমাত্রাতেই বেরিয়াম ও সিজিয়াম থেকে প্রচুর ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়। এছাড়াও যেভাবে এই নিঃসরণ সম্ভব, তা হলো দ্রষ্টব্য বস্তুটির উপর আলো, অতি-বেগুনি আলো বা একটি ধনাত্মক আয়নগুচ্ছ নিক্ষেপ করে, অথবা বস্তুটির সঙ্গে তেজস্ক্রিয় কোন পদার্থের সংযোগ ঘটিয়ে।

ই-অ যন্ত্র পরিবারের প্রাচীনতম সভ্য এই নিঃসরণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র। বর্তমানে অবশ্য এর ব্যবহার খুবই সীমিত। দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে নিঃসৃত ইলেকট্রনগুলির বেগের মধ্যে প্রচুর তারতম্য থাকায় প্রতিবিম্বে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে একটি বিশেষ ধরণের ত্রুটি—যে ত্রুটিকে বলা হয় বর্ণাপেরণ (Chromatic aberration)। ফলে এই যন্ত্রে উচ্চমাত্রার বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না।
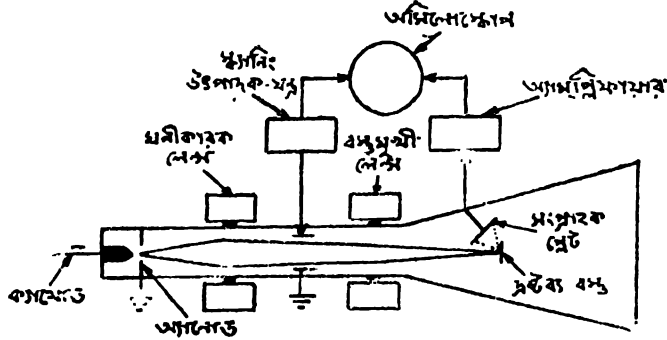
৫নং চিত্র
স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

তুমি তো অনেক দিন থেকেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা নিয়মিত পড়,—১৯৬৩ সালের জুন মাসের সংখ্যায় 'টেলিভিসন' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে স্ক্যানিং-এর বিষয় নিশ্চয় বিশদভাবে পড়েছ। স্ক্যানিং

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একটি সরু ইলেকট্রনগুচ্ছকে দ্রষ্টব্য বস্তুর সম্মুখভাগের উপর স্ক্যান করানো হয়, অর্থাৎ ইলেকট্রনগুচ্ছটিকে ওর উপর যাতায়াত করানো হয় একটি বিশেষ ধারা অনুযায়ী। এর ফলে দ্রষ্টব্য বস্তু থেকে যে সব ইলেকট্রন নিঃসৃত হয়, তারা একটি সংগ্রাহক প্লেটের মাধ্যমে এক বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের সৃষ্টি করে। অ্যাম্প্লিফায়ারের সাহায্যে সঙ্কেতটিকে পরিবর্ধিত করে ক্যাথোড রে অসিলোস্কোপে পাঠানো হয়। স্ক্যানিং-এর জন্য যে উৎপাদক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, অসিলোস্কোপের সঙ্গে তারও যোগাযোগ থাকে করে ও ঐ আয়তনেরই প্রায় সমান হয়। ৬নং চিত্রে এই জন্য দেখবে, দুটি লেন্সের সাহায্যে প্রাথমিক ইলেকট্রন উৎসের একটি হ্রাসপ্রাপ্ত প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়—ঐ প্রতিবিম্ব দ্রষ্টব্য বস্তুর ছায়া ফেলবার জন্য উৎস হিসাবে কাজ করে। তা সত্ত্বেও আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে এ যন্ত্রের কার্যকারিতা বিশেষ কিছু বাড়ানো সম্ভব হয় নি। সে জন্য ই অ যন্ত্রের শৈশবাবস্থায় এই ধরণের যন্ত্র চালু থাকলেও এর ব্যবহার এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তবে এই যন্ত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করে রঞ্জেনরশ্মি অণুবীক্ষণ যন্ত্র গঠন করা
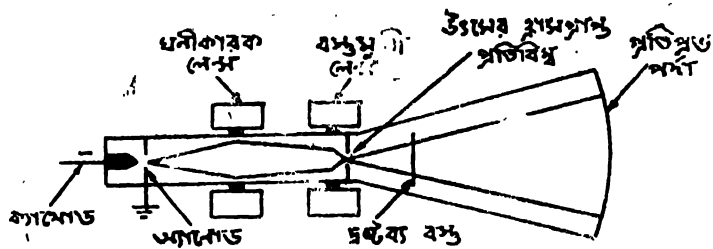
৬নং চিত্র

ছায়া ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

বলে দ্রষ্টব্য বস্তুটির প্রতিবিম্ব সরাসরি অসিলোস্কোপে দেখতে পাওয়া যায়।

ছায়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দ্রষ্টব্য বস্তুর একদিকে থাকে একটি ইলেকট্রন উৎস ও অন্যদিকে থাকে একটি প্রতিপ্রভ পর্দা বা আলোক চিত্রের ফলক। বুঝতে পারছো ঐ পর্দা বা ফলকের উপর দ্রষ্টব্য বস্তুটির ছায়া পড়বে এবং বস্তুটির অনচ্ছ অংশগুলির তুলনায় স্বচ্ছ অংশগুলির মধ্য দিয়ে বেশি পরিমাণ ইলেকট্রন নির্গত হওয়ায় ছায়ার মধ্যে বস্তুটির ভিতরের গঠন-বৈচিত্র্য প্রকাশ পাবে। ইলেকট্রনের উৎস থেকে পর্দা বা ফলকের দূরত্ব উৎসটি থেকে দ্রষ্টব্য বস্তুর দূরত্বের তুলনায় যত বড় হবে, প্রতিবিম্বের পরিবর্ধনের মাত্রাও সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণ ক্ষমতা উৎসের আয়তনের উপর নির্ভর হয়েছে, যার সাহায্যে বস্তুর ভিতর মহলের অনেক খবর জানতে পারা যাচ্ছে।

অতঃপর, বোল্‌তা, লেন্স-সংক্রান্ত তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করবার কিঞ্চিৎ প্রয়াস করবো।

কাচের লেন্সের মধ্য দিয়ে যখন আলোক-রশ্মি পাঠানো হয়, তখন তুমি জান, আলোক-রশ্মিগুলির আপতন কোণ বিভিন্ন হওয়ায় তাদের গতিপথ বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কাচের লেন্সের সাহায্যে যে আলোক কেন্দ্রীভূত করা যায় বা কোন দ্রব্যের প্রতিবিম্বকে পরিবর্ধিত আকারে দেখানো যায়, তার মূলে হলো এই বৈশিষ্ট্য

ই-অ যন্ত্রে আলোকরশ্মির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় গতিশীল ইলেকট্রন। ইলেকট্রন-কণিকা বিদ্যুৎ-সমন্বিত হওয়ায় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে

তাদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যে উপকরণের সাহায্যে এই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়, তার নাম বৈদ্যুতিক লেন্স। আগে তোমায় ৬টি ছবি পাঠিয়েছি, এবারকার পাঠানো ৭নং চিত্রে ঐ লেন্সের কার্যকারিতা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তিনটি বৃত্তাকার প্লেটের মধ্যে যে ছিদ্র আছে, তারই মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন-দের যাওয়ার পথ। বাইরের প্লেট দুটিতে কোন বিদ্যুৎ-চাপ নেই, মধ্যেরটিতে উচ্চমাত্রার ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-চাপ। এর ফলে প্লেটগুলির মধ্যস্থলে যে বিদ্যুৎক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তাতে ইলেকট্রনদের গতিপথ পরিবর্তিত হয়, কেন্দ্রীভূত হয় ঋণাত্মক ইলেকট্রনরা। এখানে দেখছো, তিনটি প্লেটের সমন্বয়ে কেমন একটি বৈদ্যুতিক লেন্স তৈরি হয়েছে। মধ্যের প্লেটটির বিদ্যুৎ-চাপ যদি বেশ কয়েক হাজার ভোল্ট হয়, তাহলে লেন্সটির ফোকাস-দূরত্ব দু-এক মিলিমিটারের মত অল্প হওয়া সম্ভব। ফোকাস দূরত্ব অল্প করবার প্রয়োজন এই জন্য যে, ঐ দূরত্ব যত অল্প হবে, প্রতিবিম্বের আকৃতিও তত বাড়তে থাকবে।

তুমি নিশ্চয় জান, গতিশীল ইলেকট্রন হলো বিদ্যুৎপ্রবাহ, আর বিদ্যুৎপ্রবাহ চুম্বকক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। অতএব বুঝতে পারছো, গতিশীল ইলেকট্রনদের গতিপথ চুম্বকক্ষেত্রের উপস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। চৌম্বক লেন্সের কার্যকারিতার মূল কথা হলো এই। ৮নং চিত্রে যে চৌম্বক লেন্সটি দেখছো, ওর তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠালে বিদ্যুৎ-চুম্বকের সৃষ্টি হয়। ঐ চুম্বক হলো বৃত্তাকৃতি, যার মাঝখানটা ফাঁপা, অর্থাৎ ওর আকার অনেকটা তোমার হাতের বালার মত। বিদ্যুৎ-চুম্বকটির সঙ্গে যে চুম্বকখণ্ডটি লাগানো রয়েছে, তার ক ও খ চিহ্নিত স্থানে ফাঁক খুব সামান্য হওয়ায় চুম্বক-ক্ষেত্র ওখানে প্রবল। বিদ্যুৎ-চুম্বকের মধ্যের ফাঁক দিয়ে ইলেকট্রনরা যাওয়ার সময় ঐখানে চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে তাদের গতিপথের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। বিদ্যুৎ-চুম্বকের তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহের মাত্রা বাড়িয়ে চৌম্বক লেন্সটির ফোকাস-দূরত্ব দু-এক মিলিমিটার পর্যন্ত স্বল্প করা সম্ভব।

বিদ্যুৎ-চুম্বকের পরিবর্তে চিরস্থন-চুম্বকও কখনও কখনও ই-অ যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কাচের লেন্সের সাহায্যে কোন দ্রষ্টব্য বস্তুকে ফোকাস করতে

৭নং চিত্র
বৈদ্যুতিক লেন্স।

হলে লেন্সটিকে এগিয়ে-পিছিয়ে ঠিকমত জায়গায় রাখতে হয়। ই-অ যন্ত্রে বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক লেন্সকে স্থির রেখে ওদের মধ্যের বিদ্যুৎ-চাপ বা বিদ্যুৎপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে এই ফোকাস করবার কাজটি সম্ভবপর হয়।

কাচের লেন্সের তুলনায় এই লেন্সগুলির এ সুবিধা আছে ঠিকই, তবে কাচের লেন্সের মত

৮নং চিত্র
চৌম্বক লেন্স।

এ সব লেন্সেও গোলাপেরণ (Spherical aberration), বর্ণাপেরণ (Chromatic aberration), বিষম দৃষ্টি (Astigmatism) প্রভৃতি ত্রুটি থাকতে পারে। নানারকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে এগুলিকে যতদূর সম্ভব এড়ানো হয়।

চৌম্বক লেন্সের কার্যকারিতার জন্য যে জটিল সার্কিটের প্রয়োজন, বৈদ্যুতিক লেন্সের সার্কিট তার তুলনায় সরল ও সেই জন্যে স্বল্পমূল্যেরও। কিন্তু চৌম্বক লেন্সের বিশ্লেষণ শক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি এবং এর সার্কিট জটিল হলেও আজকের উন্নত ইলেকট্রনিক্সের যুগে এমন কিছু দুরূহ নয়। বর্তমানে অধিকাংশ ই-অ যন্ত্রেই চৌম্বক লেন্স ব্যবহৃত হয়।

ই-অ যন্ত্রের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে এতক্ষণে, আশা করি, তোমার বেশ খানিকটা ধারণা হয়েছে। এরপর যখন কলকাতায় আসবে, আগে থাকতে জানিও—আমাদের সায়েন্স কলেজের সাহা ইনষ্টিটিউটে যে দুটি ই-অ যন্ত্র আছে, সম্ভব হলে তোমায় দেখাবার ব্যবস্থা করবো। ওর একটি সীমেন্স কোম্পানীর তৈরি, কয়েক বছর হলো এখানে আছে; আর অন্যটি ফিলিপ্স কোম্পানীর, এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসের সম্মেলনের সময় এসেছে, মূল্য প্রায় দু লক্ষ টাকা।

তবে শুধু দেখতে নয়, এই সব আশ্চর্য যন্ত্র নিয়ে কোন দিন যদি কাজ করতে ইচ্ছা হয়, সেই পুরনো কথাগুলি আর একবার তাহলে নতুন করে বলি: মন দিয়ে পড়াশুনা করো—সিনেমার জগৎ থেকে মনটাকে অনেকখানি গুটিয়ে নিয়ে আর নোট মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করবার মত উল্টো পথ সব ছেড়ে দিয়ে। অধ্যবসায়ের সোজা পথে তাহলে দেখবে একদিন এই সব যন্ত্রের রাজত্বে পৌঁছে গেছ। ইতি—

কলকাতা তোমার বাতায়নদা

৮।৭।৬৫

সঞ্চয়ন

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির অসীম সম্ভাবনা

সোভিয়েট বিজ্ঞানী নিকোলাই ঝাভোরোনকের মতে, পৃথিবীর সর্বত্র যদি ফসলের ফলন অগ্রগামী দেশগুলির সমান স্তরে তোলা যায়, তাহলেই ক্ষেত-খামার না বাড়িয়েও এক হাজার কোটি মানুষের খাদ্য সরবরাহ করা যাবে।

যদি ভূপৃষ্ঠের অর্ধেক অংশে খাদ্যশস্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন করা হয়, তাহলে আধুনিক আলোক-সংশ্লেষণ (ফটোসিন্থেসিস) পদ্ধতিতে ৫ হাজার কোটি লোকের উপযোগী যথেষ্ট খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

অনুরূপ পদ্ধতিতে সামুদ্রিক উদ্ভিদাদি কাজে লাগানো হলে দশ হাজার কোটি মানুষের খাদ্য যোগান সম্ভব।

এখন এসব অঙ্ক আজগুবি বলেই মনে হবে। তাছাড়া মানুষের সংখ্যা শুধু খাদ্যপ্রাপ্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, আর সম্ভবতঃ পৃথিবীর লোক-সংখ্যা কখনই এই রকম বিরাট অঙ্কে পৌঁছুবে না। সুদূর ভবিষ্যতের কথা না ভেবে বর্তমানে খাদ্য-বৃদ্ধির জরুরী সমস্যা কি ভাবে দ্রুত ও ব্যাপক-ভাবে সমাধান করা যায়, সে কথাটাই ভাবা যাক।

অনাবাদী জমিতে চাষ করতে এবং পার্বত্য ও মরু অঞ্চলকে আবাদী জমিতে পরিণত করতে হলে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। তাছাড়া এতে যথেষ্ট সময়ও লাগে। কাজেই আমাদের যুগে দ্রুত খাদ্যসম্পদ বৃদ্ধির উপায় হলো আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানো, রাসায়নিক সারের যথাযথ ব্যবহার এবং শস্যাদি উৎপাদন ও গবাদি পশু পালনে রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ। আগাছা ও অনিষ্টকর কীট-পতঙ্গাদির বিনাশ এবং উদ্ভিদাদির ব্যাধি নিরাকরণে রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহারও শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

গবাদি পশুপালনের ব্যাপারে রসায়নশাস্ত্র গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। প্রচলিত পশুখাদ্যের পুষ্টিকারিতা অপেক্ষা ভিটামিন, হরমোন, অ্যান্টি-বায়োটিক্স ও খনিজ দ্রব্যাদি মিশ্রিত পশুখাদ্যের পুষ্টিকারিতা অনেক বেশী। এছাড়া পশুখাদ্য নয়, এমন সব জিনিষ থেকেও পশুখাদ্য তৈরি হচ্ছে; যেমন—কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত তন্তুর প্রধান জৈব উপাদান প্রোটিনে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। স্বাভাবিক পশুখাদ্য থেকে যতটা প্রোটিন পাওয়া যায়, রাসায়নিক জ্ঞানের সাহায্যে প্রস্তুত প্রোটিন তার ২৫ শতাংশ স্থান গ্রহণ করতে পারে।

বর্তমানে রসায়ন, জৈব রসায়ন ও জীবাণু-বিদ্যা যে স্তরে পৌঁচেছে, তাতে আমরা ইতিমধ্যেই পশুখাদ্য নয়, এমন সব উদ্ভিদ থেকে নানা রকমের চিনি, স্নেহযুক্ত অম্ল, ইথাইলিন, সুরাসার, পশুখাদ্যজাত খামি, খাদ্যপ্রাণ ও অন্যান্য জিনিষ উৎপাদন করতে পারি।

পেট্রো-হাইড্রোকার্বন পশুখাদ্যের আর একটি উৎস হতে পারে। এথেকে যে খামি (ঈস্ট) এবং প্রোটিন-ভিটামিনের সার পাওয়া যাবে, তাতে থাকবে ৫০ শতাংশ সুপাচ্য প্রোটিন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, রসায়নের সাহায্যে মানুষ এখনই তার খাদ্য-সমস্যার পূর্ণ সমাধান করতে পারে।

সূর্যের আলোর সাহায্যে উদ্ভিদাদির যে কার্বন-বিপাক প্রক্রিয়া চলে, তাকেই বলা হয় ফটোসিন্থেসিস। এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদসমূহ

যে সব জৈব পদার্থ উৎপাদন করে, তা সারা পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় শত শত গুণ বেশী। এখন এই সব পদার্থ খুব সামান্যই কাজে লাগানো হয়। আর মহাসমুদ্রগুলির উদ্ভিদাদি মানুষ এখনও কাজে লাগায় নি বললেই চলে।

উদ্ভিদের ফটোসিন্থেসিস কাজে লাগাবার একটা পন্থা হলো এক কোষবিশিষ্ট শ্যাওলার চাষ করা। এই বিষয়টি বহু দেশের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিজ্ঞানীদের এই প্রয়াস বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। যেমন—ক্লোরেলা নামক এক প্রকার শ্যাওলা চাষ করলে কারবনিক অ্যাসিড, খনিজ লবণ এবং জলের সাহায্যে প্রতি হেক্টর পরিমিত জলে ২০ থেকে ৪০ টন ফসল পাওয়া সম্ভব। জাপানী বিজ্ঞানীরা বলেন যে, ক্লোরেলাজাত প্রোটিন উৎপাদনের ব্যয় ইতিমধ্যেই অন্যান্য প্রোটিন উৎপাদনের ব্যয়ের সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লোরেলাজাত প্রোটিন পশুখাদ্যরূপে ব্যবহৃত হতে পারে এবং যথোপযুক্তরূপে শোধিত হলে এই প্রোটিন মানুষের খাদ্যরূপেও ব্যবহার করা যায়। এককোষযুক্ত শ্যাওলার চাষের ব্যবস্থা যদি নিখুঁত হয় এবং এই শ্যাওলা থেকে খাদ্য যদি বাজারে বিক্রয়যোগ্যভাবে তৈরি হয়, তাহলে মানুষের খাদ্য উৎপাদনের জন্যে যে পরিমাণ জমির দরকার, তা বহুগুণ কমিয়ে দেওয়া যাবে।

সর্বশেষে বলা যায় যে, কারবনিক অ্যাসিড, জল এবং বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন থেকে আহৃত পুষ্টিকর দ্রব্যাদির সরাসরি রাসায়নিক সংশ্লেষণ ব্যাপকভাবে খাদ্যদ্রব্যাদি বৃদ্ধি করবার আর একটি পন্থা। বিজ্ঞানের অগ্রগতি নব নব দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কাজেই খাদ্যের অভাব ঘটবে, এই আশঙ্কা একেবারেই অমূলক। মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমেই বিপুল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। যদি যুদ্ধের উন্মত্ত প্রচেষ্টায় মানুষের এই জ্ঞান নিয়োজিত না হয়, তাহলে সত্যই এক নতুন জগৎ গড়ে উঠবে, যে জগতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও ব্যাধি অতীতের এক ভয়ঙ্কর স্মৃতিতেই পর্যবসিত হবে। এই মহত্তর সম্ভাবনার কথা মনে রেখে আজকে ও আগামীকালের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হবে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষকে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য যোগানো। আর আজকের পৃথিবীতেই সমস্ত ক্ষুধার্তকে অন্নদান করা সম্ভব—কারণ, জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষিসংখ্যানেই দেখা যায় যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা ১৯৫২ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে গড়ে যেখানে বছরে ১·৮ শতাংশ বেড়েছে, সেখানে খাদ্যের উৎপাদন বেড়েছে ২·৯ শতাংশ হারে।

একই জমিতে বছরে দুটি আমন ধানের ফসল

এই সম্বন্ধে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখেছেন—পশ্চিম বাংলায় যদিও চা'ল প্রধান খাদ্য, তবুও এর উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। গত কয় বছরের ফলনের উপর ভিত্তি করে দেখা গেছে যে, এই রাষ্ট্রের মোট চা'ল উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ৪৫ লক্ষ টন, যেখানে গড়পড়তা মাথাপিছু সহরাঞ্চলে ১২ আউন্স এবং গ্রামাঞ্চলে ১৬ আউন্স তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্ততঃপক্ষে বছরে ৬৪ লক্ষ টনের দরকার। কৃষি-বিজ্ঞানীরা উন্নত বীজ, সার প্রয়োগ, উন্নত কৃষি এবং কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দ্বারা বাৎসরিক ১০ লক্ষ বাড়্তি লোকের খাদ্য সংস্থানে অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করছেন।

বাংলা দেশে আউশ, আমন এবং বোরো—এই তিন শ্রেণীর ধানের চাষ করা হয়। তাদের পাকবার ঋতু অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা

হয়েছে। এই তিন শ্রেণীর ভিতরে আমন ধানই অধিকাংশ লোকের প্রিয়। আউশ এবং আমনের চাষ ব্যাপকভাবে বর্ষায় বা খরিফে করা হয় এবং যথাক্রমে এদের জমির পরিমাণ হচ্ছে ৬ লক্ষ এবং ৪০ লক্ষ হেক্টর, যখন বৃষ্টি পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়ে থাকে। বোরো চাষের পরিমাণ ২৪ হাজার হেক্টরের মত এবং এত কম হবার কারণ বোধ হয় এর মোটা চা'ল এবং সেই সময় জমির উপর বেশী চাপ থাকে, সেই জন্যে।

আউশ ধান উঁচু জমিতে ছিটিয়ে অথবা বসিয়ে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে চাষ করা হয় এবং কাটা হয় ভাদ্রে। আমন ধান আবার সাধারণতঃ রোয়া চাষ করা হয়। বীজ বপন করা হয় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে এবং ভাল করে কাদানো জমিতে শ্রাবণে ৫-৬ সপ্তাহ বয়সের রোয়া বসানো হয় এবং ফসল কাটা হয় অগ্রহায়ণে। শীতে শুকিয়ে যায় না, এমন সব নাবি জমিতেই বোরো ধানের চাষ করা হয়, যেখানে অন্য ফসল সাফল্যের সঙ্গে চাষ করা সম্ভব নয়। এর বীজতলায় বীজ ফেলা হয় কার্তিকে, রোয়া বসানো হয় পৌষে এবং ফসল কাটা হয় বৈশাখে। সাধারণতঃ ৪০-৫০ দিনের পুরনো চারা রোয়া বসানো হয় এবং খেয়াল রাখতে হয়, যাতে মাঠে দাঁড়ানো জলে ডুবে না যায়। আউশ, আমন এবং বোরো ধান সাধারণতঃ সারিতে চাষ করা হয় এবং প্রতি গর্তে ২-৩টি চারা বসানো হয়। সারিতে ১৫ সে. মি. দূরে দূরে চারা বসানো হয়ে থাকে।

সারের ব্যাপারে জৈব ও অজৈব নাইট্রোজেন হেক্টর প্রতি ৪৫ কিলো ৩ বারে প্রয়োগ করা হয়। অর্ধেক জৈব সার, যেমন—শহরের আবর্জনা, গোবর অথবা খোল ইত্যাদি শেষবার কাদানের সময় জমিতে প্রয়োগ করা হয় এবং বাকী অর্ধেক—নাইট্রোজেন, অ্যামোনিয়াম সালফেট অথবা ইউরিয়া ইত্যাদির মারফৎ দুটি সমান ভাগে রোয়া বসাবার ১ মাস পরে এবং ফুল ফোটবার তিন সপ্তাহ আগে প্রয়োগ করা হয়। বোরো ধানে গাছের অবস্থা অনুযায়ী হেক্টরে ৬৬ কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা যায়। শেষবার জমি তৈরির সময় হেক্টর প্রতি ৩৪ কেজি ফস্‌ফেটও সিঙ্গল সুপার ফস্‌ফেট হিসেবে প্রয়োগ করা হয়।

আমাদের দেশে স্মরণাতীত কাল থেকেই আমন ধানের চাষ বছরে কেবলমাত্র একবার খরিফ ঋতুতে হয়ে আসছে। আমাদের ধারণা যে, আমন ধান ঋতুবদ্ধ অর্থাৎ যখনই রোয়া বসানো হোক না কেন, বছরের একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে এর ফুল ফুটবে। কিন্তু বর্তমানে গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, ধানের ফুল ফোটা নির্ভর করে দিনের দৈর্ঘ্যের উপর, যার সাহায্যে ফুল ফোটবার হর্মোনের সংযোগ সাধন হয়ে থাকে। ধানের ফুল ফোটবার প্রয়োজনীয় দিনের দৈর্ঘ্য স্বাভাবিকভাবেই দুবার, শরতে এবং বসন্তে পাওয়া যায়, কাজেই সাফল্যের সঙ্গে কতকগুলি উচ্চ ফলন দেয়। এখন আউশ, আমন এবং বোরো ধানের চাষ বছরে দুবার—খরিফে এবং বোরোতে করা যেতে পারে, যদি বোরোতে সেচের জল নিশ্চিত থাকে এবং রোয়া বসাবার কাজ পৌষেই শেষ করা যায়। বোরো ঋতুতে সব রকমের ধানের দানা এবং খড় উভয়েই খরিফের তুলনায় অনেক বেশী ফলন দিয়ে থাকে। এথেকে এই বোঝা যায় যে, সকল প্রকার ধান—সে আউশ, আমন অথবা বোরো যাই হোক না কেন, তারা শুখা ঋতু পছন্দ করে, যখন তাপ এবং উজ্জ্বল রোদের সময়ের পরিমাণ বেশী থাকে এবং ফুল ফোটা ও দানা তৈরির সময়ে বৃষ্টি কম আর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকে। বোরো ঋতুতে গাছের দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যায় এবং এর ফলে গাছের শুয়ে পড়বার কোন ভয় থাকে না এবং এই সময় অনেক

বেশী সংখ্যায় শিষওয়ালা গুছি বের হয়। এথেকে এই বোঝা যায় যে, খরিফে উচ্চ তাপ, উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বেশী বৃষ্টি এবং কম সময়ের উজ্জ্বল সূর্যের আলো গাছের উচ্চতার পক্ষে অনুকূল—যেখানে বোরো ঋতু অর্থাৎ নিম্ন তাপমাত্রা, কম বৃষ্টি, আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ কম এবং বেশী সময়ের উজ্জ্বল সূর্যালোক প্রভৃতি আবহাওয়ার অবশ্য কারণগুলি বেশী পরিমাণে গুছি বের হওয়ার পক্ষে সহায়ক।

খরিফে সাধারণতঃ আমন ধানের ফুল ফোটে, আশ্বিন থেকে কার্তিকের গোড়া পর্যন্ত। কিন্তু বোরোতে ফুল ফোটে চৈত্রে, যখন দিনের দৈর্ঘ্য আশ্বিনের মত প্রায় একই এবং ১১.৯৫ থেকে ১২.৫৮ ঘণ্টার মধ্যে থাকে

বিভিন্ন প্রকারের আমন, যেমন—লাটিশাল, রূপশাল, বাদকলমকাটি-৬৫, ভাসামানিক, বাদশা-ভোগ (সুগন্ধী), কলমা-২২২, ঝিঙ্গাশাল, পাটনাই-২৩ ইত্যাদি বেশ লাভের সঙ্গে খরিফ এবং বোরো উভয় ঋতুতে বছরে দুবার চাষ করা চলবে এবং এতে খরিফে চাষ না করে বোরোতে করবার জন্যে হেক্টর প্রতি ৭½—৯½ কুইন্টল বেশী ফলন পাওয়া যাবে। লাটিশাল এবং বাদকলমকাটি-৬৫ বোরো ঋতুতে চাকদহ থানা কৃষিক্ষেত্রে চাষ করা হয়েছিল এবং তাদের ফলন হেক্টর প্রতি ক্রমান্বয়ে ৫৯½ এবং ৪৭ কুইন্টল হয়েছিল। বর্তমানে লাটিশাল হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান, ২৪ পরগণা এবং বীরভূম জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় বছরে দুবার চাষ করা হচ্ছে, যাতে বাংলা দেশে ভাল জাতের চা'লের উৎপাদন আরও বাড়ানো যায়। কিছুকালের মধ্যেই আরও অনেকগুলি জেলাতে এভাবে চাষ করা হবে। এই প্রসঙ্গে একথা বলা যেতে পারে যে, বোরো ঋতুতে সংগ্রহ করা আমন ধানের বীজ ফসল কাটবার পরেই খরিফে বোনবার জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ কোন সুপ্তাবস্থা এই সময় থাকে না। এর ফলে খরিফে আমন বীজের অভাব মেটানো সহজ হবে। কিন্তু খরিফে সংগ্রহ করা আমন বীজ ফসল কাটবার পরেই বোনা যাবে না—কেন না, এই সময় তাদের ভিতরে সুপ্তাবস্থা থাকতে দেখা গেছে।

যেহেতু উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রকারের আমন ধান সম্পূর্ণ ঋতুবদ্ধ নয়, সেহেতু চিরাচরিত প্রথায় কেবলমাত্র খরিফে আমন চাষ না করে, বেশী ফলন দেয়, এমন জাতের আমন ধান খরিফ এবং বোরো উভয় ঋতুতে বছরে দুবার চাষ করে আমাদের পশ্চিম বাংলার ১৯ লক্ষ টনের খাদ্য ঘাটতির কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

ধান চাষের পক্ষে শীত ঋতুই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল সময়—সে আউশ আমন অথবা বোরো যাই হোক না কেন। তবে বোরো ঋতুতে সেচের জল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন এবং পৌষের শেষেই রোয়া বসাবার কাজ শেষ করতে হবে। বোরো ঋতুতে দানা এবং খড়ের পরিমাণ খুব বেশী পাওয়া যায় এবং খরিফের তুলনায় রোগ ও পোকার আক্রমণও অনেক কম হয়ে থাকে। অবশ্য কতক-গুলি নাবি আমন জাতের ধান খরিফে খুব ভাল ফলন দিয়ে থাকে এবং খরিফে কেবলমাত্র সেই সব আমন ধানই আমাদের চাষ করা উচিত হবে, যাতে বাড়্‌তি আমন জমিগুলিতে আমরা অন্য কতকগুলি অর্থকরী ফসল, যেমন—পাট, তুলা ইত্যাদির চাষ করতে পারি, যা দিয়ে আমাদের দেশ কিছু বিদেশী মুদ্রা আয় করতে পারে।

এনট্রপির ধারণার এক-শ' বছর

শ্রীমহাদেব দত্ত

বাঁচবার তাগিদেই মানুষ পাথরের টুকরা, গাছের ডাল প্রভৃতি বাইরের বস্তু সুকৌশলে ব্যবহার করে। এভাবেই হয় যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের প্রাথমিক পরিচয়। মানুষের নিজের শারীরিক শক্তির ও কর্মক্ষমতার সীমার ধারণা যতই সুস্পষ্ট হলো, ততই বাড়লো যন্ত্রে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য। 'আমাকে দাঁড়াবার জায়গা দিন, আমি পৃথিবীকে তুলে ফেলবো'—আর্কিমিডিসের এই পরিচিত উক্তিতে সেকালে যন্ত্রের উপর আস্থা ও নির্ভরতার পরিচয় মেলে। মানুষ চায় তার যে সকল যন্ত্র আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ও কর্মক্ষম যন্ত্র তৈরি করতে, শত শত বছর ধরে স্বপ্ন দেখা হয়েছে অবিরাম কর্মক্ষম যন্ত্র আবিষ্কারের, যে যন্ত্র চালু হবার পর অবিরাম কাজ করে চলবে। এরূপ যন্ত্রকে 'প্রথম ধরনের অবিরাম কর্মক্ষম যন্ত্র' নাম দেওয়া হয়।

যেমন, সস্তা ধাতু থেকে সোনা তৈরির সাধনা রসায়নকে প্রথম দিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি এই অবিরাম কর্মক্ষম যন্ত্র তৈরির চেষ্টা পদার্থবিদ্যা, বিশেষ করে বলবিদ্যা ও তাপ-গতিবিদ্যার অগ্রগতিতে অনেক সাহায্য করে। বলবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে 'শক্তির নিত্যতা' সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা জন্মে। শক্তি নিত্য হলে যন্ত্র অবিরাম কাজ করবে কিভাবে? কিন্তু 'শক্তির নিত্যতা' অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাকৃতিক নিয়ম না হয়ে ওঠায় কোন কোন যন্ত্রকুশলী অবিরাম কর্মক্ষম যন্ত্র তৈরির চেষ্টা করেন ও সফলতার দাবী করেন।

ষ্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কার যন্ত্রের এক নতুন যুগের সূচনা করে। তাপের সাহায্যে যন্ত্র পরিচালনা সম্ভব হয়। কাউন্ট রুমফোর্ড, জুল প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের পরিকল্পিত প্রক্রিয়া ও পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়, তাপ শক্তিরই একটি রূপমাত্র। 'শক্তি নিত্য, ইহার রূপান্তর মাত্র হয়'—এটি একটি সার্বজনীন প্রাকৃতিক নিয়মরূপে গ্রাহ্য হয়। এভাবে সুসম্বদ্ধ গতিবিজ্ঞানের সঙ্গে তাপ সম্বন্ধে সে সময় পর্যন্ত অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, পাওয়া যায় তাপ-গতিবিজ্ঞান। শক্তির নিত্যতাই এই বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র।

শক্তির নিত্যতা সন্দেহাতীতভাবে গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ধরনের অবিরাম কর্মক্ষম যন্ত্র অবাস্তব হয়ে যায়। ইহার আলোচনা ও এবিষয়ে সব চেষ্টা বিজ্ঞানীমহলে পরিত্যক্ত হয়। তখন ভাবা হয়, বস্তুর তাপকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে নতুন ধরনের (দ্বিতীয় ধরনের) অবিরাম কর্মক্ষম যন্ত্র আবিষ্কারের। এবিষয়ে চেষ্টাও হয়। কিন্তু শীঘ্রই তাপ-গতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র গ্রথিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এরূপ যন্ত্রের অসম্ভাব্যতা সুস্পষ্ট হয়। ওস্ট্‌ওয়াল্ড প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মতে, দ্বিতীয় ধরনের অবিরাম কর্মক্ষম যন্ত্রের অসম্ভাব্যতাই তাপ-গতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র। অবশ্য ১৮৫০ সালে ক্লাউসিয়াস প্রথম এই দ্বিতীয় সূত্রটি 'কোন বস্তু থেকে উষ্ণতর বস্তুতে তাপ পাওয়া অসম্ভব' বলে প্রকাশ করেন। ১৮৫১ সালে কেলভিন এই সূত্রকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করে জানান যে, 'শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র একটি বস্তুকে একই উষ্ণতায় রেখে তাথেকে তাপ নিষ্কাশন অসম্ভব'। আলোচনার দ্বারা দেখা যায়, এই সূত্রের তিনটি গ্রন্থনই ভাষান্তর মাত্র।

১৮৬৫ সালে (মতান্তরে ১৮৫৪ সাল) ক্লাউসিয়াস প্রথম এনট্রপির ধারণা অবতারণা করে তাঁর 'এনট্রপি সূত্র' গ্রথিত করেন। 'জগতে (স্বতন্ত্র বস্তুর) এনট্রপি কখনই কমে না'। এনট্রপি সূত্র তাপ-গতিবিজ্ঞানে দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক প্রকাশ ব্যতীত কিছু নয়। 'এনট্রপি'র নানাভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এবিষয়ে সম্ভবমত আলোচনা করা যাবে। অবশ্য এনট্রপির সূত্র গ্রন্থনে নিম্নের সংজ্ঞাটি সহজে ব্যবহার করা যায়।

"তাপ-গতিবিজ্ঞানসম্মত অতি অতি মন্থর পরিবর্তনে কোন বস্তু তার পারিপার্শ্বিক থেকে T উষ্ণতা Q তাপ গ্রহণ করে তবে তার এনট্রপির পরিবর্তন Q/T হবে।" অবশ্য সাধারণতঃ শক্তির নিত্যতার ব্যবকলনীয় সমীকরণের আলোচনা থেকে পদার্থবিত্মায় এনট্রপির ধারণার অবতারণা করা হয়।

সমগ্র পদার্থবিত্মায় এনট্রপির সূত্র (দ্বিতীয় সূত্র) বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সাধারণতঃ প্রাকৃতিক নিয়ম বা সূত্র প্রকাশিত হয় সমীকরণের সাহায্যে। কিন্তু এনট্রপি সূত্রটি অসমতাজ্ঞাপক একটি স্বতন্ত্র বস্তুর। এনট্রপির কেবল একমুখী পরিবর্তন গাণিতিক পদার্থবিদ্‌দের বিশেষ কৌতূহল ও আগ্রহ জাগায় ও নানাভাবে এই সূত্রকে বুঝাবার চেষ্টা হয়।

১৮৬৭ থেকে ১৮৭১ সালে দুজন জার্মান বিজ্ঞানী বোল্‌ট্‌জ্‌ম্যান ও ক্লাউসিয়াস দেখান যে, সাধারণ গতিবিজ্ঞানের সাহায্যে কেবলমাত্র একটি বস্তুর জন্যে গতিবিজ্ঞানের ধারণাগুলি মাত্র ব্যবহার করে এনট্রপির অনুরূপ একটি ফ্যান্‌ক্‌সান তৈরি করা যায়। এজন্যে বস্তুর গতির পর্যাবৃত্তি ও গতিবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রগুলি থেকে ভিন্ন এক নতুন সূত্রের অবতারণা করতে হয়। এই সব আলোচনা থেকে সাধারণ বিজ্ঞানীদের—এমন কি, স্বয়ং বোল্‌ট্‌জ্‌ম্যানের কৌতূহল নিবৃত্তি হয় নি।

শীঘ্রই বোল্‌ট্‌জ্‌ম্যান ও তাঁর অনুগামীরা বস্তুকে বহুসংখ্যক গতিশীল অণুর সমবায় ধরে নিয়ে অংশতঃ গতিবিজ্ঞানের ও অংশতঃ স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের গণনার সাহায্যে এনট্রপি ও এনট্রপির সূত্রের ব্যাখ্যা করেন। এই মতে বিভিন্ন গতির জন্যে বহুসংখ্যক অণু নিজেদের মধ্যে নিয়ত ধাকাধাক্কি করছে এবং এর জন্যে সাধারণতঃ আণবিক বিপর্যয়ের (Molecular chaos) অবস্থায় থাকে, এনট্রপি এই বিপর্যয়ের পরিমাপক। গিব্‌স সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, এনট্রপি ও তার সূত্রের বৈশিষ্ট্য স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের দ্বারাই বুঝতে হবে। তাঁর মতে এনট্রপি বস্তুর (ও তার প্রতিরূপগুলির) বিভিন্ন সম্ভাব্য অবস্থার মধ্যে যে সম্ভাবনাবন্টন আছে, তার সূচকের গড়। এই সব আলোচনায় এনট্রপি সমবায়ের ধর্ম। আইনষ্টাইন, প্লাঙ্ক প্রভৃতি বিজ্ঞানের দিকপালেরা তাপ-গতিবিত্মা ও এনট্রপির আলোচনায় স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের অবতারণার পক্ষপাতী।

পদার্থবিত্মার আলোচনায় স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের অবতারণার সঙ্গে সঙ্গেই বস্তুর ধর্মের গড় ও গড় থেকে ব্যাপ্তির (Dispersion) ধারণা এসে পড়ে। পরে পদার্থবিত্মার অন্য শাখা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রক্রিয়া থেকে এই ব্যাপ্তির ধারণার নির্ভরযোগ্য সমর্থন পাওয়া যায়। এই দিক থেকে সুরু করে বসু ও ফার্মি সে সময়ের কোয়ান্টামবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুটি নতুন সূত্র আবিষ্কার করেন। এ দুটি বসু স্ট্যাটিস্‌টিকস্‌ ও ফার্মি স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ নামে পরিচিত। আজ এই দুটি স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ পদার্থবিত্মার দুটি অতিশয় মূলগত নিয়ম হিসাবে স্বীকৃত। ব্যাপ্তির ধারণা ও এই দুটি সূত্রের আবিষ্কার তাপ-গতিবিত্মায় স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের অবতারণার সফলতার বিশেষ নিদর্শন বলে গণ্য করা যায়।

১৯০৯ সালে জার্মান গণিতবিদ্‌ ক্যারাথিওডরি ব্যবকলনীয় সমীকরণে সাধারণ আলোচনার-সাহায্যে শক্তির নিত্যতা ও একটি সরল সূত্র থেকে এনট্রপির সংজ্ঞা দেন ও এনট্রপির সূত্র

প্রমাণ করেন। এই সরল সূত্রে ধরা হয়, স্বতন্ত্র বস্তু এরূপভাবে তার অবস্থার নিকটে সব অবস্থায় যেতে পারে না। প্রায় বারো বছর তাপ-গতিবিজ্ঞানের এই স্বতঃসিদ্ধভিত্তিক আলোচনা প্রায় অনাদৃত থাকে। পরে ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৮ সালে বর্ণ, ল্যাণ্ডে, তাতিয়ানা, এনফ্রেষ্ট প্রভৃতি বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের ক্যারাথিওডরি প্রদর্শিত পথে তাপ-গতিবিজ্ঞানের আলোচনা করেন। এই সকল আলোচনায় এই পদ্ধতিতে আলোচনার গুরুত্ব ও উৎকর্ষ স্পষ্ট হয়। তবুও এই সকল আলোচনা বিশেষ দুরূহ হওয়ায় আবার পঁচিশ বছরের অধিক কাল এদিকে বিশেষ গবেষণা হয় নি। অবশ্য অধুনা এবিষয়ে গবেষণা সুরু হয়েছে। আবার ১৯৬৪ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী গিলেস নতুন দিক থেকে আর একটি স্বতঃসিদ্ধভিত্তিক তাপবিজ্ঞানের আলোচনা ও এনট্রপির অবতারণা করেছেন। এই সব আলোচনায় দেখা যায়, এনট্রপি একটি বস্তুরই ধর্ম ও কোনরূপ স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল যুক্তির অবতারণায় সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়।

১৯৪৮ সালে গাণিতিক যোগাযোগ তত্ত্বের (Mathematical Theory of Communication) আলোচনায় মার্কিন বিজ্ঞানী শ্যানন্ সম্পূর্ণ নতুন পরিপ্রেক্ষিতে এনট্রপির ধারণার অবতারণা করেন। অবশ্য তাঁর সংজ্ঞা বোল্‌ট্‌জ্‌ম্যানের H-উপপাদ্যের উপর ভিত্তি করে ৭০ বছরের আগে এনট্রপির যে সংজ্ঞা পাওয়া গিয়েছিল, তা থেকে অভিন্ন। কিন্তু শ্যাননের সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিষয়বস্তুতে এনট্রপির ধারণার সার্বজনীনতা ও প্রভূত সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের সচেতন করে। এনট্রপির ধারণার উপর ভিত্তি করে অবগতি-বিদ্যা (Information Theory) গড়ে উঠে। ১৯৫৭ সালে এনট্রপির এই নতুন সংজ্ঞাকে ভিত্তি করে শ্যানন্ প্রভৃতি প্রবর্তিত অবগতি-বিদ্যার মূল পদ্ধতি প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ সম্ভাবনা-বিদ্যার দিক থেকে তাপ-গতিবিদ্যা আলোচনা করা হয়।

১৯৫১ সালে দত্ত সম্পূর্ণ স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের দৃষ্টিকোণ থেকে (কোনরূপ গতিবিজ্ঞানের যুক্তি অবতারণা না করে) তাপ-গতিবিদ্যার আলোচনা করেন। এতে প্রকৃতপক্ষে ফিশারের 'চরম সাদৃশ্য প্রণালী'র প্রয়োগ করা হয়। এই আলোচনায় এনট্রপিকে 'সাদৃশ্য-ফ্যান্‌ক্‌সানের' চরম মানের লগারিদম হিসাবে পাওয়া যায়। এভাবে সহজেই দেখা যায়, তাপ-গতিবিজ্ঞানের বাইরেও বহু স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল নমুনার জন্যে এনট্রপির ধারণা করা সম্ভব।

শ্যানন্ প্রভৃতির আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের যে কোন নমুনা বা সম্ভাবনা-বিদ্যার যে কোন অক্রম (Random) ঘটনাবলীর জন্যে এনট্রপি হিসাব করা যায়। এনট্রপির ধারণাকে ভিত্তি করে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ ও সম্ভাবনা-বিদ্যায় নতুন পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়েছে। শ্যানন্ নিজে ইংরেজী ভাষার এনট্রপি হিসাব করেন, অন্য কোন কোন ভাষারও এনট্রপি হিসাব করা হয়েছে। রুশ গণিতজ্ঞ কল্‌মোগোরোফ 'সেট তত্ত্বে'র (Set Theory) বিমূর্ত আলোচনায়ও এনট্রপির অবতারণা করেন।

আজ এক-শ' বছর পরেও এনট্রপি ব্যষ্টির ধর্ম কি গোষ্ঠীর ধর্ম, এটি একটি মূলতঃ স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল বা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তাজ্ঞাপক ধারণা প্রভৃতি মূল প্রশ্নের সম্যক সমাধান হয় নি। কিন্তু এর প্রয়োগ-ক্ষেত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব দিগন্তে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।

অগ্রগতির পথে সোভিয়েট কৃষি

সুকুমার মিত্র

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং সেখানে শিল্পের ন্যায় কৃষিও সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৯ হাজারেরও বেশী রাষ্ট্রীয় খামার এবং প্রায় ৩০ হাজার যৌথখামার আছে। ১৯৬৩ সালের পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, গড়ে প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় খামারের জমির পরিমাণ হলো ২৮,২০০ হেক্টর (এক হেক্টর=প্রায় আড়াই বিঘা) এবং গবাদি পশুর সংখ্যা হলো ২,৩৫৬। প্রত্যেকটি যৌথখামারের গড় জমির পরিমাণ ৬ হাজার একর এবং গবাদি পশুর সংখ্যা ৯৪৪। বিশেষ বিশেষ খাদ্যশস্য উৎপাদনের রাষ্ট্রীয় খামারগুলির গড় জমির পরিমাণ ২৫ হাজার একর বা ততোধিক।

এই রকম বৃহদাকার কৃষিক্ষেত্রগুলি বিজ্ঞান এবং সর্বাধুনিক কৃষি-যন্ত্রাদির প্রয়োগের আদর্শ ক্ষেত্র। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান এবং শিল্পের সহায়তা ছাড়া এই ধরণের বৃহদাকার কৃষি কখনই সাফল্যলাভ করতে পারে না। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পপ্রধান দেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে' কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষিক্ষেত্রের জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি। রাসায়নিক সারও যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা যায় নি। কৃষির জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ লগ্নী না করাতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির উন্নতির বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রধানতঃ এসব কারণেই তার অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। এছাড়া কৃষির মত একটা জটিল ব্যাপারে খেয়ালখুসী মত একপেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেও আশানুরূপ ফসল হয় নি।

বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী কে. এ. তিমিরিয়াজেভ একদা বলেছিলেন, কৃষির মত আর কোথাও, সম্ভবতঃ কোন ক্ষেত্রেই সাফল্যের এত পৃথক রকমের বিচিত্র সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করতে হয় না, কোথাও আমাদের বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করতে হয় না, কোথাও কোন রকম একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মেতে ওঠবার ফলে এমন বড় রকমের ব্যর্থতা ঘটে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই মহাবিজ্ঞানীর কথা স্মরণ রাখা হয় নি। ফলে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী বা একপেশে সিদ্ধান্ত সোভিয়েট কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছে। যেমন ধরুন, ভুট্টা চাষের কথা। যে সব অঞ্চল ভুট্টা চাষের উপযোগী, সে সব অঞ্চলে ভুট্টার ফলন খুবই ভাল হতে পারে। কিন্তু যত্রতত্র ভুট্টা চাষ করলে শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার করা হয় মাত্র। শুধু তাই নয়, অন্য যেসব ফসল হতে পারতো, সেগুলি হতে পারে না। কাজেই কোন ফসল চাষ করতে হলে কোন্ কোন্ অঞ্চলের পরিবেশ তার উপযোগী, তা বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু এসব বিষয় বিবেচনা না করেই এক সময় সোভিয়েট দেশে যত্রতত্র ভুট্টা চাষের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল ; ফলে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই হয়েছে বেশী।

বর্তমানে আধুনিক কৃষি-যন্ত্রাদি এবং রাসায়নিক সারের অভাব দূর করে সব দিক বিবেচনা করে বিভিন্ন শস্য চাষের ব্যবস্থা করে এবং অর্থনীতি ও পরিচালনা ব্যবস্থাগত গলদগুলি

দূর করে কৃষির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবার ব্যবস্থা-সমূহ অবলম্বিত হয়েছে।

আগের কথা

অবশ্য নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলবার আগে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, সোভিয়েট কৃষি বরাবরই এমন ছিল না। অক্টোবর বিপ্লবের পর চাষীদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টনের ফলে গরীব ও মাঝারি চাষীদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে। তাদের জীবন-যাত্রার মান বেড়ে যায়, কিন্তু বাজারে বিক্রয়-যোগ্য কৃষিজাত পণ্যের পরিমাণ কমে যায়। এতে সহরাঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। গৃহযুদ্ধ অবসানের পর অর্থনৈতিক সংকট রোধের উদ্দেশ্যে লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট সরকার নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি (NEP) ঘোষণা করেন। এতে কুলাক বা ধনী চাষীদের সুবিধা হয়, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার প্রভাব যাতে না বাড়ে, তার জন্যে লেনিন সমবায় প্রথার উপর বিশেষ জোর দেন

কৃষকদের সমবায় অথবা যৌথখামারের গুরুত্ব বুঝিয়ে যৌথখামার আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। বেশ কিছুকাল এই আন্দোলন চলবার পর চাষীরা নিজেরাই যৌথকৃষির পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। ১৯২৫ সালেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-সমবায়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৪,৮০০। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯২৯-৩৩) ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার যৌথখামার (তখন যৌথখামারগুলির গড় আয়তন তেমন বড় ছিল না) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যেই মোট ১০ লক্ষ ৪০ হাজার যৌথখামার স্থাপিত হয়েছিল। ধনী চাষীরা যৌথকৃষির বিরোধিতা করে এবং রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এর ফলে যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তাড়াহুড়া করে যৌথখামার গঠনের চেষ্টা ও অন্যান্য ভুলত্রুটির ফলেও প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়। কুলাকদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয় এবং ভুলত্রুটি সংশোধিত হয়। এই সময় থেকে কৃষির দ্রুত উন্নতি ঘটে

খাদ্যশস্যের পরিমাণ বৃদ্ধির হিসাব

দশ লক্ষ সেন্টনারের হিসাবে : এক সেন্টনার= প্রায় ১ মণ ১৪ সের

১৯১৩	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
৮০১·০	৭১৭·৪	৮৩৫·৪	৬৯৪·৮	৬৯৮·৮	৮৯৮·০

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে (১৯৩৩-৩৭) যৌথখামার গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়। ১৯৩২ সালের মোট কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনের পরিমাণকে ১০০ ধরলে ১৯৩৭ সালে ঐ উৎ-পাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫৩·৯ শতাংশ।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা রূপায়নের মাঝ-খানেই নাৎসী বাহিনী সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করে। এই আক্রমণে ৭০ হাজারেরও বেশী গ্রাম, ৯৮ হাজার যৌথখামার, ১,৮৭৬টি রাষ্ট্রীয় খামার ধ্বংস এবং ২,৮৯০টি যন্ত্র ও ট্র্যাক্টরের ঘাঁটি লুণ্ঠিত বা বিধ্বস্ত হয়। ৭০ লক্ষ ঘোড়া, ১ কোটি ৭০ লক্ষ গবাদি পশু, ১০ কোটিরও বেশী হাঁস-মুরগী এবং ২ কোটি শূকর নাৎসী সৈন্যেরা বধ করে খায় অথবা দেশে চালান দেয়। যুদ্ধাবসানের পরেই দেখা দেয় ভয়াবহ অনাবৃষ্টি। মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাটিয়ে আবার সোভিয়েট কৃষি মাথা তুলে দাঁড়ায় মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে এবং ১৯৪৭ সালে রেশনিং তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা কালে (১৯৪৬-৫০) এবং পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনা কালে সোভিয়েট কৃষির অগ্রগতি মন্থর হয়ে আসে। এই মন্থরতার কারণ অনুধাবনের পর যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার (১৯৫১-১৯৫৫) শেষের দিকে কৃষির দ্রুত অগ্রগতি ঘটে।

১৯৫:-৫৮—উৎপাদনের পরিমাণ

	১৯৫৩	১৯৫৮	১৯৫৩ সালের তুলনায় ১৯৫৮—শতাংশের হিসাবে
তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যশস্য (শতকোটি পুড —দশ লক্ষ টন)	৫·০	৮·৬	১৭১ শতাংশ
এর মধ্যে গম (দশ লক্ষ টন)	৪১·৩	৭৬·৬	১৮৫
আলু (ঐ)	৭২·৬	৮৬·৫৭	১১৯
তরিতরকারী (ঐ)	১১·৪	১৪·৯	১৩০
মাংস ও চর্বি (ঐ)			
পরিত্যজ্য অংশ বাদ দিয়ে ওজন	৫ ৮	৭ ৭	১৩৩
দুধ (ঐ)	৩৬·৫	৫৮ ৭	১৬০
ডিম (দশ লক্ষ জোড়া হিঃ)	১৬·১	২৩·০	১৪২

১৯৫৮ সালের পর আবার সোভিয়েট কৃষির অগ্রগতি মন্থর হয়। প্রবন্ধের গোড়াতেই এই মন্থরতার কয়েকটি প্রধান কারণের উল্লেখ করা হয়েছে। সোভিয়েটের পক্ষ থেকে অকপটে স্বীকার করা হয়েছে যে, কৃষিতে যন্ত্রাদি সরবরাহের ব্যাপারে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পিছনে পড়ে রয়েছে। এছাড়া রাসায়নিক সার ইত্যাদির সরবরাহও যথেষ্ট নয়। অনেক খামার বিজলী ব্যবহার করতে পারে না, যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের কর্মীদের উৎসাহ সৃষ্টির জন্যে যথাযোগ্য পুরস্কার দেওয়া হয় না—ইত্যাদি।

নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৬৬-৭০)

এই সব গলদ দূর করবার উদ্দেশ্যে নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৬৬-৭০) পাঁচ বছরের কৃষিতে মোট ৭ হাজার ১ শত কোটি রুবল লগ্নী করবার ব্যবস্থা হয়েছে। এর মধ্যে রাষ্ট্র যোগাবে ৪ হাজার ১ শত কোটি রুবল (প্রায় ২২,৫৫০ কোটি টাকা), বাকীটা যোগাবে যৌথখামারগুলি।

খাদ্যশস্যাদি সংগ্রহ ও ক্রয়ের নতুন পরিকল্পনা বোনাস দেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি বাবদ যে খরচ হবে, তা বাদে এই পাঁচ বছরে সমস্ত যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারকে ১০৭০ কোটি রুবল মূল্যের ১৭ লক্ষ ৯০ হাজার ট্র্যাক্টর বা কলের লাঙল ও অন্যান্য কৃষিযন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে।

ফসল কাটা ও ঝাড়াই যন্ত্রের (হার্ভেস্টার কম্বাইন) উৎপাদন বাড়িয়ে বছরে ৮৪ হাজারের জায়গায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার করা হবে। লরীর উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়ানো হবে এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি পাঁচ বছরে ১১ লক্ষ নতুন মোটর যান পাবে।

পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ট্র্যাক্টর বা কলের লাঙলের উৎপাদন দ্বিগুণ হবে, অর্থাৎ বছরে ৬ লক্ষ ২৫ হাজার ট্র্যাক্টর তৈরি হবে। এছাড়া ট্রেলার, গবাদি পশু পালনের ফার্মগুলির সাজসরঞ্জাম, মাল বোঝাই করবার যন্ত্রাদি এবং খনন, জলনিষ্কাশন ও সেচের যন্ত্রপাতির উৎপাদনও প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এই বিরাট কর্মসূচী সম্পাদনের জন্যে চার শতাধিক কোটি রুবল খরচ করে ৮০টি নতুন কারখানা স্থাপন করা হবে।

গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্র-পরিচালিত যন্ত্রাদি সজ্জিত

কর্মীদল মোতায়েন থাকবে এবং কৃষিযন্ত্র ও ট্র্যাক্টর কেন্দ্র, গবাদি পশুপালন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির কেন্দ্র এবং ভূমি-পুনরুদ্ধার কেন্দ্র স্থাপিত হবে।

গত বছর যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি ২ কোটি ২০ লক্ষ টন রাসায়নিক সার পেয়েছিল অর্থাৎ ১৯৬৩ সালের তুলনায় ৬০ লক্ষ টন বেশী সার পেয়েছিল। এবার আরও বেশী পাবে। তাছাড়া কীটনাশক ঔষধাদির সরবরাহ বাড়ানো হবে। আগামী পাঁচ বছরে সেচ-ব্যবস্থার আমলে আসবে ত্রিশ লক্ষাধিক হেক্টর জমি এবং জলাজমি থেকে পুনরুদ্ধার করা হবে ৬০ লক্ষ হেক্টর জমি। এ যে কি বিরাট ব্যাপার. তা বুঝতে হলে বিগত বিশ বছরের হিসাব লক্ষ্য করতে হবে। বিগত বিশ বছরে সেচ-ব্যবস্থাযুক্ত জমি ২৩ লক্ষ হেক্টর বেড়েছে এবং ত্রিশ লক্ষ হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশী ফলন হয়, এমন সব শস্যের চাষ হবে সেচপ্রাপ্ত জমিতে। যেমন, সেচপ্রাপ্ত নতুন ত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে ধানের চাষ করা হবে। সেচের ব্যবস্থা করা হবে প্রধানতঃ মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলিতে এবং দক্ষিণ-ইউক্রাইন, উত্তর-ককেশাস ও ভল্‌গা অঞ্চলে।

এখন থেকে ক্ষারযুক্ত জমিতে চুন দেওয়া ও জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যের জন্যে রাষ্ট্রই খরচা যোগাবে। পশুচারণ-ভূমির উন্নয়নের জন্যেও রাষ্ট্র অনেক ক্ষেত্রে অর্থব্যয় করবে। ভূমিক্ষয় রোধের জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা ও অত্যাবশ্যকীয় মালমশলাও রাষ্ট্র যোগাবে।

বিজ্ঞানের সহায়তা

সোভিয়েট দেশে বিজ্ঞানকে শুধু কারিগরী অগ্রগতির সহায়ক বলে বিবেচনা করা হয় না, বিজ্ঞান সে দেশে একটি প্রত্যক্ষ উৎপাদিকা শক্তি বলেও পরিগণিত হয়। কৃষিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। শস্যাদি উৎপাদন ও পশু-প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়ে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের দান কম নয়। উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করে যে সকল বিজ্ঞানী সোভিয়েট কৃষিকে উন্নত করে তোলছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন ভি এস. পুস্তো-ভাইট, পি. পি. লুকিয়ানেংকো, ভি পি. কুজসিন, বি. পি. সোকোলোভ, এফ. জি. কিরিচেংকো, এ. এল. মাজলুমোভ প্রভৃতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী।

দেশের প্রত্যেক অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি-ব্যবস্থা গড়ে তোলাই হলো এখন সোভিয়েট কৃষি-বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে পাঁচ বছর ধরে গবেষণা চালানো হয়েছে। কৃষি-গবেষণা পরিষদ ও ব্যবহারিক পরীক্ষার কেন্দ্রগুলিতে চার সহস্রাধিক বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানের তথ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সামঞ্জী-করণের কাজ সমাধা করে প্রত্যেকটি কৃষি-অঞ্চলের জন্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছেন।

এসব কাজ মাঝখানে পরিত্যক্ত হয়েছিল; এখন আবার পূর্ণোদ্যমে সুরু করা হচ্ছে।

সুষ্ঠু পরিচালন-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নিয়মগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ, বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ সহায়তা এবং রসায়ন শিল্পের দ্রুত উন্নতি এবং কৃষিযন্ত্রাদি-শিল্পের বিরাট সম্প্রসারণ সোভিয়েট কৃষিকে যে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষা—প্রাক্-প্রাথমিক

আগের প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ব্যাপক অর্থে শিক্ষা চলে সমস্ত জীবন ধরে। জন্মের পর ৩।৪ মাস শিশু খাওয়া, ঘুম, মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি শরীরের অতি আবশ্যকীয় কাজগুলিতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়। এভাবেই সুরু হয় ব্যাপক অর্থে শিক্ষা। জন্মের কয়েক দিনের মধ্যেই জাতকের শোনা এবং আলো ও অন্ধকার দেখা সুরু হয়। পরে দেহের পুষ্টি ও পরিণতির সঙ্গে রং চেনা ও অপরাপর ইন্দ্রিয়ের কাজ সুরু হয়। স্পর্শ, গন্ধ ও স্বাদ নেবার ক্ষমতা ধীরে ধীরে জাগে ও পরিণত হয়। হাত, পা প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়ের কাজও সুরু হয়। নিজের চেষ্টায় ও মা, বাবা প্রভৃতির সহায়তায় অল্প অল্প চলতে, বসতে ও বলতে শেখে।

সাধারণতঃ প্রায় তিন বছরের সময় শিশুদের চোখ, কান প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভূতি নেওয়া, হাত ও পা প্রভৃতি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার, অল্প অল্প মনে রাখা এবং ভয় পাওয়া প্রভৃতি মনের কাজ সুরু হয়ে যায় ও সামান্য বুদ্ধির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই বয়স থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকাল। এই শিক্ষা মা, বাপ, ভাই, বোনের কাছ থেকে হলে খুবই ভাল। কোন কারণে এই শিক্ষা বাড়ীতে সম্ভব না হলে ভাল নার্শারী বা ঐ রকম স্কুলে শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এই স্তরের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ভালভাবে বাঁচবার জন্যে শিশুর ইন্দ্রিয়গুলির সম্যক ব্যবহারের অভ্যাস করানো, যাতে তাদের সম্যক পরিণতি, আর পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় ও সম্ভবমত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবার অভ্যাস করানো। প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নিম্নের শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হয়।

১। আচরণ শিক্ষা — পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবার, যতদূর সম্ভব নিয়মিত খাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ করবার, পোষাক পরিচ্ছদ ঠিকমত ব্যবহারের অভ্যাস।

২। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজে নিপুণতা লাভের শিক্ষা—ভিন্ন ভিন্ন রং, আকার, আয়তন ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্যে প্রভেদ করবার নিপুণতা লাভের অভ্যাস।

৩। কর্মেন্দ্রিয়ের কর্মক্ষমতা লাভের শিক্ষা—নিয়মিত বেড়ানো, খেলাধুলা, নাচ, কুচকাওয়াজ প্রভৃতির অভ্যাস, যাতে কর্মেন্দ্রিয়গুলি ও তাদের চালনা করে যে সব পেশী ও স্নায়ু—সেগুলি ভাল ভাবে পুষ্ট ও কর্মক্ষম হয়।

৪। অন্তরেন্দ্রিয়ের ব্যবহার শিক্ষা—শিশু-মনের ছোট ছোট ভাব কথায় বা সম্ভব হলে ছবিতে প্রকাশ করবার, অপরের সরল সহজ কথাবার্তা বোঝা ও তাতে যোগ দেওয়া, ছোট ছোট ছড়া, গান মনে রাখা ও আবৃত্তি করবার অভ্যাস, যাতে স্মৃতিশক্তি বাড়ে, বুদ্ধির উন্মেষ হয়, মনঃসংযোগ করতে পারে ও ব্যক্তিত্ব বোধ সুষ্ঠুভাবে জাগে। শিশুর পরিবেশ, সমাজ ও প্রকৃতি—এজন্যে খেলাধুলা, বেড়ানো ও তার গল্প বা সহজ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে শিশুকে প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষ করে শিশুর শরীর ও মনের উপর প্রকৃতির যে সব জিনিষের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আছে, তার সঙ্গে পরিচয় করবার ও শিশুর কি কর্তব্য বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রকৃতির যে সম্বন্ধে শিশুর ঔৎসুক্য যাতে ক্রমশঃ বাড়ে, আর যা বিজ্ঞানসম্মত নয়, যা আজগুবি—এমন কিছু যেন না শেখে। শিশুকে তার চারপাশের ছোট জিনিষ লক্ষ্য করতে ও তার সম্বন্ধে জানবার

চেষ্টা করতে উৎসাহ দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এখানেই বিজ্ঞান শিক্ষার সুরু। তবে এই বিজ্ঞান হবে প্রধানতঃ তথ্যগত, আর সহজ অভিজ্ঞতা হবে এর ভিত্তি। শিশু বড় হবার সঙ্গে তার পরিচয়ের গণ্ডী বাড়ে, সমাজে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। এই সময়ে তার পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে ছোট সমাজ সম্বন্ধে তাকে অভিজ্ঞ করতে হবে, শেখাতে হবে তার খেলার সাথী, সহপাঠী, যাঁরা তার সংস্পর্শে আসছেন, তাঁদের সবার সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে ও তাঁদের কাছ থেকে কি ব্যবহার পাবে।

আগেই বলা হয়েছে, এই স্তরের শিক্ষায় বাড়ীতে যে ভাষায় শিশু কথাবার্তা বলে, সেই ভাষায় ও যে পরিবেশে বাড়ীতে অভ্যস্ত, সেই রকমের পরিবেশ হওয়া উচিত। সহজ ছন্দময় বা নীতিপূর্ণ কিছু শ্লোক বা ছড়া মুখে মুখে শিশুকে শেখানো চলে, কিন্তু শিক্ষা মূলতঃ মাতৃভাষায় হওয়াই কাম্য। ইংরেজি ও স্মার্টনেস শেখাবার জন্যে বিলাতী ধাঁচের নার্শারী স্কুলে পাঠাবার নেশা একদল অভিভাবককে পেয়ে বসেছে। এই নেশা যত শীঘ্র কাটে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। 'Songs Letters Sing' নামের বইয়ের মত বইগুলি ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা তাদের জন্যে লেখা—এদেশের শিশু-মনের উপর বোঝা হয়ে চাপে, কোন গানের সুর তোলে না। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' শিশু কবিদের মনে দোলা দেওয়া সম্ভব—হ্যারী, জন, ভিকদের মনে সুরের দোলা দেবে না। এই ধরনের বই বর্তমানে বহু স্কুলে প্রাথমিক—এমন কি, প্রাক-প্রাথমিকে পাঠ্য হচ্ছে। আরও মজার ব্যাপার, কোন কোন স্কুল বাংলা বই ধরাবার আগেই এই সকল বইয়ের পঠন-পাঠন সুরু করে। এই ব্যবস্থা সরকারের ঘোষিত নীতির বিরোধী; কিন্তু সরকার নীরব। এই বিষয়ে সরকার, অভি-ভাবক ও শিক্ষকদের অবহিত হওয়া উচিত। ছবির বই বাদে এই সময় কোন পাঠ্যপুস্তক শিশুদের ধরানো উচিত নয়। এই স্তরে ছাত্র ও শিক্ষক অনুপাত ১০ ঃ ১ বা তারও কম হওয়া কাম্য।

শ্রীমহাদেব দত্ত

পাঠকদের চিঠি থেকে :—

বঙ্গভাষায় এখন উচ্চতর বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা নগণ্য। বঙ্গভাষার এই বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণার্থে সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর মধ্য দিয়া হয় অনুবাদ অথবা মৌলিক লেখনী দ্বারা এই অগ্রগতি সাধন করিতে হইবে। সুখের কথা ইহাই যে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর একাদশ শ্রেণীর প্রায় সমুদয় বিজ্ঞান 'বঙ্গীয়করণ' হইয়াছে। এক্ষণে স্নাতক শ্রেণী ও সম্মানক-এর সব পাঠ্য পুস্তকগুলি আশু 'বঙ্গীয়করণ' প্রয়োজন। এই বিষয়ে প্রয়োজন মিটাইবার একমাত্র উপায় হইল যে, বিজ্ঞানের যে বিষয়ে যে অধ্যাপক অভিজ্ঞ, সে বিষয়ে তিনি (একা বা প্রয়োজনবোধে অপর অধ্যাপকের সহযোগে) যদি লেখেন, তবে সহজেই বইয়ের সমস্যার সমাধান হইতে পারে না কি? তবে একটি বিষয়ে সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, রচিত পুস্তকের মান অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের পুস্তক অপেক্ষা সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ হয়। তাহাতে লাভ হইবে এই যে, প্রথমতঃ যে কোন প্রকাশক পুস্তক প্রকাশে আগ্রহী হইবে এবং শিক্ষার মান তাহাতে উন্নত হইতে বাধ্য। ফলে পুস্তক জনপ্রিয়তা লাভ করিবে। এই বিষয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অনুরোধ করিতে পারেন।

শ্রীমনোরঞ্জন সিকদার
জাখিরপুর (দীঘিপাড়া)
পশ্চিম দিনাজপুর।

বিজ্ঞান-সংবাদ

সাংশ্লেষিক আঠা

আধুনিক শ্রমশিল্পে এমন কোন বিভাগ নেই বললেই চলে, যেখানে সাংশ্লেষিক আঠা বা সিন্থেটিক গ্লু খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত না হয়। বর্তমানে এই সাংশ্লেষিক আঠার এত উন্নতি ঘটানো হয়েছে যে, ধাতুর অংশ জোড়া দেওয়া থেকে কংক্রিট ও ইস্পাতের কাঠামো জোড়া লাগাবার মত যাবতীয় কাজে তা ব্যবহৃত হচ্ছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এত শক্তিশালী সাংশ্লেষিক আঠা তৈরি করেছেন, যা দিয়ে জোড়া লাগানো ধাতব কাঠামো সব রকমের আবহাওয়া পরিবর্তন ও ক্ষয় প্রতিরোধ করতে পারে এবং সম্পূর্ণ বায়ুরোধক হতে পারে। এর ফলে ধাতব কাঠামো জোড়া লাগাতে গিয়ে বোল্টু এবং রিভেট আঁটবার জন্যে ড্রিল করে গর্ত করবার দরকার হয় না এবং উৎপাদনের খরচ অনেক কম পড়ে; তাছাড়া কাঠামোর ওজন কম হয়, আর কাজটাও বেশ সহজ হয়ে দাঁড়ায়। বিমান আর ট্র্যাক্টর উৎপাদন শিল্পে এবং গৃহনির্মাণ শিল্পে এই সাংশ্লেষিক আঠা আজ খুব ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড গৃহের কংক্রিটের দেয়াল-ছাদ-দরজা-জানালা ইত্যাদি এই অতি-শক্তিশালী আঠার সাহায্যে জুড়ে চমৎকার টেকসই বাড়ী অতি দ্রুত তৈরি হচ্ছে।

সম্প্রতি সোভিয়েট কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারেরা সিয়াক্রিন নামে যে নতুন সাংশ্লেষিক আঠা তৈরি করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এর সাহায্যে ধাতু, কাচ, চামড়া, প্লাষ্টিক ইত্যাদি চাপ প্রয়োগ বা গরম না করে সাধারণ তাপাঙ্কেই আপনা থেকে জুড়ে যেতে পারে। অস্ত্রোপচারের সময়ে তন্তু ও ভাঙ্গা হাড় জুড়ে দেবার কাজেও এই সিয়াক্রিন খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মমি করবার পদ্ধতি অন্য দেশেও প্রচলিত ছিল

সাইবেরিয়ায় ইয়েনিসেই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য চালাবার জন্যে যে সোভিয়েট প্রত্নতাত্ত্বিকদল (সায়ান-তুভা প্রত্নতাত্ত্বিকদল) বর্তমানে কাজ চালাচ্ছেন, তাঁরা তাঁদের প্রাথমিক খননের ফলেই নানাবিধ প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন।

মস্কো থেকে এ-পি-এন প্রচারিত এই সংবাদে জানা যায় যে, এর ফলে এমন কয়েকটি প্রাচীন কবরস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলি শক-যুগের। এগুলি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো। এখানে কয়েকটি কাষ্ঠ-নির্মিত কুটিরও পাওয়া গেছে, তার মধ্যে স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ-নির্মিত বিভিন্ন সামগ্রী বেশ অটুটভাবে রয়েছে। একটি কবরের মধ্যে একটি নারীর মমিকৃত হাত পাওয়া গেছে। এর ফলে সোভিয়েট প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, প্রাচীন মিশর ও আলতাই অঞ্চল ছাড়াও বিশ্বের নানা অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই শবদেহ মমি করে রাখবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

ইয়েনিসেই নদীর দক্ষিণ তীরে প্রত্নতাত্ত্বিকদল আরও উল্লেখযোগ্য প্রাচীন যুগের নিদর্শনাদির সন্ধান পেয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছে পাথরের তীরের ফলা, যার গায়ে লিপি খোদাই করা রয়েছে। অ্যাকাডেমিশিয়ান আই. বাটামানোফ এই লিপির পাঠোদ্ধার করে দেখেছেন যে, এতে এক প্রাচীন যোদ্ধার নামাঙ্কিত রয়েছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিকদলে লেনিনগ্রাড, মস্কো ও সাইবেরিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিকেরা

আছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকদল এই অঞ্চলে এক প্রাচীন দুর্গ-নগরেরও সন্ধান পাবেন বলে আশা করছেন। ৮ম শতাব্দীতে এই দুর্গ-নগরটি ছিল বলে শোনা যায়। পরে এটি বহিরাগত যাযাবর আক্রমণ-কারীদের দ্বারা লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়েছিল।

পামীর পর্বতাঞ্চলে মধ্যযুগের রৌপ্যনগরীর সন্ধান

তাজিকিস্তানের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির ইতিহাস ইনস্টিটিউটের এক প্রত্নতাত্ত্বিক দল এই বছর পামীর পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় অভিযান চালিয়ে মধ্যযুগের ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন।

মস্কো থেকে এ-পি-এন সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে, পামীর অভিযাত্রী দলের নেত্রী মিবা বুবনোর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানা গেছে—এই পর্বত-মালার ৫০০ মিটার উচ্চে তাঁরা পাথরের বেষ্টনীযুক্ত এক প্রাচীন নগরীর সন্ধান পেয়েছেন। এটি বাজার-দার নদীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত

এই প্রাচীন নগরী তিনটি অংশে বিভক্ত। নগরীর কেন্দ্রস্থল প্রাচীরে সুরক্ষিত, একদিকে মনে হয়—কারুশিল্পী ও কামারদের পাড়া ছিল এবং আর এক প্রান্তে রয়েছে কবরস্থান। নগরীর কেন্দ্রস্থলটি মনে হয় মহাদেশীয় বাণিজ্য-পথের মধ্যে এক সরাইখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এখানে এমন সব মুদ্রা পাওয়া গেছে, যেগুলি হাজার বছর আগে ফরগনা অঞ্চলে ঢালাই করা হয়েছিল। এছাড়া অলঙ্করণযুক্ত খাদ্য ও পান-পাত্রসমূহও পাওয়া গেছে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, প্রাচীন যুগের ভারতীয় কালিতে প্রাচীন আরবী হরফে লেখা অনেকগুলি দলিল-পত্রাদি, যেগুলি সংখ্যায় ৪০টিরও বেশী হবে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে প্রশ্ন হলো যে, কোন এক দুর্গম অঞ্চলে এরূপ একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল—যেখানে সুদূর ফরগণা প্রভৃতি অঞ্চলের নানাবিধ দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে। অনুমিত হচ্ছে যে, তৎকালে এই স্থান এক রৌপ্যখনির নিকটবর্তী হওয়ায় এখানে নানাদেশীয় বণিকেরা ডেরা বাঁধতো। রৌপ্য সে সময় মহার্ঘ বস্তু হয়ে উঠেছিল—কেন না, ১১-১২ শতকে একবার রৌপ্যের দারুণ অভাব দেখা দেয়। এখন প্রাপ্ত দলিলপত্রাদির প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে।

রোটারি পদ্ধতিতে ব্রেইল হরফ উৎপাদন

বিশ্বে এই প্রথম একটি যন্ত্র নির্মিত হলো, যার সাহায্যে সম্পূর্ণ নতুন এক রোটারি পদ্ধতিতে অন্ধদের জন্যে ব্রেইল হরফ উৎপাদন করা যাবে। এটি প্রচলিত রীতির পরিবর্তে নিরেট প্লাষ্টিক বিন্দু দিয়ে ব্রেইল উৎপাদন করবে।

এই নতুন পদ্ধতির একটা সুবিধা হলো এই যে, অন্ধদের জন্যে যে বই এইভাবে তৈরি হবে, তা আকারের দিক দিয়ে অর্ধেক হতে পারবে। মুদ্রণব্যয়ও অনেক কম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নতুন যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা সংবাদপত্রের যে বৃহদায়তন রোটারি প্রেস ব্যবহার করা হয় তার মত, যদিও এটি বিশেষভাবে ব্রেইল উৎপাদনের জন্যে পরিকল্পিত।

এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবক হলেন বৃটেনের রয়েল ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট ফর দি ব্লাইণ্ড। প্লাষ্টিক ও কাগজ নিয়ে বহু বছর ধরে তাঁরা এই দিকে পরীক্ষা চালান।

ধাতুমল থেকে বাড়ী তৈরির উপকরণ

বৃটিশ বিজ্ঞানীরা ধাতুমল বা ব্লাষ্ট ফার্নেসের পরিত্যক্ত পদার্থ থেকে বাড়ী তৈরির মূল্যবান উপাদান সংগ্রহের এক উপায় বের করেছেন। এর উদ্ভাবক বৃটিশ আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন।

এই উপায়ে ইস্পাত উৎপাদনের ব্যয় কিছুটা

কম হবে। তাছাড়া ধাতুমলের যে 'পাহাড়' তৈরি হয় এবং যে 'পাহাড়' নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়, কাঁচামাল হিসাবে এই ধাতুমল ব্যবহৃত হবার ফলে তাও আর থাকবে না।

এই উপাদানের নাম হয়েছে স্ল্যাগশিরাম—ধাতুমলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় বালি ও একটি নিউক্লিয়েটিং এজেণ্ট ; যথা—ক্রোমিয়াম ও টাইটেনিয়াম অথবা লৌহ। তারপর এই মিশ্রিত পদার্থটিকে উত্তপ্ত করা হয়। নিউক্লিয়েটিং এজেণ্ট ক্রিষ্ট্যাল তৈরির কাজ করে এবং পরে আরও উত্তপ্ত করা হলে এক রকমের মাইক্রো-ক্রিষ্টেলাইন পদার্থ উৎপন্ন হয়।

এই পদার্থ দিয়ে তৈরি হতে পারে ইট, টালি ও ওয়ালব্লক।

এক মাইল পথ দৌড়ানো কত কম সময়ে সম্ভব হবে?

এই শতকের শেষের দিকে মাত্র ৩ মিনিট ৪০ সেকেণ্ডে এক মাইল পথ দৌড়ানো সম্ভব হতে পারে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার উপাধ্যায় মিঃ বি. বি. লয়েড জানিয়েছেন—যেভাবে এখন দৌড়ানো হচ্ছে, তাতে তা সম্ভব বলেই মনে হয়। মিঃ লয়েড বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশনের ফিজিওলজি ও বায়োকেমিষ্ট্রী বিভাগের এক সভায় বক্তৃতা দেবার সময় এই কথাটি জানান। একজন মানুষের মধ্যে দৌড়াবার শক্তি কতখানি থাকতে পারে, তা নিয়ে তিনি কিছুকাল ধরে পরীক্ষা করে আসছেন।

তিনি বলেন, দৌড়াবার বিশ্ব রেকর্ডগুলি শারীরবিদ্যাবিদ্‌দের কাছে স্বর্ণখনি স্বরূপ। এই সব রেকর্ড মানুষের শরীরের পেশীর ক্ষমতার শেষ সীমা বুঝে নেবার ব্যাপারে নির্ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করছে।

এথলেট অক্সিজেনের সাহায্যে ইন্ধন (চিনি ও চর্বি) পুড়িয়ে কি পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করতে পারে, তারই উপর নির্ভর করছে তার শরীরের শক্তি। তার এই অক্সিজেন পেশীতে আসে ফুস্‌ফুস থেকে রক্তের সাহায্যে। বিশ্বের নামকরা এথলেটরা দৌড়াবার সময় মিনিটে প্রায় পাঁচ লিটার রক্ত-বাহিত অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারে।

গত ১০০ বছরের রেকর্ড থেকে জানা যায়—রক্ত থেকে যে হারে অক্সিজেন হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং-এর ফলে পেশীগুলিতে গিয়ে পৌঁছায়. সেই হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮৭৪ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ হয়েছে শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ। মিঃ লয়েড এই এক মাইল দৌড়ের সময় সম্পর্কে যে পূর্বাভাস দেন, তা এই হিসাবের উপর ভিত্তি করেই।

বাতরোগের পরাজয়

আধুনিক গবেষণার ফলে যে ধরণের বাতরোগ অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ডেকে আনে, সেই ধরণের বাতরোগকে পরাজিত করা সম্ভব হয়েছে।

বাতরোগে সাধারণতঃ সহজে রোগী মারা যায় না। তবে বিশেষ ধরণের বাত, যেমন—'এস-এল-ই' (সিষ্টেমেটিক লুপাস এরিথম্যাটোসাস) এর ব্যতিক্রম। এর কারণ অজ্ঞাত বৃটেনে এই রোগ সম্বন্ধে গবেষণা চলছে।

যুবতী এবং প্রৌঢ়ারাই সাধারণতঃ এই রোগের শিকার। এই রোগে কোলাজেন নামক যে পদার্থ শরীরের টিস্যুগুলিকে সংবদ্ধ করে রাখে, তাকে আক্রমণ করে। অন্যান্য রোগের সঙ্গে এই রোগের লক্ষণগুলির এমনই মিল যে, সহজে রোগ নিরূপণ করা যায় না।

এস-এল-ই রোগ একবার নির্ণয় করা সম্ভব হলে আধুনিক ঔষধপত্রের দ্বারা বিপন্মুক্ত হওয়া যায়।

লণ্ডনের আর্থ্রাইটিশ অ্যাণ্ড রিউম্যাটিজম কাউন্সিল বলেন—চিকিৎসা বন্ধ করলে রোগ

আবার দেখা দিতে পারে। কিন্তু রোগটি এখন আর আগেকার মত ভীতিপ্রদ নয়।

শনির রহস্য সম্পর্কে গবেষণা

শনির রহস্য উদ্ঘাটনে কাজিকিস্তানের জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা আরও এগিয়ে গেছেন। তাঁরা এই গ্রহের বহু সংখ্যক আবহাওয়া বর্ণালী সম্পর্কে অনুসন্ধান-কার্য শেষ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, স্পষ্টতঃই বৃহস্পতির আবহাওয়া গঠনের সঙ্গে এর গঠনের মিল আছে।

উভয় গ্রহের মিথেন বলয়ের সৌরকিরণ বিশোষণের বণ্টন সম্পর্কে জ্যোর্তিঃপদার্থবিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। পূর্বে এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, শনির উপর বিশোষণ বলয় বেড়ে যাচ্ছে তার মণ্ডলের প্রান্তভাগের দিকে, আর হ্রাস পাচ্ছে বৃহস্পতির উপর

শনি ও বৃহস্পতির ক্ষেত্রে আবহাওয়ার সৌরকিরণ বিশোষণ বণ্টনে পরিবর্তন একই প্রকার—এই অনুমানের সমর্থনে গবেষকেরা তথ্যাদি পেয়েছেন।

ইনষ্টিটিউটে গ্রহগ্রুপের প্রধান ভিক্টর টেইফেল 'টাস'-এর সংবাদদাতাকে বলেন যে, আলমা আতার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ১৯৬৬ সালের বসন্ত কালে শনির রহস্যজনক বলয় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মত ঘটনা পর্যবেক্ষণের জন্যে প্রস্তুতি সুরু করেছেন। এই উদ্দেশ্যে স্থির হয়েছে যে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১,৫০০ মিটার উচ্চে তিয়েনশান পর্বতমালার অধিত্যকায় সম্প্রতি যে ৭০ সেণ্টিমিটার গ্রহ-টেলিস্কোপ বসানো হয়েছে, সেটি ব্যবহার করা হবে।

ভিক্টর টেইফেল ব্যাখ্যা করে বলেন—শনির বলয় যখন অদৃশ্য হবে, তখন গ্রহপৃষ্ঠে মিথেনের বিশোষণ বণ্টন সম্পর্কে গবেষণা করা সহজতর হবে। সে সময় বিশেষ পর্যবেক্ষণে শনির বলয় কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না।

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

(১৯০৯—১৯৬৬)

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

গত ২৪শে জানুয়ারী প্রাতে মণ্ট ব্লাঙ্কে এক বিমান দুর্ঘটনায় বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী ডাঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার অমূল্য জীবনের অকালে আকস্মিকভাবে অবসান ঘটলো।

১৯০৯ সালে অগাষ্ট মাসে বোম্বাই-এর এক ধনী পরিবারে হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জে. এইচ. ভাবা ছিলেন একজন শিল্পপতি এবং তাঁর পিতামহ ছিলেন বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহীশুর রাজ্যের শিক্ষা-অধিকর্তা। বোম্বাই-এর রয়েল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে শিক্ষা সমাপনের পর ডাঃ ভাবা ইঞ্জিনীয়ারিং-এ উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কেম্ব্রিজ গমন করেন এবং ১৯৩০ সালে তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং ট্রাইপোস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর নিজের পরিবারের এবং সম্ভবতঃ টাটা পরিবারের (লেডি টাটা ছিলেন তাঁর মাতুলানী) প্রভাবে ভাবাকে প্রথমে ইঞ্জিনীয়ারিং বৃত্তির দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল। কিন্তু এই বৃত্তি

তাঁর ঠিক মনঃপূত হয় নি, বরং যুক্তরাজ্যে শিক্ষাকালে নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্বে গবেষণারত প্রখ্যাত গাণিতিক পদার্থবিদ্দের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে তাঁর মনে প্রকৃতির পদার্থগত সমস্যাসমূহের গভীরে প্রবেশের আগ্রহ বিশেষভাবে জাগ্রত হয়। অনতিবিলম্বে ভাবা ইঞ্জিনীয়ারিং ছেড়ে গাণিতিক পদার্থবিদ্যায় মনোনিবেশ করেন এবং কেম্ব্রিজের গনাভিলি ও কেয়াস কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রারম্ভে তিনি প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী নীলস্ বোর, ম্যাক্স বোর্ণ, ফের্মি এবং ডিরাকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। পদার্থবিদ্যার যে বিষয়টি তাঁর মনে প্রথম আগ্রহের সৃষ্টি করে, সেটি হচ্ছে দ্রুতগামী পজিট্রনের বিনাশ সম্পর্কে গবেষণা। অধ্যাপক ফের্মির অধীনে রোমে ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্স-এ তিনি এই বিষয়ে গবেষণা করেন। এই সময় তিনি ১৮৫১ প্রদর্শনী বৃত্তি লাভ করেন। এর পর কোপেনহাগেনের বোর ইনস্টিটিউটে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন এবং এখানে থাকাকালে অধ্যাপক হাইটলারের সহযোগে 'কাস্কেড থিওরী অফ কস্মিক রে শাওয়াস''-এর সূচনা করেন। এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে ভারতে অধ্যাপক চক্রবর্তীর সহযোগে পরিপূর্ণরূপ লাভ করে। কিভাবে মেসন-সৃষ্ট আয়নন বর্ষণ (Ionisation showers) ঘটে, তা তিনি ব্যাখ্যা করেন। মহাজাগতিক রশ্মিতে পরিলক্ষিত নতুন ভারী পদার্থ-কণার 'মেসন' নামটি ডাঃ ভাবাই দিয়েছিলেন। এই সব গবেষণা-কার্য থেকে পরমাণু-কেন্দ্রীনের রহস্য সম্পর্কে ভাবার আগ্রহের সুনিশ্চিত পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই আগ্রহই সম্ভবতঃ ভারতে পরমাণু-শক্তির উন্নয়ন ও শান্তির কাজে তার প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯৪০ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরুতে ভাবা ভারতে আসেন, কিন্তু মুখ্যতঃ এই যুদ্ধের জন্যেই তিনি আর কেম্ব্রিজে ফিরে যেতে পারেন নি। এর ফলে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসেন এবং মাতৃভূমির প্রতি তাঁর অনুরাগ বর্ধিত হয়।

১৯৪০ সালে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ডাঃ ভাবাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা-মালা প্রদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানান। মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর এই বক্তৃতা মহাজাগতিক রশ্মি এবং পরমাণু-পদার্থবিদ্যার চর্চা ও গবেষণা বিষয়ে প্রভূত আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং তারই ফলে কলিকাতায় ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪১ সালে ডাঃ ভাবা বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। সেখানে মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণার একটি কেন্দ্রও স্থাপিত হয় এবং এই বিষয়ে গবেষণার জন্যে তাঁকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৪৫ সালে ডাঃ ভাবা বোম্বাই-এ কাম্বালা পর্বতে একটি ভাড়া করা গৃহে 'টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মহাজাগতিক রশ্মি ও কণিকা-পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণায় উৎসাহী সুযোগ্য কর্মিদের এখানে সমবেত করেছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর থেকেই ভারত সরকার এদেশে পরমাণু-শক্তি উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেন এবং পরমাণু-শক্তি কমিশনের সভাপতিরূপে ডাঃ ভাবার উপর এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডাঃ ভাবা ট্রম্বেতে পরমাণু-শক্তি সংস্থা এবং টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ-এর (যা পরবর্তীকালে কোলাবায় নতুন আবাসে স্থানান্তরিত হয়) উন্নয়নে তাঁর সমস্ত শক্তি ও উদ্যম নিয়োগ করেছিলেন। মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় তাঁর আগ্রহের

দরুণ পদার্থবিদ্যার এই বিভাগে গবেষণারত বহু সংখ্যক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ভারতে এসেছিলেন এবং টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ-এ তাঁদের কেউ কেউ স্বল্পকাল, কেউ কেউ দীর্ঘকাল কাজ করে যান। তাঁরই আমন্ত্রণে ১৯৬৩ সালে জয়পুরে মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

ডাঃ ভাবা মূলতঃ গাণিতিক পদার্থবিদ হলেও পদার্থবিদ্যার প্রয়োগ-ক্ষেত্রেও তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। বোধ হয় সে কারণেই তিনি ট্রম্বের পরমাণু-শক্তি সংস্থার উন্নয়নে এতখানি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। শান্তির কাজে পরমাণু-শক্তি উন্নয়নের নতুন দায়িত্ব নিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ডাঃ ভাবা কণিকা-পদার্থ-বিদ্যা, মহাজাগতিক বিকিরণ এবং ফ্লাক্চুয়েশন (Fluctuation) সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা নিয়ে সমানভাবে চিন্তা করতেন। ডাঃ ভাবা ছিলেন চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের কারণ হয়তো এই যে, তিনি অনেক সময়ই গণিতের স্বপ্ন দেখতে পারতেন এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের সমস্যা কার্যতঃ সমাধানের পূর্বেই তার গাণিতিক মীমাংসার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করতে পারতেন। বিজ্ঞানীরূপে তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে ১৯৪১ সালে ডাঃ ভাবাকে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো মনোনীত করা হয়। ১৯৪২ সালে অ্যাডামস্ পুরস্কার এবং ১৯৪৮ সালে হপ্‌কিন্‌স্ পুরস্কারও তিনি লাভ করেন।

ডাঃ ভাবা ১৯৪৩ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৫১ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯৫৫ সালে শান্তির কাজে পরমাণু-শক্তি সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলা ও বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মাননায় ভূষিত করেন।

ভারতের পরমাণু-শক্তি কমিশনের সভাপতিরূপে তিনি পরমাণু-শক্তি থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। মহারাষ্ট্রের তারাপুরে তিনি শক্তি উৎপাদনের জন্যে প্রথম পরমাণু-চুল্লী-কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই কেন্দ্রটি বর্তমানে নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে। রাজস্থানেও তিনি একটি শক্তি-কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ভারতে পরমাণু-শক্তি উন্নয়নে তাঁর অবদান এবং পরমাণু-বোমা নির্মাণে তাঁর অনিচ্ছা ভারত ও বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

ডাঃ ভাবা ছিলেন একজন সুদক্ষ সংগঠক। তিনি সর্বদাই হাসিমুখে সকলের সংসর্গে আসতেন। তিনি সঙ্গীতরসিক ছিলেন এবং অবসর সময়ে প্রায়ই চিত্র অঙ্কন করতেন। কলা ও সঙ্গীতরসিক ডাঃ ভাবা বিশিষ্ট ভারতীয় নৃত্যের একজন গভীর অনুরাগী ছিলেন। স্থাপত্য বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। কয়েক বার তিনি টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ এবং পরমাণু-শক্তি সংস্থার বীক্ষণাগার ও ভবনাদির পরিকল্পনা ও নক্সা রচনা করেছিলেন।

ডাঃ ভাবার মৃত্যুতে ভারত তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং সম্ভবতঃ একজন সর্বোত্তম বিজ্ঞান-সংগঠককে হারালো। তাঁর কাজের মধ্যে তিনি যে উদ্যম ও উৎসাহের সঞ্চার করে-ছিলেন, তা তাঁর মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকবে বলে আমরা আশা করবো। ভারতকে এক উচ্চতর বৈজ্ঞানিক স্তরে উন্নীত করবার তাঁর যে আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা সার্থক হতে পারে যদি এদেশের বিজ্ঞান-কর্মিরা তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে চলেন। তাঁর আরব্ধ কাজগুলিকে পূর্ণভাবে রূপায়িত করে

তোলবার প্রচেষ্টাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সর্বোত্তম উপায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ জগতের বিজ্ঞান সভায় ইতিমধ্যেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। আমরা আশা করবো ডাঃ ভাবার অম্লান স্মৃতিস্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানটি তার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখে ক্রমাগ্রসর হবে।

পুস্তক পরিচয়

বিশ্ববিজ্ঞান—কমলেশ রায়; প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন; ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯; পৃষ্ঠা—২০১; মূল্য চার টাকা।

আদিম যুগের মানুষ দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদে কিছু কিছু জিনিস উদ্ভাবন করিয়াছিল। পরবর্তী কালের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলি যতই সাধারণ বা তুচ্ছ বিবেচিত হউক না কেন, নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে, তখন হইতেই মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির উন্মেষ ঘটিয়াছিল। তাহার পর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বিজ্ঞানের অগ্রগতিও ততই ত্বরান্বিত হইয়া উঠিল। এই ভাবে ক্রমশঃ বিভিন্ন ধারায় অগ্রসর হইয়াই বিজ্ঞান আজ আধুনিক পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক প্রাচীন যুগ হইতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, তাহার পর রাজকীয় ও সামাজিক বিরোধিতায় তাহার প্রায় অবলুপ্তি এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রেনেসাঁ যুগ হইতে তাহার পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিবার পর সৌর পরিবার, নক্ষত্র-জগৎ, সম্প্রসারণশীল ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের পরিণতি, অণু-পরমাণু, আলোক, চুম্বক, বিদ্যুৎ, পরমাণুর গঠন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব, পরমাণু-কেন্দ্রিন, কস্‌মিক-রে, পারমাণবিক শক্তি, জড় ও জীবন প্রভৃতি নানা বিষয় সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। কতকগুলি মূল্যবান ছবি, তালিকা ও নির্ঘণ্ট সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকখানির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠকবর্গের নিকট সমাদৃত হইবে বলিয়াই আশা করি।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—১৯৬৬

১৯শ বর্ষ : তৃতীয় সংখ্যা

ডাঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

করে দেখ

আয়নার সাহায্যে আলোর বর্ণছত্র উৎপাদন

প্রিজম্ অর্থাৎ ত্রিকোণ-কাচের ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি প্রেরণ করলে রামধনুর রং দেখা যায়—নিউটনের এই বিখ্যাত পরীক্ষার কথা তোমাদের প্রত্যেকেরই হয়তো জানা আছে। কিন্তু ত্রিকোণ-কাচ সংগ্রহ করা তোমাদের অনেকের পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব হবে না। কাজেই তোমরা যদি এই পরীক্ষাটা করে দেখতে ইচ্ছা কর, তাহলে সাধারণ একখানা মুখ-দেখা আয়নার সাহায্যেও অনায়াসে এরূপ বর্ণছত্র উৎপাদন করতে পার। এর জন্যে দরকার হবে—একটা টর্চ, মুখ দেখবার একটা ছোট্ট আয়না, আর জলভর্তি একখানা চওড়া পাত্র।
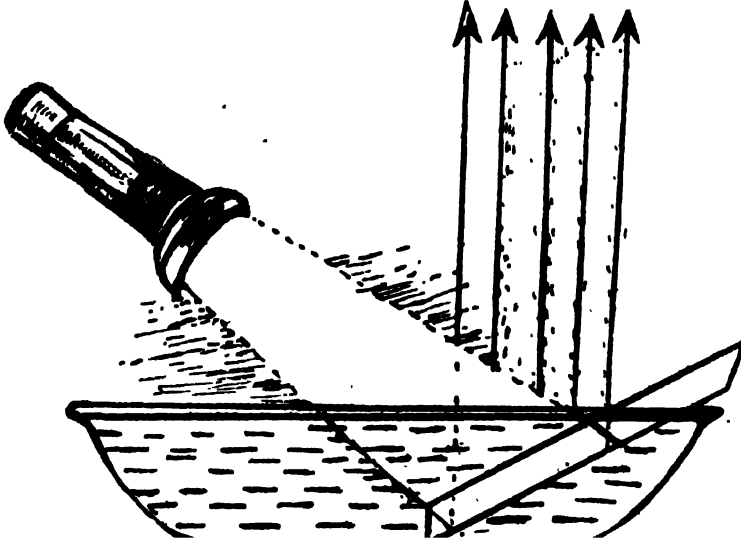
আয়নাটার বেশ খানিকটা অংশ পাত্রের জলের মধ্যে কাৎভাবে ডুবিয়ে পাত্রের কানার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখ। পাত্রের জলের উপরিতল থেকে আয়নাটি যেন প্রায় ৩০ ডিগ্রি হেলানো ভাবে থাকে। এবার দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘরটাকে অন্ধকার করে দিয়ে টর্চটা জ্বেলে আয়নার জল-নিমজ্জিত অংশের উপর আলো ফেললেই দেখবে—উপরে সিলিং-এর গায়ে রামধনু রঙের বর্ণছত্র ফুটে উঠেছে।

এই পরীক্ষায় দেখা যাবে—সাদা আলো বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন বর্ণের আলোর সমবায়ে উদ্ভূত। জলটাই ত্রিকোণ-কাচের মত বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোককে বিভিন্ন কোণে প্রতিসরিত করে বর্ণছত্র উৎপাদন করে।

সৌর-পরিবার সম্পর্কে দুটি কথা

মহাজাগতিক বস্তুসমূহের প্রতি চিরকালই বিশ্বের সকল দেশের বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নির্ণয়ে অতীতের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ায় গবেষণারত টলেমীর (প্রায় ১০০ খৃষ্টাব্দে) সিদ্ধান্ত বিশেষ যুক্তিপূর্ণ এবং বিশ্বের তদানীন্তন বৈজ্ঞানিকগণের সমর্থনপুষ্ট। সৌর-পরিবার সম্পর্কে আমাদের এখন যে ধারণা, টলেমী ঠিক তার বিপরীত ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার রচিত পুস্তকে (Almagest) তিনি যুক্তিসহ প্রতিস্থাপিত করিয়াছেন যে, সূর্য অপরাপর গ্রহ-নক্ষত্রাদির সহিত পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান এবং পৃথিবী অচঞ্চল এবং স্থির। তাঁহার এই মতবাদ বাইবেলে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং প্রায় ১৪০০ বৎসর ধরিয়া ইহাই ছিল সৌর-পরিবার সম্পর্কে অবিসম্বাদিত ধারণা।

টলেমী নক্ষত্রগুলির মাঝখানে গ্রহসমূহের সম্মুখ-অভিমুখী এবং পশ্চাৎ-অভিমুখী গতিবেগের ব্যাখ্যা করিলেন এই বলিয়া যে, গ্রহগুলি পৃথিবীর চতুর্দিকে বৃত্তাকার পথে ভ্রাম্যমান এবং গ্রহগুলির ভারকেন্দ্র বিন্দুগুলি পৃথিবীর চতুর্দিকে বৃহত্তর বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান। পূর্ববর্তী বৃত্তগুলির তিনি নামকরণ করিলেন—এপিসাইক্‌ল্‌স (Epicycles) এবং পরবর্তী বৃত্তগুলির নামকরণ করিলেন ডেফারেণ্টস (Deferents)। তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত গ্রহ সম্পর্কিত জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন সমস্যা সুবিধাজনক ব্যাসার্ধ এবং গতিবেগ আরোপ করিয়া খুব সুন্দরভাবে সমাধান করিলেন।

টলেমীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম যিনি সন্দেহ প্রকাশ করিলেন, তিনি হইলেন নিকোলাস কোপার্নিকাস। তিনি তাঁহার রচিত পুস্তকে যে জ্যামিতিক সমাধান ও প্রমাণ উপস্থাপিত করিলেন, তাহা টলেমীর সমাধান অপেক্ষা অনেক বেশী যুক্তিপূর্ণ এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কোপার্নিকাসের এই মতবাদ 'সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদ' নামে পরিচিত। এই মতবাদে বলা হইয়াছে যে, সূর্য অচঞ্চল এবং স্থির—গ্রহসমূহ বৃত্তাকার পথে সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান। এই মতবাদের প্রবর্তক কিন্তু ধর্মবিরোধিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্তী বৈজ্ঞানিক বেসেল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদে সমর্থন জানাইলেন এবং এই মতবাদের পিছনে যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি রহিয়াছে, তিনি তার উন্নতি সাধনে ব্রতী হইলেন। আরও এক শতাব্দী পরে গ্যালিলিও এই মতবাদের সত্যতা আরও সুষ্ঠুভাবে প্রতিস্থাপিত করিতে গিয়া অভিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অপরাধ এই যে, তিনি বাইবেলের অসম্মান করিয়াছেন। খুব নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হইলেন এই স্বাধীন চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক। শুনিতে পাওয়া যায়, যখন তিনি অসহায়

ও অন্ধ অবস্থায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তখনও তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইতেছিল—"তবুও, তবুও ইহাই (পৃথিবী) ঘোরে" ('E pur Si muove', 'E pur Si muove')। ইহার নয় বৎসর পরে গ্যালিলিও কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। ঐ একই মতের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে গিয়া গিয়োর্ডানো ব্রুনো প্রাণ বিসর্জন দিলেন; তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল। ইহার ২৫ বৎসর পরে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে টাইকোব্রাহী আসিলেন। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণধী জ্যোতির্বিদ। তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূর্য অচঞ্চল ও স্থির এবং পৃথিবী অপরাপর গ্রহাদির সহিত সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান (ঠিক বৃত্তাকার পথে নয়, উপবৃত্তাকার পথে)। টাইকো-ব্রাহী দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ডেনমার্কের মানমন্দিরে তাঁহার নিজের তৈয়ারী যন্ত্রপাতি লইয়া প্রত্যেক রাত্রিতে আকাশের জ্যোতিষ্কগুলির গতিবিধি সতর্কতার সহিত অনুধাবন করেন। কিন্তু গণিতশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা না থাকায় তিনি কোনও নির্দিষ্ট তত্ত্বের অবতারণা করিতে পারিলেন না। তাঁহার সহকারী কেপ্‌লার গণিতশাস্ত্রে সুদক্ষ ছিলেন এবং তিনি 'ইম্পেরিয়্যাল ম্যাথেমেটিসিয়ান' নামে সম্মানিত হইয়াছিলেন। কেপ্‌লারেরই আবিষ্কার আজিকার 'Geometrical optics'। দীর্ঘ বাইশ বৎসরের অক্লান্ত গবেষণায় কেপ্‌লার জ্যোতির্বিদ্যার তিনটি সূত্র প্রণয়ন করেন, যাহা 'কেপ্‌লারের নিয়ম' নামে পরিচিত। ইহা জ্যোতির্বিদ্যায় এক বিস্ময়কর অবদান।

কেপ্‌লার তাঁহার বিখ্যাত নিয়মগুলিতে বলিলেন, পৃথিবী এবং অপরাপর গ্রহাদি উপবৃত্তাকার পথে সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান, কিন্তু ইহার কারণ তিনি সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না, অর্থাৎ গ্রহগুলি সূর্যের চতুর্দিকে বৃত্তাকার পথে না ঘুরিয়া কেন উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে একটি নাভিকেন্দ্রে (Focus) রাখিয়া ঘূর্ণায়মান, ইহা তিনি ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না। তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভবও ছিল না, কারণ সেই যুগের বিজ্ঞানে গতির জড়তার ধর্ম তখনও অজ্ঞাত ছিল।

১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটির অধিকাংশ সভ্য, যেমন—রবার্ট রয়েল, এড্‌মাণ্ড হ্যালী, স্যামুয়েল প্যাপিস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ মন্তব্য করিলেন যে, কোনও গ্রহের সূর্যের চতুর্দিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান থাকা তখনই সম্ভব, যদি সূর্য তাহাকে এমন বলে আকর্ষণ করে যে, তাহার মান সূর্য হইতে গ্রহটির দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হয়। কিন্তু তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারিলেন না।

সার আইজ্যাক নিউটনও এই রয়্যাল সোসাইটির সভ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি ইহার অধিবেশনে খুব কমই আসিতেন। এই সময় তিনি কেম্ব্রিজের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। এড্‌মাণ্ড হ্যালী কেম্ব্রিজে গিয়া নিউটনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের সমস্যার কথা জানাইলেন এবং তিনি জানিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, নিউটন

বেশ কয়েক বৎসর আগেই ইহার সুষ্ঠু সমাধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও কারণে তিনি তাঁহার গবেষণার কাগজপত্র হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

রয়্যাল সোসাইটির আর কোনও সভ্য এই সমস্যার সমাধান কোনও দিন করিতে পারিবেন না জানিয়া এডমাণ্ড হ্যালী নিউটনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন, তাঁহার গবেষণাপ্রসূত যাবতীয় ফলসমূহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে। হ্যালীর অনুরোধ ও প্রচেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' প্রকাশিত হইল। মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ সম্পর্কে নিউটনই সর্বপ্রথম গবেষণা করিয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রগতিতে তাঁহার অবদান তাই গৌরবোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীজ্যোতির্ময় দুই

রাবার

ব্রেজিলের গভীর অরণ্যে হিবিয়া ব্রেজিলিয়েন্‌সিস্ নামে এক রকম গাছ আছে অ্যামাজন নদীর পাড়ে, যেখানে এতটুকু মাটিকে অবলম্বন করে প্রাণপণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, সে স্থানই এদের আদি নিবাস। এই গাছের কোষ থেকে ঝরে পড়ে দুধের মত এক প্রকার তরল পদার্থ। তাকেই বলা হয় রাবার। রেড ইণ্ডিয়ানদের ভাষায় ঐ গাছের নাম 'কাহচু', অর্থাৎ কাঁদুনে গাছ। তাথেকেই ঐ গাছের রসের নাম দেওয়া হয়েছে 'কাউৎসুক'।

১৭৭০ সালে জোসেফ প্রিস্টলি নামে এক বিখ্যাত রসায়নবিদ দৈবাৎ আবিষ্কার করেন যে, এই জিনিষটি দিয়ে লেড পেন্সিলের দাগ তোলা যায়। তাই এর নতুন নামকরণ করা হয়—রাবার। ১৮২৩ সালে রাবার জুতার জন্যে ব্যবহার করা হয়। সে বছরেই ইংল্যাণ্ডের চার্লস ম্যাকিন্টস কাপড়ের উপর রাবারের প্রলেপ দিয়ে এক রকম জলরোধক জামা তৈরি করেন। এই ছিল আধুনিক বর্ষাতির আদিরূপ। তখন একে বলা হতো ম্যাকিন্টস।

রাবারকে কিভাবে অবিকৃত রাখা যায়, তার উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন আমেরিকার গুড্‌ইয়ার ১৮৩০ সালে। লেবরেটরীতে গুড্‌ইয়ার একটার পর একটা রাসায়নিক পদার্থ মেশান, আর ফলাফল লক্ষ্য করেন। একদিন হাতের কাছে পেলেন গন্ধক, রাবারের সঙ্গে তাই খানিকটা মিশিয়ে চাপিয়ে দিলেন উনুনে। হঠাৎ কিছুটা জিনিষ উৎলে পড়ে গেল এবং ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধলো। দেখা গেল, গন্ধক রাবারের সঙ্গে মিশে তাতে পরিবর্তন এনেছে। এই জিনিষ শীত-গ্রীষ্মে অবিকৃত রইলো। রাবার-শিল্পে যুগান্তরের সূচনা হলো।

১৮৪৬ সালে রাবারের বেষ্টনী ব্যবহার করা হয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোড়ার গাড়ীর চাকায়। রাবারের চাহিদা যত বাড়তে লাগলো, ব্যবসায়ীরা ততই ভাবতে লাগলেন, কেমন করে অনায়াসে আরও বেশী পরিমাণে রাবার সংগ্রহ করা যায়। ইংল্যাণ্ডের কিউ গার্ডেনের কর্তারা ১৮৭০ সালে হেনরি উইক্‌হ্যামকে ব্রেজিল থেকে হিবিয়ার বীজ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে পাঠালেন অ্যামাজন নদীর মুখে। সতর্ক পুলিস বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে কিছু হিবিয়ার বীজ সংগ্রহ করে তিনি পাড়ি দিলেন লণ্ডনের দিকে। এই চৌর্যবৃত্তির জন্যে তাঁকে পুরস্কৃত করা হলো 'নাইট' উপাধি দিয়ে।

কিউ গার্ডেনের গরম-ঘরে অত্যন্ত যত্ন সহকারে এই বীজ বোনা হলো। কয়েক দিন পরেই বীজ অঙ্কুরিত হলো। চারাগাছগুলি একটু বড় হতেই তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো সিংহল ও সিঙ্গাপুরের উদ্ভিদ-উদ্যানে। বিদেশের মাটিতে গাছগুলি ক্রমশঃই বাড়তে লাগলো। এইভাবে রাবার গাছ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়লো মালয় উপদ্বীপ এবং পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি স্থানে।

রাবার গাছের রস বিজ্ঞানীদের কাছে ল্যাটেক্স নামে পরিচিত। গাছের বয়স পাঁচ-ছয় বছর হলেই রস সংগ্রহ করা আরম্ভ হয়। গাছের বাকল একটু একটু কেটে দেওয়া হয়। ঐ ক্ষত স্থান থেকে দুধের মত ল্যাটেক্স বেরুতে থাকে। সেই রস সংগ্রহ করা হয় ছোট ছোট পাত্রে।

দুধের সঙ্গে এই ল্যাটেক্সের কিছুটা মিল আছে। তরল দুধের মধ্যে ভেসে থাকে স্নেহকণা, আর তরল ল্যাটেক্সে ভেসে থাকে অসংখ্য রাবার-কণা। এই অবস্থার নাম 'ইমালসন'। ল্যাটেক্সের সঙ্গে অ্যাসিটিক অ্যাসিড মিশিয়ে রেখে দিলেই হয় তঞ্চন। তঞ্চিত রাবার ধুয়ে পাঠানো হয় রোলারের মধ্যে। এরপর তাকে একটা গরম ঘরে ধোঁয়ার মধ্যে সাত দিন ধরে রাখা হয়। এখান থেকে রাবার নিয়ে আসবার পর তাকে চেনাই কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ তার রং হয়ে যায় তখন বাদামী এবং শুকিয়ে চুপ্‌সে যায়। এই অবস্থাতেই তাকে বাক্সবন্দী করে পাঠানো হয় দেশ-বিদেশের কারখানা-গুলিতে। এর সঙ্গে মেশানো হয় হরেক রকম রাসায়নিক পদার্থ। তারপর আরম্ভ হয় ছেঁকা, পোড়া, দলাইমলাই—আরও কত কি। এই রাবারকে যেমন খুসী তেমন করে গঠন করা যায়। এই রাবার দিয়ে কুশন, বল, টায়ার, টিউব প্রভৃতি অনেক কিছুই তৈরি করা হয়।

মানুষ শুক্তির চাষ করে। অস্ত্রোপচার করে শুক্তির খোলকের মধ্যে পুরে দেয় বালিকণা—যার ফলে এক রকম রস ক্ষরিত হয়। সেই রস রূপ নেয় নিটোল এক-একটি মুক্তায়। মানুষ তেমনি চাষ করে রাবার গাছের। দিনের পর দিন তার দেহে অস্ত্রাঘাত করে রস সংগ্রহ করে' প্রয়োজনীয় রাবার প্রস্তুত করে।

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। লেসার কি? কবে এবং কে লেসার আবিষ্কার করেন? কোন্ কোন্ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এবং কিভাবে এর প্রয়োগ হয়?

প্রঃ ২। ভূপৃষ্ঠের ৪০/৫০ কিঃ মিঃ ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে কি শব্দের আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হয়?

প্রঃ ৩। মেরুজ্যোতি কি? কি কারণে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয়? মেরুজ্যোতি কি সকল সময়েই দেখা যায়? উভয় মেরুতেই কি মেরুজ্যোতি দেখা যায়?

প্রঃ ৪। বৈশ্লেষিক জ্যামিতিতে পদার্থের চতুর্থ মাত্রা বলে কিছু আছে কি? থাকলে চতুর্থ মাত্রা বলতে কি বোঝায়?

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

উঃ ১। লেসার (LASER) কথাটি ইংরেজী বাক্যাংশের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত। সম্পূর্ণ কথাটি হলো—Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation। আলোক-তরঙ্গকে কোন কোন স্ফটিকের মধ্যে পাঠালে অতি জটিল আণবিক ও পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় প্ররোচিত বিকিরণ বা Stimulated Emission-এর সৃষ্টি হয়। তাথেকে পাওয়া যায় অতি শক্তিশালী সুসংহত আলোক রশ্মি, যার গতিপথের আকার একটা ফাঁপা নলের মত। একেই বলা হয় লেসার রশ্মি। অবলোহিত এবং অতিবেগুনী তরঙ্গের ক্ষেত্রেও অনুরূপ রশ্মি সৃষ্টি করা যেতে পারে।

লেসারের আবিষ্কারের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইন বস্তু ও তরঙ্গের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্ররোচিত বিকিরণের কথা সর্বপ্রথম বলেছিলেন। তারপর থেকে কাগজে-কলমে এর উপর অনেক কাজ হয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দেখা যায় ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে। এই সময় সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে ম্যারিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবার (Weber), কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টাউনেস (Townes) ও তাঁর সহকর্মিগণ এবং রাশিয়ার বাসভ্ (Basov) ও প্রখরভ্ (Prokhorov) ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের ক্ষেত্রে প্ররোচিত বিকিরণের মতবাদ প্রয়োগ করেন। এর নাম দেওয়া হয় মেসার (MASER—Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation)। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে সলো (Schawlow) ও টাউনেস

(Townes) লেসারের সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেন। এর পর ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে মার্কিন বিজ্ঞানী মাইম্যান (Maiman) লেসার আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেন।

লেসার রশ্মির উত্তাপ অতি প্রচণ্ড। এযাবৎ মনুষ্য-সৃষ্ট সকল প্রকার উত্তাপকেই সে হার মানিয়েছে; ফলে ধাতব দ্রব্য ছাড়াও—এমন কি, হীরকখণ্ডকে ছিদ্র করবার কাজেও লেসারের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। অত্যধিক উত্তাপের ফলে সামরিক দিক থেকে লেসারের গুরুত্ব ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। কারণ শূন্যপথে আগন্তুক ক্ষেপণাস্ত্র লেসার রশ্মির সামনে পড়লে তার ধ্বংস অনিবার্য। কারো কারো মতে, একটি শত্রুঘাঁটিকে গলিয়ে ধাতুপিণ্ডে পরিণত করাও লেসার রশ্মির সাহায্যে ভবিষ্যতে অসম্ভব হবে না। ধ্বংসের কাজ ছাড়া মানব-কল্যাণের ক্ষেত্রেও লেসারের অবদান কম নয়। শল্যচিকিৎসকেরা বড় বড় অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে আজকাল ছুরিকার বদলে লেসার রশ্মি ব্যবহার করছেন। ক্যান্সার রোগেও লেসার রশ্মি শীঘ্রই ব্যবহার করা যাবে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। কারণ, দেখা গেছে যে, এই রশ্মি জীবকোষের উপাদানের গঠন বদ্‌লে ফেলতে পারে। দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগের ব্যাপারে লেসার যে অদূর ভবিষ্যতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

[লেসার সম্পর্কে আরও বিশদ ব্যাখ্যা ও বিবরণের জন্যে ফেব্রুয়ারী '৬৬ সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' দ্রষ্টব্য]

উঃ ২। ভূপৃষ্ঠের উপর উল্লিখিত উচ্চতায় শব্দের অন্তর্নিহিত পূর্ণ প্রতিফলনের ফলেই তা পুনরায় নীচে নেমে আসে।

উঃ ৩। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের আকাশে মাঝে মাঝে নানা বর্ণের ও নানা আকারের বিচিত্র আলোকচ্ছটা দেখা যায়, তারই নাম মেরুজ্যোতি।

সূর্য থেকে নিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎ-কণিকাসমূহ এসে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে ধরা পড়ে। তাদের বিদ্যুতের প্রকৃতির (পজিটিভ বা নেগেটিভ) উপর নির্ভর করে এই সব কণিকাসমূহ দুই মেরুর দিকে আকৃষ্ট হয়। প্রচণ্ড গতিবিশিষ্ট কণিকাগুলি মেরু অঞ্চলের বায়ুকণাগুলিকে উত্তেজিত করে। ফলে সেখান থেকে নানা বর্ণের আলোক বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

মেরুজ্যোতি সব সময়ে দেখা যায় না। সৌর বিদ্যুৎ-কণিকা পৃথিবীতে এসে পড়লে তবেই মেরুজ্যোতি দেখা দেবে। সূর্যে যখন সৌরকলঙ্ক দেখা দেয়, তখন সেখানে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সৌর বিদ্যুৎ-কণিকাগুলির পরিমাণও তখন বেশী হতে থাকে। তাই সৌরকলঙ্কের সংখ্যা যখন খুব বেশী, তখন খুব ঘন ঘন মেরুজ্যোতি দেখা যায়, অন্যথায় মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়।

মেরুজ্যোতি উভয় মেরুতেই দেখা যায়, তবে উত্তর মেরুর কথাই আমরা বেশী জানি; তার কারণ উত্তর মেরু অঞ্চলে মানুষের যাতায়াত সহজতর এবং ফলে পর্যবেক্ষণ বেশী হয়েছে।

উঃ ৪। দ্রব্য বা পদার্থের আধার যে দেশ বা Space—তা ত্রিমাত্রিক। এই ত্রিমাত্রিক দেশে ঘন বস্তুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। গাণিতিক সুবিধার জন্যে মিন্‌কাওস্কি দেশের ত্রিমাত্রার সঙ্গে কাল একটি চতুর্থ মাত্রা যোগ করেন। একে বলে Space-Time Continuum। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বেও চতুর্মাত্রিক দেশ কালের কথা বলা হয়েছে।

বৈশ্লেষিক জ্যামিতিতে বিশেষ কোন মাত্রার প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের মনে রাখতে হবে—বৈশ্লেষিক জ্যামিতি শুধু দেশকে বর্ণনা করে। কাজেই n-মাত্রিক দেশকে বর্ণনা করবার জন্যে n-মাত্রিক বৈশ্লেষিক জ্যামিতির সাহায্য নেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রকার দেশকে বিভিন্ন প্রকার বা বিভিন্ন মাত্রার জ্যামিতির দ্বারা বর্ণনা করা যায়।

দীপক বসু ও ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত

প্রঃ ১। লণ্ডনের কোন্ হাসপাতালে এবং কবে পেনিসিলিন আবিষ্কর্তা ফ্লেমিং গবেষণাকালে লক্ষ্য করেন যে, পেনিসিলিয়াম নোটোটাম নামক ছত্রাক ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস নামক মারাত্মক জীবাণুকে ধ্বংস করে?

প্রঃ ২। ফ্লেমিং কত সালে এবং কোথায় তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করেন এবং পেনিসিলিন কখন সর্বপ্রথম মানবদেহে প্রযুক্ত হয়?

প্রঃ ৩। কত সালে ফ্লেমিং 'নাইটহুড' ও নোবেল পুরস্কার পান?

উঃ ১। হাসপাতালের নাম সেণ্ট মেরী হাসপাতাল, লণ্ডন। আবিষ্কারের তারিখ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ।

উঃ ২। গবেষণার ফল প্রকাশের তারিখ: ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ। পত্রিকার নাম Journal of Experimental Pathology.

মানবদেহে প্রযুক্ত হবার তারিখ: ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ।

উঃ ৩। নাইটহুড: ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ।

নোবেল পুরস্কার: ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ।

দীপক বসু

বিবিধ

লুনা-৯ চাঁদে নেমেছে

মস্কো থেকে এ. এফ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—সোভিয়েট মহাকাশযান লুনা-৯ ৩রা ফেব্রুয়ারী রাতে নির্বিঘ্নে চাঁদে নেমেছে বলে মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইতিহাসে এই প্রথম একটি মহাকাশযান চাঁদের উপর ধীরে ধীরে অবতরণ করলো।

চাঁদে অবতরণের জন্যে সোভিয়েট পাঁচ বার চেষ্টা করে, কিন্তু এইবারই প্রথম সাফল্য লাভ হয়।

ভারতীয় সময় রাত্রি ১২টা ১৫ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডের সময় লুনা-৯ চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করে।

লুনা-৯-এর চাঁদে অবতরণ মানুষের চাঁদে যাবার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মরুভূমির গ্রাস

যোধপুর থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—রাজস্থানের মরুভূমি প্রতি বছর প্রায় আধ মাইল হিসাবে বেড়েই চলেছে এবং বছরে প্রায় ৫০ বর্গমাইল উর্বর জমি গ্রাস করছে। এখানকার কেন্দ্রীয় উষর অঞ্চল গবেষণা সংস্থা থেকে সম্প্রতি যে সমীক্ষা চালানো হয়, তার ফলে একথা জানা গেছে।

এই মরুভূমি ফিরোজপুর, পাতিয়ালা ও আগ্রার ভিতর দিয়ে আলিগড় ও কাসগড়ের দিকে বৃত্তাংশের মত কিছুটা বাইরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

বারমার-এর উত্তর-পূর্ব দিকে মরু-বালুকার পরিমাণ যে বৃদ্ধি পেয়েছে, এই সমীক্ষায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সূর্যরশ্মি-চালিত রেডিও সেট

শিকাগো থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—এখানে একটি নতুন ধরণের ট্র্যানজিষ্টর রেডিও সেট চালু করা হয়েছে।

জেনিথ সেলস্ কর্পোরেশন জানিয়েছে যে, মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহগুলিতে যে রকমের সৌর-কোষ বা ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এই রেডিও সেটের হাতলেও সেই রকমের সূর্যাভিমুখী সৌর-কোষ বসানো হয়েছে। কোষগুলির উপরে সূর্যকিরণ পড়লে যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, তারই সাহায্যে রেডিও চলে।

ক্যান্সারের নতুন ওষুধ

মিউনিক থেকে এ. এফ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—বাজারে ক্যান্সারের একটি নতুন ওষুধ ছাড়া হয়েছে। এই ওষুধ ব্যবহারের ফলে ক্যান্সারের অসহ্য যন্ত্রণা হ্রাস পাবে, রোগের প্রসার হবে না; তবে এতে ক্যান্সার সম্পূর্ণ সারবে না। ওষুধটির নাম—সাইটাস-ট্যাটিসাস সি পি. সি.।

ক্যান্সার-চিকিৎসার নতুন পদ্ধতি

টোকিও থেকে পি. টি. আই কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—ক্যান্সার রোগের জটিল অবস্থায় উপনীত রোগীদেরও সারিয়ে তোলবার এক নতুন চেষ্টার কথা শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে বলে জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কিয়োডো জানিয়েছেন।

এই নতুন পদ্ধতিতে ক্যান্সার রোগাক্রান্ত কোষগুলিকে প্রথমে কেটে সরিয়ে নেওয়া হবে, তারপর কোষগুলিকে সোডিয়াম বাইকারবোনেট সলিউশনে দু'ঘণ্টা ডুবিয়ে রেখে আবার রোগীর দেহে বসিয়ে দেওয়া হবে।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক ব্যাধি গবেষণা পরিষদ হাসপাতালের শল্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ নোবোরু ইজিমা জাপানী ক্যান্সার সমিতির ২৪তম অধিবেশনে এই ঘোষণা করেন।

২০জন আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রীর উপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই দেড় বছর যাবৎ বেঁচে আছেন।

প্রতি মিনিটে ১২৫

নয়া দিল্লী থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—রাষ্ট্রপুঞ্জের সমীক্ষায় প্রকাশ, বিশ্বের জনসংখ্যা প্রতিমিনিটে ১২৫ জন, প্রতি দিন ১,৮০,০০০ জন করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সারা বিশ্বে প্রতিদিন লোকসংখ্যা বাড়তো ৪০ হাজার করে। আগামী ৩৫ বছরে বিশ্বের লোকসংখ্যা ৭০০ কোটিতে দাঁড়াতে পারে।

ঐ সমীক্ষা অনুসারে, সারা বিশ্বের জমির তুলনায় ভারতের জমির পরিমাণ ২ শতাংশ এবং লোকসংখ্যা বিশ্বের লোকসংখ্যার ২৫ শতাংশ।

১৮৯১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ। ৩০ বছর পরে ১৯২১ সালে ঐ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১ কোটি ৫০ লক্ষ। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে সুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। এই শতাব্দীর শেষে ভারতের জনসংখ্যা ৯০ কোটিতে দাঁড়াবে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন।

ভারতীয় গণ্ডার সংরক্ষণ সম্পর্কে অনুসন্ধান

লণ্ডনের ওয়ার্লড্ ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের সদ্য প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ভারতসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন দেশের বন্য প্রাণী-সমূহ রক্ষার জন্যে বহু রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এখন ভারতীয় গণ্ডার সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান-কার্য চালানো হবে। প্রকাশ, সমগ্র উপমহাদেশে গণ্ডারের সংখ্যা এখন প্রায় ৪৪০। এই অনুসন্ধান বিশেষভাবে আসামে চালানো হবে। হিমালয় অঞ্চলের দুর্লভ প্রাণী সম্পর্কেও এই কাজ চলবে বলে জানা যায়।

সিংহলের ওয়াইল্ড্ লাইফ প্রোটেকশন সোসাইটি সিংহলের হাতী সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন। বিশ্বের এই বিশেষ ধরণের হাতীর সংখ্যা ১,০০০ থেকে ১,৫০০ মাত্র।

ফাণ্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকৃতি-বিজ্ঞানী মিঃ পিটার স্কট বলেন যে, এই অনুসন্ধান সম্পর্কে ভারত ও সিংহল উভয় দেশই বিশেষ উৎসাহ বোধ করছে।

ফাণ্ড মাত্র চার বছর ধরে কাজ করছে। কিন্তু এই চার বছরের মধ্যেই সংস্থাটি ৬৭৫,০০০ পাউণ্ড (৯০ লক্ষ টাকা) সংগ্রহ করেছে এবং ১৪৫টি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ সুরু করতে পেরেছে। এর মধ্যে ৩৯টি পরিকল্পনা ফাণ্ড ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করতে পেরেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে এই ধরণের কাজকর্মে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫,৬০০ পাউণ্ড (৭৫,০০০ টাকা)।

ভ্রম সংশোধন

গত ফেব্রুয়ারী (১৯৬৬) সংখ্যায় ৯৫ পৃষ্ঠায় সৌরজগতের উৎপত্তি বিষয়ক প্রবন্ধের শিরো-নামার দ্বিতীয় লাইনে 'পতনে'র স্থলে 'পত্তন' হইবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

উনবিংশ বর্ষ | এপ্রিল, ১৯৬৬ | চতুর্থ সংখ্যা

জাপানী বিজ্ঞানী তোমোনাগা

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ডাঃ তোমোনাগা (Tomonaga) এবার পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এঁর পিতা জুঞ্জিরো (Zunjiro) বহুদিন কিয়োটো (Kyoto) বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের যশস্বী অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর লেখা বই 'এই যুগে জাপানের নব জাগরণ' আজও জাপানে বহুলোকে পড়ছে। ছোট ভাই যোজিরো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলের অধ্যাপক। পিতৃব্য ও মাতুল কিয়োটোতেই শিক্ষকতা করতেন। বিদ্বানের বংশ বলে জাপানে তোমোনাগাদের সুখ্যাতি আছে

ইনি জন্মেছিলেন টোকিও সহরে, তবে অল্প বয়সেই পরিবারের সকলের সঙ্গে কিয়োটোতে চলে আসেন। স্বভাবতঃ ক্ষীণজীবি, শৈশব থেকেই নানা অসুখে ভুগেছেন। প্রকাণ্ড মাথার মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু জ্বল জ্বল করছে, তবে অস্থিচর্মসার দেহ। বিজ্ঞানের উপর ঝোঁক ছেলেবেলা থেকে। "ছেলেদের বিজ্ঞান" পত্রিকা নিয়মিতভাবে পড়তেন ও মাঝে মাঝে তাতে প্রবন্ধও লিখতেন। গাছপালা, কীট-পতঙ্গ সংগ্রহ করবার বাতিক ছিল। কাগজে তৈরি জাহাজ ও আরও টুকিটাকি জিনিসের ভিতর তাঁর কারুবিদ্যার ঝোঁক প্রকাশ পেত। জাপানের

উচ্চমান-বিত্থালয়ের তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে পদার্থ-বিজ্ঞান নিয়ে মেতে উঠলেন। সেই সময় জাপানে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন প্রোফেসর আইনষ্টাইন। তাঁর প্রত্যেক বক্তৃতা-সভায় বালক তোমোনাগা উপস্থিত থাকতেন। তখন থেকেই সারাজীবনের সালে কিয়োটোতে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করছেন নিশিনা, ইকাওয়া (Ykawa) ও তোমোনাগা (পরে দু'জনেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন) ওঁর কাছে রিসার্চে শিক্ষানবিসী করছেন, সঙ্গে আর একজন—সাকাতা (Sakata);

ডাঃ তোমোনাগা।

মত পদার্থ-বিজ্ঞানের সেবাই বরণ করে নিয়েছেন। এর কিছু পরেই কোপেনহাগেন থেকে ফিরে এলেন নিশিনা (Nishina)। ইনি নীল বরের ছাত্র—নাম বিজ্ঞানী জগতে সুপরিচিত। ১৯৩২ আজ ইনিও যশস্বী হয়েছেন। '৩৬ সালে মেসন (Meson) নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন ইকাওয়া। '৩৭ সালে নিশিনা—তোমোনাগা—সাকাতা-র ইলেকট্রন-যুগ্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধ

বের হলো। বিজ্ঞানীমহলে তোমোনাগার এই প্রথম পরিচয়-পত্র। তারপর ২ বছর ('৩৮-'৪০) তোমোনাগা জার্মেনীতে হাইসেনবার্গের কাছে কাটিয়েছিলেন।

হাসি ও রঙ্গ করে অবসর কাটান বিজ্ঞানী। জার্মেনী থেকে ফিরে নিজে একটা রঙ্গনাট্য লেখেন এবং তার অভিনয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন। আজও এই ধরণের নাট্য-নিকেতনে তাঁর আকর্ষণ অটুট রয়েছে

এর কিছু পরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রশান্ত মহাসাগরেও যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলো। যুদ্ধে দরকারী রেডার ও বেতার-সাজসরঞ্জামের প্রস্তুতি নিয়েই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতে হতো তোমোনাগাকে।

মধ্যে মধ্যে ফুজিওকার নিমন্ত্রণে যান কিয়েকু বিশ্ববিদ্যালয়ে টোকিওতে। তাঁর সঙ্গে রিসার্চের সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা হয়। তখন জাপানে খাদ্যের ভীষণ অনটন—অনুসন্ধানীদেরও খাবার জোটে না। শরীর এমন দুর্বল যে, রাস্তায় যেতে যেতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন সময় সময়। শেষে যুদ্ধ থামলো, এদিকে বোমাবর্ষণে দুই অনুসন্ধানাগারই পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। তবু ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে জানালার পাশে তোমোনাগা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, নিজে যে কল্পনা করেছিলেন পরমাণুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে, সেই ক্ষেত্রে বহু বিশিষ্ট কাল-পরিমাপের প্রয়োগ নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৪৮ সালে তাঁর মত পূর্ণরূপে প্রকাশ পেল। কিছু পরে আমেরিকান বিজ্ঞানী ফেইনম্যান ও সুইঙ্গার তাঁদের প্রবন্ধও ছাপালেন। অন্যভাবে তাঁরাও তোমোনাগার দৃষ্টিভঙ্গী ও মতের অনুরূপ অবস্থায় এসে পৌঁচেছেন। আজ তিন জনের সেই সব নতুন কথা বিশ্বস্বীকৃতি পেয়েছে—তিন জনেই এর জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। যখন ভাবি—যুদ্ধের পর জাপানে কোন বিদেশীয় বৈজ্ঞানিক সংবাদ বা সংবাদপত্র বহুদিন পাওয়া যেত না এবং তোমোনাগাকে একা একাই নব মতের সারা সৌধকেই গড়ে তুলতে হয়েছিল, তখন তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশক্তির প্রাচুর্যের কথা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

১৯৫০ সালে D. Oppenheimer-এর নিমন্ত্রণে Princeton-এ এক বছর কাটিয়ে এলেন তোমোনাগা। ফিরে আসবার পর বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—দাঁতগুলির ভাল করে চিকিৎসা করা গেল। পূর্বেই রূপনাট্যে তাঁর অনুরাগের কথা বলেছি। রূপকচ্ছলে নানা কথা বলে Quantum বাদের অনেক কুহেলিকাও জনসমক্ষে সুস্পষ্ট করতে পারতেন।

একদিন প্রোফেঃ নাকামুরাকে (Prof. Nakamura) বলছেন—রাস্তার আলোর তলায় কে একজন যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিছু হারিয়েছে না কি? বলে—হ্যাঁ চাবিটা। কোথায়? ওইখানের অন্ধকারে—তবে অন্ধকারে কিছু পাওয়া শক্ত, তাই যেখানে আলো পড়েছে, সেইখানেই হাতড়াই। আমাদের কোয়ান্টা-বাদের অবস্থা আজকাল প্রায় এই রকম নয় কি?

গল্প করবার আশ্চর্য ক্ষমতা তোমোনাগার—রহস্য করে নব্য বিজ্ঞানের নানা কথা জনপ্রিয় করতে চেয়েছেন। এখনও রঙ্গনাট্য-নিকেতন নিয়ে বিভোর। সরল সাদাসিদা মানুষ, নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব নিয়েই এইভাবে অবসর বিনোদন করেন। তবে শরীরকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে সন্ধ্যাবেলাই ঘুমের প্রয়োজন। রাতের খাওয়া শেষ করেই ঘুমের সাধনা—ডাক্তার বলেছেন, ১২ ঘণ্টা চাই প্রত্যহ। তাঁর পানের আসক্তি নিয়ে অনেকে ঠাট্টা-তামাসা করেছে। নোবেল প্রাইজের খবর এলে বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি নিজের খরচে কয়েক বোতল বিলাতী সরাব পাঠালে—সবেতেই লেখা—বিশিষ্ট রসিকের জন্যে।

টাকাকড়িতে মায়া নেই। নানাভাবে অন্ন-

স্বল্প যা আসে আর তাঁর বাঁধা মাহিনা। ঐ সব দিয়েই সংসার চলে। নিজের হয়তো হিসাব নেই, ঠিক কত তাঁর রোজগার। স্ত্রীর (রিয়োকো) সেই সব ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়। ছেলেরা স্কুলে পড়ছে। এক মেয়ের সম্প্রতি বিবাহ হলো—এসব নিয়ে তোমোনাগা ব্যস্ত নয়। শিশু অবস্থায় তিনি সন্তানদের খেলার সঙ্গী, তবে বড় হলে তাদের ভাবনা তারাই ভাবে—তাদের পড়াশুনা নিজেরাই চালিয়ে নেয়।

স্ত্রী বলেন ঠাট্টাচ্ছলে এক জাপানী প্রবাদ—

"মুচির ছেলের—খালি পা।"

পরকে জ্ঞানদান করতে তোমোনাগা ব্যস্ত, নিজের ছেলেমেয়ের শিক্ষার কথা ভাববার অবসর কোথায় ?

সাংবাদিকেরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মিসেস তোমোনাগা, নোবেল পুরস্কারের টাকায় কি হবে ?

বললেন, এখনো ভাবি নি দুজনে—হয়তো এই বাড়ী তৈরির দেনা মিটাতেই শেষ হয়ে যাবে।

প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ জানে যে, উত্তম জাতের ধান থেকে বেশী ফসল এবং নিকৃষ্ট জাতের ধান থেকে কম ফসল হয়। জাত ভাল হলে গরু বেশী দুধ দেয়, খারাপ হলে অল্প পরিমাণে দুধ দেয়। প্রজনন-বিজ্ঞানের সূত্র না জেনেও প্রাচীন কাল থেকে মানুষ নির্বাচন পদ্ধতির সাহায্যে উন্নত জাতের ধান গম, গরু, ঘোড়া সৃষ্টি করে এসেছে। বর্তমানে এই বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে উন্নত জাতের উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব করা সম্ভব।

কৃষিকার্যে সার, জলসেচন এবং উন্নত প্রণালীতে চাষ ছাড়া শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে উন্নত জাতের বীজের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। পরিবেশ অনুযায়ী সবচেয়ে উত্তম জাতের বীজ থেকেই বেশী ফসল আশা করা যায়। যে ধান উঁচু ডাঙ্গা জমিতে রোপণ করলে ভাল ফসল হয়, সেই ধান নীচু জমিতে চাষ করলে ফসলের বৃদ্ধি তেমন হয় না। আবার যে ধান লাল মাটির পক্ষে অনুকূল সেই ধান পলিমাটির পক্ষে সুবিধাজনক নয়। বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন জাতের উৎপাদনের তারতম্য দেখা যায়। যে জাত যে পরিবেশে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, সেই জাত সেই পরিবেশে গ্রহণযোগ্য। একই প্রদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি, জলবায়ু বিভিন্ন থাকবার ফলে বিভিন্ন জাতের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া বাজারে মোটা, সরু, মিহি ও সুগন্ধি চালের ক্রেতা থাকায় বিভিন্ন জাতের চাষ-আবাদও প্রয়োজন।

সংমিশ্রণ পদ্ধতির (Hybridisation) সাহায্যে বিভিন্ন জাত সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। যদি দেখা যায় যে, কোন আখ-জাতের ফলন বেশী অথচ রোগপ্রবণ, অন্য জাতের ফলন কম কিন্তু রোগ প্রতিরোধসম্পন্ন; তখন দুই জাতের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে ফলশালী ও রোগ প্রতিরোধ-সম্পন্ন নতুন সঙ্কর জাত সৃষ্টি করা সম্ভব। ভারতবর্ষে কুইম্বাটুরে ডক্টর টি. এস. ভেঙ্কটরামন সংমিশ্রণ পদ্ধতির সাহায্যে উন্নত ধরণের অনেক আখের জাত সৃষ্টি করেছেন। এসব উন্নত জাতের আখ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চাষ

করা হচ্ছে। দিল্লীর ভারতীয় কৃষি-গবেষণাগারে ডক্টর বি. পি. পাল ভারতীয় গম 'এন. পি.-৪'-এর সঙ্গে জাপানী একটি জাতের সংমিশ্রণ করে 'এন. পি-৭৭০' নামে এক উন্নত গমের জাত সৃষ্টি করেছেন। এই নতুন জাতের গমের উৎপাদন অন্যান্য দেশী জাতের অপেক্ষা বেশী। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও পাহাড়ী অঞ্চলে গম গাছের ডাঁটায় কালো রঙের এক প্রকার ছত্রাক (Rust) রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, ফলে বছরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের গম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক দিনের প্রচেষ্টায় দেশী ও বিদেশী জাতের গমের মধ্যে সংমিশ্রণ করে ছত্রাক প্রতিরোধসম্পন্ন কতকগুলি নতুন জাতের উদ্ভব করা হয়েছে। সম্প্রতি রকফেলার ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতা ও সংমিশ্রণ পদ্ধতির সাহায্যে জোয়ার ও বাজরার উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

আমেরিকায় সঙ্কর ভুট্টার বর্ধিত উৎপাদন প্রজনন-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর দান। লক্ষ্য করা গেছে যে, কোন জাতের ভুট্টা অনবরত স্ব-নিষিক্ত হলে উৎপাদনের পরিমাণ কমতে থাকে, কিন্তু দুই জাতের ভুট্টার মধ্যে সঙ্গম ঘটিয়ে যে সংকর জাতের সৃষ্টি হয়, তার দানাগুলি বেশ পুষ্ট হয়, কিন্তু সংখ্যায় কম থাকে। কিন্তু দুই প্রকার সঙ্কর গাছের মধ্যে পুনরায় সঙ্গম ঘটিয়ে যে নতুন জাতের সৃষ্টি হয়, তার উৎপাদন প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

উদ্ভিদের ন্যায় প্রাণিজগতেও সংমিশ্রণ পদ্ধতিতে উন্নত জাত সৃষ্টি করা হয়। প্রজনন-বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতবর্ষে উন্নত জাতের দুগ্ধবতী গাভী সৃষ্টি করবার চেষ্টা চলছে। সারা পৃথিবীতে চার ভাগের এক ভাগ গরু ভারতে আছে; কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ভারতে মাথাপিছু দুধের বাটোয়ারা পৃথিবীর সব দেশের তুলনায় কম। ভারতে বিভিন্ন জাতের গরুর মধ্যে রেড সিন্ধি ও হারিয়ানা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। গত বিশ বছর ধরে নির্বাচন পদ্ধতির সাহায্যে রেড সিন্ধি জাতের এমন উন্নতি করা হয়েছে যে, তারা দৈনিক গড়পড়তা সাত লিটার দুধ দিয়ে থাকে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে এই জাতীয় গরুর চাহিদা অত্যন্ত বেশী। আমাদের বাংলা দেশে দেশী গরুর দুধের স্বাদ ভাল হলেও তারা অল্প পরিমাণে দুধ দিয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মিল্ক কমিশনার উন্নত জাতের ষাঁড়ের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেশী গরুর দুগ্ধ দানের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে চিন্তা করছেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার হারিয়ানা গরু ও জার্সি ষাঁড়ের সংমিশ্রণে কল্যাণী ধেনু নামে এক সঙ্কর জাত সৃষ্টি করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই সঙ্কর জাত হারিয়ানা গরুর তুলনায় চারগুণ দুধ বেশী দিবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রজনন-বিজ্ঞানের সাহায্যে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করবার সম্ভাবনা আছে। শুধু উন্নত জাতের দুগ্ধবতী গাভীর সৃষ্টি করাই প্রজননতত্ত্ববিদ্‌দের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়—কি ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ষাঁড় বা বলদের সংখ্যার তুলনায় দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা বাড়ানো যায়, সে সম্বন্ধে অনেকে গবেষণা করছেন। এই ব্যাপারে ডক্টর ভৈরব ভট্টাচার্যের 'শুক্রবীজ থিতানো পদ্ধতি' নতুন আলোকপাত করেছে।

কলকাতার দুগ্ধ-সমস্যা সমাধানের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রামছাগল পোষার কথা মাঝে চিন্তা করেছিলেন। শুধু রামছাগল পুষলেই দুধের সমস্যা কতদূর মিটানো সম্ভব হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে গরু ও ছাগলের সম্মিলিত পালনে দুধের সমস্যা কিঞ্চিৎ লাঘব হতে পারে। শুধু দুধের জন্যে নয়, মাংস ও চামড়ার চাহিদা মেটানোর জন্যে ছাগল পোষবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আকৃতির ছাগল দেখা যায়।

পাহাড়ী অঞ্চলে গদ্দী ও পশ্‌মিনা জাতীয় ছাগলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পশ্‌মিনা জাতীয় ছাগলের লোম খুব সূক্ষ্ম ও কোমল হয়। এরই লোম থেকে বিখ্যাত কুলু শাল তৈরি করা হয়। গদ্দী জাতীয় ছাগলেরা পাহাড়ে মালপত্র বহনের কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকে। ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে যমুনাপুরী জাতীয় ছাগল আকারে বড় এবং ওজন ৭০ কিলোর উপর হয়ে থাকে। এই জাতীয় ছাগল থেকে প্রচুর পরিমাণে দুধ ও মাংস পাওয়া যায়। যমুনাপুরী ও পাঞ্জাবের স্থানীয় ছাগলের সংমিশ্রণে 'বিটাল' নামে নতুন জাতের ছাগল উৎপাদন করা হয়েছে। এরা প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয় এবং এদের সন্তানোৎপাদনের হারও বেশী। বাংলা ও উড়িষ্যায় যে জাতীয় ছাগল দেখা যায়, তারা আকারে খুব ছোট এবং ওজনে সাধারণতঃ ১৪-১৫ কিলো হয়ে থাকে। এদের মাংস খুব সুস্বাদু, কিন্তু এরা কম পরিমাণে দুধ দেয়। যদিও জলবায়ু ও খাদ্যের উপর ছাগলের স্বাস্থ্য, দৈহিক আকৃতি ও ওজন নির্ভর করে, তথাপি উন্নত জাতের সঙ্গে দেশী জাতের সংমিশ্রণ করে দুগ্ধবতী ও মাংসবহুল নতুন ছাগলের জাত সৃষ্টি করা যেতে পারে।

শুধু উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে প্রজনন-বিজ্ঞানের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের কল্যাণে এই বিজ্ঞানের সাহায্য দিন দিন গ্রহণ করা হচ্ছে। মানুষের অনেক বংশগত রোগের উৎসের কারণ ও উত্তরাধিকার সূত্র প্রজনন-বিজ্ঞানের উন্নতিতে জানা সম্ভব হয়েছে এবং এই সব রোগের প্রতিকার ও প্রতিবিধানের পন্থাও আবিষ্কৃত হচ্ছে। মানুষের বিভিন্ন রক্তশ্রেণী আবিষ্কৃত হওয়ায় রক্তের উত্তরাধিকার সূত্র জানা গেছে। রক্ত পরীক্ষার দ্বারা মানুষের বিবাহের ব্যবস্থা করলে রক্তশ্রেণীর অসামঞ্জস্যপ্রসূত হিমোলিটিক ও জনডিস্ রোগ, অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনজনিত রক্তশূন্যতা রোগ ও বিপাক-বিশৃঙ্খলাজনিত ব্যাধি—যেমন গ্যালাক্‌টোসেমিয়া, ফেনিলকেটোনুরিয়া সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রকাশ হবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অনেক বংশগত রোগ অন্তর্বিবাহের (Inbreeding) ফলে সন্তানের মধ্যে পরিস্ফুট হবার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে প্রজননতত্ত্ববিদেরা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে বিবাহ অনুমোদন করেন না। প্রজনন-বিজ্ঞানের গবেষণায় যদি রোগগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ ও বিকৃত-মস্তিষ্ক সন্তানের আবির্ভাব কিছু পরিমাণে রোধ করা সম্ভব হয়, তাহলে এই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না।

এনামেল

শ্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনার গহনায় মিনা করা অনেক দিন থেকেই প্রচলিত আছে এবং এই আধুনিক সভ্যতার কালেও তা বিঘ্নিত হয় নি। মিনা করা এনামেল শিল্পের একটি দিক। এনামেল শিল্পের আবিষ্কার বা ব্যবহার খুঁজতে গেলে বিশেষ বেগ পেতে হবে। কারণ তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস তত সহজলভ্য নয়—তবে এটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে, 'মিনা' বহু পুরাতন এবং স্বর্ণ শিল্প ও রৌপ্য শিল্পের ব্যবহারের কিছুদিন পরেই এই শিল্পের প্রচলন হয়। কোন ধাতুর উপর পাতলা একটি বিশেষ ধরণের আস্তরণকে এনামেল বলা হয়ে থাকে। এই আস্তরণটির উপকরণ আসলে একটি বিশেষ ধরণের কাচ। পটারি, পোরসিলেন, রিফ্র্যাকটরিজ ইত্যাদি জিনিষগুলি হচ্ছে Incepient fusion, অর্থাৎ গলনের সূত্রপাত হবার পর গলনকে আর অগ্রসর হতে না দিয়ে বন্ধ করা হয় এবং রাসায়নিক ক্রিয়াও সম্পূর্ণ হতে পারে না, যার ফলে একে বলা হয় Arrested reaction। আর কাচ হচ্ছে পরিপূর্ণ গলন এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার পূর্ণসাধন।

এনামেল দুই প্রকারের হতে পারে—জৈব এনামেল এবং অজৈব এনামেল। অধুনা জৈব এনামেলেরও প্রচলন সুরু হয়েছে, আগে অবশ্য অজৈব এনামেলই বেশী চলতো। প্লাস্টিক্স শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জৈব এনামেলের প্রচলন বাড়তে থাকবে—বর্তমানে রেফ্রিজারেটর-এর আস্তরণগুলির বেশীর ভাগই জৈব এনামেলের দ্বারা তৈরি। জৈব আর অজৈব এনামেল নাম থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়, দুটির মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি। জৈব জিনিষ তাপ সহনশীল নয়, তার ফলে যেখানে তাপ বর্তমান, সেখানে অজৈব জিনিষ ব্যবহার করতেই হবে। কিন্তু অজৈব জিনিষ সব জায়গায় লাগানো যেতে পারে। তবে তারও আবার সীমা আছে, যেমন—যে জিনিষের উপর আস্তরণটি লাগানো হবে, সেটি যদি সহজ তাপ প্রয়োগের ফলেই বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে, তবে সেখানে জৈব এনামেল লাগাতে হবে। কারণ অজৈব এনামেল লাগাতে হলে তাপ প্রয়োগ করতেই হবে—যার ফলে আস্তরণটি গলে একটি মসৃণ আস্তরণের সৃষ্টি করবে। এখানে জৈব এনামেল সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হবে না, কারণ তা প্লাস্টিক্স শিল্পের অন্তর্ভুক্ত এবং তা আলোচনা করতে গেলে প্লাস্টিক্স শিল্পের আলোচনা ছাড়া সম্ভবও নয়। বর্তমানে প্লাস্টিক্স শিল্প একটি বিরাট আকার গ্রহণ করেছে এবং কিছুদিন আগে এই পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪) "হাই পলিমার" নামক নিবন্ধে তা বিশেষভাবে বলবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

পূর্বে বলা হয়েছে—এনামেল আস্তরণটি আসলে কাচের আস্তরণ। এই কাচটির ধরণ হলো—খুব কম তাপে এটি গলে যায়, যাকে বলা হয় Low temperature glass। এটি লাগাবার উদ্দেশ্য হলো, ধাতুটিকে বাইরের সব আবহাওয়া থেকে রক্ষা করা; যেমন ধরা যাক—লোহা। যদি একটি লোহার পাত্র তৈরি করা যায়, তবে ব্যবহারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লোহার উপর মরচে দেখা দেবে; কিন্তু যদি এমন কিছু লাগানো হয়, যাতে লোহাটি নষ্ট হবে না এবং ব্যবহারেও সুবিধা হবে। ধাতুর উপর কোন রং লাগালে তা ক্ষণস্থায়ী হয়, যদি সেই জিনিষটি নিত্যব্যবহার

করা হয়। তাই এনামেলের একটি পাতলা আস্তরণ দেওয়া হয় ধাতুর উপর, ফলে ধাতুর বহির্ভাগটি হয় কাচের ন্যায় মসৃণ এবং তা সহজে নষ্ট হয় না।

এখন কোন কাচকে কোন ধাতুর উপর লাগাবার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে আসা যাক। কারণ সাধারণতঃ ধাতু ও অধাতুকে জোড়া দেওয়া যায় না, আবার ক্ষেত্রবিশেষে যায়ও—কারণটা কি? প্রতিটি জিনিস, তা ধাতুই হোক বা অধাতুই হোক, তাপ দিলে আয়তনের পরিবর্তন হয়, সাধারণতঃ আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং এই আয়তন বৃদ্ধি প্রতি জিনিষেরই আলাদা ধাতুর এক এক রকম, অধাতুর আর এক রকম, কিন্তু অধাতুর এই আয়তন বৃদ্ধিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে। এখন যদি একটি ধাতু, যেমন—লোহার উপর যদি কোন কাচের আস্তরণ দিই, তবে কি রকম দাঁড়াবে? যদি উভয়ের ক্ষমতা (Coefficient of expansion) সমান না হয়, তবে তাপ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে যে আয়তনের বৃদ্ধি ঘটবে, তা সমান হবে না। ফলে একটি আর একটি স্তর থেকে আলাদা হতে চাইবে। গরম করবার সময় এবং ঠাণ্ডা করবার সময়েই এই অসুবিধা দেখা দেবে, যদিও গরমের সময় যে ফল, ঠাণ্ডা করবার সময় তার বিপরীত ফল ঘটবে। এখন পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, কাচের চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা অর্থাৎ Compressive strength টানের ক্ষমতা বা Tension strength-এর চেয়ে অনেক বেশী। কাচ ফাটে বেশীর ভাগই ঠাণ্ডা করবার সময়, গরম করবার সময় কম ফাটে। এখন যদি কাচ ও ধাতুর Coefficient of expansion সমান থাকে, তবেই দুটি একত্রে যুক্ত থাকবে। যদি ভিন্ন হয়—যদি কাচের বৃদ্ধি ক্ষমতা বেশী হয়, তখন জিনিষট ঠাণ্ডা করবার সময় কাচটি ছোট হতে চাইবে, কিন্তু ধাতুটি ততখানি বাড়ে নি, তাই সে বাধা দেবে, ফলে কাচের উপর Tension থাকবে। কাচ Tension-এ দুর্বল, তাই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কাচের বৃদ্ধির ক্ষমতা কম হয় ধাতুর চেয়ে, তখন ধাতুটি বেশী বাড়বে কাচের চেয়ে এবং ঠাণ্ডা করবার সময় ধাতুটি বেশী ছোট হতে চাইবে। কিন্তু কাচটির তত ছোট হবার ঝোঁক থাকবে না, ফলে কাচের উপর Compressive বল প্রযুক্ত হবে, যেহেতু কাচের এই ক্ষমতা বেশী, ফলে নষ্ট হবার সম্ভাবনাও কম। সুতরাং উপরিউক্ত ঘটনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, কাচ ও ধাতুর বৃদ্ধির ক্ষমতা সমান থাকা উচিত বা কাচের বৃদ্ধির ক্ষমতা অল্প কম থাকা উচিত। সুতরাং যখন কোন জিনিষ কোন ধাতুর উপর প্রযুক্ত করবার কথা চিন্তা করা হবে—সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত ঘটনাটিও মিলিয়ে দেখে নিতে হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ঠিক করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সাধারণতঃ যে জিনিসের দ্বারা এনামেল হবে, সেগুলি একত্রে মেশানো হয় এবং কোন উপায়ে (উপায়গুলি পরে আলোচনা করা হবে) ধাতুর উপর লাগানো হয় এবং ধাতুটিকে একটি চুল্লীতে প্রবেশ করানো হয়—লোহার ক্ষেত্রে যেমন ৮০০° সেঃ উত্তপ্ত করা হয়। জিনিষটি গলে গিয়ে মসৃণ আস্তরণের সৃষ্টি করে এবং তা পরে ঠাণ্ডা করা হয়। ৮০০° সেঃ এর বেশী তাপ দেওয়া হয় না, কারণ তার ফলে লোহার পাতের আকারের উপর আঘাত করবে। যাহোক, এখন দেখা যাক কাচটিতে কি থাকে।

এতে থাকে সিলিকা, অ্যালুমিনা, বোরাক্স, সোডা ইত্যাদি। এমনভাবে মিশ্রণ তৈরি করা হয়, যাতে কম তাপে গলে যায়। নিম্নে সাধারণ কাচ, এনামেল কাচ ও অলঙ্কার কাচের একটি ভাগ দেওয়া গেল।

Constituents	Pyrex glass	Enamel for mild steel	Enamel for cast iron	Jewellery Enamel
SiO_2	80·6	51·1	39·0	24·0
Al_2O_3	2·0	7·7	6·4	—
B_2O_3	12·0	16·0	11·8	8·0
Na_2O+K_2O	4·4	17·8	18·5	20·0
CaF_2	—	5·5	3·9	—
MnO_2	—	1·5	—	—
PbO	—	—	10·4	48·0
F_2	—	—	6·2	—
Sb_2O_3	—	—	3·7	—

উক্ত ভাগে দেখা যাচ্ছে এনামেলে সিলিকার ভাগ কম এবং অ্যালকালি, বোরন ও লেডের পরিমাণ বেশী। সিলিকা উচ্চ তাপসহনশীল, তাই যেখানে তার পরিমাণ বেশী হবে তাকে গলানো কঠিন হবে, তাই Pyrex কাচ গলানো কঠিন। আর যেখানে অ্যালকেলী, বোরন ইত্যাদি ফ্লাক্সের পরিমাণ বেশী থাকবে, সেগুলিকে গলানো ততই সহজ হবে। সুতরাং পদার্থের গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে কঠিন তাপ সহনশীল বা অল্প তাপসহনশীল উভয় কাচই করা সম্ভব। তবে সর্বদা অল্প তাপসহনশীল কাচ তৈরি করলেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে কাচটির বৃদ্ধির ক্ষমতা ও ধাতুটির বৃদ্ধির ক্ষমতার দিকে নজর দিতে হবে। এখন লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা ইত্যাদির উপর আস্তরণটির ধর্ম কেমন হওয়া উচিত? লোহা সবচেয়ে বেশী তাপ সহ্য করতে পারে; তাই লোহার আস্তরণটি বেশী তাপসহনশীল হবে, অ্যালুমিনিয়াম তারপর এবং সোনার উপর সবচেয়ে কম তাপসহনশীল আস্তরণ ব্যবহার করতে হবে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, আস্তরণ যত বেশী তাপসহনশীল হয়, সেই আস্তরণটি ততই ভাল বা ব্যবহারে পটু হয়। সুতরাং ভাল জিনিষ পেতে হলে এই জিনিষটিকেও দেখতে হবে ভাল করে।

এক্ষণে এনামেল লাগাবার পদ্ধতি, যাকে বলা হয় Enamelling, তার পর্যায়ে আসা যাক। এই পর্যায়ের প্রথম হলো ধাতুর পরিষ্করণ। যে ধাতুটির উপর আস্তরণটি লাগানো হবে, তাকে প্রথমে উত্তমরূপে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকারের পরিষ্কার করবার পদ্ধতি বর্তমান আছে—(ক) সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ব্লাস্টিং (Blasting)। এই পদ্ধতিতে পাত্রটিকে বালি ও বাতাস দ্বারা ঘষা হয়, ফলে উপরের সব ময়লা দূর হয়ে যায়। খুব ভারী বস্তুগুলিকে সাধারণতঃ এই উপায়ে পরিষ্কার করা হয়। (খ) আর একটি উপায়ে প্রথমে আধারটিকে আগুনে উত্তপ্ত করবার পর আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করা হয় এবং তার পরে ব্লাস্টিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। উত্তপ্ত করবার উদ্দেশ্য হলো যদি আধারে কোন রকম চাপ (Internal strain) থাকে, তবে সেই চাপকে সরানো। (গ) রাসায়নিক উপায়ে পরিষ্কার করা—এতে পাত্রটিকে একটি দ্রবণের মধ্যে দেওয়া হয়। দ্রবণটিতে থাকে ক্ষার ও সাবান। এই দুটি আধারের গায়ে কোন ময়লা বা তৈল জাতীয় পদার্থ থাকলে তাকে সাফ করে দেয়। পরে এটিকে কোন অ্যাসিডজাতীয় পদার্থে ডোবালে তার ক্ষারও দূর হয়ে যায়। (ঘ) স্কেলিং (Scaling)—এই উপায়ে পদার্থটিকে কোন

অ্যাসিডজাতীয় পদার্থ বা গন্ধকের ধোঁয়ার উপস্থিতিতে গরম করা হয়। ফলে পাত্রটির উপরের ময়লা পুড়ে যায় এবং পাত্রটির উপর একটি পাতলা আস্তরণ পড়ে। এই পাত্রটিকে তখন পিকলিং (Pickling) দ্রবণে ডোবানো হয়। এতে থাকে শতকরা ৬ ভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড বা শতকরা ১১ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। যদি সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় তবে দ্রবণটিকে ১৫০° ফাঃ গরম থাকতে হবে আর যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় তবে সাধারণ উত্তাপেই কাজ হবে। এতে কয়েকটি বিশেষ জিনিস দেওয়া থাকে, যার ফলে প্রথমতঃ পাত্রটি অ্যাসিডের প্রভাবে বেশী নষ্ট না হয়, আর দ্বিতীয়তঃ বেশী অ্যাসিডের ধোঁয়া নির্গত না হয়, নচেৎ অবস্থান ক্ষেত্রটিতে কাজ করবার বিশেষ অসুবিধা দেখা দেবে। এরপর স্বাভাবিকভাবে পাত্রটি প্রথমে কোন ক্ষারজাতীয় দ্রবণে দিয়ে অ্যাসিডের ভাগ দূর করতে হবে, পরে বিশুদ্ধ জলে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এই হলো মোটামুটি পরিষ্করণ পদ্ধতি।

এরপর আসা যাক ফ্রিট (Frit) তৈরির পদ্ধতিতে। প্রথমেই জানা দরকার ফ্রিট কাকে বলে এবং কেন ফ্রিট তৈরি করা দরকার। যে সব সামগ্রীর দ্বারা এনামেল তৈরি করা হবে, প্রথমে সেগুলিকে একত্রে মেশানো হয়। এরপর মিশ্রণটিকে তাপ প্রয়োগে গলানো হয় এবং একটি গলিত কাচ তৈরি হয়। এই গলিত বস্তুটিকে জলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলে সেটি ভেঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা হয়ে যায়। এই আকস্মিক ঠাণ্ডা-করা টুক্‌রা টুক্‌রা কাচগুলিকে (Quenched glass) বলা হয় ফ্রিট। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, কাচ হচ্ছে রাসায়নিক ক্রিয়ার পূর্ণ সাধন। ফ্রিট তৈরি হবার পর ফ্রিটকে যদি গুঁড়া করে বা কোন উপায়ে পাত্রে লাগানো যায়, তাহলে পরে যখন তাপ দেওয়া হবে, তখন শুধু মাত্র গলে একটি মসৃণ আস্তরণ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন কিছু হবে না। কিন্তু যদি ফ্রিট তৈরি না করা হয় এবং বিভিন্ন সামগ্রীগুলি ভালভাবে মিশিয়ে যে মিশ্রণটি তৈরি হলো, সেটিকে কোন উপায়ে পাত্রে লাগিয়ে পরে তাপ প্রয়োগের দ্বারা মসৃণ করতে গেলে বেশ অসুবিধা দেখা দেবে, কারণ এখানেই রাসায়নিক বিক্রিয়া সুরু এবং শেষ হয়ে যায়। রাসায়নিক ক্রিয়া সুরু হলেই অনেক গ্যাসের সৃষ্টি হবে, ফলে আস্তরণটি মসৃণ না হয়ে অনেক ছিদ্র সমন্বিত হবে এবং অনেক গ্যাস বুদ্‌বুদ্‌কে পাত্রের গায়ে লেগে থাকতে দেখা যাবে। আর পাত্রটিকে বেশী সময়ও চুল্লীতে রাখা যায় না, কারণ পাত্রটির তাতে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণতঃ তিন উপায়ে ফ্রিট তৈরি করা হয়—

(১) যখন অল্প পরিমাণে ফ্রিট তৈরি করতে হবে, তখন এই পদ্ধতি বেশী কার্যকরী। বিভিন্ন সামগ্রীর মিশ্রণটিকে একটি V-আকারের পাত্রে (Crucible) নিয়ে চুল্লীতে স্থাপন করা হয় এবং যখন সব রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে, তখন তরল পদার্থটিকে জলে ঢেলে দেওয়া হয়। এই ভাবে আকস্মিকভাবে ঠাণ্ডা করবার উদ্দেশ্য হলো এই যে, এতে জিনিসটি ভঙ্গুর হয়ে যায় আর ফ্রিটে কেলাসের পরিমাণ খুব কম থাকে। ফ্রিটে যত কেলাস কম থাকবে ততই ভাল।

(২) অনেক বেশী জিনিসের দরকার হলে এই পদ্ধতি সুবিধাজনক। এই মিশ্রণটিকে হার্থ (Hearth) নামক চুল্লীতে নেওয়া হয়। চুল্লীটি বিশেষ ধরণের ইটের দ্বারা তৈরি। তাপ দেবার সঙ্গে সঙ্গে গলতে সুরু করে এবং গলন শেষ হলে তরল পদার্থটিকে চুল্লীর নিম্নভাগে অবস্থিত ছিদ্রটি খুলে বের করে জলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়।

(৩) এই পদ্ধতিতে মিশ্রণটিকে একটি

ঘূর্ণায়মান চুল্লীতে নেওয়া হয় এবং উপরিউক্ত উপায়ে গলিয়ে জলের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সমাধা করা সম্ভব এবং এই চুল্লীকে সহজেই উত্তপ্ত করা যেতে পারে। ফ্রিট তৈরি করবার সময় কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে ; যেমন—

(ক) চুল্লীতে বিজারিত (reducing) হাওয়া থাকা উচিত নয়।

(খ) চুল্লীকে তাড়াতাড়ি গরম করা উচিত নয়, আবার খুব আস্তে আস্তে গরম করাও উচিত নয়।

(গ) তরল পদার্থটি তৈরি হয়ে গেলে আর সেটিকে বেশীক্ষণ চুল্লীর মধ্যে রাখা উচিত নয়।

ফ্রিট তৈরির পর ফ্রিট লাগাবার পদ্ধতিতে আসা যাক। চারটি পদ্ধতি আছে—(১) এটি শুষ্ক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ফ্রিটকে খুব গুঁড়া করবার পর পাত্রটিকে খুব গরম করা হয় (যে তাপে এনামেল লাগানো হবে) এবং উপর থেকে আস্তে আস্তে ঠিক পরিমাণমত গুঁড়া ফ্রিট ছাকুনির দ্বারা ফেলতে হবে। পাত্রটি গরম থাকবার ফলে গুঁড়াগুলি সঙ্গে সঙ্গে গলে গিয়ে একটি মসৃণ আস্তরণ সৃষ্টি করবে।

(২) দ্বিতীয় পদ্ধতিও শুষ্ক পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। পাত্রটি গরম করে গুঁড়া ফ্রিটের মধ্যে ঢোকানো হয়, ফলে পাত্রের গায়ে ফ্রিট লেগে যায়। পরে আর একটু গরম করে আস্তরণটিকে মসৃণ করে করে নেওয়া হয়।

(৩) এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করা হয়। এটি 'ডোবানো' (Dipping) পদ্ধতি। ফ্রিটকে গুঁড়া করে জলে দেওয়া হয় এবং তার সঙ্গে আরও দু-একটি জিনিষ (Electrolyte, clay etc.) দেওয়া হয়, যাতে ফ্রিট জলের সঙ্গে একটি ঘন তরল পদার্থের সৃষ্টি করবে আর সহজে শক্ত জিনিষগুলি নীচে পরে যাবে না, যাকে বলা হয় Stable suspension। পাত্রটিকে এই মিশ্রণে ডোবানো হয়, ফলে পাত্রের গায়ে একটি পাতলা প্রলেপ লেগে যায়। এটিকে প্রথমে শুকিয়ে ঠিক ভাবে গরম করে নেওয়া হয়।

(৪) এই উপায়টি হচ্ছে Spraying। কোন যন্ত্রের দ্বারা তরল পদার্থটিকে এমন ভাবে পাত্রের গায়ে নিক্ষেপ করা হয়, যাতে পাত্রের সব জায়গায় অল্প প্রলেপ পড়ে যায়। পরে আগের মত শুষ্ক করে গরম করে নেওয়া যায় মসৃণ আস্তরণ সৃষ্টি করবার জন্যে।

এখন জানা দরকার—সাধারণতঃ ধাতুর উপর এনামেলের দুটি প্রলেপ দেওয়া হয়। প্রথমটির নাম Ground coat এবং পরেরটি বা উপরেরটির নাম Cover coat। Ground coat দেওয়া হয় যাতে এনামেলটি ধাতুর সঙ্গে ভালভাবে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এর উপরিভাগ খুব মসৃণ হয় না বা কোবাল্ট ধাতু দেবার জন্যে এটি সর্বদাই নীল রঙের নয়। এর উপর Cover coat দেওয়া হয়—এর যে কোন রং হতে পারে এবং এটি সহজেই মসৃণ আস্তরণের সৃষ্টি করে এবং সহজেই Ground coat-এর সঙ্গে লেগে থাকতে পারে। Ground coat এমন হওয়া দরকার, যাতে সে ভালভাবে ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। এই Ground coat-এ সর্বদাই কোবাল্ট ধাতু দেওয়া হয় এবং অতি অল্প পরিমাণেই কাজ হয়। নিকেল ধাতুর দ্বারাও কাজ হয়, তবে সে ক্ষেত্রে পরিমাণ অনেক বেশী লাগে। কিন্তু আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা ঠিক করে বলতে পারেন নি, কেন কোবাল্ট ধাতু দিলে সহজেই এনামেলটি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। যদিও অনেক ব্যাখ্যা আছে, তবুও কোনটিই সম্পূর্ণ নয়। প্রথমে ধাতুটির উপর Ground coat-এর

আস্তরণ দেওয়া হয় এবং পরে এর উপর একটি সুন্দর Cover coat-এর আস্তরণ দেওয়া হয়ে থাকে।

ফ্রিট লাগাবার পর পাত্রটিকে গরম করা হয়, সেই গরম করতে খুব কম সময় লাগে। বিভিন্ন জিনিষের বিভিন্ন তাপমাত্রা থাকে এবং বিভিন্ন সময়ের জন্যে চুল্লীর ভিতর থাকে। এখানে একটি নিদর্শন দেওয়া হলো।

বিভিন্ন ধরণের এনামেল	সময়	তাপমাত্রা
Sheet iron ground coat	২-৮ মিঃ	৮৩০-৯০০° সেঃ
Sheet iron cover coat	২-৭ মিঃ	৭৫০-৮৩০° সেঃ
Cast iron ground coat	১৫-৩০ মিঃ	৮০০-৮৪০° সেঃ
Cast iron cover coat	১৫-৩০ মিঃ	৭৪০-৮২০° সেঃ

এখন এনামেলের কয়েকটি দোষের কথা আলোচনা করা যাক। প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে, বিশুদ্ধ ধাতু সর্বদা ভাল ফল দেবে। দোষ দেখা যায় সাধারণতঃ খারাপ ধাতু, কম পোড়ানো, বেশী পোড়ানো—ইত্যাদির জন্যে। যে সব দোষগুলি দেখা যায় তা হলো Blistering—তার মানে এনামেলের গায়ে গ্যাস বুদ্‌বুদ থাকবে, বহির্ভাগ মসৃণ হবে না, Chipping মানে ধাতু থেকে এনামেল ছেড়ে চলে আসতে চাইবে, Hair lining মানে চুলের মত সরু সরু দাগ দেখা যাবে এনামেলের গায়ে—ইত্যাদি। যখনই কোন দোষ দেখা যাবে, তখনই ভাল করে দেখা উচিত—দোষের উৎসটি কোথায়? অনেক সময় অল্প দোষ দেখা দিলে সেই পাত্রটির উপর এনামেলের আর একটি স্তর লেপন করে দোষ চাপা দেবার চেষ্টা করা হয়। এতে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়, যদিও তাতে এনামেলের স্তরটি বেশী পুরু হয়ে যায়। এখন একটি কথা জানা দরকার যে; এনামেলের স্তরটি যতই পুরু হবে, অর্থনৈতিক দিক থেকে তার দাম ততই কমে যাবে।

বেশীর ভাগ এনামেল লাগানো হয় লোহার পাত্রের উপর। সুতরাং লৌহ শিল্পের উৎকর্ষের উপর এনামেল শিল্প অনেকখানি নির্ভরশীল বলা যেতে পারে এবং লৌহ শিল্প সঙ্কটের মধ্যে পড়লে এনামেল শিল্পকেও ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। বাংলা দেশে বেঙ্গল এনামেল ও সুর এনামেল—এই দুটি প্রসিদ্ধ কারখানা আছে। সুতরাং কোন প্রগতিশীল দেশের, যেমন ভারতবর্ষের, এই শিল্প দিনের পর দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। চতুর্থ পরিকল্পনার পর আমাদের দেশে এই শিল্প খুবই প্রসার লাভ করবে এবং বহু লোককে এই শিল্পে নিয়োগ করবে। এই শিল্প প্রসারের বিশেষ সুযোগ হলো এই যে, এই শিল্পে বৈদেশিক মুদ্রার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশ বর্তমানে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে আমাদের দেশীয় ইঞ্জিনিয়ারেরা অপরের সাহায্য না নিয়েই এই শিল্পের উন্নয়নে সক্ষম। এই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালও আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কেবল বোরাক্স বেশী পাওয়া যায় না।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

জয়ন্ত বসু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

ভাই বাতায়নদা,

তোমার চিঠি পড়ে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র কেমন ভাবে কাজ করে কিছুটা বুঝেছি। অবশ্য, প্রথমবার পড়ে অল্পই বোঝা গেছল, বারবার পড়তে পড়তে ক্রমশঃ ব্যাপারটা খোলাসা হচ্ছে। যেন আমার অজ্ঞানতার মেঘের পর মেঘ জমে আছে—এক একবার চিঠি পড়ি, আর এক একটা মেঘ কেটে যায়, আলোর আভাস খানিকটা বাড়ে

কিন্তু আলোর স্বাদ পেলেই আরো আলো পাবার ইচ্ছা জাগে। তোমার কাছে আমার তাই আরো প্রশ্ন আছে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অণু-পরমাণুরূপ লিলিপুটিয়ানদের জগতের কথা জানতে পারা যায় বুঝলাম, কিন্তু বিজ্ঞানীরা তো আগেই এ সব জগতের খবর রাখতেন ; ঐ যন্ত্রের সাহায্যে নতুন কিছু কি তাঁরা জানতে পেরেছেন ? আর যদি জেনে থাকেন, মানুষের কাজে লাগে কি সেই জ্ঞান ?

ইতি—

বোলপুর — তোমার স্নেহের

২৬।৮।৬৫ — বোল্‌তা

(৬)

কল্যাণীয়াসু,

...বোলপুরের বোল্‌তা দেখছি আজকাল শুধু প্রশ্নের হুলই ফোটাচ্ছে না, তার মুখেও বেশ বোল্‌চাল ফুটেছে—অজ্ঞানতা, মেঘ, আরো কত কী!

যাহোক তোমার কৌতূহল আমার ভাল লেগেছে। আর তার পুরস্কার হিসাবে তোমার প্রশ্নের উত্তর এখন তোমায় উপহার দেব।

ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে জীব ও জড়, দুই জগতের সম্পর্কেই বিজ্ঞানীরা অনেক নতুন কথা জানতে পেরেছেন।

জৈবিক বস্তুর ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হলেন মার্টন, যিনি ১৯৩২ সালে ব্রুসেল্‌সে এই বিষয়ে কাজ সুরু করেন।

যে জীবের মধ্যে জটিলতা সবচেয়ে কম, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যাকে যোগসূত্র বলা চলে, তার নাম হলো ভাইরাস। স্বাস্থ্যবিদ্যার ক্লাসে হয়তো এর নাম শুনে থাকবে ! না শুনলেও নিশ্চয় ডাক্তারবাবুদের মুখে শুনেছ। কারণ, নানা অসুখের—যেমন ধরো ইনফ্লুয়েঞ্জা, কোলাই, বসন্ত, পোলিও, জলাতঙ্ক ইত্যাদি—যাদের ব্যাক্‌টিরিয়া বা জীবাণু শক্তিশালী আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখতে পাওয়া যায় না, তাদের মূলে রয়েছে ব্যাক্‌টিরিয়ার চেয়েও ছোট এই ভাইরাস। এদের দ্বারা শুধু যে প্রাণীদেহ আক্রান্ত হয় তা নয় ; ব্যাক্‌টিরিয়োফাজ নামে এমন সব ভাইরাস আছে, যাদের দ্বারা ব্যাক্‌টিরিয়াও আক্রান্ত হয়। এই যে ভাইরাস, ই-অ যন্ত্রের সাহায্যেই কেবল এদের দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তোমাকে এই সঙ্গে যে ছবিগুলি পাঠাচ্ছি, তাদের মধ্যে ৯ ও ১০ নং চিত্রে ই-অ যন্ত্রে তোলা ভাইরাসের ছবি দেখতে পাবে। ভাইরাস নানান আকৃতি ও আয়তনের হতে পারে। সবচেয়ে ছোটগুলির ব্যাস মাত্র ১৫০ অ্যাংস্ট্রমের মত অর্থাৎ আয়তনে এরা কোন কোন অণুর চেয়েও

ছোট। ভাইরাস কেমন দেখতে, শুধু তাই নয় —এদের চালচলন কেমন, কত তাড়াতাড়ি এরা বংশবিস্তার করে, কী করেই বা এই বংশবিস্তারের প্রতিরোধ সম্ভব, এই সব বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে জানা গেছে।

নানারকম রাসায়নিক পদার্থ ও ঔষধের সংস্পর্শে ব্যাক্টিরিয়া ও ভাইরাসের দেহের গঠনে কী পরিবর্তন হয়, সে সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর ই-অ যন্ত্র আমাদের জানিয়েছে। কীট-পতঙ্গের দেহের অনেক সূক্ষ্ম অংশের কথাও আমরা এই যন্ত্রের সাহায্যে জানতে পেরেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রজাপতির ডানার রামধনু-রঙা আঁশের কথা

প্রাণীর দেহযন্ত্রের কয়েকটি অংশ, যেমন পেশী, স্নায়ু বা মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র কোষাদি এই সব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আজও অত্যন্ত সীমিত। সেই জ্ঞানকে বাড়ানোর কাজে ই-অ যন্ত্রের বহুল ব্যবহার করা হয়েছে ও হচ্ছে। এদের আণবিক গঠন না হলেও অতি-আণবিক গঠন ও তাদের বৈশিষ্ট্যের বিষয় কিছু কিছু জানা গেছে এবং আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আমরা ও বিষয়ে আরো পরিষ্কারভাবে জানতে পারবো।
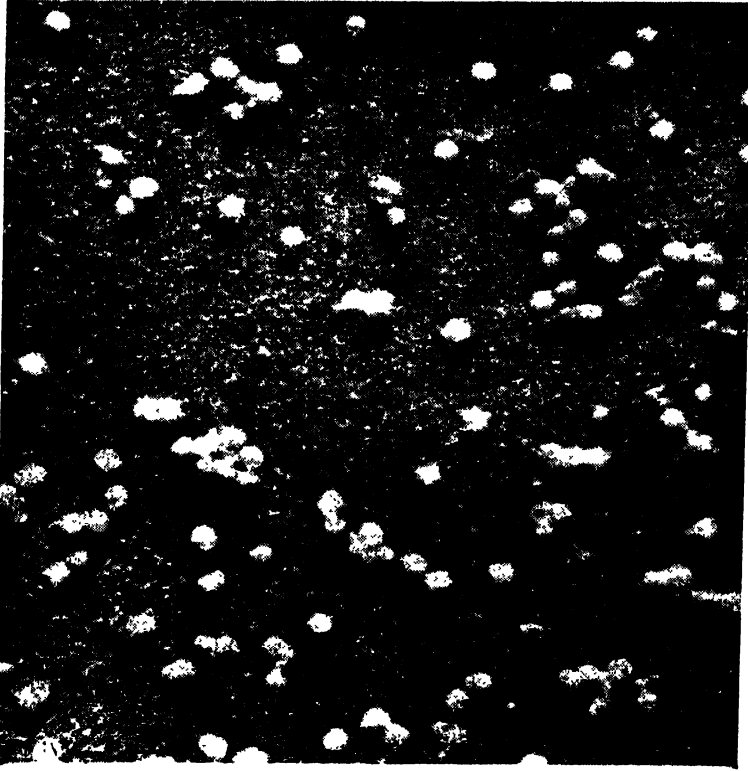
৯নং চিত্র

ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। এদের অধিকাংশই গোলাকৃতি।

(পরিবর্ধনের মাত্রা = ৪০,০০০)

এই প্রসঙ্গে তোমায় সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণার কথা জানাচ্ছি। বিজ্ঞানীদের এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল, প্রাণিদেহের মস্তিষ্কে সব কোষই এক ধরণের—যারা প্রয়োজন মত দেহের বিভিন্ন

অংশে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত প্রেরণ করে। সম্প্রতি লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অক্টোপাসের মস্তিষ্ক সংক্রান্ত যে গবেষণা-হয়েছে, তাতে মনে হয়, প্রাণিদেহের মস্তিষ্কে আর এক ধরণের কোষও আছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মস্তিষ্ক যখন জানে যে, দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক এমন কোন নির্দেশ সঙ্কেত বহন করছে, তখন ঐ দ্বিতীয় ধরণের কোষ থেকে একটি বিশেষ এন্‌জাইম নিঃসৃত হয়ে সেই সঙ্কেতের গতি রোধ করে। এই যে দু'ধরণের কোষ, এদের গঠনের সূক্ষ্ম পার্থক্য ধরা সম্ভব হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে।

প্রাণিদেহের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, বিশেষতঃ প্রোটিন সম্পর্কে অনেক নতুন কথা ই-অ যন্ত্র আমাদের জানিয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রোটিনের অপেক্ষাকৃত বড় অণুগুলি ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পাওয়া যায়। এর আগে কখনো অণুকে সরাসরি দেখার কথা চিন্তাই করা হতো না।

প্রাণীর প্রজনন-কোষের আভ্যন্তরীণ পদার্থগুলির উপর গবেষণাতে সহায়তা করছে ই-অ যন্ত্র। আমাদের সায়েন্স কলেজের সাহা ইন্‌স্টিটুটের অধ্যাপক নীরজনাথ দাশগুপ্ত ও তাঁর সহকর্মীরা প্রজনন-কোষের অন্যতম পদার্থ DNA সম্পর্কে যে মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন, গত ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ ইন্‌স্টিটুটে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সেগুলি বর্ণনা করা হয়।

তোমাকে আগেই বলেছি যে, ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে জড়জগতের অন্তর্লোকেও বিজ্ঞানীদের
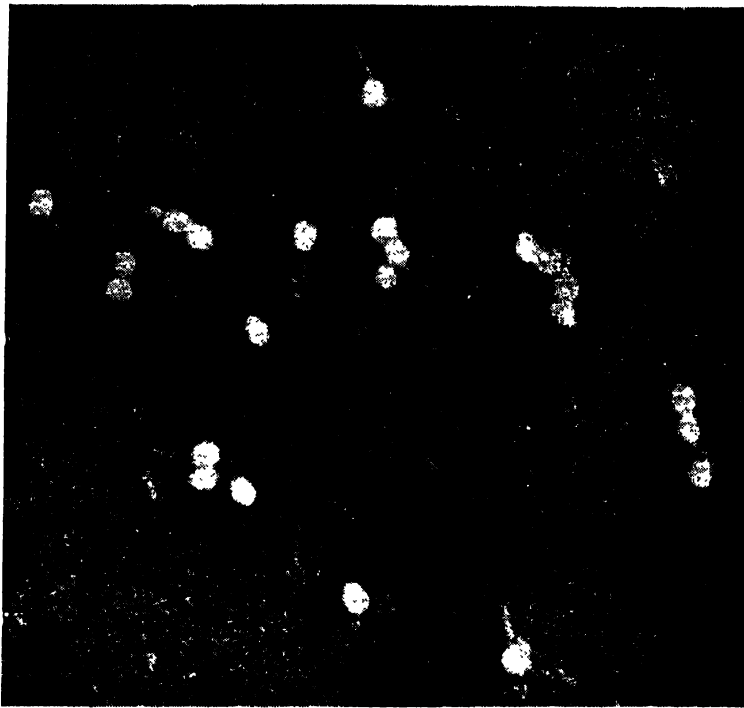
১০নং চিত্র

কোলাই-ভাইরাস। এদের দেহ গোলাকার, তবে প্রায় প্রত্যেকেরই সাধারণতঃ একটি লম্বা লেজ থাকে। (পরিবর্ধনের মাত্রা – ১০,০০০)

দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে। বিশেষ করে রসায়ন ও ধাতুবিদ্যা এর প্রসাদে পরিপুষ্ট হয়ে উঠছে।

রসায়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি আশ্চর্য আবিষ্কার হয়েছে ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে হারানো সূক্ষ্ম যোগ-সূত্রের উদ্ধার করে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে রসায়নের গবেষণাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা চলে :

১। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পরীক্ষা—রসায়নে ই-অ যন্ত্রের এইটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, আলোকচিত্রের ফিল্মকে ডেভেলপ করে যে নেগেটিভ তৈরি করা হয়, সেই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন অনুঘটক কীভাবে কাজ করে, সিমেন্ট কেমন করে আস্তে আস্তে জমে যায়—এই রকম নানা ধরণের প্রশ্নের উত্তরও জানা সম্ভব হচ্ছে।

২। সেলুলোজ, ভাল্‌ক্যানাইজ-করা রবার প্রভৃতি যে সব বস্তুর গঠনে খানিকটা শৃঙ্খলা আছে, তাদের গঠন-বৈচিত্র্যের নির্ণয়।

৩। কঠিন অবস্থার বস্তুকণিকার আকার ও আয়তনের নির্ধারণ। কার্বন, ছাপাখানার কালির রঞ্জক (Pigment), কাদামাটি প্রভৃতি হরেক রকম বস্তুর কণিকা ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষিত হয়েছে। শিল্পপ্রধান সহরের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে ধূলা ও ধোঁয়ার কণিকাও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

এবার ধাতুবিদ্যার পক্ষ থেকে ই-অ যন্ত্রের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা।

ধাতব পদার্থের আণবিক গঠন কতখানি সুসংবদ্ধ, কোন্ প্রক্রিয়ায় তার মধ্যে কেমনধারা অসংলগ্নতার সৃষ্টি হয়, ই-অ যন্ত্রের সাহায্যে এই সব বিষয় অনুসন্ধান করা হচ্ছে। বহু ধাতব সঙ্করের আভ্যন্তরীণ গঠন, বিশেষতঃ তাদের ভঙ্গুরতার কারণ নির্ণয় করায় এই যন্ত্র-বিজ্ঞানীদের সাহায্য করছে।

ধাতুকে পালিশ ও চিত্রিত করার জন্যে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে, ই-অ যন্ত্রের পরীক্ষার ফলে তাদের সীমাবদ্ধতার কথা জানতে পারা গেছে।

দু'টি ধাতব পদার্থের মধ্যে সংযোগ-প্রক্রিয়া অনুধাবন করার জন্যে ই-অ যন্ত্রের ভিতরেই অনেক সময় একটি ছোট্ট ওয়ার্কশপ্-এর ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যুজ্জনিত উত্তাপে পদার্থ দুটির সংযোগ ঘটে ও ঐ প্রক্রিয়া কেমন কার্যকরী হচ্ছে, বাইরে টেলিভিসনের পর্দায় তা সঙ্গে সঙ্গে দেখার ব্যবস্থা থাকে।

আমাদের দেশে ই-অ যন্ত্রের এপর্যন্ত যা ব্যবহার হয়েছে, তা প্রধানতঃ কেবল জীববিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং যে যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, দুঃখের বিষয়, সেগুলি সবই বিদেশে তৈরী। আমাদের দেশে এখনো কোন ই-অ যন্ত্র তৈরি হয় নি, তৈরি করার কোন পরিকল্পনা আছে বলেও আমার জানা নেই। আমরা একান্ত-ভাবে আশা পোষণ করি যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশেও এই যন্ত্র তৈরি হবে এবং শুধু জীববিদ্যা ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের বিজ্ঞানীরা এই যন্ত্রের প্রয়োগ করবেন।

এই আশা পোষণ করার যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে অবশ্য অনেক কথা বলার আছে। সেই সব কথা কলমের মুখে আসার আগেই চিঠির মুখটা আজকের মত বন্ধ করে দিচ্ছি। ইতি—

কলকাতা তোমার বাতায়নদা
২৯।১।৬৫

(৭)

ভাই বাতায়নদা,

ই অ যন্ত্র সম্পর্কে আর একটি প্রশ্ন করার আছে। উদ্ভিদবিদ্যার ক্লাসে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার জন্যে উদ্ভিদের নানান অংশের আমরা নমুনা তৈরি করি খুব পাতলা করে কেটে। ঐ করতে গিয়ে আমার হাতও কেটেছে দু'চারবার। ই-অ

যন্ত্রে দ্রষ্টব্য নমুনাও কি একইভাবে তৈরি করতে হয়? না জানি কতবার হাত কাটে তাহলে?

........ইতি—

বোলপুর তোমার স্নেহের
৬।১।১৯৬৫ বোলতা

(৮)

কল্যাণীয়াসু,

........তুমি ঠিকই ধরেছ যে, ই-অ যন্ত্রে দেখার জন্য দ্রষ্টব্য বস্তুটিকে খুবই পাতলা করা দরকার। এত পাতলা যে, সাধারণতঃ কয়েক লক্ষ ঐ রকম বস্তু উপর উপর রাখলে মাত্র এক ইঞ্চি পুরু হবে। এত পাতলা করার কারণ, ইলেকট্রনরা ওর একদিকে প্রবেশ করলে অন্যদিকে যাতে নির্গত হতে পারে। ই-অ যন্ত্রে বস্তুটির যে ছবি পাওয়া যাবে, তার অর্থোদ্ধার করার জন্যেও বস্তুটির পাতলা হওয়া দরকার। এছাড়া যন্ত্রের বায়ুশূন্যতায় বস্তুটির যাতে ক্ষতি না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়।

এই যে দ্রষ্টব্য বস্তুর কথা বলছি, এটি হলো —বিজ্ঞানীরা যা পরীক্ষা করতে ইচ্ছুক, তা সে জৈব বা জড় যাই হোক, তাথেকে উপযুক্তভাবে তৈরি একটি নমুনা। এই নমুনা তৈরি করার জন্যে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। একথা বলা চলে যে নমুনা করার পদ্ধতিতে যেমন যেমন উন্নতি হয়েছে ই-অ যন্ত্রের প্রয়োগের ক্ষেত্রও তেমন বিস্তৃততর হয়েছে।

১১নং চিত্র

ঠাণ্ডায় জমানো তরল পদার্থের উপরের বরফের কেলাস থেকে ছাঁচ তুলে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে সেই ছাঁচের ছবি।

(1μ = ০'০০০০০১ মিটার = ০'০০১ মিলিমিটার)

নমুনা তৈরি করার তিন ধরণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তোমাদের আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের

জন্যে যেমন পাত্‌লা করে নমুনা তৈরি কর, ই-অ যন্ত্রের জন্যে তেমনি কাঠ, রবার, প্রাণিদেহের স্নায়ু, প্রভৃতি কঠিন পদার্থ থেকে পাত্‌লা অংশ কাটা হয়। তবে এই পাত্‌লা অংশ হাত দিয়ে কাটা সম্ভব নয়, মাইক্রোটোম নামে একটি যন্ত্রের সাহায্য এই উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালে পীজ ও বেকার তখনকার দিনে প্রচলিত মাইক্রোটোম যন্ত্রের প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তন করে ই-অ যন্ত্রের উপযোগী নমুনা তৈরি করার জন্যে সর্বপ্রথম এই যন্ত্রের ব্যবহারে সক্ষম হন। মাইক্রোটোম যন্ত্রে সাধারণতঃ ভাঙ্গা কাচ বা পালিশ-করা হীরা ছুরির কাজ করে। যন্ত্রটির সাহায্যে এমন পাত্‌লা নমুনা তৈরি করা যায় যে, তা মাত্র কয়েক শ' অ্যাংস্ট্রম পুরু।

দ্বিতীয়তঃ, খুব পাত্‌লা কোন আস্তরণের উপর পরীক্ষাধীন বস্তুর ক্ষুদ্র কণিকা জমা করে নমুনা তৈরি করা হয়। ভাইরাস, প্রাণিদেহের পেশীর অংশবিশেষ, কালির রঞ্জক প্রভৃতি পরীক্ষার জন্যে এই পদ্ধতির প্রয়োগ আছে।

তৃতীয়তঃ, পরীক্ষাধীন বস্তুর বহির্ভাগের ছাঁচ তুলে সেই ছাঁচকে নমুনা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই বস্তু নানারকম হতে পারে; যথা—চিত্রিত ধাতুপৃষ্ঠ, দন্ত বা অস্থি, প্লাস্টিকের তন্তু, প্রোটিনের কেলাস ইত্যাদি। একটি তরল পদার্থকে ঠাণ্ডায় জমিয়ে তার উপরের বরফের কেলাস থেকে ছাঁচ তুলে ও সেই ছাঁচকে ই-অ যন্ত্রে নমুনা হিসাবে ব্যবহার করে যে ছবি পাওয়া গেছে, ১১নং চিত্রে তাই দেখানো হয়েছে। নমুনা হিসাবে ব্যবহারের জন্যে যে সব ছাঁচ তোলা হয়, সেগুলি সাধারণতঃ পুরু হয় মাত্র ৫০০ থেকে ১৫০০ অ্যাংস্ট্রম পর্যন্ত এবং তাদের একদিকে পরীক্ষাধীন বস্তুর বহির্ভাগের গঠন-বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাঁচ সেলুলোজ নাইট্রেট বা ফর্মভার নামক একটি প্লাস্টিকের তৈরি। ছাঁচকে যখন আরো শক্ত ও স্থায়ী করার প্রয়োজন, তখন এটি কার্বন দ্বারা গঠিত হয়। ধাতুপৃষ্ঠের ছাঁচ তৈরি করার জন্যে প্রায়ই যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাকে অক্সাইড-করণ পদ্ধতি বলে। ধাতুপৃষ্ঠকে প্রথমে ধাতুর অক্সাইড-এ পরিণত করে তারপর তার নীচের ধাতুকে গলিয়ে ফেললে উপরে যে অক্সাইড-এর আস্তরণটি থেকে যায়, সেটি খুব ভাল ছাঁচের কাজ করে।

পরীক্ষাধীন বস্তুর নমুনা যে ভাবেই তৈরি হোক, সব রকম নমুনাকেই একটি শক্ত অথচ পাত্‌লা আস্তরণের উপর রাখতে হয়। এটিকে শক্ত হতে হয়, যাতে ইলেকট্রনদের আঘাত এ সহ্য করতে পারে। আর পাত্‌লা হতে হয়, যাতে ইলেকট্রনরা সহজেই এর মধ্য দিয়ে যেতে পারে। এই আস্তরণ হাল্‌কা পরমাণু দিয়ে তৈরি ও পুরু খুব বেশি হলে ২০০ অ্যাংস্ট্রম। ছাঁচের মত এই আস্তরণের জন্যেও যা ব্যবহৃত হয়, তা হলো সেলুলোজ নাইট্রেট বা ফর্মভার বা বেশি মজবুত করতে হলে, কার্বন। বায়ু-শূন্য স্থানে বিদ্যুতের সাহায্যে কার্বনকে উত্তপ্ত করলে বাষ্পীভূত কার্বন জমা হয়ে এই আস্তরণটি গড়ে ওঠে। মাত্র ৫০ অ্যাংস্ট্রম পুরু কার্বনের আস্তরণেরও প্রয়োগ হয়েছে।

যাহোক, এই আস্তরণকেও সাধারণতঃ আবার একটি সূক্ষ্ম ধাতব জালের উপর রাখা হয়, আস্তরণটি যাতে আরো জোর পায় ও তাকে নড়ানোচড়ানো যাতে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।

ই-অ যন্ত্রে দ্রষ্টব্য বস্তুর যে পরিবর্ধিত প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাতে সাদা-কালোর বৈষম্য বাড়ানোর জন্যে নমুনা তৈরি করার সময় কখনো কখনো 'ছায়া-ফেলার পদ্ধতি' নামে একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ১৯৪৫ সালে উইলিয়াম্‌স ও ভাইকফ এই পদ্ধতিটির প্রচলন করেন। বায়ুশূন্য পাত্রে উত্তপ্ত টাংস্টেনের তারের কুণ্ডলীর মধ্যে রক্ষিত ইউরেনিয়াম, প্লাটিনাম, ক্রোমিয়াম বা ঐ

জাতীয় ভারী পরমাণুর কোন একটির উৎস থেকে বক্রভাবে নমুনাটির উপরিভাগে পরমাণু বর্ষণ করে (১২নং চিত্র) নমুনাটির উপর ঐ পরমাণুর এমন একটি পাত্‌লা স্তর গড়ে তোলা হয়, যাতে নমুনার উপরিতলের উচ্চ অংশগুলির ছায়া থেকে যায়। ঐ অংশগুলি যত উচ্চ হয়, ছায়াও দীর্ঘ হয় তত—অনেকটা অস্তগামী সূর্যের আলোয় ভূপৃষ্ঠের উচ্চ অংশগুলির ছায়ার মত। এখন নমুনাটিকে ই-অ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে রঞ্জন পদ্ধতি' নামে আর একটি পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বৈষম্য বাড়ানো হয় নমুনার সঙ্গে নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের সংযোগ করে। মানুষের রক্তের লোহিত কণিকার অণু—যেগুলি আকারে মাত্র ৫০ অ্যাংস্ট্রমের মত, —তাদের ই-অ যন্ত্রে পরীক্ষা করার জন্যে আমাদের সায়েন্স কলেজের সাহা ইন্‌স্টিটিউটে ছায়া-ফেলার পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে নেগেটিভ রঞ্জন পদ্ধতিরও ব্যাপক ব্যবহার সুরু হয়েছে।
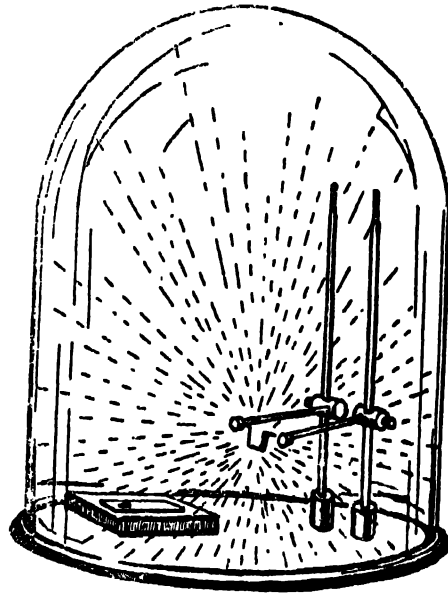
১২নং চিত্র

ছায়া ফেলার পদ্ধতি

আলোকচিত্রের নেগেটিভে কালো পশ্চাৎপটে উচ্চ অংশের ছায়াগুলি সাদা চিহ্নরূপে দেখা দেবে। সুতরাং বুঝতে পারছো, ছায়া ফেলার পদ্ধতিতে শুধু যে প্রতিবিম্বের সাদা-কালোর বৈষম্য বাড়ে, তাই নয়, দ্রষ্টব্য বস্তুর উপরিভাগের উচ্চ অংশগুলির উচ্চতাও জানা যায়।

দ্রষ্টব্য বস্তুর প্রতিবিম্বে সাদা-কালোর বৈষম্য বাড়িয়ে তোলার জন্যে সাম্প্রতিক কালে 'নেগেটিভ

এইবার, বোল্‌তা, নমুনা-সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন তোমার কাছে আমার করার আছে। শান্তি-নিকেতনে পৌষ উৎসবের সময় তোমাদের ওখানে যাব বলে ভাবছি। তখন তোমার রন্ধননিপুণতার নমুনা কিছু পাওয়া যাবে তো? ইতি—

কলকাতা
২।১২।৬৫

তোমার বাতায়নদা

ছোট ছোট নার্শারী প্রস্তুতের পরিকল্পনা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

স্থান, মাটি ও জমির আয়তন

ফলের গাছ হইতে কলম, গুটি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে একটি নার্শারী স্থাপন করা উচিত; নার্শারীর স্থান নির্বাচনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। সর্বপ্রথমেই দেখিতে হইবে যে, নির্বাচিত স্থানের অতি নিকটে বিভিন্ন রকম ফলের কোন ভাল বাগান আছে কি না এবং সেই বাগানের ফলের গাছগুলির ফল কেমন? কেন না, এই বাগানের ফলের গাছগুলি হইতেই কলম প্রস্তুত করিয়া উহাদের প্রচলন করাই বাঞ্ছনীয় হইবে। অজানা এবং আজেবাজে গাছ হইতে কলম প্রস্তুত করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। যে গাছ হইতে কলম প্রস্তুত হইবে, তাহা সেই শ্রেণীর গাছের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হওয়া দরকার। ইহাতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কলম পাওয়া যাইবে এবং নার্শারীর সুনাম ও জনসাধারণের নার্শারীর প্রতি বিশ্বাস বাড়িবে।

নার্শারীর জমির মাটি এঁটেল ও বেলে হইলে চলিবে না। দোআঁশ মাটিই নার্শারীর পক্ষে একমাত্র উপযুক্ত। নার্শারীতে সারা বৎসর জল সেচনের সুবিধা থাকা চাই।

এক একর (৮০×৮০ হাত বিঘার তিন বিঘা) জমি একটি ছোট নার্শারী প্রস্তুতের পক্ষে যথেষ্ট। প্রথমে ইহা অপেক্ষা বেশী জমিতে নার্শারী স্থাপন না করাই ভাল। যদি একান্তই বেশী জমিতে নার্শারী প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে বিশেষজ্ঞের সাহায্য লওয়া উচিত।

ঘর, বাড়ী, বেড়া ইত্যাদি

বেড়া—ছাড়া গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি হইতে নার্শারীর গাছ রক্ষা করিবার জন্য নার্শারীর চারিদিকে বেড়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আজকাল এক একর জমিতে বেড়া দেওয়ার জন্য যে পরিমাণ লোহার তারের দরকার, তাহা কেনা খুবই কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং নার্শারীর চারিদিকে গাছের বেড়া দিতে পারিলে খরচ খুবই কম হইবে, তবে বেড়া খুব ভাল ভাবে দিতে হইবে। ডুরানটা, মেহেদি, এগেভ এমেরিকানা প্রভৃতি গাছের দ্বারা বেড়া দিতে পারা যায়।

মালীদিগের থাকিবার ঘর—খড়ের ছাউনি-যুক্ত কাঁচা ঘর মালীদিগের বাসের জন্য নির্মাণ করিলেই চলিবে।

গুদাম—করগেট টিনের ছাদযুক্ত, ভিৎ পাকা ও উপরের দিকে কাঁচা একটি ঘরে নার্শারীর যন্ত্রপাতি, সার প্রভৃতি নিরাপদে রাখা যাইতে পারে।

গাছের টব রাখিবার ছাউনিযুক্ত ঘর—এই ঘর কিরূপ হইবে, তাহা নিম্নের নক্সায় ভালভাবে বুঝা যাইবে। টবে রক্ষিত কলমগুলি বন্যার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য খড়ের ছাউনিযুক্ত অল্প মূল্যের ঘর নার্শারির পক্ষে অপরিহার্য (১নং চিত্র):—

(ক) দেওয়াল ৪ ফুট উঁচু এবং প্রায় ৫ ইঞ্চি চওড়া। (খ) খুঁটির অবস্থিতি। (গ) জমি হইতে এক ফুট উঁচু ইটের মেঝে।

পাতা পচার গর্ত—এগুলি ঘর নহে, কিন্তু নার্শারীতে ইহাদের প্রয়োজন কোন অংশে কম নহে। প্রত্যেক নার্শারীতে প্রচুর পরিমাণ পচা-পাতা সারের ব্যবস্থা থাকা চাই এবং এই সার গর্তে প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রত্যেক

নার্শারীতে এই রকমের দুইটি গর্ত রাখিতে হইবে। এই গর্ত ২০ ফুট × ৫ ফুট গভীর হইবে। যখন একটি গর্তের সার ব্যবহার করা হইবে, তখন অন্য গর্তে সার প্রস্তুত হইতে থাকিবে।

(১১) জল সেচনের ছোট ঝাঁঝরি ৪
(১২) পিচকারী ১
(১৩) জল ছিটাইবার ষ্টিরাপ পাম্প
(১৪) বালতী
(১৫) মাটি প্রভৃতি ফেলিবার পাত্র (বাঁশের

১নং চিত্র।

যন্ত্রপাতি

(১) সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী কোদাল ৬
(২) খুরপি সংযুক্ত কোদাল (Fork) ৪
(৩) খুরপি ১২
(৪) নিড়ানী ৬
(৫) কুঁড়ি বাহির করিবার ছুরি (Budding knife) ৪
(৬) কলম তৈয়ারী করিবার ছুরি (Grafting knife) ৬
(৭) গাছের ডালপালা ছাঁটিবার ছুরি (Prunning knife) ৬-৮
(৮) কাস্তে ১
(৯) কাঁচি ২
(১০) জল সেচনের বড় ঝাঁঝরি ৬

সহিত লাগান বাক্স ব্যবহার করা যাইতে পারে) ১
(১৬) কুড়ালী ১
(১৭) মাটির টব ১,০০০
(১৮) চিহ্নিত করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেবেল ১,০০০
(১৯) মোম ও কলাগাছের ছোবড়া (প্রয়োজন মত)

নার্শারী পরিচালনা করিবার জন্য লোকজন

ছোট ছোট নার্শারীর পক্ষে চারজন মালী হইলেই চলিবে। ইহা ছাড়া বৎসরের প্রায় সব সময় মজুর নিযুক্ত করিতে হইবে; কিন্তু মজুরের সংখ্যা বর্ষাকালে বাড়াইতে হইবে, কেন না এই সময়েই নার্শারীর সবচেয়ে বেশী কাজের সময়

নার্শারী পরিচালনা

কলম প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় চারা গাছ ক্রয় করা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, এক হাজার অথবা দুই হাজার আমের কলম প্রস্তুত করিতে হইলে এক হাজার অথবা দুই হাজার এক বৎসর বয়সের আমের চারাগাছ লাগিবে। ইহাদের মূল্য খুবই অধিক হইবে। কিন্তু প্রথম বৎসরে অধিক মূল্য সত্ত্বেও ইহা কিনিতে হইবে। পেয়ারা, লেবু প্রভৃতি ফলের গাছের জন্য প্রথম বৎসর হইতেই ভালভাবে কাজ আরম্ভ করা যায়, কারণ এই সকল গাছের জন্য চারার প্রয়োজন হয় না, "গুটি" বাঁধিয়া এই সকল গাছের কলম করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় বৎসর হইতে প্রত্যেক নার্শারীর কলমের উপযোগী চারাগাছ যথাসময়ে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমের কলমের জন্য বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে কোন জাতের আমের বীজ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ষার প্রারম্ভে বীজগুলি লম্বা লম্বা বীজতলায় ৮ ইঞ্চি হইতে ১ ফুট অন্তর বপন করিতে হইবে। বীজ হইতে চারা বাহির হইলে চারাগাছগুলির বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত। বর্ষাকালে ইহাদের গোড়ায় জল যাহাতে না জমে অথবা গ্রীষ্মকালে রসের অভাবে ইহারা শুকাইয়া না যায় এবং আগাছার দ্বারা চারাগুলির কোন ক্ষতি না হয়—এই সব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দ্বিতীয় বৎসরের বর্ষার সময় চারাগাছ-গুলি কলমের জন্য উপযুক্ত হইবে এবং এই সময় ইহাদের কাণ্ড আঙ্গুলের মত মোটা হইবে। বর্ষা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি টবে বসাইয়া আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে দুই তিন সপ্তাহের জন্য রাখিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে ইহারা টবে ভালভাবে বসিয়া যাইবে। একবার ভাল ভাবে বসিয়া গেলে যে গাছের কলম করিতে হইবে, সেই গাছের নিকট ইহাদিগকে লইয়া যাইতে হইবে। কলম প্রস্তুত হইয়া গেলে টবগুলি পৃথক করিয়া প্রত্যেক টবের গাছে লেবেল দিয়া জন-সাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য রাখিতে হইবে। নার্শারী কর্তৃক বিক্রীত কলম যাহাতে আসল জাতের হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন ব্যক্তি বোম্বাই আমের কলম কিনিয়া বাগানে রোপণ করিয়া ৬।৭ বছর পরে গাছে যখন ফল দেখা দিল তখন তিনি যদি দেখেন যে, ইহা বোম্বাই আম নহে, অন্য আম, তাহা হইলে তিনি কখনও খুশী হইতে পারেন না; উপরন্তু নার্শারীর সুনামেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সুতরাং ভবিষ্যতে এইরূপ কোন গোলমাল না হয়, সেই জন্য প্রত্যেক টবে আলকাত্‌রা দিয়া বিশেষভাবে চিহ্নিত করা উচিত; যেমন—বোম্বাই আমের একটি বিশেষ চিহ্ন থাকিবে (ব), ল্যাংড়া আমের (ল) ইত্যাদি।

এই চিহ্নিত করা কাজটি মূল গাছ হইতে টব সরাইবার পূর্বেই করা উচিত এবং 'ব' 'ল' চিহ্নিত আমের কলম বিক্রয়ের জন্য নার্শারীতে পৃথকভাবে রাখিতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং ইহাতে কোন প্রকার ভুল না হয়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বীজতলা—বীজ অথবা ডগা পুঁতিবার জন্য নার্শারীতে যে বীজতলা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার একটি নক্সা নীচে দেওয়া হইল (২নং চিত্র):—

(ক) বেড়া; জয়ন্তী গাছের বীজ সকল নার্শারীতেই পাওয়া যায়। এক ঋতুতে এই গাছ প্রায় ৬।৭ ফুট লম্বা হয়। জয়ন্তী গাছের বীজ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে লাইনে রোপণ করিতে হইবে। উহারা এক ফুট লম্বা হইলে উহাদের ৩।৪ ইঞ্চি অন্তর পাত্‌লা করিয়া দিতে হইবে। উহাদের ডালপালার বৃদ্ধির জন্য উহারা যাহাতে ঝাড়ালো হইতে পারে, সেই জন্য উহাদের কাঁচি দিয়া ছাটিয়া দেওয়া উচিত। বেড়ার জন্য এই

গাছের লাইনগুলি উত্তর দক্ষিণে লম্বা হওয়া দরকার যাহাতে দিনের মধ্যে কতক সময় বীজতলায় রৌদ্র পড়ে।

(খ) বীজতলা: ৪ ফুট চওড়া রাখিতে হইবে, উহাতে মালীরা গাছগুলির কোনপ্রকার ক্ষতি না করিয়া উভয় দিক হইতে কাজ করিতে পারিবে। উহা জমির লেভেল হইতে ৬ ইঞ্চি উঁচু হইবে।

(গ) টবের কলমের চারাগুলি রাখিবার স্থান; কলমের চারাগাছগুলি বাহিরে আনিয়া বীজতলায় পৃথকভাবে ভালরূপে চিহ্নিত করিয়া রাখিতে ধরিলে গাছের গুণাগুণ ভালভাবে জানা যাইবে। এই গাছের "গুটি" বহু পরিমাণ সংগ্রহ করিয়া দেশে যাহাতে বহুল প্রচলন হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। ইহার চোখ-কলমও করা যায়।

পশ্চিম বাংলার মাটির উপযোগী প্রত্যেক নার্শারীতে বহু রকম গাছের কলম, চারাগাছ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, এলাহাবাদের পেয়ারা, কাশীর পেয়ারা, কাশীর কুল, নারিকেল কুল ইত্যাদি। এই ফলের গাছগুলি বাংলার মাটিতে

২নং চিত্র।

হইবে। গ্রীষ্মকালে জল দেওয়ার সুবিধার জন্য টবগুলি বীজতলায় গভীর ভাবে বসাইয়া দিতে হইবে।

বক্তব্য—পশ্চিম বাংলার মাটি মোসাম্বী কমলালেবুর পক্ষে খুবই উপযুক্ত। কিন্তু একমাত্র বীরভূম প্রভৃতি উঁচু শুক্‌না জেলা ব্যতীত নাগপুরী সান্তারা লেবুর পক্ষে ইহা উপযোগী নয়। প্রত্যেক নার্শারীতে এক বা দুই ডজন মোসাম্বী কমলার গাছ রোপণ করা উচিত। এই গাছগুলিতে চতুর্থ বৎসর হইতে ফল ধরে। একবার ফল খুব ভাল জন্মে। ইহাদের প্রচলন অতি সহজে করা যায় এবং এই সকল ফলের বাজারে খুবই চাহিদা আছে। কিন্তু এই গাছগুলি খুবই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হওয়া চাই, তবেই বাংলার ফলের অবস্থার উন্নতি হইবে। এই সকল গাছের কলম খুব ভাল নার্শারী হইতে সংগ্রহ করা উচিত। সাহারানপুরে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিচালিত বাগান হইতে খুব ভাল কলম পাওয়া যায়। তিন বৎসর পর এই সকল গাছ হইতে কলম প্রস্তুত করা যাইবে।

এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেস

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এবছর (১৯৬৬) জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৩তম বার্ষিক অধিবেশন বসেছিল পাঞ্জাবের নবগঠিত রাজধানী চণ্ডীগড়ে। দীর্ঘ ২১ বছর পরে পঞ্চনদের দেশে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন আয়োজিত হয়েছিল এবার। ইতিপূর্বে ১৯৩৯ সালে অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সর্বশেষ অধিবেশন হয়েছিল। এই দীর্ঘ ২১ বছরের ব্যবধানে ভারতে রাজনৈতিক মঞ্চে এক বিরাট পট পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেদিনের পরাধীন দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলা দেশ হয়ে গেছে দ্বিখণ্ডিত। তার ফলে ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজধানী হারিয়ে পাঞ্জাবকে নতুন করে রাজধানী গড়ে তুলতে হয়েছে। তাই এই নবগঠিত রাজধানী চণ্ডীগড়ে এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন আয়োজিত হওয়ায় আমরা বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের স্বাভাবিক প্রেরণা বোধের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবের প্রাণকেন্দ্র দর্শনের একটা অতিরিক্ত আকর্ষণও অনুভব করেছিলুম মনে মনে।

কলকাতা থেকে আমরা এক বিরাট প্রতিনিধি-দল ৩১শে ডিসেম্বর রওনা হয়ে দোসরা জানুয়ারীর ভোরে চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করি। স্টেশনে স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতির প্রাথমিক অভ্যর্থনার পর তাঁদের নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হোস্টেলে আমরা গমন করলুম আশ্রয় নিতে। সেদিন প্রতিনিধিদের বিশেষ কোন কর্মসূচী না থাকায় মধ্যাহ্ন আহার ও বিশ্রামের পর আমরা অনেকে শহর পরিদর্শনে বেরিয়েছিলাম।

তেসরা জানুয়ারী সকালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে সুপ্রশস্ত মণ্ডপে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, উপাচার্য, তথা—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি, শাখা-সভাপতি এবং পরিচালক সমিতির সদস্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন শোভাযাত্রা সহকারে মণ্ডপে প্রবেশ করেন। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের সঙ্গে অনুষ্ঠানের সূচনা হলো। প্রথমে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন রাজ্যপাল আচার্য সর্দার উজ্জ্বল সিং এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন অভ্যর্থনা সমিতির উপাচার্য শ্রীসুরজ ভান।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে প্রতি বছরই বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানীরা যোগদান করে থাকেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এবারের অধিবেশনে সর্বসমেত ৩৩ জন বিদেশী বিজ্ঞানী এসেছিলেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ডঃ আত্মারাম তাঁদের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁরা একে একে উঠে এসে রাষ্ট্রপতি ও মূল সভাপতি অধ্যাপক বি এন. প্রসাদের সঙ্গে করমর্দন করেন। অষ্ট্রেলিয়া থেকে এসেছিলেন অধ্যাপক ফেলিক্স গুটম্যান, অষ্ট্রিয়া থেকে ডঃ এমিল ব্রাইটিঙ্গার, সিংহল থেকে ডঃ কানিদা মহাদেব এবং শ্রী ডি. ভি লিয়ানাগে, চেকোশ্লো-ভাকিয়া থেকে অধ্যাপক ইয়াক্সলভ্ প্লুহার এবং অধ্যাপক ক্যারল সিস্কা, ডেনমার্ক থেকে অধ্যাপক সি. মেলার, জার্মান ফেডারেল রিপাব-লিক থেকে অধ্যাপক জে অ্যাসফ্, হাঙ্গেরী থেকে অ্যালবার্ট কোনিয়া এবং অধ্যাপক লেনার্ড পাল, জাপান থেকে অধ্যাপক ফুজিও এগামী

এবং অধ্যাপক জামুস্কিরা মিউরা ও নরওয়ে থেকে অধ্যাপক জর্জ ভালার, পোল্যাণ্ড থেকে অধ্যাপক আই. মালেস্কি এবং অধ্যাপক কে. স্মুলিকস্কি, রুমানিয়া থেকে অধ্যাপক ভির্জিল ভাৎইয়ান এবং অধ্যাপক ভালার নোভাকু, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র থেকে অধ্যাপক সহীদ রামাদাস হামারী, যুক্তরাজ্য থেকে অধ্যাপক পি এম. এস. ব্ল্যাকেট, ডাঃ ই. এন. উইলমার এবং অধ্যাপক

এবারের অধিবেশন উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, 'বিজ্ঞান কেবলমাত্র একটা কৌশল বা পদ্ধতি নয়, বিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান। বিজ্ঞান হচ্ছে কোন বিষয়কে ভালভাবে জানা। বিজ্ঞান মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করে এবং মানুষের মধ্যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী এনে দেয়। সত্যানুসন্ধানই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। বর্তমানে বিজ্ঞান অধিকতর

১নং চিত্র

বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ, মূল সভাপতি অধ্যাপক বি এন. প্রসাদ এবং উপাচার্য শ্রীসুবজ ভান

ডি. লুইস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডাঃ রবলে উইলিয়ামস্ এবং অধ্যাপক জে. রুড নেলসেন এবং সোভিয়েট রাশিয়া থেকে আকাদেমিশিয়ান য়ুবেয়াই এরিকোভিচ এরিকভ, আকাদেমিশিয়ান ভি. এ. ফক, আকাদেমিশিয়ান এ এ. এবার্সকস্কি, অধ্যাপক ভি. এল. সিলিন, অধ্যাপক ফিয়েৎকনস্কি, অধ্যাপক গ্রিজায়েন্কা, অধ্যাপক মাৎ-ভেইয়েভ, অধ্যাপক এন. কস্ত, মিঃ ইভান গ্রাস্কি এবং মিঃ ভলাদিমির তাচেন্কা।

মাত্রায় আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে। পরমাণুশক্তি ও মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত উন্নতির ফলে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই কেবলমাত্র একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করা একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে বিজ্ঞান-চর্চা বহুদিন ধরেই হচ্ছে, কিন্তু এখন এর রূপের পরিবর্তন ঘটেছে। দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কাজে বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ একান্ত

আবশ্যক। সেই সঙ্গে জগতে ভুল বোঝাবুঝি ও ঘৃণা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতিকল্পে আন্তর্জাতিক সহযোগিতারও বিশেষ প্রয়োজন।'

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি অধ্যাপক প্রসাদ তাঁর ভাষণটিকে দুটি অংশে ভাগ করেন। প্রথম অংশে তিনি সাধারণভাবে ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার বিষয় আলোচনা করেন। এই অংশে তিনি ভারতে বিজ্ঞান-প্রগতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং জাতীয় গবেষণাগার ইত্যাদি স্থাপনার দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথকে প্রশস্ত করা হয়েছে, তাতে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি প্রশ্ন তোলেন—'এই সব পরিকল্পনা থেকে আমরা ন্যায্যত: উচ্চমানের প্রতিদান পাচ্ছি কিনা এবং এই পরিকল্পনাগুলি যথোপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত হয়েছে কিনা?' তিনি বলেন—'এই উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে হলে গবেষণার সর্বস্তরে অর্থাৎ তত্ত্বীয়, ফলিত এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হচ্ছে তরুণ-তরুণীদের প্রধান উৎস, যেখানে স্নাতকোত্তর শিক্ষার পর তারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করে। একারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সুযোগ্যভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত।' এজন্যে তিনি প্রস্তাব করেন, এমন ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে নির্বাচন করা উচিত, যিনি হবেন একাধারে প্রগাঢ় জ্ঞানী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, আদর্শব্রতী, দক্ষ প্রশাসক, তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ী রাজনীতিমুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নয়নে দৃঢ় আস্থাবান। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই নির্বাচিত হওয়া উচিত।

এদেশের একশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্যে বিদেশে ছোটবার যে নেশা দেখা দিয়েছে, তা রোধের জন্যে অধ্যাপক প্রসাদ সুপারিশ করেন। ভারতে বেশ কিছুসংখ্যক উচ্চ পর্যায়ের গবেষণাগার ও উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খোলা দরকার। তিনি বলেন, 'ঐসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের জন্যে চুক্তির ভিত্তিতে খ্যাতনামা বিদেশী বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।'

বিজ্ঞানীদের সরকারী তালিকায় বিদেশী ডিগ্রিধারীদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের যে মোহ দেখা যায়, তার সমালোচনা করে ডঃ প্রসাদ বলেন, 'বিদেশ-প্রত্যাগত বিজ্ঞানীরা স্থায়ী চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের 'পুল-অফিসার পদ দেওয়া উচিত, কিন্তু তার মেয়াদ এক বছরের বেশী হওয়া উচিত নয়। আর তাঁদের বেতনও ভারতে ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্তদের বেতনের অনুরূপ হওয়া উচিত।

ভারতে বিজ্ঞান-চর্চা প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রসাদের এই গঠনমূলক সমালোচনা ও প্রস্তাবগুলি প্রতি-নিধিদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করেছিল। অভিভাষণের দ্বিতীয় অংশে তাঁর গবেষণা বিষয়ক প্রসঙ্গে ডঃ প্রসাদ 'অসীম শ্রেণীর পরম যোগব্যবস্থা সংক্রান্ত সাম্প্রতিক গবেষণা এবং তার প্রয়োগ-ক্ষেত্র' (রিসেন্ট রিসার্চেস্ ইন দি অ্যাবসোলিউট সামেবিলিটি অফ্ ইনফাইনাইট সিরিজ অ্যাণ্ড দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন) সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

উদ্বোধনের দিনে মূল সভাপতির ভাষণের পর দ্বিতীয় দিন থেকে বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণ তাঁদের ভাষণ প্রদান করেন। পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডাবলিউ. এম. বৈদ্য তাঁর ভাষণে 'হাইড্রোকার্বন শিখার বর্ণালী' সম্পর্কে আলোচনা করেন। উদ্ভিদবিদ্যা শাখার সভাপতি অধ্যাপক টি. এস. মহাবালে বলেন 'দাক্ষিণাত্যের অতীত ও

বর্তমান উদ্ভিদকুল' সম্পর্কে। শারীরবিদ্যা শাখার সভাপতি অধ্যাপক বি. কে. আনন্দ আলোচনা করেন 'রেগুলেশন অফ হোমিও স্টাসিস বাই দি লিম্বিক সিস্টেম অফ ব্রেন' বিষয়ে। মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক দুর্গানন্দ সিন্‌হার আলোচনার বিষয় ছিল 'সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিকের ভূমিকা'। যন্ত্র ও ধাতুবিদ্যা শাখার সভাপতি অধ্যাপক এস. পি. নটিয়াল-এর আলোচ্য বিষয় ছিল 'প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের মহীশূর মালভূমি'। প্রাণিবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতি ডঃ জি. পি. শর্মা বলেন 'প্রাণিকুলের শ্রেণীগত সম্বন্ধ ও শ্রেণিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের ভূমিকা'র বিষয়। গণিত শাখার সভাপতি ডঃ আর. এস. মিশ্র আলোচনা করেন 'আইনষ্টাইন-ম্যাকস্‌ওয়েল ক্ষেত্র'। কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডঃ এস.
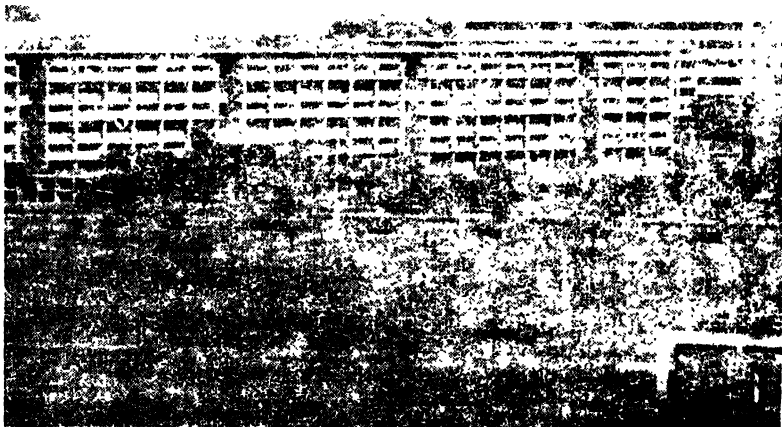
২নং চিত্র।
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ।
ফটো—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ

অধ্যাপক এ. কে. সেনগুপ্ত বলেন 'ইঞ্জিনীয়ারদের নতুন হাতিয়ার টেন্‌সর' সম্পর্কে। সংখ্যায়ন শাখার সভাপতি এন. এম. ভাট আলোচনা করেন 'ভারতে সংখ্যায়ন শিক্ষা ও গবেষণা এবং ভ্যারিয়েটের রূপান্তরের কয়েকটি দিক'। রসায়ন শাখার সভাপতি অধ্যাপক এস. এম. মুখার্জি বলেন 'সাম আস্‌পেক্ট অফ ক্যাটালয়েড অ্যালকিলেশন অ্যাণ্ড সাইক্লিঅ্যালকিলেশন অফ অ্যারোমেটিকস' বিষয়ে। ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার সভাপতি পি. রায়চৌধুরী বলেন 'ভাইরাস রোগ নিয়ন্ত্রণ সমস্যা ও সম্ভাবনা' সম্পর্কে। নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখার সভাপতি শ্রী জি. এস রায় আলোচনা করেন 'ভারতীয় প্রাগেতিহাস-চর্চার নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা'র বিষয়। আর চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডঃ পি. সি. সেনগুপ্ত বলেন 'ভারতে কালাজ্বর সম্পর্কিত গবেষণা' সম্বন্ধে।

দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন শাখার সভাপতিদের

ভাষণ পাঠের পর গবেষণা-পত্র পাঠ, বিশেষ বক্তৃতা ও আলোচনা-চক্র সুরু হয় এবং ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। এবারের অধিবেশনে বিভিন্ন শাখায় যাঁরা বিশেষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন. তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক আর. শুক্লা, ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক আর. এস. ভার্মা, ডঃ ভি. জি. পান্‌সে, ডঃ আর. পি শ্রীবাস্তব, ডঃ কে. আর নায়ার, ডঃ পি. কে. ভট্টাচার্য, ডঃ এম. ডি. কারখানাওয়ালা, শ্রী পি. কে. ঘোষ, অধ্যাপক হুজুরবাজার-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিদেশাগত বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বিশেষ বক্তৃতা ও লোকরঞ্জক বক্তৃতার ব্যবস্থা বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্মসূচীর একটি বিশেষ অঙ্গ। এবারও সে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান শাখায় অধ্যাপক রব্‌লে উইলিয়ামস্. এবং ডঃ ই. এন. উইলমার; রসায়ন শাখায় অধ্যাপক গুটম্যান, অধ্যাপক কুজিও এগামী এবং অধ্যাপক হাদারী; যন্ত্র ও ধাতুবিদ্যা শাখায় অধ্যাপক প্লুহার; নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব শাখায় অধ্যাপক ব্রাইটিঙ্গার; শারীরবিদ্যা শাখায় অধ্যাপক সিস্‌কা এবং অধ্যাপক উইলমার কয়েকটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। এবার লোকরঞ্জক বক্তৃতা দিয়েছিলেন অধ্যাপক পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট, অধ্যাপক জর্জ ভালাব এবং ডঃ ই. এন. উইলমার। এর মধ্যে অধ্যাপক ব্লাকেটের বক্তৃতা-সভায় যেমন বিপুল শ্রোতার সমাগম হয়েছিল, তেমনি তাঁর বক্তৃতাটিও হয়েছিল পরম হৃদয়গ্রাহী।

বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানীদের বিশেষ বক্তৃতা ছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবারের অধিবেশনে। ডঃ নীলরতন ধর তৃতীয় বার্ষিক 'বি. সি. গুহ স্মারক' বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'খাদ্য ও পুষ্টি'। যুবগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান-সূচীতে ডঃ পি. এস. গি . 'আমাদের পৃথিবীর সীমানা' সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক টি. এস. শেষাদ্রিও একটি বিশেষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এছাড়া, 'বিজ্ঞান ও সমাজ-জীবনের সম্পর্ক' এবং 'খাদ্যসমস্যা' বিষয়ে দুটি বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু খাদ্যসমস্যার মত বর্তমানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা বিশেষ কেউ অংশ গ্রহণ না করায় এই আলোচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের এই ঔদাসিন্যে অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। এবারের অধিবেশনের নির্দিষ্ট কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও আর একটি বিষয়ের আলোচনা এবারের অধিবেশনে যোগদানকারী বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। সেটি হচ্ছে—'ভারতের পক্ষে পরমাণু-বোমা প্রস্তুত করা উচিত কিনা?'—এ-সম্পর্কিত আলোচনা। এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ ভারতীয় বিজ্ঞানী পরমাণু-বোমা প্রস্তুতের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন, কিন্তু বিদেশী বিজ্ঞানীরা বিপরীত মত ব্যক্ত করেন।

প্রতি অধিবেশনের মত চণ্ডীগড়েও সারাদিনের গুরুগম্ভীর বক্তৃতা ও আলোচনার পর সান্ধ্য আসরে আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন দিনে নৃত্যগীত, নাটক ও যন্ত্র-সঙ্গীত পরিবেশন করে। তার মধ্যে পাঞ্জাবের নিজস্ব 'ভাঙরা' লোকনৃত্য অনুষ্ঠানটি আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল, অন্যান্য অনুষ্ঠান খুব উচ্চমানের বলে মনে হয় নি। বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের প্রদর্শনী দেখে আমরা পরম প্রীত হয়েছিলুম।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রতিনিধি এবারের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। প্রতিনিধিদের সুখসুবিধার জন্যে স্থানীয় অভ্যর্থনা সমিতি সর্বপ্রকার যত্ন নিয়েছিলেন এবং স্বেচ্ছাসেবী ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের

সাহায্যে সব সময় এগিয়ে এসেছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামকিষেণ এবং অভ্যর্থনা সমিতি প্রতিনিধিদের তিনটি প্রীতিসম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। চণ্ডীগড়ের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পিঞ্জোরের মোঘল উদ্যান এবং নবভারতের 'তীর্থক্ষেত্র' ভাকরা বাঁধ এবং নাঙ্গল সার কারখানা প্রতিনিধিদের দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন অভ্যর্থনা ও তার পাঠকক্ষের সুব্যবস্থা আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছে। ভাকরা বাঁধ দেখে একদিকে যেমন তার উচ্চতায় বিস্মিত হয়েছি, অপরদিকে তেমনি এই প্রকল্পের সার্থকতায় ভারতের প্রগতি সম্বন্ধে মনে আস্থা ও আশা দৃঢ়মূল হয়েছে।

চণ্ডীগড়ে বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনের এই মধুস্মৃতির সঙ্গে একটি বেদনাময় স্মৃতিও জড়িয়ে

৩নং চিত্র।

প্রীতিসম্মেলনে প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামকিষেণ
ফটো—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ

সমিতি। বিশ্বখ্যাত স্থপতি কাবুজিয়র-এর প্রতিভার স্বর্ণস্বাক্ষরবাহী আধুনিক স্থাপত্য-নগরী চণ্ডীগড়ের অপূর্ব পরিকল্পনা আমাদের যেমন বিমুগ্ধ করেছে, তেমনি সুবিস্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভিন্ন বিভাগের ভবন ও প্রত্যেক বিভাগের সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রেক্ষাগৃহ এবং সুপ্রশস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার আছে। সে বেদনা, অধিবেশন সমাপ্ত হবার দুদিন পরে তাসখন্দে ভারতের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু এবং এক সপ্তাহ পরে এবারকার অধিবেশনের মূল সভাপতি অধ্যাপক বি. এন. প্রসাদের আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে।

সঞ্চয়ন

ক্যান্সার রোগের কারণ

ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা গত কয়েক দশকে সব দেশেই যথেষ্ট বেড়ে গেছে। প্রধানতঃ ফুস্‌ফুস, শ্বাসনালী এবং কিছু পরিমাণে অন্যান্য দেহযন্ত্রে ক্যান্সারের প্রকোপ দেখা যায়। এই প্রকোপ বৃদ্ধির কারণ চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় নি। কিন্তু স্বভাবতঃই এই ব্যাপারে জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থা, জনগণের কাজ ও জীবনধারণের অবস্থার পার্থক্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এসব কারণ খুঁজে বের করা এবং ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব ও জীবনযাত্রার অবস্থার মধ্যে যোগাযোগ নির্ণয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে ক্যান্সার নিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নিরূপণ করা সম্ভব হবে। একথা মনে রেখে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা-বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী গত কয়েক বছর ধরে গবেষকদল পাঠাচ্ছেন উত্তর ককেশাস ও বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহে, কাস্পিয়ান উপকূলে, শ্বেত ও বারেন্ত্‌স সাগরে, পশ্চিম সাইবিরিয়ার অঞ্চলসমূহে, মধ্য-এশীয় প্রজাতন্ত্রসমূহে, ইউক্রেনীয় ও মোলদাভীয় প্রজাতন্ত্রে। এই সব দলের সদস্যেরা ক্যান্সার ও প্রাক-ক্যান্সার রোগ প্রকট করবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন, অনুসন্ধানাধীন অঞ্চলের জলবায়ু ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করেছেন—পরীক্ষা করেছেন ঐতিহ্য ও লোকাচার, জনসাধারণের কাজ ও জীবনযাত্রার অবস্থা।

এসব পর্যবেক্ষণ ও বহু বছরের গবেষণার ফলে যে সব তথ্যাদি পাওয়া গেছে—তাথেকে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের বিস্তার এবং এক বা অন্য অঞ্চলে এর প্রাধান্য সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায়।

ত্বকের ক্যান্সার সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল অপেক্ষা দক্ষিণাঞ্চলে সচরাচর বেশী দেখা যায়। দক্ষিণে যে ধরণের ক্যান্সার সবচেয়ে ব্যাপক, তা হলো মুখমণ্ডলের ত্বক ও দেহের অন্যান্য অনাবৃত অংশের ত্বকের ক্যান্সার। এর কারণ, ত্বকের অনাবৃত অংশের উপর উত্তপ্ত সূর্য কিরণের অত্যধিক প্রভাব।

গবেষকদলের সদস্যেরা আবিষ্কার করেছেন যে, যে সব স্থানে স্থানীয় লোকাচারের দরুণ ও সুসংগঠিত ক্যান্সার-বিরোধী প্রচারের দরুণ সূর্যকিরণে অত্যধিক অনাবৃত থাকবার বিরুদ্ধে রক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে—সে সব স্থানে ত্বকের ক্যান্সার খুবই বিরল। যেমন, তুর্কমেনিয়ায় জনসাধারণ শিরাবরণ ব্যবহার করে, যা তাদের মুখমণ্ডলের ত্বককে সূর্যকিরণ থেকে রক্ষা করে, অথচ একই জলবায়ুপ্রধান উজবেকিস্থানে ব্যবহার করা হয় এমন ছোট টুপি, যা পুরা মস্তক আবৃত করে না। কাজেই এটা আকস্মিক নয় যে, মুখমণ্ডলের ত্বকে ক্যান্সারের প্রকোপ তুর্কমেনিয়ার চেয়ে উজবেকিস্থানে অনেক বেশী।

মধ্য এশিয়ার কোন কোন এলাকায় (বুখারা, চার্দঝৌ, সমরখন্দ ও মারি) জিভের নীচে তথাকথিত “নাস” (খৈনি) রাখবার প্রথা রয়েছে। এই খৈনি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ সৃষ্টি করে। অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষদের শতকরা ২০ জন ও স্ত্রীলোকদের শতকরা ২০ জন “নাস” ব্যবহার করেন। এর ফল কি? ভেষজ অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, এই

সব পুরুষ ও স্ত্রীলোক মুখের ভিতরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ক্যান্সার ও প্রাক-ক্যান্সার রোগে অনেক বেশী ভোগে। পক্ষান্তরে, যাঁরা "নাস" ব্যবহার না করে ধূমপান করে, তাদের ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা আছে। যেহেতু ধূমপায়ী প্রধানতঃই পুরুষ, সেহেতু পুরুষদের মধ্যে ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারের প্রকোপ মেয়েদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী। এবিষয়ে বিশেষ ক্ষতিকর হলো সিগারেট—কেন না, ধূমপায়ীরা যথেষ্ট পরিমাণ তামাকের ধোঁয়া মুখে টেনে নেয়, যে ধোঁয়াতে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী উপাদান থাকে।

গবেষকদলের সদস্যেরা কাস্পিয়ান, শ্বেত ও বারেণ্ট্‌স্ সাগরের তীরবর্তী এলাকায়, কাজাখ রিপাব্লিকের কোন কোন অঞ্চলে, কারেলীয়, ইয়াকুৎ ও বুরিয়াৎ স্বশাসিত প্রজাতন্ত্রে ও আর্খাঙ্গালেস্ক অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যনালীর ক্যান্সারের উচ্চ হার লক্ষ্য করেছেন। প্রশ্ন করা যেতে পারে, এই সব অঞ্চলের জলবায়ু ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একে অপরের চেয়ে বিরাট দূরত্বে বসবাসকারী জনসাধারণের ঐতিহ্য ও লোকাচারের মধ্যে কি সাদৃশ্য রয়েছে? একটি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়; যেমন—মৎস্য শিকারে নিযুক্ত এই সব অঞ্চলের জনগণ খাদ্য হিসাবে মাছ গ্রহণ করে, কিন্তু ঠিক ভাবে মাছের কাঁটা বেছে খায় না। মাছের কাঁটা খাদ্যনালীতে যে সামান্য ক্ষতের সৃষ্টি করে শেষ পর্যন্ত তাই এই সব অঞ্চলে জনগণের মধ্যে খাদ্যনালীর ক্যান্সার বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গবেষকদলের সদস্যেরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে স্তনের ক্যান্সারের হারের পার্থক্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন। যেমন—এই রোগ তুর্কমেনিয়া, উজবেকিস্থান, তাজিকিস্তানের স্থানীয় জনসমষ্টির মধ্যে বিরল এবং শহর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে আরও বিরল। এর প্রকৃত কারণটিও প্রকট হয়েছে। এটি আবহাওয়া ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয়, এটি নির্ভর করে পুরুষপরম্পরায় যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, তার উপর। এই সব এলাকার মেয়েরা অনেক সন্তান প্রসব করে, দীর্ঘতর সময় ধরে স্তন্যপান করায় এবং গর্ভপাতের আশ্রয় প্রায়ই নেয় না। এই সব কিছুই তাদের বেশ কিছু পরিমাণে স্তনের ক্যান্সারের হাত থেকে রক্ষা করে। নিঃসন্তান এবং কম সন্তানের জননীদের ক্ষেত্রেই স্তনের ক্যান্সার সাধারণতঃ দেখা যায়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার মধ্যে ক্যান্সার ও প্রাক-ক্যান্সার রোগ প্রসারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এগুলি। এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিদেশী অনুসন্ধানকারীদের অনুসন্ধানের ফলাফলের সঙ্গেও মিলে যায়। যেমন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলিতে দক্ষিণী জনগণের মধ্যেই ত্বকের ক্যান্সার ব্যাপকতর। সুইডেনের উত্তরাঞ্চলে—যেখানে বহু কারখানায় ধূমপান নিষিদ্ধ, সেখানে শ্রমিকেরা তামাক পাতা চিবিয়ে থাকে। এর ফলে মুখের ভিতরকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং প্রায়শঃই এই সব শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্যান্সার ও প্রাক-ক্যান্সার রোগ দেখা দেয়।

ভারতের বহু অঞ্চলে জনসাধারণ তামাক পাতা, চুন ও সুপারি সহযোগে পান চিবিয়ে খায় এবং তারা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মুখের ভিতরকার ক্যান্সারে বেশী ভোগে। যে সব অঞ্চলে মেয়েরা গর্ভপাতের আশ্রয় নেয় না ও বেশী দিন ধরে সন্তানদের স্তন্যপান করায়, সেখানে স্তনের ক্যান্সারের নিম্নতর হার বিদেশীয়দের অনুসন্ধানেও প্রমাণিত হয়েছে। ধূমপায়ীদের মধ্যে ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার রোগের প্রকোপ অনেক বেশী।

ক্যান্সার সম্পর্কে ভেষজ ও ভৌগোলিক গবেষণা সুরু হয়েছে অতি সম্প্রতি এবং এই গবেষণা শেষ হয় নি। তবে সংগৃহীত যাবতীয় তথ্যাই প্রাক-ক্যান্সার রোগ ও ক্যান্সার-নিরোধক ব্যবস্থাদি প্রণয়নে সাহায্য করছে।

কুরকা বা তুলসী আলু

নানা জাতীয় কন্দ মানুষের আদিকালের খাদ্য তালিকা থেকে আজকের খাদ্য তালিকায় পর্যন্ত স্থান পেয়ে আসছে। আধুনিক ইউরোপ বা আমেরিকায় আলু ক্রমে ক্রমে তণ্ডুল জাতীয় শস্যের স্থান অধিকার করছে। অল্প জমিতে অধিক ফসল ফলাতে হলে কন্দ জাতীয় ফসলের চাষ অবশ্যই বাড়াতে হবে। বর্তমানে আলুর চাষ আমরা ক্রমেই বাড়াবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সমতল ভূমিতে কেবলমাত্র শীতকালেই এই ফসলের চাষ করা চলে। খরিফে চাষ করা চলে, এমন কোন কন্দ জাতীয় ফসল, যার ফলন আলুর মত ব্যবহার করা যায়—এমন ফসল সহজেই আমাদের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে। কুরকা বা তুলসী আলু (তুলসীর মত পাতা এবং গাছ—সে জন্যে এই নাম হয়েছে) আমাদের এই প্রয়োজন মিটাতে পারে।

অন্যান্য যে কোন শস্যের তুলনায় কন্দের খাদ্যমূল্য খুবই ভাল। হেক্টর প্রতি শ্বেতসারের উৎপাদন অত্যধিক এবং আলু প্রভৃতি অন্যান্য কন্দজাতীয় ফসলের মত স্বাদ-গন্ধহীন নয় এবং নিজস্ব স্বাদ-গন্ধে—যেটা রান্নার পরেও বজায় থাকে—কুরকার রান্না পরিবেশকারী একঘেয়ে মনে হয় না।

কুরকা বা তুলসী আলুর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে কোলিয়াস পারভিফ্লোরাস (=কো. টিউবারোসাস)-এর আদি বাসস্থান হচ্ছে আফ্রিকা এবং খুব সম্ভব আবিসিনিয়া। আরব বণিকেরা ভারতে বোধ হয় নিয়ে এসেছিল মালাবার উপকূলের ভিতর দিয়ে। বর্তমানে কেরালায় ব্যাপকভাবে এবং মহীশূরে ও মাদ্রাজের সন্নিহিত অঞ্চলে কিছু পরিমাণে চাষ হয়ে থাকে। ভারতের বাইরে সিংহল, মালয় এবং যবদ্বীপেও এর চাষ হয়। পশ্চিম বাংলায় কুরকা অপরিচিত নয়, তবে প্রচারের অভাবে এর চাষ তেমন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে নি।

জলনিকাশী সকল প্রকার মাটিতেই এর চাষ সম্ভব। কেরালার আর্দ্র আবহাওয়া এবং মধ্য-প্রদেশের শুষ্ক আবহাওয়ায়ও সাফল্যের সঙ্গে এর চাষ করা হয়েছে। মিষ্টি আলুর মতই কন্দ অথবা কাটিং উভয়ের দ্বারাই এর চাষ হয়ে থাকে; তবে সাধারণতঃ কন্দ থেকে তৈরি শিকড়ওয়ালা কাটিং দিয়েই এর বেশী চাষ করা হয়।

তুলসী আলুর চাষ বৈশাখ থেকে কার্তিক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যে কোন সব্জির বীজতলার মত ২ হাত চওড়া এবং ১ বিঘৎ উঁচু বীজতলা তৈরি করতে হয়। মাটি খুব গভীরভাবে কুপিয়ে এবং ভালভাবে জৈব সার গোবর ও কাঠের ছাই ইত্যাদি মিশিয়ে চারদিকে নালী কেটে দিতে হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের প্রথম বর্ষণের পর এই বীজতলায় ৩ আঙ্গুল গভীর করে ১ বিঘৎ অন্তর বীজের কন্দ বসাতে হয়। ১০-১৫ দিনেই তা থেকে কাটিং নেবার উপযোগী হয়। প্রতি ১½-২ সপ্তাহ অন্তর মোট ৪-৬ বার কাটিং তোলা চলে এবং এভাবে বীজতলায় ১৫-২০ কিলো কন্দ বসিয়ে ১½-২ মাসে এক হেক্টর জমি চাষ করা যায়।

আল অথবা সমান জমিতে কাটিং বসানো হয়। ভালভাবে হাল ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হয় এবং জমি তৈরির সময়েই হেক্টর প্রতি ২৫ টন যে কোন জৈব সার মিশিয়ে দিতে হয়। আলের চাষে আলের দূরত্ব ১½-২ হাত রাখতে হবে। প্রত্যেকটি আল ১ হাত উঁচু এবং গোড়া ১½-২ হাত চওড়া হবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ডগার দিক থেকে নেওয়া শিকড়-ওয়ালা ৪-৫টি পাতাযুক্ত ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা কাটিং বীজতলা থেকে উঠিয়ে চাষের জমিতে ;

বিঘৎ অন্তর ৪-৫ আঙ্গুল গভীর করে বসাতে হবে। কাটিংগুলি ২।৩ সপ্তাহের ভিতরে লেগে যায়।

কাটিং বসাবার ৩ সপ্তাহ পরে এবং আরও ১ মাস পরে ২ বার নিড়ানি দেওয়া হয়। তারপর গাছের ডালপালা মাটিকে ঢেকে ফেলায় আর আগাছা জন্মাবার ভয় থাকে না। নিড়ানির সময়েই হেক্টর প্রতি ৫৫-৮০ কুইন্টাল আবর্জনা সার এককভাবে অথবা ১০—২০ কুইন্টাল কাঠের ছাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে মাটিতে দিতে হবে। দেখা গেছে অল্প পরিমাণে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি পায়। নিড়ানি এবং সার প্রয়োগের সময়েই সামান্য পরিমাণে মাটিও গাছের গোড়ায় তুলে দেওয়া হয়। এর ফলে আরও নতুন প্রশাখায় কন্দ ধরবার সুযোগ পায়। মালাবারে কুরকার চাষ সম্পূর্ণ বৃষ্টির জলেই করা হয়, তবে অনাবৃষ্টি হলে সেচের ব্যবস্থা করা উচিত।

কার্তিকের গোড়ার দিকে যখন গাছের পাতা হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করে, তখন ফসল তোলবার উপযোগী হয়েছে বুঝতে হবে। আলুর মতই কাঁটা কোদালী দিয়ে কন্দ তোলা উচিত। ফলনের খুবই তারতম্য দেখা যায় এবং হেক্টরে ৭½-১৫ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা শুকনো জায়গায় যেখানে বায়ু চলাচলের ভাল ব্যবস্থা আছে, তেমন ঘরের মেঝেতে তুলসী আলু রেখে ২ আঙ্গুল পরিমাণ শুকনো বালি দিয়ে ঢেকে রাখলে নষ্ট হবার ভয় থাকে না।

মারাত্মক কোন রকম রোগ বা পোকা হতে দেখা যায় না, তবে বীজতলায় পাতা-খাওয়া শোঁয়াপোকা ক্ষতি করতে পারে। লেড আর্সেনেট সিঞ্চন করে একে দমন করা যায়।

ঠিক আলুর মতই সিদ্ধ করে বা ভেজে বা তরকারীতে একে খাওয়া যায়।

নীচের তালিকা থেকে এর আনুপাতিক খাদ্যমূল্য বোঝা যাবে।

উপাদান	আর্দ্রতা%	শ্বেতসার%	প্রোটিন%	স্নেহপদার্থ%	খনিজ পদার্থ%	ছিবড়া%
কুরকা	৭৭·৬	১৯·৭	১·৩	০·১	০·৯	০·৪
আলু	৭৪·৭	২২·৯	১·৬	০·১	০·৬	
কচু	৭৩.১	২২·১	৩·০	০·১	১·৭	
মিষ্টি আলু	৬৬·৫	৩১·০	১·২	০·৩	১·০	
টেপিওকা	৫৯·৪	৩৮·৭	০·৭	১·২	১·৯	
ওল	৭৮·৭	১৮·৪	১·২	০·১	০·৮	০·৮

কুরকা বা তুলসী আলু খেতে ভাল এবং খাদ্যমূল্যেও কারোর চেয়ে কম নয়। অধিকন্তু এর ভিতরে লৌহের পরিমাণ খুব বেশী। আলুর চাষের প্রধান অন্তরায় বীজের অভাব; যে জন্যে অনেক টাকা খরচ করতে হয় অথচ কাটিং-এ চাষ হয় বলে তুলসী আলুর চাষে খরচ হয় খুব কম। একে হাল্কা দোঁয়াশ, এমন কি অনাবাদী বেলে মাটি, যেখানে অন্য ফসলের চাষ করা সম্ভব নয়, সেখানেও চাষ করা চলে। এর ফলন হয় প্রচুর এবং সার প্রয়োগে ফলন বেড়ে যায়। যদিও আমাদের দেশে আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত হিসাব করা হয় নি, তবুও একই অবস্থায় সিংহলের চাষের হিসাবে দেখা গেছে যে, ১ হেক্টর থেকে ২৩৬০ টাকা মোট পাওয়া যায়, যা থেকে খরচ বাদ দিয়ে নিট আয় দাঁড়ায় ১৫০০ টাকা। খরিফে যে সব জমিতে জল দাঁড়ায় না, সেখানে তুলসী আলুর চাষ করে সমপরিমাণ জমি থেকে বহুগুণ বেশী খাদ্য ফলিয়ে খাদ্য-সমস্যার সমাধানে অনায়াসে আমরা সহায়তা করতে পারি।

[ভা. কৃ অ. প.]

শুক্রগ্রহে অভিযান

এ. সলোমানেভিচ এই সম্বন্ধে লিখেছেন—অন্যান্য গ্রহের ন্যায় শুক্রগ্রহও নিজের আলোকে আলোকিত নয়। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হবার ফলেই একে উজ্জ্বল দেখায়। সে জন্যেই চাক্ষুষ বর্ণালির দ্বারা এর ভৌত ধর্ম বিচার করা কঠিন। এই গ্রহের অবলোহিত আলোকরশ্মি থেকে আরও অনেক কিছু জানা যেতে পারে—কেন না, এর মধ্যে থাকে এর নিজস্ব বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণের সর্বোচ্চ তীব্রতা। যাহোক, অবলোহিত বিকিরণ আসে শুক্রের বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তর থেকে। অধিকন্তু, পৃথিবীতে এই বিকিরণ পাওয়া খুবই শক্ত।

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান অতি শক্তিশালী অতিরিক্ত তথ্য প্রেরণের পথ ব্যবহার করা সম্ভবপর করেছে। কয়েক মিলিমিটার থেকে প্রায় ১৫ মিটার পর্যন্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে "রেডিও স্লিট" মারফৎ অন্তরীক্ষ থেকে পৃথিবীতে এসব তথ্য আসে।

সেন্টিমিটার ও মিলিমিটার তরঙ্গের ব্যাণ্ডে মহাজাগতিক বিদ্যুৎ-বিকিরণ লক্ষ্য করতে সক্ষম বৃহদাকার রেডিও-টেলিস্কোপ যখন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত হলো, তখন থেকেই শুক্রগ্রহ সম্পর্কে ব্যাপক বেতার-জোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধানকার্য সুরু হয়েছে। প্রথমে এই গ্রহের বিদ্যুৎ-বিকিরণ রেকর্ড করা যেত মাত্র তখনই, যখন এটি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী হতো। পরে কলকজার সুগ্রাহীতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহের "পূর্ণ" পর্যায় সমেত বিভিন্ন পর্যায়ে এর বিদ্যুৎ-বিকিরণ রেকর্ড করা সুরু করেছেন। শুক্রগ্রহের "পূর্ণ" পর্যায়ে পৃথিবী থেকে দৃষ্ট এর সম্পূর্ণ মণ্ডলটি সূর্যের দ্বারা আলোকিত হয়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির পদার্থ-বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের ২২ মিটার রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে দীর্ঘকালের পর্যবেক্ষণের ফলে একথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, পৃথিবীর মুখোমুখি শুক্র-মণ্ডলের কার্যকরী তাপমাত্রা (তিন বা বেশী সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এই তাপমাত্রার পরিমাপ করা হলে) কেলভিন চরম স্কেলের প্রায় ৬০০ ডিগ্রি (এই স্কেলে -২৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডকে শূন্য বলে ধরা হয়)। তিন সেন্টিমিটারের কম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে তাপমাত্রার বেশ দ্রুত হ্রাস ঘটে। স্মরণ রাখা দরকার যে, অবলোহিত অঞ্চলে শুক্রগ্রহের মেঘস্তরের তাপমাত্রার পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, তাপমাত্রা কেলভিন ২৪০ ডিগ্রির কাছাকাছি।

শুক্রের অপ্রত্যাশিত উঁচু "বেতার তাপমাত্রা" জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কিংকর্তব্যবিমূঢ় করেছিল। বস্তুতঃ সেন্টিমিটার ব্যাণ্ডের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে প্রাপ্ত এরূপ উঁচু তাপমাত্রায় শুধুমাত্র সূর্যতাপে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে—এই বলে ব্যাখ্যা করা যায় নি।

তাহলে শুক্রপৃষ্ঠ এমন উত্তপ্ত কেন? কল্পনা করুন—নিম্নবর্ণিত ঘটনাবলী ঘটছেঃ মেঘরাজির ভিতর দিয়ে আংশিকভাবে প্রবেশ করে সূর্যকিরণ এই গ্রহপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে তোলে এবং শুক্র থেকে অবলোহিত বিকিরণ ঘটতে থাকে। শুক্রগ্রহের বায়ুমণ্ডল এরূপ বিকিরণের পক্ষে অনচ্ছ হলে সূর্য থেকে প্রাপ্ত তাপ এক ধরণের ফাঁদে ধরা পড়ে। এই অবস্থাকে বলা হয় 'কাচঘরের ক্রিয়াফল'।

গ্রহের মণ্ডল জুড়ে কার্যকরী তাপমাত্রা বণ্টনের পরিমাপই হবে কোন একটি তত্ত্ব নির্ভুল কিনা, তা পরীক্ষা করবার সঠিক উপায়। এরূপ পরিমাপের প্রথম প্রচেষ্টা চালান বৃহৎ পুলকোভো রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে সোভিয়েট বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। প্রান্তের দিকে এই মণ্ডল অন্ধকার হয়ে আসে—এই চিন্তার ভিত্তি জুগিয়েছে এই প্রচেষ্টার ফলাফল। ঠিক তার পরেই মার্কিন

মেরিনার-২ থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছিল যে, শুক্রগ্রহের প্রান্তদেশ থেকে বিকিরণ স্পষ্টতঃই এই গ্রহের কেন্দ্রভাগ থেকে বিকিরণের তুলনায় দুর্বলতর।

ক্যালিফোর্নিয়া রেডিও ইন্টারফেরোমিটারের সাহায্যে গত বছর সোভিয়েট ও মার্কিন বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা (এ. কুজমিন ও বি. ক্লার্ক) চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ সম্পাদন করেন। অভিনিবেশ সহকারে সমবর্তনের অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ বিশ্বাসযোগ্যভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ১০ সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বিকিরণের প্রধান অংশ শুক্রগ্রহের পৃষ্ঠদেশে থেকে নির্গত হয়। তাছাড়া এর উঁচু তাপমাত্রার তত্ত্বও সমর্থিত হয়; এসব অনুসন্ধান-কার্য "অত্যুত্তপ্ত" শুক্র তত্ত্বকেও যথেষ্ট শক্তিশালী করছে। তাছাড়া শুক্রপৃষ্ঠের (তা তরল হতে পারে না) বৈদ্যুতিক ধর্মসমূহের মূল্যায়ন করা হয়েছে। খুব সম্ভব শুক্রগ্রহ অত্যুত্তপ্ত মরুভূমির অনুরূপ, যা নভোমণ্ডলীয় কোন প্রাণীর অস্তিত্বের অনুপযোগী।

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান শুক্রগ্রহ সম্পর্কে অনুসন্ধানে যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রগতি সম্ভব করেছে। তা সত্ত্বেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে শুক্রগ্রহ ধাঁধাই রয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ—এর বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক গঠন কি? এখন পর্যন্ত যে জিনিসটি নির্ভরযোগ্যভাবে জানা গেছে, তা হলো—এই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড রয়েছে। জলীয় বাষ্প আছে কি না—এই প্রশ্নের জবাব এখনও পরিষ্কার নয়।

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আধুনিক উপায়ে শুক্রগ্রহ সম্পর্কে অনুসন্ধানকার্য চালিয়েছেন। এই ব্যাপারে বিশেষ মূল্যবান হলো, আন্তঃগ্রহ মহাকাশযানের সাহায্যে বিভিন্ন পরিমাপ সম্পাদন করা।

লণ্ডনে বিজিনেস এফিসিয়েন্সি এক্জিবিশনে প্রদর্শিত যন্ত্রপাতি

অফিসে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা অনেক সময় বলে থাকেন, নতুন যন্ত্রের কথা শুনলে ভয়ই হয়। এক ভাবে কাজ করতে শেখবার পর তাঁরা কেউই চান না অন্য একটা কিছু শিখতে, যদিও সেই শিক্ষার ফলে হয়তো তাঁরা অনেক সহজেই সেই কাজ করতে পারবেন। পিটার ওয়াইল্ড লিখেছেন, যখন তাঁরা নিজের চোখে দেখে বুঝতে পারেন যে, যন্ত্রটি সত্যই কাজের সময় অনেকটা বাঁচাবে এবং কাজের একঘেয়েমি দূর করবে, তখন তাঁরা অবাক হন এই ভেবে যে, কেন তাঁদের ফার্ম এত দিন এই যন্ত্রটি আমদানী করে নি।

আজকাল বাজারে যন্ত্রের অভাব নেই; কয়েক শ' বিভিন্ন রকমের যন্ত্র আছে, যেগুলি সবই অফিসের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সমাধা করতে সাহায্য করছে। ইলেকট্রনিক অ্যাকাউন্টিং ব্যবস্থা থেকে ইলেকট্রিক পেন্সিল শাপ্‌নার পর্যন্ত ছোট-বড় সব রকম উপকরণই এখন মানুষের মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে।

লণ্ডনে সম্প্রতি যে বিজিনেস এফিসিয়েন্সি এক্জিবিশন হয়, তাতে ১০০-এরও বেশী প্রতিষ্ঠান নানা ধরণের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করে—এগুলির মূল্যের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকার কিছু বেশী।

পিটার ওয়াইল্ড লিখেছেন—এই প্রদর্শনীতে আমি প্রায় ২০টি নতুন জিনিষ দেখেছি। সেগুলির মধ্যে একটি হলো ব্যাঙ্ক নোট গোণবার যন্ত্র। যন্ত্রটি প্রতি সেকেণ্ডে অন্ততঃ

২০টি করে নতুন অথবা পুরনো নোট গুণতে পারে, ব্যাঙ্কের কোন কেরাণীর পক্ষে যা সম্ভব নয়।

বৃটেনের আর একটি যন্ত্র হলো চেশায়ার ৫১২৪। এটি মেইলিং খরচ অনেক কমিয়েছে। যন্ত্রটি দিয়ে কম্পিউটার থেকে খাম, কার্ড অথবা ফরমের উপর ঠিকানা লেখবার কাজ হচ্ছে। যন্ত্রটি টেবিলের উপর জায়গাও খুব কম নেয়, তাছাড়া এটি ঘণ্টায় ৭,৫০০ লেবেল মারতে পারে বা ঠিকানা ছাপতে পারে।

আর একটি যন্ত্র হলো সহজ বহনযোগ্য রেডিও টেলিভিশন। এটিও অনেকটা সময় বাঁচাতে সাহায্য করে। কেম্ব্রিজের কএটি ফার্ম এর ডিজাইন প্রস্তুত করেছে। যন্ত্রটি বিজিনেস এক্‌জিকিউটিভ, ক্লার্ক ও ফোরম্যানদের এবং সেই সঙ্গে পুলিস ও অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের খুব কাজে আসবে।

কিন্তু কিসের জন্যে? এটি অফিস, কারখানা অথবা অন্য কোন কাজের জায়গা, রাস্তায় হেঁটে চলবার সময় বা গাড়িতে অথবা পাঁচ মাইল পর্যন্ত দূরের পথে দু'মুখী সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। এটিকে বহন করে নেবার কোন অসুবিধাই নেই, কারণ এটি ছোট ছোট দুটি মাত্র ইউনিট নিয়ে তৈরি এবং প্রতিটি ইউনিটের ওজন হলো প্রায় নয় আউন্স। রিসিভিং ইউনিট যেটি, সেটিতে আছে একটি লাউড স্পিকার ও গুপ্ত এরিয়েল। বুক পকেটেই এটিকে রাখা চলে। ট্র্যান্সমিটারটি সামান্য ছোট, জামার পাশের পকেটে বেশ সহজেই রাখা চলে, দরকার মত আবার তা বের করে নেওয়াও যায়। এতে আছে ছোট্ট একটি এরিয়েল প্রায় ৬ ইঞ্চি লম্বা, ট্র্যান্সমিটিং বোতাম টেপা মাত্র যা বেরিয়ে আসে।

চিঠিপত্র ডিক্টেট করা, সাক্ষাৎকার রেকর্ড করা, ইতস্ততঃ সংগৃহীত নানা বিষয় নোট করবার জন্যে বহু ব্যবসায়ী এখন ব্যবহার করছে পকেট টেপ-রেকর্ডার। এটির ওজন মাত্র ২৭ আউন্স। তাঁরা এটিকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন এবং খুসী-মত যখন তখন বাথরুমেই হোক অথবা বিছানায় শুয়েই হোক—নিজের সব কথাই রেকর্ড করে রাখতে পারেন। ইলেকট্রনিক নোটবুকটি আবার আরও ছোট, এটির ওজন ১২ আউন্স মাত্র।

আর একটি প্রয়োজনীয় জিনিষ হলো ফায়ার অ্যালার্ম, যে কোন অফিস বা বাড়ীতে যার প্রয়োজন খুব বেশী। এটির তীক্ষ্ণ সাইরেন ধ্বনি অনেক দূর পর্যন্ত—এক মাইলের এক চতুর্থাংশ দূরত্বেও শোনা যায়।

এই সব উপকরণের প্রয়োজনীয়তা এখন ক্রমশঃই যেন বেশী করে উপলব্ধ হচ্ছে। এই যুগের কর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি এগুলির ব্যবহার বাড়িয়ে সময় বাঁচাবার এবং কাজ সহজ করবার চিন্তা করা ছাড়াও কর্মীদের আরামপ্রদ চেয়ার দিয়ে, ভাল ডেস্ক দিয়ে, সুন্দর সুন্দর ফাইলিং ক্যাবিনেট ও সেফ দিয়ে তাদের কর্মোৎসাহ বাড়াবার চেষ্টা করছেন। এতে ফল সত্যই ভাল হয়। যিনি কাজ করবেন, তাঁর মনে বিরক্তি থাকলে কাজ কখনও ভাল হয় না।

বৃটেনে অফিসের সরঞ্জাম-শিল্প একটি বড় রকমেরই ব্যবসায়-কর্মের রূপ নিয়েছে। ১৯৬৪ সালে এই শিল্প থেকে মোট ৫৩,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের (৬০·৬৭ কোটি টাকার) সরঞ্জাম বিদেশে রপ্তানী হয়। এই বছর রপ্তানীর এই পরিমাণ আরও বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে। শিল্পের প্রধান ক্রেতাদের মধ্যে আছে অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, পঃ জার্মেনী ও ফ্রান্স।

শিক্ষা—প্রাথমিক বা বুনিয়াদি

সাধারণভাবে ছয় বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষার সুরু। অবশ্য গান্ধীজী সাত বছর বয়সে এই শিক্ষার সুরুর কথা আলোচনা করেছেন। শোনা যায়, রুশদেশে বর্তমানে আট বছর বয়সে এই শিক্ষা সুরু হচ্ছে। এদেশে অনেক অভিভাবক ছয় বছর বয়সের আগেই প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা সুরু করান। এর কারণ সমাজ-ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা না থাকায় সাধারণ শিক্ষিত অভিভাবকেরা ভাবেন, যথাসম্ভব শীঘ্র শিশুর শিক্ষা সুরু করাতে পারলে শিক্ষা শেষও শীঘ্র হবে, আর তাহলে পুত্র বা কন্যা শীঘ্র উপার্জনক্ষম হবে, সংসারে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা খানিকটা বাড়বে। কিন্তু অনেক শিশুর বেলায় এরূপ চেষ্টায় তার সম্যক পরিণতি লাভে বাধা সৃষ্টি হয়। সম্ভব হলে অভিভাবকদের এদিকে সচেতন হয়ে এরূপ চেষ্টায় বিরত থাকা উচিত। অনুকূল সমাজেই প্রাথমিক শিক্ষার বয়স সঠিকভাবে ছয় বা তার বেশী সাত বা আট করা সম্ভব।

আমাদের দেশে যাকে বর্তমানে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা বলি, তার কাল চার বছর মাত্র। এই শিক্ষাকাল প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম। এটা শিক্ষার নামে এক প্রবঞ্চনা। এই চার বছরে যেটুকু শেখানো হয়, তা এত কম যে, যারা এই শিক্ষার পর আর শিক্ষা পায় না, তাদের বেশীর ভাগই এই স্তরে যা শেখে, তার প্রায় সবই ভুলে যায়। এদিক দিয়ে এখানে প্রচুর অর্থ ও শক্তির অপচয় হচ্ছে। গান্ধীজী এদিকটি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন—"Money spent on primary education is a waste of expenditure in as much as what little is taught is soon forgotten and has little or no value in terms of villages or cities". গান্ধীজীর মতে, এই শিক্ষাকাল কমপক্ষে সাত বছর হওয়া উচিত ও এই শিক্ষায় একজন ছাত্র 'ম্যাট্রিকুলেশনে' (বর্তমানে 'স্কুল ফাইন্যালে') যা শেখে ইংরেজী বাদ তা সবই এবং কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত' (The course of primary education should be extended at least to seven years and should include the general knowledge gained up to the matriculation standard less English and plus a substantial vocation.)। ১৯৩৭ সালের ওয়ার্ধায় সর্ব ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনে গান্ধীজীর মতের সমর্থন করে সাত বছরের অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা ও মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে হরিপুরায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সাত বছরের প্রাথমিক শিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়। নেতাজীর সংগঠিত জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ নেহেরুজীর নেতৃত্বে প্রায় এই সময়েই প্রাথমিক শিক্ষাকাল আট বছর হবার প্রস্তাব করেন। ভারতীয় গঠনতন্ত্রেও ৮ বছরের আবশ্যিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় লক্ষ্য বলে স্বীকৃত হয়েছে। যত শীঘ্র আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা দেশে প্রবর্তিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। এজন্যে এখানে প্রাথমিক শিক্ষাকাল আট বছর ধরে নিয়েই আলোচনা করা

হলো। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এটি প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা।

এই স্তরের শিক্ষার ব্যক্তিগত লক্ষ্য মূলতঃ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে এক, তফাৎ কেবল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যের উপর দেওয়া জোর বা ঝোঁকের তারতম্যে, আর শিক্ষা-পদ্ধতিতে। আগেই বলা হয়েছে এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য শরীরের ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্যক কর্মক্ষম ও পরিণত করা এবং পরিবেশের সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও ঠিক মত তাল রেখে সক্রিয় ও সচেতনভাবে চলা। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুর ইন্দ্রিয়াদি প্রায় সম্পূর্ণ অপরিণত অবস্থা থেকে দ্রুত পরিণতি লাভ করে। এজন্যে এই সকল অভ্যাস বা আচরণে এই পরিণতির দ্রুত ও সম্যক ব্যবস্থা করবার উপর সবিশেষ জোর দেওয়া হয় এবং এবিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করে যেটুকু সম্ভব পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়ের ও শিশুর ছোট পরিবেশের সঙ্গে তাল রেখে চলবার অভ্যাস করানো হয়। প্রাথমিক স্তরে ছাত্রের ইন্দ্রিয়াদি সাধারণভাবে প্রায় পরিণতির মুখে। সুতরাং প্রাক-প্রাথমিক স্তরে এই লক্ষ্যের জন্যে যে সকল সৎ অভ্যাস করতে হতো তা বজায় রাখতে হয়, এদিকে জোর কমে আসে। কিন্তু ছাত্রের পরিবেশের গণ্ডী ক্রমে বেড়ে যায়; এজন্যে এদিকে জোর ক্রমশঃ বাড়ে, শিক্ষা পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে। আগের স্তরে শিক্ষা প্রধানতঃ নিজের অনুশীলন আর শিশুর বিশেষ দরকারী তথ্যাদি, ছড়া প্রভৃতি শেখানো হয় মুখে মুখে। প্রাথমিক স্তরে আগের অনুশীলন বা শিক্ষকের নিকট থেকে শেখার সঙ্গে বইয়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। আশা করা হয়, সে যেন ধীরে ধীরে নিজের দরকারী তথ্যাদি নিজেই বই থেকে শিখে নিতে পারে, বৃহত্তর সমাজের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়। এই স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য—ছাত্রকে জীবনের চলবার পথে একজন সচেতন সক্রিয় পথিক করা।

এই স্তরে ছাত্রকে শিখতে হয় স্বাস্থ্যবিদ্যা, কিছুটা শারীরবৃত্ত, কিছুটা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা। কারণ শরীরকে ভালভাবে চালাতে হলে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সম্বন্ধে আর কি ভাবে তারা কাজ করে, কিসে তাদের ক্ষতি হয়, তা জানা দরকার। মানুষের চলাফেরা, দেখাশোনা সব হয় পদার্থ-বিদ্যার নিয়মমাফিক; তার রোজগারী জীবনে অনেক জিনিষই চলে এই নিয়মমত। তার শক্তির বেশীটা আসে রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে, আর বাঁচবার জন্যে নানাভাবে নির্ভর করতে হয় জীবজগতের উপর। অন্তরেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের জন্যে চাই মনস্তত্ত্বের সঙ্গে কিছুটা পরিচয়, হৃদয়বৃত্তির পুষ্টির জন্যে চাই সাহিত্য, বুদ্ধিবৃত্তির জন্যে চাই গণিত ও তর্কশাস্ত্র। অবশ্য এই সব বিজ্ঞানের শিক্ষা যতদূর সম্ভব বাস্তবভিত্তিক হওয়া উচিত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব বোঝাবার জন্যে যতটা সম্ভব ছাত্রদের রোজকারে জীবন থেকে যা তারা হাতেনাতে করবে, তা বিশদভাবে আলোচনা করা উচিত। আগের প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ছাত্রের পরিবেশের দুটি দিক—প্রাকৃতিক ও সামাজিক। প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্যক পরিচয় হবে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে। সামাজিক পরিবেশের সম্যক জ্ঞানের জন্যে চাই নিজের জাতির ইতিহাসের সঙ্গে বিশদ ও পৃথিবীর ইতিহাসের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত পরিচয়; আর চাই ভূগোল, পৌরনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে পরিচয়। অবশ্য সাহিত্য এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। সাহিত্য নীতিবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ জাগায়। এসব শিক্ষা সুষ্ঠুভাবেই আট বছরের মধ্যে সম্ভব, যদি দুটি (বর্তমানে তিনটি) ভাষা শিক্ষার নিষ্ফল ব্যবস্থায় সময় ও শক্তির অপব্যবহার করা না হয়। বর্তমানে দু'বছর হিন্দী ও পরে আরও

দু'বছর সংস্কৃত বা পালি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পরে বেশীর ভাগ ছাত্রেরই এই দুটি ভাষার আর চর্চা হয় না। ফলে এই দুটি ভাষা কিছুই মনে থাকে না। এভাবে এদুটি ভাষা শিক্ষার চেষ্টায় অযথা শক্তি, সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে। এই স্তরে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা যদি করতেই হয়, তবে শেষ দু'বছর সুকল্পিতভাবে এই ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত (তবে না করলেই ভাল হয়)। এসব ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা সুপরিকল্পিতভাবে করতে পারলে যে সময়, শক্তি ও অর্থ বাঁচবে, তাতে অন্যান্য বিষয় সুন্দরভাবে শেখানো সম্ভব।

মনীষীরা এই স্তরের শিক্ষায় কোন না কোন সরল যন্ত্র হাতেনাতে চালাবার সুপারিশ করেন। গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষায় তকলি বা চরকা ব্যবহারের উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এরূপ তকলী বা চরকার উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে নানা সমালোচনা আছে। তবে ছাত্রকে ছোট যন্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা যেমন তাকে কর্মক্ষম করে, তেমনি শ্রমের মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত করে

সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গীতে গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য সামাজিক দায়-দায়িত্বে সচেতন সুনাগরিক করা। এই শিক্ষার অভাবে গণতন্ত্র সফল হওয়া সম্ভব নয়। আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক সামাজিক পরিকল্পনার সফলতার জন্যে, মানব-সম্পদকে সম্যক ব্যবহারের জন্যে আবশ্যক, প্রত্যেক মানুষকে সম্যকভাবে তৈরি করা। এজন্যে প্রত্যেক উন্নত সভ্য দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক, আবশ্যিক ও রাষ্ট্রের মূল কর্তব্য হওয়া উচিত।

এদেশেও পরিকল্পনাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু যখন শতকরা কুড়ি জন নাগরিকও এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশ বা বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে না বা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে না, তখন বাকী শতকরা আশী জনকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা অপচয় নয় কি? গান্ধীজীও এই স্তরে ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ শাসনের সর্বাধিক কৃতিত্ব এই যে, স্বাধীনতার প্রায় কুড়ি বছর পরেও ইংরেজী শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা বলে আমরা মনে করি

শ্রীমহাদেব দত্ত

চিঠি থেকে পাঠকের মন্তব্য :—

"গণিত যদি মাতৃভাষায় কাহারও লেখা থাকিত তবে শ্রীনিবাস রামানুজনের* মত ইংরেজী জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের সবিশেষ উপকার হইত"।

শ্রীমনোরঞ্জন সিকদার।
জাখিরপুর (দীঘিপাড়া), পশ্চিম দিনাজপুর।

*(রামানুজন ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন না—সঃ)

বিজ্ঞান পরিচয়—একটি প্রদর্শনী

বিজ্ঞানকে বর্তমান যুগের একচ্ছত্র নায়ক বলা চলে। আমাদের গৃহের ভিতর থেকে সুরু করে পথে-প্রান্তরে, স্কুলে-কলেজে, দোকানে-অফিসে, কলে-কারখানায়, এমন কি আকাশে-মহাকাশে, সর্বত্রই বিজ্ঞানের প্রভাব পরিব্যাপ্ত। বিজ্ঞান যেন সেই আশ্চর্য শক্তি, যার সাহায্যে সাহিত্যিকের জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতি ঘটছে, দুঃখ-দুর্দশা-দৈন্যের অবসানের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

বর্তমান কালে দেশকে উন্নত করতে হলে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও প্রয়োগ অপরিহার্য এবং বিজ্ঞানকে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, সাধারণ মানুষকেও বিজ্ঞানের

১নং চিত্র।

বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী, তাঁর পাশে রয়েছেন উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়।

ভাষায়—পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, 'দুর্জয় আশ্বাসে' মানুষ 'দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন' আহরণ করে আনতে পারে। বিজ্ঞানের প্রসাদে একদিকে যেমন মানুষের জ্ঞানের দিগন্ত নিত্যই প্রসারিত হচ্ছে, অন্যদিকে তার মূল তত্ত্ব ও তথ্যাদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আচার্য জগদীশচন্দ্রের সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া অবলা বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালনায় ও ফেডারেশন হল সোসাইটির সহযোগিতায় আচার্য প্রফুল্ল

চন্দ্র রোডস্থ ফেডারেশন হলে গত ১২ই থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীটি আয়োজিত হয়, তার উদ্দেশ্য ছিল, জনসাধারণের সঙ্গে, বিশেষতঃ আমাদের যারা ভবিষ্যৎ, সেই ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে বহুমুখী বিজ্ঞানের একটা প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া, বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ উজ্জীবিত করা।

হয় সবচেয়ে পরিচিত মহলকে কেন্দ্র করে। আমাদের সবচেয়ে যা ঘনিষ্ঠ, সেই গৃহজীবন ছিল সে জন্যে প্রথম বিভাগের উপাদান। আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের পরিচালনায় বিজ্ঞানের কতখানি কর্মকুশলতা রয়েছে এবং বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে তাকে আরো কত সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তোলা যায়, প্রথম বিভাগের এইগুলি ছিল আলোচ্য

২নং চিত্র।
'বহির্জীবনে বিজ্ঞান' বিভাগের একটি অংশ।

১২ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রদর্শনীটি বিভক্ত ছিল চারটি বিভাগে—যথা, গৃহজীবনে বিজ্ঞান, বহির্জীবনে বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অবসর বিনোদনে বিজ্ঞান।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে, বিজ্ঞান পাঠ সুরু করতে

বিষয়। গৃহকার্যে ব্যবহৃত নানাবিধ যন্ত্রপাতি এখানে দেখানো হয়, বোঝানো হয় বিদ্যুৎ-শক্তির ঘরোয়া ব্যবহার। সেই সঙ্গে খাদ্য ও পুষ্টি, রন্ধন-ব্যবস্থা, সজ্জা ও প্রসাধন প্রভৃতি জীবনযাত্রার দৈনন্দিন প্রয়োগগুলিকে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়েছিল।

তবে বিজ্ঞান অবশ্য গৃহের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়, বহির্জগতেও তার ব্যাপক প্রসার। স্কুল-কলেজের বিজ্ঞানের ক্লাসে তাই বিদ্যার্থীদের

সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। Audio Visual Method অর্থাৎ একই সঙ্গে শোনা ও দেখার পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞানশিক্ষা কেমনভাবে সহজ ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, 'বহির্জীবনে বিজ্ঞান' নামক বিভাগটির প্রারম্ভে তারি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখানো হয়। তারপর চিকিৎসা-প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হয় মানুষের দেহযন্ত্রের বিভিন্ন কল-কব্জা। নানান শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলে যে বিজ্ঞানের অবদান, তার কথা বলা হয়। আর বিজ্ঞান শুধু যে ঘরের ও বাইরের পৃথিবীতেই বিস্তৃত তা নয়, পৃথিবীর বাইরের মহাকাশেও তার বিজয়-অভিযান চলেছে। সেই অভিযানের কাহিনীও দ্বিতীয় বিভাগটিতে বিধৃত।

বিজ্ঞানের যে কৃতিত্বের পরিচয় ছিল প্রথম দু'টি বিভাগে, সেই কৃতিত্বের পশ্চাতে আছে বিজ্ঞানীদের নিরন্তর অনুসন্ধিৎসু মন ও তাঁদের নিরলস সাধনা। দৃষ্টান্ত হিসাবে মাদাম ও আইরিন কুরী, লিজে মাইট্নার, চেন সুং বু, মারিয়া মায়ার, গার্টি কোরী, ডরোথী হচ্‌কিন্স প্রমুখ কয়েকজন বিজ্ঞানীর গবেষণার পরিচয় ছিল তৃতীয় বিভাগে। আমাদের দেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে শ্রদ্ধেয়া অবলা বসুর অবদান সুবিদিত। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে সে জন্যে নারী বিজ্ঞানীদের গবেষণাই বিশেষভাবে বিবৃত হয়। তবে সেই সঙ্গে আচার্য জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদবিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকটি মূল পরীক্ষা দেখানোরও ব্যবস্থা ছিল

মানুষের কর্মজীবনেই শুধু নয়, তার অবসর বিনোদনেও বিজ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্ট। সেই প্রসঙ্গের অবতারণা চতুর্থ বিভাগের উপজীব্য। সঙ্গীতচর্চা ও সঙ্গীতরস আস্বাদনের যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, তা এখানে আলোচনা করা হয়, ব্যাখ্যা করা হয় স্থিরচিত্র ও চলচ্চিত্রের জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির কর্মকৌশল। শব্দের প্রকৃতি, মনুষ্যকণ্ঠ ও কর্ণের গঠনবৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিঃসৃত ধ্বনির পার্থক্য, বিভিন্ন বর্ণের আলোকের যোগ ও বিয়োগ, ক্যামেরা ও প্রজেক্টর প্রভৃতি হরেক রকম বিষয়বস্তু এই বিভাগটিকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুগুলি যন্ত্র, মডেল ও চার্টের সাহায্যে বোঝানোর দায়িত্ব নিয়েছিল স্কটিশ চার্চ কলেজীয়েট স্কুল, বেথুন কলেজীয়েট স্কুল, মুরলীধর বালিকা বিদ্যালয় ও ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষকের ভূমিকায় এদের অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি নিঃসন্দেহে অনুকরণযোগ্য বলা চলে।

সারা প্রদর্শনীটি পরিচালিত হয়েছিল আমাদের মাতৃভাষা বাংলায়। মাতৃভাষাই যে বিজ্ঞানশিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট বাহন, দেশবরেণ্য মনীষীরা সেই সরল সত্যটি আমাদের এই পরমুখাপেক্ষী জাতিকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের জ্ঞান সহজ ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করা যায় বলে যাঁদের সন্দেহ আছে, প্রদর্শনীটি দেখলে তাঁদের সন্দেহের নিশ্চয় নিরসন হতো।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের যে সব পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, তাদের বেশ কয়েকটি নমুনাও প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়ার সুযোগ ছিল।

প্রদর্শনী উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে দুটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে নির্ধারিত বিষয়বস্তু ছিল 'গৃহজীবনে বিজ্ঞান' এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বিষয়-বস্তু হলো 'তোমার প্রিয় বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান'। ১৫টি স্কুল থেকে সর্বসমেত ৩১ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। বক্তৃতার মান মোটামুটি বেশ উন্নতই বলা চলে, অন্ততঃ কয়েকজনের বক্তৃতা শুনে নিঃসন্দেহে মন্তব্য করা যায় যে, তাদের বিজ্ঞানচর্চা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে তারা বিজ্ঞানের সুযোগ্য প্রবক্তা হয়ে উঠবে। 'গৃহজীবনে বিজ্ঞান' শীর্ষক বক্তৃতায়

প্রথম স্থান অধিকার করে মুরলীধর বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীঅনিন্দিতা গুহরায়, দ্বিতীয় স্থান হিন্দু স্কুলের শ্রীঅশোক লাহিড়ী ও লেক স্কুল ফর গার্লস্‌-এর শ্রীআরতি চট্টোপাধ্যায় এবং তৃতীয় স্থান বাগবাজার বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীজয়তী পাল। 'তোমার প্রিয় বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান' শীর্ষক বক্তৃতায় প্রথম স্থান অধিকার করে স্কটিশ চার্চ কলেজীয়েট স্কুলের শ্রীদিলীপ রায় ও বালিগঞ্জ গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের শ্রীঅশোকমোহন চক্রবর্তী, দ্বিতীয় স্থান বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীভাস্বতী গুপ্ত ও হিন্দু স্কুলের শ্রীশান্তনু চক্রবর্তী এবং তৃতীয় স্থান ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের শ্রীঝুমুর রায়।

প্রদর্শনী উপলক্ষে যে স্মারক পত্র প্রকাশিত হয়, তাতে প্রদর্শনী-পরিচিতি ছাড়াও কয়েকটি মুল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে। "বাংলাদেশে নারী-শিক্ষার গোড়াপত্তন," "গৃহজীবনে বিজ্ঞান," "বহির্জীবনে বিজ্ঞান" ও "আধুনিক বিজ্ঞানে নারীর অবদান": এই কয়েকটি পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে বিজ্ঞানের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক—বিশেষতঃ আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্রের দু'টি সময়োপযোগী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে "বাঙ্গালী মহিলার পৃথিবী ভ্রমণ" শীর্ষক অবলা বসুর একটি চিত্তাকর্ষক রচনা

বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও মনীষী প্রদর্শনীটি দেখতে এসেছিলেন। অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর মত বিজ্ঞানের দিকপালগণ প্রদর্শনী পরিদর্শনে এসে কর্মিবৃন্দকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন।

প্রদর্শনীতে জনসমাগম হয় প্রচুর। কখন কখন প্রবেশ দ্বারের সামনে লম্বা কিউতে দাঁড়িয়ে ভিতরে প্রবেশের জন্যে দর্শনার্থীদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল, প্রদর্শনী সমিতির কর্তৃপক্ষকে নিঃসন্দেহে তা প্রেরণা দিয়েছে।

বহু শিক্ষা ও শিল্পকেন্দ্র, বহু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনী সমিতিকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ব্যক্তিগতভাবেও সহায়তা করেছেন অনেকে। এঁদের সকলকেই প্রদর্শনী সমিতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা, স্টেট্‌সম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃত প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহিকে প্রদর্শনী সম্পর্কে প্রশংসামূলক মন্তব্য প্রকাশিত হয়। আকাশবাণীর সংবাদ বিচিত্রাতেও প্রদর্শনী থেকে ক্ষুদে বক্তাদের বক্তৃতার অংশবিশেষ শুনতে পাওয়া যায়। তবে পরিবেশনের ব্যবস্থা থেকে মনে হয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্যান্য সংবাদের তুলনায় বিজ্ঞান সংবাদ আকাশ-বাণীতে অবহেলিত। প্রসঙ্গতঃ বলা চলে যে, রাজনীতিজ্ঞরা এখন যে মতামতই প্রকাশ করুন, আমাদের দেশে অদুর ভবিষ্যতে টেলিভিসন চালু হলে তাতে শিক্ষার চেয়ে রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়বস্তুই প্রাধান্য লাভ করবে।

যাহোক, একথা বোধ হয় বলা চলে যে, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মত এই প্রদর্শনীটিও তার সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রমাণ করেছে, আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে আজ যে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা পেলে তা একদিন ফলপ্রসূ বিরাট এক মহীরুহের আকার ধারণ করতে পারে।

আলোচ্য প্রদর্শনীর উপদেষ্টা মণ্ডলীতে ছিলেন অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক বাসন্তীদুলাল নাগ-চৌধুরী, অধ্যাপক শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর তপেন রায়। প্রদর্শনীটি যাঁরা পরিচালনা করেছিলেন, তাঁরা হলেন—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ডক্টর জয়ন্ত বসু, ডক্টর অনাদিনাথ দাঁ, সর্বশ্রী শ্যামসুন্দর দে, শঙ্কর চক্রবর্তী, অনিলকুমার ঘোষাল, ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দু দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ হাজরা, দীপক বসু, সন্তোষ সরকার, পঙ্কজ রায়, নলিনী চৌধুরী, প্রদীপ সেনগুপ্ত, পরিমলকান্তি ঘোষ, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুভাষচন্দ্র রায়, নীরদবরণ পতি, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্য ভাদুড়ী, রমাপ্রসাদ সরকার, ডক্টর মৃণাল দাশগুপ্ত, ডক্টর সন্তোষকুমার সেন এবং শ্রীযুক্তা টুটুল গুহ ও নন্দিনী রাহা।

জয়ন্ত বসু

বিজ্ঞান-সংবাদ

এসা-২ আবহাওয়া-উপগ্রহ

বিশ্বের সর্বত্র আবহাওয়া-বার্তার প্রচার কেন্দ্রগুলি আমেরিকার নবতম আবহাওয়া উপগ্রহ দ্বিতীয় এসার কাছ থেকে সরাসরি মেঘাবরণের ছবি পেতে সুরু করেছে।

এর ফলে মহাকাশের মাধ্যমে কৃত্রিম উপগ্রহের সহায়তায় পূর্ণাঙ্গ আবহাওয়া নির্ধারণের ব্যবস্থার উদ্বোধন হলো এবং এই সঙ্গে আবহাওয়ার ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হলো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া ব্যুরো জানাচ্ছেন, অফেনবাকে অবস্থিত জার্মান ওয়েদার সার্ভিস ঐ উপগ্রহটি থেকে ১২টি উৎকৃষ্ট ছবি পেয়েছেন বলে সংবাদ দিয়েছেন। মার্কিন আবহাওয়া ব্যুরোর একজন মুখপাত্র বলেন—বিদেশের আরও ৮০টি আবহাওয়া-কেন্দ্র জানিয়েছেন যে, তাঁরাও ছবি পাচ্ছেন।

এসা-২ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই উপগ্রহটি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সঙ্গে সঙ্গে জানায়। এতে আছে স্বয়ংক্রিয় চিত্র গ্রহণে ও প্রেরণের ব্যবস্থা। অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের গ্রাহক-যন্ত্রে এই সব ছবি গ্রহণ করা যেতে পারে।

যে সব কেন্দ্র এই ছবি গ্রহণ করছে, সেখানে আছে একটি অ্যান্টেনা, একটি বেতার গ্রাহক-যন্ত্র এবং বেতার আলোকচিত্র গ্রহণ করবার একটি যন্ত্র।

ইতিপূর্বে বিদেশের আবহাওয়া-কেন্দ্রগুলি মার্কিন উপগ্রহ টাইরস থেকে আবহাওয়ার তথ্য সংক্রান্ত আলোকচিত্র পেত, তবে যুক্তরাষ্ট্রের মারফৎ সে ছবি তাদের হাতে এসে পৌঁছাতো। কিন্তু এসা আবহাওয়া-উপগ্রহটি যখন মহাশূন্যে ছুটে চলে, তখন তার গতিপথের ২,১০০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত আবহাওয়া-কেন্দ্রগুলিতে সে সরাসরি ছবি পাঠায়। এই ছবির সাহায্যে আবহাওয়া-বিশেষজ্ঞদের দৈনিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রদানের সহায়তা হবে।

এসা-১ গত ২রা ফেব্রুয়ারী মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহে এসা-২ এসা-১-এর সহযোগিতা করছে। এসা-১ বিশ্ব পরিক্রমাকালে নানা স্থানের মেঘলোকের আলোকচিত্র গ্রহণ করে, টেপ রেকর্ডারে তা সংরক্ষিত হয়। তারপর টেলিভিশনযোগে সে সব চিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা ও ভার্জিনিয়ার তথ্যসন্ধানী-কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। ওয়েদার ব্যুরোর ওয়াশিংটনের বাইরে যে সব কেন্দ্র রয়েছে, সে সব কেন্দ্রে এই সব ছবি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় পাঠানো হয়। আর সমগ্র পৃথিবীতে বেতারযোগে এসব চিত্রের প্রতিলিপি প্রেরণ করা হয়। আবহাওয়ার পূর্বভাস

জ্ঞাপনে এসব চিত্র খুবই সহায়ক হয়ে থাকে। কারণ এসব চিত্রের মাধ্যমে আকাশের বহু বিস্তৃত স্থানের এবং পৃথিবীর আবহাওয়া গঠনের ধারা বা প্যাটার্ণ সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। এনভিরনমেণ্টাল সায়ান্স সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর শাখা ওয়েদার ব্যুরো। এই মূল সংস্থার আগ্য অক্ষর নিয়েই এই উপগ্রহের নামকরণ করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটি এসা উপগ্রহকে সর্বদাই মহাকাশে পরিক্রমণশীল অবস্থায় রাখবার কথা স্থির করেছেন। এই ধরণের উপগ্রহের প্রত্যেকটির পরমায়ু হবে প্রায় ছয় মাস। এর আগে আবহাওয়া সম্পর্কে টাইরস নামে যে সব তথ্যসন্ধানী উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের অনেকেরই পরমায়ু এসা জাতীয় উপগ্রহের তুলনায় অনেক বেশী ছিল।

এসা-২ দিনের আলোয় প্রতি সাত মিনিটে একটি করে ছবি তুলছে। এসা প্রেরিত আলোকচিত্র গুলি নিম্নলিখিত দেশসমূহে গৃহীত হচ্ছে—ভারত, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, চিলি, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মেনি, হংকং, হাঙ্গেরি, ইন্দোনেশিয়া, ইজরায়েল, জাপান, মালয়েশিয়া, নেদারল্যাণ্ডস, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে, পাকিস্তান ফিলিপাইন্স, পোল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র।

শিল্প-আবর্জনা থেকে ঐশ্বর্য

১৯ শতকের শিল্প-বিপ্লব বৃটেনের অনেক এলাকাকে আবর্জনার স্তূপে পরিণত করে। সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। আজকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিল্প-আবর্জনার স্তূপ (স্ল্যাগটিপ) থেকে নতুন ঐশ্বর্য খুঁজে বের করা হচ্ছে।

অনেক বছর ধরেই ব্লাষ্ট ফার্নেসের আবর্জনাকে গৃহ ও রাস্তা নির্মাণের কাজে লাগানো হচ্ছে। এবার বৃটিশ আয়রন অ্যাণ্ড ষ্টীল রিসার্চ অ্যাসোশিয়েশন (বি-আই-এস-আর-এ) স্ল্যাগ থেকে স্ল্যাগসিরাম নামের একটি নতুন ধরণের গৃহনির্মাণ উপকরণ তৈরি করেছেন।

ব্লাষ্ট ফার্নেস স্ল্যাগে রয়েছে চুন, অ্যালুমিনা ও ম্যাগ্নেসিয়া। এর সঙ্গে বালি মিশিয়ে সিলিকার পরিমাণ শতকরা ৪৫-৬৫ ভাগ বাড়িয়ে ভিট্রোস্ল্যাগ নামে এক শ্রেণীর কাচ পাওয়া যেতে পারে। ভিট্রোস্ল্যাগ অন্যান্য কাচের মত গুঁড়া পদার্থ। একে ক্রিষ্ট্যাল (দানা) আকার দিতে পারলে একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করা যায়।

কতকগুলি পদার্থের অক্সাইড সংযোগ করে ভিট্রোস্ল্যাগকে ক্রিষ্টালে (দানায়) পরিণত করা সম্ভব হবে। প্রস্তুত-প্রণালী সাধারণ কাচ প্রস্তুতেরই অনুরূপ, শুধু সতর্কতার সঙ্গে তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নানারকম আকারে ক্রিষ্ট্যাল হতে পারে। ক্রিষ্ট্যাল যত ছোট হয়, উপকরণটির শক্তি তত বেশী হয়।

এই ভাবে পাওয়া দ্রব্যটির নাম দেওয়া হয়েছে স্ল্যাগসিরাম। এটি সাধারণ সিরামিকের চেয়ে কঠিন, কাচের চেয়ে বেশী স্থিতিস্থাপক এবং তাপসহ ও বেশ বিদ্যুৎ-প্রতিরোধক। পরীক্ষামূলকভাবে ব্যাটারসীতে বি-আই-এস-আর-এর বাড়ীতে স্ল্যাগসিরামের টালি ব্যবহার করে দেখা গেছে—কয়েক মাসের মধ্যে তার কোন ক্ষতি হয় নি।

স্ল্যাগসিরামকে পালিশ করা চলে এবং গ্রানিটের মত একে হীরকাগ্র-করাত দিয়ে কাটা যায়। সাধারণ সিমেণ্ট দিয়ে একে গাঁথা চলে। তৈরি করবার সময় যে ছাঁচ ব্যবহার করা হবে, তারই উপর এর উপরিভাগ ও আকার নির্ভর করবে। বি-আই-এস-আর-এ স্ল্যাগসিরামের শীট তৈরি করবার ও এর সঙ্গে রং মেশাবার সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখছেন।

ব্লাষ্ট ফার্নেস স্ল্যাগ তরল বা কঠিন উভয় অবস্থায় স্ল্যাগসিরামের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে। বলা বাহুল্য, জ্বালানী খরচ বাঁচাতে হলে তরল স্ল্যাগ ব্যবহার করাই ভাল।

পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

১৯৬৫ সালের জন্যে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন তিনজন বিজ্ঞানী যুক্ত-ভাবে। তাঁদের মধ্যে দুজন মার্কিন এবং একজন অধ্যাপক জুলিয়ান সুইঙ্গার। আর জাপানী বিজ্ঞানী হচ্ছেন টোকিও বুন্‌রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিনিচিরো তোমোনাগা। দীর্ঘ ১৫

ডাঃ জুলিয়ান সুইঙ্গার
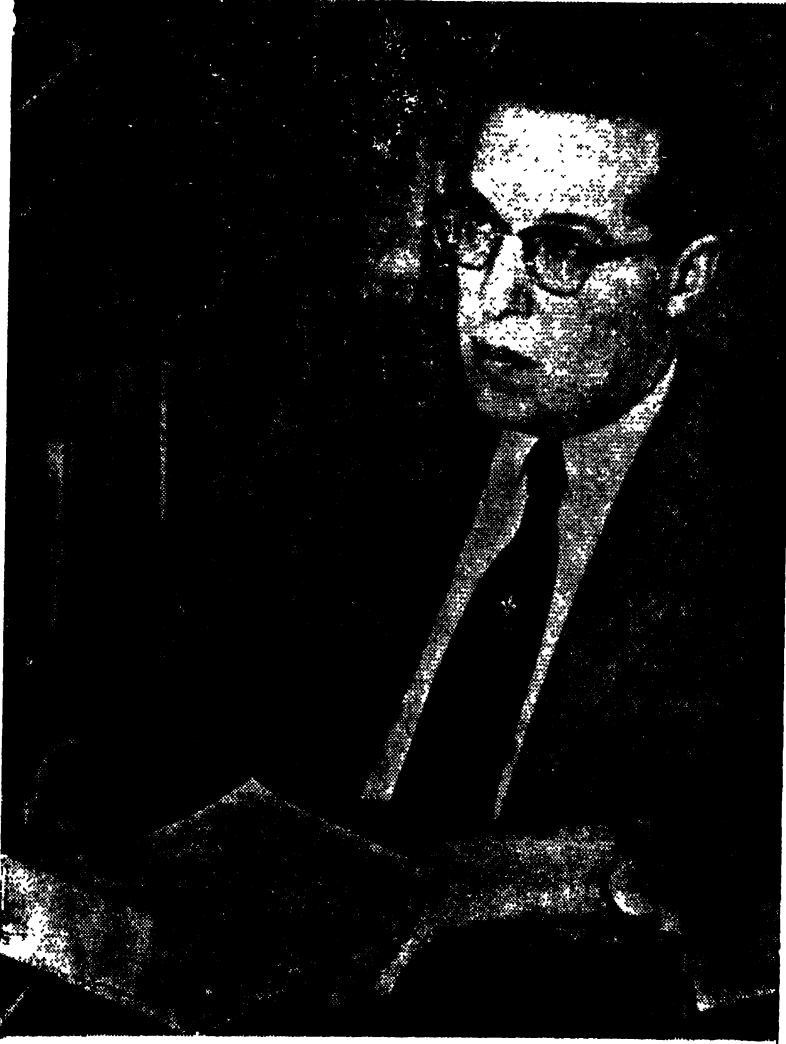
জাপানী। মার্কিন বিজ্ঞানীদ্বয় হচ্ছেন ক্যালি-ফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজির অধ্যাপক রিচার্ড ফেইনম্যান এবং হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বছর পরে আর একজন জাপানী বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন [ইতিপূর্বে ১৯৪৯ সালে জাপানী বিজ্ঞানী ডাঃ হিদেকী ইউকাওয়া

(Yukawa) পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন]। ইলেকট্রন ও আলোক-কণার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত জটিল গণিত সুনিপুণভাবে

ডাঃ রিচার্ড ফেইনম্যান

গড়ে তোলা পদার্থ-বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ কোয়ান্টাম তত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি অনন্যসাধারণ অবদান। এজন্যে তোমোনাগা, সুইঙ্গার এবং ফেইনম্যানকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে।

তাঁদের এই কাজের কথা বলতে গেলে আমাদের প্রায় ৬৫ বছর পিছিয়ে যেতে হবে। ১৯০০ সালে প্রখ্যাত জার্মান পদার্থ-বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক উষ্ণ বস্তু থেকে তড়িৎ-চোম্বক বিকিরণের বর্ণালীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নতুন একটি সূত্র উপস্থাপিত করেন, যা আজ 'প্লাঙ্ক সূত্র' নামে পরিচিত। প্লাঙ্কের নতুন কথা ছিল এই যে, বিকিরণে শক্তির

পরিবর্তন নিরবচ্ছিন্নভাবে হয় না, হয় শক্তির কোয়ান্টাম অনুসারে। এইভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা শক্তিকণাবাদের ভিত্তি স্থাপিত হলো। তড়িৎ-চৌম্বক ঘটনাবলীকে ঘিরে পরবর্তীকালে কোয়ান্টাম তত্ত্বের নানা বিকাশ ঘটেছে। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন তড়িৎ-আলোক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করলেন ফোটনের ভিত্তিতে। এরই ভিত্তিতে বোর্ পরমাণুস্থ ইলেকট্রনদের শক্তিস্তরের কল্পনা অনুসারে হাইড্রোজেনের বর্ণালীর সুচারু ব্যাখ্যা দিলেন। এরপর পারমাণবিক ঘটনাবলীর সকল ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে (Quantum mechanics) প্রয়োগ করলেন শ্রোয়েডিংগার এবং হাইসেনবার্গ।

১৯২৭ সালে ডিরাক একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব পেশ করেন। ডিরাকের এই তত্ত্বই কোয়ান্টাম তড়িৎ-বলবিদ্যার (Quantum Electro-Dynamics) সূচনা করলো এবং এটি কোয়ান্টাম তত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রগতি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোয়ান্টাম কল্পনা কেবল কণার গতিকে আশ্রয় করেই চলে না, তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রটিকেও কোয়ান্টায়িত রূপ দেওয়া হয়। প্রায় একই সময়ে ডিরাক আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতে ইলেকট্রনের স্বভাব, তার চৌম্বক ধর্ম এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীর এক বিস্তৃত ব্যাখ্যার সূত্রপাত করলেন। এই তত্ত্ব অনুসারে ধনাত্মক ইলেকট্রন অর্থাৎ পজিট্রনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ডিরাক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা পরে অ্যাণ্ডারসনের আবিষ্কারে সত্য প্রমাণিত হলো।

কিন্তু এই বিরাট কার্যকারিতার পাশাপাশি মূল ধারণাগত নানা অসুবিধা দেখা দিল। প্রধানতঃ অনেক স্থলেই কোয়ান্টাম গণনায় শক্তির পরিমাপ অনন্ত (Infinite) হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিজ্ঞানীর গণনায় শক্তি বা আধানের অনন্ত পরিমাপের কথা অচল।

তাই পুরনো রীতিকে অন্যবিধ বিশুদ্ধ করে নিয়ে 'ভর ও আধানের পুনঃ স্বাভাবিকীকরণ' (Mass and charge renormalisation) করতে হয়। এইভাবে 'অবাঞ্ছিত অনন্ত'-এর কথা আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি।

১৯৪৪ সালে জাপানী ভাষায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় তোমোনাগা তাঁর 'পুনঃ স্বাভাবিকীকরণ' সংক্রান্ত তত্ত্ব প্রথম বিবৃত করেন। সুইঙ্গার এবং ফেইনম্যান এতদ্‌সম্পর্কিত তাঁদের গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন ১৯৪৭ সালে। তোমোনাগা এবং সুইঙ্গার ও ফেইনম্যান পরস্পরের কাজের বিষয় না জেনেই (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ তখন যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয় নি) স্বতন্ত্রভাবে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

তড়িৎ-কণার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তোমোনাগা, সুইঙ্গার এবং ফেইনম্যান তাঁদের 'পুনঃ স্বাভাবিকীরণ' (Renormalisation) তত্ত্ব গড়ে তোলেন। তোমোনাগা এবং সুইঙ্গার বলেন, তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-কণার যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয়, সেটিকে তরঙ্গবাদের পরিচিত স্থানীয় ক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যায়। পক্ষান্তরে ফেইনম্যানের মতে পুরনো গতিশাস্ত্রের চলিত সময় ব্যবধানে এই ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ১৯৪৯ সালে ডাইসন দেখান, তোমোনাগা এবং সুইঙ্গার ও ফেইন-ম্যানের তত্ত্ব সম্পূর্ণ অনুরূপ।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, ইলেকট্রন ও তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে এই তত্ত্ব যদিও খাটে, কিন্তু কেন্দ্রীনের (Nucleus) অভ্যন্তরে যেখানে বল তীব্র, সে ক্ষেত্রে এটি সন্তোষ-জনক নয়। তবু এই তত্ত্বের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মূল কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং বিশেষতঃ কোয়ান্টাম তড়িৎ-চৌম্বক ঘটনাবলীকে ঘিরে যে সব গবেষণা গড়ে ওঠে, তার অনেকগুলিই নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। তাই অনেকে বলতেন,

কোয়ান্টাম তড়িৎ বলবিদ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে তোমোনাগা এবং সুইঙ্গার ও ফেইনম্যানেরও নোবেল-পুরস্কার পাওয়া উচিত। ১৯৬৫ সালে এই তিনজন বিজ্ঞানীকে একযোগে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় তাঁদের কাজের গুরুত্বই স্বীকৃত হয়েছে।

পুস্তক পরিচয়

মেঘনাথ রচনা সংকলন—শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। শ্রীমতী রমা সাহা কর্তৃক প্রকাশিত। পরিবেশক: সায়েন্স বুক এজেন্সী; পি ১৩৩ বি, লেক টেরাস, কলিকাতা-২৯। মূল্য ৫ টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের উত্তরাধিকার নিয়ে যে কয়েকজন মনীষীর আবির্ভাব হয়েছিল, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাঁদের অন্যতম। কিন্তু এই কারণেই তিনি অনন্য যে, সারাজীবন বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে তার ফলাফলকে দেশের বৈষয়িক উন্নয়নে নিয়োজিত করবার কথা তিনি চিন্তা ও প্রচার করে এসেছেন। গান্ধীপন্থা নিয়ে যখন দেশে প্রচণ্ড আলোড়ন এসেছিল, সে সময় এরকম বৈপ্লবিক চিন্তাধারা অবশ্যই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। অবশ্য সে যুগে সরকারীভাবে গান্ধীপন্থা অথবা আধুনিক যন্ত্রবিদ্যায় দেশের সর্বমুখী উন্নয়ন পরাধীন দেশে সম্ভব ছিল না। গান্ধীপন্থারও কার্যকরী পরীক্ষা যখন চলছিল, তার সমর্থকদের হাতে তখনও দেশের দায়-দায়িত্ব আসে নি। তাই এই পন্থার ফলপ্রসূতা পরীক্ষা করবারও উপায় ছিল না। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশে ভারী শিল্পের প্রসার ও যন্ত্রবিদ্যার বহুমুখী প্রয়োগ থেকে বলা যায় যে, কার্যতঃ অধ্যাপক সাহার চিন্তাধারাই বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনাবিদ্ ও জনসাধারণের পক্ষে তাই অধ্যাপক সাহার জীবনদর্শন ও চিন্তাধারার নতুন মূল্যায়ন দেশের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। বর্তমান সংকলনের প্রথম দুটি প্রবন্ধ অধ্যাপক সাহার সেই সব চিন্তাধারার প্রতীক হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। এ-সম্পর্কে তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধের সংখ্যাই অধিক। বর্তমান বাংলা প্রবন্ধ দুটি পড়ে পাঠকেরা তাঁর সামগ্রিক রচনাবলীর মৌলিকতা সন্ধানের প্রেরণা পাবেন।

বর্তমান সংকলনে অধ্যাপক সাহার সুযোগ্য ছাত্র অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় এই দুটি প্রবন্ধসহ বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক সাহার কয়েকটি রচনা বাঙ্গালী পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। প্রবন্ধগুলি শুধু সুনির্বাচিতই নয়, পরন্তু অধ্যাপক সাহার বিজ্ঞান সাধনা, দেশসেবা ও বিভিন্ন চিন্তাধারার একটা সামগ্রিক রূপ এই সংকলনটিতে বিধৃত হয়েছে। সমসাময়িক ব্যক্তিরা কোন প্রতিভার যোগ্য বিচারক নন। তাই উত্তর কালের সমাজই অধ্যাপক সাহার চিন্তাধারার উপযুক্ত মূল্যায়ন করতে পারে।

এই মনীষীর জীবনদর্শন, যা তাঁর কাজের ইতিহাসে ও লেখায় ছড়িয়ে আছে, তার ভূমিকাস্বরূপ এই সংকলনটি সে সম্পর্কে আমাদের বিচার-বুদ্ধি জাগ্রত করবে, সন্দেহ নেই।

বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারে অধ্যাপক সাহার যে আগ্রহ ছিল, বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি তার নিদর্শন। তাছাড়া এই প্রবন্ধগুলি থেকে তাঁর বিজ্ঞান-সাধনা ও বিজ্ঞানের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধার যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে তাঁর বিজ্ঞানী জীবনের স্বরূপ কিছুটা জানা যাবে।

ধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত এদেশে সমাদৃত হবে না জেনেও তিনি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তার আলোচনা করেছেন। হিন্দুর বেদ, দর্শন ও জ্যোতিষ সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। দেশাত্মবোধের প্রেরণায় স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সে যুগে যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল, তাতে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার গৌরবে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতাকে অস্বীকার করবার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-নির্ভর সভ্যতাকে অধ্যাপক সাহা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। দেশের উন্নয়নে তার প্রয়োগের জন্যে তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। নিউক্লিয়ার পদার্থ-বিজ্ঞানের মত আধুনিক বিষয়টির এদেশে গবেষণার পুরোধারূপে তিনি দেশের অশেষ কল্যাণ করেছেন। তাঁর এই দ্বিধাহীন মনোভাব নিয়ে বিরুদ্ধ মতের সঙ্গে আপোষ না করা—এই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। কোন নেতা বা জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে তাঁর মতামত থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসবার মত দুর্বলতা তাঁর ছিল না, ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে তো নয়ই।

বর্তমান সংকলনটির সম্পাদনা এই জন্যে প্রশংসনীয় যে, এর প্রবন্ধগুলি থেকে এই দৃঢ়চিত্ত দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি ফুটে উঠেছে—ফলে পাঠকেরা এই মানুষটিকে সম্পূর্ণভাবে বিচার করবার সুযোগ পাবেন।

ভূমিকায় সম্পাদক অধ্যাপক সাহা সম্পর্কে যে আলোকপাত করেছেন—তাঁর জীবনদর্শনের মূল্যায়নে তা একটি প্রয়োজনীয় সংযোজন বলে বিবেচিত হবে।

সংকলনটির ছাপা, বাঁধাই ও সজ্জা সুরুচি-সম্মত ও প্রশংসার যোগ্য।

সূর্যেন্দুবিকাশ কর

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—১৯৬৬

১৯শ বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

আজকাল কারখানায় ইস্পাতের পুরা কাঠামো তৈরি হয়, সেগুলির একটির সঙ্গে আর একটি জুড়ে যেমন নানাজিনিষ তৈরি হয়, ঠিক তেমনভাবে কারখানায় তৈরি গৃহের অংশ জুড়ে জুড়ে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ গৃহ তৈরি হবে। এই পদ্ধতির নাম — বিওটেক্‌টুর। এর উদ্ভাবক পশ্চিম জার্মেনীর ষ্টুটগার্ট শহরের স্থপতি রুডল্‌ফ ডোয়েরনাথ। এই পদ্ধতিতে দেয়াল তৈরির মালমশলা হলো অতি ছোট ছোট কাদার বল ও একরকম প্লাষ্টিকের ফেনা। এগুলিকে বলা হয় আইসোটন। এর দ্বারা শব্দ ও ঠাণ্ডা ঠেকানো যায়। প্রয়োজনবোধে একটা সম্পূর্ণ গৃহকেই ট্রেন, ট্রাক বা গাধাবোটে চাপিয়ে এক শহর থেকে আর এক শহরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া যাবে। আই, সি, এস.

করে দেখ

ছবি নকল করবার সহজ উপায়

খবরের কাগজ বা অন্যান্য কাগজে যে সব ছবি বা ব্যঙ্গ চিত্রাদি ছাপা হয়, সেগুলিকে সাদা কাগজ অথবা তোমাদের সাদা খাতায় খুব সহজেই নকল করে রাখতে পার। খবরের কাগজে ছাপা কোন ছবি যদি সাদা কাগজে তুলতে চাও, তাহলে প্রথমে তরল পদার্থের একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে। এই মিশ্রণটি তৈরি
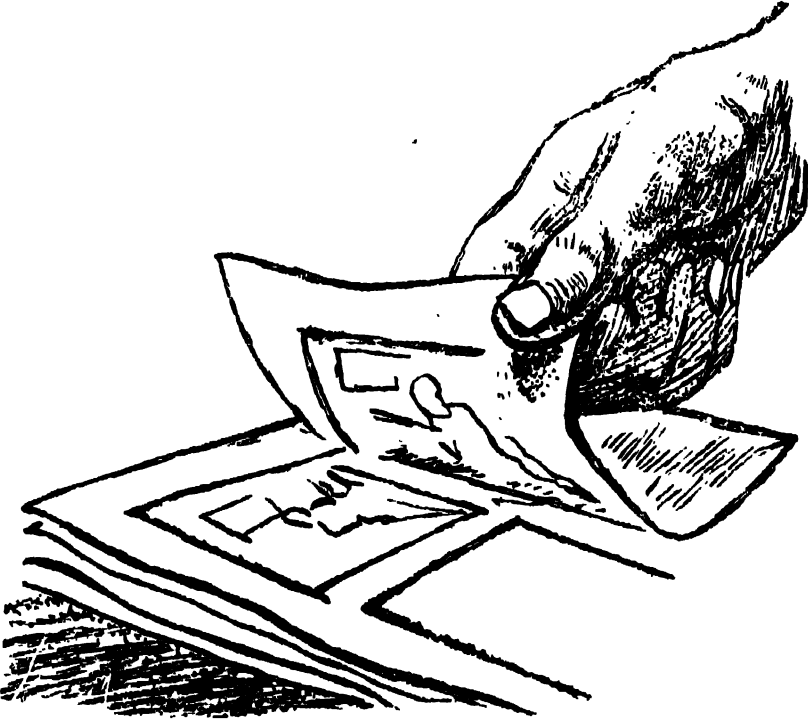
করতে কিছুটা তার্পিন (Turpentine) ও সাবানের দরকার হবে। চার ভাগ জলের সঙ্গে একভাগ তার্পিন মিশ্রিত কর। পেন্সিলের মাথায় যেমন ছোট্ট এক টুক্‌রা রাবার লাগানো থাকে, ঠিক সেই রকম এক টুক্‌রা সাবান ঐ তার্পিন মিশ্রিত জলে ফেলে দাও। সাবানের টুক্‌রাটা গলে না যাওয়া পর্যন্ত পাত্রটাকে বেশ করে ঝাঁকুনি দিতে থাক। মিশ্রণের জল ও তার্পিন (যাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিভিন্ন) যেন আলাদা হয়ে না যায়, সেজন্যেই সাবান দেওয়া দরকার।

যে ছাপানো ছবি নকল করতে চাও, মিশ্রণে ভিজানো একখণ্ড ন্যাকড়া বা তুলা দিয়ে সেটাকে এবার আল্‌তোভাবে ভিজিয়ে দিয়ে তার উপর সাদা একখানা

কাগজ চেপে বসাও এবং মসৃণ একটি বাটী বা চামচের পিঠ দিয়ে সাদা কাগজখানার উপর বেশ কয়েকবার জোরে জোরে ঘষে দিলেই দেখবে, কাগজের নীচের পিঠে ছবিটা অবিকল উঠে এসেছে—তবে ছবিটা উঠবে অবশ্য উল্টোভাবে। তার্পিন ছাপার কালিকে বেশ খানিকটা গলিয়ে দেয়, কাজেই ছবিটা সাদা কাগজে উঠে আসে।

—গ—

জোনাকী

জোনাকী এক বিচিত্র প্রাণী—ছোট শিশু যতখানি বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে, প্রাণীটি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের পরিমাণ তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে জোনাকীর জীবন-ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা এমন বহু বিচিত্র জিনিষ লক্ষ্য করেছেন, যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আজও পাওয়া সম্ভব হয় নি। তাঁরা দেখেছেন—পৃথিবীতে প্রায় দেড় হাজার বিভিন্ন প্রজাতি ও উপ-জাতির জোনাকী আছে; তাদের আলোর রং যেমন বিভিন্ন, আলো বিকিরণের সময়ও তেমনি বিভিন্ন। এক জাতের জোনাকীর শরীর থেকে প্রতি দু-সেকেণ্ড অন্তর আলো প্রকাশ পেতে দেখা যায়, আবার এমন জোনাকীও আছে, যারা আট থেকে দশ মিনিট অন্তর আলো বিকিরণ করে। তোমরা শুনলে হয়তো অবাক হয়ে যাবে যে, সব জোনাকীর কিন্তু আলো বিকিরণের ক্ষমতা নেই। উত্তর ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার কয়েকটি অঞ্চল এবং ইংল্যাণ্ডে এক শ্রেণীর জোনাকী দেখা যায়, যাদের শরীরে আলো দেবার কোন ব্যবস্থা নেই।

আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে, অন্ধকারে পথ দেখবার জন্যেই জোনাকী নিজের শরীর থেকে আলো বিকিরণ করে। সুতরাং দিন বা রাত্রি যে কোন সময়ই হোক না কেন, অন্ধকার জায়গা দেখলেই জোনাকী আলো দিয়ে থাকে। ধারণাটা কিন্তু ভুল। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, দিন ও রাত্রি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি বিশেষ সময়েই জোনাকী তার শরীর থেকে আলো বিকিরণ করে। শুধু তাই নয়, এই সময়টি নির্দিষ্ট এবং এই বিষয়ে প্রাণীটি একেবারে ঘড়ির কাঁটার মতই নির্ভুল। জোনাকীর আলো দেবার সময় হচ্ছে ঠিক সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার পর। সময় সম্বন্ধে জোনাকী এতই নির্ভুল যে, তা দেখে বিজ্ঞানীরা বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। গবেষণাগারের কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে এক ঝাঁক জোনাকী ছেড়ে দিয়ে তাঁরা

দেখেছেন, যারা দিনের ভিতর একবারও তাদের শরীর থেকে আলো বিকিরিত হয় নি—এমন কি, চারদিক একেবারে অন্ধকার করে দিয়েও আলো প্রকাশের কোন লক্ষণই দেখা যায় নি। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই তারা আলো বিকিরণ করতে সুরু করেছে। কৃত্রিম ও স্বাভাবিক আলো কিংবা দিন ও রাত্রির মধ্যে পার্থক্য জোনাকীরা কেমন করে বুঝতে পারে, আমাদের কাছে আজও তা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে, অবশ্য বিভিন্ন দেশে এবিষয়ে গবেষণা চালানো হচ্ছে।

জোনাকীদের প্রখর সময়-জ্ঞানের কারণ নির্দেশ করা যেমন বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, তেমনি এদের ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে কি ভাবে এবং কোথায় যে আলো উৎপন্ন হয়, তারও সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্য তাঁরা দিতে পারেন নি। তবে এই আলো সৃষ্টির মূলে যে অক্সিজেন রয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ আমরা জানি, প্রত্যেক দহনকার্যের জন্যে অক্সিজেনের প্রয়োজন। তাই কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, প্রাণীটির দেহের অভ্যন্তরে ছোট ছোট নালিকা থেকে কিছু পরিমাণ অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। তাদের দেহে লুসিফেরিন ও লুসিফারেজ নামক রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেনের সম্মিলনে সৃষ্টি হয় এই আলোর। এই আলোর বিশেষত্ব এই যে, এর দীপ্তি আছে, কিন্তু তাপ নেই বললেই চলে। তাই একে ঠাণ্ডা আলো বলাই সঙ্গত। পরীক্ষায় দেখা গেছে, একটি মাত্র মোমবাতি থেকে যে পরিমাণ আলো পাওয়া যায়, সেটুকু আলো উৎপন্ন করতে কম পক্ষে অন্ততঃ ৪০টি জোনাকীর দরকার।

এই আলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। জোনাকী মরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আলো দেবার ক্ষমতাও যে নষ্ট হয়ে যায়, তা কিন্তু মোটেই নয়, মৃত জোনাকীর শরীর থেকেও আলো বেরুতে দেখা গেছে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, মৃত জোনাকীর শরীরের পশ্চাদ্ভাগ চূর্ণ করে বিশেষ তাপমাত্রায় রাখলে প্রায় তিন বছর পর্যন্ত তার আলো বিকিরণের ক্ষমতা থাকে। শুধু এই গুঁড়ার মধ্যে সামান্য জল দিলেই তাথেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে।

জোনাকীরা কি খেয়ে বেঁচে থাকে, এই কৌতূহল তোমাদের মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। ছোট ছোট শামুক, গুগ্‌লি ও অন্যান্য জলজ কীট-পতঙ্গ এদের প্রধান খাদ্য। প্রাণীটির শিকার ধরবার পদ্ধতি কিন্তু বেশ মজার। পুকুরের ধারে পড়ে থাকা মরা শামুক ও গুগ্‌লির খোল তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। এর অধিকাংশই জোনাকীদের খাদ্যের ভুক্তাবশেষ। রাত্রিবেলায় জীবন্ত শামুক প্রভৃতিকে আক্রমণ করে এরা তাদের নরম মাংসটুকু খেয়ে ফেলে। এই মৃত শামুকের খোলগুলি পড়ে থাকে।

কথাটা তোমাদের অনেকের কাছেই বোধ হয় আশ্চর্য মনে হবে। পৃথিবীর বহু দেশে শরীরের শোভা বাড়াবার জন্যে প্রসাধনের দ্রব্য হিসেবে জোনাকী ব্যবহার করা

হয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন অঞ্চলে মেয়েরা মাথার চুলে ও দেহের অন্যান্য অংশে জীবন্ত জোনাকী গেঁথে রাখে ; কারণ তাদের ধারণা এর দ্বারা দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। জাপানে ছোট-বড় নানা পারিবারিক অনুষ্ঠানে কেউ কেউ লতাপাতা দিয়ে সজ্জিত বাড়ীর দরজা, জানালা ইত্যাদির মধ্যে রাত্রিবেলায় জোনাকী আট্‌কে দেয়। সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক লোক আছে, যাদের পেশাই হচ্ছে এই সব অনুষ্ঠানে জোনাকী সরবরাহ করা এবং এর দ্বারা তারা দু'পয়সা রোজগারও করে থাকে।

জোনাকীর আলোর সবচেয়ে বিচিত্র ব্যবহার দেখা যায় জাভায়। এই উদ্দেশ্যে বাটির আকারে একটি ছোট কাঠের বাক্স ব্যবহার করা হয়। এর উপরের দিকে থাকে একটি ঢাক্‌না, যেটি এক পাশে সরিয়ে দরকার মত বাক্সটি খোলা বা বন্ধ করা চলে। এর নীচের অংশে পাত্‌লা এক স্তর আঠা মাখিয়ে তাতে অনেকগুলি জীবন্ত জোনাকী আট্‌কে রাখা হয়। সেখানে প্রায় প্রতি দরিদ্র গৃহস্থের বাড়ীতেই এই যন্ত্র দেখা যায়। বাড়ীর মেয়েরা সাংসারিক কাজ করবার সময় রাত্রিবেলায় সর্বদা এটি সঙ্গে রেখে দেয় এবং প্রয়োজনমত বাক্সটির ডালা খুলে সেই আলোয় সেরে নেয় বাড়ীর কাজকর্ম। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেখানে পল্লী অঞ্চলে ছিঁচ্‌কে চোরেরাই রাত্রে চুরি করবার সময়ে জোনাকীর এই আলো ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশী। কারণ বাক্সের ঢাক্‌নাটি বন্ধ করে দিলেই আর তাদের কেউ দেখতে পাবে না, আবার দরকারমত ঢাক্‌নাটি খুললে আলো পাওয়া যাবে। তাছাড়া এই উদ্দেশ্যে কাঠের যে বাক্স ব্যবহার করা হয়, সেটিও খুব হাল্‌কা, বয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ কষ্ট হয় না। সুতরাং সহজে ও সস্তায় আলো পাবার এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়।

মিনতি সেন

বীজাণু ও প্রাণিদেহ

মানুষ বিজ্ঞানকে জয় করলেও আজও মৃত্যুকে জয় করে অমরত্ব লাভ করতে সক্ষম হয় নি, বরং এখনও নানা রোগের আক্রমণে বহু জীবনই অকালে বিনষ্ট হয়ে যায়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বহু রোগই নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছে, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, নিত্য নতুন ব্যাধির আক্রমণও অব্যাহত রয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। মানুষ আজ আবিষ্কার করেছে—পৃথিবীর সমস্ত ব্যাধিরই মূল বিভিন্ন ধরণের বীজাণু। এই বীজাণু বা ভাইরাস অনবরত মানবদেহে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছে। আর যখনই ঐ বিশেষ রোগের বীজাণু শরীরের অভ্যন্তরে অন্যান্য রক্ষাকারী বীজাণুকে জয় করতে সক্ষম হচ্ছে, তখনই মানুষ ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। বীজাণুর সঙ্গে তাই মানুষের দিবারাত্রি যুদ্ধ চলেছে।

কেবল মানুষই নয়, জন্তু-জানোয়ারের রোগের কারণও বীজাণু। প্রাণিবিদেরা প্রাণিজগতে নানা বিচিত্র ও অদ্ভুত ধরণের রোগের প্রকোপ দেখতে পেয়েছেন ও তার প্রতিকারের জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করে চলেছেন। পশুদের মধ্যে যেমন জলাতঙ্ক রোগ হয়ে থাকে, প্রাণিবিদেরা দেখেছেন—বাদুরের মধ্যেও তেমনি ঐ রোগ হয়ে থাকে। কথাটা আশ্চর্যজনক মনে হলেও সত্য। জলাতঙ্ক রোগও এক ধরণের বীজাণুর আক্রমণেই ঘটে থাকে। জলাতঙ্ক সাধারণতঃ মানুষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির মধ্যেই সংক্রামিত হয়।

বীজাণু প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হবার পর বংশবৃদ্ধি করে বেঁচে থাকবারই চেষ্টা করে। এক এক ধরণের বীজাণু এক এক ধরণের অবস্থায় এ-কাজ করতে পারে। ঐ অবস্থা যে কোন প্রাণিদেহেই থাকা সম্ভব। এতে মানুষ বা পশুর মধ্যে কোন সীমারেখা টানা চলে না বলে বর্তমানে প্রমাণ পাওয়া গেছে। যে কোন প্রাণিদেহেই বীজাণুর বৃদ্ধি চলতে পারে—অবশ্য সেই দেহে যদি ঐ বিশেষ ধরণের বীজাণুর বাঁচবার অবস্থা থাকে। বর্তমানে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে, একই ধরণের বীজাণু মানবদেহ ও পশুদেহে রোগ সংক্রমণ করতে পারে, অর্থাৎ মানবদেহের রোগ পশুদেহে ও পশুদেহের রোগ মানবদেহে সংক্রামিত হতে পারে। কতকগুলি বিশেষ ধরণের রোগের বীজাণুই একাজ করতে পারে। মানবদেহে যে সব রোগ পশুদেহ থেকে সংক্রামিত হয়, তাদের বলা হয় Zoonoses। আবার পশুদেহে যে রোগ মানবদেহ থেকে সংক্রামিত হয়, তাদের নাম Anthropozoonoses। এই ধরণের বীজাণুর কার্যক্ষমতা মানুষের গোচরে আসবার ফলে চিকিৎসা-বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। এর ফলে মানুষের চিকিৎসা ও পশুর চিকিৎসা পরস্পর খুব কাছাকাছি এসে গেছে। বর্তমানে যখন

একই ধরণের বীজাণু উভয় ক্ষেত্রে একই রোগ সংক্রমণে সক্ষম বলে জানা গেছে, তখন চিকিৎসাও অনেকটা একই রকমের হতে পারে। যার ফলে অনায়াসেই বলা চলে যে, মানুষ হয়তো ভবিষ্যতে প্রয়োজনবোধে পশু-চিকিৎসকের কাছেও যেতে পারে তার রোগ নিরাময়ের জন্যে। এতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। জার্মেনীর বিখ্যাত অধ্যাপক এ. মায়ার এ-সম্বন্ধে গবেষণার পর দৃঢ়ভাবে এরূপ মন্তব্য করেছেন। বর্তমানে বিশ্বের বহু দেশেই এই কথা স্বীকৃত হয়েছে, যার ফলে সাধারণ চিকিৎসক ও পশু-চিকিৎসকদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে।

বিশেষ ধরণের কয়েকটি রোগ মানুষ ও পশুর দেহে সহজেই সংক্রামিত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে জলাতঙ্ক, মেনিনজাইটিস্, ইনফ্লুয়েঞ্জা ও বসন্ত রোগের কথা বলা চলে। এই রোগের বীজাণু সহজেই মানব ও পশুদেহে বংশবৃদ্ধি করে রোগ সংক্রামিত করে থাকে। এই ধরণের রোগের বীজাণু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, মানবদেহ বা পশুদেহে এরা সমান তালেই এদের বংশবৃদ্ধি করে থাকে, যার ফলে রোগের প্রকোপ উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবেই হয়ে থাকে। পরীক্ষাগারে ঐ রোগের বীজাণু পরীক্ষা করে দেখা গেছে—সঠিক অবস্থায় ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে না থাকলে ঐ বীজাণুগুলিকে সজীব বলে মনে হয় না। তখন তাদের মৃত বলা চলে। আবার যে দেহকোষে এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে, সেরূপ অবস্থায় রেখে দিলেই এরা সজীবতা প্রাপ্ত হয়। কাজেই ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যজনক বলা চলে। কোন বিশেষ রোগের বীজাণুর বংশবৃদ্ধি ও রোগ সংক্রমণের জন্যে প্রয়োজন কোন এক বিশেষ স্থান বা অবস্থা। অন্য ক্ষেত্রে ঐ রোগের বীজাণুর কোন কর্মক্ষমতা থাকে না।

সংক্রামক রোগের বিশেষজ্ঞেরা জানেন—কোন বিশেষ অবস্থা বীজাণুর পক্ষে সুবিধাজনক হলে অন্য কোন দেহ বা অবস্থা তার আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে। চিকিৎসকেরা বর্তমানে জানবার চেষ্টা করছেন—আরও কত রকমের রোগ পশুদেহ থেকে মানবদেহে সংক্রামিত হবার আশঙ্কা আছে। এই বিষয়ে আলোকপাত করা সম্ভব হলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অবশ্যই যুগান্তর ঘটবে সন্দেহ নেই। চিকিৎসকেরা বর্তমানে আরও জানবার চেষ্টা করছেন—কিভাবে এই রোগের বীজাণুগুলি পরস্পর পরস্পরকে সংক্রামিত করে থাকে। এই বিষয় জানা গেলে প্রথম অবস্থাতেই সাবধানতা অবলম্বন করা চলবে।

মানবদেহ ও পশুদেহে যে একই ধরণের বীজাণু বিশেষ কোন রোগ সংক্রামিত করতে পারে, সে বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন ১৭৯৬ সালে ডাঃ জেনার। তিনিই বসন্তরোগের টিকা আবিষ্কার করে জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেন। তিনিই দেখেন যে, বসন্তরোগ মানব ও পশুদেহ সমানভাবেই আক্রমণ করে,

যার ফলে গরুর বসন্তরোগের গুটি থেকেই তিনি ঐ রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। বর্তমানে জানা সম্ভব হয়েছে যে, মানবদেহে হাম রোগের সংক্রমণ ঘটে ঐ ধরণের রোগের এক প্রকার বীজাণু থেকে। ঐ বীজাণু কুকুরের দেহ থেকেই মানবদেহে সংক্রামিত হয়। ঐ রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কোন টিকা তৈরির জন্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কুকুরের দেহ থেকে কোন বীজাণু নিয়ে টিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নি। বৈজ্ঞানিকেরা একটি আবিষ্কারে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন যে, প্রাণিদেহে কোন রোগের বীজাণু প্রবিষ্ট হলে অন্য কোন রোগের বীজাণুতেও ঐ প্রথম রোগের বীজাণু আশ্রয় নিতে পারে, অর্থাৎ দ্বিতীয় রোগ সংক্রমণ করতে সাহায্য করে।

যাহোক, বীজাণু সম্বন্ধে মানুষ এখন খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে শিখেছে। তবুও রোগের প্রকোপ কমে নি। নিত্য এখন ব্যাধি প্রাণিজগৎকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। তাঁরাও ঐ বাধা জয় করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। হয়তো একদিন নীরোগ পৃথিবী মানব-সমাজকে অভিনন্দন জানাতে পারবে।

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। জীম্যান এফেক্ট (Zeeman Effect) কি?

প্রঃ ২। হেমিমরফিক ক্রিষ্ট্যাল (Hemimorphic crystal) কাদের বলে? উদাহরণ কি?

প্রঃ ৩। টটোমারিজম (Tautomarism) কাকে বলে?

বিকাশরঞ্জন বিশ্বাস

উঃ ১। উচ্চশক্তির চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে একক কম্পনাঙ্কবিশিষ্ট আলোক-তরঙ্গ (Monochromatic light) পাঠালে ঐ আলোক-তরঙ্গ ভেঙ্গে গিয়ে ঘন সন্নিবেশিত কম্পনাঙ্কের কয়েকটা নতুন তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। আবিষ্কর্তার নাম অনুসারে এই প্রক্রিয়াকে জীম্যান এফেক্ট বলে। প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে পরমাণুর নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলেই এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। নবগঠিত

আলোক-তরঙ্গের কম্পনাঙ্কের পার্থক্য থেকে পরমাণুর গুণাবলী বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

উঃ ২। আমরা জানি যে, ঘন ক্ষেত্রবিশিষ্ট কৃষ্ট্যালের বিভিন্ন তলগুলি কৃষ্ট্যালের অক্ষ ও তার প্রান্তবিন্দুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অবস্থিত থাকে (Symmetrical)। এক ধরণের কৃষ্ট্যাল আছে, যাদের অক্ষীয় প্রান্তদ্বয়ের তলগুলি অক্ষের সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য রক্ষা করে না। এদেরই নাম হেমিমরফিক কৃষ্ট্যাল। হেমিমরফিক কৃষ্ট্যাল কোথাও রাখলে যদিও স্থান অধিকার করে, কিন্তু কোন স্থান পরিবেষ্টন করতে পারে না। এদের কোন কেন্দ্র-সাম্যও (Centre of symmetry) নেই। টুর্মালিন, ডায়াবলাইট, নেফেলিন ইত্যাদি কৃষ্ট্যালের এরূপ ধর্ম দেখা যায়।

উঃ ৩। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দুই বা ততোধিক রাসায়নিক পদার্থের অণুগুলি সমান সংখ্যক ও সমপর্যায়ের বিভিন্ন পরমাণুর দ্বারা গঠিত। কিন্তু পরমাণু-গুলির পারস্পরিক সংযোগের বিভিন্নতার জন্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়ে থাকে। এই জাতীয় রাসায়নিক পদার্থকে পরস্পরের আইসোমার বলে; যেমন—অ্যামোনিয়াম সায়ানেট (NH_4CNO) এবং ইউরিয়া [$CO(NH_2)_2$]। এখন, দুটি আইসোমার দিয়ে গঠিত যদি কোন যৌগিক পদার্থ সাম্যাবস্থায় থাকে, তবে সেই অবস্থাকে টটোমারিজম বলে। প্রত্যেকটি উপাদানকে বলা হয় টটোমার। এদের মধ্যে একটিকে যদি সরিয়ে ফেলা হয়, তবে দ্বিতীয়টির কতক অংশ প্রথমটিতে বদ্‌লে গিয়ে পুনরায় সাম্যাবস্থায় ফিরে আসে।

শ্যামসুন্দর দে

প্রঃ ১। ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্কোচন বা প্রসারণ ঘট্‌ছে কি? যদি ঘটে, কি হারে ঘট্‌ছে?

প্রঃ ২। প্রসারণের গতি যদি আলোর গতি ছাড়িয়ে যায়, তাহলে কি হওয়া সম্ভব? ব্রহ্মাণ্ডের কোন অংশে প্রসারণ সেকেণ্ডে কয়েক কোটি আলোক-বর্ষ কল্পনা করা সম্ভব কি?

প্রঃ ৩। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন কত?

নীহারেন্দু দাস

উঃ ১। ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্কোচন বা প্রসারণ হচ্ছে কি না, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছেন, কিন্তু এদের কোন পরীক্ষালব্ধ সঠিক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক স্লাইফার (Slipher) প্রথম লক্ষ্য করেন যে, বহু দূরবর্তী ছায়াপথগুলির রং ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে—ক্রমশঃ লালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ বলা হয়েছে—ছায়াপথগুলি সব পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এদের এই গতির জন্যে ডপ্‌লার এফেক্টের (যদি দর্শক ও তরঙ্গ-

বিকিরণকারী বস্তুর মধ্যে একটা আপেক্ষিক গতি থাকে, তবে দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গের দৈর্ঘ্যও বৃদ্ধি পায় এবং বিপরীতভাবে একটি কমলে অপরটিও কমে) ফলে সুদূরের ছায়াপথের আলোকের রং (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য) পরিবর্তিত হচ্ছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের কাছ থেকে দূরবর্তী ছায়াপথগুলি দূরে সরে যাচ্ছে। এথেকেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে। একদল বৈজ্ঞানিকের মতে অবশ্য ব্রহ্মাণ্ড 'স্পন্দনশীল' অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে একবার প্রসারিত হচ্ছে ও একবার সঙ্কুচিত হচ্ছে। আমরা বর্তমানে প্রসারণের পর্যায়ে রয়েছি। দূরাগত আলোক-তরঙ্গের রং পরিবর্তনের ঘটনাটি সম্প্রতি অন্য একভাবেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে দেখানো যায় যে, দূরবর্তী ছায়াপথের আলোক অন্য ছায়াপথের মাধ্যাকর্ষণের মধ্য দিয়ে আসবার সময়ে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লালের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। এই ধারণা সত্য হলে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ বা সঙ্কোচন আর স্বীকার করা চলবে না।

উঃ ২। ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণের অর্থাৎ ছায়াপথের নিরুদ্দেশ যাত্রার বেগ মোটেই কম নয়। যত দূরের ছায়াপথ, গতিবেগও ততই বেশী। সম্প্রতি পালোমার মানমন্দির থেকে ৪,৫০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে সেকেণ্ডে ৮৫,৫০০ মাইল গতিবেগ লক্ষ্য করা হয়েছে অর্থাৎ আলোকের গতিবেগের প্রায় অর্ধেক। এই বেগ যেখানে আলোকের গতিবেগের সমান, সেখানেই ব্রহ্মাণ্ডের শেষ দৃষ্টিসীমা। তারপর, অর্থাৎ যেখানে উপরিউক্ত বেগ আলোকের বেগের বেশী, যা কিছু আছে, সবই চিরকালের জন্যে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে। কারণ সে সব স্থান থেকে বিকিরিত তরঙ্গ অনন্ত কাল ধরে উন্মত্ত বেগে ছুটে কখনও পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পারবে না। অপর পক্ষে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের কোথায়ও কোন বস্তুর বেগ আলোকের বেগের চেয়ে বেশী হতে পারে না। তাই সেকেণ্ডে কয়েক কোটি আলোক-বর্ষ বেগ অবাস্তব বলেই মনে হয়।

উঃ ৩। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও খুব স্পষ্ট নয়। আয়তন সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আগে ধরে নিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড সসীম। তাহলেই প্রশ্ন উঠবে—সেই সীমার বাইরে কি আছে? তাছাড়া যদি ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয়, তবে তার আয়তন প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে। এসব সমস্যার সমাধান এখনও হয় নি। তাই ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়।

দীপক বসু

[ফেব্রুয়ারী—মার্চ, ১৯৬৬ সংখ্যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশ্নগুলি করেছিলেন জয়ন্ত হালদার। ভুলবশতঃ নামটা ছাপা না হওয়াতে আমরা দুঃখিত—স.]

বিবিধ

মহাকাশে দুটি মহাকাশযানের মধ্যে সংযোগসাধন

চন্দ্রলোকে গমন এবং চন্দ্রলোক থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হলে মহাকাশে দুটি মহাকাশযানের মধ্যে সংযোগ সাধন একান্ত প্রয়োজন। মার্কিন মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং ও ডেভিড স্কট অষ্টম জেমিনির সঙ্গে এজেনা মহাকাশযানের ঐতিহাসিক মিলন ঘটিয়েছেন। অষ্টম জেমিনির পঞ্চমবার পৃথিবী পরিক্রমাকালে ব্রেজিলের রিও ডি জেনেরিওর দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগরের উপরে এই মিলন ঘটে। দুই মহাকাশযানের মধ্যে মহাকাশে এরকম সংযোগ এর আগে আর হয় নি। জেমিনি ফ্লোরিডার কেপ কেনেডী থেকে উৎক্ষিপ্ত হবার পর থেকে এজেনার পিছনে ধাওয়া করে এবং ১ লক্ষ ৬ হাজার মাইল পথ অতিক্রমের পর তাদের মধ্যে মিলন ঘটে। এই দুটি মহাকাশযান প্রেরণ সংক্রান্ত সকল কাজ যথানির্দিষ্ট সময়েই সম্পন্ন হয়েছে।

অষ্টম জেমিনি নামে মহাকাশযানটি নীল আর্মস্ট্রং ও ডেভিড স্কট সহ ১৬ই মার্চ ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সময় রাত্রি ১০টা ১১ মিনিটে দশতলা বাড়ির সমান উঁচু টাইটান রকেটের সাহায্যে ফ্লোরিডার কেপ কেনেডী থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়।

অষ্টম জেমিনিকে মহাকাশে প্রেরণ করবার ১ ঘণ্টা ৪১ মিনিট আগে অর্থাৎ ঐ দিবস ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সময় রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিটে মনুষ্য-বিহীন এজেনা নামে মহাকাশযানটিকে অ্যাটলাস রকেটের সাহায্যে পৃথিবী থেকে ১৮৭ মাইল ঊর্ধ্বে প্রেরণ করা হয়।

অষ্টম জেমিনির পৃথিবী পরিক্রমা তিন দিন ধরে চলবার কথা ছিল। কিন্তু জেমিনির সঙ্গে এজেনার ঐতিহাসিক সংযোগের পরই জেমিনি মহাকাশযানে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। এজন্যে সপ্তমবার পৃথিবী পরিক্রমার পর মহাকাশ-চারীদের ফিরে আসবার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদনুযায়ী ১৭ই মার্চ ভারতীয় সময় সকাল ৮টা ৩৫ মিনিটে জেমিনি-৮ প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করে।

প্রায় দুশো মাইল দূরে থাকবার সময়েই মহাকাশচারীদ্বয় বেতারের সাহায্যে এজেনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং জেমিনির কম্পিউটার যন্ত্র ও সংগৃহীত পথসন্ধানী তথ্যের সাহায্যে এজেনার কাছে আসবার চেষ্টা করেন। এজেনার ৩৫ মাইল পিছনে ও নীচে থাকবার সময়েই মহাকাশচারীদ্বয় একটি রকেট ছোড়েন এবং সঠিকভাবে গতিপথ পরিবর্তনের জন্যে অন্যান্য কাজ সেরে নেন। এর ফলে তাঁরা এজেনার কিছু আগে চলে আসেন। তারপর তাঁরা রকেটের সাহায্যে চলে যান পিছনে। তখন অষ্টম জেমিনি ও এজেনা একই কক্ষপথে থাকে।

পরিচালক আর্মস্ট্রং ধীরে ধীরে অষ্টম জেমিনিকে এজেনার কাছে নিয়ে আসেন এবং দুটির সম্পূর্ণ মিলন ঘটান; একটির দেহের একাংশ আর একটির দেহে লেগে যায়। কিছুক্ষণ পরেই এদের ছাড়াছাড়ি হয় এবং রেট্রো রকেটের সাহায্যে জেমিনি থেকে ৪৫ মাইল দূরে সরে আসে।

শুক্রে সোভিয়েট মহাকাশযান

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান টাস ১লা মার্চ ঘোষণা করেছেন—সোভিয়েট মহাকাশযান সোভিয়েট পতাকা ও সোভিয়েট রাষ্ট্রপ্রতীক নিয়ে শুক্রগ্রহে পৌচেছে।

দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস ধরে পথপরিক্রমার শেষে ১লা মার্চ সকাল নয়টায় (মস্কোর সময়) মহাকাশ-যান শুক্রে গিয়ে পৌঁচেছে।

টাস জানিয়েছেন, একটি পুরা যন্ত্রাগার শুক্র-দেহের উপর নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবী থেকে সাড়ে সতেরো কোটি মাইল দূরে রয়েছে মহাকাশযান, কিন্তু আপন কক্ষপথে আবর্তিত হতে হতে সে এক এক সময় অন্য যে কোন গ্রহের তুলনায় পৃথিবীর কাছে এসে পড়ে।

সোভিয়েট মহাকাশযান সেই মেঘের আবরণ ভেদ করে শুক্রদেহের উপর নেমে পড়েছে, তার যান্ত্রিক চক্ষু শুক্রের দীর্ঘ প্রান্তরের দিকে তাকিয়েছে—এর কি সে দেখছে তাও টেলিভিশন মারফৎ ১১ কোটি মাইল দূরে পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছে।

গ্রহটির সূর্যালোকিত দিকটাই এতদিন আমরা পৃথিবী থেকে দেখে এসেছি, কল্পনা করে এসেছি দীর্ঘ প্রান্তর জুড়ে বাষ্পপুঞ্জের নীচে বালিয়াড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। আর অন্য দিকে—বিপরীত দিকে অনন্ত তুষারের রাজ্য—আর কিছু নেই, আর কিছু থাকতে পারে না। একদিকে অন্তহীন দিন, বিপরীত দিকে অন্তহীন অন্ধকার।

জীবন-স্পন্দনহীন মরু আকাশে অক্সিজেন বা জলীয় বাষ্প আছে কিনা, বিজ্ঞান এতদিন সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নি। ধরে নিয়েছে নিশ্চয়ই কার্বন ডাইঅক্সাইড রয়েছে।

সোভিয়েট মহাকাশযান এই রহস্যের যবনিকা সরিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁচেছে। টাস জানিয়েছেন, সে অনেক বার্তাও পাঠিয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, শুক্রগ্রহে কি জীবনের অস্তিত্ব আছে? সামান্য কিছু জলীয় বাষ্প বা অক্সিজেন সে সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত দিলেও সুষ্ঠু জীবন বিকাশের বিবর্তনধারার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।

সোভিয়েটের এই নতুন পরীক্ষায় হয়তো প্রশ্নটির ষোলআনা জবাব মিলবে না। কিন্তু পৃথিবীর আদি সমুদ্রতীরের জলাভূমিতে কার্বনের জীবন-নাট্য সুরু হতে যে কোটি কোটি বছর লেগেছিল, অনন্তকাল থেকে তারই এক টুক্‌রা কেড়ে নিয়ে শুক্রগ্রহে জীবনের ক্ষীণতম অভি-ব্যক্তি কি একেবারেই অসম্ভব?

টাস জানিয়েছেন, আর একটি মহাকাশযানও পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সে লক্ষাধিক মাইল দূরে থেকে শুক্রের আকাশপথ অতিক্রম করে চলে গেছে।

দ্বিতীয় মহাকাশযানটিও বিপথে চলে গিয়েছিল; কিন্তু তাকে আবার ঠিক পথে এনে দেওয়া হয়েছে। তারপর পৃথিবী থেকে যাত্রার সাড়ে তিন মাস পরে ১লা মার্চ সকালের দিকে সে শুক্রগ্রহে নেমেছে। মেঘের আস্তরণ ভেদ করে সে নেমে পড়েছে অক্ষত অবস্থায়। একটি যন্ত্র বিকল হয় নি বা মহাকাশ-যানখানা হুমড়ি খেয়েও পড়ে নি।

পৃথিবীর বছরের এই সময়টিতেই শুক্র উজ্জ্বলতম হয়ে ওঠে, সৌরমণ্ডলের গ্রহদের মধ্যে সূর্যের সব-চেয়ে কাছাকাছি রয়েছে বুধ, তার পরেই শুক্র।

আয়তনে পৃথিবী থেকে সামান্য ছোট এই গ্রহটিতে ঋতুর আবর্তন ঘটে বলেও কোন কোন বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন। কিন্তু সেখানকার দিনটি কত বড় বা কত ছোট, সে কথা তাঁরা কেউ জানেন না।

করোনারি থ্রম্বোসিস সম্পর্কে একটি নতুন থিওরি

যে সব দেশে সংক্রামক ব্যাধিগুলিকে আয়ত্তে আনা গেছে, সেখানেও ক্যান্সার, থ্রম্বোসিস ও স্ক্লেরোসিসের মত রোগ ক্রমেই মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে। দুটি সাধারণ ধমনী রুদ্ধের (ধমনী দিয়েই রক্ত মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের

সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে) রূপ হলো করোনারি ও সেরিব্র্যাল থ্রম্বোসিস।

সেরিব্র্যাল থ্রম্বোসিস সাধারণতঃ বৃদ্ধদের হয়ে থাকে। কিন্তু করোনারি মধ্য যৌবনেও আক্রমণ করতে পারে।

হৃৎপিণ্ড থেকে দুটি করোনারি ধমনী সারা দেহে রক্ত ছড়িয়ে দিচ্ছে। এদের মধ্যে যে কোনটি রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে—ধমনীর দেয়ালে 'পলি' (ডিপোজিটস্) পড়বার ফলে অথবা রক্ত জমাট বাঁধবার ফলে।

এই ভাবে ধমনী রুদ্ধ হলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায় না। এই কারণেই শতকরা ৪০ ভাগ করোনারি রোগী প্রথম আক্রমণেই আধ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

এখন প্রশ্ন হলো—কিভাবে ধমনী রুদ্ধ হয়?

ওয়েস্ট ওয়েলস্ জেনারেল হাসপাতালের ডাঃ ডি. এফ. ডেভিস এবং ডাঃ এ ক্লার্ক ধমনী রুদ্ধ হবার কারণ সম্পর্কে একটি নতুন থিওরী দিয়েছেন।

হৃদ্‌রোগীদের পরীক্ষা করে তাঁরা দেখেছেন যে, এই সকল রোগীদের দেহে রক্তের প্রোটিন (প্লাজ্‌মা প্রোটিন) কমতে থাকে বা অনুপস্থিত থাকে। প্লাজ্‌মা প্রোটিনের অনুপস্থিতির ফলে রক্তের শোধনকারী ক্ষমতা কমতে থাকে। ধমনীর দেয়ালের গায়ে সঞ্চিত বস্তুকে (ডিপোজিট) রক্ত আর দ্রব করে তার চলাচলের পথ পরিষ্কার রাখতে পারে না, বরং 'পলি' পড়ে পড়ে ধমনী আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এই থিওরী সমর্থনযোগ্য—কেন না, বড় ধমনীর সঙ্গে ছোট ধমনীর সংযোগস্থলে এই 'পলি' পড়তে দেখা যায়। তৈলবাহী পাইপ লাইনেও অনুরূপভাবে পলি পড়তে দেখা যায়।

ধমনী রুদ্ধ হবার আর একটি সম্ভাব্য কারণ হলো বিশেষ ধরণের রক্তকোষের ধমনীর দেয়ালের গায়ে লেগে থাকবার প্রবণতা। এই রক্তকোষগুলির নাম 'প্লেট্‌লেট্‌স'—এদের কোন নিউক্লিয়াস নেই।

গবেষণার ফলে এরকম ধারণা করা হয় যে, অধিক পরিমাণে পশু-চর্বি গ্রহণ রক্তের জুড়ে থাকবার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়।

একটি ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় সে হলো, আরও গবেষণা হওয়া দরকার, যার ফলে রক্তে প্রোটিনের অভাব, পশু-চর্বি গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারগুলির মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। বর্তমানে পশ্চিমী দুনিয়ায় এবং দুনিয়ার অন্যত্রও ধমনী রুদ্ধ হয়ে যাওয়াই অধিকাংশ মৃত্যুর কারণ বলে জানা গেছে।

ডায়াবেটিস রোগ প্রতিরোধে নতুন আলোর সন্ধান

বৃটেনে গবেষণার ফলে ডায়াবেটিস রোগ প্রতিরোধের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে নতুন আশার আলো দেখা দিয়েছে।

নিউক্যাসল অন টাইনের রয়্যাল ভিক্টোরিয়া ইনফার্মারিতে গবেষণারত ডাঃ জন ভালেন্স-ওয়েন লক্ষ্য করেছেন—যে সব ডায়াবেটিক রোগীকে প্রত্যহ ইনসুলিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, তাদের রক্তে স্বাভাবিক মাত্রায় ইনসুলিন থাকে, কিন্তু একটি বিপরীত ধর্মী পদার্থ অ্যান্টি-ইনসুলিন তাকে নষ্ট করে দেয়। সাধারণ মানুষের দেহেও এই পদার্থ অল্পমাত্রায় থাকে। কিন্তু রোগীর দেহে এই পদার্থের পরিমাণ খুবই বেশী।

নতুন আবিষ্কারের ফলে দুটি তথ্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এক—অল্পমাত্রায় বহু লোকই অজ্ঞাতে ডায়াবেটিস রোগে ভোগে, কিন্তু এর ফলে তাদের কোন ক্ষতি হয় না। দুই—এই রোগ বংশগত নয়।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, দেহের স্বাভাবিক ইনসুলিন বিরোধিতা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতি চারজনে এক জনের মধ্যে বর্তমান।

গবেষণায় আরো জানা যায় যে, এই অ্যান্টি-ইনসুলিন পদার্থের উপস্থিতি হৃদ্‌রোগেরও জন্ম দেয়।

এখন আশা হয় যে, এই ইনসুলিন-বিরোধী পদার্থের অতিবৃদ্ধির কারণ শীঘ্রই আবিষ্কৃত হবে এবং ডায়াবেটিস রোগের উদ্ভব প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনবিংশ বর্ষ | মে, ১৯৬৬ | পঞ্চম সংখ্যা

খাদ্যের প্রোটিন

জিতেন্দ্রকুমার রায়

দেহে প্রোটিনের মূল কাজ

প্রধানতঃ দেহের দুটি চাহিদা মিটাতে প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। এক হলো বাড়ন্ত দেহ গড়ে তোলবার মূল বস্তু প্রোটিন সরবরাহের চাহিদা, অপরটি হলো দেহ থেকে ক্রমাগত যে প্রোটিন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তা পরিপূরণের চাহিদা।

বাড়ন্ত দেহ গড়ে তোলবার কাজে প্রোটিনের প্রয়োজন হয় কেন? বহু ধরণের লক্ষ লক্ষ কোষ বিশেষরূপে সজ্জিত হয়ে জীবদেহের সৃষ্টি করে। অন্যান্য জীবদেহের মত মানবদেহও অসংখ্য কোষের সমষ্টিগত রূপ। জন্মাবার পর থেকে (এবং জন্মাবার আগেও) শিশুদেহের বৃদ্ধি হতে থাকে। পাঁচ-ছয় মাসের ভিতর শিশু-দেহের ওজন দ্বিগুণ আর বছরখানেকের ভিতর তিন গুণ হয়ে যায়। নতুন নতুন কোষ সৃষ্টি হবার দরুণ অর্থাৎ কোষের সংখ্যা বেড়ে যাবার জন্যে শিশুদেহ বাড়তে থাকে। নতুন কোষ তৈরির জন্যে কোষবস্তুর প্রয়োজন হয়। এই কোষবস্তুর প্রধান উপকরণই হচ্ছে প্রোটিন। কাজেই দেহের বৃদ্ধির জন্যে প্রোটিনের প্রয়োজন হয়।

পূর্ণবয়স্কদের দেহের বৃদ্ধি ঘটে না; তার অর্থ হচ্ছে, দেহকোষের সংখ্যাবৃদ্ধি একরকম থেমে

যায়। মনে হতে পারে, কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি না হওয়ায় বয়স্কদের জন্যে কোষবস্তুর মূল উপদান প্রোটিনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নতুন দেহ-কোষের জন্যে প্রয়োজন না হলেও কোষবস্তুর ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের জন্যে প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। কোষের প্রোটোপ্লাজমে রয়েছে বহু রকম রাসায়নিক বস্তুর অসংখ্য অণু। প্রধান বস্তু হচ্ছে নানারকম প্রোটিন। প্রোটিনের অণুগুলি চিরস্থায়ী নয়। দেহের প্রয়োজনে এই সব প্রোটিনের অণু ক্রমাগত ভেঙ্গে যাচ্ছে—ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রোটিন অণু-গুলির স্থান পূরণ করছে নতুন নতুন প্রোটিনের অণু। কোষগুলির মধ্যে প্রোটিন অণুর যে ক্ষয়-পূরণের কাজ চলছে, তার সমষ্টিগত রূপই হচ্ছে দেহের প্রোটিনের ক্ষয়পূরণ। অসংখ্য প্রোটিন অণুর ভাঙ্গা-গড়ার কাজ যে শুধু বয়স্কদের দেহেই সীমিত তা নয়, অনুরূপভাবে বাড়ন্ত শিশুর দেহেও প্রোটিন অণুর ধ্বংস ও ক্ষয়পূরণের কাজ চলছে। প্রভেদ এই যে, বাড়ন্ত দেহে ক্ষয়পূরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিন জমাও হয়, যে কারণে শিশুর দেহ বেড়ে ওঠে। কাজেই শিশুদেহে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা দ্বিমুখী—দেহের বৃদ্ধি ও দেহের ক্ষয়পূরণের প্রয়োজনীয়তা। আর পূর্ণবয়স্কদের প্রয়োজনীয়তা শুধু দেহের ক্ষয়পূরণের জন্যে। দ্বিমুখী প্রয়োজনীয়তা মিটাতে হয় বলেই দেহের ওজন অনুপাতে বয়স্কদের চেয়ে শিশুদের প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী।

বলা বাহুল্য, দেহের প্রোটিনের চাহিদা মিটায় খাদ্যের প্রোটিন। খাদ্যের প্রোটিনই দেহের প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়। দেহ গড়ে তোলা আর বিনষ্ট প্রোটিনের স্থান পূরণ করা ছাড়াও খাদ্য-প্রোটিনের আর একটি কাজ আছে—তা হলো কিছুটা ক্যালরি বা শক্তি সরবরাহের কাজ। মোটা-মুটিভাবে বলা যায়, ভারতের মত গরীব দেশের অধিবাসীরা, তথা পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের জনগণ দেহের প্রয়োজনীয় ক্যালরির সাত থেকে দশ ভাগ প্রোটিন থেকে পেয়ে থাকে। বাকী খাদ্যশক্তির প্রায় সবটাই শ্বেতসার থেকে আসে—যৎসামান্য আসে ফ্যাট থেকে। শিল্পোন্নত দেশের অধিবাসীরা শতকরা প্রায় পনেরো ভাগ ক্যালরি প্রোটিন থেকে পেয়ে থাকে। বাদবাকী ক্যালরি আসে ফ্যাট ও শ্বেতসার থেকে। সুদূর মেরু অঞ্চলের অধিবাসী এস্কিমোদের খাদ্যে শ্বেতসারের স্থান প্রায় নেই বললেই চলে। প্রয়োজনীয় ক্যালরির প্রায় সবটাই সামুদ্রিক মাছ, মাংস ও নানারকম সামুদ্রিক পাখীর ডিমের প্রোটিন ও ফ্যাট থেকে আসে। যাহোক, সাধারণভাবে বলা যায়—দেহে শক্তি সরবরাহের ব্যাপারটা প্রোটিনের গৌণ কাজ।

প্রোটিনের উপাদান

বলা হয়েছে, খাদ্যের প্রোটিন দেহের প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু খাদ্যের প্রোটিনের সঙ্গে দেহের প্রোটিনের কি সম্পর্ক? কি করেই বা এই রূপান্তরের কাজটা সাধিত হয়?

প্রোটিন একটি বিশেষ উপাদান-সমন্বিত নির্দিষ্ট রাসায়নিক বস্তু নয়—যেমন সাধারণ লবণ, চিনি, গ্লুকোজ, সোডা প্রভৃতি নির্দিষ্ট উপাদানের এক একটি বস্তু। সমস্ত গ্লুকোজের উপাদানই এক-রকম, তা আঙুরের রস থেকেই নিষ্কাশিত হোক বা রক্তের প্লাজ্মা থেকেই নিষ্কাশিত হোক। প্রোটিন এক বিশেষ উপাদানের বিশেষ বস্তু নয়—প্রোটিন এক বিশেষ শ্রেণীর বস্তু; অর্থাৎ একটি বিশেষ শ্রেণীর রাসায়নিক বস্তুর প্রত্যেকটিকে প্রোটিন নামে অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক প্রোটিনের অণুই হচ্ছে অতিকায় অণু। বিভিন্ন প্রোটিনের ভিতর রাসায়নিক এবং ভৌতিক ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও পরস্পরের ভিতর পার্থক্যও রয়েছে কিছুটা। বিভিন্ন প্রোটিনের ভিতর যে রাসায়নিক সম্পর্ক রয়েছে, বলা বাহুল্য তা উপাদান-

গত। উপাদানগত মিলের গোড়ার কথা হচ্ছে—অসংখ্য রকম প্রোটিন মূলতঃ মাত্র কুড়ি-একুশটি বা কাছাকাছি সংখ্যার অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির সাধারণ পরিচয় বর্তমান নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু বলা যায়, এগুলি হচ্ছে রাসায়নিক সম্পর্কযুক্ত এক জাতীয় বস্তু এবং এদের মূল উপাদান হচ্ছে—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন—এই কয়টি মৌলিক পদার্থ। এছাড়া তিনটি অ্যামিনো অ্যাসিডে কিছুটা সালফার বা গন্ধক ও রয়েছে। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি হচ্ছে প্রোটিন অণুর একক বা ইউনিট। এগুলির যোগ-বিয়োগ, পরিমাণগত এবং প্রোটিনের অণু গঠনে বিন্যাসগত পার্থক্যের জন্যেই মাত্র কুড়ি-একুশটি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে প্রকৃতির গবেষণাগারে অসংখ্য রকম প্রোটিন গড়া সম্ভব হয়েছে। আমাদের খাদ্যে বহু রকম প্রোটিন থাকে। পাকস্থলী ও অন্ত্রে পরিপাকক্রিয়া সাধিত হয়, যার ফলে খাদ্যের সমস্ত প্রোটিন বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়—যে সব অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে প্রোটিনের অণুগুলি গঠিত ছিল, পরিপাকের ফলে প্রোটিনের অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে সেই সব অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়; অর্থাৎ মিশ্র প্রোটিনগুলি থেকে আমরা প্রায় কুড়ি-একুশ রকম অ্যামিনো অ্যাসিড পাই। এই সব অ্যামিনো অ্যাসিডের খানিকটা দেহের বিভিন্ন কোষে বিভিন্নভাবে সংযোজিত হয়ে দেহের বিভিন্ন প্রোটিনে পরিণত হয়। বিভিন্ন রকমের ফুলের কয়েকটি মালা খুলে কিছু ফুল বাদ দিয়ে যেমন নতুন ডিজাইনের কয়েকটা মালা তৈরি করা যায়, খাদ্যের প্রোটিন থেকে দেহের প্রোটিনও অনেকটা তেমনভাবেই তৈরি হয়। বিভিন্ন ফুলকে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ফুলের মালাগুলিকে প্রোটিনের অণুর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

প্রধান খাদ্য থেকে প্রোটিন

দেহের প্রোটিন যখন খাদ্যের প্রোটিনের মালমশলা থেকেই তৈরি, তখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দেহের গঠন বা দেহের ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের জন্যে খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন থাকা প্রয়োজন। কোন্ খাদ্যে কতটা প্রোটিন রয়েছে এবং তার গুণগত উৎকর্ষ কি রকম, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। গুণগত উৎকর্ষের বিষয়ে কিছু বলবার আগে বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর, বিশেষতঃ প্রধান খাদ্যসমূহের প্রোটিনের পরিমাণের বিষয়ে এবং তাদের প্রোটিনের চাহিদা মিটাবার উপযোগিতার উপর কিছু আলোচনা করা যাক।

আমাদের বিশেষ পরিচিত কয়েকটি খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা হিসাবে মোটামুটি কতটা আছে, তা দেখানো হলো :—

চাল—৭·০	গোদুগ্ধ—৩·৩
মুসুর ডাল—২৫·০	মাছ—২১·০
আটা—১২·০	মাংস—১৯·০
মিষ্টি আলু—১·২	ডিম—১৩·০
গোল আলু—১·৬	

উপরের তালিকা থেকে আমরা জানতে পারি, শতকরা হিসাবে চালে মিষ্টি আলুর প্রায় ছয় গুণ বেশী প্রোটিন রয়েছে। তাই বলে একথা সত্য নয় যে, চালের বদলে আমরা যদি মিষ্টি আলু প্রধান খাদ্য হিসাবে খেতে সুরু করি, তবে আমাদের প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে কমে যাবে। পেটপুরে খাদ্যগ্রহণ করবার ইচ্ছার গোড়ায় রয়েছে দেহের শক্তি বা ক্যালরির চাহিদা মিটাবার তাগিদ। খাদ্যাভ্যাসের রীতি অনুযায়ী প্রধান খাদ্যই আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরির অধিকাংশ সরবরাহ করে থাকে। যেমন—সাধারণ বাঙালীরা চাল বা চালজাত খাদ্যবস্তু থেকে শতকরা প্রায় আশীভাগ ক্যালরি পেয়ে থাকে। নিউগিনির আদিবাসীরা প্রধান খাদ্য হিসাবে মিষ্টি আলু খেয়ে থাকে এবং

দেহের প্রয়োজনীয় খাদ্যশক্তি বা ক্যালরির শতকরা আশী-পঁচাশী ভাগ মিষ্টি আলু থেকে আসে। শারীরিক পরিশ্রমরত একজন বাঙালী যুবক ও অনুরূপ নিউগিনির যুবকের খাদ্যশক্তির প্রয়োজনীয়তা যদি ৩০০০ ক্যালরি হয়, তবে ২৪০০ ক্যালরির জন্যে বাঙালী ও নিউগিনির যুবক যথাক্রমে চাল ও মিষ্টি আলুর উপর নির্ভর করবে। মিষ্টি আলুতে জলের ভাগ খুব বেশী—শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ। তাই বস্তুর পরিমাণ, তথা ক্যালরির পরিমাণ তুলনায় কম। কিন্তু চালে জলের পরিমাণ খুব কম থাকায় (শতকরা বারো ভাগের মত) সমওজনের চাল থেকে মিষ্টি আলুর চেয়ে অনেক বেশী ক্যালরি পাওয়া যায়। চাল থেকে ২৪০০ ক্যালরি খাদ্যশক্তি পেতে হলে চব্বিশ আউন্স চাল খেতে হবে, আর অনুরূপ পরিমাণ খাদ্যশক্তি পেতে হলে মিষ্টি আলু খেতে হবে পঁয়ষট্টি আউন্স। চব্বিশ আউন্স চাল থেকে পাওয়া যায় আটচল্লিশ গ্র্যাম প্রোটিন আর পঁয়ষট্টি গ্র্যাম মিষ্টি আলু থেকে পাওয়া যায় কুড়ি গ্র্যাম প্রোটিন। মিষ্টি আলুতে চালের এক-ষষ্ঠাংশ প্রোটিন থাকলেও ক্যালরির চাহিদা মিটাবার প্রয়োজনে বেশী খাবার জন্যে মিষ্টি আলু থেকে মোট যে পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়, তা অনুপাতে তত কম নয়। আফ্রিকায় গোচারণ-নির্ভর কয়েকটি উপজাতি আছে, দুধ যাদের প্রধান খাদ্য। ঋতুবিশেষে একজন কর্মঠ যুবক দৈনিক ছয়-সাত লিটার দুধ পান করে। হিসাব করে দেখানো যায়, এই পরিমাণ দুধ থেকে ১৫০-২০০ গ্র্যাম প্রোটিন মিলে। শতকরা হিসাবে দুধে চালের চেয়ে অনেক কম প্রোটিন থাকলেও ক্যালরির চাহিদা মিটাতে দুধের উপর নির্ভর করলে দুধ থেকে দৈনিক অনেক বেশী প্রোটিন পাওয়া যাবে। মোট পরিমাণের বিচারে অন্ন-ভোজীরা কখনও দুগ্ধপায়ীদের মত প্রোটিন পেতে পারে না।

বিভিন্ন দেশের প্রধান খাদ্যগুলির প্রোটিন সরবরাহের পরিমাণগত উপযোগীতার তুলনামূলক বিচার করতে গেলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালরি সরবরাহ করে এমন পরিমাণ খাদ্য থেকে কতটা প্রোটিন পাওয়া যায়, তা জানা প্রয়োজন। একশত ক্যালরি খাদ্যশক্তি প্রদান করতে কয়েকটি খাদ্যবস্তু কি পরিমাণ প্রোটিন সরবরাহ করে, তা নীচে দেওয়া হলো। খাদ্যবস্তুগুলি কোন না কোন দেশের প্রধান বা অন্যতম প্রধান খাদ্য।

চাল—২.০	গ্র্যাম	মিষ্টি আলু—০.৯	গ্র্যাম
আটা—৩.৩	"	গোল আলু—১.৬	"
মাছ—২৪.০	"	বাজরা—৩.৩	"
মাংস—১৬.০	"	ভুট্টা—৩.২	"
দুধ—৫.০	"	ক্যাসেভার মূল—০.৪ (ট্যাপিওকা)	"
কাঁচকলা—২.০	"	কচুজাতীয় খাদ্য—১.৫	"

আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু অঞ্চল এবং ভারতের কেরালার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের জনগণ দৈহিক প্রয়োজনের শতকরা সত্তর থেকে আশী ভাগ ক্যালরি ক্যাসেভা থেকে নিয়ে থাকে। উপরের তালিকা থেকে সহজেই দেখানো যায় যে, আমাদের প্রধান খাদ্য চাল থেকে যতটা প্রোটিন পেয়ে থাকি, ক্যাসেভাভোজীরা তাদের প্রধান খাদ্য ক্যাসেভা থেকে মাত্র তার ২৫% প্রোটিন পেয়ে থাকে।

প্রোটিনের গুণগত উৎকর্ষ : উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ প্রোটিন

আমরা দেখেছি প্রোটিনের অণু কুড়ি-একুশটি বা তার কাছাকাছি সংখ্যার বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের সমবায়ে গঠিত। দেহের বিভিন্ন প্রোটিন বিশ্লেষণ করলেও এই অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলিই পাওয়া যায়। তবু দেহের বিভিন্ন প্রোটিন গঠনের প্রয়োজনে খাদ্য থেকে সবগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড না নিলেও চলে। প্রয়োজন হয় মাত্র

গোটা কয়েক অ্যামিনো অ্যাসিডের। এই সব অ্যামিনো অ্যাসিডকে বলা হয় অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড (Essential amino acid)। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি হচ্ছে—

লাইসিন (Lysine)
আইসোলাইসিন (Isolysine)
ট্রিপটোফেন (Tryptophane)
ভ্যালিন (Valine)
থ্রিওনিন (Threonine)
লিউসিন (Leucine)
মিথাইওনিন (Methionine) + সিষ্টিন* (Cystine)
ফিনাইল অ্যালানিন (Phenyl alanine)

অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির যে কোন একটির অভাব হলেই দেহে প্রোটিনের অভাবজনিত কোন না কোন লক্ষণ প্রকাশ পাবে। অভাব অত্যধিক হলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। দালান তৈরি করতে গেলে ইট, সুরকী, চুন, সিমেণ্ট, কাঠ ও লোহার দরকার। উক্ত জিনিষ-গুলির একটি জিনিষের অভাব হলেও দালান তৈরি করা যাবে না। দেহের প্রোটিন গড়তে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির কাজ খানিকটা দালান তৈরির মালমশলার মতই; যে কোন একটিকে বাদ দিলেই প্রোটিন গড়বার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

দেহ অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড ছাড়া অন্যান্য অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি (Non-essential amino acids) তৈরি করতে পারে—দেহের প্রোটিন গড়তে সে সব অ্যামিনো অ্যাসিড বাইরে থেকে (খাদ্য থেকে) না নিলেও চলে, যদিও খাদ্যের প্রোটিনের মাধ্যমে ঐ অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিও আসে। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি থেকেই দেহে অন্যান্য অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি হতে পারে। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেহের প্রোটিন গড়ে তোলে। অন্যান্য অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করাই অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির পরোক্ষ কাজ। দেহ অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলি তৈরি করতে পারে না—পারলেও অতি সীমিত পরিমাণে তৈরি করে। সেই জন্যেই অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি খাদ্য থেকে নেবার প্রয়োজন হয়।

অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি কি পরিমাণে রয়েছে, মূলতঃ তার উপরেই প্রোটিনের গুণগত উৎকর্ষ নির্ভর করে। পুষ্টি-বিজ্ঞানের বিচারে আদর্শ প্রোটিন এমন একটি প্রোটিন, যাতে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি উপযুক্ত পরিমাণে (শতকরা হিসাবে বিশেষ বিশেষ মাত্রায়) রয়েছে। যে কোন একটি অ্যামিনো অ্যাসিড কম মাত্রায় থেকে অন্যান্য অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি যদি আদর্শ প্রোটিনের সমমাত্রায় বা তার চেয়ে বেশীও থাকে তবুও প্রোটিনের গুণগত উৎকর্ষ অনেক কমে যায়। মুরগীর ডিমের প্রোটিনকে অনেক সময়ে আদর্শ প্রোটিন হিসাবে ধরা হয় এবং তাতে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি যে যে মাত্রায় রয়েছে, তাকেই অনেক সময় প্রোটিনে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির আদর্শ মাত্রা বলে ধরা হয়। শতকরা হিসাবে মুরগীর ডিমের প্রোটিনে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি যে

---

* সিষ্টিন মিথাইওনিনের পরিপূরক। মিথা-ইওনিন অত্যাবশ্যকীয় সিষ্টিন নয়। তবে প্রোটিনে উপযুক্ত পরিমাণ সিষ্টিন থাকলে মিথাইওনিনের প্রয়োজনীয়তা খানিকটা কমে যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সালফার বা গন্ধক দুটি অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি মূল উপাদান। অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি গন্ধকবিহীন।

যে পরিমাণে আছে, তা নীচে দেখানো হলো :—

লাইসিন—৬'৪

ট্রিপটোফেন—১'৭

আইসোলিওসিন—৬'৬

ভ্যালিন—৭'৪

মিথাইওনিন + সিষ্টিন—৫'৫

থ্রিওনিন—৫'০

লিউসিন—৮'৮

ফিনাইল অ্যালানিন—৫'৮

ইদানীং বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (FAO) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির মাত্রাভিত্তিক আদর্শ প্রোটিনের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। প্রোটিনটি কাল্পনিক। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার কল্পিত আদর্শ প্রোটিনের অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির পরিমাণ আরও কম।

প্রোটিনের জৈবিক উৎকর্ষের মান (Biological value) নির্ণয় করবার জন্যে জীবদেহভিত্তিক বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা রয়েছে। তবে খাদ্যের প্রোটিনে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি কি পরিমাণে রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে বের করে ও ডিমের প্রোটিনের অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির মাত্রার সঙ্গে তুলনা করে বিশেষ সূত্রের (Formula) সাহায্যে খাদ্য-প্রোটিনের জৈবিক উৎকর্ষের মান মোটামুটিভাবে নির্ণয় করা যায়, অর্থাৎ কোন খাদ্য-প্রোটিনের (যেমন যবের প্রোটিনের) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির পরিমাণ যদি জানা যায়, তবে পরোক্ষভাবে হিসাব করে প্রোটিনের জৈবিক উৎকর্ষের মানও মোটামুটি নির্ণয় করা যায়। এই হিসাবের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রোটিনের যে জৈবিক উৎকর্ষের মান নির্ণয় করা হয়েছে, তা নীচে দেওয়া হলো :—

প্রোটিনের উৎস	জৈবিক উৎকর্ষের মান	প্রোটিনের উৎস	জৈবিক উৎকর্ষের মান
মুরগীর ডিম	৯৭	গম	৫৮
দুধ	৮৪	মটরশুঁটি	৫৮
ছাগমাংস	৮০	বাঁধাকপি	৪৯
মাছ	৭৬	লাউ	৪৭
চাল	৬৮	বিট	৩১

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, প্রাণীজ প্রোটিনের জৈবিক উৎকর্ষের মান উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মানের চেয়ে অনেক বেশী। বলা বাহুল্য অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি উপযুক্ত পরিমাণে না থাকবার জন্যেই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনগুলির জৈবিক উৎকর্ষের মান অনেক কমে যায়। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। চালের প্রোটিনের জৈবিক উৎকর্ষের মান গমের প্রোটিনের মানের চেয়ে বেশী। গমে চালের চেয়ে বেশী প্রোটিন রয়েছে বটে; কিন্তু গুণগত উৎকর্ষের বিচারে গমের স্থান চালের নীচে।

আমরা জানি, উদ্ভিজ্জ খাদ্যে (চাল, গম, কন্দ ইত্যাদি) ক্যালরির অনুপাতে কম প্রোটিন থাকে। কাজেই চাল, গম, কন্দ ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ বস্তু যে সব দেশের প্রধান খাদ্য, সে সব দেশের সাধারণ লোক, প্রাণীজ খাদ্য যাদের প্রধান খাদ্য বা অন্যতম প্রধান খাদ্য, তাদের তুলনায় কম প্রোটিন পেয়ে থাকে। প্রাণীজ প্রোটিন ব্যয়বহুল বলে সাধারণতঃ শিল্পোন্নত, তথা আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন দেশের লোকেরাই প্রাণীজ প্রোটিন যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পারে। কয়েকটি দেশের জনসাধারণ গড়ে দৈনিক মাথাপিছু কত গ্র্যাম উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ

প্রোটিন (এবং মোট প্রোটিন) পেয়ে থাকে, তা নীচে দেখান হলো। হিসাবটি তের-চৌদ্দ বছর আগের। এক জাপান ছাড়া বর্তমানে অন্যান্য দেশের খাদ্য-পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।

দেশ	উদ্ভিজ্জ প্রোটিন (গ্র্যাম)	প্রাণীজ প্রোটিন (গ্র্যাম)	মোট প্রোটিন (গ্র্যাম)
ফ্রান্স	৫০	৪৩	৯৩
সুইজারল্যাণ্ড	৪৬	৫১	৯৭
ইংল্যাণ্ড	৪২	৪৬	৮৮
নরওয়ে	৪৭	৫৭	১০৪
ইউগোস্লোভাকিয়া	৫৬	২০	৭৬
ভারত	৩৯	৬	৪৫
জাপান	৪৪	১০	৫৪
ফিলিপাইন	৩৩	১০	৪৩
মিশর	৫৯	১০	৬৯
তুরস্ক	৬৮	১২	৮০
আর্জেন্টিনা	৩৫	৬৩	৯৮
ব্রেজিল	৪২	১৭	৫৯
যুক্তরাষ্ট্র	৩০	৬১	৯১
অষ্ট্রেলিয়া	৩২	৬৫	৯৭

প্রাণীজ প্রোটিন কি অপরিহার্য ?

অনগ্রসর দেশের লোকেরা প্রাণীজ প্রোটিন যে খুব কম পায়, তা উপরের তালিকা থেকেই প্রতিভাত হবে। শিল্পোন্নত দেশের লোকদের ভিতর শুধু জাপানের অধিবাসীরাই কম হারে প্রাণীজ প্রোটিন পেয়ে থাকে। তবে ইদানীং খাদ্য-ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের প্রাণীজ প্রোটিন খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে গেছে। প্রাণীজ প্রোটিন খাওয়ার ব্যাপারে ভারতের মত শোচনীয় পরিস্থিতি কোন দেশেরই নয়। খাদ্যে প্রাণীজ প্রোটিনের পরিমাণ কি করে বাড়ানো যায় ? উত্তর সহজ। করে মাছ-মাংস, দুধ-ডিম খেতে হবে। খেতে তো হবে, কিন্তু পাওয়া যাবে কোথায় ? দেশের সব লোকের পেট ভরাবার মত খাদ্যশস্য জন্মানো যেখানে গুরুতর সমস্যা এবং যেখানে জনসংখ্যা অত্যধিক হারে বাড়বার জন্যে জমির উপর অসম্ভব চাপ পড়ছে, সেখানে দুধ-মাংস উৎপাদনের প্রয়োজনে বিস্তৃত পশুচারণ ক্ষেত্রের বন্দোবস্ত করা এক রকম অসম্ভব কাজ। তাই প্রোটিনের জন্যে প্রায় সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিজ্জ খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা করতে হবে। তাহলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনের উপর নির্ভর করে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে কি কোন রকমে আমরা টিকে থাকবো ? জাতি হিসাবে প্রোটিনের অভাবজনিত নানারকম রোগ নিয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকা বা ধ্বংস হয়ে যাওয়াই কি আমাদের ভাগ্যলিপি ? অথবা মূলতঃ উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উপর নির্ভর করেও আমরা প্রোটিনের অভাবজনিত রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় বের করতে পারবো ? ইদানীং কালের পুষ্টি-বিজ্ঞানের গবেষণা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। জানা গেছে, অন্ততঃ পূর্ণবয়স্কদের স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষার জন্যে জান্তব প্রোটিন অপরিহার্য নয়। প্রোটিনের অভাবজনিত প্রতিক্রিয়াগুলি ঠেকিয়ে রাখতে হলে খানিকটা দুধ, ডিম বা মাছ-মাংস যে খেতেই হবে, এ রকম অমোঘ বিধান দেওয়া যায় না। প্রশ্ন—যেহেতু এক বা একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাব হলে দেহে প্রোটিনের অভাবজনিত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং উদ্ভিজ্জ প্রোটিনগুলিতে যেহেতু এক বা একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিডের খুবই অভাব রয়েছে, সেহেতু কি করে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের উপর নির্ভর করে শরীর রক্ষা করা সম্ভব হয় ?

অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির ন্যূনতা সব উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে এক রকম নয়। যেমন—আটা ও চালের প্রোটিনে (বিশেষ করে আটাতে) যে

অ্যামিনো অ্যাসিডের বিশেষ অভাব রয়েছে, তা হলো লাইসিন। কিন্তু চাল বা আটাতে প্রয়োজনীয় সালফারযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের (মিথাইওনিন + সিষ্টিন) অভাব নেই। ডালের প্রোটিনে চাল ও আটার দ্বিগুণ লাইসিন রয়েছে, কিন্তু সালফার-যুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে অনেক কম মাত্রায়। আবার মিষ্টি আলুর প্রোটিনে যে পরিমাণ থ্রিওনিন রয়েছে, তা চাল-আটা-ডাল কিছুতেই নেই। চাল বা আটা উপযুক্ত পরিমাণ ডাল ও মিষ্টি আলু সহযোগে খেলে কোন অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাব ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে না। বিশেষ করে মিষ্টি আলুর নাম না করে বলা যায়—চাল, ডাল, তরিতরকারী বা আটা, ডাল, তরিতরকারী প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ খাদ্য একযোগে আহার করলে (যা আমরা সাধারণতঃ আহার করেই থাকি) দেহে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির অভাব ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে না। উপরিউক্ত উদ্ভিজ্জ খাদ্যগুলির কোনটির প্রোটিনই উৎকর্ষের বিচারে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তবে একযোগে সম্পূর্ণ—একটি অন্যটির পরিপূরক। হজম-ক্রিয়ার ফলে চাল-ডাল ও তরিতরকারীর প্রোটিন থেকে আমরা পাই কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড। চাল-ডাল, তরিতরকারীর মিশ্র প্রোটিন থেকে সবগুলি অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। দেহের প্রয়োজনে দেহ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চালের প্রোটিন, ডালের প্রোটিন আর তরকারীর প্রোটিনকে কাজে লাগায় না। কাজে লাগায় হজম-হওয়া প্রোটিনগুলির অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে। কাজেই কয়েকটি অসম্পূর্ণ প্রোটিনের একত্রীভূত অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি থেকেই দেহ তার প্রোটিন গড়বার মাল-মশলা পেয়ে যায়। প্রত্যেকটি প্রাণীজ খাদ্য (যেমন—দুধ, ডিম, মাছ ও মাংস) প্রোটিনের গুণগত উৎকর্ষের বিচারে স্বয়ংসম্পূর্ণ; অর্থাৎ যদি যে কোন একটি খাদ্য প্রোটিনের একমাত্র উৎস হয় তবুও দেহে প্রোটিন গড়বার কাজ ভাল ভাবেই চলবে—কোন অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাব ঘটবে না।

বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মিশ্র প্রোটিন যদি গুণগত উৎকর্ষের বিচারে দেহের চাহিদা মিটাতে পারে, তবে প্রশ্ন—দৈনিক কতটা প্রোটিন আমাদের প্রয়োজন এবং বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ খাদ্য কতটা খেলে আমরা এই চাহিদা মিটাতে পারবো ? এই বিষয়ে বহু অনুসন্ধানের পর পুষ্টি-বিজ্ঞানীরা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিরা যদি দৈনিক দৈহিক ওজনের প্রতি কিলোগ্র্যাম প্রতি একগ্র্যাম প্রোটিন গ্রহণ করে, তাহলেই তা শরীর রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হবে। পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় পুরুষের গড় দৈহিক ওজন ধরা হয়েছে পঞ্চান্ন কিলোগ্র্যাম। তাই আমরা ধরে নিতে পারি, একজন পূর্ণবয়স্ক ভারতীয় পুরুষের দৈনিক প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা পঞ্চান্ন গ্র্যাম। খানিকটা ডাল আর কিছুটা তরিতরকারী দিয়ে দুবেলা পেটভরে ভাত বা রুটি খেলে আমরা আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পরিমাণ প্রোটিন পেতে পারি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—ধরা যাক, অফিসের কোন কেরাণীবাবু অন্যান্য খাদ্য বাদ দিয়ে রোজ যতটা আটা, চাল, ডাল ও তরিতরকারী খান, তার পরিমাণ এই রকম :—

চাল—১০ আউন্স
আটা—৪ আউন্স
ডাল—৪ আউন্স
তরিতরকারী—৪ আউন্স

হিসাব করে দেখানো যায়, উপরিউক্ত উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে কেরাণীবাবু রোজ ষাট গ্র্যামের উপর প্রোটিন পান এবং তাঁর খাদ্যে কোন অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডেরই ঘাটতি হয় না। কাজেই দেখা যায়, ভারতের জনসাধারণ সাধারণভাবে যে খাদ্য পায়, তাই যদি তারা পেটভরে খেতে পায়,

তবে অন্ততঃ বয়স্কেরা প্রোটিনের অভাবজনিত অপুষ্টিতে ভুগবে না।

আগেই বলেছি, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু অঞ্চলে এবং ভারতের কেরালার কয়েকটি স্থানের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ক্যাসেভা বা ট্যাপিওকা। আরও বলা হয়েছে, ট্যাপিওকা বা ক্যাসেভাতে (মূল জাতীয় খাদ্য) প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম। যদি একজন মোটামুটি পরিশ্রমী পূর্ণবয়স্ক লোকের ২৮০০ ক্যালরি খাদ্যশক্তির প্রয়োজন হয় এবং সে যদি শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ক্যালরি ট্যাপিওকা থেকে নিতে চায় অর্থাৎ ট্যাপিওকা তার প্রধান খাদ্য হয়, তবে সে প্রধান খাদ্য থেকে মাত্র ৬·৩ গ্র্যাম প্রোটিন পাবে। ঐ পরিমাণ ক্যালরির জন্যে আটা ও চালের উপর নির্ভর করলে আটা ও চাল থেকে যথাক্রমে ৭১·৪ গ্র্যাম ও ৪২ গ্র্যাম প্রোটিন পাওয়া যাবে। ক্যাসেভা বা ট্যাপিওকা যাদের প্রধান খাদ্য, তাদের পক্ষে দেহের প্রয়োজনীয় প্রোটিন যোগাড় করা খুবই দুষ্কর। তাছাড়া গুণগত উৎকর্ষের বিচারেও ট্যাপিওকার প্রোটিনের স্থান চাল ও আটার প্রোটিনের অনেক নীচে।

মিলেট জাতীয় খাদ্য, (রাগী, ভুট্টা, বাজরা, কাউন ইত্যাদি) ভারতের বহু অঞ্চলের প্রধান বা অন্যতম প্রধান খাদ্য। পরিমাণে মিলেটে প্রায় গমের মতই প্রোটিন রয়েছে। কোন না কোন মিলেট যাদের প্রধান খাদ্য, তারা যদি মিলেটের সঙ্গে খানিকটা ডাল ও কিছুটা তরিতরকারী খায়, তবে তাদের দেহেও প্রোটিনের অভাবজনিত কোন অস্বাভাবিকতা দেখা দিবে না।

শিশুর খাদ্যে প্রোটিনের স্বল্পতা ও খশিয়রকর রোগ (Kwashiorkor)

মায়ের দুধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার বয়স পার হয়ে গেলেই অথবা মাতৃস্তনে উপযুক্ত পরিমাণ দুধ না থাকলে শিশুকে পরিপূরক খাদ্য দিতে হয়।

শিশুর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পরিপূরক খাদ্যই ক্রমশঃ প্রধান খাদ্যের স্থান নেয় এবং শেষে শিশু বয়স্কদের খাদ্য খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তাতেই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে সুরু করে। সাধারণতঃ চার-পাঁচ মাস বয়স থেকে শিশুদের পরিপূরক খাদ্য দেওয়া হয়। বয়স্কদের খাদ্যে পরিপূর্ণ নির্ভরতা সাধারণতঃ বছর তিনেক বয়সের আগে হয় না। পুষ্টি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শৈশবকাল (মাস চারেক বয়স থেকে তিন-চার বছর বয়স পর্যন্ত) মানবজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময় অপুষ্টি-রোগ অতি সহজেই দেখা দেয়। দেহের ওজনের তুলনায় এই সময়ে প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী হওয়াতে এবং শিশুরা বয়স্কদের খাদ্য বহুল পরিমাণে গ্রহণ করতে সমর্থ না হওয়াতে যে সব দেশে দুধ বা অন্য কোন উচ্চ শ্রেণীর প্রোটিনবহুল শিশুখাদ্যের অভাব, সে সব দেশের শিশুরা প্রোটিনের অভাবজনিত নানারকম-রোগে আক্রান্ত হয়। পুষ্টির অভাবজনিত নানারকম রোগে ভুগে শিশুরা পাইকারী হারে মারাও যায়। পুষ্টির অভাব নানারকম উৎকট শিশুরোগের পরোক্ষ কারণও বটে।

শিশুদেহে প্রোটিনের গুরুতর অভাবে (পরিমাণগত ও গুণগত) যে জটিল রোগ দেখা দেয়, তার সাধারণ নাম খশিয়রকর রোগ। এই রোগের সাধারণ বাহ্যিক লক্ষণ হলো শিশুর দৈহিক ওজনের হ্রাসপ্রাপ্তি, দেহ রসস্থ হওয়া (Oedema), ক্ষুধামান্দ্য, নিস্তেজ ও খিটখিটেভাব, চুলের রং কটা ও বিবর্ণ হয়ে যাওয়া, ক্রমাগত উদরাময় রোগে ভোগা ইত্যাদি। প্রোটিনের গুরুতর অভাব দূরীভূত না হলে মৃত্যুই রোগের শেষ পরিণতি। প্রোটিনের অভাব গুরুতর না হলে সব লক্ষণগুলি দেখা দেয় না। অনেক সময় শুধু দেহের বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয়। এক বছর বয়স থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যেই সাধারণতঃ শিশুরা এই রোগে আক্রান্ত

হয়। দুধ বা দুধের বিকল্প সহজপাচ্য উৎকৃষ্ট প্রোটিনবহুল খাদ্যের অভাবের দরুণ অনুন্নত দেশ-গুলিতে মাতার স্তনদুগ্ধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার বয়স পার হয়ে গেলে শিশুদের সাধারণতঃ মূল বা শস্যের মণ্ড খাওয়ানো হয়। যেমন—শটি বা সাগুর মণ্ড, ক্যাসেভার মণ্ড, কাঁচকলার মণ্ড, ভাতের মণ্ড ইত্যাদি। আমরা জানি, এসব উদ্ভিজ্জ খাদ্যে প্রোটিনের ভাগ কম আর তার গুণগত উৎকর্ষও কম। ক্যাসেভা মূলের মণ্ডের কথাই ধরা থাক। আফ্রিকার বহু অঞ্চলে শিশুদের ক্যাসেভার মণ্ড খাওয়ানো হয়। এক বছর বয়সের একটি শিশুর প্রয়োজনীয়তা হলো মোটামুটি এক হাজার ক্যালরির আর প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা ২৫।৩০ গ্র্যামের মত। শিশুটি যদি শতকরা সত্তর ভাগ ক্যালরির জন্যে ক্যাসেভার উপর এবং বাকী ত্রিশ ভাগের জন্যে মাতৃস্তন্যের উপর নির্ভর করে, তবে সে ক্যাসেভা থেকে ও মাতৃস্তনের দুগ্ধ থেকে যথাক্রমে ২.৮ গ্র্যাম ও ৫ গ্র্যাম প্রোটিন পাবে, অর্থাৎ মায়ের দুধ আর পরিপূরক খাদ্য থেকে শিশুটি মাত্র ৭.৮ গ্র্যাম প্রোটিন পাবে। প্রধান শিশুখাদ্য হিসাবে সাগু বা শটির উপর নির্ভর করলে অনুরূপ পরিমাণ প্রোটিনই পাবে। সাগু ও শটিতে নামমাত্র প্রোটিন আছে। এদিক থেকে ভাত বা শস্যের মণ্ড বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। সাত শত ক্যালরি খাদ্য-শক্তি পাওয়া যায়, এমন পরিমাণ চাল থেকে চৌদ্দ গ্র্যাম প্রোটিন পাওয়া যায়। সুতরাং শিশুটির প্রধান খাদ্য যদি ভাতের মণ্ড হয়, তবে ভাতের মণ্ড ও মায়ের দুধের প্রোটিন মিলিয়ে সে দৈনিক পাবে ১৯ গ্র্যাম। গুণগত উৎকর্ষের বিচারে চালের প্রোটিনের স্থান দুধের প্রোটিনের নীচে হলেও তার স্থান ক্যাসেভা, সাগু বা শটির অনেক উপরে। তাই শিশুখাদ্য হিসাবে ভাত বা চিড়ার মণ্ড বিশেষ উপযুক্ত না হলেও সেগুলি অন্ততঃ সাগু ও শটির চেয়ে অনেক ভাল। শিশুটি যদি পরিপূরক খাদ্য হিসাবে গোদুগ্ধের উপর নির্ভর করে, তবে গোদুগ্ধ থেকেই সে পঁয়ত্রিশ গ্র্যামের মত প্রোটিন পাবে।

বহু উন্নত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের খাদ্য, দেহবৃদ্ধি ও সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্যে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালানো হয়। ভারতের কয়েকটি অঞ্চলেও কিছু কিছু সমীক্ষার কাজ চালানো হয়েছে। ইদানীং বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলার বহু গ্রামে শিশুর খাদ্য ও শিশুর দেহবৃদ্ধির উপর বিস্তৃতভাবে সমীক্ষার কাজ পরিচালিত হয়েছে। প্রবন্ধ লেখক উক্ত সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত আছেন। পাঠকেরা বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলের শিশুর খাদ্য ও শিশুর দেহবৃদ্ধি সম্বন্ধে কৌতূহলী আশা করে উক্ত সমীক্ষায় সংগৃহীত কিছু কিছু তথ্য নিম্নে পরিবেশিত হলো :—

সমীক্ষাতে জানা যায় যে, চার মাস বয়স পর্যন্ত শতকরা প্রায় সত্তরটি শিশু খাদ্যের জন্যে সম্পূর্ণরূপে মায়ের দুধের উপর নির্ভর করে আর ছয় মাস বয়সে সম্পূর্ণরূপে মায়ের দুধের উপর নির্ভর করে, এরূপ শিশুর সংখ্যা শতকরা মাত্র বিশ জন। ছয় থেকে আট মাস বয়সের পরিপূরক খাদ্য গ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে শতকরা মাত্র চল্লিশ জন শিশু সামান্য গরুর দুধ (দৈনিক চার থেকে ছয় আউন্স) পায়। শতকরা ষাট জন শিশুর পরিপূরক খাদ্য হচ্ছে চল্লিশ থেকে ষাট গ্র্যাম শটির পালো আর পনেরো থেকে পঁচিশ গ্র্যাম চিনি বা মিছরি। তারা গরুর দুধ কিছুমাত্র পায় না। আগেই বলা হয়েছে, সাগু ও শটিতে নামমাত্র প্রোটিন থাকে আর চিনি-মিছরিতে তো প্রোটিনের নামগন্ধও নেই। শুধু ভরসা মায়ের বুকের সামান্য দুধ, যা শিশুদের শুধু আংশিক ক্ষুধা মিটায়। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে, মায়েরা সাধারণতঃ স্বাস্থ্যহীন—তাদের দৈহিক ওজন মোটামুটি সত্তর থেকে পঁচাশী পাউণ্ডের মধ্যে সীমিত।

'প্রয়োজনের তুলনায় অতি সীমিত প্রোটিন

গ্রহণের ফলে শিশুর দেহবৃদ্ধির হার কমে যায়। মেদিনীপুর জেলার শিশুদের বিশেষ বিশেষ বয়সে দৈহিক গড় ওজন কত, তা নীচে দেওয়া হলো :—

বয়স (মাস)	দৈহিক ওজন (পাউণ্ড)
	৯
৬	১২
১২	১৫
২৪	১৮

মেদিনীপুর জেলার আর পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত ও অনুন্নত দেশের এক বছরের শিশুদের গড় ওজন কত, তা নীচের তালিকায় দেওয়া হলো :—

দেশ	ওজন (পাউণ্ড)
যুক্তরাষ্ট্র	২৩
সোভিয়েট রাশিয়া	২৩
জাপান	২০·৫
মিশর	১৮
নাইজেরিয়া	১৯
গ্যাম্বিয়া	১৭
ইন্দোনেশিয়া	১৬·৫
পিগ্‌মী (পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মানুষ)	১৬·৪
মেদিনীপুর	১৫

উপরের তালিকায় দেখা যাবে, দৈহিক বৃদ্ধির হারের বিচারে মেদিনীপুরের শিশুদের স্থান সকলের নীচে।

শিশুর খাদ্যে মিশ্র উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের স্থান

আমরা দেখেছি, বয়স্কেরা যদি ভাত, ডাল ও তরিতরকারী বা রুটি, ডাল, তরিতরকারী পেট ভরে খেতে পায়, তবে তাদের প্রোটিনের অভাবজনিত রোগে ভোগবার আশঙ্কা থাকে না বা তাদের দেহে প্রোটিনের অভাবজনিত কোন রকম অস্বাভাবিকতাও দেখা দেয় না। কিন্তু শিশু যখন মাত্র মায়ের দুধ ছাড়তে সুরু করে, তখন তাকে ভাত, তরকারীর মত বয়স্কদের খাদ্য দেওয়া চলে না—পশুর দুগ্ধই তখন তার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পরিপূরক খাদ্য। শিশুরা যখন বয়স্কদের খাদ্যে কিছুটা অভ্যস্ত হয়, তখনও অর্থাৎ দেড় বছর দু-বছর বয়সেও দুধ বা অনুরূপ প্রাণীজ খাদ্য তার প্রয়োজনীয় প্রোটিনের মূল উৎস হওয়া উচিত। এই বয়সটাই খশিয়রকর রোগ হবার পক্ষে সবচেয়ে আশঙ্কাজনক সময়। কারণ দুধ শিশুরা তখন একরকম পায়ই না আর প্রাণীজ প্রোটিনহীন বয়স্কদের খাদ্য সে তখন যে পরিমাণে পায়, তাথেকে দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাওয়া ও দেহের চাহিদা অনুযায়ী প্রোটিন পাওয়ার উপায় থাকে না। দুধ ও অন্যান্য প্রাণীজ প্রোটিনের অভাবে শিশুকে কি এমন উদ্ভিজ্জ খাদ্য দেওয়া চলে, যা খেয়ে সে প্রোটিনের অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে পারে?

বয়স্কদের সাধারণ উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে শিশুরা তাদের দেহের চাহিদা অনুযায়ী প্রোটিন না পেলেও বিশেষভাবে তৈরি প্রোটিনবহুল মিশ্র উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে শিশুরা যে তাদের দেহের প্রয়োজনীয় প্রোটিন পেতে পারে, সে সম্ভাবনা পুষ্টি-বিজ্ঞানের ইদানীং কালের গবেষণায় দেখা গেছে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

প্রবলভাবে খশিয়রকর রোগে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা না করালে অনেক ক্ষেত্রেই শিশুদের মৃত্যু হয়। উপযুক্ত চিকিৎসার মূল কথা হচ্ছে, রোগাক্রান্ত শিশুকে সহজপাচ্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনবহুল খাদ্য খেতে দেওয়া। এই অবস্থায় সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হচ্ছে মাখনতোলা দুধের গুঁড়া। মাখনতোলা দুধের গুঁড়া বিশেষভাবে বিশেষ মাত্রায় কয়েক সপ্তাহ ধরে খেতে দিয়ে খশিয়রকরে প্রবলভাবে আক্রান্ত শিশুদের সম্পূর্ণ

সুস্থ করা সম্ভব হয়েছে। মধ্য আমেরিকার এক পরীক্ষায় রোগাক্রান্ত শিশুদের মাখনতোলা দুধের গুঁড়ার বদলে সহজপাচ্য করে তৈরি উদ্ভিজ্জ খাদ্যের এক বিশেষ মিশ্রণ খেতে দেওয়া হয়। মিশ্র উদ্ভিজ্জ খাদ্যের উপাদানটি এই রকম :—

বিশেষ শস্য (Corn masa)—৫০%
তিলের গুঁড়া —৩৫%
তুলাবীজের খইল —৯%
ঈষ্ট —৩%
বিশেষ গাছের পাতার গুঁড়া—৩%

শিশুদের হজমের উপযোগী করে তৈরি উপরিউক্ত উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সংমিশ্রণ বেশ কিছুদিন ক্রমাগত খেতে দিয়ে রোগাক্রান্ত শিশুদের রোগমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। যদিও দুধের গুঁড়ার মত তত সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নি।

শুধু মধ্য আমেরিকায় নয়, বহু দেশেই অনুরূপ পরীক্ষায় সবিশেষ আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য, উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সংমিশ্রণ সমস্ত পরীক্ষাতেই এক ভাবে তৈরি হয় নি। ভারতে পরিচালিত কোন একটি পরীক্ষায় নিম্নলিখিত সংমিশ্রণটি ব্যবহৃত হয়েছিল :—

ছোলা —৫৯%
কলার ময়দা—২৪%
গুড় —১৭%

আফ্রিকায় কোন কোন অঞ্চলে চীনাবাদামের খইলের (তৈল নিষ্কাশনের পরে পিষ্ট চীনাবাদাম থেকে যে বস্তু পাওয়া যায়) সঙ্গে পাকা কলা মিশিয়ে "শিশু-খাদ্য" তৈরি করা হয়। এই বস্তু খেতে দিয়েও বহু রোগীকে রোগমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

মিশ্রণটি যে ভাবেই তৈরি হোক না কেন, প্রধান কথা হচ্ছে তাতে প্রোটিন ও অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি উপযুক্ত পরিমাণে থাকা চাই। এমন ভাবে খাদ্যটি তৈরি হওয়া উচিত, যাতে শিশুরা তা সহজে হজম করতে পারে এবং শিশুর রসনায় তা গ্রহণীয় হয়। এই রকম 'শিশু-খাদ্য' তৈরি করতে যতদূর সম্ভব স্থানীয় কৃষিজাত উদ্ভিজ্জ বস্তুর উপর নির্ভর করা উচিত। কয়েকটি অনুন্নত দেশে সাধারণভাবে টিফিন ও জলখাবার হিসাবে শিশু ও বালক-বালিকাদের অল্প খরচে তৈরি এরকম 'শিশুখাদ্য' খেতে দিয়ে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে।

শিশুদের উপযোগী প্রোটিনবহুল উদ্ভিজ্জ-খাদ্যের উপর যে গবেষণা চলছে, তা যে অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করে জগতে লক্ষ লক্ষ শিশুর খাদ্য ও পুষ্টি-সমস্যার সমাধানে সবিশেষ সহায়তা করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রজনন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিবাহ

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

বৈদিক যুগে আমাদের দেশে সবর্ণ বিবাহ শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত ছিল। সমান বর্ণের নরনারীর মধ্যে বিবাহ-ই সামাজিক প্রথা হিসাবে গণ্য ছিল। হিন্দুসমাজে অকারণ অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদিত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহবিধির সাহায্যে অসবর্ণ বিবাহকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছিল। অনুলোম প্রথায় ব্রাহ্মণ —ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা নারীকে, ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা ও শূদ্র নারীকে এবং বৈশ্য-শূদ্রা নারীকে বিবাহ করিতে পারিত। অসবর্ণ বিবাহে অনুলোম বিবাহ যেরূপ প্রশস্ত ছিল, প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহ সেরূপ প্রশস্ত ছিল না। অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রে নিন্দিত হলেও পরবর্তীকালে সমাজে মানুষের কুল অপেক্ষা শীলকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন ঋষিদের মধ্যে বশিষ্ঠ, ব্যাসদেব, পরাশরমুনি প্রমুখ অনেকেই ছিলেন বর্ণসঙ্কর। যে কন্যা মাতার সপিণ্ড ও পিতার সগোত্র, ব্রাহ্মণ এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন না। কিন্তু পুরাকালে নিকট সম্পর্কের মধ্যে বিবাহের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। অর্জুন নিজের মাতুল কন্যা সুভদ্রাকে বিবাহ করেন।

আধুনিক প্রজননতত্ত্ববিদেরা নিকট সম্পর্কীত আত্মীয়-স্বজন, যেমন—কাকা-ভাইঝি, মামা-ভাগ্নী, মাসী-বোনপো, পিসি-ভাইপো এবং জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো, মামাত, মাসতুতো ও পিসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ অনুমোদন করেন না। প্রাচীন কালে রাজরক্ত কলুষিত হবার আশঙ্কায় ইংল্যাণ্ড ও মিশরের রাজপরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। এই প্রকার অন্তর্বিবাহের (Inbreeding) ফলে ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের মধ্যে কি ভাবে বংশগত হিমোফিলিয়া রোগ প্রসারিত হয়েছিল, তা প্রোফেসার হলডেন দেখিয়েছেন। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, অনাত্মীয় বিবাহের তুলনায় আত্মীয় বিবাহে উৎপন্ন সন্তান-সন্ততির মধ্যে পাল্‌মোনারী টিউবারকিউলোসিস-এর প্রবণতা বেশী। Hirschfeld তাঁর পুস্তক Men and Women-এ বোম্বাই-এর পার্সী সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তর্বিবাহের কুফলের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রতি মানুষ কোন না কোন বংশগত রোগের বা ক্ষতিকর কোন বৈশিষ্ট্যের জিন (Gene) প্রচ্ছন্নভাবে বহন করে থাকে এবং তারা বাহ্যতঃ নীরোগ অবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে বিচরণ করে। একই পরিবারের ভাইবোনের বা নিকট আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিবাহ হলে, সমপ্রকৃতিসম্পন্ন দুটি প্রচ্ছন্ন জিন (Recessive gene) একই সন্তানের মধ্যে একত্র সমাবেশের সম্ভাবনা বেশী থাকে, ফলে প্রচ্ছন্ন জিনের ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে প্রকাশ পায়। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহে এল্‌কাপটোনুরিয়া, অ্যালবিনিজিম, বর্ণান্ধতা প্রভৃতি বংশগত রোগের আধিক্য দেখা যায়। আত্মীয়-স্বজনদের বিবাহ অপেক্ষা যদি অনাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ ঘটে, তাহলে প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বংশগত রোগের আত্মপ্রকাশ হবার সম্ভাবনা কম থাকে। বিধবা ভ্রাতৃবধূ বা মৃত পত্নীর ভগ্নীর সঙ্গে কোন ব্যক্তির বিবাহকে অন্তর্বিবাহের পর্যায়ে ফেলা যায় না। প্রজননতাত্ত্বিক বিচারে

কিন্তু এরূপ বিবাহে কোন বাধা নেই। সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান সন্তানোৎপাদনের উদ্দেশ্যে অনেক প্রজননতত্ত্ববিদ বহির্বিবাহের (Outbreeding) অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। প্রোফেসার হলডেনের মতে—The most efficient eugenic method is the introduction of good road transport into backward rural areas, thus encouraging outbreeding.

অনেক প্রজনন-বিজ্ঞানী মনে করেন যে, বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর বংশতালিকা (Pedigree) পরীক্ষা করা আবশ্যক। পাত্র-পাত্রীর বংশতালিকার সাহায্যে তাদের ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির মধ্যে কোন বংশগত রোগের লক্ষণ প্রকাশ হবার সম্ভাবনা আছে কিনা, তা অনেক ক্ষেত্রে জানা যেতে পারে। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ই যদি কোন প্রচ্ছন্ন জিনের বাহক (Carrier) হন, তাহলে সেই জিনের ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য যে কোন সন্তানের মধ্যে ফুটে ওঠবার সম্ভাবনা থাকে। যদি প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বংশগত রোগের বাহককে জানা সম্ভব হয়, তাহলে পাত্র-পাত্রীকে বিবাহের পূর্বেই সম্ভাবনাপূর্ণ ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়া যেতে পারে। প্রজনন-বিজ্ঞানের উন্নতিতে প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বংশগত রোগের বাহককে অনেক ক্ষেত্রে সনাক্ত করা সম্ভব। বিবাহের পূর্বে স্ত্রী-পুরুষের রক্ত পরীক্ষা করে বিবাহের ব্যবস্থা করলে অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনজনিত রক্তশূন্যতা রোগ (যেমন সিক্‌লসেল্ অ্যানিমিয়া, থ্যালাসেমিয়া প্রভৃতি) ও অনেক বিপাক বিশৃঙ্খলাজনিত ব্যাধি (যেমন—ফেনিল-কেটোনুরিয়া, গ্যালাক্টোসেমিয়া প্রভৃতি) বংশগত-ভাবে সন্ততির মধ্যে আত্মপ্রকাশ হবার সম্ভাবনা থাকে না। স্বামী-স্ত্রীর ABO ও Rh রক্তশ্রেণীর সামঞ্জস্য থাকলে সন্তানের মধ্যে হিমোলিটিক ও জনডিস রোগ প্রকাশ হতে দেখা যায় না।

যে ক্ষেত্রে বংশগত রোগ প্রকট জিনের (Dominant gene) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সে ক্ষেত্রে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পিতামাতার যে কোন একজনকে রোগগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যায় এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি সাধারণতঃ অর্ধেক সুস্থ ও অর্ধেক রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ পরিবারের সুস্থ পুত্রকন্যার বিবাহে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে প্রকট জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বংশগত রোগের প্রকাশ হবার আশঙ্কা থাকে না, কারণ এই সুস্থ পুত্রকন্যারা ক্ষতিকর প্রকট জিন বহন করে না।

জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের স্বার্থে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ কোন কোন জীববিজ্ঞানী সমর্থন করেন না। তাঁরা আশঙ্কা করেন যে, সংমিশ্রণের ফলে কোন অসুস্থ ও অনুন্নত জাতির ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্যের বা বংশগত রোগের জিন উন্নত, খাঁটি ও সুস্থ জাতির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে কালক্রমে গোটা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে। প্রজনন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কোন জাতিকে উন্নত বা অনুন্নত জাতি হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করা কঠিন। জাতির উন্নতির পিছনে সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা বা অনুকূল পরিবেশই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। মানুষের রক্তে বিভিন্ন প্রকার রক্তশ্রেণীর অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাদের অনুপাতে বিভিন্ন জাতিত বিভিন্ন। রক্তের দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর কোন জাতিকে নির্ভেজাল বা খাঁটি বলা যায় না। জাতি-গত রোগ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হতে দেখা যায়। প্রতি জাতির মধ্যে ভাল মন্দ বৈশিষ্ট্য কমবেশী মাত্রায় বর্তমান থাকে। কোন বিশেষ প্রচ্ছন্ন জিনের অনুপাত যদি একটি জাতির মধ্যে বেশী এবং অপর একটি জাতির মধ্যে কম থাকে এবং দুটি জাতি কোনক্রমে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে, তাহলে সঙ্কর বা মিশ্রিত জাতির যে কোন ব্যক্তির মধ্যে দুটি প্রচ্ছন্ন জিনের একত্র সমাবেশ হবার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া সংমিশ্রণে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষের উদ্ভব হয়। নির্বাচনে যে বৈশিষ্ট্যকে বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়, তাই

ভবিষ্যতে জাতিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রকাশ পায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে বিভিন্ন জাতের মধ্যে সঙ্গম ঘটিয়ে যে সঙ্কর জাত সৃষ্টি করা হয়, সেই সঙ্কর জাতকে অনেক ক্ষেত্রে পিতামাতা অপেক্ষা বেশী হৃষ্টপুষ্ট হতে দেখা যায়। মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে সন্তান-সন্ততির দৈহিক গড় উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ও প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বংশগত রোগের আবির্ভাব কমে যাওয়ার সংবাদও শোনা যায়।

মানুষে মানুষে দৈহিক আকৃতি ও অন্যান্য বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের মত বুদ্ধির তারতম্যও লক্ষ্য করা যায়। মনোবিজ্ঞানীরা IQ (Intelligent Quotient) দ্বারা মানুষের বুদ্ধির মান নির্ণয় করেন। IQ-র মাপকাঠিতে মানুষকে মূর্খ, বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান প্রভৃতিতে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যাদের IQ ১০০, তাদের বয়স অনুপাতে বুদ্ধি সাধারণ ও স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়। যাদের IQ ৮০-র নীচে, তাদের বুদ্ধি স্বল্প এবং যাদের IQ ১২০-র উপরে, তাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বলে ধরা হয়। শিক্ষা, বুদ্ধি ও মতবাদের ঐক্যই স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে আকৃষ্ট করে। পুরাকালের গান্ধর্ব বিবাহের মত বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরে মেলামেশা করে স্বাধীনভাবে জীবন-সঙ্গী নির্বাচন করে। এই প্রকার বিবাহে স্বামী-স্ত্রীর IQ-র পার্থক্য ২০ পয়েন্টের বেশী দেখা যায় না। সম্প্রতি আমেরিকার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১,৮৬৪টি দম্পতির মধ্যে ১,২৩০টি দম্পতির (প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ) IQ-র পার্থক্য ১৫ পয়েন্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেখানে স্বামী-স্ত্রীর IQ-র পার্থক্য কম, সেখানে স্বামীর IQ স্ত্রীর অপেক্ষা বেশী, কিন্তু যেখানে পার্থক্য বেশী, সেখানে স্বামীর IQ স্ত্রীর অপেক্ষা কম। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে দেখা গেছে যে, শিক্ষিত পিতামাতার সন্তানের বুদ্ধি সাধারণ পিতামাতার সন্তানের বুদ্ধি অপেক্ষা সাধারণতঃ বেশী। বর্তমানে উচ্চ পর্যায়ের IQ সম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ যে হারে সংঘটিত হচ্ছে, তাতে উচ্চ IQ সম্পন্ন সন্তান যথেষ্টভাবে আশা করা যায় এবং আমেরিকার জীববিজ্ঞানী Dr. John Rader Platt আশা প্রকাশ করেছেন যে, নিউটনের মত প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক আবির্ভাবের জন্যে শত শত বর্ষ অপেক্ষা করতে হবে না, মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে এক ডজন 'নিউটন'কে আমাদের মধ্যে দেখতে পাবো। তবে সন্তানদের উচ্চ IQ—বংশগতভাবে প্রকাশ পায় অথবা পরিবেশের ফলে সৃষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

ইলেকট্রনিক যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের নির্ভরশীলতা

অমিতোষ ভট্টাচার্য

গত কয়েক দশকে প্রতিরক্ষায়, শিল্পে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির কার্যকারিতার উৎকর্ষ বাড়ানোর চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতির নির্ভরশীলতার উপরও প্রচুর লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। একটা যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ তৈরি শেষ হবার পর তার উৎকর্ষ যাচাই করাটাই আজকাল তার শেষ কথা নয়, যন্ত্রটি কতটা নির্ভরশীল তাও বিবেচ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভরশীল সমরাস্ত্র না পেলে সৈনিকের সামনে এসে দাঁড়ায় বাঁচা-মরার প্রশ্ন আর সেনাপতির মনে জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্ব। নির্ভরশীলতার দিকে মনোযোগ আকর্ষিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আর তারপর থেকে এ-বিষয়ে আর গবেষণার অন্ত নেই। বিশেষ করে ইলেকট্রনিকসের ক্ষেত্রে গত দশ বছরের মধ্যে একটা যুগান্তর এসেছে, যার ফলে আজকের বিজ্ঞানী আর যন্ত্রবিদেরা এমন সব অদ্ভুত যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারেন, যাদের কর্মক্ষমতা আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপকেও হার মানাতে পারে। কিন্তু যা কিছুই তৈরি করা সম্ভব, তাই সর্বাংশে নির্ভরশীল হবে, এমন কোন কারণ নেই। অথচ আধুনিক সমরকৌশল এমন এক স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ক্ষুদ্র এক যন্ত্রাংশও যদি এক সেকেণ্ডের লক্ষভাগের এক ভাগ সময় অকেজো হয়ে বসে থাকে, তাহলেই শত্রুপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র একটা সহরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু পুরামাত্রায় নির্ভরশীল যন্ত্র তৈরির সমস্যা অত্যন্ত জটিল এবং শুধু যন্ত্রাংশের উৎকর্ষ আর কার্যকারিতার মধ্যেই আর ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ নয়। বিশেষ করে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ, যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থান, সৈনিকদের শারীরিক ও মানসিক গঠন, ট্রেনিং ইত্যাদির সঙ্গে যন্ত্র, যন্ত্রের গঠন-কৌশল ও কার্যক্ষমতা এক অদৃশ্য সুতায় গাঁথা থাকবার ফলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির নিরর্ভরশীলতা নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গবেষণার অন্ত নেই।

প্রশ্ন হলো, নির্ভরশীলতার অর্থ কি? একটা যন্ত্র যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তৈরি করা হয়েছে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যন্ত্রটির বিশ্বস্তভাবে অভীষ্ট কার্যক্ষমতা এবং উৎকর্ষ বজায় রাখবার সম্ভাবনাকে যন্ত্রটির নির্ভরশীলতা বলা যেতে পারে। যদি বলা হয় কোন যন্ত্রের বা যন্ত্রাংশের নির্ভরশীলতা শতকরা ৯০, তাহলে বুঝতে হবে, ঐ যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ যে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তৈরি করা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিশ্বস্তভাবে অভীষ্ট কার্য করা ও উৎকর্ষ বজায় রাখবার সম্ভাবনা প্রতি ১০০টি ক্ষেত্রে ৯০টি। ধরা যাক, একটা সার্কিট এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে কোন একটি যন্ত্রাংশে ত্রুটি দেখা দিলে সমগ্র যন্ত্রটি অকেজো হয়ে যাবে (Components functionally in series)। এখন এই যন্ত্রটি কতকগুলি ছোট ছোট যন্ত্রাংশের সমষ্টি মাত্র। তাই সমগ্র যন্ত্রটির নির্ভরশীলতা এই সব ক্ষুদে যন্ত্রাংশগুলির স্বকীয় নির্ভরশীলতার উপর মুখ চেয়ে বসে থাকবে। যদি যন্ত্রাংশের মোট সংখ্যা n হয়, আর প্রত্যেক যন্ত্রাংশের নির্ভরশীলতা যথাক্রমে R_1, R_2 ⋯R_n ইত্যাদি হয়, তাহলে সমগ্র যন্ত্রটির নির্ভরশীলতা হবে—

$$R=(R_1)\ (R_2)\cdots(R_{n-1})(R_n) \qquad (১)$$

$$=R_c^n \text{ যদি } R_1=R_2$$

$$=\cdots=R_n=R_c \text{ হয়।} \qquad (২)$$

সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বলা যায়, একটা যন্ত্রে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সমনির্ভরশীল হতে পারে না। কিন্তু সমনির্ভরশীল যন্ত্রাংশগুলিকে বিভিন্ন দলে চিহ্নিত করা সম্ভব। অর্থাৎ যদি—

m_1 সংখ্যক যন্ত্রাংশের স্বকীয় নির্ভরশীলতা R_1
m_2 " " " " R_2

ইত্যাদি হয়, তাহলে সমীকরণ (১) ও (২) থেকে—

$$R = \left(R_1^{m_1}\right)\left(R_2^{m_2}\right)\cdots\left(R_n^{mn}\right) \quad (৩)$$

উদাহরণ হিসাবে মনে করা যাক, একটা যন্ত্রে ভাল্ভ বা টিউবের সংখ্যা ১০টি এবং প্রত্যেকটির নির্ভরশীলতা ৯৩% এবং ৯৮% নির্ভরশীল যন্ত্রাংশের সংখ্যা ১০০, তাহলে সমীকরণ (৩) থেকে সমগ্র যন্ত্রটির নির্ভরশীলতা হবে—

$$R = (০·৯৩)^{10}\ (০·৯৮)^{100}$$
$$= ০·০৬৪৫$$
$$= ৬\%\ প্রায় \quad (৪)$$

সুতরাং উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় সার্কিট ডিজাইন করলে সমগ্র যন্ত্রটির নির্ভরশীলতার মান অত্যন্ত খারাপ হবে।

কাজেই নির্ভরশীলতা বাড়াতে হলে অন্য কোন প্রক্রিয়ার কথা ভাবতে হবে। মনে করা যাক, একটা যন্ত্র দুটি যন্ত্রাংশ A এবং B-এর দ্বারা তৈরি এবং যন্ত্রাংশ দুটির নির্ভরশীলতা যথাক্রমে R_A ও R_B। যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে যন্ত্রটি অকেজো হবে তখনই, যখন এই যন্ত্রাংশ দুটি এক সঙ্গে অকেজো হবে (Components functionally in parallel)। এদের মধ্যে যে কোন একটা যন্ত্রাংশ যদি কার্যক্ষম থাকে, তা হলে যন্ত্রটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত থাকবে। সুতরাং যে কোন একটা যন্ত্রাংশের ত্রুটিমুক্ত থাকবার সম্ভাবনা নিম্নলিখিত তিনটি বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ—

যন্ত্রাংশ A ও B দুটিই কার্যক্ষম (৫)
যন্ত্রাংশ A ত্রুটিযুক্ত, B কার্যক্ষম (৬)
যন্ত্রাংশ B ত্রুটিযুক্ত, A কার্যক্ষম (৭)

কাজেই সম্পূর্ণ যন্ত্রটির নির্ভরশীলতা হবে উপরের তিনটি বিভিন্ন অবস্থায় যন্ত্রটির নির্ভরশীলতার যোগফল। অর্থাৎ—

$$R = R_A R_B \quad [\text{সমীকরণ (৫) থেকে}]$$
$$+R_B\left(১-R_A\right) \quad [\ ,,\ (৬)\ ,,\ ]$$
$$+R_A\left(১-R_B\right) \quad [\ ,,\ (৭)\ ,,\ ]$$

$$বা\ R = R_A R_B + R_B\left(১-R_A\right) + R\left(১-R_B\right) \quad (৮)$$

যদি $R_A = R_B = ৯০\%$ হয়

$$তাহলে\quad R = ০·৯\times০·৯+০·৯\ (১-০·৯)+০·৯\ (১-০·৯)$$
$$= ০·৯৯$$
$$= ৯৯\% \quad (৯)$$

সুতরাং এভাবে যন্ত্রাংশগুলিকে যদি সমান্তরাল-ভাবে কাজ করবার জন্যে ব্যবহার করা হয়, তা হলে সমগ্র যন্ত্রের নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাবে।

অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, অনির্ভরশীলতার কারণ মোটামুটিভাবে চারটি :

(১) যান্ত্রিক জটিলতা।

(২) যন্ত্র কর্মক্ষম ও চালু রাখবার সমস্যা। এর মধ্যে আছে যান্ত্রিক গোলযোগ নির্দেশ করা এবং যন্ত্র মেরামতির সময়। যন্ত্রপাতি রক্ষণা-বেক্ষণের খরচ অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে যাচ্ছে, অথচ সেই অনুপাতে দক্ষ কর্মী নেই। দেখা গেছে, কোন কোন যন্ত্রের আয়ুকালের মধ্যে

মেরামতি খরচ, কর্মীর বেতন ইত্যাদি ক্ষেত্র-বিশেষে যন্ত্রের আসল দাম থেকে দশ থেকে এক-শ' গুণ বেশী। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, গড়ে ২৫০টি ভাল্‌ভের (Valve) জন্যে একজন করে দক্ষ টেক্‌নিসিয়ান দরকার এবং এই রিপোর্ট অনুযায়ী একখানা বিমানবাহী জাহাজে প্রায় ১২০০০ ভাল্‌ভের জন্যে কম করে পঞ্চাশ জন অভিজ্ঞ ও কুশলী কর্মী নিয়োগ করতে হবে। এটা নিঃসন্দেহে একটা ব্যাপক সংখ্যা। কারণ চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মীর অভাব প্রত্যেক দেশেই অনুভূত হচ্ছে।

সেটের কাজ চলে যায়, কিন্তু প্রতিরক্ষার যন্ত্রপাতি অল্প সময়ের মধ্যেই অকেজো হয়ে যাবে।

উপরের চারটি কারণের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে যথাসম্ভব সর্তকতা অবলম্বন করেও দেখা গেছে, কোন একটা যন্ত্রকে নির্ভরশীলতার উচ্চতম একটা মান পর্যন্ত বড়জোর টেনে নেওয়া যেতে পারে এবং তারপর নির্ভরশীলতা আর বাড়ে না বললেই হয় (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের প্রাথমিক স্তরে নির্ভরশীলতার মান উন্নয়নের শেষ স্তরের চেয়েও খারাপ। কারণ, উৎপাদিত যন্ত্রে প্রথম দিকে
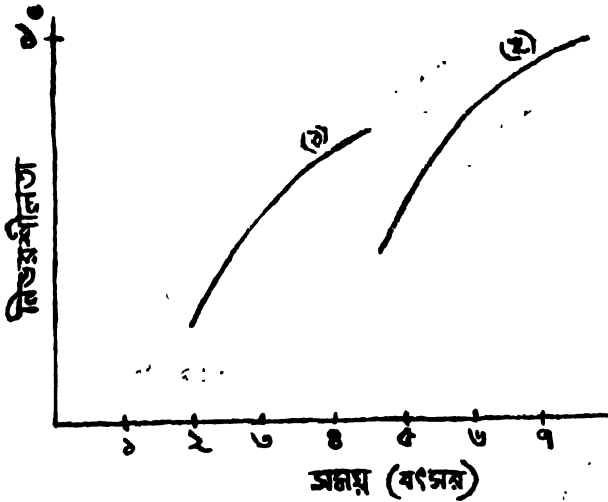
(১) গবেষণাগারে উন্নয়ন (২) কারখানায় উৎপাদন ও উন্নয়ন

১নং চিত্র।

(৩) পরিবেশ। যুদ্ধক্ষেত্র বা কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, বৃষ্টিপাত, দিন ও রাত্রের তাপমাত্রা, অত্যধিক শৈত্য বা উষ্ণতা, যন্ত্রের কার্যকরী ক্ষমতা ও নির্ভরশীলতাকে প্রভাবিত করে।

(৪) নিম্নমানের যন্ত্রাংশ ব্যবহার। প্রতি-যোগিতামূলক উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক সময় যন্ত্রের দাম কমাবার জন্যে নিম্নমানের যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়। এতে হয়তো একটা মোটামুটি রেডিও

অজানা পরিবেশের প্রভাবে ও অন্যান্য কারণে গোলযোগ দেখা দেবেই। যাহোক, দু-এক বছরের মধ্যেই পরিবেশজনিত গোলযোগের কারণ অনুসন্ধান করে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। ফলে নির্ভরশীলতা বাড়ে। কিন্তু একটা ঊর্ধ্বতম সীমায় আসবার পর আর বিশেষ বাড়ে না। উপরের কয়েকটা কারণ ছাড়াও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভীষ্ট উৎকর্ষ বজায় রেখে

উৎপাদনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার চেষ্টা এবং বাজেট সংক্রান্ত কড়াকড়িও এর জন্যে খানিকটা দায়ী।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির গোলযোগ ও অনির্ভরশীলতার কারণ সম্পর্কে যথেষ্ট অনুসন্ধান করা হয়েছে। যন্ত্রাংশের নির্ভরশীলতা ও উৎকর্ষ বাড়ালেই সেই হারে নির্ভরশীলতা বাড়বে, এমন কোন কারণ নেই। কেন না, যন্ত্রটি তৈরি হয়েছে একটা বিশেষ গবেষণার রাস্তা ধরে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষই সেটা ব্যবহার করবে। সুতরাং নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে মানুষের অবদানও কম নয়। অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, যন্ত্রবিদেরা যন্ত্রের উৎকর্ষের দিকে অত্যধিক মনোযোগী হয়ে নির্ভরশীলতার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। যন্ত্রাংশের ত্রুটি ছাড়া অন্যান্য যেসব কারণে ইলেকট্রনিক যন্ত্রে গোলযোগ দেখা দিতে পারে, সে সম্পর্কে বেল টেলিফোন লেবরেটরীর রিপোর্টটি নীচে তুলে দেওয়া হলো :

যন্ত্র ও যন্ত্রাংশে ত্রুটির কারণ	গোলযোগের শতকরা হার
(১) কারিগরী ও গবেষণা : যন্ত্রাংশ নির্বাচনে ত্রুটি, ডিজাইনে গলদ, ইত্যাদি।	৪৩
(২) ব্যবহার গত : দুর্ঘটনা, অপপ্রয়োগ, পরিবেশ, যথেচ্ছ ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটি ইত্যাদি।	৩০
(৩) উৎপাদন : অদক্ষ কর্মী, ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভাব, ত্রুটিযুক্ত কাঁচামাল ব্যবহার ইত্যাদি।	২০
(৪) অন্যান্য :	৭

একটা উদাহরণ দিয়ে গবেষণার ভুলে কিভাবে যান্ত্রিক গোলযোগ আসে, তা বলা যাক। মার্কিন জাহাজ দপ্তরের হিসাবে কতকগুলি যন্ত্রে শতকরা ২৩·৩ ভাগ যন্ত্রাংশ দখল করে ছিল 6J6 নামে একটা ভাল্‌ভ, অথচ গোলযোগের কারণ হয়েছিল শতকরা ৫৩·৩টি ক্ষেত্রে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে 6J6 ভাল্‌ভটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল। গোলযোগের কারণ অনুসন্ধান করে অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, ঐ সব বিশেষ সার্কিটগুলিতে 6J6 ব্যবহার করে অভীষ্ট ফল পাওয়া গেলেও নির্ভরশীলতার দিক থেকে বিশ্বাসযোগ্য ছিল না।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে সবচেয়ে বেশী গোলযোগ দেখা দেয় যুদ্ধক্ষেত্রে এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় ও মহড়ায়। গবেষণাগারের একটা কম্পিউটরের চেয়ে বিমানবাহিত রেডার যন্ত্রে গোলযোগের মাত্রা দশ থেকে কুড়ি গুণ বেশী। তিনটি বিভিন্ন পরিবেশে সমপরিমাণ নির্ভরশীল যন্ত্রে গোলযোগের হার নিম্নরূপ—

পরিবেশ	ব্যবহৃত সময়	গোলযোগের শতকরা হার
আদর্শ গবেষণাগার	প্রথম ৩০০০ ঘণ্টায়	১
	„ ১৪০০ „	১
যুদ্ধকালীন অবস্থা ও যুদ্ধক্ষেত্র	„ ২৩০ „	১

এর কারণ অত্যন্ত পরিষ্কার। গবেষণাগারে যন্ত্রপাতির ব্যবহার খুব সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে করা হয়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র গবেষণাগার নয়। সুতরাং অত্যন্ত বিরুদ্ধ পরিবেশ ও অবস্থার মধ্যে সৈনিকদের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয় বলে যন্ত্রপাতিগুলিকে অস্বাভাবিক রকমের ধাক্কা, আঘাত, কম্পন এবং নানারকম যথেচ্ছ ব্যবহারের মুখোমুখি হতে হয়। কাজে লাগবে, এমন সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির নির্ভরশীলতার মান অত্যন্ত উঁচু হওয়া দরকার।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, একটা যন্ত্র কতকগুলি ছোট ছোট যন্ত্রাংশ নিয়ে তৈরি। ইলেকট্রনিক যন্ত্রে এসবের অধিকাংশই হলো ভাল্‌ভ, রেজিষ্টর, ক্যাপাসিটর, ইণ্ডাকটর, ট্র্যান্স-ফরমার, রিলে, সুইচ, রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি কেব্‌ল্ ও চোক্ (R. F. cable & choke) ইত্যাদি। সর্বাপেক্ষা অধিক গোলযোগের কারণের জন্যে ভাল্‌ভের স্থান সকলের উপরে। ভাল্‌ভে নানাকারণে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। কার্যকরী ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্যে (১) গ্যাস উদগীরণ, (২) তাপের উৎপত্তি, (৩) Heater voltage-এর পরিবর্তন ইত্যাদি ব্যাপকভাবে দায়ী। টিউবের পরিবেষ্টক তাপমাত্রা (Ambient temperature) উল্লেখ-যোগ্যভাবে বেড়ে গেলে আয়ুষ্কাল কমে যায়। সাধারণ টিউবে এই তাপমাত্রা ২০০° সেন্টিগ্রেড অথবা উৎপাদন সংস্থার নির্দেশিত মানের মধ্যে যেটা কম, তা অতিক্রম করা কোন মতেই উচিত নয়। তাছাড়া যন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রাংশের অবস্থানের উপরও এই তাপমাত্রা খানিকটা নির্ভর করে। সুতরাং যিনি সার্কিট ডিজাইন করবেন, তাঁর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং যত্ন এই ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করবে। নীচে দুটি বহুল ব্যবহৃত টিউবের আয়ুষ্কালের সঙ্গে পরিবেষ্টক তাপমাত্রার একটা সম্বন্ধ দেওয়া হলো :

ভাল্‌ভ	পরিবেষ্টক তাপমাত্রা ডিঃ সেঃ	কার্যক্ষম ভাল্‌ভের সংখ্যার শতকরা হিসাব ব্যবহৃত সময়		
		২৫০ ঘঃ	১০০০ ঘঃ	৫০০০ ঘঃ
6AK5	১০০	৯৯	৯০	৪৭
	২৫০	৫৮	৩২	-
6J6	১০০	৯৮	৯০	৫
	২৫০	৯৬	৪০	-

রেজিষ্টরে গোলযোগের হা‌র বেশ কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জোড় খুলে যাওয়ার ফলে রোধের (Resistance) মান বেড়ে যায়। তার জড়ানো Potentiometer-গুলির মধ্যে বাইরের ধুলাবালি জমে গেলে অস্বাভাবিক রকমের হিস্ হিস্ শব্দের জন্ম দেয়। ক্যাপাসিটরে সাধারণ গোলযোগের কারণ হলো অন্তরণ রোধের (Insulation resistance) মান কমে যাওয়া। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত দেশে অত্যধিক আর্দ্রতার জন্যে জলীয় বাষ্প ধীরে ধীরে ভিতরে জমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে ক্যাপাসিটরের অন্তরণ রোধ কমে যায়। রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি কেব্‌ল-গুলির আভ্যন্তরীণ পরিবাহী ভেঙ্গে গেলে, জলীয় বাষ্প টেনে নিলে, মাটির রাসায়নিক ক্রিয়ায় বাইরের আবরণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে কিংবা শৈত্য, তাপ বা অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া বাইরের ও ভিতরের পরিবাহীর অসমান প্রসারণের ফলে অনেক সময় আভ্যন্তরীণ পরিবাহী বাইরের পরিবাহীকে স্পর্শ করতে পারে। ভালভাবে সীল করা ট্র্যান্সফরমারে কোন গোলযোগ দেখা দেয় না। বিভিন্ন রকমের ৮০টি যন্ত্রের প্রায় ৩৫০০ যন্ত্রাংশের ত্রুটির কারণ অনুসন্ধান করে মার্কিন অ্যাটমিক এনার্জি রিসার্চ সংস্থার অভিজ্ঞতা নিম্নরূপ :

যন্ত্রাংশ	ব্যবহৃত সময় ঘণ্টা	গোলযোগের শতকরা হিসাব
ভাল্‌ভ	১০০০	৫৩
রেজিষ্টর	"	২৪
ক্যাপাসিটর	"	৪
অন্যান্য যন্ত্রাংশ	"	১৪
যন্ত্রাংশ ছাড়া অন্যান্য কারণ	—	৫

উপরের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইলেকট্রনিক যন্ত্রে টিউবের জন্যে সচরাচর অধিক গণ্ডগোল দেখা দেয়। আজকের

দিনে নতুন নতুন এবং অধিকতর নির্ভরশীল টিউবের (যেমন নুবিষ্টর—Nuvistor) আবির্ভাবে এই হার অনেক কমে গেছে এবং নির্ভরশীলতাও চমৎকারভাবে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু মেরামতির সময় টিউবের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কম। কারণ, গলদযুক্ত টিউব খুঁজে বের করতে সময় বেশী লাগে না এবং তারপর একটা নতুন টিউব বসিয়ে দিলেই হলো। অথচ অন্যান্য যন্ত্রাংশে গোলযোগ দেখা দিলে ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রাংশের অনুসন্ধান অত্যন্ত ধৈর্য ও সময়সাপেক্ষ।

আগেই উল্লেখ করেছি, কোন জায়গা বা যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির নির্ভরশীলতা নির্ভর করে। জলবায়ুর দিক থেকে ভারতবর্ষ অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, যেমন লাডাকের জলবায়ু অনেকটা মেরু অঞ্চলের মত। রাজস্থান আর কচ্ছের রাণ প্রায় মরুভূমি। আবার আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি স্থানে বৃষ্টিপাত বেশী বলে বায়ুতে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। সুতরাং আমাদের দেশে প্রতিরক্ষার জন্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরির সমস্যা অনেকটা নিজস্ব ও অদ্ভুত ধরণের—সুতরাং এসম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার দরকার।

বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশী থাকলে যন্ত্রপাতিতে ছত্রাকের (Fungus) জন্ম হয় এবং এতে বস্তুর অন্তরণ বোধ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। দেখা গেছে ৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় অন্তরণ রোধ অসীম (Infinity) হতে প্রায় ৫×১০৬ ওম্ (Ohm)-এ নেমে যেতে পারে। সুতরাং বাহ্যিক অবরণে ও সার্কিটে এমন সব অন্তরক (Insulator) ব্যবহার করতে হবে, যাতে ফাঙ্গাস জন্মাবে না। সম্প্রতি সেরামিক (Ceramic), অভ্র, কাচ, নাইলন, টেফলন ইত্যাদি ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া ফাঙ্গাস নিরোধক ওষুধ খুব ভাল করে যন্ত্রে ও যন্ত্রাংশে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

তাপের প্রভাবে বস্তুস্থিত অণুগুলির গতিশক্তি (Kinetic energy) বেড়ে যায় এবং বস্তুর বৈদ্যুতিক ধর্মের (Electrical properties) পরিবর্তন ঘটে। তাপমাত্রা যতই বাড়তে থাকবে, এই পরিবর্তনের হার সেই অনুপাতে ত্বরান্বিত হবে। মরুভূমি অঞ্চলে রাতের ও দিনের তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি অত্যন্ত বেশী; ফলে যন্ত্রপাতি দিনে গরম ও রাতে ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং এর ফলে একটা পর্যায়বৃত্ত-তাপতরঙ্গের (Periodic heat wave) সৃষ্টি হয়। কাজেই যন্ত্রাংশ নির্মাণ ও যন্ত্রের ডিজাইন করবার সময় এই বিশেষ অবস্থাটির কথা ভুলে গেলে চলবে না। বিমান-বাহিত যন্ত্রে এই তাপের সমস্যাটা একটু অন্য রকম। সাধারণ অল্পগতির বিমানে সাধারণতঃ যন্ত্রপাতি ঠাণ্ডা করবার জন্যে বাতাস ব্যবহার করা হয় আর এতে মোটামুটি কাজ চলে যায়। কিন্তু জেট, জঙ্গী, বোমারু বা সুপারসোনিক বিমানে এই ব্যবস্থা একেবারেই অচল। বিমান যখন খুব দ্রুতবেগে চলে, তখন বাতাসের সঙ্কোচনের জন্যে বিমানের কাঠামো গরম হতে থাকে। ফলে যে বাতাস যন্ত্র ঠাণ্ডা করবার জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছিল, সেই বাতাসই উল্টে যন্ত্রপাতিকে গরম করতে সুরু করবে। বিমানের কাঠামোর তাপমাত্রা মোটামুটি

$\left(\frac{V}{১০০}\right)^2$ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এই নিয়মে বাড়ে।

[V=বিমানের গতি, মাইল/ঘণ্টা]। সমর বিশেষজ্ঞদের মতে, বিমান-বাহিত যন্ত্রকে কোনমতেই ৫৫° সেঃ-এর উপরে উঠতে দেওয়া উচিত নয়, অথচ বিমানের গতিবেগ ঘণ্টায় ৮২৫ মাইল হলেই এই তাপমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব। আর গতিবেগ ম্যাক্-২ (Mack-2)—অর্থাৎ শব্দের দ্বিগুণ গতি বা ঘণ্টায় ১৩২০ মাইল হলে বিমানের কাঠামোর তাপমাত্রা হবে প্রায় ১৫০° সেঃ। নিঃসন্দেহে এটা একটা মাথা ঘামানো তাপমাত্রা! আধুনিক সমর-বিজ্ঞানে তাই বিমানের নক্সা যখন

কাগজে আঁকা হতে থাকে, সেই সময়েই কি ধরণের ইলেকট্রনিক যন্ত্র বিমানে ব্যবহার করা হবে, তাও ভাবা হয় এবং সেই অনুসারে গবেষণাগারে কাজ করা হয়। সাধারণতঃ এই সব দ্রুতগামী বিমানে বিশেষ ধর্মযুক্ত তরল পদার্থ যন্ত্রপাতি ঠাণ্ডা করবার জন্যে ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন যন্ত্রাংশের মানের অবনতি না ঘটিয়ে সর্বোচ্চ কত তাপমাত্রা পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব, তার একটা মোটামুটি ধারণা নীচে দেওয়া হলো :

যন্ত্রাংশ	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ডিগ্রী সেঃ
কার্বন রেজিষ্টর	১৫০
তার জড়ানো রেজিষ্টর	৩২০
সেরামিক ক্যাপাসিটর	১০০
পেপার "	১১০
ট্র্যান্সফরমার ও চোক্	১৫০
সিলিকন রেক্টিফায়ার	১৮০
রিলে (Relay)	১৫০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে আবিষ্কৃত হলো, উৎপাদিত ইলেকট্রনিক যন্ত্রের একটা বিরাট অংশ ব্যবহৃত হয় নি এবং বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রগুলিকে বাক্স থেকে পর্যন্ত বের করা হয় নি। তাছাড়া যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় যন্ত্রগুলিকে সযত্নে সংরক্ষিত করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তর গুদামজাত অবস্থায় অধিক কাল ইলেকট্রনিক যন্ত্র অব্যবহার্য হয়ে পড়ে থাকলে তার নির্ভরশীলতা পরিবর্তিত হয় কিনা, দেখবার জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। এই কমিটির নাম দেওয়া হলো Advisory Group on Reliability of Electronic Equipment বা সংক্ষেপে AGREE। এই কমিটি ১৯৫৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী রিপোর্ট পেশ করেন। কমিটি নৌ-বিভাগের ২৫,৫৪৫টি, বিমান বাহিনীর ১০০,০০০টি যন্ত্র এবং ওয়েষ্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানীর ৪৬০০০ রিপোর্ট ও সিগন্যাল দপ্তরের ৬,৭৬১ টন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের গুদামে থাকাকালীন অবস্থা নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা করেন, প্রমাণিত হলো যন্ত্র সংরক্ষণ করবার ক্ষেত্রে গুদামের অবস্থা সম্পর্কে কোন যত্ন নেওয়া হয় নি—অর্থাৎ গুদামের তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা বা গুদামজাত সময় কত এই সম্পর্কে সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেক দিন অব্যবহার্য অবস্থায় যন্ত্রাদি পড়ে থাকলেও গোলযোগ বড় একটা দেখা দেয় না এবং প্রতি এক হাজার ঘন্টায় গোলযোগের হার প্রায় ০·১৪৪% মাত্র।

মোটামুটিভাবে ইলেকট্রনিক যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের নির্ভরশীলতা নিয়ে আলোচনা করা হলো। কিন্তু শুধু যন্ত্রের নির্ভরশীলতার উপর কোন উদ্দেশ্যের সাফল্য নির্ভর করে না, বরং মানুষের কর্মকুশলতা ও ট্রেনিং-এর সঙ্গে যন্ত্রের সামগ্রিক সামঞ্জস্য ঘটাতে না পারলে যন্ত্র তৈরির আসল লক্ষ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সুতরাং মানুষ ও যন্ত্র নীতিগতভাবে দুটো সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা হলেও এদের মধ্যে একটা সহজ সরল সম্পর্ক খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত নির্ভরশীলতার মত জটিল সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান হবে না।

আকরিকের প্রস্তুতি

শ্রীঅনুপম মুখোপাধ্যায়

ভূপৃষ্ঠে ধাতুর যে সকল যৌগ পাওয়া যায়, তাহা বিভিন্ন ধরণের পদার্থের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কাজেই ধাতু নিষ্কাশনের জন্য প্রথমে এই সকল ধাতুর যৌগ অপ্রয়োজনীয় পদার্থ হইতে বিমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। যে প্রণালীর দ্বারা খনিজ দ্রব্য হইতে প্রয়োজনীয় উপাদান পৃথক করা যায়, তাহাকে বলা হয় Mineral dressing অর্থাৎ খনিজ পদার্থের প্রস্তুতি। ধাতু নিষ্কাশনের কাজে 'মিনারেল ড্রেসিং' একটি অপরিহার্য অংশ। 'মিনারেল ড্রেসিং' তিন ভাগে

(১) আকরিকের প্রস্তুতি (Ore dressing)—
যে সকল প্রণালীর মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়া ব্যতিরেকে কঠিন অজৈব ধাতব যৌগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহাকে 'ওর ড্রেসিং' বলে।

(২) নিষ্কাশন ধাতুবিদ্যা (Extractive metallurgy)—
এই বিভাগে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে কঠিন অজৈব উপাদান পৃথক করা হয়।

(৩) জ্বালানী শিল্পবিজ্ঞান (Fuel technology)—
ফুয়েল টেক্‌নোলজির মাধ্যমে ভৌত ও রাসায়নিক পন্থায় কার্বনযুক্ত পদার্থ পৃথক করা হইয়া থাকে।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা 'ওর ড্রেসিং' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। 'ওর ড্রেসিং' বিভিন্ন প্রথার সাহায্যে সংঘটিত হয়। অনেক সময় আকরিকগুলি যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই শুধুমাত্র হাতুড়ির আঘাতে ভাঙিয়া হাতে করিয়াই আলাদা করা হয়। তবে এই প্রথা বিশুদ্ধ খনিজ দ্রব্যের পক্ষেই উপযোগী।

স্ক্রীন সাইজিং (Screen sizing)—সাইজিং-এর সাহায্যে বিভিন্ন আকারের মিশ্রিত খনিজ পদার্থের কণাগুলি পৃথক পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রতিটি পর্যায়ে পদার্থের আকার প্রায় সমান থাকে। এই পৃথকীকরণ সম্ভব হয় ছাঁকুনী বা স্ক্রীনের সাহায্যে। বাড়ী তৈয়ারীর সময় যেভাবে বালি ও পাথর পৃথক করা হয়, ছাঁকুনীর সাহায্যে খনিজ দ্রব্যের পৃথকীকরণও অনেকটা সেই ভাবেই হইয়া থাকে।

সিক্ত শ্রেণীবদ্ধকরণ (Wet classification)—
সিক্ত শ্রেণীবদ্ধকরণ প্রণালীতে খনিজ পদার্থের মিশ্রণ কোন তরল মাধ্যমে নিয়ে প্রবাহিত করা হয় এবং পদার্থের আকার ও আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী উহারা বিভিন্ন স্তরে আসিয়া জমা হয়। এই প্রণালীর আর একটি নাম হইল সর্টিং (Sorting)। সাধারণতঃ তরল পদার্থ হিসাবে জলই ব্যবহার করা হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য তরল পদার্থ—এমন কি, বায়ু বা গ্যাসও ব্যবহৃত হয়।

সিক্ত শ্রেণীবদ্ধকরণ প্রণালীর দ্বারা বালি এবং কাদা (Slime) আলাদা করা সম্ভব হয় এবং ছোট-বড় দানার বালিও আলাদা করা যায়। এই সকল কাজ ক্ল্যাসিফায়ার নামক যন্ত্রের সাহায্যে করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন রকমের কাজে বিভিন্ন ধরণের ক্ল্যাসিফায়ারের প্রয়োজন হয়। ইহাদের মধ্যে রেক ক্ল্যাসিফায়ার (Rake classifier), স্পাইরাল ক্ল্যাসিফায়ার (Spiral classifier), ড্র্যাগ ক্ল্যাসিফায়ার (Drag classifier), হার্ডিঞ্জ

ক্ল্যাসিফায়ার (Herdinge classifier) বেশী প্রচলিত।

পতনপ্রবণতার সাহায্যে ঘনীভূতকরণ (Gravity concentration)—পতনপ্রবণতার সাহায্যে ঘনীভূতকরণ বা গ্র্যাভিটি কনসেনট্রেসন প্রণালীর দ্বারা গ্র্যাভিটি বল এবং এক বা একাধিক বলের এই বল প্রয়োগ করা হয় কোন ফ্লুইড (Fluid) ধর্মীয় মাধ্যমের সাহায্যে। ফ্লুইড হিসাবে বায়ু, জল বা একই প্রকৃতির (Homogeneous) তরল এবং কঠিন পদার্থের কোন মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়। এই বলের জন্য দায়ী ফ্লুইডের প্লবতা এবং উর্ধ্বমুখী ঘাত (Impulse)।
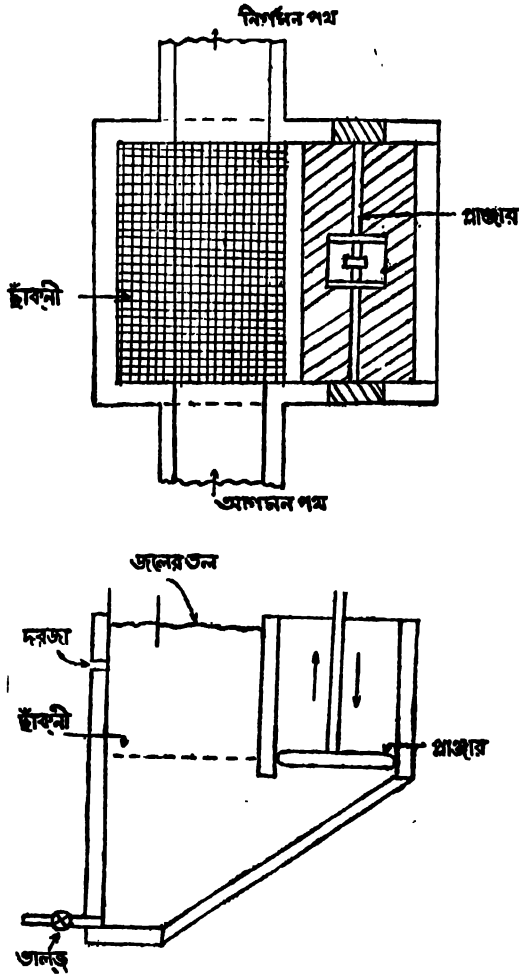
১নং চিত্র।

সমকালীন প্রয়োগের সাহায্যে খনিজ পদার্থের কণাগুলিকে তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়। গ্র্যাভিটি ছাড়া অন্য বল হইল বস্তুর নীচে নামিবার বিরুদ্ধ বল। সাধারণতঃ

স্পন্দনশীল শয্যা (Pulsated bed)—জিগ (Jig)—জিগ একটি যান্ত্রিক কনসেনট্রেটর (Mechanical concentrator), যাহার সাহায্যে হাল্কা কণাগুলি ভারী কণা হইতে পৃথক করা হয়। আংশিক

স্থির ফ্লুইডের মাধ্যমে কণাগুলির প্রবেশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া এই পৃথকীকরণ সম্ভব হয়।

ইহা একটি ট্যাঙ্ক, যাহার প্রস্থচ্ছেদ আয়তক্ষেত্রিক এবং যাহার তল ঢালু হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর কানার ঠিক নীচে একটি ছাঁকুনী স্থাপিত আছে. ট্যাঙ্কের মধ্যে সাধারণতঃ জলই ফ্লুইড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ছাঁকুনী বা জালের মধ্যে স্পন্দনশীল গতির সৃষ্টি করা হয়, যাহার ফলে ফ্লুইড ছাঁকুনীর ভিতর দিয়া উঠা-নামা করিতে থাকে এবং ছাঁকুনীর উপর অবস্থিত খনিজ পদার্থের কণাগুলিও উপর-নীচ গতি প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে ছাঁকুনীর উপর স্তরে স্তরে আসিয়া জমা হয় (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

কম্পমান শয্যা (Shaking bed) বা কম্পমান টেবিল—আধুনিক কম্পমান টেবিল বা উইল্‌ফ্লে টেবিল (Wilfley table) এক প্রকার কনসেনট্রেটর, যাহা জমা হয়, কিন্তু হাল্কা অংশ শিরগুলির উপরে থাকে এবং জলের সাহায্যে ধৌত হইয়া টেবিলের বাহিরে আসিয়া পড়ে। শিরগুলির নীচের ভারী অংশ ক্রমে ক্রমে টেবিলের মসৃণ দিকে আসিয়া পড়ে এবং টেবিলের বাহিরে জমা হয়। এইরূপে কম্পমান টেবিলের সাহায্যে খনিজ পদার্থের বিভিন্ন ওজনের কণাগুলি পৃথক করা হয়। (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

ফেনা-ভাসন পদ্ধতি (Froth floatation)—ফেনিল ফ্লোটেশনে কঠিন পদার্থের শুষ্ক নিষ্পেষিত কণাগুলি জল ও তেলের মিশ্রণের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ঐ তরল মাধ্যমে বায়ু চালনা করা হয়। তখন কণাগুলির প্রকৃতি অনুসারে কিছু অংশ তেলের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ফেনার আকারে তরল মাধ্যমের উপরে ভাসিয়া উঠে এবং বাকী অংশ জলের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া নীচে আসিয়া জমা হয়। এই কার্য সংঘটিত করিবার
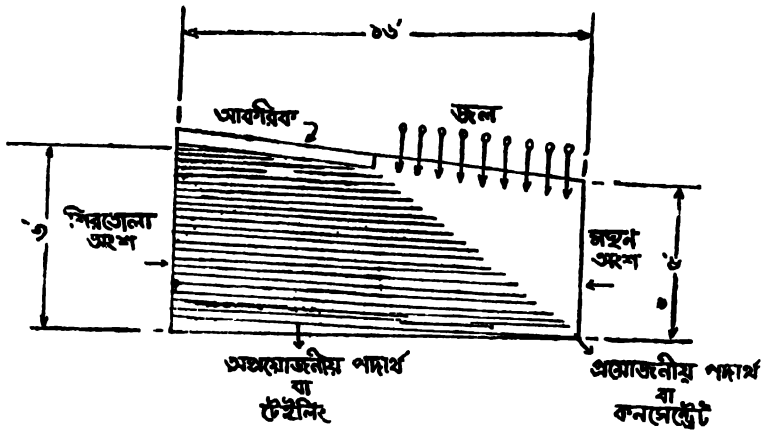
২নং চিত্র

সমান্তরাল হইতে সামান্য ঢালু। টেবিলটির অর্ধেক মসৃণ এবং অর্ধেক শিরতোলা। ইহা দৈর্ঘ্যের অক্ষ বরাবর সামনে-পিছনে চলাচল করে (১৫০/৩৭৫ বার প্রতি মিনিটে) এবং এই গতির লম্বভাবে জল প্রবাহিত হয়। টেবিলের উপরে অবস্থিত বস্তুও অনুরূপভাবে সামনে-পিছনে চলে এবং পদার্থের ভারী অংশ নীচের দিকে, অর্থাৎ শিরগুলির মধ্যে জন্য জল-তেলের মাধ্যমে বায়ু চালনা করা প্রয়োজন, কারণ উহা ফেনা তৈয়ারীর জন্য সাহায্য করে। সাধারণতঃ তেল হিসাবে পাইন তেল, ইউক্যালিপ-টাস তেল এবং ফেনিল পদার্থ হিসাবে যেনথেট (Xanthate) ব্যবহৃত হয়।

প্রথমে বল মিলে ওর অর্থাৎ আকরিক পেষণ করা হয় এবং ঐ নিষ্পেষিত ওর ক্ল্যাসিফায়ারে প্রেরণ

করা হয়, যেখানে আকার অনুসারে উহাদের আলাদা ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং বৃহদাকারের টুকরাগুলি আবার বল মিলে ফিরিয়া যায়। শ্রেণী-বদ্ধ ওর তখন যায় কনডিশনারে (Conditioner)। সেখানে ওরগুলিকে আলোড়িত করা হয় এবং ফ্লোটেশনের জন্য তেল ইত্যাদি মিশ্রিত করা হয়। আসল প্রক্রিয়াটি কিন্তু ঘটে রাফারে (Rougher)—এইরূপে ফেনিল ফ্লোটেশনের মাধ্যমে 'ওর ড্রেসিং' হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যে সকল পদার্থ সহজেই ভিজিয়া উঠে, তাহাদের পক্ষে এই প্রণালী সুবিধাজনক (৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

চৌম্বক প্রথায় পৃথকীকরণ (Magnetic Separation)—চৌম্বক শক্তির সাহায্যেও খনিজ পদার্থের পৃথকীকরণ সম্ভব। এই প্রণালীতে
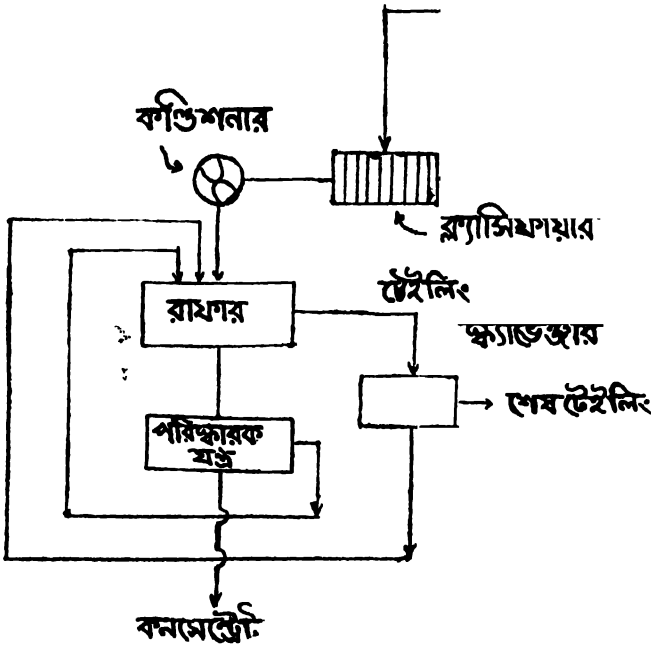
৩নং চিত্র।

সেখানে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য তলায় পড়িয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় মূল্যবান পদার্থ ফেনা হইয়া তরল পদার্থের উপরে উঠিয়া আসে। ফেনার আকারে প্রয়োজনীয় বস্তু ইহার পর যায় পরিষ্কারক-যন্ত্রে (Cleaner)। পরিষ্কারক যন্ত্রে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ পৃথক হইয়া যায় এবং রাফারে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। চৌম্বক শক্তি এবং অন্য বলের সাহায্যে পৃথকীকরণ হইয়া থাকে। এই পৃথকীকরণ শুধু চৌম্বক শক্তির উপরেই নির্ভর করে না, ইহা পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব, আকার, বিশুদ্ধতার উপরও নির্ভরশীল।

চৌম্বক যন্ত্র অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। অনেক সময়ে বেল্ট ও ড্রামের সাহায্যে ওর চৌম্বক

ক্ষেত্রের মধ্যে আনা হয় এবং আকর্ষিত বস্তু আলাদা করা হয়। চুম্বক হিসাবে ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক চুম্বক ব্যবহার করা হয়। চুম্বকের শক্তি নির্ভর করে বস্তুর চৌম্বক গুণের উপর। (৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

স্থির বৈদ্যুতিক পৃথকীকরণ (Electrostatic Separation)—চৌম্বক প্রণালীতে পৃথকীকরণ যেরূপ চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির উপর নির্ভরশীল, সেইরূপস্থির বৈদ্যুতিক পৃথকীকরণও বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের শক্তির উপর নির্ভর করে। বিদ্যুতের ধর্ম অনুসারে আমরা জানি যে, কোন বিদ্যুতাহিত বস্তু উহার বিপরীতধর্মী ইলেকট্রোডের দিকে আকর্ষিত হয়। এই আকর্ষণ শক্তির সাহায্যেই খনিজ পদার্থের পৃথকীকরণ সংঘটিত হয়। স্থির

পরিবহন প্রণালী (Conductive method)—পরিবহন প্রণালীর সাহায্যে বস্তুকণাগুলি দুইটি বিপরীতধর্মী ইলেকট্রোডের মধ্যে রাখা হয় এবং একটি ইলেকট্রোডের সহিত স্পর্শ করান হয় ইলেকট্রোডের বিপরীতধর্মী বস্তু আকর্ষিত হয়। এবং সমধর্মী বস্তু বিকর্ষিত হইয়া অপর ইলেকট্রোডের সাহায্যে আকর্ষিত হয়। এই প্রণালী বিদ্যুৎপরিবাহী বস্তুর পক্ষে উপযোগী।

আয়নাইজ্‌ড্‌ গ্যাস প্রণালী (Ionised gas method)—খনিজ পদার্থের কণাগুলিকে আয়নাইজ্‌ড্‌ গ্যাস প্রণালীর সাহায্যে বিদ্যুতাহিত করিয়া পৃথক করা হয়। এখানে পদার্থের কণাগুলি কোন গ্যাসের সাহায্যে বহন করা হয় এবং ঐ গ্যাসে কোন আয়ন (Ion) অর্থাৎ বিদ্যুতাহিত কণা
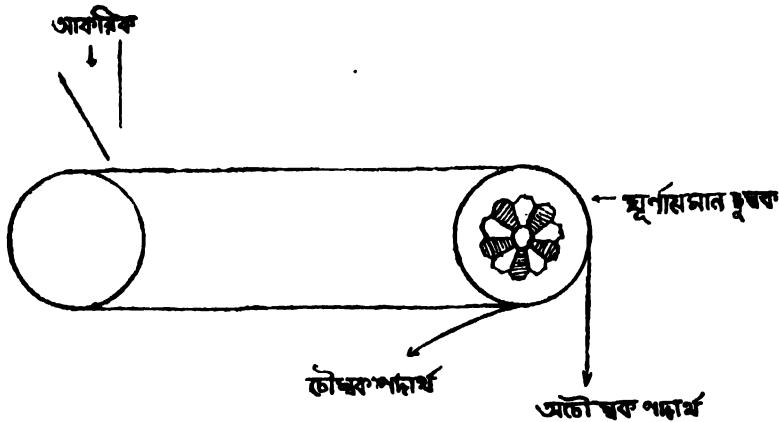
৪নং চিত্র।

বৈদ্যুতিক পৃথকীকরণ তিন প্রকারের হইয়া থাকে যথা—ঘর্ষণজনিত প্রণালী (Frictional method), পরিবহন প্রণালী (Conductive method) এবং আয়নাইজ্‌ড্‌ গ্যাস প্রণালী (Ionised gas method)।

ঘর্ষণ প্রণালী (Frictional method)—এই প্রণালীতে বিসদৃশ পদার্থ পরস্পর ঘর্ষিত হয়। ইহাতে এক অংশ পজিটিভ ধর্মী বিদ্যুতাহিত হয় এবং এক অংশে নেগেটিভ ধর্মী বিদ্যুতাহিত হয়। উহারা তখন উহাদের বিপরীতধর্মী ইলেকট্রোডের সাহায্যে আকর্ষিত হয়। সাধারণতঃ দুর্বল বিদ্যুৎ-পরিবাহী পদার্থগুলি এই প্রথার সাহায্যে পৃথক করা হয়।

অবস্থিত থাকে, খনিজ কণা আয়নের সংস্পর্শে বিদ্যুতাহিত হয় এবং উহারা বিপরীতধর্মী ইলেকট্রোডের দ্বারা আকর্ষিত হয় এবং আলাদা স্থানে জমা হয়।

'ওর ড্রেসিং' বা আকরিকের প্রস্তুতি সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। ধাতু নিষ্কাশনের কাজে যে সকল প্রকারে 'ওর ড্রেসিং' হইয়া থাকে, তাহা মোটামুটি উপরের বিভিন্ন প্রণালীতে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল প্রথাগুলির রূপান্তর ঘটিতেছে এবং ইহাতে অনেক অল্প খরচায়, অল্প সময়ে বেশী ফল লাভ করা সম্ভব হয়।

কীটঘ্ন রাসায়নিক পদার্থ কি পর্যন্ত জমির ক্ষতি করতে পারে ?

এই বিষয়ে ডেভিড উইলসন লিখেছেন—বৃটেনে এখন কয়েক রকমের কীটঘ্ন রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বন্ধ রাখা হয়েছে, কারণ আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, এই সব পদার্থ ব্যবহারের ফলে জমির ক্ষতি হতে পারে—বিশেষতঃ বৃটেনের মত দেশের জলবায়ুতে এই ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই বেশী।

কিন্তু এই সব রাসায়নিক পদার্থ উষ্ণতর জলবায়ুতে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যেতে পারে; কারণ উষ্ণতর আবহাওয়ায় গাছপালা অনেক তাড়াতাড়ি জন্মায় এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে মাটির রূপান্তর ঘটে। এর ফলে মাটি ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধের ক্ষমতা লাভ করতে পারে।

এই সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ফলে মানুষের কোন বিপদ ঘটবে কি না, বিজ্ঞানীরা সে কথা এখনও প্রমাণ করতে পারেন নি। তবে একথা জানা গেছে যে, এই সব পদার্থ অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বৃটেনের মত ছোট একটি দ্বীপের মাটিতে রাসায়নিক পদার্থ জমে জমে উর্বরতার ক্ষতি করতে পারে।

এর অর্থ এই নয় যে, উষ্ণতর জলবায়ুতেও এই ক্ষতির সম্ভাবনা আছে; কারণ এক্ষেত্রে তলানী যা পড়ে থাকে, তা সূর্যের তাপে পুড়ে যায় এবং তা পোড়ে অনেক তাড়াতাড়ি। এই চিত্রের আর একটা দিক আছে। যে সব দেশের জলবায়ু উষ্ণ, সে সব দেশে পোকামাকড় ধ্বংসের অর্থ হলো, উন্নততর স্বাস্থ্য এবং অধিকতর পরিমাণে খাদ্য।

এই দিকের ইতিহাস একটু আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে কীট-পতঙ্গের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম সুরু হয় সুইজারল্যাণ্ডের একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে। এই গবেষণাগারেই আবিষ্কৃত হয় ডি-ডি-টি নামে পদার্থ, আজ যার সঙ্গে বিশ্বের সকল দেশেরই পরিচয় ঘটেছে। কীট-পতঙ্গ ধ্বংসের ব্যাপারে ডি-ডি-টির আশ্চর্য ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়, অথচ মানুষ ও জীবজন্তুর পক্ষে তা ক্ষতিকর নয়।

অবিলম্বে এই নতুন রাসায়নিক পদার্থটির ব্যবহার সুরু হয়ে যায়, কোন কোন কীটবাহিত রোগ এর ফলে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়। ডি-ডি-টি ক্রমশঃ উকুন, মশা, পিপীলিকা, আরশোলা এবং মাছির উপর ব্যবহৃত হতে থাকে এবং তার ফল যে অত্যন্ত ভাল হয়, তা আজ নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই।

এর পর ডি-ডি-টি শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থগুলি ব্যবহৃত হতে থাকে মানুষের খাদ্যের যারা শত্রু, তাদের উপর। যে সব পোকামাকড় বাঁধাকপি প্রভৃতি সব্জির শিকড় খেয়ে ফেলে, সেগুলির বিরুদ্ধেও এই ধরণের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যেই আক্রমণ চালানো হয়। পঙ্গপাল দমনের অভিযানও এর পর অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে। এই পঙ্গপাল পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বহুকাল ধরে শস্যের ক্ষতি করে এসেছে।

একথা এখন বলতে দ্বিধা নেই যে, ডি-ডি-টি মানুষের কল্যাণে একটা বড় রকমের বৈজ্ঞানিক অবদান।

কিন্তু ক্রমশঃ দেখা যেতে লাগলো, কীট-পতঙ্গ এই সব রাসায়নিক পদার্থ প্রতিরোধের শক্তি

অর্জন করছে, যার ফলে সেগুলি আর কীট-পতঙ্গের উপর কার্যকরী হতে পারছে না। এর সঙ্গে আরও দেখা গেল যে, এই সব রাসায়নিক পদার্থ জমির উপর ক্রমাগত পড়ে জমির ক্ষতি করছে, কারণ সেগুলিকে ধুয়ে ফেলা সম্ভব হচ্ছে না।

আরও চিন্তার কথা হলো এই যে, গরু-ছাগল-ভেড়া প্রভৃতি জন্তুগুলি এই সব রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদাদি উদরস্থ করবার পর সেগুলি তাদের চর্বিতে এসে জমা হচ্ছে।

ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা শিকারী পাখীদের উপর এই সব রাসায়নিক পদার্থের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখেছেন। এই সব পাখী কীট-পতঙ্গভোজী হবার ফলেই এরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। পরীক্ষার পর শিকারী পাখীগুলির ডিমের মধ্যে ডি-ডি-টি এবং অনুরূপ রাসায়নিক পদার্থ বেশ খানিকটা পরিমাণে পাওয়া যায় এবং তাদের ডিম থেকে বাচ্চা হতেও দেখা যায় না।

আরও অনেক রকমের পরীক্ষার পর এখন একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—এতে কি মানুষেরও বিপদ দেখা দিতে পারে?

বৃটেনে এই কারণেই কর্তৃপক্ষ কৃষি-ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে এই সব রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। মানুষের মধ্যেও যে বিপদ দেখা দিতে পারে, এখনও তার প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তবে তাদের এই সিদ্ধান্তের ফলে আরও দামী সব রাসায়নিক পদার্থ এর বদলে ব্যবহার করবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু অন্য সব দেশের অবস্থা একটু ভিন্ন রকমের। অনুমান করা হয়, বিশ্বের অর্ধেক ব্যাধিই কীট-পতঙ্গের দ্বারা পরিবাহিত হয়, যেমন—পীতজ্বর, টাইফাস, বিউবোনিক প্লেগ, নিদ্রারোগ প্রভৃতি। এগুলি সমস্তই কীট-পতঙ্গের দ্বারা পরিবাহিত হয়ে থাকে এবং এই সব কীট ডি-ডি-টি ধরণের রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে বিনষ্ট করা সম্ভব, অথচ এই রোগগুলির অস্তিত্ব বৃটেনে নেই। ১৯৩৯ সালে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হয় সম্ভবতঃ ৬,০০০,০০০ লোকের। মশক ধ্বংসের জন্যে এখন ডি-ডি-টি ব্যবহার করে ১৮টি দেশ থেকে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়েছে, যদিও সম্পূর্ণরূপে রোগটি এখনও অদৃশ্য হয় নি।

এই ভাবে ডি-ডি-টি এবং এই ধরণের অন্য সব পদার্থ মানুষকে নানারকমের রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। আবার এই সব মানুষের মুখে খাদ্য পৌঁছে দেবার জন্যে খাদ্য-দ্রব্যকে রক্ষা করছে এই ডি-ডি-টি-ই। এসব দেশে এটির আরও বেশী প্রয়োজন আছে।

এই ব্যাপারে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঘানায় "ক্যাপসিড বাগ" নামে এক রকমের কীট ২০ শতাংশ কোকো নষ্ট করে থাকে, কিন্তু পরে দেখা যায়—যে সব বাগিচায় ডি-ডি-টি ব্যবহার করা হয়, সেই সব বাগিচায় তিন বছরে প্রায় পাঁচ গুণ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফিলিপাইনে চা'ল-ছিদ্রকারী কীট দমনের ব্যবস্থা একর প্রতি ৪,১০০ পাউণ্ড চালের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে।

মানুষের জীবন ও মানুষের খাদ্য রক্ষা করা যখন এই ভাবে সম্ভব হচ্ছে, তখন অন্য দিকে ক্ষতির সম্ভাবনা সামান্য রকমের থাকলেও তাকে বড় রকমের সমস্যা বলে মনে করা ঠিক হবে না।

জলবায়ুর বিষয়টিও চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে গাছগুলি যেমন তাড়াতাড়ি জন্মায়, তেমনই তাড়াতাড়ি মরে—শীতপ্রধান দেশে তার বিপরীত।

বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা যেতে পারে, 'টার্ণওভার' ও 'মেটাবলিজম' অনেক বেশী তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলিতে এবং তার ফলে রাসায়নিক পদার্থ মাটির উপর ক্রমশঃ জমে গিয়ে বিপদ সৃষ্টি করবার সম্ভাবনা থাকলেও তা খুবই কম।

এই সব সমস্তার সুনির্দিষ্ট জবাব এখনও পাওয়া যায় নি। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। বিষয়টি এখন ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে লণ্ডনের ইম্পিরীয়াল কলেজ অব সায়েন্সের ফিল্ড্ ষ্টেশন এবং অন্যান্ত কেন্দ্রে।

যাহোক, একথা স্বীকৃত হয়েছে যে, কীট-দমনের সমস্তা সম্পর্কে একটা সুষম সমাধান শেষ পর্যন্ত বিশ্বকে বের করতেই হবে। গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় দেশেই হোক কিংবা শীতপ্রধান দেশেই হোক, এই ভাবে ব্যাপক বিষাক্তকরণ ব্যবস্থা কখনও পুরাপুরি কল্যাণকর হতে পারে না।

'স্পেয়ার-পার্ট' সার্জারী

ডেভিড উইলসন বলেছেন যে, দু-জন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এমন সব আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন, যা শীঘ্রই মানুষের শরীরে 'স্পেয়ার-পার্ট' সার্জারি সম্ভব করে তুলতে পারবে। এই বিজ্ঞানী দু'জন হলেন ডাঃ অড্রে স্মিথ ও ডাঃ জে. ক্যারান্ট। এঁরা এখন লণ্ডনের কাছে মিল হিল্-এর ন্তাশন্তাল ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চ-এর সঙ্গে যুক্ত আছেন।

ডাঃ অড্রে স্মিথ ইতিমধ্যে মৃত ব্যক্তির চোখের কর্নিয়া সংরক্ষণ সম্পর্কিত কাজের জন্যে খ্যাতি লাভ করেছেন। এই সংরক্ষিত কর্নিয়া জীবিত ব্যক্তির দৃষ্টি পুনরুদ্ধারের কাজে শল্য-চিকিৎসকদের সাহায্য করবে। এর পরেই গঠিত হয় বিশ্বের প্রথম জীবন্ত টিস্যুর ব্যাঙ্ক—চক্ষু-ব্যাঙ্ক।

এই মহিলা চিকিৎসকই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি কার্টিলেজ থেকে জীবন্ত কোষ স্বতন্ত্র করবার পর সেগুলিকে জমাট করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং পরে আবার এই কোষ-গুলিকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন।

'স্পেয়ার-পার্ট' সার্জারি পূর্ণমাত্রায় সম্ভব করবার জন্যে আমরা হয়তো একদিন সম্ভমৃত ব্যক্তির শরীর থেকে অক্ষত অঙ্গ এবং টিস্যু সংরক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করে সেগুলিকে পরে জীবন্ত মানুষের রোগদুষ্ট অঙ্গ অথবা টিস্যুর জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো।

এই সংরক্ষণ এবং গ্র্যাফটিং-এর কাজ একটা বড় রকমের সমস্তা। তাছাড়া যে পদার্থটি আমাদের নিজেদের কোষ দিয়ে তৈরি নয়, তার গ্র্যাফটিং আমাদের শরীর প্রাকৃতিক কারণেই গ্রহণ করতে পারে না। চোখের সামনের কাচের মত স্বচ্ছ অংশটি, যাকে কর্নিয়া বলা হয়, তার কোন রক্ত-কোষ নেই। সেই জন্যে কোন অ্যান্টিবডিও সেখানে নেই, যা বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এই কারণেই অন্য মানুষের কোষ তা সহজে গ্রহণ করতে পারে। কর্নিয়া বদল করবার ব্যাপারে 'স্পেয়ার-পার্ট' সার্জারি প্রথম প্রচেষ্টায় সফল হয়। এর পরেই একজনের শরীরের কার্টিলেজ (তরুণাস্থি) অন্য একজনের শরীরে স্থাপন করবার চেষ্টা করা হয়, কারণ কর্নিয়ার মত কার্টিলেজও রক্তপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত নয়।

কার্টিলেজ হলো এক রকমের নমনীয় জিনিষ, যা হাড়ের গ্রন্থিস্থলের মধ্যে থাকে। এটি যথেষ্ট দৃঢ় হলেও আর্থ্রাইটিস প্রভৃতি রোগের জন্যে অথবা দুর্ঘটনার জন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এটির জীবন্ত কোষগুলি এই আঁশালো পদার্থের একেবারে অভ্যন্তরে অবস্থিত। সেই জন্যে কার্টিলেজ সংরক্ষণের সমস্তা কর্ণিয়া সংরক্ষণের সমস্তার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কর্নিয়ার জীবন্ত কোষের স্তরগুলি অতি পাত্লা এবং তা বাইরের দিকে অবস্থিত।

ডাঃ স্মিথ খরগোস এবং কুকুরের কার্টিলেজ

নিয়ে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি ক্রমশঃ প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, দীর্ঘকাল ধরে অতি নিম্ন তাপে সংরক্ষিত হবার পরেও কোষগুলি জীবন্ত থাকে।

এই সংরক্ষিত জীবন্ত কোষ নিয়ে এর পর তিনি খরগোসের 'হিপ্ বোনে'র উপর পরীক্ষা চালান এবং এই পরীক্ষায় মোটামুটি সাফল্য লাভ করেন। তিনি বুঝতে পারেন, সম্পূর্ণ কার্টিলেজ পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন এক্ষেত্রে নেই—কার্টিলেজ কোষের একটি পাত্‌লা স্তরের পুনঃস্থাপনই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

এই ভাবে যে পরীক্ষা এখনও চলছে, তাতে আশা করা যেতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে শীতলীকরণ ব্যবস্থাধীনে শরীরের যে কোন অঙ্গই সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা আমাদের এই ব্যাপারে অতিমাত্রায় আশা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা এপর্যন্ত পরীক্ষা চালিয়েছেন জন্তুর উপর এবং জন্তুর টিস্থগুলির উপর, সে জন্যে মানুষের টিস্থর ব্যাপারে তাঁরা কি পর্যন্ত সফল হবেন, তা এখনই জোর করে কিছু বলা যায় না। এখনও বহু বছর কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ডাঃ স্মিথ বলেছেন— জীবদ্দশায় এই দিকে চূড়ান্ত সাফল্য সম্ভব নাও হতে পারে। তবে কথা হলো, বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ একটু সতর্কতার সঙ্গেই মন্তব্য করে থাকেন।

কিউ গার্ডেন্‌স্

১৭৫৯ সালে রাজা তৃতীয় জর্জের মাতা প্রিন্সেস অগাস্টা কর্তৃক কিউ গার্ডেন্‌স্ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে বহু উদ্ভিদ বিনিময় ও বিজ্ঞানী বিনিময় হয়েছে। উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী বিনিময়ের ব্যাপারে কিউ এবং ভারত উভয় পক্ষই বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

ভারতে সিঙ্কোনা চাষের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সিঙ্কোনা থেকে উৎপন্ন কুইনিন ভারতে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেছে। সার জোসেফ হুকারের প্রস্তাব অনুযায়ী দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাণ্ডিস থেকে নানা অসুবিধার মধ্য দিয়ে সিঙ্কোনার চারা সংগ্রহ করা হয়। এরপর প্রখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী টমাস অ্যাণ্ডারসনকে সিকিমের হিমালয় অঞ্চলে পাঠানো হয় সিঙ্কোনার চাষ ব্যাপক হারে কি পর্যন্ত সম্ভব হতে পারে, তা পরীক্ষা করে আসবার জন্যে।

দুঃখের বিষয় এই যে, অ্যাণ্ডারসন এই পরীক্ষা চালাবার সময় নিজেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং কয়েক বছর রোগ ভোগের পর মারা যান। কিন্তু ১৮৬১ সালে উটাকামণ্ডে (নীলগিরি হিল্‌স্) শেষ পর্যন্ত চাষের কাজ আরম্ভ করা হয় এবং পরীক্ষার পর বোঝা যায় যে, 'সিঙ্কোনা ক্যালিসায়া' এবং 'সিঙ্কোনা সাকিরাবেরা' যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তরে ব্যাপকভাবে চাষের উপযুক্ত।

১৯ শতকে বৃটিশ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা কাউকে কাউকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। উপমহাদেশে এসে ফুলের বিপুল সমারোহ লক্ষ্য করে তাঁরা অভিভূত হন এবং বিশ্বের বৃহত্তম উদ্যান কিউ গার্ডেনস-এর জন্যে নমুনা সংগ্রহে উদ্যোগী হন। ১৮৪১-১৮৫৯ সালের মধ্যে তাঁরা কিউতে ৫,০০,০০০ ফুলের নমুনা এনে জমা করেন। সংগৃহীত উদ্ভিদের সংখ্যা এখন প্রায় ৭,০০০,০০০। তাছাড়া তরল পদার্থে সংরক্ষিত ফুল সমেত

২৫,০০০-এরও বেশী বোতল এবং অসংখ্য ফল ও বীজের বাক্স এখানে রয়েছে।

এই সব সংগ্রহের শ্রেণীবিভাগ এবং নামকরণের পর কিউ গার্ডেন্‌স্ সেগুলিকে মাদ্রাজ, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর এবং দার্জিলিং-এর বিখ্যাত উদ্যান-গুলির সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দেয়। এই সব বিখ্যাত উদ্যানের প্রথম দিকের কিউরেটরেরা সবাই প্রায় এই কিউ উদ্যানেই ট্রেনিং লাভ করেন।

এঁদের দান সম্পর্কে কিউ গার্ডেন্‌স্-এর জনৈক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী আই. এইচ. বার্কিল ১৯৬২ সালের অগাষ্ট মাসে বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অনেক কথা বিশদভাবে জানিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বার্কিল ভারত এবং মালয়েশিয়ায় তাঁর কাজের জন্যে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন।

আজও কিউ গার্ডেন্‌স্ ভারতের গবেষণা-কর্মীদের সঙ্গে যোগ রেখে চলেছে এবং যখনই প্রয়োজন হয়েছে কমনওয়েলথ মাইক্রোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট-এর সহযোগিতায় কিউ গার্ডেন্‌স্-এর বিশ্ববিখ্যাত লাইব্রেরী থেকে রেফারেন্স পুস্তকের মাইক্রো ফিল্মের কপি দিয়ে সাহায্য করছে। লাইব্রেরীতে আছে ৮০,০০০-এরও বেশী বাঁধানো বই, প্রায় ১৩০,০০০ রিপ্রিন্ট, প্রায় ১৫০,০০০ চিত্র এবং ৭,০০০ মানচিত্র। এখানে সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ১,৫০০ এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তকাদির এক ব্যাপক সংগ্রহ আছে।

কমনওয়েলথের অন্যান্য দেশও কিউ গার্ডেন্‌স্-এর কাজকর্মে এবং এর মারফৎ কাজ করে নানা-ভাবে উপকৃত হয়েছে। এই ভাবেই একদিন রবার এসে উপস্থিত হয় মালয়ে, যা মালয়ের অর্থনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। এই ভাবেই একদিন আখের চাষ সুরু হয় বারবাডোস, ও পেনাং-এ। সিংহলের পেরাডেনিয়ায় দেখা দেয় মশলা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ব্রেড-ফ্রুটের প্রবর্তনের মূলেও আছে এই কিউ গার্ডেন্‌স্।

কিউতে বিজ্ঞানীরা জড্রেল লেবরেটরিতে কাজ করে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের সীমাও প্রসারিত করেছেন। এইখানেই সি. এফ. ক্রস ও ই. জে. বিভান সেলুলোজের রসায়ন সম্পর্কে মূল্যবান আবিষ্কার করেন, যে আবিষ্কারের ফলে কৃত্রিম তন্তুশিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। ১৯৬৪ সালে লেবরেটরিটিকে সম্পূর্ণ নতুন করে নির্মাণ করে আধুনিক সূক্ষ্ম সাজসরঞ্জামে সজ্জিত করা হয়।

জড্রেল লেবরেটরির কীপার ডাঃ সি. রাসেল মেটকাফ্ অনেক সময় বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক কাজ ছাড়াও অন্য অনেক অদ্ভুত ধরণের কাজের জন্যে অনুরুদ্ধ হন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে—এই কিছুদিন আগেও তিনি এক ডাকাতির ব্যাপারে এক টুক্‌রা তন্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর মতামত দেবার জন্যে আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

জড্রেল লেবরেটরিতে নানা রকমের বিষয় নিয়ে গবেষণা চলেছে। একজন তরুণ বিজ্ঞানী ডাঃ পিটার এ. টমসন সেখানে এখন অর্কিডের অঙ্কুরোদ্গম সম্পর্কে পরীক্ষা চালিয়েছেন। তিনি অর্কিড বীজের উপর হর্মোন, ভিটামিন ও নানা রকমের সলিউশনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে দেখছেন। তাঁর এই পরীক্ষার একটা উদ্দেশ্য হলো, বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় সাত বছর থেকে কমিয়ে আনা এবং বীজের আয়ুষ্কাল বাড়ানো।

তাঁর এই কাজ ভারতের পুষ্প-শিল্পের স্বার্থের দিক থেকে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজ সফল হলে বহু দুর্লভ অর্কিড রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং অর্কিডের চাষের উন্নতি করা যাবে।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

শিক্ষা—মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক

প্রাথমিক শিক্ষার পরের স্তরের শিক্ষাকাল সাধারণভাবে তিন বছর (১৪⁺ থেকে ১৭⁺)। অবশ্য মাঝে মাঝে ১২ বছরের স্কুলের শিক্ষার কথা শোনা যায়, এক্ষেত্রে এই শিক্ষাকাল চার বছর। সভ্যসমাজে প্রাথমিক শিক্ষা প্রায়ই আবশ্যিক ও অবৈতনিক করা হয়। সুতরাং এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সার্বজনীন করতে হয়। এই শিক্ষায় নাগরিককে সমাজের সচেতন অংশীদাররূপে জীবনপথে সহজ ও সুন্দরভাবে যাবার জন্যে কমপক্ষে যা জানা দরকার, তা শেখাবার কথা। এদিক দিয়ে 'বুনিয়াদী' কথাটি 'প্রাথমিকে'র চেয়ে অধিকতর উপযোগী মনে হয়। এর পরের স্তরে রুচি ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন শিক্ষা-ব্যবস্থা করতে হয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় যারা সাধারণ শিক্ষায় অনুরাগ ও যোগ্যতা দেখাতে পারবে, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ী বা পেশাগত শিক্ষায় আগ্রহী, মাধ্যমিক শিক্ষায় তাদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হয়। এজন্যে মাধ্যমিক-শিক্ষার উদ্দেশ্য—প্রাথমিক স্তরের সার্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষিত ছাত্রকে ধীরে ধীরে তার রুচি ও যোগ্যতা অনুসারে কলা, বিজ্ঞান, কারিগরী, বাণিজ্য, শিক্ষা যে কোন একটিকে জোর দিয়ে সে বিষয়ে বা এর সঙ্গে বিশেষ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ী বা পেশাগত শিক্ষার জন্যে ছাত্রকে তৈরি করা। এজন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক একটা শাখার উপর জোর দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম থাকে। তবে শিক্ষা হঠাৎ সঙ্কীর্ণ করা ছাত্রের সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার দিক থেকে কাম্য নয়। এজন্যে বিজ্ঞান কারিগরী পাঠক্রমে পরিমিতভাবে সাহিত্য প্রভৃতি আর কলা প্রভৃতি পাঠক্রমে ঐরূপ বিজ্ঞান শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়।

মাধ্যমিক স্তরেও মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে মাতৃভাষা ব্যতীত অপর একটি ভাষা সুষ্ঠুভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। প্রায় দু-শ' বছরের ইংরেজ অধিকারের জন্যে এদেশে বর্তমানে আর যে কোন ভাষার চেয়ে ইংরেজী ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা অনেক ব্যাপক। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্যে ইংরেজী একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই দুই কারণে এই ভাষাটি স্বাভাবিকভাবে ইংরেজী হবে। তবে রুচি ও দরকারমত রুশ, জার্মান, ফরাসী বা এরকম যে কোন একটি আধুনিক ভাষা শেখাবার বিকল্প ব্যবস্থা বড় বড় স্কুলে রাখা উচিত। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার পক্ষে এই ভাষার শিক্ষা-প্রসারের অত্যুৎসাহীরা বলেন যে, ইংরেজী ভাষাই বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের একমাত্র চাবি। গত যুদ্ধের পূর্বে জার্মান ও ফরাসী ভাষার বইয়ের সঙ্গে পরিচিত না হলে বিজ্ঞানের বহু শাখার শিক্ষাই সম্পূর্ণ হতো না। যুদ্ধের পর আমেরিকার অর্থানুকূল্যে ও চেষ্টায় অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তবে ইংরেজীই একমাত্র চাবিকাঠি বলা ঠিক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—জ্ঞান ও বিজ্ঞানে আজ রুশ ভাষার বিশেষ স্থান আছে। রুশ ভাষায় বিজ্ঞানের অনেক শাখার অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া অসম্ভব নয়। আমেরিকার মত রুশ ভাষায় ও অন্যান্য ভাষায় ভাল ভাল বই অনুবাদের বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় এদিকে বিশেষ সুবিধা আছে।

আর রুশ ভাষার পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা হলো, রুশ ভাষায় মূল বা অনূদিত বইয়ের দাম অবিশ্বাস্য রকমের কম। রুশদের লেখার ধরণও অনেক সরল ও অনাড়ম্বর। কলিকাতায় বিজ্ঞানের রুশ ভাষার কোন ভাল মূল বই পাঁচ-সাত টাকায় পাওয়াও সম্ভব, কিন্তু ঐ বইয়ের আমেরিকায় প্রকাশিত অনুবাদের দাম সত্তর-আশী টাকা। অবশ্য আমেরিকাও বর্তমানে কোন বইয়ের কাগজে বাঁধাই সুলভ সংস্করণ টাকা দশেকের কাছাকাছি বিক্রয় করছে। এখানে ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা উদ্দেশ্য নয়। কেবল এই কথাটার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে যে, মাতৃভাষার পর দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আজ ইংরেজ শাসন শেষ হওয়ায় প্রায় কুড়ি বছর পরে নীতিগত-ভাবে রুশ, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা বা এদেশের ভাষাগুলির উৎস সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষা বা হিন্দী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা থাকা উচিত। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিজ্ঞানী আছেন, যাঁরা ইংরেজী বলতে বা লিখতে পারেন না, এঁদের কেউ কেউ কোন রকমে পড়তে পারেন মাত্র। জাপানে ইংরেজীর বিকল্প ভাষা হিসাবে জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি শেখানো হয়। কোন কোন জাপানী বিজ্ঞানী ইংরেজী প্রায় জানেন না বললেই হয়, কিন্তু জার্মান বা ফরাসী পড়তে, লিখতে ও বলতে পারেন। ছাত্রের রুচি ও পরবর্তী জীবনে কোন্ ভাষা বেশী কাজে আসবে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে দ্বিতীয় ভাষা নির্বাচন করতে পারলে ভাল হয়। মাতৃভাষার মাধ্যমে কেবলমাত্র একটি দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রেখে মাধ্যমিক শিক্ষার সুষ্ঠু পরিকল্পনা করলে আগের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার শিক্ষণীয় সবটা ও প্রাক স্নাতক স্তরে শিক্ষণীয় বিষয়ের অনেকটাই এখানে শেখানো সম্ভব, অবশ্য যদি সুপরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ভাষাগুলি বাদ ম্যাট্রিকের (বর্তমান স্কুল-ফাইনালের) সব শেখানো হয়। আগেই বলা হয়েছে, শিক্ষা সামগ্রিক—খণ্ডিত নয়। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার মান উঁচু না করলে মাধ্যমিক শিক্ষার মান উঁচু করা সম্ভব নয়। আবার মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নত না করে বিশ্ববিদ্যালয়ী ও পেশাগত শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষা সুপরিকল্পিত করতে হলে শিক্ষায় অনগ্রসর ছাত্রদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার* ব্যবস্থা করতে হবে। রাধাকৃষ্ণন কমিশনও অনুরূপ সুপারিশ করেছেন। [While we believe that every boy or girl of promise and capacity should have the right to go to an intermediate College and a University if he or she so desires ; we can not look with equanimity upon the present situation in which a large number of students who are obviously unfit for higher education and swell the percentages of failures at the intermediate (37·5%-60%) and the first degree examination (28%-62)।]

আর কমিশনের বিবরণটিতে যাকে 'Professional Education' বলা হয়েছে, তাকে এখানে 'পেশাগত শিক্ষা' বলা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই শিক্ষার মূলতঃ কোন পার্থক্য আছে, মনে হয় না। বৃত্তিগত শিক্ষায় হাতেনাতে কাজের অভিজ্ঞতার উপর জোর বেশী, আর পেশাগত শিক্ষায় অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওবিষয়ে তত্ত্ব শিক্ষার উপর জোর বেশী। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়

* রাধাকৃষ্ণন কমিশনের বিবরণী 'Occupational Training' বা গান্ধীজী 'Vocational Training' বলে যা বোঝাতে চেয়েছেন, তাকে 'বৃত্তিমূলক শিক্ষা' বলা হচ্ছে।

আইনজীবি, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি অধিকতর মর্যাদার বৃত্তিকে 'প্রোফেশান' বা পেশা বলা হচ্ছে। সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চমানের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও পেশাগত শিক্ষার পার্থক্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে যাবে। (It is likely that many of these unfortunate failures have abilities of a different kind and would fare better if they worked with their hands and figures)। যাদের সাধারণ শিক্ষায় আগ্রহ জন্মায় নি ও প্রাথমিক শিক্ষায় (সুপরিকল্পিত ৮ বছরের) যাদের যোগ্যতার কোন পরিচয় মেলে নি, তাদের জন্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। 'এদের মধ্যে যারা কিছু ভাল, তাদের জন্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা কাম্য। এসব প্রতিষ্ঠানে এক একটি বৃত্তি উপর জোর দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম থাকবে। ঐ বৃত্তি হাতেনাতে শেখাবার সঙ্গে ঐ বৃত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখার সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে ও কিছু কিছু সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে এক বছর বা তারও কম সময়ের জন্যে সরকার থেকে যে ব্যবস্থা করা হয়, তা দরকারের তুলনায় খুবই সামান্য মনে হয়। এই শিক্ষাকাল অন্ততঃ দু-বছরের ও পরে ধীরে ধীরে তিন বছরের করতে হবে। ছাত্র কোন্ বৃত্তি বেছে নেবে, তার সুবিধার জন্যে, প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রদের বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয়ের ব্যবস্থা থাকা উচিত। নেতাজীর সংগঠিত জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদে অধ্যাপক সাহা ও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এই ধরণের সুপারিশ করেছিলেন। আর ছাত্রকে ও অভিভাবককে কোন বৃত্তির চাহিদা কিরূপ সে বিষয়ে তথ্য জানাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

যাদের জন্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হলো, যারা মাধ্যমিক শিক্ষা নেবার অনুপযুক্ত হলেও কাজ করবার শারীরিক ও মানসিক পটুতা আছে, তাদের বিভিন্ন শিল্প, বাণিজ্য বা ব্যবসায়ে সরাসরি যোগ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে ও তাদের প্রথম দু-তিন বছর শিক্ষার্থী হিসাবে গণ্য করতে হবে। এদের প্রথম দিকে অন্ততঃ দু-তিন বছর বৃত্তি শিক্ষা (হাতেনাতে ও কিছু কিছু তত্ত্ব) ও সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এবিষয়ে সরকার, নিয়োগকারী শিল্প বা ব্যবসায় ও ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সচেতন ও সচেষ্ট হতে হবে। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়োগকারী শিল্পে ও ব্যবসায়ে হলেই ভাল হয়। যেখানে তা সম্ভব নয়, সেখানে স্থানীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বা সাধারণ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলিতে সন্ধ্যায় বা সকালে করা যেতে পারে। সাধারণ শিক্ষার জন্যে নানা সহজ সরল বই সরবরাহ করে বক্তৃতা, আলোচনা ও 'ফিল্ম দেখানো'র সাহায্য নিতে হবে। সহজ ও সরল বৃত্তি শিক্ষার বইও যাতে পাওয়া যায়, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এরকম শিক্ষা-ব্যবস্থা জার্মেনী ও বর্তমানে রুশ প্রভৃতি দেশে আছে। এসব দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের বিশেষ সাহায্য করবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে দিতে পারলে বিভিন্ন বৃত্তিতে যে সব সাধারণ কর্মী আছেন, তাঁদের কারো কারো পক্ষে বর্তমান যন্ত্রপাতির কিছু কিছু উন্নতি বা খানিকটা নতুন ধরণের ছোটখাট যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে যে শক্তি বা অর্থ ব্যয় হবে, তা একেবারে নিষ্ফল হবে না মনে হয়। অবশ্য এই সব শিক্ষাই মাতৃভাষায় দিতে হবে।

বর্তমানে ভদ্র ও শিক্ষিত অনেক পরিবারে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে মর্যাদা বা আস্থা না থাকায় সাধারণ শিক্ষায় আগ্রহ বা শক্তি না থাকলে ঐ পরিবারের ছাত্রদের যে কোন উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ী বা পেশাগত শিক্ষা দেবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। এই মনোভাবের পরিবর্তনের জন্যে সামাজিক ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে। সমাজে শ্রমের মর্যাদা সার্থকভাবে দিতে হবে।

শ্রীমহাদেব দত্ত

আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা

স্বাধীনতার পর হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি, "India needs scicntists and technicians." বিজ্ঞানের শাখার অন্ত নাই, যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রও সুবিস্তৃত। কোন্ ধরণের কতজন বিজ্ঞানী, কতজন যন্ত্রশিল্পী বা যন্ত্রকুশলীর দরকার, কতজন দেশে আছেন, তাঁদের সহায়তায় স্বল্পমেয়াদী কোর্স প্রবর্তন করিয়া কি হারে চলনসই যন্ত্রকুশলী তৈয়ারী করা যায়—তাহার কোন হিসাব-নিকাশ বাহির হয় নাই। আমাদের পশ্চিম বাংলার মহাশয় ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন, মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা না দিলে দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার হইবে না। ইঁহারাও ভাগ্য ও মর্যাদার সুউচ্চ মিনার হইতেই সব-কিছু দেখিয়াছেন, ধূলামাটির জগতে নামিয়া আসেন নাই। আসিলে দেখিতেন, পাঠশালা হইতে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত বিজ্ঞান-শিক্ষা প্রায় কুড়ি বৎসর হইল বাংলা ভাষাতেই দেওয়া হইতেছে। সুতরাং খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা দেওয়ার ফলে সুফল কতটা ফলিয়াছে, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা কতটা সৃষ্টি হইয়াছে, বিজ্ঞানে অনুরাগ কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমাদের আলোচনা প্রধানতঃ এই বিষয়েই। সরকারী দাক্ষিণ্যে যে ফ্রি প্রাইমারী স্কুল হইয়াছে, তাহার ঘরবাড়ী তৈয়ারীর দায়িত্ব সরকারের নয়। জমিদারী-তালুকদারী বরবাদ হইয়াছে, বড় বড় শিল্পপতিরা সহরে থাকেন। সুতরাং পল্লীর পাঠশালা পল্লীবাসীর কুটীরের মতই স্বল্পপরিসর এবং দীন। সেখানে যে কালো একখানা বোর্ড নামীয় কাঠ ঝোলে না এমন নয়, তবে লিখিবার ভাল চক্ অনেক সময়েই থাকে না। ছোটখাট পরীক্ষা দেখিবারও সুযোগ নাই। সরকারের লেখা 'প্রকৃতি পাঠ' পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার—আবার পাইলেও তাহা শিশুমনের উপযোগী নহে। সুন্দর চিত্র শিশুপাঠ্য বিজ্ঞানের প্রাণবস্তু। সস্তার তিন অবস্থা বলিয়া বাজে মাল শিশুর হাতে দিলে শিশু বাজেই হইবে। তারপর যাঁহারা শিক্ষক, তাঁহারা প্রায়ই তরুণ, সদ্য স্কুল ফাইন্যাল পাশ করিয়াছেন এবং মুরুব্বি নাই বা ঘরে ভাত নাই বলিয়া এই দারিদ্র্য বরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উৎসাহী আছেন, সরকারী অবজ্ঞার পীড়নে তাঁহাদের উৎসাহ মরিতে বেশী দিন বিলম্ব হয় না। আমাদের সরকার কথা বলেন কোটিতে, করেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। সুতরাং তিন মাসের একটা ট্রেনিং কোর্সের প্রবর্তন করিয়া ঐ সকল যুবকদিগকে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক জ্ঞান দেওয়ার কথা তাঁহাদের বড় মাথায় আসে না। শিশুচরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হইল—তাহারা দেখিতে ভালবাসে, হাতে কাজ করিতে ভালবাসে, বক্তৃতা শুনিতে ভালবাসে না। তাহাদের প্রচুর জিজ্ঞাসা, অফুরন্ত কৌতূহল। পাঠশালায় এই সম্প্রসারণশীল জীবনীশক্তির মৃত্যু ঘটে। আপ্তবাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্ত হওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না।

এখন আসা যাক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আমাদের সরকারী নেতাগণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করিয়াছেন, দেখিয়াছেন সেখানকার নয়না-ভিরাম অট্টালিকাশ্রেণী, তাহার হায়ার সেকণ্ডারী শিক্ষা-ব্যবস্থা। চিন্তা করেন নাই, ভাবেন নাই তাহাদের অর্থসঙ্গতির কথা। তাই বড় বড় বাড়ী উঠিল, অকেজো যন্ত্র আসিল, এম-এ., বি-টি প্রধান শিক্ষক আসিলেন, কলার স্নাতক ক্যারিয়ার মাষ্টার

হইয়া বিজ্ঞানের ক্যারিয়ারের পথনির্দেশ দিতে লাগিলেন। এই নববিধানে পণ্ডিত মহাশয় ও মৌলবি সাহেবদের কাজ কমিয়াছে—তাই নিম্নের শ্রেণীগুলিতে তাঁহাদের বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল পড়াইতে দেওয়া হইল। শিক্ষা দেওয়ার একমাত্র যন্ত্র হইল বোর্ড ও চক। কোন পরীক্ষা-গৃহ নাই এবং ক্লাসে ডিমন্স্ট্রেশন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। ফলে বিজ্ঞান শব্দরূপ-ধাতুরূপে পরিণত হইল। সপ্তম হইতে দশম শ্রেণীতে অবশ্য বিজ্ঞানের স্নাতকই সাধারণ বিজ্ঞান পড়ান, কিন্তু কেবল বক্তৃতাশ্রয়ী হওয়ায় সাধারণ বিজ্ঞান একেবারেই অসাধারণ বস্তু হইয়া উঠে। সাধারণ বিজ্ঞানের ছয়টি শাখা, কিন্তু ডিগ্রীতে পড়ান হয় তিনটি। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য পরাধীনতার সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি তিন মাসের কোর্স খুলিয়াছিলেন। সকাল সাতটা হইতে অপরাহ্ণ পাঁচটা পর্যন্ত, মধ্যাহ্নে ১২টা হইতে ২টা পর্যন্ত স্নানাহার। হাতেকলমে পরীক্ষা করিতে হইত, বক্তৃতা শুনিতে হইত। শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিও শিক্ষা দেওয়া হইত। পরীক্ষা (থিওরেটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল) হইত এবং প্রাপ্ত নম্বর অনুসারে দুই শ্রেণীর সার্টিফিকেট (পাশ ও ডিস্টিংশন) দেওয়া হইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এককালে ছিল 'মাদার ইউনিভার্সিটি', কিন্তু স্বাধীন সরকারের শিক্ষাধিকর্তারা উহাকে বিমাতার মত পাশে সরাইয়া দিলেন (তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রাপ্ত অর্থ বণ্টনে তাহা সুস্পষ্ট)। তাহার দেওয়া ঐ ট্রেনিং-এর কোন স্বীকৃতিই এঁরা দিলেন না। সাধারণ বিজ্ঞান তাই বৈদেশিক পর্যটকদের ভাওতা দেওয়ার একটি বিষয়ে পরিণত হইয়া রহিল এই শিক্ষাজীবি পশ্চিমবঙ্গে। ইহার পর আসে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা ইত্যাদি। পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান পড়াইতে অনার্স গ্র্যাজুয়েট চাই, এম. এস-সি হইলে ভাল। আবার বি. টি হইতে হইবে, নয় যেখানে আরম্ভ সেইখানেই শেষ। কিন্তু এত অনার্স কোথা হইতে আসিবে? স্পেশাল অনার্স হইল, কিন্তু বিজ্ঞানে তাহা পড়িবার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত—বর্তমানে নাই বলিলেই চলে। সরকার আর একটি ব্যবস্থা করিলেন—ছয় মাসের কোর্স প্রবর্তন। তাহাদের নির্ধারিত তিনটি কলেজে ছয় মাস বক্তৃতা শুনিলেই একজন পাশকোর্সের গ্র্যাজুয়েট যোগ্য বিবেচিত হইবেন। অবশ্য এখানে শ্রোতার কোন পরীক্ষা দিতে হইবে না। জীববিজ্ঞানে পাশকোর্সের বি. এস-সি হইলেই চলিবে। যার আই. এস-সিতে জীববিজ্ঞান ছিল, কিন্তু ডিগ্রি কোর্সে ছিল না, তিনি যদি ছয় মাস বক্তৃতা শুনিয়া আসেন, তবে তিনিও যোগ্য বিবেচিত হইবেন। বক্তৃতার মান ডিগ্রি পাশের। সেই পুরাতন জীবাশ্ম পদ্ধতি। পাঠ্য পুস্তকগুলি ৩০।৪০ বৎসর পূর্বের পাঠ্য পুস্তকের বঙ্গ সংস্করণ মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রে পাঠ্য হায়ার সেকণ্ডারীর বিজ্ঞান পুস্তকের সঙ্গে ইহার আকাশ-জমিন তফাৎ। পড়াইবার সময় পরীক্ষা প্রায় দেখানই হয় না, অথচ বলা হয়—Chemistry is an experimental science। বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তনে সাধারণ মার্জিত বুদ্ধির খেলা, পর্যবেক্ষণের ফলাফল কি তাহা যদি ছাত্রগণ না বুঝিতে পারে, যদি তাহাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত না হয়, তবে তাহারা ইঁচড়ে পাকিয়া যাইবে, বিজ্ঞানী হইবে না। বিজ্ঞানকে স্বতঃসিদ্ধ আপ্তবাক্যে পরিণত করিয়াছে এই পদ্ধতি। আই. এস-সির প্রথম বর্ষটি হায়ার সেকণ্ডারীতে নেওয়া হইয়াছে মাত্র। তাহা পাশকোর্সের বি. এস-সিরা কেন পড়াইতে পারিবেন না, তাহা বুঝা শক্ত। যিনি ডিগ্রী লাভ করিয়াই সরস্বতীর নিকট বিদায় নিয়াছেন, যাঁহার আহরণস্পৃহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, তিনি এম. এস-সি হইলেও তাঁহার সেকণ্ডারীর স্তরে নামিয়া আসিতে মোটেই দেরী হইবে না। শিক্ষার ভাগ্যবিধাতার মতে, কোন্‌টা বিজ্ঞান তাহা বুঝাও শক্ত। যে ছাত্রটি অর্থনীতি, ভূগোল ও গণিত নিল, সে

বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র বিবেচিত না হইবার কারণ কি? কেন তাকে সংস্কৃত পড়িতে বাধ্য করা? ঐচ্ছিক বিষয়গুলি পরস্পরের পরিপূরক হওয়া প্রয়োজন, তবেই তার 'কিউমুলেটিভ এফেক্ট' পাওয়া যাইবে। বাংলা ভাষার ব্যাকরণের যে দাপট বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে ছাত্রদের সাহিত্যজ্ঞান চাপা পড়িতেছে। একটি বাক্যও শুদ্ধরূপে লিখিতে পারে, এমন ছাত্রসংখ্যা শতকরা ত্রিশজনও হইবে না। ইহার উপর আছে—বাংলা ভাষার ইতিহাস। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা সরকারী নির্দেশে কমাইয়া দিলেই বিষয়টা সহজ ও ক্ষুদ্র হয় না, ইহাও তাঁহারা বোঝেন না। ফলে ভাষা শিক্ষায় মোট সময়ের একটা বিপুল অংশ নষ্ট হয়। শিক্ষার মান অবনত হইয়াছে বলিয়া যে সকল দৈনিক পত্র অশ্রুবিসর্জন করেন, তাঁহাদের কাগজের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন—"লাস্ট মিনিট প্রিপারেশন বাই এ বোর্ড অব একজামিনার্স।" ছাত্রগণ পড়িবে কেন, শিখিবে কেন? যে জিনিষে রস নাই, স্বাদ নাই, যাহার আবেদন কেবল কানের কাছে, তাহা শিখিতে ইচ্ছা হয় কি? ইহার পর শিক্ষকের অভাব। ছাত্র বাড়িলেও শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা চলিবে না—জরুরী অবস্থা। যে সকল মিশনারী বা ঐ জাতীয় স্কুল আছে, যাঁহারা সরকারের ধার ধারেন না—দানে বা ছাত্র-বেতনে যাঁহাদের আয় প্রচুর—একমাত্র সেখানেই বিদ্যাদান চলিতেছে। সেখানে ছবি ক্লাস, অডিটরিয়াম, হল ঘর, স্টেজ, লেকচার রুম ও ডিমন্‌স্ট্রেশনের ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই আছে। ইহাদের কোন কোনটির শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী। রাজনীতি এখানে কম। সুন্দর শৃঙ্খলা। পড়াশুনার পরিবেশ ঐ সকল জায়গায় আছে। যাহারা খুব মেধাবী বা যাহাদের পিতামাতার প্রচুর অর্থ আছে, আধুনিক শিক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞান কেবল তাহারাই শিখিবে। বাকী সকলে অব্যবস্থার ফলে পচিবে এবং সমাজে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করিবে। শুধু মাতৃভাষা মাধ্যম হইলেই সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে না। ধনিক রাষ্ট্রের নকলে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করিয়া শেষে টাকা নাই বলিয়া হাত গুটাইয়া শিক্ষাকে ব্যর্থ করা জাতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা। বাঙ্গলায় বিজ্ঞান-শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের গুণী ও বিজ্ঞানানুরাগী অধ্যাপকদের আগাইয়া আসিতে হইবে। এই সকল দরদী জ্ঞানী-গুণীদের সহায়তায় যদি সরকারী শিক্ষা বিভাগ বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন, তবেই কল্যাণ হইবে। শুভবুদ্ধি এবং আন্তরিক চেষ্টা জয়যুক্ত হইবেই।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা

যে ভাষায় বিজ্ঞানীরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আদান-প্রদান করে থাকেন, তাকে আমরা বৈজ্ঞানিকের ভাষা বলতে পারি। এই ভাষার বিশেষত্ব এই যে, এতে শব্দগুলির অর্থ অত্যন্ত নির্দিষ্টভাবে বেঁধে দেওয়া হয়। অনেক সময় সচরাচর প্রচলিত শব্দকেও বিশেষ অর্থ দিয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় যে চিন্তাধারা ব্যক্ত হয়ে থাকে, তাতে তথ্যগত নির্ভুলতা ও বিষয়নিষ্ঠাও একান্ত অপরিহার্য। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে যে চিন্তাপ্রণালীর সৃষ্টি হয়ে থাকে, প্রচলিত ভাষায় তার নিজস্ব বিশেষ প্রকাশভঙ্গী ক্রমশঃই গড়ে উঠতে থাকে। পারিভাষিকতা, তথ্যনিষ্ঠা এবং একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রকাশভঙ্গী—এই তিনের সমন্বয়ে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে, তাকে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কেবল পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা প্রভৃতি ভৌত বিজ্ঞানই (Physical Sciences) নয়, যন্ত্রবিদ্যা এবং কারুশিল্পমূলক বিজ্ঞানেরও (Engineering and Technological Sciences) নিজস্ব রীতির বৈজ্ঞানিক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

উচ্চতর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে এই যে সাহিত্য রয়েছে, তা বিশেষজ্ঞদের বিশেষ আবেষ্টনীতে সীমাবদ্ধ। উচ্চস্তরের এই চিন্তাপ্রণালীর তাৎপর্য শুধু ঐ বিশেষ শ্রেণীর বিজ্ঞানীরাই বুঝতে পারেন। তাই এই সাহিত্যকে আমরা বিশেষজ্ঞদের সাহিত্য বলতে পারি। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা পরিষ্কার হবে। পদার্থ-বিজ্ঞানের বহু বিভাগ রয়েছে; যেমন—পরমাণু-বিজ্ঞান, নিউক্লিয়াস সম্পর্কিত বিজ্ঞান, কঠিন পদার্থের বিজ্ঞান, বেতার-বিজ্ঞান প্রভৃতি। এগুলির পৃথক পৃথক সাহিত্যই বিশেষজ্ঞদের সাহিত্য। তবে বিশেষজ্ঞদেরও অনেক সময় সাধারণ ভূমিতে নেমে এসে পারস্পরিক চিন্তা ও মনোভাবের আদান-প্রদান করতে হয়। তখন তাঁদের চিন্তা যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তাকে আমরা বিশেষ বৈজ্ঞানিক সাহিত্য বলতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, পদার্থ-বিজ্ঞানে যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, তা শুধু পদার্থ-বিজ্ঞানীদেরই (অর্থাৎ পরমাণু-বিজ্ঞানী, নিউক্লিয়াস সম্পর্কিত বিজ্ঞানী প্রভৃতির) জন্যে। এই রকম রসায়ন, গণিত প্রভৃতি অন্যান্য বিভাগেরও বিশেষ সাহিত্য রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের সাহিত্য ও বিশেষ সাহিত্যের প্রভেদ শুধু বিষয়ের বিস্তৃতির জন্যেই হয়েছে; বস্তুতঃ এরা একই গোষ্ঠীর। এই দুয়ে মিলে যে সাহিত্য, তা হচ্ছে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক সাহিত্য অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সাহিত্য।

বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানীরা আবার পরস্পরের বিষয়ে একটু উকিঝুঁকি দিতে চেষ্টা করেন। রসায়ন-বিজ্ঞানী চান পদার্থ বিজ্ঞানের কথা জানতে, পদার্থ-বিজ্ঞানী চান জীববিজ্ঞানের কথা জানতে। এই অপেক্ষাকৃত সাধারণ স্তরের আদান-প্রদানের ভাষার প্রকাশভঙ্গী এবং উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে অনেক তফাৎ হবেই—কেন না, এতে "Technicality" অনেক কম থাকবে। এর ফলে এক মধ্যমশ্রেণীর (Medium) বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই সাহিত্য বিজ্ঞানবিদ্‌দের জন্যে, এর আবেদন সাধারণ হলেও বিজ্ঞানবিদ্‌দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

যাঁরা বিজ্ঞানশাস্ত্রে দীক্ষিত নন, অর্থাৎ যাঁরা মানবিক বিদ্যার (Humanities) বিভিন্ন বিষয়ে, যথা—সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি

প্রভৃতিতে শিক্ষালাভ করেছেন, তাঁদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করবার জন্মে এক ভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রয়োজন হয়। এটাকে আমরা সাধারণতঃ লোকায়ত বিজ্ঞান বা লোকপ্রিয় (Popular) বিজ্ঞানসাহিত্য বলে আখ্যা দিয়ে থাকি; কেন না, এই সাহিত্য বিজ্ঞানজগৎ থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী পণ্ডিত এবং সাধারণ মানুষের জন্মে তৈরি হয়েছে। এই সাহিত্যের অন্তঃস্তরে বিজ্ঞানলব্ধ সত্য রয়েছে বটে, কিন্তু তার প্রকাশ-ভঙ্গীটি সাধারণ সাহিত্যের, অবয়ব বিজ্ঞানের; কিন্তু আঙ্গিক বিশুদ্ধ সাহিত্যের।

উচ্চশ্রেণী বা মধ্যমশ্রেণীর বিজ্ঞান সাহিত্যই হোক বা লোকপ্রিয় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যই হোক, পারিভাষিকতা এবং বস্তুনিষ্ঠ সব ক্ষেত্রেই রয়েছে। সুধু প্রকাশভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর স্থূল-সূক্ষ্মতা ভেদেই এই তিন শ্রেণীর সাহিত্যকে পৃথক বলে চেনা যায়। বাস্তবিক বিজ্ঞানের এই পূর্ণ পরিণতির যুগে রয়েছে বলেই আমরা তিন শ্রেণীর বিভাগ করতে পেরেছি; কেন না, বিজ্ঞানের বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই তিন শ্রেণীর সাহিত্য বহু ক্ষেত্রেই পরস্পর জাতিভেদ রক্ষা করে আসে নি। কিন্তু বর্তমানে এত বিস্তৃত হয়েছে এবং এত বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়েছে যে, বিভাগ না করলেই নয়।

উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞানসাহিত্য—তথাকথিত বিভিন্ন জার্নাল-এর মাধ্যমে এর প্রবাহ ছড়িয়ে দেয় এবং দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারা ক্রমশঃই বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করে। অবশেষে এই তথ্য ও তত্ত্ব-ভাণ্ডারের একাংশ বিশাল বিশাল গ্রন্থের আকার ধারণ করে। যিনি যে বিষয়ে পারদর্শী হতে চান, তাঁকে সেই বিষয়ে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য পড়তেই হয়।

মধ্যমশ্রেণীর বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রসারও জার্নাল বা মাসিক-পত্রাদির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বর্তমানে এই ধরণের মাসিক-পত্রাদির সংখ্যাও বড় কম নয়। এগুলির মধ্যেই অনেক সময় লোকপ্রিয় বিজ্ঞানের বহু বিষয় ব্যাপ্তি লাভ করে থাকে এবং অবশেষে পুস্তক-পুস্তিকার আকারে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞানসাহিত্যের অধিকারী হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা উচ্চতর বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন; যথা—বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও গবেষকগণ, স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পরবর্তী শ্রেণীতে যাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন তাঁরা এবং অনেক সময় স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রেরাও। স্ব স্ব বিভাগে বিজ্ঞানের চূড়ান্ত অগ্রগতির সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় থাকে। বিজ্ঞানের কোনও শাখার সম্বন্ধে নির্ভুল তত্ত্ব এরাই পরিবেশন করতে পারেন।

মধ্যমশ্রেণীর বিজ্ঞানসাহিত্যে অধিকার রয়েছে তাঁদেরই, যাঁরা বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে অধ্যাপনা বা গবেষণা করেছেন, যাঁরা বিজ্ঞানের শিক্ষক ও ছাত্র এবং বিজ্ঞান-বিভায় শিক্ষালাভ করবার পর যাঁরা বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন (অথবা হয়তো বিজ্ঞানের সংস্রব ত্যাগই করেছেন)। মধ্যমশ্রেণীর বিজ্ঞানসাহিত্য প্রধানতঃ বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর জন্মেই, তবে অন্যান্য পাঠকেরাও এতে প্রচুর আনন্দ পেয়ে থাকেন।

লোকপ্রিয় বিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানানুরাগী সর্ব-সাধারণের জন্মে। এটা বিজ্ঞানের বহিরঙ্গের সুদৃশ্য রূপায়ণ; আংশিকভাবে তথ্যপ্রধান হলেও এতে চিত্ত-চমৎকারিত্ব আছে—কাব্যসাহিত্যের মত মনোহারিত্ব আছে। পাঠক সহজেই এই সাহিত্যে অনুরাগী হতে চান। আদর্শ লোকপ্রিয় বিজ্ঞান-সাহিত্য পড়তে বা হৃদয়ঙ্গম করতে কোন বেগ পেতে হয় না। লোকপ্রিয় বিজ্ঞান বুঝতে Common Sense-ই যথেষ্ট।

* * * *

পাশ্চাত্ত্য জগতের বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা-রীতি, বিবর্তন ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যগুলিও বিভিন্ন আকার নিয়েছে।

বহু শতাব্দীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যখন বিজ্ঞানের একটা সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রূপ পাওয়া গেল, তখন তার সাহিত্যের আঙ্গিকগুলিও একরকম নির্দিষ্ট হয়ে এলো। ক্রমশঃ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই বৈজ্ঞানিক সাহিত্য একটা স্বাভাবিক রূপ লাভ করেছে। পাশ্চাত্ত্য ভাষাগুলিতে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য তাই অনেক আগেই ধ্রুপদী আকার নিয়ে নিয়েছে।

প্রাচ্য জগতেও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের একটা সুশৃঙ্খল রূপ একসময় সৃষ্টি হয়েছিল এবং বহুদিন যে তার ধারা বর্তমান ছিল, তার অনেক প্রমাণ আমরা পাই। কিন্তু কালক্রমে এদেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হবার ফলে প্রাচ্যদেশীয় বৈজ্ঞানিক সাহত্যের তথ্যভাণ্ডার ক্রমশঃ দরিদ্র হয়ে পড়ে। গত শতাব্দীতে যখন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান তার প্রবল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, তখন প্রাচ্যদেশীয় ভাষায় আর তার ক্রমবিকাশের ধারাকে ধরে রাখা গেল না। প্রাচ্যের পণ্ডিতবর্গ বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে এই অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে যেতে লাগলেন। ক্রমশঃ যে পরিণতি দেখা গেল, তাতে প্রাচ্যদেশীয় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের এই প্লাবন এত আশ্চর্য-বেগে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল যে, তখন জ্ঞানলাভের দিকেই সকলের ঝোঁক ছিল; ভাষার পার্থক্য ছিল গৌণ। বাস্তবিক গত শতাব্দীর শেষাশেষি প্রাচ্যবিজ্ঞানীরা জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে এত বেশী মগ্ন ছিলেন যে, প্রাচ্য ভাষায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত করবার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেও তা করবার তাদের অবসর ছিল না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিক জগতে এমন একটা ভাঙ্গাগড়ার আলোড়ন চলেছিল যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির হদিশ রাখাই তখন এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

প্রাচ্য জগতে যতই বিজ্ঞানের প্রসার হতে লাগলো, ততই এদেশের শিক্ষাবিদ্ এবং মনস্বী পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করলেন যে, বিজ্ঞান-চর্চায় ভাষার গুরুত্ব কোথায়। যাঁরা পরিণতবুদ্ধির বিজ্ঞানী, ভাষার পার্থক্যে তাঁদের কিছু যায় আসে না, কিন্তু যখন বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের কথা ওঠে, তখন ভাষার গুরুত্ব অনেক। তরুণ শিক্ষার্থীরা তাঁদের জন্মলব্ধ ভাষায় যে বিষয় যত সহজে গ্রহণ করতে পারবে, অন্য বিদেশী ভাষায় তা তত সহজে কখনই গ্রহণ করতে পারবে না। এ-বিষয়ে দ্বিমত হবার উপায় নেই। বিজ্ঞানের মত কঠিন শাস্ত্র, যা কেবল Common sense দিয়েই বোঝা যায় না, তাকে বিদেশী ভাষায় আয়ত্ত করতে হলে তরুণ মনের উপর অযথা চাপ পড়ে. শিক্ষার্থীরা যদি মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে তাদের জ্ঞান সঞ্চয় করে, তাহলে পরিণত বয়সে ভিন্ন ভাষা শিখে তাতে নিজের জ্ঞান প্রকাশ করতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-চর্চার এই হচ্ছে আরম্ভ। এর পর এ নিয়ে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা চলেছে এবং কালক্রমে প্রাচ্যদেশীয় অনেক ভাষাতেই বিজ্ঞান-চর্চার সম্পূর্ণ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। কেবল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, উচ্চশ্রেণীর সকল বৈজ্ঞানিক সাহিত্যই মাতৃভাষায় লেখা হয়েছে। রাশিয়ার বিজ্ঞান-চর্চাই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বর্তমানে রুশ ভাষায় লিখিত জার্নালের অনুবাদের জন্যে ইংরেজী শিক্ষিতদেরও উদ্গ্রীব হয়ে থাকতে হয়। সাম্প্রতিক কালে জাপান এবং চীনও এই পরিবর্তন এনেছে। আগে যেখানে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষাই শিক্ষা ও চিন্তার বাহন ছিল, এখন সেখানে মাতৃভাষাই হয়েছে প্রধান বাহন।

ভারতবর্ষে এই পরিবর্তনের স্রোত এসেছে অনেক পরে—কেন না, পরাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-কর্ণধারেরা রাজনৈতিক কারণেই এই দিকটায় নজর দেন নি। সরকারী আনুকূল্য পায় নি

বলেই পরাধীন ভারতবর্ষে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম বলে গণ্য হয় নি, বিজ্ঞান-চর্চা তো দূরের কথা। যাঁরা দেশহিতৈষী, তাঁরা অবশ্য বহু পূর্বেই এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং স্ব স্ব সীমিত গণ্ডীতে তাঁরা মাতৃভাষাকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেবার বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আগেই বলেছি যে, তাঁদের তত অবসর ছিল না।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের ধারা বহন করে ভারতে যে প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরা আবির্ভূত হলেন, তাঁরাও তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে চলতে গিয়ে এই ভাষার দিকটায় খুব বেশী নজর দিতে পারেন নি। কিছু কিছু চেষ্টা যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের সৌধ রচনার ক্ষেত্রে তা অতি সামান্য। বিংশ শতাব্দী যতই এগিয়ে চলেছে, ততই বিজ্ঞানের প্রসার এমন অভাবনীয়রূপে ঘটছে যে, তার সব খবরাখবর রাখাই তো এক দুরূহ ব্যাপার। এই অবস্থায় জ্ঞানের উচ্চ পর্যায়ের সংস্পর্শে থাকবার জন্যেই বিজ্ঞানীদের বহু পরিশ্রম করতে হয়। কাজেই স্বাধীন ভারতেও ভাষার সেই অপরিণত রূপই থেকে যাচ্ছে। ভারতে বিজ্ঞান-চর্চায় মাতৃভাষা কেন যে এখনো মাধ্যম হয়ে ওঠে নি, তার মূল কারণ অনেকটা এই। তবে বহু বিদ্বজ্জনের যৌথ প্রচেষ্টা এবং সরকারী আনুকূল্য একত্রিত হলে এর আশু সমাধান হতে পারে।

অবশ্য বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই বাংলা ভাষায় লোকপ্রিয় বিজ্ঞানের সাহিত্য রচিত হয়ে আসছে। আচার্য জগদীশ, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, জগদানন্দ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরো অনেকে সাধারণ লোকের অবগতির জন্যে অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলি সাধারণ পাঠকের কিছুটা জ্ঞানবৃদ্ধি করেছে এবং অনেকটা আনন্দও দিয়েছে। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই ধরণের প্রবন্ধগুলিতে কেমন যেন একটা কৃত্রিম আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে; অর্থাৎ বিজ্ঞানকে আমরা তখনও নিজের বলে মনে করতে পারি নি, তাকে বাইরের আঙিনায় বসিয়ে আদর-আপ্যায়ন করেছি, বিস্ময় প্রকাশ করেছি, কিন্তু ঘরে নিয়ে আসি নি। বাংলা সাহিত্য পড়লে যেমন সেটাকে বাঙালীর সাহিত্য বলে মনে হয়, বাংলা বিজ্ঞান পড়ে আমরা কি তাকে বাঙালীর বিজ্ঞান বলে মনে করতে পেরেছি? আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুভাবে চেষ্টা করেছেন, এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিতে কেমন করে আরও familiarity আনা যায়, কেমন করে একে বাঙালীত্বের ছাপ দেওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সবটা সফল হয় নি এই কারণে যে, বিশুদ্ধ বাংলায় অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় আমরা বিজ্ঞানের বিষয়ে শিক্ষালাভ করি নি। পাশ্চাত্ত্য দেশে আগে হয়েছে বিজ্ঞান-চর্চা, তারপর সৃষ্টি হয়েছে লোকপ্রিয় বিজ্ঞান। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে লোকপ্রিয় বিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞান-চর্চার আগে। তাই এতটা কৃত্রিমতা।

বর্তমানে আমাদের দেশে যখন স্ব স্ব নির্ভর বিজ্ঞান-শিক্ষামন্দির স্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে, তখন আমাদের জাতীয় ভাষাগুলিতে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা করবার সময় এসে গেছে। উচ্চতর বিজ্ঞানের জগতে ভারতীয় একই ভাষাভাষী বিজ্ঞানীরা যখন আলোচনা করেন, তখন দেখা যায় যে, তাঁরা কেবল পারিভাষিক শব্দগুলি ছাড়া অন্য সব কথাই নিজের মাতৃভাষায় বলে থাকেন। এই মাতৃভাষায় বলবার প্রবণতা মানুষের সহজাত। সত্যি কথা বলতে কি, উচ্চতর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এখন তাঁদের মাতৃভাষায় অনেকখানি চিন্তা করে থাকেন। এর কারণ এই যে, বিজ্ঞান-চর্চা আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক পরিণতি পাচ্ছে। বিজ্ঞান-চর্চা যখন স্বাভাবিক রূপ লাভ করতে সুরু করেছে, তখন বৈজ্ঞানিক সাহিত্যও ক্রমশঃ তার স্বাভাবিক রূপ নেবে। উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এবং লোকপ্রিয় বিজ্ঞানসাহিত্য রচনার চেষ্টা

আমাদের অবিলম্বে করা দরকার। কেবল কাগজে বা মাসিকপত্রে বিজ্ঞানের মুখরোচক প্রবন্ধ লিখলে বা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির বার্তা প্রচার করলেই সব কর্তব্য ফুরিয়ে যায় না। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানসাহিত্যের একটা নির্দিষ্ট রূপ দিতে হবে, যাতে উচ্চ বা মধ্যশ্রেণীর সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিই প্রকাশ করা চলে। তবে প্রশ্ন এই যে, এই দুরূহ কাজে ব্রতী হবেন কারা এবং কি ভাবে?

প্রথমে উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞানসাহিত্যের কথা ধরা যাক। উচ্চতর গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যাদিতে পৌঁছুতে হলে যেমন একটা শিক্ষাধারার সোপান অবলম্বন করতে হয়, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও একটা সোপান অবলম্বন করতে হবে। স্কুলে যে বাংলায় বিজ্ঞানের বই পড়ানো হয়ে থাকে, ছাত্রদের মনের উপর তার প্রকাশভঙ্গী ও পরিভাষা কেমন প্রভাব বিস্তার করে, তা জানা দরকার। এসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি স্কুলের বিজ্ঞান-শিক্ষকেরা অনেকটা দিতে পারেন। তবে বর্তমানে যাঁরা স্কুলে বিজ্ঞান পড়ান, তাঁরা সকলেই ইংরেজীতে শিক্ষালাভ করেছেন, কাজেই বাংলা-ভাষা এবং বিজ্ঞান—এই দুই বিষয়েই প্রখর পাণ্ডিত্য না থাকলে তাঁদের মতামতকেও তত গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। শিক্ষার দ্বিতীয় স্তরে যাঁরা বিজ্ঞান শেখান, অর্থাৎ যাঁরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, তরুণ শিক্ষার্থীকে কেমন করে শেখালে তাদের শিক্ষা পূর্ণ হয়। তাঁদের এই অধ্যাপনাজনিত অভিজ্ঞতাও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। অধ্যাপকগণ চেষ্টা করলে স্নাতকপূর্ব ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক লিখতে পারেন। এই বিষয়ে অবশ্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তারও প্রয়োজন হবে। কারুশিল্পমূলক (Technological) বিষয়গুলির জন্যে বিভিন্ন Technician অর্থাৎ কারুশিল্পজ্ঞের পরামর্শও প্রয়োজন হবে। এভাবে ক্রমশঃ পাঠ্যপুস্তকের আদর্শ তৈরি হলে বিজ্ঞানের উচ্চতম শ্রেণীতে পৌঁছাতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষা-জগতের বিভিন্ন অংশের ব্যক্তি এবং অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী বিজ্ঞানানুরাগীদের নিয়ে এমন একটা সংঘ গঠন করা দরকার, যাতে একে অন্যের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অপূর্ণতা পূর্ণ করতে পারেন। মাতৃভাষার মর্যাদা ঘোষণা করে বড় বড় বক্তৃতা দেবার চেয়ে এরূপ বাস্তব উদাহরণ স্থাপনের চেষ্টায় অনেক কাজের কাজ হবে বলে আশা করা যায়।

এখন এই সংঘ কি কি কাজ করবে, তার একটু আভাস দিই। বিজ্ঞান-কর্মীদের প্রথম যে দুটি গুণ অর্জন করতে হবে, তা হচ্ছে সম্পূর্ণতা (Thoroughness) এবং যথোচিতত্তা (Exactness)—তাঁদের লেখা প্রবন্ধাদি হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং একান্তভাবে নির্ভরযোগ্য। এর পরই আসবে পরিভাষার কথা। তাঁরা বিজ্ঞান তো জানবেনই, বেশ ভাল করে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষাও জানবেন। যাঁরা প্রথম এই পরিভাষার বিষয়ে কাজ করবেন, তাঁরা সর্বাগ্রে কতকগুলি ভাল ইংরেজী টেক্সট্ বই বা অন্য ইংরেজী প্রবন্ধাদির প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুবাদ করে যাবেন। অনুবাদের মাধ্যমে একদিকে যেমন পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান অর্জিত হবে, তেমনি ইংরেজী চিন্তাধারাকে বাংলায় প্রকাশ করবার একটা পারদর্শিতাও জন্মাবে। প্রথম প্রথম একটু গোঁড়ামি (যেমন, সব ইংরেজী শব্দই বাংলা করবো—ইত্যাদি) থাকাটা দোষের নয়, কেন না, এতে বাংলা শব্দের দিকে অনুবাদকের একাগ্রতা বেড়ে যায়। কালক্রমে অবশ্য তিনি নিজেই বিচার করতে পারবেন যে, কোন্ শব্দটা ইংরেজী রাখলেই ভাল শোনায়—ইত্যাদি। সবচেয়ে শক্ত কাজ হচ্ছে, ইংরেজী Synonym-গুলির প্রকৃষ্ট বাংলা করা। যাহোক বর্তমানে

এই বিষয়ে একটু দ্ব্যর্থকতা থাকবেই, তবে অনুবাদক চেষ্টা করবেন, যাতে ইংরেজী Senseটা বেশ বজায় রাখা যায়।

অনুবাদ পর্যায়ে পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ যখন মোটামুটি সহজ হয়ে আসবে, তখন লেখক চেষ্টা করবেন প্রত্যেকটি স্পেশ্যাল বিষয় নিয়ে প্রবন্ধাদি লিখতে। এই ধরণের প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশ করতে পারলে খুব ভাল হয়। তবে পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত না হলে এই লেখায় খুব উপকার হবে না। 'ক্রমশঃ'-র পরেরটা জানবার জন্যে পাঠক যখন উদগ্রীব হয়ে থাকবেন, তখনই বোঝা যাবে, লেখা কতটা সার্থক হয়েছে।

উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞানসাহিত্যের আদর্শ যখন রচিত হতে থাকবে, তখন একদল বিজ্ঞান-কর্মীকে এই প্রধান ধারাটিকে অপেক্ষাকৃত সহজ খাতে বইয়ে দিতে হবে, যাতে মধ্যম শ্রেণীর ও লোকপ্রিয় বিজ্ঞানের আদর্শও ক্রমশঃ গড়ে ওঠে। বর্তমানে লোকপ্রিয় বিজ্ঞানের প্রবন্ধে মাঝে মাঝে খুবই 'সহজীকরণ' দেখা যায়, আবার অনেক সময় এমন সব বৈজ্ঞানিক শব্দ ও সঙ্কেতের বিভীষিকা থাকে যে, সাধারণ পাঠকেরা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে থাকেন। আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে বিষয়কে সহজ করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্য বিকৃত না হয়ে যায়। যিনি যে বিষয়ে অনেকখানি জানেন না, তিনি যেন সখ করে সে বিষয়ে লিখতে প্রয়াস না পান। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের যে সৌধ আমরা রচনা করবো, তাতে গোঁজামিলের স্থান নেই। আবার লেখককে এও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তিনি কোন্ ধরণের লেখা লিখেছেন—মধ্যম শ্রেণীর না লোকপ্রিয়? এই দুটি একত্র মিশে গেলে সেটা মধ্যম শ্রেণীর পাঠকদের যেমন বিরক্তি উৎপাদন করে, তেমনি সাধারণ পাঠকেরও অজীর্ণের কারণ হয়। বাস্তবিকই খাঁটি লোকপ্রিয় প্রবন্ধ লেখাই সবচেয়ে শক্ত। দেখা যায় যে, বিজ্ঞানের লোকপ্রিয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁরাই লিখতে পারেন, যাঁরা বিজ্ঞানের অত্যন্ত গভীরে প্রবেশ করেছেন অথচ বাইরের জগতে রসিয়ে বলবার মত মধুর বাক্‌কৌশলও তিনি জানেন। তবে অন্যেরাও যে পারেন না তা নয়, কেন না, অভ্যাসে এই দক্ষতাও আয়ত্ত করা যায়। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বাংলায় লেখবার জন্যে যাঁরা কৃতসঙ্কল্প হবেন, তাঁদের গভীর আন্তরিকতা ও বস্তুনিষ্ঠা থাকা চাই। প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃই স্ফুরিত হবে অনেক লেখার মধ্য দিয়ে। দৃঢ় অথচ সুনিশ্চয় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলে যে সঙ্কল্প আমরা করেছি, তার সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। মূল্যবান্ বাংলা প্রবন্ধাদির মাধ্যমে দেশের বিজ্ঞান-সচেতন মনগুলিতে যখন আমরা আঘাত করতে পারবো, তখন তারা নিশ্চয়ই এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেবেন। এখনও যে অনেকে এই ব্যাপারে বিভিন্ন উন্নাসিক মন্তব্য করেন তার কারণ কিন্তু এই যে, আমরা তাঁদের সামনে বাংলায় আদর্শ বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের যথাযথ দৃষ্টান্ত দেখাতে পারছি না। বিজ্ঞান-কর্মীরা যখন এগিয়ে আসবেন, যখন মাতৃভাষার দৃষ্টান্ত দিয়ে সকলকে অবাক করে দেবেন, তখন দেশের অন্যান্য বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ লোকের দৃষ্টি এই দিকে পড়বে—উন্নাসিকতা চলে যাবে এবং আজ যাঁরা অবজ্ঞার ভাব দেখাচ্ছেন, তখন তাঁদেরও মাথা শ্রদ্ধায় নত হবে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ সরকার

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৬৬

১৯শ বর্ষ : পঞ্চম সংখ্যা
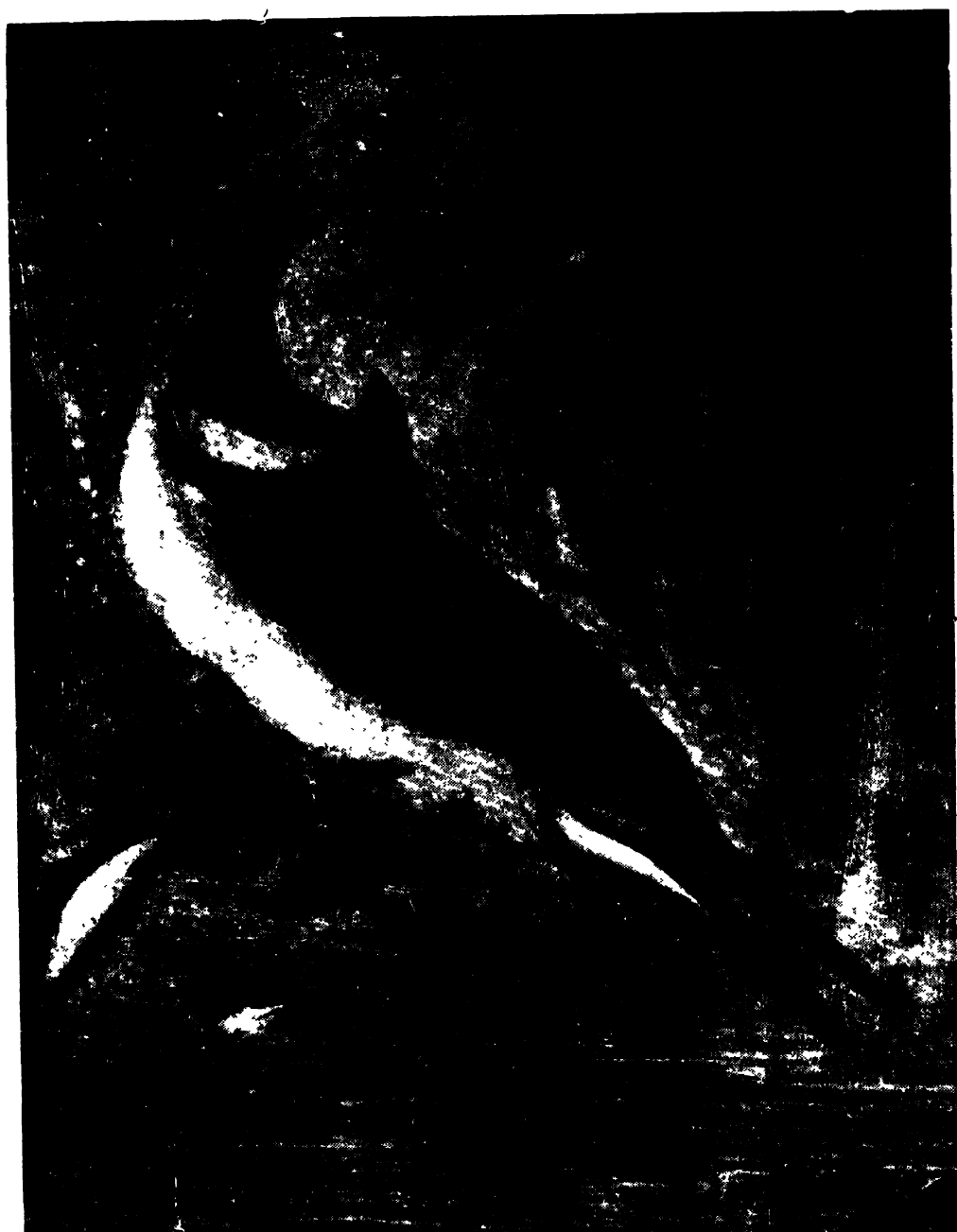
প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইকথিওসোর নামক একপ্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর পরবর্তী বংশধর।

করে দেখ

স্থির-বিদ্যুতের খেলা

আমাদের দেশের যাদুকরদের বিখ্যাত দড়ির খেলার কথা তোমরা অনেকেই হয়তো শুনে থাকবে। দড়ির খেলাটা যাই হোক না কেন, তোমরা কিন্তু অনায়াসে এই রকমের একটা ছোট্ট খেলা দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দিতে পার।

ছোট্ট একটুক্‌রা সুতা নাও। সুতাটার এক প্রান্ত এক হাতের দুই আঙ্গুলে চেপে ধর। অপর হাতে ছোট্ট একটা প্লাষ্টিকের চিরুণী নিয়ে সেটাকে বেশ
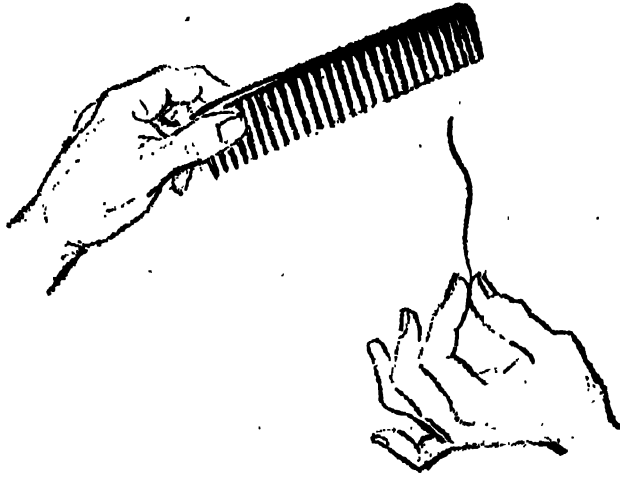
কয়েক বার তোমার জামা বা কাপড়ে খুব দ্রুতগতিতে ঘষে নাও। চিরুণীটাকে এবার অপর হাতে ধরা সুতার মুক্ত প্রান্তের কাছে নিয়ে গেলেই দেখবে—সুতাটা চিরুণীর দিকে খাড়া হয়ে উঠবে। চিরুণীটাকে সুতাটার চারদিকে বৃত্তাকারে ঘোরালে সুতার মাথাটাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে থাকবে।

স্থির-বিদ্যুতের জন্যেই এরকম ব্যাপার ঘটে থাকে। ঘর্ষণের ফলে কাপড় বা জামার মুক্ত ইলেকট্রনগুলি বেরিয়ে এসে চিরুণীর গায়ে জমা হয় এবং চিরুণীটা ঋণ-তড়িতাধানযুক্ত হয়ে পড়ে। সুতাটা ঠিক যেন ইলেক্ট্রোস্কোপের মত কাজ করে। মুক্ত ইলেকট্রনগুলি সুতা থেকে প্রত্যাহত হয় এবং সুতাটা ধন-তড়িতাধানযুক্ত হয়ে থাকে।

বিপরীত তড়িতাধানের প্রতি আকর্ষণের ফলে সুতাটা ঋণ-তড়িদাহিত চিরুণীর দিকে আকৃষ্ট হয়।

শীতকালে শুষ্ক আবহাওয়াতেই এই খেলাটি সুন্দরভাবে দেখানো যায়। জল বিদ্যুৎ-পরিবাহক—কাজেই বর্ষার আর্দ্র আবহাওয়ার জলীয় বাষ্পের মাধ্যমে তড়িৎ-পরিবাহিত হয়ে যাবার ফলে খেলাটা ভাল রকমে দেখানো যায় না।

—গ—

প্রাণীদের আয়ুষ্কাল

তোমরা জান—বিভিন্ন প্রাণীর আয়ুষ্কাল বিভিন্ন। কেউ দীর্ঘজীবী, আবার কেউ স্বল্পজীবী, কারো আয়ু শতাধিক বছর, আবার কারো আয়ু কয়েক মিনিট মাত্র। অবশ্য দুর্ঘটনা, শত্রুর আক্রমণ এবং রোগাক্রান্ত হয়ে স্বাভাবিক পরমায়ুর আগেই অনেকে মারা যায়। এখন তোমাদের পরিচিত এবং অপরিচিত কয়েকটি প্রাণীর স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে কিছু বলছি। অবশ্য নানা কারণে ক্ষেত্রবিশেষে স্বাভাবিক আয়ুষ্কালের ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায়—প্রাণীদের মধ্যে যাদের প্রজননক্ষমতা বেশী এবং ক্ষুদ্রাকার, তাদের আয়ু কম। বিজ্ঞানীদের মতে—দেহাকৃতি, কম প্রজননক্ষমতা এবং দীর্ঘজীবনের মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে।

বিভিন্ন জাতের কীট-পতঙ্গের আয়ুষ্কাল বিভিন্ন রকম। রাণী-পিঁপড়ে সাধারণতঃ ১৬ বছর পর্যন্ত বাঁচে। আবার মে-ফ্লাই নামক মশকের মত একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতির পতঙ্গের পরিণত অবস্থায় অর্থাৎ শেষবার খোলস পরিত্যাগের পর ডানাবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মে-ফ্লাই ২০ মিনিটের বেশী জীবিত থাকে না। আমাদের দেশেও প্রচুর মে-ফ্লাই দেখা যায়। কোন অপরিষ্কৃত জলাশয়ে একটু লক্ষ্য করলেই দেখবে, হঠাৎ প্রায় একই সময়ে জলাশয়ে হাজার হাজার মে-ফ্লাই-এর মৃতদেহে জলাশয়ের উপরিভাগ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। মানুষের দেহাভ্যন্তরে একটি ফিতা-কৃমিকে (Tape worm) ৩৫ বছর পর্যন্ত বাঁচতে দেখা গেছে।

দীর্ঘজীবী পাখীদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের একটি মূক সোয়ান পাখীর কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৭ সালে পাখীটিকে হত্যা করা হয়। এর পায়ে ১৭১৭ সাল খোদিত একটি আংটি পরানো ছিল। এতে বোঝা যায়—মৃত্যুকালে পাখীটির বয়স ছিল ১৭০ বছর। ১৮৪৫ সালে ফ্রান্সে একটি ঈগল পাখীকে গুলি করে মারা

হয়—তার গলায় ছিল একটি ধাতব বেষ্টনী—তাতে লেখা ছিল ১৭৫০ সাল। অতএব পাখীটির বয়স তখন ছিল ৯৫ বছর।

কোন কোন দাঁড়কাককে ৬৯ বছর পর্যন্ত বাঁচতে দেখা গেছে। পেলিকান এবং কণ্ডর নামক পাখী ৫২ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। ঈগল-প্যাঁচাকে ৬৮ বছর এবং সোনালী ঈগলকে ৫৬ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে দেখা গেছে। গৃহপালিত পাখীদের মধ্যে একটি তোতাকে ১৪০ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচতে দেখা গেছে এবং অনেক তোতা ১০০-১২৫ বছর পরমায়ু লাভ করেছে বলে জানা গেছে।

কাকাতুয়া প্রায় ৯০ বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং ঐ বয়সে তার দৈহিক অঙ্গভঙ্গী এবং স্মৃতিশক্তির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। নিউজিল্যাণ্ডে একটি কাকাতুয়াকে ১০৭ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে দেখা গেছে। অবশ্য স্বাভাবিক পরিবেশে পাখীদের সঠিক বয়স নির্ণয় করা খুব কঠিন ব্যাপার। তবুও স্বাভাবিক পরিবেশে যে সব পাখীদের বয়স নির্ণয় করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়—ম্যাগ পাই, আর্কটিক স্কুয়া এবং চ্যাফিন্স পাখীর পরমায়ু যথাক্রমে—৩০, ২৫ ও ১৭ বছর। বিভিন্ন জাতীয় পাতিহাঁসের সর্বাধিক বয়স ১৪ বছর বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন। ছোট ছোট পাখাদের বয়স প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত হয় এবং স্বাভাবিক পরিবেশে ২০ বছর বা তার বেশী বয়সের ছোট পাখী সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু পোষা অর্থাৎ বন্দী পাখীরা এর চেয়ে অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত বাঁচে। একটি পোষা রাজহাঁস ৪৪ বছর পর্যন্ত পরমায়ু লাভ করেছিল এবং ৩৩ ও ৩৭ বছরের দুটি রাজহাঁসের কথাও শোনা গেছে। একটি পোষা ক্যানারী পাখীকে ২৩ এবং আর একটিকে ৩২ বছর পরমায়ু লাভ করতে দেখা গেছে এবং ঐ বয়সেও তাদের গানের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় নি।

আমাদের দেশের রুই, কাত্‌লা প্রভৃতি মাছ দীর্ঘজীবী। ক্যাটফিস, বাণ মাছ এবং মিরর কার্প নামক মাছের আয়ুষ্কাল যথাক্রমে ৬০, ৫৫ এবং ৪৭ বছর। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে কখনও হয় না—তা নয়। গোল্ডফিস এবং প্লেইস বা পাতা মাছ বাঁচে যথাক্রমে ৩০ এবং ২৫ বছর। সাধারণতঃ দেখা যায় বেশীর ভাগ বৃহদাকৃতির মাছ কখনও কখনও কুড়ি বছরে পৌঁছায় আর বেশীর ভাগ ক্ষুদ্রাকৃতির মাছ ১০।১২ বছরের আগে মারা যায়।

কয়েক বছর আগে নিউজিল্যাণ্ডে একটি গাভীকে ৩২ বছরে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যেতে দেখা যায়। বুনো বাঘকে ১৭ বছর পর্যন্ত বাঁচতে দেখা গেছে এবং বেজীকে ৮ বছর পরমায়ু পেতে দেখা গেছে। বন্দী অবস্থায় খেঁকশিয়ালকে ২৫ বছর পর্যন্ত বাঁচতে দেখা যায়; কিন্তু স্বাভাবিক পরিবেশে অর্থাৎ বুনো খেঁকশিয়ালের আয়ুষ্কাল ১৪-১৫ বছর মাত্র। ঐ বয়সে খেঁকশিয়ালের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা থাকে না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়—স্বাভাবিক পরিবেশের তুলনায় বন্দী বা পোষা প্রাণীরা দীর্ঘদিন বাঁচে। কারণ স্বাভাবিকভাবে বিচরণের সময় নানা বাধা-বিঘ্ন,

রোগ, শত্রুর আক্রমণ এবং প্রতিকূল অবস্থার ফলে অনেক প্রাণী অকালে মারা যায়। কিন্তু বন্দী বা পোষা অবস্থায় এই সব অবস্থা থাকে না—সেজন্যে তারা দীর্ঘজীবী হয়।

দীর্ঘজীবী প্রাণীদের মধ্যে কচ্ছপই সর্বাপেক্ষা বেশী দিন বাঁচে। কোন কোন কচ্ছপের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল ৩৫০ বছর। গ্যালাপ্যাগোস এবং সেচিলি (Saychelle) দ্বীপপুঞ্জের কচ্ছপকে ১৫০-২০০ বছর জীবিত থাকতে দেখা গেছে। মরিশাস দ্বীপের এক জাতের একটি কচ্ছপ (Marion's tortoise) ১৭৬৬ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিল—তাকে ১৫২ বছর বয়সে (১৯১৮) মারা হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একটি কচ্ছপের পরমায়ু ছিল ১২৫ বছর এবং একটি ছোট্ট কচ্ছপকে (Box turtle) ১২৩ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে দেখা গেছে।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে হাতীর দীর্ঘজীবন উল্লেখযোগ্য। বোম্বে-বার্মা ট্রেডিং কোম্পানীর হিসাবে দেখা যায়, তাদের ১৭০০০টি কর্মরত হাতীর মধ্যে শতকরা প্রায় নয়টি জীবিত ছিল ৫৫ থেকে ৬৫ বছরের বেশী।

বিভিন্ন দেশের পশুশালায় ৫০ বছর বা তারও বেশী হাতীকে জীবিত থাকতে দেখা গেছে। একটি আমেরিকান পশুশালায় ৮৫ বছর বয়সে একটি হাতী মারা যায়। ১০০ বছর পর্যন্ত কোন কোন হাতীর আয়ুষ্কাল শোনা গেছে।

গৃহপালিত ঘোড়া ৫০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তবে বুড়ো ঘোড়া কোন কাজে লাগে না বলে অনেক সময় মালিকেরা তাকে মেরে ফেলে। একটি পোষা ঘোড়া ৬২ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিল।

গাধা, জলহস্তী, গণ্ডার, কাঁটাওলা পিপীলিকাভুক্ এবং শিম্পাঞ্জী যথাক্রমে ৪৭, ৪১, ৪০, ৪২ এবং ২৬ বছর পর্যন্ত বাঁচে। বিভিন্ন জাতের ভালুকের পরমায়ু হচ্ছে ৩০ থেকে ৩৪ বছর। অবশ্য কখন কখন এর ব্যতিক্রমও হয়।

কুকুর ৩৪ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে, তবে সাধারণতঃ দেখা যায় ২০ বছরের মধ্যেই কুকুরের মৃত্যু হয়। বিড়ালের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল ১৩ বছর। তবে ২৭, ৩১ ও ৩৯ বছর বয়সের বিড়ালও দেখা গেছে। সাধারণতঃ তিমির আয়ুষ্কাল ৩০-৩১ বছর; তবে একটি ক্ষেত্রে ৩৭ বছরের একটি তিমির খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। কারো কারো মতে, কোনও কোনও তিমির আয়ুষ্কাল ১০০ বছর। খরগোসের আয়ুষ্কাল সাধারণতঃ খুব কম, মাত্র ৫ বছর। কুমীরের আয়ুষ্কাল ৩০০ বছর। অন্যান্য কয়েকটি প্রাণীর আয়ুষ্কাল মোটামুটি এই রকম—ভেড়া—১২ বছর; ছাগল—১৫ বছর; উট—৪০ বছর; সিংহ—৪০ বছর, শূকর—২৫ বছর।

শ্রীঅনিল চক্রবর্তী

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। সমুদ্রের কত ফুট নীচ পর্যন্ত জলজ উদ্ভিদ জন্মিতে দেখা যায়?

প্রঃ ২। তুষারমানব কি?

প্রঃ ৩। উড়ন্ত-চাকী কি?

সুসেন বিশ্বাস

উঃ ১। উদ্ভিদ জীবনের বড় কথা, আলো ও বাতাস। সমুদ্রের জলে বাতাসের সংমিশ্রণ দেখা যায় বেশ গভীর পর্যন্ত, কিন্তু সূর্যের আলো খুব পরিষ্কার সমুদ্রেও তিন-শ' ফুটের বেশী নীচে যায় না। তাই যা কিছু উদ্ভিদজীবন সমুদ্রে দেখা যায়, সবই এই তিন-শ' ফুট পর্যন্ত; যদিও প্রাণিজীবন সাগর-মহাসাগরের সব অঞ্চলেই দেখা যায়—এমন কি, বিশ হাজার ফুট নীচ থেকেও মাছ ধরা হয়েছে বলে খবর পাওয়া যায়।

সামুদ্রিক উদ্ভিদ সাধারণভাবে এককোষী ও ক্লোরোফিল সমন্বিত—এদের বলা বলা হয় ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন (Phytoplankton)। এক নম্বর ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন হচ্ছে অ্যাল্গি (Algae)। এদের চেহারা খুব ছোট আণুবীক্ষণিক থেকে সুরু করে এক-শ', দেড়-শ' ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এবং রংও হয় নানা ধরণের—নীলাভ সবুজ, সবুজ, বাদামী, লাল ইত্যাদি। শোনা যায়, কয়েক ধরণের ঘাসজাতীয় উদ্ভিদও সমুদ্রের তলায় জন্মে; যেমন—ঈল মাছের মত চ্যাপ্টা ঈল ঘাস (Eel grass), কচ্ছপের মত ফুলো ফুলো ঘাস (Turtle grass), মানাটি ঘাস (Manatee grass) ইত্যাদি। যদিও ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ সমুদ্রে দেখা যায়, কিন্তু ফার্ণ বা শৈবালজাতীয় কিছু চোখে পড়ে না। মাটির উপর যে ধরণের ফল-ফুলের গাছপালা আমরা দেখতে অভ্যস্ত, তার কিছুই সমুদ্রের নীচে পাওয়া যায় না।

উঃ ২। পৃথিবীর তুষার-আচ্ছাদিত অঞ্চলে, বিশেষ করে তুষারাবৃত হিমালয়ে এক ধরণের প্রাণীর অস্তিত্বে কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। এই প্রাণীদের আকৃতির সঙ্গে মানুষের অনেকাংশে মিল কল্পনা করে এদের বলা হয় তুষারমানব। এরা বৃহদাকৃতির এবং এদের শরীর বড় বড় লোমে ঢাকা। এদের বাসস্থান বরফ-জমা ঠাণ্ডায় ও বহু উঁচুতে, যেখানে মানুষের পক্ষে আলাদা অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়া চলে না। এই তুষারমানবের সন্ধানে—বিশেষ করে হিমালয় অঞ্চলে, বহু অভিযাত্রী-দল খুঁজে বেড়িয়েছেন, কিন্তু এপর্যন্ত প্রামাণিক কোন তথ্যই উদ্ধার করা যায় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভল্লুকের সঙ্গে এই তুষারমানবকে মিশিয়ে ফেলা হয়। তিব্বতীদের মধ্যে এই তুষারমানব সম্পর্কে ভয় মিশ্রিত একটা সংস্কার আছে। তারা এদের বলে ইয়েতি।

উঃ ৩। উড়ন্ত-চাকীকে কল্পনা করা হয় বহির্বিশ্ব থেকে আগত (বিশেষ করে মঙ্গল ও বুধগ্রহ থেকে আগত) প্রাণীদের মহাকাশ যান হিসাবে। এগুলিকে দেখতে অনেকটা চাকৃতির মত, তাই নাম হয়েছে উড়ন্ত-চাকী। ১৯৪৭ সালের ২৪শে জুন কেনেথ আর্নল্ড নামে এক মার্কিন ব্যবসায়ী ওয়াশিংটনের মাউন্ট রাইনেয়ারের কাছে প্রথম উড়ন্ত-চাকী দেখেন বলে দাবী জানান। এরপর পৃথিবীর নানা অঞ্চল থেকে—এমন কি, আমাদের দেশেও উড়ন্ত চাকী দেখা গেছে বলে খবর পাওয়া যায়। অনেকে ছবি তোলবার চেষ্টা করেন এবং ছবিও তোলেন। অনেকে উড়ন্ত-চাকীর আরোহীদের দেখেছেন বলে দাবী জানান। এঁদের কারো কারো খবর অনুযায়ী এই আরোহীরা উচ্চতায় এক ফুটেরও কম ও পুরনো আমলের পোষাক পরা; আবার কেউ কেউ নাকি ফুট নয়েক লম্বা দানবাকৃতির আরোহী দেখেছেন।

এপর্যন্ত উড়ন্ত-চাকী সম্বন্ধে যা খবরাখবর পাওয়া গেছে, তা পর্যালোচনা করে বৈজ্ঞানিকেরা উড়ন্ত-চাকীকে দৃষ্টিবিভ্রম বলেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। সাধারণভাবে উল্কা, বহু উঁচুতে উড়ছে—এমন জেটপ্লেন, যার লেন্সের দিকে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে, উঁচুতে উড়া ঘুড়ি, আবহ বেলুন প্রভৃতি দেখে লোকে উড়ন্ত চাকী বলে ভুল করেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডোনাল্ড মেন্‌ট্‌জেলের মতে, বহু উঁচুতে বাতাসে ভেসে বেড়ানো বরফের ক্রিষ্ট্যালে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে উড়ন্ত-চাকীর মত দেখায়। তাঁর মতে, সময় সময় বাতাস লেন্সের মত কাজ করে এবং তার ফলে মরীচিকার মত দূরবর্তী আলোর প্রতিফলন বাতাসে দেখা যায়। মেন্‌ট্‌জেল গবেষণাগারে বেঞ্জিন ও অ্যাসিটোনের সাহায্যে আবহাওয়া তৈরি করে পরীক্ষা করেন ও উড়ন্ত-চাকীর মত আলোকের প্রতিফলন দেখেন।

উড়ন্ত-চাকী সম্পর্কে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে ১৯৪৮ সালের ৭ই জানুয়ারী তারিখে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকীতে অবস্থিত গড্‌ম্যান বিমানঘাঁটিতে। সেখান থেকে ঐ দিন হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিষকে উড়ে যেতে দেখা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমানঘাঁটির চারখানি বিমান নিয়ে ক্যাপ্টেন টমাস ম্যান্টেল এর পিছু নেন। কিছু পরে হদিস করতে না পেরে তিনখানি বিমান ফিরে আসে, কিন্তু ম্যান্টেল তাঁর বিমান নিয়ে উড়ন্ত বস্তুর পিছু নেন ও কুড়ি হাজার ফুট উপর থেকে জানান—বস্তুটি বিরাট আকৃতির ও ধাতুর তৈরি বলে মনে হয় এবং বহু উঁচুতে উড়ে যাচ্ছে। তারপর ম্যান্টেলের আর কোন খবর পাওয়া যায় নি। পরদিন পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ম্যান্টেলের মৃতদেহ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানটি পাওয়া যায়।

শ্রীশুভেন্দুকুমার দত্ত

পরলোকে আচার্য নন্দলাল বসু

বাংলা, তথা ভারতের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের অন্যতম ঋত্বিক শিল্পগুরু আচার্য নন্দলাল বসু গত ১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় তাঁর শান্তিনিকেতনের বাসভবনে ৮৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নানা রোগে ভুগছিলেন।

রাজ ষ্টেটের ফরেষ্ট অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। নন্দলালের আট বছর বয়সের সময় তাঁর মা ক্ষেত্রমণি দেবী পরলোক গমন করেন। ক্ষেত্রমণি দেবীর বিভিন্ন শিল্পকার্যে দক্ষতা ছিল। শৈশবকাল থেকেই নন্দলালের জীবনে

আচার্য নন্দলাল বসু

১৮৮৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর আচার্য নন্দলাল মুঙ্গেরের খড়্গপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাল অতিবাহিত হয় খড়্গপুর ও দ্বারভাঙ্গায়। তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু দ্বারভাঙ্গা

পিতা-মাতা উভয়েরই প্রভাব পড়ে। ছোটবেলা থেকেই তিনি মূর্তি গড়তে ও ছবি আঁকতে ভালবাসতেন।

তাঁর ছাত্রজীবন সুরু হয় দ্বারভাঙ্গায়। ষোল

বছর বয়সে তিনি কলকাতায় এসে সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কুড়ি বছর বয়সে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এফ-এ পর্যন্ত পড়বার পর তিনি আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার সিদ্ধান্ত করেন। এর আগে তিনি তাঁর পিসতুতো ভাই আর্ট স্কুলের ছাত্র অতুল মিত্রের কাছে বাড়ীতে চিত্রাঙ্কনের প্রাথমিক কৌশল শিখেছিলেন।

আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার পর তিনি অবনীন্দ্রনাথের নিকট ছবি আঁকবার পদ্ধতি শিক্ষালাভের সুযোগ পান।

ক্রমে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। নন্দলাল আর্ট স্কুলে পাঁচ বছর শিক্ষালাভ করেন। আর্ট স্কুলে তাঁর শিক্ষালাভ শেষ হবার পূর্বেই অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল পরিত্যাগ করেন। শিক্ষালাভ সমাপ্ত হবার পর অবনীন্দ্র-নাথের আহ্বানে নন্দলাল তাঁর জোড়াসাঁকোর বাসভবনের ষ্টুডিওতে চিত্রাঙ্কনের কাজ সুরু করেন।

ভারতীয় প্রাচ্যকলামণ্ডলীর প্রদর্শনীতে নন্দলাল তাঁর শিব-সতী ছবির জন্যে পাঁচশত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। এই টাকায় তিনি ভারতবর্ষের কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করেন। নন্দলাল ভগিনী নিবেদিতার 'Indian Myths of Hindoos and Buddhists' গ্রন্থের চিত্র অঙ্কন করেন।

১৯০৯ সালে লেডি হেরিংহ্যাম লণ্ডন থেকে অজন্তা গুহার চিত্র নকল করতে আসেন। অন্যতম একজন সাহায্যকারী হিসাবে নন্দলাল তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ১৯১৯ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে নন্দলাল বসু বিজ্ঞান মন্দিরে মহা-ভারতের কাহিনী অবলম্বনে চিত্র অঙ্কন করেন।

১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে নন্দলালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশ্য এর কয়েক বছর আগে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। তিনি কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। ১৯২৪ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশ পরিদর্শন করেন এবং পরে তাঁরা সিংহলেও যান। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে নন্দলাল কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ, ফৈজপুর ও হরিপুর অধিবেশনের সময় মণ্ডপ, মঞ্চ ও তোরণ রচনা ও সজ্জার ব্যবস্থা করেন।

আচার্য নন্দলাল মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৫০ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট উপাধির দ্বারা এবং ১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয় দেশিকোত্তম (ডি-লিট) উপাধির দ্বারা আচার্য নন্দলালকে সম্মানিত করেন। ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারত সরকার ১৯৫৫ তাঁকে পদ্ম বিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫১ সালে আচার্য নন্দলাল শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক পদে বৃত হন।

তাঁর রচিত কয়েকটি পুস্তকের নাম রূপাবলী, শিল্পচর্চা, শিল্পকথা ও Ornamental Art। তাঁর অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে শারদা, জগাই-মাধাই, শ্রীদুর্গা, কালী, শিবের তাণ্ডব নৃত্য, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, বাউল, লালন ফকির, হলকর্ষণোৎসব, কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে, ডাণ্ডী অভিযান, নটীর পূজা, পূজারিণী, শরাহত রাজহংস ও সিদ্ধার্থ, খোয়াই, জ্ঞান ও কল্পনা (বসু বিজ্ঞান মন্দির), উমার তপস্যা—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী

গত ২৪শে মার্চ ফেডারেশন হল সোসাইটির নতুন কক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নেতা ও রসায়ন-বিজ্ঞানী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তিনি জানান, আলোচ্য বছরে পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও জনসংস্থায় বিজ্ঞান বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তৃতাদান, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সাময়িক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা প্রভৃতি কিছু নতুন কর্মপ্রচেষ্টায় পরিষদ অগ্রসর হয়েছে। তা-ছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাবলী এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ, অবৈতনিক বিজ্ঞান পাঠাগার পরিচালনা প্রভৃতি কাজগুলিও যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আলোচ্য বছরে 'রাজশেখর বসু স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'মেঘ ও বিদ্যুৎ'। শ্রদ্ধেয়া লেডী অবলা বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই বছর একটি সপ্তাহব্যাপী বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল।

পরিষদের সভাপতি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ভাষণে বাংলা দেশের বর্তমান সঙ্কটময় কালের উল্লেখ করে বলেন—দেশে এখন এমন একটা অবস্থা এসেছে, যাতে সকলে নিরাশ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এই নৈরাশ্য দূর করতে হলে আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে যেতে হবে। দেশবাসীর মনে বিজ্ঞান-দৃষ্টি যাতে প্রসার লাভ করে, তার চেষ্টা করতে হবে। সাধারণ লোককে সাহায্য করতে গেলে আমাদের মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। দেশের লোককে ভালবাসতে গেলে যে ভাষা তারা সহজে বুঝতে পারে, সেই ভাষায় আমাদের বিজ্ঞানের কথা প্রচার করতে হবে। সাধারণ লোকের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা যত গড়ে উঠবে, দেশ তত সমৃদ্ধি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে পারবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন—আমাদের মনে অনেক সংস্কার থাকে। একটি সংস্কার আজও আমাদের অনেকের মনে আছে যে, ইংরেজি ছাড়া উচ্চ শিক্ষা হয় না। কিন্তু আচার্য বসুর মত আমিও বিশ্বাস করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ স্তর পর্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞান-শিক্ষাই মাতৃভাষার মাধ্যমে হতে পারে এবং তার ফলেই প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞান-শিক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষাকে সরকার স্বীকার করেছেন। কিন্তু সরকার স্বীকার করলেও এই বিষয়ে কাজ চলছে ঢিমেতালে। এই বিষয়ে দেশের বিজ্ঞানীদের একটি দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি। বিদ্যালয় স্তর থেকে এম. এস-সি পর্যন্ত সকল স্তরের বিজ্ঞানের বই লেখবার জন্যে তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই শুধু লিখলেই চলবে না, সে বই যাতে উচ্চ মানের হয়, সেদিকেও তাঁদের সজাগ হতে হবে। বর্তমানে প্রকাশিত অনেকগুলি বিজ্ঞানের বই দেখে আমার

মনে হয়েছে, সেগুলি যেন ইংরেজি বই সামনে রেখে লেখা, বাংলা বই হয় নি। তাঁদের দ্বিতীয় দায়িত্ব হচ্ছে—সাধারণ লোকের জন্যে সহজ সরল ভাষায় বিজ্ঞানের বই লেখা, যাতে সেসব বই পড়ে সাধারণের মনে একটা বিজ্ঞান-চেতনা সহজেই গড়ে ওঠে। প্রাক স্বাধীনতা যুগে আমাদের দেশে প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছে সত্য, কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা হলে আরও বেশী সংখ্যক প্রতিভাবান ব্যক্তি দেখা যেত বলে আমি মনে করি। দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে আমার তাই আবেদন, তাঁরা এই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসুন। এই পথেই বাংলা দেশের কল্যাণ সাধিত হতে পারে আর বাংলা দেশের কল্যাণ মানেই ভারতের কল্যাণ।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু বলেন, পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চার সম্বন্ধে যে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস করে চলেছেন, তা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। ছাত্রদের পড়াবার সময় দেখেছি, তাদের বোধশক্তি বা বুদ্ধি আদৌ কম নয়, শেখবার স্পৃহাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু ইংরেজির বাহনে বিজ্ঞান শিখতে হয় বলে বারংবার তাদের চলবার গতি মন্থর হয়ে যায়। ভাষার জাল ভেদ করে অতি সহজ তথ্য বা তত্ত্ব আহরণ করতে অকারণে বেচারাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। ফলে, না হয় বিজ্ঞান শিক্ষা, না হয় ইংরেজি শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় বা বড় বড় কলেজে এমন অধ্যাপক কমই আছেন, যাঁরা সহজভাবে বাংলা-ভাষায় তাঁদের প্রতিদিনকার ক্লাশে পড়াবার বক্তব্যটুকু তাঁর মা-মাসীর কাছে বা গাঁয়ের ইংরেজি-না-জানা একজন স্কুল মাষ্টার বা পণ্ডিত মশায়ের কাছে বুঝিয়ে বলতে পারেন। অন্ততঃ খুব কম গবেষক বা অধ্যাপক আছেন, যাঁরা ইংরেজি-না-জানা অথচ বুদ্ধিমান, বাংলার শিক্ষিত নরনারীর কাছে নিজেদের জ্ঞান সঞ্চারিত করবার জন্যে অধ্যবসায় সহকারে সাধনা করে থাকেন।

অনেকের ক্ষেত্রেই চিন্তা বা ধারণা কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ অথবা ফরমুলাকে একান্তভাবে আশ্রয় করে পরিচালিত হয়। এই শব্দগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজি বই পড়ে আহরিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় লিখতে গেলেও পদে পদে তাঁদের ইংরেজি শব্দ—এমন কি, ইংরেজি বাগ্‌ধারা আত্মপ্রকাশ করে। তাঁদের লেখাকে মনে মনে ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিলে তখন তার অর্থ বোঝা যায়।

এই দুর্গতি থেকে মুক্তির উপায় যে বাংলা ভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান শেখা, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু শিক্ষার বাহনকে পরিবর্তন করলেই কি গলদ দূর হয়ে যাবে? এই বিষয়ে আরও নিবিড়ভাবে চিন্তা করা দরকার। আমাদের দেশে বিজ্ঞান যেন ম্যাজিকের নামান্তর! বিজ্ঞান এখানে পোষাকী বিদ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আটপৌরে হয় নি। অথচ আজকের জগতে প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞানকে নামিয়ে আনতে না পারলে আমরা বহু দিক থেকে পিছিয়ে যাব। অতএব বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টায় আমাদের যেমন ভাষার বাহনের সংস্কার সাধন করতে হবে, তেমনি শিক্ষা-পদ্ধতিরও আমূল সংস্কার সাধন করতে হবে। অধ্যাপক হলডেনের নাম এদেশে সর্বজনবিদিত। তিনি ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে এদেশেই প্রাণ-ত্যাগ করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, মানবসমাজের প্রয়োজনবোধ থেকে এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল ও নিরীক্ষাকে আশ্রয় করে ক্রমে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমস্যা দানা বাঁধবে। অন্যথা বিজ্ঞান ম্যাজিকের উন্নত সংস্করণ বলে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাবে। সেই ম্যাজিকের দ্বারা অ্যাটম বোমা হয়, অঘটন ঘটানো যায়, কিন্তু

প্রতিদিনের চিন্তার রাজ্যে তার কোন স্থান নেই। বিজ্ঞানকে শুধু বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ না করে চিন্তার বিশেষ পদ্ধতি ভেবে এগিয়ে যেতে হবে। যতক্ষণ আমরা বৃত্তি নিরাসক্ত হয়ে চিন্তা করতে না পারি, ততক্ষণ বিজ্ঞান হবে না।

বস্তুতঃ বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মাটির প্রতিমা নির্মাণ করে এক শুভ মুহূর্তে যেমন তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তেমনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই রচনা করে প্রকৃত বিজ্ঞান সাধনার দ্বারা সেই সকল পুস্তকে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা দরকার। নয়তো সে বই মাটির পুতুলের মত প্রাণহীন হয়েই থাকবে।

অনুষ্ঠানের শেষে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ মহাদেব দত্ত এবং সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী মঞ্জুলা সেনগুপ্ত

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

১৮শ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসে কর্মসচিবের বিবরণী

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি ও উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসের এই স্মারক অনুষ্ঠানে আমি পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত অভ্যর্থনা ও সাদর অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। পরিষদের এই প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী সম্মেলনে যোগদান করে আপনারা এই জন-শিক্ষামূলক জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্যে পরিষদের সভ্যবৃন্দ ও পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে জনপ্রিয় করে তুলে দেশের জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবধারার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে গত ১৯৪৮ সালে এই পরিষদ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান বর্ষে পরিষদের এই গঠনমূলক সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াসের অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে এখন উনবিংশ বর্ষ চলছে এবং আমরা আজ পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপনের জন্যে মিলিত হয়েছি। এরূপ একটি শিক্ষামূলক জনপ্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম আঠারো বছর যাবৎ যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিষদের কর্মপ্রসার ঘটেছে, এটা আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরব ও আনন্দের কথা। আজ আমরা এই প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী অনুষ্ঠানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয়কে সভাপতিরূপে পেয়ে সবিশেষ গৌরব বোধ করছি। তিনি আমাদের পরিষদের একজন আজীবন সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী। আমরা আশা করছি, পরিষদের অধিকতর কর্মপ্রসার ও সাফল্যের পথ নির্দেশ করে তিনি আমাদের উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণা দান করবেন।

এই সম্মেলনে বাংলার খ্যাতনামা রাসায়নিক ও রাজনীতিজ্ঞ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করে আমাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন। পরিষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেও নানাভাবে পেয়েছি। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্যে তাঁর প্রচেষ্টার কথা সুবিদিত। আশা করছি, অতঃপর আমরা পরিষদের কাজকর্মে তাঁর অধিকতর

শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লাভ করবো। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যেও সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয় আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এবং অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। এজন্যে পরিষদের পক্ষ থেকে এই বরেণ্য সুধীদ্বয়কে পুনরায় আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।

বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে আমাদের এই বিজ্ঞান পরিষদ আজ জনগণের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির যুগে এর উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীন সাফল্য আমাদের জাতীয় অগ্রগতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত বলে আমরা মনে করি। দেশের জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও বিজ্ঞান-চেতনার বিকাশ সাধন করাই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পরিষদ বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গত আঠারো বছর যাবৎ যথাসাধ্য তার সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করে এসেছে। পরিষদ বর্তমানে উনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করেছে; এর উদ্দেশ্য ও কর্মধারা সম্পর্কে এখন আর নতুন করে কিছু বলবার থাকতে পারে না। বলতে গেলে একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের বলতে হয়। বারংবার পুনরুক্তি হলেও প্রতি বছর এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সে সব কথা বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের সমক্ষে আমাদের তুলে ধরতে হয়। কারণ, প্রতিষ্ঠানিক বিধিবিধান অনুসারে এই বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে বিগত বছরের একটি বিবরণী আমাদের প্রকাশ করবার বিধান রয়েছে; আর সেই সঙ্গে আমরা পরিষদের সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য ও সঙ্কল্পের কথাও নতুন করে স্মরণ করে থাকি। একে আমরা দেশের সাংস্কৃতিক কল্যাণব্রতের সংকল্পবাক্য বলেই মনে করি।

তাই বলি দেশের জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে স্বাভাবিক একটা স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও বিজ্ঞান-চেতনার বিকাশসাধন করাই পরিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় যথাসম্ভব সহজ ও সরল কথায় বিজ্ঞানের তথ্যাদি ও দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান-সংবাদ দেশবাসীর নিকট পরিবেশন করাই প্রকৃষ্ট পন্থা হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা মনে করি, বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির যুগে বিজ্ঞানের যথোপযুক্ত অনুশীলন ও তার প্রয়োগ-নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে না পারলে কোন দেশেরই বৈষয়িক উন্নতি ও জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব হতে পারে না। কেবলমাত্র শিক্ষায়তন ও গবেষণাগারের গণ্ডীতে বিজ্ঞান-শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হবে না, বিজ্ঞানের মূল তথ্যাদি ও ভাবধারা দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে হবে। এই প্রচেষ্টাকেই বলে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, আর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই জাতীয় কর্তব্য পালনের সঙ্কল্পই গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশগুলিতে এরূপ প্রচেষ্টা বহুদিন আগে থেকেই চলে আসছে; তাই তারা আজ এত উন্নত। সে সব দেশের সাধারণ মানুষও যথেষ্ট বিজ্ঞান-সচেতন, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সকলেই একটা মোটামুটি ধারণা অন্ততঃ রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে জনমানসে সাধারণ বিজ্ঞান-চেতনা আজও আশানুরূপ গড়ে ওঠে নি। জাতীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আজ বিজ্ঞানের দান ও প্রভাব অপরিসীম; অথচ আমাদের জনজীবনে আধুনিক বিজ্ঞানের সাড়া তেমন পৌঁছায় নি—এমন কি, জনসাধারণের বিজ্ঞান-বিমুখতাও দূর হয় নি। এই অবস্থার প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই এই পরিষদ কাজ করে চলেছে।

যাহোক, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের আদর্শ সামনে রেখে পরিষদ বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে। এর জন্যে যেরূপ ব্যাপক আয়োজন ও বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন, পরিষদের ন্যায় একটি জনপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা

স্বভাবতঃই সম্ভব হয় নি। তথাপি পরিষদ তার সীমাবদ্ধ শক্তি ও সঙ্গতি নিয়ে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আদর্শের পথে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে বলেই আমরা মনে করি। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি কিছুটা আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়েছে, নানাভাবে আমরা তার পরিচয় পাচ্ছি। দেশ ও জাতিকে বড় করে তুলতে হলে বর্তমান যুগে দেশের জনমানসে বিজ্ঞান-চেতনার সৃষ্টি করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন—একথা আজ দেশের জনগণ ও জাতীয় সরকারও উপলব্ধি করেছেন এবং সরকারী-বেসরকারী নানা উদ্যোগ আয়োজন চলেছে। এটা বিশেষ আশা ও আনন্দের কথা।

যাহোক, এই প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী সম্মেলনে পরিষদের কর্মসচিব হিসাবে আমাকে বিগত বছরের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে একটি বিবরণী পেশ করবার বিধান রয়েছে। তাই এখন আলোচ্য বছরে পরিষদ যা-কিছু করেছে এবং করবার চেষ্টা চলেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী আপনাদের কাছে বিবৃত করছি। এথেকে আপনারা লক্ষ্য করবেন, আলোচ্য বছরে পরিষদের আদর্শ অনুযায়ী বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয় ও জনসংস্থায় বিজ্ঞান বিষয়ে জনপ্রিয় বক্তৃতা দান, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, সাময়িক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা প্রভৃতি কিছু নতুন কর্মপ্রচেষ্টায় অগ্রসর হয়েছি। তাছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাবলী এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ, অবৈতনিক বিজ্ঞান-পাঠাগার পরিচালনা প্রভৃতি নিয়মিত কাজগুলিও যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

জনশিক্ষার প্রয়োজনে বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ পুস্তক প্রকাশ ও সেগুলি যথাসম্ভব স্বল্পমূল্যে পরিবেশন করা পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। বাংলা ভাষায় যথাসম্ভব সহজবোধ্যভাবে বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশ করে পরিষদ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রতি বছরই একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হয়ে থাকে। এযাবৎ পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এরূপ পুস্তকের সংখ্যা মোট ২১ খানা। অবশ্য এর কতকগুলি পুস্তক নিঃশেষ হবার পরে নানা কারণে আর পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। গত বছর ডক্টর রামচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত 'কয়লা' এবং রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয়ের 'খাদ্য ও পুষ্টি' শীর্ষক পুস্তক দু'খানা প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য বছরে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের লিখিত 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' শীর্ষক জীবনী গ্রন্থখানা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের 'খাদ্য থেকে যে শক্তি পাই' এবং শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার লিখিত 'রোগ তার প্রতিকার' শীর্ষক পুস্তক দু'খানা প্রকাশের কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। প্রকাশিত পুস্তকগুলি সম্পর্কে একথা উল্লেখযোগ্য যে, পরিষদের পুস্তকাবলী বিক্রয়ের কাজ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না; পরিষদের আদর্শানুযায়ী এসব পুস্তক ব্যয়ানুপাতে কম মূল্যে পরিবেশিত হয়। ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য না করে প্রতি পুস্তকের মূল্য সাধারণতঃ এক টাকা ধার্য করা হয়ে থাকে। এরূপ সম্ভব হয় এই কারণে যে, পরিষদের পুস্তকগুলি প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ সাহায্যেই প্রকাশিত হয়ে থাকে; কাজেই আর্থিক দায়দায়িত্ব পরিষদের তেমন কিছু থাকে না। দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার সাধনে পরিষদের এই প্রয়াসে রাজ্য সরকারের এরূপ শুভেচ্ছা ও সাহায্যের জন্যে আমরা সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেবল স্বল্প মূল্যই নয়, পরিষদ প্রকাশিত পুস্তকগুলির উপরে আমরা পরিষদের সভ্যগণকে শতকরা পঁচিশ টাকা হারে বিশেষ সুবিধা দিয়ে থাকি।

যাহোক, পরিষদের প্রকাশন বিভাগের

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো প্রতিমাসে পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ করা। বাংলাভাষায় নিছক বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকা হিসাবে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আজ বাংলার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। বর্তমানে এই পত্রিকার উনবিংশ বর্ষ চলেছে; প্রতি মাসের ১ তারিখে পত্রিকাখানা নিয়মিত সভ্য ও গ্রাহকগণকে প্রেরিত হয়ে আসছে। একটি মাসিক পত্রিকার পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। আলোচ্য বছরে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশ-সংখ্যা ১৮৫০ কপি থেকে ২০০০ কপিতে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। মনে হয় ২/১ মাসের মধ্যে প্রকাশ-সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। এথেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ বিজ্ঞানুরাগী পাঠকসমাজ ও বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রতি ক্রমেই অধিকতর আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। পত্রিকাখানির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সমূহ কারণের মধ্যে বলা যায়, এর বিবিধ প্রবন্ধ, বিজ্ঞান-সংবাদ, কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরাদির নিয়মিত বিভাগগুলির উৎকর্ষ একদিকে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, অপর পক্ষে 'বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা' ও বিজ্ঞানের 'প্রশ্ন ও উত্তর' শীর্ষক দু'টি নতুন বিভাগ আলোচ্য বছরে খোলা হয়েছে। দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার বিবিধ সমস্যা ও সেগুলির সমাধান সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া বিজ্ঞানুরাগী ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে অনেকেই তাদের বিজ্ঞান বিষয়ক ঔৎসুক্য মেটানো ও জ্ঞানবৃদ্ধির আগ্রহে মাঝে মাঝে আমাদের নিকট নানা রকম প্রশ্ন করে পাঠান। এযাবৎ কাল সাধারণভাবে চিঠিপত্রে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করা হতো। প্রশ্ন ও উত্তর বিভাগ খোলার জন্যে ক্রমাগত অনুরোধ আসায় আমরা এই নতুন বিভাগটি খোলবার ব্যবস্থা করেছি; নিঃসন্দেহে এটা পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সিদ্ধির বিশেষ সহায়ক হয়েছে এবং পত্রিকার জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। এই নতুন বিভাগ দু'টি পরিচালনার জন্যে পরিষদের কয়েকজন উৎসাহী ও কৃতবিদ্য সভ্য আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করছেন; এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁহাদের ধন্যবাদ জানাই।

বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে জনসাধারণ, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজকে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদির একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার দীর্ঘদিন যাবৎ পরিচালিত হয়ে আসছে; কিন্তু এই কাজে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করা যায় নি। এই গ্রন্থাগার ও পাঠাগার এখনও গতানুগতিকভাবেই চলছে। মাত্র বিজ্ঞানের সর্বপ্রকার পুস্তক সংরক্ষণ ও উপযুক্ত পরিবেশে পূর্ণাঙ্গ পাঠাগারের সুব্যবস্থা ব্যতীত পাঠকসমাজকে আকৃষ্ট করা সম্ভব নয়; কিন্তু স্থানাভাবের দরুণ এসবের ব্যবস্থা করা যায় নি। আমরা আশা করছি, পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলে এসব অসুবিধা দূর করা যাবে এবং সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক পুস্তকসমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার ও আধুনিক ধরণের একটি পাঠাগার স্থাপন করে ছাত্র ও পাঠকসমাজকে বিজ্ঞান পাঠে আকৃষ্ট করা যাবে।

বিজ্ঞান বিষয়ক মূল্যবান পাঠ্যপুস্তকাদি সংগ্রহ করতে না পেরে অনেক মেধাবী দরিদ্র ছাত্রের উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। এজন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারের একটি পাঠ্যপুস্তক বিভাগ খোলা হবে এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সর্বপ্রকার পাঠ্যপুস্তক তাতে থাকবে, এরূপ একটি পরিকল্পনা পরিষদের রয়েছে। এবিষয়ে আমরা সানন্দে জানাচ্ছি যে, পরিষদের এই পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতা নিবাসী শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট থেকে সরকারী ঋণপত্রে আমরা মোট এগারো হাজার টাকা দান সংগ্রহ করেছি। পরিষদের গৃহ নির্মিত হলে এই বিজ্ঞানানুরাগী

মহানুভব দাতার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁর পিতা-মাতার স্মরণার্থে বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার ও পাঠাগার বিভাগ খোলা হবে। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এককালীন ১১,০০০ টাকার দান লাভ করা পরিষদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের ও উৎসাহের কথা, সন্দেহ নেই।

আমাদের দেশে সাম্প্রতিক কালে বিদ্যালয়-গুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু এজন্যে আবশ্যিক বিধিব্যবস্থা, পরীক্ষাগার, পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে নানা সমস্যা রয়েছে। এই সব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও তাদের সমাধানের উপায় নির্ধারণের জন্যে গত ১৯৬৫ সালের অগাষ্ট মাসে পরিষদের জনসংযোগ সমিতির উদ্যোগে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য সুধীজনকে নিয়ে একটি আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই আলোচনা-সভায় দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতাদানের কাজে আমরা কিছুটা অগ্রসর হয়েছি। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়, মুরলীধর গার্লস স্কুল, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় প্রভৃতি কতকগুলি বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে অণু-পরমাণু জগৎ, বিদ্যুতের কথা, গ্রহ-নক্ষত্রের কাহিনী, মহাকাশ অভিযান প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষামূলক জনপ্রিয় বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করেছি। এই বক্তৃতাগুলিকে অধিকতর মনোজ্ঞ করবার জন্যে স্লাইড সহযোগে আলোকচিত্র এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উল্লিখিত আলোচন সভার প্রস্তাব অনুসারে পরিষদে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় বিজ্ঞান-শিক্ষা বিষয়ক একটি আলোচনা বিভাগ খোলা হয়েছে। এদেশে বিজ্ঞান-শিক্ষার ত্রুটিবিচ্যুতি দূর হয়ে যাতে একটি পরিপূর্ণ ও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে পারে, তার জন্যে বিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট থেকে বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে তাদের সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি আহ্বান করা হয়েছিল। যদিও এতদ্বিষয়ক আলোচনা আমরা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় চালিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু সাধারণ সুধীবৃন্দ ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট থেকে এবিষয়ে এখনও বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নি, এটা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলগত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে দেশের বিজ্ঞান-শিক্ষায় একটি বলিষ্ঠ নীতি নির্ধারণে সাহায্য করতে আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাবিদ্‌গণের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

দেশের ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও সাধারণ জ্ঞানের বিস্তার সাধনের পক্ষে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর সার্থকতা অপরিসীম, একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন। পরিষদের পক্ষে একটি স্থায়ী বিজ্ঞানপ্রদর্শনী স্থাপন করা স্থানাভাব ও আর্থিক কারণে এযাবৎ সম্ভব না হলেও গত ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি-উপলক্ষে পরিষদ কর্তৃক একটি সাময়িক বিজ্ঞান প্রদর্শনী পরিচালিত হয়েছিল, একথা আপনারা সকলেই জানেন। আমরা সানন্দে জানাচ্ছি যে, সম্প্রতি শ্রদ্ধেয়া লেডি অবলা বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা অনুরূপ একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম। এই প্রদর্শনীর চারটি বিভাগ ছিল—'গৃহজীবনে বিজ্ঞান,' 'বহির্জীবনে বিজ্ঞান', 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা' ও 'অবসর বিনোদনে বিজ্ঞান'—এই চারটি বিভাগে সাধারণের জ্ঞাতব্য বহু বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা করে বিভিন্ন চার্ট, মডেল ও যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয় হাতে-কলমে বুঝানো হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে স্বেচ্ছা-সেবক হিসাবে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, তা বিশেষ

সম্ভাবনাপূর্ণ ও প্রশংসার্হ বলে দর্শকগণ অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। এরূপ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা পরিষদের আদর্শ রূপায়ণে বিশেষ সহায়ক; কিন্তু এর পশ্চাতে একদিকে যেমন বহু পরিশ্রম ও উদ্যোগ-আয়োজনের দরকার, অপর পক্ষে একাজ যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ। সাম্প্রতিক প্রদর্শনীর ব্যয়-নির্বাহের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাঁচ হাজার টাকা সাময়িক সাহায্য দান করেছেন; তথাপি এর আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবার জন্যে প্রতি-যোগীদের পরিষদ প্রকাশিত পুস্তক দিয়ে পুরস্কৃত করা ও কৃতিত্বের অভিজ্ঞান-পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলে একটি স্থায়ী বিজ্ঞান-প্রদর্শনী ও ছাত্র-ছাত্রীদের 'খেয়াল-খুশী কেন্দ্র' স্থাপনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে, সেখানে কিশোর-কিশোরীরা সাধারণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিজ হাতে তৈরি ও বিশেষ বিশেষ যন্ত্র নাড়াচাড়া করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উৎসাহী হয়ে উঠবে। যাহোক, পরিষদের বিভিন্ন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের পক্ষে পরিষদের নিজস্ব সুপরিসর গৃহের একান্ত প্রয়োজন, একথা আমরা এই বিবরণী প্রসঙ্গে অনেকবারই বলেছি। গৃহ নির্মাণের আনুষঙ্গিক উদ্যোগ-আয়োজন, যেমন—জমিক্রয়, অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি কাজ সম্পূর্ণ হয়েও এযাবৎ আমাদের পক্ষে প্রকৃত নির্মাণকার্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় নি। গৃহের নক্সা কলিকাতা কর্পো-রেশনের অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি, শীঘ্রই আমরা পরিষদের গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করতে পারবো।

পরলোকগত বিজ্ঞানী ও সুসাহিত্যিক রাজ-শেখর বসু মহাশয়ের প্রদত্ত দানের অর্থে পরিষদ কর্তৃক প্রতি বছর 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা নিয়মিতভাবে আয়োজিত হচ্ছে। আলোচ্য বছরে এই বক্তৃতাটি দিয়েছেন অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, বিষয়বস্তু ছিল 'মেঘ ও বিদ্যুৎ'। পরিষদের নিয়মানুসারে প্রতি বছর এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আমরা আশা করছি, এই বক্তৃতাটির পাণ্ডুলিপি শীঘ্রই আমরা অধ্যাপক খাস্তগীরের নিকট থেকে পাবো এবং যথাসময়ে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে পারবো।

যাহোক, আলোচ্য বছরে পরিষদের কাজকর্ম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাদি সম্পর্কে আপনাদের নিকট সংক্ষেপে আমার এই বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করলাম। সংক্ষিপ্ত হলেও বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করবার ফলে বিবরণীটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। এখন পরিষদের আর্থিক প্রসঙ্গের কিছু উল্লেখ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো।

আলোচ্য বছরে পরিষদের আর্থিক অবস্থার সঠিক বিবরণ প্রদান করা এখন সম্ভব নয়; হিসাব পরীক্ষক কর্তৃক বিভিন্ন তহবিলের বার্ষিক আয়-ব্যয় পরীক্ষার পরে সঠিক হিসাব-বিবরণী প্রস্তুত হলে প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানা যাবে এবং পরিষদের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে তা প্রকাশিত হবে। পরিষদের আর্থিক অবস্থার কথা মোটামুটি বলতে গেলে একথা বলতে হয় যে, পরিষদ ঊনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করেছে এবং এর কর্মপ্রসারও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য, কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হতে পারে নি। অবশ্য একথা আমরা জানি যে, এরূপ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরনির্ভরতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। জনসাধারণ ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়ই এরূপ প্রতিষ্ঠান চলে। কেবল সভ্য ও গ্রাহকবর্গের চাঁদার উপরে নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানিক বিবিধ ব্যয় নির্বাহ করা হয় না; সরকারী সাহায্য ও জন-সাধারণের অনিয়মিত দানের উপর নির্ভর করতে

হয়। তদুপরি দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় কাজকর্মের সর্বস্তরে ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধির ফলে পরিষদের আর্থিক অবস্থার উপরে কোন কোন সময়ে বিশেষ চাপ পড়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্য হিসেবে আমরা বহু বছর যাবৎ বার্ষিক মাত্র ৩৬০০ টাকা পেয়ে আসছি। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সরকারী অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে আমরা কয়েকবার আবেদন জানিয়েছি। এর ফলে রাজ্য সরকারের সুপারিশক্রমে আমরা গত বছর কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরূপ ৩৬০০ টাকা অনুদানস্বরূপ পেয়েছিলাম। আলোচ্য আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনুদান ২০০০ টাকা মাত্র মঞ্জুর হয়েছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ থেকেও বার্ষিক ১৫০০ টাকা সাহায্য পেয়ে থাকে; কিন্তু কর্পোরেশনের এই সাহায্য প্রতি বছর নিয়মিত পাওয়া যায় না, বকেয়া থাকে। এভাবে অনিশ্চিত ও অনিয়মিত আয়ের উপরে নির্ভর করে আমাদের চলতে হয়; কাজেই কোন কোন বছর ঘাটতি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

যাহোক, মোটের উপরে পরিষদের আর্থিক অবস্থা অনেকটা সুদৃঢ় হয়েছে এবং মোটামুটি স্থিতিশীলতা লাভ করেছে, বলা চলে। আলোচ্য বছরে পরিষদের একটি রিজার্ভ ফাণ্ডও গঠন করা হয়েছে, যা থেকে সাময়িক ঘাট্‌তি পূরণ করা সম্ভব হবে। পরিষদের 'রাজশেখর বসু বক্তৃতা' তহবিল, গ্রন্থাগার তহবিল, পুস্তক প্রকাশ তহবিল, গৃহনির্মাণ তহবিল প্রভৃতি বিভিন্ন তহবিলেও অর্থ বিনিয়োগ করা আছে। পত্রিকা প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কার্য পরিচালনার জন্যে পরিষদের সাধারণ তহবিলের অবস্থাই কেবল সময় সময় অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে পরিষদের সভ্য ও পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে আমাদের যত্নবান হওয়া কর্তব্য। সভ্য ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কেবল আয়বৃদ্ধির প্রশ্নই জড়িত নয়; এর ফলে পরিষদের সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য সাধনেরও অধিকতর উপায় হয়। এই বিষয়ে আমরা আপনাদের সাহায্য ও সংযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। আশা করছি, আপনারা আপদের পরিচিত মহলে পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা যথাসাধ্য প্রচার করবেন এবং নতুন সভ্য ও গ্রাহক সংগ্রহ করে দিতে চেষ্টিত হবেন।

আর আমার অধিক কিছু বলবার নেই, ইতিমধ্যেই আমার বক্তব্য দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। এখন অপনাদের সকলকে পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয় আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে যে শুভেচ্ছার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্যে পুনরায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতি—

পরিমলকান্তি ঘোষ

কর্মসচিব

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিবিধ

ভারতে নতুন কুষ্ঠ নিরোধক ভেষজের পরীক্ষা

বৃটেনের একদল কুষ্ঠ-বিশেষজ্ঞ গত মার্চ মাসে দক্ষিণ ভারতে এক নতুন কুষ্ঠ-নিরোধক ভেষজ পরীক্ষা মূলকভাবে ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কে একত্রে আলোচনা করে দেখেন।

ভেষজটি এক রকমের ফেনেজাইন যৌগিক পদার্থ—এটি বৃটেনে তৈরি হচ্ছে। ডাঃ এস. জি. ব্রাউন নামে একজন বৃটিশ বিশেষজ্ঞ এই ভেষজটি নাইজেরিয়ায় প্রথম প্রয়োগ করেন। ডাঃ ব্রাউন বলেন, নাইজেরিয়ায় বৃটিশ লেপ্রোসি মিশনে পাঁচ বছরের পুরনো কয়েকজন রোগীর উপর এই ভেষজ ব্যবহার করে লক্ষণীয় ফল লাভ করেছেন।

গম উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নতুন রাসায়নিক সার

গমের গাছকে ছোট ও শক্ত করে এবং গমের উৎপাদন বৃদ্ধি করে—এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ বর্তমানে বৃটেন ও মধ্য প্রাচ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

'সাইকোসেস' বা 'ট্রি.প.স্.সি' নামে পরিচিত এই রাসায়নিক পদার্থটি আগামী বছরেই বৃটেনে তৈরি হবে এবং কমনওয়েলথ দেশগুলিতে সরবরাহ করা হবে।

বি-বি-সি'র এক বেতার প্রচারে বলা হয়েছে, এই সার ব্যবহারে শতকরা ৪০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

এক একর জমিতে ১$\frac{১}{২}$ থেকে ২$\frac{১}{২}$ পাউণ্ড সার 'স্প্রে' করে ছড়িয়ে দিতে হবে। গম ছাড়াও তামাক, তুলা, আলু, আখ, কলা, টোমাটো প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এই সার ব্যবহার করা চলবে।

কৃত্রিম ধমনী ব্যবহার করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষা করা যেতে পারে

রোগীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত বা আহত ধমনীর স্থানে নতুন ধরণের কৃত্রিম ধমনী ব্যবহারের বিষয়টি নিয়ে এখন বার্মিংহামের কুইন এলিজাবেথ হাসপাতালের চিকিৎসকেরা কাজ করছেন।

বর্তমানে ব্যবহৃত কৃত্রিম ধমনীগুলি প্লাষ্টিকের তৈরি বলে যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক নয়। একটি নতুন ধরণের উপাদান (পলিপ্রপিলান) নিয়ে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। যদি এই পরীক্ষা সফল হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যঙ্গ কেটে বাদ দেবার আর প্রয়োজন হবে না।

প্লাষ্টিকের তৈরি অপারেটিং থিয়েটার

সবটা প্লাষ্টিকের তৈরি এক অপারেটিং থিয়েটার স্থায়ী থিয়েটারগুলির সব সুযোগ-সুবিধা দিতে সক্ষম বলে বৃটিশ নির্মাতারা দাবী করেছেন। এটি মাত্র তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব।

স্থায়ী থিয়েটারগুলির শোধন বা সংস্কার-কালে এটি সাময়িকভাবে ব্যবহার করা চলবে। তাছাড়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্মাণ সম্ভব বলে এটি ফিল্ড ওয়ার্কে বা হাসপাতালের জরুরী কাজে ব্যবহার করা চলবে।

একটি বায়ু নিয়ন্ত্রণ ইউনিট এই থিয়েটারের বায়ুর চাপ নিয়ন্ত্রণ করে এটিকে জীবাণুমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। বায়ুর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, তাপ প্রভৃতিও নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং ঘণ্টায় ২০ বার বায়ু পরিবর্তন করবার ব্যবস্থা আছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনবিংশ বর্ষ | জুন, ১৯৬৬ | ষষ্ঠ সংখ্যা

আয়ন বিনিময়

সন্দীপকুমার বসু

বিংশ শতকের রসায়ন-চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ জৈব ও প্রাণরসায়নে (Biochemisty) যে বিরাট অগ্রগতি হয়েছে, তার অনেকটাই হলো প্রায় সমধর্মী বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ পৃথকী-করণের উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কারের ফল। আয়ন বিনিময় (Ion Exchange) প্রক্রিয়া এদের অন্যতম।

তড়িদাহিত পরমাণু বা পরমাণুসমষ্টিকে আয়ন বলা হয়। অধিকাংশ অজৈব পদার্থ আয়নের দ্বারা গঠিত। সাধারণ খাদ্য লবণ একটি অজৈব যৌগ। এর রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড। সোডিয়াম ও ক্লোরিন একত্রিত করলে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তাতে প্রতিটি সোডিয়াম পরমাণু থেকে একটি করে ইলেকট্রন বিমুক্ত হয় এবং প্রতিটি ক্লোরিন পরমাণু একটি করে ইলেকট্রন গ্রহণ করে। ইলেকট্রন বিমোচনের ফলে সোডিয়াম পরমাণুগুলি ধন তড়িদাহিত সোডিয়াম আয়নে এবং ইলেকট্রন-গ্রাহী ক্লোরিন পরমাণু ঋণ তড়িদাহিত ক্লোরাইড আয়নে পরিণত হয়। সোডিয়াম ক্লোরাইড স্ফটিকে বিপরীত তড়িদাহিত সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়নসমূহ স্থিরতাড়িতিক (Electrostatic) আকর্ষণে গ্রথিত থাকে।

ধন ও ঋণ আয়নসমূহের মধ্যে তীব্র এক স্থির-তাড়িতিক আকর্ষণের জন্যে সাধারণতঃ এগুলিকে

পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা দুষ্কর। বিপরীত তড়িদাহিত আয়নসমূহের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো দুষ্কর হলেও যে কোন আয়ন-সমবায় থেকে এক ধরণের তড়িদাহিত আয়নকে অপর কোন অনুরূপ তড়িদাহিত আয়নের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যায়। এই ঘটনাকে বলে আয়ন বিনিময়। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে দ্রবণ ও অদ্রাব্য কঠিন পদার্থের মধ্যে অনুরূপ তড়িদাহিত আয়নসমূহের আদান-প্রদানকেই সাধারণতঃ আয়ন বিনিময় বলা হয়। এই অদ্রাব্য কঠিন পদার্থকে বলে আয়ন বিনিময়ক (Ion Exchanger)। অদ্রাব্যতার জন্যে আয়ন বিনিময়ক দ্রবণটিকে কলুষিত করতে পারে না। এটির একমাত্র কাজ হলো দ্রবণস্থ বিনিময়যোগ্য আয়নসমূহের সঙ্গে স্বীয় আয়ন বিনিময়।

যে কোন আয়ন বিনিময়কেরই নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ, এর বিনিময়োপযোগী আয়ন থাকা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত অবস্থাতেই এটিকে জলে বা অন্য কোন দ্রবণে অদ্রাব্য হতে হবে। সাধারণতঃ বৃহদাকারের অণুগুলিতে এই ধর্ম বর্তমান। তৃতীয়তঃ, বিনিময়কের অণুগুলির মধ্যে উপযুক্ত ফাঁক থাকা দরকার, যাতে ক্ষুদ্র আয়নসমূহ সহজেই কঠিন পদার্থটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে ও বেরোতে পারে।

আয়ন বিনিময়ক অণু সাধারণতঃ বহুসংখ্যক পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত হয়। এই সব পরমাণুর অধিকাংশই দীর্ঘ শৃঙ্খল বা জালের আকারে সজ্জিত থাকে। বিনিময়ক অণুর এই প্রধান অংশটি বহু তড়িদাহিত একটি বৃহৎ আয়ন। এর তড়িৎ-আধান ধন বা ঋণ দুই-ই হতে পারে। এই তড়িৎ-আধান প্রশমনের জন্যে অণুটিতে উপযুক্ত সংখ্যক বিপরীত তড়িদাহিত ক্ষুদ্রাকার আয়ন থাকে; অর্থাৎ সম্পূর্ণ আয়ন বিনিময়ক অণুটি তড়িৎ-নিরপেক্ষ। এই ক্ষুদ্র আয়নগুলি বিনিময়ক অণুর অবশিষ্টাংশের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্থিরতাড়িতিক আকর্ষণে গ্রথিত থাকে বলে দ্রবণস্থ অনুরূপ তড়িদাহিত আয়নসমূহের সঙ্গে এরা স্থান বিনিময় করতে পারে। বিনিময়ক-স্থিত ক্ষুদ্র আয়নগুলির তড়িৎ-আধান অনুসারে এগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক্ষুদ্র আয়ন-গুলি ধন তড়িদাহিত হলে পদার্থটিকে ধনায়ন বিনিময়ক এবং ঋণ তড়িদাহিত হলে ঋণায়ন বিনিময়ক বলা হয়।

১৮৪৫ সালে ওয়ে নামক জনৈক ইংরেজ রসায়নবিদ্ সর্বপ্রথম মাটির আয়ন বিনিময় ক্ষমতা লক্ষ্য করেন। এই ধর্মের জন্যেই জলে দ্রাব্য উর্বরক, যেমন—পটাসিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি শস্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে সহজে সেগুলি ধুয়ে যায় না। মাটির অদ্রাব্য ধনায়ন বিনিময়ক পদার্থগুলির সঙ্গে এই সব দ্রাব্য উর্বরক তাদের ধনায়নগুলি বিনিময় করে। কয়েক প্রকার খনিজ পদার্থ (জিওলাইট, ক্লে প্রভৃতি) এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থের পচনজাত বিভিন্ন জৈব অ্যাসিডই মাটির আয়ন বিনিময় ক্ষমতার মূল কারণ। ১৮৫৮ সালে জার্মেনীর আইখ্‌হর্ন্ এই তথ্যের ভিত্তিতে প্রথম কৃত্রিম আয়ন বিনিময়ক প্রস্তুত করেন। সোডিয়াম সিলিকেট ও সোডিয়াম অ্যালুমিনেট দ্রবণ মিশ্রিত করলে একটি সাদা জেলী পাওয়া যায়। এই জেলীকে শুকিয়ে ছোট ছোট দানায় পরিণত করলে একটি উত্তম ধনায়ন বিনিময়ক প্রস্তুত হয়। আইখ্‌হর্নের এই আয়ন বিনিময়কটি আজও জল মৃদুকরণের জন্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে রসায়নশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে আয়ন বিনিময় পদ্ধতির যে ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়, তার সূচনা হয় ১৯৩৫ সালে অ্যাডামস্ ও হোম্‌স্ কর্তৃক কৃত্রিম জৈব আয়ন বিনিময়ক রেজিন সংশ্লেষণের ফলে। এখন বহু বিভিন্ন ধরণের কৃত্রিম আয়ন বিনিময়ক রেজিন বাজারে পাওয়া যায়। সংশ্লেষণজাত এই সব রেজিনের আণবিক গঠন

প্রয়োজনানুযায়ী নির্দিষ্ট করে এদের আয়ন বিনিময় ক্ষমতায় ব্যাপক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়। এই সমস্ত রেজিন শৃঙ্খল বা জালাকারে সজ্জিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র অণুর সমবায়ে গঠিত বৃহৎ পলিমার। উপযুক্ত আয়নান্বিত মূলক যোগ করলেই এগুলি আয়ন বিনিময়কে পরিণত হয়।

শিল্পোদ্যোগে আয়ন বিনিময়ের সবচেয়ে ব্যাপক ব্যবহার হয় খরজল মৃদুকরণে। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামের দ্রাব্য লবণই জলের খরতার মূল কারণ। মৃদুকরণের জন্যে খরজলকে একটি ধনায়ন বিনিময়ক স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করানো হয়। এই প্রবহন কালে বিনিময়কস্থ সোডিয়াম আয়ন এবং জলের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম আয়নের মধ্যে পারস্পরিক স্থান বিনিময় ঘটে। ফলে যে জল পাওয়া যায়, তাতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়ামের স্থলে তুল্য পরিমাণ সোডিয়াম আয়ন থাকে; অর্থাৎ জলের খরতা দূর হয়। বার বার খরজল প্রবহনের ফলে ক্রমে আয়ন বিনিময়কের সমস্ত বিনিময়যোগ্য সোডিয়াম আয়নের স্থান ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম গ্রহণ করে। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম আয়ন পরিপৃক্ত বিনিময়ক স্তরের মধ্য দিয়ে অতঃপর গাঢ় সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ সঞ্চালিত করা হয়। এর ফলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্‌নেসিয়াম আয়নগুলি দূর হয় এবং সোডিয়াম আয়ন সেই স্থান অধিকার করে। এই পদ্ধতিকে আয়ন বিনিময়কের পুনরুজ্জীবন (Regeneration) বলা হয়। পুনরুজ্জীবিত আয়ন বিনিময়ককে আবার খরজল মৃদুকরণে ব্যবহার করা যায়। এভাবে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়ন বিনিময়ককে বহুদিন ব্যবহার করা চলে।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে জল বিশোধিত হয় না। একটি আয়নান্বিত অপদ্রব্যের সঙ্গে অপর একটি আয়নান্বিত অপদ্রব্যের বিনিময় মাত্র ঘটে। কিন্তু ঔষধ প্রস্তুতি, ফটোগ্রাফি, উচ্চচাপের বয়লার ইত্যাদির জন্যে যে জল দরকার, তার বিশুদ্ধতা পাতিত জলের অনুরূপ হওয়া আবশ্যক। পাতন পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে জল বিশোধন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। জৈব ধনায়ন ও ঋণায়ন বিনিময়কের সাহায্যে অনেক অল্প খরচে পাতিত জলের মত বিশুদ্ধ জল তৈরি করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে কেবল আয়নান্বিত অপদ্রব্যযুক্ত জলকে হাইড্রোজেন আয়নসমন্বিত জৈব ধনায়ন বিনিময়ক রেজিন স্তরের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করা হয়। ফলে জলের সমস্ত ধনায়ন (যেমন—ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, আয়রন, সোডিয়াম ইত্যাদি) রেজিনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং রেজিনের হাইড্রোজেন আয়ন তাদের স্থান অধিকার করে। ধনায়ন-বিমুক্ত জলকে অতঃপর ঋণায়ন বিনিময়ক রেজিনের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত করলে জলস্থিত সমস্ত ঋণায়ন (যেমন—ক্লোরাইড, সালফেট ইত্যাদি) রেজিনস্থিত হাইড্রক্সিল আয়নের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। হাইড্রোজেন হাইড্রক্সিল আয়নগুলিতে যুক্ত হয়ে জল প্রস্তুত করে। এই প্রক্রিয়াজাত জলে কোন আয়ন দ্রাবিত থাকে না। এই পদ্ধতিকে জলের বিআয়নন (Deionization) বলে। সুতরাং শুধুমাত্র আয়নান্বিত অপদ্রব্য থাকলে বিআয়নন প্রক্রিয়ায় পাতিত জলের মত বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করা যায়।

জলে প্রচুর লবণ থাকলে আয়ন বিনিময় প্রক্রিয়ায় বিশোধনে পাতন-পদ্ধতির চেয়ে বেশী খরচ পড়ে। এজন্যে বর্তমানে সমুদ্রজল (লবণের মোট পরিমাণ ৩.০৫%) থেকে আয়ন বিনিময় পদ্ধতিতে প্রচুর পরিমাণে পেয় জল প্রস্তুত করা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক নয়। তবে ইস্রায়েলের মরু অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অল্প লবণাক্ত (০.২-০.৩%) জল এই পদ্ধতিতে বিশোধিত করে সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পাতনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খরচ পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমুদ্রজল থেকে অল্প পরিমাণ পেয় জল প্রস্তুত করবার জন্যে প্রত্যেক নৌ-সেনাকে এক প্রস্থ ছোট আয়ন বিনিময়ের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হতো। এতে থাকতো একটি প্লাষ্টিকের থলি এবং দুটি বিশেষ ধরণের উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ধনায়ন বিনিময়ক বড়ি। এই বড়িগুলিতে বিনিময়যোগ্য ধনায়নরূপে সিলভার থাকতো। থলির মধ্যে এক পাঁইট সমুদ্রজল ও একটি আয়ন বিনিময়ক বড়ি নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়লে জলের সোডিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ইত্যাদি ধনায়নগুলি সিলভার আয়নের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতো। এই সিলভার আয়নগুলি জলস্থিত ক্লোরাইড আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অদ্রাব্য সিলভার ক্লোরাইডরূপে অধঃক্ষিপ্ত হতো। পরিস্রবণ করে সিলভার ক্লোরাইড বাদ দিলে পেয় জল পাওয়া যেত।

শিল্পোদ্যোগে আয়ন বিনিময় পদ্ধতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখা যায় বীটের রস থেকে শর্করা প্রস্তুতিতে। লবণ জাতীয় পদার্থের উপস্থিতি বীটের রস থেকে শর্করা স্ফটিকীকরণে ব্যাঘাত ঘটায় বলে এগুলি দূর করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে আংশিক বিশোধিত বীটের রসকে প্রথমে একটি ধনায়ন বিনিময়ক প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে বীটের রসের সমস্ত ধনায়নগুলিকে হাইড্রোজেন আয়নের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়। ধনায়ন বিনিময়ক প্রকোষ্ঠ-নিঃসৃত বীটের রসকে অতঃপর হাইড্রক্সিল আয়ন সমন্বিত ঋণায়ন বিনিময়ক প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত করলে বীটের রসের বিআয়নন সম্পূর্ণ হয়।

গোদুগ্ধে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ মাতৃস্তন্যের চেয়ে প্রায় ২৫% বেশী থাকায় শিশুদের পক্ষে গোদুগ্ধ হজম করা শক্ত। আয়ন বিনিময় প্রক্রিয়ায় এই অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামের কিছু অংশ সোডিয়াম আয়নের দ্বারা প্রতিস্থাপন করে শিশুর উপযোগী সহজপাচ্য দুগ্ধ প্রস্তুত করা হয়।

সাম্প্রতিক কালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও আয়ন বিনিময় প্রক্রিয়ার ব্যবহার সুরু হয়েছে। ভুক্ত দ্রব্যের পাচনে সহায়তার জন্যে পাকস্থলীতে উপযুক্ত পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন (অর্থাৎ অ্যাসিড) ক্ষরিত হয়। বিপাকক্রিয়ার বৈকল্যের জন্যে পাকস্থলীতে হাইড্রোজেন আয়নের ক্রমাম্বয় আধিক্য ঘটলে পাকস্থলীর প্রাচীরে ক্ষত উৎপন্ন হয়। এই অতিরিক্ত অ্যাসিড প্রশমনের জন্যে রোগীকে বিনিময়যোগ্য হাইড্রক্সিল আয়নযুক্ত ঋণায়ন বিনিময়ক রেজিন খাওয়ানো হয়। পাকস্থলীতে এই রেজিন থেকে বিমুক্ত হাইড্রক্সিল আয়ন হাইড্রোজেন আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জলে পরিণত হয়। রেজিনটির স্বাদ শুক্‌নো ভুট্টাদানার মত এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ। উচ্চ রক্তচাপজনিত দেহকলার স্ফীতি নিরোধেও আয়ন বিনিময় প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়।

আয়ন বিনিময় পদ্ধতি প্রাণরাসায়নিক গবেষণায়, বিশেষতঃ প্রোটিন সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানে যুগান্তর এনেছে। যে কোন প্রোটিনের আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে বহু সংখ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি মিশ্রণ পাওয়া যায়। এই সব অ্যামিনো অ্যাসিডের পৃথকীকরণ ও বিশোধনের উপায়গুলির মধ্যে আয়ন বিনিময় পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক।

অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি উভধর্মী যৌগ। দ্রবণের অ্যাসিডত্ব অনুসারে এগুলি ঋণায়ন, ধনায়ন বা তড়িৎ-নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে। ধনায়ন বিনিময়ক কেবল ধনায়ন গ্রহণ করে এবং ঋণায়ন বিনিময়ক ঋণায়ন গ্রহণ করে। তড়িৎ-নিরপেক্ষ অণুগুলি কোনটির দ্বারাই গৃহীত হয় না। এভাবে আয়ন বিনিময়কের সাহায্যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে তিনটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে পৃথক করা যায়।

আয়ন বিনিময় পদ্ধতিতে শুধু যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব, তাই নয়, এর সাহায্যে প্রত্যেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে বিশুদ্ধ অবস্থায় মিশ্রণ থেকে পৃথক করা

চলে। এই পৃথকীকরণের মূল তত্ত্ব এই যে, বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড ও বিনিময়কের মধ্যে সংযো-জনের দৃঢ়তার মাত্রাপার্থক্য বর্তমান। বিনিময়ক-পূর্ণ একটি দীর্ঘ নলের উপরিভাগে অল্প পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিড মিশ্রণ প্রয়োগ করলে মিশ্রণস্থ অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি নলের উপরাংশে অবস্থিত বিনিময়কের দ্বারা গৃহীত হয়। অতঃপর উপযুক্ত কোন পুনরুজ্জীবক দ্রবণ নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করালে উক্ত দ্রবণস্থ আয়নসমূহ বিনিময়কের সঙ্গে যুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে। এভাবে পুনরুজ্জীবক দ্রবণটি ধীরে ধীরে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে নলের নীচে নামাতে থাকে। যে অ্যামিনো অ্যাসিড বিনিময়কের সঙ্গে সবচেয়ে দুর্বল বন্ধনে গ্রথিত, সেটিই সর্বপ্রথম প্রতি-স্থাপিত হয়ে সবার আগে নলের নীচে নামতে থাকে এবং পরিশেষে নলের অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে আসে। বিনিময়কপূর্ণ নলটি যদি যথেষ্ট দীর্ঘ হয়, তবে অন্য কোন অ্যামিনো অ্যাসিড নলের নিম্ন প্রান্তে আসবার আগেই প্রথম অ্যামিনো অ্যাসিডটি সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত হতে পারে। এই-ভাবে ক্রমে অন্যান্য অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিও পৃথক পৃথকভাবে নল থেকে বেরিয়ে আসে।

আয়নান্বিত পদার্থ পৃথকীকরণের উপরিউক্ত পদ্ধতির নাম আয়ন বিনিময় ক্রোমেটোগ্রাফি (Ion Exchange Chromatography)। ইউরেনিয়ামের বিদারণ (Fission)-জাত বিভিন্ন বিরল মৌল পৃথকীকরণে এই পদ্ধতিটি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। প্রাণরসায়ন-চর্চার ক্ষেত্রেও আয়ন বিনিময় ক্রোমেটোগ্রাফির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতি নিউক্লিক অ্যাসিড, এন্‌জাইম, হরমোন প্রভৃতি বিশোধনের জটিল সমস্যাকে অনেক সরল করে এনেছে। অনুঘটন, রাসায়নিক বিশ্লেষণ, কোলয়েড-দ্রবণ প্রস্তুতি ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে আয়ন বিনিময় পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

পরীক্ষাগারে আয়ন বিনিময় প্রক্রিয়ার বহু বিচিত্র সফল ব্যবহার থেকে অবশ্য শিল্পক্ষেত্রে এর ব্যাপক সম্ভাব্য ব্যবহার সম্বন্ধে অত্যধিক আশা পোষণ করা সঙ্গত নয়। পরীক্ষাগারে সাধারণতঃ অল্প পরিমাণ মিশ্রণ নিয়ে কাজ করা হয় এবং এক্ষেত্রে ব্যয়ের চেয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের বিশুদ্ধতার উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু শিল্পোদ্যোগে প্রধান লক্ষ্য থাকে স্বল্প ব্যয়ের দিকে। সুতরাং যে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া কয়েক মিলিগ্র্যাম বা গ্র্যাম মিশ্রণের পক্ষে উপযুক্ত, বহু টন মিশ্রণের ক্ষেত্রেও সেটি কার্যকরী ও লাভজনক হবে, একথা জোর করে বলা যায় না। আয়ন বিনিময় প্রক্রিয়ায় পৃথকীকরণের মূল কারণ হলো বিভিন্ন আয়নের তড়িৎ-আধানের মাত্রাপার্থক্য। অতএব প্রকৃতিগত-ভাবে এটি একটি বিশেষ নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নয়। যদি প্রকৃত নির্দিষ্টতাসম্পন্ন আয়ন বিনিময়ক প্রস্তুত করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ প্রতি বিনিময়ক মাত্র একটি নির্দিষ্ট ধনায়ন (বা ঋণায়ন) অন্যগুলির চেয়ে বহুগুণ দৃঢ়তা সহকারে ধরে রাখতে পারে, তাহলে অবশ্য শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা হবে। কল্পনা করা যায়—সেদিন এমনি নির্দিষ্ট আয়ন বিনিময়কের সাহায্যে সমুদ্রজলের স্বর্ণ বা ইউরেনিয়াম পৃথক করা সম্ভব হবে। এই দূর কল্পনার আংশিক রূপায়ণ এখনই দেখা যায় ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে। শতকরা একভাগেরও কম ইউরেনিয়াম সমন্বিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর আকরিককে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে দ্রাবিত করে দ্রবণস্থ ইউরেনিয়াম আয়ন বিনিময় পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে সাধারণ শিল্পক্ষেত্রে আয়ন বিনিময় পদ্ধতির বহুল প্রচলন এখনো দুরায়ত।

প্রোটিন ও অ্যামিনো অ্যাসিড

শ্রীসতীন্দ্রকিশোর গোস্বামী

মানবদেহের পরিপুষ্টি, বৃদ্ধি এবং কোষ পুনর্গঠনের জন্য যাহার প্রয়োজন অত্যধিক, তাহাকে প্রোটিন বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। প্রোটিন শব্দের অর্থ হইল প্রথম বা প্রধান। ইহা হইল প্রোটিনের ব্যবহারিক সংজ্ঞা; কিন্তু রাসায়নিক সংজ্ঞা বলিতে বুঝায়—প্রকৃতিজাত নাইট্রোজেনযুক্ত উচ্চ আণবিক গুরুত্বপূর্ণ জৈব পদার্থ এবং যাহাকে সম্পূর্ণরূপে আর্দ্রবিশ্লেষণ (Hydrolysis) করিলে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়; অর্থাৎ অ্যামিনো অ্যাসিড হইল প্রোটিনের একটি ক্ষুদ্র অংশ। অনেকগুলি ইট একসঙ্গে পর পর গাঁথিলে যেমন একটি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বাড়ীর সৃষ্টি হয়, ঠিক সেই রকম অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পর পর সজ্জিত হইয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়। সুতরাং অ্যামিনো অ্যাসিডই হইল প্রোটিনের মূল উপাদান।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতে পারে—অ্যামিনো অ্যাসিড কি? অ্যামিনো অ্যাসিড হইল জৈব অম্ল, যাহাতে একটি অ্যামিনো মূলক ($-NH_2$ group) বিদ্যমান। এই পর্যন্ত মোট ২৫টি অ্যামিনো অ্যাসিডের কথা জানা গিয়াছে। এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—প্রয়োজনীয় (Essential) এবং অপ্রয়োজনীয় ((Non-essential)। যে সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের নানাবিধ দৈহিক প্রক্রিয়ায় দেহাভ্যন্তরেই সৃষ্ট হইতে পারে না অথচ দেহের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাহাকেই প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। সিষ্টিন, লাইসিন, হিষ্টিডিন, টাইরোসিন প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং এই জাতীয় অ্যামিনো অ্যাসিড বাহির হইতে খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু খাদ্যের মধ্যে এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি মুক্ত অবস্থায় থাকে না বলিলেই চলে, ইহারা সাধারণতঃ প্রোটিন অণুরূপেই খাদ্যে অবস্থান করে। কিন্তু কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড আমাদের দেহাভ্যন্তরেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হইতে পারে এবং খাদ্যে এই সকল অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুপস্থিতি বিশেষ ক্ষতির কারণ হয় না। এই সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিডকে অপ্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। গ্লাইসিন, অ্যালানিন প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

এই দুই জাতীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতি অনুযায়ী প্রোটিনকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যে সকল প্রোটিনে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রায় সবগুলিই পাওয়া যায়, সেই সকল প্রোটিনকে সুসম্পূর্ণ (Complete) বা উচ্চাঙ্গের প্রোটিন বলা হইয়া থাকে। কিন্তু যদি অপ্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রোটিনকে নিম্নশ্রেণীর প্রোটিন বলা যেতে পারে। সাধারণতঃ জীবজগৎ হইতে উদ্ভূত খাদ্যের প্রোটিন উচ্চাঙ্গ শ্রেণীর এবং উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্যের প্রোটিন অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতিই প্রোটিনের জাত বা ধর্ম প্রকাশক।

অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ হিসাবে প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ :

প্রোটিন

প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড অত্যধিক ; সম্পূর্ণ প্রোটিন : মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি	অত্যধিক অপ্রয়োজনীয় অ্যাসিড ; নিম্নশ্রেণীর প্রোটিন : ডাল, আটা প্রভৃতি

প্রোটিন বৃহৎ অণু বলিয়া উহা সর্বদাই আমাদের শরীরের কোষের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না ; সুতরাং উহাকে ক্ষুদ্র অণু অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত করিলে দেহের উপযোগী হইয়া দাঁড়ায়। খাদ্যের প্রোটিন কিভাবে আমাদের দেহাভ্যন্তরে অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়, তাহাই এখন আলোচনা করা যাউক। দেহাভ্যন্তরে নিম্নোক্ত ভাবে প্রোটিন অণু বিশ্লেষিত হইয়া থাকে :

প্রোটিন—→মেটাপ্রোটিন—→প্রোটিয়োজেস
↓
ডাইপেপটাইড←পলিপেপটাইড←পেপটোন
↓
অ্যামিনো অ্যাসিড।

এইভাবে প্রোটিনের বৃহৎ অণু ক্ষুদ্র অণুযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। যখন দুইটি অ্যামিনো অ্যাসিড যুক্ত হয়, তখন উহাকে ডাই-পেপটাইড, তিনটি হইলে ট্রাই, তারপর ট্রেটা এবং অনেকগুলি অণু মিলিয়া পলিপেপটাইড তৈয়ার হয়। মেটা প্রোটিন, প্রোটিয়োজেস, পেপটোন প্রভৃতিও পলিপেপটাইডের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রোটিনের কম-বেশী আর্দ্রবিশ্লেষণ অনুযায়ী এই বিভিন্ন নামকরণ। প্রোটিনের এই আর্দ্রবিশ্লেষণ একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। খাদ্যের প্রোটিন মুখে কোন রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না, কেবলমাত্র চর্বণের ফলে ঐগুলি মুক্ত হবার অবকাশ পায় মাত্র। তারপর ঐ প্রোটিন যখন খাদ্যনালী দিয়া পাকস্থলীতে যায়, তখনই প্রথম প্রোটিনের বিশ্লেষণ সুরু হয়। পাকস্থলী হইতে পাকাশয় রস (Gastric juice) নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই পাকাশয় রসে একরকম জারক রস (Enzyme) পেপসিন এবং কিছু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও থাকে। এই পেপসিন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অম্লীয় পরিবেশে প্রোটিনকে পেপটোন পর্যন্ত রূপান্তরিত করিতে পারে। পেপসিন কিন্তু সব রকম প্রোটিনকেই পেপটোন পর্যন্ত ভাঙ্গিতে সক্ষম নয় ; সুতরাং কিছু অপরিবর্তিত প্রোটিনও এইখানে থাকিয়া যায়। পাকস্থলী হইতে উহা তখন অগ্ন্যাশয়ে যায়। অগ্ন্যাশয় হইতেও ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন নামক জারক রস নিঃসৃত হয়। ট্রিপসিন ক্ষারীয় পরিবেশে প্রোটিনকে পেপটোন পর্যন্ত রূপান্তরিত করে। সুতরাং যে সমস্ত প্রোটিনের পাকস্থলীতে রাসায়নিক পরিবর্তন হয় নাই, তাহারা এইখানে পেপটোনে পরিবর্তিত হয়। পেপসিন ও ট্রিপসিন-এর রাসায়নিক আচরণ সুনির্দিষ্ট (Specific) ; অর্থাৎ উহারা ঠিক কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রোটিনের নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুর উপর প্রভাবশালী, অন্যত্র নহে। এখন অগ্ন্যাশয় হইতে পেপটোন অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং অন্ত্ররস (Enteric juice) পেপটোনকে অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে। এই অন্ত্ররসে অনেক জারক রস থাকে। ঐগুলিকে অ্যামিনো পেপটিডেস, ডাইপেপটিডেস নামে অভিহিত করা হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র হইতেই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি রক্তের সংস্পর্শে আসিতে সক্ষম হয় এবং উহা শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি শরীরের বিভিন্ন অংশে গিয়া বিভিন্ন রকম কাজ করে। কোন খানে উহারা আমাদের শরীরের প্রোটিন তৈয়ার করে বা উহারা নিজেরাই বিপাকিত ((Metabolised) হইয়া বিভিন্ন রকমের হরমোন তৈয়ার করে; যেমন—টাইরোসিন নামক প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড হইতে উদ্ভূত অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডের হরমোন অ্যাড্রিন্যালিন ও নর-অ্যাড্রিন্যালিন এবং থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের থাইরক্সিন হরমোন। ট্রিপ্টোফেন তৈয়ার করে মস্তিষ্কের হরমোন সেরোটনিন। আমাদের শরীরের বর্ণ তৈয়ার করিতে মেলানিন নামক একপ্রকার জৈব পদার্থের প্রয়োজন হয়। এই মেলানিনও টাইরোসিন হইতে উদ্ভূত হয়। ইহা ছাড়া জারক রস তৈয়ার করিবার ব্যাপারেও অ্যামিনো অ্যাসিডের ভূমিকা আছে। ইনসুলিন নামক ডায়াবেটোজেনিক (Diabetogenic) - ঘটিত হরমোনও শুধু মাত্র অ্যামিনো অ্যাসিডের দ্বারা গঠিত। আমাদের রক্তের মধ্যস্থিত হিমোগ্লোবিন বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করিয়া থাকে। এই হিমোগ্লোবিনকে দুই অংশে ভাগ করা যায়; একটা হইল হিম্ (Haem) অংশ, যাহাতে লৌহ অণু এবং চারিটি পাইরোল অণু থাকে এবং অপরটি গ্লোবিন অংশ। এই গ্লোবিন অংশ একটি পলিপেপটাইড এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়াছে যে, গ্লোবিন অণুর হিষ্টিডিন নামক প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড হিম্ অণুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক এবং ঐগুলি প্রায় সমস্তই আমাদের খাদ্যের প্রোটিন হইতে গ্রহণ করিতে হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে খাদ্যের অভাব এবং উপযুক্ত পরিমাণ মাছ-মাংস খাইবার মত সামর্থ্য বেশীর ভাগ লোকেরই নাই বলিলে চলে। কাজেই যদি কোন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই সমস্ত অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি সস্তায় তৈয়ারী করা যায় এবং ঐগুলি যদি শস্যকণার সঙ্গে মিশাইয়া সুসমৃদ্ধ করা যায়, তবেই মাছ-মাংস না খাইবার ঘাটতি অনেকটা পূরণ করা যাইবে। এই অ্যামিনো অ্যাসিড তৈয়ার করিবার ব্যাপারে জাপান সর্বাধিক অগ্রগামী দেশ। সেখানে জীবাণুর সাহায্যে অব্যবহার্য শর্করা ও নাইট্রোজেনঘটিত জৈব পদার্থের গাঁজাইবার পদ্ধতিতে (Fermentation) লাইসিন, গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যালানিন প্রভৃতি অ্যামিনো অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহা ছাড়া জাপানীরা সয়াবিনঘটিত খাবার ও প্রচুর পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করিতেছে। এই সয়াবিনেও অনেক প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। সয়াবিন সস্, সয়াবিন সাকে প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের দেশেও বিভিন্ন পরীক্ষাগারে এই বিষয়ে গবেষণা করা হইতেছে এবং তাহা ফলপ্রসূ হইলে অদূর ভবিষ্যতে প্রোটিনের অভাব অনেকটা পূরণ হইয়া যাইবে।

আবহ-গবেষণার নব অধ্যায়

অমল দাশগুপ্ত

বহুদিন পর্যন্ত উচ্চতর আবহমণ্ডল সম্বন্ধে আমরা সীমিত জ্ঞানের অধিকারী ছিলাম। বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুপ্রবাহের দিক ও বেগ অনুশীলনের জন্যে 'পাইলট বেলুন' পদ্ধতিরই শুধুমাত্র প্রচলন ছিল। এই পদ্ধতি এখনও বহুল প্রচলিত এবং পৃথিবীর বহু আবহ-কেন্দ্রগুলিতে এখন পর্যন্তও এই উপায়ে উচ্চ আবহমণ্ডলের বায়ুপ্রবাহের দিক ও বেগ নির্ণীত হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন গ্যাসভর্তি একটি রবারের বেলুন ছেড়ে এক বিশেষ ধরণের ঘূর্ণায়মান টেলিস্কোপ বা থিয়োডোলাইটের সাহায্যে বেলুনের গতিপথ অনুসরণ করা হয় এবং শূন্যে বেলুনের পরিচলন পথকে (Space trajectory) বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে 'কম্পিউট' করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নির্ণয় করা হয়।

বেলুনে বেতার প্রেরক যন্ত্রের ব্যবহার এবং ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত গ্রাহক যন্ত্রে বেলুন প্রেরিত বেতার-সঙ্কেত গ্রহণ ও অনুশীলনের উপায় উদ্ভাবন উচ্চতর আবহমণ্ডলের গবেষণায় এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত করেছে। সর্বাধুনিক বেতার-সঙ্কেত প্রেরক বেলুন বা সাউণ্ডিং বেলুন উদ্ভাবিত হয় ১৯৪৮ সালে অধ্যাপক জ্যা পিকার্ডের কল্পনা অনুসারে। 'স্কাই হুক' নামে অভিহিত পলিথিলিনের তৈরি এই বেলুনের ব্যাস ৭২ ফুট এবং উচ্চতা ১০২ ফুট। এই বেলুনে হিলিয়াম গ্যাস ভর্তি থাকে এবং শূন্যে এর স্থায়িত্ব ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত। এই বেলুন ৩০০ পাউণ্ড ওজনের যন্ত্রপাতি বহন করে ১৯ মাইল উচ্চতায় উঠতে সক্ষম। স্কাই হুক এযাবৎ ২৪ মাইল উচ্চতায় উঠতে পেরেছে। ২ পাউণ্ড যন্ত্রপাতি সমন্বিত আমেরিকার সিগন্যাল কোরের একটি নিওপ্রিন সাউণ্ডিং বেলুন এপর্যন্ত সর্বাধিক উচ্চতা ২৬.৫ মাইল পর্যন্ত উঠতে পেরেছে। উচ্চতর মণ্ডলের গবেষণার জন্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল না হয়েও বেলুনের সর্বোচ্চ সীমার উর্ধ্বে উঠতে পারে, এমন উপায় উদ্ভাবনে বিজ্ঞানীরা প্রয়াসী হন। ফলে উচ্চ আবহমণ্ডলের গবেষণার ক্ষেত্রে সাউণ্ডিং রকেটের পরীক্ষা সুরু হয়। কিন্তু সাফল্যের সঙ্গে রকেট উৎক্ষেপণ ও তার প্রেরিত সঙ্কেতের নিখুঁৎভাবে অনুশীলন ও পরিবেশন অত্যন্ত জটিল এবং শ্রমসাধ্য ব্যাপার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে রেডারের অসাধারণ উৎকর্ষের ফলে বিজ্ঞানীরা সাউণ্ডিং রকেটের ব্যবহারে অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে পড়েন।

আমেরিকার প্রথম সাউণ্ডিং রকেট উদ্ভাবিত হয় ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউটের জেট প্রপালসন লেবরেটরিতে। এই রকেটের নাম দেওয়া হয় 'ওয়াক করপোরাল'। ১৯৪৫ সালের নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ডস্ থেকে এই পর্যায়ের প্রথম রকেটটি উর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই রকেটে নাইট্রিক অ্যাসিড ও অ্যানিলিন জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে জার্মানদের কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক অসংযোজিত ভি-টু রকেট আমেরিকার সমর দপ্তরের হাতে আসে। এগুলিকে নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ডসে নিয়ে আসা হয়। আমেরিকার সমর-বিজ্ঞানী ও আবহ-বিজ্ঞানীরা এই রকেটগুলিকে উচ্চ আবহমণ্ডলের গবেষণার কার্যে নিয়োগের সিদ্ধান্ত করেন এবং প্রথম ভি-টু

রকেটটি একটি গাইগার কাউন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ ১৬ই এপ্রিল ১৯৪৬ সালে হোয়াইট স্যাণ্ডস্ থেকে উর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। সে সময় থেকে ১৯৫১ সালের ২৯শে অক্টোবর পর্যন্ত ৬৫টি ভি-টু রকেট হোয়াইট স্যাণ্ডস্ ও অন্যান্য উৎক্ষেপণ-মঞ্চ থেকে আবহ-যন্ত্রপাতি নিয়ে উর্ধ্বাকাশে পাঠানো হয়েছিল। এই পরীক্ষাগুলিতে কিঞ্চিদধিক ২০ টন ওজনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রায় ২৫০ মাইল উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। ভি-টু রকেট এবং ওয়াক করপোরালকে সাউণ্ডিং রকেট হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হন। ওয়াক করপোরালের যন্ত্রপাতি বহনের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং উর্ধ্বে ওঠবার সীমা ৪০ মাইলের মধ্যে। ভি-টু রকেট সম্পূর্ণ সামরিক প্রয়োজনে নির্মাণ করা হয়েছিল। স্থিতিসাম্য (Static stability) রক্ষার জন্যে ভি-টু রকেটে আবহ-যন্ত্রপাতি ব্যতীত প্রায় ১১০০ পাউণ্ড সীসা রকেটের সুচালো নাসিকাগ্রে দেওয়া প্রয়োজন হতো। ভি-টু রকেটের উর্ধ্বচারণের সীমা গড়ে ৬০ মাইল। সুতরাং বিজ্ঞানীরা ওয়াক করপোরালের আকারের অথচ অধিকতর যন্ত্রপাতি বহনে সক্ষম এক নতুন ধরণের রকেট উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। আমেরিকার অ্যারোজেট ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন ও ডগলাস অ্যায়ার-ক্র্যাফ্ট্ কোম্পানীর সহযোগিতায় 'এরোবী নামে এক নতুন ধরণের রকেট নির্মিত হলো। এরোবী রকেট ১৮ ফুট লম্বা ও তরল জ্বালানীতে চালিত হয়। এই পর্যায়ের রকেটের যন্ত্রপাতি বহনের ক্ষমতা ১০০ থেকে ২৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত। আমেরিকার নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর অনুরোধে অ্যারোজেট ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন উন্নততর ধরণের এরোবী রকেট নির্মাণে সক্ষম হন। এই রকেটের নাম দেওয়া হয় এরোবী-এইচ-আই (Aerobee Hi)। এই পর্যায়ের রকেটকে ১৫০ ফুট উচ্চ টাওয়ার থেকে উৎক্ষেপণ করা হতো, যাতে রকেটের গতি বায়ুপ্রবাহের দিকে পরিবর্তিত হতে পারে। এরোবী রকেটের ওজন যন্ত্রপাতি সহ ½ টন।

আমেরিকার নৌ-গবেষণা সংস্থার যান্ত্রিক কলাকুশলীদের সহায়তায় গ্লেন এল. মার্টিন কোম্পানী ও রিয়্যাকশন মোটর্স্ ইনকরপোরেট ভি-টু রকেটের উৎকর্ষ বাড়াতে গিয়ে ভাইকিং নামে এক নতুন ধরণের সাউণ্ডিং রকেট নির্মাণে সক্ষম হন। সর্বাধুনিক ভাইকিং সাউণ্ডিং রকেটের ব্যাস ৪৫ ইঞ্চি এবং ৪২ ফুট লম্বা। এই রকেটের ওজন কিঞ্চিদধিক ৭½ টন। এই রকেট তরল অক্সিজেন ও অ্যালকোহলের দ্বারা চালিত হয়। হোয়াইট স্যাণ্ডস্, হলোমন অ্যায়ার ডেভলপমেন্ট সেন্টার, নিউ মেক্সিকো, ফোর্ট চার্চিল প্রভৃতি উৎক্ষেপণ-স্থান থেকে এগুলি উর্ধ্বাকাশে প্রেরিত হয়। ভাইকিং রকেটের উর্ধ্বচারণের ক্ষমতা গড়ে ১৩ মাইল।

ভূপৃষ্ঠ থেকে রকেট উৎক্ষেপণের একটা বড় বাধা হলো ভূপৃষ্ঠের ঘন বায়ুস্তরের সঙ্গে ঘর্ষণে রকেটের বেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া। আমেরিকার লেফ্টেন্যান্ট কমাণ্ডার লী লুইস ১৯৪৯ সালে এই বাধা দূরীকরণের একটি সরল সমাধানের কথা বলেছিলেন। তাঁর মতানুসারে, যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি ছোট রকেট বেলুনে করে পৃথিবীর ঘন বায়ুস্তরের উপরে নিয়ে গিয়ে লম্বভাবে তাকে উৎক্ষিপ্ত করা হবে। এই ব্যবস্থায় ভূপৃষ্ঠের ভারী বায়ুস্তরের বাধা রহিত করা সম্ভব হবে। তাঁর এই ধারণা আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব-বিখ্যাত পদার্থবিদ্ ডাঃ জেম্স্ ভ্যান অ্যালেনকে উৎসাহিত করে। দু-বছর পরে ডাঃ ভ্যান অ্যালেন এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা সুরু করেন এবং 'রকুন' বা বেলুন থেকে রকেট উৎক্ষেপণের কৌশল আবিষ্কৃত হয়। এই ব্যবস্থায় খরচও অনেক কম পড়ে। ১৯৫২ সালের অগাষ্ট মাসে আমেরিকার উপকূলরক্ষী জাহাজ ইষ্ট উইণ্ডের

ডেকের উপর থেকে গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলে প্রথম পরীক্ষামূলক রকুন উৎক্ষেপণ সুরু হয়। আমেরিকার নৌ-গবেষণা সংস্থা ও আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকমণ্ডলীর যৌথ পরীক্ষাধীনে পরবর্তী পরীক্ষাগুলি বোষ্টন থেকে গ্রীনল্যাণ্ডের ফিউল সমুদ্রের উপকূলের মধ্যবর্তী স্থানে চালানো হয়। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বছরে ৮৬টি রকুন উচ্চ আবহমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। নিয়মানুসারে ছোট ছোট রকেটগুলি বেলুনে করে ৩৫০০০ ফুট থেকে ৮৫০০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করা হতো এবং এর রকেটগুলি প্রায় ৬৪ মাইল পর্যন্ত ঊর্ধ্বাকাশে উঠতে সক্ষম হতো। এই ব্যবস্থায় কম খরচের জন্যে আবহমণ্ডলের গবেষণায় এই ধরণের পরীক্ষা প্রতি নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক ঘণ্টায় (Synoptic hours) নেওয়া সম্ভব।

অনেক সময় ছোট ছোট রকেট প্লেনে করে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে প্লেন সোজা উপরে ওঠবার সময় রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় রকেটের গতি ব্যাহত না হয়ে তার আপেক্ষিক গতি অনেক বেড়ে যায়। এই পদ্ধতিকে রকেয়ার নামে অভিহিত করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালের অগাষ্ট মাসে পরীক্ষামূলকভাবে ভার্জিনিয়ার ওয়ালপ্‌স্ দ্বীপপুঞ্জের কাছে এই কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল

রকেটবাহিত যন্ত্রপাতির দ্বারা উচ্চ আবহ-মণ্ডলের গবেষণায় অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়সাধ্য যান্ত্রিক কলাকৌশলের প্রয়োজন। ঊর্ধ্বাকাশে রকেটের বিভিন্ন অবস্থান নির্ধারণে এবং সঙ্কেত-তথ্য অনুশীলনের জন্যে ভূপৃষ্ঠে ঘনসন্নিবিষ্ট বহু রেডার উচ্চশক্তিসম্পন্ন মুভি ক্যামেরা ও টেলিস্কোপ সমন্বিত গ্রাহক কেন্দ্রের প্রয়োজন। গ্রাহক কেন্দ্রগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে এক দল বিশেষজ্ঞ যন্ত্রকুশলী এবং উৎক্ষেপণ-মঞ্চের নিকটবর্তী গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের নিরাপদ ব্যবস্থার জন্যে এবং রকেটের ভূপাতিত অংশবিশেষ উদ্ধারের জন্যেও সুশিক্ষিত উদ্ধারকারীদলের প্রয়োজন।

রকেটের গতিপথ নির্ধারণে আলোকবীক্ষণ ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়ে থাকে।

উৎক্ষেপণ-মঞ্চ থেকে এক মাইল দূর পর্যন্ত রকেটের গতিপথ অনুসরণের জন্যে তিনটি বিস্তৃত কৌণিক দূরত্বে রক্ষিত বোয়েন-ন্যাপ মুভি ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এই ক্যামেরার লেন্সের কেন্দ্র-দূরত্ব (Focal length) ৭ থেকে ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত। রকেট যখন বোয়েন-ন্যাপ ক্যামেরার পর্যবেক্ষণ সীমার বাইরে চলে যায়, তখন রকেটের গতিপথ অনুসরণে সিনেথিয়োডোলাইট যন্ত্রের ব্যবহার হয়। এই যন্ত্রের লেন্সের কেন্দ্র-দূরত্ব ১২ ইঞ্চি থেকে ১৪ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। অনেক সময় সিনে-থিয়োডোলাইটের বদলে ব্যালিস্টিক ক্যামেরাও ব্যবহৃত হয়। শেষ পর্যায়ে বিভিন্ন কৌণিক দূরত্বে অবস্থিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে রকেটের গতিপথ অনুসরণ করা হয়।

ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির মধ্যে রকেটের গতিপথ অনুসরণে বেকন রেডারের ব্যবহার সর্বপ্রধান। অন্য ব্যবস্থার মধ্যে 'ডোভাপ' (DOVAP) বা রেডিও ডপ্‌লার ব্যবস্থা অন্যতম। এই পদ্ধতিতে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কোন বেতার প্রেরক যন্ত্র থেকে উচ্চ কম্পনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ রকেট এবং ভূপৃষ্ঠে দুই-তিনটি গ্রাহক কেন্দ্রে একই সময় পাঠানো হয়। রকেটে অবস্থিত একটি পুনঃপ্রেরণক্ষম গ্রাহক যন্ত্রে (Transceiver) ঐ তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক দ্বিগুণিত করে পুনঃপ্রেরণ করা হয়। ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত গ্রাহক কেন্দ্রগুলিতে প্রাথমিক তরঙ্গ এবং রকেট প্রেরিত দ্বিগুণিত কম্পনাঙ্কের তরঙ্গ একটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে বিশেষভাবে অনুশীলন করে একটি তৃতীয় কম্পনাঙ্কের তরঙ্গ নির্ণয় করা যায়, যেটি রকেটের দিক পরিবর্তনের সমানুপাতিক।

সাউণ্ডিং রকেট উচ্চ আবহমণ্ডলের ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী এবং বায়ুর তাপ, চাপ ও প্রবাহের দিক নির্ণয়ের জন্যে ব্যবহার করা হচ্ছে।

সাউণ্ডিং রকেট ও সাউণ্ডিং বেলুন দিয়ে ওজোন (Ozone)-স্তরের পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। এই পরীক্ষায় ওজন-স্তরের আহ্নিক পরিবর্তন ছাড়াও মেরুরাত্রির শেষার্ধে উচ্চ অক্ষাংশে ১০ থেকে ২০ কিলোমিটারের মধ্যে ওজোন-স্তরের ঘনত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। ২০ কিলোমিটারের অধিকতর উচ্চতায় ওজোন-স্তরের ঘনত্ব প্রায় অপরিবর্তনীয়। ৩০ কিলোমিটার উর্ধ্বে গ্রীষ্মের প্রথমার্ধে ওজোন-স্তরের ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। ২০ থেকে ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে গ্রীষ্মকালে ওজোন-স্তরের ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা কম।

রকেটের সাহায্যে আয়নমণ্ডলের ভৌত গুণাবলী নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে; আয়নমণ্ডলের স্তরগুলি কিন্তু সর্বদা ভূপৃষ্ঠ থেকে একই উচ্চতায় থাকে না। ঋতুভেদে—এমন কি, দিন ও রাত্রিতে বিভিন্ন স্তরের উচ্চতার তারতম্য দেখা যায়। আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন-স্তরের ঋণ তড়িৎকণার ঘনত্ব (Electron density), আয়নের ঘনত্ব (Ion density) এবং ঋণ-তড়িৎকণাসমূহের সংঘর্ষের হার সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা গেছে এবং অনেক নতুন জ্ঞান লাভের ফলে মহাকাশযাত্রাকে আরো নিরাপদ ও সুষ্ঠু করা সম্ভব হচ্ছে।

রকেটবাহিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে উচ্চতর আবহমণ্ডলের চৌম্বক ক্ষেত্র এবং তড়িৎ-প্রবাহ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা গেছে। ম্যাগ্‌নেটোমিটার সমন্বিত এরোবী সাউণ্ডিং রকেট দিয়ে ১০৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন নির্ণয় করা হয়েছে। এসম্বন্ধে বিশদ গবেষণার জন্যে ২টি রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ১৭ই মার্চ পেরুর হুয়ানকায়োর ১০০০ মাইল পশ্চিমে চৌম্বক বিষুবরেখার কাছে চৌম্বক ক্ষেত্রের সর্বনিম্ন আহ্নিক পরিবর্তনের সময় প্রথম রকেটটি একটি নৌবাহিনীর সী-প্লেন থেকে উর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই পরীক্ষায় উচ্চতার সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতার হ্রাস পেতে দেখা গেছে, কিন্তু কোন চুম্বকীয় বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায় নি। ১৯৪৯ সালের ২২শে মার্চে প্রথম রকেট উৎক্ষেপণের স্থান থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে চৌম্বক ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ আহ্নিক পরিবর্তনের সময় দ্বিতীয় রকেটটি উর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই পরীক্ষায় ৯৩ কিলোমিটার থেকে ১০৫ কিলোমিটারের মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্রুত হ্রাস পরিলক্ষিত হয়েছে। এই হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ৪.০ ± ০.৫ মিলিগস্‌। ৯৩ কিলোমিটার থেকে ১০৫ কিলোমিটারের মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্রুত হ্রাসকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত এক তড়িৎ-প্রবাহের উপস্থিতির ফল বলে অনুমিত হচ্ছে। রকেটবাহিত যন্ত্রপাতির দ্বারা ভূচৌম্বক পরিবর্তনের ফলে উৎপাদিত এক তড়িৎ-প্রবাহের প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেছে। আয়নমণ্ডলের E স্তরের নিম্নাংশে এই তড়িৎ-প্রবাহের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু D স্তরে তড়িৎ-প্রবাহের উপস্থিতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এই তড়িৎ-প্রবাহ ৯৩ থেকে ১০৫ কিলোমিটারের মধ্যে বিস্তৃত। ১০৫ কিলোমিটারের ঠিক উর্ধ্বে এই তড়িৎ-প্রবাহ দ্রুত হ্রাস পেয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

রকেটের সাহায্যে সৌর এক্স-রশ্মি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। আয়নমণ্ডলের E স্তর অতিক্রমকারী রকেটের সাহায্যে সৌর এক্স-রশ্মির অস্তিত্ব 'ফোটন কাউণ্টার' নামক যন্ত্রের দ্বারা নিরূপিত হয়েছে। কোন পরীক্ষাতেই অস্বাভাবিক সৌর এক্স-রশ্মির বিকিরণ লক্ষ্য করা যায় নি।

সৌর অতিবেগুনী রশ্মির বর্ণালী রকেটবাহিত বর্ণালী-জ্ঞাপক যন্ত্র (Spectrograph) দিয়ে নির্ণয় করা হয়েছে। ২১০০ অ্যাংষ্ট্রম থেকে ১১০০ অ্যাংষ্ট্রম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অতিবেগুনী রশ্মির বর্ণালীর সন্ধানও পাওয়া গেছে।

প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic rays) তীব্রতা এবং তার গঠন পরীক্ষার জন্যে ৪১° উত্তর ভূ-চুম্বকীয় অক্ষাংশে (Geomagnetic latitude) রকেটবাহিত গাইগার কাউন্টার দূরবীক্ষণের সঙ্গে সীসার শোষক ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা নির্ণয় করা হয়েছে ০'০৭০±'০০৫ কণা প্রতি (সেন্টিমিটার)²—সেকেণ্ড—ষ্টেরাড। এগুলির মধ্যে প্রোটনের পরিমাণ ০'০৫৮±'০০৫, আলফা কণার পরিমাণ ০'০১১±'০০২ এবং অন্যান্য কণার পরিমাণ ০'০০১±'০০১। একই অক্ষাংশে গামা রশ্মি বিকিরণের পরিমাণও নির্ণয় করা হয়েছে। এই বিকিরণের পরিমাণ মোট মহাজাগতিক রশ্মির শক্তির ০'১ শতাংশ।

আমাদের দেশেও উচ্চতর আবহমণ্ডলের গবেষণায় সাউণ্ডিং রকেটের ব্যবহার সুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের সহযোগিতায় এবং ভারতীয় আবহ বিভাগের পরিচালনাধীনে ত্রিবান্দ্রমের ১০ মাইল দূরে বিষুব অঞ্চলে ৮°৩২ মিঃ উঃ অক্ষাংশে এবং ৭৬°৫২ মিঃ পূঃ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ-ঘাঁটি থেকে অনেকগুলি জুডি-ডার্ট ধরণের রকেট উর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রথম জুডি-ডার্ট রকেটটি থুম্বা রকেট উৎক্ষেপণ-ঘাঁটি থেকে ১৯৬৪ সালের ১৪ই জুলাই উর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই পরীক্ষাগুলিতে ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ও মেজোস্ফিয়ার স্তরে বায়ুপ্রবাহের দিক ও বেগ এবং অন্যান্য তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। দেখা গেছে, ৪৭ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ু পূর্বোত্তর-পূর্ব থেকে ৬০ থেকে ৯০ নট গতিতে প্রবাহিত হয়। ৫৭ কিলোমিটার থেকে ৬৩ কিলোমিটার উচ্চতায় বিষুব অঞ্চলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বায়ুপ্রবাহে এক বিশেষ ধরণের আন্দোলন লক্ষিত হয়েছে। থুম্বাতে উৎক্ষিপ্ত রকেটগুলির অনুসরণে এম-পি-এস ১৯ ধরণের ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত রেডার ব্যবহৃত হচ্ছে।

রকেটের সাহায্যে উচ্চ আবহমণ্ডলের ওজোন-স্তর, আয়নমণ্ডল ও আরো উচ্চতর মণ্ডলের গবেষণায় সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা এই যে, উচ্চতর মণ্ডলের তড়িৎ, চৌম্বক ও মহাজাগতিক কণাসমূহের বিকিরণ পরীক্ষার জন্যে মাত্র কয়েক মিনিট সময় পাওয়া যায়। উচ্চতর মণ্ডলগুলির গুণাগুণ পরীক্ষার জন্যে অধিকতর সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন উচ্চতায় উপগ্রহ স্থাপনের প্রয়াসী হচ্ছেন।

ক্যামেরা ও ইনফ্রারেড যন্ত্র সজ্জিত অনেকগুলি আবহ-উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন উচ্চতায় স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে ফটোইলেকট্রিক কোষে সজ্জিত ভ্যানগার্ড-২ উপগ্রহ প্রথম পৃথিবীর মেঘস্তরের রেডিও-ফটো পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল। ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল টাইরস-১, ১৯৬০ সালের ২৩শে নভেম্বর টাইরস-২, ১৯৬১ সালের ১২ই জুলাই টাইরস-৩ এবং ১৯৬২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী টাইরস-৪ (বীটা) উর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। 'টেলিভিসন ইনফ্রারেড অবজারভেশন স্যাটেলাইট' শব্দগুলির আদ্যাক্ষর নিয়ে টাইরসের নামকরণ করা হয়েছিল। টাইরস মণ্ডলীর উপগ্রহগুলি ঝড় ও মেঘের কয়েক হাজার রেডিও-ফটো এপর্যন্ত পৃথিবীতে পাঠিয়েছে এবং এখনও পাঠিয়ে যাচ্ছে। টাইরস-৪ উপগ্রহে ২টি টেলিভিসন ক্যামেরাও আছে। আমেরিকার ওয়েদার ব্যুরোর অধ্যক্ষ এফ. ডব্লিউ. রিকেল ডারকারের মতে, আবহ-উপগ্রহের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হলে যখন বিপুল সংখ্যক আবহ-উপগ্রহ পৃথিবীকে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হবে, সেগুলি তখন মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যে কোন স্থানের ঝড়ের অবস্থিতি ও আবহাওয়ার অন্যান্য তথ্যাদি ভূপৃষ্ঠের কোন এক কেন্দ্রীয় আবহ মন্দিরে প্রেরণ করবে এবং সেখানে ইলেকট্রনিক

মস্তিষ্কের সহায়তায় শেষ মুহূর্তের পর্যন্ত পৃথিবীর আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রকাশন সম্ভব হবে।

১৯৬১ সালের ২৭শে এপ্রিল এক্সপ্লোরার-১১ উপগ্রহ মারফৎ মহাজাগতিক রশ্মিতে গামা রশ্মির পরিমাণ জানা গেছে ও মহাশূন্যে তাদের অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। ঐ বছরের ১৫ই অগাষ্ট এক্সপ্লোরার-১২ উপগ্রহের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি দিয়ে সৌর বায়ু (Solar wind), আন্তর্গ্রহ (চৌম্বক) ক্ষেত্রের সীমা ও ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয় এবং গ্রহান্তরবর্তী স্থানের শক্তি কণার পরিমাপ করা হয়েছে।

সৌরজগতের উৎপত্তি ঃ ক্রমবিবর্তনবাদের প্রতিষ্ঠা

অত্রি মুখোপাধ্যায়

পূর্ববর্তী আলোচনায় সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি জিনিষ আমরা পরিষ্কার করতে চেয়েছি।* এই সৌরলোকের সৃষ্টি হয়েছে, না কোন আকস্মিক ঘটনায়, না কোন নক্ষত্র বা সৌর উপাদানে। আকস্মিকতাবাদের আলোচনা থেকে অপর পক্ষে যে ধারণার দিকে আমরা ঝুঁকে পড়েছি, তাতে এই কথাই মনে হয়েছে যে, সৌরজগৎ নিখুঁতভাবে প্রাকৃত নিয়মগুলি পালন করে চলেছে, তার সৃষ্টির পিছনে আছে দীর্ঘকালের ক্রমবিকাশ, ক্রমবিকাশ এমনি এক একক বস্তুসজ্ঘের, যা গঠনে, ঘনত্বে, তাপমাত্রায় যে কোন নাক্ষত্র উপাদানের চেয়ে আলাদা। পূর্বাহ্নেই বলে রাখা ভাল যে, মুখ্যতঃ এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা লক্ষ্য করবো, সম্ভাব্য কি ধরণের আদিম পদার্থের ক্রমবিবর্তন আজকের সৌরমণ্ডলীর জন্ম দিতে পারে

কাণ্ট** এই আদিম বস্তুর প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন, আজকের গ্রহজগতের সমগ্র ব্যাপ্তি জুড়ে ধূলিগ্যাসের একটি বিশাল স্থির নীহারিকা বলে। সূর্যকে তিনি এর কেন্দ্র থেকে গ্রহ-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হতে অনুমান করেছেন। তাঁর অনুমান বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে অন্তঃস্থ বস্তুগুলির বিভিন্ন পরিমাপের আকর্ষণের ফলে নীহারিকাটির সাংগঠনিক সমতা নষ্ট হয়ে যায়, ভারী পদার্থগুলি কেন্দ্রে চলে যেতে চাইলে গ্যাসের স্বভাবগত সম্প্রসারণশীলতা এতে বাধা দেয়, যার ফল হলো মেঘের মধ্যে বিভিন্ন মাপের পার্শ্বগতির (Lateral motion) উদ্ভব। কাণ্টের অনুমানে এদের লব্ধি ঘটেছে সামগ্রিকভাবে, নীহারিকাটির অক্ষোপরি ধীরে আবর্তনে। পরবর্তী ধাপে এই মেঘ ঠাণ্ডা হয়ে সঙ্কুচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবৃদ্ধবেগ হয়েছে এবং এক সময়ে এই আবর্তন-বেগ একটি চরম মাত্রায় পৌঁছালে মেঘটি তার একক সত্তা হারিয়ে কতকগুলি টুক্‌রায় ভেঙে পড়েছে। কাণ্ট বলছেন, এই সব টুক্‌রা থেকেই পরে গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

নীহারিকাটিকে প্রথম অবস্থায় স্থির বলে ধরে নিলে কাণ্ট কথিত পন্থা বা অন্য কোন পন্থাতেই পরবর্তী কালে এর অক্ষোপরি আবর্তনের সৃষ্টি কল্পনা করা যায় না—কেন না, 'কিছু না' থেকে

* সৌরজগতের উৎপত্তিঃ দুর্ঘটনা-বাদ এবং এদের পত্তনের কারণ, অত্রি মুখোপাধ্যায়, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারী, '৬৬ [পাঠকেরা দয়া করে দুর্ঘটনা-বাদ কথাটির পরিবর্তে আকস্মিকতা বাদ পড়লে অনুগৃহীত হবো—লেখক]

** ইতিপূর্বে টমাস রাইটও অনুরূপ একটি মত প্রচার করেছিলেন।

কোন ঘূর্ণন সৃষ্টির অনুমান কৌণিক ভরবেগের অবিনশ্বরতা সূত্রের পরিপন্থী। কান্ট যে পার্শ্বগতির উল্লেখ করেছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে এদের বিন্যাস হবে এমনই, যাতে তাদের কোনই কার্যকরী প্রভাব থাকে না।

সুতরাং লাপ্লাসের মত আমাদেরও নীহারিকাটির অক্ষোপরি আবর্তনকে তার একটি সহজাত ধর্ম বলেই স্বীকৃতি দিতে হবে। অবশ্য লাপ্লাস এরই সঙ্গে কান্টের মতবাদের যে সব সংশোধনের অবতারণা করেছেন, আমরা দেখবো সেগুলির কয়েকটি বিভিন্ন কারণে বর্জনীয়। কান্টের মতবাদের আরো অন্যান্য আপাত এবং যথার্থ ত্রুটিগুলি সংশোধন করে লাপ্লাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই জন্মবৃত্তান্তের যে চেহারা দাঁড়ালো, তাতে আজন্ম ধীরাবর্তিত এই নীহারিকাটির উপাদান একমাত্র গ্যাসীয় পদার্থ বলে নির্দেশ করা হলো। এই মেঘ ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে এর আবর্তনের বেগ বেড়ে গেছে, যার অনিবার্য ফল ঘটলো মেঘটির চাপা মেরুপ্রদেশ এবং স্ফীত নিরক্ষীয় প্রদেশে। আবর্তনবেগ-বৃদ্ধি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছালে নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপাদানের উপর কেন্দ্রের আকর্ষণশক্তি এর কেন্দ্রাতিগ শক্তির সঙ্গে যখন একটা সাম্যস্থিতির রচনা করে ফেললে, তখন এর পরবর্তী সঙ্কোচন এই বলয়কে সাম্যস্থিতির অবস্থানে রেখে মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। বলা হলো, মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরেও এই অঙ্গুরী মহতী আবর্তনের দিকে একই ভাবে ঘুরবে। পিণ্ডের ঘূর্ণনবেগ বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে নয় বার এরকম খোলস ছাড়বার পালা চললো। শেষ পর্যন্ত সমগ্র নীহারিকাটিকে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন আঙটা এবং এদের সাধারণ কেন্দ্রস্থিত একটি পিণ্ডে বিভক্ত দেখা যাবে, এদের প্রত্যেকেরই আবর্তন দিক হবে এক এবং অভিন্ন। অনুকূল অবস্থার অভাবে কেন্দ্রস্থিত অবশিষ্ট পিণ্ডাংশটি আর বিভক্ত না হতে পেরে বর্তমান সূর্যের রূপ নিয়েছে বলে লাপ্লাসের অনুমান। অপর দিকে প্রত্যেকটি আঙটার বিভিন্নাংশে বিভিন্ন পরিমাণের সান্দ্রতা থাকায় এবং বিভিন্ন বলের অধীন হওয়ায় ছোট-বড় অজস্র খণ্ডে এই আঙটাগুলি ভেঙে পড়েছে এবং এসব টুক্‌রা একই দিকে নানান বেগ নিয়ে সূর্য পরিক্রমা সুরু করেছে। উত্তরকালে এরাই আবার পারস্পরিক আকর্ষণের প্রভাবে সম্মিলিত হবে এক একটি পিণ্ডের আকার ধারণ করে। এরাই সৌরলোকের গ্রহাদি।

এই মতবাদের নিকট সিদ্ধান্তগুলি বিচার করে দেখা যাক। প্রথমতঃ এতগুলি আঙটা বিচ্ছিন্ন করে দেবার পর যে অংশটি অবশিষ্ট থাকছে, তার উচিত নিজের অক্ষের উপর প্রচণ্ড বেগে আবর্তন করা। এই অবশিষ্টাংশই যদি সূর্য হয় তাহলে বাস্তব ক্ষেত্রে তার অস্বাভাবিক রকমের কম কৌণিক ভরবেগ পোষণ করবার হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে সূর্যের বর্তমান কৌণিক ভরবেগ যদি নীহারিকাটির ভরবেগ বৃদ্ধিক্রমের শেষ পর্যায়ের মান নির্দেশ করে, তবে সমগ্র সৌরলোকব্যাপী আদিম নীহারিকার আবর্তনবেগের মান সহজেই অনুমেয়। এত কম কৌণিক ভরবেগ পোষণকারী এই নীহারিকার ভাঙ্গনের তখন কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এতদসত্ত্বেও যদি কোনমতে এই বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াটিকে অনুমোদন করা যায়, প্রশ্ন ওঠে এই আঙটাগুলি আদৌ কোনদিন পিণ্ডীভূত হতে পারে কিনা। লাপ্লাসের মতবাদ প্রচারকালে বায়বীয় পদার্থকে যন্ত্রধর্মী হিসাবে দেখবার রীতি ছিল না, এর তেষট্টি বছর পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্সওয়েল যখন লাপ্লাসের মতবাদের গাণিতিক পর্যালোচনা করলেন, তখন ধরা পড়লো, নীহারিকাটির ভর সৌরভরের একসহস্রাংশ হলে অত্যন্ত হাল্কা এই আঙটাগুলির জমাট বাঁধবার পরিবর্তে বাইরের মহাশূন্যে বিকীর্ণ

হয়ে পড়বার সম্ভাবনাই বেশী। আর কোন কারণে যদি এই বিকিরণ নাও ঘটে, তবে শনির বলয়ের মত চিরকাল এসব আঙটার সূর্যের চারপাশে ঘোরবার কথা। তৃতীয়তঃ লাপ্লাসীয় নীহারিকাটির অত্যন্ত উচ্চমানের সান্দ্রতা অনুমান করে বলা হয়েছিল যে, এই নীহারিকা কঠিন বস্তুর মত আবর্তন করবে। এরই ভিত্তিতে সৌরজগতে উপগ্রহগুলির আবর্তনের দিক গ্রহ-গুলির আর্বতনের দিকে হবার কারণ দর্শানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আদিতে যে নীহারিকাটিকে বর্তমান সৌরজগতের উপান্ত প্রদেশ অবধি পরিব্যাপ্ত থাকতে হচ্ছে, অথচ যার ভর সৌর-ভরের একসহস্রাংশ মাত্র—তার পক্ষে প্রয়োজন অনুভূত ঘনাঙ্ক এবং সান্দ্রতা রাখা সম্ভব নয়। আর এ না থাকলে লাপ্লাসীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী উপগ্রহগুলির আবর্তনমুখ সৌরআবর্তনের দিকে অনুষ্ঠিত না হয়ে বরং তার পশ্চাদ্‌গামী হয়ে পড়তে বাধ্য। সুতরাং বিভিন্ন দিক থেকে এই মতবাদ কথিত তাত্ত্বিক ভবিতব্যের সঙ্গে দুই তথ্যাবলীর সংঘাত ঘটছে।

লাপ্লাস-কথিত কান্টের সংশোধনগুলি পর্যা-লোচনা প্রসঙ্গে মতবাদ দুটির মধ্যে একটি তুলনা-মূলক আলোচনা হয়তো অবাঞ্ছনীয় হবে না। কান্ট বলছেন, আদিম পদার্থের গঠন হবে ধূলি এবং গ্যাসে, লাপ্লাস সংশোধন করছেন—এর গঠন হবে পুরাপুরি গ্যাসীয় পদার্থে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান নির্দেশ করেছে, গ্রহসৃষ্টির ব্যাপারে বাষ্পীভবন এবং ঘনীভবনের ভূমিকার যথেষ্ট প্রয়োজন; সুতরাং মেঘে ধূলি এবং গ্যাস—এই দুইয়েরই অস্তিত্ব প্রয়োজন অনুভূত, এই দিক থেকে কান্টের অনেকখানি অন্তর্দৃষ্টি ধরা পড়লো। আবার কান্টীয় মেঘে বস্তুকণাগুলির মধ্যে সংসক্তির যতখানি ভূমিকা অবতারণা করা হয়েছে, এই প্রপঞ্চের উপর লাপ্লাস ততখানি গুরুত্ব দেন নি, অথচ এই সংসক্তির ভূমিকা ব্যতিরেকে এমন কোন তাত্ত্বিক সৌরজগত রচনা সম্ভব নয়, যা দৃষ্ট জগতের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে সক্ষম। পুনশ্চ, কান্ট-কথিত পন্থার ঘনীভবনের প্রক্রিয়াটির তুলনায় লাপ্লাসের পন্থাটি অতিমাত্রায় কৃত্রিম।

লাপ্লাসীয় মতবাদের সবচেয়ে দুর্বলতা হচ্ছে, গাণিতিক প্রতিষ্ঠার অভাব। বিখ্যাত জ্যোতি-র্বেত্তা এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ গণিতজ্ঞ হয়েও লাপ্লাস কেন যে তাঁর মতবাদকে পুরাপুরি গণিত-বর্জিত রূপে প্রকাশ করেছিলেন, সে কথা আজও রহস্যে আবৃত।

এরপর উনিশ শতকের শেষের দিকে লিগণ্ডেসের একটি নিবন্ধে কান্টীয় মেঘে সংসক্তি ছাড়াও স্থিতিস্থাপকতাবিহীন ঘাত-সংঘাতের অপরিহার্য ভূমিকাটির প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করা সম্ভব হয়েছিল। গ্রহ-সংস্থিতির ইতিহাসে এর পরের পর্যায় আকস্মিকতাবাদ নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

ম্যাক্সওয়েল যখন লাপ্লাসের মতবাদের গাণিতিক পর্যালোচনা করেন, বিশ্বের গঠন উপাদান সম্পর্কে তখনকার ধারণা ছিল, পৃথিবী যে অনুপাতে এবং যে উপাদানে গঠিত, সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্রের গঠনও অনুরূপ। এর পরে নানান দিক থেকে এই ধারণা সংশোধন করবার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। সংশোধিত তথ্যাবলীর ইঙ্গিতে পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহ সৌর অথবা নাক্ষত্র উপাদানের একশতাংশ মাত্র গঠিত হয়েছে। নক্ষত্রের এই বাড়্‌তি অংশ হলো হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাসের সংমিশ্রণ আবার অন্তঃপ্রদেশীয় বস্তুর গঠনও এই একই উপাদানে।

এই আবিষ্কারই ধূলিগ্যাসীয় মেঘে সম্ভাবনাকে তার পূর্ব আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো। কারণ কান্টীয় মেঘের গঠনও যদি অনুরূপ হয়, তাহলে মানতে হবে গ্রহাদির সৃষ্টি হয়েছে এই মেঘের একশতাংশ মাত্র উপাদানে। মেঘের বাকী অংশ হয় সূর্যে প্রত্যাবর্তন করে, না হয় মেঘ-

লোকের বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেছে। সূর্যে প্রত্যাবর্তনকারী অংশ এভাবে তাদের নিজস্ব কৌণিক ভরবেগ সূর্যে সঞ্চালিত করবে, সুতরাং বাকী অংশটুকুকে এভাবে হারিয়ে যেতে ভাবা যায় না, কারণ সূর্যের বর্তমান কৌণিক ভরবেগ তাহলে এত কম হয় কি করে! দেখা যাচ্ছে, মেঘলোক থেকে বিবাগী হয়ে পড়া ছাড়া অন্য কিছু এদের ভাগ্যে ঘটেছে বলে মনে করবার কারণ নেই। লক্ষ্য করবার বিষয়, এর ফলে একদিকে যেমন কান্ট-প্রকল্পিত মেঘের ভর এক-সহস্রাংশের পরিবর্তে একদশমাংশ হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে স্বভাবতঃই গড় ঘনত্বের নতুন করে যে মান নির্ণীত হচ্ছে, তা ঘনীভবনের যথেষ্ট অনুকূলে। এই পুনর্বিচার আরো একটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করলো। যে কৌণিক ভর-বেগের আশ্চর্য ভাগ-বাঁটোয়ারা এতদিন জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বিব্রত করে এসেছে, এখন তার অবসান ঘটবে বলে মনে হলো। কারণ নীহারিকার কার্যকরী ভর সৌরভরের একদশমাংশে নেমে আসায় সান্দ্রতার মান যে ভাবে বেড়ে গেল, তাতে এ হেন মেঘ সূর্যের চারপাশে নিরেট বস্তুর মত আবর্তন করছে, এই অনুমানের বিপক্ষে কিছু বলবার থাকতে পারে না।

এই সমস্ত সংশোধিত দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে সমকালীন পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূ-তত্ত্বের প্রগতির প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কাল পরে (১৯৪৩ খৃঃ) কার্ল ফন্ ভিৎস্যাকার যে সনাতনী ক্রমবিকাশবাদের পুনরালোচনা করলেন, তাতে কান্টীয় বিবর্তনের আরো একটি দুর্বলতা নির্দেশ করা সম্ভব হলো। আদিম মেঘটিকে যখন ধূলি এবং গ্যাসে গঠিত বলে অনুমান করা হয়েছে, তখন বিবর্তনকালে এদের নিজেদের ব্যবহার-বিভিন্নতাও গ্রাহ্য ছিল।

ভিৎস্যাকার প্রকল্পিত মেঘটির নিরেট বস্তুর মত আবর্তনে যে সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, তা এই— মেঘটির সীমান্ত প্রদেশের কৌণিক ভরবেগ অত্যন্ত বেড়ে যাবে, যার ফলে সেই সব অঞ্চলের গ্যাসীয় অংশকে ধরে রাখা সম্ভব হবে না; এরই সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় গ্যাসীয় বস্তুগুলির কৌণিক ভরবেগ কমে আসবে। তাহলে এতে নীহারিকার মধ্যাঞ্চলের (পরে যা সূর্য হয়েছে বলে এঁর অনুমান) কৌণিক ভরবেগই শুধু কমে গেল না, সেই সঙ্গে মূল নীহারিকার ঘনত্বেরও হ্রাসমূল্যায়ন ঘটলো।

একই সঙ্গে ধূলি অংশের ভাগ্যে অন্য রকম কি ঘটেছে দেখা যেতে পারে। এরা প্রথম প্রথম সূর্যের নিরক্ষীয় তলের সঙ্গে বিভিন্ন নতিতে বিভিন্ন উৎকেন্দ্রতার বৃত্তাভাসে সূর্যের চারপাশে ঘুরে বেড়িয়েছে। কালক্রমে এদের পারস্পরিক সংঘাত এদের মধ্যে কিছুটা শৃঙ্খলা এনে দেবে। তখন কক্ষপথগুলি মোটামুটিভাবে বৃত্তাকার ধারণ করবার সঙ্গে সঙ্গে এক সমতলেও এসে পড়বে। আজকের গ্রহগুলির অনুরূপ দূরত্বে এদের তাপমাত্রা বর্তমান মূল্যের কাছাকাছি ছিল, এমন অনুমান করাও হয়তো অসঙ্গত হবে না, কারণ সূর্য থেকে পাওয়া সবটুকু তাপই সেদিন এরা বিলিয়ে দিয়েছে।

উল্লিখিত সংঘাতের প্রকৃতি কেমন হতে পারে এবারে সেটাও দেখা যাক। প্রথম দিকে সমান আকারের বস্তুকণাগুলি পরস্পর ধাক্কা খেয়ে গুঁড়িয়ে অথবা সরাসরি বাষ্পীভূত হয়ে গেলেও অবস্থার আনুকূল্যে এসব বাষ্প পরক্ষণেই অতি ক্ষুদ্র কণাপুঞ্জে ঘনীভূত হয়ে পড়বে। এই সব অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা যখন অপেক্ষাকৃত বড় বস্তুখণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা খায়, তখন বৃহৎ কণাগুলি সংসক্তির প্রভাবে তাদের সংগৃহীত করে আরো বড় হয়। এভাবে বড় হবার পর এদের অভিকর্ষণশক্তি ক্ষুদ্র কণাগুলিকে টেনে আনবার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে পড়লে ছোট ছোট কণাগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে কণাখণ্ডের গায়ে আছড়ে পড়তে থাকবে। এভাবে আঘাত-

প্রাপ্ত হওয়ায় এরা উত্তপ্ত হয়ে পড়ে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আশেপাশের ক্ষুদ্র বস্তুকণার ভীড় সম্পূর্ণরূপে কেটে না যায়, এই গরম হওয়া ততক্ষণ চলতেই থাকে। ভীড় কাটলে এদের বৃদ্ধি স্থগিত রেখে ঠাণ্ডা হবার পালা সুরু হয়।

মেঘলোকে এই ধরণের বৃহদাকার ধারণ অবশেষে কেন যে একটিমাত্র বিশাল বস্তুপিণ্ডের সৃষ্টি না করে একাধিক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার খণ্ডের সৃষ্টি করবে, তার পক্ষে এবং সৌরজগতের কয়েকটি বিশেষ নিয়মানুবর্তিতা ব্যাখ্যার প্রয়োজনে আলোচনা করা সম্ভব হয়েছে। এঁরা দেখিয়েছেন, বিশেষ কতকগুলি পন্থায় এবং অবস্থানে ন্যূনতম শক্তির বিনিময়ে সৌরনীহারিকার মধ্যে এরূপ আবর্ততন্ত্র সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব। আদিম নীহারিকার কতকগুলি অবস্থান বিশ্লেষণে এদের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকৃতি উপলব্ধি করা যেতে পারে। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ক্ষুদ্র বস্তুকণাগুলি সূর্যকে নাভিবিন্দুতে রেখে উপবৃত্তাকার পথে সূর্য পরিক্রমা করেছিল। এই কণা-ঝাঁকের মধ্যে যাদের ঘূর্ণনকাল এক, তাদের মধ্যে

একটি ঘূর্ণ্যমান অক্ষের প্রেক্ষাভূমি থেকে একটি বৃত্তীয় (ক) এবং একটি উপবৃত্তীয় গতি কেমন দেখাবে

কিছু নির্দিষ্ট ব্যাসের বৃত্তাকার পথে এবং কিছু বিভিন্ন উৎকেন্দ্রিক বৃত্তাভাসে সূর্য পরিক্রমা করতে পারে। সুতরাং সূর্যের চারপাশে ওই একই ঘূর্ণনকালবিশিষ্ট ঘূর্ণ্যমান স্থানাঙ্ক অক্ষের কল্পনা করে এরই প্রেক্ষাভূমি থেকে এসব কণার গতিপথ নির্ণয় করতে গেলে চোখে পড়বে, যে কণাটি 'ক' চিহ্নিত বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করছিল, সেটি কোন একটি 'ক' চিহ্নিত বিন্দুতে পূর্ণস্থিতি লাভ করেছে। আবার যে কণাটি 'খ' চিহ্নিত উপবৃত্তাকার পথে সূর্য পরিক্রমা করছিল, সেটি ক্রমান্বয়ে একবার সূর্যের কাছে একবার দূরে সরে যাচ্ছে, অর্থাৎ কণাটি সমভাবে ঘূর্ণ্যমান অক্ষের কখনো আগে কখনো
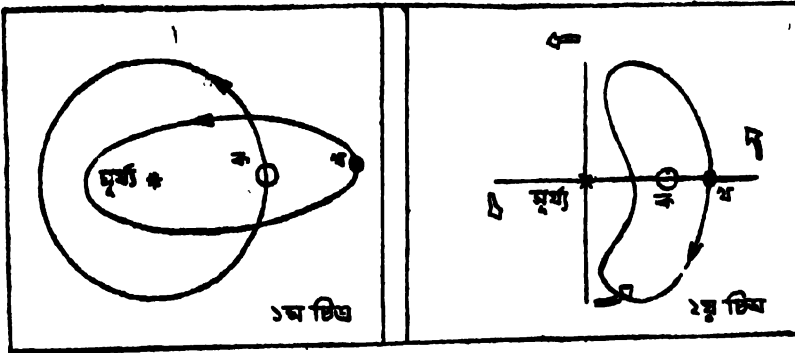
ভিৎস্তাকার নীহারিকার সম্ভাব্য কোন্ প্রদেশে এই ঘনীভবনের ক্রিয়া সম্ভব, তার বিশদ আলোচনা করেছেন।

ঘূর্ণায়মান এই আদিম চাকৃতির প্রাথমিক পর্যায়ে যে অবস্থায় বিরাজ করেছে, তাতে কেবলমাত্র একটি স্থির গতি সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। এই অবস্থায় যা ঘটা সম্ভব তা হলো, স্থির গতির একাধিক আবর্তে ভাঙন। এই আবর্তগুলি অবশ্য একটি মূল স্রোতে ভেসে থাকতে পারে। তের হার, ক্যুপার, চন্দ্রশেখর এবং ভিৎস্তাকার প্রমুখ আচার্যদের যৌথ গবেষণায় এই সব আবর্তের গতি এবং সূর্য থেকে এদের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত

যা পিছনে থাকছে (চিত্র ১ ও ২)। সহজ কথায়, এই কণার পরিভ্রমণ পথ হচ্ছে একটি আবদ্ধ হারের মত, যার হ্রস্ব অক্ষটি সর্বদাই সূর্যের দিকে ফেরানো। যে কণাটি পূর্বে আরো বড় উপবৃত্তাকার পথে চলছিল, তাকেও অনুরূপ কিন্তু আরো বৃহদাকার হারের মত পথ পরিভ্রমণ করতে হচ্ছে। এই রকম হারের মত পরিভ্রমণ পথের প্রত্যেকটিতেই কণাপ্রবাহ ঘটবে মহতী আবর্তনের বিপরীত দিকে এবং এরা প্রত্যেকে এক একটি আবর্তের সৃষ্টি করছে। এক একটি আবর্ত একটি নির্দিষ্ট সীমার নীচে যে কোন কৌণিক ভরবেগ-বিশিষ্ট কণা সংগ্রহ করতে পারে; তাই এদের আকারেরও একটি উচ্চ সীমা থাকা স্বাভাবিক। আবার ন্যূনতম শক্তির বিনিময়ে নিজেদের সংরক্ষণের দাবীতে এরা পরস্পর ছেদও করতে পরে না, কিন্তু একে অপরের মধ্যে অভিনিবিষ্ট থাকতে এদের কোন বাধা নেই। এখানে স্মরণ করা দরকার, আমরা এক নির্দিষ্ট ঘূর্ণনকাল-বিশিষ্ট কণা-ঝাঁকের আবর্ত-সৃষ্টির সম্ভাবনা চিন্তা করছি, সুতরাং এসব আবর্ত সূর্য থেকে একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের বৃত্তের উপর উপনিবিষ্ট থাকবে। গাণিতিক বিশ্লেষণ দেখিয়েছে, স্বল্পতম শক্তির বিনিময়ে এসব আবর্তের স্থায়িত্বের দাবীতে প্রত্যেকটি বৃত্তের উপর পাঁচটি করে আবর্ত থাকা দরকার, যাতে পাশাপাশি আবর্তগুলির মধ্যে গতির ধারাবাহিকতাটি বজায় থাকে। সৌর-নীহারিকাটির মধ্যে বিভিন্ন ঘূর্ণনকালের কণা-ঝাঁক থাকায় এই ধরণের বৃত্ত হবে একাধিক সংখ্যক। অধিকন্তু গাণিতিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে সূর্য অপেক্ষা এসব বৃত্তের সংস্থান হবে প্রায় তিতাস-বোদের নিয়মানুযায়ী।* আবর্তগুলি সীমিত সংখ্যক হতে বাধ্য—কেন না, সর্বকনিষ্ঠাকার আবর্ত,—যা আভিকর্ষিক স্থায়িত্বের দাবী রাখে—তার আকারই হবে সমগ্র নীহারিকাটির বেধের তুল্য। সুতরাং গণিত যেমন দেখিয়েছে, এসব আবর্তের সংখ্যা এমনিই হবে, যাতে অন্ততঃ এক ডজনের কাছাকাছি গ্রহ জন্ম নিতে পারে।

প্রতিবেশী যে কোন দুটি বৃত্তের আবর্তশ্রেণীর মধ্যাঞ্চলে রয়েছে অত্যন্ত উচ্চমানের গতিবিভব, প্রচুর সান্দ্রতাজাত পীড়ন এবং অপ্রধান প্রতিকূল স্রোত; সুতরাং পূর্বোক্ত ঘনীভবন আবর্তের ভিতরে অনুষ্ঠিত না হয়ে এই অঞ্চলে হবে। বলা বাহুল্য, এভাবে উদ্ভূত বৃহৎ খণ্ডগুলির আবর্তনের দিক মহতী আবর্তনের দিকে হতে বাধ্য।

অবিচ্ছিন্ন ধারায় এই ঘনীভবনের প্রক্রিয়াটি চলতে পারে তখনই, যখন বৃহদাকার খণ্ডের উপাদানগুলির 'বাষ্পীয় চাপ' গ্যাসীয় অংশের চাপের চেয়ে ছোট। কেন না, একমাত্র এই রকম অবস্থাতেই যতখানি বাষ্পীভূত হয়ে উবে যাচ্ছে, তার বেশী ঘনীভূত হতে পারে। কি ধরণের উপাদান সর্বাগ্রে ঘনীভূত হবে, তা এতদঞ্চলের সৌরতাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। দেখা গেছে তাপমাত্রা নীহারিকার মধ্যে এমন অবস্থান্তর সৃষ্টি করছে, যাতে নীহারিকার প্রান্তসীমায় অ্যামোনিয়া, জল, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কিন্তু কেন্দ্রাঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ভারী এবং দুর্লভ বস্তুগুলি জমতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এভাবে সৃষ্ট কেন্দ্রগুলি প্রতিবেশী আবর্তের বস্তুকণাকে আত্মসাৎ করে এবং সর্বশেষ পর্যায়ে বৃহদাকার বস্তুগুলি ছোট ছোট কণাগুলিকে আকৃষ্ট করে বড় হতে পারে। শেষোক্ত সুবিধাটি পাবে একমাত্র নীহারিকার প্রান্তে উদ্ভূত কেন্দ্রগুলি, যাদের চারপাশের হাল্কা বস্তুগুলির আধিক্য বেশী।

---

* তিতাস-বোদের নিয়ম (সূর্য থেকে গ্রহের) দূরত্ব $= ৪ + ৩ \times ২^{ন-১}$, ন শুক্রের ক্ষেত্রে ১, কিন্তু পৃথিবী, মঙ্গল ইত্যাদির ক্ষেত্রে ২, ৩ ইত্যাদি।

ভিৎস্তাকার প্রকল্পিত বিবর্তনের সৃষ্ট ছোট এবং বড় পিণ্ডগুলির রাসায়নিক গঠনে একটা স্বতোৎসারিত তারতম্য আশা করা যায়। সমগ্র সৌরজগতে বস্তুর তাত্ত্বিক বন্টনও দৃষ্ট তথ্যাবলীর সঙ্গে অনেকখানি সঙ্গতি রাখে। তবে বুধের যে ভর আশা করা হয়, আসলে বুধের ভর তার চেয়ে কম। ভিৎস্তাকারের আরো বিশ্বাস, বৃহস্পতি এবং বুধের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে গ্রহাণুপুঞ্জ বর্তমান, তা আসলে হয়তো কোন একটি গ্রহের ধ্বংসাবশেষ। এই অনুমান হয়তো খুব যুক্তিযুক্ত নয়—তার কারণ এই অঞ্চলে গ্রহাণুপুঞ্জের সম্মিলিত ভর যা দাঁড়ায়, তাতে একটা ছোটখাটো (পৃথিবীর এক হাজার ভাগও নয়!) গ্রহের সৃষ্টিও সম্ভব নয়। সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলির ধীর আবর্তনের জন্যে সূর্যের জোয়ারের প্রভাবকে দায়ী করা হয়েছে, অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে কৌণিক ভরবেগের যে অদ্ভুত বন্টন সাধিত হয়ে গেছে, তার ভূমিকাও এখানে অনস্বীকার্য। উপগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও একই বিবর্তনের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বলে তাঁর বিশ্বাস। তবে মঙ্গলের উপগ্রহ দুটি, পৃথিবীর চাঁদ এবং বহিঃগ্রহের বাইরের উপগ্রহগুলি পরে সংগৃহীত হয়েছে বলে এঁরা মনে করেন।

ভিৎস্তাকার মোটামুটি সৌরজগতের অধিকাংশ নিয়মানুবর্তিতাই ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। তবে বুধ থেকে ইউরেনাসের মধ্যবর্তী গ্রহগুলির দূরত্ব ছাড়া অন্যান্য দূরত্বগুলির ব্যাখ্যা করতে হলে আরো বেশী সংখ্যক আবর্তের অনুমান অপরিহার্য। ইউরেনাসের আবর্তনও স্বভাবতঃ একটু অসুবিধার সৃষ্টি করে। পুনশ্চ, দুটি প্রতিবেশী বৃত্তের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যে একাধিক ছোট ছোট বস্তুখণ্ডের আবির্ভাব ঘটছে, তাদের একীভবনের সমস্যাটির গ্রহণযোগ্য সমাধান উপস্থাপিত করা হয় নি। পিণ্ডীভবনের পর্যায়ে ঘনীভবন এবং সংসক্তির অবতারণার যুক্তিগুলিও জায়গায় জায়গায় কেমন যেন অসম্পূর্ণ।

ভিৎস্তাকারের মতবাদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে এইসব আবর্তগুলি। এই আবর্তগুলির সৃষ্টির সম্ভাবনার আরো নিখুঁত এবং সুসম্পূর্ণ পর্যালোচনার প্রয়োজন। আবর্তগুলির সৃষ্টির নজীর দর্শাতে গিয়ে ভিৎস্তাকার অন্যান্য নীহারিকার মধ্যস্থিত অস্থায়িত্বের উল্লেখ করেছেন। তা হয়তো মূল অস্থায়িত্বেরই অবশিষ্টাংশ। আবার নীহারিকার ঘনত্ব অকুস্থানীয় গতিগুলিকে বেগ মানিয়ে আদৌ ঘনীভবনের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সর্বোপরি সৌরজগতের নিয়মানুবর্তিতার খোঁজে ভিৎস্তাকারের এই ক্রমবিকাশবাদে আবর্তগুলির ধারণা অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। এই আবর্তের ধারণা বাতিল করে মতবাদটিকে দাঁড় করানো যায় কিনা, সে সম্পর্কে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত তের হার চিন্তা করেছেন। পরিবর্তে তাঁকে কলমোগরফ্ পন্থায় টারব্যুলেণ্ট গতি-সূত্রের প্রয়োগ করতে হয়েছে ভিৎস্তাকারের মতবাদের অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নতি সাধন করলেও কিন্তু তাঁরই সঙ্গে যেসব বিশ্লেষণী প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলেন, সেগুলি সন্দেহ-মুক্ত নয়।

প্রায় সমসাময়িক কালে অ্যাকাডেমিসিয়ান অটো স্মিথ এবং তাঁর গোষ্ঠী যে বিশ্বতত্ত্ব প্রচার করলেন, তাতে ধরা পড়লো, এই ধূলিগ্যাসের মেঘে কোন রকম আবর্তের প্রয়োজন ব্যতিরেকেই একটি সহজ এবং স্বাভাবিকতর ক্রমবিকাশ কল্পনা করা সম্ভব, যেখানে সৃষ্ট সৌরজগতে প্রয়োজনীয় নিয়মানুবর্তিতাগুলি আপনাআপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয়, স্মিথের মতবাদ সেই সনাতনী কাণ্টীয় বিশ্বতত্ত্বের মত ও চিন্তাধারাকে

বিজ্ঞানের সম্পূর্ণতার প্রলেপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলো।

এঁরা পরিষ্কার কতগুলি বক্তব্য রাখলেন; এতে বলা হলো সৌরজগৎ সৃষ্টির কাজ নক্ষত্রলোক তৈরির অনেক পরের ঘটনা, পূর্বগঠিত সূর্য তার আলো, তাপ এবং অভিকর্ষ দিয়ে সৌরলোক-সৃষ্টির পালা বেঁধেছে, শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে তার অস্তিত্বের কোন ভূমিকা নেই। এতে আরো বলা হলো, এই আদিম মেঘ অত্যন্ত বিরল গঠনের, সেখানে গ্রহসৃষ্টি ঘটেছে মুখ্যতঃ দুটি ধাপে। প্রথম ধাপে অপেক্ষাকৃত বড় বড় বস্তুখণ্ডের আবির্ভাব ঘটলো, যার পরের ধাপে প্রধান কাজ হলো এদের জমায়েত করে বড় করে তোলা। এসব কাজে প্রথমে ভৌত রাসায়নিক শক্তি এবং পরে ক্রমান্বয়ে অভিকর্ষ শক্তি ও যান্ত্রিক শক্তির তাপীয় শক্তিতে রূপান্তর প্রক্রিয়া কাজ করেছে।

ভিৎস্তাকারের মেঘে এসব অতিরিক্ত গুণাগুণ আরোপ করে সমষ্টিগণিতের ভিত্তিতে দেখা গেল, প্রথম পর্যায়ে অন্তঃস্থ অক্রম চলাচলের কণাগুলি পরস্পর স্থিতিস্থাপকতাবিহীন সংঘর্ষ ঘটিয়ে আপেক্ষিত গতিবেগকে কমিয়ে এনে মেঘকে চ্যাপ্টা এবং প্রাথমিক তল ঘেঁষে ঘন করে ফেলবে। এর ঘনত্ব এভাবে বাড়তে বাড়তে একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রান্ত হলেই মেঘের মধ্যে আভিকর্ষিক কারণে ধূমকেতুর আকারের বস্তুখণ্ডের আবির্ভাব ঘটবে। দ্বিতীয় ধাপে সংসক্তিই হবে এসব খণ্ডের সংযুক্তিকরণের প্রধান হাতিয়ার।

এই বিবর্তনকে স্বীকৃতি দিলে কক্ষপথগুলি কেন বৃত্তাকার হয়ে পড়েছে, তার কারণ সহজেই অনুমেয়। কেন না, বিভিন্ন উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণকারী কণাসমূহ পাস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে সমস্ত উপবৃত্তগুলির একটি গড় আপনা-আপনি তৈরি করে নিয়েছে—যে গড়ের প্রকাশ এসব বৃত্তাকার কক্ষপথে। এই বিবর্তনের মধ্যে মোট কৌণিক ভরবেগের দিক এবং পরিমাণ সংরক্ষণ নীতিগতভাবে বাধ্য থাকায় এই সব শিশু লাপ্লাস তলে এবং সৌর-ঘূর্ণনের দিকে আবর্তনশীল থাকতে বাধ্য।

স্মিথ প্রমুখ আচার্যেরা যে তাত্ত্বিক বিবর্তনের অবতারণা করলেন, তাতে সমষ্টিগণিতের সাহায্যে এই সব বস্তুখণ্ডের সূর্য থেকে দূরত্বগুলি সম্পর্কে একটি গাণিতিক নির্দেশ পাওয়া সম্ভব হলো। তিতাস-বোদের নিয়মটিকে এঁরা কোনদিনই একটি প্রাকৃত নিয়ম বলে স্বীকৃতি দেন নি। কেন না, দৃষ্ট তথ্যাবলীর সঙ্গে এর প্রভেদ অনেকাংশে। আশ্চর্যের বিষয় এই নতুন সম্পর্কটি বিশেষ বাস্তবানুগ।

এই বিশ্লেষণ আমাদের স্বতঃই যে আরেকটি সিদ্ধান্তে নীত করে, তাতে পৌঁছাতে পূর্ববর্তী প্রত্যেকটি মতবাদই এপর্যন্ত বিফল হয়েছিল; তাঁদের পক্ষে এমন কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি রাখা সম্ভব হয় নি, যাতে গ্রহ-উপগ্রহাদির অক্ষোপরি আবর্তনের হেতু নির্দেশ করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে যখনি বিভিন্ন চলমান বস্তুকণার সম্মেলনে গ্রহদের সৃষ্টি হচ্ছে, তখন এই সম্মেলন প্রক্রিয়ায় এইসব প্রাক-গ্রহ কণাগুলির সাথী কৌণিক ভরবেগ এবং শক্তির গড় নির্ণীত হয়েছে। কৌণিক ভরবেগের ক্ষেত্রে এই গড় যে ভাবে নির্ণীত হয়, শক্তির বেলায় প্রক্রিয়াটি একটু বিভিন্ন। ফলে উদ্ভূত কোন গ্রহের পক্ষে এমন কোন কক্ষপথ বেছে নেওয়া সম্ভব নয়, যেখানে সে তার সবটুকু কৌণিক ভরবেগ এবং শক্তি কক্ষপথে চলতে গিয়ে নিঃশেষে খরচ করে ফেলে; সব সময়েই তার সঞ্চয়ে কৌণিক ভরবেগের হয় কম্‌তি, না হয় বাড়্‌তি পড়ে যাচ্ছে। এই বাড়্‌তিটুকুর তাগিদেই নিজের মেরুদণ্ডের উপরে পাক খাওয়া ছাড়া তার অন্য কোন গতি থাকে না। বোঝবার পক্ষে বোধ হয় এই কথাটাই বেশী সুবিধার—

যে কণাগুলি জড়ো হয়ে একটি গ্রহ সৃষ্টি করছে তাদের কৌণিক ভরবেগ, যেটি শুধুমাত্র তাদের কক্ষপথের চলাচলে জমানো, সেটির সবটুকুরই পুনঃপ্রকাশ ঘটা উচিত সৃষ্ট গ্রহটির সৌর-পরিক্রমায়—তা না হয়ে তার মোট শক্তি কণাগুলির শক্তি থেকে আলাদা হয়ে পড়ছে। এই যে তফাৎ, এই তফাৎ ঘটবার মধ্যে ছোট ছোট কণাগুলির বৃহৎ খণ্ডের গায়ে আছড়ে পড়বার কালে যান্ত্রিক শক্তির তাপীয় শক্তিতে রূপান্তরের অনেকখানি হাত আছে। যখনি এর পরিমাণ অত্যন্ত উচ্চমানের, যা গ্রহ সৃষ্টির কালে মোটেই অবাস্তব নয়—সৃষ্ট গ্রহের অক্ষোপরি আবর্তনে এর পরিণতি অনিবার্য।

এখন অন্যত্র উপগ্রহ সৃষ্টির অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। যে সমস্ত গ্রহকেন্দ্রীন ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে, তাদের আশেপাশের কণাসজ্বের যে সব কণা ঘাতে-সংঘাতে নিজেদের গতির অনেকখানি বিকিয়ে ফেলেছে, তাদের ভাগ্যে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গ্রহকেন্দ্রীনের চারপাশে ঘোরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। গ্রহগুলির চারপাশে এসব কণাঝাঁকের মধ্যে গ্রহসৃষ্টিকারী বিবর্তনের অনুরূপ ঘটনাই উপগ্রহগুলির জন্যে দায়ী, গ্যাসের চাকতির যে অংশ মোটা, সেখানে উপগ্রহের আধিক্যও হবে বেশী। বলা বাহুল্য, এই অংশ বৃহস্পতির কাছাকাছি অঞ্চল নির্দেশ করে। শনির চারপাশে এই ধরণের বিবর্তনে বাদ সেধেছে শনি নিজেই, ফলে ওটার চারপাশে কণাঝাঁকে অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নি, ওটা আজও বেষ্টনীই রয়ে গেছে।

লক্ষ্যের বিষয়, এই বিশ্লেষণে গ্রহগুলি প্রধানতঃ সৌর আলো এবং তাপের প্রভাবে দুটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অস্বচ্ছ পিণ্ডাকার এই আদিম মেঘের—যার নিরক্ষপ্রদেশ স্ফীত এবং মেরুপ্রদেশ চাপা—তার ঘন অস্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে সৌর-আলোর বেশীদূর যাবার পথ বন্ধ; তাই সূর্য থেকে একটি দূরত্বের পর থেকেই মেঘের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক রকমের নেমে গিয়েছে। তাহলে সৌরনীহারিকাটিকে ভৌত গঠনের দিক থেকে এভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়তে হচ্ছে।

এখন স্মিথের সৌরজগতে যে মৌলগুলির প্রাচুর্য অপেক্ষাকৃত বেশী, সেগুলি হলো হাইড্রোজেন (৯০%), হিলিয়াম (৯%), কার্বন ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন, সিলিকার প্রাচুর্য যৎসামান্য। বিবর্তনের ফলস্বরূপ যে রাসায়নিক যৌগিকগুলির সৃষ্টির সম্ভাবনা সর্বাধিক, সেগুলি হলো মিথেন, অ্যামোনিয়া, বরফ এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড। মেঘের সর্বত্রই এই রাসায়নিকগুলি তৈরি হবার অনুকূলে, কিন্তু সূর্যের কাছাকাছি রাজত্বটিতে বাষ্পীভবন এবং ঘনীভবন দুটি জিনিষের উপর নির্ভরশীল। সেগুলি সূর্য থেকে পাওয়া তাপ এবং পারিপার্শ্বিক দেশের স্বচ্ছতা। এই রাজ্যটিতে এই দুটি জিনিষই এমন অবস্থান্তরের সৃষ্টি করেছিল, যাতে সহজ উদ্বায়ী পদার্থগুলি সেখানে জমতে না পেরে খোঁচা খেয়ে বাইরের ঠাণ্ডা অঞ্চলে চলে গিয়েছে। সুতরাং ভিতরকার প্রদেশে যে অত্যুচ্চ গলনাঙ্কের পদার্থগুলি, যেমন—পাষাণ, ধাতু ইত্যাদি রইলো, উত্তরকালে এরাই একীভূত হয়ে উচ্চঘনাঙ্কের অন্তর্বর্তী গ্রহগুলির জন্ম দিল। এদের আকার খুব বড় না হবার কারণ, ধাতু এবং পাষাণজাতীয় পদার্থগুলির স্বল্পতম প্রাচুর্য।

অপর দিকে বাইরের শীতমণ্ডলে অবস্থার আনুকূল্যে যে সব রাসায়নিকগুলি এমনিতেই জমে গেছে, ভিতরকার রাজ্য থেকে যাওয়া সহজ উদ্বায়ী বস্তুগুলি এসব কেন্দ্রকের উপর জমে অল্প ঘনাঙ্কের কিন্তু বৃহদাকার বহির্গ্রহগুলির সৃষ্টি করলো।

এখানে আরেকটি জিনিষ লক্ষ্য করবার রয়েছে। অন্তর্বর্তী প্রদেশের বস্তুকণাগুলি যতই বড় হয়েছে, চারপাশের দেশের স্বচ্ছত্ব গেছে বেড়ে, সূর্যালোক ততই পূর্বাপেক্ষা ভালভাবে বাইরের রাজ্যটিতে পড়তে পাচ্ছে। স্বভাবতঃই বাইরের রাজ্যটির অন্তর্বর্তী সীমানা ততই সূর্য থেকে পিছু হটে হটে ভিতরের রাজ্যের দেশকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

গ্রহ ছাড়াও আমাদের সৌরলোকে আরো অন্যান্য সদস্য বর্তমান। এরা হলো গ্রহাণুপুঞ্জ, উল্কা এবং ধূমকেতু। সাম্প্রতিক অতীতকাল অবধিও বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ধূমকেতুকে সৌরলোক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটা বিশেষ কিছু বলে মনে করা হতো এবং স্বভাবতঃই জ্যোতির্বেত্তাগণ এদের উৎপত্তির অন্য উৎস নির্দেশ করতেন। কান্টের বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি তুলে স্মিথ প্রবল অভিঘাতে সনাতনী জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই ভ্রান্ত ধারণার পরিসমাপ্তি ঘটালেন। তাঁর মতবাদে বলা হলো, এরা সেই আদিম নীহারিকার উপান্ত প্রদেশের না-বাড়তে-পারা কেন্দ্রক, অপর পক্ষে গ্রহাণুপুঞ্জ হলো অপান্ত প্রদেশের না-বাড়া কেন্দ্রক। উল্কা এদেরই আরো ক্ষুদ্র সংস্করণ।

অপান্ত প্রদেশে গঠনমূলক কিছু বৈশিষ্ট্য, বৃহস্পতির প্রভাব এবং সৌরতাপ বৈশিষ্ট্য—এই কয়টি কারণ কিছু কণার একত্রীভূত হবার প্রতিকূলে থাকায় এরা তেমনিই থেকে গেছে, ভিতরের রাজ্যে স্বচ্ছতা বাড়বার ফলে পরে এদের মধ্যস্থিত উদ্বায়ী উপাদানগুলি উবে গেছে, ফলে এরা হয়ে পড়েছে বিশুদ্ধ প্রস্তর গঠিত। এরাই আমাদের গ্রহাণুপুঞ্জ এবং উল্কার দল।

অন্য দিকে বাইরের শীতাঞ্চলে বিবর্তন-কালে যে কণাগুলি শুধু স্থিতিস্থাপকতাবিহীন সংঘর্ষ ঘটিয়েছে তাই নয়, এমন অনেক বস্তুও সেখানে থাকতে পারে যারা পারস্পরিক আকর্ষণ কিন্তু গতিদিক বিভিন্নতার ফলে থাকার পরিবর্তে গতিপথ পরিবর্তন করেছে মাত্র। এরই ফলে এদের কারো কারো গতিপথ অত্যুচ্চ উৎকেন্দ্রিক বৃত্তাভাসে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এতে সৌরলোকের মাধ্যমিক তলের সঙ্গে নানান নতি সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে ধূমকেতুগুলির স্বভাবতঃই স্থায়িত্বও দীর্ঘ। ধূমকেতুগুলির জীবনে প্রদক্ষিণ পথে এরকম অপঘাত ঘটেছে বহু বহুবার—ঘটেছে বিভিন্ন কারণে। ধরা যাক, বৃহস্পতির ধার ঘেঁষে যদি কোন ধূমকেতু চলে যায়, তাহলে গতিপথের উৎকেন্দ্রিকতা ভীষণভাবে পরিবর্তনসাপেক্ষ—এমন কি, উপবৃত্তাকার গতিপথের অধিবৃত্তে রূপান্তরও অসম্ভব নয়। এসব ধূমকেতু চিরকালের জন্যে সৌরজগতের বন্ধনমুক্ত হয়ে পড়ে। আবার যারা সৌরজগতের সীমানা ঘেঁষে যাওয়ার সময়ে অন্যান্য নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে গিয়ে পড়বে, তাদের গতিপথ বদ্‌লানোও স্বাভাবিক। পুনশ্চ, সূর্যের কাছ দিয়ে যাবার সময়েও যখন মধ্যেকার গ্যাস সজোরে উবে যায় (যার জন্যে ধূমকেতুর লেজ দেখতে পাওয়া যায়), তখনও এই পরিবর্তন ঘটতে পারে।

সৌরজগতে যে সব ধূলিকণা এখনো বর্তমান, যার জন্যে সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে এবং সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম আকাশে একটা হেলানো আলোর ঝাঁটা দেখতে পাওয়া যায় (জোডিয়াক্যাল লাইট), —সে সব ধূলিকণা স্মিথ প্রমুখ জ্যোতির্বেত্তাগণের মতে দুটি কারণে বর্তমান। প্রথমতঃ তাদের মধ্যে খুব নগণ্য একটি অংশ সেই আদিম মেঘের অবশিষ্ট, দ্বিতীয়তঃ তারা ক্রমাগত বিভিন্ন কারণে নানান কণাখণ্ডের ভাঙনে সৃষ্ট। প্রথম প্রথম যে ধূমকেতুগুলি অদূর কালে অপেক্ষাকৃত বাইরের সমস্ত গ্যাসটাই হারিয়ে ফেলেছে সূর্যের দাপটে, পরে তাদের হাল হয়েছে আরো শোচনীয়। কেন না, পরবর্তী অদূর কালে এদের পাষাণ আবরণের ভিতরের গ্যাসটুকুও বের হয়ে এসেছে, ফলে পাষাণের আস্তরণ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে

পড়েছে। এভাবে অসংখ্য রকমে সৌরলোকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণার নিরন্তর আবির্ভাব ঘটছে। সূর্যের কাছাকাছি অঞ্চলে অবশ্য কণাগুলি প্রায় সম্পূর্ণ অংশটুকুই পয়েন্টিং-রবার্টসন প্রক্রিয়ায় * আত্মসাৎ করে ফেলেছে। এদেরই কিছু কিছু আজও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভিতরে নিরন্তর ঢুকে পড়ছে বেপরোয়ার মত। এরাই উল্কার দল হিসাবে আমাদের দৃষ্টিতে ধরা দেয়।

মনে হয়, সৌরজগতে ঘূর্ণিবেগের আশ্চর্য ভাগবাটোয়ারার চাবিকাঠিটি যেন প্রাক-গ্রহসৃষ্টি-মেঘের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে বাঁধা। পূর্ববর্তী আলোচনার যে মতবাদগুলিতে এই আদিম মেঘ কোন সৌর বা নাক্ষত্র উপাদানে গঠিত বলে অনুমান করা হয়েছিল, আমরা দেখেছি কৌণিক ভরবেগের হিসাব সেখানে সঠিক দেওয়া সম্ভব হয় নি। আবার বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত মতবাদগুলির প্রথম দুই পর্যায়ের (কান্ট-লাপ্লাস এবং ভিৎস্যাকার) ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। এদের প্রত্যেকটি মতবাদেই একটি বিশেষ সাধারণ ভুল ঘটেছে। এই হিসাবে সূর্যসহ গ্রহজগৎকে ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য জিনিষ থেকে 'সম্পূর্ণ পৃথক একটা কিছু' বলে ধরে নেওয়া চলে না। একথা আজ সবাই জানেন যে, সূর্য আমাদের নীহারিকালোকের একটি নক্ষত্র, যা তার পারিপার্শ্বিক ভাস্তঃপ্রদেশের উপাদান, অন্যান্য নক্ষত্র এবং নীহারিকার কেন্দ্র করে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। এর অন্তর্বর্তী গুরুত্ব অনেকখানি।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে লিণ্ডব্লাড ভাস্তঃপ্রদেশীয় উপাদানের মধ্যে অণুগুলির পরস্পর সংযুতির মাধ্যমে বস্তুকণার আবির্ভাবের আবিষ্কারের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ভাস্তঃপ্রদেশীয় উপাদান থেকে সৌরলোকের গ্রহাদি সৃষ্টির সম্ভাবনা সম্পর্কে স্মিথের গবেষণার সূত্রপাত সেখানেই। সুতরাং সূর্যের স্থান যখন নীহারিকার ভিতরে, যেখানে এই ভাস্তঃপ্রাদেশিক উপাদান রয়েছে অপর্যাপ্ত পরিমাণে—তখন সূর্যের পক্ষে কিছু ভাস্তঃপ্রদেশীয় উপাদান সংগ্রহ করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাহলে সূর্য নীহারিকার একটি পরিণত তারা, ভাস্তঃপ্রদেশীয় উপাদানও তার একটি অংশ। নীহারিকার মধ্যে এদের দুজনেরই কিছু কিছু ঘূর্ণিবেগ আছে, কিন্তু একে অপরের এই বিষয়ে যে বিশেষ কোন সম্বন্ধের ধার ধারে, তা নয়। সূর্য এই উপাদান সংগ্রহ করেছে, যার মধ্যে গড়ে উঠেছে সৌরলোক, সূর্যের সঙ্গে যদি জন্মসূত্রে গ্রহগুলির কোন সম্পর্ক থেকে থাকে, তাহলে তা এই পর্যন্তই, এর বেশী কিছু নয়। বলা বাহুল্য, এর ভিত্তিতে গাণিতিক বিশ্লেষণ কৌণিক ভরবেগের সমস্যাটির পরিসমাপ্তি ঘটালো। স্মিথ দেখালেন, তত্ত্বের সঙ্গে তথ্যের আর কোন বিরোধ নেই।

সৌরলোক সৃষ্টির ব্যাপারে এখনো বিতর্কের শেষ হয় নি। স্মিথের যে মত এখানে প্রকাশ করা হলো, তা বিজ্ঞানীমহলে এখনো সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত নয়। একথাও সেই সঙ্গে প্রযুক্ত হবার যোগ্য যে, ন্যূনতম অনুমানের ভিত্তিতে প্রাকৃত নিয়মগুলির প্রয়োগে এবং গণিতের সর্বস্বীকৃত বিশ্লেষণে যে তাত্ত্বিক সৌরজগৎ স্মিথ উপস্থাপিত করেছেন, বাস্তব জগতের সঙ্গে তার সঙ্গতি অন্যান্য যে কোন মতবাদ অপেক্ষা বহুলতর। তবে মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তির ঊর্ধ্বে প্রকৃতি সব সময়েই একটা অভাবনীয় সহজতম প্রক্রিয়ায় তার সংসার সাজায়, এখানেও হয়তো তার কোন ব্যতিক্রম

---

* সূর্যের কাছ দিয়ে যাবার সময়ে আলোর অপেরণের জন্যে আলোক-প্রচাপ কণাটির সঙ্গে সঙ্গে না গিয়ে একটুখানি এগিয়ে পড়ে যায়। ফলে কণাটির চলার বেগ এবং ঘূর্ণিবেগ কমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এরা সর্পিল পথে সূর্যের উপরে গিয়ে পড়ে।

নেই—সেই সহজতম প্রক্রিয়াটি কি, তা নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এখনো আলোড়ন চলছে। ব্রহ্মাণ্ডে সৌরজগতের আবির্ভাবের কে কতখানি স্বাভাবিক, সহজতম পথ বেঁধে দিতে পারে, এ যেন তারই জোর প্রতিযোগিতা। বিশ্ববিবর্তনের সুদূরতম অতীতে ঘটনার সাক্ষ্য এঁটে মহাবিশ্বে এখনো এমন 'ক্লু'ও রয়ে গেছে, যার ব্যবহারিক বিশ্লেষণে বিবর্তন-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক মতবিরোধের অবসান হয়তো ঘটানো সম্ভব, কিন্তু গ্রহলোক সৃষ্টির কাজে প্রকৃতি যেন দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তার কাজে নেমেছে, গ্রহসৃষ্টি সংক্রান্ত মতবিরোধের ব্যবহারিক মীমাংসা তাই আজও অসম্ভব। দু-একটা সামান্য ক্লু আর তার তাত্ত্বিক জ্ঞানাজ্ঞান সম্বল করে গ্রহ-বিজ্ঞানী চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছেন।

আশ্বাসের কথা, সম্প্রতি তের হার, ক্যুপার, এডগ্যআর্থ, হয়েল এবং গোল্ড যে সমস্ত গ্রহতত্ত্ব রচনা করেছেন, তাতে ক্রমান্বয়ে যে সত্য প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, তা স্মিথের মতবাদের অনুকূলে। এঁদের মুখ্য বক্তব্যগুলি এবং অতি সাম্প্রতিক ভূতাত্ত্বিক তথ্যের বিশ্লেষণের ফলাফলগুলির সমীক্ষার সিদ্ধান্তটি গুটেনবার্গের কথার প্রতিধ্বনিতে বলা যায়—পৃথিবী কোন দিনই কোন গলিত অবস্থায় ছিল না; বারান্তরে, যে কথা নিত্য প্রমাণ হচ্ছে তা এই যে, পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে ঠাণ্ডা পদার্থকণার ক্রমিক সংযোজন এবং উপলেপের ফলে। এতে ভূকেন্দ্রে যে অসম্ভব তাপের অস্তিত্ব—তাকেও আমরা অস্বীকার করছি না; তার সৃষ্টি পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে, তার উৎস কেন্দ্রের উপর বাইরের প্রবল চাপ এবং তেজস্ক্রিয় বস্তুর স্বতঃ-বিস্ফোরণে। বলা বাহুল্য, এই সব মতবাদ আদিম বস্তুর পূর্ববর্তী অথবা পরবর্তী ইতিহাস নিরপেক্ষ-ভাবে এই সাধারণ কথাটি বলছে। অধিকন্তু গুটেনবার্গের এই যে উক্তি, এটা কোন একটি মতবাদের অনুকূলে—সে কথা বলি না, কিন্তু ক্রম-বিকাশবাদের মুখ্য বক্তব্যের ভিত্তি দিনের পর দিন এতে শক্ত হয়ে পড়ছে, সেটাই উল্লেখ্য।

*　　*　　*　　*

এই আবিষ্কার আরো একটি অভিনব সম্ভাবনার কথা বলে। যখন সৌরলোকের আবির্ভাব নিতান্তই বিশ্বজগতের কোন একটি আকস্মিক ঘটনা থেকে হয় নি—তখন, নীহারিকার মধ্যেই আমাদের মত শত সহস্র সৌরলোকের অস্তিত্ব থাকা এমন কিছু বিচিত্র নয়—বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে যাদের সংখ্যা গিয়ে ঠেকবে কয়েক লক্ষ কোটিতে। আশ্চর্য, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে জ্যোতির্বিদ স্ট্রাণ্ড ৬১ বলাকামণ্ডলে এমন দুটি যুগ্ম তারার হদিশ পেলেন, যাদের গতির হিসাবে আর পর্যবেক্ষণে বেশ গড়মিল। যদি তাদের কাছাকাছি সৌরভরের ১/৬০ ভাগ ভরের কোন গ্রহ থেকে থাকে, তবেই এই অসঙ্গতির মীমাংসা হয়। এমনি ধারা আরো একটি গ্রহ ৭০ ওফায়াক্স মণ্ডলের একটি যুগ্মতারার কাছাকাছি অনুমান করতে হয়েছে। অতএব ?

মহাবিশ্বে সৌরলোকের নিঃসঙ্গতা কাটবার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য কারণে যে আরেকটি প্রশ্ন এরই সঙ্গে উঠছে—তা হলো ব্রহ্মাণ্ডে অন্যত্র প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে। জগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর বার্তাবহ যে জীবকোষের কণা সুদূর অতীতে একদিন দৃষ্টির অগোচরে পৃথিবীতে বাসা বেঁধে তার গুপ্ত মহিমার ইতিহাস খুলে ধরছে ক্রমে

ক্রমে, তার অস্তিত্ব কি সর্বপ্রাচীন তারাঃপ্রদেশীয় উপাদানে ছিল না—সে জীবনকোষ কি বিশ্বের অন্যত্র এমনিভাবে অপরূপ শিল্পকলা গড়ে তোলে নি?

এ এক চিরন্তন প্রশ্ন—সর্বকালে, সর্বস্তরে যা নিয়ে মানবীয় চিন্তার বিরাম নেই। আজ যখন জীববিজ্ঞানী ব্রহ্মাণ্ডে অন্যত্র প্রাণের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন, ঠিক সেই সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে তখন চিরন্তর জীবলোকের বহুতার ইসারা আসছে। জীববিজ্ঞানীর পক্ষে এটাই হয়তো চরম আত্মপ্রসাদের কারণ হতো 'If, amid the tumult of the elements and the dreams of nature, (he) is always elevated to a height from whence (he) can see the devastations which their own perishableness brings upon the things of the world as they thunder past beneath (his) feet.' (Kritik der reinen vernunnft : Kant এ প্রসঙ্গের ঈষৎ পরিবর্তন করে)। কিন্তু জীববিদ্‌কে তাঁর মত বদ্‌লাতে হবেই। এক জড় জগতের পটভূমিকার পরিবর্তে অগণিত জীবলোকের ভীড়েই যেন পৃথিবীর প্রাণকে যথাযথ নম্র স্থান খুঁজে নিতে হবে—জ্যোতির্বিজ্ঞান যেন সেই কথাই বলবে।

সঞ্চয়ন

ফসলের শত্রু ইঁদুর

স্মরণাতীত কাল থেকে নানান জাতের ইঁদুর মানুষের অনাহুত সাথী। ইঁদুর মানুষকে তার বাসস্থান এবং কর্মক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলেছে। ভাগবত পুরাণে ইঁদুর দেখামাত্র বাসস্থান পরিত্যাগ করবার সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। হয়তো প্রাচীনকালেও ইঁদুরের দ্বারা বাহিত প্লেগের দরুণই এই সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছিল।

একটা হিসাব থেকে জানা যায় যে, ভারতে প্রতি বছর প্রায় ২৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ইঁদুরে খেয়ে ফেলে। কারো মতে—আমরা বিদেশ থেকে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করে থাকি, প্রায় ততটাই ইঁদুরে খেয়ে ফেলে। শতকরা ২২ ভাগ খাদ্যই ইঁদুরেরা খায় এবং নষ্ট করে, মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কারিগরী গবেষণা সংস্থার এই তথ্য সন্দেহজনক মনে হওয়ায় অধুনা খাদ্যমন্ত্রকের তদারকে একটি নিরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, ইঁদুরের দ্বারা মোট উৎপাদনের শতকরা ৬-৭ ভাগ খাদ্যশস্যের ক্ষতি হয়ে থাকে। একটা কথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে যে, ইঁদুর যতটা খায় তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অপচয় করে এবং প্রচুর পরিমাণ খাদ্য সংক্রামিত করে।

এরা যে কেবল খাদ্যশস্যেরই ক্ষতি করে—তাই নয়, ফল, সব্জি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, ছোট চারা এবং

ফসলের গোড়া খুঁড়ে তাদের ক্ষতি করে। ফলন্ত নারকেল গাছের কচি ডাব ফুটা করায় সেগুলি ঝরে পড়ে এবং ফলন ব্যাহত হয়। আল এবং সেচের জলের নালিতে গর্ত খোঁড়ায় সেচের জলের অত্যন্ত অপচয় হয়। আলের ইঁদুরের গর্তে অনেক সময় যে সব বিষধর সাপ আশ্রয় নেয়, তাদের আক্রমণে অনেক ক্ষেত্রেই জীবনহানি হয়ে থাকে। বাড়ী-ঘরের ভিৎ খুঁড়ে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, কাঠের মেঝে বা দেয়াল ফুটা করে তাকে কুৎসিত করে তোলে। ঘরে রাখা মূল্যবান কাপড়চোপড়, বই এবং আসবাবপত্র সুযোগ পাওয়া মাত্রই কেটে ব্যবহারের অনুপযোগী করে দেয়। সবচেয়ে মারাত্মক রোগ প্লেগের জীবাণুবাহী উনি পোকা ইঁদুরের গায়েই পুষ্টিলাভ করে। অনেক সময় ঘুমের ঘোরে ইঁদুরের কামড়ে অনেককে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, ইঁদুরের কামড়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে বিষধর সাপের দংশনজনিত ক্ষতচিহ্নের মিল থাকায় গুরুতর বিহ্বলতার সৃষ্টি হয়।

বহু প্রকারের ইঁদুর দেখা যায় এবং তার মধ্যে আমরা ধেড়ে, নেংটি, গেছো ইঁদুর, ছুঁচো ইত্যাদি সবাইকে এক কথায় ইঁদুর বলে থাকি। এদের মুখের সামনে বাটালীর মত ধারালো দাঁত আছে। এই দাঁত দিয়েই তারা খাদ্যদ্রব্য এবং জিনিষপত্র কাটবার কাজ করে। ইঁদুর সাধারণতঃ আড়াল পছন্দ করে এবং গর্ত, ছাইগাদা, ভূগর্ভস্থ নর্দমা, সকল প্রকারের বাড়ী, কাঠের ঘরের মেঝে এবং ডবল দেয়ালের ফাঁকা জায়গায় বাস করে। ৭-১০½ সে. মিটার নেংটি ইঁদুর থেকে বিরাটাকার মেঠো ইঁদুর—যাদের লেজ বাদে শরীরের দৈর্ঘ্য ১৭½-২৪½ সে. মি. এবং ভূগর্ভস্থ নর্দমার ইঁদুর—যাদের লেজ বাদে শরীরের দৈর্ঘ্য ২৪½-২৮ সে. মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। শরীরের অনুপাতে এরা অনেক বেশী লাফাতে পারে। শরীরের তুলনায় অনেক ছোট পথ গলে এরা অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারে। ইঁদুরের চোখের দৃষ্টি বেশ ক্ষীণ, কিন্তু গন্ধ, স্বাদ, শব্দ এবং স্পর্শের ইন্দ্রিয়গুলি তীব্র অনুভূতিশীল। ইঁদুরের সবচেয়ে বড় ক্ষতিকারক ক্ষমতা হচ্ছে এই যে, এরা বছরে ৪-৮ বার সন্তান প্রসব করে এবং প্রতিবারই গড়পড়তায় ৮টি বাচ্চার জন্ম দেয়, অর্থাৎ ১ জোড়া ইঁদুর থেকে বছরে ১২৫০টি ইঁদুরের সৃষ্টি হতে পারে। একটা হিসেব থেকে দেখা গেছে যে, বর্তমানে ভারতে প্রায় ২৪০ কোটি ইঁদুর আছে। বর্তমানে জনসংখ্যার সঙ্গে যার অনুপাত হচ্ছে জনপ্রতি ৬টি ইঁদুর। সাধারণতঃ ইঁদুর দিনে ঘুমায় এবং রাতে তাহার অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়। এরা অত্যন্ত ধূর্ত, সন্দেহপ্রবণ এবং সুনির্দিষ্ট খাদ্যের প্রতি অনুরক্ত। কাজেই ইঁদুর দমন করতে হলে তাদের অভ্যাস, প্রতিক্রিয়া এবং খাদ্যের প্রতি পক্ষপাতিত্বের বিষয় জানতে হবে, যাতে তাদের উপযুক্ত টোপ নির্ধারণ করা যায় এবং যথাযথ স্থানে ফাঁদ পাতা যায়।

বিভিন্ন ইঁদুরের স্বভাব এবং জীবনযাত্রা প্রণালী বিভিন্ন। যেমন—ছুঁচোর গর্তের সামনে সব সময়েই গর্ত থেকে বের করা তাজা মাটির গুঁড়া দেখা যাবে। এরা বাগান, ঘাসে ঢাকা মাঠ, গোচারণ ভূমি এবং কোন কোন সময় পতিত জমিতে আস্তানা গাড়ে এবং সাধারণতঃ একাকী বাস করে। স্ত্রী ও পুরুষ মেঠো ইঁদুর বেড়া, ঝোপের নীচ অথবা জমির আলে ভিন্ন ভিন্ন গর্তে বাস করে। সহরের নর্দমার ইঁদুর বেশ সবল এবং বৃহদাকারের হয়ে থাকে। বিড়ালও অনেক সময় তাদের দেখে ভয় পায়।

আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই বিড়ালের আদর ইঁদুর মারবার জন্যে। কিন্তু ডিপথেরিয়ার সঙ্গে বিড়ালের যোগাযোগ থাকবার দরুণ বর্তমান যুগে বিড়ালের আদর কমে গেছে। অনেক

সময় ইঁদুর মারবার জন্যে বেজী পুষতেও দেখা যায়, তবে বেজী যৌবনপ্রাপ্ত হলে আর সাধারণতঃ বাড়ীতে থাকতে চায় না। গ্রামাঞ্চলে আরও বেশী করে বিড়াল বা বেজী পোষা উচিত। সাধারণতঃ ফাঁদ পেতে অথবা নানারকম বাক্স বা জাঁতিকলে ইঁদুর ধরে মারা হয়। এছাড়া বিষাক্ত গ্যাস ও গুঁড়া অথবা বিষের টোপও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। ফাঁদ সাধারণতঃ বাড়ী-ঘরেই পাতা হয়, কারণ মাঠে পাতলে অন্যান্য গৃহপালিত জীবজন্তুরও ফাঁদে পড়বার ভয় থাকে। মাঠে ইঁদুর দমনের জন্যে বিষের টোপই সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নারকেল গাছে ইঁদুরের আক্রমণে এই সব ছাড়াও গাছের গোড়ার দিক থেকে ৫-৬ হাত উপরে টিন দিয়ে ঢালু করে টোপরের মত চারদিক ঘিরে দিলে এই বাধার জন্যে ইঁদুর আর গাছের উপরে উঠতে পারে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, খাদ্যের ব্যাপারে ইঁদুরের পক্ষপাতিত্ব আছে। ফাঁদ বা অন্যান্য সূত্রের মারফৎ কোন্ অঞ্চলের ইঁদুর কোন্ জাতীয় খাবার বেশী পছন্দ করবে, সেটা আন্দাজ করে সেই খাবারের সঙ্গেই বিষ মেশাতে হবে। সাধারণতঃ প্রথম সপ্তাহে বিষহীন টোপ ব্যবহার করে দ্বিতীয় সপ্তাহে বিষমাখানো টোপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বছরে দুবার ইঁদুর মারবার অভিযান চালানো যেতে পারে। তবে বিভিন্ন অভিযানে অবস্থা অনুযায়ী টোপের উপাদান বিভিন্ন হওয়া উচিত।

যে সব বিষ ইঁদুর মারবার জন্যে ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে গাঢ় ধূসর বর্ণের জিঙ্ক ফস্ফাইড প্রধান এবং এরই ব্যবহার ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। ফস্ফরাসের হাল্কা গন্ধওয়ালা এই গুঁড়া সকল প্রকার প্রাণীর পক্ষেই একটি মারাত্মক বিষ, কাজেই এর ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করা উচিত। এছাড়াও ষ্ট্রিকনিন, ডারফারিন ইত্যাদিও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ষ্ট্রিকনিন হাইড্রোক্লোরাইডও একটি মারাত্মক বিষ। মাঠে ব্যবহারের জন্যে সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম সায়ানাইডের গুঁড়া গর্তে প্রয়োগ করলে জলীয় পদার্থের সংযোগে মারাত্মক গ্যাসে পরিণত হয়, যার ফলে ইঁদুর মারা পড়ে।

জিঙ্ক ফস্ফাইড সাধারণতঃ ৯৭ ভাগ টোপের সঙ্গে তিন ভাগ মেশাতে হয়। অনেক সময় দুই ভাগ মিশিয়েও ভাল ফল পাওয়া গেছে। মোটা অথবা পেষাই-করা ভুট্টা, বাজ্রা, ছোলা, গম এবং অন্যান্য শস্যের দানা টোপের জন্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দানা ব্যবহার করলে তাকে কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে সামান্য পরিমাণ উদ্ভিজ্জ তেল মিশিয়ে লম্বা হাতলওয়ালা চামচে দিয়ে বিষ মেশাতে হবে। পেষাই-করা দানার সঙ্গে বিষ মেশাবার পর জল দিয়ে ভিজিয়ে ছোট মটর দানার মত গুলি পাকিয়ে দিতে হয়। এই সব কাজে রবার অথবা চামড়ার দস্তানা ব্যবহার করা উচিত। একজন অভিজ্ঞ চাষীর মতে ২ হেক্টার পরিমাণ জমির উপযোগী উপাদেয় টোপ তৈরি করতে আটা ১ কিলো, বেসন ১ কিলো, চিনি ½ কিলো এবং ৩০ গ্র্যামের মত নুনের প্রয়োজন। আরও উপাদেয় করবার জন্যে এর সঙ্গে একটা লেবুর রস অথবা পেঁয়াজ বা আদা, রসুন কুঁচিয়ে দেওয়া যায়। বিষের টোপ সব সময়ই ফাঁক-ফোকরের বেশ খানিকটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে কিছু আবর্জনা দিয়ে গর্তের মুখ মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিতে হয়। অনেক সময় পাম্পের সাহায্যেও এই কাজ করা হয়। গুঁড়া গর্তে দেবার পর কাদা অথবা ভিজা মাটি দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করা হয়। বিষের টোপ সব সময়েই বিকেল বেলায় প্রয়োগ করা উচিত।

এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

১। বিষ বায়ুবদ্ধ টিনে পরিষ্কারভাবে লেবেল লাগিয়ে নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে। বিষের ধোঁয়া নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত নয়।

২। বিষের টোপ গর্তের বেশ ভিতরে প্রয়োগ করতে হবে। বাড়্তি টোপ উপযুক্ত পাত্রে রাখা উচিত। তবে তাজা টোপই যেহেতু ব্যবহার করা বিধেয়, সেহেতু বাড়্তি টোপ ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

৩। যে সব পাত্রে টোপ মেশানো হয়, সেগুলি খুব ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে এবং হাত সাবান জলে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

৪। যে সব জায়গায় বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, গৃহপালিত জীবজন্তু যাতে সেখানে না যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। বিষ প্রয়োগের ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে অবিলম্বে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ডাক্তার ডাকতে হবে।

ফসল মাঠ থেকে কেটে আমরা ঘরে তুলি এবং মাড়াই-ঝাড়াইয়ের পর গুদামজাত করি। এই সব গুদাম ইঁদুর-নিরোধক হওয়া উচিত এবং এর জন্যে অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ খুবই কম। নতুন গুদাম অবশ্যই ইঁদুর-নিরোধক করতে হবে। পুরোনো গুদামকেও ক্রমে ক্রমে ইঁদুর নিরোধক অবশ্যই করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইঁদুর কলে ধরা পড়বার পর তাকে মাঠে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়। সহরাঞ্চলে বাড়ীর সামনের নালীতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরূপ কাজ বন্ধ করবার ব্যবস্থা করা দরকার।

(ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ)

মহাকাশযানের সাহায্যে নক্ষত্র-জগৎ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ

নক্ষত্রমণ্ডলী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দু-টন ওজনের জটিল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি মহাকাশযান মহাকাশে প্রেরিত হবে। অতি শক্তিশালী অ্যাটলাস এজেনা রকেটের সাহায্যে এই আরোহীশূন্য মহাকাশযানটি উৎক্ষিপ্ত হবে এবং ৫০০ মাইল উর্ধ্বে থেকে সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে পৃথিবী পরিক্রমা করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নক্ষত্র-জগৎ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই ধরণের চারটি যান মহাকাশে প্রেরণের পরিকল্পনা করেছেন। এই রকম চেষ্টা এর আগে আর কোন দেশে হয় নি।

এক্স-রশ্মি, অতিবেগুনী-রশ্মি এবং গামা-রশ্মির বর্ণালীর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্যে পৃথিবী পরিক্রমণশীল এই মহাকাশযানে থাকবে চারটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র। পৃথিবী থেকে দূরবীক্ষণযোগে নক্ষত্রদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হয়ে আসছে বহুকাল থেকে। এই সকল বর্ণালীই ব্রহ্মাণ্ডের বাতায়ন। কিন্তু পৃথিবীর আবহমণ্ডল এই বাতায়ন-পথে যবনিকার সৃষ্টি করে। পৃথিবীস্থিত দূরবীক্ষণের সাহায্যে এই আবহমণ্ডল ভেদ করে সঠিক তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয় নি বলে পৃথিবীর ২০ মাইল উর্ধ্বে বেলুন পাঠিয়ে সেখান থেকে দূরবীক্ষণ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে অথবা রকেটের মুখে দূরবীক্ষণ পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এসব বেলুন অথবা রকেটের সাহায্যেও আবহমণ্ডল পেরিয়ে মহাকাশে থেকে নক্ষত্র-জগৎ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। বর্তমান পরিকল্পনায় তা সম্ভব হতে চলেছে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই মহাকাশযানের সাহায্যে তাঁরা এবার নক্ষত্রসমূহের রাসায়নিক গঠন সঠিকভাবে জানতে পারবেন, ছায়াপথে অবস্থিত নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যভাগের সুস্পষ্ট পরিচয় পাবেন, আর মহাশূন্যের গভীরে নক্ষত্র-জগতের মধ্যে এক্স-রশ্মির যে উৎস রয়েছে, সে বিষয়েও তথ্য

সংগৃহীত হবে। এছাড়া নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কিত রহস্যের যবনিকাও অনেকখানি উদ্ঘাটিত হবে। নক্ষত্রের জন্ম ও বিবর্তন সম্পর্কে বর্তমানে যে সকল মতবাদ প্রচলিত রয়েছে, তার অনেক কিছুই হয়তো সংগৃহীত তথ্যের আলোকে পরিবর্তিত হবে।

পৃথিবী থেকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে নক্ষত্রের আলোকচিত্র গৃহীত হয়। এই সকল আলোক-চিত্রই নক্ষত্র সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ভিত্তি। এবার আবহমণ্ডলের বহু উপর থেকে ঐ মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি কেবল নক্ষত্র-জগৎই অবলোকন করবে না, এর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যা দেখবে, তার বিবরণ বেতারযোগে পৃথিবীতে পাঠাবে। সঙ্কেত-ধ্বনির মাধ্যমে এই সকল সংবাদ প্রেরিত হবে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্লেষণ করে তাদের উপর আলোকপাত করবেন।

তবে নক্ষত্রের প্রতি সঠিক নিশানা ও তাদের অচঞ্চল অবস্থানই হবে সঠিক তথ্য সংগ্রহের ভিত্তি। পৃথিবী থেকে দূরবীক্ষণযোগে তথ্য সংগ্রহেরও ভিত্তি এটাই। সামান্য নড়ে গেলেই সঠিক ছবি পাওয়া যায় না।

এই আকাশযানে তথ্য সংগ্রহের জন্যে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি থাকবে। আর এতে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করা হবে, তাদের দৈর্ঘ্য ৩০ মাইল। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির দিক থেকে এরকম জটিল, এত বৃহদাকার ও ভারী আরোহীশূন্য মহাকাশযান এর আগে তৈরি হয় নি। এর প্রধান অংশে আছে সপ্তভুজ সমন্বিত ১০ ফুট লম্বা ও সাত ফুট চওড়া একটি সিলিণ্ডার। সেখানেই থাকবে চারটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র এদের মোট ওজন হবে আধ টন।

মহাকাশে পরিক্রমণ কালে এর সোলার প্যানেলগুলি যখন ডানার মত খুলে যাবে, তখন এরা প্রস্থে হবে ২১ ফুট। ঐ সকল সোলার প্যানেল বা সূর্যমুখী ডানার মধ্যে থাকবে ১৪০০০ সোলার সেল। এই সকল সেল সূর্যের রশ্মিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করবে। এই বৈদ্যুতিক শক্তিতেই এই মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি চালু থাকবে। এর স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা ১২৮ রকমের নির্দেশ নিতে ও তা তামিল করতে পারবে।

মোস্‌বাওয়ারের আবিষ্কার

সূর্যেন্দুবিকাশ কর

১৯৬১ সালে রুডল্‌ফ্‌ লুড্‌উইগ মোস্‌বাওয়ার তাঁর আবিষ্কারের জন্যে মাত্র ৩২ বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর নাম অনুযায়ী এই আবিষ্কার 'মোস্‌বাওয়ার এফেক্ট' নামে পরিচিত হয়েছে। এই আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানের বহু শাখায় গবেষণার দ্বার খুলে গেছে—অনেক অজানা তথ্যের উপর নতুন আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। তাই মোস্‌বাওয়ার এফেক্ট শুধু একটি আবিষ্কার নয়—বরং বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখার রূপ নিতে চলেছে।

এই আবিষ্কারের তথ্যটুকু জানতে হলে বিজ্ঞানে ব্যবহৃত অনুনাদ (Resonance) কথাটির সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। শব্দ-বিজ্ঞানে এর পরিচয় পাই—টিউনিং ফর্কের অনুনাদে। টিউনিং ফর্কের আকার ও উপাদান থেকে দেখা যায় যে, তার একটি বিশেষ কম্পাঙ্ক আছে, একটু আঘাত দিলেই ফর্কটি ঐ কম্পাঙ্কের শব্দ-তরঙ্গের জন্ম দেয়। এখন ফর্ক্‌টিকে যদি শান্ত অবস্থায় আনা যায় এবং আর একটি ঐ কম্পাঙ্কের শব্দের উৎসকে তার কাছাকাছি নিয়ে আসা যায়, তবে শান্ত ফর্ক্‌টি আপনা থেকেই আপন কম্পাঙ্কের শব্দ সৃষ্টি করবে। এই হলো অনুনাদ। এখন দুটি ফর্কের কম্পাঙ্কে যদি একটু ইতর বিশেষ থাকে, তখনও অনুনাদ পাওয়া যাবে; কিন্তু শান্ত ফর্ক্‌টির সাড়া দেবার মাত্রারও পরিবর্তন হবে। এখন শব্দের তীব্রতা ও কম্পাঙ্কের যদি একটি লেখচিত্র আঁকা যায় (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য), তাতে আমরা এই সাড়া দেবার মাত্রা নির্ণয় করি অর্ধেক তীব্রতায় কম্পাঙ্কের কতটুকু ইতর বিশেষ

১নং চিত্র।

হয়েছে, সেই সংখ্যা থেকে। একে বলা হয় অনুনাদ বেধ (Resonance width)। এই বেধ আরও সঙ্কীর্ণ হবে—যদি দুটির কম্পাঙ্ক আরও কাছাকাছি হয়।

বেতার-বিজ্ঞানে 'Q' কথাটির বিশেষ প্রচলন আছে। বেতার প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রে অনুনাদী বেতার-তরঙ্গের তীব্রতার মাত্রা Q কথাটি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। Q হলো Quality factor বা গুণমান। বেতার-তরঙ্গ, আলো এক্স-রে, গামা-রে—এগুলি সবই হলো তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ—কিন্তু শক্তি ও কম্পাঙ্কের পার্থক্য রয়েছে বলেই তাদের ধর্ম ও প্রয়োগ ভিন্ন। শক্তি ও কম্পাঙ্কের যোগসূত্র হলো:

$$\text{কম্পাঙ্ক (প্রতি সেকেণ্ডে)} = \frac{\text{শক্তি (আর্গ)}}{h \text{ (আর্গ-সেকেণ্ড)}}$$

$h = ৬·৬২ \times ১০^{-২৭}$ আর্গ-সেকেণ্ড। এই নিত্য-সংখ্যাটি প্ল্যাঙ্কের নিত্যসংখ্যা। বেতার-তরঙ্গ, আলো, গামা-রে—সবই এই নিয়ম মেনে চলে।

নিত্যসংখ্যা h-এর আবির্ভাব হয়েছে হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ থেকে। এই মৌলিক মতবাদ থেকে দেখা যায় যে, কোন শক্তি-তরঙ্গের শক্তির মাত্রা যতই নিখুঁতভাবে মাপবার চেষ্টা করা যাক না কেন, যে জড় পদার্থের উত্তেজনায় তার সৃষ্টি হয়েছে, সেই উত্তেজনার একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল রয়েছে বলেই সেই শক্তি একটি সরলরেখা না হয়ে একটু মোটা হবে। ধরা যাক, পরমাণুর নিউক্লিয়াস বাইরের শক্তিতে উত্তেজিত হয়ে $১০^{-৭}$ সেকেণ্ড পরে শান্ত অবস্থায় ফিরে এল। এখন এই উত্তেজনায় যে শক্তি পাওয়া গেল, তা প্রায় ২৩·৮ হাজার ইলেকট্রন ভোল্ট*। এই শক্তি গামা-রের পর্যায়ে পড়ে। অনিশ্চয়তাবাদের মতে—

২নং চিত্র

* ১ ইঃ. ভোঃ. = $১·৬০ \times ১০^{-১২}$ আর্গ; সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার গতিবেগে—½ আর্গ হলো এক গ্র্যাম বস্তুর গতীয় শক্তি।

$$\text{রশ্মিরেখার বেধ (আর্গ)} = \frac{h \text{ (আর্গ-সেকেণ্ড)}}{2\pi \times ১০^{-৭} \text{ (সেকেণ্ড)}}$$

এখন এই শক্তি মাপতে গেলে অন্ততঃ উল্লিখিত বেধ পাওয়া যাবে, অর্থাৎ ২৩'৮ হাজার ইঃ. ভোঃ.-এর জায়গায় গামা রেখাটি (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য) বেধহীন রেখা না হয়ে প্রায় $১০^{-৮}$ ইঃ. ভোঃ. মোটা হয়ে দাঁড়াবে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনিশ্চয়তা-বাদজনিত এই বেধ ছাড়াও পারিপার্শ্বিক আরও কয়েকটি কারণে রেখাটির আরও বেশী পরিসর হয়।

আলোর কথা ধরা যাক—সোডিয়াম বাষ্পের বিশিষ্ট D বর্ণালীরেখার একটি বিশেষ কম্পাঙ্ক আছে। এই D রেখার আলো একই সোডিয়ামে যখন আবার শোষিত হয়, তখন তীব্র প্রতিপ্রভা (Flourescence) দেখা যায়। এই প্রতিপ্রভার ক্ষেত্রে যে অনুনাদ আমরা পাই, তার বেধ প্রায় $১০^{-৮}$ ইঃ. ভোঃ, যার অনুনাদ শক্তি ১ ইঃ. ভোঃ.-এর মত। তাই $Q = \frac{\text{শক্তি}}{\text{বেধ}} = ১০^{৮}$। আলোক বর্ণালীরেখা এই উচ্চ গুণমানের জন্যে যথেষ্ট সরু হয়। লেসারের ক্ষেত্রে এই গুণমান $১০^{১৩}$ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব হয় বলেই লেসারের আলো তীব্র।

অনিশ্চয়তাবাদজনিত বেধ ছাড়াও আলোর ক্ষেত্রে প্রতিঘাতজনিত শক্তির হ্রাসও সম্ভব। আলোর ফোটন যখন যে শক্তি নিয়ে পরমাণু থেকে বেরোয়, তার কিছু অংশ পরমাণুর প্রতিঘাত প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়; যেমন—বন্দুকের গুলির যে গতীয় শক্তি তার কিছু অংশ বন্দুকের কুঁদার উল্টো দিকে যে প্রতিঘাত হয়, তাতে খরচ হয়ে যায়। পরমাণুর বেলায় এই প্রতিঘাত-শক্তি খুবই কম; তাই আলোর রেখা যথেষ্ট সরুই থাকে

গামার বেলায় ব্যাপারটা একটু অন্য রকম. কারণ ক্ষীণতম গামার শক্তিও দৃশ্য আলোর চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশী। ধরা যাক, $১০^{৪}$ ইঃ. ভোঃ. গামা-রশ্মির কথা। এ রকম একটি গামা-রশ্মি যদি অনুরূপ একটি নিউক্লিয়াসে শোষিত হয়, যার $১০^{৪}$ ইঃ. ভোঃ.-এর মত একটি উত্তেজিত অবস্থা আছে। তাহলে কি অনুনাদ হবে? হওয়া অবশ্যই উচিত। কিন্তু গামার শক্তি বেশী, তাই গুণমান $= \frac{১০^{৪}}{১০^{-৮}} = ১০^{১২}$ অথবা আরও বেশী হবে। তাছাড়া প্রতিঘাত

$$\text{শক্তি} = \frac{(\text{শক্তি})^{২}}{২ \times \text{ভর} \times (\text{আলোর গতিবেগ})^{২}}$$

এখানে ভর হলো বিকিরণকারী বা শোষণকারী নিউক্লিয়াসের ভর। এই সূত্র থেকে গামা-রে'র ক্ষেত্রে আমরা পাই প্রতিঘাত-শক্তি $= ১০^{-৩}$ ইঃ. ভোঃ। এই সংখ্যাটি $১০^{৪}$ বা অধিক শক্তির তুলনায় নগণ্য বটে, কিন্তু অনুনাদ বেধ $১০^{-৮}$ ইঃ. ভোঃ.-এর চেয়ে অনেক গুণ বেশী। অনিশ্চয়তা-বাদের জন্যে $১০^{-৮}$ ইঃ. ভোঃ থেকে $১০^{-৯}$ ইঃ. ভোঃ. হলো গামা অনুনাদের স্বাভাবিক বেধ। এই বেধ প্রতিঘাত ক্রিয়ার জন্যে অনেক গুণ বেড়ে যায়। অনুনাদের ক্ষেত্রে বিকিরণ ও শোষণজনিত গামা-রশ্মির শক্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যাবে (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। শোষণের বেলায়ও প্রতি-ঘাত শক্তিটুকু যোগ করে গামা-রশ্মির শক্তি বেড়ে যাবে। নিখুঁত গামা-রশ্মির শক্তির মান বিকিরণ-জনিত অল্পতর ও শোষণজনিত উচ্চতর মানের গামার মাঝখানে চাপা পড়ে যাবে।

এছাড়া নিউক্লিয়াসের ভিতর তাপীয় শক্তির জন্যেও যে স্বেচ্ছাচার গতিবিধি থাকবে, তাতে এই অনুনাদ বেধ আরও বাড়বে—তাকে আমরা বলি ডপ্‌লার বেধ। টিন—১১৯ আইসোটোপের ক্ষেত্রে আমরা উদাহরণস্বরূপ ২৩'৮ হাজার ইঃ. ভোঃ. গামা-রশ্মির অনুনাদ বিবেচনা করলে প্রতিঘাত-শক্তি হবে $২'৫ \times ১০^{-৩}$ ইঃ. ভোঃ. আর ডপ্‌লার বেধ হবে $১'৬ \times ১০^{-২}$ ইঃ. ভোঃ.।

তাপীয় গতি-শক্তি কমাবার একটা উপায় অবশ্য আছে—নিম্ন তাপমাত্রায় এই গতীয় শক্তি কমে যায়। গামার অনুনাদের ক্ষেত্রে এই উপায়ে দেখা গেল যে, ৩নং চিত্রের বিকিরণ ও শোষণ

জনিত বেধ তখন সরু হয়ে যায়—তেমনি মাঝখানের চাপা পড়া নিখুঁত গামার শক্তির পরিসরও যায় কমে। তাই যেটুকু অনুনাদ পাওয়া যাচ্ছিল, তাও পাওয়া অসম্ভব হয়। তাহলে নিউক্লিয়াসকে উত্তপ্ত করে বরং চাপা অংশটির আরও পরিসর করা সুবিধাজনক। এ হলো বেধ বাড়িয়ে কোন রকম অনুনাদের কিছু অংশ পাওয়া, বিকিরণ আর শোষণ রেখাকে মিলিয়ে দিতে তো পারা গেল না—তাই পুরা অনুনাদ কোথায়?

সম্ভব হলো, যাতে প্রায় অনিশ্চয়তাবাদজনিত অনুনাদ বেধটুকুই (যা কমাবার কোনও উপায় নেই) রইলো। আলোর চেয়ে গামা ফোটনের শক্তি অনেক গুণ বেশী, তাই তার প্রতিঘাত শক্তির ঘাট্‌তিটুকু বেশী, ডপ্‌লার বেধও বেশী। মোস্‌বাওয়ার গামা বিকিরণ ও শোষণের উৎস হিসাবে নিলেন কৃষ্ট্যাল বা দানাবাঁধা পদার্থ। দানাবাঁধা পদার্থের ভিতর পরমাণুগুলি সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত। পরমাণুগুলি কৃষ্ট্যালের ভিতর
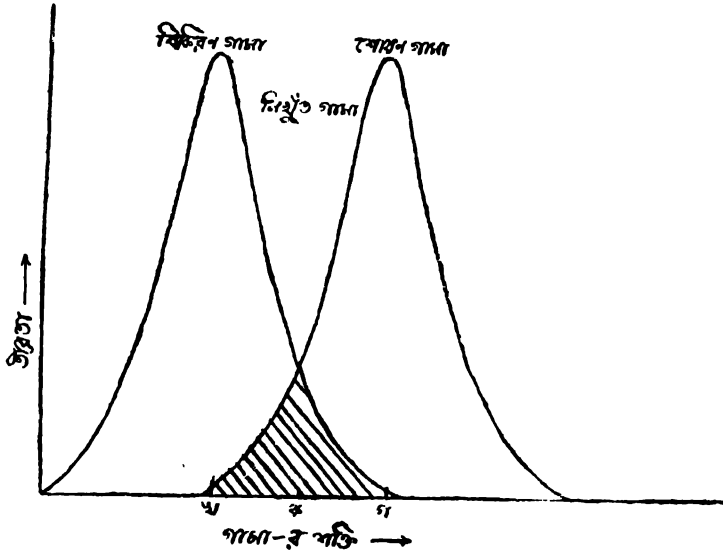
৩নং চিত্র।

আর একটা উপায়ও পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে গামা বিকিরণকারী নিউক্লিয়াসকে তীব্র গতিবেগে যদি শোষক নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি আনা হয়, তবে ঘাট্‌তি প্রতিঘাত শক্তিটুকু গামার ফোটন এই গতিবেগ থেকে আহরণ করে নিখুঁত অনুনাদ সৃষ্টি করতে পারে। এই পরীক্ষাও কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হলো।

গামা-রশ্মির অনুনাদের উল্লিখিত পটভূমিকায় মোস্‌বাওয়ার এক চমকপ্রদ পন্থার আবিষ্কার করেন, যাতে প্রতিঘাত-শক্তি ও তাপীয় শক্তি সম্পূর্ণ নগণ্য হয়ে রইলো ও নিখুঁত অনুনাদ পাওয়া

যেন ল্যাটিসে (Lattice) বাঁধা। এই ল্যাটিসে পরমাণুগুলির বন্ধন-শক্তি প্রতিঘাত-শক্তির তুলনায় কিছু কম নয়। তাই নিউক্লিয়াসের প্রতিঘাত-শক্তি ল্যাটিসের ভিতর দিয়ে তার কম্পনরূপে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে প্রতিঘাত-শক্তির মান একটি নিউক্লিয়াসের পরিবর্তে কৃষ্ট্যালের নিউক্লিয়াসগুলির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। তখন দাঁড়ায়

$$\text{প্রতিঘাত শক্তি} = \frac{(\text{শক্তি})^2}{2 \times \text{কৃষ্ট্যালের ভর} \times (\text{আলোর গতিবেগ})^2}$$

ক্রিষ্ট্যালের ভর নিউক্লিয়াসের ভরের তুলনায় অনেক বেশী (লোহার ১ মিঃ মিঃ ঘন বস্তুতে ৮×১০¹⁹টি পরমাণু থাকে) বলে প্রতিঘাত-শক্তি নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়।

তাপীয় শক্তিও ক্রিষ্ট্যালের বেলায় পরমাণু-গুলির ভিতর ভাগ হয়ে যায়। ফলে ডপ্‌লার বেধও নগণ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাপীয় গতির জন্যে ডপ্‌লার বেধ কেন হয়? তার কারণ হলো তাপজনিত নিউক্লিয়াসের যথেচ্ছ বিচরণ। গামা বিকিরণের উৎস নিউক্লিয়াস যদি এই গতির ফলে শোষক থেকে সরে যায় বা কাছে আসে, আবার শোষকের বেলায় যদি উল্টোটা ঘটে, তবেই তো ডপ্‌লার ক্রিয়ায় অনুনাদের বেধ বাড়বে। কিন্তু ক্রিষ্ট্যালের ভিতর ল্যাটিসে নিউক্লিয়াসের এরকম যথেচ্ছ বিচরণ বা রৈখিক গতি সম্ভব নয়—তাপীয় গতিও সেখানে ল্যাটিসের কম্পনে বিলীন হয়ে যায়। তাই ক্রিষ্ট্যাল বিকিরক বা শোষক থেকে গামা-রশ্মি নিখুঁত পরিমাণে পাওয়া যাবে।

ক্রিষ্ট্যাল দিয়ে এই পরীক্ষায় নিখুঁত গামা পরিমাপের জন্যে ৩নং চিত্রের শোষণ ও বিকিরণ রেখা একই জায়গায় পাওয়া যায় কিনা, দেখা প্রয়োজন। তাছাড়া নিম্ন তাপমাত্রায় এই অনুনাদ-বেধ আরও সরু হবে। কিন্তু গামা-রশ্মি সাধারণতঃ যে যন্ত্রে মাপা হয়, তাতে এত সঙ্কীর্ণ গামা-রশ্মির রেখা ধরা সম্ভব নয়, কিন্তু গামা বিকিরণের উৎস ও শোষক-এর মধ্যে যদি একটা আপেক্ষিক গতিবেগ দেওয়া যায়, তবে নিখুঁত অনুনাদ থেকে গামা-রশ্মি কতটুকু অপসারিত হবে, তা মেপে ক্রিষ্ট্যালের সাহায্যে নিখুঁত অনুনাদ পাওয়া গেছে, তা মোস্‌বাওয়ার প্রমাণ করেন। সেকেণ্ডে ১০⁻² সেণ্টিমিটারের মত আপেক্ষিক গতিবেগও মোস্‌বাওয়ার এফেক্টের অনুনাদকে বিনষ্ট করতে পারে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, গামা-রশ্মির নিখুঁত অনুনাদের এই পরীক্ষাটি কত সূক্ষ্ম।

এত সূক্ষ্ম বলেই মোস্‌বাওয়ার এফেক্ট দিয়ে অনেক সূক্ষ্মতর পরীক্ষা সম্ভব হয়েছে। গতিশীল ফোটনের ভর আছে, আইনষ্টাইনের এই তথ্যটি প্রকাশ করা যায় নিম্নের সূত্রে—

গামার শক্তি=গামা-ফোটনের ভর×(আলোকের গতিবেগ)²। সব শক্তির ক্ষেত্রে এই সূত্র প্রয়োগ করা যায়।

এখন মহাকর্ষের টান যদি ফোটনের ভরের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তা প্রমাণ করা যায়, তবে এই সূত্রের পরীক্ষা হয়। ধরা যাক, বিকিরক ক্রিষ্ট্যাল থেকে গামা-রশ্মির ফোটন ক দূরত্বে নীচের ক্রিষ্ট্যাল শোষকের দিকে নিক্ষিপ্ত হলো। তাহলে ফোটনের মহাকর্ষজনিত স্থৈতিক শক্তি কমবে।

$$\text{ভর} \times g \times \text{ক} = \frac{\text{শক্তি} \times g \times \text{ক}}{(\text{আলোর গতিবেগ})^2}$$

g হলো মহাকর্ষীয় ত্বরণের মান। এই কমতি শক্তির জন্যে মোস্‌বাওয়ার এফেক্টের নিখুঁত অনুনাদ শোষক থেকে পাওয়া যাবে না—তবে শোষকটিকে যদি নির্দিষ্ট আপেক্ষিক গতিবেগ দিয়ে নিখুঁত অনুনাদ ফিরিয়ে আনা যায়, তবেই এই পরীক্ষার সত্যতা ধরা যাবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাউণ্ড ও রেবকা মোস্‌বাওয়ার এফেক্টের সাহায্য নিয়ে ২১ মিটার উঁচু থেকে ফোটন নিক্ষেপ করে আইনষ্টাইনের এই সূত্রটি পরীক্ষা করতে পেরেছেন।

তাছাড়া মোস্‌বাওয়ার এফেক্টের সাহায্যে যন্ত্র-বিজ্ঞান, নিউক্লিয়ার পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূক্ষ্ম পরীক্ষা সম্ভব হয়েছে। এখানে আমরা রমন এফেক্টের কথা স্মরণ করতে পারি। ভারতীয় বিজ্ঞানী রমনের এই আবিষ্কারের ভিত্তিতে বহু সহস্র মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে মোস্‌বাওয়ার এফেক্ট ও তার প্রয়োগ নিয়ে এই পাঁচ বছরেই বহু সংখ্যক মৌলিক প্রবন্ধ বিভিন্ন গবেষক প্রকাশ করেছেন। এমন কি, মোস্‌বাওয়ার এফেক্ট নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডক্টরেট থিসিস হিসাবে তরুণ বিজ্ঞানী মোস্‌বাওয়ার যে আবিষ্কার করেছেন—বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা বিস্ময়কর ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ডাঃ নন্দলাল বসু ও তাঁহার রূপ সৃষ্টি

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এই যুগ প্রবর্তক রূপ-ঋষির তিরোভাবে বাংলা দেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ ও এশিয়া খণ্ড যে মহান রূপকারকে হারাইলেন, তাহা সম্যক উপলব্ধি করা সহজ নয়। তিনি যে এশিয়া-খণ্ডের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পগুরু ছিলেন, তাহা দেশে-বিদেশে সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। একমাত্র জাপানের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর 'তাইকন এবং বিলাতের পৌরাণিক চিত্রকর 'স্যার এডওয়ার্ড ব্রার্ণ জোন্সের' সহিত নন্দলালের চিত্র সৃষ্টির তুলনা হইতে পারে। পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক কাল নন্দলাল একাক্রমে (ক্রমাগত) অসংখ্য চিত্র লিখিয়া তিনি সমসাময়িক চিত্র সাধনার ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার সমস্ত Masterpieces উল্লেখ করাও সম্ভব নহে। তাঁহার লিখিত প্রথম মহৎ চিত্র হইল, 'সতীর সহ-মরণে অলৌকিক কল্পনা'। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াসে এই দেশে 'সতী-দাহ' প্রথা নিষিদ্ধ হয়। সুতরাং নন্দলাল 'সতী-দাহ' কখনও চাক্ষুষ করেন নাই। কিন্তু অলৌকিক কল্পনার বলে তিনি 'সহ-মরণে'র আদর্শ এবং ভারতের নারীর পাতিব্রত্য এমন উজ্জ্বল করিয়া লিখিয়াছেন, তাহা নবীন-কলার ভারতীয় চিত্রে একটি চিরস্থায়ী অবদানরূপে চিরকাল প্রশংসিত হইবে। এই চিত্রখানি জাপানী রীতির রঙীন প্রতিলিপিতে মুদ্রিত হইয়া দেশে-বিদেশে প্রচারিত হইয়া ভারতীয় নবীন রীতির শ্রেষ্ঠ চিত্র বলিয়া দেশে-বিদেশে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় চিত্র হইল 'কৈকেয়ী ও মন্থরা'। সবুজ রংয়ের শাড়ী পরা ভরতের জননী ঈর্ষার জলন্ত প্রতিমূর্তিরূপে নন্দলালের তুলিকায়ে উজ্জ্বল হইয়া আছে। এই চিত্রের মৌলিক ও বলিষ্ঠ কল্পনা দেশে-বিদেশে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে জাপানী প্রতিলিপির মারফৎ। নন্দলালের শিল্প জীবনের সূচনা হয় দক্ষিণ দেশের তীর্থের অসংখ্য মন্দির ও প্রতিমার অনুশীলন করিয়া। মনে পড়ে, ১৯০৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে নন্দলাল একটি ভ্রমণ বৃত্তি লাভ করিয়া লেখকের সহিত দক্ষিণ দেশের শিল্প অনুশীলন করিতে যাত্রা করেন। পুরী, ভুবনেশ্বর, বিজয়াবাদ (ওয়ালটেয়ার), মহাবলীপুরম, চিদম্বরম, ত্রিচিনাপলী, তাঞ্জোর, রামেশ্বরম প্রভৃতি নানা প্রাচীন মন্দিরের শিল্প-কলা নন্দলালের চোখে ভারতীয় শিল্পকলার ধারা ও তাহার রহস্য অতি অল্প সময়ে উদঘাটিত হইল। তিনি এই দিব্যজগতের যে মহিমা চাক্ষুষ করিলেন, দ্রুত রেখাপাতে তাহার অসংখ্য স্কেচ প্রস্তুত করিয়া ভারতীয় শিল্পের রীতি তিনি সহজে আত্মসাৎ করিলেন এবং তাঁহার ভাবী-কালের চিত্ররীতির ভাষা সংগ্রহ করিলেন। প্রাচীন ভাস্কর্যের বলিষ্ঠ কল্পনা ও অবয়ব রীতি তাঁহার চিত্র সাধনায়ে অঙ্গীভূত হইয়াছে। এই সকল প্রাচীন ভাস্কর্যের রীতি অবলম্বনে তিনি তাঁহার একটি নিজস্ব বলিষ্ঠ রেখার রীতির উদ্ভাবন করিলেন, যাহা সময়ে সময়ে তাঁহার গুরু আচার্য অবনীন্দ্রনাথের রেখাসৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়াছে। আচার্য এই কথা সস্নেহে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—

"সর্বত্র বিজয়মিচ্ছেৎ, শিষ্যাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্"।

"তোমার কাছে যে হার মানি প্রিয়, সেই ত' আমার জয়"।

কিন্তু, নন্দলাল তাঁহার গুরুর কাছে যে ভারতের শিল্প-রহস্য পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি একটি চিত্রে চমৎকার বিনয়ের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রতিলিপি কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়, নবীন বালক নন্দলাল তাঁহার গুরুর নিকট শিখিয়া লইতেছেন। নন্দলালের এই গুরুভক্তি সকলকেই মুগ্ধ করিবে। নন্দলালের চিত্র সাধনার দ্বিতীয় পর্যায়ে হইল, তাঁহার

গুরু শিষ্যকে আরতি করা শিখাইতেছেন।

এখানে সন্নিবেশিত হইল। আমরা চিত্রে দেখিতেছি মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত দুর্বল হস্তে আরতির দীপ সঞ্চালনে অক্ষম হইয়া একজন নবীন বালককে আরতি করাইতে শিখাইতেছেন। আমাদের ভারতের মন্দিরের শিল্প দেবতাকে

অজন্তা-গুহার চিত্রাবলীর অনুশীলন। বিলাতের India Society-র পক্ষ হইতে লেডী হেরিংহাম ১৯০৯ সালে অজন্তার ভিত্তি চিত্রাবলীর প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতে আসিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার উদ্যোগে লেডী হেরিংহামের সহিত গিয়াছিলেন

নন্দলাল। কয়েক মাস অবস্থান করিয়া প্রাচীন ভারতের চিত্ররীতির রহস্য ও ধারা অনায়াসে আত্মসাৎ করিয়া আনিলেন। অজন্তা হইতে ফিরিয়া নন্দলাল কয়েকটি চমৎকার চিত্র রচনা করিলেন। তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল চিত্রাবলী। বাংলাদেশে শিবের আদর্শ একটা কৃত্রিম ও হাস্যকর পথে নামিয়া আসিয়াছিল। প্রাচীন ভাস্কর্যে শিব অনন্ত যৌবনসম্পন্ন মহাপুরুষ, শ্মশ্রু-গুম্ফযুক্ত হাস্যকর 'বুড়া' শিব নহে। নন্দলাল তাঁহার চিত্রে শিবচরিত্রের
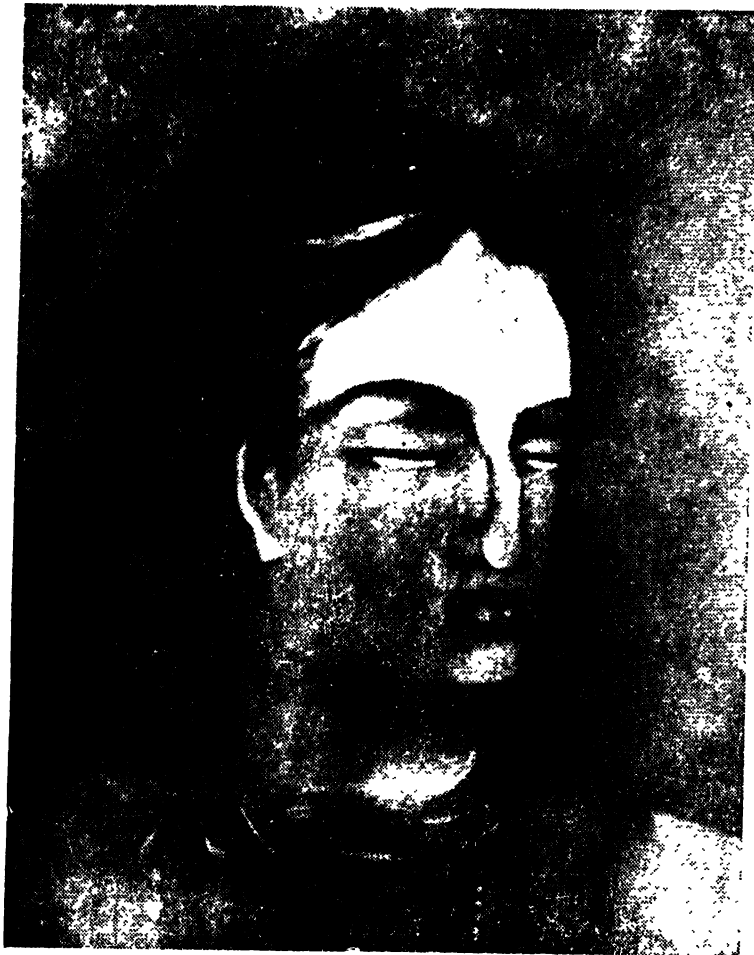
শোকাচ্ছন্ন শিবের ধ্যানমগ্ন মূর্তি।

'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' এবং 'দময়ন্তীর স্বয়ম্বর'। এই চিত্রগুলিতে নন্দলাল অজন্তার অনুকরণ না করিয়া ঐ রীতির পথে নূতন ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু চিত্র সাধনার পথে নন্দলালের শ্রেষ্ঠ অবদান হইল, 'শিবলীলা'র অলৌকিক যথার্থ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং কল্পনার বলে শিবের পৌরাণিক রীতির উপর অনেক নূতন ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিলেন। তাঁহার চিত্র মালায় শিবচরিত্র এক নূতন মৌলিক আদর্শে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহা শৈব পুরাণের অনুকৃতি

মাত্র নহে। তাঁহার এই চিত্রমালার মারফৎ আমরা 'শিব-লীলার' এক নূতন অপূর্ব রসময় ব্যাখ্যা পাইতেছি, যাহা শিবতত্ত্বকে উচ্চাসনে নমঃ।" নন্দলাল এই পথ অতিক্রম করিয়া শিবকে উচ্চতর অলৌকিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পাহাড়ী চিত্রশিল্পে এবং কখনও

শিবের পার্বতীকে বর্ষফল কথন।

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আমাদের পুরাণকার বলিয়াছেন—"শিবতত্ত্বং ন যানামি, কি দৃশোঽসি মহেশ্বর, যা দৃশোঽসি মহেশ্বর, তা দৃশায় নমো কখনও রাজপুত শিল্পে শিবের গার্হস্থ্য জীবন চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু নন্দলালের শিবলীলায় আমরা এক উচ্চতর রসময় আদর্শের সম্মুখীন হইতেছি।

তাঁহার শিব-চিত্রের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—'শিবের ধ্বংসনৃত্য', 'শিবের বিষপান,' 'পার্বতীর শোক', 'পার্বতীকে ক্রোড়ে করিয়া শিবের যুগ যুগ ব্যাপী ধ্যানে মগ্ন শোকের চিত্র' ('প্রতিলিপি'), শিবের এই মুখের কল্পনা নন্দলালের উচ্চ চিন্তার শ্রেষ্ঠ পথ। শিব-চিত্রে এইরূপ মহান কল্পনা ইতিপূর্বে কোনও শিল্পী সার্থক করিতে পারেন নাই। শিবতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য নন্দলাল আমাদের উদ্ঘাটন করাইয়া দেখাইয়াছেন এবং ভারতের অধ্যাত্ম চিন্তার অনেক কথাই তিনি আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন—

As the Modern interpreter of older forms of thought, he is nevertheless a modern artist, and one among us, sharing many of our views and many of our experiences. In the guise of his mythic theme, Bose comes with a message to modern life, much as that of Blake, Burne—Jones or Watts; that it is couched in an old imagery may delay its acceptance, but will not discount its real values. We shall indeed be misjudging his aims if we think that he is persuading us to relapse into old and idolatrous habits of thought. We are indebted to him for recovering our racial imagery from the pitfalls of narrow religious dogmas and presenting the same in a new, and in some sense, original dress, suited to the spirit of the times, which will not bend its knees to an image of Shiva, but will never refuse to bow to all fundamental truths and Philosophical concepts underlying the Shaivaite imagery, or, for the matter of that, of any form of imagery. The new life under new conditions is yet to frame its new images for which the poet laureate of Asia has given us some real earnest. In the field of Art, these images are yet to come. Many of our friends contend that they have already come in the creation of Nandalal Bose.

অনেকের বিশ্বাস নন্দলালের রূপদৃষ্টি কেবলমাত্র পৌরাণিক বিষয়বস্তুর দ্বারা সীমিত বা আচ্ছন্ন হইয়াছিল, এ কথা সত্য নহে। আমাদের জীবনের পরিবেশে আধুনিক অনেক বাস্তবিক বস্তু তাঁহার চিত্রমালায়ে উজ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে। সাঁওতালদের জীবনের নানা কথা ও আচরণ, পুরীর সমুদ্রতটে মৎস্য-ব্যবসায়ী নিলুয়াদের নিত্য জীবন তাঁহার অসংখ্য রেখা-চিত্রে এমন সঠিক জীবন্ত রূপ লাভ করিয়াছে, যাহা কোন ক্যামেরার snap-shot-এ ধরা পড়ে নাই।

অনেকের বিশ্বাস শিল্প-কলা ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি অবশ্যম্ভাবী প্রাচীরের বেড়া আছে, একথা নন্দলালের চিত্রাবলীতে মিথ্যা প্রমাণ হইয়াছে। কারণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ চক্ষু হইল রূপশিল্পের তৃতীয় নয়ন এবং নন্দলালের তৃতীয় নয়নে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্য-কথা সহজ ভাষায়ে প্রকাশিত হইয়াছে। নন্দলালের জয় হউক, ভারতশিল্পের জয় হউক।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

শিক্ষা—বিশ্ববিদ্যালয়ী

মাধ্যমিক শিক্ষার পর সুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা। এই শিক্ষার তিন স্তরের কথা আগে বলা হয়েছে; যথা—সাধারণতঃ তিন বছরের প্রাক-স্নাতক শিক্ষা, দুই বা এক বছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা। রুশ, জার্মান প্রভৃতি উন্নত দেশে প্রাক-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর দুটি স্তরের পরিবর্তে একটিমাত্র প্রাক-গবেষণা স্তরে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা পাঁচ বছরের। মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্যে পৃথক শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকায় ও ছাত্রদের আর্থিক অবস্থা উন্নত ধরণের হওয়ায় পাঁচ বছরের কেবলমাত্র একটি স্তর করবার কোন অসুবিধা হয় নি। এদেশে শিক্ষক শিক্ষণের অনুরূপ পৃথক ব্যবস্থা না থাকায় ও ছাত্রদের আর্থিক অবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শোচনীয় হওয়ায় এরূপ পাঁচ বছরের একটি স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক অসুবিধা। শিক্ষক শিক্ষণ ও গবেষণার জন্যে ছাত্র শিক্ষণ মূলতঃ ভিন্ন। শিক্ষকদের শিক্ষা সাধারণতঃ ব্যাপকতর হওয়া কাম্য, অন্যদিকে গবেষণার জন্যে ছাত্রের শিক্ষাকে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ করে এনে যে বিষয়ে ছাত্র গবেষণা করবে, সে বিষয়ে ছাত্রকে নিবিড় ও গভীরভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। অবশ্যই এরূপ একমুখী শিক্ষায় কিছু ত্রুটি থাকে। কিন্তু বর্তমান বিশেষজ্ঞতার যুগে এ না করলে সাধারণভাবে গবেষণার মান ও পরিমাণ সহজে বাড়ানো যায় না। একথাটি ভালভাবে বোঝবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কি, তা আলোচনা করা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় কেবল একটি বড় বিদ্যালয় নয় বা কেবল বিশ্ববিদ্যার বা কোন মহাবিদ্যার আলয় নয়। বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় (College) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বতন্ত্র, অন্য জাতের। এই স্বাতন্ত্র্য কিসে ও কিভাবে, তা স্পষ্টভাবে ধারণা করে নেওয়া উচিত। বিদ্যালয় বিদ্যার আলয়, যেখানে বিদ্বান ও বিদ্যার্থীরা সমবেত হয়ে বিদ্যাচর্চা করেন—অধ্যয়ন ও অনুশীলন করে জ্ঞান লাভ করেন। অবশ্য বর্তমানে এদেশে বিদ্যালয়গুলি দেখে কেউ যদি ব্যাখ্যা করেন—বিদ্যাকে যেখানে লয় বা বিনাশ করা হয়, সে স্থানই বিদ্যালয়, তাঁদের কাছে নিবেদন এই যে, বর্তমান প্রবন্ধগুলিতে শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত তাই আলোচনা করা হচ্ছে। সুতরাং এখানে বিদ্যালয়ের প্রথম অর্থ গ্রহণ করা হবে। যখন এদেশের শিক্ষার রূপ, শিক্ষা-ব্যবস্থা বর্তমানে কেমন তা আলোচনা করা হবে, তখন এই দুটি অর্থের কোন্‌টি বেশী বাস্তবানুগ তা দেখা যাবে। মানুষের লব্ধ জ্ঞানের এক অংশ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে সমস্ত সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের দৈনন্দিন কাজ অভ্যাসে পরিণত হয়। বাকী জ্ঞান সঞ্চিত থাকে পুস্তকে। গ্রন্থাগার একদিক দিয়ে এই জ্ঞানের ভাণ্ডার; জ্ঞান-পিপাসু নিজের চেষ্টায় পুস্তক থেকে জ্ঞান আহরণ করে। বিদ্যালয়ে জ্ঞান পরিবেশন ও বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। এখানে জ্ঞান প্রবহমান। বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যার সর্বপ্রকার বিদ্যার আলয় ও আশ্রয়। এর গ্রন্থাগারে বিশ্ব-বিদ্যা সঞ্চিত থাকে। এর বক্তৃতাগৃহে ও কারু-শালায় চলে এই জ্ঞানের পরিবেশন। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ মঞ্জুরী কমিশন কলা, বিজ্ঞান, কারিগরী প্রভৃতিতে অন্ততঃ তিনটি শিক্ষণ-বিভাগ (Faculty) না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকার করেন না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বড়

বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় নয়, বিদ্যার আহরণ ও পরিবেশনই মাত্র এর লক্ষ্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, স্বাতন্ত্র্য, সর্বাপেক্ষা মহৎ উদ্দেশ্য নব নব বিদ্যার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃজনে ও আবিষ্কারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে কবিগুরু বলেছেন—'বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্য পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার করে দিয়ে আশুতোষ এখানে গবেষণা বিভাগ স্থাপন করেছেন—বিদ্যার ফলন শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ।' বিদ্যার ফসল ফলানোর অক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অগৌরবের। রাধাকৃষ্ণন কমিশনও গবেষণাকে (বিদ্যার ফসল ফলানো) শিক্ষাদানের মতই গুরুত্বপূর্ণ মনে না করবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের ও কোন কোনও শিক্ষকের এ-বিষয়ে ঔদাসীন্যের সমালোচনা করেছেন (That research is as important function of a university as teaehing has not been realised by teachers and university administrator in our country)। ১৯৬১ সালের উপাচার্য সম্মেলনে গবেষণার গুরুত্ব ঘোষণা করা হয় (It was felt that in a university teaching and research go together)। ঐ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি ডাঃ কোঠারী বলেন—'বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শিক্ষা ও আবিষ্কারের একীকরণ। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা হয় না তা মহাবিদ্যালয় মাত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ব্যবহারের সামান্যই দাবী রাখে।' (A university invites education and discovery. If it is not engaged in research, it is no more than a college and has a little claim to be called a university)। তিনি আরও বলেন—যদি শিক্ষার মানের প্রকৃত উন্নতি এবং গবেষণার পরিমাণ ও মান উন্নয়ন করতে পারে তবেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সার্থক।' (Establishment of a new univarsity is worthwhile only if it would lead to a substantial improvement in standards and raise the output and level of research)। আর ঐ জ্ঞানের ফসল ফলানোর, নতুন বিদ্যার সৃষ্টির সার্থকতা ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে কবিগুরুর কথায়—'যে বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সে এই রকম * শিক্ষক আকর্ষণ করে, শিক্ষার সাহায্যে সেখানে মনোলোকের সৃষ্টি চলে, এই সৃষ্টিই সকল সভ্যতার মূলে।' দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকেরা (সাধারণভাবে সরকার নিযুক্ত বা মনোনীত ও এদেশের রীতি অনুযায়ী এঁরা শিক্ষক নন) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বাতন্ত্র্য, গৌরব ও মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন নন বা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন না। অবশ্য কেউ কেউ, ভাল শোনায় ও বেশ প্রশংসা পাওয়া যায় বলে গবেষণা, নতুন নতুন সৃজন সম্বন্ধে ভাল কথা বলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর গুরুত্ব দিতে চান না। এবিষয়ে পরে (এ দেশের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার সময়) বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে। রুশ, জার্মান প্রভৃতি দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে গবেষণামুখী। ছাত্রেরা পরে ভাল গবেষক হবে, এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে সমস্ত পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যব্যবস্থা করা হয়। সে দেশে বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপকদের ঘিরে গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন

* যিনি স্বভাবসিদ্ধ, যিনি নিজগুণে জ্ঞান দান করেন, যিনি নিজের অন্তর থেকে শিক্ষাকে অন্তরের সামগ্রী করেন, যাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে সকল শক্তির সঞ্চার হয়।

বিভাগ বা ইনষ্টিটিউট। এই বিশেষজ্ঞের যুগে এক একটি বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমাধানে নিয়োগ করা হয় অধ্যাপক, গবেষক ও ছাত্রদের সমবেত চেষ্টা।

প্রাক-স্নাতক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠের উপযোগী করা ও মাধ্যমিক শিক্ষকতার জন্যে প্রস্তুত করা। এই শিক্ষা দেওয়া হয় কোথাও কোথাও সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর কোথাও কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত মহাবিদ্যালয়ে। অবশ্য ভারতীয় কারিগরী ইনষ্টিটিউটগুলির বা ভারতীয় ষ্ট্যাটিসটিক্সের ইনষ্টিটিউটের মত প্রতিষ্ঠানে প্রাক-স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে এদের পৃথকভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষাদান ব্যাপারে এর প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ। যাদবপুর, কল্যাণী, বিশ্বভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক-স্নাতক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। কলিকাতা, বর্ধমান প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানতঃ অনুমোদিত কলেজগুলিতে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। দুটি ব্যবস্থারই কিছু সুবিধা ও কিছু অসুবিধা আছে। স্নাতকোত্তর শিক্ষার সঙ্গে প্রাক-স্নাতক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে আশা করা যায় যে, প্রাক-স্নাতক শিক্ষার মান উন্নত ধরণের হবে। কিন্তু ভয়ের দিকও আছে, স্নাতকোত্তর শিক্ষার মানের অবনতি ঘটতে দেখা যায়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন থেকে সযত্নে পাঠ্যসূচী ও পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করলে সমধিক সুফল আশা করা যায়। এই স্তরের শিক্ষাকাল বর্তমানে এদেশে দু-বছর। এখানে ছাত্রদের অধ্যয়নের বিষয় মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে কিছুটা সঙ্কীর্ণ করে কলা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতির যে কোন একটি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই স্তরে ছাত্রদের শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজির বিকল্পে মাতৃভাষার প্রচলন কলিকাতা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত হয়েছে। তবে শিক্ষার মাধ্যম সর্বতোভাবে মাতৃভাষা হলে, ছাত্রদের শিক্ষার সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভ করে নিজস্ব করবার (যাকে কবিগুরু 'স্বাঙ্গীকরণ' বলেছেন) বিশেষ সুবিধা হয়। তবে এই স্তরে ছাত্রকে, বিশেষ করে যে সসম্মানে স্নাতক হতে চায়, তাকে, মাধ্যমিক স্তরে শেখে নি, এমন একটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত।

স্নাতকোত্তর শিক্ষাকাল বর্তমানে দু-বছর। যারা পরে গবেষণা করবে বা যারা পরে প্রাক-স্নাতক স্তরে শিক্ষক হবে, প্রধানতঃ তাদের জন্যে এই শিক্ষা। এখানে ছাত্রেরা কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতির একটি শাখা বেছে নিয়ে তাতে বিশেষ শিক্ষা লাভ করে। বিষয়ে সমধিক অধিকার লাভের জন্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়াই কাম্য। অবশ্য এই স্তরে শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক আছে। কিছু ইংরেজি ভাষানুরাগী আছেন, যাঁদের মতে ইংরেজির মাধ্যমে বিজ্ঞান না শিখলে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শেখালে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবে, এই যুক্তি নিতান্তই ভ্রান্ত। প্রত্যেক উন্নত দেশেই নিজ মাতৃভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষা হয়। যদি ফরাসী, জার্মান, রুশ, হাঙ্গেরীয়, রুমানীয়, পোলিশ ও জাপানী ভাষায় উন্নতমানের বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব হয়, বাংলা ভাষায় সম্ভব না হবে কেন? বিজ্ঞান, সাহিত্য যদিও ভাষায় প্রকাশিত হয়, তবু ভাষার অতিরিক্ত এর সত্তা আছে ও তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব। এই স্তরেও আর একটি ভাষা (যা মাধ্যমিক বা প্রাক-স্নাতক স্তরে পড়ে নি) শিক্ষা দেওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন ওঠে মাতৃভাষা বাদে যদি তিনটি ভাষা-শিক্ষা কাম্য হয়, তবে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা দেওয়া হবে না কেন?

প্রথম কারণ, যারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করবে না (যার জনসংখ্যায় শতকরা দশ অংশেরও কম)* তাদের অযথা ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষায় সময়, শক্তি ও অর্থ নষ্ট না করে তাদের জীবন-যাত্রার জন্যে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় শেখানোই ভাল। আর একটি কারণ, একটা ভাষা ভাল করে শিক্ষার পর অন্য ভাষা শিক্ষা সহজ হয়। গান্ধীজী এই মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। (If our education is more systematic and the boys free from the burden of having to learn their subjects through a foreign medium, I am sure, learning all these languages would not be an irksome task, but a perfect pleasure. A scientific knowledge of one language makes a knowledge of other languages comparatively easy.

*আমেরিকাতেই বুঝি শতকরা বিশ ভাগ মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা নেয়।

স্নাতকোত্তর শ্রেণীর কৃতী ছাত্রেরা গবেষণা সুরু করেন। এর কোন নির্দিষ্ট কারণ নেই। অজানাকে কখন কিভাবে জানা যাবে, প্রথম থেকে বলা যায় না। গবেষণার বিষয় নেওয়া হয় সাধারণতঃ স্নাতকোত্তর স্তরে পঠিত বিষয়-সংশ্লিষ্ট কোন সমস্যা। এই স্তরেও মাধ্যম মাতৃভাষা হওয়া উচিত। এতে একদিকে প্রবেশ ভাল হবে, অপর দিকে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের কিছু কিছু দেশে সহজে প্রচারিত হবে, দেশের সঙ্গে প্রাণের যোগ যুক্ত হবে। মাতৃভাষায় প্রথমে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে যা উচ্চমানের হবে, তা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্যে পরে ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে। পোল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দেশে এরূপ করা হয়।

শ্রীমহাদেব দত্ত

বিজ্ঞান-সংবাদ

দীর্ঘস্থায়ী দুধের জনপ্রিয়তা

একটি বৃটিশ ফার্মের তৈরি দীর্ঘস্থায়ী দুধ (ঠাণ্ডা অবস্থায় নয়, কিন্তু ছয় মাস তাজা থাকে) প্রস্তুতের পর থেকে মোট ১০০,০০০ গ্যালন বিক্রী হয়েছে। আট মাস আগে এটি প্রস্তুত করা হয়।

প্রস্তুতকারকদের সংবাদে প্রকাশ, এই দুধের শতকরা ৮০ ভাগ রপ্তানী হয়েছে বিদেশে। সিরিয়া, পারস্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ, পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহ, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়েশিয়া, জিব্রাল্টার এবং মালদ্বীপে এই দুধের নিয়মিত সরবরাহ আছে। ১৬টি জাহাজ প্রতিষ্ঠান এই দুধ সরবরাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। ৫০টি দেশ থেকে এই পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে।

এই দুধকে প্রথমে মাত্র দু-সেকেণ্ডের জন্যে ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরম করা হয় এবং তারপরই তড়িৎগতিতে ঠাণ্ডা করা হয়। এতে অতিরিক্ত কোন খরচ পড়ে না এবং দুধের স্বাদও অক্ষুণ্ণ থাকে।

নতুন ধরণের তিন-সিটের মোটর গাড়ী

বর্তমানে মোটর গাড়ী পার্কিং (দাঁড় করানো) সব দেশেরই একটি বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমস্যাটি নিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার ও বিশেষজ্ঞেরা মাথা ঘামাচ্ছেন।

বৃটিশ ডিজাইনার মিঃ ই. জে. ররার্টস এমন এক তিন-সিটের মোটর-গাড়ীর নক্সা প্রস্তুত করেছেন, যা সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় জায়গার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকবে। এই গাড়ী সোজাসুজি পাশের দিকে ঘুরতে পারে।

গাড়ীটি মাত্র ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি লম্বা, ৫ ফুট ৩½ ইঞ্চি চওড়া, ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি উঁচু। প্রয়োজন হলে সামনের চাকা দুটি একটুও না এগিয়ে সোজাসুজি ঘুরতে পারে।

গাড়ীটি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সকল কাজেই ব্যবহারযোগ্য। ইংল্যাণ্ডে এই গাড়ীর দাম হবে আনুমানিক ৬০০০ টাকা।

বাতরোগ সম্পর্কে শামুকের উপর পরীক্ষা

এতদিন চিকিৎসা-বিদ্যার গবেষণায় গিনিপিগের সাহায্য নেওয়া হতো। এবার শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জিওফ্রে মীক বাতরোগের মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে শামুক নিয়ে পরীক্ষা করবেন।

মানুষের দেহের মতই শামুকের দেহেও রয়েছে কোলাজেন নামক সংযোজক তন্তু।

বাতরোগের গবেষকদের মতে—এই কোলাজেনের গণ্ডগোলের জন্যেই বাতরোগের সৃষ্টি হয়। জানা গেছে যে, কোলাজেন তৈরি করে ফাইব্রোব্লাষ্টিন নামক বিশেষ কোষ। কোলাজেনকে সব সময়ই কোষের বাইরে দেখা যায়, কোন সময়েই এদের কোষের ভিতরে দেখা যায় না।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে ডাঃ মীক দেখতে পান যে, কিছু শামুকের ফাইব্রোব্লাষ্টিনের ভিতরেও কোলাজেন দেখা যায়। এইভাবে গিনিপিগের মত শামুকও গবেষণাগারের প্রাণী হয়ে উঠেছে। এখন শামুকের খোল নিয়ে পরীক্ষা চলবে। ডাঃ মীককে এই গবেষণা চালাবার জন্যে তিন বছরের একটি বৃত্তি দিয়েছেন আর্থ্রাইটিস অ্যাণ্ড রিউম্যাটিসিজম কাউন্সিল।

শব্দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

বৃটেনের বিল্ডিং রিসার্চ ষ্টেশন এমন একটি দ্বি-স্তর জানালা উদ্ভাবন করেছে, যা বাইরের গোলমাল, শব্দ ইত্যাদি দূরে রাখতে পারবে। এরূপ একটি জানালা লণ্ডন বিমান-বন্দর থেকে কিছু দূরে একটি স্কুলে বসানো হয়েছে।

এই ব্যবস্থায় বাড়ীর ছাতে একটি মাইক্রোফোন বসানো থাকে। বাইরের শব্দ একটি বিশেষ মাত্রায় পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে জানালা যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। শব্দ নীচু মাত্রায় নামলে জানালা আবার আপনা থেকেই খুলে যায়।

এই দ্বি-স্তর জানালা বিশেস করে স্কুলের জন্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে।

জানালার দুটি স্তরের মধ্যে ব্যবধান আট ইঞ্চির মত এবং তা বাতাস ভর্তি বলে শব্দ প্রবেশ করতে পারে না। এই স্বয়ংক্রিয় দ্বি-স্তর জানালা ফিক্সড্ ডবল জানালার মত কার্যকরী। এই জানালাকে সকল আবহাওয়ার উপযোগী করা হয়েছে।

আগামী কালের হোভারট্রেন

ভবিষ্যতে ট্রেন হয়তো চলবে বায়ুর চাপে এবং এই সব ট্রেনের গতিবেগ হয়তো হবে ঘণ্টায় প্রায় ২৫০ মাইল। কেউ কি কল্পনা করতে পারে—এক্সপ্রেস ট্রেন চলেছে, কিন্তু তা রেলের উপর দিয়ে চলে না এবং চলে বায়ুর চাপে? কিন্তু অদূর ভবিষ্যতেই তা সম্ভব হতে পারে।

সম্প্রতি উদ্ভাবিত যান, যেমন 'হোভারক্রাফট',

বিনা ডানায় বা বিনা চাকায় নিছক বায়ুর চাপে গড়িয়ে গিয়েই দ্রুতগতি লাভ করতে পারে।

এই পদ্ধতিতে এখন সমুদ্রপথে যাত্রী বহনের কাজও চলছে—বেশ খানিকটা দূরত্ব এইভাবে অতিক্রম করা হচ্ছে। আশা করা যায় স্থলপথেও এই ব্যবস্থা—হোভারট্রেনের রূপে দেখা দেবে।

বর্তমানে যে সব পরিকল্পনা হয়েছে, তাথেকে জানা যায়, প্রথম হোভারট্রেনগুলি প্রাচীরের ধরণের কংক্রিটের পথের উপর দিয়ে ছুটবে এবং তা দু-বছরের মধ্যেই ঘণ্টায় ১০০ মাইল পর্যন্ত গতিবেগ লাভ করতে পারবে।

হোভারক্র্যাফট-এর উদ্ভাবক মিঃ ক্রিষ্টোফার ককরেল বলেন, পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে হোভার-ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫০ মাইল করা সম্ভব হবে।

গবেষণায় জানা গেছে যে, হাভারক্র্যাফট উচ্চ অথবা নিম্ন গতির পথ-যান হিসাবে অন্য সব যানের তুলনায় অনেক বেশী ফলপ্রদ হবে।

প্রথম হোভারট্রেনের চাকা থাকবে বলে অনুমান করা হয়, তবে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে, শেষ পর্যন্ত চাকা একেবারে তুলে দেওয়া যাবে। ভবিষ্যতের হোভারট্রেনগুলি সম্পূর্ণভাবে চলবে বায়ুর উপর ভর করে।

ভারী লরীর ভার লাঘব

যখন বড় বড় ভারী লরীগুলি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী সেতুর উপর দিয়ে যায়, তখন সেতুর উপর খুব বেশী চাপ পড়ে। সেতুগুলিকে শক্তিশালী করতে অনেক খরচ হয়।

এজন্যে বৃটেনের সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি জেনারেটিং বোর্ড একটি অন্য সমাধানের কথা ভাবছেন। লরীর পিছনের ট্রেলারগুলিতে যদি ‘হোভারক্র্যাফট’ পদ্ধতি যুক্ত করা যায়, তাহলে সমগ্র ভারটি শুধু চাকার উপর না পড়ে বিস্তৃত জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে। এই ভাবে সেতুর কোন নির্দিষ্ট স্থানে যে চাপ পড়ে, তা কয়েক শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হবে।

হোভারক্র্যাফট বায়ুর চাপে চলে। সে জন্যে প্রত্যেক ট্রেলারের সঙ্গে একটি ‘স্কার্ট’ (ঝালর জাতীয় জিনিষ) ও একটি বায়ু-সঞ্চালনের যন্ত্র যুক্ত করবার কথা আছে। সেতুর নিকটবর্তী হলে চালক অতিরিক্ত একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে স্কার্টটিকে নীচু করে বায়ু-সঞ্চালনের যন্ত্রটিকে চালু করে দেবে। চাকা মাটি স্পর্শ করে থাকলেও তার উপর বিশেষ চাপ পড়বে না।

ভাইকারস্ আর্মষ্ট্রং কোম্পানী ইতিপূর্বেই ল্যাণ্ড রোভার গাড়ীর সঙ্গে এই স্কার্ট যুক্ত করেছেন। এবার তারা হোভারক্র্যাফট ডেভেলপ-মেণ্ট লিমিটেডের সহযোগিতায় এই নতুন ডিজাইনের জন্যে কাজ করছেন।

লরীগুলিকে হোভারক্র্যাফট যুক্ত করা ব্যয়সাধ্য হতে পারে, কিন্তু সেতুগুলিকে শক্তি-শালী করবার মত ব্যয়সাধ্য নিশ্চয়ই হবে না।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—১৯৬৬

১৯শ বর্ষ : ষষ্ঠ সংখ্যা
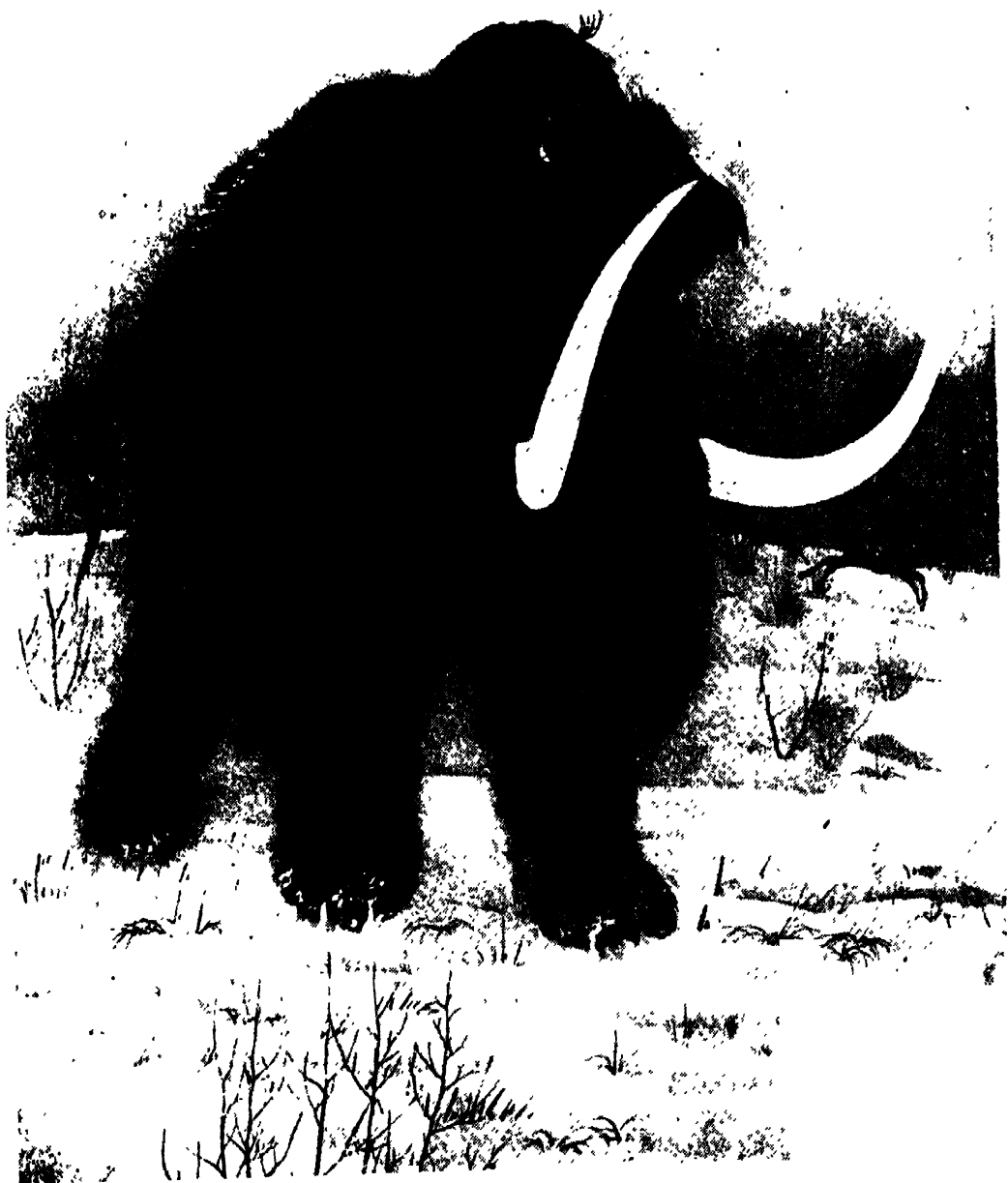
প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোমশ ম্যামথ ।

করে দেখ

ভাসমান কর্কের খেলা

একটা কাচের গ্লাসের কানার সমান জল ভর্তি করে তাতে ছোট একটা কর্ক্ ছেড়ে দাও। দেখবে—কর্ক্‌টা গ্লাসের একপাশে লেগে ভেসে আছে। বন্ধুদের বল—গ্লাসের কোন দিক স্পর্শ না করে তাদের মধ্যে কেউ জলের ঠিক মাঝখানটায় কর্ক্‌টাকে ভাসিয়ে রাখতে পারে কিনা। কিন্তু তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, কেউ সেটাকে জলের ঠিক মধ্যস্থলে ভাসিয়ে রাখতে পারবে না।
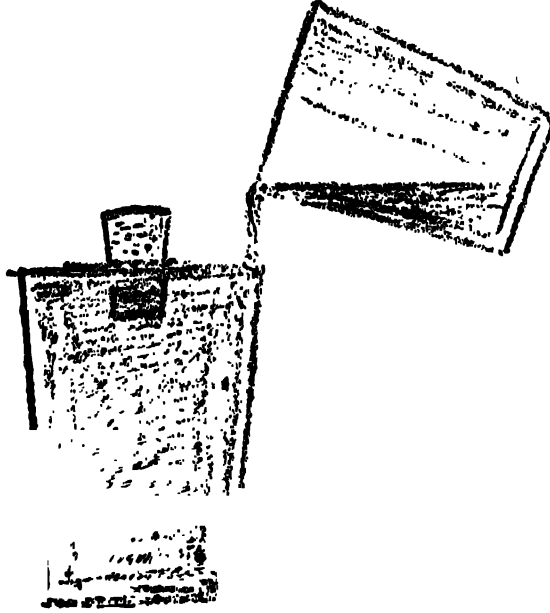
সবাই যখন অকৃতকার্য হবে, তখন তুমি তাদের দেখিয়ে দিতে পার—কত সহজে এই কাজটা করা যেতে পারে। অন্য একটা গ্লাস থেকে ঐ গ্লাসটার মধ্যে খুব সতর্কভাবে আস্তে আস্তে আর একটু জল ঢেলে দাও, যেন জলটা উপ্‌চে না পড়ে' কানা থেকে সামান্য একটু উঁচু হয়ে থাকে। তলটানের (Surface tension) ফলে জলের উপরিভাগ কুব্জপৃষ্ঠের মত উপরের দিকে ঈষৎ বেঁকে থাকবে। কর্ক্‌টা তখন আপনা থেকেই গ্লাসের জলের সর্বোচ্চ স্থানে সরে গিয়ে স্থির হয়ে থাকবে।

সূর্যের সংসার

যে সুনীল আকাশ পৃথিবীকে নিবিড়ভাবে ঢেকে রেখেছে, তার রাজা হলেন সূর্য ঠাকুর। দিনের বেলায় রাজার দাপটে প্রজাদের দেখা মেলে না। রাতে যে অসংখ্য তারা আকাশের গায়ে ফুটে ওঠে, তারা সবাই কিন্তু সূর্য ঠাকুরের প্রজা নয়। মাত্র নয়জন বড় প্রজা নিয়ে তাঁর রাজত্ব। প্রজারা হলো বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, কিছুদিন আগেও সূর্যদেবের এই রাজত্বের হদিশ কেউ জানতো না।

পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, একথাটা আজ আমরা সবাই জানি। পুরাকালের লোকেরা কিন্তু এই সহজ কথাটা জানতো না। খৃঃ পূঃ ৪০০ শতকে অ্যারিষ্টটল এক নতুন মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে, আমাদের এই পৃথিবী নিশ্চল অবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে, আর স্বচ্ছ সব গোলকের দল নক্ষত্র-রাশিকে নিয়ে এর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সব গোলকের বাইরে আরও একটা গোলক আছে, যার নিয়ন্ত্রণ কর্তা হলেন স্বয়ং ভগবান। জ্যোতির্বিদ কোপার-নিকাস এই চলতি মতবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর কথায় কেউই আমল দেয় নি। এরপর গ্যালিলিও অ্যারিষ্টলের মতবাদ নাকচ করে দিলেন। তিনি বললেন—সূর্য নয়, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। অমনি ধর্মযাজকেরা হেঁকে উঠলো—খবরদার, ও কথা বলা চলবে না। সাধারণ লোকেরাও তাঁর মতবাদ কানে তুললো না। ধর্মযাজকদের জ্বালায় অস্থির হয়েও তিনি সত্যের সন্ধান চালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত গ্যালিলিও এবং তাঁর সহকর্মীদের চেষ্টায় লোকেরা জানলো, সূর্যের চারদিকে গ্রহ-উপগ্রহেরা ঘুরছে, আর তাদেরই মধ্যে পৃথিবী একটা সাধারণ গ্রহ মাত্র।

আকাশের অনেক তারার মত সূর্যও একটা তারা। এই সূর্যের একটা ছোট সংসার আছে, গ্রহ ও উপগ্রহগুলি হলো যার সদস্য। সৌরপরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সূর্য। গ্রহগুলিকে পর পর সাজালে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও সবশেষে প্লুটো। এই সব গ্রহ নির্দিষ্ট কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলছে। প্রদক্ষিণের সময় এরা নিজ নিজ কক্ষের উপর লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে। যে গ্রহ সূর্যের সবচেয়ে কাছে, সূর্যকে পরিক্রমা করতে তার সময় লাগে সবচেয়ে কম। সূর্য থেকে গ্রহগুলির দুরত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পরিক্রমার সময়ও বাড়তে থাকে।

উপরের নয়টি প্রধান গ্রহ ছাড়াও অসংখ্য ছোট ছোট গ্রহ কাছাকাছি থেকে

সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এরা হলো গ্রহাণুপুঞ্জ বা গ্রহকণিকা। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে এদের অবস্থিতি। ১৮০১ সালে সিসিলি দ্বীপের জ্যোতির্বিদ পিয়াজী এই গ্রহকণিকার সবচেয়ে বড় কণাটিকে আবিষ্কার করেন। এর নাম সিরিস। এরপর আরও গ্রহকণা আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা হলো পালাস্, ভেষ্টা, জুনো প্রভৃতি। এরা সবাই খুবই ছোট ছোট গ্রহ। সবচেয়ে বড় সিরিসের পরিমাপ মাত্র ৪৮০ মাইল।

বুধ সূর্যের নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৫৭৮'৫ লক্ষ কিলোমিটার। সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে বা সূর্যোদয়ের আগে পূব আকাশে এর দেখা মেলে। বুধের কোন উপগ্রহ নেই। বুধের পরই শুক্র। আয়তনে এই গ্রহটি বুধের চেয়ে বড়, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে ছোট। পূব আকাশের যে তারাটিকে আমরা শুকতারা বলি, সেটাই শুক্রগ্রহ। এই গ্রহের কোন উপগ্রহ নেই। এরপর আমাদের পৃথিবী—সূর্য থেকে যার দূরত্ব ১৪৯৪'৫ লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবীতে আমাদের বাস, তাই এই গ্রহের সবচেয়ে বেশী খবর আমরা জানি। চাঁদ হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবীর পরের গ্রহ মঙ্গল। গাঢ় কমলা রঙের অনুজ্জ্বল এই গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্বের কথা অনেকে বলে থাকেন। আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহে মেরিনার-৪ নামক উপগ্রহ পাঠিয়েছিলেন। মেরিনার-৪ কর্তৃক প্রেরিত ফটো থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, মঙ্গল গ্রহে বুদ্ধিমান জীবের কোন অস্তিত্ব নেই। মঙ্গলের দুটি উপগ্রহ—ফোবাস ও ডিমোস। আয়তনে এদের মধ্যে বৃহস্পতি বৃহত্তম। বৃহস্পতি পৃথিবী থেকে প্রায় তেরো-শ' গুণ বড়। এর বারোটি উপগ্রহের মধ্যে ক্যালিস্টো বৃহত্তম। আয়তন অনুসারে বৃহস্পতির পরই শনির স্থান। তিনটি জ্যোতির্ময় বলয় একে বেষ্টন করে আছে বলে এর বহিরাকৃতি খুব সুন্দর। শনির নয়টি উপগ্রহ। সবচেয়ে বড়টি হলো টানটান, আর সবার ছোটটি ফোবে। শনির পর ইউরেনাস। এই গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৭৬১ সালে আর এর আবিষ্কারক হলেন হার্শেল। ইউরেনাসের চারটি উপগ্রহ। এরিয়েল, আমাব্রিয়েল, টিটোনিয়া ও ওবেরন। নেপচুন ও ইউরেনাস আকারে প্রায় সমান। আডাম্স্ ও লেভেরিয়ার ১৮৪৬ সালে একই সময়ে এই গ্রহটিকে আবিষ্কার করেন। নেপচুনের মাত্র একটি উপগ্রহ। সৌরজগতের সর্বশেষ গ্রহ প্লুটো। ১৯৩০ সালে এর আবিষ্কার হয়। প্লুটো সৌরজগতের সুদূরতম ও শীতলতম গ্রহ। অনেকে প্লুটোর পর আরও একটি গ্রহের অবস্থিতির কথা ভেবে থাকেন। কিন্তু এর অস্তিত্বের কথা এখনও প্রমাণিত হয় নি।

গ্রহ-উপগ্রহ এবং গ্রহকণিকা ছাড়া সূর্যের সংসারে আরও দু-রকমের সদস্য আছে। তারা হলো ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জ।

শ্রীজয়ন্তকুমার মৈত্র

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। রামন এফেক্ট কি ?

মহুয়া বিশ্বাস

প্রঃ ২। আলেয়া কি ?

জয়শ্রী ভাদুড়ী

প্রঃ ৩। মেথিলেটেড স্পিরিট কি ?

রুবি কুণ্ডু, সোমা দত্ত

উঃ ১। এক বর্ণের বা স্থির কোন এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো কোন স্বচ্ছ মাধ্যম দিয়ে পাঠালে আলোকরশ্মি মাধ্যমের অণুতে বাধা পেয়ে বিকিরিত হয়ে পড়ে। এই বিকিরিত আলো ও বিকিরণের পূর্বাপর আলোর যে কোন অল্প পরিবর্তনও আমরা যন্ত্র দিয়ে লক্ষ্য করতে পারি। ১৯২৮ সালে রামন দেখান যে, বিকিরিত জ্যোতির মধ্যে উদ্ভাসী আলো ছাড়া আরও ক্ষীণ কিছু নতুন আলো মিশে আছে। এদের রং আলাদা অর্থাৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা কম্পনাঙ্ক পৃথক। এই নতুন ভিন্ন-ধর্মী আলোক তরঙ্গমালাকে রামন-রশ্মি বলা হয়। কত রকমের নতুন কম্পনাঙ্কের আলো তৈরি হবে তা বিকিরক অণুর গঠনের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন অণুর ক্ষেত্রে রামন-রশ্মি বিশ্লেষণ করে আমরা সেই সব অণুর আভ্যন্তরীণ পরমাণু-বিন্যাস, আপেক্ষিক তাপমাত্রা, বৈদ্যুতিক ভ্রামক (Electric moment), বোলজ্-ম্যানীয় শক্তির বণ্টন ও অপরাপর পদার্থগত নিত্যধর্ম নির্ণয় করতে পারি। অধ্যাপক সি, ভি, রামনের এই আবিষ্কারকে আমরা রামন-প্রক্রিয়া বা রামন এফেক্ট বলি।

উঃ ২। পচা উদ্ভিদপূর্ণ অগভীর জলাশয়ে সামান্য নাড়া লাগলে একপ্রকার গ্যাস বুদ্বুদ আকারে বেরিয়ে আসে এবং তা বাতাসের সংস্পর্শে এসে জ্বলে ওঠে। তখন দূর থেকে মনে হয় একটা আগুনের শিখা দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। একেই আলেয়া বলে।

হপ-শেলারের (Hoppe-Seyler) মতবাদ অনুযায়ী জলের নীচে উদ্ভিদের দেহকোষ গঠনকারী সেলুলোজ অ্যামাইলোব্যাক্টেরিয়াম (Amylobacterium) নামক একপ্রকার ছত্রাকের প্রভাবে অবিভাজক শর্করা $C_6H_{12}O_6$-এ পরিণত হয়—যেটা ভেঙ্গে গিয়ে মিথেন (CH_4) ও কার্বন-ডাইঅক্সাইড (CO_2) উৎপন্ন হয় :

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 3CH_4+3CO_2.$$

পচন ক্রিয়ায় উদ্ভূত গ্যাসে এছাড়াও অল্প পরিমাণ ফস্ফিন (PH_3), ফস্ফরাস এবং ফস্ফরাস ডাইহাইড্রাইড (P_2H_4) থাকে। এগুলি ক্যালসিয়াম ফস্ফাইডের (Ca_3P_2) বিশ্লেষণে উৎপন্ন হয় :

$$3\,Ca_2\,P_2 + 12H_2O = 4PH_3 + P_2 + 6\,Ca\,(OH)_2$$

$$Ca_2\,P_2 + 4H_2O = 2\,Ca\,(OH)_2 + P_2H_4.$$
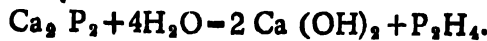
এই গ্যাস মিশ্রণের মধ্যে মিথেন ও ফস্‌ফিন দাহ্য, কিন্তু দহনে সাহায্য করে না। কিন্তু ফস্‌ফরাস ডাইহাইড্রাইড বাতাসের সংস্পর্শে আসা মাত্রই জ্বলে ওঠে। অবশ্য ফস্‌ফরাসও কিছুটা আলোকচ্ছটা বা ফস্‌ফোরেসেন্স দেয়। সুতরাং P_2H_4 জ্বলে ওঠা মাত্র দাহ্য পদার্থগুলি (CH_3, PH_3) জ্বলতে আরম্ভ করে। এভাবে উৎপন্ন আগুনের শিখাই হচ্ছে আলেয়া। সাধারণ মানুষেরা রাতের অন্ধকারে এই স্বতঃস্ফূর্ত আলোকের শিখাকে কোন রকম ভৌতিক ক্রিয়াকলাপের অংশ বলে মনে করে থাকে।

উঃ ৩। সাধারণতঃ অ্যালকোহল বিনা আবগারী শুল্কে বিক্রয় হয় না। অথচ বিভিন্ন শিল্পে প্রচুর পরিমাণে অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সে জন্যে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শিল্পপতিরা বৃটিশ সরকারের নিকট বিনা শুল্কে অ্যালকোহল বিক্রয়ের জন্যে আবেদন করেন। তখন বৃটিশ সরকার নয় ভাগ রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট (C_2H_5OH) এবং একভাগ মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH) মিশিয়ে মেথিলেটেড স্পিরিট নামে বিনা শুল্কে বাজারে ছাড়লেন। উদ্দেশ্য, যাতে এই মিশ্রণ পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা না যায় (যেহেতু মিথাইল অ্যালকোহল বিষাক্ত), অথচ শিল্পে ব্যবহৃত হতে পারে।

বর্তমানে মেথিলেটেড স্পিরিটে বিভিন্ন যৌগ পদার্থ মেশানো হচ্ছে এবং এগুলি বাজারে বিভিন্ন নামে পরিচিত :

(১) ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মেথিলেটেড স্পিরিট—এর মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ বা ততোধিক উড্‌ ন্যাপ্‌থা (Wood naphtha) থাকবে। [কাঠের অন্তর্ধূম পাতন প্রণালীতে অপরিশোধিত অবস্থায় পাওয়া বর্ণহীন বিষাক্ত তরল পদার্থকে উড্‌ ন্যাপ্‌থা বলা হয়। এর প্রধান উপাদান মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH)]।

(খ) মিনারালাইজড্‌ মেথিলেটেড স্পিরিট—এখানে প্রতি নব্বই আয়তন ভাগ স্পিরিটের সঙ্গে সাড়ে নয় আয়তন ভাগ উড্‌ ন্যাপ্‌থা এবং অর্ধ আয়তন ভাগ অপরিশোধিত পিরিডিন (Crude pyridine) থাকে। আবার প্রতি এক-শ' গ্যালনের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পেট্রোলিয়াম তেল ও অ্যানিলিন ডাই (মিথাইল ভায়োলেট) থাকে।

(গ) পাওয়ার মেথিলেটেড স্পিরিট—এতে বিভিন্ন নির্দিষ্ট মাত্রায় রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটের সঙ্গে উড্‌ ন্যাপ্‌থা, অপরিশোধিত পিরিডিন, পেট্রোল বা বেঞ্জল ইত্যাদি মেশানো হয়।

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

পরলোকে ডাঃ পি. মাহেশ্বরী

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডাঃ পঞ্চানন মাহেশ্বরী ১৮ই মে নয়াদিল্লীতে ৬২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে সুপরিচিত ডাঃ মাহেশ্বরী উদ্ভিদের ভ্রূণতত্ত্ব ও অঙ্গসংস্থান সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, বৃটেন, ক্যানাডা, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও জার্মেনী পরিভ্রমণ করে সেখানকার উদ্ভিদ-শালার বিভিন্ন নতুন তথ্যাদির অনুসন্ধান করেছেন।

জয়পুর ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ডাঃ মাহেশ্বরী আগ্রা কলেজ, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তী কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রধানতঃ গমের অঙ্কুর সম্পর্কিত গবেষণাতেই ব্যাপৃত ছিলেন। পরবর্তী কালে বৃক্ষের অঙ্গসংস্থানের রহস্যপূর্ণ বিষয়টি তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ডাঃ মাহেশ্বরী লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে যোগদান করেন। সে বছরেই তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৯ সালে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভিজিটিং' প্রোফেসর ও ১৯৬৪ সালে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে বীরবল সাহানি ও হোরা স্মৃতি পদক লাভ করেন।

গ্রহান্তরে জীবন-কণা

সিয়ার্টলের এক খবরে প্রকাশ—বৃটেনের জডরেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরের ডিরেক্টর স্যার বার্নার্ড লোভেল সিয়ার্টলের বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতায় বলেন—ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্র বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ছায়াপথের মেঘপুঞ্জের মধ্যে জীবন সৃষ্টির প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ নিশ্চয়ই রয়েছে।

ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের পথে এই রাসায়নিক পদার্থগুলি মিশ্রিত হয়ে জীবন সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হতে থাকে। নিকটবর্তী গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছাতে পারলে মানুষ নিশ্চয়ই জীবন-কণার আদি বস্তুটির সন্ধান পাবে।

ভ্রম সংশোধন—'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' এপ্রিল সংখ্যায় 'প্রশ্ন ও উত্তর' বিভাগে 'জীম্যান এফেক্ট কি ?'—এই প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে হায়দরাবাদের ডিফেন্স ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ লেবরেটরীর শ্রীঅমিতোষ ভট্টাচার্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আলোক-তরঙ্গ পাঠালে জীম্যান এফেক্ট-এর সৃষ্টি হয় বলে উত্তরে যে কথা লেখা হয়েছিল, সেটা ভ্রমাত্মক। জীম্যান এফেক্টের জন্যে আলোকের উৎসকেই চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখতে হয়। এটা সহজেই বোঝা যায়—কেন না, জীম্যান এফেক্টের কারণই হলো উৎসের অভ্যন্তরস্থ ইলেকট্রনের সম্ভাব্য অবস্থাগুলির উপর প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব। —স

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

উনবিংশ বর্ষ | জুলাই, ১৯৬৬ | সপ্তম সংখ্যা

পঞ্চভূতের একটি ভূত

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

সাধারণ পরিচয়

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় জড়সৃষ্টির অন্তিম উপাদান হিসাবে পাঁচটি মহাভূতের অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়েছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম নামে হলো এদের পরিচয়। কিন্তু ক্ষিতি শব্দে এখানে শুধু মাটিকে বুঝলে চলবে না; ক্ষিতি হলো যাবতীয় মৃত্তিকাধর্মী পদার্থ, অর্থাৎ সকল কঠিন পদার্থ। সেরূপ অপ্ বললে বুঝতে হবে শুধু জল নয়, কিন্তু যাবতীয় জলধর্মী বা তরল পদার্থ। তেজ হলো এইভাবে সকল আলোক ও তাপধর্মী সত্তা। মরুৎ হলো সকল বায়ুধর্মী পদার্থ এবং ব্যোম হলো আকাশ বা শূন্যদেশ। প্রাচীন ভারতের দার্শনিকেরা আকাশকেও জড়পদার্থের একটি চরম উপাদান হিসাবে গণ্য করতেন। আবার এই আকাশ থেকেই বাকী চারটি মহাভূতের উৎপত্তি হয়েছে, এ ছিল তাঁদের ধারণা। সুতরাং তাঁদের মতে আকাশই হলো জড়বিশ্বের একমাত্র অন্তিম উপাদান।

বর্তমান প্রবন্ধে অপ্ মহাভূতের অন্তর্গত আমাদের অতি পরিচিত ও অতি প্রয়োজনীয় জলের গঠন, ধর্ম ও গুণাবলী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলো লেখকের উদ্দেশ্য। পাঠক পাঠিকারা হয়তো মনে করবেন জলের মত এমন

একটি অতি সাধারণ জিনিসের এমন কী অসাধারণ ধর্ম থাকতে পারে যে, বিংশ শতকের শেষার্ধে বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর প্রগতির যুগে, তার আলোচনার আবশ্যক হতে পারে। সত্য বটে, জল অতি সাধারণ জিনিস যা আমরা দিনরাত ব্যবহার করি এবং অপচয়ও করি প্রচুর পরিমাণে। কিন্তু জল না হলে মানুষের জীবন টেঁকে না। মানুষ অন্নাভাবে কয়েকদিন বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণায় জলের অভাব হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জীবনের সঙ্গে জলের সম্বন্ধ খুবই নিকট। কথায় বলে জলই জীবন। সৃষ্টির আদিযুগে জীবনের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল জলে—প্রাচীন সমুদ্রের জলে অ্যামোয়বারূপে। জলহীন স্থানে জীবনের কোন চিহ্ন মেলে না, মরুভূমিতে বীজ বুনলে সকল পরিশ্রম যায় পণ্ড হয়ে। পৃথিবীর $\frac{৯}{১০}$ ভাগ জীবের বাসস্থান হলো জলে। মানুষের দেহের $\frac{৩}{৪}$ ভাগ হলো জল, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের $\frac{৩}{৪}$ ভাগ হলো জলে ঢাকা। এক কথায় বলা চলে যে, জীবনের সঙ্গে জলের সম্বন্ধ হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন।

পৃথিবীপৃষ্ঠে জীবনের আবির্ভাবের পুর্বে জলই ছিল একমাত্র তরল পদার্থ। এই একমাত্র পদার্থ যা আমরা কঠিন, তরল ও মারুত তিন অবস্থাতেই দেখতে পাই—উত্তুঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে বরফরূপে, নদী সমুদ্র ও প্রস্রবণে জলরূপে এবং বায়ুমণ্ডলে বাষ্পরূপে।

জল হচ্ছে পৃথিবীতে জীবনের অগ্রদূত। যুগ যুগান্তব্যাপী পৃথিবীগ্রহকে নানাপ্রকারে এটি উপযোগী করে তুলেছিল জীবনের আবাহন ও আবির্ভাবের জন্যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের কঠিন শিলাকে ভেঙ্গে চূর্ণ করে পরিণত করেছে উদ্ভিদ জন্মের উপযোগী নরম মাটিতে, আদিযুগের পৃথিবীর আবহাওয়ার কঠোর উত্তাপ ও শৈত্যকে প্রশমিত করে তাকে গড়ে তুলেছে তরুলতা ও জীবজন্তুর বাসোপযোগী পরিবেশে।

রাসায়নিক পরিচয়

রাসায়নিক পরিচয়ের গোড়াতেই জলের মাতাপিতার উল্লেখ করতে হয়। যে দুটি মৌল পদার্থের (হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন) সম্মিলনে জলের জন্ম, তারা হলো মৌল সমাজে বিশেষ সামাজিক ও সক্রিয়। মাতাপিতার বহুগুণ উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করা সত্ত্বেও জলের প্রবল বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

প্রথমত সংক্ষেপে জলের মাতাপিতার পরিচয় দেওয়া যাক। (ক) অক্সিজেন—এটি একটি গ্যাস বা মারুত মৌলিক পদার্থ—পৃথিবী গ্রহের ও তার বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান উপাদান। পৃথিবীপৃষ্ঠের পদার্থসমষ্টির শতকরা ৫০ ভাগ হচ্ছে অক্সিজেন; বায়ুমণ্ডলে এর অস্তিত্ব হচ্ছে আয়তনে প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এটি বিশুদ্ধ মৌল নয়। তিন প্রকারের বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর অস্তিত্ব দেখা যায় অক্সিজেন গ্যাসে, যথা :

O^{16} (শতকরা ৯৯·৮), O^{17} (শতকরা ০·১), O^{18} (শতকরা ০·১)। পরমাণু কেন্দ্রের সংযুতি : ৮ প্রোটন +৮, ৯ বা ১০ নিউট্রন, কেন্দ্রের বাইরে চক্রপথে ভ্রমণশীল ইলেকট্রনের সংখ্যা ৮। স্ফুটনাঙ্ক :—১৮৩°C, হিমাঙ্ক :—২১৯°C। সাধারণতঃ বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন অতি উগ্র ক্রিয়াশীল পদার্থ; বহু মৌলিক পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে প্রচুর তাপশক্তির সৃষ্টি করে। প্রজ্বলন প্রক্রিয়া ও জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ার পোষক। উপযুক্ত পরিমাণে অক্সিজেনের অভাবে কোন জিনিস জ্বলতে পারে না বা কোন জীবজন্তু বাঁচতে পারে না। অক্সিজেনের সহযোগে দেহে ভুক্তদ্রব্যের যে বিপাক (Metabolism) ঘটে, তাতে আসে আমাদের দেহের তাপ এবং চলাফেরা ও সকল কাজের শক্তি। এ-শক্তি থেকেই চলে আমাদের হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ইচ্ছামত সঞ্চালন।

অক্সিজেনের প্রভাবেই আবার আমাদের রান্না ঘরের উনানে এবং কারখানার চুল্লীতে জ্বলে আগুন।

১৭৭৪ সালে ইংরাজ বিজ্ঞানী প্রীষ্টলি অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখেন যে, অক্সিজেন গ্যাসে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি অধিকতর উজ্জ্বল শিখায় বেশি তাড়াতাড়ি জ্বলে যায়; একটি ইঁদুর অক্সিজেন গ্যাসে বেশ উৎসাহের সঙ্গে লাফালাফি করতে থাকে। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, একটি বাড়ন্ত চারাগাছ থেকে অক্সিজেন নির্গত হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় যে সূর্যরশ্মির প্রয়োজন হয়, তা প্রীষ্টলি বুঝতে পারেন নি। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ রাসায়নিক জান ইনজেনহাউস এই তথ্যটি প্রথম আবিষ্কার করেন। প্রীষ্টলি এই অক্সিজেন গ্যাসের নাম দিয়েছিলেন ডিফ্লজিষ্টিকেটেড বায়ু অর্থাৎ বায়ু থেকে ফ্লজিষ্টন বেরিয়ে গেলে যে গ্যাস থাকে তাকেই বলা যায় ডিফ্লজিষ্টিকেটেড বায়ু।

বাড়ন্ত চারাগাছ থেকে অক্সিজেন গ্যাসের উৎপত্তি লক্ষ্য করে প্রীষ্টলি লিখে গেছেন:

"I found that this operation of the plants is more or less brisk in proportion of the clearness of the day and exposition of the plants; that the office is not performed by the whole plant, but by the leaves and great stalks."

অর্থাৎ বাড়ন্ত চারাগাছ থেকে যে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ পরিষ্কার দিনে বাড়ে এবং যত বেশিক্ষণ চারাগাছটি দিবালোকে থাকে নির্গত গ্যাসের পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়তে থাকে। কেবলমাত্র গাছের সবুজ পাতা এবং ডাঁটা থেকে গ্যাসের উৎপত্তি দেখা যায়।

আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় গাছের পাতায় ক্লোরোফিল নামক সবুজ রঙীন পদার্থ থাকে, তাই সূর্যরশ্মির সাহায্যে বাতাসের অঙ্গারাম্ল (CO_2) গ্যাসকে ভেঙে অক্সিজেন গ্যাসকে বিনির্মুক্ত করে।

হাইড্রোজেন

হাইড্রোজেন গ্যাস হচ্ছে যাবতীয় মৌলিক-পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা। সূর্য এবং নক্ষত্রদেহে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত অবস্থায় এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এটিও একটি মিশ্র মৌল: তিন বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর সহমিশ্রণ এতে দেখা যায়।

H^1—প্রোটিয়াম (৯৯.৯%)

H^2—ডয়টেরিয়াম (০.০২%)

H^3—ট্রিটিয়াম (≡ঊর্ধ্বাকাশে জড়কণিকার সঙ্গে মহাজাগতিক বা সৃষ্টিরশ্মির সংঘাতে উৎপন্ন হয়।)

H^1 পরমাণুর বিশেষত্ব হচ্ছে এর কেন্দ্রে আছে মাত্র একটি প্রোটন এবং কেন্দ্রের চতুর্দিকে আছে আপন অক্ষপথে ভ্রমণশীল একক ইলেকট্রন।

স্ফুটনাঙ্ক:—২৫২.৫°C, হিমাঙ্ক:—২৫৯°C। অক্সিজেনের চেয়েও হাইড্রোজেন বেশি সক্রিয় ও সঙ্গপ্রিয়। কার্বন এবং অক্সিজেনের সঙ্গে এর সংযোগ ঘটে প্রবলভাবে।

১৭৬৬ সালে ইংরাজ বিজ্ঞানী ক্যাভেনডিস এর আবিষ্কার করেন। অগ্নিসংযোগে এটি বাতাসে জ্বলে উঠে। একারণে এর নাম ছিল দহনশীল বায়ু। জ্বলবার সময় বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে এর সংযোগ ঘটে এবং তার ফলে সৃষ্টি হয় জল। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের এই প্রক্রিয়া ঘটে অগ্নিকাণ্ডরূপে। এতে প্রতি গ্রামাণু হাইড্রোজেন থেকে ৬৮.৩ K-cal তাপ সৃষ্টি হয়। এই সংযোগের ফলে যে জলের উৎপত্তি হয় তাতে কিন্তু আগুন নিভে যায়।

জলের ধর্ম

উষ্ণতার সমতা রক্ষা করা হচ্ছে জলের প্রধান ধর্ম। শৈত্যের বা উষ্ণতার আধিক্যকে মন্দীভূত করার ক্ষমতা হলো জলের একটি বিশেষত্ব। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প দিবাভাগে সূর্যকিরণের প্রখর উত্তাপ শোষণ করে ধরাতলকে অতিমাত্রায় উত্তপ্ত হতে দেয় না। এই একই কারণে আবার তাপ বিকিরণ করায় রাতের শেষে ধরাপৃষ্ঠ অত্যধিক শীতল হতে পারে না। বায়ুমণ্ডলের এই জলীয় বাষ্প পৃথিবীর চারিদিকে এক তাপ নিরোধক আবেষ্টনের মত কাজ করে। বায়ুতে এই জলীয় বাষ্প না থাকলে দিবাভাগে সূর্য থেকে প্রবল তাপে এবং রাত্রিকালে ভূমি থেকে দ্রুত তাপ বিকিরণের ফলে আমাদের পৃথিবী চন্দ্রের মত হতো বাসের অযোগ্য উদ্ভিদহীন মরুভূমি।

জলের আপেক্ষিক ও লীন তাপ অন্যান্য পদার্থের চেয়ে অনেক বেশি। এ-কারণে উষ্ণপ্রধান প্রদেশ থেকে শীতপ্রধান প্রদেশে তাপ চলাচলের কাজে বিশেষ উপযোগী। উপসাগরীয় স্রোত (Gulf-Stream) হলো এর দৃষ্টান্ত।

জলের ঘনত্বের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। জলের হিমাঙ্ক হচ্ছে 0°C। কিন্তু বরফ অপেক্ষা বরফ জল ভারী, তাই জলে বরফ ভেসে ওঠে। জলের ঘনত্ব খুব বেশি হয় 8°C (4°C)-এ। এ-কারণে শীতকালে শীতপ্রধান দেশের নদী ও হ্রদের জল ঠাণ্ডায় বরফে পরিণত হলে তা উপরে ভেসে ওঠে এবং একটি আবরণের সৃষ্টি করে। এর ফলে তলার জল আর সহসা বেশি ঠাণ্ডা হতে পারে না। সেকারণে মাছ ও অন্যান্য জলজীবের বেঁচে থাকার অসুবিধা হয় না। কিন্তু জীব ও উদ্ভিদের দেহকোষে যদি ঠাণ্ডায় জল জমে বরফ হয়ে যায়, তবে কোষগুলি ফেটে নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, সমান ওজনের জলের চেয়ে সমান ওজনের বরফের আয়তন যায় বেড়ে।

জলের পৃষ্ঠদেশের অণুগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি টান হচ্ছে প্রবল। এ-কারণে জলের ফোঁটা বর্তুলাকার ধারণ করে। একে বিজ্ঞানীরা বলেন Surface tension বা পৃষ্ঠটান। জলের পৃষ্ঠদেশ এ-কারণে একটি স্থিতিস্থাপক পর্দার মত কাজ করে। তাই দেখা যায়, সাবধানে রাখতে পারলে একটি সূচ জলের উপর ভাসতে পারে। এরই ফলে সৃষ্টি হয় জলের কৈশিকাকর্ষণ বা Capillary attraction ; অর্থাৎ খুব সরু কোন নলের একভাগ জলে ডোবালে ঐ নলের ভিতর দিয়ে জল উর্ধ্বে উঠতে থাকে—মাধ্যাকর্ষণের শক্তি অতিক্রম করে।

জলের আর একটি বিশিষ্ট ধর্ম হচ্ছে অভিদ্রবণ চাপের (Osmotic Pressure) সৃষ্টি করা। এমন অনেক স্বাভাবিক বা কৃত্রিম ঝিল্লী (Membrane) আছে যার ভিতর দিয়ে জল চলাচল করতে পারে, কিন্তু জলে দ্রবিত বা প্রলীন কোন পদার্থ যাতায়াত করতে পারে না। এরূপ ঝিল্লীর পর্দায় প্রস্তুত একটি থলের মধ্যে যদি চিনি বা লবণগোলা জল রেখে তা বিশুদ্ধ জলের মধ্যে অর্ধমগ্ন করে রাখা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, বাইরে থেকে বিশুদ্ধ জল থলের মধ্যে প্রবেশ করে থলের আভ্যন্তরীণ জলের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। যে-শক্তিতে এ-প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাকে বলা হয় অভিদ্রবণের শক্তি বা চাপ (Osmotic Pressure)। জলের পৃষ্ঠতলে, কৈশিকাকর্ষণ অভিদ্রবণ (Osmosis) শক্তির সাহায্যে গাছের শিকড় থেকে পাতায় এবং পাতা থেকে পুনরায় কাণ্ড ও গুঁড়ির মধ্য দিয়ে শিকড়ে খাদ্যরস পরিচালিত হয়। এ জন্যে কোন পাম্প বা হৃৎপিণ্ডের আবশ্যক হয় না। মাটির জল ধরে রাখবার শক্তিও আসে জলের কৈশিকাকর্ষণ থেকে।

জলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে তা অহরহ চক্রপথে ঘুরপাক

খাচ্ছে—কখনো বাষ্পরূপে, কখনো তরল জলরূপে এবং কখনো কঠিন বরফ হয়ে।

সমুদ্র—→জলীয় বাষ্প—→মেঘ, শিশির, তুষার

নদী প্রস্রবণ←————————বৃষ্টি, শিলা, বরফ

আমরা দেখেছি যে, জীবজন্তু ও উদ্ভিদের দেহের একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে জল। জলের অভাবে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। শিল্পের ক্ষেত্রেও শক্তির একটি বিপুল উৎস হলো জল। জলকে বাষ্পে পরিণত করে বাষ্পের শক্তিতে এবং জলের গতি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করে ঐ শক্তিতে মানুষ আজ রেল, ষ্টিমার ইত্যাদি সকল প্রকার যানবাহন ও কলকারখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতি চালাচ্ছে। শহরের রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী আজ আলোকিত হচ্ছে জল থেকে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তিতে

উপরে বর্ণিত জলের বহু অসাধারণ ধর্মের সহজ ব্যাখ্যা মেলে জলের অণুর গঠন বৈশিষ্ট্য থেকে এবং তাদের পরস্পর সংযোজন বিধি থেকে।
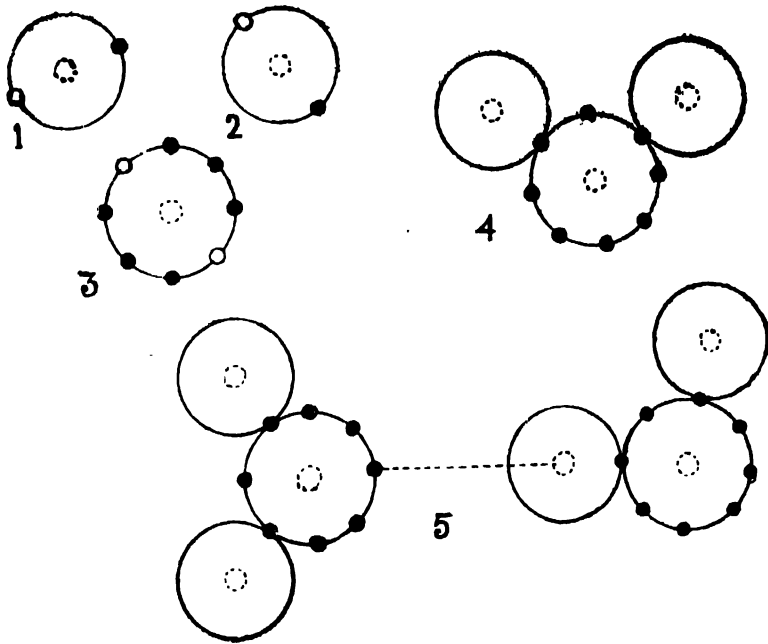
১নং চিত্র

1 এবং 2 হাইড্রোজেনের পরমাণুদ্বয়, 3—অক্সিজেনের পরমাণু, 4—জলের অণু, 5—দুটি জলের অণু H-bond দিয়ে সংশ্লিষ্ট। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রের বহির্দেশে একক ইলেকট্রন; অক্সিজেন পরমাণুর কেন্দ্রের বহির্দেশে শেষ স্তরে ৬টি ইলেকট্রন।

H—বাঁধন

হাইড্রোজেন পরমাণু বিশেষত্ব হচ্ছে যে, তার কেন্দ্রস্থ একমাত্র প্রোটনের চতুর্দিকে শুধু একক ইলেকট্রনের অবস্থিতির দরুণ পরমাণুর বৈদ্যুতিক ভারসাম্যের ব্যতিক্রম ঘটে। ফলে পরমাণুটি যেমন একদিকে তার ইলেকট্রনের সাহায্যে অন্য কোন পরমাণুর সঙ্গে রাসায়নিক

সংযোগ সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি অপরদিকে তার মুক্ত প্রান্তের হা-ধর্মী বৈদ্যুতিক ভারের আধিক্যের দরুণ অন্য কোন পরমাণুর অসংবদ্ধ ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করে তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। একে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন হাইড্রোজেন বাঁধন বা H-bond। এর ফলে জলের পরমাণুগুলি পরস্পর জুড়ে গিয়ে একটি অতিকায় অণুর সৃষ্টি করে। এক খণ্ড আগে বলা হয়েছে। জলের অণুরও বহু প্রকার ভেদ সম্ভব। কারণ যে কোন দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও যে কোন একটি অক্সিজেন পরমাণুর পরস্পর সংযোগে একটি জলের অণুর সৃষ্টি হতে পারে। মোটের উপর এভাবে ১৮ বিভিন্ন প্রকারের জলের অণুর গঠন সম্ভব। এগুলি আবার বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের ফলে ৩ প্রকারের H^+-ion, ৯ প্রকারের OH^--ion এবং ৩ প্রকার
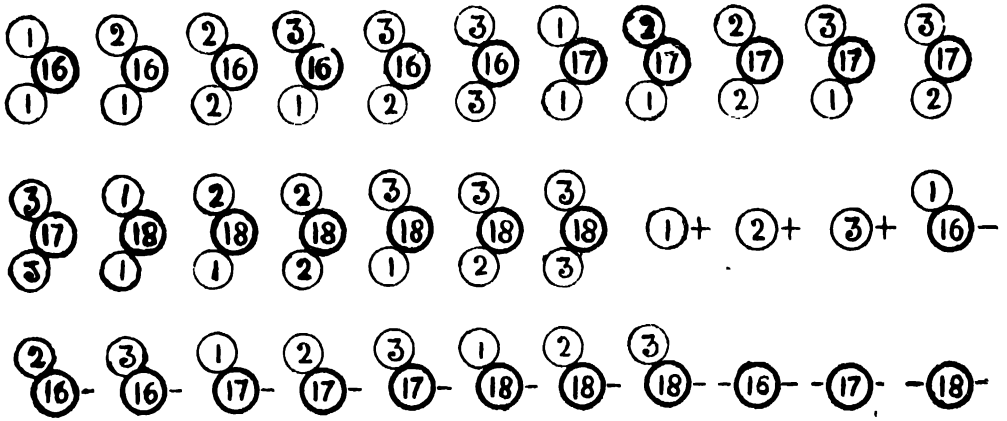
২নং চিত্র

জলের পরিবারবর্গ

বরফের সমস্ত দেহটা জুড়ে একটিমাত্র অতিকায় জলের অণু বিরাজ করে বলা যায়। ১নং চিত্রে জলের অণুর পরস্পরের মধ্যে এই H-bond-এর একটি প্রতিকৃতি দেখানো হলো।

জলের উপাদান ও জলাণুর প্রকারভেদ

ওজনভেদে তিন বিভিন্ন প্রকার হাইড্রোজেন ও তিন বিভিন্ন প্রকার অক্সিজেন পরমাণুর কথা

$O^=$ion এর জন্ম দেয়। সর্বসাকুল্যে জলের রাজ্যে ৩৩ জাতীয় অধিবাসীর বাসস্থান আছে। এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে $H^1_2O_{16}$; বাকী সব খুবই বিরল সংখ্যক। অনেকগুলির সংখ্যা নগণ্য বললেই চলে। ২ নং চিত্রে জলের এই বিরাট রাজ্যের অধিবাসীদের পরিচয় দেওয়া গেল।

ভারী জল (Heavy Water)

D_2O_{16} or $H^2_2O_{16}$
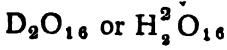
১৯৩২ অব্দে বিজ্ঞানী উরে এর আবিষ্কার করেন। স্ফুটনাঙ্ক: ১০১·৪°C ; হিমাঙ্ক: ৩·৮°C. স্বাভাবিক জলের (H_2O) স্ফুটনাঙ্ক: ১০০°C, হিমাঙ্ক: 0°C. ভারী জলের (D_2O) সান্দ্রতা সাধারণ জলের (H_2O) চেয়ে বেশি। প্রাণী বা উদ্ভিদ ভারী জল সেবনে বেঁচে থাকতে পারে না। ভারী জলে কোন বীজ অঙ্কুরিত হয় না। ইঁদুরকে শুধু ভারী জল পান করতে দিলে তৃষ্ণায় মরে যায়! সকল প্রকার স্বাভাবিক জলে ভারী জলের পরিমাণ থাকে ৯০০০ ভাগের এক ভাগমাত্র।

জলের অণুর গঠন

একক জলের অণুর গঠন (জলীয় বাষ্পে) সোজা সরল রেখার মত নয়। দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অক্সিজেন পরমাণুকে কেন্দ্র করে ১০৫° কোণ সৃষ্টি ক'রে অবস্থান করে। ৩নং চিত্রে একক জলের অণুর গঠন দেখানো হয়েছে।

৩নং চিত্র

জলের অণুর গঠন

কঠিন অবস্থায় (বরফ) জলের দানার গঠন

রঞ্জেন-রশ্মির (X-rays) সাহায্যে ও অন্যবিধ উপায়ে বরফের দানার গঠন পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, প্রত্যেক জলের অণুর চতুর্দিকে আর চারটি জলের অণু একটি সমচতুস্তলকের (Tetrahedron) কোণে অবস্থিতি করে। অণুগুলি পরস্পর হাইড্রোজেন বাঁধনে (H-bond) আবদ্ধ থাকে। এ-ভাবে সমগ্র বরফ খণ্ডটি জুড়ে
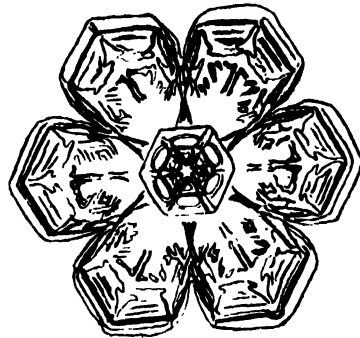
৪নং চিত্র

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট বরফের দানা

একটি অতিকায় বিরাট অণু গঠিত হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে একটি বরফের দানাকে ঘনসন্নিবিষ্ট সমষড়ভুজ ক্ষেত্রের আকার দেখায়। ৪, এবং ৫নং চিত্রে বরফের দানার গঠন দেখানো হয়েছে। বরফের দানার অভ্যন্তরে জলের অণুগুলির মধ্যে পরস্পর আকর্ষণের দরুণ একটি আভ্যন্তরীণ চাপের (Internal Pressure) সৃষ্টি হয়।

থেকে চাপ প্রয়োগ করলেও বরফ গলে যায়। কারণ, বাইরের চাপে দানার অন্তর্গত জলাণুগুলির আভ্যন্তরীণ চাপের যায় ব্যতিক্রম হয়ে। তাতে দানার গঠন যায় ভেঙ্গে এবং জলাণুগুলি এলোমেলোভাবে চলাচল করতে থাকে। এ-কারণে, হিমাঙ্কের নীচেও চাপের প্রয়োগে বরফ গলে জল হয়।

জল থেকে হাল্কা বলে ঠাণ্ডা জলে বরফ
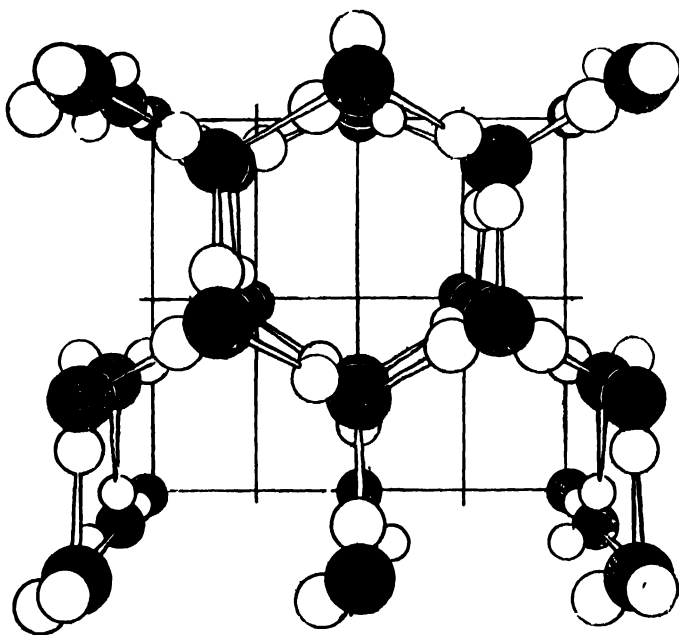
৫নং চিত্র
রঞ্জেন রশ্মির সাহায্যে নির্ধারিত বরফের দানার গঠন

এক টুকরো কঠিন দানাবদ্ধ জল বা বরফের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার আভ্যন্তরীণ জলের অণুগুলি তাপ-কম্পনের ফলে চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে H-bond এর বাঁধন যায় ক্রমশঃ শিথিল হয়ে। পরিশেষে দানার মধ্যে তাপের সুসংবদ্ধ শৃঙ্খলা যায় ভেঙ্গে, এবং অণুগুলি ছুটোছুটি সুরু করে। এ-অবস্থায় কঠিন বরফ গলে জলে পরিণত হয়। বাইরে

ভাসে। বরফের দানার মধ্যে জলের অণুগুলি H-bond এর দরুণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে সজ্জিত থাকে। তারা পরস্পরের খুব নিকটে আসতে পারে না। কিন্তু শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গেলে তারা ছুটোছুটি করে জড় হতে পারে। একারণে ঠাণ্ডা জল বরফের চেয়ে ভারী হয়।

জলের বিশিষ্ট ক্রিয়া ও ধর্মের ব্যাখ্যা

প্রাণীদেহের প্রধান উপাদান হচ্ছে আমিষ

জাতীয় পদার্থ বা প্রোটিন। প্রোটিনমাত্রই অতিকায় অণুতে গঠিত। প্রোটিন সাধারণতঃ প্লাষ্টিকের মত নমনীয় পদার্থ। প্রোটিনের অতিকায় অণুগুলি বেশির ভাগ এঁকেবেঁকে বা চক্রাকারে গুটিয়ে থাকে। এ-সব ক্ষেত্রে জলের অণু থেকে H-bond এর দরুণ প্রোটিন অণুর গঠন-বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হয়। জলের অপেক্ষাকৃত বেশি সান্দ্রতা ও তাড়িত-প্রতিরোধক ক্ষমতাও নির্ভর করে জলাণুর পরস্পরের মধ্যে H-bond এর সৃষ্টির উপর।

এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রান্তে হয় হাঁ-ধর্মী তাড়িত আধানের আধিক্য। ফলে, জলের অণুর দুই বিপরীত প্রান্তে দুই বিপরীত-ধর্মী তাড়িত মেরুর সৃষ্টি হয়। এরূপ তাড়িত মেরু সমন্বিত জলের অণু যখন দুই বিপরীত-ধর্মী তাড়িত ফলকের মাঝে অবস্থিতি করে, তখন উভয় ফলকের মধ্যে তাড়িত পরিবহনের অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। এ-কারণে তরল পদার্থের মধ্যে জলের তাড়িত-প্রতিরোধক শক্তি (Dielectric constant) অপেক্ষাকৃত বেশি। তাই কোন
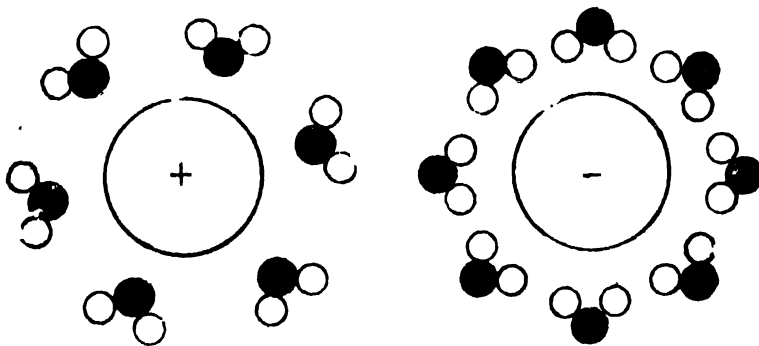
৬নং চিত্র
বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ

জলের অণুর উভয় প্রান্তে দুই বিপরীত ধর্মী তড়িতের আধান থাকে। কারণ যখন অক্সিজেন পরমাণু ও হাইড্রোজেন পরমাণুর সংযোগে জলের অণুর সৃষ্টি হয়, তখন যে যুগ্ম ইলেকট্রন তাদের মধ্যে বাঁধনের কাজ করে, তা উভয় পরমাণুর ঠিক মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে অবস্থিতি করে না। ঐ ইলেকট্রনদ্বয় অক্সিজেন পরমাণুর অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকে। এ-কারণে জলের অণুতে অক্সিজেন পরমাণুর প্রান্তে হয় না-ধর্মী তাড়িত আধানের আধিক্য

লবণ জাতীয় পদার্থ, যেমন NaCl, জলে গুললে Na^+ আয়ন ও Cl^- আয়নের চারপাশে জলের অণুর একটি আবরণের সৃষ্টি হয়। Na^+ আয়নের চতুর্দিকে যে সব জলের অণু থাকে তাদের অক্সিজেন পরমাণুগুলি থাকে Na^+ আয়নের দিকে মুখ করে; সেরূপ যে সব জলের অণু Cl^- আয়নকে বেষ্টন করে থাকে তাদের হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি থাকে Cl^- আয়নের দিকে মুখ করে। এর ফলেই ঘটে জলে লবণ জাতীয় পদার্থের বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ (Electroly-

tic Dissociation)। ৬নং চিত্রে এর নমুনা দেওয়া হয়েছে।

তাই লবণজাতীয় ও অন্যান্য (Ionic) পদার্থের পক্ষে জল একটি উত্তম দ্রাবক। সুতরাং বিশুদ্ধ জল তাড়িত-প্রতিরোধক হলেও লবণাক্ত বা আয়নিক পদার্থযুক্ত জল হচ্ছে উত্তম তাড়িত-পরিবাহক। এমন কি আপাততঃ বিশুদ্ধ জলও তাড়িত-পরিবাহক হয়ে যায় বায়ু থেকে অঙ্গারাম্ল গ্যাস (CO_2) শোষণ করে। জলের সংস্পর্শে অঙ্গারাম্ল গ্যাস কার্বনিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং কার্বনিক অ্যাসিড একটি আয়নিক পদার্থ। এ-কারণে ভিজে জমির উপর দাঁড়িয়ে কোন কোন উচ্চ তানের বিদ্যুৎবাহী তারে হাত দিলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা থাকে।

পরস্পরের মধ্যে H - বাঁধনের দরুণ একাধিক জলের অণু একসঙ্গে জুড়ে থাকে। এই কারণে জলের স্ফুটনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক তার চেয়ে আণবিক ওজনে ভারী H_2S, H_2Se এবং H_2Te থেকে অনেক বেশি। স্বাভাবিক অবস্থায় জল তরল, কিন্তু তার সমগোত্রীয় উপরিউক্ত পদার্থগুলি গ্যাস।

হাইড্রেটস (Hydrates)

শীতের দেশে দেখা যায়, যে সব পাইপের ভিতর দিয়ে শহরে জ্বালানী গ্যাস সরবরাহ করা হয় তাদের মধ্যে সময় সময় জলের হিমাঙ্কের অনেক উর্ধ্বে (১৮-২০°C) কাদার মত বরফ জমে পাইপগুলি বন্ধ হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা এর কারণ নির্ণয় করেছেন জলের অণুর সঙ্গে গ্যাসের হাইড্রেট গঠনের দরুণ। যে সব গ্যাস, যেমন জ্বালানী গ্যাস বা বায়ুমণ্ডলের বিরল গ্যাস আরগন বা ক্রিপটন, জলে খুবই কম দ্রবণীয়। এরা জলের অণুর সঙ্গে জুড়ে হাইড্রেট গঠন করে এবং এই সব হাইড্রেট, জলের হিমাঙ্কের অনেক উর্ধ্বে কঠিন আকার ধারণ করে। স্বাভাবিক গ্যাসে প্রায়ই জলীয় বাষ্প থাকে। মিথেন (CH_4) এই জাতীয় একটি স্বাভাবিক জ্বালানী গ্যাস। এর আণবিক আয়তন জলের অণুর দ্বিগুণ। এটি জলে খুব কমই দ্রবণীয়; কিন্তু হেক্সেনে (Hexane) সহজে গুলে যায়। কিন্তু মিথেন জলে গুলবার সময় প্রচুর তাপের উৎপত্তি হয়। কারণ জলের অণুর সংযোগে তা হাই-ড্রেটের সৃষ্টি করে। একটি মিথেনের অণু এভাবে বহু জলের অণুর সঙ্গে জুড়ে থাকে। এতে একটি মিথেন অণুর চতুর্দিকে ১০-২০টি জলের অণু জুড়ে থাকে। ফলে জলের অণুর গঠন যায় অনেকাংশে বদলে। প্রত্যেক মিথেন অণুর চারদিকে একটি জলের অণুর খাঁচার সৃষ্টি হয়। এরই ফলে তাপের উৎপত্তি।

যেখানে মিথেন অণু অবস্থিতি করে সে সব স্থানে জলের অণুর পরস্পর আকর্ষণ বা জলের আভ্যন্তরীণ চাপ লোপ পায়। সুতরাং জলের হিমাঙ্ক যায় বেড়ে এবং মিথেন অণুর চতুষ্পার্শ্বের জলের অণুসমূহ বরফে পরিণত হয় ও কঠিন হাইড্রেট সৃষ্টি করে।

জীবের জীবন প্রক্রিয়ায় হাইড্রেট গঠনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যখন প্রোটিন অণু ও জলের অণু মুখোমুখী হয়ে দেহের কোন স্থানে হাইড্রেট গঠন করে, তাতে যে সম্প্রসারণ হবে তার ফলে দেহের ঘোরতর ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

আয়ন (Ion) মাত্রেই জলের অণুর সঙ্গে জুড়ে হাইড্রেট গঠন করে। তাতে তাদের আয়তন যায় বেড়ে, সুতরাং চলাচলের শক্তি (Mobility) যায় কমে। H^+ আয়ন ও OH^- আয়নের যে প্রবল চলাচলের শক্তি দেখা যায় বিজ্ঞানীরা তার ব্যাখ্যা করেছেন জলের ঔপাদানিক H^+ এবং OH^- আয়নের সঙ্গে তাদের বিনিময়ের প্রক্রিয়ায়। ৭নং চিত্রে এই প্রক্রিয়ার নমুনা দেওয়া গেল।

বাইরের থেকে কোন তাড়িতক্ষেত্রের প্রয়োগে একটি H^+ আয়ন জলের অণু থেকে পরবর্তী অণুতে লাফিয়ে চলতে পারে। এরূপ প্রক্রিয়ায় পুনঃপুনঃ সংঘটনের OH^- আয়ন থাকবে পরিশেষে পশ্চাতে
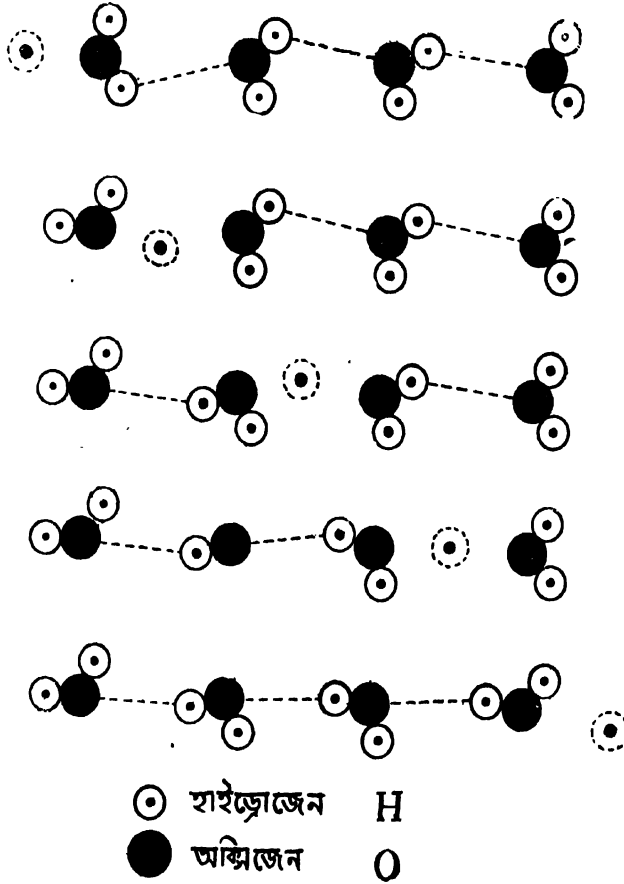
৭নং চিত্র

জলের অভ্যন্তরের H^+ আয়নের চলাচল

পড়ে এবং মনে হবে তা বিপরীত দিকে সরে যাচ্ছে।

অবদ্রব সংঘটন(Emulsion formation)

কথায় বলে জলে তেলে মেশে না। কিন্তু জল ও তেলের অবদ্রব সৃষ্টি করা যায় স্নেহাম্ল (Fatty acid) বা তাদের লবণের সাহায্যে। ষ্টীয়ারিক অ্যাসিড, $CH_3(CH_2)_{16}COOH$, হচ্ছে একটি স্নেহাম্ল। এটি একটি উত্তম অবদ্রব সংঘটক (Emulsifier)। ষ্টীয়ারিক অ্যাসিড সাধারণতঃ জলে অদ্রবণীয়, কিন্তু এর-COOH উপাণুর সাহায্যে এটি জলের অণুর সঙ্গে H-bond সৃষ্টি করে জুড়ে যেতে পারে। এর ফলে জলের উপরিভাগে এটি একটি একাণবিক (Monomolecular) স্তর গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু ষ্টীয়ারিক অ্যাসিড অণুর অপরাংশ অর্থাৎ হাইড্রোকার্বন

চেন, CH_3-$(CH_2)_{16}$ তেলে সহজে গুলে যায়। সুতরাং জলের সঙ্গে তেলের অবদ্রব সৃষ্টি করবার এ হচ্ছে একটি উত্তম উপায়। ৮নং চিত্রে এভাবে অবদ্রব সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নমুনা দেখানো হলো।

৮নং চিত্র

জলের উপর ষ্টীয়ারিক অ্যাসিডের একাণবিক (Monomolecular) স্তর

সাবান বা সোডিয়াম ষ্টীয়ারেটের ব্যবহারে কাপড় ধোওয়া ও পরিষ্কার করার এই হলো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। সাধারণতঃ কাপড়ের গায়ে কোন প্রকার তৈলাক্ত পদার্থের সাহায্যে ময়লা জমে যায়। জলের সঙ্গে সাবান বা সোডিয়াম ষ্টীয়ারেট জলে কাপড়ের গায়ে লাগালে সকল তৈলাক্ত পদার্থ জলের সঙ্গে অবদ্রব সৃষ্টি করে পৃথক হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সকল ময়লা বা ধূলোবালিও সরে যায়।

নক্ষত্রের জন্মকথা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ

নক্ষত্রের গঠন-উপাদান গ্যাস। দিগন্ত বিস্তৃত গ্যাসরাশি ক্ষুদ্রায়তনে সঙ্কুচিত হলে সেটাই জলন্ত নক্ষত্রের রূপ পরিগ্রহ করে।

নক্ষত্রের জন্ম দেখা যায় না। এর কারণ সুবিস্তৃত গ্যাসীয় মেঘের অভ্যন্তরে তাদের জন্ম হয়। গ্যাসীয় মেঘ আমাদের দৃষ্টিকে আড়াল করে রাখে, তাই নক্ষত্রের জন্ম অদৃশ্য। নক্ষত্রের জন্মের পর তার তাপ চতুর্দিকের উদ্বৃত্ত গ্যাসকে সরিয়ে দেয়, তারপর জলন্ত নক্ষত্রের দীপ্তি বহির্বিশ্বে প্রকাশিত হয়। নক্ষত্র সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে দীপ্ত নক্ষত্ররূপে প্রকাশিত হতে কোটি কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়। এজন্যে নক্ষত্রের জন্মপ্রণালী এবং এই প্রণালীর প্রগতি সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। এই বিষয়ে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—এস্থলে তারই আলোচনা করা হলো।

ছায়াপথের সীমানার বাইরে লক্ষ লক্ষ আলোক-বর্ষ দূরস্থিত কোন স্থান থেকে কেউ যদি ছায়াপথ-বিশ্বটির দিকে তাকায়, তাহলে সে এটিকে দেখবে একটি জ্যোতির্ময় নীহারিকারূপে—এখানকার নক্ষত্রগুলির পৃথক সত্তা সে বুঝতেও পারবে না।

পৃথিবী থেকে আমরাও সেরূপ দূরস্থিত দ্বীপ-জগৎগুলিকে অল্পবিস্তর উজ্জ্বল নীহারিকারূপে দেখি এবং আকৃতি অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন নামকরণ করি; যেমন—সর্পিল নীহারিকা (Spiral Nebula), উপবৃত্তাকার নীহারিকা (Elliptical Nebula) ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এরাও নক্ষত্র সমাকীর্ণ বিশ্ব এবং এদের অনেকের মধ্যে নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী স্থানে আছে গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ, ঠিক ছায়াপথ-বিশ্বে যেমন দেখা যায় নক্ষত্রদের অন্তর্বর্তী স্থানে গ্যাসীয় মেঘমালা। ছায়াপথ বিশ্বে যে ভাবে নক্ষত্রের জন্ম, অন্য সব বিশ্বেও সেই ভাবেই নক্ষত্রদের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক।

ছায়াপথ-বিশ্ব একটি কুণ্ডলী পাকানো বা সর্পিল নীহারিকা। আমাদের সৌরজগৎ ছায়াপথ-বিশ্বের ভিতরে এক পাশের দিকে অবস্থিত। এই বিশ্বের কেন্দ্রীয় নক্ষত্রদের পৃথিবী থেকে বিশেষ দেখা যায় না—তার প্রথম কারণ কেন্দ্রের দূরত্ব, দ্বিতীয় কারণ গ্যাসীয় মেঘস্তূপ কেন্দ্রকে পৃথিবী থেকে আড়াল করে রেখেছে। অতএব পৃথিবীর আকাশে আমরা যাদের দেখি, তারা প্রধানতঃ প্রান্তীয় নক্ষত্র ও প্রান্তীয় মেঘস্তূপ অর্থাৎ এদের অবস্থান ছায়াপথের সর্পিল গ্যাস-বাহুর অভ্যন্তরে। সর্পিল বাহুতে ধূলিমিশ্রিত গ্যাসের প্রাদুর্ভাব। এই সব ধূলিমিশ্রিত গ্যাস-স্তূপ থেকে কি করে নক্ষত্রের উদ্ভব হয়, সেই তত্ত্বই আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়।

আগে মনে করা হতো, পৃথক পৃথক পরিবেশে গ্যাস ঘনীভূত হয়ে প্রতিটি নক্ষত্র এককভাবে সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই ধারণায় বিজ্ঞানসম্মত সমর্থন পাওয়া দুষ্কর। অধুনা বিজ্ঞানীরা মনে করেন, নক্ষত্রের জন্ম হয় দলে দলে। একই পরিবেশে, একই সঙ্গে বহু নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়, যেমন—মেঘ থেকে একটি মাত্র বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে না, বর্ষণ হয় বৃষ্টিবিন্দুর ধারায়।

পৃথিবী থেকে কোনও বস্তু উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে সেই বস্তু আবার মাধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবীতেই ফিরে আসে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করতে পারে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে অন্যূন ১১.২ কিলোমিটার (প্রায় সাত মাইল) গতিবেগ দিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে যদি কোনও বস্তু ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, তবে সে বস্তু আর মাটিতে নেমে আসবে না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে ক্রমান্বয়ে দূরে চলে যাবে। একে বস্তুটির প্রস্থান-বেগ (Escape Velocity) বলা হয়। কোন বস্তুকে সূর্যপৃষ্ঠ ত্যাগ করতে হলে তাকে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করতে হবে অর্থাৎ তার প্রস্থান-বেগ হওয়া চাই প্রতি সেকেণ্ডে কমপক্ষে ৬২০ কিলোমিটার (প্রায় ৩৮০ মাইল)।

গ্যাস যথেষ্ট ঘনীভূত হলেই নক্ষত্র হয়ে দাঁড়ায়। সূর্যে যে পরিমাণ গ্যাস আছে, তা যদি আদিম কালের বিরল অবস্থায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে সেই বিরল গ্যাসের বর্তুল স্তূপটি বর্তমান সূর্যের আয়তন অপেক্ষা এক কোটিগুণ বড় হবে এবং তার ব্যাসের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় তিন আলোক-বর্ষের দৈর্ঘ্যের সমান। পদার্থের মাধ্যাকর্ষণ নির্ভর করে শুধু তার আয়তনের উপর নয়, তার ঘনত্বের উপরও। এই বিরাট ও বিরল গ্যাসস্তূপের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এত কম যে, ওর উপর থেকে সেকেণ্ডে মাত্র এক কিলোমিটারের এক পঞ্চমাংশ বেগে কোন বস্তু উৎক্ষিপ্ত হলেই বস্তুটি স্তূপপৃষ্ঠ ত্যাগ করে বাইরে প্রস্থান করতে সক্ষম হবে। গ্যাসের পরমাণুগুলির স্বকীয় স্বাভাবিক গতিবেগও এই সামান্য প্রস্থান-বেগের চেয়ে বেশী। তার ফলে ঐ গ্যাসস্তূপের উপর থেকে পরমাণুগুলি পালাতে আরম্ভ করবে। এই কারণে স্তূপটি কোন দিনই আর ঘনীভূত হয়ে সূর্যে অর্থাৎ নক্ষত্রে পরিণত হতে পারবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একক নক্ষত্রের উপযোগী কোনও বিরল গ্যাসস্তূপ থেকে নক্ষত্রের জন্ম সম্ভব নয়।

কিন্তু একক সূর্যে যে গ্যাস আছে, তার চেয়ে

(Super Nova) বা নোভা অর্থাৎ নবতারা হবার প্রাক্কালে যে বিস্ফোরণ ঘটে, তার ফলেও ঐ সব মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ নিয়ে বহির্বিশ্বের গ্যাস-সমুদ্রে মিশে যায়। এরাও কালক্রমে তাপ হারিয়ে গ্যাসীয় অবস্থা থেকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তরল ও কঠিন কণায় রূপান্তরিত হয়ে গ্যাস-সমুদ্রে ধূলিকণারূপে দৃষ্ট হয়।

উল্লিখিত প্রক্রিয়াতেই প্রত্যেক সর্পিল নীহারিকার কুণ্ডলী পাকানো গ্যাস বাহুতে নক্ষত্রের জন্ম হয়। এদের ১নং টাইপ (Type I) নক্ষত্র বলা হয়।

দেখা যাচ্ছে—নক্ষত্র সৃষ্টিতে যে ধূলিকণা অত্যাবশ্যক, সেই ধূলিকণা নক্ষত্রেরই সৃষ্টি। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, যখন নক্ষত্র ছিল না একটিও, তখন নক্ষত্রের জন্ম হলো কি ভাবে?

ছায়াপথ-বিশ্বে আমরা যে নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কের সমারোহ দেখতে পাই—চিরদিন এমনটি ছিল না। একদিন ছিল যখন এখানে নক্ষত্র বা অন্য কোন জ্যোতিষ্ক ছিল না একটিও—ছিল মাত্র তাদের গঠন-উপাদান অর্থাৎ গ্যাস। এই গ্যাসও সম্ভবতঃ শতকরা একশত ভাগই ছিল হাইড্রোজেন পরমাণু এবং তা বিস্তৃত ছিল অত্যন্ত বিরল অবস্থায়। আদিম কালের এই গ্যাসরাশির যে কোন প্রান্ত থেকে তার বিপরীত প্রান্তের ব্যবধান ছিল বহু কোটি আলোক-বর্ষ।

এই গ্যাসরাশির ঘনত্ব ও তাপমাত্রা পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঘনত্ব ছিল জলের ছয় হাজার কোটি কোটি কোটি কোটি (৬০০০×১০^{২৯}) ভাগের এক ভাগ। তাপমাত্রাও ছিল অত্যন্ত উচ্চ। কারণ এই গ্যাসের মধ্যে ধূলি নেই। ধূলি থাকলেই তার গাত্রসংলগ্ন পরমাণু থেকে অণু সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে এবং অণু সৃষ্টি হলেই গ্যাসের তাপমাত্রা কমে যায়। এক্ষেত্রে পূর্বে কোন নক্ষত্র না থাকায় ধূলি থাকবার সম্ভাবনা নেই, অতএব অণু সৃষ্টিও সম্ভব নয়।

হাইড্রোজেন পরমাণুর তাপমাত্রা দশ হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের উপরে না উঠলে তারা বহির্বিশ্বে তাপ বিকিরণ করে দিতে পারে না। তাপমাত্রা দশ হাজার ডিগ্রীর উপরে উঠলে হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ইলেকট্রন খসে যায় এবং তখন স্বচ্ছন্দে তাপ বিকিরিত হয়ে যেতে পারে।

সুবিশাল গ্যাসস্তূপ অর্থাৎ যে স্তূপে বহু দ্বীপ-জগতের ভর আছে, সেই স্তূপের গ্যাসরাশির তাপমাত্রা প্রথমে থাকে দশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে। আপন মাধ্যাকর্ষণ বলে গ্যাস স্তূপ ঘনীভূত* হতে থাকলে স্তূপদেহ থেকে বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপের বহির্গমন আরম্ভ হয়। এইভাবে শেষ পর্যন্ত গ্যাসরাশির তাপমাত্রা ক্রমে নেমে এসে প্রায় দশ হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডে দাঁড়ায়।

এই স্তূপ যদি মহাকর্ষীয় টানে অধিকতর সঙ্কুচিত** হতে থাকে তাহলে ঐ সঙ্কোচনের

---

* ফুটবলের ব্লাডারে পাম্প দিয়ে যত বেশী হাওয়া প্রবেশ করানো যায়, বাইরের চামড়ার আবরণ তত বেশী শক্ত হয়। তারপর ব্লাডারের মুখ খুলে দিলে হাওয়া প্রবল বেগে বেরিয়ে যায়। এখানে ব্লাডারের ভিতর স্বল্প পরিসর স্থানে স্বাভাবিকের চেয়েও বেশী হাওয়া প্রবেশ করেছিল এবং তার ফলে বায়ুকণা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে বায়ু সঙ্কুচিত অবস্থায় ছিল, ব্লাডারের মুখ খোলা পাওয়ায় আবার প্রসারিত হয়ে গেল। একে বলা হয় অস্থায়ী সঙ্কোচন (Shrinkage)। স্থায়ী সঙ্কোচন হলে ব্লাডারের মুখ খোলা পেলেও বায়ু বেরিয়ে যেত না।

** স্থায়ী সঙ্কোচন ঘটলে গ্যাস পূর্বের তুলনায় স্বল্প পরিসর স্থান অধিকার করে থাকে। স্থায়ী সঙ্কোচনকে এক কথায় ঘনীভবন (Condensation) বলা হয়। সঙ্কোচনের ফলে গ্যাসের মধ্যে যে তাপ উৎপন্ন হয়, সেই তাপ বিকিরিত হয়ে গেলেই সঙ্কোচন হতে পারে অর্থাৎ গ্যাস ঘনীভূত হতে

ফলে গ্যাসের মধ্যে যে তেজ উৎপন্ন হয়, তার অল্লাংশ যায় তাপমাত্রা বাড়াতে, অবশিষ্ট যায় গ্যাসীয় চলৎ-শক্তি* (Aerodynamic Energy) বাড়াতে। তাপের বিকিরণ আছে, কিন্তু চলৎ-শক্তির কোন বিকিরণ নেই—কাজেই গ্যাসের ঐ সঙ্কোচন নিতান্তই সাময়িক। চলৎ-শক্তি গ্যাসস্তূপকে আবার সম্প্রসারিত করে দেবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রকাণ্ড বড় স্তূপের সামগ্রিক ভাবে স্থায়ী সঙ্কোচন সম্ভব হয় না।

তাহলে এই গ্যাসরাশির সঙ্কোচন ঘটে কি ভাবে? এর উত্তর হচ্ছে—সম্পূর্ণ গ্যাসরাশির স্থায়ী সঙ্কোচন সামগ্রিক ভাবে না ঘটলেও খণ্ড খণ্ড ভাবে ঘটতে পারে। গ্যাসীয় চলৎ-শক্তির প্রভাবে সমগ্র গ্যাসস্তূপের ভিন্ন ভিন্ন অংশ কতকগুলি ক্ষুদ্রতর স্তূপে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তখন তারা প্রত্যেকে পৃথকভাবে সঙ্কুচিত ও ঘনীভূত হতে পারে। এই ভাবে বিভক্ত ক্ষুদ্র স্তূপে থাকে কোনটায় দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের ভর, কোনটায় লক্ষ কোটি নক্ষত্রের ভর, কোনটায় বা মাত্র তিন-শ' কোটি নক্ষত্র গঠনের উপাদান; অর্থাৎ বড় বা ছোট এক একটি দ্বীপ-জগতের ভর নিয়ে আদিম গ্যাসরাশি ভিন্ন ভিন্ন স্তূপে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের ভর আছে যে গ্যাসস্তূপে, সেই স্তূপ যখন মহাকর্ষীয় টানে সঙ্কুচিত হতে থাকে, তখন তার অভ্যন্তরের তাপমাত্রা বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসীয় চলৎ-শক্তিও বাড়ে। পরমাণুদের চলৎ-শক্তি ও তাপ এক্ষেত্রে প্রায় সমহারেই বাড়ে। সঙ্কোচনের দরুণ গ্যাসের আভ্যন্তরীণ ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে তাপের বিকিরণ হতে থাকে। বিকিরণের ফলে বেশ কিছু তাপ চিরদিনের জন্যে স্তূপদেহ পরিত্যাগ করে যায়—এই কারণে সঙ্কোচনও স্থায়ী হয়। এই সঙ্কোচন অবশ্য খুব বেশী নয়—পূর্বের আয়তনের তুলনায় বর্তমান আয়তন দাঁড়ায় হয়তো মাত্র এক-তৃতীয়াংশের মত। এই অবস্থায় মহাকর্ষ যদি স্তূপটিকে অধিকতর সঙ্কুচিত করেও তথাপি তা স্থায়ী হবে না, গ্যাসে নিহিত চলৎ-শক্তি তাকে আবার প্রসারিত করে দেবে

স্থায়ী সঙ্কোচনের দরুণ স্তূপের যে ঘনত্ব বাড়লো, তার ফলে স্তূপের মধ্যে বিভিন্ন অংশ স্থায়ী ভাবে ঘনীভূত হয়ে যায় এবং এই কারণে স্তূপটিও ৪।৫টি ক্ষুদ্রতর খণ্ডে বিভক্ত হয়। এক্ষেত্রেও পূর্বেকার স্তূপের সামগ্রিক সঙ্কোচন স্থায়ী না হয়ে ক্ষুদ্রতর আয়তনে স্থায়ী সঙ্কোচন হলো (চিত্র-১)। ক্ষুদ্রতর পিণ্ডের প্রত্যেকটি আবার ঐ প্রণালীতেই মহাকর্ষীয় টানে সঙ্কুচিত হয়, তাপ বিকিরণের দ্বারা তাদের স্থায়ী সঙ্কোচন ঘটে, প্রত্যেকের অভ্যন্তরে গ্যাসের ঘনত্ব বাড়ে। অবশেষে তারা প্রত্যেকেই আবার ৪।৫টি অধিকতর ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভাজন প্রণালী চলতে থাকে, কিন্তু অনন্ত কাল চলতে পারে না, এক সময়ে তার শেষ হয়। যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্যাসপিণ্ড এমন

পারে। গ্যাস থেকে যে পরিমাণ তাপ নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় তদনুপাতে গ্যাস ঘনীভূত হয়, যেমন—বায়ুমধ্যস্থ জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ ও কুয়াশায় পরিণত হয়। তাপ আহরণ করে ঘনীভূত গ্যাস পুনরায় সম্প্রসারিত হতে পারে।

* সঙ্কোচনকালে গ্যাসের মধ্যে যে তেজ উৎপন্ন হয়, তা দুটি শক্তিতে বণ্টিত হয়ে যায়—একটি তাপশক্তি, অপরটি গ্যাসীয় চলৎ-শক্তি (Aerodynamic Energy)। সুতরাং গ্যাসকণাগুলির পূর্বেকার তাপমাত্রা ও চলৎ-শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাপ বাইরে বিকিরিত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু চলৎ-শক্তির বিকিরণ নেই। এজন্যে চলৎ-শক্তি গ্যাসের মধ্যেই নিহিত থেকে যায়—পরিবেশ অনুকূল হলে তা প্রকাশ পায়; যেমন—গোলকে প্রবিষ্ট সঙ্কুচিত বায়ু মুক্তি পেলে প্রবল বেগে বেরোয়। জলস্রোত বাধা পেলে যেমন জলাবর্তের সৃষ্টি হয়, অনুরূপভাবে সঞ্চরণশীল গ্যাসের স্রোত কোথাও বাধার সম্মুখীন হলে সেখানে ঘূর্ণাবর্ত জাতীয় বিবিধ আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

ঘনত্বে পৌঁছায় যে, তা ভেদ করে অভ্যন্তরের তাপ আর বিকিরণের দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হতে পারে না; তখন পিণ্ডের বিভাজনেরও শেষ। ক্রমান্বয়ে সঞ্চিত তাপের দরুণ এরাই জ্বলন্ত নক্ষত্র এবং এভাবে বিভাজনের ফলে লক্ষ নক্ষত্র একই সঙ্গে হচ্ছে, তাদের বলা হয়েছে ১নং টাইপ নক্ষত্র এবং আদিম কালের ধূলিহীন গ্যাস থেকে যাদের জন্ম; তাদের বলা হলো ২নং টাইপ নক্ষত্র। অতএব আদিতে সৃষ্টি ২নং টাইপের নক্ষত্রগুলি প্রাচীন এবং বর্তমান কাল অবধি যাদের সৃষ্টি চলেছে.
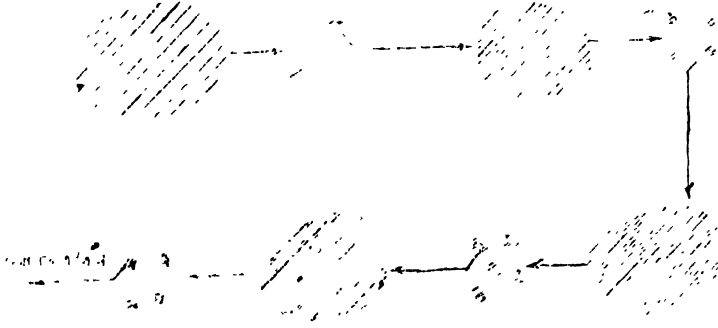
১নং চিত্র।
গ্যাসস্তূপের ক্রমিক বিভাজন।

জন্ম নিল। আদি বা প্রাচীন নক্ষত্র বলতে এদেরই বুঝায়। উপবৃত্তাকার নীহারিকায় কেবল এই আদি নক্ষত্রসমূহেরই সমাবেশ। সর্পিল নীহারিকার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে এবং বেষ্টকেও (Halo) এই সব প্রাচীন নক্ষত্রের অবস্থান।

আদি নক্ষত্রের এক একটার ভর সূর্যের এক-তৃতীয়াংশ থেকে দেড়গুণ পর্যন্ত। এদের ২নং টাইপ (Type II) নক্ষত্র বলা হয়। বৃহত্তর গ্যাসস্তূপে অর্থাৎ যে স্তূপে আনুমানিক এক লক্ষ কোটি নক্ষত্রের গঠন-উপাদান আছে, তার প্রাথমিক তাপমাত্রা থেকে সাধারণতঃ দেড় লক্ষ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে দশ লক্ষ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে। এক্ষেত্রে প্রারম্ভে কিছু প্রভেদ থাকলেও পরে ঠিক উল্লিখিত বিভাজন প্রণালী অবলম্বনেই নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। এরাও ঐরূপ প্রাচীন বা আদি নক্ষত্র অর্থাৎ ২নং টাইপ নক্ষত্রের দলভুক্ত।

সর্পিল নীহারিকার কুণ্ডলী পাকানো বাহুতে নক্ষত্রসমূহের অন্তর্বর্তী স্থানের ধূলিমিশ্রিত গ্যাস-সমুদ্রে বর্তমান কালেও যে সকল নক্ষত্রের জন্ম সেই সব ১নং টাইপের নক্ষত্রদের তরুণ বলা যায়। প্রাচীন নক্ষত্রগুলি কিছুটা ক্ষুদ্রকায় ও কম উজ্জ্বল। ঔজ্জ্বল্য কম বলে এরা দীর্ঘায়ু। এদের বয়স বর্তমানে ৪০০-৮০০ কোটি বছরের মধ্যে। গ্যাস কোথাও আর ধূলিহীন নেই বলে এখন আর এই জাতীয় প্রাচীন নক্ষত্রের জন্ম সম্ভব নয়।

কিছু সংখ্যক প্রাচীন বা আদি নক্ষত্রের সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোথাও গ্যাস-সমুদ্রে ধূলির মিশ্রণ আরম্ভ হয়। এজন্যে নক্ষত্রের সৃষ্টি কিছুদূর অগ্রসর হলেই তরুণ নক্ষত্রের জন্মের সূত্রপাত হয়। সুতরাং তরুণদের মধ্যেও বয়স্ক নক্ষত্র আছে। আমাদের সূর্য তরুণ শ্রেণীভুক্ত হলেও এর বয়স প্রায় ৫০০ কোটি বছর। সূর্যে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে ও ঔজ্জ্বল্য বিচারে যে হারে সেই হাইড্রোজেন ব্যয় হচ্ছে, তার হিসেব করে বিজ্ঞানীরা বলেন—সূর্যের মোট পরমায়ু প্রায় দেড় হাজার কোটি বছর এবং তন্মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়েছে।

সূর্যের সমকক্ষ অন্যান্য নক্ষত্রসমূহের মোট পরমায়ুও এই প্রকারই অনুমিত হয়।

তরুণ নক্ষত্রগুলির মধ্যে কোন কোনটার ঔজ্জ্বল্য এত বেশী যে, নিজের সঞ্চিত গ্যাসভাণ্ডার অল্পদিনের মধ্যে পারমাণবিক বিক্রিয়ায় নিঃশেষিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এরূপ অমিতব্যয়িতার দরুণ এদের অনেকের পরমায়ু হয়তো মাত্র কয়েক কোটি বছর আবার কারুর বা হয়তো মাত্র এক কোটি বছরেরও কম।

[বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তিনির্ভর কল্পনা অনুসরণ করে হ্রেড হয়েল নক্ষত্রের জন্মের যে প্রণালী অনুমান করেছেন, এই প্রবন্ধে সেই মতবাদই বিধৃত হলো।]

Reference—Fred Hoyle প্রণীত Frontiers of Astronomy এবং The Nature of the Universe.

রক্তের ধারা

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের মাথার আকৃতি, গায়ের রং প্রভৃতির দ্বারা জাতির শ্রেণীবিভাগ করে থাকেন। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগে একটা অসুবিধা এই যে, মানুষের এই সব বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রম ছাড়া পরিবেশের উপর আংশিকভাবে নির্ভরশীল। পৃথিবীর কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, তারা শিশুকে বিশেষভাবে শুইয়ে রেখে মাথার আকৃতি পাল্টে ফেলে। আবার মানুষের গায়ের রং সূর্যোত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ফর্সা ও তামাটে হয়ে থাকে। এই কারণে জাতির পার্থক্য নির্ণয়ে এমন বৈশিষ্ট্যের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, যা পরিবেশের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সম্পূর্ণরূপে বংশানুক্রমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মানুষের বিভিন্ন প্রকার রক্তশ্রেণী আবিষ্কারের পর থেকে নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও রক্তশ্রেণীর সাহায্যে জাতির শ্রেণীবিভাগ, সংমিশ্রণ ও গতিবিধি সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করে থাকেন। মানুষের রক্তকে O, A, B ও AB—এই চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব জাতির মধ্যে চার শ্রেণীর রক্ত দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের অনুপাত বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন। এই সব রক্তশ্রেণী পরিবেশের উপর নির্ভর করে না। পিতামাতার রক্তশ্রেণী নির্দিষ্ট উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তান-সন্ততির রক্তে সঞ্চারিত হয়। যে রক্তশ্রেণী নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তা মৃত্যুকাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে কোন বিশেষ রক্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মানুষ তাড়াতাড়ি মারা যায় বা বেশী দিন বাঁচে—এরকম কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলে যে কোন জাতির রক্তশ্রেণীর অনুপাত বহুকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে। তাছাড়া কোন জাতির লোকেরা যদি দেশান্তরে গিয়ে বসবাস করে, তাদের রক্তশ্রেণীর অনুপাতে কোন পরিবর্তন আশা করা যায় না। কিন্তু যখন দুটি জাতি সংমিশ্রিত হয়, তখন সঙ্কর বা মিশ্রিত জাতির রক্তশ্রেণীর অনুপাত দুটি জাতির রক্তশ্রেণীর অনুপাতের মাঝামাঝি হয়ে থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ABO রক্তশ্রেণীর হার পরীক্ষা করলে ইউরোপে A এবং এশিয়ায় B রক্তশ্রেণীর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপ

থেকে এশিয়ার দিকে অগ্রসর হলে O ও A শ্রেণীর অনুপাত হ্রাস পায় এবং B ও AB শ্রেণীর অনুপাত বৃদ্ধি পায়। বৃটেন, বেলজিয়াম, স্পেন ও পোর্তুগালে একশত জনের মধ্যে দশ জন B শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও যুগোশ্লাভিয়ায় এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে কুড়ির কাছাকাছি হয়ে থাকে। মধ্য এশিয়া ও উত্তর ভারতে B শ্রেণীর হার সর্বাধিক (৩৫%—৪০%)। আফ্রিকা মহাদেশে B-এর অনুপাত ইউরোপের তুলনায় বেশী, কিন্তু এশিয়ার তুলনায় কম। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যে B ও AB রক্তশ্রেণী নেই বললেই চলে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ যেমন ঘটেছে, অপর পক্ষে বিভিন্ন ধর্ম, ভাষাভাষী ও বর্ণের লোকেরা নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে বিবাহ করে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। ফলে প্রজনন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তারা পৃথক পৃথক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। রক্তশ্রেণী পরীক্ষায় এই সব গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্বন্ধ জানা যায়। যদিও অনেক নৃতত্ত্ববিদ্ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন আদিবাসীদের রক্তশ্রেণীর অনুপাত নির্ণয় করে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু এখনও অনেক অঞ্চলের অধিবাসীদের রক্তশ্রেণীর বিশদ তথ্যের অভাবে ভারতবর্ষে রক্তশ্রেণীর অনুপাতের সঠিক মানচিত্র প্রস্তুত হয় নি।

ভারতবর্ষে B রক্তশ্রেণীর প্রাধান্য অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষ থেকে পশ্চিমে আফ্রিকা এবং পূর্বে মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে B রক্তশ্রেণীর ধারা প্রবাহিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। উত্তর ভারতে B শ্রেণীর হার সাধারণতঃ বেশী এবং দক্ষিণ ভারতে কম। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও পাঞ্জাবে চারশ্রেণীর রক্তের অনুপাত প্রায় সমান দেখা যায় এবং এই সব প্রদেশে B-এর হার (৩২%—৩৫%) A-র (২৩%—২৫%) তুলনায় বেশী। উচ্চবর্ণের তুলনায় B শ্রেণীর হার নিম্নবর্ণে বেশী, কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে কম। তবে আদিবাসী ও নিম্নবর্ণের সংমিশ্রণের ফলে যে সব মিশ্রিত গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে, তাদের রক্তে B শ্রেণীর হার বেশী। ভারতের বাইরের মুসলমানদের B-র অনুপাত কম এবং A-র অনুপাত বেশী, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের রক্তশ্রেণীর অনুপাতে বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায়। এক সমীক্ষায় দেখা দেখা গেছে যে, ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের রক্তে B শ্রেণীর হার ৮%-২০%, কিন্তু কলকাতার আংলোইণ্ডিয়ানদের রক্তে তার হার ১৯%। অনুমান করা যেতে পারে যে, ধর্মান্তকরণের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের এবং সংমিশ্রণের ফলে অ্যাংলোইণ্ডিয়ানদের B শ্রেণীর হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলা দেশে হিন্দুদের প্রধানতঃ উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ হিসাবে ভাগ করা হয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য উচ্চবর্ণের অন্তর্ভুক্ত। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের রক্তশ্রেণীর অনুপাতের পার্থক্য বিশেষ দেখা যায় না। তাদের O, A, B ও AB শ্রেণীর শতকরা হার যথাক্রমে ৩৬, ২৪, ৩৩ ও ৭ এবং ৩৫, ২৪, ৩৪ ও ৭। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের তুলনায় বৈদ্যদের মধ্যে A-র হার বেশী এবং B-র হার কম। চার শ্রেণীর রক্তের হার যথাক্রমে ৩৩, ৩০, ২৬ ও ১১। উচ্চবর্ণের তুলনায় বাংলা দেশে বাগ্দী, পোদ, নমশূদ্র প্রভৃতি নিম্নবর্ণের O শ্রেণীর (৩১%) হ্রাস ও B শ্রেণীর (৩৭%) বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বাংলা দেশে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে রক্তশ্রেণীর অনুপাতে সামান্য পার্থক্য ছাড়া অন্য বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে গুরুতর প্রভেদ দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন বর্ণের রক্তশ্রেণীর অনুপাতের পার্থক্য অপেক্ষা বিভিন্ন গবেষকদের দ্বারা বিশ্লেষিত একই বর্ণের রক্তশ্রেণীর অনুপাতের পার্থক্য অনেক বেশী।

ABO ছাড়া MN, Rh প্রভৃতি অনেক প্রকার রক্তশ্রেণী ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জাতির শ্রেণীবিভাগে এই সব রক্তশ্রেণীর তথ্যও কাজে লাগানো হয়। ABO রক্তশ্রেণীর মত মানুষের রক্তকে M,N ও MN শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের অনুপাতের পার্থক্যও দেখা যায়। M ও N শ্রেণীর সংমিশ্রণে MN শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ইউরোপে M-এর হার ২৯-৩৪% এবং N-এর হার ১৪-২০%। চীন ও জাপান ছাড়া এশিয়ার অন্য অঞ্চলে M-এর হার সাধারণতঃ বেশী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে M বা N শ্রেণীর অনুপাতে খুব বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। বাঙ্গালী-দের মধ্যে M ও N-এর পরিমাণ যথাক্রমে ৪২% ও ১৩%। অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে মধ্যে M রক্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত লোকের শতকরা হার নগণ্য, কিন্তু মেক্সিকো ও ব্রেজিলের আদিবাসীদের মধ্যে M-এর হার অত্যধিক।

মানুষের রক্তকে আবার Rh-পজিটিভ ও Rh-নেগেটিভ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে Rh-নেগেটিভ শ্রেণীর শতকরা হার ১৪-১৮%। Rh-নেগেটিভ শ্রেণীর সর্বোচ্চ হার (২৯%) বাসাক (Basque) সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। এরা ফ্রান্স ও স্পেনের পশ্চিম প্রান্তে বাস করে। এই অঞ্চল থেকেই Rh-নেগেটিভ রক্তশ্রেণী ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে বলে অনুমান করা হয়। এই রক্তশ্রেণী আফ্রিকার সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়, তবে তার হার ইউরোপের তুলনায় কম। ভারতবর্ষে Rh-নেগেটিভের হার ২% থেকে ১০-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু চীন, জাপান ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বিরল। বাংলা দেশে এর হার মাত্র ৫%। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় শ্বেতকায় ব্যক্তিদের মধ্যে Rh-নেগে-টিভের হার ইউরোপের অধিবাসীদের হারের সঙ্গে যথেষ্ট মিল দেখা যায়, কিন্তু দুই মহাদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই রক্তশ্রেণীর শতকরা হার খুব কম।

মানুষের রক্তে বিভিন্ন প্রকার অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন আবিষ্কার হবার ফলে জাতির পার্থক্য নির্ণয়ে অনেক সুবিধা হয়েছে। কোন জাতির রক্তে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব ধরা পড়লে নৃতত্ত্ববিদেরা তার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। মানুষের রক্তে অস্বাভাবিক S-হিমোগ্লোবিন থাকলে সিক্‌ল্ সেল্ অ্যানিমিয়া (Sickle-cell anemia) রোগের উৎপত্তি ঘটে। পূর্ব আফ্রিকা ও মাদাগাস্কার দ্বীপের অধিবাসীদের রক্তে S-হিমোগ্লোবিনের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী। এছাড়া মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রোদের এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু উপজাতির রক্তেও দেখা যায়। অস্বাভাবিক S-হিমোগ্লোবিনের ন্যায় C, D, E প্রভৃতি আরও অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন আবিষ্কৃত হয়েছে। মানুষের রক্তে উপরিউক্ত যে কোন হিমোগ্লোবিন থাকলে রক্তশূন্যতার লক্ষণ কম-বেশী পরিমাণে পরিস্ফুট হয়। পশ্চিম আফ্রিকায়, বিশেষতঃ ঘানায় C-হিমোগ্লোবিনের হার খুব বেশী। D-হিমো-গ্লোবিনের অস্তিত্ব পাঞ্জাব ও গুজরাটের অধিবাসী-দের রক্তে সামান্য পরিমাণে দেখা যায়, কিন্তু E-হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড ও মালয়ে শতকরা দশ জনের রক্তে দেখা যায়। বাঙ্গালীদের রক্তে D ও E-হিমোগ্লোবিনের অনুপাত খুবই নগণ্য।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির রক্তশ্রেণী পর্যালোচনা করলে এই ধারণা জন্মে যে, কোন বিশেষ শ্রেণীর রক্ত কোন জাতির বৈশিষ্ট্য নয়, বরং প্রতি জাতির মধ্যে সবশ্রেণীর রক্ত কম-বেশী পরিমাণে বর্তমান। তারা অব্যাহত ধারায় নির্দিষ্ট অনুপাতে বয়ে চলে এবং তাদের অনুপাতের পার্থক্যই এক জাতিকে অপর জাতি থেকে নির্দিষ্ট করে।

কাল-পঞ্জী

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ

আজ দেশে বিভিন্ন প্রকারে কাল গণনা হয়ে থাকে। কোথাও চান্দ্রমাস, কোথাও বা সৌর মাস। কাহারও বৎসর আরম্ভ হয় ১লা বৈশাখ আবার কাহারও বা অন্য কোন দিনে। কিন্তু সুবিধার জন্য সর্বভারতীয় একই পন্থা গ্রহণ করা দরকার। সেই হিসাবে ভারত গভর্নমেণ্ট স্বর্গীয় মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে এক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মত অনুসারে গভর্নমেণ্ট হইতে সংশোধিত শকাব্দ সারা ভারতের জন্য গ্রহণ করিলেও জনসাধারণের উপর তাহার বিশেষ কোন প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, এখানে কাল গণনার ক্রমবিকাশ লইয়া কিছু আলোচনা করিতে চাই।

কোন ঘটনার অবলম্বন ব্যতীত 'কাল' আমাদের অনুভূতি ও বুদ্ধির অতীত। কতকগুলি ঘটনা-পরম্পরা হইতে আমাদের কালের জ্ঞান হয়। একটা ঘটনার অনুভূতির পরে যদি আর একটা ঘটনা ঘটে, তবে এই দুই ঘটনার ব্যবধান হইতে আমরা কালের পার্থক্য বুঝি। কিন্তু কেবল বিচ্ছিন্ন দুই বা ততোধিক ঘটনা হইতে কালের অনুভূতি গড়িয়া উঠিলেও তাহার পরিমাপের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। কালের সম্যক জ্ঞানের জন্য চাই এক অচ্ছেদ্য ঘটনা-পরম্পরা। কেবল তাহাতেই চলিবে না—এই অচ্ছেদ্য ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে মাইল পোষ্টের মত ছেদও দরকার। তাহা না হইলে সময় পরিমাপের উপায় থাকে না। সুতরাং আমাদের এমন কোন ঘটনা বাছিয়া লইতে হয়, যাহার মধ্যে এই দুই গুণই বর্তমান। চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতির গতির মধ্যে এই দুই গুণই দেখিতে পাই। ইহাদের গতির মধ্যে কোন ছেদ নাই, সেই জন্য কাল সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতিও অচ্ছেদ্য প্রবাহের মত। চন্দ্র-সূর্যের উদয়াস্ত হয়, তাহাই আমাদের নিকট মাইল পোষ্টের কাজ করে। এক উদয় হইতে অন্য উদয়কে আমরা মাপকাঠি রূপে ব্যবহার করিতে পারি। মানবজাতির অজ্ঞাতে আদিম কাল হইতে চন্দ্র-সূর্যের গতি হইতেই কালের জ্ঞান জন্মিয়াছে। তাহাদের বিচার-বুদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞান পরিমার্জিত হইয়াছে।

উদয়-অস্ত হইতে কালের এক মাপকাঠি অর্থাৎ এক দিনের জ্ঞান হওয়া সহজ। এক দিনকে ছোট ছোট বিভাগ করিয়া দণ্ড, পল বা ঘণ্টা, মিনিট করাও কঠিন নয়। আবার দিনকে যোগ করিয়া মাস, বৎসর ব্যক্ত করিতে পারি। ঋতুর আরম্ভ হইতে পুনরাবির্ভাব অবলম্বন করিয়া আমাদের বৎসরের ধারণা হয়। ঋতুর আরম্ভ হইতে পুনরাবির্ভাবের ভিতর কতবার সূর্যের উদয়াস্ত হইল, তাহা হইতে বৎসর ও দিনের মোটামুটি সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ক্রমে তারকাখচিত আকাশে সূর্য ও চন্দ্রের গতির সূক্ষ্ম জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সম্বন্ধের হিসাব সূক্ষ্মতর হয়।

রোম সাম্রাজ্যের সময় খৃঃ পূঃ ৪৫ সালে ইউরোপে পুরান পঞ্জিকা সংশোধন করা হয়। জুলিয়াস সিজার দেখেন যে, তাঁহাদের কাল-পঞ্জিকা অত্যন্ত অসংলগ্ন, তাই তিনি আলেকজেণ্ড্রিয়ার তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতিষী সোসিজিনিসের সাহায্যে ইহাকে সংশোধন করাইয়া নেন। এই কাল অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ৩৬৫¼ দিনে এক বৎসর হয়। কোন বিশেষ এক তারকা হইতে সূর্যকে পুনরায় সেই স্থানে আসিতে ৩৬৫¼ দিন লাগে, তাহাই হইল বৎসর। সূর্যের পরিক্রমা-পথকে ১২ ভাগ

করিয়া তাহার এক এক ভাগকে অতিক্রম করিতে সূর্যের যে সময় লাগে তাহাই মাস। কিন্তু অসুবিধার কথা এই যে, ৩৬৫¼-কে সমানভাবে ১২ ভাগ করা যায় না। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাসের জন্য পৃথক দিন-সংখ্যা ধার্য করা হইল। যেমন—জানুয়ারীর জন্য ৩১, সেপ্টেম্বর ৩০ এবং ফেব্রুয়ারীর ২৮। সমান বার ভাগ করিবার পরে যে ৫¼ দিন বেশী থাকিয়া যায়, তাহাকে কোন কোন মাসে ১ দিন করিয়া বাড়াইয়া সমস্যার সমাধান করা হয়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, ফেব্রুয়ারীকে ২৮ দিন করিবার কি প্রয়োজন ছিল? এই সম্বন্ধে মজার এক গল্প প্রচলিত আছে। সত্য নাও হইতে পারে। জুলিয়াস সিজার তো দিন-পঞ্জী চালু করিয়া দিলেন, তাহাতে ফেব্রুয়ারী মাস ২৯ এবং অগাষ্ট মাস ৩০ দিনে ছিল। জুলিয়াস সিজারের পরে অগাষ্টাস যখন সম্রাট হইলেন, তখন তিনি আপত্তি তুলিলেন—জুলিয়াস সিজারের নামে যে মাস, তাহাতে হইবে ৩১, আর আমার নামের মাসে ৩০ দিন—তাহা হইতেই পারে না। আমার নামের মাসেও ৩১ দিন হইতে হইবে। কি আর করে! জ্যোতিষীরা তখন অগাষ্ট মাসকে ৩১ করিতে ফেব্রুয়ারীর ১ দিন আরও কাটিয়া নিলেন

বৎসর গণনায় ৫ দিনের গোলমাল তো কোন রকমে মিটিল। বাকী সমস্যা রহিল ¼ দিন লইয়া। সমাধান হইল লিপ-ইয়ার সৃষ্টি করিয়া। যে বৎসর-সংখ্যাকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে শেষাংশ কিছু থাকিবে না, তাহাই হইবে লিপ-ইয়ার। অর্থাৎ সেই বৎসরে দিন-সংখ্যা হইবে ৩৬৬। ফেব্রুয়ারী মাস ২৮-এর পরিবর্তে ২৯ দিনে হইবে। জুলিয়াস কাল-পঞ্জীতে বৎসর আরম্ভও পরিবর্তিত হইল। পূর্বে হইত মার্চে, এখন আরম্ভ হইল জানুয়ারীতে।

জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, সূর্যের প্রকৃত পরিক্রমণ কাল ৩৬৫¼ (৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা) নয়—ইহা হইল ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড। সুতরাং লিপ-ইয়ারে এক দিন করিয়া বাড়াইলে ৪০০ বৎসরে ৩ দিন অধিক হইতে পারে।

তাহা ছাড়া আরও জানা যায় যে, Equinoxes (রাহু ও কেতু) সূর্যের গতিপথে ক্রমে সরিয়া যায়। এই গতিকে ইংরেজীতে বলা হয় Precession of the Equinoxes। ইহার গতিবেগ অত্যন্ত কম—বৎসরে ৫০".২৬১৯ মাত্র—অর্থাৎ ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়া গতিপথ পূর্ণ করিতে লাগে ২৬০০০ বৎসর।

পৃথিবীর বিষুব সমতল (Equatorial plane) ও সূর্যের গতিপথ সমতল যে দুই বিন্দুতে মিলিত হয়, তাহাকেই Equinoxes বলে। সূর্য যখন এই দুই বিন্দুতে আসিয়া পড়ে তখনই দিন ও রাত্রি সমান হয়। Equinoxes খানিকটা করিয়া পিছাইয়া পড়ে বলিয়া বৎসরের কাল পরিমাণ অতি সামান্য করিয়া ছোট হইতে থাকে।

এই সকল কারণে দেখা যায় যে, জুলিয়াস কাল-পঞ্জীর আবার সংশোধনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে পোপ গ্রীগরী তৎকালীন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ক্লভিয়াসের সাহায্যে কাল-পঞ্জী আবার সংশোধন করান। পোপ গ্রীগরী বিধান দিলেন যে, ১৫৮২ খৃঃ-এর ৪ঠা অক্টোবরের দিন ৫ই না হইয়া ১৫ই অক্টোবর হইবে; অর্থাৎ কাল-পঞ্জী হইতে ১০ দিন লোপ করিয়া দিলেন। আরও বলিলেন যে, যে শতাব্দী আরম্ভ সংখ্যাকে ৪০০ সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট থাকিবে, যেমন—১৭০০, ১৯০০ বা ২২০০ খৃঃ বৎসর লিপ-ইয়ার হইবে না।

তখনকার দিনে পোপের বিধান অলঙ্ঘনীয় ছিল; সুতরাং সমস্ত ক্যাথলিক খৃষ্টীয় জগৎ বিনা দ্বিধায় এই বিধান মানিয়া নিলেন। কিন্তু গ্রীক ও প্রোটেষ্টাণ্ট চার্চ এই লোপ মানিয়া লইতে অস্বীকার করিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড এই বিধানের সার্থকতা উপলব্ধি করিল। পালিয়ামেণ্ট

হইতে দিন-পঞ্জী সংশোধনের আইন পাশ হইল। তাহাতে ২রা সেপ্টেম্বরের পরদিন ৩ তারিখ না হইয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর গণ্য করা হইবে এবং পূর্ব প্রথা অনুযায়ী ২৫শে মার্চ হইতে বৎসর গণনা না হইয়া তাহা হইবে ১লা জানুয়ারী। কিন্তু জনতা এই সিদ্ধান্তের প্রবল বিরুদ্ধতা করে। আন্দোলন, দাঙ্গা প্রভৃতি আরম্ভ হয় এবং বহুলোকের প্রাণ যায়। তাহাদের নাড়া বা শ্লোগান ছিল—Give us back our fortnight. ক্রমে প্রায় সব দেশেই এই সংশোধিত দিন-পঞ্জীর প্রচলন হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাশিয়ায় এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রুমেনিয়ায় জুলিয়ান কাল-পঞ্জী প্রচলিত ছিল। এই দুই দেশে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কাগজপত্রে দুই তারিখেরই উল্লেখ থাকিত, যেমন—জুন ৯।২২, ১৯১৬। বিপ্লবের পরে এই দুই দেশের কাল-পঞ্জীর পরিবর্তন হয় আজ পাশ্চাত্ত্য জগতে সকলেই জর্জিয়ান কাল-পঞ্জী ব্যবহার করেন। আমাদের দেশেও গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে জর্জিয়ান এবং সাহা কমিটির সংশোধিত কাল-পঞ্জী দুই-ই স্বীকৃতি পাইয়াছে। জনসাধারণ কিন্তু এখনও পূর্ব প্রথা অনুসারেই চলিতেছে।

আমাদের দেশে সৌরমাস ও চান্দ্রমাস দুইয়েরই প্রচলন আছে। মুসলমান সমাজ, কেবল আমাদের দেশেই নহে, সর্বত্র চান্দ্রমাস অবলম্বন করে। হিন্দুদের মধ্যে দুই প্রকার মাসই প্রচলিত। পূজা-অর্চনার কাজ তিথি অনুসারে অর্থাৎ চান্দ্রমাসিক দিন অনুসারে চলে। অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্যন্ত এক চান্দ্রমাস ধরা হয়। কিন্তু এই প্রথায়ও দিনের পরিমাপ হয় সূর্যের সাহায্যে। সুতরাং উভয় প্রথায় দিনের পরিমাপ থাকে এক। এই ভাবে গণনায় দেখা যায় যে, এক সৌরবৎসরের কাল পরিমাণ হইতে চান্দ্রবৎসরের কাল পরিমাণ প্রায় ১২ দিন কম। সুতরাং প্রতি ২½ সৌরবৎসরের পর ১২ সৌরমাস কাল ১৩ চান্দ্রমাসের সমান হয়। মুসলমান সমাজে ইহার সংশোধন করিবার কোন পন্থা অবলম্বন করা হয় নাই। সুতরাং তাহাদের বৎসর আরম্ভ, পূজাপার্বণ সবই সৌরবৎসর ঋতুর তুলনায় ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসে। তাতেই আমরা দেখিতে পাই মহরম বা ঈদ কখনও হয় শীতকালে, কখনও বা গ্রীষ্মে। হিন্দুদের মধ্যে মোটামুটি একটা সংশোধনের পন্থা আছে। যাহারা সৌরমাস মানিয়া চলে, পূজাপার্বণের কাল মোটামুটি ঠিক রাখিবার জন্য প্রতি ২½ বৎসরে একটি মলমাস মানিয়া থাকে। পূজাপার্বণ, বিবাহাদি কিছুই এই মাসে হইতে পারে না। অর্থাৎ চান্দ্রবৎসর হইতে ইহাকে লোপ করিয়া সৌরমাসের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়। আর যাহারা কাল-পঞ্জীতেও চান্দ্রমাস মানেন, তাহারা এক অধিক চান্দ্রমাস আখ্যা দিয়া সৌরমাসের সঙ্গে মোটামুটি সামঞ্জস্য রাখেন। অর্থাৎ প্রতি ২½ বৎসরে একই নামে দুই মাস হবে—যেমন আশ্বিন আর অধিক আশ্বিন। এই অধিক মাসে মলমাসের মত কোন পূজাপার্বণ হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে সৌরমাসকে সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

এখন এই সৌরবৎসর ও সৌরমাসের গণনা কি প্রকারে করা হয়? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সূর্যের গতিপথের কোন এক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যকে সেই স্থানে ফিরিয়া আসিতে যে সময় লাগে, তাহাকে বলা হয় সৌরবৎসর। সূর্যের এই গতিপথকে ক্রান্তিচক্র বলা হয়। ক্রান্তিচক্রকে ১২টি সমান ভাগে ভাগ করিয়া এক এক ভাগকে বলা হয় রাশি। সূর্যকে এক এক রাশি অতিক্রম করিতে যে সময় লাগে তাহাই হইল মাস। আমরা দেখিয়াছি পাশ্চাত্ত্য প্রথায় মাসের কাল পরিমাণ কতকটা যথেচ্ছভাবে ঠিক করা হইয়াছে। কারণ মুশকিল হইয়াছিল সেই ৫¼ দিন লইয়া। কিন্তু

আমাদের মাস গণনার প্রথায় তাহার প্রয়োজন হয় নাই।

বর্তমানে আমরা জানি যে, ক্রান্তিচক্রের সকল অংশে সূর্যের গতি সমান হয় না। কেপ্‌লারের নিয়ম অনুসারে কম-বেশী হইয়া থাকে। পৃথিবীর কাছে সূর্য আসিলে (পক্ষান্তরে বলা উচিত পৃথিবী সূর্যের কাছে আসিলে) ইহার গতিবেগ বৃদ্ধি ও দূরে গেলে হ্রাস পায়। সুতরাং ক্রান্তিচক্রের সম-বিভাজনকে অতিক্রম করিতে সূর্যের কম-বেশী সময় লাগিবে। সেই জন্য আমাদের মাস-কাল সবগুলি সমান হয় না। আমরা দেখি শীতকাল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং গ্রীষ্মের মাসগুলি বড় হয়। কারণ, আমরা জানি পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে শীতকাল হয় পৃথিবী যখন সূর্যের কাছে থাকে আর দূরে গেলে হয় গ্রীষ্মকাল। তেজপুঞ্জ সূর্যের কাছে আসিলে গ্রীষ্ম না হইয়া শীতকাল কেন হয়—সে অন্য চর্চার বিষয়। যোটের উপর বাড়্‌তি ৫$\frac{1}{4}$ দিনের সমস্যা ভারতীয় গণনা প্রথায়ই সমাধান হইয়া যায়। তবে কি আমাদের কাল-পঞ্জী সংশোধনের দরকার নাই? নিশ্চয়ই আছে। অতীত কালেও সংশোধন করা হইয়াছে। পুরাতন শাস্ত্রে দেখা যায় যে, বৎসর আরম্ভ হইত অগ্রহায়ণ হইতে। নামের অর্থও তাই। অয়ন অর্থাৎ সূর্যগতির অগ্র; কিন্তু আমরা দেখি যে, বাংলা প্রভৃতি রাজ্যে বৎসর আরম্ভ হয় বৈশাখ হইতে। ইহাতে বোঝা যায়, কোন এক সময়ে কাল-পঞ্জীর সংশোধন হইয়াছে। ইতিহাসে তাহার কোন বিবরণ আছে কিনা জানি না। কিন্তু জ্যোতিষের সাহায্যে এই সংশোধন-কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে।

১লা বৈশাখ বৎসর আরম্ভ—অর্থাৎ ৩০ চৈত্র যখন পৃথিবী Equinoxe-এ আসিত, তখনই এই সংশোধন হয়। ইহাতে বোঝা সহজ যে, যাহাদের সূর্যগতি সম্বন্ধে সূক্ষ্মজ্ঞান ছিল তাহারা বিশেষ একটা অবস্থান হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করিবে। তাই তাহারা ৩০শে চৈত্র বাছিয়া নিয়াছিল। কিন্তু আজ আমরা দেখি যে, সূর্য Equinox-এ আসে অর্থাৎ দিন ও রাত্রি কাল সমান হয় ৩০শে নয়—৯ই চৈত্র তারিখে; অর্থাৎ Equinox ২১ দিন অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে।

আমরা আগে দেখিয়াছি যে, Equinox-এর গতি সম্বন্ধে জ্যোতিষীদের সেকালে কোন জ্ঞান ছিল না, তাই তাঁহারা এদিকের সংশোধনের কথা ভাবিতে পারেন নাই। পরে জানা গিয়াছে যে, এই Equinox পরিক্রমা পূর্ণ করিতে ২৬০০০ বৎসর লাগে অর্থাৎ ২৬০০০ বৎসরে Equinox ৩৬০ ডিগ্রি এবং দিন হিসাবে বলিতে গেলে পূর্ণ এক বৎসর সরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং ২১ দিন সরিয়া আসিতে Equinox-এর লাগিবে $\frac{২১ \times ২৬০০০}{৩৬০} = ১৫০২$ বৎসর, অর্থাৎ ১৯৬৬ − ১৫০২ = ৪৬৪ খৃষ্টাব্দে। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ে বরাহের মত বিচক্ষণ জ্যোতিষী সমুদ্রগুপ্তের সভায় এক রত্নরূপে বিরাজ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ে বরাহের সাহায্যে সমুদ্রগুপ্ত আমাদের বর্তমান দিন-পঞ্জীর প্রতিষ্ঠা করেন। আর এই Equinox পরিক্রমা সংশোধনের অভাবেই জর্জিয়ান দিন-পঞ্জীর বৎসরারম্ভ, অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা ছোট দিন সরিয়া আসিয়াছে। এখন সর্বাপেক্ষা ছোট দিন হয় ২২শে ডিসেম্বর।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, স্বাধীনতার পরে আমাদের নানা ধরণের দিন-পঞ্জী এক করা এবং তাহাকে সংশোধন করিবার দিকে নজর পড়ে। সাহা কমিটি গঠিত হয়। তাহার সুপারিশও বাহির হইয়াছে। আমাদের জনসাধারণ তাহা এখনও গ্রহণ করে নাই।

সঞ্চয়ন

খাদ্যসমস্যা সমাধানে সয়াবীনের ভূমিকা

যে সকল দেশে ভাত এবং তণ্ডুলজাতীয় দ্রব্যই প্রধান খাদ্য, সে সকল দেশের অধিবাসীদের দেহ-পুষ্টির জন্যে প্রত্যেকেরই অন্ততঃ ১০ গ্র্যাম প্রোটিনের প্রয়োজন। এই ১০ গ্র্যাম প্রোটিনের জন্যে প্রতিদিন অন্ততঃ একজনের প্রায় এক সের চালের ভাত খাওয়া দরকার। কিন্তু খাদ্যাভাবগ্রস্ত দেশসমূহে মাথাপিছু এই পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ আদৌ সম্ভব নয়। বহু দেশেই গ্রামবাসীরা সারাজীবন কেবলমাত্র শাকসব্জী বা সাধারণ শস্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। মাংস বা অন্যান্য প্রোটিন খাদ্য প্রায়ই তাদের জোটে না।

এদের এই পুষ্টির অভাব, খাদ্যের পুষ্টির সমস্যা সয়াবীনের দ্বারা মেটানো যেতে পারে। এশিয়ার বহু দেশই এই জিনিষটির সঙ্গে পরিচিত। বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে—এক কাপ ঘন সয়াবীনে অন্ততঃ ১১০ গ্র্যাম প্রোটিন থাকে। গড়পড়তা একজন বয়স্ক ব্যক্তির প্রতিদিন যে পরিমাণ প্রোটিন, ভিটামিন ও ধাতব উপকরণের প্রয়োজন হয়, তা সয়াবীনের সাহায্যে মেটানো যেতে পারে।

তৈরি করবার উপরই সয়াবীনের স্বাদ নির্ভর করে। সয়াবীনকে মাংসের মত, শুকনো খেজুর অথবা আলুভাজার মত করে তৈরি করা যেতে পারে। শাকসব্জীর মতই এর স্বাদ হয়। টেক্সাসের এগ্রিকালচার্যাল ও মেকানিক্যাল কলেজের গবেষণাগারে সয়াবীন নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। ঐ গবেষণাগারেই নানা স্বাদের সয়াবীন তৈরি হয়েছে। এই গবেগণাগারেই আবার খাদ্যশস্য ও ভুট্টার সাহায্যে প্লাষ্টিক'ও তৈরি হয়েছে।

সয়াবীন নিয়ে গবেষণা কেবল টেক্সাসের ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই হয় নি, কয়েকটি ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানও সয়াবীন এবং গমের প্রোটিনের সাহায্যে শূকর, মুরগী ও গরুর কৃত্রিম মাংস তৈরি করেছে তবে আসল ও কৃত্রিম মাংসের স্বাদের মধ্যে একটু পার্থক্য আছেই।

বিজ্ঞানীরা বলেন, এসব সিন্থেটিক কৃত্রিম খাদ্যে আসল খাদ্যের প্রায় সকল গুণই রয়েছে। এসব খাদ্য কোন দিক থেকেই আসলের তুলনায় নিকৃষ্ট নয় এবং নকলও নয়। আর এই সকল কৃত্রিম খাদ্যে ইচ্ছামত গন্ধও জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। এজন্যে এসব খাদ্য জনসাধারণের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। মানুষ বর্তমানে সিন্থেটিক ওষুধপত্র, কাপড়চোপড়, রবার, রং, সাবান প্রভৃতি ব্যবহার করছে।

তবে বাজারে এই কৃত্রিম মাংস চালু করবার পথে স্বাদের চেয়ে আর্থিক লাভ-লোকসানের প্রশ্নই বেশী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আসল মাংসের তুলনায় এই সয়াবীনের কৃত্রিম মাংসের মূল্য এখনও অনেক বেশী। তবে টাট্‌কা মাংসের চেয়ে ঐ কৃত্রিম মাংসে প্রোটিনের পরিমাণ থাকে অনেক বেশী। তাতে দেহের পুষ্টিও তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে। এছাড়া কৃত্রিম মাংস স্নেহবর্জিত; সুতরাং হৃদ্‌রোগে যারা ভুগছেন, তাদের পক্ষে ঐ মাংসই বিশেষ উপযোগী। কৃত্রিম মাংসের মূল্য আসল মাংসের তুলনায় বেশী হলেও

আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠান বছরে ত্রিশ লক্ষ ডলার মূল্যের এই কৃত্রিম মাংস বিক্রয় করছে।

সয়াবীনকে নানাভাবেই কাজে লাগানো হয়ে থাকে। সয়াবীনের তৈলও বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। যে সকল উপকরণ রপ্তানী করে আমেরিকা সর্বাধিক পরিমাণে ডলার অর্জন করে থাকে, তাদের মধ্যে সয়াবীনের তৈল অন্যতম। প্রাচ্যখণ্ডে গত চার হাজার বছর ধরে সয়াবীনের চাষ হয়ে আসছে এবং জনসাধারণ সয়াবীন ব্যবহার করছে। কিন্তু উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের দিক থেকে তরুলতা সংগ্রহের উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকায় মাত্র সাট বছর আগে সয়াবীনের সন্ধান করা হয়েছিল। তখন থেকে সেখানে সয়াবীনের চাষ হচ্ছে। বর্তমানে সয়াবীন থেকে বাড়ী-ঘর নির্মাণের উপকরণও তৈরি হয়। এছাড়া রুটি, মদ, ঈস্ট, মারগারিন এবং মিছরি প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্যও তৈরি হয়ে থাকে। আমেরিকায় বর্তমানে ৯০০ বুশেল সয়াবীন উৎপন্ন হয়ে থাকে। এর চাহিদা ভবিষ্যতে আরও বেড়ে যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সয়াবীনের চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে, আমেরিকার সয়াবীন বিক্রির জন্যে রোম, বোগোটা, কায়রো, হামবুর্গ, তেহারান, কাসাব্লাঙ্কা, করাচী, আঙ্কারা এবং মেড্রিডে মার্কেটিং অফিস খুলতে হয়েছে। বর্তমানে এর কোন মজুত ভাণ্ডার বা রিজার্ভ ষ্টক নেই।

সয়াবীন ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশ্ববাসী আজও তেমন সচেতন নন। ত্রিশ বছর আগে মোটর গাড়ী নির্মাণের ক্ষেত্রে বিখ্যাত মার্কিন শিল্পপতি হেনরী ফোর্ড এক দল সাংবাদিককে তাঁর কারখানায় সয়াবীনের তৈরি খাদ্য দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন। তারপর তাঁদের তিনি তাঁর কারখানা দেখাবার জন্যে নিয়ে যান এবং তাঁদের সামনেই জনৈক শ্রমিকের হাত থেকে হাতুড়ীটি নিয়ে একটি নতুন ফোর্ড মোটর গাড়ীর গায়ে সজোরে আঘাত করেন। তাতে ঐ মোটর গাড়ীর গায়ে সামান্য আঁচড়ও কাটে নি। ধাতুর পরিবর্তে সয়াবীনের প্লাষ্টিকেই ঐ মোটরের বডি তৈরি হয়েছিল।

তেল থেকে খাদ্য

জন নিউয়েল এই সম্বন্ধে লিখেছেন—তেল থেকে খাদ্য, আরও যথাযথ ভাবে বলতে গেলে—পেট্রোল থেকে প্রোটিন। তৈলবিজ্ঞানীরা বিশুদ্ধ পেট্রোলজাত এককোষী উদ্ভিদ থেকে উচ্চমানের প্রোটিন উৎপাদনে সফল হয়েছেন। একথা এখন বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে, পেট্রোলজাত এই প্রোটিন দেহগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। প্রোটিনের অভাবের ফলে পৃথিবীর বিস্তৃত এলাকা জুড়ে পুষ্টিহীনতা বিদ্যমান।

পৃথিবীর খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে পেট্রোলজাত প্রোটিন স্থায়ী উৎস হতে পারে না, কারণ পৃথিবীর পেট্রোল সম্পদ অফুরন্ত নয়, আর তার কোন বিকল্পও নেই। কিন্তু যেহেতু তৈল সম্পদ সীমিত, সেহেতু তার ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া দরকার এবং পৃথিবীর এই দানকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার নিশ্চয়ই সর্বোত্তম ব্যবহার নয়।

প্লাস্টিক শিল্পের জন্যে পৃথিবীর মোট উৎপাদিত তৈলের একটা বড় অংশ আলাদা করে রাখা উচিত। কেন না, প্লাস্টিক শিল্পের ভিত্তি যে

অপরিশ্রুত পেট্রোল, তা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা কঠিন ও ব্যয়সাধ্য।

পরিসংখ্যান নিলে বোঝা যাবে, পেট্রোল থেকে প্রোটিন উৎপাদন কত কাজের হবে। গবেষকেরা হিসাব করে দেখেছেন যে, এক বছরের মধ্যে ৪ কোটি টন অপরিশ্রুত পেট্রোল ব্যবহার করে ২ কোটি টন বিশুদ্ধ প্রোটিন পাওয়া যেতে পারে। এর ফলে পৃথিবীর মোট বার্ষিক প্রোটিন উৎপাদন দ্বিগুণ হতে পারে। এর সঙ্গে আর একটি প্রোটিন-উৎসের তুলনা করা যেতে পারে। বর্তমানে গভীর সমুদ্র থেকে বছরে যে মাছ ধরা হতো, তা থেকে ৬০ লক্ষ টন প্রোটিন পাওয়া যায়। যথোপযুক্ত চেষ্টার ফলে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৫ কোটি টন দাঁড়াতে পারে। ১৯৬২ সালে পৃথিবীর তৈল-ক্ষেত্রগুলি থেকে মোট ১২৫ কোটি টন পেট্রোল উৎপাদিত হয়। ৪ কোটি টন এই পরিমাণের এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

যাহোক মোট পেট্রোলের মাত্র শতকরা ৩ ভাগও এই নতুন উদ্দেশ্যসাধনে ব্যয় করবার আগে চিন্তা করা উচিত। বিবেচনা করা উচিত যে, পেট্রোলের মত বিকল্পহীন সম্পদকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার মত উদ্দেশ্যটি বড় কি না?

২০০০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণ হবে। তখন বছরে মোট ৬ কোটি টন প্রোটিনের প্রয়োজন হবে।

এই পরিসংখ্যান থেকে এটা পরিষ্কার যে, পেট্রোল থেকে প্রোটিন তৈরির কাজ খুব জরুরী। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম তৈল প্রতিষ্ঠান বৃটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী এই ব্যাপারে গবেষণা সুরু করে দিয়েছেন।

পেট্রোল থেকে প্রথম যে প্রোটিন উৎপাদন করা হয়েছে, তা এক ধরণের স্বাদ-গন্ধহীন ঈষ্ট। এই প্রোটিনকে শুকিয়ে গুঁড়া করলে সাদা পাউডারের মত দেখায়। আপাততঃ একে গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারযোগ্য এর একটি সংস্করণও প্রস্তুত করেছেন। এর মধ্যে সুস্বাদু মাংস-সার ও মাছের সস্‌ও আছে। এই প্রোটিন ব্যবহারের আরও সহজ উপায় হলো, প্রোটিনবিহীন খাদ্যে পাউডার হিসাবে ছড়িয়ে দেওয়া।

এখন গবেষণা এতদূর এগিয়েছে যে, একটি অগ্রণী প্ল্যান্টে পেট্রোল থেকে প্রোটিন তৈরি করা হচ্ছে। ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই প্রোটিন অপেক্ষাকৃত সহজপাচ্য। তাছাড়া লাইজিন নামে একটি অ্যামিনো-অ্যাসিড এই প্রোটিনে খুব বেশী পরিমাণে আছে। এই জিনিষটি শুধু প্রাণীজ প্রোটিনেই পাওয়া যায় এবং সুষম খাদ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়।

পেট্রোলজাত প্রোটিন তৈরির আর একটি সুবিধা হবে এই যে, তা আংশিকভাবে পেট্রোল পরিশ্রুত করবার কাজ করে দেবে—কেন না, অপরিশ্রুত পেট্রোল ঈষ্টের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

ট্যাঙ্কের মধ্যে ঈষ্ট জন্মানো যেতে পারে, মাটি, সূর্যরশ্মি বা বৃষ্টি—কোন কিছুরই প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া বস্তুতঃ ঈষ্ট এক শ্রেণীর উদ্ভিদ হওয়ায় এই প্রোটিন ব্যবহারে কোন ধর্মীয় বাধাও উপস্থিত হবে না।

পেট্রোল আপেক্ষিকভাবে দামে সস্তা এবং পৃথিবীর সর্বত্র বহন করে নিয়ে যাওয়াও সহজ। পৃথিবীর সর্বত্র ১০০ তৈলশোধনাগার ছড়িয়ে রয়েছে। এদের যে কোনটিকে প্রোটিন তৈরির কাজে লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া আর একটি উপ-উৎপাদনের ফলে তৈল-শিল্প শক্তি-শালীই হবে।

এখানে উদ্ধৃত তথ্য ও তত্ত্বগুলি পাওয়া গেছে ফরাসী দেশস্থিত বৃটিশ পেট্রোলিয়ামের আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থার ব্যবস্থাপক আলফ্রেড

ক্যামপাডাবার-এর একটি প্রবন্ধ থেকে। বৃটিশ পেট্রোলিয়াম ছাড়া অন্যান্য পেট্রোল কোম্পানীগুলিও এই পথে অগ্রসর হচ্ছেন।

এমন দিন বেশী দূরে নয়, যখন আরব মরুভূমির ডেরিকগুলি একই সঙ্গে তেল ও খাদ্য উৎপাদন করবে।

মানুষ চাঁদে যাবে কবে?

ভিতালি ব্রনষ্টেইন এই সম্বন্ধে লিখেছেন—স্বয়ংক্রিয় স্পেস-ষ্টেশনের সাহায্যে গত আট বছর ধরে ক্রমাগত চাঁদে অভিযান চালাবার পরীক্ষা হচ্ছিলো। মহাকাশে আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীটি সম্পর্কে এই ষ্টেশনগুলির মাধ্যমে বহু নতুন নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। উল্টোদিকের ছবি ছাড়াও লুনা-৩ ও মহাকাশ অভিযাত্রী জোন্দ-৩ ও ৩টি রেঞ্জার চাঁদের প্রকাশ্য দিকটারও অনেক ছবি পাঠিয়েছে। এতে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, চাঁদে কোন চৌম্বক ক্ষেত্র তো নেই-ই, কোন তেজস্ক্রিয় বলয়ও নেই। ভবিষ্যতে চাঁদে যেতে হলে এই দুটি তথ্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।

চাঁদে অবতরণ করবার আগে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারদের আরও অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রথম হলো যাত্রাপথ সন্ধানের সমস্যা। এখানে দুটি বক্তব্য রয়েছে। একটি হলো চাঁদের নিজের কক্ষপথের অদূরে থেকে প্রথমে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে নামা। এর ফলে সময় লাগবে ১০ দিন। দ্বিতীয় হলো, সাময়িকভাবে চাঁদের একটি কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হবার পর কয়েকবার চাঁদ প্রদক্ষিণ করে নামা। এই ব্যাপারে রকেট ইঞ্জিনকে কক্ষ পরিবর্তন করতে হলে বার দুই ইঞ্জিন বন্ধ করতে ও চালাতে হবে। এতে ইঞ্জিনের জ্বালানীর ঘাটতি হতে পারে। এর ফলে উড্ডয়নের সময় দেড় দিন পর্যন্ত কমে যেতে পারে এবং ফেরবার সময়ও লাগবে দেড় দিন। যে সময়টা এভাবে বাঁচবে, সেই সময়টা চাঁদে পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য গবেষণা চালাবার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই দুটি বক্তব্যের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য, সেই বিষয়টিও বিশেষ ধরণের ইলেকট্রিক কম্পিউটার দিয়ে হিসেব করে নিতে হবে।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো জীব-বিজ্ঞানের। মহাকাশে ১০ দিন যাত্রার জন্যে মহাকাশযানের আরোহীদের খাদ্য, জল ও বায়ু সরবরাহ কি করে করা হবে? সোভিয়েট মহাকাশচারী ভ্যালেরি বিকোভস্কি, আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েফ, প্যাভেল পোপোভিচ ও ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভার দীর্ঘ সময়ব্যাপী মহাকাশে উড্ডয়ন এবং মার্কিন মহাকাশচারী গর্ডন কুপার ও চার্লস কন্‌রাডের 'জেমিনি-৫' ক্যাপস্যুলে সম্প্রতি ৮ দিন ব্যাপী উড্ডয়নে দেখা গেছে যে, আরোহীদের জন্যে প্রয়োজনীয় সরবরাহের ব্যাপারে মৌলিক কোন অসুবিধা নেই।

আবার এটাও ঠিক যে, আরোহীদের জন্যে সমস্যটাই সব নয়। কক্ষপথে উড্ডয়নকালে মহাকাশযানের ব্যবস্থায় কোন গোলযোগ দেখা গেলে কিম্বা মহাকাশচারীগণ অসুস্থ বোধ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আধ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীতে নামিয়ে নেওয়া যায়। স্বভাবতঃই মহাকাশচারীদের মনোবলও অটুট থাকে। কিন্তু চাঁদের দিকে বা তাকে ঘুরে আসবার জন্যে যে উড্ডয়ন সুরু হবে, তা মাঝপথে দিক পরিবর্তন করে মহাকাশযানকে প্রয়োজনমত উড্ডয়ন সম্পূর্ণ হবার আগেই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যাবে না। মহাকাশ-

যানকে নতুন কক্ষপথে স্থাপনের ক্ষেত্রে রকেট ইঞ্জিন চালাবার ব্যাপারে সামান্যতম ভুলত্রুটি দেখা দিলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। মহাকাশযানটি তখন হয় পৃথিবী এড়িয়ে গিয়ে চিরতরে হারিয়ে যেতে পারে অথবা আবহ-মণ্ডলের ঘনত্বে পড়ে উল্কাখণ্ডের মত একেবারে পুড়ে যেতে পারে। সুতরাং যাবার প্রস্তুতি করতে হলে মহাকাশযানের সমস্ত ব্যবস্থাগুলি বার বার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

মহাকাশযানের চাঁদে নামবার ব্যাপারটাও সমস্যাপূর্ণ নয়। প্রথমতঃ ধীর অবতরণ ' দ্বিতীয়তঃ মহাকাশচারীর চাঁদে অবস্থানের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করা। তৃতীয়তঃ সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো—মহাকাশচারীর পৃথিবীতে প্রত্যা-বর্তন সমস্যা।

যেহেতু চাঁদে কোন আবহমণ্ডল নেই, সেহেতু রকেট ইঞ্জিনের সাহায্যে গতিবেগ কমিয়ে চাঁদে ধীরে অবতরণ করতে হবে।

'লুনা-৫'-এর সাহায্যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম চাঁদে ধীর অবতরণের চেষ্টা করে। যদিও লুনা-৫ সমগ্র সমস্যাটির সমাধান করতে সক্ষম হয় নি, তবু বহু মূল্যবান তথ্য সে সরবরাহ করে গেছে। ১৯৬৫ সালের জুন মাসের ৮ই তারিখে লুনা-৬ মহাজাগতিক ষ্টেশনটি ক্ষেপণ করা হয়। কিন্তু তার গতিপথের সঠিক পরিবর্তন করা গেলেও ইঞ্জিনটি বন্ধ করা যায় নি এবং ষ্টেশনটি চাঁদ এড়িয়ে চলে যায়। এবার অচিরেই সেই ধীর অবতরণের সমস্যাটির সমাধান হবে।

এখন মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে চাঁদের পিঠে নামতে গিয়ে মহাকাশচারীকে এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, তাঁকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে, সেটি হলো চাঁদে আবহমণ্ডলের আবরণ না থাকায় উল্কাখণ্ড যে কোন মুহূর্তে তার উপর এসে পড়তে পারে। সূর্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মিও সরাসরি এসে পড়বে চাঁদের পিঠে। তাপমাত্রার তারতম্যও দেখা দেবে তীব্র আকারে।

চাঁদে কোন মহাকাশযান-ঘাঁটি (কস্‌মোড্রোম) না থাকায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সমস্যাটি দেখা দেবে বিরাট আকারে। পৃথিবীকেই রেডিও মারফৎ সাহায্য পাঠাতে হবে এই ব্যাপারে। ভবিষ্যৎই এই সমস্যার সমাধান করবে।

বিশেষ ধরণের জেট ইঞ্জিনের দ্বারাই চাঁদে ধীর অবতরণ সম্ভব হয়েছে

স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের ধীর গতিতে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণে মহাকাশচারী টিটভ বলেছেন—মহাকাশে পরিচালন ও বেগ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক বিদ্যার পদ্ধতি ভালভাবেই কাজ করে চলেছে এবং নবম লুনার ন্যায় একটি যন্ত্র নির্মাণের ফলে মহাকাশ সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

তিনি মনে করেন, চন্দ্রের আকার ও তার পৃষ্ঠের উপরের স্তর, তার তাপমাত্রা, চৌম্বক ক্ষেত্র প্রভৃতি সম্পর্কে আরও নিখুঁত সংবাদাদি লুনা-৯-এর সাহায্য পাওয়া যাবে। টিটভের ধারণা—মানুষের চন্দ্রে অবতরণের পূর্বে অন্য কোন প্রাণীকে পাঠানো হবে। মনুষ্য-নির্মিত পৃথিবীর উপগ্রহে যেমন কুকুরকে পাঠানো হয়েছিল, সেই রকম নতুন "বেল্‌কা" ও "স্ত্রেল্‌কা"-র দলও তারা হতে পারে।

ঘেরম্যান টিটভ বলেন, চাঁদে লুনা-৯-এর অবতরণ সুনিশ্চিত করবার জন্যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা নানান ধরণের ক্ষমতাসম্পন্ন বিশেষ জেট ইঞ্জিনের ব্যবহার করেছিলেন। তিনি

বলেন, এই স্বয়ংক্রিয় ষ্টেশনটির চাঁদে ধীর অবতরণের তাৎপর্য বিরাট। কেন না, পৃথিবীতে ধীর অবতরণ অপেক্ষা চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীর অবতরণ পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। তিনি এই বিষয়টির উপর জোর দিয়ে বলেন যে, চাঁদে যেহেতু কোনও আবহমণ্ডল নেই, সেহেতু চন্দ্রাভিমুখী যানের সামনে কোনও স্বাভাবিক 'ব্রেক'ও নেই, যা আবহমণ্ডল থাকলে হতো। প্যারাসুটের কৌশলও এখানে অবান্তর। জেট ইঞ্জিনের সাহায্যেই এক্ষেত্রে চন্দ্রাভিমুখী যানটির গতিবেগ যথাসময়ে হ্রাস করতে হয় এবং ঠিক সময়ে তা একেবারে থামিয়ে ফেলতে হয়।

চাঁদে মানুষের অভিযান চালাবার ব্যাপারে মানুষকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনাই হলো প্রধান সমস্যা। তাই চাঁদের সফর শেষে মহাকাশচারীকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবার সুনিশ্চিত পদ্ধতি নির্ধারিত না করা পর্যন্ত চাঁদে মনুষ্যবাহী যান পাঠাবার প্রশ্ন উঠতে পারে না। প্রথম মহাকাশচারীদের চাঁদে নামাবার আগে সর্বপ্রথম চাঁদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি জেনে নিতে হবে এবং তাঁদের নামবার নির্দিষ্ট স্থানটিকেও নির্বাচন করে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, চাঁদকে বাসোপযোগী করতে বহু দিকের বিশেষজ্ঞদের কাজের প্রয়োজন হবে। তিনি আশা করেন, পৃথিবী থেকে চাঁদ ও চাঁদ থেকে পৃথিবী—এই যাতায়াত পথটি একদিন খুবই ব্যস্ত এক সড়ক হয়ে উঠবে।

একদিন চাঁদে যে কৃত্রিম পার্থিব আবহাওয়া সৃষ্টি করা হবে, ক্ষুদ্র নগরী গড়ে উঠবে, উদ্ভিদ-গৃহ ও জলাধার বসবে, গবেষণাগার এবং সম্ভবতঃ শিল্পকারখানা গড়া হবে, তা সুনিশ্চিত।

চাঁদকে বাসোপযোগী করবার ধারণার অর্থ হলো, চাঁদে এক বিরাট মহাকাশযান ষ্টেশন গড়ে তোলা। আন্তগ্র্হ ষ্টেশনে মহাকাশযান-সমূহ নিয়ে মহাকাশচারীরা সেখানে হাজির হবে এবং সেখান থেকে মহাবিশ্বের গভীরতম প্রদেশে মানুষের অভিযান চলবে।

পাইল ফাউণ্ডেসন

রমাপ্রসাদ ঘোষরায়

মাটির ভারবহনের ক্ষমতা যদি কম হয় (যেমন হয় পলিমাটি বা কাদামাটির ক্ষেত্রে), তাহলে সেই রকম জমিতে কোন বহুতলবিশিষ্ট ইমারত গড়তে হলে প্রথমেই তার ফাউণ্ডেসন বা ভিৎ শক্ত করা দরকার। সেটি না করলে ঐ ইমারত নিজের ওজনেই মাটিতে বসে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে পড়বে। এর প্রতিকারের জন্যে যে সব উপায় অবলম্বন করা হয়, তার মধ্যে পাইলের ব্যবহার অন্যতম।

১নং চিত্র।

পাইলের কাজ হলো অন্যান্য ধরণের ভিতের মত উপরের ভার এমনভাবে মাটিতে সঞ্চারিত করে দেওয়া, যাতে মাটির প্রতি একক আয়তনে ভার খুব বেশী না হয়, অর্থাৎ মাটি অতিরিক্ত বসে না গিয়ে যাতে ঐ ভার বহন করতে পারে।

পাইল যেভাবে ভার বহন করে, সেই অনুযায়ী একে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ, পাইল যতখানি নীচে গাঁথা হলো সেখানে যদি কোন শক্ত পাথরের স্তর পাওয়া যায় এবং উপরের মাটি যদি অত্যন্ত নরম অর্থাৎ যথেষ্ট ভারবহনের অনুপযুক্ত হয়, তাহলে ঐ পাইলকে বিয়ারিং পাইল (Bearing Pile) বলে।

ধরা যাক, পাশাপাশি এই রকম কতকগুলি পাইল বসিয়ে তার উপরে একটি দশতলা বাড়ী তৈরি করা হলো। এক্ষেত্রে পাইলগুলি থামের মত কাজ করে এবং বাড়ীটির সমস্ত ভার ঐ পাইলগুলির মধ্য দিয়ে নীচেকার শক্ত পাথরে চলে যায়; অর্থাৎ ঐ পাথুরে স্তর পাইলের গোড়ায় যে রিয়্যাকসন দেয়, তাতেই বাড়ীটি দাঁড়িয়ে থাকে

এবং খুব একটা বসে যেতে পারে না (এক্ষেত্রে বলে রাখা দরকার, যে ধরণের ভিৎই ব্যবহার করা হোক না কেন, অতি সামান্য হলেও বাড়ী কিছুটা বসে যাবেই)। উপরের নরম মাটি কোন ভার বহন করে না বললেই চলে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

দ্বিতীয় ধরণের পাইল হলো Frictional Pile ; যদি অনেক নীচে গিয়েও পাইলের গোড়ায় কোন শক্ত পাথুরে মাটি না পাওয়া যায়, তখন পাইল নিম্নোক্ত ভাবে কাজ করে :

২নং চিত্র

উপর থেকে ভার পড়লে পাইল নীচে বসে যেতে চায়, তখন পাইলের বক্রতলের সঙ্গে মাটির ঘর্ষণের ফলে যে বাধার সৃষ্টি হয় (Frictional resistance), সেই ঘর্ষণজনিত বাধা এক্ষেত্রে উপরের সমস্ত ভার বহন করে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয়তঃ, পাইল সাধারণতঃ পূর্বোক্ত দু-ভাবেই কাজ করে (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

চতুর্থতঃ, অনেক সময় মাটিকে শুধু শক্ত করবার জন্যে ঘন ঘন পাইল ঠুকে দেওয়া হয়। এই সব ক্ষেত্রে কংক্রীটের পাইল ব্যবহার না করে সাধারণতঃ কাঠের পাইল ব্যবহার করা হয়।

পাইলের দু-রকম গুণ বা ধর্ম থাকা দরকার। প্রথমতঃ উপরের ভারে বা চাপে পাইল নিজেই যেন ভেঙ্গে না যায়।

দ্বিতীয়তঃ পাইলের বক্রতলের ক্ষেত্রফল $2\pi rd$ ($2\pi rd$; r পাইলের ব্যাসার্ধ d—পাইলের দৈর্ঘ্য) যথেষ্ট হওয়া দরকার, যার ফলে মাটির সঙ্গে এর ঘর্ষণে প্রচুর বাধার সৃষ্টি হয় এবং ঐ বাধা উপরের সমস্ত ভার বহন করতে পারে।

পাইল পিটিয়ে মাটিতে ঢোকাবার সময় যে বাধার সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় পাইলের Dynamic resistance।

আবার, পাইল পুরাপুরি ঢোকাবার পর যখন

তার উপরে বাড়ী তোলা হলো, তখন উপরের চাপে পাইল এবং মাটির মধ্যে যে বাধার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে Static resistance এবং এই বাধাই উপরের সমস্ত ভার বহন করে।

এই দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পাইলের ভার বহনের ক্ষমতা দু-ভাবে নির্ণয় করা যায়।

নিয়মটি হলো :

$$Q_a = \frac{2\,W.\,H}{\rho + c}$$

Q_a নিরাপদ ভার (Safe load)

W – যেটি দিয়ে পাইল গাঁথা হয় (Hammer) তার ওজন

৩নং চিত্র
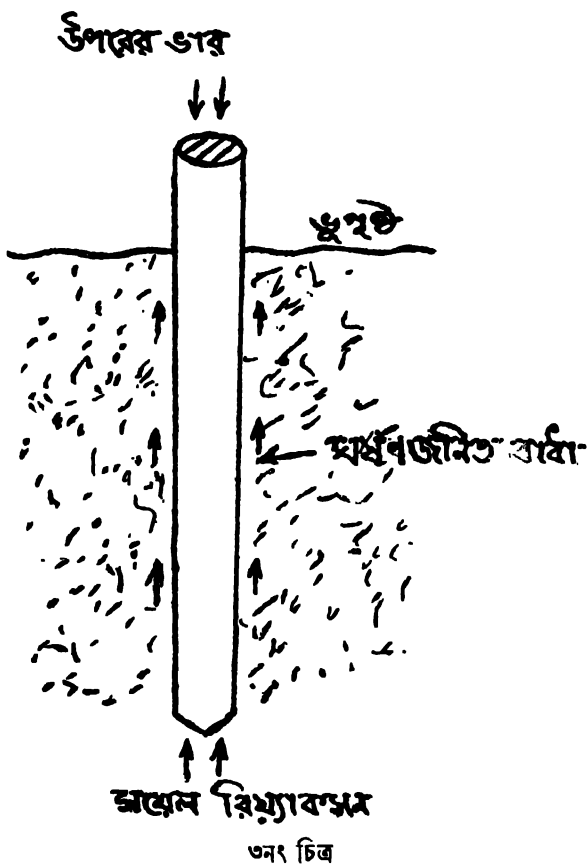
নিয়ম দুটি নীচে দেওয়া হলো :—

(i) Dynamic Formula.

(ii) Static Formula.

(i) Dynamic Formula—এক্ষেত্রে যে নিয়মটি সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়, তা হলো Engineering News Formula। Engineering News নামক একটি পত্রিকায় এই নিয়মটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

H ft. – পাইলের মাথার উপরে যতটা উঁচু থেকে W পাইলের উপরে ফেলা হয় (Height of Fall in ft), H-এর মাপ হবে ফুট এককে, ইঞ্চিতে নয়।

ρ inches – একবার পিটিয়ে পাইল মাটিতে যত ইঞ্চি ঢোকানো হয়। ρ মাপ হবে ইঞ্চি এককে।

C = ধ্রুবক (Constant)। Steam hammer ব্যবহার করলে C – 0.1 ইঞ্চি, Drop

hammer ব্যবহার করলে C=1 ইঞ্চি (৪নং ছবি দ্রষ্টব্য)।

পাইল মাটিতে ঢোকাবার সময় W, H এবং ρ তিনটিই জানা যায়, অতএব Q_a সহজেই নির্ণয় করা যায়।

৪নং চিত্র

W এবং H একই (Constant) রাখলেও প্রথমের থেকে শেষের দিকেই ρ একটু বেশী হয় এবং ρ-এর সেই মান (শেষের দিকের) নিয়েই Q_a নির্ণয় করা হয় ; অবশ্য ভূপৃষ্ঠ থেকে পাইলের গোড়া অবধি একই ধরণের মাটি থাকলেই শেষের দিকে ρ-এর মান একটু বেশী হয়, শেষের দিকে বলতে পাইল যখন প্রায় সবটাই মাটিতে ঢোকানো হয়েছে।

(ii) Static formula—ধরা যাক, পাইলের ব্যাসার্ধ = r inches, পাইলের দৈর্ঘ্য = L ft. = 12 L inches, পাইলের মোট ভার বহনের ক্ষমতা = Q Tons. পাইলের বক্রতলের ক্ষেত্রফল

$A_f = 2\pi r \times 12 L$ Sq. inches

$= 24\pi r. L$ Sq. inches.

পাইলের প্রস্থচ্ছেদ বা Cross Sectional area

$A_t = \pi r^2$ Sq. inches

মাটি এবং পাইলের বক্রতলের সঙ্গে ঘর্ষণজনিত বাধা $=\Upsilon$ tons/Sq. inches

. পাইলের তলদেশে মাটির ভার বহনের ক্ষমতা $= q$. tons/in²

$$\therefore Q = A_f \Upsilon + A_t \times q = (24 \pi r L)\Upsilon + (\pi r^2)q$$; মাটি পরীক্ষা করে Υ এবং q নির্ণয় করা যায়।

পাইলের ভারবহনের ক্ষমতা Loading Test করেও নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে পাইলের উপরে Hydraulic Jack-এর সাহায্যে ভার বা Load চাপানো হয় এবং পাইল কতটা বসে গেল, তা নির্ণয় করা হয়। এই Test-এর সাহায্যে পাইলের ভার বহনের ক্ষমতা নির্ণয় করা হলে সেটাই হবে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য।

কলকাতার মত জায়গায় যেখানে ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচ অবধি সাধারণতঃ পলিমাটির স্তরই দেখা যায়, সেখানে কোন বহুতলবিশিষ্ট বাড়ী করতে গেলে পাইল ফাউণ্ডেসনের ব্যবহার প্রায় অবশ্যম্ভাবী। এসব ক্ষেত্রে পাশাপাশি অনেকগুলি পাইল ব্যবহার করা হয়, যেগুলির উপরে বাড়ীটি দাঁড়িয়ে থাকে।

ধরা যাক, কোন বাড়ী পঞ্চাশটি পাইলের উপরে ভিৎ করে তোলা হলো। এক্ষেত্রে একটি পাইলের ভার বহনের ক্ষমতা যদি Q Tons হয়, তাহলে ঐ পাইলগ্রুপের ভার বহনের ক্ষমতা যে $50 \times Q$ Tons হবেই, তা নয়। বিশেষ করে যদি ঐগুলি Frictional Pile শ্রেণীর হয়, তাহলে ঐ পাইল গ্রুপের ভারবহনের ক্ষমতা 50 Q Tons থেকে কম হয়। এর প্রধান কারণ হলো, পাশাপাশি অনেক পাইল থাকলে একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, ফলে একটি পাইলের ভার বহনের ক্ষমতা কিছুটা কমে যায়।

যাহোক, পাইলের ব্যবহারে অনেকাংশেই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করতে হয় এবং পূর্বোক্ত নিয়ম দুটি (Dynamic ও Static formula) এই ব্যাপারে অনেকটা সাহায্য করতে পারে মাত্র।

ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমির তিন-শ' বছর

দিলীপ মালাকার

১৯৬৬ সালের ৬ই জুন তারিখে ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমি তিন-শ' বছর পূর্ণ করেছে। ওই দিন প্যারিস আকাদেমি ফ্রাঁসেজ-এ বিশেষ অধিবেশনে তিন শত বার্ষিকী প্রতিপালিত হয় রাষ্ট্রীয় জাঁকজমকের মধ্যে। ফরাসী আকাদেমি-সিয়ান ছাড়াও বিদেশী প্রায় ছাব্বিশ জন আকাদেমিশিয়ান সেদিন উপস্থিত ছিলেন। উপরন্তু ফরাসী রাষ্ট্রপতি ওই বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত থেকে সরকারীভাবে তিন শত বার্ষিকী উৎসব উদ্বোধন করেন।

ভারতে সত্যিকারের বিজ্ঞানচর্চা ব্যাপকভাবে সুরু হয় বিংশ শতাব্দীতে। ফরাসী আকাদেমির মত কোন প্রতিষ্ঠান যদিও এখনও গড়ে ওঠে নি, তথাপি বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ও সভা গড়ে ওঠে এই শতাব্দীতে। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমি প্রপিতামহের চেয়ে প্রবীণ। ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমির ইতিহাস তিন-শ' বছরের ; তাই বলে মনে করা উচিত নয় যে, ফ্রান্সে বিজ্ঞানচর্চা সুরু হয় তিন-শ' বছর আগে। ফরাসীরা বিজ্ঞানচর্চা সুরু করে ষোড়শ

শতকের শেষে। যখন ফলিত বিজ্ঞান বিকাশের পথে এগোয়, তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় আকাদেমি।

ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমির তিন শত বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনে ফরাসী সরকার একটি স্মারক ডাকটিকিট বাজারে ছেড়েছেন—বিজ্ঞান আকাদেমির প্রথম সম্পাদকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এটি সমর্পিত হয়। প্রথম সম্পাদক মঁঃ ফন্তেনেল ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার কর্নেইর ভ্রাতুষ্পুত্র। ফন্তেনেল-এর জন্ম হয় রুঁয় শহরে ১৬৫৭ সালে আর তিনি প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন ১৬৯৯ সালে।

জেতা সম্রাটই ছিলেন না, তাঁরই আমলে ফরাসী সাহিত্য ও শিল্প গড়ে ওঠবার সুযোগ পায়। সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর বয়স যখন আঠাশ, তখন প্রধান মন্ত্রী জঁবাপ্তিস্ত কলব্যার রাজকীয় আইন প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠা করেন বিজ্ঞান আকাদেমি। তখন সদস্যপদ ছিল মাত্র একুশটি। তার মধ্যে সাতটি ছিল জ্যামিতির, তিনটি জ্যোতিষশাস্ত্রের, একটি যন্ত্রবিদ্যার, তিনটি পদার্থ-বিজ্ঞানের, তিনটি শারীরবিদ্যার, দুটি রসায়নের, একটি উদ্ভিদবিদ্যার ও অপর একটি আসন সংরক্ষিত ছিল আরেকটি বিজ্ঞান শাখার জন্যে। আর তখনই একজন বিদেশী
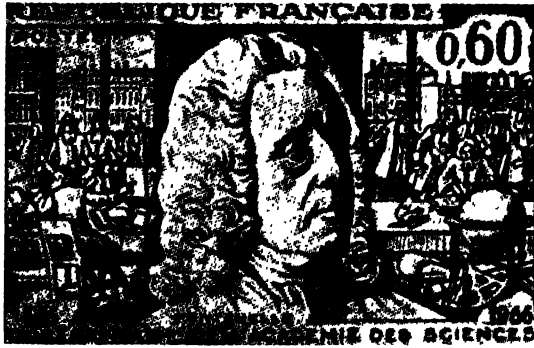
ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমির তিন শত বার্ষিকী স্মারক ডাকটিকিট

যে সময়ে ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইউরোপময় চলে গীর্জা ও পাদ্রিদের রাজত্ব। গীর্জা ও পাদ্রিদের শাস্ত্রবহির্ভূত কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা আলোচনা করলে ধর্মযাজকদের দ্বারা তিরস্কৃত হতে হতো—বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা তারা স্বীকার করতো না। তাই অনেক বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রচারকদের উপর নির্যাতন চালানো হতো। এহেন অবস্থায় বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির প্রসারকল্পে একটি বিজ্ঞান আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করবার মত দুঃসাহস হয় চতুর্দশ লুই-এর মন্ত্রী কলব্যার-এর। ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই শুধু সাম্রাজ্য স্থাপনকারী এবং যুদ্ধে

সদস্যকে গ্রহণ করা হয়। তিনি হলেন হল্যাণ্ডের পদার্থবিদ্ সি, হুইগেন্‌স্। আকাদেমির প্রথম কয়েকটি সভা বসে প্যারিসের কলব্যার-এর লাইব্রেরীতে ১৬৬৬ সালের জুন মাসে। তারপর সভা বসতো নিয়মিতভাবে সম্রাটের নিজস্ব লাইব্রেরী রুঁ ভিবিয়েন-এ। সরকারীভাবে বৈঠকের উদ্বোধন হয় ১৬৬৬ সালের ২২শে ডিসেম্বর। তখনকার বৈঠকে শুধু গতানুগতিক বক্তৃতা বা আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না আকাদেমিসিয়ানদের কার্যকলাপ। বৈজ্ঞানিকেরা যে সব বিষয়ে গবেষণা বা কাজ করতেন, সে সম্বন্ধে তাঁরা আলোচনা করতেন ওই সব

বৈঠকে। বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয় কার্যকরী-ভাবে সেই থেকে।

মধ্যযুগে—এমন কি, ষোড়শ শতক পর্যন্ত ইউরোপের কোন দেশেই বিজ্ঞানচর্চার কথা উঠলেই ধর্মান্ধরা তাদের মারতে তাড়া করতো। বিজ্ঞানচর্চাকে তখনও অনেকে ভৌতিক বা ডাইনিবিদ্যা বলে মনে করতো। তারপরে অবশ্য মানুষের চিন্তাধারায় বিবর্তনের বিকাশ সুরু হয়। দার্শনিক চিন্তা, দ্রব্যগুণের বিচার, একবগ্‌গা চিন্তা ছেড়ে চিন্তাধারায় আসতে থাকে যুক্তি ও বিচার। আধুনিক বিজ্ঞানের যখন শৈশবাবস্থা, তখন সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সে গড়ে ওঠে আস্তে অস্তে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। কতিপয় বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল মিলিত হতেন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে। সেই হলো বিজ্ঞান আকা-দেমির সূত্রপাত। আজ হয়তো সে সব কথা ভাবলে মনে হবে, সে যেন হাস্যকর কথা। কিন্তু সে যুগের সমাজে ছিলেন তাঁরা বিজ্ঞান-জগতের অগ্রদূত।

শুধু আধুনিক চিন্তাধারায় নয়, বৈজ্ঞানিক চিন্তায় বিপ্লব আনেন ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত। ১৬২৮ সালে প্যারিসে পোপের প্রতিনিধির ঘরে এক বিদ্বজ্জন সভায় দেকার্ত দর্শনে যুক্তিবাদ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন, তার ফলে আসে চিন্তাশীল মহলে আলোড়ন এবং যার ফলে তাঁকে শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগ করে হল্যাণ্ডে নির্বাসন গ্রহণ করতে হয়। দেকার্তের সেই সব চিন্তাধারা বই হিসেবে পরে যখন প্রকাশিক হয়, তখন সে বই-এর নাম দেওয়া হয় "দি স্কুর দ্য লা মেথড্" (লেকচার্স অন মেথডস্)।

দেকার্তের সময়ে শুধু ফ্রান্স নয়, সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ধর্মান্ধদের কুসংস্কারের অক্টো-পাশে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে বেঁধে রেখেছিল। ঠিক সেই সময়ে এক নিষ্ঠাবান ধার্মিক পুরুহিত ম্যারঁ্যা মারসেন ক্যাথলিক মঠে বাস করতেন প্যারিসের মধ্যাঞ্চলে, যার বর্তমান নাম প্লাস দে ভোজ এ। সেখানে মারঁ্যা মারসেনকে ঘিরে একটি বেসরকারী আকাদেমি বা বৈজ্ঞানিক বৈঠকের সুরু হয়। ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও বিজ্ঞানের প্রসারে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন মারঁ্যা মারসেন-এর দল। তার দলে শুধু দেকার্ত বা ফরাসী বিজ্ঞানীরাই যোগ দেয় নি, অনেক ইউরোপীয় বিজ্ঞানী ও দার্শনিক তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন করেন প্রত্যক্ষভাবে বা গোপনে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন গ্যালিলি, তরিচেল্লি, টমাস হবস্‌, কাভালিয়েরি ইত্যাদি বিদেশীয়রা আর ফরাসীদের মধ্যে ছিলেন দেকার্ত, ফের্মা, রবারভাল, গাসেন্দি, পাস্কাল ইত্যাদি। মারসেন-এর বৈঠককে বলা হলো বেসরকারী মারসেন আকাদেমি। একালের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় অগ্রগতিতে তাঁদের প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে এগিয়ে দেয়।

বিজ্ঞান আকাদেমি প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রায় অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আইনকানুনের পরিবর্তন হয় নি। ১৬৯৯ সালে সম্রাট চতুর্দশ লুই এটাকে সরকারী আকাদেমিরূপে পরিণত করলেন। সদস্যপদ বৃদ্ধি করে সত্তরটি করা হয়। রাষ্ট্রিক সংগঠনে আসায় চতুর্দশ লুই আকাদেমিকে এনে বসালেন লুভ্‌র প্রাসাদে, যাতে তিনি সরাসরি দৃষ্টিপাত করতে পারেন এর কার্যকলাপে।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আকাদেমির কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলে এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তার অবদান অবিদিত নয়। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব সুরু হওয়ায় আকাদেমির কাজ অনেকখানি বিঘ্নিত হয়। বিপ্লববাদীরা যাতেই রাজকীয় প্রভাব বা চিহ্ন দেখেছেন, তাই বন্ধ করে দিয়েছেন বা ধ্বংস করেছেন। কয়েক বছরের জন্যে আকা-দেমির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ফরাসী বিপ্লবের দু'বছর পর মন্ত্রী মিরাবো

তাঁর মৃত্যুর কিছু আগে এক সরকারী আইন জারী করে, যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অগ্রগতি এনেছে, তাদের পুনরাবির্ভাবের ব্যবস্থা করেন। ১৭৯৫ সালের ২৫শে অক্টোবরের আইন বলে আকাদেমি আবার নতুন জীবন লাভ করে।

ফরাসী বিপ্লবের পরে এলো নেপোলিয়নের যুগ। ১৭৯৭ সালের ক্রিশমাসে বিজ্ঞান আকাদেমির মেকানিক্স বিভাগের সদস্য নির্বাচিত হন নেপোলিয়ন। ফরাসী সরকারের প্রধান হিসাবে ১৮০৩ সালে নেপোলিয়ন আকাদেমির সংস্কার স্বরু করে দেন। তারপর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। আকাদেমির আইনগত কোন পরিবর্তন হয় নি।

১৭৯৭ সালে যখন নেপোলিয়ন ইজিপ্ত বিজয় করে ওবেলিস্ক স্তম্ভ এবং নানান ঐতিহাসিক স্তম্ভ ও ভাস্কর্য নিয়ে আসেন ঈজিপ্ত থেকে ফ্রান্সে, তখন সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে স্তম্ভগুলি স্থাপনের সময় লেখা হয় "নেপোলেয় বোনাপার্ত, ফরাসী সামরিক বাহিনীর প্রধান কর্মকর্তা ও আকাদেমির সদস্য"। প্রাচীন মিশরের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ভাষা চর্চার জন্যে নেপোলিয়ন তাঁর সঙ্গে অনেক পণ্ডিত নিয়ে গিয়েছিলেন মিশরে। প্রাচীন সংস্কৃতি, সভ্যতা ও শিল্পকলা চর্চার জন্যে আকাদেমিকে সরকারী নির্দেশ দেন নেপোলিয়ন, অর্থাৎ আকাদেমিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তোলবার সব ভার নেপোলিয়ন নিজের হাতে তুলে নেন।

১৮১৬ সালে নেপোলিয়ন নিজের হাতে নতুন আইনকানুন বিধিবদ্ধ করে আকাদেমির নতুন রূপ দেন, যা আজ পর্যন্ত বদ্‌লায় নি। তবে গত দেড়-শ' বছরের মধ্যে যৎসামান্য এদিক-ওদিক হয়েছে, যা প্রায় নগণ্য।

নেপোলিয়নের গড়া নতুন আইনকানুন থেকে এপর্যন্ত ষোলটি শাসনতন্ত্র বদ্‌লেছে, কিন্তু আকাদেমির মূল শাসনতন্ত্র বদ্‌লায় নি। রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে আকাদেমির বিজ্ঞান সাধনায় কোন ব্যাঘাত আনে নি, বরং ফরাসী মনীষীদের বিজ্ঞানচর্চায় আকাদেমি তার উপযুক্ত কার্যক্রম বলে বিজ্ঞানের জয়পতাকা বয়ে চলেছে।

ফরাসী আকাদেমি বা বিজ্ঞান আকাদেমি শুধু বিজ্ঞানচর্চার বৈঠকখানা নয়। যাঁরা বিজ্ঞান সাধনায় জীবনপাত করেছেন, তাঁদের যথার্থ সম্মান প্রদর্শনে বিজ্ঞান আকাদেমি সরকারী ও জনগণের তরফ থেকে তাঁদের মান-সম্মানে ভূষিত করেছে। এখানেই ফরাসী আকাদেমির সার্থকতা।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

শিক্ষা—অসাধারণী

এপর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের যে শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে, তা সাধারণ ছাত্রদের জন্যে। কিন্তু যারা অসাধারণ, তাদের জন্যেও উন্নত দেশে শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় ও পরিকল্পনা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় তা করা অবশ্য কর্তব্য। রাশিয়ায় এই বিষয়ে সর্বাধিক ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমাদের দেশে এই বিষয়ে এখনও বিশেষ কোন চেষ্টা হচ্ছে বলে মনে হয় না—এমন কি, এখনও বোধ হয় যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা ও এদেশের কমিশনের বিবরণে বা মনীষীদের লেখায় বিশেষ স্থান লাভ করে নি। রাশিয়া'র নানা রকম প্রচেষ্টা ওদের পুস্তক বা পুস্তিকায় বা এদেশের সাময়িক পত্রিকাদি মারফৎ বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। কিন্তু রাশিয়ায় শিক্ষার বিশেষ ও অভিনব ব্যবস্থা এদেশে বিশেষ প্রচারিত হয় নি। ওদেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যে তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছিল, তার মোটামুটি পরিচয় এই প্রবন্ধে দেওয়া হলো। এতে রাশিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির মূল কোথায়—তা খানিকটা বোঝা যাবে, আর এদেশেও এই বিষয়ে কতটা কি করা সম্ভব, ভাবা যাবে। আমেরিকাতেও প্রায় দশ বছর আগেই এই বিষয়ে দৃষ্টি পড়েছে ও কি ভাবে এরকমের ব্যবস্থা ওদেশে প্রবর্তন করা যাবে তার চেষ্টা হয়েছে।

ছাত্রদের অসাধারণত্ব দু-ধরণের। কিছু ছাত্রকে মানসিক গঠন ও বুদ্ধির বিকাশে সমবয়সী সাধারণ ছাত্রের চেয়ে বিশেষ অনগ্রসর, খানিকটা জড় হতে দেখা যায়। আবার কিছু ছাত্রকে বুদ্ধিতে ও মেধায় সমবয়সী সাধারণ ছাত্রের চেয়ে অনেক উন্নত ও বিশেষ প্রতিভাবান হতে দেখা যায়। জড়বুদ্ধি ছাত্রদের সাধারণ যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা এপর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে, তাতে সমবয়সী অন্য ছাত্রদের সঙ্গে কোনমতেই তাল রেখে চলতে পারে না। এদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ বিদ্যালয় দরকার, ঠিক যেমন অন্ধ, মূক, বধির ছাত্রদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ বিদ্যালয় করা হয়ে থাকে। অপরিণত জড়বুদ্ধিদের সম্বন্ধে সব দেশের মনোবিজ্ঞানীরাই কিছু কিছু গবেষণা করেন এবং তাঁদের চেষ্টায় ও সহযোগিতায় সবদেশেই এসব ছাত্রদের জন্যে বিদ্যালয় চলে। কলিকাতায়ও মনোবিজ্ঞানীরা এরূপ একটি বিশেষ বিদ্যালয় চালাচ্ছেন। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র 'শিক্ষা প্রসঙ্গে' মনোবিজ্ঞানীদের এসম্বন্ধে তথ্যমূলক মনোজ্ঞ ও আকর্ষণীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে। এজন্যে এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ অন্য ধরণের অসাধরণ ছাত্রদের বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হলো।

বুদ্ধি ও মেধায় উন্নত অসাধারণ ছাত্রদের কেউ কেউ সমবয়সী ছাত্রদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে এর কাঠামোর মধ্যেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে ও এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করে এবং কর্মক্ষেত্রে সফল হয়। কিন্তু একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় এদের

বিশেষভাবে উন্নত বুদ্ধি ও মেধার সম্পূর্ণ ব্যবহার করা হয় না আর এজন্যে সম্যক স্ফুরণ হয় না। এতে এদের ব্যক্তিগত প্রতিভার, সংসত্তার সম্যক বিকাশ না হওয়ায় ব্যষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আবার এতে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি ও বুদ্ধি পূর্ণভাবে সমষ্টির হিতে ব্যবহার না হওয়ায় সমষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকেও শিক্ষা সম্পূর্ণ সফল হয় না। আর কিছু বিশেষ প্রতিভাবান ছাত্র দেখা যায়, যাদের বুদ্ধি ও মেধার এত দ্রুত ও অভিনবভাবে উন্নতি হয় যে, শিক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা এরা ঠিক মানিয়ে নিতে পারে না। এদের বিষয় আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ফরাসী গণিতজ্ঞ গাল্যয়ের (Galois) কথা মনে হয়। এঁর জীবিতকাল মাত্র ১৮১১ সালের ২৫শে অক্টোবর থেকে ১৮৩২ সালের ৩১শে মে। ১৮২৩ সালে নিজের মায়ের কাছে শিক্ষা নিয়ে প্রথমে বিদ্যালয়ে আসেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে সাধারণ পড়াশুনার সঙ্গে গাল্যয় কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারেন নি। এই শিক্ষা তাঁর কাছে একঘেঁয়ে, অনাকর্ষণীয় ও শেষে ভয়াবহ বোধ হয়। বিশেষ ভাবে শিক্ষা পদ্ধতিতে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের রুচিমত গণিতচর্চায় মন দেন। ফলে 'পলিটেক-নিকে' ভর্তি হবার পরীক্ষা, শিক্ষকতার যোগ্যতার জন্যে গৃহীত পরীক্ষা প্রভৃতি সমস্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। শেষ পরীক্ষায় গণিত ও পদার্থবিদ্যার পরীক্ষকেরা খুব ভাল ও গবেষণার শক্তিসম্পন্ন বলে মত প্রকাশ করেন। অপর দিকে কলা বিভাগের পরীক্ষকেরা সবচেয়ে অকৃতকার্য ও শিক্ষক হবার অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করেন। অপর দিকে ষোল বছর বয়সেই বীজগণিতের একটি গবেষণা প্রবন্ধ লেখেন। উনিশ বছর বয়সেই সর্বদেশের ও সর্বকালের উল্লেখযোগ্য তাঁর নামে পরিচিত তত্ত্বের গোড়া পত্তন করে তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করে সেকালে সকল গণিতজ্ঞের কামনার বস্তু ফরাসী আকাদেমির পুরস্কারের জন্যে পেশ করেন। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও পিতার শোচনীয় মৃত্যুর পর গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। একুশ বছর পূর্ণ হবার আগেই এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা যান। এর আগের রাতে তাঁর গণিতের মৌলিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করে তার পাশে লিখে রেখে যান, আর সময় নেই। গাল্যয় তত্ত্ব গণিতের এক বিশিষ্ট অবদান রূপে ১৮৪৬ সালের পর গৃহীত হয়। কে জানে, কয়জন গাল্যয় হবার আগেই গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছেন! রবীন্দ্রনাথেরও গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন আকর্ষণ ছিল না। এধরণের বিশেষ প্রতিভাবানদের মধ্যে যাঁদের পারিবারিক অবস্থা বিশেষ সঙ্গতিসম্পন্ন, তাঁদের জন্যে পরিপূরক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় ও প্রতিভা, ধ্বংস থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু অপরদের প্রতিভা লোকচক্ষুর অগোচরেই নিশ্চিহ্ন হয়। এই ক্ষতি শুধু ব্যক্তি বা পরিবারের ক্ষতি নয়, এই ক্ষতি সমগ্র রাষ্ট্রের— সমগ্র মানব সমাজের। এজন্যে অসাধারণদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ দরকার।

রাশিয়ায় অসাধারণ মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্রদের জন্যে দুটি বিশেষ ব্যবস্থা চালু আছে, একটি 'অলিম্পিয়া' পরীক্ষা, অপরটি 'বিশেষ বিদ্যালয়'। রাশিয়া বাদে কয়েকটি কমিউনিষ্ট দেশেও 'অলিম্পিয়া' পরীক্ষা চালু আছে। প্রায় বছর দশেক আগে আমেরিকাতেও এই বিষয়ে বিশেষ সোরগোল পড়েছিল। মনে হয়, এতদিনে অনুরূপ কিছু একটা ওখানে চালু হয়েছে।

যে সব ছাত্রের কোন একটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষ ঝোঁক ও বিশেষ যোগ্যতা থাকে, তাদের প্রেরণা দেবার জন্যেও ঐ রকম ছাত্রদের বেছে বের করবার জন্যে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। বেশ মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্রদের যে বিষয়ে বিশেষ ঝোঁক ও যোগ্যতা থাকে, তাতে সাধারণ শিক্ষা তালিকা

পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু তাদের পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব—এমন সব বিষয়বস্তুর পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষায় যারা কৃতিত্ব দেখাতে পারে তাদের বিশেষ সম্মান, নানা পুরস্কার ও সুবিধা দেওয়া হয়। এই সব পরীক্ষা হয় প্রথমে ছোট ছোট তালুকে (মহকুমায় বা জিলায়)। যারা কৃতকার্য হয় তাদের নিয়ে হয় প্রদেশের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় কৃতীদের নিয়ে হয় সমগ্র রাশিয়ায় পরীক্ষা। পরে হয় সমস্ত কমিউনিষ্ট দেশের কৃতী ছাত্রদের একসঙ্গে পরীক্ষা—সর্বোচ্চ 'অলিম্পিক' পরীক্ষা—অনেকটা 'স্পোর্টস' যে রীতিতে হয় দেশে দেশে।

এই সকল পরীক্ষায় যোগ দেবার প্রেরণা দিতে আর প্রস্তুতি করতে চলে সমস্ত দেশ-ব্যাপী সম্যক প্রচেষ্টা। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা বিষয়ের (পাঠ্যসূচীতে নেই এরূপ বিষয়বস্তু) উপর বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয় সহজ ও সরলভাবে, যাতে মেধাবী, বুদ্ধিমান ছাত্রেরা বুঝতে পারে। এই আলোচনা ও বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষকেরা, বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপকেরাও এই বিষয়ে সহযোগিতা করেন ও মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা দেন। আর এই সকল সংগঠন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবসংস্থা (ছাত্র ইউনিয়নের মত সংস্থা)। তবে এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী ও সরকারের থাকে সর্ববিধ সহযোগিতা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির বাইরেও গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে আলোচনা ও বক্তৃতার ব্যবস্থা আছে। এই সকলের সংগঠনের প্রধান দায়িত্ব নেয় ওদেশের পাইওনিয়ার সংস্থা (স্কাউটের অনুরূপ কিশোর ও বালকদের সংস্থা)। মেধাবী ছাত্রেরা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও 'পাইওনিয়ারে'র শাখা থেকে এই সব অলিম্পিয়া পরীক্ষা সম্বন্ধে তথ্যাদি পায় আর পায় বিশেষ উৎসাহ ও প্রেরণা। রাশিয়ার প্রায় সব বড় বড় সহরে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই সব বিশেষ বিদ্যালয়ে একটি বিষয়কে প্রধান করে ঐ বিষয় এবং ওর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষার মান যথাসম্ভব উঁচু করবার অনলস চেষ্টা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। আর অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার মান দেশের সাধারণ বিদ্যালয়ে যেরূপ, সেরূপ করা হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ঐ বিষয়ে দিকপালের নামে, আর এই সকল বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার পূর্ণ দায়িত্ব থাকে ঐ সব দিকপালের উপর। ঐ সকল বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষকদের সঙ্গে ঐ সব দিকপাল নিজেরা, ওঁদের ঘনিষ্ঠ ছাত্রেরা ও সহকর্মীরা শিক্ষকতায় অংশগ্রহণ করেন। মস্কোয় বোধহয় গণিতে দুটি এই ধরণের বিদ্যালয় আছে—একটি বর্তমানে রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ্ কল্‌মোগ্রোফের নামে পরিচিত এবং ব্যবস্থাপনার সমস্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা কল্‌মোগ্রোফের। প্রসিদ্ধ গণিতবিদ্ গেলফোণ্ডের নামেও নাকি এরূপ একটি বিদ্যালয় আছে। ওঁরা নিজেরা, এঁদের গবেষক ছাত্র ও সহকর্মীরা নিয়মিত বিদ্যালয়ের দেখাশোনা ও শিক্ষকতায় অংশগ্রহণ করেন। এরূপ এক একটি বিদ্যালয় এক একজন দিকপালের গবেষণা মন্দির। বিশ্ববিদ্যালয় বা আকাদেমির গবেষণাগারে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান আর এই সব গবেষণা মন্দিরে (বিশেষ বিদ্যালয়ে) সৃষ্টি হয় নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সাধক, ভবিষ্যৎ স্রষ্টা, যাঁরা হবেন দিকপালদের উত্তরসূরী।

এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র সংগ্রহ করা হয় বিশেষ যত্ন নিয়ে। প্রতি বছরে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে অনুরোধ পাঠানো হয় মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্রদের তাদের রুচি অনুযায়ী নিকটে সহরের নির্বাচন কেন্দ্রে। সহরের বড় বড় বিদ্যালয়গুলিতে বসে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের নির্বাচন

কেন্দ্র। এসব কেন্দ্রে আসেন বিশ্ববিদ্যালয় ও আকাদেমির শিক্ষক ও গবেষকেরা। তাঁরা উপস্থিত প্রত্যেক ছাত্রকে পরীক্ষা (মৌখিক ও লিখিত) করেন দীর্ঘকাল ধরে। যে সকল ছাত্র ঐ বিষয়ে নিজের বিশেষ ঝোঁক ও যোগ্যতা দেখাতে পারেন, তাদের নির্বাচন করে আনা হয় বড় বড় সহরের বিশেষ বিদ্যালগুলিতে। এরা হয় বিশেষ বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র, এদের লেখা-পড়া, থাকা-খাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ, ছুটিতে ছুটিতে দেশভ্রমণ, পরিমিতভাবে সিনেমা, থিয়েটার, ব্যালে দেখবার সমস্ত ব্যবস্থা করে সরকার। এদেশেও বিশেষ মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্র নির্বাচন করে কিছু কিছু বিশেষ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা বর্তমানে 'Talent Search'-এর নামে হচ্ছে, কিন্তু আলোচিত ব্যবস্থাগুলি তুলনায় যৎসামান্য—কেবল সুরু।

আজ যে রাশিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানে কল্পনাতীতভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তার একটি প্রধান কারণ, এই দুটি শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের দেশেও এরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়। 'অলিম্পিয়া' পরীক্ষা ব্যবস্থা শীঘ্রই করা সম্ভব। সরকার এই বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের সহযোগিতা আহ্বান করলে পাবেন বলেই মনে হয়। আর সবার সহযোগিতায় এর এক সুষ্ঠু রূপ পাওয়া সম্ভব। তবে আমলাতন্ত্রের মারফৎ এই বিষয়ে সহজে কিছু করা এদেশে সম্ভব নয়।

আর বিশেষ বিদ্যালয় স্থাপন করাও অসম্ভব নয়, বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষও নয়। গত পাঁচ বছর সরকারী খরচায় কলিকাতায় ছয়-সাতটি বিদ্যালয় চলছে, এদের ব্যবস্থাপনার ভার আছে একজন প্রবীণ আমলার উপর। এই বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের বিশেষ করে ইংরেজী পঠন ও কণ্ঠস্থ করবার ব্যবস্থা করেছেন—এমন কি, অপরাপর বিষয়ের শিক্ষার ক্ষতি করেও। শিক্ষা যে কেবল ভাষা শিক্ষা নয়, একথা ইংরেজিনবীশ আমলাদের কাছে স্পষ্ট নয় বোধ হয়। যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন সরকার অনুভব করেন, তবে এসব বিদ্যালয়গুলির ব্যবস্থাপনার ভার জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকপালদের উপর ন্যস্ত করে রাশিয়ার মত বিশেষ বিদ্যালয় সুরু করতে পারেন নতুন খরচ না করে। এই চেষ্টায় জাতীয় অধ্যাপক বসু বা অপরাপর দিকপালদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীমহাদেব দত্ত

বিজ্ঞান-সংবাদ

ক্ষুদ্রাকৃতির কম্পিউটর

জি-ই-সি কম্পিউটর অ্যাণ্ড অটোমেশন একটি নতুন ধরণের ডিজিট্যাল কম্পিউটর উদ্ভাবন করেছেন, যার ওজন মাত্র ২৫ পাউণ্ড এবং সেটি এক ঘনফুটের চেয়েও কম জায়গা অধিকার করে। এটি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে, তাছাড়া এই ধরণের অন্য যে কোন যন্ত্রের তুলনায় এটি অনেক বেশী হাল্কা। এই ক্ষুদ্রাকৃতির কম্পিউটরটি বিমান, পূর্ত, ইঞ্জিনারিং, জিওফিজিক্যাল কর্ম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হতে পারে। যন্ত্রটি ফ্লাইট প্ল্যানম্যানেজমেণ্ট, ফ্লাইট ইনস্ট্রুমেণ্ট চেক, এয়ার-ক্র্যাফ্‌ট্‌ মেইনটেনান্স ও টেস্টিং-এর ব্যাপারেও সাহায্য করবে। যন্ত্রটি এতদূর হাল্কা যে, একজন কর্মী তা অতি সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে নিয়ে যেতে পারে।

এটি সেকেণ্ডে ১২৫,০০০ ইউনিট গুণ করতে পারে। ১৯৬১ সালে ডেক্সান নামে যে কম্পিউটরটি উদ্ভাবিত হয়, এটি তার একটি নতুন ও উন্নত সংস্করণ।

তরঙ্গ-বিক্ষোভ দমনের উপায় অনুসন্ধান

কয়েক বছর ধরে গবেষণা এবং রেডিও-নিয়ন্ত্রিত মডেল জাহাজ নিয়ে পরীক্ষা চালাবার পর বিজ্ঞানীরা তরঙ্গ-বিক্ষোভ দমনের নতুন এক পদ্ধতি খুঁজে বের করতে চলেছেন। এর ফলে সমুদ্রভ্রমণ আগের তুলনায় অনেক বেশী নিরাপদ ও আরামপ্রদ হতে পারবে।

প্রথম নৌকা নির্মাণের যুগ থেকে সমুদ্রের ঢেউ মানুষের ভ্রমণক্ষমতা অনেকটা সীমাবদ্ধ করে আসছে। এই ঢেউয়ের জন্যেই বন্দরগুলিকে সুরক্ষিত করবার প্রয়োজন হয়েছে এবং জাহাজগুলিকে বিশেষভাবে শক্ত করে নির্মাণ করবার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট থাকলেও ঢেউ পরিমাপের সঠিক ও সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি এখন পর্যন্তও গড়ে ওঠে নি, যার ফলে অনেক সময় বন্দর বা জাহাজ নির্মাণ সম্পর্কে ডিজাইন প্রস্তুতের সময় এমন অনেক সব অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রশ্ন ওঠে, যা অর্থ ও সময় দুই-ই নষ্ট করে।

সম্প্রতি গবেষণার ফলে জাহাজের উপর ঢেউয়ের প্রতিক্রিয়া বোঝবার জন্যে ঢেউয়ের পরিমাপ আরও সঠিকভাবে করা সম্ভব হয়েছে। ঢেউ পরিমাপের সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবন সম্পর্কে বৃটেনে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। নৌ-স্থপতিগণ জাহাজের ডিজাইনেরও অনেক উন্নতি ঘটিয়েছেন এবং রোলিং ও পিচিং নিয়ন্ত্রণের উপায় উদ্ভাবন করেছেন। জাহাজে বাহিত ওয়েভ রেকর্ডারটি এদেরই উদ্ভাবিত যন্ত্র। এই যন্ত্রটি তরঙ্গ-তথ্য পরিমাপের প্রধান সহায়ক।

এই যন্ত্রটি সন্তোষজনকভাবে ঢেউ রেকর্ড করবার কাজ করে যাচ্ছে। ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব ওশেনোগ্রাফি ঢেউ-চলাচলের দিক সম্পর্কিত পরীক্ষায় ব্যাপৃত আছে। প্রতিষ্ঠানটির একটি নতুন যান্ত্রিক উপকরণ হলো "কোভারলিফ বয়া"—শিপমোশন স্টাডিজ এবং বিশুদ্ধ তরঙ্গ গবেষণার দিক দিয়ে এটি এক মূল্যবান উপকরণ।

ইনস্টিটিউট এখন হোভারক্র্যাফট সম্পর্কেও বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছে। ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক জে. ডার্বিশায়ার ঢেউয়ের পূর্বাভাস দেবার এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করায় উন্মুক্ত সমুদ্রে ইংল্যাণ্ড

থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত প্রথম হোভারক্র্যাফট চালাবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। এই 'ওয়েভ ফোরকাস্টিং টেক্‌নিক' বিশ্বের অন্যান্য অংশেও নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, জাহাজ ও ঢেউয়ের পরীক্ষা ঠিকমত হলে জাহাজের ডিজাইনের একটা বড় রকমের পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে।

হোভার বেলুন

হোভারক্র্যাফটের বিষয়ে অগ্রণী বৃটেন এবার হোভারক্র্যাফটের এমন একটি সংস্করণ উদ্ভাবন করেছে, যাকে হোভার বেলুন বলা যায়।

দুটি ইঞ্জিনচালিত এই হোভার বেলুন ৭ জন যাত্রী নিয়ে ঘণ্টায় ৩৫ মাইল বেগে চলতে পারে। অসম্প্রসারিত অবস্থায় একে মোটর গাড়ীর পিছনে করে নিয়ে যাওয়া যায়।

বৃটেনের বিমান দপ্তরের বিশেষজ্ঞেরা হোভার-ক্র্যাফটের ঝালরের (স্কার্টের) উপাদান নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে হোভার বেলুনের আবিষ্কার করেছেন।

বিমান দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র জানান, হোভার বেলুনের আকার আরও বড় করা যেতে পারে—এমন কি, শক্তিশালী ইঞ্জিন জুড়লে ৭০ বা ৮০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ করা যেতে পারে।

ম্যালেরিয়ার নতুন ঔষধ

বৃটেনের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল গবেষণাগারের কর্মীরা গ্যাম্বিয়ায় যে ম্যালেরিয়া-বিরোধী ঔষধ নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছেন, তার ফল আশাপ্রদ বলে জানা গেছে।

এই ঔষধটির নাম সাইক্লোগুয়ানিল প্যামোয়েট। ১৯৬৪ সালে গ্যাম্বিয়ায় যে পরীক্ষা চালানো হয় তাতে মনে হয় এই ঔষধ ইনজেকশন করলে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী ও দীর্ঘ কাল প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করবে। অবশ্য বলা হয়েছে যে, এই ইনজেকশনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে গেলে আরও পরীক্ষার প্রয়োজন।

কেরালা রাজ্যে স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা

স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা প্রবল, কেরালা রাজ্যের এমন অঞ্চলের জীবজন্তুদের পর্যবেক্ষণ করে জানা গেছে যে, জন্মের উপর এই তেজস্ক্রিয়তার কোন প্রতিকূল প্রভাব পড়ে নি।

মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্‌সিলের (এম-আর-সি) এক্সপেরিমেন্টাল জেনেটিক্স রিসার্চ ইউনিটের পক্ষ থেকে যে দলটি এই অঞ্চলে অনুসন্ধান চালান, তাঁরা এরকম সিদ্ধান্ত করেছেন।

প্রফেসর এইচ. গ্রুনেবার্গ এই দলের নেতা ছিলেন। এই দলকে ইণ্ডিয়ান অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের বিজ্ঞান-কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহ-যোগিতায় কাজ করতে হয়।

লণ্ডনে প্রকাশিত এই গবেষণার বিবরণীতে বলা হয়েছে—মোনাজাইট বালিপূর্ণ সমুদ্রতীরের স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ দেশের অভ্যন্তর ভাগের ৭½ গুণ বেশী।

সমুদ্রতীরের ৮টি গ্রাম ও দেশের অভ্যন্তরের ৮টি গ্রাম থেকে কালো ইঁদুর নিয়ে তুলনামূলক গবেষণা চালানো হয়। এতে দেখা যায়, এদের মধ্যে প্রজনন শক্তি বা জ্রণের স্থায়িত্ব প্রভৃতি বিষয়ে কোন তারতম্য ঘটে না।

ছ'মাস পর্যন্ত দুধ তাজা রাখা যায়

বৃটেনের একটি ডেয়ারি কোম্পানী এমন এক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন, যে পদ্ধতিতে দুধ যে কোন আবহাওয়ায় রেফ্রিজারেশন ছাড়াই ছ'মাস পর্যন্ত তাজা অবস্থায় রাখা যায়।

ফার্মটি হলো লণ্ডনের এক্সপ্রেস ডেয়ারি কোঃ। এটির একটি যন্ত্র দৈনিক ২,০০০ গ্যালন 'দীর্ঘস্থায়ী দুধ' উৎপাদন করে থাকে। গত বছরের মাঝামাঝি থেকে ফার্মটি ৫০০,০০০ গ্যালনেরও বেশী দুধ অন্যান্য দেশে সরবরাহ করেছে।

দীর্ঘকাল ধরে এই তাজা রাখবার পদ্ধতিতে দুধকে দুই সেকেণ্ডের জন্যে ২৮০° ফারেনহাইটে উত্তপ্ত করা হয় এবং জীবাণুমুক্ত বায়ুশূন্য পাত্রে ভর্তি করবার আগে তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা হয়।

এক্সপ্রেস ডেয়ারির চেয়ারম্যান মি. ডবলিউ. ই ডি বেল বলেন—দুধ ছ'মাস পরেও একেবারে তাজা অবস্থায় থাকে। অবশ্য দেখতে হবে, পাত্রগুলি যেন মাঝপথে খোলা না হয়।

এই দুধ এখন মালয়েশিয়া, মধ্য আফ্রিকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, পশ্চিম আফ্রিকা, লিবিয়া ও সৌদি আরবে বিক্রয় করা হচ্ছে। কোন কোন ইউরোপীয় দেশগুলিতেও এই দুধ নিয়মিতভাবে পাঠানো হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি আশা করেন, দূর প্রাচ্যে দুধ বিতরণের জন্যে শীঘ্রই তাঁরা অস্ট্রেলিয়াতে প্রোসেসিং যন্ত্র স্থাপন করতে পারবেন।

দ্রুতগতি যানের জন্যে নতুন ধরনের ট্র্যাফিক সঙ্কেত

ট্র্যাফিকের লাল আলো নিয়ে কোন সমস্যা নেই, নীল আলো নিয়েও নেই। কিন্তু হলদে আলো সমস্যার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে দ্রুতগামী যানের ক্ষেত্রে। তারা অনেক সময় টপ-লাইন পার হয়ে চলে যায়, কিন্তু লাল আলো জ্বলবার আগে সম্পূর্ণ সংযোগস্থল পার হতে পারে না।

এই সমস্যাটি নিয়ে বৃটেনের রোড রিসার্চ লেবরেটরীতে গবেষণা করা হয়। একটি উপায়ও উদ্ভাবিত হয়েছে, যাতে সমস্যাটি এড়ানো যাবে।

হাই-স্পীড 'অ্যাপ্রোচগুলি'তে টপ-লাইন থেকে ৫০০ ফুট দূরে একটি গাড়ীর গতি-নির্ধারক যন্ত্র বসানো থাকবে এবং নীল আলো ততক্ষণ জ্বলতে থাকবে, যতক্ষণ না গাড়ীটি সংযোগস্থল পার হয়ে যায়।

কিংস্টান বাই-পাসে সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষার পর একটি মডেল তৈরি করা হয়েছে। সাধারণ যানবাহনের সঙ্কেত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করবার জন্যে এই ধরণের যন্ত্রের উৎপাদন শীঘ্রই সুরু হবে।

অন্ধদের জন্যে 'আল্ট্রাসোনিক গাইড্যান্স ডিভাইস'

টর্চের মত দেখতে যে 'আল্ট্রাসোনিক গাইড্যান্স ডিভাইস'টি উদ্ভাবিত হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে উৎপাদন করা উচিত হবে কি না, তা স্থির করবার জন্যে ১৮টি দেশে এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এই সম্পর্কে পরীক্ষার যে ফলাফল পাওয়া যাবে, আগামী বছর লণ্ডনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তা বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

সেন্ট ডানষ্টান্সের (অন্ধদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত একটি বৃটিশ সংগঠন) রিসার্চ ডিরেক্টর মিঃ আর. ডাফটন বলেন, ব্যবস্থাটি কারিগরী দিক দিয়ে নিখুঁত, কিন্তু এখন দেখতে হবে ব্যবহারকারী কি পর্যন্ত তা নিখুঁতভাবে কাজে লাগাতে পারে।

বার্মিংহামের ল্যাঙ্কেস্টর কলেজ অব টেক্নো-

লজির ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ লেস্‌লি এই ডিভাইসটি উদ্ভাবন করেন। এটি থেকে এক রকম রশ্মি নির্গত হয়, যার পাল্লা ২৫ ফুট পর্যন্ত। কোন কঠিন বস্তুর উপর এই রশ্মি পড়লে একটা প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়, ব্যবহারকারী তা তার ছোট ইয়ারপিসের মধ্য দিয়ে শুনতে পায়। ধ্বনি-তরঙ্গের পিচ্ থেকে ব্যবহারকারী বস্তুটির দূরত্ব বুঝতে পারে।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও হিমমণ্ডলীয় অবস্থায় ইতিমধ্যে এই যন্ত্রটির পরীক্ষা হয়ে গেছে। এটি নিয়ে আরও পরীক্ষা চলেছে।

কম্পিউটর যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করবে

১৯৬৬ সালের শেষে লণ্ডনে কম্পিউটর বসিয়ে যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবার একটা চেষ্টা হবে। ব্যবস্থাটি মোটামুটিভাবে সফল হলে এক বছর পরে যন্ত্রটি পশ্চিম লণ্ডনের ছয় বর্গমাইল পরিমিত এক কর্মব্যস্ত এলাকায় পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে।

কম্পিউটরটি স্টপ্-লাইট নিয়ন্ত্রণ ও ডাইভারশন সাইন অপারেট করা ছাড়াও ডান দিকে বা বাঁ-দিকে যাবার নির্দেশ দেবার জন্যে সাইন 'সুইচ অন' ও 'সুইচ অফ' করবে।

যন্ত্রটি পরীক্ষামূলকভাবে এখন ব্যবহৃত হবে। এটির কাজকর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখবে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসানো ক্লোজ্‌ড্-সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরা।

পুস্তক পরিচয়

পারিবারিক পোল্ট্রী (দ্বিতীয় সংস্করণ)—শ্রীশান্ত; প্রকাশক—শ্রীতপনকান্তি দত্ত; ১১৮ মহারাজ নন্দকুমার রোড-সাউথ, বরানগর; কলিকাতা-৩৬। মূল্য ৪.০০ টাকা।

বর্তমানে মানুষের নিম্নতম চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রয়োজনীয় মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতির একান্ত অভাব লক্ষিত হইতেছে। এই খাদ্য সঙ্কট অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য পল্লী অঞ্চলের অনেকেই—এমন কি, সহরাঞ্চলেরও কিছু কিছু লোক হাঁস-মুরগী প্রতিপালন করিয়া নিজেদের পরিবারবর্গের জন্য ডিম ও কিছু মাংসের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকিলে এই কাজে সাফল্য লাভ করা সহজ নহে। কাজেই যাহারা এই কাজে উদ্যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই বইখানি হইতে হাঁস-মুরগী পালনের যাবতীয় বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

গ্রন্থকার নিজে বহুদিন ধরিয়া হাঁস-মুরগী পালন করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন এবং অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ এই সম্বন্ধে—যেমন, হাঁস-মুরগী পালনের ঘর, আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জাম, খাদ্য, বাচ্চা উৎপাদন, রোগ ও তাহার প্রতিকার, ইনকিউ-

বেটরের ব্যবহার, ডিম পাড়া নিয়ন্ত্রণ, উন্নত জাত সৃষ্টির জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে চিত্রাদির সাহায্যে আলোচনা করিয়াছেন।

এই বিষয়ে যদি কেহ কার্যক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিতে উৎসাহী হন, তাহা হইলে এই বইখানি পড়িয়া তিনি যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।

মেঘনাদ সাহা—প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ—কমলেশ রায়। প্রকাশক—তরুণ সেনগুপ্ত, মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেড; ৩/৪বি, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য দুই টাকা।

বাঙালী বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহার নাম সকলেরই পরিচিত। জীবনের প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ও গবেষণার কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন। দেশের বিজ্ঞান গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্বাধীন ভারতে পার্লিয়ামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হইবার পর তিনি দেশের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার, বিজ্ঞান ও কারিগরী-শিল্প বিষয়ক গবেষণার ব্যাপক প্রচলন, নদী-নিয়ন্ত্রণ, শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি, পারমাণবিক শক্তির কল্যাণকর প্রয়োগ, পঞ্জিকা সংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। শিক্ষাব্রত, জাতীয় পরিকল্পনা, প্রভৃতি ব্যাপারে যেভাবে তিনি দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন, সচরাচর তাহার তুলনা মিলে না।

কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক সাধনার কৃতিত্ব, জনকল্যাণ ও দেশোন্নয়নের প্রচেষ্টায় তাঁহার কার্যাবলীর বিষয় অনেকেই সম্যক অবগত নহেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে ছোট-বড় প্রত্যেকেই ডাঃ সাহার উদ্যমশীলতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানিতে পারিবেন।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান—(ত্রৈমাসিক পত্রিকা), সম্পাদক—শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য ও বিজ্ঞান পরিষদ (সোদপুর, ২৪ পরগণা) কর্তৃক পরিচালিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

আমরা 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যাটি পাইয়াছি। ইহাতে গণিতের কথা, রেডার ও কম্পিউটর বা গণক যন্ত্র শীর্ষক ৩টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিষয় বৈচিত্র্য, সজ্জা এবং মুদ্রণ পারিপাট্যে পত্রিকাটি আকর্ষণীয় হইয়াছে। আমরা নবীন সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—১৯৬৬

১৯শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা
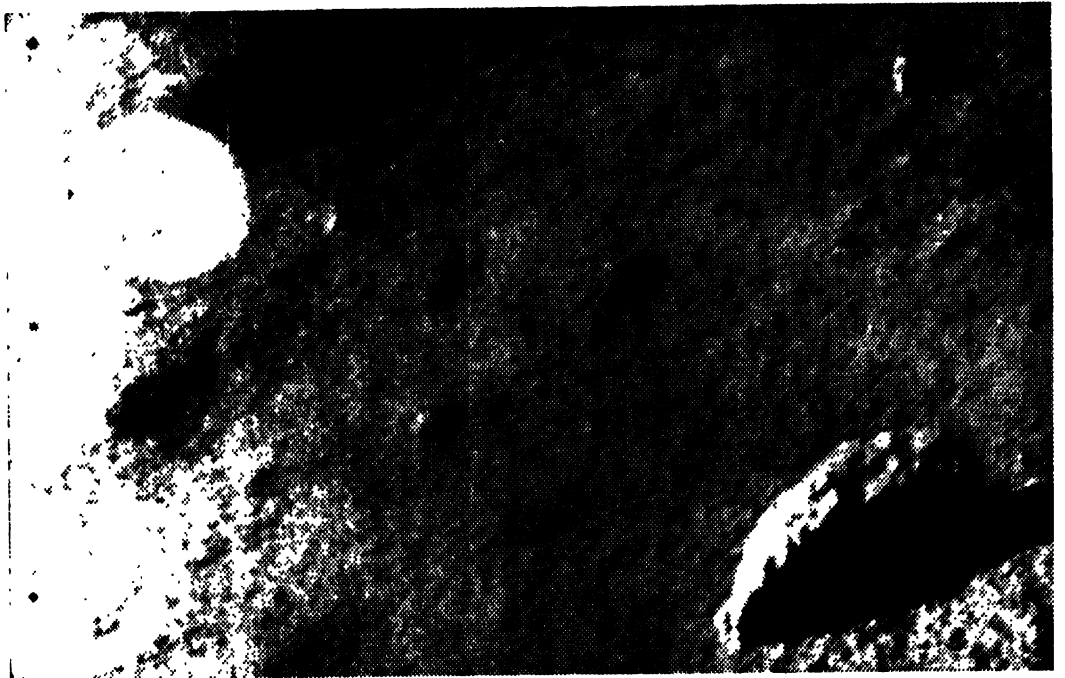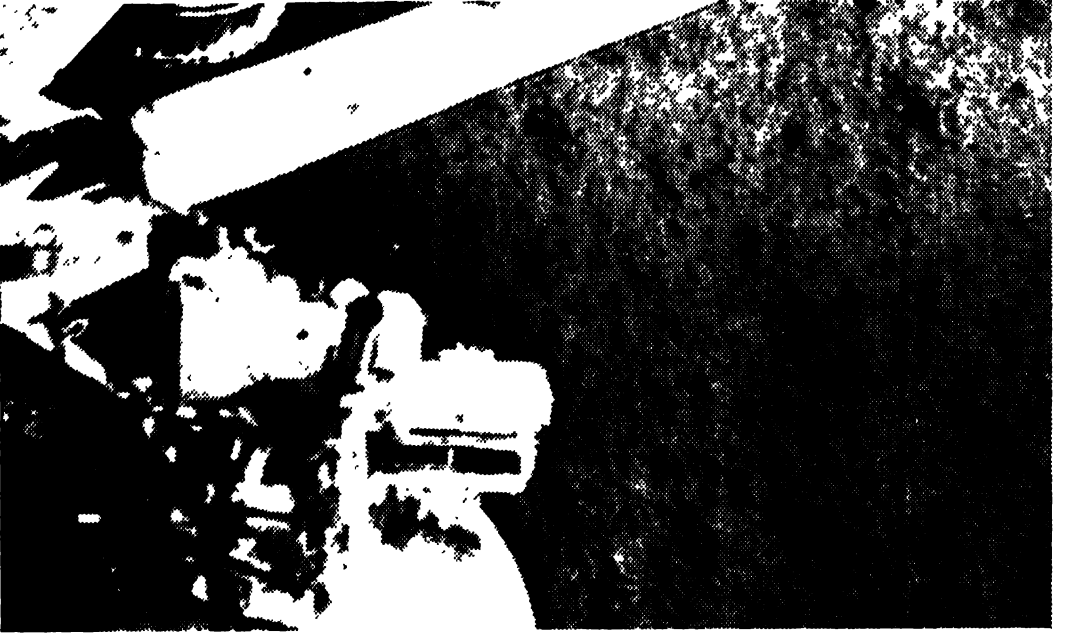
উপরে—গত ২রা জুন চাঁদে অবতরণের পর সার্ভেয়র প্রথম দফায় চন্দ্রলোকের যে ছবিগুলি পাঠিয়েছিল, তারই একটি ছবি উপরে দেখা যাচ্ছে। ছবির বাঁ-দিকে সার্ভেয়রের একটি পায়া, মাঝ বরাবর সার্ভেয়রের অ্যান্টেনা এবং নীচু দিকে হিলিয়ামের আধার দেখা যাচ্ছে।

নীচে—সার্ভেয়র কর্তৃক গৃহীত চন্দ্রলোকের আলোকচিত্র। চিত্রে একটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মত গর্ত, একটি ছোট পাহাড় এবং উপলাকীর্ণ প্রান্তর দেখা যাচ্ছে।

করে দেখ

কাগজের চলচ্চিত্র

দৃষ্টিভ্রমের জন্যে সিনেমার পর্দায় ছবিগুলিকে আমরা গতিশীল দেখে থাকি— একথা হয়তো তোমরা অনেকেই জান। ফিল্মের গায়ে মুদ্রিত বহুসংখ্যক স্থির ছবিকে অতি দ্রুতগতিতে পর পর পর্দার উপর ফেলে এরূপ দৃষ্টিবিভ্রমের সৃষ্টি করা হয়। কাগজের উপর আঁকা দুখানা ছবির সাহায্যে ব্যাপারটা তোমরা অনায়াসেই পরীক্ষা করে দেখতে পার।
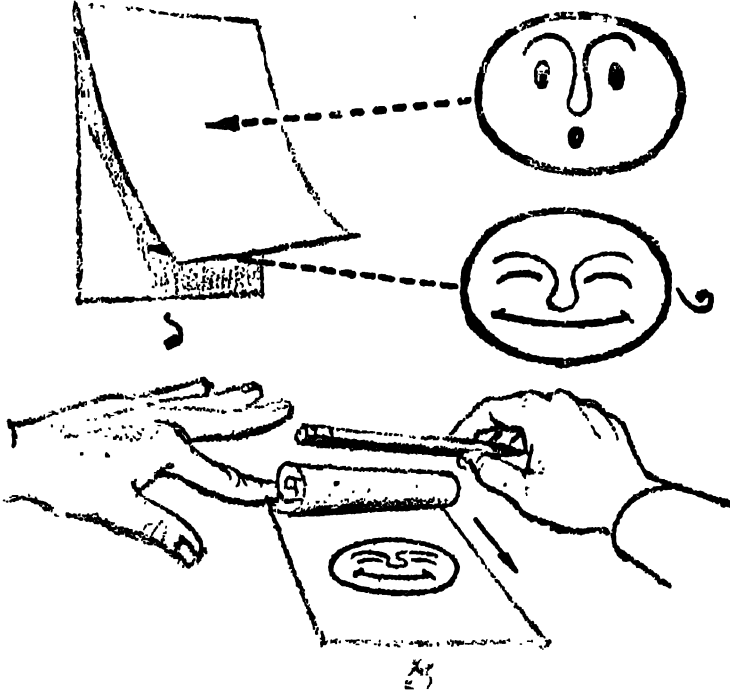
লম্বায় ৮ ইঞ্চি ও পাশে ৩ ইঞ্চি মাপের বেশ একটু মোটা ও শক্ত একখণ্ড কাগজ নিয়ে তাকে ১নং চিত্রের মত সমান দু-ভাঁজ কর। উপরের কাগজখানাতে ২নং ছবির মত একটি এবং নীচের কাগজখানাতে ৩নং ছবির মত একটি ছবি এঁকে নাও। এবার উপরের ছবির কাগজখানাকে একটা পেন্সিলের গায়ে জড়িয়ে একটা চোঙের মত গুটিয়ে দিয়ে পেন্সিলটা খুলে নাও। পেন্সিলটা খুলে নিলেও কাগজখানা চোঙের মত গুটিয়ে থাকবে।

এবার কাগজখানাকে টেবিলের উপর রেখে উপরের বাঁ-দিকের কোণে বাঁ-হাতের আঙ্গুলে চেপে ধরে ডান হাতে একটা পেন্সিলের সাহায্যে জড়ানো কাগজটাকে দ্রুতগতিতে একবার উপরের দিকে আবার নীচের দিকে বুলাতে থাক। পেন্সিলটাকে উপর থেকে নীচের দিকে টানলে কাগজটার পাক খুলে যাবে এবং ২নং-এর ছবিটা দেখা যাবে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার পেন্সিলটাকে নীচ থেকে উপরের দিকে টানলে কাগজটা পুনরায় জড়িয়ে যাবার ফলে ৩নং ছবিটাকে দেখা যাবে। পেন্সিলটাকে বেশ তাড়াতাড়ি উপরে-নীচে বুলাতে হবে। এর ফলে মনে হবে—ছবির মুখখানা যেন একবার হাসছে, আবার গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। চলচ্চিত্রের মূল রহস্যটি এথেকেই বুঝতে পারবে।

—গ—

প্রাণী-জগতের বহুরূপী

তোমরা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' বইয়ে ছিনাথ বহুরূপীর কথা অনেকেই হয়তো পড়েছ। সেই শ্রীনাথ সং সেজে বেড়াতো এবং একবার বনমানুষ সাজতে গিয়ে কি নাস্তানাবুদই না হয়েছিল। প্রাণী-জগতেও অনেক শ্রেণীর প্রাণী আছে, যারা ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিজেদের রং পাল্টে বহুরূপী সাজে। অবশ্য এরা সখ করে বা আনন্দ করবার জন্যে সং সাজে না—প্রয়োজনের তাগিদেই এদের বহুরূপী সাজতে হয়। শত্রুর কাছ থেকে আত্মগোপন করবার জন্যে অথবা শিকার ধরবার জন্যে এরা রং পাল্টে নিজেদের অনেকটা অদৃশ্য করে রাখে।

তোমাদের কাছে ক্যামেলিয়ন নামক একটি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর কথা বলবো। ক্যামেলিয়ন—গিরগিটি, টিকটিকিজাতীয় প্রাণী। এরা নিজেদের শরীরের রং এত ঘন ঘন পাল্টাতে পারে যে, এদের বহুরূপী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এদের রং পাল্টাবার ক্ষমতা বহু কাল পূর্বেই বিজ্ঞানীদের নজরে পড়েছিল। অ্যারিষ্টটল প্রথম এই রং পাল্টাবার কথা জানতে পারেন।

ক্যামেলিয়ন আফ্রিকার বনে-জঙ্গলেই বেশী পাওয়া যায়, অবশ্য কিছু কিছু ইউরোপ এবং দক্ষিণ ভারতেও দেখা যায়। ক্যামেলিয়নের আকৃতি অদ্ভুত। এর মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি শিরস্ত্রাণের মত অংশ আছে—কাঁধের উপর চামড়ার এই পদার্থটি দেখতে অনেকটা সিংহের কেশরের মত। সেই জন্যেই ক্যামেলিয়ন নাম দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে বেঁটে সিংহ। দুই পাশে

দুটি গোলাকার চোখ আছে। এর লেজ এবং জিহ্বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লেজের সাহায্যে এরা গাছের ডালপালা আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে। ঐ ধরণের লেজকে গ্রাহী লেজ বলে। জিহ্বা ব্যাঙের জিহ্বার মত অর্থাৎ সামনের দিক মুখের সঙ্গে লাগানো এবং পিছনের দিক আল্গা—ঠিক আমাদের বিপরীত। কীট-পতঙ্গ দেখলেই (এরা কীট-পতঙ্গ খায়) এরা জিহ্বা ছিপের মত ছুড়ে মারে এবং জিহ্বার আঠালো অগ্রভাগে শিকার আট্‌কে যায়। ক্যামেলিয়ন বা বেঁটে সিংহের আকৃতির কথা অনেক বলা হলো। এবার ক্যামেলিয়নের দেহের রং পাল্টাবার কথা আলোচনা করা যাক। ক্যামেলিয়ন দিনরাত্রির মধ্যে হরেক রকমের রং ধারণ করে। দুপুরে এক রকম, সন্ধ্যায় আর একরকম এবং রাতে অন্যরকম। দেখা গেছে, দিনের বেলায় কোন গাছের রঙের সঙ্গে খাপ খাইয়ে রং পাল্টায় অর্থাৎ গাছের রং সবুজ হলে ওদের গায়ের রঙে সবুজের সঙ্গে কখনো কালো, কখনো পিঙ্গল এবং নীল রঙের মিশ্রণ থাকে। সকাল এবং বিকেল বেলায় এদের রং ঈষৎ ধূসর ও ঈষৎ সবুজ অর্থাৎ সবুজ ও ধূসরের মাঝামাঝি থাকে। রাতের বেলায় বাদামী রঙের মাঝে গাঢ় হলুদ রঙের দাগ থাকে। প্রখর সূর্যকিরণে ক্যামেলিয়নের গায়ের রং সবুজ থেকে কালো হয়ে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক রঙের ছোপ থেকে অন্য রঙের ছোপে রূপান্তরিত হতে পারে।

তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে যে, এক রঙের শরীর অন্য রঙে কি করে রূপান্তরিত হয়? আমরা তো ইচ্ছা করলে কালো শরীরকে ফর্সা রঙে রূপান্তরিত করতে পারি না।

রঙের এই রূপান্তর সাধিত হয় এক রকম কোষের সাহায্যে—যার নাম হলো রঞ্জক কোষ (Pigment cell)। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ক্যামেলিয়নের ত্বকের মধ্যে চারটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে থাকে হলুদ রঞ্জক কোষ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরে কোন রঞ্জক পদার্থ নেই—তবে আলোক প্রতিফলনের দরুণ দ্বিতীয় স্তরটিকে নীল রঙের এবং তৃতীয় স্তরটিকে সাদা রঙের মনে হয়। চতুর্থ স্তরে কালো এবং পিঙ্গল রঞ্জক কোষ থাকে। রঞ্জক কোষগুলি প্রসারিত হয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন লাইন তৈরি করতে পারে অথবা ঐগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যায় এবং ঐ স্তরের মাধ্যমে পরের সারিতে আলো যেতে পারে। ঐ রঞ্জক পদার্থের প্রসারণ এবং সঙ্কোচনের ফলেই ক্যামেলিয়নের রং পরিবর্তিত হয়।

অন্ধকারে রঞ্জক কোষ সঙ্কুচিত হয় এবং আলোতে তার প্রসারণ ঘটে। ক্যামেলিয়নের রং পাল্টাবার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্নায়ুতন্ত্রের অধীন। স্নায়ুতন্ত্রকে টেলিগ্রাফ পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মস্তিষ্ককে তার প্রধান অফিস এবং সুষুম্নাকাণ্ডকে ছোট অফিস ধরা যেতে পারে। সাধারণতঃ কোন কাজ

করবার আগে বড় অফিসে খবর পাঠিয়ে—কি করতে হবে তার নির্দেশ ছোট অফিসে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু অনেক সময় মস্তিষ্ক বা বড় অফিসের আদেশ ছাড়াই কোন কোন কাজ সমাধা হয়ে যায়। অজ্ঞান্তে হঠাৎ যদি আমরা জ্বলন্ত কয়লার উপর পা দিয়ে ফেলি, তখন কি করতে হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ নেবার জন্যে বড় অফিসের অপেক্ষায় থাকি কি? নিশ্চয়ই না, সঙ্গে সঙ্গে আমরা পা সরিয়ে নিই। স্নায়ুতন্ত্রের যে সব কাজ ছোট অফিস বা সুষুম্নাকাণ্ড, যখন বড় অফিস বা মস্তিষ্কে সংবাদ না দিয়ে নিজেই স্বাধীনভাবে করে—তখন তাকে প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া (Reflex action) বলে। ক্যামেলিয়ন প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার সাহায্যেই রং পাল্টায়। আলোকরশ্মি ত্বকের উপর পতিত হলে ত্বকের ভিতর যে অনুভূতির কোষ (Sense cell) থাকে, তা উত্তেজিত হয়। আলোকরশ্মি চোখের ভিতরকার স্তর বা অক্ষিপটকেও (Retina) উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনা প্রথমে সুষুম্নাকাণ্ডে যায় এবং সেখান থেকে অন্যান্য স্নায়ুকোষের সাহায্যে উপরিউক্ত উত্তেজনা রঞ্জক কোষে পৌঁছায়—যার ফলে রঞ্জক কোষের প্রসারণ ঘটে; অর্থাৎ সুষুম্নাকাণ্ড মস্তিষ্ককে খবর না দিয়েই প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার সাহায্যে কাজ সমাধা করে।

এক জাতের ক্যামেলিয়ন আছে যারা রং পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি কৌশল অবলম্বন করে—যার সাহায্যে এরা শত্রুকে পুরাপুরিভাবে ধাপ্পা দিয়ে থাকে। শত্রুকে নিকটে দেখলেই এরা কালো কুচ্‌কুচে রং ধারণ করে—আর সেই সঙ্গে নিঃশ্বাসের সাহায্যে ফুস্‌ফুস দুটিকে ফুলিয়ে বেলুনের মত করে তোলে। এভাবে কুচ্‌কুচে কালো শরীরকে ফুলিয়ে রেখে শত্রুর দিকে তাকিয়ে হাঁ করে থাকে। হাঁ করবার ফলে মুখের ভিতরকার উজ্জ্বল হলদে রং বেরিয়ে আসে। ফোলা শরীর এবং মুখ-গহ্বরের হলদে রং—সবকিছু মিলিয়ে এক কিম্ভুতকিমাকার প্রাণীর সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে আবার ধূর্ত ক্যামেলিয়নটি অবিকল সাপের মত হিস্‌ হিস্‌ শব্দ করতে থাকে। এই সব দেখে শত্রু ভয় পেয়ে তার শিকারকে ফেলে চম্পট দেয়। শত্রুর অন্তর্ধানের পর ক্যামেলিয়ন আবার ভাল মানুষটি সেজে বসে অর্থাৎ প্রকৃত আকৃতি ধারণ করে—হিস্‌ হিস্‌ শব্দও থেমে যায়।

কাজেই বুঝতে পার, মানুষের মত প্রাণীরাও আত্মগোপনের নানারকম উপায় অবলম্বন করে। এখানে শুধুমাত্র ক্যামেলিয়নের রং বদ্‌লাবার কথাই বলা হলো। প্রাণী-জগতে আরো অনেক মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণী আছে, যাদের দৈহিক রং পাল্টাবার ক্ষমতা আছে।

শুভ্রা দেবনাথ

সামুদ্রিক শ্যাওলা

শ্যাওলা তোমাদের অপরিচিত নয়। জলে-স্থলে পৃথিবীর সর্বত্র শ্যাওলা জন্মায়। বিজ্ঞানীরা নানা জাতের, নানা রঙের এবং বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য শ্যাওলার খোঁজ পেয়েছেন। পৃথিবীতে যখন অন্য কোন জীবের আবির্ভাব হয় নি, তখনও শ্যাওলার অস্তিত্ব ছিল। শ্যাওলাকে পৃথিবীর আদি জীব বলেও অভিহিত করা হয়। এখানে তোমাদের কয়েকটি সামুদ্রিক শ্যাওলার কথা বলছি।

সামুদ্রিক শ্যাওলার গুণাগুণের কথা প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দেশের মানুষ জানতো আর সে জন্যে তাদের কদরও ছিল যথেষ্ট। সামুদ্রিক শ্যাওলা—সামুদ্রিক আগাছা (Seaweed) নামে পরিচিত।

সব রকম সামুদ্রিক শ্যাওলায় ক্লোরোফিল থাকায় এরা সূর্যালোকে আলোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে। সমুদ্রের অগভীর অংশে অর্থাৎ যেখানে সূর্যের আলো সহজে প্রবেশ করতে পারে, সেখানেই বেশীর ভাগ শ্যাওলা দেখা যায়। শিলা, কর্দম, সামুদ্রিক প্রাণীর পরিত্যক্ত খোলা প্রভৃতিতে সামুদ্রিক শ্যাওলা জন্মায়। শিকড়ের মত উপাঙ্গের সাহায্যে এরা আশ্রয়স্থল আঁকড়ে থাকায় সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে যায় না। অবশ্য কিছু কিছু শ্যাওলা ভাসমান অবস্থায়ও থাকে। যদিও শ্যাওলার গঠন খুব সরল—অন্যান্য উদ্ভিদের মত সাধারণতঃ এদের পাতা, ডাঁটা, শিকড় ইত্যাদি নেই, কিন্তু অনেক সামুদ্রিক শ্যাওলার দৈহিক আকৃতি এমনই যে—তাদের ডাঁটা, পাতা ইত্যাদি থাকে।

সামুদ্রিক শ্যাওলা নিরামিষ-ভোজী সামুদ্রিক জীবের অন্যতম প্রধান খাদ্য। সমুদ্রের উপকূলে বসবাসকারী সামুদ্রিক জীবের প্রধান আশ্রয়ও হচ্ছে সামুদ্রিক শ্যাওলা। ভাটার সময় সমুদ্রের জল নেমে গেলে অনেক সামুদ্রিক জীব জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার জন্যে শ্যাওলার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সামুদ্রিক শ্যাওলা না থাকলে তাদের বাঁচাই সম্ভব হতো না। সমুদ্রের শিলাকে শ্যাওলা এমনভাবে আবৃত করে ফেলে যে, ঢেউয়ের আঘাতে শিলার ক্ষয়ও হয় না। বালুকাময় সমুদ্র-উপকূলে এদের সাধারণতঃ দেখা যায় না। তার কারণ—সেখানে কোন কিছুতে এরা নিজেদের আবদ্ধ রাখতে পারে না। গবাদি পশু এবং মানুষের খাদ্য হিসাবে পৃথিবীর কতকগুলি দেশে সামুদ্রিক শ্যাওলা ব্যবহৃত হয়। অনেক দেশে মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিকল্পে সামুদ্রিক শ্যাওলা সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া সমুদ্রতটের ক্ষয়রোধেও এরা সহায়তা করে।

কোন কোন সামুদ্রিক আগাছা অর্থাৎ শ্যাওলা শ্রেণীবদ্ধভাবে সমুদ্রের বিশাল অংশ জুড়ে অবস্থান করে। স্বচ্ছ খোলসের মধ্যে কোন কোন জাতের সামুদ্রিক শ্যাওলা নিজেদের আবদ্ধ রাখে। মৃত সামুদ্রিক শ্যাওলা সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হয়ে পুরু স্তর গঠিত হয়। হাজার হাজার বছর পরে এই সব উদ্ভিদের দেহাবশেষ কঠিন শিলায় রূপান্তরিত হতে পারে।

সামুদ্রিক শ্যাওলার শরীরে জিলাটিনের মত একপ্রকার চট্‌চটে আঠালো পদার্থ থাকে। সমুদ্রের জল যখন ভাটার সময় নেমে যায় এবং রোদের তাপ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, তখন এই চট্‌চটে আঠালো পদার্থই তাদের জীবনধারণের পক্ষে সহায়তা করে। অতি ক্ষুদ্র স্পোর-এর দ্বারা সামুদ্রিক শ্যাওলার বংশবৃদ্ধি হয়। স্পোরগুলি জলের মধ্যে কোন কঠিন বস্তুর উপর পড়ে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে।

সামুদ্রিক শ্যাওলা রোদে শুকালে তার আকৃতি এবং রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। এক সময় মানুষের সখ ছিল সমুদ্র থেকে সামুদ্রিক শ্যাওলা সংগ্রহ করা এবং তা রোদে শুকিয়ে অ্যালবামে আঠা দিয়ে বা অন্য ভাবে লাগিয়ে রাখা। তাছাড়া অলঙ্কার ও স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণে প্রচীন কালে সামুদ্রিক শ্যাওলা ব্যবহৃত হতো। প্রাচীন রোমে সামুদ্রিক শ্যাওলা সংগ্রহ করে তা রোদে শুকানো হতো। তার পর তা গুঁড়া করে রোমানরা পাউডারের মত হাতে-মুখে মাখতো। দৈহিক সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যে তৎকালে রোমে শ্যাওলার গুঁড়ার যথেষ্ট চাহিদা ছিল।

এস্কিমো-মেয়েরা সামুদ্রিক শ্যাওলার রং নিষ্কাশিত করে মাছের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে তা দিয়ে অঙ্গলেপন করতো। প্রসাধন সামগ্রী হিসাবে এর খুব কদরও ছিল। প্রাচীন কালে রোমে সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে নিষ্কাশিত রং দিয়ে কাপড় বোনবার সুতা রঞ্জিত করা হতো।

প্রাচীন কালে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় সামুদ্রিক শ্যাওলা সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ধারণা পোষণ করা হতো। তারা মনে করতো এসব আগাছার ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে। এদের সাহায্যে যাদুর খেলা দেখানো যায়। সে জন্যে প্রাচীন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার যাদুকরেরা তাদের যাদুদণ্ড প্রস্তুতে সামুদ্রিক শ্যাওলা ব্যবহার করতো।

সামুদ্রিক শ্যাওলার রোগ নিরাময়ের ক্ষমতার কথাও হাজার হাজার বছর আগেই মানুষ জানতো। পাঁচ হাজার বছর আগে চীন দেশের জনৈক চিকিৎসক ওষুধ হিসাবে সামুদ্রিক শ্যাওলা প্রথম ব্যবহার করেন বলে শোনা যায়। কেল্প ও ডাল্‌স্ নামক সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে আমাদের দেহের পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় উপাদান—আয়োডিন পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে—প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ সামুদ্রিক শ্যাওলাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতো। আমাদের দেহ-পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা উপাদান সামুদ্রিক

শ্যাওলায় আছে। আয়োডিন, সোডিয়াম ও ম্যাগ্নেশিয়াম লবণ, সোডিয়াম কার্বনেট, পটাশিয়াম সালফেট, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, বিভিন্ন রকমের ভিটামিন ইত্যাদি বিভিন্ন সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে সংগ্রহ করা হয়। বহু বছর যাবৎ প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপের লোকেরা সামুদ্রিক শ্যাওলা খেয়েই জীবনধারণ করতো। পরে অবশ্য সেই দ্বীপে অন্যান্য দেশ থেকে লোক আসবার পর তাদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এখন অবশ্য উন্নত বৈজ্ঞানিক পন্থায় রসায়নাগারে আয়োডিন প্রস্তুত হচ্ছে। জীবাণুনাশক হিসাবে আয়োডিনের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। কিন্তু দেহের, বিশেষতঃ থাইরয়েড গ্রন্থির পুষ্টির জন্যে যে আয়োডিন প্রয়োজনীয়, তা কেবল সামুদ্রিক আগাছা থেকেই পাওয়া যায়।

র‍্যাক উইড (Wrack weed) এবং কেল্প নামক সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে এক রকম চট্‌চটে আঠালো পদার্থ নিষ্কাশন করা হয়। জলে প্রায় দু-সপ্তাহ সামুদ্রিক শ্যাওলা ডুবিয়ে রাখা হলে জলটা মধুর মত ঘন হয়। তারপর ঐ পদার্থটাকে কাপড়ে ছাঁকলে জলটা বেরিয়ে যায় এবং থক্‌থকে জেলির মত পদার্থ কাপড়ে পড়ে থাকে। এই জেলি ফোঁড়া এবং হজমের পক্ষে বিশেষ উপকারী। সামুদ্রিক শ্যাওলা আগুনে পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যায়, তা দাঁতের মাজন হিসাবে উৎকৃষ্ট।

পৃথিবীর মধ্যে জাপানেই মানুষের নানা প্রয়োজনে সবচেয়ে বেশী সামুদ্রিক শ্যাওলা ব্যবহৃত হয়। খাদ্য হিসাবেও সামুদ্রিক শ্যাওলা সেখানে ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে।

আইরিশ মস বা ক্যারাজিন (Carrageen) শিলাময় সমুদ্রের উপকূলে জন্মায়। এদের শাখাগুলির আকৃতি অনেকটা ইংরেজী 'ওয়াই' অক্ষরের মত। এদের পাতাগুলির প্রান্তভাগ কোঁকড়ানো। এক সময়ে কোন কিছুকে বিরঞ্জিত করবার জন্যে আইরিস মস ব্যবহৃত হতো। আয়ারল্যাণ্ডে আইরিস মস খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হতো। আইরিস মসকে সেদ্ধ করলে জিলাটিন পাওয়া যায়—এটি স্বাদহীন, কিন্তু পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য খাদ্য। বাসনপত্র চক্‌চকে করতে এই সামুদ্রিক শ্যাওলা ব্যবহৃত হতো। শ্লোক নামক এক প্রকার সামুদ্রিক শ্যাওলা ইংল্যাণ্ডেও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রোপকূলের কাছাকাছি শিলায় এই শ্যাওলা জন্মায়। এগুলিকে সমুদ্র থেকে সংগ্রহ করে ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। তারপর ভিনিগার সহযোগে সেদ্ধ করে এক রকম চট্‌চটে আঠালো পদার্থ বা জেলি পাওয়া যায়। এই জেলি খেতেও সুস্বাদু। প্রাচ্য দেশসমূহে এক প্রকার সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে অ্যাগার অ্যাগার নামক একরকম জেলি এবং আঠা তৈরি হয়। জীবাণুর বংশবৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে গবেষণাগারে অ্যাগার অ্যাগার ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সামুদ্রিক আগাছা

থেকে অ্যালজেনিক অ্যাসিড পাওয়া যায়—এটি কঠিন পিণ্ডে পরিণত হবার পর ভাল অন্তরক (Insulating) পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

জোস্‌টেরা (Zostera) বা ঈল-গ্রাস নামক সামুদ্রিক আগাছা চীনামাটি বা কাচের বাসন-পত্র প্যাক করবার কাজে ব্যবহৃত হয়। সুমিষ্ট ওর-উইডের (Oar-weed) ডাঁটা ভাল করে শুকিয়ে তা দিয়ে ছড়ি, ছাতি, ছুরি, তরোয়াল, চাবুক প্রভৃতির হাতল তৈরি করা হয়। সমুদ্রের উপকূলের কাছে ট্যানজেল-উইড (Tangel weed) নামক এক জাতের সামুদ্রিক শ্যাওলা জন্মে। এগুলি সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাত থেকে সমুদ্রতীরের ক্ষয় প্রতিরোধ করে।

রং অনুযায়ী সামুদ্রিক শ্যাওলাকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা—বাদামী, লাল এবং সবুজ।

বাদামী রঙের সামুদ্রিক শ্যাওলাই বৃহদাকৃতির হয়। একে Macroystic নামে অভিহিত করা হয়। গ্রীক ভাষায় Macroystic শব্দের অর্থ হচ্ছে 'বড় থলি'। এদের দেহে উটপাখীর ডিমের মত অসংখ্য বড় বড় বায়ুপূর্ণ থলি বা গুটি থাকে। এই শ্যাওলা লম্বায় দুই শত ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

পপ-উইড গুটি বা থলিযুক্ত একজাতের সামুদ্রিক শ্যাওলা। এরা এমনভাবে জলের উপর ছড়িয়ে থাকে যে, সামুদ্রিক প্রাণীরা প্রয়োজনের সময় অনায়াসে এর নীচে আশ্রয় নিতে পারে। এই শ্যাওলা জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাউটেল, ফিঙ্গারবেড-সী-ট্যাঙ্গেল, সুগার-উইড, পুওর ম্যান্‌স্ ওয়েদার গ্লাস প্রভৃতি শ্যাওলা সামুদ্রিক ভাটার সময় শিলার উপর থেকে জলে হেলে পড়ে এবং এদের পাতাগুলি সমুদ্রের জলের বেশ কিছুটা স্থান জুড়ে থাকে। সুগার উইড থেকে কেলাসিত চিনি পাওয়া যায়। এই চিনি ম্যানিট (Mannit) নামে পরিচিত এবং জাপানে খাদ্য হিসাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সুগার উইডকে 'আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বক্তা'ও (Weather Prophet) বলা হয়। এদের শুক্‌নো পাতা বাতাসের আর্দ্রতা শোষণ করে স্যাঁতসেঁতে হয়। এর দ্বারা বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণ বোঝা যায়।

বাদামী রঙের সামুদ্রিক শ্যাওলায় Fucoxanthin নামক এক রকম রঞ্জক পদার্থ থাকায় এর রং বাদামী দেখায়। বুটলেস উইড (Bootlace weed) এবং থং উইড (Thong weed) নামক বাদামী রঙের সামুদ্রিক শ্যাওলা খুব সরু অথচ লম্বা হয়ে থাকে। এদের চাবুকের আকৃতির মত পাতাগুলি ছোট ছোট বোতামের ন্যায় আঁকড়া থেকে উদ্‌গত হয়। সারগ্যাসো সমুদ্রে (Sargasso Sea) গাল্‌ফ্‌ উইড নামক এক প্রকার সামুদ্রিক শ্যাওলাকে ভাসমান দেখা যায়। এরা সমুদ্রের বিশাল অংশ অধিকার করে থাকে। এই শ্যাওলার মধ্যে এক জাতের সামুদ্রিক কাঁকড়া বাস করে। শোনা যায়, কলাম্বাস প্রথম আমেরিকা আবিষ্কারের সময় এই কাঁকড়া

দেখেই বিশ্বাস করেছিলেন যে, কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোথাও ভূখণ্ড আছে। এছাড়াও সারগ্যাসো সমুদ্রে আরও নানা রকমের বাদামী রঙের সামুদ্রিক শ্যাওলা দেখা যায়।

লাল রঙের সামুদ্রিক শ্যাওলা বাদামী সামুদ্রিক শ্যাওলার তুলনায় সাধারণতঃ কিছুটা ছোট হয়। Phycoerythrin নামক রঞ্জক পদার্থের জন্যে এর রং লাল হয়। এরা সমুদ্রের উপকূলের কাছাকাছি শিলায় জন্মায় এবং সমুদ্রের খুব গভীরে প্রসারিত হয়।

সবুজ রঙের সামুদ্রিক শ্যাওলার ক্লোরোফিল ছাড়া অন্য রঞ্জক পদার্থ না থাকায় এদের রং হয় সবুজ। ক্লোরোফিলের রং সবুজ। এই সব শ্যাওলা সমুদ্রের উপকূল থেকে কিছু দূরে জন্মায়। সী-লেটুস (Sea-lettuce) বা আলভা (Ulva) সবুজ বর্ণের সামুদ্রিক শ্যাওলা। এর পাতা চ্যাপ্টা। আবার কোন কোন সবুজ শ্যাওলার পাতা হয় সুতার মত সরু। ষ্ট্রাপ উইড নামক সবুজ সামুদ্রিক শ্যাওলা থেকে এক রকম উপাদেয় আচার জাতীয় পদার্থ তৈরি হয়। চীন দেশে এই শ্যাওলা দিয়ে "পাখীর বাসার ঝোল"-এর মত উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। সী-ফার্ণও একজাতীয় সবুজ সামুদ্রিক শ্যাওলা।

এখানে মাত্র কয়েকটি বিভিন্ন জাত ও রঙের সামুদ্রিক শ্যাওলার কথা বলা হলো। এছাড়া আরও বহুরকম সামুদ্রিক শ্যাওলা আছে, যারা মানুষ এবং সামুদ্রিক জীবদের পক্ষে নানা দিক থেকে খুবই প্রয়োজনীয়।

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। গাড়ীর পেট্রোল ও কাপড়-কাচা (দ্রাবক) পেট্রোলের মধ্যে পার্থক্য কি?

অনুশ্রী দে, স্বাগতা পাল

প্রঃ ২। হাইড্রোজেন শিখার বর্ণালী সম্বন্ধে জানতে চাই।

শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

উঃ ১। গাড়ীর পেট্রোল বা গ্যাসোলিন খনিজ পেট্রোলিয়াম শোধন করে পাওয়া হাল্কা দাহ্য তৈল। রসায়নগত ভাবে এর মধ্যে প্রধানতঃ C_6 থেকে C_{11} পর্যন্ত কার্বন পরমাণুযুক্ত নানারকম হাইড্রোকার্বনের সংমিশ্রণ আছে। এছাড়াও কিছু কিছু জৈব দাহ্য পদার্থ এর মধ্যে থাকে। গ্যাসোলিনের স্ফুটনাঙ্ক সাধারণতঃ ৭০° সেঃ থেকে

২০০° সেঃ পর্যন্ত। বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত গ্যাসোলিনের রাসায়নিক সংযুতি ও স্ফুটনাঙ্কের মাত্রা নির্ভর করে সেই সেই দেশের আবহাওয়া এবং স্বাভাবিক উষ্ণতার উপর।

কাপড়-কাচা পেট্রোল বা শিল্পে ব্যবহৃত দ্রাবক পেট্রোলও খনিজ পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনের ফলে উৎপন্ন হয়। এর স্ফুটনাঙ্কের মাত্রা ২০° সেঃ থেকে ১২০° সেঃ পর্যন্ত। গ্যাসোলিন অপেক্ষা এটা বেশী উদ্বায়ী বলে গ্যাসোলিন অংশ পাতিত হবার আগেই তা সংগৃহীত হয়। এর মধ্যে সাধারণতঃ C_5 থেকে C_8 পর্যন্ত কার্বন পরমাণুযুক্ত হাইড্রোকার্বন থাকে। তবে ৭০° সেঃ থেকে ৯০° সেঃ পর্যন্ত সংগৃহীত দ্রাবক (বেনজাইন) বিশেষ ধৌত কার্যে ব্যবহৃত হয়।

উঃ ২। আমরা জানি সাদা আলো প্রিজমের মধ্য দিয়ে পাঠালে তাথেকে বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী পাওয়া যায়। কিন্তু হাইড্রোজেন শিখা থেকে উদ্ভূত আলো যখন বর্ণ-লেখ (Spectrometer) যন্ত্রে পরীক্ষা করা হয়, তখন নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালীর পরিবর্তে উজ্জ্বল ও বিচ্ছিন্ন বর্ণালী-রেখা সমান্তরালভাবে সন্নিবেশিত হতে দেখা যায়। (সাধারণতঃ যে যন্ত্র ভিন্ন বর্ণের মিশ্র আলোক রশ্মিকে বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ বর্ণমালায় পৃথক পৃথক করে ফেলে, তার নাম বর্ণ-লেখ যন্ত্র) এই বর্ণালী রেখায় যে সব রঙের আলো পাওয়া যায়, তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একটি সরল আঙ্কিক সূত্র উদ্ভাবনে বিজ্ঞানী বামার সক্ষম হন।

সূত্রটি এই—

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

এখানে λ = রেখা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য

R = ধ্রুবক

n = 3, 4, 5, ইত্যাদি

এই সূত্র থেকে আমরা যে সব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো পাই, তারা বর্ণালীর বেগুনী এলাকা এবং অতিবেগুনীর এলাকায় পড়ে। এই পর্যায়ের বর্ণালীকে বামার পর্যায় বলা হয়।

পরবর্তী কালে দেখা যায় যে, হাইড্রোজেন বর্ণালীতে বামার পর্যায় ছাড়াও আরো কিছু পর্যায় আছে। তারা যথাক্রমে লিম্যান, প্যাসেন, ব্রাকেট, ফাণ্ড ইত্যাদি। বামার থেকে সুরু করে এই সব বর্ণালীকে একটি আঙ্কিক সূত্রে যুক্ত করতে হলে আমরা নিম্নলিখিত সাধারণ সূত্রটি পাই—

$$\frac{1}{\lambda} = R_H\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right)$$

যখন $n_1=1$, $n_2=2, 3, 4,$ ……লিম্যান পর্যায়

$n_1=2$, $n_2=3, 4, 5,$ ……বামার পর্যায়

$n_1=3$, $n_2=4, 5, 6$ ……প্যাসেন পর্যায়

$n_1=4$, $n_2=5, 6, 7,$ ……ব্র্যাকেট পর্যায়

$n_1=5,$, $n=6, 7, 8,$ ……ফাণ্ড পর্যায়

আমরা R-এর নির্দিষ্ট মান ধরে এই সব পর্যায়ের বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হিসাব করতে পারি।

উদাহরণ :—

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{}{n_1^2\ n_2^2}\right)$$

$$\lambda = \frac{1}{R} \cdot \frac{n_1^2\ n_2^2}{n_2^2 - n_1^2}$$

$$\frac{1}{R} = {}^{\cdot}0912 \text{ মাইক্রন}$$

[এক মাইক্রন $= 10^{-5}$ সেমি

মনে করা যাক—$n_1=1,\quad n_2=2.$

$$\therefore \lambda = {}^{\cdot}0912 \times \frac{1^2\ 2^2}{\ } = .1216 \text{ মাইক্রন}$$

এই ভাবে সমস্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হিসাব করা যেতে পারে।

রাদারফোর্ড অনুমিত পরমাণুর উপর প্ল্যাঙ্ক ও আইনষ্টাইন উদ্ভাবিত কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগে নিল্‌ বোর হাইড্রোজেন বর্ণালী বিশ্লেষণ করেন। তাঁর তত্ত্ব কতকগুলি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও হাইড্রোজেন বর্ণালীকে প্রায় সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করে। পরে এই তত্ত্ব সোমারফেল্ড কর্তৃক সংশোধিত হয়।

বর্তমানে এই তত্ত্বকে পুরাতন কোয়ান্টাম তত্ত্বের পর্যায়ে ফেলা হয় এবং শ্রোডিংগার, হাইজেন্‌বার্গ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্বের আলোকে এই সব তথ্যকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে।

বলা বাহুল্য নিল্‌ বোরের অনুমানগুলি গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তাঁর তত্ত্বের সার্বজনীনত্বের হানি দেখা যায়।

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

বিবিধ

মার্কিন মহাকাশযানের চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ

২রা জুন, ১৯৬৬ মার্কিন মহাকাশযান সার্ভেয়ার-১ সাফল্যের সঙ্গে চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরে অবতরণ করে। পৃথিবী থেকে মানুষের উৎক্ষিপ্ত মহাকাশযানের চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরে অবতরণের ঘটনা এই দ্বিতীয়। এই বছরের (১৯৬৬) গোড়ায় ৩রা ফেব্রুয়ারী রুশ মহাকাশযান 'লুনা-৯' প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে ধীরে অবতরণ করে। কিন্তু নবম লুনার তুলনায় সার্ভেয়ারের এই ধীরে অবতরণ নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ চন্দ্রপৃষ্ঠে সার্ভেয়ারের ধীরে অবতরণ প্রথম প্রচেষ্টাতেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, যদিও রুশ প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল পাঁচবার অসাফল্যের পর। দ্বিতীয়তঃ নবম লুনা চন্দ্রপৃষ্ঠের মাত্র ৯খানা আলোকচিত্র প্রেরণ করেছিল, সে তুলনায় সার্ভেয়ার প্রেরণ করেছে ১০ হাজারেরও বেশী চিত্র এবং তার মধ্যে কয়েকখানা রঙীন চিত্রও আছে। চন্দ্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন, রহস্যঘেরা চন্দ্রপৃষ্ঠের এত পরিষ্কার ও ভাল ছবি এর আগে পাওয়া যায় নি।

কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষিপ্ত হবার পর সাড়ে ৬৩ ঘণ্টায় পৃথিবী থেকে চন্দ্র পর্যন্ত ২লক্ষ ৪০ হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে সার্ভেয়ার ধীরে ধীরে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে। উৎক্ষেপণের সময় এই মহাকাশযানের সর্বসমেত ওজন ছিল ২১৯৪ পাউণ্ড এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে যখন অবতরণ করে, তখন তার ওজন ছিল প্রায় ৬২০ পাউণ্ড।

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মাইল উর্ধ্বে থাকবার সময় অবতরণের এক ঘণ্টা আগে ক্যালিফোর্নিয়ার গোল্ড স্টোন যাত্রাপথ পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র থেকে চন্দ্র অভিমুখী সার্ভেয়ারের নাকের সঙ্গে যুক্ত গতি-সঙ্কোচক রকেটসহ মহাকাশযানটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। চন্দ্র থেকে ২০০ মাইল দূরে থাকতে পৃথিবীর আরেকটি নির্দেশ কেন্দ্র থেকে যানসংলগ্ন রেডার যন্ত্র চালু করা হয়। এর সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে ধ্বনি নিক্ষেপ করে চন্দ্র থেকে মহাকাশযানের দূরত্ব স্থির করা হয়। রেডারে প্রাপ্ত নির্দেশ যানের কম্পিউটরে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং এই সময় থেকেই কম্পিউটর অবতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

৬০ মাইল থাকতে কম্পিউটরটি তিনটি ছোট 'ভারনিয়ের' নির্দেশক রকেট নিক্ষেপ করে। এর ফলে ঘণ্টায় ৬০০০ মাইল বেগে গেলেও সার্ভেয়ার খাড়াভাবে নামতে থাকে। নির্দেশক রকেট নিক্ষেপের দু-এক সেকেণ্ডের মধ্যেই কম্পিউটরটি ১০,০০০ পাউণ্ড চাপবিশিষ্ট বড় রেট্রো-রকেটের বিস্ফোরণ ঘটায়। ৪০ সেকেণ্ডের মধ্যে রকেটটি পুড়ে শেষ হয়ে যায় এবং সার্ভেয়ারের গতি কমে গিয়ে ঘণ্টায় ২৫০ মাইলে দাঁড়ায়।

শেষ কয়েক মাইল মহাকাশযান চালনার দায়িত্ব কম্পিউটরটি আরও একটি সূক্ষ্মতর কম্পিউটরের উপর ন্যস্ত করে। এর নাম হলো 'রেডার অলটিমিটার ডপ্‌লার ডেন্‌সিটি সেন্‌সর'। এই যন্ত্রটি প্রয়োজনমত ভারনিয়ের ইঞ্জিনগুলি চালিত করে এবং তাদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মহাকাশযানটিকে খাড়া রাখে।

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৪ ফুট উঁচুতে থাকবার সময় সার্ভেয়ারের গতি কমিয়ে সেকেণ্ডে পাঁচ ফুট করা হয়। তারপর ভারনিয়ের ইঞ্জিনগুলি কেটে দেওয়া হয় এবং মহাকাশযানটি চন্দ্রপৃষ্ঠে আপনাআপনি নেমে আসে।

মহাকাশযানটি এমন ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে এর মধ্যে রক্ষিত যন্ত্রপাতি চন্দ্রদিবসের প্রচণ্ড উত্তাপ (বিজ্ঞানীদের মতে দিনে চন্দ্রপৃষ্ঠের

উত্তাপ প্রায় ১০০ ডিগ্রী সেঃ) সহ্য করতে পারে। এক একটি চন্দ্রদিবস পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান। ১৪ দিন পরে দীর্ঘ ও হিমশীতল চন্দ্ররাত্রিতে (রাত্রে চন্দ্রপৃষ্ঠের উত্তাপ প্রায় -১২০ ডিগ্রী সেঃ-এ নেমে আসে) মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

মহাকাশযানের মাস্তুলে একটি বিরাট প্যানেলে সৌর বিদ্যুৎ-কোষ সন্নিবিষ্ট রয়েছে। এই কোষ থেকে যানটি তার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-শক্তি সংগ্রহ করেছে। মহাকাশযানের প্রধান যন্ত্র হচ্ছে এর টেলিভিশন ক্যামেরা। যানটির নিম্নভাগে এর অবস্থান এবং এটি উর্ধ্বমুখী। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত একটি আয়নার সাহায্যে ক্যামরাটি চন্দ্রপৃষ্ঠ ও অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুর ছবি তুলে ভূপৃষ্ঠে প্রেরণ করেছে। আয়নাটি সম্পূর্ণভাবে (অর্থাৎ ৩৬০ ডিগ্রী) আবর্তন করতে পারে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রেরিত নির্দেশানুসারে আয়নাটি বিভিন্ন দিকে আবর্তন করে চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি তুলেছে। নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী সার্ভেয়ার প্রতি ইঙ্গিতে ৬০০ রেখার সাহায্যে টেলিভিশন চিত্র পাঠায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং গ্রেট বৃটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে টেলিভিশনে এই চিত্র প্রদর্শিত হয়।

চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের ৩৫ মিনিট পরে সার্ভেয়ার প্রথম আলোকচিত্র পাঠায়। প্রথম ছবিতে সার্ভেয়ারের তিনটি পায়ার একটিকে দেখা যায়। পায়াটি যেখানে রয়েছে, সেই স্থানটি ঈষৎ বসে গেছে। আরও দেখা গেছে, ১০ ফুট দীর্ঘ মহাকাশযানটি খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরবর্তী ছবিগুলিতে চন্দ্রপৃষ্ঠে ছোট ছোট পাথর ও ছোট আগ্নেয়গিরির মুখ দেখা গেছে

১৬ জুন পর্যন্ত ১৪ দিন নিয়মিত চিত্র প্রেরণের পর সার্ভেয়ার চন্দ্ররাত্রির সম্মুখীন হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, চন্দ্ররাত্রি অতিক্রান্ত হবার পর মহাকাশযানটি আবার হয়তো সক্রিয় হয়ে উঠবে।

সার্ভেয়ার প্রেরিত আলোকচিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে এখন পর্যন্ত যে সব তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, তাতে জানা যায়—চন্দ্রপৃষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে ভস্ম দিয়ে ঢাকা নয়। চন্দ্রের বুকে মনুষ্যবাহী যান নিরাপদে অবতরণ করতে পারে; ক্ষুদ্র উল্কাখণ্ডের দ্বারা আহত হবার আশঙ্কা ছাড়াই মানুষ চন্দ্রপৃষ্ঠে পদচারণা করতে পারবে। 'ঝটিকা সমুদ্র' অঞ্চল, যেখানে সার্ভেয়ার অবতরণ করেছে, তা প্রায় পৃথিবীর সমতল ভূমির মত। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও বিবরণ পাওয়া যাবে।

ভারতে পরমাণুশক্তি কমিশনের নতুন কর্ণধার

ডাঃ হোমী জাহাঙ্গীর ভাবার অকাল ও আকস্মিক প্রয়াণে তাঁর স্থলাভিসিক্তরূপে ভারতের পরমাণুশক্তি কমিশনের অধিকর্তাপদে ভারত সরকার সম্প্রতি বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ বিক্রম সরাভাইকে নিয়োগ করেছেন।

বিজ্ঞানী হিসাবে ডাঃ সরাভাই স্বদেশ ও বিদেশে সুপরিচিত। জন্ম ১৯১৯ সালে আমেদাবাদে। বাবা বিশিষ্ট শিল্পপতি আম্বালাল এবং মা সরলা দেবীও বিশিষ্ট শিল্পপতির কন্যা। আমেদাবাদে তাঁদের একটি প্রাইভেট স্কুল আছে। পুত্র বিক্রমের ছোট বেলায় শিক্ষা সেখানেই হয়েছিল। তারপর গুজরাট কলেজে আই. এস. সি এবং বিদেশ যাত্রা। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সেন্ট জনস্ কলেজে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তিনি ১৯৩৯ সালে ট্রাইপোজ লাভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় স্বদেশে ফিরে এসে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ডাঃ সি. ভি. রামনের অধীনে ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্স-এ তিনি ৬ বছর গবেষণা করেন। ব্যাঙ্গালোরে

অবস্থান কালে ডাঃ ভাবার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে। এরপর কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে তিনি কিছুকাল গবেষণা করেন এবং ১৯৪৭ সালে সেখান থেকেই ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে আমেদাবাদে পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের মহাজাগতিক রশ্মি ও পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৬৫ সালে তার অধিকর্তার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্প গবেষণা সমিতির আংশিক সময়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৯৬২ সালে ডাঃ সরাভাই ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থার পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরমাণুশক্তি দপ্তর মহাকাশ গবেষণার জন্যে যে ভারতীয় জাতীয় কমিটি গঠন করেন, তার প্রথম সভাপতি হন ডাঃ সরাভাই। তিনি থুম্বায় রকেট উৎক্ষেপণ-ঘাঁটি এবং আমেদাবাদে পরীক্ষামূলকভাবে উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি স্টেশন স্থাপন করেন। তাঁরই উদ্যোগে ফ্রান্সের সহযোগিতায় এদেশে রকেট উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে।

পদার্থ-বিজ্ঞানে মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে ডাঃ সরাভাই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। সৌর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মহাজাগতিক রশ্মির তারতম্যের একটি নতুন সূত্র তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন। সৌরক্রিয়ার এগারো বছর-ব্যাপী চক্র এবং মহাজাগতিক রশ্মির দৈনন্দিন তারতম্যের সম্পর্ক সরাভাই এবং কেন্ (Kane) ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতার দৈনন্দিন পরিবর্তন ও তার শক্তি বর্ণালী এবং ভান্তঃ দেশের অবস্থার সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়েও তিনি গবেষণা করেন এবং এই বিষয়ে তাঁর একাধিক গবেষণা-নিবন্ধ আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

ডাঃ বিক্রম সরাভাই স্বদেশ ও বিদেশের বহু বিজ্ঞান সংস্থার সদস্য এবং একাধিক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৬২ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতিপদে বৃত হন এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে ভাটনগর স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' সম্মাননায় ভূষিত করেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ আছে। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী সরাভাই খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী।

ভারতে আর একটি রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র স্থাপন

নয়া দিল্লী থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্ব স্তরে আবহাওয়ার অবস্থা অনুশীলনের জন্যে শীঘ্রই দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আর একটি রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বর্তমানে বেলুনের সাহায্যে আকাশে রেডিও শোণ্ডি পাঠিয়ে আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের যে ব্যবস্থা আছে, তার পরিবর্তে এই কেন্দ্র থেকে রকেট উৎক্ষেপণ করে এই সব তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হবে।

এই রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্রের জন্যে বিভিন্ন ধরণের যে সব সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হবে, তা ক্রয় করবার জন্যে চতুর্থ যোজনায় ৩২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

বর্তমানে থুম্বায় যে রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র আছে, তাতে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে একটি শাখা আছে। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করবার জন্যে ইতিমধ্যেই থুম্বা কেন্দ্র থেকে কয়েকবার রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়েছে এবং বাতাস ও তাপমাত্রা সম্পর্কে তথ্যাদিও সংগৃহীত হয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনবিংশ বর্ষ অগাষ্ট, ১৯৬৬ অষ্টম সংখ্যা

বেতার-তরঙ্গ

বিশ্বরঞ্জন নাগ

শব্দ, আলো ও তাপ আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারি; কাজেই এই তিনটি শব্দের দ্বারা কি বোঝানো হয়, তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতিতে বিভিন্ন ভাবে এদের অজস্র উৎস ছড়িয়ে আছে এবং অহরহ এই তিন ধরণের শক্তিকে আমরা অনুভব করি। বেতার-তরঙ্গও এদের মতই এক ধরণের শক্তি। মেঘে যখন বিদ্যুৎ চমকায়, তখন আলো, তাপ ও শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বেতার-তরঙ্গেরও সৃষ্টি হয়। সূর্য এবং বিশেষ কতকগুলি তারকা থেকেও বেতার-তরঙ্গ প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। কিন্তু বেতার-তরঙ্গকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে পারি না বলে এর অস্তিত্বের কথা বহুকাল পর্যন্ত ছিল আমাদের অজানা। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, বিশেষভাবে তড়িতের গবেষণা থেকেই বেতার-তরঙ্গের খোঁজ পাওয়া গেছে।

বহু প্রাচীন কালেই গ্রীস দেশের বিজ্ঞানীরা ঘর্ষণজাত তড়িতের কথা জানতেন। কাচকে রেশম দিয়ে ঘর্ষণ করলে কাচের ছোট ছোট কাগজের টুক্‌রাকে টেনে নেবার ক্ষমতা জন্মে। কাচের এই ক্ষমতার জন্যে দায়ী হলো তড়িৎ। তড়িৎ দু-রকমের হতে পারে—ধনাত্মক ও ঋণাত্মক। কাচ ও রেশমে ঘর্ষণের ফলে যে তড়িৎ জন্মায় তা বিপরীত-ধর্মী। বিপরীত-ধর্মী তড়িৎযুক্ত বস্তু

পরস্পরকে কাছে টানে এবং একই রকমের তড়িৎযুক্ত হলে পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেয়। তড়িতের আকর্ষণের ফলেই তড়িৎযুক্ত কাচ কাগজের টুক্‌রাকে টেনে নিতে পারে। মনে হতে পারে—এই তড়িৎ ঘর্ষণ থেকেই উৎপন্ন হলো; কিন্তু পরমাণুতত্ত্বের দিক থেকে বলা যায় যে, তড়িৎ পদার্থেরই একটা বিশেষ অবস্থার প্রকাশ। পরমাণুর ইলেকট্রন ও প্রোটন স্বভাবতঃই বিপরীত-ধর্মী ও সমপরিমাণের তড়িৎগুণসম্পন্ন। সাধারণ অবস্থায় কোন বস্তুতে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান বলে মোট তড়িতের পরিমাণ হলো শূন্য এবং বস্তুর পরমাণুতে তড়িৎ থাকলেও তড়িতের অস্তিত্ব বোঝা যায় না। ঘর্ষণের সময়ে পরমাণুর ইলেকট্রন ও প্রোটনের কিছু অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কাচের কিছু ইলেকট্রন রেশমে চলে যায়। এর ফলে কাচে কিছু উদ্বৃত্ত প্রোটন থাকে এবং কাচ ধনাত্মক তড়িৎ-যুক্ত হয়। ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় রেশম ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত হয়। এভাবে ঘর্ষণের ফলে বস্তুর অন্তর্নিহিত তড়িৎই পুনর্বিন্যস্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

কোন তড়িৎযুক্ত বস্তুর নিকটে আর একটি তড়িৎযুক্ত বস্তু রাখলে পরস্পরের তড়িতের ধর্মানুসারে দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথম বস্তুটির কাছে আসবে বা দূরে সরে যাবে। এথেকে বলা যেতে পারে যে, তড়িৎযুক্ত পদার্থ তার চারপাশে একটি বলক্ষেত্র তৈরি করে। অন্য কোন তড়িৎ-যুক্ত পদার্থ এই ক্ষেত্রে এলে ক্ষেত্রের বলের দ্বারা পরিচালিত হয়। একটি ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত বস্তুকণা বলক্ষেত্রে যে পথে পরিচালিত হয়, তাকে বলা হয় বল-নির্দেশক রেখা (Lines of force)। ১নং চিত্রে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দুটি তড়িৎযুক্ত জিনিসের বলক্ষেত্র দেখানো হয়েছে। দুটি তড়িৎযুক্ত জিনিসকে কাছাকাছি রাখা হলে পরস্পরের প্রভাবে এদের তড়িৎ-ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। বস্তু দুটির তড়িতের পরিমাণ যদি সমান ও বিপরীত-ধর্মী হয় তাহলে যে বলক্ষেত্র হয়, তাকে বলা হয় তড়িৎ দ্বিমেরুর বলক্ষেত্র। ২নং চিত্রে তড়িৎ দ্বিমেরুর বলক্ষেত্র দেখানো হয়েছে।

১নং চিত্র
তড়িৎ বলক্ষেত্র

ঘর্ষণজাত তড়িতের কথা যেমন জানা ছিল, তেমনি বিজ্ঞানের প্রথম যুগ থেকেই চুম্বকের সঙ্গেও মানুষ পরিচিত ছিল। চুম্বকের দুই প্রান্তের চুম্বকত্ব বিপরীত-ধর্মী। তড়িতের ন্যায় বিপরীত-

ধর্মী চুম্বক পরস্পরকে কাছে টানে এবং সমধর্মী চুম্বক পরস্পরকে দূরে ঠেলে। পরস্পরের উপরে চুম্বকের প্রভাব সব দিক দিয়েই তড়িতের মত। তাই চুম্বকযুক্ত পদার্থেরও বলক্ষেত্র আছে এবং সেই বলক্ষেত্রে অন্য কোন চুম্বক রাখলে তার উপরে একটি বল কাজ করে। কিন্তু তড়িতের সঙ্গে চুম্বকের সামান্য পার্থক্য আছে—এক ধর্মের তড়িৎযুক্ত বস্তু হতে পারে, কিন্তু চুম্বকের সব সময়েই দুটি মেরু থাকে। তাই চুম্বকের বলক্ষেত্র হবে সব ক্ষেত্রেই তড়িৎ দ্বিমেরুর মত।

তড়িৎ আবার দু-ভাবে প্রকাশিত হতে পারে। ঘর্ষণজাত তড়িৎ বস্তুকে আশ্রয় করে অচলাবস্থায় থাকে। কিন্তু দুটি বিপরীত-ধর্মী তড়িৎযুক্ত পদার্থকে ধাতুর তার দিয়ে যোগ করে দিলে একের উদ্বৃত্ত ইলেকট্রন অপরের ইলেকট্রনের অভাব মেটাবার জন্যে তারের মাধ্যমে যাত্রা করে। খুব অল্প সময়ের জন্যে তারে কিছু ইলেকট্রন একই দিকে গতিশীল হয়। একে বলা হয় তড়িৎ-প্রবাহ বা সচল তড়িৎ। তড়িৎ-প্রবাহ সব রকমের পদার্থে চলতে পারে না। পরীক্ষায়

২নং চিত্র
তড়িৎ দ্বিমেরুর বলক্ষেত্র

দেখা যায় কতকগুলি পদার্থ, যেমন—কাচ, অভ্র ও এবোনাইটে তড়িৎ-প্রবাহ চলতে পারে না, আবার তামা, লোহা বা রূপায় খুব সহজেই তড়িৎ-প্রবাহ চলতে পারে। প্রথম পর্যায়ের পদার্থগুলিকে বলা হয়েছে অপরিবাহী (Insulator) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের পদার্থগুলিকে বলা হয়েছে পরিবাহী (Conductor)। পরমাণুতত্ত্বের দিক থেকে তড়িৎ-পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, পরিবাহী পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে আর অপরিবাহী পদার্থে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীনের সঙ্গেই বাঁধা থাকে। তাই পরিবাহী পদার্থে
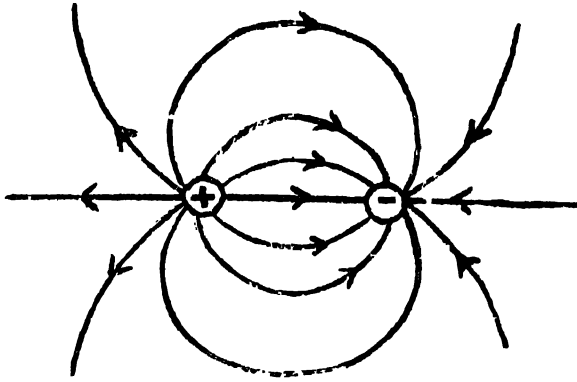
তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও এরা প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি ঘটনা। তড়িৎ ক্ষেত্রে তড়িৎযুক্ত এবং অন্যান্য পদার্থও বলের প্রভাবে আসে, কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্রে অন্য চুম্বক বা চুম্বক হতে পারে এরূপ বিশেষ ধরণের পদার্থ, যেমন—লোহা ও নিকেলই প্রভাবান্বিত হতে পারে। তড়িৎ ও চুম্বকের উৎপত্তিও হয় পরমাণুর গঠনের বিভিন্নতা থেকে। তড়িতের উৎপত্তি যেমন পরমাণুর গঠন থেকে বোঝা যায়, তেমনি পরমাণুর ইলেকট্রনের গতির বিশেষত্বই চুম্বক সৃষ্টি করে, কিন্তু কিভাবে এই চুম্বকের সৃষ্টি হয়, তার ব্যাখ্যা একটু জটিল এবং সহজে বোধগম্য নয়।

তড়িৎ যোগ করলে স্বাধীন ও চলনশীল ইলেকট্রনগুলির মাধ্যমে এই তড়িৎ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু অপরিবাহী পদার্থে ইলেকট্রনগুলি বাধা থাকায় তড়িৎ ছড়িয়ে পড়তে পারে না। অপরিবাহী পদার্থকে শুধু ঘর্ষণের মাধ্যমেই তড়িৎযুক্ত করা যায়, কিন্তু পরিবাহী পদার্থকে রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমেও তড়িৎযুক্ত করা যায়। সালফিউরিক অ্যাসিডে ছটি বিভিন্ন ধাতুর দণ্ডকে রেখে দিলে দণ্ড ছটিতে স্বতোৎসারিতভাবে তড়িৎ সঞ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে দণ্ড ছটিকে ধাতুর তার দিয়ে যোগ করলে দীর্ঘ সময় ধরে তড়িৎ-প্রবাহ চলতে পারে। এই ধরণের তড়িৎ-প্রবাহকে বলা হয় সম তড়িৎ-প্রবাহ (D. C.)। অচল তড়িতের সঙ্গে চুম্বকের কোন যোগাযোগ নেই, কিন্তু তড়িৎ-প্রবাহের সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্র ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কোন তারে তড়িৎ-প্রবাহ চললে তারটিকে ঘিরে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় (৩নং চিত্র)। ঐই চৌম্বক ক্ষেত্রের বল নির্দেশক রেখা বৃত্তাকারে তারটিকে আবেষ্টন করে ছড়িয়ে থাকে। সাধারণ চুম্বকের বলক্ষেত্রে যেমন কোন চুম্বক প্রভাবান্বিত হয়, এক্ষেত্রেও তেমনি হয়।

তড়িৎ-প্রবাহ চললে যেমন চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তেমনি আবার কোন চৌম্বক ক্ষেত্রে তারের বর্তনীকে (Loop) ঘোরালে তারের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ চলতে থাকে। এই তড়িৎ-প্রবাহ একদিকে চলে না, সময়ের সঙ্গে এর দিক ও জোর পরিবর্তিত হয় এবং এর নাম হলো পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ (A. C.)। ৪নং চিত্রে সম ও পরিবর্তী তড়িত-প্রবাহের বিশেষত্ব দেখানো হয়েছে। সম তড়িৎ-প্রবাহ সব সময়ে একই দিকে একই রকম জোরে প্রবাহিত হতে থাকে। পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহে প্রবাহের জোর শূন্য (ক) থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে একটি উচ্চ সীমায় (খ) পৌঁছায়—তারপর আবার কমতে থাকে, কমে কমে শূন্য মাত্রায় (গ) পৌঁছায় এবং দিক পরিবর্তন করে উল্টোদিকে চলতে থাকে। ক্রমান্বয়ে বেড়ে বেড়ে উল্টোদিকের তড়িৎ-প্রবাহ
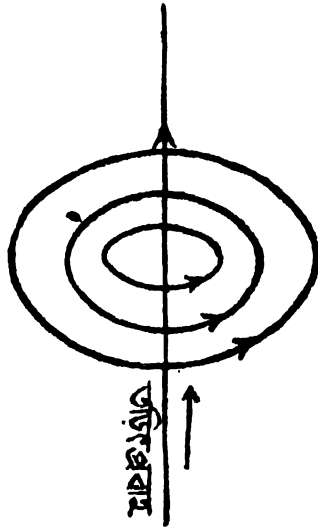
৩নং চিত্র
তড়িৎ-প্রবাহের চৌম্বক ক্ষেত্র

একটি উচ্চ সীমায় (ঘ) আসে। তারপরে আবার কমে কমে শূন্য মাত্রায় (ক) পৌছায়। এই ক্রমপরিবর্তন বার বার হতে থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে যতবার পরিবর্তিত হয়, তাকেই বলা হয় পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহের কম্পনাঙ্ক।

মিলিত বলক্ষেত্র দেখানো হয়েছে। তারটিতে তড়িৎ-প্রবাহের যখন দিক পরিবর্তন হয়, তখন তড়িৎ দ্বিমেরুও দিক পরিবর্তন করে। কাজেই ভাবা যেতে পারে, তড়িৎ ও চৌম্বক বলক্ষেত্রও দিক পরিবর্তন করবে। ভাবা যেতে পারে যে,
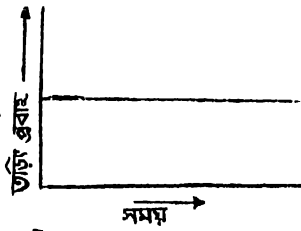
সমতড়িৎ প্রবাহ
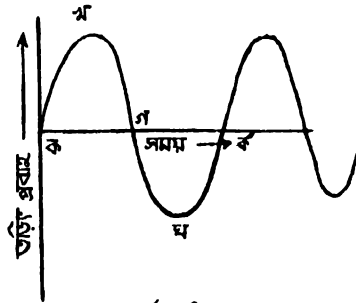
পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহ

৪নং চিত্র
সম ও পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ

পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ যেমন ধাতুর তারের মাধ্যমে চলতে পারে, তেমনি আবার অপরিবাহী পদার্থ—এমন কি, শূন্যের মধ্যেও চলতে পারে। কোন পরিবর্তী তড়িত-প্রবাহ উৎপাদক যন্ত্রের দুই প্রান্তে কিছুটা লম্বা তার জুড়ে দিলে (৫নং চিত্র) তড়িৎ-প্রবাহ উৎপাদক যন্ত্র থেকে আরম্ভ করে তার ও পারিপার্শ্বিকের শূন্যের মধ্য দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ করে চলতে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে তড়িৎ-প্রবাহ যখন চলে, তখন তারের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহ থাকে, কিন্তু তারের প্রান্তে জমা থাকে তড়িৎ। ফলে তড়িৎ-প্রবাহ ও তড়িৎ দ্বিমেরু সম্মিলিতভাবে অবস্থান করে। তাই পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহের বলক্ষেত্র হয় তড়িৎ ও চুম্বকের মিলিত বলক্ষেত্র। তড়িৎ বলক্ষেত্র হবে তড়িৎ দ্বিমেরুর মত এবং চৌম্বক ক্ষেত্রে সরল তারে স্থির তড়িৎ-প্রবাহ চালালে যে চৌম্বক বলক্ষেত্র হয়, তার অনুরূপ। ৫নং চিত্রে এই

একটি সীমিত তারে পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহ চালালে তার চারপাশে এক তড়িৎ-চৌম্বক বলক্ষেত্র হবে, যা তড়িৎ-প্রবাহের দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্তন করবে।

ম্যাক্সওয়েল প্রথমে গণিতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করেন যে, উপরের অনুমান সত্য নয়। বলক্ষেত্রের শুধুমাত্র দিক পরিবর্তন হবে না—অচল তড়িৎ দ্বিমেরু ও তড়িৎ-প্রবাহের বলক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত আর এক ধরণের বলক্ষেত্র হবে। এই বলক্ষেত্র অনেক দূর বিস্তৃত হবে এবং দূরের জায়গায় পৌছুতে কিছু সময় নেবে। বলা যেতে পারে, তারটির সংলগ্ন তড়িৎ-চৌম্বক বলক্ষেত্র যেন তারটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার চারপাশের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে (৬নং চিত্র)। ছড়িয়ে পড়বার গতিবেগ মাধ্যমে আলোর গতিবেগের সমান। এই গতিশীল তড়িৎ-চৌম্বক বলক্ষেত্রই হলো বেতার-তরঙ্গ। ম্যাক্সওয়েলই প্রথমে তড়িৎ

ও চৌম্বক বলক্ষেত্রের স্বরূপ নিয়ে গবেষণা করে বেতার-তরঙ্গ আবিষ্কার করেন। এই তরঙ্গের কথা ম্যাক্সওয়েলের আগে কেউ চিন্তা করেন নি। পরবর্তী কালে হার্ৎজ প্রথমে পরীক্ষাগারে বেতার-তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণিত করেন। বর্তমান কালে হার্ৎজের পরীক্ষাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খুব জোরালো বেতার-তরঙ্গ আজ সৃষ্টি করা সম্ভব, যা বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। গবেষণা থেকে বেতার-তরঙ্গের বিভিন্ন গুণাগুণও জানা গেছে।

আজ জানা গেছে, বেতার-তরঙ্গ আলো ও বিকিরিত তাপের সমগোত্রীয়। এই তিন ধরণের তরঙ্গই মূলতঃ এক, তফাৎ শুধুমাত্র কম্পনাঙ্কের। বেতার-তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক বেশী হলে আমরা চোখে অনুভব করতে পারি এবং তাকেই বলি আলো। আবার কম্পনাঙ্ক মাঝামাঝি হলে আমরা ত্বক দিয়ে অনুভব করতে পারি এবং তাকে বলি তাপ। কম কম্পনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গকে আমরা অনুভব করতে পারি না। কিন্তু বৈদ্যুতিক যন্ত্রে এই বেতার-তরঙ্গের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। আবার
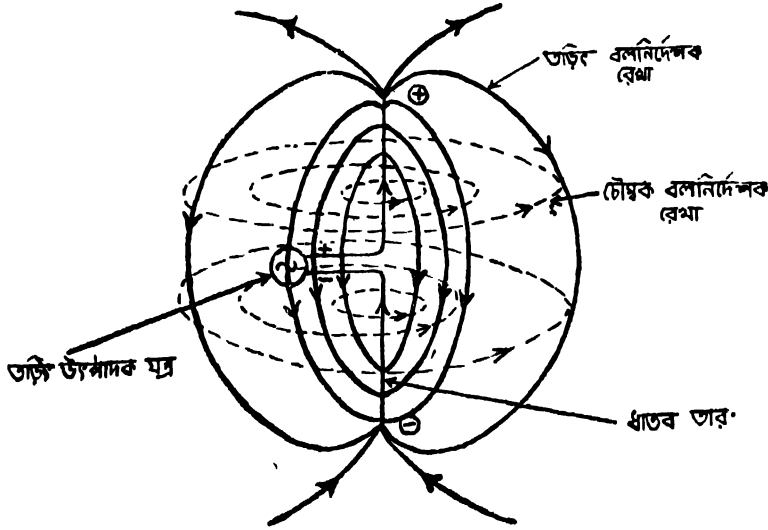
৫নং চিত্র
পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহের বলক্ষেত্র
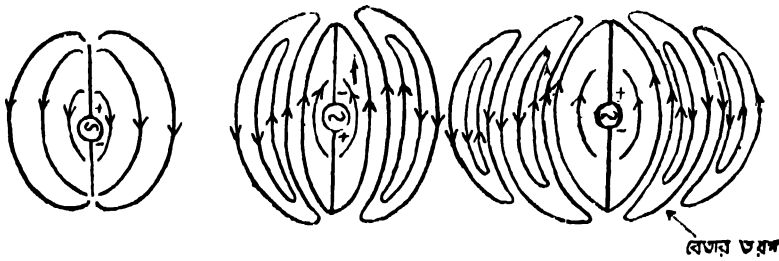
৬নং চিত্র
পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহের বলক্ষেত্রের বিস্তার
(শুধুমাত্র তড়িৎ-ক্ষেত্র দেখানো হয়েছে)

বেতার-তরঙ্গকে সহজে সৃষ্টি করে তার জোর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কোন শব্দ বা আলোর পরিমাণ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। অন্যভাবে বলতে গেলে বেতার-তরঙ্গের উপরে শব্দ বা আলোর ছাপ ফেলে দেওয়া যায়। কাজেই বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে আলো ও শব্দকে বহু দূরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে—কেন না, বেতার-তরঙ্গ আলো ও শব্দের চেয়ে অনেক দূর সহজেই বিস্তৃত হয়। বেতার-তরঙ্গের এই গুণই সম্ভব করেছে রেডিও ও টেলিভিশন। এর ফলেই বেতার-তরঙ্গ আজ সভ্যজগতের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

জীবন জিজ্ঞাসা

কুণাল রায়

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের মনে এক চিরন্তন প্রশ্ন—প্রাণ কি? জীবন কি?—আর এই প্রশ্ন থেকে সৃষ্টি হয়েছে বহু দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্যের। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিকেরা আরও একটি নতুন প্রশ্ন জুড়েছেন—এই প্রাণ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা? কেন না, অধুনা বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণাগারে কয়েকটি অভূতপূর্ব পরীক্ষায় পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হলো কেমনভাবে, এই তত্ত্ব যাচাই করতে উদ্যোগী হয়েছেন। বিশ্বের অচেতন জড় পদার্থগুলি কি ভাবে চেতনাসম্পন্ন জৈব পদার্থে রূপান্তরিত হলো, তারই সম্ভাব্য পথ আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়ে তাঁরা বর্তমানে প্রাচীনতম কোষ-সদৃশ বস্তু নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন, যার মধ্যে সজীব কোষের কিছু কিছু ধর্ম রয়েছে। বহু প্রাচীন কালে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি ক্রমাগত মিথেন, জলীয় বাষ্প, অ্যামোনিয়া এবং সম্ভবতঃ কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উদ্গীরণ করতো এবং এই সব গ্যাসই সৃষ্টি করলো পৃথিবীর প্রথম বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুতে এভাবেই ছিল জীবন গঠনের চারটি মৌলিক উপাদান—কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন। যদিও এই বায়ু ছিল যে কোন জীবের পক্ষে বিষাক্ত এবং তা ক্রমাগত অতিবেগুনী রশ্মি ও ক্রমাগত বজ্রপাতের ফলে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে লাগলো।

গ্রীসের অ্যানাক্সাগোরাসের (খৃঃ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) ধারণায় পৃথিবীতে জীবন ছোট ছোট বীজগুটির (Spermata) আকারে বৃষ্টিবাহিত হয়ে নেমে আসে। ১৯২৪ সালে রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক এ. আই. ওপারিন বলেন—জড় পদার্থগুলির বহুকাল ধরে জৈব পূর্ব-যুগের বিবর্তনের ফলে সম্ভবতঃ সজীবতা বা জৈব-পদার্থের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর তত্ত্বে তিনি দেখান যে, কি ভাবে প্রাচীন পৃথিবীর অতি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন প্রাণের মূলগত গুণসম্পন্ন অণুর সৃষ্টি করতে পারে। তিন বছর পরে অধ্যাপক জে. বি. এস. হলডেন লেখেন যে, যদিও জীবাণুর (Microorganism) দ্বারা ঐ সব বস্তুগুলির ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল, তথাপি ওগুলি নিশ্চয়ই জীবন সৃষ্টির পূর্বে সঞ্চিত হয়েছিল। যখন আদিম মহাসাগরগুলি গরম পাতলা জেলীর মত ঘনত্ব পেল, তখন ঐ সব সমুদ্রের উপরিভাগে অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে অজৈব পদার্থ বা যৌগিক পদার্থগুলি ধীরে ধীরে

জৈব অণু অর্থাৎ কার্বন-যুক্ত অণুতে রূপান্তরিত হতে লাগলো।

১৯৫০ সালে এসব ধারণা তাত্ত্বিকের আরামকেদারা থেকে ঘরে এসে গবেষণাগারের বাস্তব পরীক্ষার সম্মুখীন হলো। ডাঃ মেলভিন কেলভিন দেখান যে, সাইক্লোট্রন থেকে প্রাপ্ত মহাজাগতিক রশ্মি-সদৃশ অতিশয় শক্তিসম্পন্ন কণিকার দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের একটি মিশ্রণকে প্রচণ্ড আঘাত করায় কিছু জৈব-যৌগিকের সৃষ্টি হয়। ডাঃ হ্যারল্ড উরে (পারমাণবিক বিজ্ঞানী, সিকাগো) যুক্তি দেন যে, মিথেন, অ্যামোনিয়া এবং হাইড্রোজেন সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রাচীনতম বায়ুমণ্ডলের উপাদান ছিল। এই সব জড় যৌগিক পদার্থগুলিকে যদি একটি ফ্লাস্কে রেখে বজ্রবিদ্যুতের মত ক্রমাগত বিদ্যুতাঘাত দেওয়া যায়, তবে কিছু মৌলিক রূপান্তর দেখা যেতে পারে। ১৯৫৩ সালে তাঁর ছাত্র ষ্ট্যানলি মিলার এই মৌলিক পরীক্ষা করেন এবং সবিস্ময়ে দেখেন যে, কিছু অ্যামিনো অম্ল তৈরি হয়েছে। অ্যামিনো অম্লগুলির সমন্বয়েই প্রোটিন জাতীয় পদার্থের, তথা জীবনের সৃষ্টি হয়। জীবনের মূল চারটি মৌলিক পদার্থ—কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন, প্রত্যেক অ্যামিনো অম্লের মধ্যে এমনভাবে সন্নিবদ্ধ থাকে যে, প্রতিটি অণুতে দুটি বিপরীত-ধর্মী মূলক (Group) বিপরীত-ধর্মী তড়িৎবিশিষ্ট হওয়ায় একরূপ সাম্য ও স্থায়িত্ব বা দৃঢ়তার সৃষ্টি করে, যেন দুটি কুস্তিগীর একটি সমযুদ্ধে সংবদ্ধ হয়ে আছে—

$$NH_2.CH_2.COOH \rightleftharpoons {}^{+}NH_3\ CH_2\ COO^{-}$$

গ্লাইসিন — অ্যামিনো অম্ল
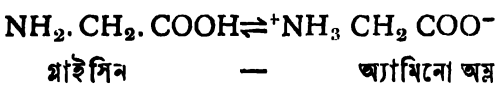
এই সমস্ত স্থায়ী অ্যামিনো অম্ল বা অ্যাসিডগুলি প্রাচীন পৃথিবীর সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটিয়ে উঠে চেতন ও অচেতনের মধ্যে সেতুরূপে টিকে থাকে। পরবর্তী পরীক্ষাগুলি থেকে দেখা যায় যে, 'জীবন'-এর মূল উপাদান এই সব অ্যামিনো অম্লগুলি অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তি, যেমন—রঞ্জেন রশ্মি (X-ray), মহাজাগতিক রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি এবং আগ্নেয়গিরির উত্তাপের দ্বারাও সৃষ্ট হতে পারে। বিরাট প্রোটিন অণুগুলি (যা যাবতীয় জীবদেহেরই উপাদান) প্রকৃতপক্ষে বহু অ্যামিনো অম্লের একটি শৃঙ্খল মাত্র। এখন প্রশ্ন এই যে, এই অ্যামিনো অম্লগুলি কিভাবে জুড়ে যায় এবং কিভাবে পাকানো অতিকায় প্রোটিন-অণুগুলি জীবকোষের সৃষ্টি করে? অতিকায় প্রোটিন-অণুগুলির অকল্পনীয় সৌষ্ঠব ও গঠন বোধ হয় প্রকৃতির মহত্তম স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। রক্তের অপরিহার্য প্রোটিন হিমোগ্লোবিনের একটি অণুতে ৮৯৫৪টি পরমাণু অপরূপভাবে বিন্যস্ত রয়েছে, প্রত্যেকটি জীবকোষে প্রোটিনই মূল উপাদান। এখন প্রশ্ন এই যে, যখন কোনও জীবকোষেরই অস্তিত্ব ছিল না, তখন প্রথম প্রোটিনের সৃষ্টি হলো কি ভাবে? ডাঃ জর্জ ওয়াল্ড্ (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়) অনুমান করেন যে, প্রাকৃতিক পরিবেশেই সম্ভবতঃ এমন অবস্থা রয়েছে, যার প্রভাবে অ্যামিনো অম্লগুলি রাখলে আপনা থেকেই তার উত্তর পাওয়া যাবে। ডাঃ সিডনি ফক্সই এই উত্তর পেতে প্রথম এগিয়ে আসেন। একটি অদ্ভুত ঘটনা দেখা গেল—যখন অ্যামিনো অম্লের দ্রবণকে শুকোতে দেওয়া হলো। তাঁদের ধারণা ছিল, অ্যামিনো অম্লের দ্রবণ নিশ্চয়ই প্রাচীনকালে উত্তপ্ত শুষ্ক জায়গায় পড়ে কোনভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল। দেখা গেল, উত্তপ্ত টেস্ট টিউবের গায়ে যখন অ্যামিনো অম্লের দ্রবণের জলটুকু বাষ্প হয়ে উবে যায়, তখন অ্যামিনো অম্লের অণুগুলি জুড়ে গিয়ে লম্বা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সুতার মত পদার্থের সৃষ্টি করে; এগুলির কোন কোনটির মধ্যে শত শত অণু পর পর জুড়ে রয়েছে। এদের নাম দেওয়া হলো প্রোটিনয়েড। হরেক রকমের প্রোটিনকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে আমরা প্রায় ২০টি মুখ্য অ্যামিনো অম্ল পেয়ে থাকি। সব রকমের জীবদেহে

বিভিন্ন প্রকার প্রোটিনের আদিম উপাদানই এই ন্যূনাধিক বিশটি অ্যামিনো অম্ল। সংযোজন সজ্জায় অদল-বদল করেই এরা তৈরি করে বিভিন্ন প্রকার অসংখ্য প্রোটিন-বস্তু। সুতরাং একটি মূল প্রশ্নের উত্তর মিললো যে, অ্যামিনো অম্লগুলি নিজেরাই কোনও নির্দিষ্ট পরিবেশে সংযোজিত হয়ে প্রোটিন-সদৃশ বস্তু নির্মাণে সক্ষম।

এখন তাহলে চূড়ান্ত প্রশ্ন এই যে, প্রোটিন কিভাবে আবার মিলিত হয়ে জীবকোষের সৃষ্টি করে—যে জীবকোষ (Cell) জীবনের ক্ষুদ্রতম প্রকাশ এবং যার মধ্যে লক্ষ পরমাণু ও অণু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে কোন এক নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সুবিন্যস্ত রয়েছে? এটা নিশ্চিত যে, জীবকোষের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই প্রোটিনের আবির্ভাব ঘটেছে এবং ডাঃ কেলভিনের ধারণা অনুযায়ী এই সময়টা প্রায় ২০০০ নিযুত বছর।

আবার পরীক্ষা সুরু হলো, এবারেও সেই ডাঃ ফক্স। তিনি হাওয়াই দ্বীপের আগ্নেয়গিরির লাভায় সৃষ্ট একটি জায়গায় আরোহণ করে দেখলেন যে, ভূত্বকের ঠিক অল্প নীচেই বিরাট এলাকা জুড়ে আজও যথেষ্ট গরম রয়েছে। হয়তো প্রাচীন পৃথিবীর এই রকম উত্তপ্ত ভূত্বকই জীকোষের গর্ভাধারের কাজ করে থাকবে। ডাঃ ফক্স কিছু লাভার ডেলা গবেষণাগারে আনেন এবং তাদের উপর মিথেন, অ্যামোনিয়া ও জল থেকে তৈরি অ্যামিনো অম্ল ঢেলে দেন। সমস্ত জিনিষটিকে জীবাণুমুক্ত করে নিয়ে তিনি তাদের একটি কাচের মধ্যে ১১০° সে.-এ উত্তপ্ত করেন। এই ১১০° সে. হাওয়াই দ্বীপের ঐ জায়গার মাটির চার ইঞ্চি নীচের উত্তাপ। যখন বস্তুগুলিকে ঠাণ্ডা করা হলো, তখন বাদামী রঙের একটি আঠালো পদার্থকে লাভার গায়ে লেগে থাকতে দেখা গেল। ঐ আঠালো পদার্থটিকে জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রাখতেই এক অপরূপ দৃশ্য দেখা গেল—এক আশ্চর্যজনক অসংখ্য গোলাকার বস্তু ভেসে বেড়াচ্ছে। এগুলি দেখতে এবং কিছু কিছু গুণগত ধর্মেও প্রাচীন সরল বীজাণু (Bacteria) সদৃশ এবং নীল-সবুজ এককোষী প্রাণী Algea-এর (এক ধরণের Bacteria) মত গায়ে গায়ে লেগে লম্বা সুতার আকারে থাকে। অতএব দেখা গেল, অ্যামিনো অম্লগুলি সংযুক্ত হয়ে প্রোটিনয়েডের সৃষ্টি করে, যারা আবার জুড়ে গিয়ে এই ছোট ছোট গোলাকার বস্তুগুলির জন্ম দেয়—ডাঃ ফক্স যার নাম দেন মাইক্রোস্ফিয়ার। অবশ্য এই গোল বস্তুগুলি মোটেই জীবকোষ নয়, কেন না জীবন-বৃত্তির অনুশীলন থেকে আমরা বর্তমানে জানি যে, কোষের মধ্যে প্রোটিন ছাড়া আরও একপ্রকার অম্লাত্মক অতিকায় অণু আছে, যাদের প্রকৃতি ও গঠন অনুযায়ী দু'ভাগ করে নাম দেওয়া হয়েছে D. N. A ও R. N. A। D. N. A অণুগুলি R. N. A অণু অপেক্ষা অনেক গুণ বড়, D. N. A-এর আণবিক ওজন কুড়ি হাজার কোটি। এরা উভয়েই Ribose নামে শর্করা, ফস্‌ফরিক অম্ল ও কতকগুলি জৈব ক্ষারের (মূলতঃ Adenine, Thymine, Uracil, Eytosin, Guanine) সমন্বয়ে তৈরি। বিজ্ঞানীরা এখন সন্দেহাতীতভাবে এই ধারণায় উপনীত হয়েছেন যে, D. N. A. এবং R..N.A-ই সৃষ্টি-রহস্যের মূল চাবিকাঠি এবং D. N. A-গুলি তথাকথিত ক্রোমোসোমস্থিত জিন এবং প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সৃষ্টির নিয়ামক।

আমরা যদি কোন জীবকোষের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে, এর মধ্যে রয়েছে প্রচুর জল। তাছাড়া প্রধান সাংগঠনিক উপাদান হিসাবে রয়েছে প্রোটিন, যা কোষের অভ্যন্তরে জেলীর মত সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কোথাও রয়েছে রাইবোসোম হিসাবে, কোথাও জারক (এন-জাইম) হিসাবে কোথাও বা মাত্র কোষের দেয়াল গঠনের উপাদানরূপে। Ribosome-

(প্রোটিন ও R. N. A.-এর মিলিত একটি রূপ) গুলি নতুন প্রোটিন স্বষ্টির পক্ষে অপরিহার্য। আবার জারকগুলিও কোষের অভ্যন্তরস্থ বহু প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার জৈব অনুঘটক। এছাড়া আর যে বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু থাকে—তা হলো D.N. A. ও R. N. A.। অসংখ্য অ্যামিনো অম্ল কিভাবে পর পর যুক্ত হবে, এই সংযোজন বিন্যাসই নির্ধারণ করবে নতুন উদ্ভূত প্রোটিনের জৈব গুণাবলী ও কাজ। আর এই সজ্জা বা বিন্যাস সাধিত হয় D. N. A., R. N, A. ও প্রোটিনের প্রভাবে।

সংখ্যা বৃদ্ধি করা অর্থাৎ নতুন D. N. A.-এর জন্ম দেওয়া, দ্বিতীয়তঃ কোষের অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য সব প্রক্রিয়া ঘটানো ও নিয়ন্ত্রিত করা। এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে একে তিন প্রকারের (Messenger, Transfer, Ribosomal) R. N. A. স্বষ্টি করতে হয়। তারপর এই তিন প্রকারের R. N. A. মিলে স্বষ্টি করে প্রোটিন। এই প্রোটিন সাংগঠনিক হতে পারে বা জারকও হতে পারে। কি ধরণের প্রোটিন হবে, তার নির্দেশও D. N. A.-এর কাছ থেকেই আসে। জারকগুলি বাইরে থেকে আগত বিভিন্ন
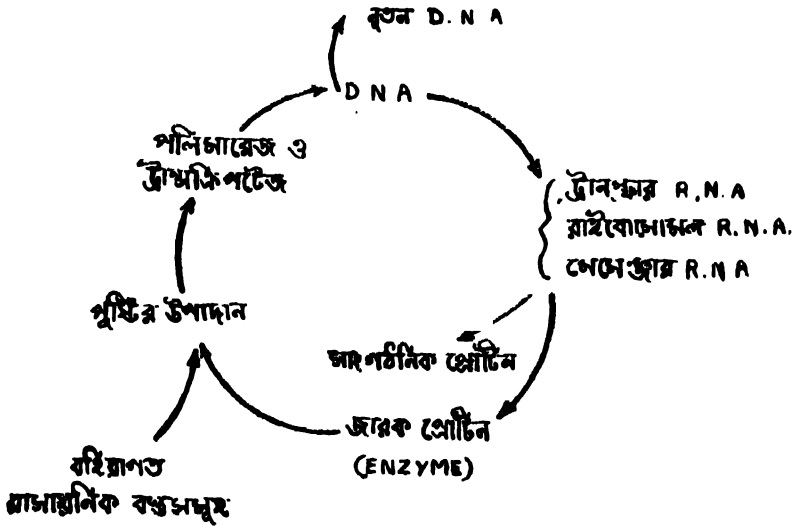
১নং চিত্র

জীবকোষের প্রাণবৃত্তিকে এখন এক স্বয়ংক্রিয় কারুশালার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বহু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হয় নতুন কোষের জন্ম বা নতুন প্রোটিনের স্বষ্টি—সমস্ত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কাজের মত একটির পর একটি প্রক্রিয়া ঘটতে থাকে। আর এই সব স্বষ্টি-প্রক্রিয়ার মূল বা নিয়ামক হচ্ছে D. N. A. (সমস্ত ব্যাপারটিকে ১নং চিত্রে বর্ণনা করা হয়েছে)। D. N. A.-এর দুটি কাজ—প্রথমতঃ নিজের রাসায়নিক বস্তুগুলিকে পুষ্টিকর উপাদানে রূপান্তরিত করে এবং তারপরে এই রসদ যোগান দেয় D. N. A.-এর মূল দুটি কারুশালা—Polymerase (যেখানে বহুযৌগিক ক্রিয়া হয়) ও Transcriptase-এ। অবশ্য কোষের ভিতরের ব্যাপার, চিত্রের বা উপরের বর্ণনার চেয়ে আরও অনেক বেশী ব্যাপক ও জটিল, তবে মোটামুটিভাবে প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়গুলি ঐরূপ।

এখন এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে যদি আমরা কোনও কোষ তৈরি করতে প্রয়াসী হই, ঠিক যেভাবে আমরা ঘড়ি জুড়ি, সেইভাবে বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদা তৈরি করে জুড়ে তারপরে যদি দম দিয়ে চালিয়ে দেব বলে মনে করি, তবে নিশ্চয়ই আমরা কোন দিনই তা করতে সক্ষম হবো না, বরং অনেক বেশী সহজ এই ধারণা করা যে—কোন মতে কোনও এক নির্দিষ্ট অবস্থার প্রভাবে আদিম কোষ-সদৃশ বস্তু তৈরি করে তারপরে তার বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা, অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশে যে সব বিবর্তন ঘটতে হাজার হাজার বছর লেগেছে, গবেষণাগারে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে সেই বিবর্তনকে কয়েক ঘণ্টায় ঘটানো। অবশ্য হয়ার বণ্টন এবং ম্যাকার্থির কাজ থেকে বর্তমানে এই আশা জাগে যে, হয়তো আমরা আদিম কোষ খুঁজে পাব। তাদের কাজের মধ্য দিয়ে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, D. N. A. প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষিত হয়ে আছে কোষের মধ্যে। কোষের ভিতরকার D. N. A.-কে অটুট রাখবার প্রয়োজনীয়তা কোষের পক্ষে এত বেশী যে, ঐ D. N. A. যে কোনও প্রকার ধ্বংস বা অপসারণের হাত থেকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষিত হয় এবং এই D. N. A. সঞ্চয় প্রবৃত্তির ফলে হয়তো বর্তমানে কোনও কোনও কোষ দেখা যেতে পারে, যার মধ্যে হয়তো D. N. A. তার সেই প্রাচীনতম রূপে বর্তমান। বর্তমানে নিষ্ক্রিয় এরূপ কোষের সন্ধান ও বিশ্লেষণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আমরা ধারণা করতে পারবো D. N. A.-এর কত প্রাচীন রূপ আমরা পেতে পারি এবং সেই চেহারা কিরূপ। আর সেই ধারণা থেকে আমরা সেই প্রাচীন D. N. A., যা অনেক সহজ ও সরল-গঠনের, তৈরি করতে সক্ষম হবো, যা অতি প্রাচীন কোষরূপে কাজ করবে। প্রকৃতপক্ষে এটাও সম্ভব যে, কোষগুলির অতি প্রাচীন পর্যায়ে হয়তো D. N. A., R. N. A. ও প্রোটিন—এই তিনের জটিল কার্যকলাপ ছিল না। এই সব তথ্য যাচাই করে তারপরে আমাদের সরলতম বস্তুটি (কোষ) তৈরি করতে হবে। তারপরে রূপান্তর বা বিবর্তনের যে সব পর্যায় ও পদ্ধতিতে D. N. A.-এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে, সেই পথগুলি জেনে প্রয়োজনমত বিভিন্ন বস্তু সংযোজন করতে হবে, যাতে লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই করতে সক্ষম হবো। এই একমাত্র পন্থা যা নতুন কোষ, জীবন বা প্রাণ সৃষ্টির কৃত্রিম উপায়রূপে ভাবা যেতে পারে।

টেলিভিসন

অনিলকুমার ঘোষাল

বর্তমান যুগকে টেলিভিসনের যুগ বললে অত্যুক্তি করা হয় না। ১৯৩৬ সালে আলেক-জান্ড্রা প্যালেস থেকে বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন কর্তৃক প্রথম টেলিভিসনের প্রচার সুরু হয়। তারপর থেকে টেলিভিসনের জনপ্রিয়তা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষে টেলিভিসন কেন্দ্র চালু হয় ১৯৫৯ সালে দিল্লীতে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কলকাতাতেও টেলিভিসন কেন্দ্র খোলবার কথা রয়েছে।

কিন্তু টেলিভিসন কি? ধরুন, ঘরে দু'জন বসে দূরের ষ্টুডিওর কোন অনুষ্ঠান দেখছেন। যে যান্ত্রিক কৌশলে কোন দৃশ্য বা বস্তুর ছবি স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমা থেকে বহুদূরে অবস্থিত কোন স্থানে দেখা সম্ভব হয়, তাকে টেলিভিসন বলা যায়। টেলিভিসনে রেডিওর মত শব্দও ছবির সঙ্গে পাঠানো হয়ে থাকে।

টেলিভিসনের সূত্রপাত হয় ১৮৮৪ সালে, যখন জার্মান বৈজ্ঞানিক পাওল নিপকাও ছবি কিভাবে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পাঠানো সম্ভব—তার ধারণা দেন। কিন্তু তখন কারিগরীবিদ্যা এতটা উন্নত হয় নি যাতে সেই ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়। ১৯২৭ সালে স্কটল্যাণ্ডের জন লগি বেয়ার্ড লণ্ডনে রয়াল সোসাইটির সভ্যদের প্রথম টেলিভিসন দেখান। লণ্ডনের সাউথ কেনসিং-টনের বিজ্ঞান যাদুঘরে প্রথম টেলিভিসন যন্ত্রটি এখনও রক্ষিত আছে। ১৯৩৬ সালে লণ্ডনে বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন টেলিভিসন প্রচার সুরু করেন। ১৯৪১ সালে আমেরিকায় টেলিভিসন প্রচার আরম্ভ হয়। তারপর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে টেলিভিসন কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

বর্তমান প্রবন্ধে টেলিভিসনের কার্য-প্রণালী ও ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

তরঙ্গ

টেলিভিসনের কার্যপ্রণালী বুঝতে গেলে তরঙ্গ সম্পর্কে দু-একটি কথা জানা দরকার। পুকুরের জলে একটি ঢিল ফেললে ঢিলটি যেখানে পড়ে, সেখান থেকে চারদিকে জলের উপর ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। তেমনি আমরা যখন কথা বলি, তখন গলার পর্দায় কাঁপুনিতে বাতাসে শব্দের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। সেই ঢেউ কানের পর্দায় আঘাত করলে কানের পর্দা সেই ভাবে কাঁপে। আমরা তখন কথা শুনতে পাই। চোখ দিয়ে আমরা কোন জিনিষ দেখতে পাই তার কারণ, তাথেকে আলোর ঢেউ আমাদের চোখে আসে বলে। জলের ঢেউ বা শব্দের ঢেউ এবং আলোর ঢেউয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত একটা বড় তফাৎ আছে। জলের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় জলে, আর শব্দের ঢেউ ওঠে বাতাসে। সেখানে জল নড়ে এবং বাতাসও কাঁপে। কিন্তু আলোর ঢেউয়ের বেলায় এরকম কোন কিছুর দরকার হয় না। শূন্য স্থানেও আলোর ঢেউয়ের সৃষ্টি সম্ভব। আলোর ঢেউ জল বা বাতাসের মধ্য দিয়ে গেলে জল নড়ে না বা বাতাস কাঁপে না, কিন্তু ঢেউ ঠিকই বয়ে যায়। সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে আসবার পথে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে শূন্য। জল, বাতাস কিছুই নেই। তবু আলোর ঢেউ ঠিকই আসে।

আমরা কথা বললে বাতাসে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, তা কিছু দূর গিয়েই মিলিয়ে যায়। দূরত্বের সঙ্গে-শব্দের বিস্তার ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং এভাবে কমতে কমতে একটা দূরত্ব আসে, যার পর আর শব্দ শোনা যায় না। আলোর বেলায়ও তাই।

শব্দ কি করে দূরে পাঠানো হয়

মাইক্রোফোন নামক একটি যন্ত্রের সামনে কোন শব্দ উৎপন্ন হলে বায়ুতে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তা মাইক্রোফোনের একটি বিশেষ পর্দায় আঘাত করে। পর্দাটিতে সাধারণতঃ গুঁড়া কার্বন মাখানো থাকে। লাউড স্পীকারে পাঠানো হয়। লাউডস্পীকারে একটি চুম্বকের নিকটস্থ তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ঐ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। ফলে কুণ্ডলীটি আন্দোলিত হতে থাকে ও কুণ্ডলীসংলগ্ন একটি বিশেষ কাগজের চোঙা নড়তে থাকে। লাউড স্পীকারের সম্মুখস্থ বায়ুতে এর ফলে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঐ শব্দ প্রেরক যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সম্মুখস্থ শব্দের অনুরূপ।

টেলিভিসনের ক্ষেত্রে একই ধরণের কৌশলে শুধু শব্দই নয়, ছবিও একস্থান থেকে বহুদূরের স্থানে পাঠানো যেতে পারে। প্রথমে আলোক-তরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিবর্তন, সেই তরঙ্গকে
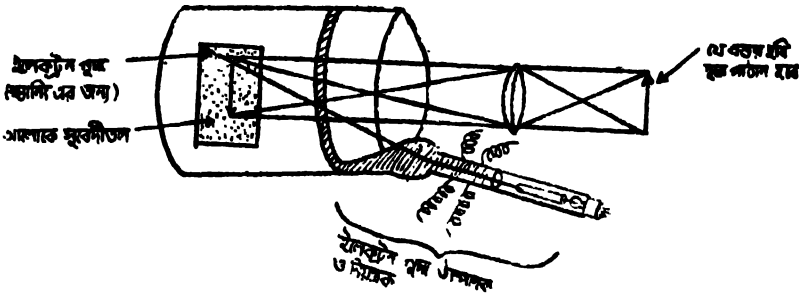
১নং চিত্র

আইকনোস্কোপ নামক ক্যামেরা-চোখ

এখানে শব্দ-তরঙ্গ বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে পরিবর্ধিত করে একটি বাহক তরঙ্গের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। বাহক তরঙ্গটি মূল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অপেক্ষা অনেক দ্রুত স্পন্দনশীল। এইবার সমগ্র তরঙ্গটি এরিয়েলের সাহায্যে বেতার-তরঙ্গরূপে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দ্রুত কম্পনশীল তরঙ্গ ব্যবহারের সুবিধা এই যে, অনেক বেশী দূর না গেলে এর বিস্তার বিশেষ কমে না। গ্রাহক যন্ত্রের এরিয়েলে ঐ বেতার-তরঙ্গ গৃহীত হলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে তার রূপান্তর ঘটে। ঐ তরঙ্গ থেকে বাহক তরঙ্গটিকে বাদ দিয়ে মূল বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে পরিবর্ধিত অবস্থায় দ্রুত কম্পনশীল বাহক তরঙ্গের উপর উপস্থাপন করে এরিয়েলের সাহায্যে বেতার-তরঙ্গরূপে আকাশে নিক্ষেপণ, তারপর গ্রাহক যন্ত্রের এরিয়েলে ঐ বেতার-তরঙ্গের বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিবর্তন করে বাহক তরঙ্গটিকে বাদ দিয়ে মূল বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে আবার আলোক-তরঙ্গে ফিরিয়ে আনাই হচ্ছে মোটামুটি কাজ।

টেলিভিসনের চোখ ও পর্দা

কোন দৃশ্যকে আমরা দেখতে পাই, তাথেকে প্রতিফলিত আলোক-তরঙ্গ আমাদের চোখে এসে পৌঁছায় বলে। কোন দৃশ্যের ছবি টেলি-

ভিসনে পাঠাতে হলে একটি ক্যামেরা-চোখ (চিত্র ১) দৃশ্যটির সামনে রাখা হয়। এই ক্যামেরা-চোখ অনেকটা আমাদের চোখের মত। ক্যামেরার লেন্সকে আমাদের চোখের লেন্সের সঙ্গে এবং বিশেষ বস্তুর পর্দাকে চোখের রেটিনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই পর্দার বিশেষত্ব এই যে, এর যে অংশে যে পরিমাণ আলো পড়ে, সেই অংশ সেই অনুপাতে ইলেকট্রন হারায়। যেহেতু ইলেকট্রন কণিকা নেগেটিভ বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পন্ন, সেহেতু পর্দার ঐ অংশ শক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি সম্ভব হয়ে ওঠে।

যে ক্যামেরা-চোখের কথা বলা হলো, তার নাম আইকনোস্কোপ। টেলিভিসনের যত প্রকার ক্যামেরা এখন ব্যবহৃত হয়, ঐতিহাসিকভাবে এটি তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। বর্তমানে আরও উন্নত ক্যামেরা-চোখের ব্যবহার আছে।

আমরা টেলিভিসনের ছবি দেখি একটি এটি পর্দায়, যাতে প্রতিপ্রভ পদার্থ মাখানো থাকে। এই পদার্থের উপর ইলেকট্রনগুচ্ছ এসে
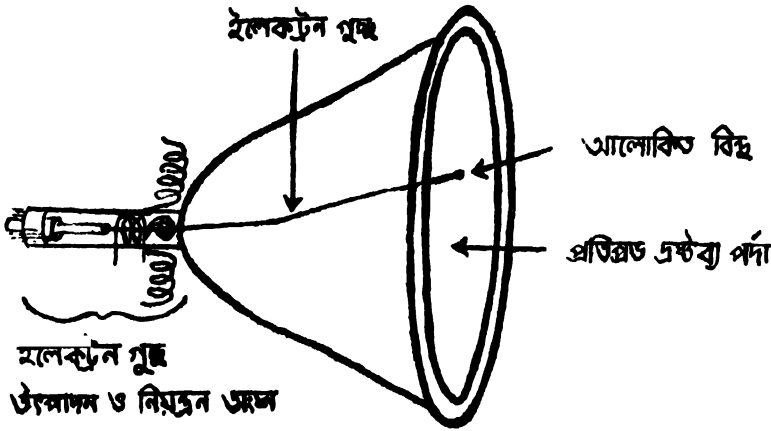
২নং চিত্র
টেলিভিসনের পিকচার টিউব

একই অনুপাতে পজিটিভ বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এভাবে লেন্সের সম্মুখস্থ দৃশ্যটির একটি বৈদ্যুতিক প্রতিকৃতি পর্দার উপর গড়ে ওঠে। ঐ প্রতিকৃতি অনেকগুলি অংশে বা উপাদানে বিভক্ত করা হয়। পর্দার উপর একটি ইলেকট্রনগুচ্ছ ফেলা হয় এবং যখন যে উপাদানের উপর ইলেকট্রনগুচ্ছ এসে পড়ে, তখন সেই উপাদানের বিদ্যুৎ-শক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। একের পর এক পর্দার সমস্ত উপাদানগুলির উপর ইলেকট্রনগুচ্ছকে ফেললে সমগ্র প্রতিকৃতির বিভিন্ন অংশের বিদ্যুৎ-পড়লে আলোর সৃষ্টি হয়। এই ইলেকট্রনগুচ্ছকে নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ টেলিভিসনের ক্যামেরা-চোখের বিদ্যুৎ-তরঙ্গের অনুরূপ। টেলিভিসনের ক্যামেরা-চোখ যেভাবে ছবিটি দেখে, ঠিক সেই ভাবেই পর্দার উপর ইলেকট্রনগুচ্ছ ফেলা হয় এবং আমরা পূর্ণ ছবিটি দেখতে পাই। এই ব্যবস্থা যেখানে করা হয় তার নাম পিক্‌চার টিউব (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

ছবি কি ?

মানুষের চোখের দুটি ত্রুটির জন্যেই টেলিভিসন সম্ভব।

(ক) পাশাপাশি অবস্থিত দুটি কালো দাগকে দূর থেকে একটি বড় দাগ বলেই মনে হয়।

(খ) একটি ছবি দেখবার পরেও তার রেশ কিছুক্ষণের জন্যে (১/৩০ সেকেণ্ড) আমাদের পাশাপাশি সাজালে সামান্য দূর থেকে আমরা একটা লাইন বলে মনে করি। তেমনি অসংখ্য বিন্দু, যাদের ঘনত্ব ও দৈর্ঘ্য ভিন্ন, সমাবেশ করলে একটি পূর্ণ ছবির সৃষ্টি হতে পারে (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।
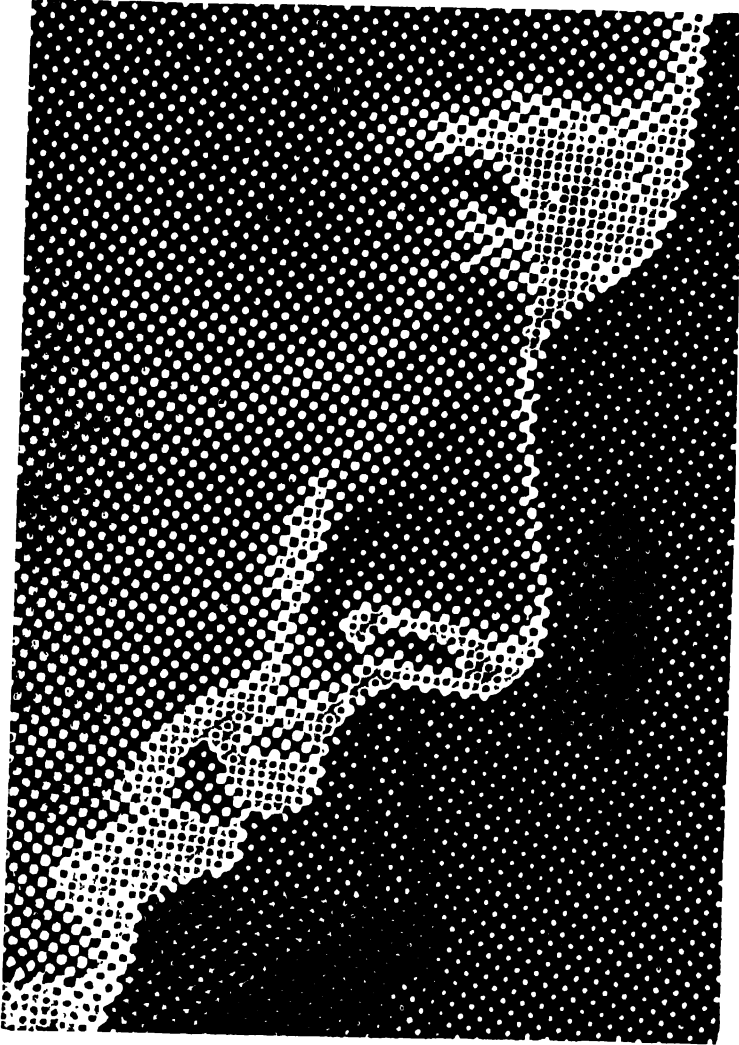
৩নং চিত্র
বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও ঘনত্বের কালো বিন্দুর সমাবেশে একটি পূর্ণ ছবি

চোখে থাকে, যাকে বলা যায় দৃষ্টির নির্বন্ধতা (Persistence of Vision)।

সাদা কাগজের উপর কয়েকটি কালো বিন্দু

টেলিভিসনে একটি দৃশ্যের ছবিকে বিভিন্ন উপাদানে ভাগ করা হয় এবং এক একটি উপাদান থেকে বিদ্যুৎ-রশ্মি গ্রহণ করে পাঠানো

হয়। এই বিদ্যুৎরশ্মির বিস্তার নির্ভর করে ছবির সেই অংশে আলোর ঘনত্বের উপর।

আমরা বইয়ের একটি পাতা সবটা একসঙ্গে পড়ি না। প্রথমে বাঁ-দিক থেকে সুরু করে একটা লাইন পড়া শেষ করি। তারপর আবার পরের লাইন পড়তে সুরু করি। টেলিভিসনেও প্রত্যেকটি ছবিকে এরূপ লাইনে ভাগ করে নেওয়া হয় ও ইলেকট্রনগুচ্ছ একদিক থেকে আরম্ভ করে পরপর প্রতিটি লাইন থেকে বিদ্যুৎ-রশ্মি গ্রহণ করে, যতক্ষণ না সবটা ছবি শেষ হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম Scanning (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

৪নং চিত্র

স্ক্যানিং

স্বভাবতঃই লাইনের সংখ্যা যত বেশী হয়, ছবিটিও তত আসলের কাছাকাছি হয়। সর্ব-প্রথম যখন টেলিভিসন হয়েছিল, তখন একটি ছবিতে লাইনের সংখ্যা ছিল ৩০।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংখ্যার লাইন ব্যবহৃত হয়। ইংল্যাণ্ড ৪০৫, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ৫২৫, রাশিয়া ৬২৫, ফ্রান্স ৬২৫ অথবা ৮১৯ প্রভৃতি। ভারতে ব্যবহৃত হয় ৬২৫ লাইন এবং এটিই আন্তর্জাতিক মান। টেলিভিসনে নিখুঁত ছবি দেখবার জন্যে প্রেরক যন্ত্রের লাইনের সঙ্গে গ্রাহক যন্ত্রের ছবির লাইন মিলিয়ে নেবার ব্যবস্থা থাকে।

রঙীন টেলিভিসন

পৃথিবীতে যত রকম রং সম্ভব, তাদের বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি মৌলিক রং পাই—লাল, নীল ও সবুজ। সাধারণ টেলিভিসন থেকে রঙীন টেলিভিসনের প্রধান তফাৎ হলো ক্যামেরা-চোখে এবং পিকচার টিউবে। দৃশ্যটিকে লাল, নীল ও সবুজ এই তিনটি ফিল্টারের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ও একটি আলোক-তরঙ্গে সুবেদী (Photosensitive Surface) তলে ফেলা হয়। তারপর সেই তল থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে যাওয়া হয় ও যথারীতি বেতার-তরঙ্গে রূপান্তরিত অবস্থায় প্রেরিত হয়। গ্রাহক যন্ত্রে এর ফলে তিনটি বিভিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

রঙীন পিকচার টিউবের পর্দায় তিনটি স্তর থাকে, যার একটি লাল রঙে অনুভূতিশীল, একটি নীল রঙে অনুভূতিশীল আর একটি অনুভূতিশীল সবুজ রঙে। আবার রঙীন পিকচার টিউবে থাকে তিনটি ইলেকট্রনগুচ্ছ, তিনটি মৌলিক রঙের জন্যে।

গুচ্ছ তিনটি পর্দার নিকটের একটি গর্ত দিয়ে একই সময়ে প্রবেশ করে পর্দার বিভিন্ন স্তরকে আঘাত করে। সব মিলিয়ে পর্দায় আসলের অনুরূপ একটি রঙীন ছবি ফুটে ওঠে।

যে ব্যক্তি বা বস্তুর ছবি নেওয়া হয়, তাকে যথোপযুক্ত আলোকিত করা হয়, ক্যামেরা-চোখ বসানো থাকে তার সামনে এবং তার পরিচালক থাকেন। স্বর ধরবার জন্যে মাইক্রোফোন থাকে।

টেলিভিসনের ব্যবহার

টেলিভিসনকে মানুষ এমন সব কাজে লাগায় যা তার পক্ষে খুব বিপজ্জনক, খুব কঠিন, অত্যন্ত ব্যয়বহুল, খুব অসুবিধাজনক, নাগালের বাইরে, বিরক্তি উৎপাদনকর, অত্যন্ত দূরে, খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা, অত্যন্ত উঁচুতে বা অত্যন্ত নীচুতে, অত্যন্ত অন্ধকার বা যার সরাসরি দেখা পাওয়া যায় না—এক কথায় যা মানুষের অসাধ্য। টেলিভিসনের সমস্ত ধরণের প্রয়োগ সম্পর্কে বলা এখানে সম্ভব নয়, কেবল কয়েকটি প্রয়োগের কথা বলবো।

শিল্পে—স্বয়ংক্রিয় কারখানার সমস্ত যন্ত্রপাতি অপারেটর এক জায়গা থেকেই তদারক করতে পারেন। গাড়ীর নীচে টেলিভিসন ক্যামেরা ও সীটের উপর পিকচার টিউব রেখে গাড়ী চলাকালীন তার চাকা স্প্রিং প্রভৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব।

মহাকাশে ও গভীর সমুদ্রে—চন্দ্রের এক দিক পৃথিবীর দিক থেকে সব সময় ঘোরানো থাকে। তাই অন্য দিক কোন সময়ই পৃথিবী থেকে দেখা যায় না। রাশিয়ার প্রেরিত লুনিক-৩ নামক আন্তগ্র্হ ঐ অদৃশ্য পৃষ্ঠটির ছবি তুলে টেলিভিসনের সাহায্যে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে প্রত্যেক মহাকাশযানেই এক বা একাধিক টেলিভিসন থাকে। গভীর সমুদ্রের মধ্যে কোন জাহাজ ডুবে গেলে টেলিভিসনের সাহায্যে তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব।

শিক্ষায়—শিক্ষকতার কাজে টেলিভিসনকে নানাভাবে কাজে লাগানো সম্ভব। অণুবীক্ষণের নীচে একটি ক্ষুদ্র জিনিষ টেলিভিসনের পর্দায় অনেকে এক সঙ্গে দেখতে পারে। একজন পারদর্শী চিকিৎসক একটি জটিল অস্ত্রোপচার করছেন। অপারেশন করবার জায়গায় ভীড় না বাড়িয়ে ভাবী চিকিৎসকগণ ঐ অস্ত্রোপচার পদ্ধতি দেখতে পান টেলিভিসনের সাহায্যে। শিক্ষক মহাশয় একটি কক্ষে বক্তৃতা দিচ্ছেন, টেলিভিসনের সহায়তায় ঐ বক্তৃতা ক্লাসের বাইরে থেকেও অনেকেই অনুধাবন করতে পারে। বিদেশের কোন কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষার সময় নজর রাখা হয় দূর থেকে টেলিভিসনের সাহায্যে।

চিকিৎসায়—একজন রোগীর চোখে ক্যান্সার হয়েছে। রোগীর চোখের ফটো টেলিভিসনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো আর এক শহরে যেখানে চোখের ক্যান্সারের বিশেষজ্ঞ রোগ নির্ধারণ করে তৎক্ষণাৎ নিরাময়ের ওষুধ দেবেন।

যুদ্ধে—যুদ্ধেও টেলিভিসনের ডাক পড়েছে। কুয়াশায় ঘেরা সমুদ্রে বা অন্ধকারে জাহাজের ক্যাপ্টেন টেলিভিসনের পর্দায় দেখলেন দূরের একটি জাহাজ এবং সহজেই নির্ণয় করলেন তা মিত্রপক্ষের কি না। একজন জওয়ানের হাতে রয়েছে টেলিভিসন ক্যামেরা এবং কাঁধে প্রেরকযন্ত্র। ইনি শত্রুপক্ষের সৈন্যসামন্ত, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতির ছবি হেডকোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। হেডকোয়ার্টার্সে আবার এরূপ বিভিন্ন জায়গার ছবি একত্রিত করে শত্রুপক্ষের শক্তিশালী ও দুর্বল স্থান খুঁজে বের করে সৈন্যদের যথোপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া হবে।

চিত্তবিনোদনে—চিত্তবিনোদনে টেলিভিসনের ব্যবহার সর্বাধিক সংখ্যায় এবং তার আবেদন

প্রত্যেকের কাছেই। নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার, পুরনো ভাল সিনেমা প্রভৃতি সমস্ত রকম অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব টেলিভিসনে। আমেরিকায় তিন বছরের শিশুদের জন্যেও টেলিভিসন প্রোগ্রাম রয়েছে এবং তা শিশুদের খুব প্রিয়। খেলার মাঠে না গিয়েও কোন ভাল খেলা টেলিভিসনে ঘরে বসেই উপভোগ করা যায়।

এসব ছাড়াও অ্যাডভারটাইজিং, ইলেকশন ক্যাম্পেন প্রভৃতি আরও নানা কাজে টেলিভিসনকে কাজে লাগানো সম্ভব টেলিভিসনের এক কৌতুক-পূর্ণ ব্যবহারের কথা বলবো। নিউইয়র্কের এক চিড়িয়াখানায় দুটি শিম্পাঞ্জী নিজেদের মধ্যে খুব ঝগড়া করতো। খাঁচার বাইরে একটি টেলিভিসন সেট রাখবার পর থেকে ওদের ঝগড়া থেমে যায়।

টেলিভিসনের কাছে আমরা আর কি আশা করছি

ভিডিও পিক্‌চার ফোন (Video Picture Phone) এখনই করা সম্ভব। এতে যিনি টেলিফোন করছেন এবং যাকে করছেন, উভয়েই উভয়কে দেখতে পাবেন।

পৃথিবীময় রিলে ষ্টেশনের সাহায্যে প্রত্যেক দেশের সঙ্গে প্রত্যেক দেশের যোগাযোগ সম্ভব। এতে শিক্ষা-সংস্কৃতির সমন্বয়ে পৃথিবীতে একজাতি একপ্রাণ গড়ে উঠবে এবং শান্তির পথ সুগম হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্র ইউরোপে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের যোগ আছে টেলিভিসন রিলে ষ্টেশনের মাধ্যমে। আমেরিকাতেও তাই। রিলে করবার কাজ অবশ্য কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যেও সম্ভব। ১৯৬২ সালে টেলষ্টারের সাহায্যে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে প্রথম টেলিভিসন সংযোগ সাধিত হয়। জাপানের অন্তর্গত টোকিওতে যে অলিম্পিক খেলা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালে, তা আর্লি বার্ড (Early Bird) নামক উপগ্রহ রিলে করে আমেরিকার বিভিন্ন সহরে পাঠায়। এই কৃত্রিম উপগ্রহ রিলে ষ্টেশন হয়তো একদিন পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর রিলে ষ্টেশনের অপ্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করবে।

ভারতে টেলিভিসন

টেলিভিসনের কথা বলতে গিয়ে আমাদের দেশে টেলিভিসনের অবস্থা কি, তা না বললে অসম্পূর্ণতা থেকে যায় বলে মনে হয়। ভারতে প্রথম টেলিভিসনের কথা চিন্তা করেন শিশির কুমার মিত্র ১৯৪২ সালে, যখন জাপানে সপ্তাহে দু-দিন প্রোগ্রাম হতো আর রঙীন টেলিভিসন আমেরিকায় সবে চালু হয়েছে। তার সতেরো বছর পরে ১৯৫৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে টেলিভিসন কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। তখন সপ্তাহে মাত্র দু-দিনের প্রোগ্রাম প্রচারিত হতো। ১৯৬৫ সালের ১৫ই অগাষ্ট থেকে প্রতিদিন প্রোগ্রাম প্রচার করা হচ্ছে। দিল্লীতে ও দিল্লীর কাছাকাছি এখন ২৩০টি স্কুলে এবং ২০০টি টেলিভিসন ক্লাবে টেলিভিসন গ্রাহক যন্ত্র আছে। রাজস্থানের অন্তর্গত পিলানীতে সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে ১৯৬৪ সালে পরীক্ষা-মূলকভাবে টেলিভিসন গ্রাহক যন্ত্র গঠন করা সম্ভব হয়েছে। সেটা খুবই আনন্দের বিষয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ এবং সম্ভব হলে কানপুরে টেলিভিসন প্রচার-কেন্দ্র খোলা হবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্র

ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কারণ না থাকলে কার্য হয় না। কোন একটি ঘটনার সূত্র ধরে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার মূলে রয়েছে এমন কতকগুলি যুক্তি ও চিন্তা, যা ঘটনার রূপ দিয়েছে। এরূপ ঘটনার আকস্মিক প্রকাশ আমাদের কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তার পটভূমিকায় লুকিয়ে থাকে মননক্রিয়ার একটা নিভৃত খেলা। যে সকল ঘটনা অহরহ আমাদের চোখের সামনে ভাসছে, তাদের কেন্দ্র করে মননশক্তি প্রয়োগে এমন সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, যা আমাদের কাছে চমকপ্রদ। কথায় আছে, 'Thought provokes thought', অর্থাৎ একটি চিন্তা আর একটি চিন্তাকে উদ্দীপিত করে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধি-নিয়মের কথা ভাবতে ভাবতে বৈজ্ঞানিক এক নতুন ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রে উপনীত হতে পারেন, কিংবা সেই নিয়ম-নীতিকে অন্য কোন সদৃশ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার কল্পনাও তাঁর ভিতরে জাগতে পারে। কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাধনায় বৈজ্ঞানিক সেই নীতিকে কল্পিত ব্যবহারিক সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে থাকেন। এইরূপে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উদ্ভব ঘটেছে। দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য আর একটু পরিস্ফুট হবে

মনে করা যাক, একটি বালক বাড়ীতে জ্বলন্ত উনুনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আগুনের তাপ তার গায়ে এসে লাগছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, খালি গায়ে মাঠের পথে যাবার সময় সূর্যরশ্মির প্রখর উত্তাপের কথা। সূর্যটাও যে আগুনের একটা জ্বলন্ত গোলক হতে পারে—এই সিদ্ধান্ত বালকের মনে আসবার পক্ষে এই অনুভূতিই যথেষ্ট; এজন্যে তার পূর্ব শিক্ষার কোন প্রয়োজন হয় না। স্বভাবতঃই তার মনে আসে—তাই যদি না হবে, তবে অত দূরে অবস্থিত থেকেও সূর্য এরূপ প্রখর উত্তাপ কেমন করে দিতে পারে? জ্বলন্ত উনুনের উত্তাপের সাদৃশ্য বোধ থেকে বালকের মনে জাগলো সূর্যের প্রখর তাপ-শক্তির কথা। বৈজ্ঞানিকের মনেও ঠিক একই ভাবে কোন সাধারণ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে তার সদৃশ অন্য কোন জটিল প্রশ্নের সমাধান এইরূপে এসে যেতে পারে।

একটি চুম্বক-শলাকাকে মাঝখানে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে দেখা যায়, সেটি সর্বদাই উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, অবশ্য অন্য কোন চুম্বক যদি কাছে না থাকে। এটি একটি নিত্য সাধারণ ঘটনা। শলাকার যে প্রান্তটি উত্তর দিকে মুখ করে থাকে, সেটিকে বলা হয় তার উত্তর মেরু, আর যেটি দক্ষিণ দিকে মুখ করে থাকে, তাকে বলা হয় দক্ষিণ মেরু। এই তথ্যটি বহুকাল পূর্বে আবিষ্কৃত হলেও কেন এরূপ হয়, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এযাবৎ কেউ দিতে পারেন নি। প্রাচীন পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল, পৃথিবীর উত্তর দিকে হয়তো চুম্বকের বড় পাহাড় আছে, কিংবা উত্তর আকাশে এমন কোন নক্ষত্র আছে, যার আকর্ষণে চুম্বক-শলাকার উত্তর-দক্ষিণ মেরু উত্তর-দক্ষিণমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ইংরেজ পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ গিলবার্ট চুম্বক-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন এবং চুম্বক-

শলাকার উপর বিভিন্ন আকৃতির চুম্বকের প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে থাকেন। তাঁর লেবরেটরীতে গোল আকৃতির একটি বৃহৎ চুম্বক ছিল। সেই চুম্বক-বলটির কাছে তার বিভিন্ন স্থানে যখন তিনি একটি চুম্বক-শলাকা ধরে পরীক্ষা করছিলেন, তখন তিনি দেখতে পান চুম্বক-বলটির একটি নির্দিষ্ট প্রান্তে চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরু এবং বলের বিপরীত প্রান্তে শলাকাটির দক্ষিণ মেরু আকৃষ্ট হচ্ছে। তিনি জানতেন, চুম্বকের বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সেই তত্ত্বকে অবলম্বন করে চুম্বক-বলের প্রতি শলাকাটির আকর্ষণ-বিকর্ষণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা তিনি সহজেই করতে পারলেন।

বস্তুতঃ চুম্বক-শলাকার উত্তর প্রান্ত চুম্বক-বলের যে দিকটাতে আকৃষ্ট হচ্ছে, সেটা হলো বলের দক্ষিণ মেরু। একটা চুম্বক-শলাকার মাঝখানে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে সেটার উত্তর মেরু যে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে—যে কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—এই ঘটনা তাঁর উল্লিখিত পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের অনুরূপ। এই সাদৃশ্য থেকে ডাঃ গিলবার্টের ধারণা হলো, পৃথিবীটাও তাহলে একটা বিরাট গোলাকৃতির চুম্বক—যার দক্ষিণ মেরু ভৌগোলিক উত্তর দিকে এবং উত্তর মেরু ভৌগোলিক দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই ধারণা থেকে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়, চুম্বক-শলাকার উত্তর মেরু সর্বদাই উত্তর দিকে (ভৌগোলিক) দাঁড়িয়ে থাকে কেন। এই একটা সহজ ও সরল সাদৃশ্য থেকে এমন একটা সমস্যার সমাধান হলো, যা পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের কাছে একটা হেঁয়ালির বিষয় ছিল।

আমেরিকার খ্যাতনামা রাজনীতিজ্ঞ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর অবসর সময়ে বৈদ্যুতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে চিত্ত বিনোদন করতেন। তিনি একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র কিনেছিলেন এবং সেটা তখনকার দিনে সকলের আকর্ষণের বস্তু ছিল। সেটা থেকে তিনি বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ বের করতেন। তা দেখে তিনি নিজে ও তাঁর বন্ধুবান্ধব খুব আমোদ উপভোগ করতেন। আঁকাবাঁকা পথে যখন এক তার থেকে অন্য তারে বিদ্যুতের আলো ঝিলিক দিয়ে যেত, তখন তাঁদের আনন্দের সীমা থাকতো না। কিন্তু খ্যাতনামা রাজনীতিজ্ঞের মন শুধু এই আমোদের খেলার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকতো না। অন্য কোন সমস্যার সমাধান এর মধ্যে তিনি গভীরভাবে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতেন।

এক তার থেকে অন্য তারে বিদ্যুৎ-প্রবাহ যখন লাফিয়ে চলে, তখন মধ্যেকার বায়ু-স্তর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং স্ফুলিঙ্গ আকারে তা প্রকাশিত হয়। এই ধারণা থেকে ফ্র্যাঙ্কলিনের মনে আর একটি সদৃশ ঘটনা—আকাশে বিদ্যুৎ-চমকানোর প্রশ্ন জেগে ওঠে। উভয় ঘটনার মধ্যেই একটা মিল আছে। তিনি বুঝতে পারলেন, আকাশে বিদ্যুৎ চমকানোর সময় আলোর যে বিকিরণ, মেঘের যে গর্জন এবং স্ফুলিঙ্গের যে দাহিকা শক্তির প্রকাশ দেখা যায়, তা মেঘের ভিতর থেকে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা ঘটনার সাদৃশ্য থেকে অন্য একটি প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

তাঁর আগে আকাশের বিদ্যুৎ সম্বন্ধে লোকের সব অদ্ভুত ধারণা ছিল। কেউ বলতেন, আকাশে গ্যাসের বিস্ফোরণ তার কারণ, কেউ মনে করতেন, মেঘের ভিতর থেকে হঠাৎ সবেগে বায়ু বেরিয়ে আসবার ফলে তা ঘটে। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন এসব আজগুবি কথা আদৌ বিশ্বাস করতেন না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের সত্যতা পরীক্ষার দ্বারা সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করলেন যে, প্রকৃতপক্ষে মেঘের মধ্যে অপরিমিত বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চিত থাকে এবং তার স্ফুরণে বিদ্যুৎ চমকায়।

মেঘের স্তর থেকে বিদ্যুৎ আকর্ষণ করবার জন্যে তিনি একটি উচ্চ চূড়ার উপর ধাতুনির্মিত একটি দণ্ড স্থাপন করবার ইচ্ছা করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যখন অর্থ সংগ্রহ করেন, তখন তাঁর হঠাৎ খেয়াল হলো, দণ্ডের সাহায্য ভিন্ন ঘুড়ি উড়িয়েও তো তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত করতে পারে! সেই খেয়ালে তিনি মেঘের স্তরে একটা ঘুড়ি উড়িয়ে দিলেন এবং আশা করতে লাগলেন যে, ঘুড়ির সুতা বেয়ে বিদ্যুৎ নেমে আসবে। ঘুড়ির সুতায় তিনি ধাতুনির্মিত একটি চাবি বেঁধে দিয়েছিলেন এবং লক্ষ্য করছিলেন, তাতে কোন স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয় কিনা। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। তিনি ভাবলেন, তবে কি তাঁর ধারণা মিথ্যা? কিন্তু দৈব ছিল তাঁর অনুকূল। সেই সময়ে বৃষ্টি পড়া সুরু হলো। বৃষ্টির জলে ঘুড়ির সুতা ভিজে গেল এবং সেই সময়ে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন তাঁর আকাঙ্খিত স্ফুলিঙ্গের স্ফুরণ। তিনি আবার এবং পরে আরও কয়েক বার ঘুড়ির সুতায় বাঁধা চাবির দিকে সাগ্রহে তাকালেন এবং বুঝলেন তাঁর দেখা ভুল নয়, ভালভাবেই স্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে। বৃষ্টির জলে সুতা ভিজে যাবার ফলেই তা বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়েছে, তার আগে শুকনো অবস্থায় তা হয় নি। ফ্র্যাঙ্কলিন নিঃসংশয়ে এও প্রমাণিত করেন যে, মেঘ থেকে আকর্ষিত বিদ্যুতের ধর্ম এবং তাঁর বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুতের ধর্ম এক, কোন পার্থক্য নেই। এখানেও দেখা যায়, তাঁর এই আবিষ্কারের মূলে হলো একটা সহজ সরল বৈজ্ঞানিক ঘটনার সাদৃশ্য সূত্র।

বিদ্যুৎ-পরিবাহী ধাতব তারের কাছে যদি একটি চুম্বক-শলাকা আনা যায়, তাহলে শলাকাটি তখনই স্থানচ্যুত হয়। এই আবিষ্কার সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিশেষ করে রয়াল ইনষ্টিটিউশনে গবেষণা কালে মাইকেল ফ্যারাডে এই বিষয়ে বিশেষ কৌতূহলী হন। চুম্বক এবং বিদ্যুৎ সম্বন্ধে যে সব তথ্য তাঁর সময় অবধি আবিষ্কৃত হয়েছিল, সবই তাঁর জানা ছিল। ক্রমশঃ তাঁর দৃঢ় ধারণা হলো যে, বিদ্যুৎ ও চুম্বক—উভয়ের মধ্যে একটা গভীর সম্বন্ধ আছে। সাধারণতঃ একটি চুম্বক-শলাকাকে যদি মুক্তভাবে রাখা যায়, তাহলে তা উত্তর-দক্ষিণমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যে আবিষ্কারের কথা এই মাত্র বলা হলো তাতে বুঝা যায়, উত্তর-দক্ষিণ মুখে অবস্থিত স্থির চুম্বক-শলাকার কাছে যদি বিদ্যুৎ-পরিবাহী একটি তার নিয়ে আসা যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ শলাকাটি তার নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে সরে যায়। তারের ভিতরকার বিদ্যুৎ-প্রবাহ এমন একটা প্রভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে, যাতে চুম্বক-শলাকাকে তার স্থান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই যদি হয়, তাহলে একটি চুম্বকের পক্ষেও কি একটি তারের ভিতরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়? যদি চুম্বক ও বিদ্যুতের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের সূত্র থাকে, তাহলে তা অবশ্যই সম্ভব—ফ্যারাডের মনে এই প্রত্যয় দৃঢ় হলো।

ফ্যারাডে একটি লম্বা ধাতব তারকে একটি শক্তিশালী চুম্বকের প্রভাবে আনতে মনস্থ করলেন। লম্বা তারকে যতটা সম্ভব চুম্বকের প্রভাবে আনবার জন্যে সেটিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে চুম্বকটিকে আলাদাভাবে অর্থাৎ তার স্পর্শ না করে এমনভাবে কুণ্ডলীর মধ্যে রাখলেন। তারের ভিতরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে কিনা, দেখবার জন্যে সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎও ধরা পড়ে, এমন একটি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সঙ্গে তারটিকে সংযুক্ত করলেন। কিন্তু যন্ত্রে বিদ্যুতের একটুও প্রবাহ ধরা পড়লো না। তিনি নিরাশ হলেন। তিনি বারংবার পরীক্ষা চালাতে লাগলেন, কিন্তু কোন ফল পাওয়া গেল না।

অবশেষে ফ্যারাডে লক্ষ্য করলেন যে, যতবারই

চুম্বকটিকে তারের কুণ্ডলীর মধ্যে তিনি প্রবেশ করান কিংবা সেটিকে বের করে নেন, ততবারই সেই মুহূর্তের জন্যে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ যেন দেখা যায়। কিন্তু প্রবাহটি এত ক্ষীণ যে তা দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ফ্যারাডে বুঝলেন—সেই ক্ষীণ প্রবাহ চুম্বকের উপস্থিতির জন্যে নয়। প্রবেশ ও নির্গমনের পথে চুম্বকটির যে গতি তাই বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হবার কারণ।

ফ্যারাডে স্থির করলেন, চুম্বকটিকে নাড়াচাড়া করবার বদলে তার নিকটে তারের কুণ্ডলীটিকে গতিশীল করলে কি ফল হয় দেখা যেতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতি-বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী চুম্বক নিয়ে তার প্রান্ত-ভাগে একটি তারের কুণ্ডলী দোলাতে লাগলেন। তিনি দেখে খুসী হলেন যে, দোলাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ তারের ভিতর দিয়ে সঞ্চালিত হচ্ছে এবং তাঁর যন্ত্রে তা ধরা পড়ছে। চুম্বক কিংবা তার, যেটিকেই গতিশীল রাখা হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। মূল কথা, গতিটাই হলো মুখ্য, অর্থাৎ যখনই একটিকে আর একটির সান্নিধ্যে গতিশীল অবস্থায় রাখা যাবে, তখনই তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে।

এভাবেই ডায়নামোর নীতি ফ্যারাডে একদিন আবিষ্কার করেছিলেন। সেই নীতি অনুসরণ করে বিশাল শিল্প-নগরে, পরিত্যক্ত পার্বত্য অঞ্চলে, গহন অরণ্যে ইঞ্জিনিয়ারেরা এখন চুম্বক-প্রান্তে তারের কুণ্ডলী ঘোরাবার ব্যবস্থা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছেন। বিদ্যুৎ-পরিবহনকারী তার সন্নিহিত চুম্বক-শলাকাকে গতিশীল করে—একথা ফ্যারাডের জানা ছিল, কিন্তু সেই তথ্যের সাদৃশ্যে চুম্বকের সান্নিধ্যে ধাতব তারকে ঘুরিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম জগৎকে দেখালেন যে, তাথেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা যায়।

যৌন-ক্রমোসোম ও বংশগতি

রমেন দেবনাথ

নতুন শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে যে ঔৎসুক্য দেখা যায়, তা হলো শিশুর চেহারা সম্পর্কে। সকলের মনেই এক প্রশ্ন—নবজাতক দেখতে কার মত হলো—মা'র মত, না বাবার মত? একথা অনস্বীকার্য যে, সন্তানের মধ্যে মা-বাবা দুজনেরই কিছু না কিছু চেহারার সাদৃশ্য থাকে। আকৃতি-গত এই যে সাদৃশ্য তার মূলে আছে ক্রমোসোম। ক্রমোসোমের মাধ্যমেই মাতা-পিতার গুণাবলী সন্তান-সন্ততি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে। কিন্তু কোন্ ক্রমোসোম কোন্ বৈশিষ্ট্য বহন করে, অর্থাৎ কোন্ ক্রমোসোমের জন্যে টিকালো নাক, কোন্ ক্রমোসোমের জন্যে কোঁকড়ানো চুল ইত্যাদি আরও হরেক রকম বৈশিষ্ট্য বা গুণ সঞ্চারিত হয়, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। একটি ক্ষেত্রে অবশ্য তা আবার নির্ণয় করা সম্ভব এবং সেটি হচ্ছে যৌন-ক্রমোসোমজড়িত বংশগতির ক্ষেত্রে। যে সব বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী যৌন-ক্রমোসোমের সঙ্গে জড়িত থাকে এবং ঐ ক্রমোসোমের মাধ্যমেই এক জেনারেশন থেকে অন্য জেনারেশনে প্রবাহিত হয়, তাকে যৌন-ক্রমোসোমজড়িত বংশগতি (Sex-linked Inheritance) বলা হয়। এসম্পর্কে আলো-চনা করবার পূর্বে বংশানুক্রম-প্রক্রিয়া (Mecha-

nism of Heredity) সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

জীব-কোষের কেন্দ্রীনে যে সূক্ষ্ম সূত্রবৎ আণুবীক্ষণিক জৈব পদার্থ থাকে, তাকে ক্রমোসোম বলা হয়। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, ক্রমোসোমের মাধ্যমেই মাতা-পিতার গুণাবলী সন্তান-সন্ততিতে বর্তে, আসলে ক্রমোসোমস্থিত জিনই (Gene) কিন্তু বংশানুক্রমের প্রধান উপকরণ। বিজ্ঞানীদের মতে প্রত্যেকটি ক্রমোসোমের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বিন্দুর মত কতকগুলি জৈব পদার্থ আছে—তার নামই জিন। ক্রমোসোমের মধ্যে এই জিনগুলি একটির পর একটি মিশে মালার ন্যায় গ্রথিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক জোড়া ক্রমোসোমের একটিতে জিন যে ভাবে গ্রথিত বা সাজানো থাকে, অন্যটিতেও ঠিক তেমনি। জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে এই জিন। সে জন্যে জিনকে বংশানুক্রমের মূলাধার বলা হয়। এক এক প্রাণীর জিন-সজ্জা এক এক ধরণের। যত দিন পর্যন্ত এই জিন-সজ্জা অপরিবর্তিত থাকে, ততদিন পর্যন্ত কোন নতুন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের জন্ম হয় না। যখন কোন একটি জিনের পরিবর্তন ঘটে, তখন সেই ক্রমোসোমস্থিত সমস্ত জিনে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে সবগুলি জিন মিলে যে সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছিল, তাতে ভাঙ্গন ধরে, আর এরই ফলে নতুন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়। এই জিন পরিবর্তনের নামই মিউটেশন বা পরিব্যক্তি। সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞানীদের মতে, জিনের অভ্যন্তরে D. N. A. (Deoxy ribo nucleic acid) নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ থাকে। প্রাণীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে এই D. N. A.। এখন D. N. A.-কেই বংশানুক্রমের মূলাধার বলে গণ্য করা হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে D. N. A. থাকে জিনের মধ্যে এবং জিন থাকে ক্রমোসোমের মধ্যে অর্থাৎ বাহ্যতঃ ক্রমোসোমের মধ্যেই জীবের বংশবৃত্তি এবং ধর্ম নিবদ্ধ থাকে।

এই ক্রমোসোম দুই রকমের—অযৌন (Autcsome) এবং যৌন (Sex chromosome)। মানুষের ৪৬টি ক্রমোসোমের মধ্যে ৪৪টি হলো অযৌন এবং জোড়াবদ্ধ অবস্থায় থাকে অর্থাৎ এরা ২২টি জোড়া তৈরি করে। কিন্তু ৪৫ এবং ৪৬ নম্বর ক্রমোসোম দুটি হচ্ছে যৌম ক্রমোসোম এবং স্ত্রী ও পুরুষে এরা ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষের বেলায় এই ক্রোমোসোম দুটি অসমান এবং বেজোড় অবস্থায় থাকে—বড়টিকে X এবং ছোটটিকে Y-ক্রমোসোম বলা হয়। স্ত্রীর ক্ষেত্রে আবার এই দুটি ক্রমোসোম সমান এবং জোড়াবদ্ধ। এই দুটিকেই X ক্রমোসোম বলা হয়। পুরুষকে XY এবং স্ত্রীকে XX—এই ভাবে চিহ্নিত করা যায়। Y ক্রমোসোমকে অসার (Empty) বলে গণ্য করা হয়; কারণ এতে সাধারণতঃ কোন জিন থাকে না।

এবার আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়ে আসা যাক। মানুষের অনেকগুলি বংশগত রোগের জিন যৌন-ক্রমোসোম X-এর সঙ্গে জড়িত এবং উক্ত ক্রমোসোমের মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই সব রোগের একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করা গেছে যে, ভুক্তভোগী পিতা তার কন্যার মাধ্যমে নাতিদের মধ্যে এই রোগ বিস্তার লাভ করে, পুত্র বা কন্যা সাধারণতঃ এই সব রোগে আক্রান্ত হয় না, অর্থাৎ প্রথম পুরুষ এবং তৃতীয় পুরুষের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়, কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষে নয়। এই ধরণের আঁকাবাঁকা বংশগতিকে ক্রুশাকার বংশগতি (Criss-cross pattern of Inheritance) বলা হয়। যৌন-ক্রমোসোমের সঙ্গে জড়িত এই ধরণের বংশানুক্রম-প্রক্রিয়া সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় ড্রসোফিলা নামক একপ্রকার

মাছির ক্ষেত্রে, ১৯১০ সালে এবং আবিষ্কর্তা হলেন টি. এইচ. মর্গ্যান। মানুষ এবং ড্রসোফিলা উভয় ক্ষেত্রেই লিঙ্গ-নির্ধারণের প্রক্রিয়া এক, অর্থাৎ পুরুষে XY এবং স্ত্রীতে XX ক্রমোসোম থাকে। সুতরাং ক্রমোসোম সম্পর্কিত যাবতীয় প্রক্রিয়াই ড্রসোফিলায় যা, মানুষের বেলায়ও তা।

ড্রসোফিলার যৌন-ক্রমোসোমজড়িত বংশগতির প্রক্রিয়াটি এবার বিশদভাবে আলোচনা করা যাক—তাহলে মানুষের কতিপয় বংশগত রোগের বংশানুক্রমের ধারাটিও বুঝতে সুবিধা হবে। মর্গ্যান বংশগতি নিয়ে ড্রসোফিলা মেলানোগেস্টার নামক এক প্রকার মাছির (আঙ্গুর, কমলালেবু, কলা ইত্যাদি কাটা ফলের উপর এই ক্ষুদ্রকায় মাছি এসে ভিড় করে) উপর গবেষণা করেন এবং "জিন থিওরি" আবিষ্কার করেন—যার জন্যে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। মর্গ্যান যে প্রজাতির ড্রসোফিলা নিয়ে কাজ করেছিলেন, সেই মাছির চোখ লাল। গবেষণা করবার সময় হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন যে, সাদা চোখবিশিষ্ট ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়েছে। মর্গ্যানের মতে ড্রসোফিলার এই নতুন বৈশিষ্ট্য পূর্বকথিত মিউটেশন বা জিন পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি লাল চোখওয়ালা স্বাভাবিক স্ত্রী-ড্রসোফিলার সঙ্গে সাদা চোখওয়ালা পুরুষ-ড্রসোফিলার মিলন ঘটিয়ে (১নং চিত্র) দেখলেন যে, দ্বিতীয় জেনারেশনের সব কয়টি ড্রসোফিলাই লাল চোখওয়ালা—তবে স্ত্রী-ড্রসোফিলাটি সঙ্কর (Hybrid), অর্থাৎ তার ক্রমোসোমের মধ্যে লাল এবং সাদা—এই দুই রকম চোখেরই জিন আছে। কিন্তু যেহেতু প্রথমোক্ত জিন প্রভাবশালী (Dominant) এবং দ্বিতীয়োক্ত জিন দুর্বল (Recessive) সেহেতু সঙ্কর স্ত্রী-ড্রসোফিলার চোখ লাল। দ্বিতীয় জেনারেশনের এই স্ত্রী-ড্রসোফিলার সঙ্গে আর একটি লাল চোখওয়ালা পুরুষ ড্রসোফিলার মিলন ঘটিয়ে মর্গ্যান দেখতে পেলেন যে, তৃতীয় জেনারেশনে লাল এবং সাদা দুই রকম চোখবিশিষ্ট ড্রসোফিলারই জন্ম হয়েছে এবং তাদের অনুপাত হলো যথাক্রমে ৩ : ১। এই অনুপাত বংশানুক্রমের জনক মেণ্ডেলের অনুপাতের মত (মেণ্ডেল লম্বা এবং বেঁটে মটরশুঁটির মিলনের ফলে ২য় জেনারেশনে সব কয়টিই লম্বা গাছ পান, কিন্তু তৃতীয় জেনারেশনে তিনি লম্বা এবং বেঁটে দুই রকমের গাছই পান এবং তার অনুপাত যথাক্রমে ৩ : ১)।

কিন্তু একদিক থেকে ড্রসোফিলার এই পরীক্ষাটি সাধারণ মেণ্ডেলীয় অনুপাতের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এই পরীক্ষার তৃতীয় জেনারেশনে যে সাদা চোখবিশিষ্ট ড্রসোফিলার জন্ম হয়, তার সব কয়টিই ছিল পুরুষ। মেণ্ডেলীয় বংশগতির বেলায় কিন্তু তা নয়, সেখানে স্ত্রী-পুরুষ উভয় লিঙ্গেই কোন বৈশিষ্ট্য সমানভাবে সঞ্চারিত হয়। এই নতুন বংশগতির কারণস্বরূপ মর্গ্যান বলেছেন যে, এটা দুর্বল বা রিসেসিভ জিনের জন্যে হয়েছে এবং এই জিন যৌন-ক্রমোসোম X-এর সঙ্গে জড়িত। লাল-চোখের জন্যে যে জিন দায়ী, তার প্রভাব সাদা চোখের জন্যে দায়ী জিনের চেয়ে বেশী। সে জন্যে একটিকে প্রভাবশালী (Dominant) এবং অন্যটিকে দুর্বল (Recessive) জিন বলা হয়। এই দুটি বিপরীত-ধর্মী জিন সদৃশ (Homologous) ক্রমোসোম-জোড়ার এক একটিতে পৃথক পৃথক ভাবে থাকে, অর্থাৎ একটিতে যদি সাদা জিন থাকে তাহলে অন্যটিতে লাল জিন থাকবে। এই দুটি পরস্পর বিরোধী জিন যদি সদৃশ ক্রমোসোম-জোড়ায় এক সঙ্গে উপস্থিত থাকে, তাহলে প্রভাবশালী জিনের জন্যে দুর্বল জিন তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না। সুতরাং দুর্বল জিনকে তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে হলে অসদৃশ ক্রমোসোমের মধ্যে তাকে থাকতে হবে—যেখানে প্রভাবশালী জিন

অনুপস্থিত। যেহেতু পুরুষ ড্রসোফিলায় XY এই অসদৃশ ক্রমোসোম আছে এবং যেহেতু Y ক্রমোসোম্ অসার এবং কোন জিন তাতে থাকে না, সেহেতু পুরুষের X ক্রমোসোম-স্থিত দুর্বল জিন তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে ক্রমোসোম থাকে। নিষেক প্রক্রিয়ার (Fertilization) সময় পুরুষের X ক্রমোসোম বহনকারী শুক্রাণু স্ত্রীর X-এর সঙ্গে মিলে কন্যা বা XX-এর জন্ম হয়। পুরুষের X ক্রমোসোমের সঙ্গে যে দুর্বল জিন ছিল, তা স্ত্রীর X

১নং চিত্র

ড্রসোফিলার যৌন-ক্রমোসোমজড়িত বংশগতি
+ — লাল চোখের জিন (প্রভাবশালী জিন),
W — সাদা চোখের জিন (দুর্বল জিন)

XX — স্ত্রীর ক্রমোসোম
XY — পুরুষের ক্রমোসোম

পারে এবং তাই সাদা চোখবিশিষ্ট পুরুষ ড্রসোফিলার উদ্ভব হয়। পুরুষের অর্ধেক শুক্রাণু X এবং অর্ধেক শুক্রাণু Y ক্রমোসোম বহন করে। কিন্তু স্ত্রীর সমস্ত ডিম্বেই X ক্রমোসোমের প্রভাবশালী জিনের কবলে পড়ে যায়; ফলে কন্যার মধ্যে দুর্বল জিনের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কিন্তু কন্যা এই দুর্বল জিনকে বহন করে বেড়ায় এবং তৃতীয়

জেনারেশনের পুরুষদের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। সুতরাং কন্যাকে (Hybrid daughter) দুর্বল জিনের বাহক বলা যেতে পারে।

সোম সজ্জা এক। নিম্নে কতিপয় রোগের কথা বলা হচ্ছে।

বর্ণান্ধতা রোগে (Colour blindness) রোগে যারা ভোগে, তারা লাল এবং সবুজ রংকে

২নং চিত্র
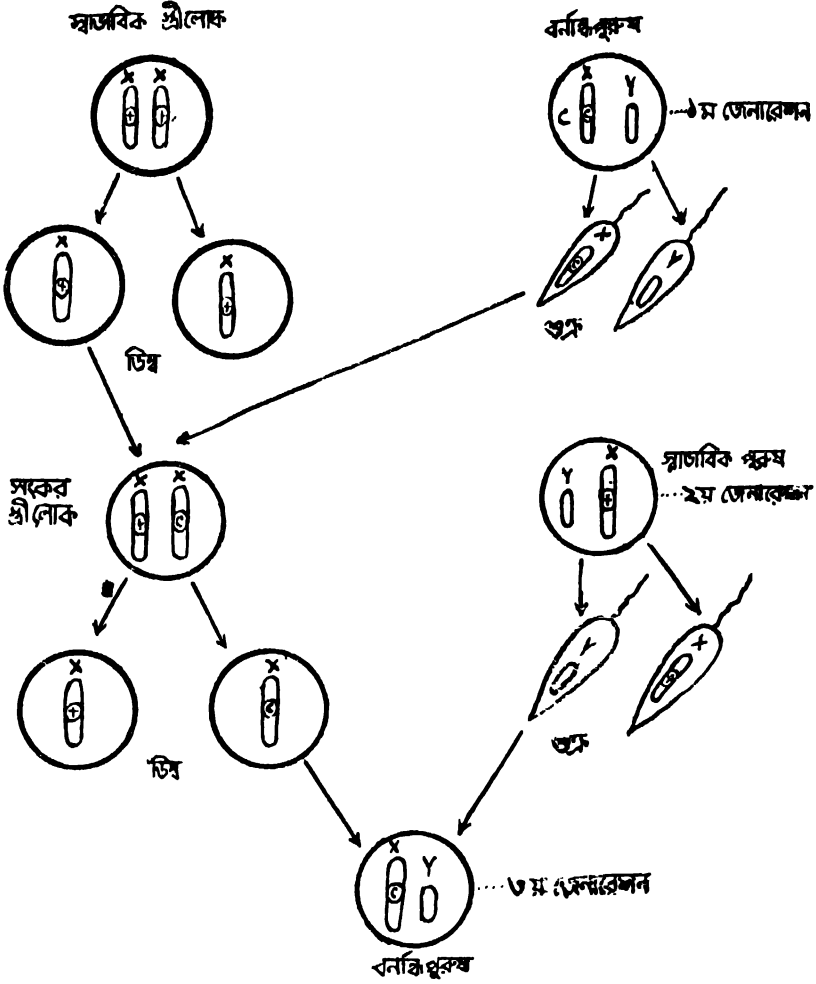
বর্ণান্ধতা রোগের বংশগতি
XX=স্ত্রীর ক্রোমোসোম
XY=পুরুষের ক্রমোসোম

+ – স্বাভাবিক চোখের জিন (প্রভাবশালী জিন)
C – বর্ণান্ধ চোখের জিন (দুর্বল জিন)

মর্গ্যানের উপরিউক্ত আবিষ্কারের সাহায্যে যৌন-ক্রমোসোমের সঙ্গে জড়িত মানুষের কতকগুলি বংশগত রোগের ধারাও বিশ্লেষণ করা যায়; কারণ ড্রসোফিলা এবং মানুষের ক্রমো-

এক মনে করে—এই দুই রঙের পার্থক্য তারা বুঝতে পারে না। ১৭৭৭ সালে এই রোগ সর্বপ্রথম চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই রোগের বেলায় দেখা গেছে যে, যদি

পিতা বর্ণান্ধ হয়, তাহলে তার পুত্র-কন্যাদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায় না। কিন্তু সেই বর্ণান্ধ পিতার নাতিদের মধ্যে (নাতনীদের নয়) এই রোগ আবার দেখা দেয় (২নং চিত্র)। কন্যা যদিও বর্ণান্ধ হয় না তবু বর্ণান্ধতা রোগের দুর্বল জিন তার ক্রমোসোমে (পিতার X ক্রমোসোম থেকে প্রাপ্ত) থাকে। এই সঙ্কর কন্যার সঙ্গে স্বাভাবিক পুরুষের বিয়ে হলে তাদের ছেলেদের মধ্যে আবার বর্ণান্ধতা ফিরে আসে অর্থাৎ বর্ণান্ধ পিতা তার মেয়ের মাধ্যমে নাতিদের মধ্যে রোগ বিস্তার করে। ড্রসোফিলার ন্যায় এই ধরণের বৈশিষ্ট্য দুর্বল জিনের জন্যে প্রকাশ পেয়ে থাকে এবং X ক্রমোসোম এই দুর্বল জিন বহন করে। সুতরাং যেখানে XY ক্রমোসোম থাকে, সেখানেই কেবলমাত্র দুর্বল জিন তার গুণ প্রকাশ করতে পারে। যেহেতু পুরুষে XY ক্রমোসোম থাকে, সেহেতু পুরুষের মধ্যে বর্ণান্ধতার প্রাদুর্ভাব বেশী। বর্ণান্ধ কন্যার জন্ম তখনই সম্ভব, যখন বর্ণান্ধ পুরুষ বাহক স্ত্রীলোককে বিয়ে করে। এই ধরণের বিয়ে সাধারণতঃ ভাই-বোনদের মধ্যে ছাড়া সম্ভব নয় এবং কদাচিৎ হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে ৮% পুরুষদের মধ্যে এবং ০.৫% মেয়েদের মধ্যে বর্ণান্ধতা দেখা যায়।

হিমোফিলিয়া একটি মারাত্মক রোগ, যার জন্যে রক্তের জমাট বাঁধার (Clotting) উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ক্ষতস্থান থেকে অবিরত রক্তক্ষরণ হতে থাকে। অবিরত রক্তক্ষরণের ফলে অনেকে রক্তাল্পতা রোগে ভোগে এবং অনেক সময় মারা যায়। হিমোফিলিয়া রোগের বংশগতিও বর্ণান্ধতার মতই অর্থাৎ এই রোগও দুর্বল জিন-এর জন্যে হয় এবং পিতা থেকে কন্যার মাধ্যমে নাতিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

ড্রসোফিলা বা অন্যান্য প্রাণীদের নিয়ে বংশগতির গবেষণা করা যত সহজ, মানুষের ক্ষেত্রে তত সহজ নয়। কারণ এক্ষেত্রে গবেষকের ইচ্ছানুযায়ী স্ত্রী-পুরুষের মিলন ঘটানো সম্ভব নয় এবং এক জেনারেশন থেকে অন্য জেনারেশনে যেতে অনেক বছর সময় লাগে। সে জন্যে মানুষের বংশগতি সম্পর্কে জানতে হলে তার বংশ পরিচয় বা কুলজি (Pedigree) বিচার করতে হয়। কুলজি পরীক্ষাই বংশগতি বিচারের প্রথম উপায় ছিল এবং বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই এর প্রচলন আছে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হলডেন ইউরোপের রাজ পরিবারেরর কুলজি পরীক্ষা করে হিমোফিলিয়া রোগের বংশগতি নির্ণয় করেন এবং পরীক্ষায় এই প্রতিপন্ন হয় যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ছিলেন হিমোফিলিয়া রোগের বাহক, যদিও তিনি নিজে রোগী ছিলেন না। ভিক্টোরিয়ার মাধ্যমে রাজপরিবারের অনেক পুরুষ এই ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হয়। এই পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের রাজ পরিবারের বিয়ে হওয়াতে এই দুর্বল জিন মেয়েদের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ পরিবারে, বিশেষ করে স্পেন ও রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। সৌভাগ্য বশতঃ ইউরোপের বর্তমান রাজপুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে এই রোগ নেই, কারণ কুলজি পরীক্ষা থেকে বুঝা যায় যে, তাদের মধ্যে হিমোফিলিয়ার দুর্বল জিন নেই। বিজ্ঞানীদের হিসেব থেকে জানা যায় যে, আমেরিকায় ৪০,০০০ হাজারেরও বেশী পুরুষ এই রোগে ভুগছে।

উপরে বর্ণিত দুটি বংশগত রোগ ছাড়া আরও অনেক বংশগত রোগ আছে, যেগুলি যৌন-ক্রমোসোমের সঙ্গে জড়িত। যেমন, রাতকানা (Night blindness) রোগে চোখের স্বল্প দুরত্বের দৃষ্টিদোষ (Myopia) ঘটে। (যার ফলে রোগী কাছের জিনিষ দেখতে পারে, কিন্তু দূরের জিনিষ নয়), অক্ষিস্নায়ুর বিলুপ্তি (Degeneration of optic nerve), চোখের ছানির জটিলাবস্থা

(Juvenile glaucoma—যার ফলে চোখের মণি শক্ত হয়ে যায়), হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভের অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি।

ড্রসোফিলা এবং মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও যৌন-ক্রমোসোমজড়িত বংশগতি দেখা যায়। প্রজাপতি, পাখী ও মাছের ক্ষেত্রে এই বংশধারা ঠিক উল্টো ধরণের, কারণ তাদের ক্রমোসোম-বিন্যাস ড্রসোফিলা এবং মানুষের বিপরীত। ওই সব প্রাণীদের ক্ষেত্রে পুরুষে XX এবং স্ত্রীতে XY ক্রমোসোম থাকে। মুরগীর পোলট্রিতে এই বংশগতির একটি সাধারণ উদাহরণ হলো দাগওয়ালা পালক। প্লাইমাউথ রক মুরগীর সাদা রঙের পালকের মধ্যে যে কালো কালো দাগ থাকে, তা হলো যৌন-ক্রমোসোমজড়িত বংশগত বৈশিষ্ট্য। এই বংশগতি ড্রসোফিলা এবং মানুষের চেয়ে একেবারে উল্টো। মানুষের বেলায় পিতা তার মেয়ের (বাহক) মাধ্যমে নাতিদের মধ্যে এই ধরণের বৈশিষ্ট্য বিস্তার করে, কিন্তু এখানে মা তার ছেলের (বাহক) মাধ্যমে নাতনীদের মধ্যে বিস্তার করে অর্থাৎ প্রথম জেনারেশনের স্ত্রী-মুরগী দ্বিতীয় জেনারেশনের মোরগের মাধ্যমে তৃতীয় জেনারেশনের মুরগীর মধ্যে পালকের দাগওয়ালা বৈশিষ্ট্য বিস্তার করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যৌন-ক্রমোসোম যেমন লিঙ্গ নির্ধারণে সহায়তা করে, তেমনি আবার এর মাধ্যমে বংশগত রোগও সঞ্চারিত হয়।

সঞ্চয়ন

শিক্ষার অভাব দূর করতে যন্ত্রের সাহায্য

জর্জ পোলক এই সম্বন্ধে লিখেছেন—সমগ্র বিশ্বে শিক্ষার চাহিদা বেড়েই চলেছে। এদিকে চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষকের অভাব আছে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাহিদা মেটাতে যন্ত্র কিছু সাহায্য করতে পারে।

শিক্ষার এই যন্ত্রটি খুব জটিলও নয়। একটি প্লাষ্টিক মোড়কে একটি পাকানো কাগজে প্রশ্ন ও উত্তর লেখা থাকে। ছাত্রকে একটি কাগজ টেনে নিতে হয়। এক একটি প্রশ্নের অনেকগুলি উত্তর দেওয়া থাকে। ছাত্রকে সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের করতে হয়। এই সাধারণ যন্ত্রটি প্রাথমিক স্তরে ব্যবহার করা হয়।

উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যেও জটিল শিক্ষাযন্ত্র রয়েছে। লণ্ডনের নিকটবর্তী এক বৃটিশ ফার্ম একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। যন্ত্রটি টেলিভিশন সেটের মত দেখতে। পর্দার উপর ছবি পড়ে। প্রত্যেক ছবিতে একটি তথ্য ও সেই সঙ্গে একটি প্রশ্ন দেওয়া থাকে। তারপরের ছবিতে থাকে দশটি সম্ভাব্য উত্তর। ছাত্র যে উত্তরকে সঠিক বলে মনে করে, একটি বোতাম টিপে তা জানিয়ে দেয়। যদি তার উত্তর নির্ভুল হয়, তাহলে পরের প্রশ্নটি উঠে আসে। উত্তর ভুল হলে পরের ছবিগুলিতে সঠিক উত্তরটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় ও ছাত্রটিকে আবার প্রথম প্রশ্নে ফিরে যেতে বলা হয়।

এভাবে অগ্রগামী ছাত্র আরও এগিয়ে যেতে পারে। পিছিয়ে পড়া ছাত্রেরও কোন অসুবিধা হয় না। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরকেই এভাবে ছাত্রেরা যে যার মান অনুযায়ী এগিয়ে যেতে পারে।

এই শিক্ষা-যন্ত্রগুলির নির্মাতাদের শিক্ষার বিষয় নির্বাচন করবার উদ্দেশ্যে কর্মী নিয়োগ করতে হয়। একটি সাধারণ বিষয় হলো "কেমন করে ব্যবসায় সংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখতে হয়"। ৩৪০টি চিত্রের সাহায্যে এটি তৈরি এবং শিখতে সময় লাগে ৩ থেকে ৬ ঘণ্টা।

ফিল্মের সাহায্যে কারিগরী শিক্ষাও দেওয়া যেতে পারে। ফোটোমেট্রি শিক্ষা দেওয়া হয় ১৮০২ ছবির সাহায্যে, শিখতে সময় লাগে ৬ থেকে ১২ ঘণ্টা। অবশ্য এটি শিখতে গেলে ছাত্রের শক্তি ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার।

রয়্যাল এয়ার ফোর্স স্কুল অব এডুকেশন কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি শিক্ষা-যন্ত্র এখন কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। এটি এমনভাবে তৈরি যে, টেপ-রেকর্ডার, প্রোজেক্টর এবং অন্যান্য বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র এক সঙ্গে ব্যবহার করা যায়।

শিক্ষকের অভাব যতদিন আছে, ততদিন শিক্ষা-যন্ত্রেরও প্রয়োজন থাকবে।

মরুভূমি থেকে জমি উদ্ধার

জেম্‌স্ লরী এই সম্বন্ধে লিখেছেন যে—বৃটিশ ফার্ম এসো রিসার্চ লিমিটেড লিবিয়া মরুভূমি থেকে ২০০০ একর জমি উদ্ধারের একটি কাজ পেয়েছেন। ২০০০ একর মরুভূমিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই কাজ করা করা হবে মরুভূমির উপর একটি পেট্রোলজাত দ্রব্য স্প্রে করে। পেট্রোল স্প্রে করবার ফলে বালি আর সরে গিয়ে মরুভূমির পরিধি বিস্তার করবে না। তাছাড়া জমি জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে পারবে। এমন কি, দু-বছরের মধ্যে ঐ জমি গাছপালা দিয়ে ঢেকে দেওয়া যাবে।

বৃটেনে গবেষণার ফলে এই সহজ পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর আগে মরুভূমিগুলি অবাধ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছিল। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ভেবে আমাদের মরুভূমি দমনের কাজে এগোতে হবে। ভূপৃষ্ঠের এক-পঞ্চমাংশই মরুভূমি। উষর অঞ্চলগুলি এর সঙ্গে যোগ করলে মানুষের হাতে বাসযোগ্য ভূমি থাকে ভূপৃষ্ঠের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ।

এই পটভূমিকায় বিজ্ঞানীরা মরুভূমি থেকে জমি উদ্ধারের জন্যে গবেষণা সুরু করেন। গবেষণার জন্যে ইংল্যাণ্ডে একটি ছোট টানেল ব্যবহার করা হয়। উত্তর আফ্রিকা থেকে বালি এনে এই টানেলে রাখা হয় ও সেই বালির গতি-প্রকৃতি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ঘণ্টায় ১১ মাইল বা তার বেশী বেগে বায়ু প্রবাহিত হলে বালিস্তূপ উড়তে থাকে। পেট্রোল স্প্রে করে দেখা গেছে, বালিস্তূপ ঘণ্টায় ৭০ মাইল পর্যন্ত বায়ুর বেগ সহ্য করতে পারে

ট্রিপোলিটানিয়াতে পরীক্ষামূলকভাবে জলযুক্ত বালিতে অ্যাকেসিয়া ও ইউক্যালিপ্টাসের চারা বসানো হয়েছিল। তারপর বালির জমির উপর তৈলজাতীয় দ্রব্য স্প্রে করে দেওয়া হয়। এক বছর পরে দেখা গেল চারাগুলি ছয় ফুট লম্বা বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। তেল ছড়িয়ে না দিলে বালি উড়ে তাদের সমাধিস্থ করে দিত।

লিবিয়া কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ১০০০ একর বালি-জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। টিউনিসিয়া, ভারত, ইস্রায়েল, অষ্ট্রেলিয়া এবং আর্জেনটিনাতেও মরুভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এই পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। উত্তর আফ্রিকায় প্রতি হেক্টর জমিতে মাত্র ১ টন

তেল ব্যবহার করে জমি উদ্ধারের কাজে সাফল্য লাভ করা গেছে। আবহাওয়া ও জমির প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন মরু অঞ্চলের জন্যে বিভিন্ন রকমের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

উদ্ধার করা জমিতে যতদূর সম্ভব চারাগাছগুলি বড় দেখে বসানোই যুক্তিযুক্ত। জমিতে তেল স্প্রে করবার আগে গাছ বসালে অবশ্য তা কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব নয়। হয় শিকড়গুলি বের হয়ে পড়বে, নয় তো বালিতে গাছটিকে ঢেকে ফেলবে।

তেল যে শুধু এইভাবে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে মানুষের উপকার করছে, তাই নয়, যেখানে বৃষ্টিপাত অল্প সেখানে পেট্রোল 'মাল্‌চ' ব্যবহার করলে জমি থেকে জল বাষ্প হয়ে উবে যায় না—জমির প্রয়োজনীয় উষ্ণতাও রক্ষা করা যায়।

যন্ত্রণাহীন সন্তান প্রসব

যন্ত্রণাহীন সন্তান প্রসবের পদ্ধতিটি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আজ পনেরো বছর ধরে প্রচলিত। ইউরি জমানোভ্‌স্কি এই পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছেন—

আজ থেকে ১৫-২০ বছর আগেকার হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগগুলির সঙ্গে আজকের প্রসূতি ভবনগুলির একটি খুব লক্ষণীয় পার্থক্য হলো এই যে, এখানে বেশ নিস্তব্ধতা ও শান্তির ভাব বিরাজ করে। তখনকার দিনে প্রসবের সময়ে যন্ত্রণাক্লিষ্ট প্রসূতিদের যেরূপ আর্তনাদ ও চীৎকার শোনা যেত, এখন আর সেরূপ কিছু শোনা যায় না বললেই চলে। প্রায় ত্রিশ বছর থেকেই প্রসবের যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে আসছে। এই ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, প্রসব-যন্ত্রণার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটানো যেতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যে সব যন্ত্রণা-প্রশমনকারী ওষুধ ব্যবহার করা হয়, সেগুলি চিকিৎসার অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন—অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রণা-উপশমকারী ওষুধ থেকে পৃথক। অনেক ক্ষেত্রেই প্রসূতি ২৪ ঘণ্টা বা তারও বেশী সময় ধরে প্রসব-যন্ত্রণা ভোগ করে এবং দীর্ঘকাল ধরে কার্যকরী থাকবে, এমন কোন যন্ত্রণা-উপশমকারী ওষুধও নেই। একই ওষুধ বার বার ব্যবহারের ফলে প্রসূতির ক্ষতি হতে পারে এবং প্রায় নিশ্চিতভাবেই গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।

অন্যান্য কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করেও প্রসবকালে এই ধরণের ওষুধ প্রয়োগকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হয়। সাধারণ সংজ্ঞালোপকারী ওষুধ প্রয়োগের কোন প্রশ্নই ওঠে না; কারণ আসন্নপ্রসবাকে সজ্ঞান অবস্থায় রাখতেই হবে। স্থানীয় বেদনারোধক ওষুধ প্রয়োগ করে গর্ভদ্বারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিকে অসাড় করে দেওয়াও কঠিন।

১৯৪৮ সালে কন্‌স্টান্টিন প্লাটোনফ ও ইলিয়া ভেলভোভ্‌স্কির নেতৃত্বে একদল সোভিয়েট ধাত্রীবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ প্রসূতিদের যন্ত্রণাবিহীন প্রসবের জন্যে রোগ নিবারক মানসিক (সাইকো-প্রফিল্যাক্টিক) প্রস্তুতির এক প্রচার পদ্ধতির কথা বলেন। মানুষ ও প্রাণীর উচ্চতর স্নায়ুসমূহের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্যাবলভের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতেই তাঁরা এই পদ্ধতিটি গড়ে তোলেন। এই সম্পর্কে প্যাবলভের মূল কথাটি হলো—সন্তানপ্রসব সহ জীবদের প্রত্যেকটি জৈব ক্রিয়া হলো জটিল এক-একটি প্রতিবর্তী বা রিফ্লেক্স প্রক্রিয়া। গর্ভপথে উদ্ভূত উত্তেজনা বা ইমপাল্‌স্‌ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মস্তিষ্কে

পৌঁছায়। মস্তিষ্ক তখন কার্যনির্বাহক অঙ্গ, যেমন —গর্ভাশয়, উদর-পেশী প্রভৃতিকে নির্দেশ পাঠায়। প্রসবনালী থেকে মস্তিষ্কের বহিঃস্তর অর্থাৎ কর্টেক্সে প্রেরিত উত্তেজনার ফল হলো এই যন্ত্রণাবোধ। কর্টেক্স থেকেই সুনির্দিষ্ট এক মানসিক অভিব্যক্তি হিসেবে এই যন্ত্রণাবোধের সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়াসংক্রান্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ওই যন্ত্রণাবোধেরও পরিবর্তন—এমন কি, বিলোপ ঘটানোও সম্ভব।

সোভিয়েট ধাত্রীবিদ্যা-বিশেষজ্ঞেরা ঠিক তাই করছেন—মস্তিষ্কের সেই ক্রিয়া সংক্রান্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার কাজে তাঁরা এতটা সফল হয়েছেন যে, উত্তেজনা ঘটলেও যন্ত্রণা সৃষ্টির ক্ষমতা হারায়। এই পদ্ধতিতে গর্ভকালের শেষ দুই মাসে স্নায়ুতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধি ঘটানোই হলো এই সাইকো-প্রফিল্যাক্টিক বা রোগনিবারক মানসিক পদ্ধতির মূল কথা।

এই পদ্ধতি প্রয়োগে প্রথমেই যে ফল পাওয়া যায়, তাথেকেই এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়। ১৯৫০ সাল থেকে সাধারণভাবে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশেষভাবে ইউক্রাইনে এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হয়েছে। ইউক্রাইনে প্রসূতিদের শতকরা ৭০ থেকে ৯০ জন এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রসবের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত হবার পর আজ লক্ষ লক্ষ প্রসূতি বিনা যন্ত্রণায় সন্তান প্রসব করছেন।

১৯৫১ সাল থেকেই এই সোভিয়েট পদ্ধতি অন্যান্য দেশেও অনুসৃত হচ্ছে। সবার আগে একে কাজে লাগায় চেকোস্লোভাকিয়া ও ফ্রান্স। এখন এই পদ্ধতি বা তারই কোন না কোন রকমফের পঞ্চাশটিরও বেশী দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রসবের আগে প্রস্তুত হবার দু-রকমের ব্যবস্থা আছে, যেটাকে সাধারণ ও বিশেষ—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। গর্ভবতী হবার সময় থেকেই অর্থাৎ জননী যখন প্রথম মাতৃমঙ্গল সদনে আসেন, তখন থেকেই গর্ভধারণের সময়টা জুড়ে চলে সাধারণ প্রস্তুতির পর্ব। গর্ভবতীর অবস্থান্তর, তাঁর সাধারণ স্বাস্থ্য, ভ্রূণের বিকাশ ইত্যাদির প্রতি নজর রেখে বিশেষজ্ঞ তাঁর জন্যে প্রয়োজনীয় এক বিশেষ খাদ্যতালিকা তৈরি করে দেন।

উচ্চতর স্নায়ুর ক্রিয়াকলাপ হলো ষ্টিমুলেশন বা উদ্দীপনা আর ইন্‌হিবিশন বা অবদমন—এই দুইয়ের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ার ফল। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা গ্রহণ করে চর্ম, চক্ষু ইত্যাদিতে অবস্থিত স্নায়ুর প্রান্তগুলি—যাদের বলা হয় গ্রহণকারী বা রিসেপ্টর। এই রিসেপ্টরসমূহ থেকে স্নায়ুর পথ বরাবর উত্তেজনাসমূহ প্রেরিত হয় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে—যেখান থেকে তারা বার্তার আকারে ফিরে আসে কার্যনির্বাহক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। এই হলো উদ্দীপনার প্রক্রিয়া। সেই সঙ্গে যে সব স্নায়ুবিন্যাসে উদ্দীপনা জাগে নি, সেগুলি অবদমিত অবস্থায় রয়েছে। একে বলা হয় ইণ্ডাক্টিভ অবস্থা। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উদ্দীপনা জেগেছে, এমন স্নায়ুবিন্যাসেও অবদমন থাকতে পারে। বিশেষ ধরণের শিক্ষা নিয়ে সেই অবস্থা সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই যে বিশেষ ট্রেনিংয়ের দ্বারা উদ্দীপিত স্নায়ুতে অবদমনের অবস্থা সৃষ্টি করা হয়, একেই ইভান প্যাবলভ কণ্ডিসণ্ড ইনহিবিশন বা বিশেষ অবস্থাধীন অবদমন বলে অভিহিত করেছেন।

প্রসবের সময় যন্ত্রণানুভূতির পথে সেই অবদমনের অবস্থা সৃষ্টির জন্যে আসন্নপ্রসবাদের প্রস্তুত করে তোলবার সময়ে প্রধানতঃ তাদের মস্তিষ্কের বহিঃস্তর বা কর্টেক্সকে সক্রিয়ভাবে উদ্দীপিত রাখা হয়। এর জন্যেই আসন্নপ্রসবাদের বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়। পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত অবদমনের এই প্রক্রিয়াটি হলো এমন একটি

সাধারণ শারীরবৃত্তিগত নিয়ম, যেটা মানুষ ও প্রাণীর প্রাণসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্যাবলভ ও তাঁর অনুগামীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্বারা গুরুতর বিধ্বংসী এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করা সত্ত্বেও কুকুরের বেলায় কোন রকম যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দেখা যায় না। মানুষের বেলায়ও যখন যন্ত্রণার উদ্দীপনা সত্ত্বেও তার কোন অভিব্যক্তি হয় না, তখন বুঝতে হবে যে, সে ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ অবস্থাধীন অবদমনের সৃষ্টি হয়েছে।

গর্ভবতীদের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ভাবে মৌখিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে আরও কতকগুলি শারীরিক ট্রেনিং দিয়ে ওই প্রসবপূর্ব প্রস্তুতিকালে বিশেষজ্ঞেরা তাদের মস্তিষ্কে এই উপলব্ধিটাকে 'কণ্ডিসণ্ড' করে দেন যে, সন্তানের জন্ম হলো একটি শারীরবৃত্তিগত কাজ এবং প্রসবকালে যদি সঠিকভাবে এই শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহলে প্রসবক্রিয়াটা বেদনাহীন হবে।

এই পদ্ধতির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে —আসন্নপ্রসবা কতটা ভাল ভাবে আর যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে সেই প্রস্তুতিকালীন ট্রেনিং নিচ্ছেন, তার উপরে। বলা দরকার, বেশীর ভাগ জননীই বেশ মনোযোগের সঙ্গে এই ট্রেনিং নিয়ে থাকেন এবং তার ফলে তাঁরা প্রসবের সময় হয় যন্ত্রণাবোধ করেন না, নয়তো খুব অল্পক্ষণের জন্যে অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রণা বোধ করেন। তদুপরি এদের বেলায় প্রসবকালের মেয়াদও কম হয়, প্রসবের পরবর্তী রক্তক্ষরণ খুব সামান্য হয় বা মোটেই হয় না। অস্ত্রোপচারের দ্বারা প্রসব করাবার দরকার হয় না এবং নবজাতকের রোগসংক্রমণ নিবারণের জন্যে কোন রকম বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় না বললেই চলে।

ইংরেজ ধাত্রীবিদ্যা-বিশেষজ্ঞ ডাঃ গ্র্যাণ্টলি ডিক রীড কর্তৃক প্রবর্তিত তথাকথিত স্বাভাবিক সন্তান প্রসবের পদ্ধতি পশ্চিম ইউরোপীয় কতকগুলি দেশে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সোভিয়েট পদ্ধতির সঙ্গে এর নানা দিক থেকে অমিল রয়েছে। প্রয়োগগত ভাবে প্রধান অমিল হলো —ডাক্তার রীডের পদ্ধতিতে গর্ভবতীকে তার সমস্ত পেশীকে শিথিল করতে শেখানো হয়। কিন্তু ডাক্তার রীডের পদ্ধতি কার্যক্ষেত্রে কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে, তা বিচার করবার মত কোন পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায় নি।

বলা দরকার. রোগনিবারক মানসিক প্রস্তুতির এই সোভিয়েট পদ্ধতি যে কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রণার উপশম ঘটাতে পারে না তার কারণ, সেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গর্ভবতীর স্নায়ুতন্ত্রের কতকগুলি বিশেষ ধরণের বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্ব। স্নায়ুর সাড়া জাগাবার ক্রিয়াটি যাদের ক্ষেত্রে দুর্বল বা যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় নয় কিংবা অতিরিক্ত সক্রিয় বা স্পর্শকাতর, প্রধানতঃ তাদের বেলাতেই এরকম হতে দেখা যায়। কিন্তু এর প্রতিষেধকও আছে—প্রথমোক্তদের বেলায় স্নায়ুকে আরও সক্রিয় করে এবং দ্বিতীয়োক্তদের ক্ষেত্রে তাকে আরও কিছুটা অবদমিত করে মোটামুটি স্বাভাবিক স্তরে আনবার জন্যে কতকগুলি 'সাইকো-ট্রপিক' বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করা হয়। খুব সাবধানতার সঙ্গে প্রসবের আগে এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে সুনির্দিষ্ট মাত্রায় তা প্রয়োগ করা হয়। বেদনা-প্রমশনকারী কোন ওষুধ দেওয়া হলেও তা একবার মাত্র দেওয়া হয়, যাতে সন্তানের উপর তার কিছুমাত্র ক্ষতিকর প্রভাব না হতে পারে।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে, প্রসবকালীন যন্ত্রণার বিলোপ ঘটাবার সমস্যাটির আজ সোভিয়েট দেশে দ্রুত সমাধান ঘটে চলেছে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বহু নারী আজ লিখেছেন যে, সন্তান প্রসব হলো এক স্বাভাবিক, যন্ত্রণাহীন শারীরবৃত্তিগত প্রক্রিয়া।

পদার্থবিদ্যা ও অনির্দেশ্যবাদ

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন বলবিদ্যার ধারাকে অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনাকে নির্ভুল এবং নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা সম্ভব—এই রকম একটা বিশ্বাস সব সময়ই তার মধ্যে নিহিত রয়েছে। জাগতিক ক্রিয়াকলাপকে পর্যবেক্ষণ করে তার প্রত্যেক অংশের পরিষ্কার চিত্রগুলি মনের গোচর করাই পদার্থবিদ্যার কাজ। প্রাচীন পদার্থ বিদ্যা, যা সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত স্থূল জগৎ নিয়েই কারবার করতো, তাথেকে অবশ্যই নিউটনীয় যান্ত্রিক বিশ্বের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক এবং নৈশ্চিত্যবাদও মানুষের মনকে তাই সহজেই অধিকার করেছিল। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিদ্যার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের ধারণারও ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটলো, কিন্তু এই সব পরিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণ দিতে গেলে ইতিহাসের একটি বিশাল অধ্যায় রচনা করতে হয়। কিন্তু আমাদের সময় এবং স্থান উভয়ই অতি সংক্ষিপ্ত। সুতরাং কেবলমাত্র অতি প্রয়োজনীয় অংশটুকুই সংক্ষেপে আলোচনা করবো। আলোর কথা দিয়েই সুরু করা যাক।

আলো অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিজ্ঞানীর এক অসীম কৌতূহলের বস্তু (?)। তাই যুগে যুগে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এর উপর আলোকপাত করবার চেষ্টা করেছেন। হিউগেন্স, নিউটন থেকে আরম্ভ করে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক পর্যন্ত বহু প্রতিভা প্রকৃতির এই রহস্যটির উন্মোচনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন। নিউটন আলোককে কণিকা-ধর্মী বলে অভিহিত করেন, কিন্তু হিউগেন্স আলোককে তরঙ্গধর্মী বলে কল্পনা করে সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হলেন। হিউগেন্সের মতে আলোক হচ্ছে অবাঙ্‌মনসগোচর, সর্বচরাচর পরিব্যাপ্তকারী, কিম্ভূতকিমাকার কোন এক মাধ্যমের অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ-কম্পন (Longitudinal wave vibrations)। মাধ্যমটির অস্তিত্ব পরীক্ষা-মূলকভাবে প্রমাণিত হয় নি, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু হিউগেন্সের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে মেনে নিলে আলোর সমবর্তন (Polarization of Light) সংক্রান্ত ব্যাপারে অনতিক্রমণীয় কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ফ্রেস্‌নেল নামক একজন বৈজ্ঞানিক আলোককে এই মাধ্যমের তির্যক তরঙ্গ-কম্পন বলে কল্পনা করে এই অসুবিধাগুলি অতিক্রম করতে সক্ষম হন। তিনিই প্রথম আলোক তরঙ্গবাদকে একটি সুস্পষ্ট গাণিতিক রূপদান করেন। আলোক তরঙ্গবাদের চরম বিকাশ ঘটে ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গবাদে (Electro-magnetic wave theory)। এটি অবশ্য আমাদের আলোচনার পর্যায়ে পড়ে না, তবে প্রসঙ্গক্রমে শুধু এটুকুই বলে নেওয়া যেতে পারে যে, এই তত্ত্বে আলোককে পরস্পরের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক প্রাবল্যের তরঙ্গগতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, আলোক তরঙ্গবাদ এপর্যন্ত স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখলেও কণিকাবাদকে একেবারে অস্বীকার করা যায় নি—বিশেষ ক্ষেত্রে আলোর কণিকা ধর্মকে অবশ্যম্ভাবী রূপেই মেনে নিতে হয়েছিল।

কিন্তু আলোক-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই

সত্যটা ক্রমশঃই প্রকট হয়ে উঠলো যে, আলোর মধ্যে কণিকা ও তরঙ্গ এই উভয় ধর্মেরই বিকাশ ঘটে। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই ধর্মকে অতি স্বাভাবিকভাবেই পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। তাই এই দুটি তত্ত্ব অর্থাৎ কণিকা তত্ত্ব ও তরঙ্গ তত্ত্ব দীর্ঘদিন ধরে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলেছিল। উভয়ের মধ্যে একটা সেতু স্থাপনার প্রয়োজন অনুভূত হলেও ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের আগে পর্যন্ত তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এর কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। ধরুন, যদি আপনি এমন একটি জীবের সম্মুখীন হন যার সঙ্গে মানুষের যতখানি সাদৃশ্য, বাঁদরেরও ঠিক ততখানিই সাদৃশ্য, তাহলে জীবটি মানুষ না বাঁদর, তা নিশ্চিতভাবে বলা নিশ্চয়ই সহজসাধ্য হবে না। এক্ষেত্রেও অনেকটা সেই রকমই অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। যাহোক এসব অসুবিধাগুলি অতিক্রম করে প্ল্যাঙ্ক আলোর একটি নতুন ধরণের মডেল তৈরি করলেন। এই মডেলটির নাম কোয়ান্টাম তত্ত্ব। কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূলে যে কল্পনা শক্তি কাজ করেছে, তা শুধু অত্যাশ্চর্যই নয়, অভূতপূর্বও বটে। অবশ্য এই কল্পনার মধ্যে অবাস্তবতার লেশ মাত্র নেই এবং বলাই বাহুল্য যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপেই একে যথেষ্ট সঙ্গতিও রক্ষা করতে হয়েছে। এই তত্ত্বের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আলো সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান বেশ সহজেই হয়ে গেল। আমরা এখন গাণিতিক জটিলতা ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা যথাসম্ভব পরিহার করে এই তত্ত্বের একটি সরল চিত্ররূপ পরিস্ফুট করবার চেষ্টা করবো।

প্ল্যাঙ্কের তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, আলো যখন চলে তখন ঢেউ তুলে চলে ঠিকই, তবে এই ঢেউয়ের প্রবাহ একটানা নিরবচ্ছিন্নভাবে হয় না। আলোর প্রবাহকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন তরঙ্গের সমষ্টি বলে মনে করা যায়। প্রতিটি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গকে প্ল্যাঙ্ক এক একটি তরঙ্গের গুচ্ছ বা প্যাকেট (Wave packets) বলে বর্ণনা করেছেন। এই তরঙ্গগুচ্ছগুলির নাম কোয়ান্টাম (Quantum)। প্রতিটি কোয়ান্টাম নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি ধারণ করে এবং এই শক্তির পরিমাণ E, আলোর কম্পন সংখ্যা ν-এর সঙ্গে সমানুপাতিক। সুতরাং এই ভাষাকে গাণিতিক রূপ দিলে দাঁড়ায়,

$$E=h\nu \qquad \cdots (i)$$

(hকে বলা হয় প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। সি. জি. এস. এককে এর মান, 6.625×10^{-27} আর্গ সেকেণ্ড)। পাঠক হয়তো অনুভব করেছেন যে, উপরে 'শক্তি ধারণ করে' কথাটার প্রয়োগ ঠিক যুক্তিসঙ্গত হয় নি। কারণ 'কোয়ান্টাম' কথাটির অর্থই (অন্ততঃ আলোক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে) নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি। সুতরাং শক্তি ধারণ করবার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে আরও একটি মূল্যবান তথ্য পাওরা যায় এবং তা হচ্ছে এই যে, কোন বস্তু যখন তাপ বা শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে, তখন শোষিত বা বিকিরিত শক্তির পরিমাণ সব সময়ই $h\nu$ এর গুণিতক (Multiple) হবে, অর্থাৎ ν কম্পন-সংখ্যার আলোর ন্যূনতম পরিমাণ $h\nu$। আমরা এথেকে এই কথাও বলতে পারি যে, আলোর ক্ষেত্রে কোয়ান্টামের ভূমিকা অনেকটা পদার্থের ক্ষেত্রে পরমাণুর ভূমিকারই অনুরূপ।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের এক মূল্যবান সংযোজন হচ্ছে—তাঁর ফোটন মতবাদ (Photon theory of Light)। কোয়ান্টাম তত্ত্বে যে রকম আলোর তরঙ্গ-ধর্মকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এখানে কিন্তু কারও উপর সে রকম কোন পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয় নি। এই তত্ত্বে যেন আলোক তরঙ্গবাদ ও আলোক কণিকাবাদ বাস্তবিকই একাকার হয়ে

গেছে। ফোটন হচ্ছে আলোর পরমাণু এবং বিভিন্ন আলোকের পরমাণুগুলির গতিবিষয়ক ধর্মগুলি ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ কম্পন-সংখ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে ফোটনগুলির বস্তুকণিকার মত ভর ও ভরবেগ আছে। আমরা খুব সহজেই দুটি জ্ঞাত সমীকরণ থেকে এগুলি হিসাব করে ফেলতে পারি। একটি সমীকরণ আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, অপরটি জানবার চেষ্টা করা যাক।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে (Special theory of Relativity) একথা বলা হয়েছে যে, পদার্থ ও শক্তি মূলগতভাবে অভিন্ন এবং পদার্থের শক্তিতে রূপান্তর সম্ভব। আপেক্ষিকতাবাদের আরও একটি বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, ভর একমাত্র জড়েরই ধর্ম নয়, শক্তিরও ভর আছে। সুতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তিকে আমরা ভরের এককেও প্রকাশ করতে পারি। যেমন খানিকটা জলের পরিমাণ নির্দেশ করবার পক্ষে তার ভর বা আয়তন, যে কোন একটি উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। এক গ্র্যাম জলের আয়তন যেমন এক ঘন সেন্টিমিটার, তেমনি এক গ্র্যাম শক্তিকেও আমরা শক্তির প্রচলিত এককে (আর্গ বা জুল) প্রকাশ করতে পারি। ভর ও শক্তির সম্পর্কটাও বেশ সহজ ও সরল। ভরকে আলোর গতিবেগের বর্গ দিয়ে গুণ করলেই পাওয়া যাবে শক্তির তুল্যাঙ্ক পরিমাণ। এর আঙ্কিক রূপ হচ্ছে,

$$E = mc^2 \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (ii)$$

এখানে E হচ্ছে শক্তির পরিমাণ, m হচ্ছে তুল্যাঙ্ক ভর এবং c হচ্ছে আলোর গতিবেগ।

সুতরাং এক গ্র্যাম শক্তির পরিমাণ আমরা সহজেই পেতে পারি এই সমীকরণ থেকে। m-এর স্থানে এক গ্র্যাম এবং c-এর স্থানে আলোকের গতিবেগ 3×10^{10} সে. মি./সেকেণ্ড বসিয়ে আমরা পাবো যে, এক গ্র্যাম ভরের তুল্যাঙ্ক পরিমাণ শক্তি হচ্ছে 9×10^{20} আর্গ বা 9×10^{13} জুল! এক গ্র্যাম পদার্থের মধ্যেও এই পরিমাণ শক্তিই লুকিয়ে আছে। তাহলে একজন 60 কিলোগ্র্যাম ওজনের মানুষের দেহ কি অপরিমেয় শক্তি ধারণ করে কল্পনা করুন। কিন্তু বাস্তবিকই আমাদের এতে উৎসাহিত হবার কোন কারণ নেই। আমরা অসীম শক্তিমান ঠিকই, কিন্তু এই শক্তির রূপ হচ্ছে 'স্বয়ংসার্থক'। একে 'স্বয়ং সার্থক' করে তুলতে গেলে নিজেরই বিনাশ সাধন করতে হয়—কেন না, জড়ের বিলয়েই এর উৎপত্তি। সম্ভবতঃ বজ্র নির্মাণের জন্যে দধীচির তনুত্যাগের মূল রহস্যই এই। তবে জড়কে শক্তিতে রূপান্তরিত করা মোটেই সহজসাধ্য নয় এবং সে জন্যেই আর পাঁচ জনকে বাদ দিয়ে দেবরাজ খোদ দধীচিরই শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

যাহোক, আবার সেই ফোটনের কথাতেই ফিরে যাওয়া যাক। আমরা সমীকরণ (i) ও (ii) থেকে পাই।

$$mc^2 = h\nu$$

$$\text{অথবা, } m = \frac{h\nu}{c^2} \cdots\cdots\cdots (iii)$$

অর্থাৎ ν কম্পন-সংখ্যার আলোর একটি ফোটনের ভর $\frac{h\nu}{c^2}$, আবার যেহেতু ফোটনের গতিবেগ c, সেহেতু এর ভরবেগ

$$mc = \frac{h\nu}{c^2} \times c = \frac{h\nu}{c} \qquad (iv)$$

আইনস্টাইন ও প্ল্যাঙ্কের আলোক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা সম্ভবতঃ উপরের আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে এবং আমরা এরই ভিত্তিতে হাইসেনবার্গের অনৈশ্চিত্যবাদের একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও গাণিতিক জটিলতা বর্জিত সরল চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করবো। আঙ্কিক

প্রমাণ পরিবর্জনের ফলে পাঠকের কাছে হয়তো এই আলোচনাকে দার্শনিক—এমন কি, আধ্যাত্মিক পর্যায়ভুক্ত বলে মনে হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু নিতান্ত অবশ্যম্ভাবীভাবেই আঙ্কিক জটিলতা পরিহার করা ছাড়া উপায় নেই। তাই পাঠক এই আলোচনাকে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক, যে স্তরে খুশী ফেলতে পারেন, আমার কোন আপত্তি নেই—আপত্তি নিষ্প্রয়োজনও বটে। কারণ সত্যের রূপটাই আসল, তা কোন্ পর্যায়ভুক্ত, সে প্রসঙ্গ একান্তই অবান্তর।

ভাষায় বর্ণনা করলে অনির্দেশ্যবাদের চেহারাটা অনেকটা দাঁড়ায় এই রকম যে, কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে আমরা একটি কণিকার যুগপৎ অবস্থান ও ভরবেগকে নির্ভুলভাবে নির্দেশ করতে পারি না। আমরা এই দুটি ধর্মের একটির সম্বন্ধে যতই নিশ্চিত হবো, অপরটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ততই অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়াবে। আমরা যদি কোন একটি পরীক্ষার সাহায্যে একটি বস্তুকণিকার অবস্থান সম্পূর্ণ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হই, তবে তার গতি-বিষয়ক কোন ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞই থাকতে হবে। এর বিপরীত ঘটনাও সমানভাবে সত্য, অর্থাৎ কণিকাটির গতিবিষয়ক ধর্মগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নির্ভুল হলে কণিকাটির অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের নির্বাক থাকতে হবে। কোন একটি বিশেষ পরীক্ষার সাহায্যেই হয়তো উপরিউক্ত ধর্ম দুটি একই সঙ্গে নির্ণয় করা সম্ভব, কিন্তু একটির সম্বন্ধে আমাদের ধারণার স্পষ্টতা অপরটির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে সীমিত করে দেয়। আমাদের এতক্ষণের বক্তব্য বিষয়ের সরল আঙ্কিক রূপ এই রকম—

$$\Delta x \times \Delta p \geq h/2\pi \quad \cdots\cdots\cdots (v)$$

এখানে Δx ও Δp যথাক্রমে অবস্থান ও ভরবেগের অনিশ্চয়তাকে সূচিত করছে; অর্থাৎ উপরের সমীকরণ থেকে একটা বিষয় খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, কোন একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি গতিশীল কণিকার ভরবেগ ও অবস্থান নির্ণয় করলে নির্ণীত ফলাফলের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যাবেই এবং উপরিউক্ত ফলাফলগুলির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তাদ্বয়ের গুণফল কখনই একটি ধ্রুবক রাশি $(h/2\pi)$ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হতে পারে না।

তবে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সাধারণ বস্তুনিচয়ের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিধানের প্রয়োজনীয়তা প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ স্থূল বস্তুজগতের ক্ষেত্রে এই অনিশ্চয়তা-জনিত বিচ্যুতি এতই সামান্য হয়ে থাকে যে, তাকে অনায়াসেই পরিহার করা চলে। এই জন্যে এই নীতির প্রয়োগ কেবলমাত্র পরমাণু-জগতেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করা চলে। বর্তমান প্রসঙ্গে একটি বহুপ্রচলিত সহজ দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যেতে পারে।

ধরা যাক, আমরা কোন একটি পরমাণুর অভ্যন্তরস্থিত কোন একটি বিশেষ ইলেকট্রন সম্বন্ধে অবহিত হতে চাই। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পারিপার্শ্বিক কোন কিছুর সঙ্গে এর কোন ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া সংঘটিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং ইলেক-ট্রনটিকে দেখতে চাইলে আমাদের এর উপর আলোক সম্পাত করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা যদি সাধারণ দৃশ্য-আলোক ব্যবহার করি, তবে হয়তো এর ভরবেগ সম্বন্ধে আমরা বেশ খানিকটা নিশ্চিত হতে পারি। কারণ সাধারণ আলোর কম্পন-সংখ্যা খুব বেশী না হওয়ায় এর কোয়ান্টামে বেশী শক্তি থাকে না। সুতরাং আলোক সম্পাতের ফলে কণিকাটির ভরবেগের পরিবর্তন সামান্যই হবে। কিন্তু দৃশ্য-আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য একটি

পরমাণুর ব্যাসের চেয়েও বড়। সুতরাং আমরা ইলেকট্রনটির অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বেশ বড় রকমের অনিশ্চয়তার মধ্যে এসে পড়ছি। আবার আমরা যদি এই কাজে বেশ ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলো (রঞ্জেন রশ্মি) ব্যবহার করি, তবে আমরা ইলেকট্রনটির অবস্থান সম্বন্ধে বেশ নিশ্চিত হতে পারি। কিন্তু যেহেতু রঞ্জেন রশ্মির কোয়ান্টামগুলি অধিকতর শক্তিশালী, সেহেতু ইলেকট্রনটির ভরবেগ যথেষ্ট বদ্‌লে যাবে এবং আমরা এর ভরবেগ সম্বন্ধে বেশ অনিশ্চিত হয়ে পড়বো।

আপাত বিচারে এই অনৈশ্চিত্যকে একটি যান্ত্রিক অসুবিধা বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে এটি প্রকৃতির মুলনীতিগুলির মধ্যে অন্যতম এবং উপরিউক্ত সমস্যাটি অতিক্রম করবার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, এরকম অদ্ভুত ঘটনার কারণ কি? এর সহজ উত্তর হচ্ছে এই যে, ঘটনাটির মধ্যে আশ্চর্য কিছুই নেই, আসল গলদ হচ্ছে আমাদের চিন্তাধারায়। কারণ আমরা যার অনুসন্ধান করছি, তার বাস্তব অস্তিত্বই নেই; অর্থাৎ একটি বিশেষ মুহূর্তে কোন বস্তুর অবস্থান ও ভরবেগ—এই উভয় ধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়।

অনির্দেশ্যবাদ আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটি মূল স্তম্ভস্বরূপ। তবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে ছাড়াও এর একটি দার্শনিক মূল্য আছে। এই তত্ত্বের আলোচনা করলে আমাদের কাছে একটা সত্য সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে, তথাকথিত 'সাধারণ বুদ্ধি', যা দিয়ে সাধারণতঃ আমরা বাহ্যজগৎকে বিচার করে থাকি, তার প্রয়োগক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান থেকেই এর উৎপত্তি। সুতরাং পারমাণবিক এবং নাক্ষত্রিক উভয় জগতেই এর প্রয়োগ অচল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থুল বস্তুজগতের বাইরে একে প্রয়োগ করতে গেলে বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সংঘর্ষ অনিবার্য।

রক্ত ও তাহার কার্যাবলী

শ্রীস্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

মানবদেহে রক্তের পরিমাণ শরীরের ওজনের শতকরা প্রায় ৮ ভাগ, অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক যুবকের দেহে প্রায় ৫ লিটার রক্ত থাকে। দেহে ইহার গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৬০০ গজ। রক্তের প্রধান উপাদান প্লাজ্‌মা নামক একপ্রকার জলীয় পদার্থ। ইহাতে থাকে শতকরা ৯১ ভাগ জল, ৮ ভাগ প্রোটিন ও ১ ভাগ গ্লুকোজ, লবণ ও নানা প্রকার জৈব পদার্থ। এই জলীয় পদার্থের মধ্যে রক্তকণিকাগুলি (রক্তকোষ) ভাসিয়া বেড়ায়। রক্তকণিকা তিন রকমের হইতে পারে।

(১) লোহিত কণিকা (R B C)

(২) শ্বেত কণিকা (W B C)

(৩) অণুচক্রিকা বা Blood Platelets

লোহিত কণিকাগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র গোলাকার চাকতির মত। ইহাদের চলিবার বা আকৃতি পরিবর্তনের নিজস্ব ক্ষমতা নাই। মাছ ও উভচরদের লোহিত কণিকায় একটি বৃহৎ নিউক্লিয়াস থাকে। সরীসৃপ ও পাখীদের লোহিত কণিকার নিউক্লিয়াসটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু মানুষ ও স্তন্যপায়ী জীবদের লোহিত কণিকায় কোন নিউক্লিয়াস নাই—অবশ্য ইহাদের ভ্রূণে কিছুকাল পর্যন্ত নিউক্লিয়াস

থাকে। নবজাত শিশুর দেহের রক্তে প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে প্রায় ৬৫ হইতে ৭৫ লক্ষ লোহিত কণিকা দেখা যায়। কিন্তু শিশু যতই বড় হয়, এই সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং অবশেষে উহা ৪৫ হইতে ৬০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়। লোহিত কণিকার সর্বাপেক্ষা জটিল ও প্রধান উপাদান হইল হিমোগ্লোবিন। প্রোটিন ও লৌহ-যুক্ত এক বিশেষ ধরণের রঞ্জক পদার্থের যৌগিক প্রক্রিয়ায় ইহার উৎপত্তি। ইহার একটি বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহা অক্সিজেনসমৃদ্ধ অঞ্চল হইতে সহজেই অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া যে স্থানে অক্সিজেন কম আছে তথায় অক্সিজেন সরবরাহ করিতে পারে। এই আশ্চর্য গুণের জন্যই রক্ত ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়া যাইবার সময় ঐ স্থানের অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনের দ্বারা শোষিত হয় এবং দেহযন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হইবার সময় হিমোগ্লোবিন তাহার শোষিত অক্সিজেনের প্রায় সমুদয় অংশ কোষগুলিতে ছাড়িয়া দেয়। অস্থি-র মজ্জা হইল লোহিত কণিকার জন্মস্থান। প্রায় ৪ মাস ধরিয়া অক্সিজেন সরবরাহের প্রক্রিয়া চালাইবার পর ইহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে প্লীহা ও যকৃতে আসিয়া বিনষ্ট হয়। যকৃতের একটি বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহা বিনষ্ট লোহিত-কণিকার শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ লৌহ উদ্ধার করে এবং ঐ লৌহ মজ্জায় উপনীত হইয়া পুনরায় নূতন রক্ত উৎপন্ন করে। যকৃতের এই বিশেষ গুণটি না থাকিলে আমাদের দেহে শীঘ্রই হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমিয়া যাইত এবং আমরা রক্তাল্পতা (Anaemia) রোগে ভুগিতাম। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, মানবদেহে প্রতি সেকেণ্ডে ১২ লক্ষ লোহিত কণিকার জন্ম ও মৃত্যু ঘটে। প্রতি ১০০ কিউবিক সেন্টিমিটার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ প্রায় ১৪ গ্র্যাম।

এইবার শ্বেত কণিকার কথায় আসা যাক। ইহাদের সংখ্যা প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে ৪০০০ হইতে ১০০০০। সংখ্যায় ইহারা লোহিত কণিকার চেয়ে কম হইলেও ইহাদের গুরুত্ব কিন্তু কম নয়—ইহারাই আমাদের সত্যিকারের দেহরক্ষী। প্রতি মুহূর্তে আমাদের নাক, মুখ ও চামড়ার ছিদ্রপথ দিয়া অসংখ্য জীবাণু দেহে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু শ্বেত কণিকাগুলি ইহাদের ঘিরিয়া ফেলে এবং অবশেষে নিজেদের দেহের মধ্যে শোষণ করিয়া ধ্বংস করে। শ্বেত কণিকা চার রকমের হইতে পারে—নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল, বেসোফিল ও লিম্ফোসাইট।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রক্তে শ্বেত ও লোহিত কণিকা ছাড়াও আর এক ধরণের কণিকা আছে—ইহাদের নাম অনুচক্রিকা (Platelets)। প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে প্রায় ৩ হইতে ৫ লক্ষ অনুচক্রিকা থাকে এবং ইহাদের প্রধান কাজ হইল রক্ত জমাট বাঁধিতে সাহায্য করিয়া রক্তপাত বন্ধ করা। শরীরের কোন অংশ কাটিয়া রক্ত বাহির হইতে আরম্ভ করিলে রক্তরসের মধ্যে একের পর এক অতি সূক্ষ্ম তন্তু (Fiber) আবির্ভূত হয়। এইগুলি পরস্পরের সহিত মিলিয়া ক্রমে একটি ঘন জালের আকার ধারণ করে এবং এই জালের বুনানির মধ্যে রক্তকণিকাগুলি আবদ্ধ হওয়ায় রক্তপাত বন্ধ হয়। রক্তের এই জমাট বাঁধিবার কাজে ফাইব্রিনোজেন নামক প্রোটিন জাতীয় পদার্থও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে রক্তে এই ফাইব্রিনোজেন ও অনুচক্রিকাগুলি না থাকিলে শরীরের সামান্যতম ক্ষতস্থান হইতেও অবিশ্রান্ত রক্তপাত হইত এবং অবশেষে মৃত্যুও হইত সুনিশ্চিত। সাধারণতঃ ক্ষতস্থান হইতে রক্তপাত ৪-৫ মিনিটের মধ্যেই বন্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু যদি সময় আরও বেশী প্রয়োজন হয়, তবে সে ক্ষেত্রে থ্রম্বিনে সিক্ত গজ অথবা

ভিটামিন-K প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রক্ত দ্রুত জমাট বাঁধান হয়।

প্লাজ্‌মা বা রক্তরসের প্রধান উপাদান প্রোটিন। ইহা প্রধানতঃ তিন রকমের—ফাইব্রিনোজেন, অ্যালবুমিন ও গ্লোবিউলিন। ইহাদের কাজ নানাবিধ। ইহারা লৌহ, ফস্‌ফরাস, আয়োডিন, অ্যামিনো অ্যাসিড প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থকে রক্তপ্রণালীর মধ্য দিয়া দেহকোষে পৌঁছাইয়া দেয়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ভিটামিন, হরমোন ও ঔষধাদি রক্তস্রোতের দ্বারাই দেহকোষে পৌঁছায়। দেহ ধারণের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় পদার্থ যে অক্সিজেন, তাহাও রক্তস্রোতের দ্বারাই দেহকোষে পৌঁছায়। এইরূপে প্রতিদিন প্রায় তিন কিলোগ্র্যাম অক্সিজেন দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ হয়। এই অক্সিজেনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কেবল মস্তিষ্কের জন্যই প্রয়োজন

রক্তের যাত্রাপথের সুরু হয় হৃৎপিণ্ডের বামপার্শ্বে অবস্থিত মহাধমনী (Aorta) হইতে। ইহা বাম নিলয় (Left ventricle) হইয়া উপরের দিকে উঠে এবং পরে নীচের দিকে মেরুদণ্ডের পথে চলিতে থাকে। বৃহৎ ধমনীগুলি (Arteries) বারে বারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অসংখ্য প্রণালীর (Vessels) সৃষ্টি করে। এই সূক্ষ্ম প্রণালীগুলিকে বলা হয় কৈশিক নালী বা Capillaries। ইহারা এত সূক্ষ্ম যে, ইহাদের গড়পরতা প্রস্থচ্ছেদ এক বর্গমিলিমিটারের ৮ লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র, অর্থাৎ ইহারা মাথার চুল হইতেও সূক্ষ্মতর। এই কৈশিক নালীগুলির দ্বারাই দেহের সকল অংশে রক্ত সরবরাহ হয়। এই রক্ত অতঃপর বিপরীতমুখী হইয়া উচ্চ ও নিম্ন মহাশিরার (Superior and inferior vena cava) মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় এবং তথা হইতে দক্ষিণ অলিন্দে (Right ventricle) ফিরিয়া আসে।

এইবার রক্তের রোগ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা যদি বেশী বাড়িয়া যায়, তবে উহাকে বলা হয় লিউকোসাইটোসিস। ইহা ছাড়া লিউকেমিয়া নামক ক্যান্সার রোগেও শ্বেত কণিকার সংখ্যা ভীষণ রকম বাড়িয়া যায়—কখনও কখনও প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ইহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষের কাছাকাছি। এই রোগে অস্থি-র মজ্জায় অধিক পরিমাণ শ্বেত কণিকা উৎপন্ন হয়, কিন্তু সমানুপাতে লোহিত কণিকা তৈয়ারী হয় না; ফলে রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়। আবার রক্তে যদি শ্বেত কণিকার সংখ্যা স্বভাবিক অপেক্ষা কমিয়া যায়, তবে তাহাকে বলে লিউকোপেনিয়া। সাধারণতঃ সাল্‌ফা ঔষধের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার ফলে অথবা তেজস্ক্রিয় রশ্মির সংস্পর্শে আসিবার দরুণ এই রোগ হইয়া থাকে। আবার থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া রোগে রক্তে অনুচক্রিকার সংখ্যা হ্রাস পায়। থ্রম্বোসিস রোগে রক্তপ্রণালীর মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তঞ্চক-পিণ্ডের সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে রক্ত সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা সাধারণ রোগ হইল অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা। এই রোগে রক্তে লোহিত কণিকা অথবা হিমোগ্লোবিনের সংখ্যা সাধারণতঃ হ্রাস পায়। ফলে রক্তের অক্সিজেন পরিবহনের ক্ষমতা কমিয়া যায়। রক্তাল্পতা রোগের প্রধান কারণ হইল যথোপযুক্ত খাদ্যের অভাব, অত্যধিক রক্তক্ষয় অথবা লোহিত কণিকার ধ্বংস। রক্ত প্রস্তুতের জন্য যে সমস্ত পদার্থের প্রয়োজন, তাহাদের মধ্যে প্রধান হইল লৌহ, ভিটামিন B_{12}, ফোলিক অ্যাসিড ও প্রোটিন। এই কয়টি অত্যাবশ্যকীয় পদার্থের যে কোনটির ঘাটতি হইলেই রক্তাল্পতা রোগ দেখা দেয়। ১৯২০ সালে প্রোফেসর হুইপ্‌ল্ ও তাঁহার সহকর্মীরা আবিষ্কার করেন যে, খাদ্যে যদি যথেষ্ট পরিমাণ যকৃৎ থাকে, তবে রক্তাল্পতা

রোগ অল্পদিনেই আরোগ্য হইতে পারে।

যকৃতের মধ্যে এমন কি পদার্থ আছে, যাহার দ্বারা শরীরে রক্ত উৎপন্ন হইতে পারে? সুরু হইল বিজ্ঞানীদের গবেষণা। অবশেষে ১৯৪৮ সালে বিজ্ঞানী রিকেস যকৃৎ হইতে একটি নূতন পদার্থ পৃথক করিতে সক্ষম হইলেন। এই পদার্থটির বর্ণ গোলাপী, দেখিতে স্ফটিকাকার এবং জলে দ্রবণীয়। তিনি উহার নাম দিলেন ভিটামিন B_{12}। যকৃতের অপর এক প্রধান উপাদান হইল ফোলিক অ্যাসিড। ইহা আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী অ্যাঞ্জিয়ার ১৯৪৫ সালে। কাজেই রক্তাল্পতা রোগের চিকিৎসায় আজকাল খাদ্যের সহিত সরাসরি যকৃৎ (দৈনিক ২৫০ গ্র্যাম) গ্রহণ না করিয়া ইহার পরিবর্তে ঔষধ হিসাবে Liver extract ব্যবহার করা হইতেছে। ইহাতে ভিটামিন B_{12}, ফোলিক অ্যাসিড প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলি ঘনীভূত অবস্থায় বর্তমান থাকে।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা—বাস্তবে

পর পর সাতটি প্রবন্ধে শিক্ষা কি, শিক্ষার বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ও কাম্য রূপ আলোচনা করা হয়েছে। এবার কয়েকটি প্রবন্ধে এদেশে বর্তমানে শিক্ষা বাস্তবে কিভাবে চলছে, তা আলোচনা করা হবে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা—এই স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও প্রকৃতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধে* আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে এই স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন সে সব শিশুদের জন্যে, যাদের পরিবার বিত্তশালী না হওয়ায় বাবা, মা প্রভৃতি অভিভাবকদের জীবিকার জন্যে দিনের অধিকাংশ সময় বাড়ীর বাইরে থাকতে হয়। আর সে জন্যে শিশুর (৬ বছরের আগে) শারীরিক ও মানসিক সুষ্ঠ গঠনের জন্যে সাহায্য করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবে এসব পরিবারের অধিকাংশই অল্প আয়ের মজুর শ্রেণী ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এছাড়া এধরণের পরিবারের মধ্যে আসেন উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবার, যাঁদের কাম্য জীবনধারণের মান এরূপ যে, একজনের আয়ে ঐরূপ ভাবে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী দুইজনকে আয়ের চেষ্টা করতে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশে মজুর শ্রেণীর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, এঁদের নিজ নিজ শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করবার অবসর বা মানসিক অবস্থা থাকে না। আর দেশের ভাগ্যবিধাতা নেতাদের সময় ও সামর্থ্য এত কম যে, তাঁরা এসব দুর্ভাগাদের শিক্ষার জন্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার কথা ভাবেন না। আর যখন এসব দুর্ভাগারা নিজেরাই এই বিষয়ে সচেতন নয়, তখন এই বিষয়ে কিছু করলে নির্বাচনে কোনরূপ সুবিধা হবার কথা নয়। সুতরাং

*বর্তমান বর্ষের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' দ্রষ্টব্য।

এই বিষয়ে এখন দৃষ্টি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এজন্যে এদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেটুকু গড়ে উঠেছে, তা বড় বড় সহরে আর ধনী পরিবারের বা শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের জন্যে। এজন্যে এই স্তরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি খানিকটা বিলাসের জিনিষ, খানিকটা আভিজাত্যের নিদর্শন হিসাবে রয়ে গেছে, এদেশের সমাজের সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে কোন আত্মিক যোগাযোগ ঘটে নি। এখনও এটি সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে আসে নি। বর্তমানে সমাজের উচ্চস্তরে উগ্র সাহেবীয়ানার প্লাবন রয়েছে। এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। এই স্তরের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যম ইংরেজী, শিশুদের পোষাক-পরিচ্ছদ সাহেবী, আচরণ শিক্ষা দেওয়া হয় সাহেবী ঢঙে, শিক্ষা ব্যবস্থাও পুরাপুরি ইউরোপীয় ব্যবস্থার অনুকরণে। এর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। অবশ্য ইউরোপের কাছে যা শিক্ষণীয় তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে, তবে যতদূর সম্ভব এদেশের সমাজের জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। না হলে তা বাইরের জিনিষই থেকে যাবে, মজ্জাগত হবে না। যে সব পরিবারের জীবন-ধারণের মান, রীতি-নীতি ঐসব বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সে সব পরিবারের শিশুদের এতে বিরোধের মধ্যে পড়ে এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রাথমিক শিক্ষা—এই শিক্ষা এদেশের গঠনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একটি দায়রূপে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির উনিশ বছর পরেও এদেশে সমস্ত শিশুদের জন্যে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করে ওঠা সম্ভব হয় নি। আগেই বলা হয়েছে, বর্তমানে যে চার বছরের প্রাথমিক শিক্ষা আছে, তা প্রত্যেক প্রকৃত চিন্তাশীলের মতে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এবিষয়ে গান্ধীজী প্রমুখ কয়েক জন চিন্তাশীলের মতামত চতুর্থ প্রবন্ধে* আলোচিত হয়েছে। মাঝে মাঝে কেবলমাত্র পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষার কথা সরকারী মহলে আলোচনার কথা শোনা যায়, কিন্তু এদিকে এপর্যন্ত কিছুই করা হয় নি। আবার সরকারের বলিষ্ঠ নীতি, সুষ্ঠু পরিচালনা ও সিদ্ধান্তের স্থিরতার অভাবে এই চার বছরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সুষ্ঠু রূপ লাভ করে নি। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ইংরেজী পঠন-পাঠন তুলে দেওয়া হলো আবার গত কয়েক বছর থেকে ইংরেজী পঠন-পাঠন সুরু করা হয়েছে। ভাষা শিক্ষা কি নীতিতে দেওয়া উচিত, তা আগের অনেক প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে ও পরে একটি প্রবন্ধে আলোচিত হতে পারে। এখানে এই বিষয়ের পুনরায় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশতঃ নেতাদের মধ্যে ও শিক্ষার কর্ণধারদের বা তথা-কথিত অভিজ্ঞদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আছেন, যাঁরা শিক্ষার মান বলতে ইংরেজী শিক্ষার মান বোঝেন। এদের চেষ্টায় ইংরেজী প্রাথমিক শিক্ষা পুনরায় কায়েমী হলো।

প্রাথমিক শিক্ষার ভার নেবার কিছু পরে সরকার পাঠ্যপুস্তক সংস্কারে অগ্রণী হয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্যে 'কিশলয়' প্রকাশ করলেন। সে সময় শোনা গেল, এই 'কিশলয়' থেকেই ছাত্রদের সব বিষয় শেখানো হবে। এজন্যে এর এক ভাগে বাংলা ও অপর ভাগে পাটিগণিত দেওয়া হলো। পরে সরকারই 'প্রকৃতি পরিচয়' ও 'ইতিহাস' প্রকাশ করলেন। অবশ্য ৫ম শ্রেণীর 'কিশলয়'ও সরকার প্রকাশ করেছেন। এসব সত্ত্বেও বেসরকারী নানা ধরণের পাঠ্য-পুস্তক শিক্ষার আসর জমিয়ে থেকে গেল নানা-ভাবে। এ কেবল শিক্ষার স্বার্থেই রয়েছে মনে

*এপ্রিল (১৯৬৬) সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' দ্রষ্টব্য।

হয় না, এর পিছনে আছে অন্যান্য কায়েমী স্বার্থের সক্রিয় প্রভাব। বহু বিদ্যালয়েই সরকার প্রকাশিত বইগুলির সঙ্গে সহপাঠনের ছুতায় অন্য বাংলা বই, পাটিগণিতের বই প্রভৃতি ছেলেদের কিনতে বাধ্য করা হয়। আবার অযোগ্য সরকারী ব্যবস্থায় সরকার প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক-গুলি দোষমুক্ত হয়ে আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠে নি। যখন দেশের সর্বস্তরের শিক্ষায় অর্থ পুস্তক ও পরীক্ষা-সহায়ক পুস্তকগুলির অপকারিতা সরবে ঘোষিত হচ্ছে, তখন সরকারী পরিচালনার ব্যর্থতায় আর প্রাথমিক শিক্ষকদের ও পুস্তক বিক্রেতাদের যোগসাজসে 'কিশলয়' ও 'Peacock Reader' অর্থপুস্তক না নিয়ে কেনা প্রায় অসম্ভব। এর উপর 'ছাত্রবন্ধু' 'প্রাথমিক বান্ধব' প্রভৃতি বইগুলি শিক্ষক মশায়দের চেষ্টায় প্রায় অবশ্য পাঠ্য। প্রাথমিক স্তরেই যদি অধিকাংশ ছাত্রকে অর্থপুস্তক সরলীকরণের (Made Easy) পুস্তকগুলির উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়, তবে পরে এবিষয়ে ছাত্রদের প্রতি দোষারোপ করবার সার্থকতা কি?

সরকারী ব্যবস্থায় এই স্তরে দু-রকমের বিদ্যালয় আছে—প্রাথমিক ও বুনিয়াদী। গান্ধীজী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থার কিছু কিছু নিজস্ব ত্রুটিতে ও সরকারী সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে এপর্যন্ত বহু অর্থ অযথা ব্যয় করা হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষার নামে। আবার প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের স্থান, গৃহ, উপকরণ ও শিক্ষক সম্বন্ধে যে সব বিধিনিষেধ কাগজ-পত্রে থাকে, তা সাধারণভাবে কাগজী আইন থেকে যায়। এই বিষয়ে অন্যান্য বিবেচনা থেকে সাধারণতঃ কাজ করা হয়।

স্বাধীনতার পরেই জেলায় 'স্কুলবোর্ড' গঠন করে সেই সেই জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব ঐ বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়। অবশ্য এসব 'স্কুলবোর্ড'-এ জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের যোগাযোগের কোন চেষ্টা না করে সম্পূর্ণ দলীয় স্বার্থ বিবেচনায় সদস্য গ্রহণ করা হয়। এই সদস্যদের অনেকেই শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। এঁরা শিক্ষকদের ধারণা জন্মান যে, তাঁদের প্রধান কর্তব্য, ছাত্রদের নিয়ে মিছিল করে গিয়ে দলের নেতাদের সংবর্ধনা করা এবং দলীয় সংগঠন ও নির্বাচনে সাহায্য করা। শিক্ষকদের মাসে মাসে নিয়মিত বেতন দেবার ব্যবস্থা প্রথম দিকে বহু বোর্ডই করে উঠতে পারেন নি। আবার বেতনের কাগজপত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই তৈরি করে স্থানীয় বিদ্যালয়ের অবর-পরিদর্শক মারফৎ পাঠাতে হবে। কারণ বিদ্যালয়ের নিয়মিত পরিদর্শনের ভার সরকারী কর্মচারী এই সকল অবর-পরিদর্শকের। এই ব্যবস্থায় শিক্ষকদের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয়। বেতনের বিল পাঠাবার, 'কিশলয়' প্রভৃতি বই আনবার জন্য, আরও নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে অবর-পরিদর্শকের অফিসে ও বাড়ীতে শিক্ষকদের হাজিরা দিতে হয়। শিক্ষকেরা আক্ষরিক, তাঁরা শীঘ্রই বুঝে নিলেন, যে কটা টাকা বেতন পাওয়া যায় তার জন্যে বেশী প্রয়োজন বোর্ডের স্থানীয় সদস্য ও তাঁর অনুচরদের আর অবর-পরিদর্শককে সন্তুষ্ট রাখা। ছাত্রদের লেখাপড়ায় যত্ন নেওয়া বা দৃষ্টি দেওয়া তো গৌণ কর্ম। আর গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে যদি ভাল সম্পর্ক থাকে, তবে তো ছেলেদের পড়াশুনা করানোরও দরকার থাকে না। এর উপর যদি বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণী, স্বাধীনতা দিবস, সরস্বতী পূজা, রবীন্দ্র জয়ন্তী ান করে বোর্ডের সদস্য বা প্রভাবশালী কোন নেতা ও অবর-পরিদর্শককে বিদ্যালয়ে এনে শিক্ষকদের পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কর্মতৎপরতা দেখানো যায়, তবে অযোগ্যতা বা কর্মে অবহেলার কথা তো উঠতেই পারে না। পাঠ্য বিষয়ের পঠন-পাঠন তো ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য, আর

এর জন্যে আছে 'ছাত্রবন্ধু', 'প্রাথমিক বান্ধব' প্রভৃতি পুস্তক, আর দক্ষিণার বিনিময়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সাহায্য গৃহশিক্ষকতা। অবশ্যই এরও ব্যতিক্রম আছে—এখনও কিছু কিছু কর্মনিষ্ঠ শিক্ষক আছেন, তবে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। বড় সহরে এই শিক্ষার ভার 'করপোরেশন' বা মিউনিসিপালিটির উপর ন্যস্ত; তবে সেখানকার সামগ্রিক চিত্র প্রায় একরূপ, সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন জীবনধারণের প্রয়োজনের তুলনায় এতই অল্প যে, তাঁদের বইয়ের বা অনুরূপ ছোটখাট কারবার, নিজের ও আত্মীয়দের জমির চাষবাস দেখা ও বাকী সময়ে গৃহশিক্ষকতা করতেই হয় এবং প্রায় সবাই করেন। কেউ কেউ আবার গৃহশিক্ষকতার সুবিধার জন্যে বিদ্যালয়ে এমনভাবে পড়ান যে, ছাত্রদের গৃহশিক্ষকতার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। শিক্ষার জন্যে আছে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সরকারী ব্যবস্থা ও তার পরিপূরক বেসরকারী প্রচেষ্টা—গৃহশিক্ষকতা। এদেশে প্রায় সব শিক্ষা-ব্যবস্থাই এই মিশ্রনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষকদের বেতনের স্বল্পতা ও সামাজিক অমর্যাদা যোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষায় আকৃষ্ট করে না। অন্য কোন বৃত্তি না পেয়ে সাধারণতঃ লোকে শিক্ষকতা করে, অপর কোন বৃত্তি সুবিধামত সংগ্রহ করতে পারলেই শিক্ষকতা ত্যাগ করেন। যাঁরা শিক্ষকতায় থেকে যান, তাঁরাও তা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন না; সহজ কথায় সাধ্যমত ফাঁকি দেন। নিউটনের নিয়মমত জড় বস্তুর গতি অবস্থার জাড্য আছে। জার্মান বিজ্ঞানী ক্লাইন একটু শ্লেষ করে বলেছেন, লোকের বুদ্ধিগত অবস্থার জাড্য বা পরিবর্তন না করবার ঝোঁকে কথা বলেছেন। মানুষের ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তিরও জাড্যধর্ম সহজে পরিবর্তিত হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিবর্তন করে বিশেষ চাপ সৃষ্টি করতে না পারলে এর পরিবর্তনের কোন আশা নেই।

শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থাও অপ্রতুল ও দোষযুক্ত। এক্ষেত্রেও অরাজকতা আছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিত্তি। এর সুব্যবস্থা না হলে দেশে উচ্চমানের শিক্ষা হওয়া কখনই সম্ভব নয়।

শ্রীমহাদেব দত্ত

বিজ্ঞান-সংবাদ

ভ্যানিলিনের বিকল্প এসেন্স

হায়দরাবাদের আঞ্চলিক গবেষণাগারে ভ্যানিলিনের বিকল্প একটি মিশ্র বস্তু উদ্ভাবিত হয়েছে এবং ফ্লেভার তৈরি বা সুবাসিত করবার কাজে তা ভ্যানিলিন অপেক্ষা পনেরো-বিশ গুণ বেশী সার্থক হয়েছে। কেরলে উৎপাদিত এক ধরণের দারুচিনি পাতার রসই এই নতুন ভ্যানিলিনের প্রধান অংশ। এর নাম দেওয়া হয়েছে লোংগিনিন। ব্যবহারকারীরা জিনিষটিকে সানন্দে গ্রহণ করেছেন। ভ্যানিলিন তৈরির জন্যে আমাদের প্রায় ৪ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হতো। লোংগিনিন উদ্ভাবনের ফলে এখন তার সাশ্রয় হবে।

জমি পরীক্ষার নতুন যন্ত্র

ব্যাঙ্গালোর কৃষি কলেজ ও গবেষণা মন্দিরে মাটি পরীক্ষার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। কাজের দিক থেকে এটি আমদানীকৃত সোলুব্রীজ নামক যন্ত্রটির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এর প্রত্যেকটি অংশই দেশে তৈরি করা হয়। জমির উর্বরতা পরিমাপের জন্যে জল ও মাটির বিদ্যুৎ-পরিচালন ক্ষমতা মূল্যায়নের জন্যে এই যন্ত্রের দরকার হয়। জমি পরীক্ষা যেমন জরুরী, সরল যন্ত্রও তেমনি প্রয়োজন এবং ব্যাঙ্গালোরে উদ্ভাবিত ঐ ইলেকট্রনিক যন্ত্রটিও খুবই সরল।

অ্যালুমিনা-ইট

কলিকাতার সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউটে একটি নতুন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে, যার সাহায্যে ৭০ থেকে ৯৫ শতাংশ অবধি অ্যালুমিনাসম্পন্ন ইট তৈরি করা যায় এবং এই ইট তৈরি করতে বিদেশ থেকে কোন কিছু আমদানী করতে হয় না। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে এই ইট অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইটগুলি যেমন খুব বেশী তাপ সহ্য করতে পারে, তেমনি ক্রমাগত জলে ভিজলেও তার কোন ক্ষতি হয় না।

গিসার উপত্যকায় পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কার

সম্প্রতি তাজিকী কৃষকদের আবিষ্কারকে পুরাতত্ত্ববিদগণ সাম্প্রতিক কালের সর্বাধিক চাঞ্চল্যকর বলে অভিহিত করেছেন। মধ্য এশিয়ার গিসার উপত্যকায় তুলা চাষ করবার সময় তাঁরা খুঁজে বের করেন দুটি প্রস্তর স্তম্ভশীর্ষ, যেগুলির প্রকৃতই খুব শৈল্পিক মূল্য আছে।

চার কোণে ক্ষোদিত রয়েছে সিংহের দেহ ও ড্রাগনের পাখাযুক্ত অদ্ভুত জীব। চিত্তাকর্ষক অবয়বযুক্ত মনুষ্যমূর্তির পরনে নেংটি এবং নারীদের হাতে আয়তাকার পাত্র ও গলায় হার রয়েছে।

পুরাতত্ত্ববিদগণের বিশ্বাস, এগুলি খৃষ্টীয় প্রথম শতকের গ্রীকোবৌদ্ধ (গান্ধার) শিল্পকলার নিদর্শন। এই শিল্পকলার ব্যাপক প্রচলন ছিল ভারত, আফগানিস্থান ও দক্ষিণ তাজিকীস্তানের এলাকায়। এর আগে এই সংস্কৃতির একটি মাত্র নিদর্শন—তারমেজের বিখ্যাত এয়ার্তাম কারুকার্য-খচিত কার্নিশতল—সোভিয়েট ইউনিয়নে পাওয়া গেছে।

স্তম্ভশীর্ষ ছাড়াও বহুসংখ্যক মৃৎপাত্রের টুকরা ও দু-হাজার বছরের পুরনো জিনিষ পাওয়া গেছে নতোবাদ গ্রামে। এর মধ্যে আছে

চিত্রিত পাত্র, মদ ও ফসল রাখবার বিরাট বিরাট কলসী, মাটির জলের পাইপের টুক্‌রা এবং প্রথম শতকের মুদ্রা।

পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের খননকার্যের ফলে নিবারণ করা সম্ভব হয়েছে যে, এককালে এখানে ছিল প্রায় ৩৫০ হেক্টর জমির উপর এক নগরী। এর চারপাশ ঘিরে ছিল অন্ততঃ সাত কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর। খননকার্যের ভারপ্রাপ্ত তাজিকী পুরাতত্ত্ববিদ আহরোর মুখাতারোফ মনে করেন যে, এই নগরীর আকার প্রাচীন সমরখন্দ ও বোখারার অনুরূপ ছিল।

তিন-শ' কোটি বছর আগেকার জীবন

সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী সাইবেরীয় শাখায় প্রাক-কেম্ব্রীয় প্রত্নজীববিদ্যা সম্পর্কে যে আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করা হয়েছে, তাতে অংশগ্রহণকারীগণ বিশ্বাস করেন যে, প্রায় তিন শত কোটি বছর আগে আমাদের গ্রহে জীবনের আবির্ভাব ঘটেছিল। দীর্ঘ দিন ধরে বিজ্ঞান-জগতে এই অভিমত প্রাধান্য লাভ করেছিল যে, আমাদের গ্রহে গাছপালা ও প্রাণীর প্রধান নমুনাগুলি রূপ গ্রহণ করেছিল আরও পরবর্তী যুগে—ভূতত্ত্বে যে যুগের নাম ক্যাম্বিয়ান যুগ।

এই ধরণের এই প্রথম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স, নরওয়ে, ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড ও জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিকের বিজ্ঞানীরা।

শুধুমাত্র তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে নয়, এই বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, বিশেষ করে লৌহ-আকর সন্ধানের পদ্ধতি সম্পর্কেও

নবজাত শিশু শীতে কাঁপে না কেন?

ঠাণ্ডার জন্যে মানুষ কাঁপে—না, কাঁপুনি গা গরম করবার একটা উপায় মাত্র? কিছুদিন আগে চিকিৎসকেরা লক্ষ্য করেন, নবজাত মানবশিশু অত্যন্ত শীতল পরিবেশেও কাঁপে না।

অক্সফোর্ডের দু-জন চিকিৎসক রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। নবজাত শিশুদের শীতে কাঁপুনির প্রয়োজন হয় না—কারণ তাদের দেহের মধ্যেই থাকে 'তৈরি উনুন' বা 'গরম জলের বোতল'; অবশ্য তা থাকে খয়েরী রঙের চর্বির আকারে।

জন্মকালে মানবশিশুর কাঁধের পাখ্‌নার মাঝে, বুকের পাঁজরের পিছনে এবং মেরুদণ্ডের সর্বত্র 'ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু' থাকে। নবজাত খরগোসের ক্ষেত্রে এই টিস্যুর ওজন মোট ওজনের শতকরা ৬ ভাগ।

শিশুরা যে গা গরম রাখতে এই অ্যাডিপোজ টিস্যু (চর্বিবহুল) কাজে লাগায়, এটি ডাঃ মাইকেল ডকিন্স ও ডাঃ ডেভিড হালের আবিষ্কার। ডাঃ ডকিন্স ছিলেন তাঁর সহকর্মী।

প্রথমতঃ চিকিৎসকেরা লক্ষ্য করলেন, এই চর্বি টিস্যুগুলি খরগোস-শিশুর দেহ থেকে সরিয়ে নিলে তারা ঠাণ্ডায় দেহ গরম রাখবার শক্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে। সাধারণতঃ খরগোস-শিশুকে হিমাঙ্কের তাপমাত্রায় রাখলে তারা তিন গুণ অক্সিজেন গ্রহণ করে। কিন্তু খয়েরী টিস্যুগুলিকে অপসারিত করলে তাদের অক্সিজেনের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় না। স্পষ্টতঃ খরগোস বা মানবশিশুর দেহের খয়েরী চর্বি-টিস্যুগুলিই অতিরিক্ত অক্সিজেন ব্যবহারের জন্যে দায়ী।

এই টিস্যুগুলির রং খয়েরী হবার কারণ, এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে লৌহ থাকে। দ্রুতগতি শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে লৌহের প্রয়োজন হয়। চিকিৎসকেরা দেখিয়েছেন, এই খয়েরী টিস্যুগুলি জরুরীকালীন তাপোৎপাদক হিসাবে খুবই ভাল—এমন কি, পরিশ্রমের ফলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী যে গতিতে তাপ উৎপাদন করে, তার চেয়ে দ্রুততর গতিতে এরা তাপ উৎপাদন করতে পারে।

শীতকালে যে সব প্রাণী মৃতবৎ হয়ে থাকে, তারা এই ভাবেই তাপোৎপাদন করে।

এই সব গবেষণার মূল্য এই যে, প্রয়োজন হলে কৃত্রিম উপায়ে এই জরুরীকালীন তাপ সরবরাহ অব্যাহত রাখা যেতে পারে।

তেজস্ক্রিয় স্ট্রনসিয়ামের অনিষ্টকারিতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের সংগ্রাম

দেহের ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ বহুলাংশে হ্রাস করতে পারে, এমন পদার্থ দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের হারওয়েলে অবস্থিত মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের রেডিও বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইউনিট আবিষ্কার করেছেন।

ত্ব-বছর ধরে ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সোডিয়াম অ্যালজিনেট (সমুদ্রের আগাছা থেকে পাওয়া) দেহের স্ট্রনসিয়াম গ্রহণ এক-চতুর্থাংশ কমিয়ে দিতে পারে।

পারমাণবিক পরীক্ষার ভস্মরাশি থেকে স্ট্রনসিয়াম-৯০ খাদ্যে (প্রধানতঃ দুধ ও তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যে) সঞ্চিত হয়।

কিছু খাদ্য-সংযোজক পদার্থ আছে, যা দেহের স্ট্রনসিয়াম গ্রহণ হ্রাস করতে পারে, কিন্তু সেগুলি আবার দেহের ক্যালসিয়াম গ্রহণের পরিমাণও হ্রাস করে—অথচ দেহগঠনের জন্যে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন।

অ্যালজিনেটের প্রাণিদেহকে স্ট্রনসিয়াম গ্রহণ থেকে দূরে রাখবার ক্ষমতা এখনো পর্যন্ত ঠিকমত জানা যায় নি, তবে তাদের অণু-সজ্জার কাঠামো জানা আছে। রেডিও বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইউনিটের পরিকল্পনা আছে—রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের অ্যালজিনেট তৈরি করে প্রাণিদেহের স্ট্রনসিয়াম গ্রহণ হ্রাস সম্পর্কে পরীক্ষা চালান। শীঘ্রই ইঁদুর ছেড়ে মানবদেহে পরীক্ষা চালানো হবে। লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউন্সিলের স্বেচ্ছাসেবকদের উপর অল্প পরিমাণ স্ট্রনসিয়াম ও সোডিয়াম অ্যালজিনেট প্রয়োগ করে তার ফলাফল দেখা হবে। স্ট্রনসিয়াম-৯০ হলো দীর্ঘায়ু রেডিও আইসোটোপ। সে জন্যে এই সব পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু স্ট্রনসিয়াম-৮৫ ব্যবহার করা হবে।

স্ট্রনসিয়াম সম্পর্কিত এই গবেষণা রেডিও বায়োলজিক্যাল ইউনিটের মানবদেহের উপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা প্রকল্পের একটি অংশ মাত্র।

পারমাণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার ও মহাকাশযানের যুগ সুরু হলে মানবদেহ আরও বেশী করে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে আসবে।

ইউনিট প্রজননের ব্যাপারে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা চালাচ্ছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী তেজস্ক্রিয়তা সহ্য করতে পারে। এর কারণ অবশ্য জানা যায় নি।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—১৯৬৬

১৯শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা
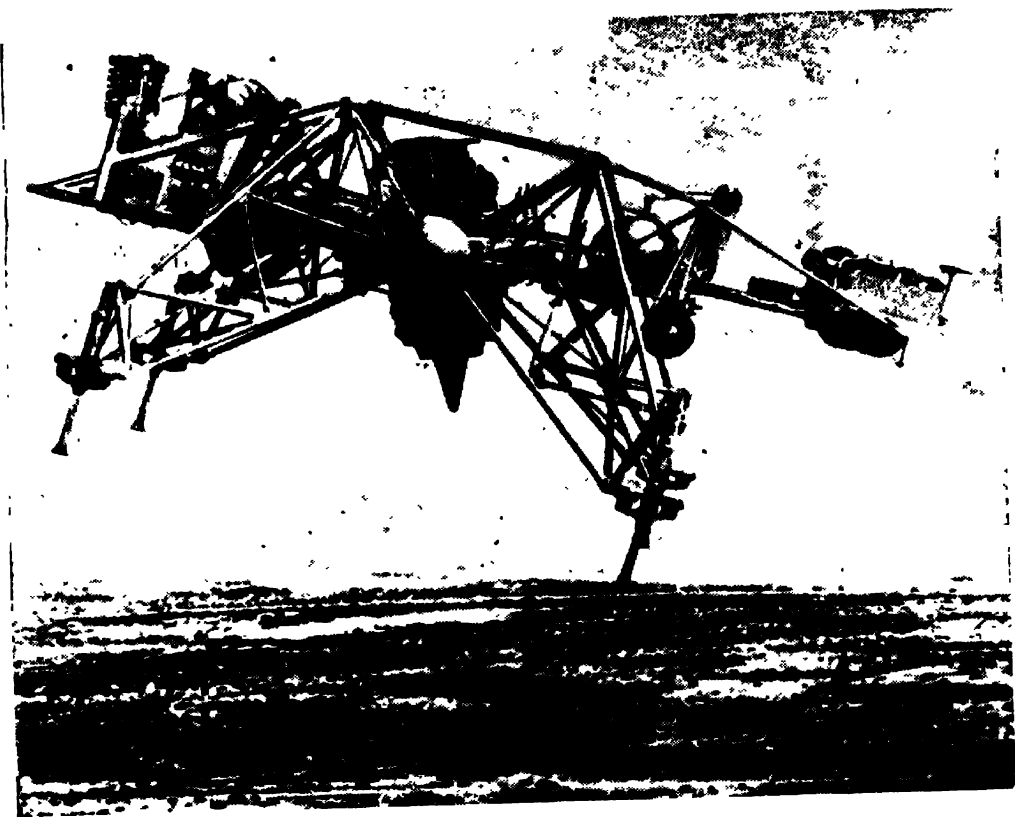
এরূপ একখানি ডানাশূন্য যানের সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে নিরাপদে অবতরণের জন্যে টেষ্ট পাইলট ডন ম্যালিক ক্যালিফোর্নিয়ার রোজার্স ড্রাই লেকে পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

করে দেখ

জটিল সমস্যা

প্রায় আড়াই ফুট বা তিন ফুট লম্বা সরু একগাছা দড়ি টেবিলের উপর রেখে তোমার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা কর, তাদের মধ্যে কেউ সেই দড়িটার দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরে কোন প্রান্ত থেকে হাতের মুঠো না ছেড়ে দড়িটার মধ্যে একটা গেরো দিতে পারে কি না।

দড়িটার দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরে রেখে মধ্যস্থলে একটা গোরা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে মনে হলেও খুব একটা সহজ কৌশলেই কিন্তু কাজটা করা যায়।

কৌশলটা হচ্ছে—প্রথমে তোমার হাত দুটি মুড়ে ডান হাতখানা বাঁ-হাতের বাহুর উপরে রাখ এবং বাঁ-হাতখানা ডান হাতের উপর দিয়ে ডান বাহুর নীচে চালিয়ে দাও। এবার টেবিলের উপরে রাখা দড়িটার দুই প্রান্ত দুই হাত দিয়ে ধর। এখন হাত দুটির ভাঁজ ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আনলেই দেখবে, দড়িটার মাঝখানে

একটা গেরো পড়ে গেছে। ছবিটা লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। ডান হাত বাঁ-হাতের উপর না রেখে বাঁ-হাত ডান হাতের উপর এবং ডান হাত বাঁ-হাতের উপর দিয়ে বাম বাহুর তলায় নিয়ে দড়িটার দুই প্রান্ত ধরে হাত খুলে নিলেই দড়িতে উল্টো মোচড়ের গেরো পড়বে।

—গ—

আর্কিওপ্‌টেরিক্স

বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে আমরা প্রথম পাখীর অস্তিত্ব পাই জুরাসিক যুগে —আজ থেকে প্রায় ষোল কোটি বছর আগে। জুরাসিক যুগে ছিল অতিকায় সরীসৃপদের প্রাণের মহোৎসব। জলে-স্থলে ছিল তাদের অবাধ রাজত্ব। আকাশেও ডানা মেলে ধরলো এই সরীসৃপেরা—যেমন টেরোড্যাকটিল। শূন্যে ডানা মেলে ওড়বার আনন্দ তারা প্রথমে অনুভব করলো। এই উড়ুক্কু সরীসৃপেরা রূপান্তরিত হয়েছিল পাখীতে—একথা স্বীকার করতেই হবে। এটা ঠিক যে, প্রথম পাখীর জীবাশ্মে দেখতে পাই, পাখী আর সরীসৃপের অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

জীবাশ্ম বা ফসিলের ইতিহাসে আর্কিওপ্‌টেরিক্স নিঃসন্দেহে প্রথম পাখী। জার্মেনীর ব্যাভেরিয়ার সোলেন হফেন-এ চুনাপাথরে শিলীভূত সুন্দর দুটি ফসিল পাওয়া গেছে। এছাড়া পাওয়া গেছে কিছু টুক্‌রা ফসিল। কবে কোন এক অগভীর সমুদ্রের অবক্ষেপে সঞ্চিত হচ্ছিল চুন ও মাটি—আর প্রথম পাখী নিশ্চয়ই পড়েছিল সেই সঞ্চয়নে। তারপর কত যুগ কেটে গেছে—তার আকৃতি আজও ধরে রেখেছে সোলেন হফেনের চুনাপাথর।

সোলেন হফেন চুনাপাথরের খ্যাতি ছিল। চুনাপাথরের খনিতে পাথর কাটবার সময় পাওয়া গেছে পাতার ছাপ, অমেরুদণ্ডী জীব, মাছ, সরীসৃপ—এমন কি, উড়ুক্কু সরীসৃপ টেরোড্যাকটিলের হাড়গোড়ও পাওয়া গেছে। সুতরাং পাথরের রহস্য ছাড়াও ফসিল সংগ্রহকারীদের একটা আকর্ষণ ছিল সোলেন হফেনের চুনাপাথরে।

এমনি একজন ছিলেন ডক্টর কার্ল হাবার লেইন—প্যাপেন হাইমের মেডিক্যাল অফিসার—অবসর সময় অনুসন্ধান করেন পাথরের স্তরে স্তরে লুপ্ত প্রাণের নীরব ইতিহাস।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের এক সুন্দর সকালে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা দিল। পাথরের গায়ে অবিকল একটা পাখীর ঝরা পালকের ছাপ। তবে কি সেই সময় পাখী ছিল? ৬৮ মিলিমিটার লম্বা অনুরূপ ছাপ পড়েছিল পাথরের উল্টো দিকে। আসল পাথরের

টুক্‌রাটা পাঠানো হলো মিউনিকের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমিতে। আর উল্টো দিকের পাথরের ছাপটা রইলো বার্লিন মিউজিয়ামে।

কিছুদিন পর প্যাপেন হাইমের আর একটা খনিতে পাথরের উপর আর একটা পাখীর কঙ্কাল পাওয়া গেল। শিরদাঁড়া, হাত, পা ছিল—তাছাড়া পাখ্‌নার ছাপও ছিল। ডানা না থাকলে সত্যিকার সরীসৃপ থেকে আলাদা করা যেত না। এই আবিষ্কার খনির শ্রমিকদের মধ্যেও চাঞ্চল্য এনে দেয়। কারণ তারা প্রথম থেকেই নানারকম ফসিলের সঙ্গে পরিচিত ছিল, কিন্তু পাখার ছাপ তারা কোন দিনই দেখে নি। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর হাবার লেইন সেটা সংগ্রহ করেন। সারা ইউরোপে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। ফন মেয়ার এর নামকরণ করেন আর্কিওপ্‌টেরিক্স লিথোগ্রাফিকা।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ মিউজিয়ামের ভূতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষক হাবার লেইনকে চিঠি লেখেন যে, তারা তাঁর সংগ্রহটি কিনতে চান। অনেক কথা, অনেক লেখার পর সেই বিখ্যাত পাখীর পালক ও হাবার লেইনের অন্যান্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ সাত-শ' পাউণ্ডের বিনিময়ে কিনতে রাজী হলো। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরের পয়লা তারিখ বৃটিশ মিউজিয়ামে পৌঁছলো সেই বহু প্রতীক্ষিত ডক্টর হাবার লেইনের সংগ্রহ। ডক্টর হাবার লেইন অবশ্য সেই সাত-শ' পাউণ্ড মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিয়েছিলেন। অধ্যাপক ওয়েগ্‌নার কিন্তু আগেই নাম দিয়েছিলেন—গ্রিফোসোরাস, লম্বা লেজওয়ালা টেরোড্যাকটিল—যদিও ডক্টর ওয়েগ্‌নার ফসিলটা স্বচক্ষে দেখেন নি। লোকের কথা শুনে তাঁর এই ধারণা হয়েছিল। বৃটিশ মিউজিয়ামে আসবার পর ফসিলটি নিয়ে গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত হন রিচার্ড ওয়েন। তিনি এই নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন এবং ফসিলটির নামকরণ করেন আর্কিওপ্‌টেরিক্স ম্যাকরুরা।

এক-শ' বছরেরও বেশী কেটে গেছে, সেই ফসিল পাখীটার আবিষ্কারের পর। বহু বিজ্ঞানী পরীক্ষা করেছেন এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন। তবে দুটি জিনিষ নিশ্চিতভাবে জানা গেছে। প্রথম হচ্ছে—আর্কিওপ্‌টেরিক্স পাখী এবং দ্বিতীয় হচ্ছে সরীসৃপের সঙ্গে অদ্ভুত বিবর্তনের যোগ আছে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ব্লুমেনবার্গে আর একটা দুষ্প্রাপ্য পাখার ফসিল পাওয়া যায়। এটা প্রথম আবিষ্কারের জায়গা থেকে দশ মাইল দূরে। এর নামকরণ করা হলো আর্কিওপ্‌টেরিক্স সিমেনসি।

মনে হয়, আর্কিওপ্‌টেরিক্সের বাসস্থান ছিল ডাঙ্গায়। খুব বেশী ওড়বার শক্তি ছিল না। কোন এক ঝড়ো হাওয়ায় হয়তো উড়ে পড়েছিল সোলেন হফেন হ্রদে, যেখানে সঞ্চিত হচ্ছিল চুন স্তরে স্তরে। চাপা পড়ে গেল সেই প্রথম পাখী—ডান পা, নীচের চোয়াল আর ঘাড়ের কাছের শিরদাঁড়া ছাড়া সবই পাওয়া গেছে। আকারে আর্কিওপ্‌টেরিক্স বড়জোর দাঁড়কাকের মত ছিল। শিরদাঁড়া ও করোটিতে সরীসৃপের

সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। এছাড়া ছিল লম্বা লেজ। সামনের হাত দুটি স্বভাবতঃই বড় ছিল পাখ্‌নার জন্যে। তাছাড়াও ছিল পাখীর মত বক্ষফলক। মোরগ যেভাবে ছোটে, আর্কিওপ্‌টেরিক্স বোধ হয় সে ভাবেই ছুটতো। আকৃতিগতভাবে দেখলে আর্কিওপ্‌টেরিক্স আধা সরীসৃপ, আধা পাখী। কিন্তু যেহেতু পাখ্‌না আছে, সেহেতু আর্কিওপ্‌টেরিক্স নিঃসন্দেহে পাখী।

পাখী যে সরীসৃপ থেকে উদ্ভূত, সে কথা সকলেই স্বীকার করেন। আর্কোসরিয়ান সরীসৃপ ও আর্কিওপ্‌টেরিক্সের মধ্যবর্তী রূপ ঠিক কি রকম হবে—এ নিয়ে মতভেদ আছে।

জল আর ডাঙ্গা ছেড়ে পাখী প্রথম কেন উড়লো, এই নিয়ে দুটি মতবাদ আছে। কেউ কেউ বলেন, প্রথম পাখী জোরে দৌড়াবার সময় পাখাওয়ালা সামনের হাত দুটাকে মেলে ধরতো, যেমন এখনও অনেক পাখীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। বিবর্তনের ফলে পাখাওয়ালা হাত দুটি শুধু দৌড়াবার সময়ই নয়, ওড়বারও সাহায্য করতো।

কেউ কেউ আবার বলেন, ঠিক তা নয়—প্রথম পাখী গাছে উঠতো। মাটিতে নামতো পাখ্‌না দুটি মেলে। বর্তমানে উড়ুক্কু কাঠবিড়ালীরা যেমন ভাবে গাছ থেকে নামে। ওড়বার এই প্রথম চেষ্টা। প্রথমে নিশ্চয়ই পাখাওয়ালা সামনের হাত দুটি ছোট ছিল। কিন্তু বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন মেটাবার জন্যে সামনের পালকওয়ালা হাত দুটি বড় হয়ে দেখা দিল। পাখী ডানা মেলে ধরলো অসীম নীলাকাশে।

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

কুমীর

ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে কুমীরের গল্প খুবই প্রিয়। শেয়াল পণ্ডিত আর কুমীর ভায়ার গল্প ছেলে-মেয়েদের অজানা নয়। চিড়িয়াখানায় কুমীর দেখবার জন্যে ছেলে-মেয়েরা সকলেই অধীর হয়ে ওঠে। চিড়িয়াখানায় কুমীর দেখে ছোটদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। চিড়িয়াখানায় কিন্তু কুমীর স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে না—নির্জীব অবস্থায় পড়ে থাকে। কুমীর সম্বন্ধে কেবল আমাদের দেশেই নয়—পৃথিবীর সব দেশের ছোট-বড় প্রত্যেকেরই কৌতূহল অদম্য।

কুমীরের চেহারা দেখেই মনে হয়—এদের সঙ্গে আমাদের অতি পরিচিত টিক-টিকির কতকটা সাদৃশ্য আছে। কুমীর হচ্ছে এক জাতের সরীসৃপ। কুমীর উভচর

প্রাণী; অর্থাৎ এরা জলেও থাকে, আবার ডাঙ্গায়ও বিচরণ করে। কুমীরের জন্ম হয় ডাঙ্গায় তারপর যায় জলে।

সুযোগ পেলেই কুমীর মানুষ ধরে খায়, তাছাড়া তাদের বিরাট আকৃতির জন্যে সবাই তাদের ভীতির চক্ষে দেখে, তবে সব কুমীর কিন্তু মানুষ খায় না। "জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না"—এই প্রবাদ বাক্য থেকেই মানুষের কুমীর ভীতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে কোথাও কোথাও (যেমন মিশর দেশে) কুমীর-ভীতি থেকেই কুমীর-পূজার প্রচলন হয়েছিল। প্রাচীন কালে মিশরে কুমীরকে দেবতা হিসাবে পূজা করা হতো। কুমীরের সম্মানার্থে মন্দির তৈরি করা হতো, আর সেই সব মন্দিরে নীল নদের জ্যান্ত কুমীর রাখা হতো এবং তাকে নানা রকম ভোজ্যদ্রব্য নিবেদন করা হতো। সময় সময় দেশের সেরা সুন্দরী কুমারী মেয়েকে নানা রকম অলঙ্কারে সাজিয়ে সাড়ম্বরে শোভাযাত্রা করে নীল নদের জলে কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করা হতো। আবার মিশরেরই কোন কোন অঞ্চলে কুমীরকে শয়তানের প্রতীক হিসাবেও গণ্য করা হতো! অ্যাপোলিনোপোলিসে (Apollinopollis) বছরে একবার কুমীর শিকারের অভিযান চালানো হতো। যত বেশী সম্ভব কুমীর মেরে সেগুলিকে শিকারীরা তাদের দেবতার কাছে উৎসর্গ করতো। মিশরে অনেক কুমীরের 'ম্যমি' আবিষ্কৃত হয়েছে। মোগল যুগে ভারতে কুমীর শিকারের বিচিত্র বর্ণনা দিয়েছেন ভিনিসীয় পর্যটক Niccolao Manucci। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে কুমীরের পূজা প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। মিশরে এক সময়ে দেবতার তুষ্টিবিধানের জন্যে কুমীরের মুখে নবজাতক উৎসর্গ করবার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

১৬০০ থেকে ১৮০০ শতাব্দীর মধ্যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কুমীরের ব্যাপক চাহিদা ছিল। তখনকার লোকেদের বিশ্বাস ছিল—কুমীরের শুষ্ক রক্ত নাকি সর্পবিষ প্রতিষেধক এবং চোখের ব্যাধি নিরাময়ের অমোঘ ওষুধ। কুমীরের পিত্তরস এবং গল-ব্লাডার শুকিয়ে গুঁড়া করে এক রকম মলম তৈরি হতো। তাদের ধারণা ছিল, এই মলম চোখে লাগালে নাকি দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। মানুষের দেহের কোন অংশে অস্ত্রোপচারের দরকার হলে সেই স্থানটা অবশ করা দরকার। কুমীরের চামড়া শুকিয়ে তাকে গুঁড়া করে ভিনিগার বা তেলের সঙ্গে মিশিয়ে অস্ত্রোপচারের স্থান অবশ করা হতো। কুমীরের চর্বি দেহে মালিশ করলে নাকি জ্বর কমে যায়, কুমীরের মল নাকি টাকে মাখলে চুল গজায়—এই বিশ্বাসও তখন চালু ছিল। অবশ্য এই সব বিশ্বাস তৎকালে মানুষের মনে কেন সৃষ্টি হয়েছিল, তার কারণ জানা যায় না। আজ এই সব কথা শুনে অনেকেই হয়তো অবাক হচ্ছো। আফ্রিকানদের এক সময়ে ধারণা ছিল—কুমীরের দাঁতের মালা তৈরি করে গলায় পড়লে তার কোন বিপদ হবে না।

কোন কোন আফ্রিকান উপজাতির মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রথা চালু ছিল—তাদের গোষ্ঠীর লোকদের কুমীর সম্বন্ধে সাংঘাতিক ভীতি ছিল। গোষ্ঠীর কাউকে কুমীরে কামড়ালে বা লেজ দিয়ে আঘাত করলে তাকে তৎক্ষণাৎ গোষ্ঠী থেকে তার স্ত্রী ও সন্তানসহ বের করে দেওয়া হতো। কুমীর কর্তৃক আক্রান্ত কোন লোক তাদের গোষ্ঠীভুক্ত হলে অন্যান্যদের অমঙ্গল হবে—সম্ভবতঃ এই ধারণা থেকেই এই প্রথার উদ্ভব। প্রাচীন চীনেও কুমীরকে যথেষ্ট ভক্তি ও ভয় করা হতো। অনেকের ধারণা অ্যালিগেটরের আকৃতির অনুকরণেই চীনের বিখ্যাত ড্র্যাগনের মূর্তির কল্পনা করা হয়েছিল। ক্রুদ্ধ ড্র্যাগনের বৃষ্টি বন্ধ করবার এবং ভূকম্পন ঘটাবার ক্ষমতা আছে বলে এক সময়ে চীনে বিশ্বাস করা হতো।

আমেরিকা এবং চীন দেশে অ্যালিগেটর নামক এক জাতের কুমীর দেখা যায়। কুমীরের সঙ্গে অ্যালিগেটরের চেহারায় সামান্য পার্থক্য আছে। অ্যালিগেটরের মুখ লম্বাটে ও চওড়া এবং অগ্রভাগ গোল ও ভোঁতা। কুমীরের মুখ লম্বাটে এবং সম্মুখের দিকে সরু হয়ে থাকে।

কুমীরের পিঠের উপর উঁচু হাড়ের মত কতকগুলি শক্ত গুটিকা সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকে। এই শক্ত গুটিকার সারি কুমীরের শরীরের বর্ম হিসাবে কাজ করে। এই বর্ম ভেদ করে শত্রুর পক্ষে কুমীরকে আক্রমণ করা সহজ নয়। কুমীরের পিঠের রং কালো এবং পেটের রং হলদে। কুমীরের চোখ দুটি থাকে মস্তকের উপরিভাগে। তার নাকের ছিদ্র দুটি থাকে উপরের দিকে। জলের মধ্যে শরীরটা ডুবে থাকলেও এদের চোখ এবং নাসারন্ধ্র জলের উপরে থাকে, কাজেই দেখা বা শ্বাসক্রিয়ার কোন অসুবিধা হয় না। কুমীরের লেজ যেমন স্থূলাকার তেমনই শক্তিশালী। লেজের সাহায্যে কুমীর জলে স্বচ্ছন্দে সাঁতার কেটে বেড়ায়। কুমীরের লেজের শক্তি অসাধারণ। লেজের ঝাপটায় এরা যে কোন বড় প্রাণীকে ঘায়েল করতে পারে। কুমীর শরীরটাকে উঁচু করে ডাঙ্গার উপর চলাফেরা করে। সাধারণতঃ ডাঙ্গার উপর এরা বেশী দূরে যায় না, জলের কাছাকাছিই থাকে। ভয় পেলে কাদামাটির উপর দিয়ে হড়্‌কে জলে নেমে যায়। কুমীরের দাঁত যেমন শক্ত, তেমনি ধারালো। কোন কারণে দাঁত ভেঙ্গে গেলে আবার নতুন দাঁত গজায়। উপর এবং নীচু উভয় চোয়ালেই কুমীরের দাঁত আছে। একবার কামড়ে ধরতে পারলে আর মুখ খোলে না। শিকারের পক্ষে তখন আর কুমীরের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় না। ছোট বড় নানা রকমের কুমীর দেখা যায়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের নদী, ঝিল, হ্রদে সাধারণতঃ কুমীর দেখা যায়। সময় সময় সমুদ্রেও এদের দেখা যায়।

কুমীর পুরাপুরি আমিষভোজী প্রাণী। এরা খুব পেটুক। শিকার বাগে পেলেই আক্রমণ করবে। কোন কোন জাতের কুমীর একবারে খাবারটাকে সম্পূর্ণ না খেয়ে

কিছুটা ভবিষ্যতের জন্যে কোন কিছুর আড়ালে লুকিয়ে রেখে দেয় এবং পরে সুবিধামত উদরসাৎ করে। মেছো কুমীর বা ঘড়িয়াল প্রধানতঃ মৎস্যভোজী—মাছ ছাড়া অন্য কিছুর দিকে এদের নজর থাকে না। মাছ না পেলে এরা যে উপবাস করে থাকে তাও নয়, তখন অন্য যা মুখের কাছে পায় তাই খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। আমাদের দেশে ঘড়িয়াল গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী এবং তাদের শাখা নদীতে দেখা যায়। এরা চটপট মাছ শিকারে বেশ ওস্তাদ। পাখী, হরিণ, গরু, ঘোড়া, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মানুষ প্রভৃতি কুমীরের খাদ্য। সাধারণতঃ জলপান করতে এসেই বিভিন্ন জানোয়ার কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত হয়। শিকারকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে কুমীর তাকে জলের নীচে নিয়ে যায় এবং শিকার ছোট হলে তাকে গিলে খায়। এ তো গেল ছোট ছোট প্রাণী শিকারের কথা। শিকার বৃহদাকারের হলে কুমীরের পক্ষে তাকে একেবারে গিলে ফেলা সম্ভব হয় না। তখন কুমীর অদ্ভুত কৌশলে শিকারের আক্রান্ত অংশটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। শিকারের শরীর কামড়ে ধরে কুমীর প্রবল বেগে জলে ঘুরপাক খেতে থাকে ; ফলে আক্রান্ত অংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন কুমীর তা গিলে খায়। ডাঙ্গায় উঠেও অনেক সময় কুমীর শিকার ধরে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। জলে কুমীরের দাপট সাংঘাতিক। দূরে শিকারকে লক্ষ্য করে কুমীর জলের নীচ দিয়ে শিকারের কাছে এসে তাকে আক্রমণ করে। কুমীর তার ঘাড় এদিক-ওদিক ঘোরাতে পারে না, কাজেই সোজাসুজি এসে শিকারকে আক্রমণ করে। সুতরাং শিকার কিছুটা এদিক-ওদিক সরে গেলে কুমীরের পক্ষে তাকে আর আক্রমণ করা সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে সুন্দরবনের নদী-নালায় প্রচুর কুমীর দেখা যায়। সময় সময় ঝিল, নালা, বদ্ধ জলাশয়েও মানুষ-খেকো কুমীর দেখা যায়। কুমীর নদীতে ভাসমান পচা বা গলিত মৃতদেহও উদরসাৎ করে।

'কুম্ভীরাশ্রু' কথাটার মানে তোমরা সবাই জান—অর্থাৎ মায়া কান্না। আসলে শিকার বড় হলে তা গিলবার সময় কুমীরের শ্বাস নিতে কিছুটা অসুবিধা হয়—তখন তার চোখ দিয়ে প্রচুর জল নির্গত হয়, মনে হয় যেন শিকারকে খাবার জন্যে তার দুঃখেই সে কাঁদছে। এথেকেই 'কুম্ভীরাশ্রু' কথাটির উদ্ভব।

সাধারণতঃ কুমীর ৮।১০ হাত লম্বা হয়। এরা সাধারণতঃ ৭০ থেকে ১০০ বছর বাঁচে। অবশ্য এর চেয়েও বেশী বছর বাঁচতে কোন কোন কুমীরকে দেখা গেছে। কুমীরের শত্রু থাকলেও পূর্ণবয়স্ক কুমীরের একমাত্র শত্রু হচ্ছে মানুষ। কুমীরের নানারকম চামড়া দিয়ে তৈরি হয় জুতা, ব্যাগ, সুটকেশ প্রভৃতি। কুমীরের চামড়ার ব্যবসায়ে বহু লোকই নিযুক্ত আছে। ব্যাপক শিকারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কুমীরের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

কুমীর নিশাচর প্রাণী সাধারণতঃ রাতেই এরা শিকার ধরে। রাতে কুমীরের গর্জনও শোনা যায় বেশী। সকাল বেলায় এরা নদীর পাড়ে উঠে রোদ পোহায়। ডাঙ্গায় উঠে এরা খুব সতর্কভাবে থাকে। সামান্য বিপদের আভাস পেলেই দ্রুত-গতিতে জলে নেমে যায়। কুমীরের পরমবন্ধু হচ্ছে প্লোভার নামক এক জাতের পাখী। কুমীর যখন হাঁ করে নদীর পাড়ে বিশ্রাম করে, তখন এরা কুমীরের মুখের মধ্যে ঢুকে দাঁতের গোড়া থেকে মাংসের টুক্‌রা এবং জোঁক খুঁটে খুঁটে খায়। এজন্যে কুমীরের
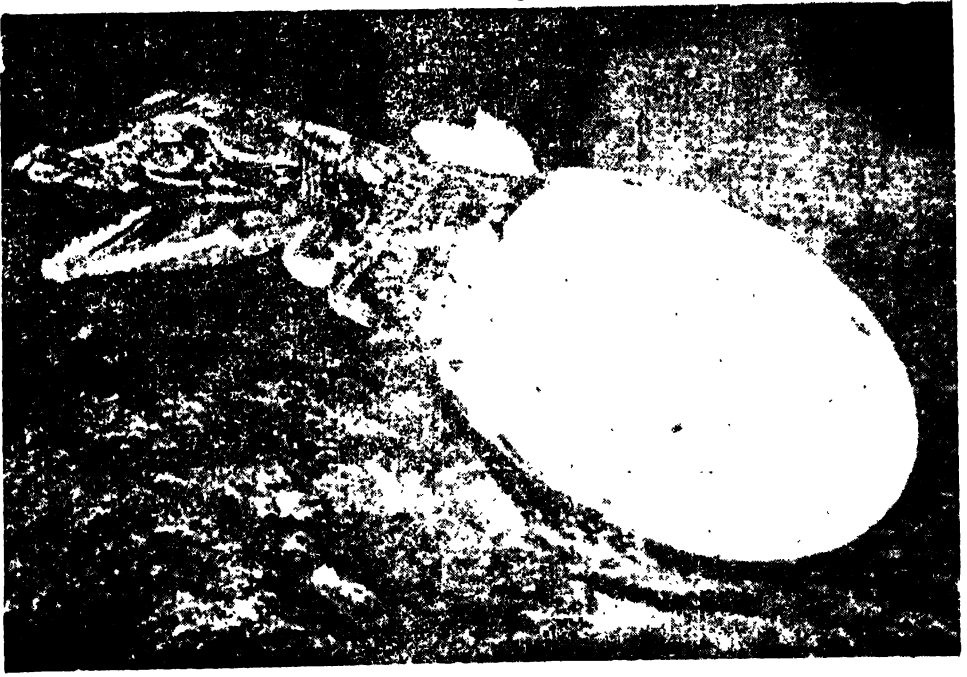
ডিম থেকে কুমীরের ছানা বেরিয়ে আসছে।

দাঁতও পরিষ্কার থাকে। বিপদের ইঙ্গিত পেলেই এই পাখীরা 'জাই-জ্যাক' শব্দে চীৎকার করে ওঠে। এই শব্দের জন্যে এদের 'জাই-জ্যাক' পাখীও বলা হয়। পাখীর শব্দ শুনে কুমীর সতর্ক হয়ে জলে নেমে যায়। সারা শীতকালে কুমীরের দেখা মেলা ভার। তখন এরা নিরাপদ স্থানে নির্জীব অবস্থায় সময় কাটায়। একে বলে কুমীরের -ঘুম।

স্ত্রী-কুমীর নির্জন নদীর পাড়ে পায়ের নখের সাহায্যে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে ৪০ থেকে ৬০টা পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিমগুলি রাজহাঁসের ডিমের মত। ডিম পাড়বার

পর গর্তের মুখ বালি, কাদা বা লতা-পাতার সাহায্যে বন্ধ করে পাহারায় থাকে। কেউ কেউ আবার সময় সময় গর্তের উপরেই শুয়ে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই ডিম থেকে বাচ্চাগুলি কিচির-মিচির শব্দ করতে থাকে। স্ত্রী-কুমীর সেই শব্দ শুনেই গর্তের মুখ খুঁড়ে তাদের বেরুবার পথ করে দেয়। স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত কুমীর তাদের উপর নজর রাখে।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানে খুঁড়িয়া জল পাওয়া যায়, ইহার দ্বারা কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পৃথিবীর উপরিভাগ জলের উপর ভাসিতেছে? যদি তাহা না হয়, তবে জলের উৎস কোথায়?

প্রঃ ২। প্রতিদিন যে লক্ষ লক্ষ গ্যালন জল তোলা হইতেছে, ইহাতে কোন ক্ষতি হইতেছে না কেন?

মদনমোহন নস্কর

উঃ ১। না, পৃথিবীর উপরিভাগ জলের উপর ভাসিতেছে না। পৃথিবীতে যতটা বৃষ্টিপাত হয় তাহার সবটাই নদীর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়ে না। একটা বিশেষ
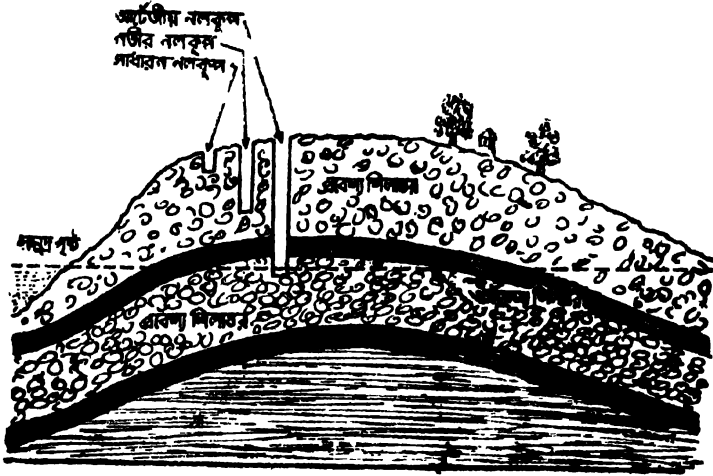
অংশ, যেখানে বৃষ্টি পড়ে সেখানকার মাটির নীচে চোঁয়াইয়া যায়। ভূত্বক শিলাস্তর দ্বারা গঠিত। কোন কোন শিলা সহজেই উহার ভিতর দিয়া জল যাইতে দেয়, কোন কোন

শিলা জল একেবারে যাইতে দেয় না। ইহাদের বলা যাইতে পারে যথাক্রমে প্রবেশ্য শিলাস্তর ও অপ্রবেশ্য শিলাস্তর। জল প্রবেশ্য স্তরে জমা থাকিতে পারে। দুইটি অপ্রবেশ্য স্তরের মধ্যেকার প্রবেশ্য স্তরেও জল সঞ্চিত থাকে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। একটি প্রবেশ্য স্তরের যতটা জল ধারণের ক্ষমতা আছে, তাহা পূর্ণ হইলে জল গড়াইয়া অন্য দিকে যায়। কোন প্রবেশ্য স্তরে কূপ খনন করিলে পাম্পের সাহায্যে আমরা জল পাইতে পারি। আবার ঐ স্থানে জলের উপর পার্শ্বচাপ বেশী হইলে জল আপনা হইতেই উপরের দিকে ওঠে। যেহেতু আমরা পৃথিবীর যত কেন্দ্রাভিমুখী হই, ততই উত্তাপ বাড়ে। তাই যে জল যত গভীর হইতে আসে, তাহার তাপও তত বেশী হয়।

উঃ ২। কোন প্রবেশ্য স্তরে যতটা জল সঞ্চিত ছিল, পাম্পের সাহায্যে আমরা সেই জলটাই উপরে তুলি। তাই সাধারণতঃ ইহার (পৃথিবীর উপরিভাগ) কোন ক্ষতি হয় না।

অনিল কুমার ঘোষাল

শোক-সংবাদ

কুমার হারীতকৃষ্ণ দেব

কুমার হারীতকৃষ্ণ দেব অকস্মাৎ পরলোক গমন করেছেন, শুক্রবার ২২শে জুলাই। বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁর কাছে আমরা বরাবর প্রেরণা ও সহানুভূতি পেয়ে এসেছি। বিজ্ঞান প্রচারের নানা সভায়, পরিষদের আয়োজিত নানা উৎসবে এত বৎসর তাঁকে সব সময় কাছে পেয়েছি—এতদিন। বিজ্ঞান কলেজের বহু কর্মীদের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাঁর মহাপ্রয়াণে সকলে ভাবছি—একজন অকৃত্রিম সুহৃদকে হারালাম। হারীতকৃষ্ণ জন্মেছিলেন শোভাবাজারের প্রসিদ্ধ রাজ পরিবারে—জানুয়ারী, ১৮৯৪ সালে। প্রাচীন কালের সমৃদ্ধি ও সমারোহ অনেকাংশে অন্তর্হিত হলেও তাঁদের পৈত্রিক ভবনে সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার আবহাওয়া তখনও বর্তমান ছিল। পিতামহ উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাংলায় সামাজিক উপন্যাস লিখেছিলেন, এক সময়ে তার খুব আদর হয়েছিল। শৈশবে হারীতকৃষ্ণ অন্যান্য নাতি-নাতনীদের সঙ্গে তাঁর কাছে অনেক রঙ্গরসের কাহিনী শুনতেন। হারীতের শ্লেষ ও কৌতুক-প্রবণতা হয়তো এইভাবে শিশুকাল থেকেই লালিত ও পুষ্ট হয়েছিল। পিতা অসীমকৃষ্ণের লাইব্রেরীতে নানাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের সংগ্রহ ছিল। এই সব বই তিনি আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন; গ্রীস, রোম, আরব, ভারত, ঈজিপ্ট সম্পর্কে তাঁর নতুন ধরণের নানা অভিমত ছিল, নিজের বৈঠকখানায় বন্ধুদের কাছে মাঝে মাঝে হাজির করতেন সে সব—তবে অভিজ্ঞ মহলে প্রতিষ্ঠা পেতে যে প্রকারের অনুসন্ধান বা পরিশ্রম করার দরকার, তাতে তাঁর বিশেষ রুচি ছিল না। শোভাবাজারের রাজবাটীতে বৈঠকী নৃত্য-গীত—সাহিত্য নাটক আলোচনার ঐতিহ্য

বহুদিনের। অসীমকৃষ্ণ গানবাজনার মধ্যেই নিবিড় আমোদ পেতেন—নিজে হারমনিয়াম বাজাতেন অপূর্ব সুন্দর—অনেক বিখ্যাত সুরকার, গায়কেরা তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করতো—মাঝে মাঝে বাড়ীতে বসতো বিখ্যাত গায়ক-বাদকদের জলসা।

হারীতকৃষ্ণ এই আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন। নিজে ভাল গাইতে পারতেন—যত্ন করে শিখেছিলেন টপ্পা, ঠুংরী ও রবীন্দ্র চৌধুরীর বীরবলী প্রবন্ধগুলি বের হয়ে গিয়েছে, চলিত বনাম সাধুভাষা আন্দোলনের দেশে তখন ভরা জোয়ার। 'সবুজপত্র' বের হচ্ছে। চৌধুরী মশায়ের ব্রাইট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে প্রতি হপ্তায় বসতো সাহিত্যের আসর। রবীন্দ্রনাথকে কখনও কখনও সেখানে দেখা যেত, সঙ্গীতের আসরে দিলীপ রায় প্রমুখ গানবাজনা করতেন। পরিণত-বয়স্ক যশস্বী কৃতবিদ্যদের সঙ্গে অনেক নবীনদেরও সেখানে যাওয়া-আসা ছিল। উত্তরকালে তাঁরা

কুমার হারীতকৃষ্ণ দেব

সঙ্গীত সমকালীনদের মধ্যে সমজদার বলে তাঁর সুখ্যাতি ছিল।

প্রথম কয়েক বৎসর স্কটিশ-চার্চ কলেজে পড়াশুনা করে শেষে প্রেসিডেন্সী থেকে ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করেন। আইন শিক্ষা সুরু করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেই সময়ে প্রমথ চৌধুরী মশায় ল'-ক্লাসে অধ্যাপনা করতেন—হারীত ছিলেন তাঁর এক ছাত্র।

নানাভাবে যশস্বী হয়েছেন। নবীনদের মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ তখন প্রমথ চৌধুরীর বিশেষ স্নেহের পাত্র—তাঁর সঙ্গী হারীতকৃষ্ণও সেখানে যাওয়া-আসা করতেন। চৌধুরী মশায় চাইতেন নবীনেরা কলম ধরুক, বাংলাভাষায় ইতিহাস-বিজ্ঞান-কাব্য-দর্শন সব বিষয়েই নিজেদের স্বকীয় মতবাদ—প্রবন্ধ লেখাতে ব্যক্ত করুক। এইভাবে

তাঁরই উৎসাহে হারীত এবং আরও অনেকের বাংলা লেখায় হাতেখড়ি হয়।

প্রায় সেই সময়ে প্রাচীন ভারতের ও বিশ্বের ইতিহাস আলোচনার জন্যে—কলকাতায় নতুন স্নাতকোত্তর ক্লাস প্রথম খোলা হলো। দেবদত্ত ভাণ্ডারকর এলেন কারমাইকেল প্রফেসর হয়ে। প্রথম দিকের ছাত্র হিসাবে প্রবোধ বাকচী, ননী মজুমদার-রা তখন অধ্যয়ন সুরু করেছেন। হারীতকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে গিয়ে জুটলেন। পিতার নিত্যসঙ্গী হিসাবে হারীতকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই প্রাচীন কালের ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করে-ছিলেন। এইবার অনুসন্ধানীদের সাহচর্যে গবেষণার কাজে নেমে পড়লেন। ডিগ্রী তাঁর লক্ষ্য নয়—রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভাণ্ডারকর সকলেরই কাছে যাচ্ছেন—নতুন কথা শুনতে ও পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করতে। আইন পড়া বন্ধ হলো। পিতার নানা কৌতূ-হলোদ্দীপক মতবৈশিষ্ট্যের ঐতিহাসিক ভিত্তি খোঁজবার আগ্রহ জাগলো। সুরু হলো সংস্কৃত—পালি — ভাষাতত্ত্ব — শিলালেখ — তাম্রশাসনের আলোচনা—পুরনো মুদ্রার পরিচিতি ইত্যাদি। নিজের পরিশ্রম ও সাধনায় একাজে সুনাম ও সিদ্ধি অর্জন করলেন। বিক্রমাদিত্য, অশোক, উদয়ণের বিষয় নতুন কথা বলেছেন। ভারতে প্রাচীন পদ্ধতিতে বর্ষগণনার আলোচনা করেছেন। জ্যোতিষের আলোচনা করেছেন বা শক-যবনের কথা অথবা বেদে উল্লিখিত পণি-কপর্দী ও পৌলস্ত্যের আন্তর্জাতিক স্বরূপ নির্ধারণের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে।

সারা জীবন এই সব নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। শেষের কয় বৎসর ইচ্ছা হয়েছিল নিজের কতক-গুলি মতবাদকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন—এর জন্যে আবার নতুন উদ্যমে অধ্যয়ন ও আলোচনা সুরু করেছিলেন। তবে নানা ঝঞ্ঝাট ও অশান্তির দরুণ কাজটি শেষ করে যেতে পারেন নি—এটি বড়ই দুঃখের কথা। কিশোর বয়স থেকেই সুদর্শনকান্তি—সৌজন্য, ভদ্র ব্যবহার, মধুর-কণ্ঠস্বর ও রঙ্গ-রসপ্রবণতা—বন্ধুমহলে তাঁকে একান্ত প্রিয়জন করেছিল। সব সমাজেই তিনি অন্তরঙ্গের মত মিশে যেতে পারতেন। তাঁকে দেখা যেত হেদুয়ার সাঁতারের ক্লাবে—ইউনিভার-সিটির নাট্য আয়োজনে, বঙ্গ সংস্কৃতির সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসরে—কিশোর কল্যাণ পরিষদে ও আরও কত জায়গায়। কাতর বন্ধুরা আজ তাঁর মিষ্টস্বভাব, সহজ সহমর্মিতা, তাঁর হারমনিয়াম বাজনা—সঙ্গীত ও কৌতুক-কথা মনে করছে।

প্রথম বয়সে বিজ্ঞান, গণিত ও ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন সুরু করেছিলেন—পরে 'সবুজপত্র' ও 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সম্পর্কে এসে বুঝেছিলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-প্রচারের বিপুল প্রয়োজনীয়তা। তাই সব সময় তাঁকে আমরা বিজ্ঞান সভায় সহৃদয় বন্ধুভাবে পেয়ে এসেছি।

অকৃতদার, সারাজীবন সরস্বতীর সেবা করেছেন তিনি, পয়সাকড়ির জন্যে নিজের আদর্শকে কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নি। সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় ২২শে জুলাই শোভাবাজার পৈত্রিক ভবনের বারান্দায়—তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে।

সত্যেন বোস

ক্ষেত্রমোহন বসু স্মরণে

গত ৭ই জুলাই, ১৯৬৬ ডঃ ক্ষেত্রমোহন বসু হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করেন। ঐদিন তিনি ফলিত গণিত বিভাগে গণিত-জ্যোতিষের ক্লাসে অধ্যাপনাকালে বিশেষ অসুস্থতা বোধ করেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার চিকিৎসার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু সবই বিফল হয়—অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৭০ বৎসর। তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ১৫ই অগাষ্ট, ১৮৯৬।

ক্ষেত্রমোহন বাবুর আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলায়—হুগলী জেলার সীমান্তের নিকট। তিনি মালাধর বসুর (যিনি 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের প্রথম বঙ্গানুবাদ রচনা করেন) বংশধর। এই বংশেই বৈষ্ণব কবি এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অনুচর রামানন্দ বসু জন্মগ্রহণ করেন। এই বসুবংশের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে, তবে ক্ষেত্রমোহন বাবুর পিতামহ জৌগ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। ক্ষেত্রমোহন বাবু বাল্যকাল হইতেই কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি সাউথ সুবারবন (মেন) স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। পরে উচ্চশিক্ষার্থে স্কটিশচার্চ কলেজে যোগদান করেন। গণিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি. এস্‌-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিতের (তখনকার মিশ্র গণিতের) এম. এস্‌-সি ক্লাসে যোগদান করেন। সে সময় (অধুনা স্বর্গতঃ) অধ্যাপক মেঘনাদ

ক্ষেত্রমোহন বসু

সাহা ঐ বিভাগে অধ্যাপনা করিতেন। ক্ষেত্রমোহন বাবু ও তাঁহার কয়েকটি সহপাঠিকে লইয়া ঐ বিভাগে Geodesy and Geophysics Special Paper-এর অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। এই বিষয়টির অধ্যাপনা করিতেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। তিনি কৃতিত্বের সহিত এম. এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছু দিন পরে তিনি অধ্যাপক সাহার অধীনে গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন—Wave Mechanics-এ। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক সাহার অধীনে কিছু দিনের জন্য Research Fellow in Mathematical Physics ছিলেন। তাঁহার গবেষণার সাফল্যে তিনি ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস্-সি উপাধি লাভ করেন। তিনি কিছুদিনের জন্য ঢাকায় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গেও গবেষণা করিয়াছিলেন—Wave Mechanics-এ। জার্মান অধ্যাপক Arnold Sommerfeld-এর Atombau und Spektrallinien, Band II, (Braunschweig, 1939)-এ তাঁহার Stark-effect সংক্রান্ত গবেষণার উল্লেখ আছে।

প্রথম জীবনে তিনি বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজে অধ্যাপনা করেন। তারপর অল্প কিছু দিনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিতের অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগে Part-time lecturer -এর পদে যোগদান করেন এবং ফলিত গণিত বিভাগের সঙ্গে তাঁহার এই সম্পর্ক তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল (শুধু অল্প দিনের জন্য ছুটি লইয়া আসানসোল কলেজে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন)। ১৯৪৭ সালে তিনি চারুচন্দ্র কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯৫৫ সালে ঐ কলেজের উপাধ্যক্ষ ও ১৯৫৮ সালে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং ১৯৬৪ সালে অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

জীবনের বেশীর ভাগ সময়েই তাঁহাকে স্বল্প বেতনে কাজ করিতে হইয়াছে। এমতাবস্থায় তাঁহাকে একবার তাঁহার এক শিক্ষাগুরুর অনুরোধে তখনকার দিনের একটি ভাল পদের বাসনা পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি এই জন্য কখনও ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই বা কর্মে শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই।

তিনি খুব অমায়িক এবং শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহার খুব প্রিয় ছিল এবং তিনি ছাত্রদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে একজন সাতিশয় সহানুভূতি-সম্পন্ন অধ্যাপকের তিরোভাব ঘটিল।

তাঁহার কর্তব্য-প্রীতি ছিল অপরিসীম। শেষ দিন ফলিত গণিত বিভাগে আসিয়া ক্লাসে যাইবার সময় তিনি একটু অসুস্থতা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার সহকর্মিরা তাঁহাকে ক্লাসে না যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই—বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য আগে তিনি কয়েকটি ক্লাস লইতে পারেন নাই, এই চিন্তা তাঁহাকে মনঃকষ্ট দিতেছিল।

তিনি স্কুল ও কলেজের জন্য কয়েকখানি সুন্দর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং আর একখানি পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশের পঞ্জিকা সংস্কার কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং বাংলাভাষায় সুখবোধ্য অনেক প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও ছয় কন্যা, আত্মীয়স্বজন, অগণিত ছাত্র ও গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবগণকে শোকে মুহ্যমান করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞান কলেজ ও সাহা ইনষ্টিটিউটের বহু বিজ্ঞানী তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান জ্ঞাপনের জন্য ফলিত গণিত বিভাগে আসেন। তাঁহার প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় ফলিত গণিত বিভাগে উপস্থিত হইয়া শবদেহে মাল্য দান করেন। ফলিত গণিত বিভাগের পক্ষ হইতে বিভাগীয় প্রধান মহাশয় মাল্যদান করেন এবং ফলিত গণিত বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইতেও মাল্য দান করা হয়। বিজ্ঞান কলেজ হইতে শেষ বিদায়ের সময় জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুও উপস্থিত ছিলেন।

পরিমলকান্তি ঘোষ

অধ্যক্ষ রমণীমোহন রায়

গত ৪ঠা জুলাই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রমণীমোহন রায় আকস্মিকভাবে তাঁর কলকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করেন। ১৯০১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ঢাকার অন্তর্গত দেউভুর গ্রামে রমণীমোহনের জন্ম। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন কলকাতার বাসিন্দা। তাঁর ছাত্র জীবন ও কর্মজীবন কৃতিত্বে উজ্জ্বল। ১৯১৭ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯১৯ সালে আই. এস-সি. পরীক্ষায় একাদশ স্থান, বি. এস-সি-তে রসায়নের অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় এবং ১৯২৪ সালে এম. এস-সি. পরীক্ষায় অজৈব রসায়ন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২৫ সালে বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপকরূপে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা। তারপর কিছুকাল স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ গবেষকরূপে কাজ করেন এবং ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত পুনরায় বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং ক্রমান্বয়ে ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, কলেজের উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন। মৃত্যুকালে তিনি অধ্যক্ষপদেই আসীন ছিলেন। মাঝে কিছুকাল তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এর রেজিষ্ট্রাররূপে কাজ করেন। অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়ের সঙ্গে তিনি 'রুবেনিক অ্যাসিডের ধাতব যৌগিক' সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন।

শিক্ষাবিদ হিসাবে রমণীমোহন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অফ মেডিসিন-এরও তিনি সদস্য ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিল ও রিপোর্ট প্রণয়নে সহযোগিতা করেন। পশ্চিম বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং নিখিল ভারত শিক্ষা

সমিতির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। পশ্চিম বঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতি, ভারতীয় রসায়ন সমিতি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শিল্প সংস্থা, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, মিত্র ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি নানাভাবে জড়িত ছিলেন। সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল এবং বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। রসায়ন বিষয়ে তিনি পাঠ্য-পুস্তকও রচনা করে গেছেন। তাঁর সরল অমায়িক ব্যবহার, ছাত্রবাৎসল্য, বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান, বাগ্মিতা সকলকে মুগ্ধ করতো। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন; তাঁর পত্নী পূর্বেই গত হয়েছেন।

রমণীমোহন রায়

র. ব.

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ঊনবিংশ বর্ষ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ নবম সংখ্যা

খাদ্য ও খাদ্যপ্রাণ

সুবীর চট্টোপাধ্যায়

প্রাণীর দেহ হলো শিল্পনগরী। সেখানে রয়েছে হাজার হাজার কলকারখানা, আর এক একটা কারখানার কাজ এক এক রকম। কারখানার কাজ চালু রাখতে গেলে ইন্ধনের প্রয়োজন। দেহের ইন্ধন হলো খাদ্য। খাদ্যের অভাবে কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না। প্রতিদিন আমরা নানা কাজ করি, সে জন্যে শক্তি ক্ষয় হয়। সে সব ক্ষয়-ক্ষতি আমরা পূরণ করি খাদ্য গ্রহণ করে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মানুষের হৃৎপিণ্ড একবার মাত্র সঙ্কুচিত হলে যতখানি শক্তির অপচয় হয়, ঐ শক্তিকে কাজে লাগালে প্রায় এক সের পরিমাণ কোন দ্রব্য দুই ফুট উঁচু অবধি তোলা যায়। সুতরাং চিন্তা করুন, কি পরিমাণ শক্তি প্রত্যহ ক্ষয় করছি আমরা।

"মোটামুটি তিনটি কারণে শরীরকে খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন—উহার কর্মশক্তির ইন্ধন যোগাইবার জন্য, উহার উত্তাপ বজায় রাখিবার জন্য এবং ক্ষয়প্রাপ্ত বস্তুর নিত্য ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য। অতএব খাদ্য বলিতে কেবলমাত্র তাহাকেই বুঝাইবে —যাহা আমাদের কর্মশক্তি দিতে পারে, যাহা তাপের সৃষ্টি করিতে পারে এবং যাহা শরীরের মাংসাদি নানাপ্রকার তন্তুগুলিকে নিত্য নূতন

গড়িয়া তুলিবার কাজে লাগিতে পারে।" (ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য—'আহার ও আহার্য্য')।

খাদ্যকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—নিরামিষ ও আমিষ। শাকশব্জী, ফলমূল ইত্যাদি যাবতীয় উদ্ভিদ-জাত দ্রব্যকে বলে নিরামিষ, আর মাছ-মাংস-ডিম ইত্যাদি প্রাণীজ দ্রব্যকে বলে আমিষ। শরীরের গঠন ও সংরক্ষণের জন্যে এই দুই জাতীয় খাদ্যেরই প্রয়োজন আছে। খাদ্যের প্রধান উপাদান হলো কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার (শর্করা) জাতীয় পদার্থ। প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় পদার্থ ও ফ্যাট বা চর্বি (স্নেহ) জাতীয় পদার্থ—এই তিন রকম প্রধান উপাদান ছাড়াও থাকে—জল, লবণ ও খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন।

আগেই বলেছি, আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় যাবতীয় শক্তি আমরা খাদ্য থেকে পেয়ে থাকি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শ্বেতসার ও আমিষ সমান শক্তি দেয় ও চর্বি দেয় তাদের দ্বিগুণেরও কিছু বেশী। এক আউন্স চর্বি থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, সমপরিমাণ শ্বেতসার বা আমিষ থেকে পাওয়া যায় তার অর্ধেক শক্তি। অনুপাতে শ্বেতসার : আমিষ : চর্বি—৪ : ৪ : ৯।

শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের উপাদান হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। শেষের মৌল দুটি থাকে সমপরিমাণে। উদ্ভিদ-জাত প্রায় সমস্ত খাদ্যবস্তুই হলো শ্বেতসার। সুতরাং একে নিরামিষ খাদ্য বলা চলে। চাল, গম, যব, ভুট্টা, মূলা, কচু, আলু, বিট, গাজর, চিনি, গুড়—এই সব হলো শ্বেতসার। আমাদের শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে গেলে যে ইন্ধনের দরকার, তার বেশীর ভাগই জোগায় এই কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার। খাদ্যে আমিষ, চর্বি ও শ্বেতসারের অনুপাত হলো ১ : ১ : ৪—যদি ১০০ গ্রাম আমিষ আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি, তবে চর্বিও ১০০ গ্রাম এবং শ্বেতসার ৪০০ গ্রাম গ্রহণ করা উচিত।

দেহকোষ গড়ে তোলা ও দেহের সংস্কারের কাজে আমিষের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। প্রত্যহ যে পরিমাণ তাপ বা ক্যালোরি আমাদের প্রয়োজন, তা কেবলমাত্র এক প্রকার খাদ্য থেকেই গ্রহণ করা চলবে না। প্রয়োজনীয় ক্যালোরির শতকরা ১০ থেকে ১৫ ভাগ আসা উচিত আমিষ জাতীয় খাদ্য থেকে, আর শতকরা ২০ থেকে ৩০ ভাগ চর্বি জাতীয় খাদ্য ও শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য থেকে আসা উচিত। সমস্ত শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেট দেহের মধ্যে গিয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। এই কাজ সমাধা করে যকৃৎ বা লিভার এবং এই গ্লুকোজের বেশীর ভাগটাই গ্লাইকোজেন নামক একপ্রকার জটিল যৌগে রূপান্তরিত হয়ে লিভারে (প্রায় সবটাই) ও মাংসপেশীতে সামান্য পরিমাণে জমা থাকে।

দেহপুষ্টিতে আমিষ বা প্রোটিনের স্থান সর্বাগ্রে। প্রোটিন কথাটি ল্যাটিন 'প্রোটোস' কথা থেকে এসেছে, যার মানে হলো সর্বপ্রথম। প্রোটিন বা আমিষ একটি জটিল পদার্থ। এর মূল উপাদান হলো নাইট্রোজেন। তাছাড়াও এতে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার ও ফস্ফরাস থাকে। প্রত্যেক জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে আমিষ বর্তমান। সুতরাং প্রাণীর মাংস আমিষের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। মাংস ছাড়াও ডিম, মাছ ইত্যাদিতে এবং নিরামিষের মধ্যে ছানা, মুসুর ডাল, দুধ ও বাদামে (পেস্তা ও কাগজী বাদামে প্রচুর পরিমাণে) আমিষ বর্তমান। আমিষের অভাবে জীবকোষ বাঁচতে পারে না। আমিষ দেহের অভ্যন্তরে গিয়ে অ্যামিনো অ্যাসিড নামক জটিল যৌগে পরিণত হয়।

ফ্যাট বা চর্বি জাতীয় খাদ্যের উপাদান হলো

কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। তাছাড়াও থাকে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল। জীবজন্তুর চর্বি, সর্ষে, বাদাম, নারকেল তেল ইত্যাদি হলো চর্বিজাতীয় খাদ্য এবং তাছাড়া পেস্তা, বাদাম, আখরোট, ছানা-দুধ-ঘি ও সয়াবিনে বেশ কিছু পরিমাণ চর্বি বর্তমান। শরীরের উত্তাপ বাড়াবার কাজে চর্বির স্থান সর্বাগ্রে। শ্বেতসার বা আমিষ যত উত্তাপ দেয়, চর্বি দেয় তার দ্বিগুণ—একথা আগেই বলেছি। চর্বি প্রচুর পরিমাণে দেহে জমা থাকতে পারে ও দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। দেহের ওজনের প্রায় শতকরা ১২ ভাগই হলো চর্বি।

শ্বেতসার, চর্বি ও আমিষ বাদে খাদ্যে অন্য যে সকল উপাদান থাকে, সেগুলি হলো—জল, লবণ ও খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন। জল ও লবণ দেহকোষ গঠন ও সংরক্ষণের কাজে একান্ত প্রয়োজন। দেহের শতকরা ৭০ ভাগই হলো জল। দেহের প্রতিটি কোষই জলপূর্ণ। সুতরাং জল ছাড়া জীবনধারণ অসম্ভব, তাই জলের আর এক নাম জীবন। জলের পর লবণ। লবণও একটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য-উপাদান। এক এক প্রকার খাদ্য থেকে আমরা এক এক প্রকার লবণ পাই। শাকশব্জী ও মাংস থেকে পাই লৌহ বা আয়রন, দুধ, ডিম বাঁধাকপি ইত্যাদি থেকে পাই ফস্‌ফরাস ও ক্যালসিয়াম; আলু থেকে পাই পটাসিয়াম ও ভাতে আছে ম্যাগ্‌নেসিয়াম। মানুষের শরীরের যে কোন অংশ পুড়িয়ে ছাই করে ফেললে দেখা যাবে, সেখানে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, সোডিয়াম, সালফার ইত্যাদির লবণ বর্তমান। প্রাণিদেহে এক একটি লবণের কাজ এক এক রকম। হাড় তৈরি ও সংরক্ষণ করে ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়াম রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে ও হৃৎপিণ্ডের কাজ চালু রাখে। শ্বেতসারের জ্বলন ফস্‌ফরাস ব্যতীত সম্ভব নয়। লৌহ, রক্তে হিমোগ্লোবিন নামক এক যৌগের রূপ ধরে থাকে। এই হিমোগ্লোবিন ছাড়া রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না ও দেহকোষে অক্সিজেন পাঠাতে পারে না। অক্সিজেনের অভাবে দেহকোষের বাঁচা সম্ভব নয়। সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের অভাবে রক্ত বিষাক্ত হয়ে যায়, কারণ রক্তের ক্ষারীয় গুণ হ্রাস পায়।

খাদ্যের পর খাদ্যপ্রাণের কথায় আসা যাক। খাদ্যপ্রাণ হলো খাদ্যেরই একটা উপাদান। খাদ্যে খাদ্যপ্রাণের অভাবে অনেক রকম রোগ হতে পারে এবং খাদ্যপ্রাণ ছাড়া বাঁচাও সম্ভব নয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক লুনিন প্রমাণ করেছেন যে, কেবলমাত্র শ্বেতসার, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জল খেয়ে বাঁচা অসম্ভব। তিনি প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, খাদ্যের উপরিউক্ত উপাদানগুলির সঙ্গে দুধ গ্রহণ করলে বাঁচা সম্ভব। সুতরাং দুধের মধ্যে এমন কোন পদার্থ বর্তমান, যা জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য। এই অপরিহার্য বস্তুই হলো খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন। ভিটামিনকে জান্তব অনুঘটক বা অরগ্যানিক ক্যাটালিষ্ট বলা চলে। দু-একটি ভিটামিন সামান্য পরিমাণে দেহে তৈরি হয় বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ ভিটামিনই আমরা পাই বাইরে থেকে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে।

ভিটামিন একটা নয়। আজ অবধি প্রায় সাত রকম ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে। ভিটামিনকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—চর্বিতে দ্রাব্য ভিটামিন ও জলে দ্রাব্য ভিটামিন। চর্বিতে দ্রাব্য ভিটামিনের মধ্যে আছে—ভিটামিন-এ, ডি, ই ও কে, আর জলে দ্রাব্য ভিটামিন হলো—ভিটামিন বি, সি ও পি।

ভিটামিন-এ একপ্রকার অ্যালকোহল। ক্যারোটিন নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। এই ভিটামিন ছোঁয়াচে রোগ ও চক্ষুরোগ প্রতিষেধক।

ভিটামিন-এ সাধারণতঃ লিভারে জমা থাকে এবং কিছু পরিমাণে দেহের মধ্যে ক্যারোটিন থেকে তৈরি হয়। ভিটামিন এ চর্বিতে দ্রাব্য ও জলে অদ্রাব্য—বর্ণহীন এবং তাপ সহ্য করতে পারে। কড্ লিভার অয়েল, হ্যালিবাট লিভার অয়েল, শার্ক লিভার অয়েল, দুধ, ডিমের কুসুম, মাখন, মাছ ইত্যাদি জান্তব পদার্থে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-এ বর্তমান। তাছাড়া রাঙ্গা আলু, বাঁধাকপি, গাজর, লেটুস শাক, কড়াইশুঁটি ইত্যাদিতে কিছু পরিমাণ ভিটামিন-এ আছে। দেহে ভিটামিন-এ-র অভাব ঘটলে দেহের বাড় কমে যায় ও চোখের রোগ (রাতকানা), চর্মরোগ, কিড্নীর রোগ, শ্বাস-প্রশ্বাসের গণ্ডগোল, মেরুদণ্ড ও মাথার হাড়ের অত্যধিক বৃদ্ধি ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হয়।

ভিটামিন-বি বহু ভিটামিনের সমষ্টি। ভিটামিন-বি-এর প্রধান দুটি উপাদান হলো বি$_1$ ও বি$_2$। ভিটামিন-বি$_1$-এর রাসায়নিক নাম থায়ামিন হাইড্রোক্লোরাইড। এই ভিটামিন জলে দ্রাব্য ও তাপ সহ্য করতে অক্ষম। এর অভাবে প্রধান যে রোগটি হয়, তার নাম বেরিবেরি। তাছাড়াও এর অভাবে শরীরের বৃদ্ধি কমে যায় এবং ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, স্নায়ুদৌর্বল্য ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হয়। ঈষ্ট নামক একপ্রকার ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ, সবুজ শাক, চালের লাল আবরণী, ডিমের কুসুম ইত্যাদিতে ভিটামিন-বি$_1$ থাকে।

ভিটামিন-বি$_2$ আবার একাধিক ভিটামিনের সমষ্টি। এতে নিয়াসিন, ফোলিক অ্যাসিড, রিবোফ্ল্যাবিন, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, পাইরি-ডক্সিন, বায়োটিন ও ভিটামিন-বি$_{12}$ বর্তমান। তাছাড়াও এই ভিটামিনে কোলিন, অ্যাডেনিলিক অ্যাসিড, প্যারা অ্যামিনো বেন্‌জয়িক অ্যাসিড এবং ইনোসিটল ইত্যাদি পদার্থ বর্তমান।

ঈষ্ট, মাছ, মাংস, লিভার ইত্যাদিতে নিয়াসিন থাকে। নিয়াসিনের অভাবে পেলেগ্রা নামক একপ্রকার রোগ জন্মে।

লিভার, কিড্নী, দুধ, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদিতে এবং ঈষ্টে রিবোফ্ল্যাবিন থাকে। এর অভাবে ঠোঁটে ঘা, জিভে ঘা, চর্মরোগ (লোম উঠে যাওয়া) হয় এবং দেহের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

প্রাণীর লিভার ও সবুজ পাতায় ফোলিক অ্যাসিড বর্তমান। দেহে ফোলিক অ্যাসিডের ঘাট্‌তি হলে একপ্রকার রক্তশূন্যতা রোগের সৃষ্টি হয়, যার নাম ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া। ফোলিক অ্যাসিড রক্তের লোহিত কণিকার সৃষ্টি ও পুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য।

প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড—লিভার, কিড্নী, ডিমের সাদা অংশ, মাংস ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এর অভাবে পেলেগ্রা জাতীয় রোগ, অপুষ্টি ও স্নায়ুরোগের সৃষ্টি হয়।

মাংস, ঈষ্ট, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদিতে বায়োটিন পাওয়া যায়। বায়োটিনে সালফার বর্তমান। বায়োটিনের অভাবে চর্মরোগ ও রক্তে কোলেস্টেরল বৃদ্ধি পায়।

পাইরিডক্সিন—মাংস, ডিমের কুসুম, লিভার, ঈষ্ট ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই ভিটামিন অনিদ্রা রোগ দূর করে। এর অপর নাম ভিটামিন-বি$_6$। এর অভাবে চর্মরোগ ও রক্তশূন্যতা ইত্যাদি দেখা যায়।

ভিটামিন-বি$_{12}$ ১৯৪৮ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে। এর রাসায়নিক নাম সায়ানো কোবা-লামিন। ভিটামিন-বি$_{12}$—কঠিন পদার্থ, রং লাল এবং জলে দ্রাব্য। এর উপাদান হলো—নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস ও কোবাল্ট। কোবাল্টের পরিমাণ শতকরা ৪·৫ ভাগ। এই ভিটামিন সাধারণতঃ নিরামিষ জাতীয় খাদ্য অর্থাৎ শাক-শব্জী বা ফলমূলে একদম পাওয়া যায় না। একমাত্র ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসেস গ্রিসিয়াস নামক ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদে কিছু পরিমাণে থাকে এবং ষ্ট্রেপ্‌টো-

মাইসিন তৈরির সময় উপজাত দ্রব্য বা বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে পাওয়া যায়। এই ভিটামিন লিভারে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাছাড়া গরুর মাংস, গুঁড়া দুধ ইত্যাদিতেও কিছুটা বর্তমান। এই ভিটামিনের অভাবে বিশেষ একপ্রকার রক্তশূন্যতা রোগের সৃষ্টি হয়, যার নাম পারনিসাস অ্যানিমিয়া। রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি এবং পুষ্টির কাজে এই ভিটামিনের অবদান অনেকখানি। স্নায়ুতন্ত্রের কিছু অংশের কাজ সুস্থ রাখতেও এই ভিটামিনের প্রয়োজন।

কমলালেবু, টোমেটো, পাতিলেবু, আমলকী, কালো জাম, আনারস, পীচফল, শসা, পেয়ারা, লিচু, আম, মটর, অঙ্কুরিত ছোলা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি বর্তমান। দুধ, বিশেষতঃ মায়ের দুধে বেশ কিছুটা ভিটামিন-সি থাকে। এই ভিটামিন তাপ সহ্য করতে পারে না। দুধ ফোটালে নষ্ট হয়ে যায়। ফলমূল শুকিয়ে গেলে বা রান্না করলে এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন-সি-এর রাসায়নিক নাম অ্যাসকরবিক অ্যাসিড—বর্ণহীন এবং জলে দ্রাব্য। এই ভিটামিন দেহের মধ্যে সুপ্রারিন্যাল গ্ল্যাণ্ডে তৈরি হয়। এর অভাবে এক রকমের রোগ সৃষ্টি হয়, যার নাম স্কার্ভি। রক্তশূন্যতা, চর্মরোগ, অসম বৃদ্ধি, দাঁত ও হাড়ের রোগ, গাঁটে ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ হলো স্কার্ভির লক্ষণ। এই ভিটামিনের অভাবে রক্তের ঘনত্ব কমে যায় ও চামড়ায় কালো কালো দাগ জন্মায়।

মাছের লিভারের তেলে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-ডি থাকে। তাছাড়া মাখন, দুধ ও ডিমে কিছুটা আছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, ছয় প্রকারের ভিটামিন-ডি আছে। তার মধ্যে ডি$_{২}$, ডি$_{৩}$ ও ডি$_{৪}$ প্রধান। ডি$_{২}$-এর রাসায়নিক নাম ক্যালসিফেরল। দেহের মধ্যে আরগোস্টেরল নামক একপ্রকার পদার্থ বর্তমান, আরগোষ্টেরলের উপর সূর্যরশ্মি পড়লে সূর্যরশ্মির অন্তর্গত আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি আরগোষ্টেরলকে উত্তেজিত করে' ক্যালসিফেরল উৎপন্ন করে। ভিটামিন-ডি জলে অদ্রাব্য ও তাপ সহ্য করতে পারে। এই ভিটামিনের অভাবে ছেলেবেলায় রিকেট ও বড় বয়সে অষ্টিওম্যালাসিয়া রোগ হয় এবং হাড় ও দাঁত ভালমত পুষ্ট হয় না।

ভিটামিন-ই-এর রাসায়নিক নাম হলো টোকোফেরল। α, β, γ—এই তিন প্রকারের টোকোফেরল বর্তমান। এইগুলি তৈলাক্ত তরল পদার্থ। এই ভিটামিন চর্বিতে দ্রাব্য, তাপ সহ্য করতে পারে ও রান্নায় নষ্ট হয় না। দুধ, ডিম, অলিভ অয়েল, গমের অঙ্কুর, লেটুস শাক, ডিমের কুসুম ইত্যাদিতে কিছু পরিমাণ ভিটামিন-ই বর্তমান। এর অভাবে বন্ধ্যাত্ব জন্মে।

বাঁধাকপি ও অন্যান্য শাকশব্জিতে ভিটামিন-কে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই ভিটামিন চর্বিতে দ্রাব্য, তাপ সহ্য করতে পারে ও রান্না করলে নষ্ট হয় না। এই ভিটামিন তৈলজাতীয় পদার্থ। এর অভাবে রক্তপাত বন্ধ হয় না এবং অযথা রক্তক্ষয় হয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ডিম ও দুধে খাদ্যের সমস্ত উপাদান—শ্বেতসার, চর্বি, আমিষ, লবণ, জল ও ভিটামিন বর্তমান। একমাত্র ডিম ও দুধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্যে এই সব কয়টি উপাদান থাকে না। এই জন্যে দুধ ও ডিমকে সুষম বা সম্পূর্ণ খাদ্য বলা হয়।

আসল না নকল ?

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

সেদিন সন্ধ্যার একটু পরে গোপালদার বাসায় বেড়াতে গেছি। দেখি—হৈ হৈ কাণ্ড, সবার মুখ খুশীতে ঝলমল করছে। ব্যাপার কি ? দাদা, বৌদি ছেলেমেয়ে সঙ্গে বেরিয়েছিলেন। পূজার জামা-কাপড় কিনে ফিরে এসেছেন, তাই এত স্ফূর্তি !

বললাম, "কই বৌদি, দেখি—এবার পূজায় কি কি কিনলেন ?"

বৌদি হাসিমুখে প্রথমেই নিজের শাড়ীখানা দেখিয়ে বললেন, "এবার ভাই ডেক্রনের শাড়ীই কিনলাম। দেখ তো কেমন হলো ?"

শাড়ীখানা সত্যি খুব সুন্দর। যেমন সুন্দর রং, তেমনি সুন্দর প্রিন্ট। ফর্সা বৌদিকে সত্যি সুন্দর মানাবে। বললাম, "খুব চমৎকার হয়েছে, বৌদি! আপনার পছন্দের তারিফ করতে হয়।"

প্রশংসা শুনে বৌদি খুব খুশী, দাদার দিকে একটু কটাক্ষ করে তারপর বললেন—"কিন্তু তোমার দাদা তো এটা কিনতেই চান নি। বলেন কিনা, এই শাড়ী বড্ড স্বচ্ছ। বয়স হয়েছে, ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে, এখন এরকম শাড়ী পরা উচিত নয়। লোকে নিন্দে করবে। দেখতো কাণ্ড!"

বৌদিকে খুশী করবার জন্যে আমি বৌদির পক্ষ হয়ে বললাম—"গোপালদা, এটা আপনার অত্যন্ত অন্যায়। আমাদের দেশেরই মসলিন কাপড়ের কথা নিশ্চয় জানেন। শুনতে পাই, চৌদ্দবার ঘুরিয়ে পরলেও নাকি লজ্জা নিবারণ হতো না! তবুও তার কত সমাদর ছিল, তা জানেন তো? আপনি দেখছি এসব বিষয়ে এখনও খুব রক্ষণশীল রয়ে গেছেন!"

বৌদি বাধা দিয়ে বললেন, "এটা কিন্তু ঠিক নয়। নিজে কি কিনেছেন দেখ। টেরিলিনের সার্ট আর ডেক্রনের ট্রাউজার।"

এবারে গোপালদা একটু লজ্জা পেলেন, তবুও আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্যে বললেন, "আহা, রমা, তুমি রাগ করছো কেন? এতে তোমারই সুবিধা হবে সবচেয়ে বেশী। একটু সার্ফ দিয়ে ধুয়ে টাঙিয়ে দিলেই চলবে। কাচতে হবে না, নিঙড়াতে হবে না, ইস্তিরিও করতে হবে না। কত সুবিধা!"

বৌদি রাগ করে বললেন—"আহা, নিজের বেলায় কত রকম সুবিধার কথা বলা হচ্ছে! আর আমার বেলায়ই যত দোষ।"

এমন সময় দাদার ছেলেমেয়ে ভানু আর রুণু নতুন জামা-কাপড় পরে সেখানে এসে হাজির হলো। যেমন রঙের জলুস, তেমনি প্রিন্টের বাহার! দুটি যেন রঙীন প্রজাপতি, মনের খুশীতে ফুরফুর করে উড়ে বেড়াচ্ছে। সত্যি, ওদের অনেক বেশী স্মার্ট দেখাচ্ছে। খুশী হয়ে বললাম—"বাঃ! তোমাদের জামা-কাপড়ও খুব সুন্দর হয়েছে।"

গোপালদা এখন একটু গর্বের সঙ্গেই বললেন, "এবারে পূজার বাজার তাহলে ভালই হয়েছে, কি বল, নিখিল ?"

বললাম, "তা ঠিক। কিন্তু এখন দেখছি, আপনারা সবাই আসল ছেড়ে নকলের দিকেই বেশী করে ঝুঁকছেন, ব্যাপার কি ?"

"তা কি করবো বল ? নাইলন আর টেরিলিনের

যুগে কার্পাস আর রেশমের জামা-কাপড় বড্ড সেকেলে ম্যাটমেটে মনে হয়। ওগুলি এখন আর মোটেই চোখে ধরে না।"

"সে কথা খুবই সত্যি। তবে এর কৃতিত্ব কাদের বলুন তো ?"

"ও হরি! এতক্ষণ মনেই ছিল না যে, তুমি একজন রসায়নবিদ্। তা ভাই বল তো, এটা কি করে সম্ভব হলো ?"

তাহলে একটু স্থির হয়ে বসুন। আমি একেবারে গোড়া থেকেই সুরু করছি।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন যে রকম জিনিষের ব্যবহার বহুল পরিমাণে হয়েছে, তারই উপর নির্ভর করে এক একটা যুগের নামকরণ হয়েছে। যেমন—প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ এবং লৌহযুগ। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, এটা হলো প্লাষ্টিকযুগ। বাস্তবিক, সেলুলয়েড, ব্যাকেলাইট, পলিথিন, নাইলন, টেরিলিন প্রভৃতি এখন আমাদের সবার কাছে খুবই পরিচিত। এক কথায় বলা যায়, প্লাষ্টিক না হলে আজ সভ্যজগৎ অচল।

কিন্তু ১৯৩০ সালের আগে প্লাষ্টিকের প্রচলন বিশেষ ছিল না বললেই চলে। অল্প দিনের মধ্যেই, বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এই শিল্প এত প্রসার লাভ করেছে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই জিনিষটি একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বাস্তবিক প্লাষ্টিক ছাড়া যে সভ্যজগৎ চলতে পারে, একথা যেন এখন ভাবাই যায় না!

আচ্ছা, প্লাষ্টিক বলতে ঠিক কি বোঝায়, বলো তো ?

প্লাষ্টিক বলতে বোঝায় এমন একটি পদার্থ, উত্তাপ ও চাপের সাহায্যে যাকে ছাঁচে ঢালাই করা যায়, যেমন খুশী গঠন দেওয়া যায়।

উৎসবের সময় ছেলেরা রঙীন কাগজ জুড়ে জুড়ে যেমন সুন্দর শিকল বানায়, আর তা দিয়ে ঘর সাজায়—দেখেছেন তো! রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময়ও সেই রকম ছোট ছোট অনেকগুলি অণু পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে যেন এক-একটি শিকল গড়ে তোলে। এইভাবে সৃষ্টি হয় এক-একটি অতিকায় অণুর শৃঙ্খল। বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন পলিমার। আর এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন পলিমারিজেশন। এইভাবে গঠিত অতিকায় অণুগুলিই সাধারণ-ভাবে প্লাষ্টিকের ধর্ম প্রকাশ করে থাকে।

আচ্ছা, প্লাষ্টিক-শিল্পের সূচনা কখন কিভাবে হয়েছিল, বলতে পার ?

নিশ্চয়ই। সর্বপ্রথম কৃত্রিম প্লাষ্টিক তৈরি করেন মার্কিন বিজ্ঞানী হায়াট, ১৮৬৩ সালে। আগে বিলিয়ার্ড বল তৈরি করা হতো হাতীর দাঁত থেকে। তাই তার দাম হতো খুব বেশী, অথচ বেশী দিন টিকতো না। এজন্যে ঘোষণা করা হলো, কৃত্রিম উপায়ে সস্তায় হাতীর দাঁতের মত জিনিষ তৈরি করবার পদ্ধতি যিনি আবিষ্কার করতে পারবেন, তাঁকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। নানাদেশে গবেষণা চলতে লাগলো। হায়াটও গবেষণায় মন দিলেন।

আগেই জানা ছিল যে, সেলুলোজ (যেমন —কার্পাস তুলা, কাগজ প্রভৃতি) এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে বিক্রিয়া হলে প্রথমে সেলুলোজ মনো-নাইট্রেট, তারপর ডাই-নাইট্রেট এবং শেষে ট্রাই-নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। সেলুলোজ ট্রাই-নাইট্রেটকে চলিত কথায় বলা হয় নাইট্রে-সেলুলোজ বা গান-কটন। এটি একটি তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ। রাইফেলের গুলিতে যে কর্ডাইট ব্যবহার করা হয়, তার উপাদান হলো গান-কটন, নাইট্রোগ্লিসারিন এবং ভ্যাসেলিন।

হায়াট গবেষণা সুরু করেন সেলুলোজ ডাই-নাইট্রেট নিয়ে। তিনি একে কর্পূর এবং অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশিয়ে তারপর উচ্চ চাপে

এবং ৭৫° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে এক রকম প্লাষ্টিক উৎপন্ন করতে সক্ষম হন। এর নাম দেওয়া হলো সেলুলয়েড (Cellulose+oid)। দেখা গেল, উত্তপ্ত অবস্থায় একে ছাঁচে ঢেলে যে কোন আকার দেওয়া যায়, কিন্তু ঠাণ্ডা হলে জিনিষটি বেশ শক্ত হয়ে যায়। এই পদার্থটি হাল্‌কা, স্বচ্ছ, জলরোধী এবং খনিজ তেলরোধী। কিন্তু জিনিষটি খুবই সহজদাহ্য, তবে বিস্ফোরক নয়। এটিই পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম প্লাষ্টিক। আগে এই জিনিষটি সার্টের শক্ত কলার (Stiff collars) তৈরির উদ্দেশ্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতো। মোটর গাড়ীর প্রচলন হলে প্রথম দিকে জানালার নিরাপদ স্বচ্ছ আবরণ তৈরি করবার জন্যে কাচের বদলে সেলুলয়েড ব্যবহার করা হতো। কিন্তু দেখা গেল, আলোর প্রভাবে এর স্বচ্ছতা ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যায়, তাই অল্প দিনের মধ্যেই এই ব্যবস্থা বাতিল করে দিতে হয়। তবে এখনও দৈনন্দিন প্রয়োজনের অনেক জিনিষ, যেমন—চিরুণী, ব্রাশ, চশমার ফ্রেম ইত্যাদি এর সাহায্যেই তৈরি করা হয়। স্বচ্ছ বর্ণহীন সেলুলয়েডের মধ্যে অনেক রকম রঙের অনুপ্রবেশ ঘটানো যায়। এইভাবে কৃত্রিম কচ্ছপের খোল, অ্যাম্বার প্রভৃতি তৈরি করা হয়। এগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। তাছাড়া যন্ত্রের সাহায্যে একে কাটা যায়, যেমন খুশী আকার দেওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সেলুলয়েডের দুটি টুক্‌রা কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে অ্যাসিটোনে ভিজিয়ে রেখে তারপর চাপ দিয়ে অনায়াসে জুড়ে দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে প্লাষ্টিক-শিল্পে এখনও সেলুলয়েড বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৮৮৯ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ঈষ্টম্যান কাচের বদলে সেলুলয়েড দিয়ে ফটোগ্রাফীর ফিল্ম তৈরি করেন। সেই থেকে এই জিনিষটি প্রধানতঃ ফটোগ্রাফীর ফিল্ম তৈরির উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আর চলচ্চিত্রের যত প্রসার হচ্ছে, এর চাহিদাও তত বেড়ে যাচ্ছে।

প্লাষ্টিক-শিল্পে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞানী বেকল্যাণ্ড। ১৯০৯ সালে তিনি ফিনল এবং ফরম্যালডিহাইডের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করেন ব্যাকেলাইট। বৈদ্যুতিক সুইচ, ঝরণা কলম প্রভৃতি তৈরি করবার উদ্দেশ্যে এই জিনিষ ব্যবহার করা হলো। দেশ-বিদেশে গড়ে উঠলো প্লাষ্টিক-শিল্প।

সম্প্রতি আই. সি. আই. কোম্পানি আর এক রকম প্লাষ্টিকের প্রচলন করেছেন এবং তা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এর নাম পলিথিলিন, সংক্ষেপে পলিথিন। স্বল্প পরিমাণ অক্সিজেনের সংস্পর্শে এবং উচ্চ চাপে ইথিলিনকে উত্তপ্ত করলে ইথিলিনের অনেকগুলি অণু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পলিথিলিন বা পলিথিনের অণু গঠন করে [Poly (বহু)+ethylene]। এর সাহায্যে বর্ষাতি, টেবিল ক্লথ, বেলুন, বোতল, পাইপ প্রভৃতি নানারকম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি করা হয়। এগুলি এখন সর্বত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কৃত্রিম কাচ বা কাচের মত স্বচ্ছ অথচ ভঙ্গুর নয়, আবার হাল্‌কা, এমন পদার্থও বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন। আজ খেলনা, কৌটা, বোতল, দড়ি, ঝুড়ি, কৃত্রিম লতাপাতা, ফুল প্রভৃতি সবই এখন তৈরি করা হচ্ছে নানা রকম প্লাষ্টিক দিয়ে।

চমৎকার, নিখিল, তোমার আলোচনা এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। তোমার কাছ থেকে আজ প্লাষ্টিক সম্বন্ধে অনেক কিছু জানলাম। এবার কৃত্রিম তন্তুর কথা কিছু বল দেখি!

বলছি, শুনুন।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই রেশম এবং রেশমজাত বস্ত্রাদি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রাজা, মহারাজা এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের

জন্যে মহার্ঘ বস্ত্রাদি তৈরি হয়েছে রেশমের সূতা দিয়ে। এজন্যে দেশে দেশে গুটিপোকার চাষ হয়েছে, আর রেশম-শিল্পের প্রসার হয়েছে যুগ যুগ ধরে।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই বিজ্ঞানীর চিন্তা—কৃত্রিম উপায়ে রেশমের মত সূতা তৈরি করা সম্ভব হবে কি? কত রকম গবেষণা, কত রকম পরীক্ষা! কিন্তু কিছুই হয় না। অবশেষে ফরাসী বিজ্ঞানী সার্দনে একদিন লক্ষ্য করলেন, রেশমকীট মালবেরী গাছের (আমাদের দেশে বলে তুঁত গাছ) পাতা খেয়ে বড় হয়। তারপর লালা দিয়ে সুন্দর রেশম সুতা তৈরি করে। সার্দনে ভাবলেন, প্রকৃতিতে রেশম-কীট যে কাজ করছে, চেষ্টা করলে হয়তো লেবরেটরীতেই সে কাজ করা যাবে। কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতির প্রচেষ্টায় তিনি মালবেরী গাছের পাতা নিয়েই গবেষণা সুরু করলেন। অনেক দিনের অনেক কষ্টসাধ্য গবেষণার ফলে ১৮৮৪ সালে তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হলো। তিনি কৃত্রিম রেশম তৈরি করতে সক্ষম হলেন। এর নাম দেওয়া হলো রেয়ন। ১৮৮৯ সালে রেয়নের বস্ত্রাদি প্যারিসের একটি এক্‌জিবিশনে দেখানো হলো। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল।

প্যারিসের সম্ভ্রান্ত মানুষ এবং ব্যবসায়ীরা এই সম্পর্কে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। এর ফলে অল্প দিন পরেই বেসাকোঁতে পৃথিবীর প্রথম রেয়ন কারখানা স্থাপিত হলো। কৃত্রিম রেশমের বস্ত্রাদি খুবই জনপ্রিয় হলো। দেশ-বিদেশে রেয়ন প্রস্তুত হতে লাগলো।

কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতির ফলে শিল্প-জগতে কি বিপ্লব এসেছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে মাত্র এক পাউণ্ড রেশম পেতে হলে কমপক্ষে ১৬০০০ রেশম-কীট হত্যা করতে হয়। এতএব দেখা যাচ্ছে, উদ্ভিদের আত্মত্যাগের ফলে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি রেশম-কীট অকাল মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

বাঃ তোমার বর্ণনা দেখছি খুবই ইন্টারেষ্টিং! এসম্পর্কে আরও অনেক কথা জানতে ইচ্ছা করছে।

বেশ, তাহলে শুনুন। রেয়ন তৈরি করা হয় কি করে—তাই এখন বলছি।

বল, আমরা মন দিয়ে শুনছি।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, সাধারণতঃ বাঁশ অথবা কাঠ থেকে কাগজ তৈরি করা হয়। কাঠ প্রকৃতপক্ষে সেলুলোজ ও লিগ্‌নিক অ্যাসিড সহযোগে উৎপন্ন এক রকম যৌগিক পদার্থ। বাঁশ বা কাঠকে টুকরা করে কেটে তারপর কস্টিক সোডার দ্বারা জীর্ণ করলে তা সেলুলোজ এবং লিগ্‌নিক অ্যাসিডে বিয়োজিত হয়ে যায়। এই অ্যাসিড ক্ষারের সংস্পর্শে এসে সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণীয় সোডিয়াম লবণে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় সেলুলোজের মণ্ড (Pulp) পাওয়া যায়।

এরপর সেলুলোজের মণ্ডের সঙ্গে কস্টিক সোডা দ্রবণের (শতকরা ১৮ ভাগ) বিক্রিয়া ঘটিয়ে পাওয়া যায় ক্ষার-সেলুলোজ (Alkali-cellulose)। এর সঙ্গে কার্বন ডাই-সালফাইডের বিক্রিয়া সম্পাদন করলে সেলুলোজ জ্যান্‌থেট (Cellulose xanthate) নামক একটি হলুদ রঙের দ্রবণ পাওয়া যায়। একে আবার লঘু কস্টিক সোডার দ্রবণে দ্রবীভূত করলে যে আঠালো দ্রবণ উৎপন্ন হয়, তার নাম ভিস্কোজ (Viscose)। একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র পথ দিয়ে এই দ্রবণ লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে প্রবেশ করালে রেশমের মত সূতা পাওয়া যায়। সেই সূতাকে একপ্রকার যন্ত্রের সাহায্যে পাকিয়ে নেওয়া হয়। এই সূতা দিয়েই বস্ত্রাদি তৈরি করা হয়।

অপর একটি পদ্ধতিতে সেলুলোজকে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে উত্তপ্ত করে সেলুলোজ ট্রাই-অ্যাসিটেট উৎপন্ন করা হয়। একে অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত করে যে দ্রবণ পাওয়া যায়, তা একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়ে একটি উত্তপ্ত প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। অ্যাসিটোন উদ্‌বায়ী বলে সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং রেশমের মত চক্‌চকে সূতা উৎপন্ন হয়। দ্রাবকটি উদ্ধার করে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এতে উৎপাদনের ব্যয় কিছুটা কমে। তা সত্ত্বেও অ্যাসিটেট রেশমের দ্বারা নির্মিত বস্ত্রাদির মূল্য কিছু বেশী হয়। তবে এগুলিই দেখতে বেশী সুন্দর এবং টেকসই হয়ে থাকে। এরূপ বস্ত্রাদি সহজদাহ্য নয় এবং ভিজলে বেশী জল শোষণ করে না বলে কাচার সময় ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে। এজন্যে এজাতীয় বস্ত্রাদির চাহিদাই ক্রমশঃ বাড়ছে।

এই সময় চাকর ট্রেতে করে বিস্কুট নিয়ে এল। বৌদি আমাদের সামনে চা-বিস্কুট এগিয়ে দিয়ে বললেন—ঠাকুরপো, এই নাও চা। অনেকক্ষণ বক্‌বক করেছ, এখন একটু গলা ভিজিয়ে নাও।

থ্যাঙ্ক ইউ, বৌদি! ঠিক এই জিনিষটিই এখন চাইছিলাম।

সবার চা খাওয়া শেষ হলে বৌদি কাপ-ডিস সরিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন—আচ্ছা ঠাকুরপো, রেয়ন বা কৃত্রিম রেশমের কথা তো শোনলাম। বেশ ভাল লাগলো। এবার বল দেখি, নাইলন আর টেরিলিন কি করে তৈরি করা হয়?

হ্যাঁ বৌদি, বলছি। নাইলন আর টেরিলিন সম্পর্কেই যে আপনার আগ্রহ বেশী, তা বেশ বুঝতে পারছি। আর একটু ধৈর্য ধরুন, তাহলেই সব জানতে পারবেন।

নাইলন* তন্তুর উদ্ভাবন করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানী ক্যারোথার্স, ১৯৩৫ সালে। এটি একরকম পলি-অ্যামাইড জাতীয় যৌগ—পাওয়া যায়, অ্যাডিপিক অ্যাসিড [HOOC. $(CH_2)_4$. COOH] এবং হেক্সামিথিলিন ডাই-অ্যামিনের [H_2N. $(CH_2)_6$. NH_2] মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে। নাইলনের অণুর কাঠামোর সঙ্গে রেশমের প্রোটিনের খুব মিল আছে। এখানে একটা কথা বলা দরকার, উপরিউক্ত পদ্ধতিতে বিভিন্ন অ্যাসিডের সঙ্গে বিভিন্ন ডাই-অ্যামিনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে বিভিন্ন রকম নাইলন উৎপন্ন হয়। কাজেই এভাবে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন বিভিন্ন রকম নাইলন তৈরি করা যেতে পারে।

আর একটা কথা। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে যে নাইলন-তন্তু উৎপন্ন হয়, তার সুদীর্ঘ অণু-গুলি অত্যন্ত এলোমেলোভাবে থাকে। কাজেই তা সরাসরি শিল্প-প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় না। এরূপ তন্তু যন্ত্রের সাহায্যে টেনে বেশ কয়েক গুণ লম্বা করে নেওয়া হয়। তখন অণুগুলি সব সমান্তরালভাবে সজ্জিত হয়ে যায়। এর ফলে নাইলন তন্তুর স্থিতিস্থাপকতা ধর্মের উন্নতি হয় বলে তা শিল্প-প্রয়োজনে ব্যবহারের উপযোগী হয়। আর এইভাবে যে নাইলন-তন্তু পাওয়া যায়, তা খণ্ড খণ্ড করে কেটে তারপর যন্ত্রের সাহায্যে পাকিয়ে সূতায় পরিণত করা হয়, ঠিক যেমন করে কার্পাস তুলা থেকে

---

*প্রথমে এর নাম দেওয়া হয়েছিল Polymer 6-6, কারণ উপাদান দুটির প্রত্যেকটির অণুতে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা ছয়। ১৯৪০ সালে যুদ্ধের প্রয়োজনে প্যারাসুটের কাপড় ও দড়ি তৈরির উদ্দেশ্যে এটি সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়। তখন যুক্তরাষ্ট্রে এবং যুক্ত-রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতার নিদর্শনস্বরূপ এর নাম দেওয়া হয় Nylon (New york & London)।

সুতা তৈরি করা হয়। এজন্যে নাইলনের সুতা খুব মজবুত হয়।

বাস্তবিক, নাইলন এই যুগের এক বিস্ময়কর তন্তু! নাইলনের সুতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং হাল্কা, কিন্তু সে তুলনায় খুবই মজবুত, আর দাহ্য নয় বললেই চলে। নাইলনের জামা-কাপড় থেকে ময়লা সহজেই ছেড়ে যায়, এজন্যে এসব জামা-কাপড় পরিষ্কার করা খুবই সহজ। আর ধুয়ে দিলে তাড়াতাড়ি শুকায়, তাছাড়া ধোয়ার পর জামা-কাপড় কুঁচ্‌কায় না বলে ইস্তিরি করবারও কোন প্রয়োজন হয় না। এই সব কারণে নাইলনের জামা-কাপড়, মোজা প্রভৃতি এখন সর্বত্র খুবই সমাদৃত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে এখন নাইলন দিয়ে মেয়েদের এমন রাত্রিবাস (Night-dress) তৈরি করা হচ্ছে, যার ওজন এক আউন্সের ১৬ ভাগের ৫ ভাগ মাত্র। এদিক দিয়ে নাইলনকে স্বচ্ছন্দে আমাদের দেশের মসলিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এছাড়া প্যারাসুটের কাপড়, দড়ি-দড়া সবই এখন তৈরি করা হয় নাইলনের সুতা দিয়ে। নাইলনের কাপড় জলে ভিজে নষ্ট হবার সম্ভাবনা অনেক কম, তাই সৌখীন নৌকার পালও এখন নাইলনের সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়। আরও বিস্ময়কর সংবাদ এই যে, এতকাল চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের পর সেলাই করবার জন্যে বিড়ালের নাড়ী (Cat-gut) শোধন করে শুকিয়ে নিয়ে তাই তন্তুরূপে ব্যবহার করছিলেন, আজ সেখানে নাইলনের সুতা ব্যবহার করা চলছে।

এবার টেরিলিনের কথা বলছি। এই পদার্থটি তৈরি করা হয় বায়ুশূন্য স্থানে উচ্চ তাপমাত্রায় ডাই-মিথাইল টেরিথ্যালেট (Dimethyl terephthalate, HOOC. C_6H_4. COOH) এবং ইথিলিন গ্লাইকল (Ethylene glycol, $HOCH_2$. CH_2OH)-এর মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়ে। এটি এক রকম পলি-এস্টার জাতীয় যৌগ। মনে রাখবেন, টেরিলিন এবং ডেক্রন কিন্তু একই জিনিষ। ১৯৫৪ সালে, বলতে গেলে প্রায় একই সময়ে, এই পদার্থটি স্বাধীনভাবে যুক্তরাজ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রে আবিষ্কৃত হয়। যুক্তরাজ্যে এর নাম দেওয়া হয় টেরিলিন, আর যুক্তরাষ্ট্রে এর নাম দেওয়া হয় ডেক্রন।

টেরিলিনের জামা-কাপড়ের দাম তুলনায় অনেক বেশী। তাছাড়া এগুলি সহজদাহ্য। তা সত্ত্বেও কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকায় জিনিষটি এখন সর্বত্র সমাদৃত হচ্ছে। টেরিলিন খুব টেকসই, কাচলে একটুও সঙ্কুচিত হয় না বা কুঁচ্‌কায় না। তাই টেরিলিনের জামা-কাপড় ধোয়ার পরে ইস্তিরি করবার কোন প্রয়োজন হয় না। এজন্যে ধোবার খরচও অনেক বাঁচে। তাছাড়া এসব জামা-কাপড় পোকায় কাটে না, আর বর্ষাকালে এতে ছাতা পড়বারও কোন সম্ভাবনা থাকে না। এসব জামা-কাপড় ব্যবহারের এও একটা মস্ত বড় সুবিধা।

গোপালদা এতক্ষণ খুব মন দিয়ে শুনছিলেন। এখন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন—তাহলেই বোঝ নিখিল, এই বিজ্ঞানের যুগে আমরা সবাই কেন আসল ছেড়ে নকলের দিকে এতটা ঝুঁকে পড়েছি। আমাদের এরকম রুচি পরিবর্তনের জন্যে যে তোমরা দায়ী, তা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। অন্যে যাই বলুক, আশা করি তুমি অন্ততঃ এজন্যে আমাদের দোষারোপ করতে পারবে না।

আপনি ঠিকই বলেছেন। এই বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব আমি অস্বীকার করছি না। আর এক্ষেত্রে আসল ছেড়ে নকল জিনিষ ব্যবহার করছেন বলে আপনাদের নিন্দাও আমি করতে পারছি না—এই বলে সেদিনকার মত বিদায় নিলাম।

সয়াবীন বা গাড়ী কলাই

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুলেখা সেন

বর্তমানে সারা দেশে খাদ্য-সঙ্কট খুবই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষজ্ঞগণ দেশকে খাদ্য সম্বন্ধে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, কিন্তু তাঁহারা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন। বিদেশী ছাঁচে ঢালা ব্যয়বহুল বহু পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ব্যয়ের অনুপাতে ফল বিশেষ কিছু হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। অনেকেই বলেন গৌরী সেনের টাকার শ্রাদ্ধ হইতেছে। এই কথা যাউক। আমাদের মতে অতি সহজেই গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন রকমের মাটি, জলবায়ু ও অন্যান্য অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের পুষ্টিকর খাদ্যশস্য প্রবর্তন করা যায়। এই দিকে কর্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হয় না।

এইরূপ একটি খাদ্যশস্য হইতেছে সয়াবীন বা গাড়ী কলাই। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত ডাল-শস্যের কত অভাব এবং উহারা কত দুর্মূল্য, সকলেই হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। সয়াবীন বা গাড়ী কলাইয়ের চাষের প্রবর্তন করিলে ও ডাল হিসাবে উহার ব্যবহার চালু করিলে ডালের অভাব কতকটা মিটিতে পারে। অবিভক্ত বাংলার কৃষি-বিভাগ এই ডাল-শস্য প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা কখন, কোথায়, কি কারণে থামিয়া গেল জানি না। অবশ্য সয়াবীনের উপকারিতার কথা এখনও মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে পড়ি। অধুনা প্রকাশিত পশ্চিম বাংলার কৃষি-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকাতে দেখিলাম যে, তিন প্রকারের উন্নত শ্রেণীর সয়াবীন উদ্ভাবিত হইয়াছে—সয় ম্যাক্স, কে ৩০ এবং বরমালী। সয় ম্যাক্সের বীজ হলদে, একর প্রতি ৯-১৫ মণ ফলন হয়, ১১০-১১৫ দিনে ফসল পাকে। কে ৩০-এর বীজ কালো রঙের, একর প্রতি ৩২ মণ পর্যন্ত ফলন পাওয়া গিয়াছে, ১২৫-১৩০ দিনে পাকে। বরমালীর ফলনও খুব বেশী, একর প্রতি ৪০ মণ, ১৩৫-১৪০ দিনে পাকে। কিন্তু কোথায় কি ভাবে ইহাদের ব্যাপক প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে এবং চেষ্টার কি ফল হইয়াছে, তাহা উক্ত পুস্তিকা পাঠে জানা গেল না। যাহারা এই বিষয়ে উৎসাহী, তাঁহারা কৃষি বিভাগের নিকট অনুসন্ধান করিতে পারেন।

নিম্নে অতি সংক্ষেপে সয়াবীনের চাষ ও ইহার উপকারিতার কথা লিখিত হইল।

চাষের সময়: দুই ঋতুতেই অর্থাৎ খরিপ ও রবিশস্য হিসাবে সয়াবীনের চাষ হইতে পারে। খরিপ শস্যের জন্য বৈশাখ হইতে আষাঢ়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ বুনিতে হয়। রবিশস্যের জন্য আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজ বুনিতে হয়।

চাষের উপযুক্ত জমি ও সার: জল দাঁড়ায় না, এই রকম উঁচু বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ জমিই ইহার চাষের পক্ষে উপযুক্ত। একর প্রতি ৫-৯ গাড়ী পুরাতন ও পচা গোবর সার প্রয়োগ করিলে ফসল ভাল হইবে।

জমি প্রস্তুত প্রণালী: জমিতে ৩।৪ বার লাঙ্গল ও মই দেওয়া দরকার। মাটি একটু গভীর-ভাবে চাষ করিতে হইবে—অন্ততঃ ৬।৭ ইঞ্চি গভীর হওয়া দরকার। মাটি যেন বেশ গুঁড়া হয় এবং মাটিতে যেন কোন আগাছা, আবর্জনা, রাবিস ইত্যাদি না থাকে।

বীজের হার, বপন প্রণালী : একর প্রতি বীজের গুণ অনুসারে ৮-১২ সের বীজ লাগে।

সারি করিয়া বীজ বোনাই প্রশস্ত। গাছ বড় কি ছোট হইবে, ইহার উপরেই সারির দুরত্ব এবং বীজ বোনার দুরত্ব নির্ভর করে; অর্থাৎ বড় জাতের গাছ হইলে এক সারি হইতে আর এক সারির দূরত্ব এবং প্রত্যেক সারিতে একটি বীজ হইতে আর একটি বীজ বোনার দূরত্ব বেশী হইবে। সাধারণতঃ ২ ফুট অন্তর সারিতে ১½-২ ফুট অন্তর বীজ বোনা হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়।

ফসল তোলা : ৪।৫ মাসের মধ্যে ফসল পাকে সাধারণতঃ একর প্রতি ১০-১৫ মণ। তবে কৃষি-বিভাগের উদ্ভাবিত উন্নত শ্রেণীর বীজের ফলন বেশী।

সয়াবীনের উপকারিতা : ডাল ছাড়া সয়াবীন হইতে আটা, দুধ, তেল পাওয়া যায়। আটা হইতে নানা প্রকারের খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত হয়। বহুমূত্র-রোগীর পক্ষে সয়াবীনের দুধ খুবই উপকারী। সয়াবিনের তেল হইতে সাবান, রং, মোমবাতি, কৃত্রিম রবার, ছাপার কালি, অয়েল ক্লথ প্রভৃতি বহু রকমের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে আরও অনেক প্রকারের শিল্প-সামগ্রী প্রস্তুত করা যায়।

আমাদের দেশে ডাল হিসাবে সয়াবীনের প্রচলন খুবই বাঞ্ছনীয়। দুধের জন্যও সয়াবীনের প্রচলন দেশের প্রভূত কল্যাণ করিবে।

শব্দোত্তর তরঙ্গ

মিহিরকুমার কুণ্ডু

শব্দ জগতের ছোট বড় অজস্র আবিষ্কারের মধ্যে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো, শ্রুতির অগোচর শব্দের অস্তিত্ব নির্ণয় ও উৎপাদন। আলোর মধ্যে বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল—এই সাতটি দৃশ্য বর্ণ ছাড়া আরও অনেক দৃশ্য বর্ণ আছে। লালের পরে অবলোহিতের (Infrared) বড় বড় ঢেউ, বেগুনীর পরে অতিবেগুনীর (Ultraviolet) ছোট ছোট ঢেউ দুই-ই সমান অদৃশ্য। আলোর মত শব্দেরও শ্রুতিসীমার বাইরে অস্তিত্ব রয়েছে। আমরা জানি, শব্দ-সৃষ্টিকারী উৎসের কম্পনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু যদি উৎসের কম্পনের সংখ্যা বা কম্পনাঙ্ক * সেকেণ্ডে ১৫-এরও কম হয়, তবে ঐ শব্দ আমাদের কর্ণগ্রাহ্য হবে না। আবার কম্পনাঙ্ক ২০০০০-এর বেশী হলেও কান সেই শব্দ শুনতে পায় না। কর্ণগ্রাহ্য শব্দের কম্পনাঙ্ক ১৫ থেকে ২০০০০-এর মধ্যে অবস্থিত। যে শব্দের কম্পনাঙ্ক সেকেণ্ডে ২০০০০-

* আলোর ন্যায় শব্দও তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়। এক তরঙ্গ-শীর্ষ থেকে অন্য তরঙ্গ-শীর্ষ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (Wave length) বলা হয়। আমরা যে সব শব্দ শুনতে পাই, তাদের সকলের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক নয়। তরঙ্গ প্রসঙ্গে এর দৈর্ঘ্য ছাড়াও আরেকটি অধিকতর প্রচলিত পরিমাপ আছে—প্রতি সেকেণ্ডে এই ঢেউ কতবার দুলে ওঠে, তাকে কম্পনাঙ্ক (Frequency) বলে। কোন শব্দের কম্পনাঙ্ক ২৫৬ বলতে বোঝায়, প্রতি সেকেণ্ডে ২৫৬ বার দোলে। তরঙ্গ-তত্ত্বের প্রথম কথা এই যে, দৈর্ঘ্য ও কম্পনাঙ্ক—এই দুইয়ের গুণফলের উপর তরঙ্গের গতিবেগ নির্ভরশীল। শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগ নির্দিষ্ট। সুতরাং যে তরঙ্গ যত দীর্ঘ, তার কম্পনাঙ্ক তত কম।

এর বেশী, সেই শব্দকে শব্দোত্তর তরঙ্গ (Ultrasonic বা Supersonic wave) বলা হয়।

যদিও শব্দোত্তর তরঙ্গ মানুষের কানে কোন শব্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে না, তথাপি এর ব্যবহারিক প্রয়োগ বহুবিধ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের পরিধি ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

জল বা কোন তরল পদার্থের মধ্যে শব্দোত্তর তরঙ্গ পাঠালে তরলের মধ্যে জায়গায় জায়গায় গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এর কারণ, এই তরঙ্গ পাঠাবার ফলে তরল পদার্থ তীব্র পীড়নের (Stress) সম্মুখীন হয়, ফলে স্থানে স্থানে তরল পদার্থ বিদীর্ণ হয়ে শূন্য গহ্বরের সৃষ্টি করে। শূন্য হওয়ায় গহ্বরগুলি তরল পদার্থে দ্রবীভূত গ্যাসীয় পদার্থসমূহ শোষণ করে নেয়। কিন্তু এই গহ্বরগুলি অত্যন্ত অস্থায়ী, শীঘ্রই বিস্ফোরণসহ ভেঙ্গে যায়। বিস্ফোরণের কালে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। এই চাপের পরিমাণ কয়েক শত থেকে দুই হাজার বায়ুচাপ (১ বায়ুচাপ = ১৪.৭ পাউণ্ড/বর্গ ইঞ্চি) পর্যন্ত হতে পারে।

এর ফলে আশেপাশের জিনিষপত্র, যেমন—শব্দোত্তর তরঙ্গ-উৎপাদনকারী যন্ত্র সামান্য পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শব্দতরঙ্গের প্রবাহও বিঘ্নিত হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, আপাতদৃষ্টিতে রুদ্ররূপে আবির্ভূত হলেও শীঘ্রই এই তরঙ্গ শিবরূপে আত্মপ্রকাশ করে, বিনাশী শক্তি কল্যাণী শক্তিরূপে দেখা দেয়। শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে ময়লা কাপড়-জামা অতি সহজে অল্প সময়ে ধোওয়া হয় বা শব্দোত্তর তরঙ্গ এক নতুন ধৌত প্রণালী উদ্ভাবনের কৃতিত্ব অর্জন করে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা আবশ্যক—পরিষ্করণ প্রসঙ্গে শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রেরণের পুর্ব থেকেই অবস্থিত তরল পদার্থে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ কণার অবদানও শব্দতরঙ্গের সৃষ্ট গহ্বরের চেয়ে কম নয়। এটা ঠিক যে, এই বুদ্বুদগুলি বায়ুপূর্ণ ও বেশ স্থায়ী। এরা কোন ঢেউয়ের আলোড়ন সৃষ্টি করে না—শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রভাবে এরা কেবল পর্যায়ক্রমে সঙ্কোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে স্পন্দিত হয়। তাহলে প্রশ্ন হলো, এই পরিষ্করণ সংক্রান্ত বিষয়ে এদের ভূমিকা কি ধরণের?

আমরা জানি, তরলের স্পর্শতলে পৃষ্ঠটানজনিত (Surface tension) বল ক্রিয়া করে। এই টানের ফলে বুদ্বুদের বহিস্তল ছোট হতে চায় অর্থাৎ এটা গোলাকার হয়, যেহেতু গোলকের বহিস্তল ক্ষুদ্রতম। কোন বুদ্বুদ কঠিন তলের সন্নিকটে এলে পৃষ্ঠটানের ফলে সেটা ঐ স্থান সংলগ্ন হয়ে থাকে। ধরা যাক, কঠিন তলটি কোন ময়লা জামা কাপড় বা ঐ ধরণের কোন ময়লা দ্রব্য এবং এই ময়লার কণাগুলি নিশ্ছিদ্রভাবে জামার উপর বিস্তৃত নয়। মনে করা যাক, বুদ্বুদটি কোন ছিদ্র দিয়ে ময়লা ও জামার স্তরের ভিতর প্রবেশ করছে। এবার শব্দোত্তর তরঙ্গ পাঠানো হলো। বুদ্বুদটি প্রসারিত হবার সময় ময়লার স্তরটিকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চাইবে। আবার সঙ্কোচনের সময় জামার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে জামা ও ময়লা—এই দুই স্পর্শতলের আরও ভিতরে ঢুকতে চাইবে। এইরূপ বারংবার হবার ফলে ময়লার স্তরের কোন কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিট্‌কে যাবে। এইরূপ অসংখ্য বুদ্বুদের ক্রিয়ার ফলে ময়লার সম্পূর্ণ আস্তরণটি ভেঙ্গে যায়। যে সব বুদ্বুদ ময়লা ও জামার স্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে নি, তারাও কিন্তু অলস হয়ে বসে থাকে না। বিচ্যুত ময়লা পৃষ্ঠটানের ফলে এদের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে পড়ে এবং পরিশেষে বহিষ্কৃত হয়ে যায়।

শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে অনেক পদার্থ, যা জলে অদ্রবণীয় অথবা তরল পদার্থ, যা জলে মিশ খায় না, তাদের জলে দ্রবণীয় করা যায়।

যেমন—তেল আর জলে মিশ খায় না, কিন্তু শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রভাবে এটা এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণায় বিভক্ত হয়ে পড়ে যে, একটি খুব স্থায়ী অবদ্রব (Emulsion) তৈরি হয়—দীর্ঘ সময় তেল ও জল আলাদা হয়ে যায় না। অনুরূপভাবে দুধ, চর্বি ও জলের অবদ্রবের মধ্যে যদি শব্দোত্তর তরঙ্গ পাঠানো হয়, তাহলে চর্বি এত সূক্ষ্ম কণায় ভেঙ্গে যায় যে, দুধকে বহুদিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় এবং কোন কল্কও (Sediment) পড়ে না।

এই তরঙ্গ একত্রীভূত কণাকেই কেবল বিচ্ছিন্ন করে না, বিচ্ছিন্ন কণাকে একত্রীভূতও করে। গলিত কাচের ভিতর এই তরঙ্গ পাঠালে এর মধ্যে আবদ্ধ বায়ুবুদ্বুদ একত্রিত হয়ে উপরে ভেসে ওঠে। ফলে অপ্‌টিক্যাল লেন্সের উপযোগী উৎকৃষ্ট কাচ অনেক সহজে এবং সুনিপুণভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়। এই তরঙ্গের প্রভাবে অধঃক্ষিপ্ত সূক্ষ্মকণার একত্রীভবনের ফলে অধঃক্ষেপণ (Precipitation) অত্যন্ত ত্বরান্বিত হয়। সোডা তৈরি কালে ম্যাগ্‌নেশিয়াম হাইড্রক্সাইডের অধঃক্ষেপণ এইভাবে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে অত্যন্ত শক্ত জিনিষ, যেমন—কাচ, পাথর, শক্ত সঙ্কর ধাতু (Alloy) এবং আরো অনেক কঠিন পদার্থ কাটা সম্ভব। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়—উল্লিখিত পদার্থগুলি প্রত্যেকেই উচ্চ আঘাতে ভঙ্গুর।

অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, কলঙ্কশূন্য ইস্পাত এবং আরো অনেক ধাতু ও সঙ্কর ধাতুর উপর টিনের আস্তরণ দিতে শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। যে পদার্থের উপর আস্তরণ দিতে হবে (যেমন—লোহা) তাকে গলিত সলডারের (Solder—সীসা ৮০%, টিন ২০%) মধ্যে রেখে শব্দোত্তর তরঙ্গ পাঠানো হয়। এই তরঙ্গের স্পন্দনের ফলে লোহার উপরিস্থিত অক্সাইডের আস্তরণ ছিন্ন হয়ে যায় এবং সহজেই টিনের দৃঢ় আস্তরণ পড়ে। কিন্তু এর চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই তরঙ্গের সাহায্যে যে কোন দুই বা ততোধিক ধাতু বা সঙ্কর ধাতু (যেমন অ্যালুমিনিয়াম ও পিতল) সাধারণ উষ্ণতায় জোড়া লাগানো যেতে পারে, কোন তাপের দরকার হয় না, অথচ বন্ধন খুব দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। প্লাষ্টিকের দ্রব্যাদিও জোড়া লাগানো যেতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ডুবো জাহাজের অবস্থান নির্ণয়ে শব্দোত্তর তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। এই তরঙ্গের একটি বিশিষ্ট ধর্ম এই যে, এটা আলোর তরঙ্গের ন্যায় সরলরৈখিক পথে চলাচল করে। এই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে জলে শব্দোত্তর তরঙ্গ ছাড়া হয়। সম্মুখে কোন বাধা থাকলে তাতে প্রতিহত হয়ে প্রতিফলনের মাধ্যমে এই তরঙ্গ সোজা ফিরে আসে। তরঙ্গের বেগ জানা থাকায় সময় নির্ণয় করে ডুবো জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করা কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার মাত্র। শব্দোত্তর তরঙ্গের এই ধর্ম আজকাল সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়েও ব্যবহৃত হয়।

মাছ ধরাতেও এই তরঙ্গ ব্যবহার করা যেতে পারে। দেখা গেছে, মাছের পেটের ভিতর যে বায়ুপূর্ণ থলি (Air bladder) আছে, তা শব্দোত্তর তরঙ্গ প্রতিফলিত করতে সক্ষম। প্রতিফলিত শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে জলপৃষ্ঠ থেকে মাছের অবস্থানের গভীরতা কত এবং ওদের গতির অভিমুখ জানা খুবই সহজ।

আজকাল যে সব পদ্ধতিতে কড্ মাছের লিভার থেকে কড্‌লিভার তেল নিষ্কাশিত হয়, তাতে উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োজন। কিন্তু এতে এই তেলে যে সব ভিটামিন থাকে, তা কিছু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে তেলের কার্যকারিতা কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে সাধারণ উষ্ণতায় তেল নিষ্কাশন

সম্ভব, ফলে তেলের ভিটামিনগুলি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তেলের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

যে সব পদার্থ সহজে শুকাতে চায় না, যেমন—সিলিকা জেল, অ্যালুমিনা বা যে সব পদার্থ তাপ প্রয়োগে বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যেমন—অনেক রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ঔষধপত্র—প্রভৃতি এই তরঙ্গের সাহায্যে অত্যন্ত সহজে এবং দ্রুত শুকানো যেতে পারে। ভ্যাকুয়াম পদ্ধতির সাহায্যে যেখানে সিলিকা জেল থেকে ১৫ মিনিটে শতকরা ৪ ভাগ জলীয় বাষ্প বা ৯৩° সে. উষ্ণতায় ঐ পদ্ধতিতে শতকরা ২০ ভাগ জল বিদূরিত করা যায়—এই তরঙ্গের প্রভাবে ঐ একই সময়ে উষ্ণতা বৃদ্ধি না করে পদার্থটিকে সম্পূর্ণরূপে শুকানো যেতে পারে।

ধাতুর (যেমন—লোহা) ভিতরের খুঁৎ (Flaw) বের করতেও এই তরঙ্গ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভেষজ-বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ে ও উপশমে শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই কিছু কিছু আরম্ভ হলেও ঐ মহাযুদ্ধের পরেই সমধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

আমরা জানি, মস্তিষ্কের দুটি অংশ—শ্বেত ও বাদামী। উভয় অংশই স্নায়ুকোষে গঠিত, তবে এদের উভয়ের কাজ আলাদা। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বাদামী অংশ অপেক্ষা শ্বেত অংশের উপর শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রতিক্রিয়া অধিকতর মারাত্মক ও ক্ষিপ্র। সুতরাং বাদামী অংশের কোন ক্ষতি না করে রোগগ্রস্ত স্নায়ুকোষের বিনাশ সাধন সম্ভব। প্রচলিত পদ্ধতিতে স্নায়ুর শস্ত্রচিকিৎসার (Neuro-surgery) অসুবিধা এই যে, এতে অনেক সুস্থ অংশ বিনষ্ট হয় এবং অনেক প্রয়োজনীয় রক্তবাহী শিরা ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে অনিবার্যরূপেই মস্তিষ্ক বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে এই অসুবিধা দূরীকরণ সম্ভব। কিন্তু এই তরঙ্গ খুলিতে অত্যধিক প্রতিফলিত হয়। এই জন্যে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে হলে খুলির কিছুটা অংশ অপসারিত করা প্রয়োজন। জীবজন্তুর উপর এই পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত সফল হয়েছে। মানুষের উপর পরীক্ষাও আশাজনক ও সম্ভাবনাপূর্ণ।

শব্দোত্তর তরঙ্গ স্নায়ুবেদনা, বাতবেদনা (বিশেষতঃ নিতম্বের বাত), শ্বাসনালীর শ্লেষ্মা ও শ্বাসকষ্ট উপশমে অত্যন্ত কার্যকরী। বেদনা, ফোঁড়া, একজিমা প্রভৃতির চিকিৎসায় এর সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবাণুকোষে এই তরঙ্গের প্রতিক্রিয়া মারাত্মক। এই জন্যে পানীয় জল, দুধ এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যাদি জীবাণুশূন্য করতে এই তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়।

জটিল চক্ষুরোগ, যেমন—রেটিনার বিচ্যুতি নির্ণয়ে, অনেক কঠিন হৃদ্‌রোগ যা ইলেকট্রো-কার্ডিয়োগ্রাফ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না, শরীরের কোন্ হাড় কি ভাবে ভেঙ্গেছে, তা নির্ধারণ করতে রণ্টগেন রশ্মিও যেখানে অসহায়, সেখানে পর্যন্ত শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার বিস্তৃত হচ্ছে।

পরিশেষে একথা বলাই বাহুল্য যে, শব্দোত্তর তরঙ্গ বিজ্ঞান এখনো শৈশবাবস্থায়। এর সুলভে উৎপাদন ও পূর্ণ সদ্ব্যবহার হতে এখনো হয়তো বেশ কিছু সময় লাগবে। কিন্তু এর বিপুল সম্ভাবনার কথা ভেবে বিজ্ঞানের দিক দিয়ে উন্নততর দেশগুলিতে, বিশেষতঃ রাশিয়া ও আমেরিকায় এর সুষ্ঠু ও যথাসাধ্য প্রয়োগ এবং একে সুলভ করবার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চলছে।

অধ্যাপক পঞ্চানন মাহেশ্বরী

রথীন চক্রবর্তী

১৮ই মে, (১৯৬৬) অধ্যাপক পি. মাহেশ্বরী, এফ. আর. এস. নয়া দিল্লীর উইলিংডন নার্সিং হোমে মস্তিষ্কে ভাইরাসজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৬২ বছর। তাঁর অকস্মাৎ পরলোক গমন শুধু যে ভারতের এক অবিস্মরণীয় দুর্দিন তা নয়, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রেও এক অপূরণীয় ক্ষতি।

গত নভেম্বর-ডিসেম্বর (১৯৬৫) মাসে অধ্যাপক মাহেশ্বরী বসু বিজ্ঞান মন্দির এবং বঙ্গীয় উদ্ভিদ সমিতির আমন্ত্রণে কলকাতায় আসেন এবং তাঁর সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করবার সুযোগ পাই। অবশ্য ১৯৬৩ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। যে মহান বৈজ্ঞানিক তাঁর সারা জীবন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, যে জ্ঞান-তপস্বী তাঁর কর্মরত জীবনের উত্তর-কালে অসাধারণ প্রতিভায়, বিদ্যাবত্তায় ও চরিত্রের মাধুর্যে প্রভূত যশ ও খ্যাতি অর্জন করে চিরবিদায় নিয়েছেন, সেই প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ক্ষেত্রে বহুবিধ অবদানের মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে বাতুলতা মাত্র। তাই অতি সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। ভারতের যে কয়েকজন বিজ্ঞানী তাঁদের অসাধারণ গবেষণার ফলে আন্তর্জাতিক যশ ও সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, অধ্যাপক মাহেশ্বরী ছিলেন তাঁদেরই একজন। ১৯০৪ সালের ৯ই নভেম্বর রাজস্থানের জয়পুর সহরে তাঁর জন্ম হয়। যথাসময়ে সেখানকার স্কুলের শিক্ষা শেষ করে ১৯২১ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্যে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে সম্মান ও কৃতিত্বের সঙ্গে ১৯২৭ সালে এম. এস-সি পাস করেন।

মেধাবী ছাত্র হিসাবে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণায় রত, তখন থেকেই তাঁর শিক্ষকতার কাজ সুরু হয়। তাঁর প্রথম কর্মস্থল আগ্রা কলেজ। এখানে থাকাকালীন ১৯৩১ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। সেই অবধি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর তিনি অসীম গৌরবের সঙ্গে শিক্ষা ও গবেষণার কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

অধ্যাপনার কাজে জীবনের প্রথম ছয় বছর (১৯৩০-৩৬) তাঁর কাটে আগ্রা কলেজে। ১৯৩৬ সালে সুরু হয় তাঁর প্রথম বিদেশ যাত্রা (১৯৩৬-'৩৭)। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৭-'৩৯) ও পরে অল্প কিছু কালের জন্যে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে তিনি উদ্ভিদবিদ্যার রীডার ও সদ্যপ্রতিষ্ঠিত জীববিদ্যার প্রধানরূপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এখানে থাকা-কালীন ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয়বার তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় যান ও সেখানে দু-বছর থাকবার পর ১৯৪৭ সালে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করবার পর অধ্যাপক পদে উন্নীত হন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডীনরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন

তখন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জীব-বিদ্যা বিষয়ে বি. এস-সি. ও উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে এম. এস-সি. শিক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৩৭ সালে তিনিই প্রথম জীববিদ্যা বিষয়ে বি. এস-সি. শিক্ষণের সূত্রপাত করেন এবং ১৯৪৭ সালে উদ্ভিদবিদ্যায় এম. এস-সি. পাঠক্রমের প্রবর্তন করেন। ১৯৪৯ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ মাহেশ্বরীকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ও বিভাগের প্রধানরূপে যোগদান করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালে তিনি অবিলম্বে সেখানকার কার্যভার গ্রহণ করেন। সেই অবধি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কর্মজীবনের গভীর ব্যস্ততার মধ্যেও ডাঃ মাহেশ্বরী বহুবার ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপক-ভাবে সফর করেন। তথাকার বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে তিনি যে কেবল নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করেছিলেন তাই নয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণ ও গবেষণার পদ্ধতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত হবার ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহান গবেষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ও মিলিত হবার সৌভাগ্যও লাভ করেছিলেন।

এলাহাবাদে শিক্ষাকালে তাঁর শিক্ষাগুরু Dr. Winfield Dudgeon-এর অগাধ পাণ্ডিত্য, সুনিপুণ গবেষণা-পদ্ধতি ও চরিত্রমাধুর্য ডাঃ মাহেশ্বরীর ছাত্রজীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। ১৯৩৬-৩৭ সালের তাঁর প্রথম ইউরোপ ভ্রমণের সময় জার্মেনীর কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের Professor Karl Schnarf-এর গবেষণার রীতি ও কৌশলও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এর ফলে তখন থেকে গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology of Angiosperms) সম্বন্ধে গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তু নিয়ে পুস্তক রচনার ইচ্ছা তাঁর মনে প্রথম উদয় হয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণের সময় হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পুস্তক রচনার জন্যে প্রচুর সময় অতিবাহিত করেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৫০ সালে তাঁর বহু ঈপ্সিত পুস্তক 'An Intrcduction to the Embryology of Angiosperms' প্রকাশ করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বত্র বিজ্ঞানী মহলে তাঁর এই পুস্তক খুবই সমাদর লাভ করেছে। রুশ ভ্রূণতত্ত্ববিদেরা এই পুস্তকখানিকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং ১৯৫৮ সালে ডাঃ মাহেশ্বরী যখন রাশিয়ায় যান, তখন রুশ বৈজ্ঞানিকেরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনসূচক বইখানির অনুবাদ উপহার দেন। রাশিয়া থেকে ঠিক এই রকমই সম্মান পেয়েছিলেন ভারতের আর একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক স্বর্গীয় ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র তাঁর 'আপার অ্যাটমোস্‌ফিয়ার' বইখানি লিখে।

বিদেশের বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে ও বিদেশে বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে ভারতের নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিরূপে ডাঃ মাহেশ্বরী বহুবার বিদেশে গমন করেছিলেন। আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ কংগ্রেসে যোগদান করবার জন্যে তিনি ১৯৫০ সালে ষ্টকহোমে, ১৯৫৪ সালে প্যারিসে ও ১৯৫৯ সালে মন্ট্রেলে গিয়েছিলেন। আবার UNESCO-এর আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন ১৯৫২ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ও ১৯৫৪ সালে ইজিপ্টে। ভারত সরকারের প্রবর্তিত একটি বিজ্ঞান ও একটি শিক্ষা মিসনের অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি ১৯৫৬ সালে রাশিয়ায় ও ১৯৫৮ সালে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালে ভিজিটিং অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে তিনি ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে যান ও সেখানে তাঁর গবেষণালব্ধ গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি বক্তৃতা দেন। ১৯৬১ সালে জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক সরকারের আমন্ত্রণে তিনি পশ্চিম

জার্মেনীর কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন ও বক্তৃতা দেন।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও জটিল গবেষণার স্বীকৃতিরূপে ভারত ও ভারতের বাইরের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের বিভিন্ন সম্মেলনের উচ্চতর পদে নির্বাচিত করে ডাঃ মাহেশ্বরীকে সম্মানিত করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর ফেলো ও ১৯৩৫ সালে ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের সদস্য (এফ. এন. আই.) নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে আমেরিকান বোটানিক্যাল সোসাইটি তাঁকে তাঁদের Corresponding member পদে বরণ করেন ও আমেরিকান কলা ও বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী তাঁকে তাদের অবৈতনিক বৈদেশিক 'ফেলো' মনোনীত করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি জার্মেনীর Kaiserlich Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Halle-এর বৈদেশিক সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৫০ সালে পুনায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং সেই বছরই ষ্টকহোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ কংগ্রেসের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ কংগ্রেসের ভ্রূণতত্ত্ব শাখার সভাপতিত্ব করেন ও পুনরায় ১৯৫৯ সালে মন্ট্রেলে অনুষ্ঠিত ঐ কংগ্রেসের উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান শাখার সহকারী সভাপতি হন। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের জীববিদ্যা বিষয়ের কর্মসচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের যে সব বিষয় নিয়ে তিনি আজীবন মৌলিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, তার মধ্য উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাজনের তথ্য নির্ধারণ, ভ্রূণতত্ত্বের উন্নতিসাধন ও কৃত্রিম উপায়ে বীজ, ফল-মূল উৎপাদন। উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত, অঙ্গসংস্থান ও ভ্রূণবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি যে সব বই লিখেছেন, তার মধ্য, গুপ্তবীজী উদ্ভিদের ভ্রূণতত্ত্ব, Gnetum, ভারতের অর্থনৈতিক উদ্ভিদের অভিধান, ভ্রূণতত্ত্বে আধুনিক প্রগতি, ভারতের উদ্ভিদবিদ্যায় ৫০ বৎসর (ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত), ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ মাহেশ্বরীর আগ্রহ ও উৎসাহে উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান বিষয় নিয়ে চর্চা ও আলোচনার জন্যে গড়ে উঠেছে International Society of Plant Morphologists এবং তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের Founder President প্রথম সভাপতি। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতিরূপে কাজ করে গেছেন। Phytomorphology নামক সমিতির এই পত্রিকাখানি ভারত ও ভারতের বাইরে ডাঃ মাহেশ্বরীর কীর্তির বাহকরূপে বিদ্যমান। তিনি ছিলেন এই পত্রিকার Founder Editor। তাঁর নিজস্ব ১৮০টি মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের মিলিত প্রায় ৪০০ গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে।

এই সব বহুবিধ মৌলিক গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৯ সালে মন্ট্রেলে ম্যাকৃগিল বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে Honorary Doctorate ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করে! সেই বছরই তিনি ভারতীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সমিতির বীরবল সাহানী স্মৃতিপদক ও ১৯৬৪ সালে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের সুন্দরলাল হোড়া স্মৃতিপদক প্রাপ্ত হন।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সম্মান এসেছিল গত বছর ইংল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত রয়েল সোসাইটির কাছ থেকে। বৈজ্ঞানিক জীবনের নতুন নতুন বিভিন্ন অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে রয়েল সোসাইটি অধ্যাপক মাহেশ্বরীকে 'ফেলো' নির্বাচিত করে তাঁর জ্ঞান ও গবেষণার সম্মান প্রদর্শন

করেছিল। ইতিপূর্বে আরও দু-জন ভারতীয় উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী এই আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেন। তাঁরা হলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাঃ বীরবল সাহানী।

তিনি ১৯৬৮ সালের জন্যে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৩০শে নভেম্বর, ১৯৬৫ ডাঃ মাহেশ্বরী বসু বিজ্ঞান মন্দিরের আমন্ত্রণে 'Botany and the food problem of India' সম্বন্ধে এবং ১লা ডিসেম্বর বঙ্গীয় উদ্ভিদ সমিতির আমন্ত্রণে কলকাতায় 'Experimental Embryology'র উপর আচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন।

অধ্যাপক মাহেশ্বরী ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। নিজের চেষ্টা ও সাধনায় বিশ্বের বিজ্ঞানী সমাজে তিনি কেবল নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করে যান নি বরং যে সব ছাত্র তাঁর সান্নিধ্যে শিক্ষা লাভ করেছেন, তাঁদের অনেককেই তিনি বড় করে, যশ ও খ্যাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

অধ্যাপক মাহেশ্বরীর তিরোধানে ভারতের উদ্ভিদ-বিদ্যার চর্চার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো, তা হয়তো সহজে পূর্ণ হবার নয়, কিন্তু একজন আদর্শ অধ্যাপক ও মৌলিক গবেষণার অধ্যক্ষ হিসাবে বিজ্ঞান-জগতে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মস্তিষ্কের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ

বীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

তখন বেলা একটা।

বিজ্ঞানী আপন মনে একটার পর একটা বোতামে চাপ দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর হাতের ক্ষুদ্র বেতার প্রেরক যন্ত্রটায়—আর লক্ষ্য করছেন, ষাঁড়টার স্বভাবের পরিবর্তনে কি কি ঘটে। প্রথম বোতামে চাপ দিতেই দেখতে পেলেন, মারমুখী ষাঁড়টা ছুটে আসতে চায় বিজ্ঞানীর দিকে। পর মুহূর্তে চাপ দিলেন বিজ্ঞানী দ্বিতীয় বোতামটায়। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল এক অদ্ভুত পরিবর্তন। শান্ত ও গম্ভীরভাবে ষাঁড়টা আপন মনে জিভ দিয়ে নিজের পা চুলকাচ্ছে। দেখে নিজের মনেই সন্দেহ হলো, আগের মুহূর্তে যে ভাবটা দেখলাম, তা কি সত্য না স্বপ্ন! তারপর বিজ্ঞানী তাঁর হাতের ক্ষুদ্র যন্ত্রটার তৃতীয় বোতামে চাপ দিলেন। দেখতে পেলেন ষাঁড়টা এখন তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে অতি নির্বোধ দৃষ্টিতে।

বিজ্ঞানী ডেলগ্যাডো তাঁর পরীক্ষার জন্যে বেছে নিলেন বিড়াল আর বানর। তিনি তাদের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে বসিয়ে দিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইলেকট্রোড। প্লাগের মত আট্‌কে রইলো ইলেকট্রোডগুলি। বাইরে খুলির উপর ইলেকট্রোডের একটু অংশ বেরিয়ে রইলো মাত্র। তারপর তাদের নিয়ে পরীক্ষা চললো। বিজ্ঞানী কখনো কখনো তাদের মধ্যে তাঁর নিজের ইচ্ছামত ঝগড়া বাঁধিয়ে দিতেন; কখনো বা তাদের মধ্যে এমন একটা স্নেহপূর্ণ ভাব এনে দিতেন, যাতে মনে হতো—এদের একটি মা, অন্যটি তারই সন্তান। এই সব পরীক্ষা দেখলে মনে হবে যেন কোন বৈদ্যুতিক পুতুলের খেলা দেখছি।

বাইরের সাধারণ দৃষ্টিতে এটা বৈদ্যুতিক পুতুল নাচ বলে মনে হলেও বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে এটার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। এর উদ্দেশ্য জৈব

দৃষ্টিকোণ থেকে জীবের স্বভাব-চরিত্র, তার বৈশিষ্ট্য ও তার ভাবাবেগ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা। নতুন ভাবে এই সম্বন্ধে আলোচনা হলেও এটা কিন্তু আজকের কথা নয়। আজ থেকে দেড়-শ' বছর আগেকার বিজ্ঞানীরা একথা বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা মানুষের মাথার খুলির বিভিন্ন ভাগগুলিকে মস্তিষ্ক পরিচালনার এক-

অর্থাৎ একটা অংশের কাজের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের স্বাভাবিক সহযোগিতার উপর।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিজ্ঞানীরা স্বাভাবিক প্রাণীর মস্তিষ্কের উল্লিখিত বিভিন্ন অংশকে ঐ একই ভাবে উত্তেজিত করে তাদের কার্য নিয়ন্ত্রণাবলী আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করতে সক্ষম হন। ওষুধ প্রয়োগে চেতনাহীন
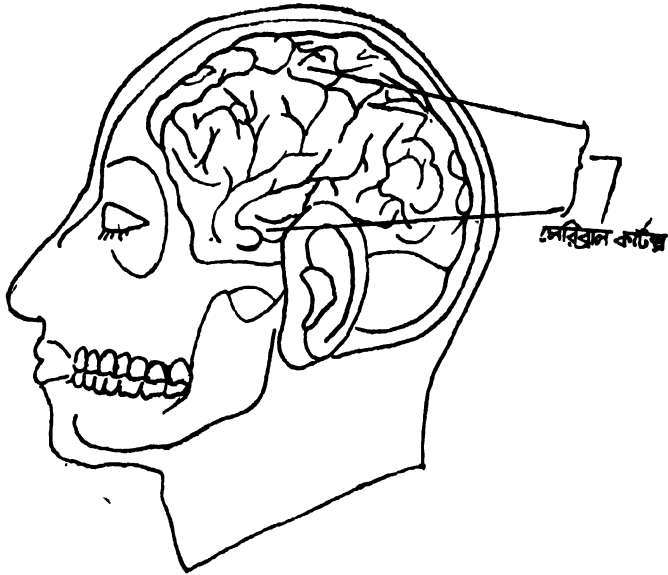
১নং চিত্র—ক
মাথার খুলির ভিতর মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেক্স-এর উপস্থিতি দেখানো হয়েছে।

একটা অংশ বলে মনে করতেন। এঁদের মধ্যে এফ. জে. গল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা অতি কম ভোল্টেজের কারেন্ট ওষুধ প্রয়োগে চেতনাহীন প্রাণীর মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে ব্যবহার করে দেখালেন যে, মস্তিষ্কের প্রতিটি অংশের কাজ যদিও পৃথক, তথাপি এই অংশগুলির নিজেদের মধ্যে একটা পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব দেখা যায়;

প্রাণীর মস্তিষ্কের কার্যাবলীর যে সব তথ্য কিছুতেই জানা সম্ভব হচ্ছিল না, যেমন—প্রাণীর বিচার বুদ্ধি অথবা তার ভাবাবেগ ইত্যাদি—বিংশ শতাব্দীর স্বাভাবিক প্রাণীর উপর পরীক্ষার তাদের প্রতিক্রিয়া আরও গভীর, আরও পরিষ্কার-ভাবে জানতে পারা গেল। ক্যাম্বেল মস্তিষ্কের উপরি-ভাগের একটা চিত্র অঙ্কন করে তাতে সমস্ত মস্তিষ্ক-টাকে কুড়িটা ভাগে ভাগ করেন। ব্রডম্যান

ক্যাম্বেলের ভাগটাকে বাড়িয়ে ৪৭টি অংশে পরিণত করেন। কিন্তু এর পরবর্তী কর্মীরা ঐ ৪৭টি অংশকে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে মোটমাট দুই শত করেন। মনুষ্য মস্তিষ্কের পরিধি প্রায় ২২০,০০০ বর্গ মিলিমিটার। আর এখান থেকে আসা-যাওয়া স্নায়ুতন্তুর সংখ্যা ২০০ মিলিয়ন। এগুলি বাদ দিলেও দেখা যায় আরও বহুসংখ্যক স্নায়ুতন্তু আছে, যারা মস্তিষ্কে এক অংশের একটা স্নায়ু-

বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন সেরিব্র্যাল কর্টেক্স এই সেরিব্র্যাল কর্টেক্স কিন্তু আসলে কয়েক কোটি স্নায়ুকোষ ও তার সংযোগকারী স্নায়ুতন্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের সোজা সিঁথির মাঝ বরাবর এই আঁকাবাঁকা বস্তুগুলি সমান দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা আমাদের ডানদিকে থাকে, যাকে দক্ষিণ হেমিস্‌ফিয়ার, অন্যটা বাঁ-দিকে থাকে, যাকে বাম হেমিস্‌ফিয়ার বলে। একটা হেমিস্‌ফিয়ার
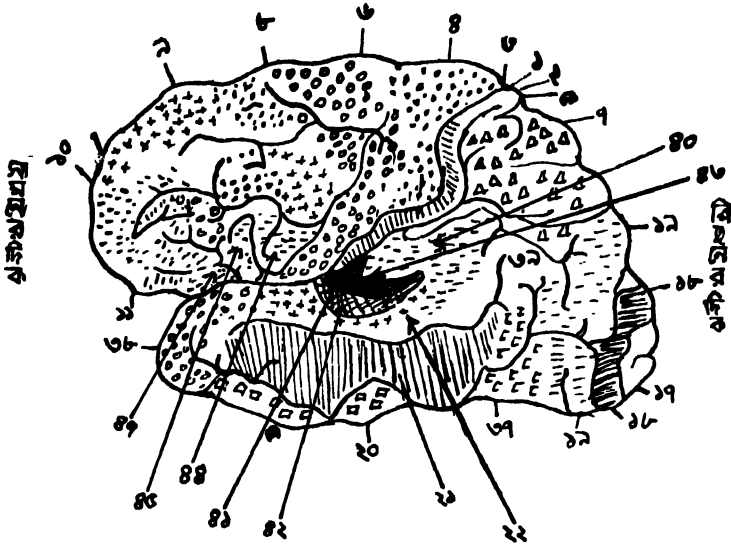
১নং চিত্র—খ
মানব-মস্তিষ্কের মানচিত্র

কোষের সঙ্গে অন্য একটা অংশের যোগাযোগ রক্ষা করছে। এই সব অংশগুলির কাজের উপর এদের সংখ্যা লিখে দেওয়া হলো এবং পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীরা তা স্বীকার করে নিলেন। ১নং চিত্রের ক ও খ-র দিকে লক্ষ্য করলে এই সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে পরিষ্কার জানতে পারা যাবে। মাথার খুলিটা তুলে ফেলবার পর কতকগুলি এবড়ো-খেবড়ো, আঁকাবাঁকা বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। আর এগুলির সবটা মিলে যা হয়,

অন্যটার সঙ্গে সব সময়ই যোগাযোগ রক্ষা করে চলে স্নায়ুতন্তুর সাহায্যে। সমস্ত সেরিব্র্যাল কর্টেক্সটাকে মোটামুটি প্রধান চারটি অংশে ভাগ করা হয়েছে; যেমন—আমাদের কপালের ভিতরের অংশটাকে 'সামনের ভাগ,' তার পরের অংশটা অর্থাৎ মস্তিষ্কের ঠিক মধ্যস্থলের সামনের অংশটাকে 'প্যারাইট্যাল' আর মধ্যস্থলের পিছনের অংশটাকে অক্সিপিট্যাল বলা হয়। চতুর্থ অংশটার স্থান হচ্ছে আমাদের

বাইরের কানের মধ্যস্থল থেকে ঠিক ৪ মিলিমিটার উপরের দিকে। এই তো গেল মোটামুটি প্রধান প্রধান অংশের কথা। এর পর বিভিন্ন অংশের কার্য পরিচালনার ভিত্তিতে এদের আরও পৃথক পৃথক নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন, একটা অংশের কাজ হচ্ছে—বহির্জগতের বস্তুসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন Sensory cortex (মস্তিষ্কের অনুভূতিশীল অংশ)। তেমনি আর একটা অংশ আছে যার কাজ হচ্ছে—মস্তিষ্ক থেকে নানা প্রকারের চিন্তা ও অভিব্যক্তি বাইরের পৃথিবীকে জানানো। তার নাম হলো Motor cortex। প্রাণীদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, তাদের ক্ষেত্রে এই হেমিস্ফিয়ার-এর পরিধি অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের অনুপাতে বেশী।

নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্যে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ দায়ী। এই অংশগুলির নাম দেওয়া হয়েছে তাদের কার্য-নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে। যেমন, মস্তিষ্কের একটা বিশেষ অংশ 'দেখা' এই কাজটার জন্যে দায়ী, তার নাম দেওয়া হলো দৃষ্টিবোধক অংশ। অপর একটা অংশ আস্বাদের অনুভূতি বিচারের কাজটার জন্যে দায়ী তার নাম দেওয়া হলো 'স্বাদ' অনুভূতিশীল অংশ। এই ভাবে মস্তিষ্কের অপরাপর অংশগুলির, যেমন—ঘ্রাণ, শ্রবণ, কথা বলা কেন্দ্র ইত্যাদির নামকরণ করা হয়েছে তাদের কার্য-নিয়ন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে।

আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মস্তিষ্কের মধ্যে আমাদের শরীরের আরও বিভিন্ন অংশের কার্য-নিয়ন্ত্রণের জন্যে এক একটি কেন্দ্র আছে এবং এই অংশগুলি শারীরিক কাজের গুরুত্ব হিসাবে পর পর সাজানো আছে। যে অঙ্গের গুরুত্ব যত বেশী, সেই অঙ্গের কার্যনিয়ন্ত্রণকারী অংশটিও মস্তিষ্কের তত গভীরে অবস্থিত থাকে। অপর পক্ষে যে অঙ্গের গুরুত্ব অন্য অঙ্গের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম, তার স্থান মস্তিষ্কের অপেক্ষাকৃত উপরের দিকে; অর্থাৎ আমরা শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গের ঠিক একটা উল্টো প্রতিচ্ছবি মস্তিষ্কের মধ্যে দেখতে পাবো, যেমন—পায়ের গোড়ালী, পায়ের পাতা, পা, হাঁটু, কোমর, ঘাড়, কাঁধ, বাহু, কব্জী, হাতের পা, আঙুল, চোখের পাতা, চোখ, মুখমণ্ডল ইত্যাদি, (২নং চিত্র ক ও খ)। আর এদের সমবেত স্বাভাবিক কাজের উপর নির্ভর করছে একজনের বিচারবুদ্ধি, তার কার্যক্ষমতা আর অন্যান্য সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

বোতাম পরীক্ষায় আবার ফিরে আসা যাক।

'বোতাম পরীক্ষা' দিয়ে নানা প্রকারের মজার কাজ প্রাণীদের দ্বারা করানো সম্ভব হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ একটা পরীক্ষার কথা বলতে পারি। একটা বানরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল যে, যখনই অপর একটা বানর তার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসবে, তখনই সে একটা বোতামের উপর চাপ দেবে। আর ঐ বোতামটার উপর চাপ পড়লেই দ্বিতীয় বানরটা শান্ত হয়ে যাবে। এভাবে যখন দ্বিতীয় বানরটা প্রথম বানরটার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসতো, তখন প্রথম বানরটা কিছু না বলে ঐ বোতামটায় গিয়ে চাপ দিত, আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বানরটা শান্ত হয়ে যেত। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হলো? এখন আমাদের বুঝতে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে না যে, ঐ বোতামটার সঙ্গে দ্বিতীয় বানরটার মস্তিষ্কের একটা নির্দিষ্ট অংশের সঙ্গে যোগ আছে। যে অংশটা ক্রোধ-উৎপাদক কেন্দ্রটার কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে, সেই অংশটা যখন অস্বাভাবিক-ভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তখনই ক্রোধের সমস্ত লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। মস্তিষ্কের অপর একটা অংশ শান্ত ভাবটা নিয়ন্ত্রণ করছে। এখন বাইরের বোতামটার সাহায্যে যদি ঐ অংশ দুটার কাজ আমরা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দিয়ে

নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে উত্তেজিত প্রাণীকে শান্ত করা নিশ্চয়ই কঠিন হবে না। উল্লিখিত পরীক্ষায় আসলে তাই করা হচ্ছে।

সহকর্মীদের মস্তিষ্ক বোতামের মাধ্যমে শান্ত করা সম্ভব হবে।

জীবিত প্রাণীর শরীরের প্রতিটি কোষ অতি
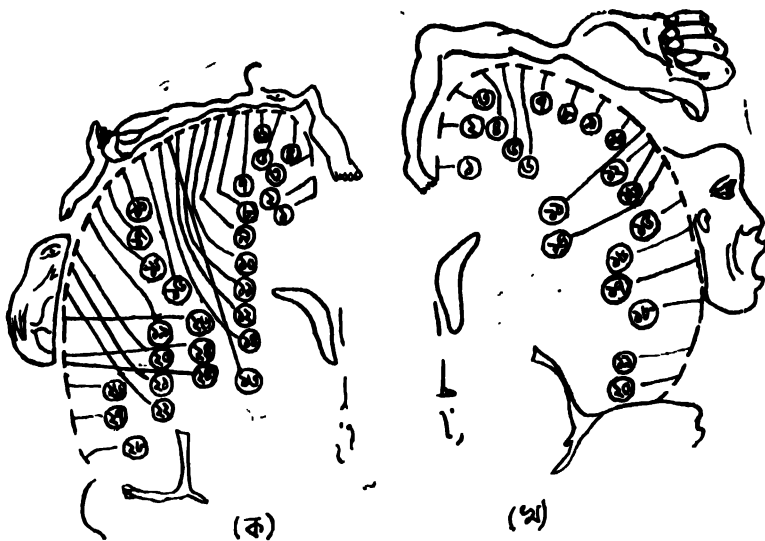
২নং চিত্র

(ক) আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ পরিচালনার অংশগুলি কিভাবে মস্তিষ্কে পর পর সাজানো আছে—তা দেখানো হচ্ছে। এটা মস্তিষ্কের 'অনুভূতি এলাকা'। (খ) মোটর কর্টেক্স-এর এলাকায় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলি দেখানো হচ্ছে (পেনফিল্ড্ ও টি-র‍্যাশমুশেন-এর সৌজন্যে)।

২নং চিত্র—ক—১—যৌনাঙ্গ, ২—গোড়ালী, ৩—পায়ের পাতা, ৪—পা, ৫—পাছা, ৬—কাঁধ, ৭—গলা, ৮—বগল, ৯—ঘাড়, ১০—বাহু, ১১—কনুই, ১২—হাত, ১৩—হাতের কজী, ১৪—হাতের তালু, ১৫—কনিষ্ঠা, ১৬—অনামিকা, ১৭—মধ্যমা, ১৮—তর্জনী, ১৯—অঙ্গুষ্ঠ, ২০—চক্ষু, ২১—নাসিকা, ২২—মুখমণ্ডল, ২৩ ও ২৪—ওষ্ঠযুগল, ২৫—দাঁত ও চোয়াল, ২৬—জিহ্বা, ২৭ ও ২৮—ফেরিংস।

২নং চিত্র—খ—১—গোড়ালী, ২—পায়ের কজী, ৩—হাঁটু, ৪—পাছা, ৫—ঘাড়, ৬—কাঁধ, ৭—কনুই, ৮—হাতের কজী, ৯—হাত, ১০—কনিষ্ঠা, ১১—অনামিক, ১২—মধ্যমা, ১৩—তর্জনী ১৪—অঙ্গুষ্ঠ, ১৫—গলা, ১৬—ভ্রূ, ১৭—চোখের পাতা ও মণি, ১৮—মুখমণ্ডল, ১৯—ওষ্ঠযুগল, ২০—জিহ্বা ও চোয়াল।

বর্তমানে যদিও মানব-মস্তিষ্কের উপর এই সব পরীক্ষা খুব বেশী করা সম্ভব হচ্ছে না, তবুও এমন একটা দিনের কথা মনে মনে কল্পনা করতে দোষ কি—যে দিন খিট্‌খিটে মেজাজের

ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গ তৈরি করতে পারে। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের ক্ষেত্রে ঐ কথাটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ঐ ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে যন্ত্রের সাহায্যে ইচ্ছামত কমানো

বাড়ানো যায়। আর কলম রেকর্ডারের (Pen recorder) সাহায্যে তা রেকর্ড করা যায়। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ থেকে উদ্ভূত ঐ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ যে যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড করা হয়ে থাকে, তাকে ইলেকট্রো-এনসেফালোগ্রাম আর রেকর্ডগুলিকে ইলেকট্রো-এনকেফালোগ্রাফ সংক্ষেপে E. E. G. (Electroencephalograph) বলে।

ঐ যন্ত্রের সাহায্যে মস্তিষ্ক-রোগাক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্ক পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। অনেকের ধারণা, ঐ যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক শক্‌ দেওয়া হয়, আসলে কিন্তু ঐ ধারণাটা একেবারে ভুল, এখানে বৈদ্যুতিক শক্‌ দেবার কোন ব্যাপারই নেই। রেকর্ড নেবার সময় রোগী টেরই পায় না যে, তার রেকর্ড নেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ রোগী এতে কোন কষ্ট পায় না। অনেক মস্তিষ্ক-রোগাক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্ক ঐ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তাদের মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট একটা বিন্দু থেকে অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ রেকর্ড হয়ে আসছে। মস্তিষ্কের কোন্‌ অংশে সেই বিন্দুটা অবস্থিত, ঐ যন্ত্রের সাহায্যে সেটাও জানা যায়। মস্তিষ্কের টিউমার ইত্যাদির অবস্থিতিও ঐ যন্ত্রের সাহায্যে জানতে পারা সম্ভব।

অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশ একটুতেই অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মস্তিষ্কের একটা বিন্দু এমনিতেই এত অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরি করছে, যাতে অন্যান্য অংশের স্বাভাবিক কাজ ব্যাহত হয়ে পড়ছে। ফলে দেখা যায়, ঐ বিন্দুটাই যেন সমস্ত মস্তিষ্কটাকে পরিচালনা করছে। আর এই সবগুলিই হচ্ছে ঐ রোগের বহুবিধ লক্ষণের প্রধান প্রধান লক্ষণ।

আমরা এখন যদি ‘বোতাম পরীক্ষা’ দিয়ে ঐ বিন্দুরটার কার্যক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তাহলে নানা প্রকার মস্তিষ্ক-রোগের নিরাময় করা মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না।

বিজ্ঞানের এই বিরাট অগ্রগতির সম্পূর্ণতা তখনই আসবে এবং মানুষ একে তখনই পূর্ণভাবে স্বাগত জানাবে—যখন এই সব পরীক্ষা মানব-কল্যাণে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হবে।

সঞ্চয়ন

আধুনিক কারিগরী বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্যাভাব কি দূর করা যেতে পারে ?

ওয়াল্টার ফাউলার অপুষ্টির সমস্যা সম্পর্কে লিখেছেন—এই পৃথিবীর একটা সুবৃহৎ অংশের অধিবাসীরা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। তারা যে খাদ্যাভাবে ভোগে তা নয়, যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যই তারা পেয়ে থাকে। কিন্তু প্রোটিন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ যে খাদ্য রোগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সে রকম খাদ্য তারা পায় না। পৃথিবীর লোকসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাতে এই পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণেই বেড়ে যাবার সম্ভাবনা। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, আগামী ২০০০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের খাদ্যোৎপাদন তিন গুণ বাড়াতে হবে।

পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই দেখা যায়, যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যাভাবই মাত্র অপুষ্টির কারণ নয়, বরং যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য পেলেও ঐ অঞ্চলবাসীদের ক্ষুধার পূরণ হয় না, দেহের পুষ্টিবিধান হয় না। দেহপুষ্টির জন্যে খাদ্যে যে সকল প্রোটিন ও ভিটামিন থাকা প্রয়োজন, তা তাদের খাদ্যে না থাকায় এই সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, সুষম খাদ্যে ৪৩ রকমের রাসায়নিক উপকরণ থাকে, যেমন—নানা ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিড (প্রোটিনের উপাদান), ভিটামিন এবং নানা আকরিক ও কতিপয় স্নেহজাতীয় অ্যাসিড।

মানবদেহের মাংস, হাড় এবং তন্তু গড়ে তোলে প্রোটিন। আর যে সেল বা দেহকোষ নষ্ট হয়ে যায়, তারই স্থলে নতুন কোষও এই প্রোটিনই গড়ে তোলে। দেহ গড়ে তোলবার ইন্ধন হচ্ছে প্রোটিন, আর তাদের কার্যকরী করে তোলে ভিটামিন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন একটি রাষ্ট্রে পরিমাণেই খাদ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে—সেখানে খাদ্যাভাব নেই বললেই হয়। সেই রাজ্যে সম্প্রতি ব্যাপকভাবে বেরিবেরি রোগ দেখা দেয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধানের পর জানতে পারেন, এই রোগের কারণ খাদ্যাভাব বা দারিদ্র্য নয়, প্রাচুর্য বা সমৃদ্ধিই এই রোগের হেতু।

এই দেশের জনসাধারণের ভাতই প্রধান খাদ্য। যারা বুনিয়াদী ঘরের লোক তারা মিহি ও কলে-ছাটা পরিষ্কার চালের ভাত খেয়ে থাকেন। এই কলে-ছাটা অতি পরিষ্কার চালের ভাত খাওয়া একটা সামাজিক মর্যাদার পরিচায়ক। কিন্তু কোরা মোটা চালে যে ভিটামিন থাকে, সে ভিটামিন ঐ সকল চালে থাকে না। এই ভিটামিনের অভাবেই এই রোগ এই দেশে দেখা দেয়। তারপর এই দেশের সরকার কলে-ছাটা পরিষ্কার চালে ভিটামিন যোগ করে দিয়ে সেই রোগের কবল থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করেন।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সবচেয়ে ক্ষতি হয় বাড়ন্ত ছেলেমেয়ে ও শিশুদের। যেমন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির যে পরিমাণ ক্যালোরি ও উন্নত ধরণের প্রোটিনের প্রয়োজন হয়ে থাকে, একটি ছয় মাসের শিশুর দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্যে দ্বিগুণ ক্যালোরি (বিভিন্ন খাদ্যের তাপ উৎপাদনের শক্তি এর সাহায্যে উল্লেখ করা হয়) এবং পাঁচগুণ প্রোটিনের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

অনেক সময়েই দেখা যায়, পিঠাপিঠি সন্তান

দুটির মধ্যে বড়টির মেজাজ হয়েছে খিট্‌খিটে, কান্না আর তার থামে না, কিছুই তার ভাল-লাগে না। সুষম খাদ্যের অভাবই রয়েছে তার মূলে। বড়টি মায়ের বুকের যে দুধ পেত, তাতে তখন তার কম্‌তি পড়ে এবং পরিপূরক অন্য খাদ্যও সে পায় না। ফলে ক্ষুধা থেকেই যায়। কাজেই সে শুকিয়ে যায়, তার গায়ের রং মলিন হতে থাকে, চামড়া কুচ্‌কে যায়, মাথার চুল কটা হয়ে যায় এবং লিভারটি নষ্ট হয়ে যায়। এই রকম বহু ছেলে কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অপুষ্টির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে মেক্সিকো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ঐ দেশটি অল্প সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় খাদ্যোৎ-পাদন বহু পরিমাণে বাড়িয়েছে। মেক্সিকোর বহু তরুণ বিজ্ঞানী যুক্তরাষ্ট্রে এসে আধুনিক কৃষি-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে গেছেন। সেখানে ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে দশ গুণ। আগে যেখানে প্রতি একর জমিতে ১০ বুশেল ভুট্টা উৎপন্ন হতো, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের ফলে সেখানে ১০০ বুশেলেরও বেশী ফসল উৎপন্ন হয়েছে। গমের উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ২৫০ ভাগ। প্রধানতঃ জমির উন্নতি এবং নতুন ধরণের ভুট্টা ও গমের প্রবর্তনের ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এই সকল ভুট্টা বা গমের গাছ বিশেষ ধরণের ব্যাধিতেও আক্রান্ত হয় না।

মেক্সিকোর লোকসংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও ঐ দেশে খাদ্যাভাব নেই, অপুষ্টিও নেই। পৃথিবীর অতি উন্নত রাষ্ট্রসমূহের কোন কোনটিতে প্রতিটি ব্যক্তি ক্যালোরি হিসাবে যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে থাকে, মেক্সিকোর অধিবাসীরা সেই হারেই সেই পরিমাণ খাদ্য পেয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর বহু খাদ্য-ঘাট্‌তি অঞ্চলেরই খাদ্যাভাব, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ ও গবেষণার ফলে এবং কারিগরী জ্ঞান কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দূর করা যেতে পারে।

কৃষি ব্যবস্থা

বুভুক্ষা কোন রোগ নয়। কিন্তু যেখানে খাদ্যাভাব ও বুভুক্ষা নিত্য লেগে থাকে, সেখানে তা হয় মারাত্মক ব্যাধির কারণ। মানুষের তখন দুঃখের অন্ত থাকে না, মানুষকে তা পঙ্গু করে দেয়—এমন কি, পৃথিবীর বহু অঞ্চলে অনাহারের ফলে মৃত্যুও ঘটে থাকে।

পৃথিবীর সর্বত্র আজ মানবকল্যাণকামী বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র খাদ্যাভাবজনিত রোগের চিকিৎসা ও রোগ দূরীকরণেই নয়, বুভুক্ষা ও অনাহার দূরীকরণেও আত্মনিয়োগ করেছেন এবং তারই জন্যে তাঁরা নানাক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে জীব-বিজ্ঞানী ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা উন্নত ধরণের বীজ উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করেছেন। এসব বীজের গাছ থেকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী ফসল পাওয়া যায়। প্রতিকূল আবহাওয়ায় এসব গাছ জন্মে এবং উদ্ভিদ-রোগের দ্বারা এরা আক্রান্ত হয় না।

রসায়ন-বিজ্ঞানীরা আত্মনিয়োগ করছেন পতিত জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করায় এবং সার প্রয়োগ করে তাদের উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিতে। এজন্যে তাঁরা উন্নত ধরণের যৌগিক সার উৎপাদন করছেন। তারপর ফসলকে কীট-পতঙ্গ এবং রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্যে উন্নত ধরণের নানা রাসায়নিক উপকরণও তাঁদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে। পরিশ্রম লাঘব করবার জন্যে এবং মাথাপিছু ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে ইঞ্জিনিয়ারগণ উদ্ভাবন করেছেন নানা যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম। বন্যানিয়ন্ত্রণ ও সেচের নতুন পদ্ধতি ও ব্যবস্থাও এঁদের দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছে।

তারপর চাষের কখন সুসময়, ফসল তোলবার প্রকৃত সময় কখন, তা নির্ধারণ করে আবহ-বিজ্ঞান। আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপন ব্যবস্থার ও আবহ-বিজ্ঞানেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আবহ-বিজ্ঞানীরা বর্তমানে আবহাওয়া কি করে পরিবর্তন করা যায়, যেখানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে না, সেখানে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত কি ভাবে হতে পারে এবং যেখানে প্রবল বারিবর্ষণ হচ্ছে, তা কি করে থামানো যায়, তারই পন্থা উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছেন।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপনে বর্তমানে যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তার মূলে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা। আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহসমূহ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। এসব উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতিটি মনুষ্য-অধ্যুষিত অঞ্চলের উপরিস্থিত আকাশে মেঘলোকের আলোকচিত্র প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করে গৃহীত হচ্ছে এবং অন্যান্য তথ্যও সংগৃহীত হচ্ছে। এই সব তথ্য চাষীদের সরবরাহ করবার উদ্দেশ্যে ভূতলস্থিত কেন্দ্রসমূহে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাধীনে পাঠানো হচ্ছে।

গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানী ও পদার্থ-বিজ্ঞানীরা কম খরচে খাদ্য সংরক্ষণের পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্য পাঠাতে হলে যেখানে অনেক সময় লাগে, সে স্থলে এবং দীর্ঘকাল খাদ্য গুদামে রাখবার জন্যে কোন কোন খাদ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে ঐ সব খাদ্য দীর্ঘকাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে। ঠাণ্ডা ঘরে রেখে খাদ্য-সংরক্ষণে খরচ অপেক্ষাকৃত কম পড়ে এবং গন্ধ ও পুষ্টির গুণাগুণ অটুটই থাকে। তবে ওজন ও আকার কমে যায়।

ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে বিজ্ঞানীরা সমুদ্র থেকেও খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে বিশেষভাবে ব্রতী হয়েছেন। তাঁদের ধারণা, বর্তমানে সমুদ্র থেকে খাদ্যের জন্যে যে পরিমাণ মাছ ধরা হয়, ভাণ্ডার অটুট রেখেই তা পাঁচ গুণ বাড়ানো যেতে পারে। তবে কোন্ কোন্ সমুদ্রে কি পরিমাণ মৎস্য রয়েছে, তার সন্ধান নিতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নতুন নতুন ক্ষেত্রে মৎস্য-চাষের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রোটিন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ অ্যালজী বা সামুদ্রিক গাছ-গাছড়াও মানুষের খাদ্যাভাব মেটাতে পারে। বিজ্ঞানীরা অ্যালজীর চাষ নিয়েও ভাবছেন। তাঁদের ধারণা, ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, যখন কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম থেকেও সুষম খাদ্য তৈরি হবে এবং পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক তা গ্রহণ করবে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের যে সকল উন্নতি হয়েছে, তাতে কোন দেশে অজন্মা হলেই যে সেখানে দুর্ভিক্ষ হবে, এরকম ধারণার কোন হেতু নেই। কারণ এই যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার খুবই উন্নতি হয়েছে। ফলে এখন উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি এলাকায় দ্রুত খাদ্য সরবরাহ করা যায়।

তাহলেও একথা আজ খুবই সত্য যে, পৃথিবীর ৩০ থেকে ৫০ কোটি লোক নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য পায় না। আর পৃথিবী প্রায় ১৫০ কোটি লোক অপুষ্টিতে ভুগে থাকে; অর্থাৎ তারা যে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে, তা তাদের দেহের পুষ্টিবিধানের সহায়ক নয়, বহু পুষ্টিকারক উপকরণ তাদের খাদ্যে থাকে না।

কাজেই তারা বেরিবেরি, রিকেট, স্কার্ভি প্রভৃতি নানা স্নায়ুরোগ ও চর্মরোগে ভুগে থাকে এবং এই সব দেশকে তথা জাতিকে দুর্বল করে দেয়—দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, তথা কৃষির উন্নতি ব্যাহত হয়।

বেঁচে থাকবার জন্যে মানুষের খাদ্য গ্রহণ

করতেই হবে। অতীত ইতিহাসে দেখা যায়, এই খাদ্যের অন্বেষণেই মানুষ দেশদেশান্তরে পাড়ি দিয়েছে, উদ্বৃত্ত খাদ্যের জন্যে সংগ্রাম করেছে, নতুন নতুন দেশে এসে বাসা বেঁধেছে।

কিন্তু এ যুগে আর তার প্রয়োজন নেই। আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ ইতিমধ্যে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, সে জ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের উপরই খাদ্য ও অপুষ্টি সমস্যা সমাধানের পথ রয়েছে।

সুষম খাদ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষা

খাদ্যে একটি মাত্র জিনিষ, যেমন—ম্যাগ্‌নেসিয়াম অথবা দস্তার অভাবে এবং অনেকেই জানেন, প্রোটিনের অভাবে অপুষ্টিজনিত নানা রোগ হয়ে থাকে। দেহপুষ্টির জন্যে যৎসামান্য পরিমাণেই দস্তা অথবা ম্যাগ্‌নেসিয়াম এবং যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিনের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা আসলে খাদ্য ঘাটতির সমস্যা নয়—এ হচ্ছে প্রোটিন ঘাটতির সমস্যা। অথবা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে এ হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডের সমস্যা। অ্যামিনো অ্যাসিড হচ্ছে প্রোটিনেরই উপাদান। মানবদেহেই এসব অ্যাসিড থেকে প্রয়োজনানুযায়ী বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন তৈরি হয়। রাসায়নিক দ্রব্য যাই গ্রহণ করা হোক না কেন, মানবদেহে ঐ সকল দ্রব্য অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয় না। তাই দেহপুষ্টির জন্যে অ্যামিনো অ্যাসিডের যে সকল উপকরণ আছে তা গ্রহণ করতে হয়।

মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, মাখন প্রভৃতি হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট প্রোটিনসমৃদ্ধ উপকরণ। তবে কোন কোন শাকসব্জীতেও যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন আছে।

যে সব এলাকার অধিবাসীরা প্রোটিনযুক্ত খাদ্য না পাওয়ার ফলে অপুষ্টিজনিত নানা রোগে ভুগে থাকে, তাদের প্রোটিনযুক্ত পরিপূরক খাদ্যদানের চেষ্টা হচ্ছে।

আমেরিকার পারডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একপ্রকার নতুন ধরণের ভুট্টা উৎপাদন করেছেন। ঐ সকল ভুট্টা লাইসিন নামে এক প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডে খুবই সমৃদ্ধ। প্রাণীদেহ সহজেই অ্যামিনো অ্যাসিডকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করে।

এই সকল ভুট্টার গুণাগুণ প্রাণ-রসায়ন-বিজ্ঞানী ডাঃ এডুইন টি. মার্ৎস এবং ডাঃ অলিভার ই. নেলসন ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণ ভুট্টা খেয়ে তাদের ওজন যতখানি বাড়ে, ঐ সকল প্রোটিনসমৃদ্ধ ভুট্টাতে ঐ সকল ইঁদুরের ওজন তিন গুণ বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীরা অতঃপর ঐ সকল ভুট্টা তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের খাওয়ান। এর গুণাগুণ আরও পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে এসব ভুট্টা গুয়াতেমালার ইনষ্টিটিউট অব নিউট্রিশন অব সেন্ট্রাল আমেরিকা অ্যাণ্ড পানামাতেও পা ছেন। সেখানকার শিশুদের ঐ সকল ভুট্টা খাওয়ানো হচ্ছে।

এই নতুন ধরণের ভুট্টার নামকরণ করা হয়েছে অপেক-২। সাধারণ ভুট্টার তুলনায় এই নতুন ধরণের ভুট্টা মানুষ ও পশুর খাদ্য হিসেবে অনেক বেশী পুষ্টিকর—এই কথা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলে দক্ষিণ আমেরিকায় এর ব্যাপক চাষের ব্যবস্থা হবে। ঐ অঞ্চলে অপুষ্টি ব্যাধির প্রকোপ খুবই বেশী। পরে মেক্সিকো সহরে ঐ ভুট্টার বীজের জন্যে একটি কেন্দ্র স্থাপিত হবে। ঐ কেন্দ্র থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে এবং কেন্দ্রটি পরিচালনা করবেন রকফেলার ফাউণ্ডেশন।

গুয়াতেমালার ঐ ইনষ্টিটিউট ইতিমধ্যেই প্রোটিনসমৃদ্ধ একটি খাদ্য উৎপাদনে সাফল্য অর্জনের জন্যে সমগ্র বিশ্বেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন

করেছে। ইনক্যাপেরিনা নামে খাদ্যটি ভুট্টা, সরগম, তুলার বীজের গুঁড়া এবং ঈষ্ট মিশিয়ে তৈরি হয়।

ভারতের মহীশূরে বাদাম ও শুঁটির গুঁড়া মিশিয়ে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরি হয়েছে। এই খাদ্যের নামকরণ করা হয়েছে বাংলা চানা।

কেবল খাদ্য-সমস্যা মেটানোই নয়, পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা যাতে স্বাস্থ্যসম্মত যথোপযুক্ত খাদ্য পেতে পারে, তাদের উন্নততর জীবনযাত্রা সম্ভব হতে পারে, তারই উদ্দেশ্যে যে সকল চেষ্টা হচ্ছে, দৃষ্টান্ত হিসাবে তাদের মাত্র কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হলো।

ভারতের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ

কেবলমাত্র খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়েই নয়—খাদ্যের গুণগত উৎকর্ষ বিধান এবং যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন করে ভারত খাদ্যাভাব দূরীকরণে ব্রতী হয়েছে। যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব স্বাস্থ্যের পক্ষে অপুষ্টির মতই মারাত্মক হয়ে থাকে। এজন্যেই মহীশূরের কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সেন্ট্রাল ফুড টেক্নোলোজিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে দেশের খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে যেমন আত্মনিয়োগ করেছেন, তেমনি অপুষ্টিজনিত রোগ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তাঁরা আরও উন্নত ধরণের পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করেছেন।

ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ এইচ. এ. বি. প্যারপিয়া এই প্রসঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—আমাদের দেশে প্রতি বছর মোট ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টনের কাছাকাছি খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু খাদ্যশস্যের অর্ধেকই নষ্ট হয়ে যায়। উৎপন্ন খাদ্যশস্যের বেশীর ভাগ নষ্ট হয় মাঠে। সেখানে শতকরা ২৫ ভাগ খাদ্য ইঁদুরে নষ্ট করে। তারপর মরাইয়ে রাখবার পরও ইঁদুরে খায় শতকরা ১৫ ভাগ। ধান তোলা, মাড়াই ও মরাইয়ে রাখবার সময়ে নষ্ট হয় আরও দশ ভাগ।

এই সমস্যা সমাধানের জন্যে ইনিষ্টিটিউট কি করছে—ডাঃ প্যারপিয়াকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন—আমাদের ইনষ্টিটিউটে খাদ্য সংরক্ষণের কতকগুলি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। খাদ্য মরাই করবার ব্যাপারে এই সব পদ্ধতি সহর এবং গ্রাম উভয় অঞ্চলেই কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করতে হবে। মুস্কিল হচ্ছে এই যে, গবেষণা হয় কিন্তু তার ফলাফল ব্যাপক প্রচারের কোন ব্যবস্থা নেই। এজন্যে দেশের ৩০০টি জেলার প্রত্যেকটিতে একজন কর্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। ঐ কণ্ট্রোল অফিসারের কাজ হবে ইঁদুর, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি খাদ্যশস্য যাতে নষ্ট করতে না পারে, তারই ব্যবস্থা করা। নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাবেন।

এই কার্যসূচী রূপায়ণের জন্যে যে সকল শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হবে, তাদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে ইনষ্টিটিউট প্রস্তুত আছে।

খাদ্যের গুণগত উৎকর্ষবিধান সম্পর্কে ডাঃ প্যারপিয়া বলেন যে, আজ অপুষ্টি এক গুরুতর সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোক পুষ্টিকর খাদ্য পায় না, অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে। শিশু, বাড়ন্ত ছেলে-মেয়ে, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোক এবং যে সকল রোগী আরোগ্যলাভের পথে, তাদের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ও অপুষ্টি সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে থাকে।

ভিটামিন, ধাতব উপকরণ এবং প্রোটিন দেহের পুষ্টিবিধান করে থাকে এবং এর মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে প্রোটিন। ভারতীয়দের খাদ্যে এই সকল উপাদানের অভাব খুবই বেশী। যেখানে ৭০ গ্র্যাম প্রোটিনের একান্ত প্রয়োজন,

সেখানে গড়পড়তা একজন ভারতীয় ৩০ অথবা ৩৫ গ্র্যামের বেশী প্রোটিন পায় না। তণ্ডুল ও ডাল জাতীয় উপকরণ থেকেই এই প্রোটিন সংগৃহীত হয়—মাছ-মাংস-ডিম থেকে পায় মাত্র শতকরা ৬ ভাগ।

ডাঃ প্যারপিয়া বলেন, নিরামিষ জাতীয় খাদ্য থেকেও প্রোটিন সংগ্রহ করা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই ১ কোটি টন তৈলবীজ থেকে এবং ১ কোটি ১০ লক্ষ টন ডাল জাতীয় উপকরণ থেকে প্রোটিন সংগ্রহ করা হচ্ছে। তৈল সংগ্রহের পর যে খইল পাওয়া যায়, তাকে মানুষের খাদ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করা গেলে দেশের প্রোটিনের অভাব অনেকখানি মেটানো যেতো।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দিক থেকে তা কতখানি সম্ভব—এ প্রশ্নের উত্তরে ডাঃ প্যারপিয়া বলেন যে, চীনাবাদাম নিয়ে এই ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা গত ১৫ বছর ধরে গবেষণা করে অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁরা মানুষের খাদ্য হিসাবে একপ্রকার বাদামের ময়দা তৈরি করেছেন, যার ৫০ থেকে ৫২ ভাগ হচ্ছে প্রোটিন। তাঁরা চীনা-বাদাম থেকে আরও একটি জিনিষ তৈরি করছেন—এর শতকরা ৯০ ভাগই প্রোটিন। এই জিনিষটি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর কোন রকম গন্ধ নেই এবং হজম না হওয়ার মতও কোন জিনিষ এর মধ্যে নেই।

চীনাবাদামের এই প্রোটিন এবং ময়দা দিয়ে ইনষ্টিটিউট শিশু ও রোগীদের জন্যে নানাপ্রকার প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরি করেছেন, যেমন—পৌষ্টিক ময়দা, প্রোটিনসমৃদ্ধ বিস্কুট, ট্যাপিওকা, ম্যাকারনি, সয়াবিনের দুধ ইত্যাদি। এসব খাদ্য ভিটামিন, ধাতব উপকরণ এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এই সব খাদ্য—সাধারণ যে ভারতীয়েরা গ্রহণ করে থাকে—তার পরিপূরক এবং খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে। শিশুদের অপুষ্টিজনিত রোগ নিরাময়েও এই সব খাদ্য ব্যবহার করে খুবই ভাল ফল পাওয়া গেছে।

প্রোটিনের এই অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নিরামিষজাতীয় প্রোটিন থেকে নানারকম পরিপূরক খাদ্য উদ্ভাবন ও খাদ্যবস্তু উৎপাদনের পথ নির্দেশের জন্যে মহীশূরের এই সেন্ট্রাল ফুড টেক্‌নোলোজিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

রাষ্ট্রসংঘের জরুরী শিশুরক্ষা তহবিলের সহযোগিতায় ভারত সরকার একটি বোম্বাইতে এবং আর একটি কোয়েম্বাটুরে চীনাবাদামের ময়দা তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন। ঐ সব ময়দায় স্নেহজাতীয় পদার্থের ভাগ থাকবে খুবই কম। প্রতিটি কারখানায় বছরে তিন হাজার টন পর্যন্ত ময়দা উৎপন্ন হবে। আমেরিকার মিল্‌স্ ফর মিলিয়নস অ্যাসোসিয়েশন চীনাবাদাম থেকে যে ধরণের প্রোটিনসমৃদ্ধ ময়দা তৈরি করেছেন, ঠিক সেই ধরণের ময়দা এই কারখানায় তৈরি হচ্ছে। এই ময়দা দিয়ে নানা প্রকার খাদ্য তৈরি করা যায়। ভারতে বর্তমানে প্রোটিনসমৃদ্ধ বহু রকমের খাদ্য তৈরির তিনটি কারখানা রয়েছে। আশা করা যায়, ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যেই অদূর ভবিষ্যতে একটি করে কারখানা স্থাপিত হবে।

ভারত রাষ্ট্রসংঘের জরুরী শিশুরক্ষা তহবিল ও বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার প্রোটিন উপদেষ্টা সমিতির সদস্য। ইনষ্টিটিউটের প্রোটিন সংক্রান্ত গবেষণার ফল এবং নানা তথ্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহেও সরবরাহ করা হয়। ঐ অঞ্চলের প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই সমস্যা ভারতেরই মত। প্রোটিনের অভাব ঐ সকল রাষ্ট্রের সামনেও একটা বড় সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে।

১৯৬৫ সাল থেকে এই ইনষ্টিটিউটে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিদ্যার্থীদের গ্রহণ করা হচ্ছে এবং রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি-সংস্থার উদ্যোগে এটি একটি নতুন আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সংস্থা ইনষ্টিটিউটকে সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্যে অর্থসাহায্য দিয়ে থাকে।

প্রত্নতত্ত্বে তেজস্ক্রিয় কার্বন

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পুরনো জিনিষের বয়স জানবার আগ্রহ বোধহয় সকলেরই আছে। ভারতবাসীর আবার এই বিষয়ে আগ্রহটা স্বভাবতঃই বেশী, কারণ প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্যের সত্যতা প্রমাণিত হোক, এটা প্রত্যেকেরই কাম্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আর্য সভ্যতার প্রথম দিকের হিসাব তো অনেকটা অনুমানের উপরই নির্ভর করে। সিন্ধু সভ্যতার বয়স সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচলিত। সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বয়সের বিজ্ঞানভিত্তিক হিসাব পাওয়া বর্তমান যুগের পূর্বে সম্ভব ছিল না।

কোন প্রাচীন নিদর্শন মাটির কত নীচে পাওয়া গেছে, তার উপর নির্ভর করে তার প্রাচীনত্ব সাধারণভাবে ধারণা করা হয়ে থাকে। মোটা-মুটি তথ্য হিসাবে এটা একেবারে ভুল নয়। মাটির স্তরের উপর নির্ভর করেই বিগত শতাধিক বছর ধরে ভূতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে আসছে। কিন্তু এই পদ্ধতি অনেকটা আনুমানিক; তাই সত্যসন্ধানীদের বিশেষ সন্তুষ্ট করতে পারে নি। বর্তমান শতকে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই চেষ্টা চলতে থাকে, প্রাচীন বস্তু এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতার বয়স নির্ণয়ে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কারের। সাফল্যলাভ করতে বিশেষ দেরী হয় নি। নানা নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি, বিশেষ করে ক্লোরিন, নাইট্রোজেন, ইউরেনিয়াম, ওরসিডিয়াম প্রভৃতি পদ্ধতি, প্রত্নতাত্ত্বিক চুম্বকত্ব পদ্ধতি, পটাশিয়াম-আর্গন পদ্ধতি, থার্মো-লুমিনিসেন্স পদ্ধতি প্রভৃতিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগাবার চেষ্টা চলে আসছে।

সকল রকম পদ্ধতির মধ্যে তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতিটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। শিকাগো নিউক্লিয়ার ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক লিবি ১৯৪৭ সালে এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। লিবি দেখলেন, জৈব পদার্থের বয়স সহজে নির্ণয় করা যেতে পারে। কারণ প্রত্যেক জৈব পদার্থের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তা বর্তমান এবং ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মক্রমে তা ক্ষয় হয়। কার্বন-১৪ নামক কার্বনের একটি আইসোটোপের অবস্থিতির জন্যেই সকল জৈব পদার্থে তেজস্ক্রিয়তা থাকে। সাধারণ কার্বনের পরমাণুর ওজন ১২, কিন্তু কার্বনের এই আইসোটোপটির ওজন ১৪। এর উদ্ভব সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ঊর্ধ্ববায়ু-মণ্ডলে কস্‌মিক রশ্মি নাইট্রোজেন পরমাণুকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলে ঐ পরমাণু কার্বন-১৪-এ রূপান্তরিত হয়। বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে তেজস্ক্রিয় কার্বন কার্বনডাই-অক্সাইড গঠন করে। উদ্ভিদের ফটো-সিন্থেসিসের সময় তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদ কর্তৃক শোষিত হয় এবং এরূপে উদ্ভিদদেহ এবং তাথেকে প্রাণীদেহে তা সঞ্চালিত হয়। এই চক্রের সাহায্যে প্রকৃতিতে সর্বত্র তেজস্ক্রিয় কার্বন পাওয়া যায়। জীবদেহে তেজস্ক্রিয় কার্বন ও সাধারণ কার্বনের অনুপাত নির্দিষ্ট এবং নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্টভাবে তেজস্ক্রিয় কার্বনকে ক্ষয় হতে দেখা যায়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, কোন বস্তুতে অবস্থিত তেজস্ক্রিয় কার্বনের অর্ধেক বিনষ্ট হয় ৫৫৬৮ (±৩০)

বছরে। যা পড়ে থাকে তার অর্ধেক যায় পরবর্তী ৫৫৬৮ বছরে। এইভাবে ক্ষয় চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্তটা শেষ না হয়। তাই পুরনো জৈব পদার্থের অবশেষে তেজস্ক্রিয় কার্বন কি পরিমাণ পড়ে আছে, তা পরিমাপ করে তার সঠিক বয়স নির্ণয় করা যায়। প্রণালীটি আবিষ্কারের সময় ৪০,০০০ বছরের পুরনো বস্তুর বয়স সঠিকভাবে জানা গিয়েছিল। পরবর্তী কালে এই সীমাকে আরও বাড়াবার ও আরও উন্নত করবার চেষ্টা চলে আসছে এবং প্রাথমিক পর্যায়ের অনেক ত্রুটি এখন সংশোধিত হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় কার্বন পরিমাপের জন্যে সংগৃহীত কার্বনজাত বস্তুটিকে প্রথমে আবর্জনামুক্ত করা হয় এবং অম্ল ও ক্ষারজাতীয় পদার্থ দূরীভূত করবার জন্যে বিশেষভাবে ধৌত করা হয়। এরূপে বিশুদ্ধিকৃত বস্তুটি শক্ত কাচের নলের মধ্যে রেখে পোড়ানো হয় এবং যে গ্যাসটি বেরোয় তা একটি বায়ুশূন্য ফ্ল্যাস্কে গ্রহণ করা হয়। গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে এই গ্যাসের তেজস্ক্রিয়তা গণনা করা হয়ে থাকে।

এরূপ গ্যাসীয় অবস্থায় কার্বন ব্যবহার করবার পূর্বে কঠিন কার্বনই ব্যবহার করা হতো, কিন্তু তার জন্যে বস্তুর পরিমাণ অনেক বেশী লাগতো। বর্তমানে এক আউন্সের এক শতাংশ চারকোল হলেই চলে। কাউন্টারে কার্বন-জাত কোন্ গ্যাস সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে, তা এখনও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় নি। কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন ডাইসালফাইড, মিথেন, ইথিলীন, অ্যাসিটিলিন প্রভৃতি সব রকম গ্যাসই ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য বস্তুর তেজস্ক্রিয়তা থেকে বাঁচাবার জন্যে কাউন্টারের নলটিকে আর একটি ছোট গাইগার কাউন্টারের রিং দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় এবং এই কাউন্টারের তেজস্ক্রিয়তা মাপবারও বন্দোবস্ত থাকে। এটিকে কাউন্টারের ব্যাক গ্রাউণ্ড বলে। এই ব্যাক গ্রাউণ্ড মাপবার জন্যে লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো তেজস্ক্রিয় কার্বন-শূন্য কয়লা ব্যবহার করা হয়। গণনার মোট পরিমাণ থেকে ব্যাক গ্রাউণ্ডের পরিমাণ বাদ দিয়ে সঠিকভাবে গণনা করা হয়।

তেজস্ক্রিয় কার্বনের সাহায্যে বয়স নির্ণয়ের পদ্ধতি আবিষ্কারের পর থেকে খুব সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ব্যবহার চলতে থাকে এবং নিজস্ব নির্দিষ্টতার মধ্যে নির্ভরযোগ্য ফলও পাওয়া যায়। এর সাহায্যে ইউরোপ ও আমেরিকার হিমযুগের খবর জানা সম্ভব হয়েছে। পাশ্চাত্যের মত প্রাচ্যের সভ্যতা বিকাশের সময়ও জানিয়ে দিচ্ছে এই পদ্ধতি। অশোকের পূর্ববর্তী কালের ভারতের যে ইতিহাস কালের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল—তারও উদ্ধার সম্ভব হয়েছে। হরপ্পার সভ্যতার বিষয় আবিষ্কার হবার পর স্যার হার্গেভ্‌স্ ভারত, পারস্য ও বেলুচিস্থানের সীমান্তে বহু ছোট ছোট সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। তেজস্ক্রিয় কার্বন-পদ্ধতির সাহায্যে এদের প্রকৃত বয়স নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। জানা গেছে, কিলিগুলমহম্মদের সভ্যতা খৃষ্টপূর্ব ৩৬৯০ ± ৮৫ বছরের। সিন্ধুর কোটডিজির সভ্যতা খৃষ্টপূর্ব ২৬০৫ ± ১৪৫ বছরের ইত্যাদি। এই পদ্ধতি প্রচলিত করবার পূর্বে হরপ্পার সভ্যতার বয়স তুলনামূলকভাবে বিচার করা হতো এবং স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নানা আনুমানিক তথ্যের উপর নির্ভর করা হতো। বর্তমানে এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রামাণ্য তথ্য স্থির করা সম্ভব হয়েছে। আজ আমরা জেনেছি, এই সভ্যতা সমগ্র সিন্ধু, বেলুচিস্থান, পাঞ্জাব, রাজস্থান, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং খৃষ্টপূর্ব ২৩০০ অব্দ পর্যন্ত এই সভ্যতা গৌরবের চরম শীর্ষে অবস্থিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে সৌরাষ্ট্র ও রাজস্থানের পতন সুরু হয়। তেজস্ক্রিয় কার্বনের সাহায্যে শুধু এর বয়সই নয়, অভ্যুত্থান, বিস্তার ও পতন সম্পর্কে বহু প্রামাণ্য খবর জানা সম্ভব হয়েছে।

মধ্যভারতের চ্যালকোলিথিক সভ্যতা খৃষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ থেকে প্রায় খৃষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দ পর্যন্ত ছিল বলে আজ আমরা জানতে পেরেছি। তেজস্ক্রিয় কার্বন-পদ্ধতি আমাদের জানিয়েছে যে, সিন্ধু সভ্যতার যুগে ভারতের অন্যান্য স্থানও ঘুমিয়ে ছিল না। বহু স্থানেই সে সময় সভ্যতার আলো পৌঁচেছিল। গঙ্গা-যমুনার অববাহিকায় সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব ১০০০—৮০০ অব্দের মধ্যে।

প্রত্নতত্ত্ব গবেষণায় এই নতুন পদ্ধতি অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই যুগান্তর এনেছে। বয়স নির্ণয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ হবার সুযোগ আর বিশেষ রইলো না। সাধারণ অনুসন্ধিৎসু মানুষের মনেও সংশয় দেখা দেবে না। বিজ্ঞান-আশ্রয়ী প্রত্নতত্ত্ব গবেষণা নিশ্চয় আরও গভীর রহস্যের সন্ধান জানাতে পারবে অদূর ভবিষ্যতে।

তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থা

হিরণ্ময় চক্রবর্তী

কোন ধাতব দণ্ডের এক প্রান্তে তাপ প্রয়োগ করলে কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায়, তার অপর প্রান্তও উষ্ণ হয়ে গেছে। এক প্রান্তে তাপ প্রয়োগ করবার পর দণ্ডের অপর প্রান্ত যে পদ্ধতিতে উষ্ণ হলো, তাকে আমরা পরিবহন পদ্ধতি বলি। যখন দণ্ডের কোন অংশে তাপ প্রয়োগ করা হয়, তখন ঐ অংশের অণুগুলি খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ উত্তেজিত অণুগুলির জন্যে পার্শ্ববর্তী অণুগুলিও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তারাই আবার পরবর্তী অণুকেও উত্তেজিত করে তোলে। যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত দণ্ডটা উত্তপ্ত না হয়ে ওঠে, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এথেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, পরিবহনের ক্ষেত্রে উত্তপ্ত অণু স্থান পরিত্যাগ না করেই তার পার্শ্ববর্তী অণুকে উত্তেজিত করছে, আবার সে উত্তেজিত করছে তার পার্শ্ববর্তীকে।

প্রথমেই আমরা কেন ধাতব দণ্ডের কথা বললাম? যে কোন পদার্থ বললেই তো হতো! কথাটা ঠিক তা নয়। অবশ্য ধাতব পদার্থ না বলে যে কোন কঠিন পদার্থই বলতে পারতাম, কিন্তু ধাতব দণ্ড বললে বোঝবার একটু সুবিধা হবে।

একটু আগেই বলেছি, তাপ প্রয়োগে অণুগুলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে, এখন বলছি—এই উত্তেজনা আবার নির্ভর করে কঠিন পদার্থের বৈশিষ্ট্যের উপর; অর্থাৎ প্রত্যেক কঠিন পদার্থের অণুগুলি সমানভাবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে না। এজন্যে কঠিন পদার্থকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। যে ক্ষেত্রে অণুগুলির উত্তেজিত হবার ভাব বেশী, তাকে আমরা বলি পরিবাহী (Conductor), যে ক্ষেত্রে এটা সাধারণতঃ খুব কম, তাকে প্রায়-পরিবাহী (Semi-conductor) আর যে ক্ষেত্রে এটা একেবারে নেই বললেই চলে, তাকে আমরা অপরিবাহী (Non-conductor) বলি। কোন কঠিন পদার্থ পরিবাহী, প্রায়-পরিবাহী বা অপরিবাহী কেন হয়, তার বিশদ আলোচনা আমরা একটু পরে করবো।

এক্ষেত্রে আর একটা কথা বলা দরকার যে, তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রেও পরিবহন হয়,

তবে তা এত কম যে, এই সাধারণ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। উভয় ক্ষেত্রেই অণুসমূহের স্থান পরিত্যাগের ফলে পরিচলনের সাহায্যেই তাপ সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

খুব সাধারণ জ্ঞান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তাপের পরিমাণ—

(ক) পাত্‌লা ধাতব পাত্রের ক্ষেত্রে সমানুপাতে বেশী,

(খ) অধিক ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ধাতব পাতের ক্ষেত্রে সমানুপাতে বেশী,

(গ) তলদ্বয়ের তাপমাত্রার অধিক পার্থক্যের উপর সমানুপাতে বেশী,

(ঘ) সময় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমানুপাতে বেশী।

সুতরাং আঙ্কিক গঠন দিলে আমরা উপরের কথাগুলিকে নিম্নলিখিত উপায়ে লিখতে পারি—

$$Q = K. \frac{A\theta}{d}. t$$

এখানে A ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট d পুরুত্বের কোন ধাতব পাতের মধ্য দিয়ে t সময়ে Q পরিমাণ তাপ পরিবাহিত হবে, যখন পাতের দুই তলের মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্য হবে θ। K একটি ধ্রুবক। দেখা গেছে, কঠিন পদার্থের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে K-এর মানের পরিবর্তন হয়; অর্থাৎ কোন এক বিশেষ কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রেই K ধ্রুবক। তাই আমরা একে পরিবাহিতাঙ্ক (Conductivity) আখ্যা দেব। দেখা গেছে, ধাতুর ক্ষেত্রে K-এর মান সবচেয়ে বেশী, অধাতুর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম।

একখানা সমসত্ত্ব দণ্ড দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করতে হলে দণ্ডের প্রান্তদ্বয় ব্যাটারীর দুই মেরুর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সুতরাং প্রান্তদ্বয়ে নির্দিষ্ট বিভব-বৈষম্য হবে এবং তার জন্যে দণ্ডে আমরা গড় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র পাব। এই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দণ্ডের ইলেকট্রনের উপর বল প্রয়োগ করে তাতে ত্বরণ সৃষ্টি করে। এখন আমরা প্রত্যেক ইলকট্রনকেই ত্বরণ সৃষ্টির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্থির আছে বলেই মনে করে নেব। গ্যাসের গতিতত্ত্ব (Kinetic Theory) থেকে প্রত্যেক ইলেকট্রনের মূল গড় বর্গ বেগ (r. m. s velocity) পাব। এভাবে অঙ্ক কষে প্রতি সেকেণ্ডে কতগুলি ইলেট্রন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যায়, তা জানা যাবে। আমরা জানি যে, ইলেকট্রনের চলনই বিদ্যুৎ সৃষ্টির কারণ; ফলে দণ্ড দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। এভাবে দণ্ডের স্থির ইলেকট্রন প্রদত্ত বিভব-বৈষম্যের ফলে ত্বরিত হয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে।

পুনরায় ওমের সূত্র থেকে জানা যায় যে, প্রতিরোধ হচ্ছে বিভব-বৈষম্য ও বিদ্যুৎ-শক্তির অনুপাত; সুতরাং উক্ত দণ্ডের প্রতিরোধ, ফলে আপেক্ষিক প্রতিরোধকতা জানতে পারবো। আপেক্ষিক প্রতিরোধকতা হচ্ছে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতাঙ্ক। ১৮৫৩ সালে হ্বিডিম্যান ও ফ্রাঞ্জ দেখান যে, তাপমাত্রা অপরিবর্তিত রাখলে তাপ ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতাঙ্কের অনুপাত ধ্রুবক। এথেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, তাপ ও বিদ্যুতের পরিবহন অনেকটা সমধর্মী। কোন ধাতুর ক্ষেত্রে তাপ-পরিবাহিতাঙ্ক বেশী হলে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতাঙ্কও বেশী হবে, অর্থাৎ যে ধাতু তাপের সুপরিবাহী তা বিদ্যুতেরও সুপরিবাহী হবে।

এখন পরিবাহী, প্রায়-পরিবাহী এবং অপরিবাহীর গঠন নিয়ে আলোচনা করবো। যোজক ইলেকট্রন (Valence Electron) এবং কেন্দ্রকের (Nucleus) মধ্যে আকর্ষণের ফলে বিভব প্রত্যেক জায়গায় সমান থাকে না, আর এই পরিবর্তনই বৈদ্যুতিক তেজ-বন্ধনীর কারণ (Electronic Energy Band)। এই বৈদ্যুতিক তেজ-বন্ধনী নিরবিচ্ছিন্ন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়; এরা হচ্ছে ঘেঁষাঘেঁষি কোয়ান্টাম অবস্থার সংগ্রহ। এই তেজ-বন্ধনীর তিনটি হচ্ছে—পরিবাহী তেজ-বন্ধনী (Conduction Band),

যোজক তেজ-বন্ধনী (Valence Band) এবং অপ্রবেশ্য তেজ-বন্ধনী (Forbidden Band)। পরিবাহী তেজ-বন্ধনী ও যোজক তেজ-বন্ধনীর মাঝখানে অপ্রবেশ্য তেজ-বন্ধনী। পরিবাহীর ক্ষেত্রে অপ্রবেশ্য তেজ-বন্ধনী মোটামুটি সরু হয়, অর্থাৎ পরিবাহী ও যোজক তেজ-বন্ধনীর মধ্যে দূরত্ব মোটামুটি কম হয়। পরিবাহী ও যোজক তেজ-বন্ধনী যথাক্রমে প্রবেশ্য কিন্তু আর তাই তারা তাপ ও বিদ্যুতের পরিবাহী (চিত্র—ক)।

অপরিবাহীর ক্ষেত্রে অপ্রবেশ্য তেজ-বন্ধনী খুব মোটা অর্থাৎ পরিবাহী ও যোজক তেজ-বন্ধনীর মধ্যে দূরত্ব খুব বেশী হয় এবং যোজক তেজ-বন্ধনী ইলেকট্রনে পরিপূর্ণ থাকে। এই দুই কারণেই যোজক-তেজ বন্ধনী থেকে ইলেকট্রনের স্থানান্তর অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং বস্তুটি তাপ ও বিদ্যুতের
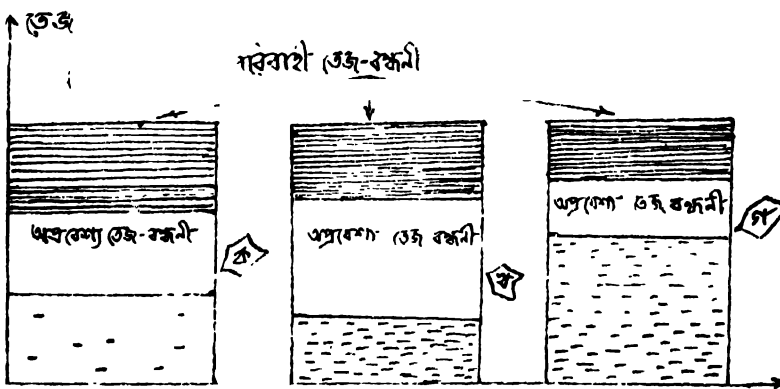
ক—আংশিক পূর্ণ যোজক তেজ-বন্ধনী, খ—পূর্ণ যোজক তেজ-বন্ধনী, গ—পূর্ণ যোজক তেজ-বন্ধনী

ইলেকট্রনশূন্য এবং প্রবেশ্য কিন্তু ইলেকট্রনে আংশিক পূর্ণ। এজন্যে সামান্য তেজেই যোজক তেজ-বন্ধনী থেকে ইলেকট্রন পরিবাহী তেজ-বন্ধনীতে স্থানান্তরিত হতে পারে। তাই পরিবাহী তেজ-বন্ধনীতে ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটে; ফলে অতি সহজেই তাপ ও বিদ্যুৎ একস্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবাহিত হতে পারে। বেশীর ভাগ ধাতুরই গঠন-প্রণালী মোটামুটি এই ধরণের, পক্ষে অপরিবাহী হয় (চিত্র—খ)। প্রায়-পরিবাহীতে অপ্রবেশ্য তেজ-বন্ধনী খুব সরু ছাড়া আর সবই অপরিবাহীর মত। তাই প্রথম ক্ষেত্রের দ্বিতীয় কারণের জন্যে ইলেকট্রনের স্থানান্তরকরণে অনেক তেজের প্রয়োজন হয়। প্রায়-পরিবাহীর ক্ষেত্রে পরিবাহী তেজ-বন্ধনী খুব সরু হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবাহী ইলেকট্রনের বৃদ্ধি হয়, ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে প্রায়-পরিবাহীর পরিবাহিতাঙ্ক বেড়ে যায় (চিত্র—গ)।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

প্রতিভা, ডিগ্রী ও হবি

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পর্ক এবং সুযোগের অভাবে প্রতিভা, ডিগ্রী ও হবির কি ভাবে মৃত্যু ঘটে, তাহা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ প্রতিভা কি, তাহাই দেখা যাক। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'প্রতিভা' নামক প্রবন্ধে ইহাকে প্রকৃতিদত্ত শক্তি-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ইহা মানুষের সৃজনীশক্তি। এই শক্তি চেষ্টার দ্বারা অর্জন করা যায় না, তবে ইহা শিক্ষা-নিরপেক্ষও নয়। সার টমাস এডিসন বলিয়াছেন—জিনিয়াস =৯০% পারস্‌পিরেশন + ১০% ইনস্‌পিরেশন। মনীষী জনসনের সংজ্ঞামতে, প্রতিভা পরিশ্রম করিবার অসীম ক্ষমতা। সৃষ্টির বেদনা প্রসব-বেদনার ন্যায়ই গুর্বী বেদনা। যতক্ষণ নূতনের জন্ম না হইতেছে ততক্ষণ স্বস্তি নাই, বিশ্রাম নাই। অনিচ্ছাকৃত কর্মে যেমন ক্লান্তি আছে, দুঃখ আছে, এই কর্মে তাহা নাই। ইহার মধ্যে এমন একটি রস রহিয়াছে, যাহা স্রষ্টাকে মাতাল করিয়া রাখে। এই প্রতিভাধরেরা যদি ভাল স্কুল-কলেজে শিক্ষা লাভের সুযোগ পান, তাহা হইলে মণিকাঞ্চন যোগ ঘটে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর স্কুল-কলেজে তাহারা 'মিস্ ফিট্' বলিয়া গণ্য হন। অতএব প্রতিভা ও ভাল স্কুল-কলেজের যোগাযোগ ঘটা নিতান্তই ভাগ্যের ব্যাপার। যে সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন আচার্য রায়, পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং ছাত্র মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি, সেই কাল ছিল বাঙলার শিক্ষার ইতিহাসে স্বর্ণযুগ। যেমন অধ্যাপকগণ, তেমনি তাঁহাদের ছাত্রগণ। আজিকার পরিবেশে ঐ দিনের কথা ভাবিয়াও সুখ হয়, গর্ববোধ হয়। কিন্তু এইরূপ যোগাযোগ খুব কমই ঘটে এবং সত্যিকারের প্রতিভাধরও কোন দেশেই গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় না। সুতরাং যাঁহারা খুব প্রতিভা বা অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি লইয়া জন্মায় নাই, কিন্তু যাঁহাদের স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিবার পরেও অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল পূর্ণমাত্রায় বর্তমান, তাঁহাদের কথা বাদ দিলে বিজ্ঞানের ইতিহাসের অনেকখানিই বাদ পড়িয়া যাইবে। ব্যক্তির অনুরাগ যেই বিষয়ের প্রতি, সেই বিষয় যদি কর্মক্ষেত্রের বিষয় না হয়, তাহা হইলে ব্যক্তি দ্বিধাবিভক্ত হন। কর্মক্ষেত্রে হয়তো তিনি কেরাণী, কিন্তু গৃহে তিনি চিত্রকর। কর্মক্ষেত্রের বাহিরের এই যে বিষয়, ইহাই হইবে তাঁহার 'হবি'। মানুষের যে দিকে ঝোঁক, যে বিষয়ের প্রতি তীব্র অনুরাগ, দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা যদি তাঁহার কর্মক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়, তবে তাহা 'হবি'রূপে বাঁচিয়া থাকিবে কিনা, তাহা নির্ভর করিবে ব্যক্তির হবির জন্য কিছু অর্থ ও সময় ব্যয় করিবার সুযোগ আছে কিনা, তাহার উপর। যাঁহার পেটই সকল শ্রম ও অর্থ শোষণ করিয়া নেয়, তাঁহার হবির মৃত্যু ঘটিতে বিলম্ব হয় না। আমাদের দেশের বিদ্যালয়-গুলির অধিকাংশই বক্তৃতাশ্রয়ী এবং ব্ল্যাক বোর্ড

ও চক্ষু সর্বস্ব। এইখানে পরীক্ষা পাশের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোন কার্য হইবার সুযোগ নাই। অতএব কোন বিশেষ বিষয়ে অনুরাগ-বিরাগের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। প্রতিভাধরদেরও আবার দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—একদল বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চার ফলে নূতন সূত্র ও তথ্য আবিষ্কার করিয়া একটা দিগন্ত খুলিয়া দিয়া যান, কিন্তু আর একদল নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈয়ার করিয়া সমাজকে সুখী ও সমৃদ্ধ করেন। প্রথম যিনি টিউবওয়েল তৈয়ার করিয়াছিলেন, আইনষ্টাইনের সঙ্গে অবশ্য তাঁহার তুলনা করা চলে না। আজিকার এই প্রচণ্ড খরার দিনে কে না টিউবওয়েল আবিষ্কারককে দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ না করিবেন? এই সকল আবিষ্কারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সম্বন্ধ থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। স্বাধীন দেশে যদি এই ধরণের প্রতিভা অর্থ ও সুযোগের অভাবে শুখাইয়া যায়, তাহা হইলে কেবল বৈদেশিক মুদ্রা ও বিদেশী 'এক্সপার্ট' আমদানী করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উচ্চ ডিগ্রী ছাড়াও কাহার কাহার ঐ সকল বিষয়ে কিছুটা প্রতিভা থাকিতে পারে এবং আছেও। এখন তাঁহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে চাই। মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত পালং-এর অধিবাসী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এণ্ট্রান্স ফেল করিয়া একটা মেয়ে স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং নন-ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। কোথাও কোন সুযোগ না পাইয়া শেষ সময়ে তিনি সার আশুতোষের নিকট আসেন। তিনি সামান্য আলোচনা করিয়াই বুঝিতে পারেন তাঁহার গুণের কথা এবং তিনি ডুমকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পরম দুর্ভাগ্য গুপ্ত মহাশয়ের, তিনি আর ফিরিলেন না। এই আঘাতের কয়েক বৎসর পরেই গুপ্ত মহাশয় মারা যান। ঐ মহকুমারই একটি পল্লী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য বিজ্ঞানের ডিগ্রী লাভের সুযোগ পান নাই। তিনি কবিতা ও গান রচনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার হবি ছিল প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ। এই কৌতূহলই তাঁহাকে টানিয়া নিয়াছিল সার জগদীশের কাছে। গুণগ্রাহী সার জগদীশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন না, একজন কর্মসঙ্গী করিয়া লইলেন। তাই আমরা একজন প্রখ্যাত জীব-বিজ্ঞানীকে পাইয়াছি, নয়তো তাঁহাকেও তলাইয়া যাইতে হইত। যশোহরের (পূঃ পাকিস্থান) এক ভদ্রলোক রাধাগোবিন্দ চন্দ্র জ্যোতিষ-চর্চা করিতে আনন্দ পাইতেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একটি পত্রিকায় নিজের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া একটি টেলিস্কোপ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঐ জেলার অধিবাসী ঈশ্বর ঘটক (মৃত) চিড়া তৈয়ারীর কল প্রস্তুত করেন। তাঁহার পুত্র ইউ. কে. ঘটকের ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিপ্লোমা না থাকিলেও এই বিষয়ে তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান উঁচু স্তরের।

বোড়াল নিবাসী (রাজভবন হইতে ৮ মাইল দূরে) শিব বাড়ুজ্যে ক্রশপলিনেশনে বিশেষজ্ঞ। তিনি বিশেষ ধরণের পালং (যাহার মূলটা মূলার মত কিন্তু মিষ্টি) এবং কলিফ্লাওয়ার (ফুলকপি কিন্তু স্বাদ ও রং মটরশুঁটির ন্যায়) উৎপন্ন করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া টিউসনি করিয়া প্রথম জীবন সুরু করেন। ছাত্র ফেল করিলে জবাবদিহি করিতে যাইয়া বিরক্ত হন এবং সার পি. সি. রায়ের কাছে উপদেশের জন্য যান এবং তাঁহার উপদেশে ও উৎসাহে শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী কৃষিবিদ্যা ও অ্যাপলাইড বটানির চর্চা আরম্ভ করেন। স্বাধীন পশ্চিম বঙ্গে তাঁহার অবস্থা কি? দেখিলে মনে হইবে এক বৃদ্ধ পাগল ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে লুথার বারবাঙ্ক সৃষ্টি হয়, কিন্তু স্বাধীন পশ্চিম বঙ্গে তাঁহার মৃত্যু

হয়। পি. সি. মুখার্জীর (বি. এস্-সি) রেলে রাহাজানি-নিরোধক যন্ত্রের কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ছয় মাস ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াও উহা বিনা কারণে পরিত্যক্ত হয়। স্বাধীন ভারতে প্রাদেশিকতার মৃত্যু আজও হয় নাই কিনা! ভদ্রলোক মরিয়া বাঁচিয়াছেন। তিনি সৃষ্টি-বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন। আসামের একটি মফঃস্বল কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীকান্তি সেন। তিনি একটি 'স্লেভ বক্স' তৈয়ার করেন এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উহা প্রদর্শনও করেন। অবশ্য আধুনিক কালের টেলিভোক্স-রোবটের তুলনায় উহা একটি খেলনা মাত্র। তবু এই স্বাধীন প্রচেষ্টা প্রশংসা এবং সাহায্যের অপেক্ষা রাখে। ইহার উন্নতি সাধন করিতে পারিলে হয়তো প্রতিরক্ষার কাজে আসিতে পারিত। এই অধ্যাপকের ডিগ্রী আছে, কিন্তু অর্থ নাই। উত্তর বঙ্গের এক ভদ্রলোক রৌদ্রের তাপে জলের পাম্পিং মেসিন চালাইবার এক প্রক্রিয়া বাহির করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈদেশিক আমদানীতে উৎফুল্ল সরকার ঐ দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যেই 'সান কুকারে' ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রাসাদকে রান্না করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল, তাহাও এক বাঙ্গালী (টাটার কর্মী) যুবকের তৈয়ারী। আজ পর্যন্তও তাহা বাজারে কেহ দেখিয়াছেন কি? বাইসাইকেলে দাঁতকাটা দুইটি চক্রের সহিত একটি চেন যুক্ত থাকে। একটা একবার ঘুরাইলে পিছনের চক্রের সহিত যুক্ত সদন্ত চক্র তিন বা চার বার ঘোরে। এমনি গিয়ারের সাহায্যে একবার ঘূর্ণনকে শতবারে পরিণত করা যায় কিনা এবং তার সাহায্যে প্রোপেলার চালাইয়া একটি আরোহী সমেত এরোপ্লেন আকাশে উড়ান যায় কিনা—ইহা ছিল এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পরীক্ষার বিষয়। ইহার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাই। ধনীদের এই সকল 'ছবি' নাই আমাদের দেশে।

যাঁহাদের মধ্যে নূতন কিছু তৈয়ারীর প্রেরণা আছে, তাঁহাদের অর্থ নাও থাকিতে পারে। হেন্‌রি ফোর্ডের টাকা ছিল না, কিন্তু যন্ত্রপ্রেম ছিল। মোটর তৈয়ারীর নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল এবং তাঁহাকে টাকা ধার দেওয়ার মত পাগলও সেখানে মিলিয়াছিল। সার টমাস এডিসন, টেস্‌লা, ফোর্ড প্রভৃতির ন্যায় ডিগ্রীহীন উদ্ভাবক ভারতবর্ষে নাই। অতি সামান্য স্ফুলিঙ্গ যেখানে দেখা যায়, তাহাকেও জ্বলন্ত রাখিবার কোন ব্যবস্থা স্বাধীন দেশের সরকার বা ধনী মহাজনেরা করেন নাই। নদীয়া জেলার শ্রীশচীনন্দন গোস্বামী (বি. এস-সি, এম-বি দুই বৎসর পড়িয়াছিলেন) স্বীয় চেষ্টায় একটি ঘড়ি নির্মাণের কারখানা করিয়াছেন। এক স্প্রিংটি ব্যতীত সমস্ত অংশই ঐ কারখানায় তৈয়ারী। এই বিদ্যা তিনি নিজ চেষ্টায় আয়ত্ত করিয়াছেন, কলেজে পড়িয়া নয়। তিনি কোন বিদেশী এক্সপার্ট আমদানী করেন নাই। কর্মীদের তিনি নিজেই শিক্ষা দেন। তিনি নিজে পরম বৈষ্ণব (শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের বংশধর); কারখানার মালিকানা কর্মীদের দান করিয়াছেন। কুটীর শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে পারঙ্গমতায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, যাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় স্বাধীনতা সংগ্রামে কাটাইয়াছেন, আজ স্বাধীন পশ্চিম বঙ্গে বৃদ্ধবয়সে তিনি ব্যর্থতার বেদনাঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন। উদ্ভাবনী শক্তি আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আছে। আমাদের মধ্যে বাক্যবিলাস অত্যন্ত বেশী। শিক্ষা ক্ষেত্রেও বক্তৃতা—গুরু বলিতেছেন শিষ্য শুনিতেছেন। ছাত্রজীবনে যাঁহারা হাতে-কলমে কাজ করেন না তাঁহারা যন্ত্রশিল্পী হন না, উদ্ভাবকও হন না। পৈত্রিক অর্থ থাকিলে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর অধিকারী হইতে পারেন।

বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার সুযোগ এখানে অত্যন্ত সীমিত। ভাল কলেজের সংখ্যা খুবই কম। পরীক্ষার ফল প্রথম শ্রেণীর না হইলে এই স্থানের দ্বার রুদ্ধই থাকিয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্র (বি. এস-সি পাশ কোর্সে পাশ) জীব-বিজ্ঞানের মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রোঃ জে. বি. এস. হলডেনের প্রশংসা অর্জন করেন। অধ্যাপক হলডেন তাঁহাকে এম. এস-সি ক্লাশে ভর্তি করিয়া লইবার জন্য এক অনুরোধপত্র পাঠান। কর্তাব্যক্তিরা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া পড়েন। অনার্স নাই যার তাহাকে ভর্তি! সে কি কথা!

তাঁহাদের মুহূর্তের জন্যও মনে পড়িল না, নোবল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ জন ফ্রাঙ্কলিন এণ্ডার্সের কথা। তিনি ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের পি-এইচ. ডি। প্রখ্যাত জীবাণু-বিজ্ঞানী জিনসারের সঙ্গে তাঁহার এক সাক্ষাৎকার হয়। জিনসার এণ্ডার্সকে বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রে কত কিছু করিবার আছে। অনাবিষ্কৃত এই জগতের বিরাট দিগন্তের মোহিনী মায়ায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। সাহিত্যের ডক্টর বিজ্ঞানের সাধনায় লাগিয়া গেলেন। স্বাধীন ভারতে জাতিভেদ যায় নাই। এখানে বিজ্ঞানের মন্দিরে বিশেষ ধরণের জাতির মাত্র প্রবেশাধিকার আছে। এখানে এণ্ডার্সের সৃষ্টি সম্ভব নয়। ডাঃ ভৈরব ভট্টাচার্য (প্রজনন বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ), ডাঃ খোরানা (এনজাইম বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ) প্রভৃতির ন্যায় ডিগ্রীধারী প্রতিভাধরদের স্থানও ভারতে হয় না। তবু প্রায়ই মহাশয় ব্যক্তিগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, ভারতে বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীর প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। তেলে ও বাকবিলাসে যে স্থানের শিক্ষাক্ষেত্র সফেন রঙীন হইয়া শোভা পাইতেছে, সেখানে একখানা সার্টিফিকেটই তো যথেষ্ট— শ্রমসাধ্য অধ্যয়ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সদাজাগ্রত সাধনার কি প্রয়োজন?

আরও একজন যুবক (পাশ কোর্সের ডিগ্রীধারী) যাঁহার পদার্থ-বিজ্ঞানে, বিশেষ করিয়া আপেক্ষিকতা-বাদ সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক অধ্যাপকের জ্ঞান হইতে নিম্ন মানের নয়—তাঁহার গবেষণার সুযোগ নাই। আমরা যে দেশের নকল অন্ধভাবে করিতেছি, সেই যুক্তরাষ্ট্রের বহু অধ্যাপকই বি. এস-সি, পি এইচ. ডি। পাশকোর্সের বি. এস-সি বড় জোর লেবরেটরী অ্যাসিষ্টেণ্ট হইতে পারে, তাহার আবার গবেষণা কি! তাই ভদ্রলোককে জার্মান ও ফরাসী হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হইতেছে। অপর দিকে দেখুন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পদার্থ-বিজ্ঞানী অ্যাস্টনকে। ক্যাম্ব্রিজে তিনি বার তিনেক পদার্থ-বিজ্ঞানে বি-এ ফেল করিয়া অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া ডিগ্রী লাভ করেন এবং ক্যাম্ব্রিজে ফিরিয়া আসিয়া অধ্যাপক জে. জে. টমসনের অধীনে গবেষণা আরম্ভ করেন। অধ্যাপক টমসনের মত খুব কম পদার্থ-বিজ্ঞানীরই পদার্থ-বিজ্ঞানের দুইটি চোখ (গণিত ও পরীক্ষা) ছিল (ডাঃ সাহার মতে)। অধ্যাপক টমসনের ছয়জন ছাত্র নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। আমাদের দেশে অ্যাস্টন জন্মিলে তাঁহাকে স্কুল মাষ্টারী করিয়া পচিতে হইবে এবং দশটাকা মহার্ঘ ভাতার জন্য দশ দিন রাজপথে অবস্থান ধর্মঘট করিতে হইবে। এখানে কেবলই শোনা যায়, যোগ্য শিক্ষকই মিলিতেছে না। সকলের মুখে ঐ একই কথা—যোগ্য লোক নাই। যাঁহারা এই কথা বলেন তাঁহাদের মধ্যে কে আছেন, যিনি টমসনের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারেন? যে বাতি নিজে জ্বলে না, সে অপরকেও জ্বালাইতে পারে না (রবীন্দ্রনাথ)।

স্বাধীন দেশের স্কুল-কলেজেও 'ওয়ার্কশপ' রাখা হয় নাই, যেখানে ছোটখাট যন্ত্রপাতি শিক্ষক মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণ তৈয়ার করিয়া লইবেন। পরাধীন ভারতের বিজ্ঞানী সার

জগদীশচন্দ্র দেশী মিস্ত্রীদের দ্বারা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ, উদ্ভিদকোষের স্পন্দন ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি-পরিমাপক অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়াছেন। এখনো নিজ হাতে যন্ত্রাদি তৈয়ারীর মানসিকতাসম্পন্ন অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। ইহার জন্য চাই অর্থ, চাই উৎসাহ। কে তাহা দিতেছেন? বিদেশ হইতে মুদ্রা আমদানী, যন্ত্র আমদানী, বিশেষজ্ঞ আমদানী করিয়া কোন স্বাধীন জাতি বড় তো হইতে পারেই না, অধিকন্তু স্বাধীনতা বজায় রাখাও শক্ত হয়।

বিজ্ঞান যাঁহাদের পেশা নয়, নেশা—তাঁহাদের বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধিতে অবদান কম নয়। ইঁহারা বিজ্ঞানের অধ্যাপক বা গবেষণাগারের গবেষক ছিলেন না। বর্ণালীর মধ্যে যে কালো রেখা (ফ্রনহফারস্ লাইন) দেখা যায়, তাহার আবিষ্কারক ফ্রনহফার ছিলেন একজন চশমা-ব্যবসায়ী। ইংল্যাণ্ডে অ্যাডমিরালিটি অফিসের কেরাণী নর্মান লকিয়ার সখ করিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা করিতেন এবং তিনিই প্রথম সূর্যগ্রহণের সময় সৌরচ্ছটার বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া সৌর-পরিমণ্ডলে হিলিয়ামের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। ইহার ত্রিশ বৎসর পরে সার র‍্যাম্জে হিলিয়াম তৈয়ার করেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম রেডিও-টেলিস্কোপ প্রস্তুত করেন 'রেডিও অ্যামেচার' Grote Reber। ইহা ছিল তাঁহার নেশা, পেশা নয়। নিজের উদ্যানে নিজ অর্থব্যয়ে নিজ হাতে তিনি ইহা তৈয়ার করেন। ভারত গৌরব অধ্যাপক সি. ভি. রামন—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের স্থাপিত কালটিভেশন অব সায়েন্সে পদার্থ-বিজ্ঞানের আলোচনা সভায় যোগ দিতেন নেশায়। উহা ছিল তখন তাঁহার হবি। তিনি তখন সরকারের অর্থদপ্তরের মোটা বেতনের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। পরে তিনি সার আশুতোষের অনুরোধে বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন। তখন পদার্থ-বিজ্ঞান হয় তাঁহার নেশা ও পেশা—দুই-ই।

অতএব নেশাটাও উপেক্ষার বিষয় নয়। কেহ প্রয়োজনের তাগিদে, কেহ মানসিক তৃপ্তির জন্য সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টি ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক—কোনটাই উপেক্ষার নয়। যিনি প্রথম বাইসাইকেল তৈয়ার করিয়াছিলেন, তিনি সাধারণ মানুষের কম উপকার করেন নাই। দরিদ্র ও প্রায় মূর্খ হারগ্রিব্‌স্, আর্করাইট ডিগ্রীহীন, অল্প শিক্ষিত জেম্‌স্ ওয়াট, জর্জ স্টিভেনসন প্রভৃতিদের যন্ত্র সৃষ্টির ফলেই শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছিল—ইংল্যাণ্ডের রূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল। সভা করিয়া, রিজলিউশন পাশ করিয়া ঐ বিপ্লব ঘটে নাই। মাইকেল ফ্যারাডে—এই মহান নামটি বাদ দিলে পদার্থ ও রসায়ন-বিজ্ঞানের একটা বিরাট অংশই ধ্বসিয়া যাইবে—সেই ফ্যারাডের কোন ডিগ্রী ছিল না এবং তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। প্রতিভার জন্ম ধনী ও ভাগ্যবানের ঘরেই হইবে, এমন কোন নিয়ম বিধাতা করেন নাই। আমাদের গৌরবের পাত্র ডাঃ সাহাও গরীবের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। তবে তিনি মস্তিষ্কের অত্যধিক শক্তির জোরেই দারিদ্র্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সাধারণ কোন স্রষ্টার অতটা মগজের শক্তি নাও থাকিতে পারে। যাহা দুর্লভ, যাহা কেবল চেষ্টা করিয়া তৈয়ার করা যায় না এবং যাহার জন্মের স্থান বা ঘরও নির্দিষ্ট নয়, সেই বস্তুর এতটুকুও অপচয় যাহাতে না ঘটে, তাহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা স্বাধীন দেশের সরকারের কর্তব্য। এই বিষয়ে ইউ. এস. এস. আর অত্যন্ত সতর্ক। ঘা খাইয়া যুক্তরাষ্ট্রও সতর্ক হইয়াছে। এই যুগ বড় ভয়ঙ্কর যুগ। পাঁচ শত মাইল উপর দিয়া ভ্রাম্যমান কৃত্রিম উপগ্রহ বিশ্বের কোথায় কি হইতেছে, তাহার সন্ধান লইয়া তাহার মাতৃভূমিতে সঙ্কেত প্রেরণ করিতেছে। সমস্ত দ্রুত ধাবমান যন্ত্রকে বিকল করিয়া দিবার জন্য LASER-এর গবেষণার প্রতিযোগিতা চলিতেছে, ক্ষুদ্র রেডার তরঙ্গের সাহায্যে চলকে অচল করা যায় কিনা—

প্রভৃতি বিষয়ে কত কি গবেষণা চলিতেছে সেই যুগে যদি বৈজ্ঞানিক ছাটাই, অর্থকষ্টে বৈজ্ঞানিকের আত্মহত্যা করিতে হয়, বিজ্ঞান প্রচারক প্রতিষ্ঠানকে অর্থাভাবে কাজকর্ম বন্ধ করিয়া যদি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের তালগুড় আধিকারিক, নারিকেল উন্নয়ন আধিকারিক আছেন, নাই শুধু বিজ্ঞান-উন্নয়ন আধিকারিক! আমরা ভাসিব, না ডুবিব?

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞান-সংবাদ

ডুবুরীদের জন্যে নতুন ধরণের সরঞ্জাম

সম্প্রতি ডুবুরীদের জন্যে এক নতুন ধরণের সরঞ্জাম উদ্ভাবিত হয়েছে। এর সাহায্যে তারা দু-শ' ফুটেরও বেশী জলের নীচে একটানা আট ঘণ্টা কাজ করতে পারবে। বর্তমানে যে সাজসরঞ্জাম রয়েছে, তার সাহায্যে ডুবুরীরা জলের অতখানি নীচে গিয়ে প্রতিদিন কুড়ি মিনিটের বেশী কাজ করতে পারে না।

সমুদ্রে বা বড় বড় নদীতে জাহাজ ও নৌকা-ডুবীতে যাত্রীদের উদ্ধারের কাজে, ভাঙ্গা জাহাজ ও নৌকা মেরামতিতে, সমুদ্রের তলায় খনিজ সম্পদের সন্ধান ও আহরণে এবং সমুদ্রের গভীরে গবেষণার ব্যাপারে এই নতুন সরঞ্জাম খুবই কাজে লাগবে।

সম্প্রতি এর কার্যকারিতাও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এই সাজসরঞ্জামের সাহায্যে আট জন ডুবুরী চল্লিশ দিনে হ্রদের তলায় অবস্থিত একটি জল-বিদ্যুৎ কারখানার ভারী ইস্প'তে তৈরি একটি বাঁধ মেরামত করেছে। এজন্যে তাদের অনেক রকম কাজ করতে হয়েছে। ঐ বাঁধের টারবাইন যন্ত্রে হ্রদের তলার কোন আবর্জনা যাতে ঢুকতে না পারে, তারই জন্যে জলের মধ্যে ইস্পাতের তৈরি একটি ফ্রেম বসানো আছে। ডুবুরীরা নতুন সরঞ্জামের সাহায্যে সেটিকে মেরামত করেছে। যে সাজসরঞ্জাম বর্তমানে প্রচলিত আছে, সেগুলির সাহায্যে ঐ ফ্রেমটি মেরামত করতে হলে ডুবুরীদের প্রায় এক বছর লাগতো। ভার্জিনিয়ার স্মিথ মাউন্টেন লেকের বাঁধে তাঁরা এই কাজ করেছে এবং অ্যাপেলেশিয়ান পাওয়ার কোম্পানী ওই কাজকর্ম পরিচালনা করেছেন। হার্ডহাট নামে সরঞ্জামের সাহায্যে ডুবুরীরা জলের ২০০ ফুট নীচে গিয়ে দিনে প্রায় কুড়ি মিনিট কাজ করতে পারে। এর নীচে তারা যেতে পারে নি বা এর বেশী সময়ও তাদের পক্ষে থাকা সম্ভব হয় নি।

পেনসিলভ্যানিয়ার পিট্স্বার্গের ওয়েস্টিং হাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারগণ এই নতুন সরঞ্জাম তৈরি করেছেন। তাঁদের ধারণা, কয়েক মাসের মধ্যেই ডুবুরীরা এর সাহায্যে ৪৫০ ফুট পর্যন্ত নীচে গিয়ে একটানা আট ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারবে।

এই নতুন সরঞ্জামটির নামকরণ করা হয়েছে "ক্যাচালাট"। সমুদ্রের গভীরে যে এক ধরণের তিমি মাছ থাকে, তাদের নামেই এর নামকরণ করা হয়েছে।

ছুটি প্রেশার চেম্বার বা কামরা হচ্ছে এই সরঞ্জামের প্রধান অংশ। এই চেম্বার ছুটির মধ্যে একটি থাকে জলের উপরে। দ্বিতীয়টির মধ্যে থেকে ডুবুরী জলে ওঠা-নামা করে। একটি হাইড্রলিক সিলিণ্ডারের মাধ্যমে ঐ ছুটি চেম্বার

যুক্ত থাকে। জলের উপরের চেম্বারটি অন্যটির তুলনায় বড় এবং তাতে থাকবার ও শোবার ব্যবস্থা আছে। ডুবুরীরা রাত্রিবেলাটা উপরের চেম্বারে কাটিয়ে পরের দিন আবার আট ঘণ্টার জন্যে দ্বিতীয় চেম্বারটির সাহায্যে জলের নীচে গিয়ে কাজকর্ম করে।

২০০ ফুট জলের নীচে তারা এমন এক পরিবেশে দিন কাটায়, যেখানে প্রতি বর্গইঞ্চিতে বায়ুর চাপ থাকে ১০০ পাউণ্ড। ঐ সময়ে তারা শ্বাস-প্রশ্বাসে হিলিয়াম, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন গ্যাস গ্রহণ করে থাকে।

সপ্তাহান্তে ডুবুরীরা কাজের শেষে বাড়ী ফিরে এলে চেম্বারটিও সম্পূর্ণ খালি করে ফেলতে হয়।

ডুবুরীদের নিয়ে ঐ চেম্বারটি ক্রেনের সাহায্যেই জলের নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট স্থানে এটিকে রাখবার পর ডুবুরীরা ঐ চেম্বারের নীচে একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে। ঐ দরজা দিয়ে আসা-যাওয়ার সময়ে ঐ চেম্বারে জল ঢুকতে পারে না।

ডুবুরীদের সঙ্গে ঐ চেম্বারের ৫০ ফুট দীর্ঘ একটি রজ্জুর মাধ্যমে সংযোগ থাকে। তারা প্রত্যেকেই মুখোস পরে থাকে এবং সেই মুখোসেই শ্বাস-প্রশ্বাস চালাবার ব্যবস্থা রয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে ছুটি ব্যাগ নিয়েও তাদের চলতে হয়—একটি শ্বাস নেবার জন্যে এবং আর একটি প্রশ্বাসের জন্যে। এই ব্যাগ ছুটি বুকের সঙ্গে বাঁধা থাকে।

জলের তলায় নিরন্ধ্র অন্ধকারে এদের পথ দেখায় অতি শক্তিশালী আলো। আলোটি থাকে এদের মাথায় চূড়ার মত। আর তারা সমুদ্র বা হ্রদের যত গভীরে যায়, শীতলতাও তত বাড়তে থাকে। এই শীতলতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এরা রবারে তৈরি এক ধরণের পোষাক পরে গভীর জলে ঘুরে বেড়ায়। ঐ পোষাকটির সঙ্গে হোজ পাইপের মাধ্যমে উপরের চেম্বারের সঙ্গে সংযোগ থাকে। ঐ পাইপের সাহায্যে ডুবুরীদের পোষাকে গরম জল সরবরাহ করা হয়।

ডুবুরীদের সঙ্গে নীচের চেম্বারে যারা থাকে, তারা টেলিফোনযোগে সব সময়েই উপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে—শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রপাতির খবরাখবর করে। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে প্রশ্বাসের গ্যাসের শতকরা দশ ভাগ জলের সঙ্গে মিশে যায়, আর কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ বাকী ৯০ ভাগ ডুবুরীর পিঠে স্থাপিত একটি আধারে গিয়ে জমা হয়।

জলের উপরের চেম্বারটি লম্বায় ২১ ফুট এবং প্রস্থে সাত ফুট। এর মধ্যে আছে ১০ ফুট দৈর্ঘ্যের ছুটি কামরা। ঐ ছুটি কামরার ট্রান্সফার-লকের ও জলের নীচে যে চেম্বারটিকে প্রেরণ করা হয়, তার চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে কোন কিছুর উপর নির্ভর করতে হয় না। চাপ কমাবার প্রয়োজন হলে যখন খুসী তা করা যেতে পারে। ছুটাতে দু-রকম চাপ—একটাতে কম এবং আর একটাতে বেশীও থাকতে পারে।

জলের নীচের চেম্বারের মাধ্যমে ডুবুরীরা যে এলাকায় কাজ করে, সে এলাকা এবং উপরের চেম্বারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হয়। ঐটির উচ্চতা নয় ফুট এবং ব্যাস ৫ ফুট। বর্তমানে জলের দু-শ' ফুট নীচে গিয়ে কাজ করলেও এটি ৪৫০ ফুট পর্যন্ত নীচে যেতে পারে এবং ৬০০ ফুট নীচের জলের চাপও সহ্য করতে পারে, অর্থাৎ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ৩০০ পাউণ্ডেরও বেশী চাপ সহ্য করতে পারে।

অভিনব টেলিভিশন ক্যামেরা

সম্পূর্ণ অন্ধকারেও "দেখতে পায়," সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এরকম একটি টেলিভিশন ক্যামেরা উদ্ভাবিত হয়েছে। বেতারবীক্ষণ বা টেলিভিশনযোগে বার্তা প্রচারের জন্যে প্রচুর আলোর প্রয়োজন।

যেখানে এই প্রকার আলো পাওয়া যাবে না, সেখানে এই ব্যবস্থা খুবই কাজে লাগবে। কোন বস্তু বা ব্যক্তির টেলিভিশনযোগে রেডিও ফটো পাঠাবার সময়ে ঐ বস্তু বা ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণ অন্ধকারেও থাকে তথাপি সে ছবিটি যেখানে পাঠানো হবে, সেখানে তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে—দিনের বেলায় অতি উজ্জ্বল আলোতে তোলা ছবিই মতই সুস্পষ্ট হবে।

'লেসার' ব্যবস্থার মাধ্যমে ঐ বস্তু বা ব্যক্তিকে আলোকিত করবার প্রক্রিয়া ঐ ক্যামেরার মধ্যে আছে। "লাইট অ্যামপ্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অব রেডিয়েশন"—এই কথাটির প্রধান শব্দের ইংরেজি আদ্যাক্ষর নিয়ে 'লেসার' শব্দটি গঠিত হয়েছে। আলোক-তরঙ্গকে কোন কোন স্ফটিকের মধ্যে পাঠালে অতি জটিল আণবিক ও পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় প্ররোচিত বিকিরণের সৃষ্টি হয় এবং তাথেকে পাওয়া যায় অতি শক্তিশালী সুসংহত আলোকরশ্মি। এর গতিপথের আকার একটা ফাঁপা নলের মত। অন্যান্য রশ্মির মত এই আলোক ছড়িয়ে পড়ে না। এই আলো প্রায় অদৃশ্য বললেই হয়। যার ফটো তোলা হচ্ছে, সে হয়তো জানতেই পারে না কি ঘটে গেল।

শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 'লেসার' প্রক্রিয়াকে নানাভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের দিক থেকে, যেমন—নিশাচর প্রাণীর প্রকৃতি পর্যালোচনায় এবং সকল ঋতুতে বিমানের অবতরণের ব্যাপারে এই ব্যবস্থা খুবই কাজে লাগতে পারে। যেমন—বিমানে অবতরণ ক্ষেত্রের রানওয়ে বা পথটি থেকে যাতে লেসার আলোক প্রতিফলিত হতে পারে, সে রকম রং বা টেপ দিয়ে চিত্রিত করতে হবে। বৈমানিকের স্বাভাবিক দৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগে যখন বাধাপ্রাপ্ত হবে, তখন বৈমানিক বিমানের ককৃপিটের অন্ধকারে টেলিভিশন রিসিভারের সাহায্যে পথের সন্ধান পাবেন। ঐ রিসিভারে রানওয়ের চিত্রটি ফুটে উঠবে।

কনেকটিকাট রাজ্যের নরওয়াকস্থিত পার্কিন এলমার কর্পোরেশন কর্তৃক নতুন এই ব্যবস্থাটি উদ্ভাবিত হয়েছে। ১৯৬১ সালে লেসার রশ্মি উদ্ভাবিত হবার অল্পকাল পরেই কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্পর্কে এই প্রতিষ্ঠানটিই হয়েছিল।

এই ধরণের টেলিভিশনে হিলিয়াম-নিয়ন গ্যাস লেসার ব্যবহৃত হয়। এর আলোর তীব্রতা এত অল্প যে, এতে চোখের কোন রকম ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই। তীব্রতা কম হলেও এই আলো খুবই শক্তিশালী। ক্যামেরা থেকে ৩০ ফুট দূরের কোন বস্তু বা ব্যক্তির সুস্পষ্ট ফটো তোলা যায় ও তা অন্য স্থানে প্রেরণ করা যায়। ভবিষ্যতে এর আরও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে ক্যামেরা থেকে বস্তু বা ব্যক্তির দূরত্বের মাত্রা বাড়ানো যেতে পারে।

লেসার টেলিভিশন সেটটির ওজন যাট পাউণ্ডের কাছাকাছি। এটি দৈর্ঘ্যে ৮ ইঞ্চি, প্রস্থে ৩০ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ১৮ ইঞ্চি। যাঁরা এটি তৈরি করেছেন, তাঁরা বলছেন—ভবিষ্যতে এর চেয়ে অনেক ছোট আকার ও হাল্কা ধরণের লেসার টেলিভিশন সেট তৈরি করা যেতে পারে—তখন এটি হবে ওজনে ২৫ পাউণ্ডের কাছাকাছি, দৈর্ঘ্যে ৮ ইঞ্চি, প্রস্থে ১০ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ১৮ ইঞ্চি।

লেসার টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে এইভাবে ছবি তোলা হয়: টেলিভিশন ক্যামেরায় একজোড়া আবর্তনশীল আয়না থাকে। লেসার থেকে যে আলো বিকিরিত হয়, তা ঐ আবর্তনশীল আয়নার সাহায্যে ক্যামেরার সামনে দৃশ্য বস্তুর উপর প্রতিফলিত হয়। সেকেণ্ডের ৬০ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে তা হয়ে থাকে।

ক্যামেরার সামনে বা কাছে কোন বস্তু থেকে প্রতিফলিত লেসার আলোক ফটো মালটিপ্লায়ার যন্ত্রে ধরা পড়ে। সেই আলোকের ইলেকট্রনিক তরঙ্গ টেলিভিশন রিসিভার যন্ত্রে গৃহীত হয়। ঐ রিসিভার ক্যাথোড-রে টিউবের সাহায্যে ও ফটো-সেলের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক রশ্মি এবং ক্যামেরার লেসার রশ্মি একই সময়ে নির্গত হয়ে থাকে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর—১৯৬৬

১৯শ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা
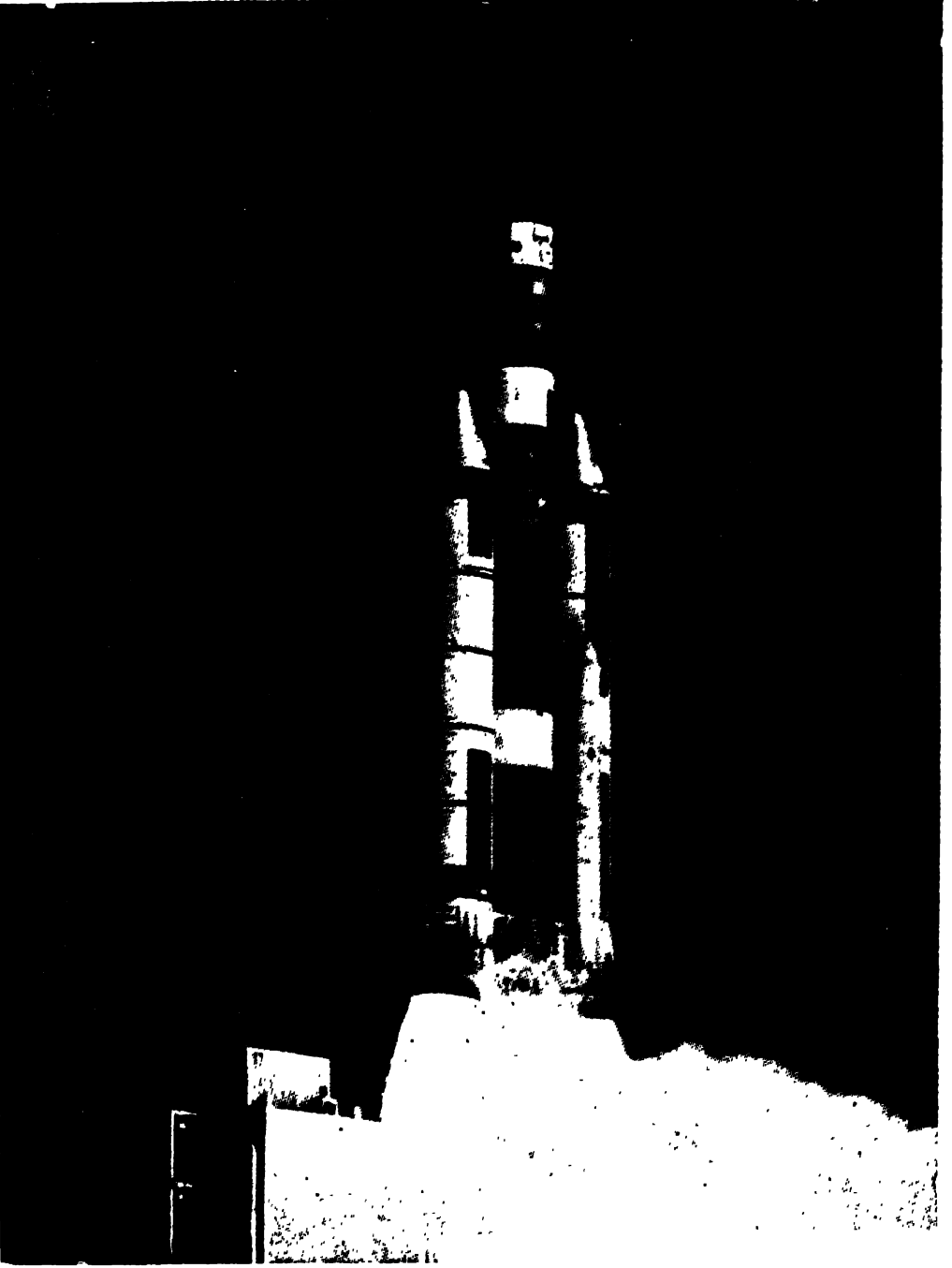
পাশাপাশি ৩টি ব্যারেল সংলগ্ন টাইটান-৩-সি রকেট ৮টি কৃত্রিম উপগ্রহসমেত গত ১৬ই জুন কেপ কেনেডি (ফ্লোরিডা) থেকে ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে।

করে দেখ

জলছাপের লেখা

তোমরা সবাই দেখে থাকবে—নোট, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির কাগজের গায়ে সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে জলছাপ দেওয়া থাকে। সাধারণভাবে দেখলে কাগজে জলছাপের কোন চিহ্নই নজরে পড়ে না। কিন্তু কাগজখানাকে জলে ডুবিয়ে বা ভিজিয়ে নিলে সেই ছাপ পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। কাগজের উপর জোরে চাপ দিয়ে জলছাপ তৈরি হয়ে থাকে। কাগজের যে সব জায়গায় জোরে চাপ পড়ে, সে সব জায়গার তন্তুগুলি বেশ চেপে বসে যায়। জলে ভিজিয়ে দিলে সে সব জায়গা থেকে প্রতিফলিত আলোর পথও কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এই কারণেই ভিজা কাগজে জলছাপ নজরে পড়ে থাকে। ইচ্ছা করলে তোমরাও খুব সহজেই জলছাপ দেবার কৌশলে সাদা কাগজে লিখে গোপন সংবাদাদি আদান-প্রদান করতে পার।
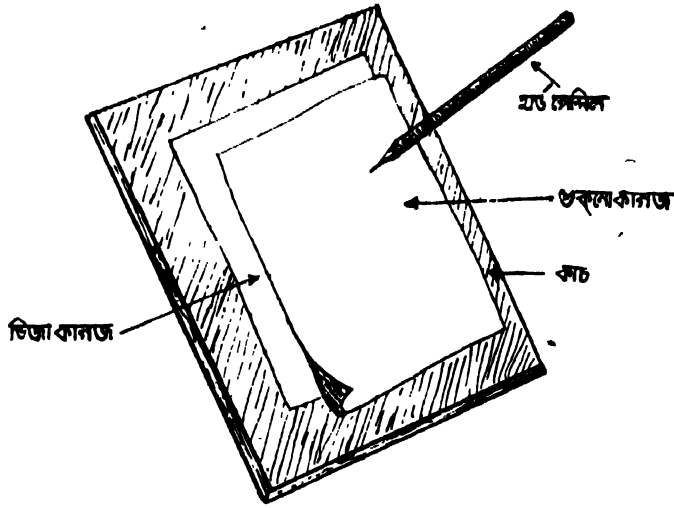
কৌশলটা খুবই সহজ। একখণ্ড সাদা কাগজ জলে ভিজিয়ে নিয়ে সেটাকে একখানা পরিষ্কার কাচ বা আয়নার উপর রাখ। এবার ভিজা কাগজখানার উপর আর একখানা শুক্‌নো কাগজ রেখে একটা হার্ড পেন্সিলের সাহায্যে খুব চাপ দিয়ে তোমার বক্তব্য লেখ। এবার শুক্‌নো লেখা-কাগজখানা সরিয়ে নাও—দেখবে, নীচের ভিজা কাগজটাতে তোমার লেখাগুলি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কাগজখানা শুকিয়ে গেলে তাতে লেখার কোন চিহ্নই দেখা যাবে না। কিন্তু কাগজটাকে আবার জলে ডুবিয়ে নিলেই লেখাগুলি পরিষ্কার দেখতে পাবে।

মরুভূমি

মরুভূমি বলতে আমরা বুঝি—সূর্যের তাপে ঝলসানো প্রচণ্ড উষ্ণ উন্মুক্ত ভূমিখণ্ড, যেখানে বৃষ্টি নেই, জল নেই, মানুষ নেই, কোন জীব নেই, গাছ-গাছড়া, লতাগুল্ম কিছুই নেই—রয়েছে শুধু দিগন্ত প্রসারিত বালুকাময় প্রান্তর আর মাঝে মাঝে নুড়ি, পাথর আর বড় বড় বিরাট নিরাবরণ পাথরের চাঙ্ কিম্বা বালি আর পাথরের পাহাড়। কথাটা আংশিক সত্য বটে, কিন্তু একেবারে সত্য নয়। সেখানে মানুষ নেই একথা ঠিক, কিন্তু বিশেষভাবে যেখানে গাছগাছড়া নেই বা কম এবং জীবজন্তুও নেই বা কম, যে স্থান অতিশয় উষ্ণ বা অতিশয় শীতল তাই হচ্ছে মরুভূমি। সে হিসাবে পৃথিবীর দুটি মেরুদেশও মরুভূমি, অন্ততঃ দক্ষিণ মেরু তো বটেই।

মেরু প্রদেশ বা শীতল মরুভূমির কথা বাদ দিয়ে উষ্ণ মরুভূমির কথাই এখানে ধরা যাক। প্রথমেই যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, ঐটিই হচ্ছে উষ্ণ মরুভূমির আপাত রূপ। একথা ঠিক যে, সে জায়গা দিনের বেলায় প্রচণ্ড সূর্যের তাপে সর্বদা উত্তপ্ত—অসহনীয় গরম, তবু মানুষ সেখানে রয়েছে, যদিও পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মত ঘন বসতিতে নয়। কিন্তু জীবজন্তু আর গাছপালা যে একেবারেই নেই, সে কথা বলা চলে না। বৃহৎ বনরাজ্যের বাসিন্দার মত বহু রকমের জীবজন্তু বা গাছপালা সেখানে নেই বটে, তবু কতক কতক প্রাণী ও উদ্ভিদ সেখানে রয়েছে এবং মরুভূমির ঐ আবহাওয়ায় তারা মানিয়েও নিয়েছে বেশ। তারা সবই ছোট ছোট জীব ও গুল্মজাতীয় গাছ, বড় গাছ বলতে শুধু খেজুর।

মরুভূমিতে আছে এক ধরণের লতানে কাঁটা গাছ, মাটির উপর দিয়ে অর্থাৎ ঐ দিগন্ত বিস্তৃত বালির উপর দিয়ে কিছুদূর বাদে বাদেই বালির ভিতরে শিকড় ঢুকিয়ে দিয়ে তারা চলে আর আচ্ছন্ন করে রাখে মাইলের পর মাইল বালুকারাশি। আর আছে ফণীমনসা ও গুল্মজাতীয় অনেক রকম কাঁটার ঝোপ। তাছাড়া প্রায়ই আছে খেজুর আর পাম্থপাদপের গাছ।

মরুভূমির মাঝে মাঝে রয়েছে মরূদ্যান। মরূদ্যান হচ্ছে, মরুর উদ্যান অর্থাৎ মরুভূমির বাগান। বাগান মানে অবশ্য মানুষের বিশেষ চেষ্টায় তৈরি বাগান নয়—সে বাগান হচ্ছে মরুভূমির মধ্যে কোথাও একটু জলা জায়গায় প্রকৃতির নিজের তৈরি কিছু গাছগাছড়ার আকর। মরুভূমিতে কোথাও কোথাও বালির উপর রয়েছে প্রস্রবণ; সেখানে জল উঠে উঠে গড়িয়েছে অনেকখানি জায়গায় আর সেখানে আপনা থেকে গজিয়েছে যত মরুভূমির গাছ—বিশেষ করে খেজুর গাছ বহু সংখ্যায় এবং অন্যান্য আরও অনেক রকম লতা, গুল্ম, শ্যাওলা ও ঘাস। এই সব মরূদ্যান কখনো হয় ছোট

একটুখানি জায়গা জুড়ে, কখনো হয় অনেকখানি জায়গা নিয়ে—সেটা নির্ভর করে জল সরবরাহকারী প্রস্রবণের উপর—যদি সেটা বেশ বড়সড় হয়।

যদি এই মরূদ্যান বেশ বড় হয়, তাহলে সেখানে মানুষ বসবাস করে, ধীরে ধীরে বেশ জনপদও গড়ে ওঠে। আর ছোটখাটো হলে মরুবাসীরা তাকে ব্যবহার করে তাদের বিশ্রামস্থল হিসেবে। চলতে চলতে কিছুক্ষণের মত তারা তার গাছের ছায়ায় বসে জিরোয়—কার্পেট, মাদুর বা সতরঞ্চি বিছিয়ে শুয়ে একটু ঘুমিয়েও নেয়। পোটলা-পুটলি খুলে বের করে তাদের ভোজন-রসদ—খাওয়া-দাওয়া করে, জলপান করে, সংগ্রহ করে তাদের পথ চলবার পানীয় বড় বড় চামড়ার থলেয়। তারপর আবার চলে যায় তাদের গন্তব্য পথে। কখনো কখনো তাঁবু খাটিয়ে এসব জায়গায় তারা রাত্রিবাস করে।

মরুবাসীদের প্রধান বাহন হলো উট। ঐ বালুকাময় প্রান্তরে কোন যানবাহন চলতে পারে না এবং উট ছাড়া আর কোন জন্তুই ঐ অপরিসীম গরম সহ্যও করতে পারে না; তাই উটই হচ্ছে মরুবাসীর সবচেয়ে বড় সহায়। উপরন্তু এই উট বহুদিন কাটাতে পারে এবং বহুদূর চলতে পারে জল না খেয়ে, তাতেও মরুবাসীর হয় যথেষ্ট সুবিধা। উটকে তারা অভিহিত করে "মরুভূমির জাহাজ" বলে।

মরুভূমিতে আর দুটি গাছ আছে—একটি গাছ এবং একটি লতা; তা হচ্ছে পান্থপাদপ ও তরমুজ। এরা যে কেবল মরূদ্যানেই জন্মায় তা নয়, এরা মরুভূমির যে কোন জায়গায় হয়। গরম বালুকাময় প্রান্তেও এবং সত্যি কথা বলতে কি, সে সব জায়গায়ই তারা বেশী জন্মায় এবং ভালও হয়। এ যেন মানুষকে সাহায্য করবার জন্যেই প্রকৃতির এক বিশেষ অবদান। সে সব তরমুজ হয় সুবৃহৎ। আমরা যে তরমুজ সাধারণতঃ বাজারে দেখতে পাই তার চেয়ে অনেক বড় আর অনেক স্বাদু। পান্থপাদপের গাছে পাতার গোড়ায় গোড়ায় সঞ্চিত থাকে জল। তরমুজ নিবারণ করে মরুচারীর ক্ষুধা ও তৃষ্ণা আর পান্থপাদপ নিবারণ করে তৃষ্ণা। পান্থপাদপের দণ্ডটি মাটি থেকে কিছু দূরে উঠে দু-দিকে ছড়িয়ে দেয় দু'সারি কলাপাতার মত পাতা। এই পাতার গোড়ায় জমা থাকে জল। মরুচারীরা পাতার গোড়ায় অঙ্কুশের মত কোন একটি যন্ত্র দিয়ে ছিদ্র করে' প্রয়োজনমত জল বের করে নেয়। পাতাটি ভেঙ্গে তারা গাছের ক্ষতি করে না। কারণ এই গাছ তাদের কাছে প্রকৃতির আশীর্বাদস্বরূপ। চলতে চলতে তরমুজ-লতা বা পান্থপাদপের গাছ পেলে তারা সেটাকে অত্যন্ত সৌভাগ্য বলে মনে করে এবং ঘন ঘন না হলেও প্রায়ই তারা তা পায়ও।

মরুভূমিতে যে সব জীব বাস করে তারা সবই ছোট ছোট প্রাণী, বড় জন্তু-জানোয়ার সেখানে নেই। নানারকম পোকা-মাকড়, বিছে, টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ ও ইঁদুর—এরাই হচ্ছে ওখানকার প্রধান বাসিন্দা। সামান্য বড় জন্তুদের ভিতরে আছে—শেঁয়াল ও ছোট ছোট এক ধরণের হরিণ।

মরুভূমিতে বৃষ্টি হয় খুবই কম, একরকম হয়ই না বলা চলে। এসব জায়গার একটি বিশেষত্ব হচ্ছে দিনের বেলায় যেমন প্রচণ্ড গরম আবার রাত্রিতে তেমনি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। মরুভূমিতে যে ঝড় হয় তা জল-বৃষ্টির ঝড় নয়, তা হচ্ছে বালির ঝড়। উত্তাল বাতাসে বালি উড়িয়ে একাকার করে। তখন একমাত্র বালির মেঘ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। মরুচারীরা এই ঝড়ের ভিতরে পড়লে ভারী বিব্রত হয়। অনেক সময় তাতে প্রাণহানিও ঘটে। তবে তারাও বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই জানে—তখন কি করতে হবে। ঝড়ের আরম্ভেই উটের দল পেটে মাথা গুঁজে বসে পড়ে আর বাতাসের বিপরীত দিকে উটের পেটের নীচে শুয়ে পড়ে মানুষেরা। ঝড় ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দুয়েকের বেশী স্থায়ী হয় না, তখন আবার উঠে তারা সুরু করে তাদের যাত্রা।

পৃথিবীর বৃহত্তম মরুভূমি হচ্ছে আফ্রিকার সাহারা—উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম সীমান্ত থেকে আরম্ভ করে প্রায় পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ভূমিখণ্ড অধিকার করে এর অবস্থিতি। তার পরেই আকারে ও খরতায় হচ্ছে আরবের মরুভূমি। তার পরেই হচ্ছে চীনদেশের মরুভূমি গোবি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আর একটি মরুভূমি কালাহারি। এর পর আছে উত্তর আমেরিকার মরুভূমি আরিজোনা, দক্ষিণ আমেরিকার আটাকামা আর প্যাটাগোনিয়া। মধ্য অষ্ট্রেলিয়ায় রয়েছে এক সুবৃহৎ মরুভূমি।

ভারতবর্ষেও খানিকটা মরুভূমি আছে, রাজপুতনার মরু অঞ্চল—যার নাম হচ্ছে থর। বরোদা অর্থাৎ রাজপুতনার পশ্চিম অঞ্চল থেকে আরম্ভ করে জয়পুর অর্থাৎ রাজপুতনার পূর্ব অঞ্চল পর্যন্ত এই মরুভূমি বিস্তৃত। তবে পৃথিবীর আর যে সব মরুভূমির নাম এখানে করা হলো, সে তুলনায় ভারতবর্ষের এই মরুভূমি মরুভূমিই নয়, নিতান্তই মরূদ্যান মাত্র। এর মধ্যভাগ যশোলমীড়কেই বলা যায় সত্যিকার মরুভূমি—একটুকু মাত্র জায়গা।

শ্রীবিনায়ক সেনগুপ্ত

মাছি

সভ্যতা বিকাশের সময় থেকেই মানুষ কীট-পতঙ্গের হাত থেকে অনবরত নিজেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে আসছে। সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে মানুষ এই কীট-পতঙ্গের আক্রমণ বা উৎপাতে ব্যতিব্যস্ত না হয়। এই কীট-পতঙ্গের মধ্যে মাছিই সম্ভবতঃ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। সভ্যতার আদিযুগে তাই মানুষ মাছিকে নোংরা আর বিপজ্জনক বলে মনে করতো। মাছির অত্যাচার

থেকে রক্ষা পাবার জন্যে মানুষ নানা ভাবে চেষ্টা করে আসছে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, নানা ধরণের কীটঘ্ন রাসায়নিক ব্যবহার করা সত্ত্বেও মাছিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা কখনও সম্ভব হয় নি। অতি আশ্চর্যজনক উপায়ে মাছি বংশবৃদ্ধি করে মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। মাছি বিপজ্জনক ও ছোঁয়াচে রোগের বীজাণু বহন করে মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে। মাছির উৎপাত এই কারণেই ভয়ের কারণ।

বাইবেলে উল্লিখিত আছে যে, মিশরের ফ্যারাওদের প্রাসাদ মাছির উৎপাতে বসবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। প্রাচীন মিশর ও ইসরাইলের অধিবাসীদের কাছে এক সময় মাছি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় ইসরাইলের অধিবাসীদের নাম দেওয়া Beelzebab-এর অর্থ মাছির অধিকর্তা। এর কারণ সম্ভবতঃ তখন ঐ দেশের প্রচণ্ড মাছির উৎপাত।

আদিকাল থেকেই মাছির বিরুদ্ধে মানুষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছে। সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা বোধ হয় নেওয়া হয় খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ হাজার অব্দে। এই সময় প্রাচীন মেসোপোটেমিয়ায় পাথরের সাহায্যে ঢাকা নর্দমা আর জল নিকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে জানা যায়। মাছি যাতে এই সব জায়গায় সহজে বংশবৃদ্ধি করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই ধরণের ব্যবস্থা করা হয়। ইসরাইলের অধিবাসীদের নেতা মোজেসও তার অনুচরবর্গকে মাছির সম্বন্ধে সতর্ক করেন। তিনি আদেশ দেন, সবাই যেন নোংরা বস্তু আর পচা খাদ্যদ্রব্য মাটির নীচে প্রোথিত করে ফেলে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরাও বিশ্বাস করতেন যে, মাছি নানা রোগের কারণ। তাই তাঁরা খাদ্যদ্রব্য ঢাকা দেবার ব্যবস্থা করতেন। প্রাচীন রোমক চিকিৎসকেরাও মাছিকে রোগের বাহন বলে মনে করতেন। ১৪৯৮ সালে ডেনমার্কের বিশপ কুড মনে করতেন প্লেগের বীজাণু মাছিই বহন করে। ইংরেজ চিকিৎসক টমাস সিডেনহাম সপ্তদশ শতাব্দীতে বলেন যে, গ্রীষ্মকালে গৃহে মাছির উৎপাত অত্যধিক বেশী হলে পরবর্তী শরৎকাল অস্বাস্থ্যকর হবে। মোট কথা, সমস্ত বিষয় আলোচনা করে দেখা যায় যে, মাছি চিরকালই মানুষকে বিব্রত করেছে।

বর্তমানে জানা গেছে যে, মাছি অন্ততপক্ষে পঁয়ষট্টি রকমের রোগ-বীজাণু বহন করে। এই সব বীজাণু মানুষ বা অন্যান্য প্রাণিদেহে রোগের সৃষ্টি করে থাকে। এই সব রোগ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় দেখা যায়। মাছি যে সব রোগ-বীজাণু বহন করে বলে জানা গেছে, সেগুলি হলো—আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরা, যক্ষ্মা ও আরও কয়েকটি রোগ। এদের মধ্যে মাছি কলেরা রোগের বীজাণু অত্যন্ত অধিক মাত্রায় বহন করে কি না, সে বিষয়ে কিছু আলোচনার অবকাশ আছে। কীট-পতঙ্গ যে নানা

রোগের বীজাণু বহন করে, তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে ; যেমন—ম্যালেরিয়া একমাত্র অ্যানোফেলিস মশার দ্বারাই সংক্রামিত হয়। আবার টাইফাস রোগ ছড়ায় উকুনের সাহায্যে। যে সব রোগ মাছির দ্বারা সংক্রামিত হয় বলে মনে করা হয়, সেগুলি অবশ্য অন্য আরও চারটি উপায়ে সংক্রামিত হতে পারে। এদের মধ্যে খাদ্যের ছত্রাক ইত্যাদি প্রধান। যে সময়ে মাছির সংখ্যা কম থাকে, যেমন শীতকালে—সেই সময়েও আমাশয় ইত্যাদি রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী রকম হতে পারে। এর প্রমাণ পেয়েছেন বিশেষজ্ঞেরা। মোটের উপর মাছি যে রোগ ছড়ায়, এতে কোন সন্দেহ বা তর্কের অবকাশ নেই।

মাছি দুটি ডানাবিশিষ্ট পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের বলা হয় Diptera। এদের মধ্যে মশা, মাছি ইত্যাদি প্রধান। তাছাড়া বিভিন্ন জাতের আরও কয়েকটি পতঙ্গও এর অন্তর্গত। অন্ততঃ দু-শ বিভিন্ন প্রকারের পতঙ্গ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এগুলি সাধারণতঃ মানুষের আবাসস্থলের কাছাকাছিই দেখা যায়। মাছির ছয়টি পা আছে। আমাদের বাসগৃহে যে সব মাছি দেখা যায়, সেগুলি নোংরা উচ্ছিষ্ট আহার করেই জীবন-ধারণ করে। এই মাছি কামড়াতে পারে না—মানুষ বা অন্য প্রাণীর ত্বক ভেদ করবার ক্ষমতা এদের নেই। মাছি যদিও ত্বক ভেদ করে রক্ত দূষিত করতে পারে না, তবু ঘা বা পচনশীল কোন অঙ্গে বসতে পারে। আর এই ভাবেই এরা রোগ-বীজাণু ছড়াতে পারে। সমুদ্রতীরবর্তী কোন কোন জায়গার মাছি দংশনও করতে পারে বলে শোনা গেছে।

মাছির জীবনে চারটি নির্দিষ্ট ভাগ আছে। ডিম, শূককীট, গুটি ও পূর্ণ অবস্থা। একটি স্ত্রী-মাছি একসঙ্গে এক শত থেকে দেড় শত ডিম প্রসব করে। মাছি সাধারণতঃ কোন নোংরা পচা জিনিষ, যেমন—গোবর বা ঐ জাতীয় কিছুর উপরেই ডিম পাড়ে। প্রায় একদিনের মধ্যেই ঐ ডিম থেকে শূককীট বেরিয়ে আসে। ঐ শূককীট অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। একটি নীল মাছির সদ্যোজাত শূককীটের ওজন মাত্র ·১ মিলি-গ্র্যাম। পাঁচদিন বাদে ঐ কীটের ওজন দাঁড়ায় ৮৪ মিলিগ্র্যাম ; অর্থাৎ ঐ শূককীট প্রায় ৮০০ গুণ বৃদ্ধি লাভ করে পাঁচ দিনের মধ্যে। মাছির শূককীট তরল খাদ্য গ্রহণ করে। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বীজাণু মাছির জীবনে অতি প্রয়োজনীয়। এরপর গুটি থেকে মাছি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অধিকাংশ মাছির রং অনেকটা গাঢ় ধূসর বর্ণের। এদের দেহে তিনটি ভাগ আছে। একটি পূর্ণবয়স্ক মাছি গ্রীষ্মে তিরিশ দিন বাঁচে। নোংরা আর পচা আহার্য গ্রহণ করে মাছি পূর্ণবয়স্ক হয়। শূককীটের দেহে পাত্‌লা চামড়া বা খোলস থাকে। ক্রমে ঐ খোলস ছেড়ে মাছি বেরিয়ে আসে। শূককীট দু-বার খোলস ছাড়ে। শূককীটের পরের অবস্থা গুটি। গুটি থেকে পূর্ণতা লাভ করতে মাছির তিন থেকে ছয় দিন সময় লাগে। পূর্ণতা লাভ করবার পর মাছি সহজেই উড়তে পারে।

পচা বা রোগ-বীজাণুপূর্ণ দ্রব্যের উপর বসবার পর মাছি আবার মানুষের ব্যবহার্য খাদ্য ইত্যাদির উপর বসে। এর ফলে অতি সহজেই ঐ রোগ-বীজাণু বা দূষিত পদার্থ মানুষের খাদ্যে মিশ্রিত হয়ে রোগ সংক্রামিত করে। মাছির পা ঐ সব রোগ-বীজাণু বহন করে আনে। মাছির যত্রতত্র আনাগোনার ফলেই রোগ-বীজাণুও অতি সহজে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর এই ভাবে কলেরাজাতীয় মারাত্মক রোগ সংক্রামিত হয়ে মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে।

মাছির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই মাছির উৎপাত বেশী। আমাদের দেশে তাই মাছির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। ডি-ডি-টি জাতীয় কীটনাশক দ্রব্য এই বিষয়ে যথেষ্ট ফলদায়ক হতে পারে। অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখবার দিকে নজর দেওয়া উচিত। মাছি-অধ্যুষিত অঞ্চলে অনেক জায়গায় পাত্‌লা জাল জানালা দরজায় লাগানো চলতে পারে। বাড়ীর চতুর্দিক সর্বদাই জঞ্জালমুক্ত রাখা দরকার। পরিষ্কার নর্দমা আর জলনিকাশের ব্যবস্থা মাছির উৎপাত কমাতে সাহায্য করে। নর্দমায় ফিনাইল ব্যবহারও মাছি নিধনে সাহায্য করে।

মোট কথা, মাছি মানুষের জীবনে এক অভিশাপ বলা যেতে পারে। স্মরণাতীত কাল থেকেই এই ক্ষুদ্র পতঙ্গের সঙ্গে তাই মানুষ সংগ্রাম করে আসছে। নতুন নতুন কীটঘ্ন রাসায়নিক আবিষ্কারের ফলে হয়তো একদিন মানুষ মাছির হাত থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হতে পারবে। মাছিকে নির্মূল করা সহসা সম্ভব না হলেও আশা করা যায়, এদের দ্বারা রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারবে, যেমন ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

জোহান গুটেনবার্গ

মানুষের জ্ঞান বিস্তারে মুদ্রাযন্ত্রের দান অতুলনীয়। মুদ্রণ-কৌশল আবিষ্কৃত না হলে অল্প সময়ে দ্রুতগতিতে সভ্যতার বিস্তার সম্ভব হতো কিনা—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বহু জনের চেষ্টায় আজ মুদ্রণ-ব্যবস্থার অভাবনীয় উৎকর্ষ লাভ সম্ভব হয়েছে। মুদ্রণ-কৌশল মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই আয়ত্ত করেছিল। আধুনিক মুদ্রণ-কৌশল অর্থাৎ একই অক্ষর বা টাইপকে নানাভাবে সাজিয়ে যে মুদ্রণের সূত্রপাত হয়—তার আবিষ্কর্তা হচ্ছেন জোহান গুটেনবার্গ। মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসে গুটেনবার্গের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

মাটির ছাঁচ বা কাঠের ব্লকের সাহায্যে মুদ্রণের কৌশল খৃষ্টপূর্বাব্দেই মানুষ জানতো। খৃষ্টের জন্মের ৭০০ বছর পূর্বে অ্যাসিরিয়ানরা মাটির ছাঁচ বা কাঠের ব্লকের সাহায্যে নানারকম ছবি ছাপতো। খৃষ্টের জন্মের ৫০ বছর আগেও চীন-দেশে মুদ্রণ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আধুনিক মুদ্রণ-কৌশলের ইতিহাস সুরু হয় ৫০০ বছরেরও আগে।

কেউ কেউ মনে করেন—নেদারল্যাণ্ডের অন্তর্গত হারলেম-এর লরেন্স কোষ্টার নাকি আধুনিক মুদ্রণ-পদ্ধতির জনক। ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নাকি প্রথম গাছের ছালে খোদিত টাইপ বা অক্ষরের সাহায্যে একটি পুস্তক মুদ্রিত করেন। পরে তিনি সীসা এবং রূপদস্তার (Pewter) টাইপ ব্যবহার করেন। কিন্তু এই ধারণা সর্বজনস্বীকৃত নয়; কারণ এর সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

আনুমানিক ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে গুটেনবার্গ জার্মেনীতে জন্মগ্রহণ করেন। গুটেনবার্গ তাঁদের বংশগত পদবী নয়। যে অঞ্চলে তাঁরা বাস করতেন, সেখানকার নামানুযায়ী তাঁরা গুটেনবার্গ পদবী গ্রহণ করেন। গুটেনবার্গের বাবা ফ্রিলেজাম গুটেনবার্গ ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত এবং মেইঞ্জ নগরীর কোষাধ্যক্ষ।

তখন মেইঞ্জ নগরীর অভিজাত সম্প্রদায় ও বিভিন্ন বণিক সম্প্রদায়ের (Guilds) মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। বণিক সম্প্রদায় অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত থেকে ক্ষমতা দখলে সচেষ্ট ছিলেন। অভিজাতগণ সর্বব্যাপারে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চাইতেন।

এই বিরোধপূর্ণ অবস্থার মধ্যে জোহান গুটেনবার্গের শৈশব অতিবাহিত হয়। স্কুলে তিনি ল্যাটিন শিখতেন। বাদবাকী সময় তাঁকে বাড়ীতেই থাকতেই হতো এবং বাড়ীতেই তিনি শিক্ষা অর্জন করতেন। তাঁর বাবার আশঙ্কা ছিল—সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে মিশলে তাঁর আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হবে। গুটেনবার্গ বাইবেলও অধ্যয়ন করেন। অবসর সময়ে তিনি বাড়ীতে ছবির ব্লক নিয়ে খেলা করতেন।

এখনকার মত সে সময়ে পাঠ্যপুস্তক ছাপা হতো না, হাতে লেখা হতো। কিন্তু কাজটা সহজসাধ্য নয়—তদুপরি সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। পুরনো বইয়ের পড়া শেষ হলে যখন নতুন পাঠ্যপুস্তকের দরকার হতো, তখন তা চট্ করে পাওয়া যেত না। সুতরাং গুটেনবার্গকেও নতুন বইয়ের জন্যে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হতো। সে সময়টায় তিনি ছবির ব্লকে কালি মাখিয়ে তার ছাপ তুলতেন—পার্চমেণ্ট বা সাদা কাগজে। তার খেলার সাথী ছবির ব্লকগুলিতে ছিল সাহেব, বিবি, গোলাম আর বাইবেলের নানা কাহিনীর ছবি।

ব্লক নিয়ে খেলা করতে করতে গুটেনবার্গের মনে প্রশ্ন জাগে—এই সব ছবি পর পর সাজিয়ে সেলাই করে নিলেই তো একটা বই হয়ে যায়! আর এভাবে ছবি ছাপিয়ে তো অনেক বই তৈরি করা যায় এবং একটা ব্লক দিয়েই তো

অনেকগুলি ছবি ছাপানো যেতে পারে। এই প্রশ্নের সমাধান করবার জন্যে তিনি চেষ্টা করতে থাকেন। গুটেনবার্গের বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে আর একটি প্রশ্ন জাগে—টাইপ-এর ব্লক তৈরি করে বইও ছবির ব্লকের মত ছাপানো যেতে পারে! কিন্তু এর জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কাঠ খোদাই শেখা, তা না হলে তিনি ব্লক তৈরি করতে পারবেন না।

গুটেনবার্গ তাঁর বাবাকে বললেন—তিনি কাঠ খোদাই করা শিখবেন। পুত্রের এই ইচ্ছা শুনে জোহানের বাবা খুব অবাক হলেন। কারণ বৃত্তিটা অভিজাতদের পক্ষে সম্মানজনক নয়। কিন্তু জোহান নাছোড়বান্দা। যাহোক, শেষ পর্যন্ত খোদাই-এর কাজ শেখায় তাঁর বাবা মত দিলেন। কিন্তু তিনি জোহানকে কাঠ খোদাই করা শিখতে দিলেন না। তিনি জোহানকে স্থানীয় টাকশালে সোনা, রূপা ধাতু খোদাই শিখবার জন্যে ভর্তি করে দিলেন।

টাকশালে সোনা, রূপায় ছাপ মেরে মুদ্রা তৈরি হতো। মুদ্রার উপর যে ছাপ থাকে শিল্পী তার নক্সা মোমের উপর এঁকে নিত। তারপর খোদাইকর ছেনী ও হাতুড়ীর সাহায্যে একখণ্ড কোমল ইস্পাতের উপর সেই নক্সা খোদাই করতো—এটাকে বলা হতো মোহর। এভাবে মুদ্রার দুই দিকের মোহর তৈরি করা হতো। তারপর মোহরকে আগুনে উত্তপ্ত করে কঠিন করা হতো। এরকম দুটি মোহরের মাঝখানে সোনা বা রূপা রেখে জোরে চাপ দিয়ে মুদ্রায় ছাপ মারা হতো। গুটেনবার্গ এখানে কাজ শিখতে থাকেন।

তখনকার দিনে ছাপার কাজ হতো ব্লকের সাহায্যে। কাঠের ব্লকে তৈরি ছবি ও তার তলায় কয়েক লাইন লেখা ছাপানো হতো। লেখাগুলি ব্লকে খোদাই করা হতো। কিন্তু এভাবে ছাপার কাজে যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। একটা শব্দ বা অক্ষর অদল-বদল করতে হলে আবার নক্সাটা নতুন করে তৈরি করে সেটাকে কাঠের ব্লকে খোদাই করতে হতো।

গুটেনবার্গ কাঠের পৃথক পৃথক টাইপ তৈরি করে তার সাহায্যে ছাপার চেষ্টা সুরু করেন। কিন্তু কাজটা খুবই পরিশ্রমসাধ্য। তিনি চৌকা কাঠের টাইপ তৈরি করেন। প্রতিটি চৌকা কাঠে একটি টাইপ তৈরি হলো। ছাপতে গিয়ে দেখা গেল টাইপগুলি ফেটে যায়, কোন কাজ হয় না। বার বার কাঠের টাইপ তৈরি করা সম্ভব নয়। গুটেনবার্গ তখন চেষ্টা সুরু করেন ধাতুর টাইপ তৈরি করবার জন্যে। কারণ ধাতুর টাইপ সহজে ভাঙ্গবে না। দিন-রাত গুটেনবার্গের একই চিন্তা—কেমন করে ধাতুর টাইপ তৈরি করা যায়। কিন্তু সমস্যা সমাধানের পথ তিনি খুঁজে পান না।

কিন্তু সামান্য একটা ঘটনা দেখেই হঠাৎ তিনি তাঁর সমস্যার সমাধান করেন।

একদিন তিনি এক স্বর্ণকারের দোকানে বসে আছেন। স্বর্ণকার তখন ঢালাই করবার বাক্সের দুই পাল্লায় সামান্য ভিজা বালি ভরে একটা পাল্লার ভিজা বালির উপর একটা ব্রোচ রেখে তারপর পাল্লা দুটি খুব চাপ দিয়ে বন্ধ করে বালিতে ব্রোচের একটি ছাঁচ তুলে নিল। তারপর আসল ব্রোচটিকে তুলে নিয়ে ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতু ঢেলে একটার পর একটা ব্রোচ তৈরি করতে লাগলো।

ঘটনাটি দেখে গুটেনবার্গের মনে হলো—এভাবে তো তাহলে ধাতুর টাইপ তৈরি করাও সম্ভব! একটা টাইপের ছাঁচ তৈরি করলে তাথেকে সেই রকম অনেকগুলি টাইপ অল্প সময়েই প্রস্তুত করা যায়। তাছাড়া বার বার কাঠের টাইপ তৈরির হাঙ্গামাও থাকবে না। এথেকেই ধাতুর টাইপ প্রস্তুতের সূত্রপাত হয়। কিন্তু সমগ্র বর্ণমালা তৈরি করা বেশ কঠিন ব্যাপার। তিনি স্বর্ণকারের কাছে পাথর কাটা, খোদাই করা এবং পালিশের কাজ শিখতে সুরু করেন। শীঘ্রই তিনি এই ব্যাপারে দক্ষতাও অর্জন করেন।

কিন্তু এই কঠিন কাজ শেখবার কয়েক বছরের মধ্যে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর কাজে বাধা পড়ে। মেইঞ্জ নগরার বণিক সম্প্রদায় সেখানকার অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাঁদের শহর থেকে তাড়িয়ে দেয়। বহিষ্কৃত অভিজাতদের মধ্যে জোহান গুটেনবার্গও ছিলেন।

গুটেনবার্গের বয়স তখন ত্রিশ। কপর্দকশূন্য অবস্থায় তিনি এক-শ' মাইল দূরবর্তী ষ্ট্রাসবার্গ শহরে চলে যান। সেখানে তিনি পাথর কাটাই-এর কাজ করেন এবং অবসর সময়ে টাইপ প্রস্তুতের পরীক্ষা চালান। এখানে তিনি তিন জন অংশীদার পান। তাঁরা গুটেনবার্গের পরিকল্পনা রূপায়ণে অর্থসাহায্যে স্বীকৃত হন। শীঘ্রই একজন অংশীদার মারা যান। বাকী দুজন গুটেনবার্গের ছাপাখানা এবং তাঁর উদ্ভাবিত মুদ্রণ-পদ্ধতি আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করেন। এই সময় গুটেনবার্গ আবার মেইঞ্জ নগরীতে ফেরবার সুযোগ পান।

মেইঞ্জে এসে গুটেনবার্গ জোহান ফাষ্ট নামক একজন স্বর্ণকারকে অংশীদার হিসাবে পান। তিনি একটা ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানায় ডোনাটাসের ল্যাটিন গ্রামার ছাপা হয়। ল্যাটিন গ্রামার ছাপায় খুবই সাফল্য লাভ হয়। ইউরোপের বহু বিদ্যালয়ে তখন এই গ্রামার পড়ানো হতো। অল্প সময়ের মধ্যে ২৮ পাতার এই পাতলা বইটির ১৫টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তাঁদের বাইবেল ছাপবার পরিকল্পনাও ছিল।

গুটেনবার্গ কাঠের টাইপ তৈরি করে পিতলে তার ছাঁচ তুললেন। সমস্ত টাইপে উচ্চতা সমান করলেন। একখণ্ড সীসার মধ্যে টাইপের পিতলের ছাঁচকে হাতুড়ী দিয়ে ঠুকে ঠুকে বসালেন। এতে সীসার মধ্যে টাইপের ছাপ পরিষ্কার ফুটে

উঠলো। সীসার এই ছাঁচটিতে ঢালাই করে একটি টাইপ থেকে অনেকগুলি টাইপ তৈরি করা সম্ভব হলো। পরবর্তী কালে গুটেনবার্গ নতুন পদ্ধতিতে টাইপ তৈরি করেন। একখণ্ড কোমল ইস্পাতে অক্ষর বা টাইপ তৈরি করে তা বারবার উত্তপ্ত এবং ঠাণ্ডা করে হাতুড়ীর ঘা দিয়ে সীসায় বসাবার মত কঠিন করেন। আরও পরীক্ষার পর গুটেনবার্গ দেখেন—পান-দেওয়া (Tempered) ইস্পাতের অক্ষর সীসার চেয়েও কঠিন ধাতুতে হাতুড়ীর ঘা দিয়ে বসিয়ে তার ছাঁচ তোলা যায়। তিনি টাইপের ছাঁচের জন্যে সীসার বদলে তামার ব্যবহার সুরু করেন।

এদিকে বাইবেল ছাপার কাজ আর এগোয় না। তাঁর অংশীদার ফাষ্ট অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি গুটেনবার্গের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ে প্রদত্ত তাঁর টাকা দাবী করে মামলা দায়ের করেন। ফাষ্ট গুটেনবার্গকে মামলায় হারিয়ে ছাপাখানার একক মালিক হন।

এই সময়ে গুটেনবার্গের বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। এরপর ফাষ্ট বাইবেল ছাপেন। কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে গুটেনবার্গের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করলেন না।

গুটেনবার্গের তখন আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু তিনি হাল ছাড়লেন না। কিছু অর্থ সংগ্রহ করে আবার তিনি ছাপাখানা খুললেন। নানা অসুবিধার মধ্যেও তিনি ছাপাখানায় বাইবেল ছাপান। তখন তাঁর বয়স ৬১। তাঁর মুদ্রিত বাইবেল, ফাষ্টের মুদ্রিত বাইবেলের চেয়ে অনেক সুন্দর হলো।

গুটেনবার্গের খ্যাতি ক্রমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নানা জায়গায় ছাপাখানা স্থাপিত হয়। নানা দেশ থেকে ছাত্রেরা তাঁর কাছে মুদ্রণবিদ্যা শেখবার জন্যে আসতে সুরু করে। গুটেনবার্গ ল্যাটিন অভিধান Catholicon ছাপেন। এভাবেই গুটেনবার্গ মুদ্রণ-জগতে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেন।

১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে জোহান গুটেনবার্গ পরলোকগমন করেন।

শ্রীঅনিলকুমার চক্রবর্তী

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। ফারমেট বলেছেন a, b, c তিনটি যদি বাস্তব রাশি হয় এবং n যদি কোনও বাস্তব সংখ্যা হয়, তবে n-এর যে কোনও মানের জন্যে

$$a^n + b^n = c^n \text{ হয় না।}$$

কিন্তু যদি $a + b = c$ হয় তবে,

$$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n + \left(b^{\frac{1}{n}}\right)^n = \left(c^{\frac{1}{n}}\right)^n$$

যেহেতু n, a, b, c সকলেই বাস্তব সংখ্যা ;

সুতরাং $a^{\frac{1}{n}}, \; b^{\frac{1}{n}}, \; c^{\frac{1}{n}}$ সকলেই বাস্তব।

মনে করা যাক $a^{\frac{1}{n}} = x, \quad b^{\frac{1}{n}} = y, \quad c^{\frac{1}{n}} = z$

$$\therefore x^n + y^n = z^n$$

কিন্তু ফারমেট কেন যে এটা হয় না বলেছেন, সেটা বুঝতে পারছি না।

অমল চক্রবর্তী

প্রঃ ২। কোন একটি পদার্থকে যদি আলোর গতিবেগে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পদার্থটির ভর বা ওজনের কোনরূপ পরিবর্তন হইবে কি না এবং পরিবর্তন যদি হয়, তবে উহার কারণ কি ?

পীযূষকান্তি সরকার

প্রঃ ৩। (ক) উত্তর আকাশে যেরূপ ধ্রুবতারা আকাশে স্থির হইয়া থাকে, স্থান পরিবর্তন করে না, সেরূপ দক্ষিণ গোলার্ধ হইতেও কি দক্ষিণ আকাশে ঐরূপ কোন তারা দেখা যায় ?

(খ) সূর্য ও চন্দ্র অস্ত যাওয়ার সময় বড় দেখায় কেন ?

(গ) কোন্ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম বলেছিলেন, গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে ঘুরছে ? তিনি কি কোপার্নিকাসের পূর্ববর্তী ?

পরেশ অধিকারী

উঃ ১। ফারমেটের শেষ উপপাদ্যটি হলো, n-এর মান ২-এর বেশী পূর্ণসংখ্যা হলে এমন তিনটি সংখ্যা (পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংশ) x, y, z পাওয়া সম্ভব নয়, যা

$x^n + y^n = z^n$ সমীকরণটিকে সিদ্ধ করবে। প্রশ্নে দেওয়া সমাধানটি বাস্তব সংখ্যার (Real number) অমূলদ সংখ্যার (Irrational number) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ফারমেটের উপপাদ্যটি হলো পূর্ণসংখ্যা বা ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মূলদ সংখ্যার (Rational number) ক্ষেত্রে।

যুগলকান্তি রায়

উঃ ২। মূল প্রশ্নটির মধ্যে একটি ভুল কথা বলা হয়েছে। ভর (মাস) বা ওজন কিন্তু এক জিনিষ নয়। কোন বস্তুর উপর একটি বল (ফোর্স) প্রয়োগ করলে বস্তুটি বলের অনুপাত অনুযায়ী একটি গতিবেগ (অ্যাকসিলারেসন) লাভ করে। কোন বলের সাহায্যে একটি বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থার মাঝে পরিবর্তন ঘটাতে গেলে জাড্য-জনিত (ইনারসিয়াল) যে বাধা বস্তুটির কাছ থেকে পাওয়া যায়, তাই হলো তার জাড্য-জনিত ভর; আমরা একে শুধু ভরও বলতে পারি।

পৃথিবী আকর্ষণ-বলের দ্বারা প্রতিটি বস্তুকে আপন কেন্দ্রের দিকে টানছে। পায়ের তলার জমি বা অন্য কোন বাধা সেই বলকে প্রতিরোধ করছে। তাই পৃথিবীর অন্য প্রতিটি বস্তুর মত আমরা নিজেরাও ওজন অনুভব করি।

মনে কর, একটি কঠিন ও মসৃণ সমতলের উপর একটি লোহার ও একটি কাঠের বল রয়েছে। বল দুটাকে যদি আমরা উপরে তোলবার চেষ্টা করি, তাহলে কাঠের বলের তুলনায় লোহার বলের ক্ষেত্রে আমাদের বেশী বল (ফোর্স) প্রয়োগ করতে হবে—সোজা কথায় পরিশ্রমটা বেশী করতে হবে। আমরা বলবো, কাঠের বলটার চেয়ে লোহার বলটা বেশী ভারী বা তার ওজন বেশী। যদি বল দুটাকে সামনে ঠেলে দেবার চেষ্টা করা যায়, তবে দেখতে পাব ভারী বলটি অনেক বেশী বাধা দিচ্ছে এবং তাকে স্থানচ্যুত করতে ধাক্কাটা লাগাতে হচ্ছে বেশী জোরে। ঠেলতে গিয়ে বলগুলির কাছ থেকে এই যে বাধা পাওয়া যাচ্ছে, তার সঙ্গে তাদের ওজন বা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-বলের কোন সম্পর্কই নেই। লোহার বলটিকে ঠেলতে কাঠের বলের তুলনায় বেশী বেগ পেতে হচ্ছে, কারণ তার জাড্য-জনিত ভর অনেক বেশী।

মনে করা যাক, বল দুটাকে আমরা চাঁদের জমিতে নিয়ে গিয়ে আগের পরীক্ষাটা করবার চেষ্টা করছি। চাঁদের আকর্ষণ-বল পৃথিবীর আকর্ষণ-বলের $\frac{1}{6}$ ভাগ মাত্র। কাজেই লোহা ও কাঠের বলের ওজনটা $\frac{1}{6}$ ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে আমরা আগের চেয়ে অনেক সহজে লোহার বলটাকে চাঁদের জমি থেকে তুলে নিতে পারবো আর কাঠের বলটাকে আমাদের মনে হবে স্রেফ বেলুনের মত হাল্‌কা। কিন্তু আমরা যদি বল দুটাকে ঠেলে চাঁদের জমির উপর দিয়ে গড়িয়ে দিতে চাই, তাহলে দেখা যাবে,

পৃথিবীতে ঐ কাজটি করবার জন্যে আমাদের যে বল প্রয়োগ করতে হয়েছিল, চাঁদেও ঠিক একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে।

আগের পরীক্ষাগুলি থেকে আমরা যা বোঝলাম, তা হলো এই যে, বিভিন্ন বস্তুর ওজনের মাপ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তফাৎ দেখালেও তাদের ভর কিন্তু সব সময়ে একই থাকবে। তাহলে একটি বস্তুর মধ্যে কি পরিমাণ মালমশলা রয়েছে, তার পরিচয় দেবার জন্যে আমরা বস্তুটির ওজনের পরিবর্তে তার ভর কথাটি ব্যবহার করবো।

যে আলোচনাটা আমরা এতক্ষণ করলাম, আসল প্রশ্নের কথায় আসবার আগে তার প্রয়োজন ছিল। আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (স্পেশাল থিওরী অব রিলেটিভিটি) একটি সিদ্ধান্ত হলো এই যে, আলোর গতিবেগ (সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল) এক সর্বোচ্চ সীমা—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোন বস্তুর পক্ষে যে গতি আয়ত্ত করা কখনো সম্ভব নয়। যদি একটি বস্তুর গতি ক্রমাগত বেড়ে আলোর গতির কাছাকাছি এগিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তার ভরও বেড়ে চলতে থাকবে।

মনে করা যাক, ক ও খ দুটি বস্তু, যাদের পরস্পরের মধ্যে একটি আপেক্ষিক গতি রয়েছে। গতি বৃদ্ধির সঙ্গে ভরের বৃদ্ধির ঘটনাটি বোঝাবার জন্যে আইনষ্টাইন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে একটি গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করেছিলেন। সূত্রটি হলো $ম' = \frac{ম}{\sqrt{১-\frac{গ^২}{ঘ^২}}}$

যেখানে, ম´=খ-এর যে ভর ক-এর কাছে ধরা পড়ছে (অথবা খ-এর কাছে ক-এর ভর)

ম=স্থির অবস্থায় থাকাকালীন খ-এর ভর (অথবা ক-এর ভর)

গ=ক ও খ-এর মধ্যেকার আপেক্ষিক গতি

ঘ=আলোর গতি

উপরের সূত্রটি থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি, গ-এর পরিমাণ বেড়ে যখন ঘ-এর সমান হয়ে দাঁড়াবে তখন সূত্রটি হবে $ম' = \frac{ম}{\sqrt{১-১}} = \frac{ম}{\sqrt{০}}$ = এক অনন্ত বা অসীম সংখ্যা। অর্থাৎ আলোর বেগে গতিশীল একটি বস্তুর ভর অসীম হয়ে দাঁড়াবে।

একটি বস্তুর গতি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার ভরও বেড়ে চলবে, এ আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কেন না, বস্তুটি তার গতি বাড়াবার বিরুদ্ধে বেশী পরিমাণে বাধা দিতে থাকবে এবং সেই বাধা কাটিয়ে তার গতি বৃদ্ধির জন্যে ক্রমাগত আরো বেশী বলের প্রয়োগ করতে হবে। বস্তুটি যখন আলোর গতিতে ছুটছে,

তখন তার ভর অসীম হয়ে দাঁড়াচ্ছে অর্থাৎ তাকে গতিশীল করবার জন্যে এক অসীম পরিমাণ বল (যার পরিমাণ করা সম্ভব নয়) প্রয়োজন হয়ে পড়বে। অতএব আমাদের এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে হচ্ছে, কোন বস্তুর পক্ষেই আলোর সমান গতিতে ছুটে চলা সম্ভব নয়।

উঃ ৩। (ক) উত্তর গোলার্ধে পোলারিস বা মেরুতারার মত দক্ষিণ গোলার্ধে কোন মেরুতারা নেই। দক্ষিণ মেরুর সবচেয়ে কাছাকাছি যে তারাটি রয়েছে, তার নাম সিগ্‌মা অক্‌ট্যানিস্। এ হলো ৫½ মাত্রার একটি তারা, খালি চোখেই একে দেখা যায়। তারাটি দক্ষিণ মেরু থেকে এক ডিগ্রী তফাতে রয়েছে। (ধ্রুবতারা কিন্তু ঠিক উত্তর মেরুর উপর অবস্থান করছে)। ফলে পৃথিবীর আপন অক্ষের উপর ঘূর্ণনের সঙ্গে একে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তাকার পথে ঘুরতে দেখা যায়। এই তারাটি দক্ষিণ গোলার্ধে সমুদ্রযাত্রার সময় দিকনির্ণয়ের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।

(খ) তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যার সময় পুব আকাশে যে চাঁদ ওঠে এবং পশ্চিম আকাশে যে চাঁদ অস্ত যায়, তাকে পাঁচটা চাঁদের মত বড় বলে মনে হয়। কিন্তু গভীর রাতে সেই চাঁদই যখন মধ্য আকাশে পৌঁছায়, তখন তাকে অনেক ছোট দেখায়। দিগন্তের উপর উদয় বা অস্ত যাবার সময় সূর্যকেও তার মধ্যাহ্নের চেহারার তুলনায় অনেক বড় বলে মনে হয়। যন্ত্র দিয়ে মাপলে কিন্তু ধরা পড়বে যে, উদয় বা অস্তের সময় চাঁদ বা সূর্যের যে মাপ পাওয়া যাচ্ছে, মাঝ আকাশে তাদের উভয়ের মাপও অবিকল একই হবে।

তোমরা হয়তো ভাবছো, চাঁদ ও সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় তাদের আলো গভীর বায়ুর স্তর ভেদ করে আসে, তাতেই ওদের বড় দেখায়। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। প্রতিসরণের ফলে উদয়াস্তের চাঁদ ও সূর্যকে উত্তরে ও দক্ষিণে একটু লম্বা দেখায় মাত্র।

আসল ব্যাপারটা হলো সূর্য ও চাঁদকে যখন পশ্চিম আকাশের নীচে দিগন্তের উপর দেখা যায়, তখন আমরা পৃথিবীর গাছপালা, ঘরবাড়ী প্রভৃতির মাপের সঙ্গে তাদের মাপের তুলনা করতে পারি এবং তাদের একটা নির্দিষ্ট আকৃতিও কল্পনা করে ফেলি। কিন্তু সেই চাঁদ ও সূর্য যখন মধ্য আকাশে এসে হাজির হয়, তখন অকূল আকাশে কোন বস্তুর সঙ্গে তাদের মাপের তুলনা করা যায় না। তার জন্যেই তাদের ছোট দেখায়।

(গ) সৌরজগতের গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, এই রকমের একটি ধারণা ভারতীয় জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট প্রকাশ করেছিলেন বলে অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন। এই বিষয়ে খুব সঠিক ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। আর্যভট্ট কোপার্নিকাসের প্রায় এক হাজার বছর আগে জন্মেছিলেন।

শঙ্কর চক্রবর্তী

শোক-সংবাদ

ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রখ্যাত আবহতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১০ই অগাষ্ট তাঁর কলিকাতার বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৭৩ বছর হয়েছিল এবং তিনি স্ত্রী ও তিন পুত্র রেখে গেছেন।

ঢাকা জেলার (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) অন্তর্গত মালাপোদিয়া গ্রামে ১৮৯৩ সালের ২১শে এপ্রিল সুধাংশুকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবগঠিত বিজ্ঞান কলেজে তিনি ফলিত গণিতের সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন এবং ঐ একই বছরে ডাঃ গণেশ প্রসাদের উত্তরাধিকারীরূপে ফলিত গণিতের রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক হন। ১৯২২ সালে সার গিলবার্ট ওয়াকারের আহ্বানে
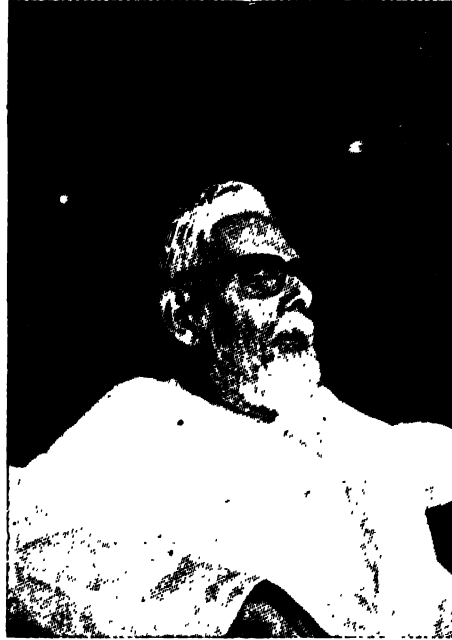
ডাঃ সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্র ও কর্মজীবন নানা কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। ১৯০৮ সালে ডুমকা জেলা স্কুল থেকে সরকারী বৃত্তি ও স্বর্ণপদকসহ তিনি প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এবং ১৯১৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে ফলিত গণিতে এম. এস-সি পরীক্ষায় তিনি ভারতীয় আবহতত্ত্ব বিভাগের কাজ গ্রহণ করেন এবং কোলাবা ও আলিবাগ মানমন্দিরের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩২, ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালে তিনি এই বিভাগের অস্থায়ী ডিরেক্টর জেনারেলরূপে কিছুকাল কাজ করেন এবং

১৯৪৪ সালে সার চার্লস নরম্যাণ্ডের উত্তরাধিকারী-রূপে এই পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। তিনিই হচ্ছেন আবহতত্ত্ব বিভাগের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর জেনারেল। ১৯৫০ সালে সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ (পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে তিনি এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলে তাঁকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপকের পদে নির্বাচিত করা হয়।

গবেষণার ক্ষেত্রে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহু উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। সার সি. ভি. রামনের প্রেরণায় তিনি প্রথমে বায়ু-তরঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল ১৯১৬ সালে 'ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি 'ব্যালিস্টিক ফোনোমিটার' নামে একটি নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক সমস্যা সম্পর্কে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন। 'থিওরী অব মাইক্রোসিজিম,' ভূকম্পন ও কৃত্রিম বারিপাত সংক্রান্ত তাঁর গবেষণাসমূহ সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্যে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা সম্মান লাভ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতির পদে বৃত হন। লণ্ডনের রাজকীয় আবহতাত্ত্বিক সমিতি, মার্কিন আবহতাত্ত্বিক সমিতি, মার্কিন ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক সমিতি, লণ্ডন গণিত সমিতি, মার্কিন গণিত সমিতি, ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ভারতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি প্রভৃতি স্বদেশ ও বিদেশের বহু বিদ্যোৎসাহী সভার তিনি সদস্য ছিলেন। কলিকাতা গণিত সমিতির সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল জড়িত ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ও সভাপতি-রূপে কাজ করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতি, ভারতীয় পরিসংখ্যান মন্দির, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেরও তিনি সদস্য ছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের আহ্বানে তিনি দ্বাদশ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার বিদেশে গমন করেন এবং ভারতের প্রতিনিধিরূপে বহু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদান করেন এবং কোন কোন সম্মেলনে সভাপতিত্বও করেন। তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। ভূমিকম্প সম্পর্কে বাংলা ভাষায় তাঁর তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর শবাধারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা গণিত সমিতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পিত হয়।

বিবিধ

মহাকাশ অভিযানে দশম জেমিনির বিস্ময়কর প্রয়াস

গ্রহান্তর অভিযানে মানুষকে মহাকাশে যখন বহু লক্ষ মাইল দূরান্তে পৌঁছুতে হবে, তখন একখানা মহাকাশযান দিয়ে তা সম্ভব হবে না, আর দু-একজন লোক দিয়েও হবে না। এজন্যে এক মহাকাশযান থেকে অন্য মহাকাশ-যানে লোক-লস্কর বা যন্ত্রপাতি স্থানান্তরিত করা অথবা ক্লান্ত, অসুস্থ মহাকাশচারীকে পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠাবার সর্বপ্রকার আকস্মিক সম্ভাব্যতার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ১৮ জুলাই জেমিনি-১০ মহাকাশযানকে মহাকাশে প্রেরণ করে। এই মহাকাশযানের চালক ছিলেন দু-জন মহাকাশচারী—জন ইয়ং এবং মাইকেল কলিন্স। এই যানকে মহাকাশে প্রেরণের ১০০ মিনিট আগে একটি এজিনা রকেটকে প্রেরণ করা হয়। রকেটটি যখন পৃথিবীর ১৭৩ মাইল উর্ধ্বে প্রদক্ষিণ করতে সুরু করে, তখন দশম জেমিনিকে উৎক্ষেপণ করা হয়। মহাকাশে এক লক্ষ মাইল ধাওয়া করে জেমিনি-১০ এজিনা রকেটের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তারপর রকেটের প্রচণ্ড ধাক্কায় ৪৭৪ মাইল উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবী পরিক্রমা করতে থাকে। ইতিপূর্বে সোভিয়েট মহাকাশযান ভূপৃষ্ঠের ৩১০ মাইল উর্ধ্বে পরিক্রমা করে রেকর্ড স্থাপন করেছিল। দশম জেমিনি সে রেকর্ড ভঙ্গ করে এখনকার মত সর্বোচ্চ রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে।

মহাকাশে দশম জেমিনির পরিক্রমার কর্মসূচী তিন দিনের জন্যে পরিকল্পিত হয়েছিল। পরিক্রমার শেষ পর্যায়ে মহাকাশচারী কলিন্স মহাকাশযান চালনার ভার প্রধান চালক ইয়ং-এর হাতে ছেড়ে দিয়ে মহাকাশযানের বাইরে এসে পৃথিবী ও গ্রহাদির আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। মহাকাশ-যানের ভিতরের বায়ুর চাপমাত্রা হ্রাস করবার সঙ্গে সঙ্গে কলিন্স মহাকাশযানে পদচারণা সুরু করেন। প্রধান চালক ইয়ং মহাকাশযানের কামরা থেকে যেমন বাতাস বের করতে থাকেন, তেমনি কলিন্সের পোষাকটি মিশ্রিত গ্যাসে ভর্তি হতে থাকে—শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার জন্যে। পৃথিবীতে বায়ুর যে পরিমাণ চাপে থাকতে তাঁরা অভ্যস্ত, ঠিক সেই পরিমাণ চাপ পোষাকের মধ্যে সৃষ্টি করবার জন্যে এই ব্যবস্থা করা হয়।

দশম জেমিনি মহাকাশযানে ৪২ পাউণ্ড ওজনের একটি বাক্স ছিল। কলিন্স ঐ বাক্সটি তাঁর বুকে বেঁধে নিয়ে মহাকাশে বেরিয়ে আসেন। ৫০ ফুট দীর্ঘ একটি রজ্জুর দ্বারা এটি মহাকাশযানের সঙ্গে বাঁধা ছিল। এই বাক্সটি নিয়ে কলিন্স তাঁর পাশের দরজাটি খুলে দাঁড়ান এবং মহাকাশযানের বাইরে বেরিয়ে আসেন। নিজেকে চালনার জন্যে তাঁর হাতে যেসব সাজসরঞ্জাম ছিল, সেগুলি নাইট্রোজেন গ্যাস জেটের সাহায্যে চালু করেন। তারই সাহায্যে তিনি ইচ্ছামত সামনে, পিছনে বা পাশে যেভাবে খুশী চলাফেরা করেন।

মহাকাশে ৫৫ মিনিট পদচারণার পর কলিন্স কিছু দূরে পরিক্রমারত অষ্টম এজিনা রকেটের (গত মার্চ মাস থেকে মহাকাশে পরিক্রমারত) কাছে যান এবং দ্বিতীয় এই এজিনার এক পাশে বাঁধা একটি ছোট বাক্স খুলে নেন। এটিতে মহাজাগতিক উল্কাকণা সংগৃহীত ছিল। দশম জেমিনি পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের পর এইসকল কণা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

মহাকাশে স্বাধীনভাবে পরিক্রমারত কোন যানের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ সাধনের ঘটনা এই প্রথম সম্পন্ন হলো। এদিক দিয়ে দশম জেমিনি মহাকাশ অভিযানে একটি নতুন দিক উন্মুক্ত করেছে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র

সীমেন্স কোম্পানী নির্মিত এই ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি রয়েছে কলকাতার সাহা ইন্‌ষ্টিট্যুটের বায়োফিজিক্স বিভাগে। অতিক্ষুদ্র বস্তুকে এ যন্ত্রের সাহায্যে ১০ লক্ষ গুণ পর্যন্ত পরিবর্ধিত আকারে দেখতে পাওয়া যায়। ভাইরাস, রক্তের হিমোগ্লোবিন, প্রজনন-কোষের অন্যতম পদার্থ DNA প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণায় যন্ত্রটি গত দশ বছর ধরে বিজ্ঞানীদের সহায়তা করছে।

উপরের চিত্রটির বাঁদিকের কোণে রয়েছে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে গৃহীত ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের আলোকচিত্র (পরিবর্ধনের মাত্রা – ৪০,০০০)।

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

উনবিংশ বর্ষ | অক্টোবর, ১৯৬৬ | দশম সংখ্যা

নিবেদন

সরল ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে বিজ্ঞানানুরাগী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে বিগত প্রায় উনিশ বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক এই মাসিক পত্রিকাখানি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। প্রথম দিকে পত্রিকাটির প্রচার পরিষদের সদস্য ও কিছু সংখ্যক গ্রাহকবর্গের মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ থাকিলেও সম্প্রতি কিছু কাল যাবৎ ইহার প্রচার-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। প্রচার-সংখ্যার তুলনায় পত্রিকাটির পাঠক-সংখ্যা যে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, নানাভাবে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মন্থর গতিতে হইলেও বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ যে ক্রমশঃ প্রশস্ততর হইতেছে, ইহা হইতে তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই কারণেই আমাদের পাঠক-পাঠিকা এবং লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ বর্ধনের নিমিত্ত আমরা শারদীয় সংখ্যা নামে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশে অনুপ্রাণিত হইয়াছি।

এই সংখ্যাটিতে লিখিয়াছেন — জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, ডাঃ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীগণ। আমাদের দেশের মানুষ আজ যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে জানিতে সর্বাধিক উৎসুক, প্রধানতঃ সেই সকল বিষয় সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী এই সংখ্যাটিতে স্থান পাইয়াছে। গ্রহান্তরে জীবের অস্তিত্ব, চাঁদ, রকেট, আয়নমণ্ডল, কম্পিউটার, কৃত্রিম তন্তু, অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রভৃতি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধাদি ছাড়াও কিশোর বিজ্ঞানীদের জন্য আছে—করে দেখ, জেনে রাখ, প্রশ্ন ও উত্তর, ধাঁধা প্রভৃতি বিভিন্ন উপকরণ। অনেক কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই বিশেষ সংখ্যাটি পাঠক-পাঠিকাদের কথঞ্চিৎ আনন্দ দানে সক্ষম হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পুরনো দিনের স্মৃতি

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

গত সোমবার (২৯শে অগাষ্ট) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের কুটীতে হাজির হতে হয়েছিল। সেখানে দেখি ডাঃ চাটার্জী বৃষ্টির জল ধরে নিয়মমত পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন—বললেন কয়েক বছর ধরেই এ-কাজ চলছে। আকাশ ধুয়ে নানা জাতের জড়কণা বৃষ্টির জলের সঙ্গে নেমে আসে। বাড়ীর ছাদে বা ময়দানে খোলা জায়গায় নানা আধারে বৃষ্টির জল ধরা হয়। তেজস্ক্রিয় কণাগুলির খবর তাদের বিকিরণ-বৈচিত্র্য পরীক্ষা করলে পাওয়া যায়।

চীনা জুজুর ভয়ে আমরা আজকাল সন্ত্রস্ত। কাগজে পড়ছি, তারা গত কয়েক মাসের মধ্যে ২।৩টি অ্যাটম-বোমা ফাটিয়েছে। তাই চাটার্জিকে জিজ্ঞাসা করলাম—প্রত্যেক বিস্ফোরণের পরে তেজস্ক্রিয় রেণুর ভারে উচ্চাকাশ তো বহুদিন দূষিত থাকবার কথা! উত্তুরে হাওয়ার প্রবাহে ভারতের আকাশে সেগুলি ছড়িয়ে পড়বেই ও শেষে বৃষ্টির জলের সঙ্গে নেমে আসবে নিশ্চয় নানা জায়গায়। যাদবপুরে পরীক্ষা করে বোমার মশলার বিষয় কিছু খবর কি পাওয়া গেছে? চাটার্জী বললেন—বিস্ফোরণের পর ইউরেনিয়ামের সমস্থানিক U-২৩৫ এখানকার বৃষ্টির জলে ধরা পড়েছে; কাজেই U-২৩৫ প্রচুর পরিমাণে চীনা-বোমাতে থাকবার কথা। সাধারণ ইউরেনিয়ামের সঙ্গে মেশানো থাকে U-২৩৫ খুব অল্প পরিমাণেই। চীনদেশে শুনেছি ইউরেনিয়ামের আকর আছে নানাস্থানে—তবে প্রভূত পরিশ্রম ও উন্নত বিজ্ঞানের প্রক্রিয়াগুলি নিপুণভাবে ও যথাযথ খাটিয়েই U-২৩৫ প্রচুর পরিমাণে নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়েছে। এর দৌলতে অ্যাটম-বোমা তৈরি সম্ভব হয়েছে চীনদেশে এ-বছর।

* * *

নানা কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম। প্রায় ২৪ বছর আগের এক সপ্তাহের কথা মনে জেগে উঠলো।

* * *

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পুরাদমে চলছে। জাপানীরা এগিয়ে আসছে, সিঙ্গাপুর ও বর্মা দখল করেছে। ওদিকে চীনদেশেরও অনেকটা তারা কয়েক বছর অধিকার করে বসে রয়েছে। চ্যাং-কাই-শেক আশ্রয় নিয়েছেন দক্ষিণ চীনের পার্বত্য অঞ্চলে, পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসছে চুং-কিং বিশ্ববিদ্যালয়—বোমার অভিযান থেকে আত্মরক্ষা করবার তাগিদে।

তখন চীনদেশের দারুণ দুর্দিন। খাবার দুষ্প্রাপ্য আবার রোগের প্রতিষেধক সাধারণ কোন ঔষধ মেলে না গ্রামদেশে, প্রায় সবই তখন বিদেশ থেকে আমদানী করতো চীনারা। তা ছাড়া সেখানে গরম কাপড়চোপড়েরও অত্যন্ত অভাব। কালোবাজারীরা অগ্নিমূল্যে গ্রামের লোকের কাছে বিক্রী করছে—এসব অবশ্য মিত্রদেশ থেকে করুণাবশে যা সাধারণের জন্যে পাঠাতো, তার সবটা আত্মসাৎ করেই! ঢাকা থেকে আমেরিকান বিমান-বিহারীরা হরদম চুং কিং যাতায়াত করতো—বলতো সেখানে ছেঁড়া মোজা ও গেঞ্জী বিক্রী করে বেশ পয়সা করা যায়।

সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছি। আমার এক ছাত্র Sulphonamide নিয়ে নানা গবেষণায় ব্যস্ত। ওদিকে জৈব-

রসায়নের গবেষণা-কেন্দ্রে ডাঃ কালীপদ বসু নানাপ্রকার চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের বিশ্লেষণ করে চলেছেন। তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে স্নেহ-কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের শতকরা কয়ভাগ করে বর্তমান রয়েছে, তা নিরূপণ করে তালিকা করছেন। তার মধ্যে Vitamin (খাদ্যপ্রাণ) সমূহের অবস্থানের খবরও থাকছে ও তাদের পরিমাণ নিরূপণের প্রয়াসও চলেছে। ঢাকার খুব কাছেই আমেরিকান বোমারু বিমানের ঘাঁটি। ঢাকা সহরের মধ্যে আমেরিকান, ইংরেজ ও ভারতীয় পল্টনের নানা হাসপাতাল বসেছে। নানাদেশের ডাক্তার ও বিজ্ঞানী এসে ঢাকায় রয়েছেন। তাঁরা মধ্যে মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান মন্দিরে বেড়াতে আসেন ও আমরাও তাঁদের কাছ থেকে নানা খবর পাই।

* * *

সেই সময় খবর এলো চীন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জৈব-রসায়নে অভিজ্ঞ পর্যটক এসেছেন ভারত ভ্রমণে। ভারতে নানাস্থানে কিভাবে নানা খাদ্যপ্রাণসমন্বিত বটিকা তৈরি হচ্ছে দেখতে। দক্ষিণ ভারতে টুটিকোরিনে দেখলেন, মাছের তেল থেকে Vitamin D-এর সংগ্রহ আবার আফ্রিকা দেশের লাল তালের তেল থেকে Vitamin-এর সংগ্রহ। Vitamin-এর অভাবে চীনা শিশুদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে, তারই প্রতিকারের চেষ্টায় এই পর্যটন। রাজপুতানা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, দিল্লী বেড়ানো শেষ হলো, সব শেষে পূর্বপ্রান্তের সহর ঢাকায় তিনি উপস্থিত হলেন। শ্রীকালীপদ বসুর খাদ্যবিশ্লেষণ ও সংগ্রহের তালিকার কথা তিনি শুনেছিলেন। নিজেরও ওই বিষয়ে কিছু কাজ করা ছিল তাঁর, তাই কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছে—কিভাবে ভারতে ওই প্রকারের অনুসন্ধান চালানো হয়।

* * *

চীনা বিজ্ঞানীকে সাদরে অভ্যর্থনা করলাম আমরা। ঢাকা-হল অফিসের একটি কামরা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়ে তাঁর বাসের উপযোগী করে দেওয়া হলো। এক সপ্তাহেরও বেশী দিন তিনি আমাদের সঙ্গে কাটালেন।

নানা প্রসঙ্গের আলোচনা হচ্ছে। নিজে কিভাবে চীনদেশের উদ্ভিজ্জের মধ্যে Vitamin B, ও C-এর সন্ধান পেয়েছেন, তার কথা। চীনদেশে রসায়নশিল্পের তখন সবে পত্তন হয়েছে। গন্ধকাম্লের কারখানা মাত্র কয়েক জায়গায় গড়ে উঠেছে, অন্যান্য দরকারী জিনিষ ও ঔষধপত্র তখনও আসছে বিদেশ থেকে। পুরনো কেতায় জীবনযাত্রা চলেছে সাধারণ চৈনিকের, যদিও কয়েক বছর আগেই সুন-য়ত-সে-ন বিপ্লবের বন্যায় মাঞ্চু সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহজেই Sulphonamide ও তার নানা যৌগিকের প্রস্তুতি চলেছে শুনে প্রথমে তাঁর বিশ্বাস হলো না। আমাদের নিমন্ত্রণে এসে স্বচক্ষে প্রক্রিয়ার সব ধাপগুলিই ছাত্রকে অতিক্রম করে শুদ্ধবস্তুতে উপনীত হতে দেখলেন। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানদানের পরিবর্তে আমরা চাইলাম তাঁর কাছে সয়াবিন থেকে কিভাবে চীনদেশে দুধ তৈরি হয়, তার সন্ধান। কাশ্মীর থেকে আনা অনেক সয়াবিন শ্রীমান কালিপদ যত্ন করে রেখেছিলেন। তাথেকে যথানিয়মে দুধ তৈরি হলো, দুধ থেকে ছানা। চীনা হালুইকরেরা নাকি নানা মিষ্টান্ন এই ছানা থেকেই তৈরি করে (আজকাল সন্দেশ নিয়ন্ত্রণের কল্যাণে এই সব বিদ্যা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝছি।)

বাংলায় দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। কঙ্কালসার ভিখারীরা দ্বারে দ্বারে ফেন ভিক্ষা করছে,

রাস্তায় বের হয়ে ২।৪টা মৃতদেহ দেখা প্রাত্যহিক ব্যাপার। সহরে লঙ্গরখানায় বাজরার খিচুড়ী পরিবেশন হচ্ছে। আমরা চেষ্টা করছি, গাছের পাতা থেকে বীরেশ গুহের ঘাসের চপের সমতুল্য কোন রুচিকর বস্তু পয়দা করা সম্ভব কিনা। চীনা বিজ্ঞানী আমার লেবরেটরীর অফিস ঘরে মধ্যে মধ্যে বসেন। সবুজ ঘাসে ভরা পাশের ময়দানে ২।৪টা গরু সব সময় চরে বেড়াচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে।

কথা ওঠে দুর্ভিক্ষের—চীনা বিজ্ঞানী বলেন—আমি বুঝতেই পারি না, তোমাদের! চোখের সামনে দেখছি এদেশে গরু, ঘোড়া, ছাগল অফুরন্ত রয়েছে, তবু এখানে লোকে অনাহারে মরে কেন? আমাদের দেশে লোকেরা দরকার পড়লে হিংস্র বন্যজন্তু পর্যন্ত মেরে খেয়ে ফেলে। ফলে শেষ অবধি দাঁড়িয়েছে চীনে তোমাদের দেশের তুলনায় গোধন অনেক কম, সেখানে প্রসূতির দুধ না পেলে সদ্যোজাতদের সয়াবিনের দুধের উপর নির্ভর করতে হয়। অবশ্য প্রোটিন ইত্যাদি বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাওয়া যায়, তবে অবশ্য দরকারী Calcium এতে কম আছে—তা চীনারা মুরগীর ডিমের খোলা গুঁড়িয়ে দুধে মিশিয়ে সে ঘাটতি পূরণ করে। যে দিন চীনা বিজ্ঞানী সয়াবিনের দুধ থেকে ছানা বের করেছিলেন, আমি একটু জেদ ও বড়াই করেই বাড়ীতে রান্না করে খেয়েছিলাম সে ছানা; ফলে সে রাত্রি অনিদ্রা ও অজীর্ণতায় কেটেছিল। তাই চীনা ছেলে-মেয়েরা সর্বভুক মনে হলো। জীবনযাত্রার প্রতিযোগিতায় তাদের সঙ্গে আমাদের ঠোকাঠুকি লাগলে অহিংসাপরায়ণ ভারতীয়দের তারা অনায়াসে হজম করবে, ভয় হলো মনে মনে।

* * *

দক্ষিণ চীনে বেরিবেরি রোগ নাকি প্রাচীনকাল থেকেই বাসা বেঁধে স্থিতিশীল। তবে সে দেশের প্রাচীনপন্থী চিকিৎসকেরা এই রোগের জন্যে একটা ফুলের বীজ ব্যবহার করে উপকার পেতেন। Plantagenus জাতির গাছ, তার হলদে ফুল, অযত্নে সবত্রই হচ্ছে। চীনা ভাষায় নাম তর্জমা করলে দাঁড়াবে 'গাড়ীর সামনে হলুদ রং'; অর্থাৎ প্রতি গ্রামের প্রান্তরে এই গাছ অজস্র জন্মায়। আমাদের চীনা বিজ্ঞানী নিজে পরীক্ষা করে দেখেছেন, এর মধ্যে সত্য সত্যই Vitamin B_1 বিদ্যমান রয়েছে। এই ঔষধই এখন বেরিবেরির প্রতিষেধক বলে ভারতে ও সর্বত্র চলছে। তাছাড়া পাতাঝরা গোলাপের বোঁটাতে তিনি দেখেছেন Vitamin C প্রচুর বর্তমান। ভারতের প্রাচীন প্রথা কবিরাজী মতে চিকিৎসার কথা তুলতে তিনি বললেন, আমাদের দেশেও পুরনো পদ্ধতি অনুসারে চিকিৎসা চলছে। রহস্যচ্ছলে বললেন—অনেক সময় সরকারী হাসপাতালে আরোগ্যের সংখ্যা-মান যথাসম্ভব উচ্চ ধাপে রাখতে যে সব রোগী আমরা সারাতে পারবো না বুঝি, তাদের অনেককে স্তোকবাক্য বলে বাড়ী পাঠিয়ে দিই। তবে সময় সময় এমনও হয় যে, কয়েক মাস বা বছর বাদে তাদের মধ্যে কেউ বা আপাতদৃষ্টিতে নীরোগ অবস্থায় চলাফেরা করছে দেখা যায়। আমরা আশ্চর্য হয়ে খবর নিলে দেখা যায়, অনেক সময়েই দেশী বৈদ্যের

চিকিৎসায় তারা বেশী সুফল পেয়েছে। এই দেশেও যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়, তাও আমাকে বলতে হবো।

*　　　*　　　*

প্রথম প্রথম নবাগত চীনা আগন্তুকের ইংরেজী বুঝতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। শেষ অবধি কান তৈরি হলো। আলাপ জমলো—হলো ব্যক্তিগত নানা সুখ-দুঃখের কথা। বন্ধুবর উত্তর চীনের মুকদেন সহরের বাসিন্দা। জাপানীরা দেশ দখল করাতে সহর ছেড়ে চলে এসেছেন। যুদ্ধরত চীন-শক্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, সাধ্যমত তার সেবা করছেন। চুং কিং-এ চলে এসেছেন। চীনারা বিজয়ী জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে ত্রিশ বছর কেটে গেছে, দেশ ছেড়ে দক্ষিণের পার্বত্য ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছেন, তবু আশা দৃঢ় হয়ে আছে মনে—একদিন জাপানীদের তাড়িয়ে মাতৃভূমিতে ফিরে যাবেন।

*　　　*　　　*

সপ্তাহখানেক বাদেই বিজ্ঞানী ঢাকা ছাড়লেন—তারপর আর খবর নেই। সে সময় মনে হয়েছিল চীনারা আমাদের নিকট জ্ঞাতি, (হিন্দী-চিনী ভাই ভাই।)। দুই জাতিই বিরাট প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী ও হয়তো প্রাচীনপন্থী, তবে অগ্রগতিতে চীনারা আমাদের চেয়ে একটু পিছিয়ে রয়েছে। আজ ২৪ বছর বাদে মনে হচ্ছে, সত্যই চীনা বিজ্ঞানীর প্রাণের আকাঙ্খা পূর্ণ হয়েছে। মুকদেন উদ্ধার হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবহেলা করে দ্রুতগতিতে চলেছে দুর্ধর্ষ এই জাত। প্রাচীন হলেও সে আজ বিদ্রোহী নবীন। সুবিধাবাদী সে, তাই পাতানো ভ্রাতৃপ্রেমের মোহ কাটিয়েছে। চ্যাং অবশ্য দেশ ছেড়ে এখন ফরমোজায় আশ্রয় নিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট মাও চলেছেন বিজয় গর্বে, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল নদী সন্তরণে পার হওয়া নবযুগের চীনজাতের দুর্জয় সাহসের প্রতীক।

*　　　*　　　*

শত্রুকে অশ্রদ্ধা করলেই বিজয়লক্ষ্মী অঙ্কগত হন না। আমাদের ২৪ বছরের অগ্রগতির ছবি চীনের সঙ্গে তুলনা করে গর্ব করবার মত কিছু খুঁজে পাই না।

এর জন্যে ভারতের বিজ্ঞানীরা কতখানি দায়ী?

গণতন্ত্র এবং ভারতীয় সমাজ

নির্মলকুমার বসু

একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা গণতান্ত্রিক উন্নতির উপযোগী নহে। জাতিভেদ প্রথা এবং একান্নবর্তী পরিবারের ন্যায় সংগঠনগুলি কর্তৃপক্ষের প্রতি আজ্ঞানুবর্তিতা এবং অধীনতার মনোভাব সৃষ্টি করে। কর্ম এবং ধর্মের ঐতিহ্যও এই আজ্ঞানুবর্তিতার ভাবকে বলিষ্ঠ করিতে সাহায্য করে এবং প্রচলিত অবস্থা সম্বন্ধে তাহাদের মনে কোন অসন্তোষ জাগায় না। তাই কিছুসংখ্যক সমাজতত্ত্ববাদী যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যতদিন ভারতবর্ষ ঐ সকল সংগঠন ও ধারণার অধীনে থাকিবে, ততদিন তথায় গণতন্ত্র গঠন করা সম্ভব হইবে না। ন্যায়শাস্ত্রের কূটতর্কের পথে না যাইয়াও একজন সমাজ-বিজ্ঞানীর পক্ষে পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করা অধিকতর সহজ মনে হয়। এমন কি, যখন জাতিভেদ প্রথা এবং একান্নবর্তী পরিবার প্রথার রীতিমত রাজত্ব ছিল, তখনও কি কেহ ইহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন নাই? অতীতে ঐতিহ্যবাদের বিরুদ্ধেও কি কোন দিন বিপ্লব হয় নাই? একদা কি বুদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি অধীনতা প্রদর্শন অপেক্ষা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কর্মবাদের প্রবর্তন করেন নাই?

এই সকল প্রশ্ন মনে লইয়া ভারতীয় নৃতত্ত্ব সমীক্ষা জাতিভেদ প্রথা এবং অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে দুইটি গবেষণার কার্য আরম্ভ করিয়াছে। সম্প্রতি এই দুই সংগঠনে কি কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সমীক্ষা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান সুরু করিয়াছে।

ওড়িশায় জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কার্য শেষ হইয়াছে এবং পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় তাহার কাছাকাছি অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। কলিকাতা ৮০টি মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক ওয়ার্ডে বহুসংখ্যক স্থানীয় স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান আছে। গত বিশ বৎসর বা তাহারও অধিক সময়ে ইহাদের মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য এগুলিকেও সমীক্ষায় গবেষণার বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে যে ফলাফল পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরিচয় দেওয়া হইল।

ওড়িশায় জাতিভেদ প্রথা

ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বিভিন্ন জাতির নিয়ন্ত্রণকারী পঞ্চায়ৎগুলি ১৯৪৭ সালের অর্থাৎ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দশ বৎসরেরও পূর্বে প্রায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যেক জাতির, বিশেষতঃ যাহারা কারিগর অথবা তথাকথিত 'নীচু' শ্রেণীভুক্ত, তাহাদের প্রত্যেকের বংশানুক্রমে প্রধান ব্যক্তি এবং স্থানীয় পঞ্চায়ৎ ছিল। ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি এই পঞ্চায়ৎ-গুলির শাসনের এলাকাভুক্ত ছিল। কিন্তু এই সকল পঞ্চায়ৎ এবং বংশানুক্রমে প্রধান ব্যক্তিদের প্রভাব স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। দরিদ্র গ্রাম্যজাতির মধ্যে ব্যতীত জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে জাতি পঞ্চায়ৎ-গুলির কার্য ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। উদাহরণ-স্বরূপ, ভোই নামক কৃষকজাতির পঞ্চায়ৎগুলি শুধুমাত্র তাহাদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিত। বিবাহ, চুক্তিভঙ্গ ইত্যাদি তখনও পঞ্চায়ৎগুলির কার্যের অধিকার-

ভুক্ত ছিল। কিন্তু শহরবাসী সমৃদ্ধিশালী তেলী অর্থাৎ তৈল ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েৎগুলির প্রভাব অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার তাহাদের মধ্যে একটি নূতন রাজনৈতিক চেতনা বহন করিয়া আনিল, তখন জনসাধারণ তাহাদের জাতিপঞ্চায়েৎগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জাতির সংখ্যাধিক্য ঘটিলে নির্বাচনের মাধ্যমে সেই জাতির শক্তিলাভের সম্ভাবনা দেখা দেয়। যখন জনসাধারণকে ভোটের মাধ্যমে তাহাদের রাজনৈতিক অধিকারগুলি ব্যবহারের জন্য হঠাৎ আহ্বান করা হইল, তখন দেখা গেল—জাতিভেদকে অতিক্রম করিয়া নূতন বৃত্তি অনুযায়ী শ্রমিক সঙ্ঘগুলি (ট্রেড ইউনিয়ন) বা অন্য নানাবিধ প্রতিষ্ঠানগুলি দেশে সম্যকভাবে গড়িয়া উঠে নাই। তখন মানুষ নূতন প্রতিষ্ঠানের অভাবে জাতিপঞ্চায়তের ন্যায় পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকেই আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল।

যদিও জাতিপঞ্চায়েৎগুলিতে ঐভাবে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করা হইল, তথাপি রাজনীতির প্রয়োজনে এবং সমাজ সংস্কারের দাবীতে এই পঞ্চায়েৎগুলির গঠন ও কর্তব্যে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল। পঞ্চায়েৎগুলি পূর্বে বংশানুক্রমিক প্রধানদের অধীন ছিল, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সেগুলিতেও গণতন্ত্র অনুসারে নেতা নির্বাচনের ব্যবস্থা হইল। শুধু নির্বাচন প্রথাতেই যে পরিবর্তন ঘটিল তাহা নহে, পঞ্চায়েৎগুলির বার্ষিক অধিবেশন এখন হইতে কংগ্রেসের মিটিং-এর ধরণে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই ভাবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যে গণতন্ত্রের বিস্তার ঘটিতেছে, তাহা সমাজের নিম্নতম প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

জাতিভেদ প্রথার মধ্যে আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয়, যাহা স্বাধীনতার পরে আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্বে যখন জাতিপঞ্চায়েৎগুলি গ্রাম্যস্তরে কার্য করিত, তখন স্থানীয়, ব্যক্তিগত এবং সাংসারিক সমস্যা লইয়াই তাহাদের বিচারাদি কার্য প্রধানতঃ চালিত হইত। এই বিষয়ে স্বাধীনতা লাভের পর একটি বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। আজকাল বিভিন্ন জাতিপঞ্চায়েৎগুলি যে সকল দাবী করিতেছে, তাহা বিশেষভাবে নিজেদের জাতীয় আর্থিক বা সামাজিক স্বার্থের সহিত ততটা সম্পৃক্ত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তৈলিক বৈশ্যজাতি এরূপ দাবী করে না যে, তাহাদের ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত হউক। তৎপরিবর্তে তাহারা দাবী করে যে, রাষ্ট্র এই অবনত জাতিটিকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং নূতন নূতন সরকারী বৃত্তিতে চাকরীর সুযোগ দান করুক; অর্থাৎ তৈলিক জাতি সমশ্রেণীভুক্ত অপরাপর বহু জাতির মত একই ধরণের বহু দাবী করিতেছে। এই সকল দাবীর মধ্যে তাহাদের জাতীয় পূর্বতন বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে রক্ষা করিবার কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ভবিষ্যতে একই ধরণের অনেকগুলি নিপীড়িত জাতি হয়তো শেষে একত্রিত হইয়া সরকারের উপর একই দাবীর জন্য চাপ প্রয়োগ করিবে। ইহার ফলে বিভিন্ন বৃত্তির উপর নির্ভরশীল জাতিদের স্বাতন্ত্র্য অথবা বিশিষ্টতা উত্তরোত্তর লোপ পাইয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন পূর্বে তৈলিক বা তন্তুবায় বা গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতিগুলির মধ্যে বিবাহাদি ব্যাপারে যে সকল উপবিভাগ ছিল, সেই সকল ব্যাপারে জাতিগুলি নিজেদের আভ্যন্তরীণ ভেদকে মিটাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং জাতিসংগঠনগুলি আজ এক ধরণের সামাজিক সংস্কারে অধিকতর আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত বাংলাদেশে বহুবিধ সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা হইয়াছে। ইহার ফলে জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচারের উপযোগী সামাজিক ভিত্তি নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু অপরাপর রাজ্যে এই সংস্কার সম্পূর্ণভাবে হইবার পূর্বেই আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ ঘটিয়াছে। তাহার ফলে যে সকল রাজ্য বা সম্প্রদায় সংস্কারের ব্যাপারে একটু পিছাইয়া ছিল, তাহারা দ্রুত সেই বাকি কাজ সমাধা করিবার চেষ্টা করিতেছে। অন্যথা বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রতন্ত্রের সম্পূর্ণ সুযোগ হইতে তাহারা বঞ্চিত থাকিয়া যাইবে। ওড়িশা প্রভৃতির মত অপেক্ষাকৃত সংরক্ষণশীল সমাজে তাই জাতি-পঞ্চায়ৎগুলির মধ্যে পর্যন্ত দ্রুত সংস্কারের তাড়াহুড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন জাতির বিশিষ্টতা ও পার্থক্য উত্তরোত্তর মুছিয়া যাইতেছে।

বর্তমান যুগের দাবী এরূপে জাতিসংগঠনের মধ্যে এমন পরিবর্তনের স্রোত বহাইতে আরম্ভ করিয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের চাল-চলনে, চিন্তায়, বৃত্তিতে সংস্কৃতির মধ্যে এক সমতা আসিবার সম্ভাবনা স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে। ইহারই উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে ১৯৫৯ সালে কটক শহরে অনুষ্ঠিত তৈল-ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে অনুমোদিত কয়েকটি প্রস্তাবের নমুনা দিতেছি। তৈল-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য একটি সংশোধিত সংবিধান ঐ সময় গঠিত হইয়াছিল, তাহার একটি পূর্ণ বর্ণনা নৃতত্ত্ব সমীক্ষার একটি পুস্তিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। [Memoir No. 7. 1960 : Data on caste : Orissa.]

সংবিধান

১। প্রতিষ্ঠানটির নাম হইবে নিখিল উৎকল তৈলিকবৈশ্য মহাসভা।

২। প্রত্যেক জেলা হইতে ১০ জন সদস্য লইয়া একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত হইবে। ১৫০ জন সদস্য নির্বাচিত হইবে এবং প্রত্যেক জেলা হইতে প্রতিনিধিদের তালিকাভুক্ত করিবার চেষ্টা হইবে। স্থায়ী সমিতি হইতে ৩১ জন সদস্য লইয়া একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইবে।

৩। প্রতিষ্ঠানটির (মহাসভা) একজন সভাপতি ও উপ-সভাপতি থাকিবে। উপ-সভাপতি কোষাধ্যক্ষের কার্যও সম্পাদন করিবে। তদ্ভিন্ন ৩ জন সম্পাদক থাকিবে। কোন জেলা হইতে নিমন্ত্রণ পাইলে সেই জেলায় মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন বসিবে। স্থায়ী সমিতির বৈঠক বৎসরে অন্ততঃ দুইবার হইবে। কার্যনির্বাহক সমিতি বৎসরে চার বার বসিবে। কার্যনির্বাহক সমিতিতে অন্ততঃ ১১ জন সদস্য এবং স্থায়ী সমিতিতে অন্ততঃ ৫১ জন সদস্য উপস্থিত হইলে সেই বৈঠক সিদ্ধ হইবে।

৪। প্রতি জেলায় সেই জেলার সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়া জেলা সমিতি স্থাপিত হইবে। জেলা সমিতি কার্যনির্বাহক সমিতির নির্দেশমত প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রথম বৎসরে স্থায়ী সমিতি জেলা সমিতির মধ্যে ১০ জন সদস্যের নাম স্থির করিয়া দিবে। কার্যনির্বাহক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর মহাসভা ওড়িশার যে কোন প্রান্ত হইতে দুইজন চরিত্রবান পদস্থ বা কর্মকুশল ব্যক্তিকে সেই সমিতিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

ক্ষমতা এবং অধিকার

১। সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে উপ-সভাপতি এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে কোন নির্বাচিত সদস্য বৈঠকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সম্পাদকগণ নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কার্যের ভার বন্টন করিয়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। উপ-সভাপতি এবং

সম্পাদকগণ যাবতীয় অর্থ তৈলিকবৈশ্য মহাসভার নামে ব্যাঙ্কে জমা দিবেন।

২। প্রতি জেলায় জেলা সমিতির কার্যের জন্য স্বতন্ত্র অর্থভাণ্ডার গঠন করিতে হইবে। ইহার অর্ধেক জাতির উন্নতির জন্য জেলার মধ্যে ব্যবহৃত হইবে এবং অবশিষ্ট অংশ উপ-সভাপতি ও সম্পাদকগণ কর্তৃক ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইবে।

উদ্দেশ্য

১। বিভিন্ন জেলায় তৈলিকজাতির মধ্যে আচার-ব্যবহারের তারতম্য আছে। এমন কি এক জেলার মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চলে এরূপ প্রভেদ দেখা যায়। মহাসভা সর্বত্র আচার-ব্যবহারের মধ্যে সমতা আনিবার চেষ্টা করিবেন।

২। একটি পত্রিকা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে স্বজাতির ইতিহাস এবং সংস্কারের যাবতীয় প্রচেষ্টার সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হইবে। এই ইতিহাস যাহাতে সকলের গোচরে আসে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩। ২৪শে মে, ১৯৫৯ তারিখে পুরী শহরে মহাসভার যে অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনে উক্ত সংবিধান সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইহার রদ-বদল করিবার অধিকার সাধারণ সভার হাতে ন্যস্ত আছে।

সভাপতির দ্বারা স্বাক্ষরিত — রঘুনাথ সাহুর (সরোদা, গঞ্জাম) দ্বারা প্রস্তাবিত
নিত্যানন্দ চৌধুরীর (বনতলা, অঙ্গুল) দ্বারা সমর্থিত

শিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাব

১ (ক) কয়েকজনকে বাদ দিলে জাতির অধিকাংশ সভ্যই অত্যন্ত দরিদ্র। তাহারা পুত্রকন্যার শিক্ষার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করে। ইহার জন্য একটি তহবিল গঠন করিয়া এবং বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষায় সহায়তা করিবার চেষ্টা হউক।

১ (খ) জাতির অধিকারীগণ স্থায়ী এলাকা হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা ব্যাঙ্কে জমা দিবেন এবং সেই সংবাদ মহাসভার সম্পাদকের গোচরে আনিবেন।

১ (গ) জনসাধারণের নিকট হইতে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য চাঁদা তুলিয়া ব্যাঙ্কে একটি তহবিল গঠন করিতে হইবে।

১ (ঘ) প্রত্যেক প্রতিনিধি স্বীয় এলাকায় জাতির লোকগণনা করিয়া তন্মধ্যে কতজন ছাত্র স্কুল বা কলেজে পাঠ করিতেছে, তাহা নির্ধারণ করিবেন। এক মাসের মধ্যে এই সংবাদ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১ (ঙ) সরকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমাদের জাতির অনেকেই শিক্ষার মূল্য বোঝেন না এবং সন্তানদের শিক্ষিত করিবার চেষ্টাও করেন না। জেলা সমিতির কর্মচারীগণ জাতির প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষালাভের জন্য উৎসাহ প্রদান করিবেন।

১ (চ) জাতির মধ্যে যে সকল বালিকা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। বিভিন্ন কর্মচারীবৃন্দ এবং সমাজের কল্যাণকামী সেবকগণ স্বজাতির মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ প্রদান করিবেন। প্রতি জেলায় অন্ততঃ একটি বা দুইটি বৃত্তি বিদ্যালয়ে পাঠরতা বালিকাদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা উচিত।

রঘুনাথ সাহুর (সরোদা, গঞ্জাম)
দ্বারা প্রস্তাবিত
নিত্যানন্দ চৌধুরীর (বনতলা, অঙ্গুল)
দ্বারা সমর্থিত

বিবাহ সম্পর্কিত প্রস্তাব

২ (ক) তৈলিক জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

২ (খ) জগন্নাথের মহাপ্রসাদ স্পর্শ করিয়া নির্বন্ধ বা প্রতিজ্ঞা ব্যতীত কোন বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নহে।

২ (গ) বর এবং কন্যাপক্ষের কেহই কোন প্রকার পণ দাবী করিতে পারিবে না। যদি কেহ সেরূপ দাবী করে, তবে তাহাকে জাতিচ্যুত করা হইবে।

২ (ঘ) বাজি পোড়ানো, বহু খরচ করিয়া আলোকসজ্জা বা মিছিল, আত্মীয়-স্বজনকে উপহার দান প্রভৃতি অনাবশ্যক বিবাহের ব্যয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইল।

২ (ঙ) পাত্র ২১ বৎসর এবং কন্যা ১৫ বৎসরের কম হইলে বিবাহ দেওয়া হইবে না।

পানুচরণ সাহুর
দ্বারা প্রস্তাবিত
নারায়ণবন্ধু সাহুর
দ্বারা সমর্থিত

কলিকাতা

এখন আমরা কলিকাতায় বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ভারতবর্ষের নৃতত্ত্ব সমীক্ষা ১৯৬১-৬২ সালে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। কলিকাতায় মোট ৮০টি পল্লী আছে। ইহার প্রায় প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন প্রকারের ছোট বড় বহু প্রতিষ্ঠান বর্তমান। গ্রন্থাগার, থিয়েটার অথবা সঙ্গীতচর্চার জন্য ক্লাব, বিদ্যালয়, শরীরচর্চার নানাবিধ প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, অনাথ ভাণ্ডার, পূজা পরিচালনা সমিতি প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১১০০-এর অধিক।

পূর্বে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মূলে কোন ধনী জমিদার অথবা আইন ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার বা অধ্যাপক বর্তমান ছিলেন। ইঁহারা কিছু অর্থ সাহায্য বা ব্যক্তিগত পরামর্শ দিয়া প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় সহায়তা করিতেন। বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা অবশ্য নির্বাচিত সভ্যবৃন্দের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। কোন কোন ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি বৎসরের পর বৎসর সম্পাদক থাকিয়া যাইতেন; কারণ একজন দায়িত্ব লইয়া কার্য করিতে আরম্ভ করিলে পরিচালনা সমিতির অপর সভ্যগণ তাঁহারই উপরে সকল কার্যের ভার ন্যস্ত করেন।

দেশের স্বাধীনতা লাভের পর জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। খাজনা, ট্যাক্স বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কল্যাণকর রাষ্ট্র সমাজকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান-গুলিকে উত্তরোত্তর অর্থ সাহায্য প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফলে বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইতেছে।

এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যে সকল শিক্ষা বা সমাজসেবার প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত, সেগুলির পরিচালনায় বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তাহারা পূর্বের মতই পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানতঃ স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ অথবা পৌরসভা আদির সমর্থনের উপরেই নির্ভর করে, তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। জমিদার, শিক্ষক বা আইনজীবীদের পরিবর্তে যাঁহারা

নেতার স্থান গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কর্মী। পৌরসভা, বিদ্যালয় বা গ্রন্থাগার আদির পরিচালনার ভার গ্রহণের জন্য কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, কমিউনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য বামপন্থী দলের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা দেখা যায়। প্রত্যেকেই স্থায়ী দলের সমর্থকদের নিকটে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিবেন বলিয়া মনে করেন। সরকারও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া বিভিন্ন মাত্রায় প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তা করিতেছেন। ইহার ফলে বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা সমিতির নির্বাচন দেশের সাধারণ নির্বাচনের মত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। প্রতি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠানগুলিকে আয়ত্তে রাখিয়া স্থায়ী ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে।

ইহার ফলে বহু প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিচালনায় ইতরবিশেষ ঘটিতেছে। মূল উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত না হইলেও নূতন প্রভাবের ফলে অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মে শিথিলতা দেখা দিয়াছে।

উপসংহার

উপরিউক্ত দুইটি উদাহরণ বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ওড়িশার গ্রামেই হউক অথবা কলিকাতার মত বিশাল শহরেই হউক, ভারতীয় সমাজে গণতন্ত্রের প্রসারে কোন বাধা নাই। যদিও কেহ কেহ মনে করেন যে, ভারতীয় সমাজব্যবস্থা গণতন্ত্রের অনুকূল নহে, ইহাকে সমীচীন বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃত গণতন্ত্রকে ক্রিয়াশীল করিবার জন্য সমাজে যে জাতীয় শিক্ষা এবং সংগঠনের প্রয়োজন আছে, তাহা পর্যাপ্ত পরিমাণে এখনও সাধিত হয় নাই, ইহা সত্য। কিন্তু দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরে সেই পরিবর্তনের পরিমাণ উত্তরোত্তর সাধিত হইতেছে। পরিবর্তনের ক্রিয়া যত দ্রুত এবং বুদ্ধিযুক্তভাবে আমরা সম্পাদন করিতে পারিব, তত দ্রুত দেশের মধ্যে গণতন্ত্রের আদর্শ বিস্তার লাভ করিবে। অন্ততঃ আমাদের আলস্য এবং নির্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কোন বাধা সাক্ষাৎভাবে চক্ষুগোচর হইতেছে না। গ্রামেই হউক বা শহরেই হউক, রাজনীতির ক্ষেত্রে, শিক্ষাপ্রসার অথবা সমাজ সেবার ব্যাপারে সর্বত্রই ধীরে ধীরে গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করিতেছে। ইহাকে দেশের এক অত্যন্ত মঙ্গলজনক লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করা যায়। ইহাতেই আমাদের নূতন জীবন গড়িয়া উঠিবার আশা ও ভরসা নিহিত রহিয়াছে।

কৃত্রিম তন্তু

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

তিনটি বিভিন্ন জাতীয় স্বাভাবিক তন্তুর ব্যবহার করে মানুষ আবহমান কাল থেকে তার পরিধেয় কাপড় জামা তৈরি করে আসছে। এরা হলো তুলা, পশম এবং রেশম। এর মধ্যে তুলা হচ্ছে উদ্ভিজ্জ পদার্থ—কার্পাস গাছের বীজের আবরণ হিসেবে উৎপন্ন হয়; পশম হচ্ছে মেষের লোম এবং রেশম তন্তুর সৃষ্টি হয় রেশম কীটের মুখ-নিঃসৃত লালা থেকে। সুতরাং পশম এবং রেশম হলো প্রাণিজ পদার্থ।

কার্পাস তুলা হলো কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনঘটিত একটি রাসায়নিক পদার্থ—নাম হচ্ছে সেলুলোজ (Cellulose)। এর রাসায়নিক সংযুতি হলো $[C_6(H_2O)_5]_n$। শ্বেতসার ও শর্করার মত রাসায়নিক সংজ্ঞা অনুযায়ী এটি কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate) শ্রেণীর অন্তর্গত একটি পদার্থ। কার্বোহাইড্রেট বলতে বোঝায় এসব পদার্থের অণু গঠিত হয় কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সমবায়ে এবং এদের অণুতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর অনুপাত থাকে জলে বর্তমান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর অনুপাতের সমান (H_2O)। সেলুলোজ হলো একটি অতিকায় অণুগঠিত পদার্থ। উপরে যে এর আণবিক সংযুতির সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে, তা থেকে দেখা যাবে যে, এর এক একটি অণু বহু ক্ষুদ্র একক অণুর ($C_6H_{10}O_5$) সমবায়ে গঠিত। n-এর মূল্যমান হলো ৩০০০ বা ততোধিক। অর্থাৎ প্রায় ৩ হাজারটি ক্ষুদ্রকায় একজাতীয় একক $C_6H_{10}O_5$ অণু পরস্পর জুড়ে গিয়ে একটি অতিকায় সেলুলোজ অণুর সৃষ্টি করে। পশম এবং রেশমও তুলা বা সেলুলোজের মত অতিকায় অণুগঠিত পদার্থ। কিন্তু এদের আণবিক সংযুতিতে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পরমাণু ছাড়াও নাইট্রোজেন পরমাণু বর্তমান থাকে; পশমে অধিকন্তু থাকে গন্ধকের (সালফার) পরমাণু। পশম এবং রেশম হচ্ছে রাসায়নিক সংজ্ঞা মতে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। পশমের প্রোটিনকে বলা হয় কেরাটিন (Keratin) এবং রেশমের প্রোটিনকে বলা হয় ফাইব্রোয়ান (Fibroin)।

এ-সব স্বাভাবিক তন্তুর বিবরণ থেকে এখন আমাদের পক্ষে কৃত্রিম তন্তুর আবিষ্কার আলোচনা সহজ হবে। বহু ক্ষুদ্রকায় অণু যখন পরস্পর জুড়ে গিয়ে একটি অতিকায় অণুর সৃষ্টি করে, তখন তার আকার হয় দীর্ঘ চেনের বা সুতোর মত; অথবা তা তাল পাকিয়ে পিণ্ডাকার ধারণ করে। সেলুলোজ, কেরাটিন ও ফাইব্রোয়ান দীর্ঘ চেনের আকার ধারণ করে বলে তন্তু হিসাবে তাদের ব্যবহার হয়। অতিকায় অণুগঠিত পদার্থ সাধারণতঃ জলে বা জৈব দ্রাবকে গুলে না। তাই তুলা ও রেশম ও পশম দিয়ে কাপড় জামা তৈরি করা চলে। ময়লা হলে ধুয়ে পরিষ্কার করবার কোন অসুবিধা হয় না।

প্রায় ৪ হাজার বছর আগে চীন দেশে প্রথম রেশম কীটের মুখ-নিঃসৃত লালা থেকে উৎপন্ন রেশম দিয়ে কাপড় তৈরি সুরু হয়। পরবর্তীকালে এ রেশম শিল্প ছড়িয়ে পড়ে জাপানে এবং ফরাসী দেশে।

১৬৬৪ সালে বিখ্যাত আইরিশ বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল (Robert Boyle) লিখেছিলেন যে, সম্ভবতঃ এমন কোন উপায় উদ্ভাবিত হবে যাতে

রেশমকীটের মুখ থেকে নিঃসৃত লালার মত আঁঠাল পদার্থ মানুষ তৈরি করতে সক্ষম হবে। তাথেকে যে তন্তু হবে তা গুণে রেশমের মত বা রেশমের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হতে পারে

বয়েলের উক্তির দু-শ' কুড়ি বছর পর ১৮৮৪ সালে জোসেফ সোয়ান (Joseph W. Swan), এক ইংরাজ যুবক কিছু নাইট্রোসেলুলোজ (Nitrocellulose or guncotton=সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন) সিরকায় (Vinegar) গুলে, এটি একটি দীর্ঘ নলের বহু সূচীমুখ রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে সজোরে সুরাসারের (Alcohol) মধ্যে বিনিঃসৃত করে। এ উপায়ে সৃষ্টি হলো এক প্রকারের দীর্ঘ সূক্ষ্ম তন্তুর। তাথেকে সুতো করে সোয়ান কাপড় বুনতে সক্ষম হলো। ঐ কাপড় বাহারে ও স্পর্শে হলো রেশমের মতই মসৃণ এবং উজ্জ্বল। এর নাম হলো কৃত্রিম রেশম। উদ্যমের অভাবে সোয়ান কিন্তু একে বাজারে চালু করতে পারে নি। কিন্তু এ কাজে কৃতী হলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের (Louis Pasteur) ছাত্র এক ফরাসী যুবক—কাউন্ট লুই মেরি হিলেয়ার দ্য সার্দোনে (Count Louis Marie Hilairede Chardonnet)। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই 'কৃত্রিম রেশম' প্রস্তুতের আরো কয়েকটি সহজ ও সুলভ উপায় আবিষ্কৃত হলো এবং এই কৃত্রিম রেশম, রেয়ন (Rayon) নামে বাজারে ছড়িয়ে গেল। সস্তাদরের সেলুলোজ হলো এর প্রধান উপাদান; যথা—পরিত্যক্ত তুলা, নানা গাছের তন্তু ইত্যাদি। সম্প্রতি কৃত্রিম রেশম শিল্পের এক বার্ষিক বিবরণীতে দেখা যায় যে, ঐ বছর পৃথিবীর ৩০টি বিভিন্ন দেশে উৎপন্ন রেয়নের মোট পরিমাণ হচ্ছে ৪.৫ বিলিয়ন পাউণ্ড। উক্ত বছরে উৎপন্ন স্বাভাবিক রেশমের পরিমাণ হলো এর মাত্র একশত ভাগের এক ভাগ। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সকলের অগ্রণী।

'কৃত্রিম রেশম' বা রেয়নকে কৃত্রিম তন্তু বলা যায় শুধু স্বাভাবিক সেলুলোজেরই রূপান্তর মাত্র। রাসায়নিক সংযুতিতে সেলুলোজে ও কৃত্রিম রেশমে কোন প্রভেদ নাই। শুধু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সেলুলোজের তন্তুতে রেশমের ভৌতিক ধর্মের আবেশ করা হয়েছে।

রেশম কীটও অবশ্য মালবেরী জাতীয় গাছের পাতা থেকে সেলুলোজ চর্বণ করে। কিন্তু ঐ সেলুলোজ তার পাকস্থলীতে এক প্রকার কিণ্বের (Enzyme) প্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তনে আঁঠাল রেশম পদার্থে (ফাইব্রোয়ান-প্রোটিন) পরিণত হয়।

রসায়ন-বিজ্ঞানীরা চাই 'কৃত্রিম রেশম' বা রেয়ন প্রস্তুতপ্রণালী আবিষ্কার করে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রকৃত কৃত্রিম তন্তু প্রস্তুতের প্রচেষ্টা হলো এখন তাঁদের উদ্দেশ্য। সুলভ সহজসাধ্য সাধারণ পদার্থ থেকে, যেমন—কয়লা, পেট্রোলিয়াম, স্বাভাবিক গ্যাস, বায়ু এবং জল—কৃত্রিম তন্তুর সৃষ্টির প্রচেষ্টা তখন সুরু হলো বিপুল উদ্যমে। এর ফলে ১৯৩৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে E. I. du pont de. Namours Co.-এর পরীক্ষাগারে রসায়ন-বিজ্ঞানী কেরোথারস (Wallace Hume Carothers) বহু বছর ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম ও বহু ব্যয়সাধ্য পরীক্ষার পর স্বাভাবিক রেশমের অনুরূপ প্রকৃত কৃত্রিম তন্তুর প্রস্তুতবিধি আবিষ্কার করেন। ইতিপূর্বে উক্ত কোম্পানীতেই কেরোথারস কৃত্রিম রাবার নিউপ্রিন (Neoprene) প্রস্তুতবিধির কাজে ফাদার নিউল্যাণ্ডের (Father Nieuwland) সহকর্মী ছিলেন। বাজারে তখন বহুজাতীয় প্লাস্টিকের পদার্থ চালু হয়ে গেছে। রাবার, প্লাস্টিক এবং স্বাভাবিক তন্তুসমূহ সবই অতিকায় অণুগঠিত পদার্থ। সুতরাং এ-জাতীয় পদার্থসমূহের রাসায়নিক সংযুতি ও জ্ঞান সম্বন্ধে

কেরোথারসের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাই কৃত্রিম তন্তু সংশ্লেষণের জন্যে কেরোথারস অনেক চিন্তা ও পরীক্ষার পর ছুটি রাসায়নিক পদার্থের নির্বাচন করলেন। এর একটি হলো Hexamethylene diamine এবং আরেকটি Adipic acid। প্রথমটি ক্ষারজাতীয় পদার্থ—পেট্রোলিয়াম বা স্বাভাবিক গ্যাস (Natural gas) থেকে সহজ সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় একে প্রস্তুত করা যায়। দ্বিতীয়টি অম্লজাতীয় পদার্থ—আলকাত্‌রা থেকে উৎপন্ন ফিনল বা কার্বলিক অ্যাসিড থেকে একে সৃষ্টি করা সহজ। এ ছুটি পদার্থের ঘন সংযোগ প্রক্রিয়ার (Condensation reaction) ফলে কিছু জল বেরিয়ে একটি নতুন পদার্থের অণুর সৃষ্টি হয়, যা সঙ্গে সঙ্গে বহুগুণিত হয়ে অতিকায় অণুগঠিত কৃত্রিম তন্তুর সৃষ্টি করে। এরই নাম হলো নাইলন (Nylon)।

এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন নাইলনের ঘনদ্রব একটি নলের প্রান্তে বহুসূচীমুখ রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে সজোরে বিনিঃসৃত করে তাকে সূক্ষ্ম তন্তুর আকারে পরিণত করা হয়।

নাইলনের আবিষ্কর্তা নিরাসক্ত, নীরব, অক্লান্তকর্মী বিজ্ঞানী কেরোথারস অতি অল্প বয়সে মাত্র ৪১ বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু তাঁর দশ বছরেরও কম কর্মজীবনে যে বিপুল পরিমাণ গবেষণা করে গেছেন, তার তুলনা বিজ্ঞানের ইতিহাসে বেশী দেখা যায় না।

নাইলন একটি অতিকায় অণুগঠিত পদার্থ। ডায়ামিন এবং অ্যাডিপিক অ্যাসিডের উপাণুর উপরিউক্ত সঙ্কেত মতে পর পর ধারাবাহিক বিন্যাসে একটি সুদীর্ঘ চেনের সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি চেনগুলি রাসায়নিক শক্তিতে আবার পরস্পর বাঁধা থাকে। জানা আছে যে, রাবার এবং প্লাস্টিকও এই জাতীয় অণুগঠিত পদার্থ। একটি নির্দিষ্ট আণবিক সংস্থান বহুগুণিত হয়ে একটি অতিকায় অণু সৃষ্টি করে। পাশাপাশি সুদীর্ঘ অতিকায় আণবিক চেনের মধ্যে যদি বাঁধনশক্তি দুর্বল হয়। তবে রাবারজাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। ঐ বাঁধন যদি প্রবল হয় তবে তন্তুজাতীয় পদার্থ গড়ে উঠে। বাঁধনের শক্তি মাঝামাঝি রকমের হলে উৎপন্ন পদার্থটি হয় প্ল্যাস্টিকধর্মী।

নাইলনের অতিকায় অণুগুলি হাইড্রোজেনের অণুর প্রায় ১০,০০০ গুণ ভারী। এথেকে হিসাব করলে দেখা যায় যে, ৫০টি Hexamethylene diamine-এর অণু ও ৫০টি Adipic acid-এর অণু পরস্পর জুড়ে নাইলনের এক একটি অতিকায় অণুর সৃষ্টি করে এবং এ প্রক্রিয়ায় ১০০টি জলের অণু বেরিয়ে যায়। নাইলনের অণুর গঠন-বিন্যাস অনেকটা রেশমের অণু ফাইব্রোয়ানের মত।

নাইলনের সুতো খুব শক্ত এবং টেকসই। একে টেনে ছেঁড়া খুবই কঠিন। এটি জলে ভিজে না। এ কারণে নাইলনের জামা, কাপড় জলে কাঁচবার পর অতি সত্বর শুকিয়ে যায় এবং শরীরের ঘামও নাইলনের জামা, কাপড় সহসা টেনে নেয় না। নাইলনের জামা, কাপড়, মোজা, গেঞ্জি, মাছ ধরবার সুতলি ও জাল, জানালার পর্দা, দাঁতের ব্রুশ, চেয়ারের ছাউনি ও বহুবিধ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বাজারে চালু হয়েছে। নাইলন আবিষ্কারের পর অল্পকালের মধ্যে আরো অনেক প্রকার কৃত্রিম তন্তুর প্রস্তুত-বিধির সংশ্লেষণে বিজ্ঞানীরা সক্ষম হন। এর মধ্যে Du Pont de Nemours কোম্পানির প্রবর্তিত অরলন ও ডেক্রন (Dacron) প্রথম উল্লেখযোগ্য। অরলন হচ্ছে বহুগুণিত অ্যাক্রাইলো নাইট্রাইল (Acrylo nitrile)। স্বাভাবিক গ্যাস এবং অ্যামোনিয়া থেকে সুরু করে বিজ্ঞানীরা এই অ্যাক্রাইলো নাইট্রাইল পদার্থটিকে সংশ্লেষণ করেছেন। এর অণুগুলি পরস্পর জুড়ে বহু-গুণিত (Polymerized) হয়ে অরলনের অতিকায় অণুর সৃষ্টি করে। ডেক্রন একটি ঈষ্টার (Ester) জাতীয় পদার্থ। পেট্রোলিয়াম থেকে উৎপন্ন দুটি রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে এর সৃষ্টি হয়। এগুলি হলো গ্লাইকল (Glycol) ও টেরিথেলিক অ্যাসিড (Terephthalic acid)। এর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নাইলনের মত বহু জলের অণু বেরিয়ে যায়। একারণে নাইলন এবং ডেক্রনকে ঘন-বহুগুণিতক (Condensation polymer) বলা হয়। ডেক্রনের অপর নাম টেরিলিন (Terylene)।

ডাইনেল (Dynel) আর একটি কৃত্রিম তন্তু; Union Carbide and Carbon Co. হলো এর নির্মাতা। এটি একটি মিশ্র বহুগুণিতক অ্যাক্রাইলো নাইট্রাইল এবং ভিনাইল ক্লোরাইড (Vinyl chloride)—এ দুটি পদার্থের সংযোজন ও বহুগুণনে এর উৎপত্তি। Dow Chemical কোম্পানির তৈরি দুটি বাজার চলতি কৃত্রিম তন্তুর নাম হচ্ছে জেফ্রান (Zefran) এবং সারান (Saran)। সারান হচ্ছে ভিনাইল ক্লোরাইড এবং ভিনাইলিডিন ক্লোরাইড (Vinylidine chloride) মিশ্র বহু গুণিতক। তাপ, আলোক, জলীয় বাষ্প বা রাসায়নিক পদার্থের আক্রমণে সারান সহজে বিকৃত হয় না। অ্যাক্রিলান (Acrylan), দারলান (Darlan), ক্রেস্‌লান (Creslan), ভেরেল (Verel), অ্যাভ্রিল (Avril), ঝানত্রেল (Zan-trel) ইত্যাদি নামে বহু প্রকার কৃত্রিম তন্তুতে এখন বাজার ছেয়ে গেছে। ১৯৬০ সালে প্রায় ৫৫ রকমের বিভিন্ন কৃত্রিম তন্তুর প্রচলন ছিল বাজারে। এখন এর সংখ্যা আরো অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে।

বিজ্ঞানীরা কয়েক রকমের পশমধর্মী কৃত্রিম তন্তু নির্মাণ করেছেন। এ সবার নির্মাণে মূল উপাদান হিসাবে তাঁরা ব্যবহার করেছেন নানা জাতীয় প্রোটিন পদার্থ। এ-সব কৃত্রিম তন্তুও এখন বাজারে চলছে। দুধের প্রোটিন কেসিন (Casein) থেকে তৈরি লেনিটাল (Lanital), খাদ্য শস্য করণ (Corn) বীজের প্রোটিন ঝাইন (Zein) থেকে তৈরি ভিকারা (Vicara) এবং চীনাবাদামের প্রোটিন থেকে তৈরি তন্তু আরদিল (Ardil) এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সয়াবিনের প্রোটিন, ডিমের প্রোটিন এবং পাখীর পালকের

প্রোটিন (কেরাটিন-Keratin)ও বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম পশমতন্তু নির্মাণে ব্যবহার করছেন।

সম্প্রতি আমেরিকার Du pont কোম্পানি কৃত্রিম তন্তু নাইলন, ডেক্রন ও অরলন থেকে নানা রকমের কাগজ প্রস্তুত-প্রণালীর উপায় উদ্ভাবন করেছেন। লেখার কাগজ, সংবাদপত্রের জন্যে কাগজ, দলিলপত্রের কাগজ, জিনিষপত্র মোড়বার কাগজ ইত্যাদি সব রকমের কাগজ তৈরি হতে পারে এ-জাতীয় কৃত্রিম তন্তু থেকে। এ-সব কাগজের বিশেষ গুণ হচ্ছে এরা অনেক দিন বেশী টিকবে এবং আলো, বাতাস, কীট, পোকা ও রাসায়নিক পদার্থে এদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা হবে কম।

ফেল্টের (Felt) বদলে এবং প্যাডিং (Padding) ও আস্তরণের (Linings) কাজেও কৃত্রিম তন্তুর প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে। তাছাড়া টেবিল ক্লথ ও পর্দার জন্যে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার এখন অপ্রতুল নয়।

কৃত্রিম ও স্বাভাবিক তন্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন সুতো থেকে তৈরি নানা রঙের কাপড় এখন বাজারে বিক্রী হচ্ছে। অবস্থাবিশেষে এরা বেশী আরামদায়ক ও ব্যবহারোপযোগী বলে এদের যথেষ্ট কাটতি আছে।

কৃত্রিম তন্তুর শিল্প ক্রমশঃ দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছে। অচিরে এটি স্বাভাবিক তন্তুর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে, এরূপ আশঙ্কা স্বাভাবিক। ফলে অনেক অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হবে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োগে একদিকে যেমন মানুষের সুখ-সুবিধা বেড়ে উঠছে, তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিচ্ছে অনেক দুরূহ সমস্যা। এটিই হলো প্রকৃতির প্রতিশোধ।

"পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে তাহারা সত্যের সন্ধান পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র

পলিথিন প্লান্ট

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)
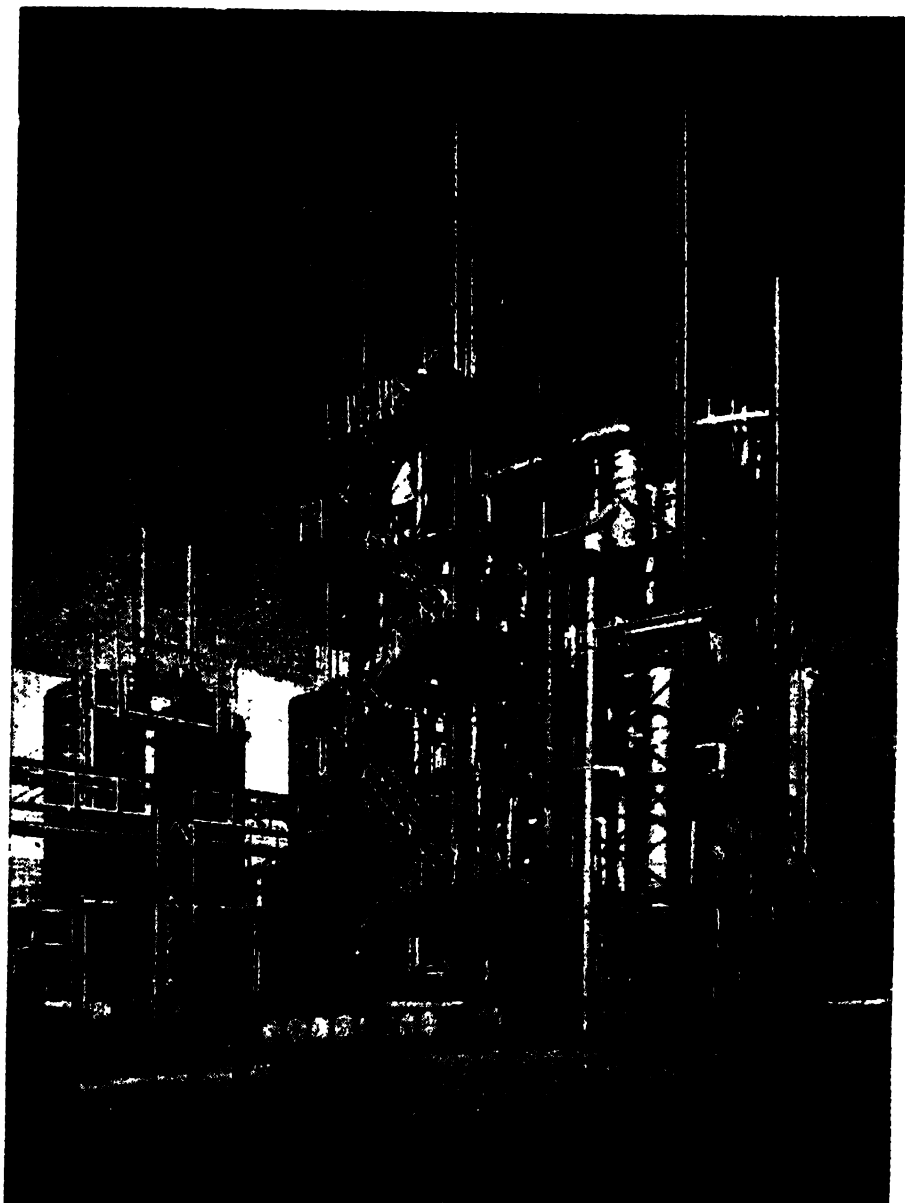
পলিথিন প্লাণ্ট

'আই-সি-আই' কোম্পানীর সহযোগিতায় 'দি অ্যালকালি অ্যাণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ' কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের রিষড়ায় ভারতে সর্বপ্রথম পলিথিন প্রস্তুতির এই কারখানা স্থাপিত হয়েছে। বহুসংখ্যক পাতন-যন্ত্রের সাহায্যে গুড় থেকে পাতিত 'ইথাইল অ্যালকোহল' হল পলিথিনের মূল উপাদান। কনভার্টার যন্ত্রে এই অ্যালকোহলের নির্জলীকরণে যে গ্যাসীয় ইথিলিন উৎপন্ন হয় তাকে প্রথমে বিশুদ্ধ করে তারপর বিশেষ চাপ প্রয়োগে রূপান্তরিত করা হয় অতিকায় অণুবিশিষ্ট পলিথিনে। এই ঘনীভূত কঠিন পলিথিনকে পৃথক করে নিয়ে শেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কেটে বাজারে দেওয়া হয়।

'আই-সি-আই' আবিষ্কৃত এই পলিথিন 'অ্যালকাথিন' নামে পরিচিত। শিল্প, কৃষিকার্য ও গৃহস্থালীর শত শত জিনিস তৈরি করতে অ্যালকাথিন আজকাল প্রচুর ব্যবহৃত হচ্ছে—খেলনা, বালতি, বোতল প্রভৃতি থেকে সুরু করে নানা শিল্প কাজে ব্যবহারোপযোগী হাল্কা পাইপ, কার্বয়, বৈদ্যুতিক কেব্ল প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রে এর ব্যবহার আজ ব্যাপক হয়ে উঠেছে।

অ্যাণ্টিবায়োটিক্স

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

বিংশ শতকের প্রথম তৃতীয়াংশকে বলা হতো ভাইটামিন যুগ; আর দ্বিতীয় তৃতীয়াংশকে অনুরূপভাবে আখ্যা দেওয়া চলে অ্যাণ্টিবায়োটিকের যুগ। গ্রীক শব্দ Bios মানে জীবন, সুতরাং Biosis মানে জীবনী-শক্তি আর তা থেকে উদ্ভূত Antibiotics মানে, যা দিয়ে জীবনীশক্তিকে খর্ব করা যায়। কিন্তু যে কোন প্রাণী সম্বন্ধে এই নতুন শব্দটি প্রযোজ্য নয়, যোগরূঢ় অর্থে মানুষের অসংখ্য অদৃশ্য শত্রু জীবাণুর জীবনীশক্তির অপহ্নবকারী উপাদানগুলিরই নাম অ্যাণ্টিবায়োটিক্স। সুতরাং এক দিকে যেমন পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, অরিয়োমাইসিন, টেরামাইসিন প্রভৃতি ছত্রাকঘটিত উপাদানসমূহ এর পর্যায়ে পড়ে, আবার তেমনি স্যালভারসন, নিওস্যালভারসন, প্রণ্টোসিল, M. B. 693, সিবাজোল প্রভৃতি সালফোনেমাইড জাতীয় রাসায়নিক উপাদানও সংজ্ঞা হিসাবে এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাসমরের কিঞ্চিৎ আগুপিছু সমসাময়িক কালে অত্যাশ্চর্য ফলপ্রদ এসব ওষুধগুলির আবিষ্কারের ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং পৃথিবীর সর্বত্র প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোকের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে শুধু প্রাণরক্ষাই সম্ভব হয় নি, এভাবে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের লোকের গড়পড়তা আয়ুও বিগত কালের তুলনায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। এটি যেমন একদিকে আনন্দের কারণ, আবার তেমনি পৃথিবীর লোকসংখ্যার জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি এবং সে কারণে খাদ্যাভাব জনিত হরিষে বিষাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে নিয়তির পরিহাস ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

এই সকল প্রাণরক্ষাকারী যাদু-ওষুধের আবিষ্কারের ইতিহাস রূপকথার মতই কৌতূহলোদ্দীপক। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, অতি আকস্মিকভাবে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ফললাভ হয়েছে, তাহলেও এদের আবিষ্কারের জন্যে ক্ষেত্র-প্রস্তুতি চলেছে যুগ-যুগান্তর ধরে তিলে তিলে, বহু জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর জ্ঞান ও বহু গবেষক কর্মীর কর্মপ্রচেষ্টার সমন্বয়ে। সুদূর অতীতে প্রাচ্যদেশে কোন কোন ছত্রাক (Mould) ও ঈস্ট যে ওষুধরূপে ব্যবহৃত হতো, নানা দেশের প্রচলিত উপাখ্যানে তার উল্লেখ আছে। তিন হাজার বছর আগে চৈনিক ভিষকগণ ফোঁড়া, বহুমুখী-ফোঁড়া এবং দূষিত ক্ষত আরোগ্যের জন্যে ছত্রাকসহ সয়াবিনের ময়দার পুলটিশের ব্যবস্থা দিতেন এবং ভারতীয় চিকিৎসকগণও আমাশয় রোগ নিরাময়ের জন্যে ছত্রাকঘটিত ওষুধের বিধান দিতেন। খৃষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছরেরও আগে লিখিত Ebers Medical Papyrus নামক চিকিৎসা-শাস্ত্রের পুস্তকে দূষিত ক্ষতে ঈস্ট, ছড়ে যাওয়া ও আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বাসী রুটির টুকরায় গজানো ছত্রাক, একজিমা ও অন্যান্য ত্বকরোগে ছত্রাক মেশানো পুলটিশ প্রয়োগের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। একইভাবে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বড় প্লিনীর (Pliny the elder) বিখ্যাত গ্রন্থে মায়াদের (Mayans) মধ্যেও রোগ-নিরাময়কল্পে কোন কোন ছত্রাক ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও যুদ্ধ-ক্ষত আরোগ্যের জন্যে ছত্রাক ওষুধরূপে ব্যবহৃত হতো। বর্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনকরূপে অভিহিত হিপ্পোক্রেটিসও (Hippocrates) স্ত্রীরোগ নিরাময়ের জন্যে ছত্রাকের ব্যবস্থা দিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বহু রোগের কারণ জীবাণু সম্বন্ধে কোন ধারণা বা জ্ঞান না থাকাতে কিভাবে ছত্রাক রোগ-নিরাময়ে সাহায্য করে, তা বুঝতে পারা কিংবা জানা সম্ভব হয় নি।

অবশেষে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী লিউয়েনহোয়েক (Leeuwenhoek) কর্তৃক অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং পাস্তুর (Pasteur), কক্ (Koch) প্রভৃতির দ্বারা জীবাণুতত্ত্ব ও তাদের সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হয়। পাস্তুরের একজন কৃতী ছাত্র জৈব-রসায়নে মস্ জাতীয় উদ্ভিদের মুখ্য ভূমিকার বিষয় প্রমাণিত করেন এবং জীবাণুদের মধ্যে পারস্পরিক বিরূপতা সম্বন্ধে পাস্তুরের মতবাদ অনুসারে ইউক্রেনের বিজ্ঞানী মেচ্নিকফও (Metchnikoff) দেখতে পান যে, দইয়ের জীবাণু ল্যাক্টো-ব্যাসিলাসের অন্ত্রের মধ্যে উপস্থিতিতে অন্যান্য—এমন কি, আমাশয়ের জীবাণু পর্যন্ত নির্জীব হয়ে পড়ে এবং তাদের সংখ্যাও হ্রাস পায়। অন্য দিকে প্রায় ঐ একই সময়ে (১৮৭৬) ইংরেজ পদার্থ-বিজ্ঞানী টিণ্ডেল (John Tyndall), মাংসের কাথের মধ্যে এক জাতীয় ছত্রাকের (Penicillum glaucum) চাষের পর তার সঙ্গে জীবন্ত জীবাণু মিশিয়ে দিলে, হয় তারা মরে যায়, না হয় নির্বীর্য হয়ে নীচে থিতিয়ে পড়ে, এরূপ লক্ষ্য করেন এবং লণ্ডন রয়্যাল সোসাইটিতে তাঁর গবেষণার রিপোর্ট পেশ করেন। ১৮৮৮ সালে চার্লস্ বুচার্ড (Charles Bouchard) দেখতে পান যে, ব্যাসিলাস পায়োসায়ানাস (B. pyocyaneus) জীবাণু টাইফয়েড, ডিপ্থিরিয়া ও প্লেগ জীবাণুর শত্রু। কিন্তু ঐ বিশেষ জীবাণু নিঃসৃত পায়োসায়ানেজ নামক রাসায়নিক উপাদান নিজের বিষক্রিয়ার জন্যে শেষোক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের দেহে ইনজেকশনের অনুপযুক্ত বলে তাদের নিরাময়ের জন্যে ঐভাবে আর কোন চেষ্টা পর্যন্ত হয় নি। ১৮৯৩ সালে দু'রকমের পেনিসিলিয়াম সাকেরিন ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের মাধ্যমের মধ্যে সাইট্রিক অ্যাসিড এবং ১৮৯৬ সালে ঐ একই ভাবে মাইকো-ফিনোলিক অ্যাসিড নামে এমন একটি কেলাসিত উপাদান উৎপাদনে সক্ষম হন, যার দ্বারা অ্যানথ্রাক্স জীবাণুকে ধ্বংস করা চলে। ১৯০৪ সালে ফ্রস্ট (Frost) কর্ষিত মাটিতে টাইফয়েড জীবাণুকে পুঁতে রেখে দেখতে পান যে, কয়েক দিনের মধ্যেই তারা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। সে কারণে তাঁর ধারণা জন্মে যে, মৃত্তিকায় বর্তমান স্বাভাবিক জীবাণুগুলি এমন কিছু রাসায়নিক উপাদান উৎপাদনে সক্ষম, যার ফলে টাইফয়েড জীবাণুর মত জীবাণুও এভাবে মারা পড়ে।

প্রাণিজগতে কি মানুষ, কি পশু-পক্ষী সকলের মধ্যেই এক গোষ্ঠীর মধ্যে একদিকে যেমন একে অন্যের প্রতি স্বাজাত্যবোধ, সামাজিকতা, সহানুভূতি ও একে অন্যকে নিয়ে বেঁচে থাকবার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়, আবার তেমনি অন্য গোষ্ঠী, প্রতিকূল প্রতিবেশী বা ভিন্ন দেশীয়দের প্রতি প্রতিকূলতা, তাদের শক্তি খর্ব করবার প্রয়াস এবং সময়ে সময়ে তাদের একেবারে দুনিয়া থেকে উৎখাত করবার চেষ্টাও দেখা যায়। শুধু জলজগতেই নয়, স্থলজগতেও এরকম মাৎস্য-নীতি সৃষ্টির আদি থেকেই যেমন চলে আসছে, জীবাণুজগৎও যে তার ব্যতিক্রম নয়, তা সর্ব-প্রথমে দেখতে পান ফরাসী বিজ্ঞানী পাস্তুর এবং এক গোষ্ঠীর জীবাণু অন্য গোষ্ঠীর প্রতি বংশানুক্রমিক বিদ্বেষ এবং ঘৃণাকে মানুষের কাজে

লাগিয়ে জীবাণুঘটিত রোগ-নিরাময়ের সম্ভাব্যতা তাঁর কাছেই সর্বপ্রথমে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এরূপ উপায়ে রোগের চিকিৎসা আশু ফলপ্রদ হলেও পরিণামে বিপজ্জনক হতে পারে ; কেন না, প্রাথমিক রোগজয়ে সহায়তাকারী আপাত-দৃষ্টিতে বন্ধু জীবাণুও পরবর্তীকালে শত্রুরূপে অন্য রোগের সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং ঐ পথ ত্যাগ করে বিজ্ঞানীর প্রয়াস চললো খোদ জীবাণুর পরিবর্তে তাদের দ্বারা নিঃসৃত রাসায়নিক উপাদানের প্রয়োগে অন্য জীবাণুঘটিত রোগ আরোগ্যের। ১৮৮৯ সালে আর একজন ফরাসী চিকিৎসক ভিলেমাঁই (Vuillemin) এরূপ জীবাণুর বিন প্রতিষেধক রাসায়নিক উপাদানের নামকরণ করেন অ্যান্টিবায়োটিক্স বা "জীবাণুর জীবনীশক্তি প্রতিষেধক উপাদান।" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগের বিজ্ঞানীমহলে তাঁর অবদান একরকম বিস্মৃতপ্রায় বললেও চলে।

অতঃপর প্রায় চল্লিশ বছর নিষ্ক্রিয়তার পর লণ্ডনে সেণ্ট মেরী হাসপাতালের একটি ছোট লেবরেটরিতে একটি আকস্মিক ঘটনার ফলে আবার বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি ফিরে আসে এই বিস্মৃতপ্রায় গবেষণার ক্ষেত্রে। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং নামে একজন স্কচ্ বিজ্ঞানী রক্তদুষ্টিকর স্ট্যাফাইলোকক্কাস নামক জীবাণু-কৃষ্টির পেট্রিডিশে কোন অজানা কারণে সূক্ষ্ম অদৃশ্য সবুজ পদার্থ এসে ছাতার মত গজানোতে ঐ জীবাণুর বংশ-বৃদ্ধির ফলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপনিবেশগুলির অনেকটা ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে বলে লক্ষ্য করেন। তিনি অতঃপর বারবার অন্য পেট্রিডিশে অক্ষত উপনিবেশগুলির উপর ঐ ছাতার কিছুটা সংক্রামিত করবার পর ঐ ছত্রাকের "স্টাফ" ধ্বংসকারী ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অতি ক্ষুদ্র শুঁয়াযুক্ত লোমশ আকৃতি দেখে এই ছত্রাক যে "পেনিসিলিয়াম বা বুরুশ জাতীয়" সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে। এই "পেনিসিলিয়াম নোটাটাম" নামক ছত্রাক সাধারণতঃ অতি দুর্লভ বলে তিনি প্রথম পেট্রিডিশ থেকে সামান্যমাত্র বীজ তুলে নিয়ে অন্যান্য পেট্রিডিশে তার বারবার চাষ করে যেটুকু উপাদান পেলেন, তারই নির্যাস খরগোশের দেহে ইনজেকশন করে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, রক্তের শ্বেতকণিকা বা লোহিতকণিকার উপর এর কোন অনিষ্টকর প্রভাব নেই। ১৯২৯ সালে তাঁর এই যুগান্তকারী গবেষণার সাফল্যের কথা প্রকাশিত হলেও এই ফলপ্রদ ওষুধটি দুর্লভ বলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্ভব নয় বলেও বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ সাড়া পড়ে নি। এতদসত্ত্বেও ফ্লেমিং ও তাঁর সহকারী রেষ্ট্রিক সকলের ঔদাসীন্য উপেক্ষা করে একরকম "একাকী"ই সম্পূর্ণ আস্থার সঙ্গে পরীক্ষা-নলে এবং নানা জন্তুর দেহে তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালে রাসায়নিক অ্যান্টি-বায়োটিক্স সালফা জাতীয় ওষুধের আবিষ্কারে জীবাণুঘটিত রোগজয়ের সাফল্যলাভ ঘটলো। পেনিসিলিন আবিষ্কারের ইতিহাসের চেয়ে সাল্ফা জাতীয় রাসায়নিক অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কারের ইতিহাসও কম চমকপ্রদ নয়। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে, পেনিসিলিন বা ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতিও মূলতঃ জীবাণুধ্বংসী রাসায়নিক উপাদান হলেও তারা জীবাণু বা ছত্রাকের দেহ-নিঃসৃত উপাদান। সালফা জাতীয় ওষুধ কিন্তু সেভাবে উৎপন্ন কিছু নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লেবরেটরীতে সম্পূর্ণ রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত সিফিলিস রোগের ওষুধ স্যালভারসন বা নিওস্যালভারসন, কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া-ষ্টীবামাইন বা নিও-স্টিবোসান প্রভৃতিও অনুরূপ রাসায়নিক উপাদান। সে জন্যেই বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী পল এর্লিক (Paul Ehrlich) তাদের নামকরণ করেছিলেন

রাসায়নিক ওষুধ (Chemotherapeutic agents)।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম অবস্থা থেকে আরম্ভ করে বিগত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে নীলের চাষ হতো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্মেনীতে কৃত্রিম উপায়ে নীল ও অন্যান্য রঞ্জক দ্রব্যের প্রস্তুতিতে—কষ্ট করে বহু অর্থব্যয়ে এদেশের নীলের চাষের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। ঐ সময়ে এর্লিক বার্লিনে নিজের লেবরেটরিতে নানা জন্তুর দেহে ঐ সকল রঞ্জক উপাদান প্রয়োগের ফলাফল লক্ষ্য করতে থাকেন। কোন কোন জীবাণু ঐ জাতীয় বিশেষ বিশেষ রং নিজ দেহে গ্রহণ করে মারা যায় এবং কেউ কেউ রঞ্জিত হয়েও বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে, এরূপ দেখা যায়। ১৯০৫ সালে এরিক হফ্ম্যান (Eric Hoffman) সিফিলিস রোগের জীবাণু (Spirochæta pallida) আবিষ্কার করেন। বহুবার বিফল মনোরথ হয়ে অমানুষিক অধ্যবসায়ের ফলে ১৯০৭ সালে এর্লিক ঐ জীবাণুনাশক স্যালভার্সন বা আর্সফেনামাইন (Salvarson or Arsphenamine) আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। তাঁর ৬০৫ বার বিফলতার পর, ৬০৬ বারে সাফল্য অর্জনের স্মারকরূপে আজও ঐ ওষুধটি Compound '606' নামে পরিচিত। তবু প্রচেষ্টার শেষ হয় নি—তাকে ক্রিয়া হিসাবে আরো ফলপ্রদ এবং অনিষ্টকারিতা রহিত করবার জন্যে ৯১৪ বারের প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছিল নিও-স্যালভার্সন (Neosalvarson) বা Compound "914"। একই ভাবে আমাদের দেশে ডাঃ ব্রহ্মচারীও কয়েক বছর পরে লেবরেটরীতে প্রস্তুত করেছিলেন কালাজ্বরের অব্যর্থ ওষুধ ইউরিয়া-স্টিবামাইন (Urea-stibamine)।

এর্লিকের প্রদর্শিত পথেই আর একজন জার্মান বিজ্ঞানী গেরহার্ড ডোমাক (Gerhard Domagk) প্রথমে লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি রঞ্জক উপাদান জীবদেহে জীবাণুদের বৃদ্ধি ও ক্রিয়ার প্রতিরোধ (Bacteriostatic) ঘটায়। এভাবেই Azosulfamide স্তর পার হয়ে সালফোনেমাইড বা সালফা জাতীয় রাসায়নিক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের প্রথম স্তরের সূচনা হয় জার্মেনীতে। এ-হিসেবে সালফোনে-মাইডের ব্যবহারকে নিঃসন্দেহে পেনিসিলিন-এর ব্যবহারিক প্রয়োগের পূর্বস্তর বলা চলে। জীবাণু-গুলির পুষ্টিকর খাদ্য প্যারা অ্যামাইনো বেন্-জোয়িক অ্যাসিডের সমাকৃতিসম্পন্ন বলে "সাল্ফা" ওষুধকে জীবাণুগুলি খাদ্য বলে ভুল করে গ্রহণ করে এবং তাতেই ক্রমশঃ নির্জীব হয়ে মারা পড়ে।

১৯৩২ সালে জার্মেনীর I. G. Farben নামক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হেন্‌রিক হোয়ার্লিন (Henrik Hoerlin)-এর নির্দেশে ডোমাক (Domagk) ঐ কোম্পানীর এল্‌বারফিল্ডের লেবরেটরীতে আলকাত্‌রার রঞ্জক অংশ থেকে জীবাণুধ্বংসী একটি রাসায়নিক উপাদানকে আংশিকভাবে স্বতন্ত্র করতে সক্ষম হন। প্রথমে পরীক্ষা-নলে এবং পরে প্রাণিদেহে তার ক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষার ফলে লক্ষ্য করা গেল যে, প্রাণীর দেহে এর জীবাণুনাশক ক্ষমতা পরীক্ষা-নলের মধ্যে জীবাণু-নাশক ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী। হাসপাতালে রোগীদের উপর পরীক্ষা করেও দেখা গেল যে, তা কোন কোন স্থলে আংশিকভাবে এবং কোন কোন স্থলে সম্পূর্ণভাবেই রোগ নিরাময়ে সক্ষম হলো। সুতরাং প্রচুর লাভের আশায় "প্রন্টোসিল" নাম দিয়ে কোম্পানী ঐ ওষুধটির পেটেন্ট নিয়ে সর্বস্বত্ব সংরক্ষণ করে নিলেন।

১৯৩৫ সালে এই ওষুধ সম্বন্ধে ডোমাকের সম্পূর্ণ তথ্যাদির বিবরণ এবং লেবরেটরীতে জন্তু-দেহে ও হাসপাতালে রোগীদের উপর প্রয়োগে এর সাফল্যের বিবরণ প্যারিসে এসে পৌঁছলো, পাস্তুর ইনস্টিটিউটে ডাঃ ফুরনুর কাছে। এরকম

একটি অত্যাশ্চর্য ফলপ্রদ ওষুধ আবিষ্কারের কথা জানতে পেরে যুগপৎ আনন্দিত ও উৎসাহিত হলেন তিনি অথচ দুঃখিত হলেন এই ভেবে যে, তিন-তিনটি বছর শুধু তিনিই নন, অন্যান্য দেশের চিকিৎসকেরাও নিছক মন্ত্রগুপ্তির (?) ফলে এতদিন সে বিষয়ে কিছুই জানতে পারেন নি। তিনি আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে ডাঃ হোয়ার্লিনের কাছে কিছু ওষুধের নমুনা চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু পত্রোত্তরে তাঁর প্রার্থিত নমুনা সম্বন্ধে কোন উল্লেখই না থাকাতে তিনি নিজেই যাত্রা করলেন জার্মেনীতে। কিন্তু বৃথা আশা, ফরাসী দেশে ওষুধটা চালু করবার ব্যবসায়িক সর্ত ছাড়া শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে হোয়ার্লিন কিছুতেই ওষুধটি দিতে সম্মত হলেন না। অগত্যা ফুরন্থকে বিফল মনোরথ হয়ে প্যারিসে ফিরে আসতে হলো। কিন্তু তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। ওষুধটির প্রস্তুতি সম্বন্ধে যেটুকু বিবরণ তাঁর হস্তগত হয়েছিল, সে অনুসারে কাজ চালিয়ে তাঁরই সহকারী আর একজন বিজ্ঞানী ডাঃ গিরার্দ (Girhard) প্রন্টোসিল তৈরি করতে সক্ষম হলেন এবং পাস্তুর ইনস্টিটিউটে জন্তু-জানোয়ার এবং ক্লদ বার্নার্ড হাসপাতালে স্ট্রেপ্টোকক্কাসে আক্রান্ত রোগীর উপর প্রয়োগে এই ওষুধের জীবাণুধ্বংসের মোক্ষম ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন।

প্রন্টোসিল সম্বন্ধে গবেষণাক্রমে দেখা গেল যে, তার মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র অংশ আছে, একটি লাল রঙের অকেজো অংশ এবং অন্যটি বর্ণহীন অথচ ফলপ্রদ। ক্রেফুয়েল নামে দু-জন বিজ্ঞানী (স্বামী ও স্ত্রী) অবশেষে লাল অকেজো অংশটি বাদ দিয়ে যে সাদা জীবাণুধ্বংসী অংশটুকু তৈরি করতে সক্ষম হলেন, তাই হলো সালফানিলামাইড (Sulfanilamide)। এই নতুন ওষুধটি তৈরি করা প্রন্টোসিল তৈরির চেয়ে অনেক সহজ; সুতরাং সস্তায় ও অবিলম্বে হাসপাতাল বা বাইরের রোগীদের পক্ষেও যতটুকু আবশ্যক ততটুকু পাওয়াও সহজতর হয়ে গেল এভাবে।

লণ্ডনে কুইন শার্লট হাসপাতালে ৬৫ জন জীবাণুঘটিত মারাত্মক রোগিণীকে প্রন্টোসিল দিয়ে দেখা গেল যে, তাদের মধ্যে ৬১ জনই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে ও হাসপাতালে ডাঃ লং (Long) ও তাঁর সহকর্মীরা সালফানিলামাইড প্রয়োগে দেখতে পেলেন যে এর প্রয়োগে বহু সাংঘাতিক রোগী আরোগ্যলাভ করলেও কোন কোন স্থলে তা নিষ্ফল প্রতিপন্ন হচ্ছে, আবার সময়ে সময়ে কিছু কিছু বিষক্রিয়াও লক্ষিত হচ্ছে। আরো লক্ষ্য করা গেল, কোন কোন দুর্দান্ত ব্যাধির জন্যে যখন অনেক দিন ধরে বা অল্প সময়ের জন্যে অত্যধিক পরিমাণে তা ব্যবহৃত হয়, তখন শরীরে তার প্রতিরোধ শক্তি জন্মাবার ফলে আর তেমন ফল পাওয়া যায় না। এতদসত্ত্বেও ওষুধটি যে বহুস্থলেই জীবন রক্ষায় সক্ষম হবে, সে সম্বন্ধে তাঁদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

১৯৩৬ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ছেলের হলো গলায় স্ট্রেপ্টোকক্কাস নামক দুর্দান্ত জীবাণুর সংক্রমণ এবং অবস্থা যখন খুবই সঙ্কটাপন্ন, তখন মিসেস রুজভেল্টের অনুরোধে ডাঃ লং হোয়াইট হাউসে ছুটে গিয়ে সালফানিলামাইডের দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করাতে অগৌণে সে রোগমুক্ত হলো। সুতরাং আমেরিকার সর্বত্র এই অত্যাশ্চর্য ফলপ্রদ ওষুধের জয়-জয়কার পড়ে গেল। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত কুড়ি হাজার লোকের জীবন রক্ষা করে এই বিস্ময়কর ওষুধটি সাফল্যের এক উল্লেখযোগ্য সম্মান অর্জন করলো। নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস, বি-কোলাই প্রভৃতি অসংখ্য জীবাণু-ঘটিত রোগে মুখে খেতে দিয়ে বা ইনজেকশন করে এবং আহত স্থান বা ক্ষতে বহিঃপ্রয়োগেও সাল্‌ফা জাতীয় ওষুধ অব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে

এবং বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন পদ্ধতিতে প্রস্তুত M. B. 693, Cibazol, Thiazamide, Soluseptasine প্রভৃতি খাওয়ার এবং ইনজেকশনের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও তার পূর্বে এবং পরেও হচ্ছে আজ পর্যন্ত, লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণরক্ষাকারী অত্যাশ্চর্য ওষুধরূপে।

১৯৩৯ সালে ইউরোপে আরম্ভ হলো দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাসমর। যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সৈনিকের এবং যুদ্ধক্ষেত্রের বহুদূরে অসামরিক অঞ্চলগুলিতেও বোমাবর্ষণের ফলে যারা আহত হয়ে রোগাক্রান্ত হতো, তাদের জন্যে ব্যবহৃত হতে লাগলো সালফা জাতীয় মহৌষধ। কিন্তু সম্পূর্ণ চাহিদা তাতে মিটলো না ; সুতরাং বিজ্ঞানাগারে গবেষণা চললো অন্যান্য এবং আরো অধিক ফলপ্রদ ওষুধ আবিষ্কারের জন্যে। অক্সফোর্ডে ফ্লোরি (H.W. Florey) ও তাঁর সহযোগী চেইন (E. B. Chain) ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন সম্বন্ধীয় কাজ হাতে নিয়ে (১৯৪০) ছত্রাকের চাষ, নিষ্কাশন এবং তার বিশুদ্ধিকরণ প্রভৃতি উন্নয়নের দ্বারা রোগীর দেহে প্রয়োগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মত পরিমাণ তৈরি করতে সক্ষম হলেন। অক্সফোর্ডে র‍্যাডক্লিফ হাসপাতালের একজন চিকিৎসক ছিলেন ডাঃ ফ্লোরির স্ত্রী ডাঃ মেরী ফ্লোরি। তাঁর অধীনে একজন মরণোন্মুখ রোগী ছিল, যার বাঁচবার কোন আশাই ছিল না। সুতরাং তাঁর হাতে যতটুকু ওষুধ ছিল, তাই নিয়ে তাঁরা হাজির হলেন রোগীর পাশে এবং কিছুক্ষণ পর পর তার দেহে ইনজেকশন করা হলো ওষুধটি জলে গুলে। রোগীর অবস্থা যখন অনেকটা ভালর দিকে, তখন ওষুধ গেল ফুরিয়ে। সুতরাং আবার যে-কে-সেই অবস্থা! অর্থাৎ ওষুধ পরিমাণে কম ছিল বলে রোগী মৃত্যুর হাত এড়াতে গিয়েও পারলো না! ভবিতব্য আর কাকে বলে?

ফ্লোরি কিন্তু দমবার পাত্র নন। আবার চললো ওষুধ-তৈরি ও সংগ্রহ। তিনি ও ডাঃ রবার্ট উইলিয়াম্‌স্ (Dr. Robert Williams) তাঁদের যৎসামান্য সম্বল (কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে) দিয়ে বার্মিংহাম হাসপাতালে ২১২ জন আহত সৈন্য ও নাগরিকের বিষাক্ত ক্ষতের রোগীকে অচিরে রোগমুক্ত করে তোললেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে জার্মান বোমারুর বোমাবর্ষণে এসম্বন্ধে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়াতে ১৯৪১ সালে ডাঃ ফ্লেমিং-এর পেট্রিডিশে সর্বপ্রথম গজানো ছত্রাকের একটি ক্ষুদ্র অংশ একটি কাচের পরীক্ষা-নলে পুরে হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও ডাঃ হিট্‌লি গিয়ে উপস্থিত হলেন আমেরিকায়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিভিন্ন স্তর পার হয়ে প্রথমে ডাঃ রেপার ও পরে ডাঃ ময়ার ও ডাঃ হিট্‌লির সমবেত চেষ্টায় বড় বড় চৌবাচ্চার মধ্যে শস্য-ভিজানো জলে ছত্রাকটির চাষের ফলে যথেষ্ট পরিমাণে পেনিসিলিন পাওয়া সম্ভব হলো। অবশেষে সেখানেই তা থেকে প্রচুর পরিমাণে নিষ্কাশন ও বিশুদ্ধ পেনিসিলিন তৈরির উপায় উদ্ভাবিত হয়।

যে গবেষণার পথে ফ্লেমিং একদিন ছিলেন একাকী নিঃসঙ্গ যাত্রী—তাই অবশেষে ফ্লোরির অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে সাফল্যলাভ করলো এবং তাঁরা দুজনে মানবের প্রাণরক্ষাকারী শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরূপে পৃথিবীর কাছে সমাদৃত হলেন।

পেনিসিলিনের পরেই উল্লেখযোগ্য স্ট্রেপ্‌টো-মাইসিন। রাটজার (Rutgers) বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক সেলম্যান এ ওয়াক্সম্যান ও তাঁর এককালীন ছাত্র ডুবোর (Dubos) অধ্যবসায় ও গবেষণার ফলেই আবিষ্কৃত হয় এই দ্বিতীয় অত্যাশ্চর্য অ্যান্টিবায়োটিকটি। পেনিসিলিন আবিষ্কারের মত এরও আবিষ্কারের ইতিহাস চমকপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক।

১৯২৭ সালে রকফেলার ইনস্টিটিউটে ডাঃ ডুবোর

উপর তার পড়ে, নিউমোনিয়া জীবাণুর কঠিন বহিরাবরণটির ক্ষয় ঘটাতে সমর্থ কোন রাসায়নিক উপাদান বা জীবাণুর অনুসন্ধানের জন্যে। ঐ সময়ে নিউ জার্সিতে ডাঃ ওয়াক্সম্যানও যক্ষ্মা-জীবাণুর আবরণ ক্ষয় করতে সক্ষম কোনও একটা রাসায়নিক উপাদান খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রের একে অন্যের কাজের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য ছিল এবং দুজনেই দুজনের কাজে আগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলেন।

পাস্তুরের ধারণা অনুসারে নিউমোনিয়ার জীবাণুর প্রতিকূল অন্য কোন জীবাণু মাটিতে পাওয়া যায় কিনা, তাই ছিল দুবোর অনুসন্ধানের বিষয়। ভাবতে ভাবতে তিনি ঠিক করলেন, দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ যেমন স্বাভাবিক খাদ্যের অভাবে যা-তা খেতে আরম্ভ করে, খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না, জীবাণুরাও হয়তো বা ঐ অবস্থায় অভ্যস্ত খাদ্যের অভাবে, পাশে অন্য জীবাণু পেলে তাই খেতে আরম্ভ করবে। এই উদ্দেশ্যে মাটিসমেত কতকগুলি জীবাণুকে জলের গ্লাসে রেখে যতদিন পর্যন্ত ঐ মাটিতে বর্তমান খাদ্য তারা খেয়ে শেষ না করে, ততদিন বদ্ধভাবে আর কিছুর সংস্পর্শে যেতে না দিয়ে রাখবার পর তাদের উপর নিউমোনিয়া জীবাণুর মিশ্রণ ঢেলে দিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি অবাক হয়ে দেখতে পেলেন যে, অসংখ্য আগের জীবাণু খাদ্যাভাবে মরে গেলেও তাঁর নিজের আশানুরূপ অন্ততঃ কিছু সংখ্যক প্রথম জীবাণু নিউমোনিয়া জীবাণুকে খেয়ে বেশ বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। এই নিউমোনিয়া জীবাণু-ভুক জীবাণুগুলির নির্যাস থেকে একটি রাসায়নিক উপাদান নিয়ে ইঁদুরের দেহে সংক্রামিত নিউ-মোনিয়া জীবাণুকে তার দ্বারা তিনি ধ্বংস করতে সক্ষম হলেন। তারই নামকরণ হলো টাইরোথ্রিসিন এবং ঐ সঙ্গে আরো একটি অ্যাণ্টিবায়োটিক পাওয়া গেল (১৯৩৯) গ্র্যামিসিডিন নামে। রোগীর দেহে টাইরোথ্রিসিন প্রয়োগ কিন্তু সম্ভব হলো না—কেন না, নিউমোনিয়া জীবাণু ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাতে রক্তের লোহিত-কণিকাগুলিও মারা পড়ে, এরূপ দেখা গেল। তাহলেও অন্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ পচনশীল দুষ্টক্ষত ও অন্যান্য চর্মরোগে তার উপকারিতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো। একই ভাবে বাহ্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্র্যামিসিডিনও যে বিশেষ ফলপ্রদ, এরূপ দেখা গেল।

রকফেলার ইনস্টিটিউটে ডাঃ দুবোর আবিষ্কৃত এই দুটি অ্যাণ্টিবায়োটিকই ঐ একই ইনস্টিটিউটে ডাঃ ফ্লোরি ও তাঁর সহযোগীদের পেনিসিলিন-গবেষণায় আর্থিক আনুকূল্যের পথ প্রশস্ত করে দিল এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের জীবাণুধ্বংসী ছত্রাক বা অন্য জীবাণু-নিঃসৃত অ্যাণ্টিবায়োটিক আবিষ্কারের প্রয়াসে অনুপ্রাণিত করলো। নিউ জার্সির কৃষি-গবেষণা কেন্দ্রের ডাঃ সেলম্যান ওয়াক্সম্যান যক্ষ্মা-জীবাণুর দুর্ভেদ্য কঠিন আবরণটি কিসে ভাঙ্গা যায়, তারই কথা তখন চিন্তা করছিলেন। শিষ্য দুবোর আবিষ্কার থেকে তাঁর নিশ্চিত ধারণা হলো যে, মাটিতে জন্মায় যে সকল ছত্রাক, তাথেকে নিশ্চয়ই অন্যান্য—এমন কি, যক্ষ্মাধ্বংসকারী ওষুধও বের করা সম্ভব। এজন্যে তিনি মানুষের কবরখানা ও মৃত পশুদের যে সকল স্থানে কবর দেওয়া হয়, তাদের মাটির জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ অধ্যবসায়ের সঙ্গে চালিয়ে যেতে লাগলেন এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এমন কতকগুলি জীবাণু আছে, যারা অন্যগুলির বৃদ্ধি প্রতিহত করে কিংবা একেবারেই তাদের নাশ করতে পারে এবং নানাভাবে অবস্থার পরিবর্তনে তাদের ঐরূপ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাও সম্ভব। পাস্তুর পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন যে, ব্যাধিজয়ে জীবাণুরাই বলবে শেষ কথা "Ce sont les microbes qui

auront le dernier mot"। ওয়াক্সম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে তাঁদের অধ্যবসায় ও কর্মনিষ্ঠার দ্বারা ঐ আর্ষবাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হলেন।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়াক্সম্যান ও তাঁর সহযোগিগণ একটি ব্যাধিগ্রস্ত মুরগীর গলায় আট্‌কে-থাকা চট্‌চটে মাটির ডেলার মধ্যে গজানো ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসেস গ্রিসিয়াস (Streptomyces griseus) নামে একপ্রকার ছত্রাকের সন্ধান পেলেন। এতদিন তিনি যে 'মৃতসঞ্জীবনী'র সন্ধানে ছিলেন, এভাবে হঠাৎ তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে তা ধরা দিল। তারই নির্যাস থেকে তিনি দেবেরও অসাধ্য যক্ষ্মারোগ ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ, যেমন—হুপিং কাশি, নানাপ্রকারের আমাশয়, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পচনশীল ঘা প্রভৃতির মহৌষধ ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কারে সক্ষম হলেন। এর আবিষ্কারের পর একদিকে যেমন অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন উৎপাদনের চেষ্টা চললো, আবার অন্য দিকে রোগীর দেহে তার উপকারিতা ও অনিষ্টকর প্রভাব কিছু আছে কিনা, সে সম্বন্ধেও প্রচুর গবেষণা-কার্য হতে লাগলো। দেখা গেল যে, বেশী প্রয়োগে শ্রুতিবহ নার্ভের (Auditory nerve) ক্রিয়া ব্যাহত হয়, কিন্তু কিছুটা পরিবর্তিত আকারে অর্থাৎ ডাইহাইড্রো-ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন রূপে ইনজেকশনে ঐরূপ কুফল এড়ানো যায়। আবার অনেক দিন ধরে প্রয়োগ চলতে থাকলে শেষের দিকে আর তেমন আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। সেই কারণে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের সঙ্গে আইসোনিয়াজিড (Isoniazid), PAS (Para-amino-Salicylic Acid) এবং নবতর অ্যান্টিবায়োটিক টেরামাইসিন (Terramycin), ভায়োমাইসিন (Viomycin) প্রভৃতি ডাইহাইড্রো-ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের সঙ্গে দিলে দেবের অসাধ্য (?) যক্ষ্মারোগও সমূলে নির্মূল হয়ে যায়।

১৯৫৫ সালে জর্জিয়া ষ্টেটের অন্তর্গত অ্যাটলান্টায় (Atlanta, Georgia) সাইক্লোসেরিন (Cycloserine) নামে আর একটি যক্ষ্মারোগে ফলপ্রদ অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়। নিউ ইয়র্ক সিটির মেট্রোপলিটান হাসপাতালের ডাঃ এপ্‌ষ্টিন (Dr. Epstein) ও সহকর্মী ডাঃ নায়ার (Dr. Nair), যে সকল যক্ষ্মারোগীর অন্যান্য চিকিৎসা সত্ত্বেও আর বাঁচবার কোন আশাই ছিল না, এরূপ ২৯ জনকে এই ওষুধটির সাহায্যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। ঐ অ্যাটলান্টাতেই প্রায় একই সময়ে অক্সামাইসিন (Oxamycin) নামে আর একটি যক্ষ্মা-প্রতিষেধক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়। এখন পর্যন্ত এগুলির খুব বেশী পরিমাণে উৎপাদন সম্ভব হয় নি, তাহলেও যে সকল রোগী ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ও অন্যান্য উপাদানের সাহায্যে চিকিৎসা সত্ত্বেও ভাল হয় নি, এগুলির সাহায্যে তাদেরও সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের সম্ভাবনা। যক্ষ্মার জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত মেনিন্‌জাইটিস, অন্ত্রপ্রদাহ প্রভৃতি ছাড়া অন্য জীবাণুঘটিত মূত্রসংক্রান্ত রোগগুলিও এদের এবং বিশেষতঃ সাইক্লোসেরিনের দ্বারা আরোগ্য হয়।

ছত্রাকঘটিত অব্যর্থ ফলপ্রদ ওষুধ পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রভৃতির আবিষ্কারে বিজ্ঞানীদের চোখে একটি সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত রাজ্যের রুদ্ধদ্বার খুলে গেল। তাঁরা কোমর বেঁধে লেগে গেলেন নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধানে। কয়েক বছর প্রয়োগের পর দেখা গেল, পেনিসিলিন বা ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের কর্মক্ষেত্র খুব বিস্তৃত নয়, যেমন —রিকেটসী (Rickettsiae) বা ভাইরাস রোগে তাদের কোনটিই ফলপ্রদ নয়। আবার গ্র্যাম-রঞ্জকের দ্বারা রঞ্জিত (Gram positive) জীবাণুর উপর পেনিসিলিনের প্রভাব যত, ঐভাবে অরঞ্জিত (Gram negative) জীবাণুর উপর তত প্রভাব নেই, অন্যভাবে ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের প্রভাব ঠিক

উল্টো। সুতরাং বহুবিস্তৃত প্রভাববিশিষ্ট (Broad spectrum) অ্যাণ্টিবায়োটিকের সন্ধান করতে আরম্ভ করলেন বিজ্ঞানীরা। তারই ফলে ১৯৫২ সালের মধ্যে পার্ক ডেভিস কোম্পানীর লেবরেটরীতে আবিষ্কৃত হলো ক্লোরোমাইসেটিন, লেডারলে লেবরেটরীতে অরিয়োমাইসিন এবং ফাইজার লেবরেটরীতে টেরামাইসিন। এই তিনটিই টেট্রাসাইক্লিন (Tetracyclin) জাতীয় বহু বিস্তৃত প্রভাব-সম্পন্ন অ্যাণ্টিবায়োটিক।

অরিয়োমাইসিনও (Aureomycin) প্রায় ক্লোরোমাইসেটিনের মতই বহুবিস্তৃত প্রভাবসম্পন্ন একটি অ্যাণ্টিবায়োটিক। এটি আবার স্কার্লেট ও টাইফাস জ্বর (Scarlet & Typhus fevers), নিউমোনিয়া, বি-কোলাই, রিকেট্সী এবং নানা ভাইরাসঘটিত রোগেরও ফলপ্রদ ওষুধ।

ফাইজার গবেষণাগারে তৈরী টেরামাইসিনও (Terramycin) অরিয়োমাইসিনের মতই অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (Oxytetracycline) জাতীয়
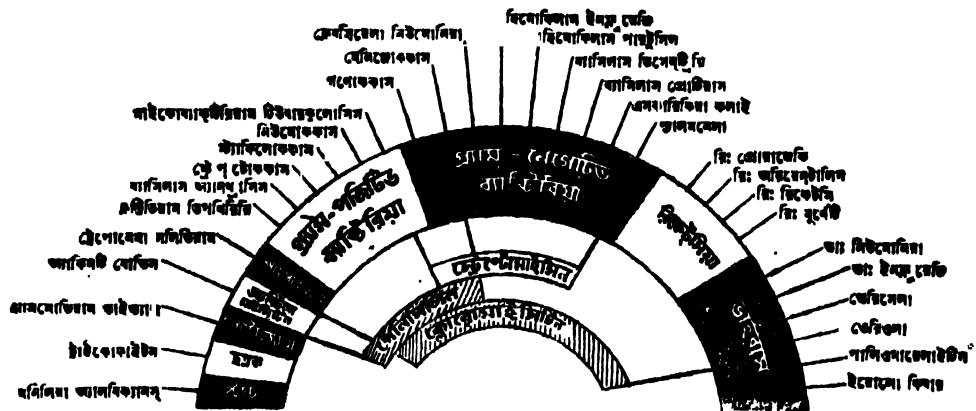
বিভিন্ন রোগ-জীবাণু প্রতিরোধে বিভিন্ন নাশক-বস্তুর কার্যকারিতা

পার্ক ডেভিস কোম্পানীর গবেষণাগারে ক্লোরোমাইসেটিন (Chloromycetin) প্রথমে প্রস্তুত হয় ষ্ট্রেপ্টোমাইসেস ভেনিজুয়েলি (Streptomyces venezuelae) নামক ছত্রাক থেকে। কিন্তু মহিলা বিজ্ঞানী ডাঃ মিলড্রেড রেবস্টকই সর্বপ্রথমে সম্পূর্ণ রাসায়নিক পদ্ধতিতে এই অ্যাণ্টিবায়োটিক ওষুধটিকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। আজ ক্লোরোমাইসেটিন, যে সকল রোগে পেনিসিলিন ও ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন কাজ করে, সেগুলি ছাড়াও অন্যান্য মারাত্মক রোগ, যেমন— জীবাণুঘটিত টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড প্রভৃতি এবং ভাইরাসঘটিত নিউমোনিয়া, হার্পিস প্রভৃতি রোগেরও অব্যর্থ ওষুধ বলে পরিচিত।

লেডারলে গবেষণাগারে প্রস্তুত সোনার রঙের আর একটি অ্যাণ্টিবায়োটিক। একই ভাবে বহু রোগে এরও সাফল্যমূলক প্রয়োগ হয়। বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্রগুলির রোগে—এমন কি, যক্ষ্মারোগে পর্যন্ত তা ফলপ্রদ। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের সঙ্গে একত্রে ব্যবহারে এর দ্বারা যক্ষ্মারোগকে সম্পূর্ণরূপে কাবু ও প্রতিহত করা যায়।

বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন নামে, যেমন—অ্যাক্রোমাইসিন, পলিসাইক্লিন, টেট্রাসিন, স্টেক্লিন, প্যানমাইসিন (Polycycline, Tetracyn, Steclin, Panmycin), টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় ওষুধ তৈরি করে বাজারে ছাড়ছেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য অ্যাণ্টিবায়োটিক ব্যাসিট্রাসিন (Bacitracin)। কলাম্বিয়া বিশ্ব-

বিত্তালয়ের শল্যচিকিৎসা বিভাগের দু-জন চিকিৎসক ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক মিনিলি ও মিস বলবিনা জনসন, মার্গারেট ট্র্যাসি নামে একজন রোগিণীর পায়ের হাড়ভাঙা-জনিত ক্ষতস্থানে এমন কতকগুলি জীবাণুর সন্ধান পেলেন, যারা রক্তদুষ্টিকর অন্ত জীবাণুদের ক্রিয়া কতকটা প্রতিহত করছে বলে আন্দাজ করলেন। এগুলিকে সরিয়ে উপযুক্ত চাষের দ্বারা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দীর্ঘ অধ্যবসায় ও চেষ্টার পর ঐগুলির মধ্যে তাঁরা এমন কিছু পেলেন, যার দ্বারা রক্তদুষ্টিকর জীবাণুর বিনাশ সম্ভব। তাঁরা মার্গারেট ট্র্যাসির দেহ থেকে প্রাপ্ত বলে ঐ অ্যান্টিবায়োটিকের নামকরণ করলেন "ব্যাসিট্র্যাসিন"। এই ওষুধকে কোঁড়ার মধ্যে ইনজেকশন করলে কিংবা ঘা ও ক্ষতের উপর মলমরূপে লাগালেও খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। বর্তমানে ঐরূপ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে পেনিসিলিনের মত ইনজেকশন করেও রোগীকে নিরাময় করবার জন্যে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

আমাদের দেশেও যে অ্যান্টিবায়োটিক-গবেষণা না হচ্ছে এমন নয়। পলিপোরিন ও জহোরিন (Polyporin & Johorin) নামে ওষুধের প্রাথমিক সন্ধানের রিপোর্ট বেরিয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মত স্তরে এখনো ঐগুলি এসে পৌঁছায় নি।

পরিশেষে বক্তব্য, অ্যান্টিবায়োটিক-চিকিৎসার ফলে বহুলোকের অকালে প্রাণহানি কিংবা স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা দূর হয়ে মানুষের গড়পড়তা আয়ুবৃদ্ধি সত্ত্বেও ঐগুলির অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় কিংবা মাত্রাধিক ব্যবহারের কুফল সম্বন্ধে সর্বদাই অবহিত থাকা উচিত। ঐ ভাবে অযথা ব্যবহারে দেহে প্রতিরোধ-শক্তি জন্মানোতে প্রয়োজনমত ব্যবহারেও ফল পাওয়া না যেতে পারে এবং সময়ে সময়ে এলার্জির (Allergy) আবির্ভাবে সাতিশয় কষ্ট এবং সময়ে সময়ে প্রাণহানির পর্যন্ত আশঙ্কা ঘটতে পারে। অ্যান্টি-বায়োটিক্স প্রয়োগকালে দেখতে হবে যে, তাতে যেন রোগের কারণ জীবাণুর ধ্বংস হয় অথচ রক্তকোষ বা দেহকোষের কোন ক্ষতি না হয়। আবার মুখে খেলে যেমন রক্তের বা দেহের কোন অংশে অবস্থিত রোগ-জীবাণু মারা পড়ে, তেমনি বৃহদন্ত্রে বর্তমান ভিটামিন-প্রস্তুতকারী জীবাণুগুলিরও বিনাশ ঘটে। সেই কারণে তাদের সঙ্গে সর্বদাই কিছু না কিছু ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স (B-Complex) খেতে দেওয়া উচিত, তা না হলে বিপত্তির সমূহ আশঙ্কা। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিনের সঙ্গে কিছুটা অ্যালকালিও খেতে দেওয়া উচিত।

"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা আবশ্যক।"

রবীন্দ্রনাথ

আয়ন-মণ্ডল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

ভূমিকা

আয়ন-মণ্ডল নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান দেশে-বিদেশে বহু বছর থেকেই আরম্ভ হয়েছে। আয়ন-মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের আবিষ্কার এবং স্তরগুলির গুণাগুণ, বিশেষত্ব ও অন্যান্য কথা বর্তমান প্রবন্ধে সাধারণভাবে আলোচিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উর্ধ্বে আয়ন-মণ্ডলে প্রেরণ করে এবং তাথেকে প্রতিফলিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে যে সব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সম্ভব হয়েছে—তা সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। আয়ন-মণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গ কখন ও কিভাবে প্রতিফলিত হয়—বর্তমান প্রবন্ধে তার নিয়ম-সূত্রের নির্দেশ এবং আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের উপর ভূ-চুম্বকত্বের প্রভাব সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য অনেক কথা বলা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উর্ধ্বে পাঠিয়ে ও প্রতিফলিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে আয়ন-মণ্ডলের উপরিভাগের কোনও তথ্য আমাদের জানা সম্ভব নয়। কেন তা সম্ভব নয়, সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে। প্রায় দশ বছর থেকে সে জন্যে ভূতল থেকে বহু উর্ধ্বে কৃত্রিম উপগ্রহে অবস্থিত বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ নিয়ে আয়ন-মণ্ডলের দিকে প্রেরণ এবং আয়ন-মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরগুলি থেকে উর্ধ্বে প্রতিফলিত তরঙ্গ সেই উপগ্রহে অবস্থিত গ্রাহক যন্ত্রে গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উর্ধ্বে কৃত্রিম উপগ্রহে অবস্থিত গ্রাহক যন্ত্রে গৃহীত ফলাফল স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৃথিবী-পৃষ্ঠে আবার প্রেরণ করাও কার্যকরী হয়েছে—যার ফলে আয়ন-মণ্ডলের উপরের দিকের অনেক তথ্য জানা আজ সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আয়ন-মণ্ডলের উপরিভাগ সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূচনা হয়েছে, তার কিছু আভাসও এই প্রবন্ধে পাওয়া যাবে।

ভূ-তরঙ্গ ও আকাশ-তরঙ্গ

বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সাধারণতঃ এরিয়েলের সব দিকেই ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর গা বেয়ে যে তরঙ্গ যায়, তাকে ভূ-তরঙ্গ (Gıound wave) বলা হয়। ভূ-তরঙ্গ যখন ভূপৃষ্ঠ-তলে অগ্রসর হতে থাকে, পৃথিবীর মাটি তখন এই তরঙ্গকে ক্রমশঃ শোষণ করে নেয়। শোষণের ফলে বেশী দূর যেতে না যেতেই ভূ-তরঙ্গ তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ফেলে। এই শক্তি-হ্রাসের হার প্রধানতঃ মাটির তড়িৎ-পরিবাহিতার উপর নির্ভর করে। দীর্ঘ বা মধ্যম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠের উপর কয়েক শত মাইল পর্যন্ত যেতে পারে—হ্রস্ব তরঙ্গের দৌড় তার চেয়েও কম—অথচ দেশ-দেশান্তর থেকে কথা বা গান বেতারে শোনা যায়। বেতারের আদিপর্বেই মার্কোনি আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে প্রায় দু-হাজার মাইল পর্যন্ত বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়েছিলেন। এ কি করে সম্ভব হলো, তার উত্তর দিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী হেভিসাইড (Heaviside) ও মার্কিন বিজ্ঞানী কেনেলী (Kennelly)। ১৯০২ সালে এঁরা দু-জন প্রায় একই সময়ে এই মত প্রচার করেন যে, পৃথিবী থেকে প্রায় এক শত কিলো-মিটার উর্ধ্বে একটি তড়িৎ-পরিবাহী স্তর আছে।

বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উপরের দিকে উঠে এই স্তরটির উপর গিয়ে পড়ে এবং তাথেকে প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। কল্পিত এই স্তরটির নামকরণ হয়েছিল—কেনেলী-হেভিসাইড স্তর। এথেকে প্রতিফলিত তরঙ্গকেই আকাশ-তরঙ্গ (Sky wave) বলা হয়। বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ যখন একদিকে হেলে কেনেলী-হেভিসাইড স্তরে আপতিত হয়, তখন এই তরঙ্গ ঐ স্তর থেকে ঠিক বিপরীত দিকে হেলে প্রতিফলিত হয়ে বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে দূরে ভূপৃষ্ঠে আবার নেমে আসে। আকাশ-তরঙ্গের সাহায্যে এভাবেই দূর-দূরান্তরে বেতার-বার্তা প্রেরিত হয়। বহু বছর আগেই পৃথিবীর চৌম্বক বলের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি তড়িৎ-পরিবাহী স্তরের কল্পনা করা হয়েছিল—কেনেলী ও হেভিসাইড এই পুরাতন পরিকল্পনারই নতুন যুক্তি দিয়েছিলেন। বেতার-তরঙ্গ কি প্রক্রিয়ায় তড়িৎ-পরিবাহী স্তর থেকে নেমে আসে, ১৯১২ সালে ইংল্যাণ্ডের ইক্‌লস্ (Eccles) ও লারমার (Larmor) এই বিষয়ে গবেষণা করেন। তত্ত্বের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে এই বিষয়ের মোটামুটি আলোচনাই এখানে যথেষ্ট হবে।

আয়ন-মণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন

কেনেলী-হেভিসাইড স্তরে বহুসংখ্যক ইলেকট্রন মুক্ত অবস্থায় থাকে—যার জন্যে স্তরটি তড়িৎ-পরিবাহিতা গুণ পায়। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, আয়ন-মণ্ডলের যে কোনও স্তরে ইলেকট্রনের ঘনত্ব উপরের দিকে কিছু দূর পর্যন্ত অল্পে অল্পে বেড়ে গিয়ে চরমে এসে পৌঁছয় এবং আরও ঊর্ধ্বে ইলেকট্রনের ঘনত্ব আবার ক্রমশঃ কমতে থাকে। আয়ন-মণ্ডলের নিম্ন প্রান্তে বেতার-তরঙ্গ যখন একদিকে হেলে আপতিত হয় এবং ক্রমবর্ধমান ইলেকট্রন-সংখ্যার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়, তখন এই স্তরের ভিন্ন ভিন্ন ধাপে আংশিক প্রতিফলন ও প্রতিসরণ (Refraction) হয়। বেতার-তরঙ্গের বেশীর ভাগই স্তরের ভিতর প্রবেশ করে ও ভূপৃষ্ঠের দিকে ক্রমশঃ বেঁকতে বেঁকতে উপরে উঠতে থাকে। ভূপৃষ্ঠের দিকে বেতার-তরঙ্গের ক্রম-প্রতিসরণের ফলে স্তরের ধাপে ধাপে ঐ তরঙ্গের আপতন-কোণ ক্রমে বাড়তে থাকে। যখন এই আপতন-কোণ সঙ্কট-কোণের (Critical angle) সমান হয়, তখন তরঙ্গের সবটাই প্রতিফলিত হয়ে নীচের দিকে নেমে যায়। পূর্ণ-প্রতিফলনের পর নীচে নামবার পথে ইলেকট্রনের সংখ্যা ক্রমশঃ কম বলে বেতার-তরঙ্গের পথ বিপরীত দিকে আবার বেঁকতে থাকে। অবশেষে স্তরের নিম্ন প্রান্ত অতিক্রম করে বেতার-তরঙ্গ তির্যকভাবে পৃথিবীর দিকে নেমে আসে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

আয়ন-মণ্ডল থেকে এভাবে প্রতিফলিত হয়ে বেতার-তরঙ্গ প্রেরক-কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। বেতার-তরঙ্গ যদি হ্রস্ব হয়, তবে এই দূরত্ব খুব বেশী হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত অধিক হলে এই দূরত্বও অপেক্ষাকৃত কম হয়। আবার বেতার-তরঙ্গ যদি খুব বেশী হ্রস্ব হয়, তবে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশী হলেও পূর্ণ-প্রতিফলন সম্ভব নয়। বেতার-তরঙ্গ তখন স্তর ভেদ করে ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

আয়ন-মণ্ডল থেকে আকাশ-তরঙ্গ যখন পৃথিবীতে নামে, পৃথিবীর মাটি থেকেও তা আবার কিছু পরিমাণে উপরের দিকে প্রতিফলিত হয়। এই ঊর্ধ্বগামী প্রতিফলিত তরঙ্গ আবার উপরের স্তরে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিফলিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে আবার নেমে আসে। দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গগুলি ভূপৃষ্ঠ ও উপরের স্তর থেকে পর্যায়ক্রমে অনেক বার প্রতিফলিত হতে পারে। হ্রস্ব-তরঙ্গের

ক্ষেত্রে সময় সময় এমন হতে পারে যে, তরঙ্গ উপরে উঠে কেনেলী-হেভিসাইড স্তরে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল পথে চলতে থাকে। এই

বেতার-তরঙ্গ যদি খাড়াভাবে উপরের দিকে পাঠানো যায়, তাহলেও দেখা যায়, কেনেলী-হেভিসাইড স্তরের বিশেষ কোনও উচ্চতা থেকে
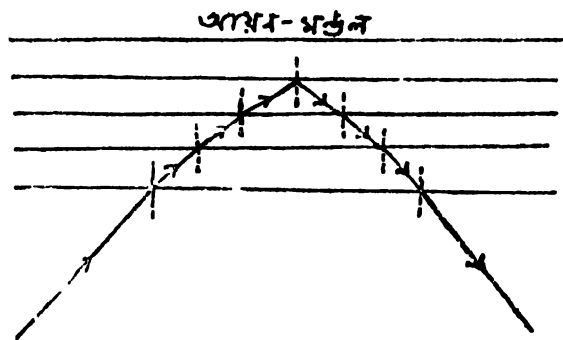
১নং চিত্র

আয়ন-মণ্ডলে বেতার তরঙ্গের প্রতিসরণ ও পূর্ণ-প্রতিফলন।

ভাবে চলতে চলতে স্তরের আভ্যন্তরীণ কোনও পরিবর্তনের ফলে বেতার-তরঙ্গ কখনও কখনও ভূ-গোলকে প্রেরক-কেন্দ্রের প্রায় বিপরীত দিকে

বেতার-তরঙ্গের পূর্ণ-প্রতিফলন হয়। তির্যক-ভাবে আপতিত বেতার-তরঙ্গের বেলায় স্তরের ধাপে ধাপে যে আংশিক প্রতিফলন ও প্রতিসরণ
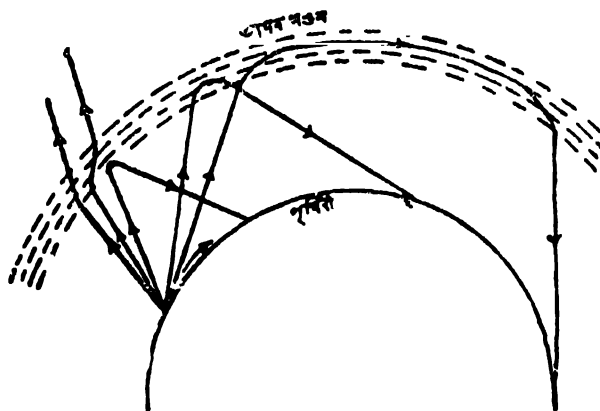
আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের অনুপ্রবেশ ও প্রতিফলন

২নং চিত্র

নেমে আসতে পারে। এই অবস্থায় বেতার-তরঙ্গের পক্ষে পৃথিবী প্রদক্ষিণও কিছুমাত্র আশ্চর্য নয় (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এবং পরে পূর্ণ-প্রতিফলন ১নং চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, ঊর্ধ্বাধঃভাবে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের বেলায় তা প্রযোজ্য নয়; কারণ বেতার-তরঙ্গ

খাড়াভাবে উর্ধ্বে প্রেরিত হলে প্রতিসরণের প্রশ্নই ওঠে না। তবে এ-ক্ষেত্রে পূর্ণ-প্রতিফলনের ব্যাখ্যা হয় কি করে? ব্যাখ্যা মোটামুটিভাবে এই রকম: বেতার-প্রেরক কেন্দ্র থেকে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-বিক্ষেপ সঞ্চারিত হয় এবং উর্ধ্বে আয়ন-মণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করে, গণিতজ্ঞ ফুরিয়ের (Fourier) বিশ্লেষণ-বিধি অনুসারে তা ক্রমবর্ধমান স্পন্দনাঙ্কের অসংখ্য অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পর্যবসিত হয়। আয়ন-মণ্ডলে এই তরঙ্গরাজির সমষ্টিগত রূপায়ণের যে গতিবেগ, শূন্যে আলোকের গতিবেগ অপেক্ষা তা কম। এই সমষ্টিমূলক তরঙ্গের গতিবেগকে সংক্ষেপে সমষ্টিগত বেগ (Group velocity) বলা যেতে পারে। একক তরঙ্গের ব্যষ্টিগত বেগ (Wave velocity) যে বহুল তরঙ্গের সমষ্টিগত বেগ থেকে ভিন্ন, তা ইংরেজ বিজ্ঞানী র‍্যালে (Rayleigh) বহু বছর আগেই দেখিয়েছিলেন। আয়ন-মণ্ডলের স্তরে প্রবেশ করে বেতার-তরঙ্গ যখন ক্রমবর্ধমান ইলেকট্রন-সংখ্যার মধ্য দিয়ে উর্ধ্বে অগ্রসর হয়, তখন তার 'ফুরিয়ে'-উপাংশগুলির (Fourier components) সমষ্টিগত বেগ ক্রমশঃ কমতে থাকে। ইলেকট্রনের ঘনত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগত বেগ যখন কমতে কমতে শূন্যে পরিণত হয়, তখনই তরঙ্গরাজি পৃথিবীর দিকে আবার নেমে আসে—বিজ্ঞানীরা এরূপ পরিকল্পনা করে থাকেন। তরঙ্গরাজির সমষ্টিগত গতিবেগ আয়ন-মণ্ডলের স্তরের যে স্থানটিতে শূন্যে পরিণত হয়, সেই স্থানের প্রতি-সরাঙ্কও তখন শূন্য হয়। কাজেই তরঙ্গরাজির সমষ্টিগত বেগ U=০, অথবা প্রতিসরাঙ্ক μ=০ — এই হলো আয়ন-মণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের মূল সর্ত বা সূত্র। এই মূল সূত্রটি থেকে যে সমীকরণটি পাওয়া যায়, তাথেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আয়ন-মণ্ডলে ইলেকট্রনের ঘনত্ব যদি কোনও বিশেষ মানের হয়, তবে উর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গ ঐ স্থানটি থেকে সম্পূর্ণভাবে প্রতি-ফলিত হতে পারে, যদি তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা স্পন্দনাঙ্ক এক নির্দিষ্ট মানের হয়। স্পন্দনাঙ্ক এই নির্দিষ্ট মান অপেক্ষা বেশী হলেই বেতার-তরঙ্গ আয়ন-মণ্ডলের স্তরটিকে অতিক্রম করে উর্ধ্বে উঠে যায়—আবার স্পন্দনাঙ্ক যদি এই নির্দিষ্ট মানের কম হয়, তবে বেতার-তরঙ্গ নীচের দিকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হবে সন্দেহ নেই। এই নির্দিষ্ট স্পন্দনাঙ্ককেই অনুপ্রবেশশীল সঙ্কট-স্পন্দনাঙ্ক (Critical penetration frequency) বলা হয়। আয়ন-মণ্ডলের স্তরের যে স্থানে ইলেকট্রনের ঘনত্ব সর্বোচ্চ, সেই সর্বোচ্চ ইলেক-ট্রনের ঘনত্ব এবং ঐ স্তরের সঙ্কট-স্পন্দনাঙ্ক এই দুইয়ের সম্বন্ধ নিম্নলিখিত সূত্র থেকে জানা যায়:

$$f_0^2 = \frac{Ne^2}{\pi m} \quad \cdots \quad \cdots \quad (১)$$

এখানে f_0 হচ্ছে সঙ্কট-স্পন্দনাঙ্ক

N—আয়ন-মণ্ডলের স্তরের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন-ঘনত্ব

e ও m ইলেকট্রনের তড়িৎ-মান ও ভর

এবং $\pi = \frac{22}{7}$

এখানে বলা প্রয়োজন যে, তির্যকভাবে যখন বেতার-তরঙ্গ আয়ন-মণ্ডলের স্তরে আপতিত হয়, তখনও আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গরাজির সমষ্টিগত গতিবেগ U=০ অথবা আয়ন-মণ্ডলের প্রতিসরাঙ্ক μ=০, এই সাধারণ সূত্র থেকেও এই বিষয়ের অনুশীলন সম্ভব।

আয়ন-মণ্ডলের বিভিন্ন স্তর

আয়ন-মণ্ডল সম্বন্ধে তাত্ত্বিক অনুশীলন সত্ত্বেও এর অস্তিত্বের সাক্ষাৎ পরীক্ষাগত প্রমাণ পাওয়া যায় অনেক পরে। ১৯২৫ সালে সর্বপ্রথম আমেরিকায় ব্রাইট (Breit) ও টুভ (Tuve) উর্ধ্বে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের বিক্ষেপ পাঠিয়ে আয়ন-মণ্ডল থেকে প্রতিফলিত বিক্ষেপ গ্রাহক যন্ত্রে লিপিবদ্ধ

করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে প্রায় একই সময়ে অ্যাপল্টন (Appleton) ও তাঁর সহকর্মীরা এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী আয়ন-মণ্ডলের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ভূতল থেকে প্রায় এক শত কিলোমিটার ঊর্ধ্বে কেনেলী ও হেভিসাইড কল্পিত তড়িৎ-পরিবাহী স্তরটি তাঁদের পরিকল্পনার প্রায় তেইশ বছর পরে সাক্ষাৎভাবে প্রমাণিত হলো। এর এক বছর পরেই অ্যাপলটন আরও ঊর্ধ্বে আরও একটি অনুরূপ স্তরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। আজকাল এই দুই স্তরের নীচেরটিকে (অর্থাৎ কেনেলী-হেভিসাইড স্তরটিকে) E-স্তর ও উপরেরটিকে F-স্তর বলা হয়। E-স্তরের ঠিক নীচে অ্যাপল্টন আরও একটি স্তরের সন্ধান কখনও কখনও পেয়েছিলেন। এই স্তরটি বেতার-তরঙ্গকে শোষণ করে এবং ক্বচিৎ কখনও প্রতিফলিত করে—সে জন্যে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন নিয়ে এর সন্ধান সব সময়ে পাওয়া যায় না। এরই নাম D-স্তর। ভারতীয় বিজ্ঞানী শিশিরকুমার মিত্রের গবেষণায় D-স্তরের অস্তিত্ব সর্ববাদিসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং তারই ফলে D-স্তর সম্বন্ধে নানাদিক দিয়ে অনুশীলনের সূত্রপাত হয়। সাধারণতঃ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত D-স্তরটি থাকে। অ্যাপলটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, দিনের বেলায় এবং কখনও কখনও রাত্রে F-স্তরটি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই দুই ভাগকে F_1 ও F_2 নাম দেওয়া হয়েছে। F-স্তরের উপরেও কয়েকটি তড়িৎ-পরিবাহী স্তর থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে। এদের G ও H নামে অভিহিত করা হয়েছে। বহু বছর থেকেই E-স্তরের কিছু উপরে, ভূতল থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে একটি স্তরের সন্ধান মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। এই স্তরটি থেকে বেতার-তরঙ্গ সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিফলিত হয় এবং এই বিক্ষিপ্ত তরঙ্গের বিস্তারও অনির্দিষ্ট ও অনিয়মিতভাবে কমে-বাড়ে। এই স্তরটিকেই বিক্ষিপ্ত (Sporadic) E-স্তর বা সংক্ষেপে E_s-স্তর বলা হয়। ইলেকট্রনের ঘনত্ব এই বিশেষ স্তরটিতে E-স্তর অপেক্ষা অনেক বেশী। বেতার-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তুলনায় সাধারণ E-স্তরকে পুরুই বলা যেতে পারে—F-স্তর আরও অনেক বেশী পুরু। কিন্তু E_s-স্তরটি অত্যন্ত ছাড়া-ছাড়া এবং সম্ভবতঃ অত্যন্ত পাত্‌লা বা অগভীর। তত্ত্বের দিক থেকে পাত্‌লা বা অগভীর স্তরে আংশিক প্রতিফলন ও আংশিক অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা—আবার স্তরটি ছাড়া-ছাড়া হলেও ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন ও স্তরের ফাঁকে ফাঁকে অনুপ্রবেশ সম্ভব হতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে E_s-স্তরে সাধারণতঃ আংশিক প্রতিফলন ও আংশিক অনুপ্রবেশ দেখা যায়—যার ফলে E_s ও F-স্তর থেকে বেতার-তরঙ্গ বিক্ষেপের প্রতিফলন একই সঙ্গে অনেক সময়ে পাওয়া যায়।

ওজোন-স্তরটি (Ozone) D-স্তরেরও অনেক নীচে, প্রায় ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে অবস্থিত। বেতার-তরঙ্গের চলাচলে ওজোন-স্তর কোন ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে না। অবশ্য সূর্য থেকে অতিবেগুনি বিকিরণের অনেক অংশই ওজোন-স্তরটি শোষণ করে নেয়। শিশিরকুমার মিত্রের গবেষণাগারে ওজোন-স্তরেরও অনেক নীচে, পৃথিবীর পরিমণ্ডলে ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere) ও স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere) অঞ্চল থেকে কখনও কখনও বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা চালিয়ে এর সমর্থন করেন। বেতার-তরঙ্গের এই প্রতিফলন যে তড়িৎ-পরিবাহী স্তর থেকে নয়, তা বলাই বাহুল্য। বায়ুমণ্ডলে স্থানে স্থানে জলীয় বাষ্প স্তরীভূত অবস্থায় দেখা যায়। অনুকূল অবস্থায় এরূপ জলীয় বাষ্পের স্তর থেকেই বেতার-তরঙ্গ প্রতি-

ফলিত হয়। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে তাপমান অনেক দূর পর্যন্ত প্রায় সমানই থাকে—আরও উর্ধ্বে তাপমান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। যে স্থানে তাপমান হঠাৎ বাড়তে আরম্ভ করে, সেই স্থান থেকেও যে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন সম্ভব—মার্কিন বিজ্ঞানী কলওয়েল (Colwell) ও তাঁর সহকর্মীরা তা প্রমাণ করেন।

আয়ন-মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের উচ্চতা এবং স্তরগুলির সর্বোচ্চ ইলেকট্রন-ঘনত্ব

আয়ন-মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের উচ্চতা নানাভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। ব্রাইট ও টুভ-এর পরীক্ষার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরীক্ষা পদ্ধতি আজ সর্বত্রই চালু হয়েছে বলা যেতে পারে। বেতার-প্রেরক যন্ত্র থেকে উচ্চ হারের উপযোগী স্পন্দনাঙ্কের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অল্পক্ষণ পর পর ক্রমান্বয়ে সঞ্চারিত করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা এই পরীক্ষায় নিতান্তই প্রয়োজন। যে প্রেরক যন্ত্র থেকে এই ধরণের খণ্ড-তরঙ্গ বা তরঙ্গ-বিক্ষেপ ক্ষণকাল পর পর সৃষ্টি করা যায়—তারই নাম পাল্‌স্‌-ট্র্যান্সমিটার (Pulse transmitter) পাল্‌স্‌-ট্র্যান্সমিটারে অনুভূমিক এরিয়েলের তার লাগানো থাকে। গ্রাহক যন্ত্রটি পাল্‌স্‌-ট্র্যান্সমিটারের খুব কাছাকাছি বসানো হয়। পাল্‌স্‌-ট্র্যান্সমিটারের এরিয়েল থেকে বিদ্যুতের বিক্ষেপ বা খণ্ড-তরঙ্গ প্রায় তখন-তখনই সোজাসুজি গ্রাহক যন্ত্রে এসে পৌঁছয়। এই ভূ-তরঙ্গের জন্যে গ্রাহক যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন যে অসিলোস্কোপ (Oscilloscope) যন্ত্রটি থাকে, তার প্রতিপ্রভ বস্তুর প্রলেপ দেওয়া কাচখণ্ডে বা পর্দায় একটি নীলাভ বা পীতাভ রেখাপাত হয়। আবার পাল্‌স্‌-ট্র্যান্সমিটারের অনুভূমিক এরিয়েলের তার থেকে বিদ্যুতের বিক্ষেপ বা খণ্ড-তরঙ্গ খাড়াভাবে উর্ধ্বে উঠে যায়। যদি খণ্ড-তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক সঙ্কট-স্পন্দনাঙ্ক থেকে কম থাকে, তবে এই খণ্ড-তরঙ্গ আয়ন-মণ্ডল থেকে পূর্ণ-প্রতিফলিত হয়ে ভূতলে ফিরে আসে এবং পাল্‌স্‌-ট্র্যান্সমিটারের সন্নিকটস্থ গ্রাহক যন্ত্রে গৃহীত হয়। ভূতল থেকে খাড়াভাবে আয়ন-মণ্ডলের স্তরে এবং আয়ন-মণ্ডলের স্তর থেকে আবার নামতে কিছুটা সময় লাগে। অসিলোস্কোপ-যন্ত্রে এরকম ব্যবস্থা থাকে, যাতে খণ্ড-তরঙ্গ যত দেরীতে গ্রাহক যন্ত্রে এসে পৌঁছয়, অসিলোস্কোপের কাচখণ্ড বা পর্দার বাঁ-দিকে এই আকাশ-তরঙ্গ-জনিত খাড়া রেখাটি তত দূরে দৃষ্ট হয়। কাজেই অসিলোস্কোপ-যন্ত্রের পর্দায় পাশাপাশি দুটি খাড়া রেখা সাধারণতঃ দেখা যায়—ডান পাশের দীর্ঘ রেখাটি ভূ-তরঙ্গ-জনিত এবং বাম পাশের রেখাটি আকাশ-তরঙ্গ-জনিত। দুটি রেখার ব্যবধান থেকে সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায়—অবশ্য এর জন্যে আগেই পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। ভূতল থেকে আয়ন-মণ্ডলের স্তরে এবং আয়ন-মণ্ডলের স্তর থেকে সোজাসুজি ভূতলে আসতে বেতার-তরঙ্গের যে সময় লাগে, তা যদি t দ্বারা সুচিত করা যায় এবং আয়ন-মণ্ডলের ...র উচ্চতা যদি হয় h, তবে শূন্যে (বা বাতাসে) আলোর গতিবেগ c ধরলে আমরা সহজেই নিম্নলিখিত সমীকরণটি পাই ; যথা—

$$2h = ct \quad \ldots \quad (২)$$

অর্থাৎ $h = \frac{1}{2} ct$

ভূ-তরঙ্গ ও আকাশ-তরঙ্গের জন্যে অসিলোস্কোপ-যন্ত্রের পর্দায় দৃষ্ট খাড়া দুটি রেখার ব্যবধান থেকে t কত তা জানা যায়। আর শূন্যে (বা বাতাসে) আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩×১০^{৫} কিলোমিটার—তা আমরা জানি। সুতরাং আয়ন-মণ্ডলের স্তরটি ভূতল থেকে কত উঁচুতে অবস্থিত, ২নং সমীকরণ থেকে সহজেই তার হিসাব করা যায়। এখানে বলা দরকার, যদি আয়ন-মণ্ডলের স্তর থেকে খণ্ড-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ভূতলে নেমে আসে এবং

ভূতল থেকে প্রতিফলিত হয়ে যদি আবার আয়ন-মণ্ডলের স্তরে গিয়ে তাথেকে দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত হয়—তবে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিফলনের জন্যে পর-পর দুটি খাড়া রেখা অসিলোস্কোপের পর্দায় দেখা যায়। অনুকূল অবস্থায় ভূতল ও আয়ন-মণ্ডলের মধ্যে বার বার অনেক সংখ্যক প্রতিফলন হতে পারে—তখন অসিলোস্কোপের পর্দায় পর পর অনেকগুলি রেখা পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ আংশিক প্রতিফলন হয় বলে, E_S-স্তর থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ-বিক্ষেপের সঙ্গে F-স্তর থেকে পূর্ণ-প্রতিফলনের নির্দেশ পাওয়া যায়। বেতার-তরঙ্গের বিক্ষেপের ফলে অসিলোস্কোপ-যন্ত্রের পর্দায় যে ভূ-তরঙ্গজনিত ও আকাশ-তরঙ্গ-জনিত খাড়া রেখাপাত হয়, তা (৩নং ক ও খ) চিত্রে প্রদর্শিত হলো। ৪নং চিত্রে পাল্‌স্‌-ট্র্যান্সমিটারের একটি ছবি দেওয়া গেল।
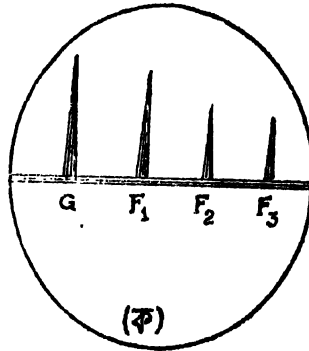
৩নং চিত্র (ক)

অসিলোস্কোপ-যন্ত্রের পর্দায় F-স্তর থেকে পর পর তিনটি প্রতিফলন (F_1, F_2, F_3) এবং ভূ-তরঙ্গ-জনিত খাড়া রেখা (G)।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। E-স্তরে ইলেকট্রনের ঘনত্ব F-স্তরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং ১নং সমীকরণ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, E-স্তর থেকে পূর্ণ-প্রতিফলন পেতে হলে ঐ স্তরের সঙ্কট-স্পন্দনাঙ্ক অপেক্ষা কম স্পন্দনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গের ব্যবহার প্রয়োজন। আবার F-স্তর থেকে পূর্ণ-প্রতিফলন তখনই সম্ভব, যখন ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক E-স্তরের সঙ্কট-স্পন্দনাঙ্ক অপেক্ষা বেশী ও F-স্তরের সঙ্কট-স্পন্দনাঙ্ক অপেক্ষা কম। E_S-স্তর থেকে

এবার আয়ন-মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ ঘনত্ব মোটামুটি কি ভাবে মাপা যায়, সংক্ষেপে তার বিবরণ দেওয়া যাবে। মনে করা যাক, পাল্‌স্‌-ট্র্যান্সমিটার থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের ক্ষণস্থায়ী বিক্ষেপ বা খণ্ড-তরঙ্গ খাড়াভাবে ঊর্ধ্বে পাঠিয়ে আয়ন-মণ্ডলের E-স্তর থেকে প্রতিফলনের জন্যে গ্রাহক যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন অসিলোস্কোপের পর্দায় খাড়া একটি রেখাপাত হলো। বেতার-তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক যদি এখন ক্রমশঃ বাড়ানো যায়, তবে স্পন্দনাঙ্ক যখন ঐ স্তরের সঙ্কট-স্পন্দনাঙ্কের সমান হয়, ঠিক তখন

পর্যন্ত E-স্তর থেকে প্রতিফলনের জন্যে অসিলোস্কোপের পর্দায় যে রেখাপাত হয়, তা দেখতে পাওয়া যায়। বেতার-তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক এর চেয়ে বেশী হলেই এই তরঙ্গ-বিক্ষেপ E-স্তর কোনও স্তরের সঙ্কট-স্পন্দনাঙ্ক জানা থাকলেই ১নং সমীকরণের সাহায্যে ঐ স্তরের ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ ঘনত্ব মোটামুটিভাবে হিসাব করে পাওয়া যায়।
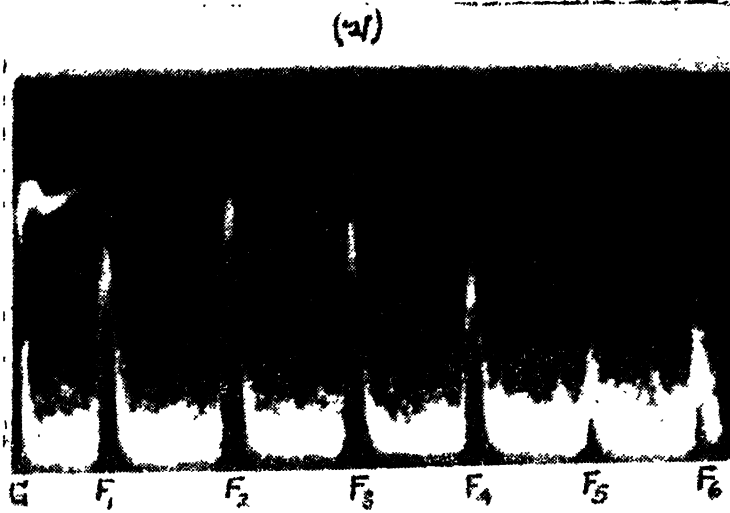
৩নং চিত্র (খ)

আয়ন-মণ্ডলের F-স্তর থেকে পর পর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রতিফলন (F_1, F_2, F_3, F_4, F_5, F_6) এবং বাম প্রান্তে ভূ-তরঙ্গের নিশানা (G)।

ভেদ করে যায়—তখন অসিলোস্কোপের পর্দায় খাড়া রেখাটি আর দেখা যায় না। এভাবে পরীক্ষা চালিয়ে আয়ন-মণ্ডলের যে কোনও স্তরের সঙ্কট-স্পন্দনাঙ্ক নির্ধারণ করা কঠিন নয়।

আয়ন-মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের উচ্চতা, ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের উপর এদের মধ্যাহ্নকালীন ইলেকট্রন-ঘনত্বের সর্বোচ্চ মান এবং এদের আনুমানিক উষ্ণতা নীচের তালিকায় দেওয়া গেল।

স্তরের নাম	উচ্চতা	ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ ঘনত্ব		উষ্ণতা
		ইংল্যাণ্ড	ভারতবর্ষ	
D	৫০-৭০ কি. মি.	—	—	—
E	৮০-১০০ ,, ,,	$৩\cdot৮ \times ১০^{৫}$	$৭\cdot৩ \times ১০^{৫}$	৩০০° কেল্‌ভিন
E_s	১১০-১৩০ ,, ,,	—	—	—
F_1	১৫০-২০০ ,, ,,	১২×১০^{৫}	২০×১০^{৫}	৬০০° কেল্‌ভিন
F_2	২৫০-৩৫০ ,, ,,			

আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গ সঞ্চলনের উপর ভূ-চুম্বকত্বের প্রভাব

অ্যাপলটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছিলেন যে, বেতার-তরঙ্গ যদি উর্ধ্বে প্রেরণ করা হয়, আয়ন-মণ্ডলে প্রবেশ করে ভূ-চুম্বকত্বের ফলে তা দুই অংশে ভাগ হয়ে যায়। এক অংশকে আমরা 'সাধারণ' (Ordinary) ও অন্য অংশটিকে 'অ-সাধারণ' (Extra-ordinary) তরঙ্গ বলে থাকি। আয়ন-মণ্ডলের কোনও স্তরে বেতার-তরঙ্গের উপর ভূ-চুম্বকত্বের প্রভাব সম্বন্ধে অ্যাপলটন ও প্রায় একই সময়ে হার্ট্রি (Hartree) এবং গোল্ডস্টাইন (Goldstein) যে তত্ত্বের অবতারণা করেন, তাকে Magneto-ionic theory বলা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে ভূ-চুম্বকত্বের ফলে বেতার-তরঙ্গ আয়ন-মণ্ডলে শুধু যে দুই অংশে বিভক্ত হয় তা নয়, এই দুই অংশের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্যও দেখা যায়। যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বেতার-প্রেরক কেন্দ্রের এরিয়েলের তার থেকে সঞ্চালিত হয়, তার বৈদ্যুতিক স্পন্দন মোটামুটি একই দিকে সম্পন্ন হয়। এই রকমের তরঙ্গকে সমবর্তনশীল (Plane-polarized) বলা হয়। সমবর্তনশীল বিদ্যুতের তরঙ্গ আয়ন-মণ্ডলে প্রবেশ করে যখন 'সাধারণ' ও 'অ-সাধারণ'— এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তখন এদের

৪নং চিত্র

পাল্‌স্‌-ট্র্যান্সমিটার (Pulse-transmitter)

প্রত্যেকটিতে বৈদ্যুতিক বল সাধারণতঃ উপবৃত্তের আকারে এবং কখনও কখনও বৃত্তের আকারে আবর্তিত হতে থাকে। যে তরঙ্গে বৈদ্যুতিক বল বৃত্তাকারে বা উপবৃত্তাকারে আবর্তিত হয়, তাকে বৃত্তাবর্তনধর্মী (Circularly polarized) অথবা উপবৃত্তাবর্তনধর্মী (Elliptically polarized) বলা হয়। 'সাধারণ' তরঙ্গে বৈদ্যুতিক বলের আবর্তন যদি ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেই দিকে হয়, তবে 'অ-সাধারণ' তরঙ্গে বৈদ্যুতিক বলের আবর্তন তার বিপরীত দিকে দেখা যায়। এই বিষয় নিয়ে অ্যাপলটন, র‍্যাটক্লিফ্ (Ratcliffe), হোয়াইট (F. G. & E. L. C. White), ফার্মার (Farmer), একার্স্লি (Eckersley), মার্টিন (Martyn), পিডিংটন (Piddington), মান্‌রো (Munro) প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞানী তাত্ত্বিক ও পরীক্ষাগত গবেষণা করেছেন। জাপানে এবং ভারতবর্ষেও এই বিষয়ে উচ্চাঙ্গের গবেষণা হয়েছে।

আয়ন-মণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন সম্পর্কে পূর্বে যে সূত্রটি দেওয়া হয়েছে (১নং সমীকরণ দ্রষ্টব্য), তাতে ভূ-চুম্বকত্বের প্রভাব ধরা হয় নি। বেতার-তরঙ্গ-বিক্ষেপের অসংখ্য অবিচ্ছিন্ন 'ফুরিয়ে' (Fourier) উপাংশগুলির সমষ্টিগত গতিবেগ আয়ন-মণ্ডলের ক্রমবর্ধমান ইলেকট্রন-ঘনত্বের ভিতর দিয়ে যখন খাড়াভাবে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে, তখন এই সমষ্টিগত গতিবেগ ক্রমশঃ কমতে কমতে শূন্যে পরিণত হয়—পূর্বেই একথা আলোচিত হয়েছে। এই সমষ্টিগত গতিবেগ $U=o$, অথবা আয়ন-মণ্ডলের প্রতিসরাঙ্ক $\mu=o$, এই সর্ত অবলম্বন করে অ্যাপলটন দেখিয়েছিলেন যে, ভূ-চুম্বকত্বের ফলে আয়ন-মণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন সম্পর্কে তিনটি সূত্র পাওয়া যায়; যথা—

$$f_o^2 = f^2 - f f_H \qquad (৩ক)$$

$$f_o^2 = f^2 \qquad \ldots \qquad (৩খ)$$

$$f_o^2 = f^2 + f f_H \qquad (৩গ)$$

এখানে $f_o^2 = \frac{Ne^2}{\pi m}$

N= ইলেকট্রনের ঘনত্ব

e, m= ইলেকট্রনের তড়িৎ-মান ও ভর

$f_H = \frac{eH}{m}$

H=পৃথিবীর চৌম্বক বল

এবং f=ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক

এই তিনটি নিয়মসূত্রের দ্বিতীয়টি 'সাধারণ' তরঙ্গের ক্ষেত্রে এবং প্রথম ও তৃতীয়টি 'অ-সাধারণ' তরঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অ্যাপলটনের এই তিনটি সূত্র থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই। যদি ঊর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক সমান রাখা হয়, তবে স্পষ্টই দেখা যায় যে, আয়ন-মণ্ডলে প্রবেশ করে সর্বপ্রথমে প্রতিফলিত হয় 'অসাধারণ' তরঙ্গ আর তার কিছু ঊর্ধ্বে প্রতিফলিত হয় 'সাধারণ' তরঙ্গ। যদি কোনও বিশেষ কারণে 'অ-সাধারণ' তরঙ্গের আংশিক প্রতিফলন সম্ভব হয়, তবে 'অ-সাধারণ' তরঙ্গের একাংশ আয়ন-মণ্ডলের আরও ঊর্ধ্বে উঠে প্রতিফলিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে 'অ-সাধারণ' ও 'সাধারণ' তরঙ্গ যে আয়ন-মণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতা থেকে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে, অ্যাপলটন ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের বীক্ষণাগারে তার পরীক্ষাগত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এদের স্পন্দনগত বৈশিষ্ট্যও প্রমাণিত হয়েছে। উত্তর গোলার্ধে 'সাধারণ' তরঙ্গে বৈদ্যুতিক বলের আবর্তন বাঁ-হাতি (Left-handed) অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে, আর 'অ-সাধারণ' তরঙ্গে বৈদ্যুতিক বলের আবর্তন ডান-হাতি (Right-handed) অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে সেই দিকে। তৃতীয় সূত্র

অনুসারে আয়ন-মণ্ডলের আরও ঊর্ধ্বস্থান থেকে প্রতিফলনের নিদর্শনও কোনও কোনও বীক্ষণাগারে পাওয়া গিয়েছে। আয়ন-মণ্ডলে খুব বেশী ঊর্ধ্বে উঠলে শোষণের ফলে বেতার-তরঙ্গ ক্ষীণ বা বিলীন হয়ে যায় বলেই তৃতীয় সূত্র অনুসারে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন সচরাচর ধরা যায় না। আয়ন-মণ্ডল থেকে প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গের বিক্ষেপ যখন ভূতলে গ্রাহক যন্ত্রে splitting)। ইংরেজ বিজ্ঞানী একার্স্‌লি (Eckersley) ১৯৩৩ সালে সর্বপ্রথম এটি লক্ষ্য করেন। পরে যে সব বিজ্ঞানী এই বিষয়ে গবেষণা করেন তাঁদের মধ্যে সুইডেনের বিজ্ঞানী রিড্‌বেকের (Rydbeck) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে-যে স্থান ভূ-গোলকের উচ্চমানের চৌম্বক অক্ষাংশে (Geomagnetic latitude) অবস্থিত, সে সব স্থানের উপরেই F-স্তর থেকে বেতার-

G E_S $F^1F^2F^3$

৫নং চিত্র

F-স্তর থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ-বিক্ষেপের ত্রিস্বভবন (Triple-splitting) ও E_S -স্তর থেকে প্রতিফলন। (Ionogram-এর অংশ বিশেষ)

গৃহীত হয়, গ্রাহক যন্ত্রের সঙ্গে সংলগ্ন অসিলোগ্রাফের পর্দায় তখন খাড়া রেখাটি সচরাচর দুই ভাগে খুব কাছাকাছিভাবে দেখা যায়। কচিৎ কখনও F-স্তর থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ-বিক্ষেপের জন্যে অসিলোস্কোপের পর্দায় একটি খাড়া রেখার পরিবর্তে তিনটি রেখা খুব কাছাকাছি দেখা যায়। একেই বলা হয় F-স্তর থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ-বিক্ষেপের ত্রিস্বভবন (Triple তরঙ্গ-বিক্ষেপ পর পর তিন ধাপে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। উচ্চমানের অক্ষাংশে কেন এমন হয়, তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রিড্‌বেক দিয়েছিলেন। যে-যে স্থান নিম্নমানের চৌম্বক অক্ষাংশে অবস্থিত, সেই সব স্থানের উপরেও F-স্তর থেকে বেতার-তরঙ্গ-বিক্ষেপের তিন ধাপে প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে; যেমন—এলাহাবাদ, দিল্লী ও বারাণসীতে। নিম্নমানের অক্ষাংশে

F-স্তর থেকে প্রতিফলিত বিক্ষেপের ত্রিত্বভবনের ব্যাখ্যাও আজ সম্ভব হয়েছে। F-স্তর থেকে প্রতিফলিত এই তিনটি বেতার-তরঙ্গে বৈদ্যুতিক বলের আবর্তন নিয়ে হোগার্থ (Hogarth) ও ল্যাণ্ডমার্ক (Landmark) গবেষণা করেছেন। বারাণসীতেও এই নিয়ে পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষায় জানা যায় যে, F-স্তরের নিম্নতম ধাপ থেকে যে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়—তা 'অ-সাধারণ' তরঙ্গ অর্থাৎ এই তরঙ্গে বৈদ্যুতিক আবর্তন ডান-হাতি (Right-handed)। মধ্যম ধাপ থেকে যে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়, তা 'সাধারণ' তরঙ্গ, অর্থাৎ এই তরঙ্গে বৈদ্যুতিক বলের আবর্তন বাঁ-হাতি (Left-handed)। F-স্তরের আরও উপরের ধাপ থেকে যে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়, তা-ও 'সাধারণ' তরঙ্গ। বৈদ্যুতিক বল এই তরঙ্গে বাঁ-হাতি। বলা বাহুল্য, এখানে আমরা উত্তর গোলার্ধের কথাই বলছি। ৫নং চিত্রে F-স্তর থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ-বিক্ষেপের ত্রিত্বভবন এবং E_s-স্তর থেকে প্রতিফলন প্রদর্শিত হলো।

আয়ন-মণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনের চতুর্থ সর্ত

আয়ন-মণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের তিনটি সর্ত বা সূত্রের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গরাজির সমষ্টিগত বেগ যেখানে শূন্য হয়, সেই স্থান থেকেই বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন হয়—এই প্রস্তাবনাটি অবলম্বন করে মেঘনাদ সাহা ও তাঁর সহকর্মীরা এই বিষয়ে তত্ত্বীয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের শোষণ যথেষ্ট পরিমাণেই হয়। এই শোষণক্রিয়া প্রতিফলন সমস্যার সমাধানে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করায় শোষণাঙ্কটিকে বাদ দিয়ে অধ্যাপক সাহা ও তাঁর সহকর্মীরা প্রতিফলনের নতুন একটি সর্ত বা সূত্রের প্রবর্তন করেন। একেই বলে আয়ন-মণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের চতুর্থ সর্ত বা সূত্র। সূত্রটি এই ভাবে লেখা হয়:

$$f_O^2 = \frac{f^2 (f^2 - f^2_H)}{f^2 - f_L^2} \quad \ldots \; (৪)$$

এখানে $f_H = \frac{eH}{mc}$, $f_L - f_H \operatorname{Cos} \theta$, θ হচ্ছে পৃথিবীর চৌম্বক বল H ও তরঙ্গের গতিপথ—এই দুয়ের মধ্যস্থ কোণ, $f_o^2 - \frac{Ne^2}{\pi m}$ আর f হচ্ছে উর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক। অধ্যাপক সাহার গবেষণাগারে এই চতুর্থ সূত্রটির সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তের মিল পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের শোষণাঙ্ককে অগ্রাহ্য না করে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু অনতিকাল পরেই তরঙ্গবাদ অবলম্বন করে আয়ন-মণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের তিনটি সূত্র তো পেয়েছিলেনই, উপরন্তু আরও একটি সাধারণ সূত্র পেয়েছিলেন, যার প্রয়োগ কষ্টসাধ্য। বসুর এই নতুন সাধারণ সূত্রে আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের শোষণাঙ্ককে শূন্য বলে ধরে নিলে সূত্রটি সাহা-প্রদত্ত চতুর্থ সূত্রে পর্যবসিত হয়।

এখানে বলা আবশ্যক, আয়ন-মণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের সাহা-প্রদত্ত চতুর্থ সূত্রটি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে। বিরুদ্ধ মতবাদীদের মধ্যে হেডিং (Hedding) ও হুইপ্‌ল্‌ (Whipple) এবং বাডেনের (Budden) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আয়ন-মণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টিতত্ত্ব

সূর্যের বিকিরণ যখন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং এই বিকিরণের শক্তি যদি পর্যাপ্ত হয়, বায়ু-মণ্ডলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অণুর মধ্যস্থ পরমাণুর ভিতরকার ইলেকট্রন তখন নিষ্কাশিত হয়। বিকিরণের বিশেষ বিশেষ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গে

নিহিত শক্তির ফলেই এই নিষ্কাশন সম্ভব হয়; অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে এসে সাধারণ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অণুকে ঋণ-বিদ্যুৎসম্পন্ন আয়নে (Ion) পরিণত করে। পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে এলে এই পরমাণু ধন-বিদ্যুতের গুণ পায়—এদেরই বলা হয় ধন-বিদ্যুৎসম্পন্ন আয়ন। সূর্যের আলোর প্রভাবে বায়ুমণ্ডল এই ভাবে আয়নিত হয়। বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরে বায়ুর চাপ অত্যন্ত অল্প বলে পরমাণু থেকে নির্গত ইলেকট্রনগুলি অনেক সময় মুক্ত অবস্থায় থাকে। এই কারণেই আয়ন-মণ্ডল তড়িৎ পরিবাহিতার গুণ পায়। কিন্তু সূর্যের বিকিরণের ফলে উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল কিভাবে বিভিন্ন স্তরে আয়নিত হয় সে এক রহস্য! এই রহস্য উদ্ঘাটনে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার তাপ-আয়নন (Thermal ionization) তত্ত্বটি অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল। আমরা জানি, বিকিরণের ফলে বায়বীয় পদার্থ বা গ্যাস আয়নে পরিণত হয়। বিকিরণের উৎস এবং যে মাধ্যমের ভিতর দিয়ে তাপ বা আলোর বিকিরণ হয়—এই দুইয়ের তাপমান বা উষ্ণতা যখন সমান হয়, এই সাম্যাবস্থায় বায়বীয় পদার্থ বা গ্যাসের কতখানি অংশ আয়নিত হয়, মেঘনাদ সাহা ১৯২০ সালে এই সম্পর্কে এক নিয়ম-সূত্রের প্রবর্তন করেন। এই নিয়ম-সূত্রটি আজ দেশ-বিদেশে সর্বত্র সুবিদিত। সূর্যের বিকিরণ যখন পৃথিবীর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে, সেখানকার তাপমাত্রা সূর্যের বহিরাবরণের তাপমাত্রার চেয়ে অনেক কম। তাপমাত্রার এই অসমতার জন্যে সাহার তাপ-আয়নন তত্ত্বের সূত্রটির পরিবর্তন আবশ্যক হয়। ইংরেজ বিজ্ঞানী মিল্‌নে (Milne) এবং হল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী Woltjer—দুজনেই স্বাধীনভাবে সাহার সূত্রটির আবশ্যকীয় পরিবর্তন করেন। সাহার পরিবর্তিত সূত্রটি প্রয়োগ করে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে বিভিন্ন আয়নিত স্তরের সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেকেই গবেষণা করেন। এঁদের মধ্যে হল্যাণ্ডের প্যানেকেক (Pannekoek), আমেরিকার হাল্‌বার্ট (Hulbert), ইংল্যাণ্ডের চ্যাপ্‌ম্যান (Chapman), উল্‌ফ্‌ (Wulf) ও ডেমিং (Deming) এবং ভারতবর্ষের মেঘনাদ সাহা ও শিশিরকুমার মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়—তবে সাধারণভাবে বিভিন্ন স্তরের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেই এখানে যথেষ্ট হবে।

F-স্তর: এই স্তরের সৃষ্টি সম্বন্ধে সকলেই আজ একমত। এখন আমরা জানি যে, ১০০ কিলোমিটার এবং তারও উর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন অণুগুলি বিযুক্ত হয়ে পরমাণুতে পরিণত হয়। সূর্যের বর্ণালীর ৭৯৫-৯১০Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ অক্সিজেন পরমাণুগুলিকে আয়নিত করে—যার ফলে ২৫০-৩০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে F-স্তরের উদ্ভব হয়। এই স্তরটি যে দিনের বেলায় দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইংল্যাণ্ডের বেট্‌স্‌ (Bates) ও অষ্ট্রেলিয়ার মার্টিন (Martyn)।

E-স্তর: এই স্তরের সৃষ্টি সম্বন্ধে বহুদিন কোনও সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় নি। মেঘনাদ সাহার তাপ আয়ননের পরিবর্তিত সূত্রটি অবলম্বন করে শিশিরকুমার মিত্র এক সুসম্বদ্ধ তত্ত্বের অবতারণা করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে সূর্যের বর্ণালীর ৬৬১-৭৪৪Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন অণুর ভিতরকার পরমাণু থেকে এক সঙ্গে দুটি ইলেকট্রন নিষ্কাশিত হয়। এই যুগল নিষ্কাশনের ফলে উর্ধ্বে ৮০ থেকে ১৩০ কিলোমিটারের মধ্যে একটি আয়নিত স্তরের সৃষ্টি সম্ভব। এখানে বলা দরকার, ৮০ কিলোমিটার উর্ধ্বে অক্সিজেন অণু বিযুক্ত হয়ে পরমাণুতে পরিণত হতে আরম্ভ করে এবং ১৩০ কিলোমিটারের উর্ধ্বে অক্সিজেন শুধু পরমাণু অবস্থাতেই থাকে। ১৯৩৮

সালে এই তত্ত্বটি খুব আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হলেও যখন পরে জানা গেল যে, ১৩০ কিলোমিটারের উর্ধ্বে যে অক্সিজেন পরমাণুগুলি থাকে, তা উল্লিখিত ৬৬১-৭৪৪Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সৌর বিকিরণকে সম্পূর্ণভাবে শোষণ করে নেয়, তখন E-স্তরের সৃষ্টি সম্বন্ধে নতুন ভাবে অনুশীলন আরম্ভ হয়। ১৯৪৫ সালে বিজ্ঞানী নিকোলে (Nicolet) E-স্তরের উৎপত্তির সম্পূর্ণ ভিন্ন যে ব্যাখ্যা দেন—অনেক বিজ্ঞানী তা মেনে নিয়েছেন। ১৯৩৮ সালে বেট্‌স্ (Bates) ও হয়েল (Hoyle) বলেন যে, সূর্যের আলোক-মণ্ডল (Corona) থেকে বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণই E-স্তরের উৎপত্তির কারণ। মহাকাশে আজকাল প্রচুর পরিমাণে রঞ্জেন (Röntgen) রশ্মির সন্ধান পাওয়া গেছে। অনেকের মতে এই রঞ্জেন-রশ্মিও E-স্তরের উৎপত্তির কারণ হতে পারে।

D-স্তর : এই স্তরের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকেরই মত এই যে, সূর্যের বর্ণালীর ৯১০--১০১২ Å তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন অণুর ভিতরকার প্রত্যেকটি পরমাণু থেকে যখন একটি করে ইলেকট্রন নিষ্কাশিত হয়, তখনই ৫৫ কিলোমিটার উর্ধ্বে এই স্তরটির সৃষ্টি হয়। শিশিরকুমার মিত্র এই মতটি প্রথম প্রচার করেন। অবশ্য এই মতের বিপক্ষেও পরীক্ষামূলক যুক্তি আছে। নিকোলে বলেন, বায়ুমণ্ডলে সোডিয়াম (Sodium) ও নাইট্রিক অক্সাইড (Nitric oxide) গ্যাস আয়নিত হলেও D-স্তরের সৃষ্টি সম্ভব। একে তিনি বিক্ষিপ্ত (Sporadic) D-স্তর বলেছেন।

E_s-স্তর : বিক্ষিপ্ত E-স্তরের সৃষ্টি সম্বন্ধে এখনও অনেক গবেষণা চলছে। বিষুবরেখার উপরে, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং মেরু-অঞ্চলে এই বিক্ষিপ্ত স্তরটির উৎপত্তি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। উল্কাপাত, বিদ্যুৎ-পাত, আয়ন-মণ্ডলের সাময়িক উর্ধ্বগতির ক্রমিক পরিবর্তন, উর্ধ্বে বায়ুস্তরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ (Electro-jet) এবং অন্যান্য নানা কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নি।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আয়ন-মণ্ডলের উপরিভাগ সম্বন্ধে গবেষণা

১৯৫৭-সালের ৪ঠা অক্টোবর রুশ বিজ্ঞানীরা ভূতল থেকে রকেটের সাহায্যে উর্ধ্বে মহাকাশে যে স্পুট্‌নিক (Sputnik) পাঠিয়েছিলেন, তা উপগ্রহের মত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এর পর রাশিয়া ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরা বহু কৃত্রিম উপগ্রহের সৃষ্টি করেছেন—আধুনিক বিজ্ঞানে এ এক আশ্চর্য ব্যাপার! কৃত্রিম উপগ্রহে নানাবিধ যন্ত্রপাতি (যেমন স্বয়ংক্রিয় বেতার-তরঙ্গের প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র, তাপমান ও বায়ুর চাপমান যন্ত্র, নানারকম তেজস্ক্রিয় বিকিরণের তীব্রতা-পরিমাপক যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় সাধারণ ও দূরেক্ষণ-ক্যামেরা ইত্যাদি) বহন করবার ব্যবস্থা করা হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে এই সব যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর পরিমণ্ডলের উপরিভাগ সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। ভূতলের পাল্‌স্-ট্র্যান্সমিটার থেকে বেতার-তরঙ্গ বিক্ষেপ উর্ধ্বে পাঠিয়ে ও আয়ন-মণ্ডল থেকে তার প্রতিফলন গ্রাহক যন্ত্রে পরীক্ষা করে F-স্তরের যে স্থানে ইলেকট্রনের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী, সচরাচর সেই স্থানের উপরকার খবর পাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়—আয়ন-মণ্ডলের উর্ধ্বতন সীমার বাইরের তথ্য জানা তো দূরের কথা!

মনে করা যাক, কোনও কৃত্রিম উপগ্রহে অবস্থিত পাল্‌স্-ট্র্যান্সমিটার থেকে ক্রমবর্ধমান কতকগুলি নির্দিষ্ট স্পন্দনাঙ্কের তরঙ্গ-বিক্ষেপ

স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় পর পর নীচে আয়ন-মণ্ডলের দিকে প্রেরিত হলো। যেহেতু আয়ন-মণ্ডলের উপর দিক থেকে নীচের দিকে নামলে ইলেকট্রনের ঘনত্ব প্রথমটা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে—কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট স্পন্দনাঙ্কের তরঙ্গ-বিক্ষেপ সেহেতু ক্রমশঃ আয়ন-মণ্ডলের নীচের স্তরগুলি থেকে প্রতিফলিত হতে থাকে। সহজ হবে। আয়ন-মণ্ডলের নীচের দিকে ইলেকট্রনের ঘনত্ব কিভাবে জানা যায়, তাও এই চিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। ভূতলের পাল্‌স্‌-ট্র্যান্সমিটার থেকে ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট কতকগুলি স্পন্দনাঙ্কের তরঙ্গ-বিক্ষেপ ঊর্ধ্বে প্রেরিত হলে কম স্পন্দনাঙ্কের তরঙ্গ-বিক্ষেপ নিম্নতর স্তর থেকে এবং বেশী স্পন্দনাঙ্কের তরঙ্গ-বিক্ষেপ
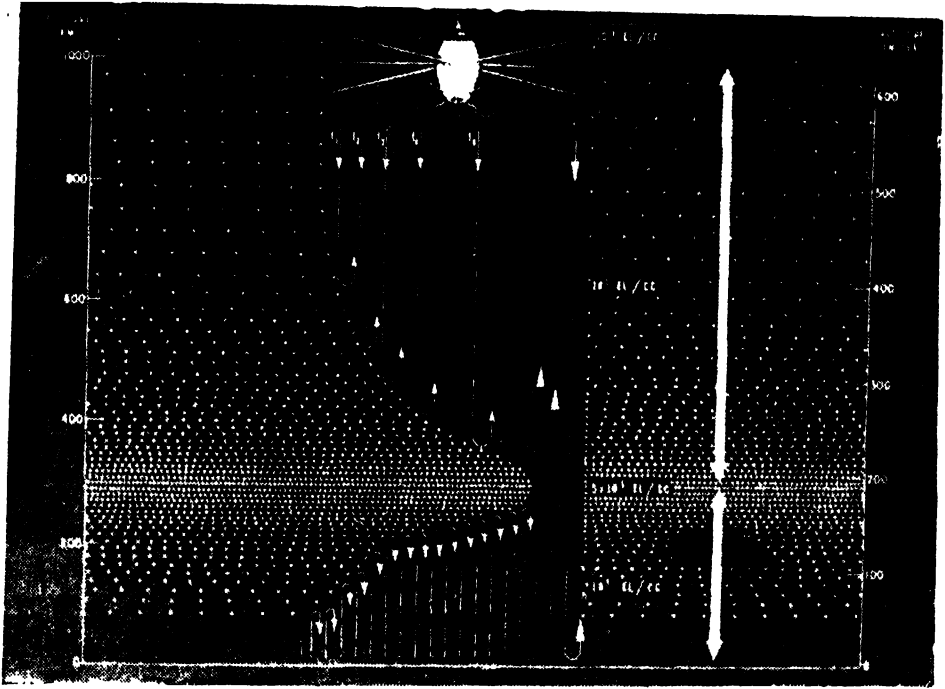
৬নং চিত্র

আয়ন-মণ্ডলের উপরিভাগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা। Transactions American Geophiysical Union. Vol. 46, No. 1. p. 309, March, 1965 থেকে গৃহীত।

এই প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গের বিক্ষেপ কৃত্রিম উপগ্রহের গ্রাহক যন্ত্রে গৃহীত হয়। গৃহীত ফলাফল স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ভূতলের গ্রাহক কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। এভাবে আয়ন-মণ্ডলের উপরিভাগের বিভিন্ন স্তরে ইলেকট্রনের ঘনত্ব কত, তা ১নং সূত্র থেকে জানা যায়। ৬নং চিত্র থেকে উল্লিখিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তর থেকে প্রতিফলিত হবে। এভাবে আয়ন-মণ্ডলের নিম্নভাগের ধাপে ধাপে ইলেকট্রনের ঘনত্ব কত, তা সহজেই জানা যায়।

এবার কিভাবে আজকাল কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আয়ন-মণ্ডলের উপরিভাগের সমগ্র ইলেকট্রন-সংখ্যা এবং উপরিভাগের বিভিন্ন উচ্চতায়

ইলেকট্রনের ঘনত্ব নির্ধারণ করা যায়, তার কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করবো।

(১) ফ্যারাডে-আবর্তন: সমবর্তনশীল (Plane-polarized) বেতার-তরঙ্গে যেদিকে বিদ্যুতের স্পন্দন হয়, সেদিক ও তরঙ্গের গতিপথ যে সমতলে অবস্থিত, তাকেই সমবর্তন-তল (Plane of polarization) বলা যেতে পারে। চৌম্বক বলের ফলে এই সমবর্তন-তল আবর্তিত হয়, বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী ফ্যারাডে (Faraday) তা বহু বছর আগেই আবিষ্কার করেছিলেন। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে যখন সমবর্তনশীল বেতার-তরঙ্গ নীচের দিকে প্রেরিত হয়—আয়ন-মণ্ডলে প্রবেশ করে তখন পৃথিবীর চৌম্বক বলের প্রভাবে এই তরঙ্গ 'সাধারণ' ও 'অ-সাধারণ'—এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, 'সাধারণ' ও 'অ-সাধারণ' তরঙ্গ সাধারণতঃ উপবৃত্তাবর্তন-ধর্মী (Elliptically polarized)। কিন্তু এরা যখন আয়ন-মণ্ডল পরিক্রমা করে বেরিয়ে আসে, তখন আবার এই দুই ভাগ মিলে যায় এবং আমরা আবার সমবর্তনশীল তরঙ্গ পেয়ে থাকি। যেহেতু পৃথিবীর চৌম্বক বল আয়ন-মণ্ডলের সর্বত্র সমান নয় এবং ইলেকট্রনের ঘনত্বও বিভিন্ন, সেহেতু আয়নমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসা সমবর্তনশীল তরঙ্গের সমবর্তন-তল বিভিন্ন পরিমাণে আবর্তিত হয়। এই ফ্যারাডে-আবর্তন পরিমাপ করা যায় এবং এথেকেই আয়ন-মণ্ডলের উপরিভাগের সমগ্র ইলেকট্রন-সংখ্যা অঙ্ক কষে বের করা সম্ভব। আয়ন-মণ্ডলের উপরিভাগের কোনও স্থানে ইলেকট্রনের ঘনত্ব নির্ধারণ করাও আজ সম্ভব হয়েছে।

(২) ডপ্‌লারের সিদ্ধান্ত: তরঙ্গের উৎস এবং দর্শকের মধ্যে যদি আপেক্ষিক গতিবেগ থাকে, তবে দর্শকের কাছে এই তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক সমান থাকে না। দর্শক যদি তরঙ্গের উৎসের দিকে অগ্রসর হয়, তবে তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক বেশী মনে হয়, আর দর্শক যদি তরঙ্গের উৎস থেকে দূরে সরে যায়, তবে তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক কম মনে হয়। একেই ডপ্‌লারের (Döppler) সিদ্ধান্ত বলে। কৃত্রিম উপগ্রহ যখন তার কক্ষপথে যেতে যেতে পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়, তখন এই উপগ্রহ থেকে প্রেরিত উচ্চ-হার স্পন্দনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ নীচে আয়ন-মণ্ডল ভেদ করে ভূতলের বেতার-গ্রাহক যন্ত্রে গৃহীত হয়। ডপ্‌লারের সিদ্ধান্ত অনুসারে গতিশীল কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এই স্পন্দনাঙ্ক পরিবর্তনের ফলে আয়ন-মণ্ডলে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের পথও কিছু পরিবর্তিত হয়। আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের পথ আয়ন-মণ্ডলের প্রতিসরাঙ্কের উপর নির্ভর করে এবং এই প্রতিসরাঙ্ক আবার আয়ন-মণ্ডলের ইলেকট্রন-সংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই যখন কৃত্রিম উপগ্রহটি ভূতলে গ্রাহক-কেন্দ্রের উপর দিয়ে তার কক্ষপথ ধরে চলে যায়—আপেক্ষিক গতিবেগের জন্যে বেতার-তরঙ্গের স্পন্দনাঙ্ক যতটুকু বদ্‌লায়—আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গ পথের পরিবর্তনের জন্যে স্পন্দনাঙ্ক তাছাড়া আরও কিছু বদ্‌লায়। স্পন্দনাঙ্কের এই পরিবর্তন পরিমাপ করবার জন্যে আধুনিক গবেষণাগারে নানারকম ব্যবস্থা হয়েছে। এই পরিমাপের ফলে আয়ন-মণ্ডলের উপরিভাগের সমগ্র ইলেকট্রন-সংখ্যা কত, তা জানা গিয়েছে।

(৩) কৃত্রিম উপগ্রহ-প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের উদয় ও অস্ত: সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল কৃত্রিম উপগ্রহের উদয় ও অস্ত শুধু চোখে কিংবা দূরবীনের সাহায্যে আমরা অনেকেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে আকাশে এর আবির্ভাব বা তিরোধান কি সূর্যের আলোয় দেখা উদয় ও অস্তের মত ঠিক

একই সময় হয়? একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের ক্রম-প্রতিসরণের ফলে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহের উদয়, সূর্যের আলোয় দেখা উদয়ের কিছু আগে হয়—আবার বেতার-তরঙ্গের অস্ত, সূর্যের আলোয় যে অস্ত আমরা দেখি, তার কিছু পরে হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ তার কক্ষপথে যেতে যেতে যখন আয়ন মণ্ডলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়, তখন আয়ন-মণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের প্রতিসরণ ও পূর্ণ প্রতিফলনের জন্যে বেতার-তরঙ্গ একটি শঙ্কুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে বেতার-তরঙ্গ এই শঙ্কুর মধ্যে প্রবেশ করলেই শঙ্কুর ঠিক নীচে অবস্থিত গ্রাহক-কেন্দ্রে এই বেতার-তরঙ্গ গৃহীত হয়, আবার যখন উপগ্রহটি এই শঙ্কুটিকে অতিক্রম করে যায়, তখন থেকে বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে আর গৃহীত হয় না। এই শঙ্কুকেই অনুপ্রবেশ শঙ্কু (Transmission cone) বলা হয়। বেতার-তরঙ্গের উদয় ও অস্ত লক্ষ্য করে আয়ন-মণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় ইলেকট্রনের ঘনত্ব নির্ধারণ করা আজ সম্ভব হয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আয়ন-মণ্ডলের উপরিভাগের গবেষণা প্রায় দশ বছর থেকে আরম্ভ হয়েছে। এই বিষয়ে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের মধ্যে বের্নিং (Berning), এচিসন (Aitchison), টমাস (Thomas), উইক্‌স্ (Weeks), আল' পার্ট (Al'pert), হিব্বার্ড (Hibberd) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আয়ন-মণ্ডল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনেক কথা হয়তো ঠিকমত বলা হয় নি, কোনও কোনও বিষয়ের উল্লেখমাত্র করা হয়েছে, আবার অনেক কথাই বাদ পড়েছে।

"বস্তুতঃ এক্‌জামিন পাশ করিবার নিমিত্ত (আমাদের দেশের ছাত্র ছাত্রীদের) এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আহ্লাদে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞান-চর্চার কাল আরম্ভ হয়; কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে। তাঁহারা একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি। অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুন্নমনে প্রত্যাবর্তন করি।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

ব্যবহারিক মনোবিদ্যা

(অভীক্ষা প্রসঙ্গে)

দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের নিজেকে জানবার চেষ্টা অনেক দিনের। মানব-সভ্যতার ঊষাকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন পথে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে আসছে। মানুষ তার চার পাশের বস্তুনিচয় থেকে যেমন আপন প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করেছে, তেমনি চেষ্টা করেছে নিজেকে জানবার জন্যে। মানব-সত্তার রহস্যময় রূপ ও গতি-প্রকৃতিকে উপলব্ধি করবার এই প্রচেষ্টা বহু পরিক্রমার পর আজ বাস্তবধর্মী বিজ্ঞানের পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। সুরুতে যা ছিল, তা শুধুমাত্র অনুমানভিত্তিক ধর্মীয় দর্শনের মতবিশেষ মাত্র। বিজ্ঞানভিত্তিক মনোবিদ্যার প্রথম যুগে মনোবিদেরা অন্তর্দর্শনের (Introspection) মাধ্যমে আমাদের মনের নানা শক্তির (Faculty) গঠন ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের চেষ্টা করেছিলেন। কোন্ কোন্ মানসিক বৃত্তি সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান—এই ছিল তখন তাঁদের আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তিবিশেষের গুণ ও প্রকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ্য করা সত্ত্বেও ঐ দিকে তখন তাঁরা বিশেষ মনোযোগ দেন নি। কিন্তু ক্রমে গবেষকেরা এই 'ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য' বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দেবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করলেন। তাঁরা দেখলেন যে, ব্যবহারিক ও জনকল্যাণমূলক মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য এক বিশেষ স্থানের অধিকারী।

বাস্তবিকপক্ষে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আমরা প্রায়ই যাদের সংস্পর্শে আসি, তাদের প্রত্যেকের আচরণ, কর্মপ্রচেষ্টা ইত্যাদি থেকে তাদের সম্বন্ধে আমরা নানারকম ধারণা করে থাকি। "অমুক বেশ চট্পটে", "অমুক একটু বোকা", "অমুক বেশ রাগী প্রকৃতির" বা "অমুক অত্যন্ত আমুদে এবং অমায়িক"—ইত্যাদি বিশেষণ সম্বলিত আমাদের এই ধারণাগুলি নিঃসন্দেহে ব্যক্তিবিশেষের দক্ষতা, মেজাজ, বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি এবং কখনও বা ব্যক্তিবিশেষের সামগ্রিক মানসিকতার ফলবিশেষ। ব্যক্তিমানুষের দক্ষতা বা Ability-র কথাই ধরা যাক। আমরা জানি সব মানুষ সব কাজের উপযুক্ত নয়, অর্থাৎ মানুষ মাত্রেরই যে, সব কাজ সুচারুভাবে করবার দক্ষতা আছে, এরূপ আশা করা যায় না। কার কি দক্ষতা আছে বা কে সঠিকভাবে কোন্ কাজের উপযুক্ত, তা জানতে গেলে ব্যক্তিবিশেষের কি কি বা দক্ষতা তার ব্যক্তিত্ব-প্রকৃতির মধ্যে কি পরিমাণে বর্তমান, তা জানতে হবে সেই ব্যক্তিমানুষের সামগ্রিক মানসিক প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু মানসিক প্রকৃতির বিষয় বিশদ আলোচনার আগে দক্ষতা সম্বন্ধে সামান্য দু-চার কথা বলা দরকার।

ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা এক নয়। বুৎপত্তিকে বলা যায় আয়াসলব্ধ অভিজ্ঞতাপ্রসূত ক্ষমতাবিশেষ, কিন্তু দক্ষতা হলো সাহজিক বৃত্তি। বিনা অনুশীলনে যে গুণাগুণ মানুষের মধ্যে স্বভাবতঃই দেখা যায়, তাকে আমরা বলবো দক্ষতা। তবে সহজাত বৃত্তি হলেও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে দক্ষতা যে কিছুটা পরিবর্তনশীল—এই মতও অনেকে পোষণ করেন। বিভিন্ন গবেষণার ফলে সাধারণ বুদ্ধি (General intelligence) ছাড়াও

কতকগুলি বিশেষ দক্ষতা (Special abilities) নির্ণীত হয়েছে। যেমন—যান্ত্রিক দক্ষতা (Mechanical ability), সঙ্গীতনৈপুণ্য (Musical talent), হস্তসাধ্য নিপুণতা (Manual dexterity), সংখ্যাবিষয়ক দক্ষতা (Numerical ability) প্রভৃতি।

বিশেষ বিশেষ দক্ষতা পরিমাপের জন্যে বিশেষ বিশেষ অভীক্ষা তৈরি হয়েছে। এই অভীক্ষাগুলিতে সমস্যা সমাধানের জন্যে নানা রকম প্রশ্ন থাকলেও এগুলি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। যে চারটি নিয়মের ভিত্তিতে পদার্থ-জগতে নির্ভুল পরিমাপক যন্ত্র তৈরি হয়ে থাকে, ঠিক সেই নিয়মগুলিই মনোবিদ্যার জগতে অভীক্ষা তৈরির বিষয়েও প্রযোজ্য। এখন দেখা যাক, মনোবিদ্যায় অভীক্ষা তৈরির ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ নিয়মগুলি কি ভাবে প্রযোজ্য। প্রথম যেটি দেখা দরকার, সেটি হলো প্রামাণিকতা (Validity)। অভীক্ষাগুলি অবশ্যই প্রামাণিক হওয়া চাই, অর্থাৎ যে দক্ষতা মাপবার জন্যে অভীক্ষাটি তৈরি হয়েছে, অভীক্ষা প্রয়োগে ঠিক সেই দক্ষতাটি প্রকাশিত হচ্ছে কি না, তা 'জ্ঞাত বিনির্ণায়কের' (Criterion) সাহায্যে যাচাই করে দেখে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, দেখা দরকার অভীক্ষাটি নির্ভরযোগ্য (Reliable) কি না। একই ব্যক্তি-সমষ্টির উপর একাধিক বার অভীক্ষা প্রয়োগ করলে যতগুলি অভীক্ষালব্ধ মান পাওয়া যাবে, সেগুলির মধ্যে খুব ব্যতিক্রম না হলে অভীক্ষাটিকে বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য বলে ধরা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ, অভীক্ষা ব্যক্তি-নির্ভর (Subjective) না হয়ে বিষয়গত (Objective) হওয়া আবশ্যক। তা না হলে যে কোনও ব্যক্তির অভীক্ষালব্ধ মান অন্য ব্যক্তির সেই অভীক্ষালব্ধ মানের সঙ্গে তুলনাযোগ্য হবে না। এছাড়া অভীক্ষার আরও একটি জিনিষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অভীক্ষার মান স্থির-অর্থসম্পন্ন হওয়া (Standardized) বিশেষ প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ সকলের কাছে মানের অর্থ একই ভাবে গৃহীত হবে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি অভীক্ষার বিবরণ উল্লেখ করা যেতে পারে; যেমন :—

(১) বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test)। সাধারণ বুদ্ধির অভীক্ষা দুই রকমের হয়। (ক) বাচনিক (Verbal) ও (খ) অবাচনিক অভীক্ষা (Non-verbal test)। প্রথমোক্ত ধরণের অভীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে স্মরণশক্তি ও বিভিন্ন প্রকারের যুক্তিমত্তা সংক্রান্ত প্রশ্ন ও সমস্যাদি থাকে (যেমন, "কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া উচিত কেন, তার অন্ততঃ তিনটি কারণ দেখাও" বা "সূর্যের সঙ্গে শুকনোর যা সম্বন্ধ, বৃষ্টির সঙ্গে নিম্নলিখিত চারটি কথার মধ্যে কোন্‌টির সেই সম্বন্ধ ?—মেঘ, ধারা, স্যাঁতসেঁতে, ছোট ডোবা")। এই গেল বাচনিক অভীক্ষার কথা। অবাচনিক অভীক্ষা আবার দুই রকমের হতে পারে। এক—রেখাঙ্কনের আরোহ উপমা ইত্যাদি (Induction, analogy etc. in diagrams)। দুই—কায়িক (Performance) অভীক্ষা। শেষোক্ত অভীক্ষায়, অভীক্ষাস্থিত সমস্যা হিসাবে কতকগুলি কাষ্ঠ-ঘনককে নির্দিষ্ট প্রথায় সমাধানের উদ্দেশ্যে বিশেষ-ভাবে আয়োজিত করতে হয়।

(২) বিশেষ দক্ষতা অভীক্ষা (Special ability test)—কয়েকটি বিশিষ্ট দক্ষতা-অভীক্ষা এখানে দেওয়া হলো।

(ক) যান্ত্রিক (Mechanical) অভীক্ষা—এই অভীক্ষায় প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের দ্বারা অভীক্ষা গ্রহণার্থীর যান্ত্রিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের কতকগুলি বিযুক্ত অংশ পরীক্ষার্থীকে সমস্যা হিসাবে দেওয়া হয় যথাযোগ্য সংযোজন করবার জন্যে। এই কাজে পরীক্ষার্থীর সফলতা, নৈপুণ্য

ইত্যাদির মাধ্যমে তার যান্ত্রিক কুশলতা ও দক্ষতার পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

(খ) হস্তসাধ্য দক্ষতা অভীক্ষা (Manual ability)—এই ধরণের অভীক্ষায় পরীক্ষার্থী কত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিপুণভাবে অভীক্ষাস্থ বস্তুগুলিকে নির্দিষ্ট পথে আয়োজিত করতে পারে, তা পরীক্ষা করা হয়। এখানে কতকগুলি কাষ্ঠঘনক বা লৌহ যন্ত্রাংশ পরীক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষভাবে আয়োজিত ও বিয়োজিত করতে বলা হয়। এই আয়োজন-বিয়োজনের সময় ও যথার্থতা থেকে পরীক্ষার্থীর হস্তসাধ্য-দক্ষতার পরিমাপ পাওয়া যায়।

মানসিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান শাস্ত্রের অন্তর্গত (Statistics) উৎপাদক-বিশ্লেষণ-পন্থার (Factor analysis technique) বহুল প্রয়োগের ফলে মনোবিদ্যায় পরিমাপের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী উন্নতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মানসিক বৃত্তি বা মেজাজ (Temperament) সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, এখনও পর্যন্ত মানসিক বৃত্তির সঠিক পরিমাপ করবার কোনও অভীক্ষা তৈরি হয় নি। মানসিক প্রকৃতির নানা জাতিরূপ বা Type কল্পিত হয়েছে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপ নির্ণয়ের জন্যে নানা প্রকার অভীক্ষা তৈরি হয়েছে। এই রকম অভীক্ষা প্রয়োগে পরীক্ষার্থীর প্রকৃতিতে কোন্ কোন্ জাতিরূপ বিদ্যমান, তা জানা যায়। এইভাবে জ্ঞাত জাতিরূপের সমষ্টি নিয়ে পরীক্ষার্থীর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব (Total personality) সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়।

জাতিরূপ নির্ণয়ের জন্যে দুই রকমের অভীক্ষা হয়; যথা—(১) প্রশ্নোত্তর অভীক্ষা (Questionnaire) এবং (২) প্রক্ষেপাত্মক অভীক্ষা (Projective tests)। প্রশ্নোত্তর অভীক্ষায় ভাব, অভ্যাস, পছন্দ, অপছন্দ প্রভৃতি নিয়ে প্রশ্ন থাকে। এই সব প্রশ্নের উত্তর (যা পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে পাওয়া যায়) নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-প্রকৃতি ও জাতিরূপ বোঝা যায়। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ দুটি এই জাতীয় অভীক্ষার বিবরণ দেওয়া হলো :—

(ক) অন্তর্বৃত্ততা ও বহির্বৃত্ততা অভীক্ষা। যে লোকের ভাব, ধারণা বা চিন্তাধারা সাধারণতঃ নিজ অন্তরের দিকে নিবদ্ধ, তার মানসিক বৃত্তিকে অন্তর্বৃত্ত বলা হয়। অন্তর্বৃত্ত ব্যক্তি প্রায়ই লাজুক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং জনসমাজে সহজে মিশতে পারে না। বহির্বৃত্ততা হলো এর বিপরীত মনোবৃত্তি। বহির্বৃত্ত ব্যক্তি খুব সহজেই লোকসমাজে মিশে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে। ৫০টি ভাব নিয়ে এই অভীক্ষা তৈরি। অভীক্ষা-লিখিত ভাব পরীক্ষার্থীর প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর—মাত্র এই বিবেচনা করে পরীক্ষার্থী অন্তর্বৃত্ততাসম্পন্ন না বহির্বৃত্ততাসম্পন্ন, তা নির্ধারণ করা হয়।

(খ) মানসিক গঠন-বৈশিষ্ট্য (Mental constitution)। পরীক্ষার্থীর কোনও মানসিক বিকৃতি বা রোগপ্রবণতা থাকলে এই অভীক্ষায় তা ধরা পড়ে। অভীক্ষা নির্ধারিত প্রশ্ন অনুযায়ী পরীক্ষার্থীকে নানারূপ প্রশ্ন করা হয় এবং প্রশ্নের উত্তর থেকে পরীক্ষার্থীর মনোবিকারের কোনও সম্ভাবনা আছে কি না, তা জানা যায়।

প্রক্ষেপাত্মক অভীক্ষায় কতকগুলি শব্দ, ছবি বা কালির পোচড়া (Ink blot) দেখিয়ে পরীক্ষার্থীর অভিক্ষেপিত অনুষঙ্গ নেওয়া হয়; অর্থাৎ প্রক্ষেপাত্মক অভীক্ষায় দেখা হয়, ঐ নির্দিষ্ট উদ্দীপক (শব্দ, ছবি অথবা কালির পোচড়া) পরীক্ষার্থীর মনে কি ভাবের অবতারণা করছে। এই ভাবানুষঙ্গ লিখে নেওয়া হয় এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে সেগুলি বিশ্লেষণ করে পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয়ে থাকে। অনেক প্রক্ষেপাত্মক অভীক্ষার মধ্যে উদাহরণস্বরূপ নীচে কতকগুলির বিবরণ দেওয়া হলো।

শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা (Word association test)। পরীক্ষার্থীকে পর পর ১০০টি কথা শোনানো হয়; যথা—ঘোড়া, বাড়ী, রক্ত, হাত, ছুরি ইত্যাদি। প্রত্যেক কথা শোনা মাত্র পরীক্ষার্থীর মনে যে কথা বা ভাব জাগে, পরীক্ষার্থীকে তৎক্ষণাৎ তা জানাতে হয়। পরীক্ষার্থীর দেওয়া উত্তর এবং উত্তর দানের জন্যে যে সময় লাগলো, তা অভীক্ষাপত্রে লিখে রাখা হয়। এই উপায়গুলি বিবেচনা করে পরীক্ষার্থীর নির্জ্ঞান গূঢ়ৈষার সন্ধান পাওয়া যায়।

রর্স্যাক অভীক্ষা (Rorschach Test)। মোট ১০টি কালির পোচড়া সম্বলিত ছবি এই অভীক্ষার উদ্দীপক। এর মধ্যে ৫টি ছবি রঙীন এবং বাকী ৫টি কালো-সাদা। ছবিগুলি একে একে পরীক্ষার্থীকে দেখানো হয় এবং প্রতি ছবি থেকে উৎসারিত পরীক্ষার্থীর ভাবানুষঙ্গ লিখে নেওয়া হয়। পরে এই ভাবানুষঙ্গের গতি-প্রকৃতি ও ধারা থেকে পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-প্রকৃতি ও মান গঠন-বৈচিত্র্য নিধারণ করা হয়ে থাকে।

থিমাটিক অ্যাপারসেপ্‌সন অভীক্ষা (Thematic Apperception Test)। বিভিন্ন অবস্থার অনিশ্চিতার্থক ১৯টি ছবি এবং একটি সাদা কার্ড—এই মোট ২০টি হলো অভীক্ষার উদ্দীপক। এখানেও অভীক্ষা প্রয়োগের আবশ্যিক নিয়ম হলো এই যে, ছবিগুলি পরীক্ষার্থীকে একে একে দেখাতে হবে এবং পরীক্ষার্থী তাঁর চিন্তা, যুক্তি এবং অনুষঙ্গের সাহায্যে প্রতি ছবির ঘটনাবস্তুকে কেন্দ্র করে গল্প রচনা করবে। এই গল্পগুলির অন্তর্নিহিত রস, পারম্পর্য, প্রতিন্যাস ও বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ করে পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

আরও বহু প্রক্ষেপাত্মক অভীক্ষা তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এর প্রতিটি অভীক্ষাই কিঞ্চিদধিক ব্যক্তিত্ব-প্রকৃতি নির্ধারণ করতে সক্ষম হলেও রর্স্যাক (Rorschach) ও থিমাটিক অ্যাপারসেপ্‌সন অভীক্ষা (Thematic Apperception Test) এদের নির্ভরতা ও প্রামাণিকতার গুণে মনোবিদ্যার জগতে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যদিও মানসিক অভীক্ষার আলোচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আরম্ভ হয়েছে, তবুও এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই বিষয়ে বহুমুখী উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

কম্পিউটারের আত্মকাহিনী

জয়ন্ত বসু

কলকাতার পথে ঘাটে আপনারা নিশ্চয় আমাদের বিরুদ্ধে পোষ্টার দেখেছেন, খবরের কাগজের 'সম্পাদক সমীপেষু' চিঠি পড়ে হয়তো আমাদের উপর বিক্ষুব্ধও হয়েছেন। অফিসে বা কারখানায় আমাদের নিয়োগ করলে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাবে (কত বেড়ে যাবে, তা সহজে হিসেব করতে হলে অবশ্য আমাদেরই সাহায্য নিতে হবে), এই হলো আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

কম্পিউটারদের পক্ষ থেকে আমি এখন এই অভিযোগের উত্তর দিতে চাই। তবে সমস্ত ব্যাপারটিকে পরিষ্কার করে বোঝবার জন্যে আমাদের বংশপরিচয় প্রথমে আপনাদের জানতে হবে, জানতে হবে কেমন করে ও কীসের জন্যে আমাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। মনুষ্যত্বের সব থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষের যে মস্তিষ্করূপ অঙ্গ, আমরা যে তার একটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ অংশস্বরূপ, এই সত্যটি আপনারা যাতে উপলব্ধি করতে পারেন, সেজন্যে আমাদের কাজ কী ও কীভাবে আমরা তা করি, তা আপনাদের শোনাব। মানুষের কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগে আমরা তাকে কত ভাবে সাহায্য করছি, সত্যের খাতিরে নিজেদের সেই গুণকীর্তনও আমাকে কিঞ্চিৎ করতে হবে। আর তারপর আপনাদের বুঝিয়ে দেব, আসল অভিযোগ যদি থাকে তো, তা আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের নয়, আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের।

বংশপরিচয়

যে সব স্তম্ভের উপর ভর দিয়ে মনুষ্যসভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে, গণিত নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম। আমাদের কাজ হচ্ছে সেই গণিতের সমস্যার সমাধানে মানুষকে সাহায্য করা। ঐ কাজ দু-ভাবে হতে পারে। প্রথমতঃ, সংশ্লিষ্ট রাশিগুলিকে বিচ্ছিন্ন সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করে: যেমন, ধরা যাক, একটি পাত্রে কিছু তেল ঢালা হয়েছে, আপনি আরও খানিকটা তেল ঢাললেন (তেলা মাথাতে তেল দেওয়াই কি আপনাদের সমাজের রেওয়াজ নয়?), তাহলে তেল মোট কতটা হলো? এখানে আগে যে তেল ঢালা হয়েছিল ও আপনি যা ঢাললেন, তাদের সংখ্যায় (অর্থাৎ এত মণ, এত সের ইত্যাদি) প্রকাশ করে উত্তরটি সংখ্যার মাধ্যমে জানতে পারা যায়। দ্বিতীয়তঃ, সংশ্লিষ্ট রাশিগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে অন্য কোন উপযোগী অবিচ্ছিন্ন রাশির মাধ্যমে তাদের প্রকাশ করে: যেমন, কোন জমির সীমানাগুলিকে তাদের আনুপাতিক দৈর্ঘ্যের রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করে জমির মাপজোক ঠিক করা চলে। এই দুটি পদ্ধতি অনুযায়ী কম্পিউটারকুলেরও দুই ধারা: প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে যারা গণনা করে, তাদের বলা হয় ডিজিটাল বা সংখ্যাত্মক কম্পিউটার, আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি যারা ব্যবহার করে, তাদের বলা হয় অ্যানালগ বা সাদৃশ্যাত্মক কম্পিউটার।

প্রায় ২৫,০০০ বছর আগে সংখ্যা সম্বন্ধে মানুষের প্রথম ধারণা জন্মায়, হাতের আঙুলের সাহায্যে সে গুণতে শেখে। তারপর ধীরে ধীরে তার গণনা পদ্ধতির উন্নতি হতে থাকে। প্রথম যে উল্লেখযোগ্য গণকযন্ত্রটি মানুষ উদ্ভাবন করে, তার নাম অ্যাবাকাস। সে প্রায় ২,৫০০ বছর আগেকার কথা। এই যন্ত্রে সারিবদ্ধ কয়েকটি

নুড়ি বা কাঠের বল ব্যবহার করে গণনা করা হত। অনেক দেশে এখনো অ্যাবাকাসের প্রচলন আছে। এই অ্যাবাকাস হলো সংখ্যাত্মক
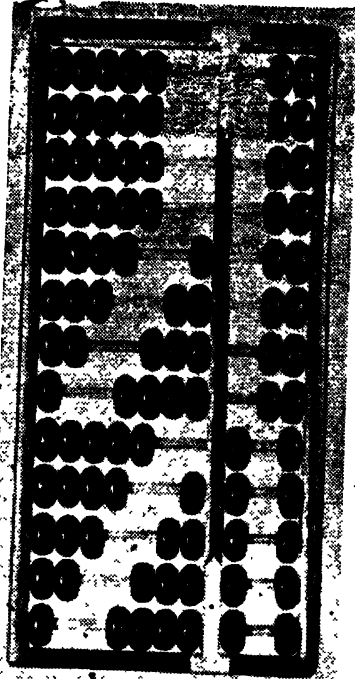
১নং চিত্র
অ্যাবাকাস—সংখ্যাত্মক কম্পিউটারদের আদিপুরুষ।

কম্পিউটারদের আদিপুরুষ—১নং চিত্রে এর একটি আলোকচিত্র আপনারা দেখতে পাবেন। আর সাদৃশ্যাত্মক কম্পিউটারদের আদিপুরুষ বলা চলে স্লাইড রুলকে—যার সঙ্গে আপনারা অনেকেই হয়তো পরিচিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্কটল্যাণ্ডের জন নেপিয়ার এর জন্ম দেন আর তারপর একে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম আউট্রেড।

যাই হোক, যে কম্পিউটারদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ, তারা প্রায় সবাই সংখ্যাত্মক এবং আমি নিজেও তাদের দলে। সেজন্যে সংখ্যাত্মক কম্পিউটারদের কথাই আমি কেবল বলব। (প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, আমাদের জ্ঞাতিরা আমাদের থেকে সাধারণতঃ অধিকতর দ্রুতগতিসম্পন্ন বটে, কিন্তু আমাদের সমাধান তাদের থেকেও অপেক্ষাকৃত নিখুঁত এবং তাদের আওতায় যত রকমের সমস্যা পড়ে, আমরা তার থেকে অনেক বেশি রকমের সমস্যার মোকাবিলা করতে পারি। টাকা-পয়সার হিসেবে আমাদের দরও সাধারণতঃ বেশি। আপনারা যাঁরা অর্থসর্বস্ব সমাজে বাস করেন—নিশ্চয় বুঝবেন যে, আমরাই বেশি সম্মানের পাত্র। যে বুদ্ধিমানেরা 'Meritocracy' বা গুণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁরাও আমাদের বেশি কদর দেন।)

সংখ্যাত্মক কম্পিউটারের বংশে অ্যাবাকাসের পরে জন্ম নিল ডেস্ক ক্যালকুলেটর—সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্লেজ পাস্‌কেল ও গট্‌ফ্রিড উইলহেল্‌ম লাইব্‌নিৎজ গিয়ার-সমন্বিত এই ক্যালকুলেটর উদ্ভাবন করেন। অতঃপর উল্লেখযোগ্য অবদান ঘটল প্রায় দু-শতাব্দী পরে। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক চার্লস ব্যাবেজ প্রথমে একটি 'পার্থক্য নির্ধারক যন্ত্র' ও পরে একটি 'বিশ্লেষক যন্ত্রের' পরিকল্পনা করেন। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল গাণিতিক তালিকা তৈরি করা। দ্বিতীয়টির পরিকল্পনা ছিল আরও উন্নত ধরণের: যোগ, গুণ, ভাগ, এসব করা ছাড়াও সে যাতে যথাযথ হুকুম তামিল করতে পারে, সেজন্যে তার যুক্তিশক্তি-সমন্বিত একটি অংশ থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এদিক থেকে যন্ত্রটিকে বর্তমান কম্পিউটারদের সমতুল্য বলা চলে। গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবার জন্যে ঐ যন্ত্রের যে অঙ্গ—ব্যাবেজ যাকে গণিতের কারখানা বলতেন, ২নং চিত্রে তার অংশবিশেষ দেখানো হয়েছে। দুঃখের বিষয়, যন্ত্র দুটির জন্যে যে সব সূক্ষ্ম কলকব্জার প্রয়োজন ছিল, ব্যাবেজের সময় তাদের অধিকাংশই পাওয়া যেত না বলে

ব্যাবেজ তাঁর যন্ত্র দুটির কোনটিই সমাপ্ত করতে পারেন নি।

কম্পিউটারদের পরবর্তী বংশধরের জন্ম আমেরিকার আদমসুমারীর দপ্তরখানায়। ১৮৮০ সালে আমেরিকায় যে লোকসংখ্যা গণনা করা হয়, তার হিসেব শেষ করতে ৭ বছর লেগে যায়। বোঝা গেল, যে হারে লোক সংখ্যা বাড়ছে, জোসেফ এম জ্যাকার্ড তাঁতযন্ত্রে সর্বপ্রথম প্রছিন্ন কার্ড ব্যবহার করেন। গণকযন্ত্রে ঐ ধরণের কার্ড ব্যবহার করবার প্রস্তাব ব্যাবেজ করেছিলেন, তবে হল্যারিথই প্রথম সেই প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। হল্যারিথের যন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, তাতে প্রছিন্ন কার্ডের ব্যবহারে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগ ঘটল।
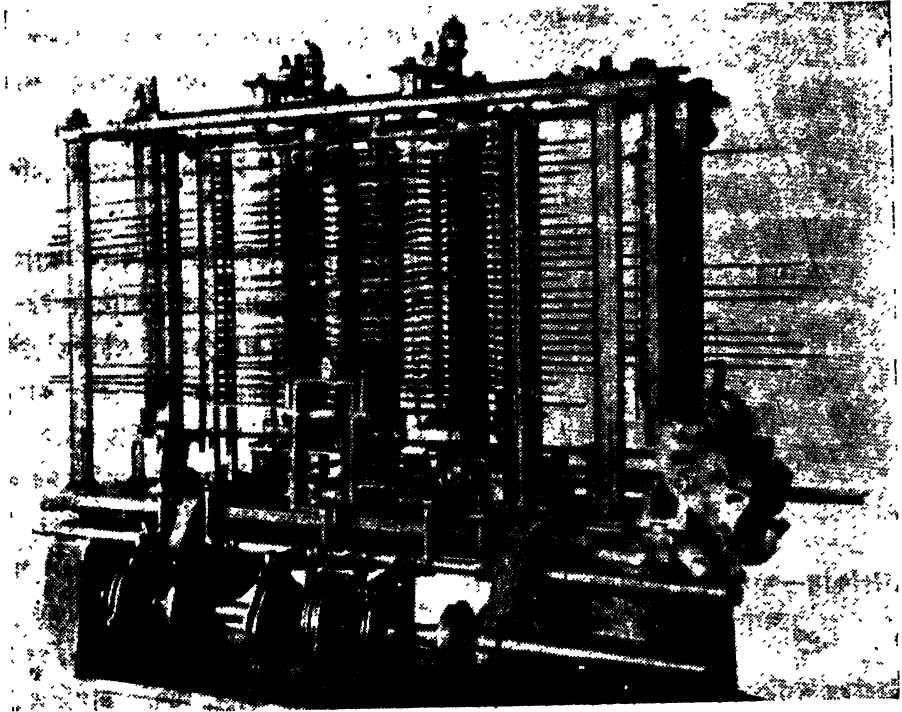
২নং চিত্র

ব্যাবেজের 'বিশ্লেষক যন্ত্রের' ভিতর যে 'গণিতের কারখানা', তার অংশবিশেষ

গণনার গতি না বাড়ালে ভবিষ্যতে আদমসুমারী শেষ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। নতুন এক গণকযন্ত্রে প্রছিন্ন (Punched) কার্ড ব্যবহার করে সেই সমস্যার সমাধান করলেন হার্মান হল্যারিথ। ঐ সব কার্ডে এক একটি ছিদ্রের অবস্থান এক একটি সংখ্যাকে নির্দেশ করত। কাপড়ে বিভিন্ন প্যাটার্ণ বোনবার সুবিধার জন্যে ফরাসীদেশের

এরপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমসাময়িক কালে ইলেকট্রনিক্সের প্রয়োগ কম্পিউটারকুলে নতুন সব বংশধর দেখা দিতে লাগল। ইতিমধ্যে প্রতীকধর্মী যুক্তিশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ক্লড শ্যাননের গবেষণার ফলে ঐ যুক্তিশাস্ত্রকে ভিত্তি করে কম্পিউটারকে যুক্তিসম্পন্ন করা হলো। কম্পিউটার আর শুধু কর্মী রইল না, চিন্তাশীল

হয়ে উঠল। ঐ ধরণের প্রথম কম্পিউটার তৈরি করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-জন স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র—কালিন ও বুর্খার্ট। আমাদের মধ্যে যারা আধুনিক সংখ্যাত্মক কম্পিউটার বলে পরিচিত, তাদের সর্বপ্রথমটির জন্ম পেন্সিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। যন্ত্রটির নাম Electronic Numerical Integrator And Computer, (ENIAC—ইংরেজি শব্দগুলির আদ্যাক্ষর নিয়ে

৩নং চিত্র

এনিয়াক—সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক সংখ্যাত্মক কম্পিউটার

ত), জন্ম সন ১৯৪২ সাল। এটি পূর্ণতা লাভ করে ১৯৪৬ সালে; তখন এতে ইলেকট্রনিক ভাল্‌বের সংখ্যা প্রায় ১৮,০০০, ওজন ৩০ টন, প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ ১৫০ কিলোওয়াট (৩নং চিত্র)। অতঃপর কম্পিউটারকুলের বংশধরদের সংখ্যা হাজার ছেড়ে লক্ষ ছুঁয়েছে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে বুদ্ধিমান মানুষকে তারা আরো বুদ্ধি জুগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা কীভাবে কাজ করি

আপনি যতক্ষণ এই বাক্যটি পড়ছেন, আমি সেই সামান্য সময়ে কয়েক লক্ষ যোগ বিয়োগ করে ফেলতে পারি। এজন্যে আমাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'বিশাল মস্তিষ্ক'। আমরা কীভাবে কাজ করি, ৪নং চিত্র দেখলে তা খানিকটা বোঝা যাবে। আমাদের পাঁচটি অঙ্গ—প্রবেশ, স্মারক, নিয়ন্ত্রক, পাটীগণিত ও প্রস্থান। যে সমস্যার আমাদের সমাধান করতে হবে, সেই সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যগুলি প্রবেশের মাধ্যমে স্মারকে উপস্থিত হয়ে সেখানে সঞ্চিত হয়। অতঃপর গাণিতিক প্রক্রিয়ার যথাযথ ধারা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রক অঙ্গ স্মারক থেকে তথ্যাদি পাঠিয়ে দেয় পাটীগণিত অঙ্গে; সেখানে প্রয়োজনীয় যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ ইত্যাদি সম্পন্ন হয়। ফলাফলগুলি নিয়ন্ত্রক সঙ্কেতে আবার স্মারকে চলে

গিয়ে সেখানে সঞ্চিত থাকে। পরিশেষে নিয়ন্ত্রক অঙ্গের নির্দেশে সমস্যার উত্তর স্মারক থেকে প্রস্থান অঙ্গের মধ্য দিয়ে বাইরে চলে যায়।

এখানে বলে রাখি, আমাদের নিজস্ব একটি ভাষা আছে, একটি দ্বিসংখ্যক ভাষা, (আপনাদের দেশে আমাদের সংখ্যা আর একটু বাড়লে একটি ভাষাভিত্তিক রাজ্য আমরা দাবী করব কিনা, তাই ভাবছি), আমরা যখন কাজ করি, মানুষের সমস্যাকে আমাদের ভাষায় এবং আমাদের উত্তরকে মানুষের ভাষায় অনুবাদ

যুক্তিধারার প্রবর্তক হলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের গণিতজ্ঞ জর্জ বুল। আর ১৯৩৮ সালে বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক সার্কিটের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স্ ইন্‌স্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির তদানীন্তন স্নাতকোত্তর ছাত্র ক্লড শ্যানন। এই প্রয়োগের একেবারে মূল বক্তব্য হলো: কোন সুইচ বন্ধ থাকলে তা দিয়ে বোঝানো হয় ১ আর খোলা থাকলে ০। শ্যানন এবং কালিন ও বুর্খার্টের কথা আগে আপনাদের বলেছি।
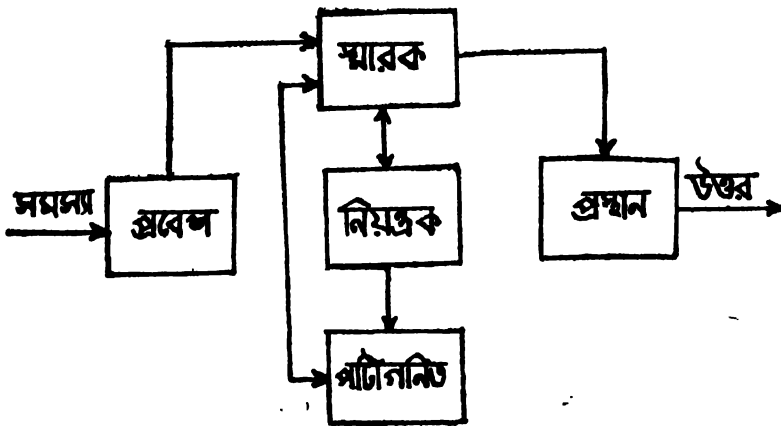
৪নং চিত্র
কম্পিউটারের কর্মধারা।

করে দিতে হয়। আমাদের ভাষায় সব কিছুকেই দুটি সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়; ঐ দুটি সংখ্যা হলো ০ ও ১। যে কোন সংখ্যার এক একটি Digit বা অঙ্ক হচ্ছে ঐ দুটির মধ্যে একটি—অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলা হয় একটি Binary Digit, সংক্ষেপে 'Bit' (বিট)। বিট ব্যবহার করে শুধু যে সংখ্যাকে এবং + বা − চিহ্নকে প্রকাশ করা হয়, তা নয়, বিট আমাদের যুক্তিশক্তিরও ভিত্তি। হাঁ, নির্ভুল বা সত্য বোঝাতে হলে আমরা বলি ১ আর না, ভুল বা মিথ্যা বোঝাতে হলে ০। এই প্রতীকধর্মী

আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কালিন-বুর্খার্ট যন্ত্রে যুক্তিশক্তির প্রথম আবির্ভাব ঘটল।

আমাদের পাঁচটি অঙ্গের এইবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে নিচ্ছি। মানুষকে প্রথমে তার সমস্যা অনুযায়ী আমাদের জন্যে একটি কর্মসূচী স্থির করতে হয়। এই 'প্রোগ্রামিং' বা কর্মসূচী নির্ধারণে অনেক সময় যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। প্রচ্ছিন্ন কার্ড, কাগজের ফিতা বা চৌম্বক ফিতায় ঐ কর্মসূচীকে দ্বিসংখ্যক ভাষায় লিখে আমাদের প্রবেশ অঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত করলে ঐ অঙ্গ তাকে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত করে স্মারকে

পাঠিয়ে দেয়। আমাদের মধ্যে কয়েকজন এখন মানুষের ভাষায় লেখা (বা এমন কি মুখে বলা কয়েকটি) নির্দেশ সোজাসুজি বুঝে নিতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের ভাষায় অনুবাদের কাজটি প্রবেশ অঙ্গের ভিতরেই ঘটে থাকে।

স্মরণ রাখবার উপকরণ নানারকম হতে পারে। তবে সব থেকে বেশি যা ব্যবহৃত হয়, তা হচ্ছে চৌম্বক ফিতা; টেপ-রেকর্ডারে আপনারা ঐ ধরণের ফিতার ব্যবহার দেখেছেন। ঐ ফিতায় থাকে ফেরাইট নামক একজাতীয় দ্রব্যের ছোট ছোট সব উপাদান। যে সব বিটকে স্মরণ করে রাখতে হবে, তাদের সমধর্মী বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের সাহায্যে ঐ সব উপাদানের এক একটির চৌম্বক অবস্থা এক একটি বিট অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং ঐ সব উপাদানের চৌম্বক অবস্থার মধ্যে বিটগুলির খবর জমা থাকে। কোন বিটকে স্মরণ করবার অর্থ: চৌম্বক ফিতার যে উপাদানে ঐ বিটের খবরটি আছে, বিটটির তথাকথিত ঠিকানায় সেই উপাদানকে খুঁজে বের করা এবং উপাদানটির চৌম্বক অবস্থা অনুযায়ী একটি কার্যকর বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের সৃষ্টি করা। আমাদের স্মারক অঙ্গে যতগুলি বিট সঞ্চিত থাকতে পারে, কারো কারো ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা ১০০ কোটি পর্যন্ত হয়ে থাকে। স্মারক অঙ্গে একই আয়তনে যাতে সঞ্চিত বিটের সংখ্যা বাড়ানো যায়, সেই উদ্দেশ্যে স্মারকে খবর লিখে রাখা ও স্মারক থেকে খবর উদ্ধার করবার ব্যাপারে লেজার রশ্মি ব্যবহার করবার চেষ্টা চলেছে।

নিয়ন্ত্রক অঙ্গকে আমাদের হৃৎপিণ্ড বলতে পারেন। আমাদের মধ্যে যে বিপুল সংখ্যক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে একটি সুশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করবার দায়িত্ব এই অঙ্গের। 'কাজ আরম্ভ করো', 'যোগ করো' 'অমুক নং বিটকে স্মরণ করো', 'কাজ বন্ধ করো,' প্রভৃতি যে সব নির্দেশ কর্মসূচীতে দেওয়া থাকে, সেগুলিকে এ বুঝতে পারে এবং এরই নির্দেশে আমাদের সমস্ত সুইচ যথাসময়ে খোলে বা বন্ধ হয়। যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্যে একটি দ্রুত-স্পন্দনশীল বৈদ্যুতিক দোলক বা ঘড়ি এবং রিলে (Relay), ডিলে (Delay) প্রভৃতি হরেক রকম বৈদ্যুতিক উপকরণ এ ব্যবহার করে থাকে।

ইলেকট্রনিক সুইচের সাহায্যে আঙ্কিক সব প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে পাটীগণিত অঙ্গ। এই সব সুইচ প্রায় আলোর সমান গতিতে খোলে বা বন্ধ হয়; আমাদের মধ্যে যারা খুব চালাক-চতুর, তাদের সুইচগুলি খুলতে বা বন্ধ হতে সময় লাগে এক সেকেণ্ডের ১০০ কোটি ভাগের মাত্র এক ভাগ। এখানে বলে রাখি যে, কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আমাদের সব ইলেকট্রনিক সুইচের কাজ করত ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব্‌। আধুনিক সব কম্পিউটারে এই ভাল্‌বের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে ট্রান্‌জিষ্টর ও সেমি-কণ্ডাক্টর ডায়োড্। পাটীগণিত অঙ্গে মূলতঃ যে প্রক্রিয়াটি হয়ে থাকে, তা হলো যোগ; তবে প্রতীকধর্মী যুক্তিধারার উপর ভিত্তি করে বিপুল সংখ্যক সুইচের সাহায্যে নানাবিধ প্রক্রিয়া এই অঙ্গটিতে সম্ভব হয়ে ওঠে।

যে সব ফলাফল স্মারকে জমা হয়ে থাকে, নিয়ন্ত্রক অঙ্গের নির্দেশে সেই সব ফলাফল অনুযায়ী বৈদ্যুতিক সঙ্কেত প্রস্থান অঙ্গে চলে যায় এবং সেখানে তারা রূপান্তরিত হয় এমনভাবে যাতে মানুষের বোধগম্যরূপে তারা আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এই আত্মপ্রকাশ প্রায়শঃ ঘটে প্রচ্ছিন্ন কার্ড বা কাগজের ফিতায় মুদ্রিত দ্বিসংখ্যক ভাষায়—যা থেকে সহজেই মানুষের প্রচলিত যে কোন ভাষায় অনুবাদ করা চলে। কোন কোন কম্পিউটারের প্রস্থান অঙ্গ থেকে ফলাফলগুলি কাগজের উপর মানুষের প্রচলিত ভাষাতেই মুদ্রিত হয়ে বেরিয়ে আসে। এই মুদ্রণের গতি এমন হতে পারে যে, এই

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' একটি পৃষ্ঠা এক সেকেণ্ডেই মুদ্রিত হয়ে বেরিয়ে আসবে। তবে আমাদের কাজ করবার তুলনায় এই গতি অত্যন্ত ধীর হওয়ায় অন্য নানারকম মুদ্রণ ব্যবস্থার চেষ্টা হয়েছে বা হচ্ছে। এছাড়া, প্রয়োজন অঙ্গ অন্যান্য ভাবেও ফলাফল প্রকাশ করতে পারে। যেমন, বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় 'সেজ' (SAGE) নামক যে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়, তার প্রস্থান অঙ্গ শত্রুপক্ষের বিমান বা ক্ষেপণাস্ত্রের গতিপথ সোজাসুজি একটি বিশেষ পর্দার উপর তুলে ধরতে পারে। অথবা এমন কম্পিউটারও আছে, যার ঐ অঙ্গটি মানুষের ভাষায় বিমান-চালককে সোজাসুজি নির্দেশ দেয় কোন্ পথে সে তার বিমানকে আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়ে আনবে।

যাহোক, আমাদের কাজের ধারা থেকে বুঝতে পারছেন যে, মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে আমাদের প্রভূত সাদৃশ্য আছে। মানুষের মতই আমরা অঙ্ক কষতে পারি, পারি স্মরণ করে রাখতে এবং যুক্তির আশ্রয় নিতে। অনেকে অবশ্য বলেন, ইন্‌টিউয়িশন বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে মানুষের যে যুক্তির ক্ষমতা, আমাদের তা নেই, থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু আমার মনে হয়, উক্ত ইন্‌টিউয়িশন হচ্ছে মানুষের অবচেতন মনের ধর্ম এবং অবচেতন মনের যুক্তি চেতন মনের যুক্তির মতই কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসারে ঘটে থাকে। ঐ প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে এখনো প্রায় কিছুই জানা নেই; যখন জানা যাবে, তখন তাদের সমধর্মী প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরাও তথাকথিত ইন্‌টিউয়িশন-ভিত্তিক যুক্তিশক্তির অধিকারী হবো।

অবশ্য মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে আমাদের অনেক পার্থক্যও রয়েছে। যে সমস্যার সমাধান করতে একজন বিজ্ঞানীর কয়েক বছর কেটে যাবে, আমরা তা কয়েক ঘণ্টায় করে দিতে পারি। তবে এ কথা স্বীকার করব যে, আমাদের স্মরণ-শক্তির তুলনায় মানুষের স্মরণশক্তি অনেক বেশি বিপুল: এক একটি কম্পিউটার ১০০ কোটি বিট পর্যন্ত স্মরণ করে রাখতে পারে বটে, কিন্তু একজন মাত্র মানুষের মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি ১০০ কোটি কম্পিউটারের সম্মিলিত স্মৃতিশক্তিরও প্রায় ২০০ গুণ। তাছাড়া, আমাদের সুইচের সংখ্যা যেখানে ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ, সেখানে আপনাদের মস্তিষ্কে তার সমধর্মী নিউরনের সংখ্যা ১০০০ কোটি হওয়ায় আপনাদের মস্তিষ্ক যত হরেক রকম সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে, আমরা তা পারি না—সে দিক থেকে আমাদের গণ্ডী বেশ খানিকটা সঙ্কীর্ণ। এই সব কারণে আমার কম্পিউটার-বুদ্ধিতে মনে হয়, মানুষের মস্তিষ্কের পরিবর্তে আমাদের ব্যবহারের কথা না ভেবে তার পরিপূরক হিসেবে আমাদের ব্যবহারের কথা ভাবাই যুক্তিযুক্ত। আপনাদের বুদ্ধিও কি তাই বলে না?

মানুষকে আমরা কতভাবে সাহায্য করছি

কিছুদিন আগে পর্যন্তও যে সব সমস্যাকে বিজ্ঞানীরা অসাধ্য বলে মনে করতেন, আমাদের সাহায্যে তাদের অনেকগুলির সমাধান করা এখন সম্ভব হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, প্রায় সব দেশেই আমাদের প্রথম উৎপত্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রে। শহর কলকাতাতেও ইসিযু-১ (ISIJU-1) নামে প্রথম যে আধুনিক সংখ্যাত্মক কম্পিউটারটি গড়ে উঠেছে, তা I. S. I. অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিট্যুট এবং J. U. অর্থাৎ যাদবপুর য়ুনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবেত প্রচেষ্টায়।

বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার আজ সব থেকে চমকপ্রদ প্রয়োগ যে মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রেও আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছি। গতিশীল মহাকাশযানের গতিবিধি

সংক্রান্ত তথ্যাদি বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলে আমরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিসেবনিকেশ করে জানিয়ে দিই, ঐ যানটি পূর্বনির্ধারিত পথেই চলেছে কি না। যদি বিচ্যুতি ঘটে, তার পরিমাণও আমরা জানিয়ে দিয়ে থাকি। ঐ বিচ্যুতির মাত্রা খুব বেশি না হলে তাকে সংশোধন করবার স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকে।

কারিগরী বিদ্যার অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইঞ্জিনীয়ারদের সহকারী হয়ে আমরা কাজ করে থাকি। ধরুন, কোন সেতু তৈরী হবে বা কোন সুড়ঙ্গ কাটতে হবে; তার জন্যে প্রয়োজনীয় যে সব গণনা, আমরা তা অত্যন্ত অল্প সময়েই সম্পন্ন করে দিই। জানেন বোধ হয়, অঙ্কনকে বলা হয় ইঞ্জিনীয়ারদের ভাষা। আলোকধারারূপ একটি কলমের সাহায্যে টেলিভিসনের পর্দায় ইঞ্জিনীয়ার-দের নক্সাকে যদি অঙ্কিত করা যায়, তাহলে তাঁদের ভাষাকে সোজাসুজি আমাদের প্রবেশ অঙ্গের মাধ্যমে আমাদের ভাষায় আমরা অনুবাদ করে নিতে পারি এবং তারপর বলে দিতে পারি বিভিন্ন নক্সার মধ্যে কোন্‌টি সবথেকে উপযোগী। 'টাটা ইনস্টিট্যুট অব ফাণ্ডামেন্টাল রিসার্চ' নামে বোম্বাইতে যে প্রসিদ্ধ গবেষণা-কেন্দ্রটি আছে, আলোর সাহায্যে নক্সা অঙ্কিত করবার পরিকল্পনাটি সেখানে এখন রূপায়িত হচ্ছে।

শুধু ইঞ্জিনীয়ারদের নয়, চিকিৎসদেরও আমরা সাহায্য করি। সোভিয়েট ইউনিয়নে সেজন্যে চিকিৎসাবিদ্যার সবথেকে মেধাবী ছাত্রদের আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার নিয়মিত ব্যবস্থা আছে। রোগের উপসর্গগুলি আমাদের কাছে উপস্থিত করলে আমরা সহজেই রোগ নির্ণয় করে দিতে পারি। তাছাড়া, মানুষের মস্তিষ্কের কর্মধারার সঙ্গে আমাদের কর্মধারার অনেক সাদৃশ্য থাকায় আমাদের কাছ থেকে সংগৃহীত জ্ঞান নিয়ে মানুষ চেষ্টা করছে তার মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ডের জটিল রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে, উদ্ভাবন করতে নানাবিধ স্নায়ুরোগের চিকিৎসার উপায়। এর উপর ভিত্তি করে নতুন যে বিষয় বস্তুটি গড়ে উঠেছে, তার নাম বায়োনিক্স্‌ (Bionics: Biology+Electronics)।

শিক্ষার ক্ষেত্রে আবার অন্যভাবে আমরা কাজ করে থাকি। ছাত্রদের কাছে অনেকগুলি প্রশ্ন তুলে ধরা হয়, সেই সব প্রশ্নের উত্তর কি হবে ও কেন হবে, আমরা তা তাদের বলে দিই।

অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক নানান ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োগ হচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে বলতে পারি, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীতে অসংখ্য তথ্য সঞ্চয় করে রাখতে হয় ও দীর্ঘ হিসেব-নিকাশের পালা থাকে; ঐ কাজগুলি অনেক ক্ষেত্রে আমরাই আজকাল করে দিচ্ছি। ভারতের জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের বোম্বাইয়ের দপ্তরখানায় আমাদের একজন নিযুক্ত আছে, কলকাতাতেও আর একজনকে আনবার কথা-বার্তা চলছে। ব্যবসায় ও শিল্পে আজ যে অটোমেসন বা স্বয়ংক্রিয়তা আশ্চর্যরকম সাফল্য লাভ করছে, তার অন্যতম কারণ আমাদের অকৃপণ সাহায্য।

এ সব ছাড়াও আমাদের হরেকরকম প্রয়োগ হচ্ছে বা প্রয়োগ করবার চেষ্টা চলেছে। কিছুদিন আগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পত্রিকায় জনৈক ছাত্র প্রস্তাব করেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের রাণীর জায়গায় একটি কম্পিউটারকে বসানো যাক —রাণীর করণীয় কাজগুলি কম্পিউটার অনেক ভালভাবে করে দিতে পারবে। যাহোক, আমার মনে হয়, আমাদের সবথেকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগের চেষ্টা চলেছে, তা হলো একটি কম্পিউটারকে দিয়ে অন্য কম্পিউটার বানানো। জীবের অন্যতম লক্ষণ যে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা, আমরা তাহলে সেই ক্ষমতার অধিকারী হব। আমরা যেদিন জীব

হিসেবে সম্পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করব, সেই 'দিন আগত ঐ'।

উপসংহার

বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করি বলে আজ আমাদের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ, প্রথম শিল্পবিপ্লবের সময় সেই রকম একই কারণে যন্ত্রের বিরুদ্ধে ইওরোপে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, কিন্তু যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠল; যে আন্দোলন পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল যন্ত্রের মুনাফালোভী মালিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, তা যন্ত্রের বিরুদ্ধে চালিত হওয়ায় সে আন্দোলন অচিরেই 'কালস্রোতে ভেসে' গেল। আজ দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবের আমরা সূচনা করেছি। ভবিষ্যতের প্রতীক আমরা, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আমাদের জয় হবেই। বিজ্ঞানীরা আমাদের জন্ম দিয়েছেন মানুষের কল্যাণের জন্যে। জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা আমাদের দমন করবার 'ব্যর্থ পরিহাসে' যোগ দেন না, বরং চেষ্টা করেন যাতে আমাদের উন্নতি হয় ও মানুষের কল্যাণের কাজে নিযুক্ত হয়ে যাতে আমরা সার্থক হয়ে উঠি।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। মানুষের বুদ্ধি এক বিরাট শক্তি। তবে তা সুবুদ্ধি হতে পারে, কুবুদ্ধিও হতে পারে। আপনাদের দেশে যেহেতু কুবুদ্ধিরই চলন বেশি, সেজন্যে বুদ্ধিকেই বাতিল করতে হবে, এটা নিশ্চয় কাজের কথা নয়। বরং চেষ্টা করতে হবে বুদ্ধিকে আরও উন্নত করবার এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে সুপথে চালিত করবার।

এ কথা ঠিক যে, কোন বিশেষ গোষ্ঠীর মুনাফা লাভের উপর ভিত্তি করে যদি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো রচিত হয়, তাহলে আমাদের প্রয়োগেরও মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় ঐ মুনাফার বৃদ্ধি। সেজন্যে আমাদের সাহায্যপুষ্ট অটোমেসনের ফলে আমেরিকার মত সম্পদশালী দেশেও সপ্তাহে প্রায় ৭৮,০০০ লোক বেকার হয়ে পড়ে। কিন্তু রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি যদি হয় সর্বসাধারণের কল্যাণ, তাহলে আমাদের প্রয়োগে বেকারত্বের সৃষ্টি হবে না, কারণ যে সব কর্মী বাড়তি হিসেবে গণ্য হবেন, অন্যত্র তাঁদের নিয়োগ করবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রই করে দেবে। সুতরাং বুঝতে পারছেন, আমাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ বাহ্যতঃ আংশিকভাবে সত্য মনে হলেও মূলগতভাবে তা ভিত্তিহীন। বরং আপনাদের বিরুদ্ধে যদি এই অভিযোগ আনি যে, বিজ্ঞানের আজ যে উন্নতি হয়েছে, তার উপযোগী অর্থনৈতিক কাঠামো আপনারা এখনো গড়ে তুলতে পারেন নি এবং সেজন্যে আমাদের অপব্যবহার ঘটছে ও আমাদের দুর্নাম রটছে, তবে সে অভিযোগ কি আপনারা অস্বীকার করতে পারেন?

ইসিযু-১ (ISIJU-1)

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইসিযু-১ (I S I J U-1)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলি-কমিউনিকেসন ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে অবস্থিত এই সংখ্যাত্মক কম্পিউটারটি I. S. I. অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনষ্টিট্যুট এবং J. U. অর্থাৎ যাদবপুর য়ুনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমবেত প্রচেষ্টায় গঠিত হয়েছে। এটি প্রথম সক্রিয় হয়ে ওঠে বর্তমান বছরের ২রা এপ্রিল। সর্বাধুনিক কম্পিউটারদের ধারা অনুযায়ী 'ইসিযু'তে ইলেক্‌ট্রনিক ভাল্‌বের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে ট্রান্‌জিস্টর ও সেমি-কণ্ডাক্টর ডায়োড। সেই দিক থেকে এ ধরণের কম্পিউটার ভারতবর্ষে এই প্রথম তৈরি হল।

কম্পিউটারটিতে ট্রান্‌জিস্টরের সংখ্যা প্রায় ৭,০০০ ও ডায়োডের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০। কম্পিউটারে সংবাদের একক যে 'বিট' (০ বা ১), 'ইসিযু'র স্মারক অঙ্গে ৩,২০,০০০ সংখ্যক সেই 'বিট' সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা আছে। এগারটি ডিজিট যে সব সংখ্যার, সেই রকম ১০,০০০ সংখ্যার যোগফল এক সেকেণ্ডে নির্ণয় করতে পারে এর পাটীগণিত অঙ্গ। 'ইসিযু' তার প্রবেশ অঙ্গে সমস্যাকে গ্রহণ করে কাগজের ফিতার মাধ্যমে, উত্তরও জানিয়ে দেয় কাগজের ফিতায়। কম্পিউটারটিকে আরো উন্নত করার এখনো নানাবিধ চেষ্টা চলেছে।

'ইসিযু'র পরিকল্পনা ও রূপায়ণের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ভারতীয় বিজ্ঞানীদের। এটিকে তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে ন্যূনাধিক ৪ লক্ষ টাকা; তার মধ্যে, আনন্দের কথা, বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ অর্ধেকেরও কম

শূন্য আর এক

পরিমলকান্তি ঘোষ

টরে টক্কা (•, —) একটি হ্রস্ব এবং একটি দীর্ঘ এই দুটি শব্দের নানাবিধ বিন্যাসের সাহায্যে আমরা টেলিগ্রামে সমস্ত সংবাদ (সংখ্যা সমেত) পাঠাতে পারি। বর্ণমালার যে কোন অক্ষর, বিরাম চিহ্নগুলি এবং 0 থেকে 9 পর্যন্ত অঙ্ক এই শব্দ দুটির নানাবিধ বিন্যাস দিয়ে জানান সম্ভব। আবার ইচ্ছা করলে '•' এবং '—' এর সাহায্যে এগুলি লিখেও ফেলতে পারি। এসব এখন আর কোন চমকপ্রদ বিষয় নয়। দুটি চিহ্ন—শূন্য (0) আর এক (1) দিয়ে যে সমস্ত সংখ্যাই লেখা যায় এবং এইরূপে লেখা সংখ্যা নিয়ে যে যোগ বিয়োগ প্রভৃতি পাটিগণিতের প্রক্রিয়া করা যায় তাও গণিতবিদেরা অনেক দিন থেকেই জানেন। আমরা সাধারণ ভাবে সংখ্যাগুলিকে দশগুণোত্তরা প্রণালীতে লিখি, যেমন 1111 লিখলে $1\times10^4+1\times10^3+1\times10^2+1\times10+1$ বুঝায় 1234 লিখলে $1\times10^4+2\times10^3+3\times10+4$ বুঝায়। এই প্রণালীতে আমাদের 0, 1,..., 9 এই কয়টি অঙ্কের (চিহ্নের) প্রয়োজন হয়। এরূপ আমরা দ্বিগুণোত্তরা, ত্রিগুণোত্তরা বা অন্যকোন গুণোত্তরা প্রণালীতে সংখ্যা লিখতে পারি—প্রয়োজনবোধে কত গুণোত্তরা প্রণালী অনুসরণ করছি তা বোঝাবার জন্য সংখ্যাটিকে বন্ধনীর মধ্যে লিখে বন্ধনীর ডান দিকে নীচুতে মূলটি লিখে দেব যেমন $(11111)_2$ লিখলে বোঝাবে 1111 সংখ্যাটি দ্বিগুণোত্তরা প্রণালীতে লেখা :—

$$(11111)_2=1\times2^4+1\times2^3+1\times2^2+1\times2+1=(31)_{10}$$
$$(11111)_3=1\times3^4+1\times3^3+1\times3^2+1\times3+1=(121)_{10}$$
$$(11111)_8=1\times8^4+1\times8^3+1\times8^2+1\times8+1=(4681)_8$$

এগুলির মধ্যে দ্বিগুণোত্তরা প্রণালীই এই প্রবন্ধে আমাদের বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়। এই প্রণালীতে কোন সংখ্যা লিখতে মাত্র দুটি অঙ্কের (চিহ্নের) প্রয়োজন হয়, যথা 0 এবং 1 1 থেকে 10 পর্যন্ত সাধারণ সংখ্যাগুলি (অর্থাৎ দশগুণোত্তরা প্রণালীর সংখ্যাগুলি) এই প্রণালীতে লিখলে দাঁড়ায়—

$1=(1)_2$, $6=(110)_2$,
$2=(10)_2$, $7=(111)_2$,
$3=(11)_2$, $8=(1000)_2$,
$4=(100)_2$, $9=(1001)_2$,
$5=(101)_2$, $10=(1010)_2$।

এই প্রণালীতে যোগ বা গুণের নামতা খুবই সরল :—

(যোগ)	(গুণ)
$0+0=0$	$0\times0=0$
$0+1=1$	$0\times1=0$
$1+0=1$	$1\times0=0$
$1+1=10$	$1\times1=1$

এদের সাহায্যে আমরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করতে পারি :—

```
  1101          1101
 +1001         -1010
 10110 (যোগফল)    11 (বিয়োগফল)
```

```
   1101             111)10101(11
  ×1011                 111
 ------                 ---
   1101                 111
  1101                  111
                        ---
 0000                   11 (ভাগফল)
1101
--------
10001111 (গুণফল)
```

এই দ্বিগুণোত্তরা প্রণালীতে লেখা সংখ্যাগুলিকে সাধারণ সংখ্যায় পরিণত করে দেখা যেতে পারে যে, বিভিন্ন ক্রিয়ার ফলগুলি সঠিক পাওয়া গেছে কিনা. যেমন ভাগের বেলায় $(10101)_2 = (21)_{10}$, $(111)_2 = (7)_{10}$ এবং $(11)_2 = (3)_{10}$ এবং $(21)_{10} \div (7)_{10} = (3)_{10}$.

সাধারণ কোন সংখ্যা দেওয়া থাকলে তা দ্বিগুণোত্তরা প্রণালীতে লেখা খুবই সহজ ; প্রদত্ত সংখ্যাটি বার বার শুধু 2 দিয়ে ভাগ করে যেতে হয় এবং ভাগশেষগুলির সাহায্যে সংখ্যাটি দ্বিগুণোত্তরা প্রণালীতে লেখা হয়। মনে করা যাক, সাধারণ সংখ্যা 59-কে দ্বিগুণোত্তরা প্রণালীতে লিখতে হবে।

```
2) 59
2) 29...1
2) 14...1
2) 7 ...0
2) 3 ...1
2) 1 ...1
   0    1
```

$(57)_{10} = (111011)_2$

নিয়মটির প্রমাণ অবশ্য সহজ। প্রথমে অষ্টগুণোত্তরা প্রণালীতে সংখ্যাটি লিখে তারপর দ্বিগুণোত্তরা প্রণালীতে সংখ্যাটি লেখা তাড়াতাড়ি হয় অভ্যস্ত হলে :—

$$(59)_{10} = (73)_8 = (111011)_2$$

কেন না $(7)_8 = (111)_2$, $(3)_8 = (11)_2$ দ্বিগুণোত্তরা, অষ্টগুণোত্তরা প্রণালী দুটির মধ্যে একটি নিকট সম্বন্ধ রয়েছে যা সহজেই দেখা যায়। অষ্টগুণোত্তরা প্রণালীর একটি স্থান দ্বিগুণোত্তরা প্রণালীর তিনটি স্থানের সমান কারণ $2^3 = 8$, তাই এই পথে যাওয়া সহজ।

আবার আমরা দ্বিগুণোত্তরা প্রণালীতে লেখা সংখ্যাকে দশগুণোত্তরা প্রণালীতে লিখতে পারি সহজেই প্রথম পন্থার অনুরূপ পন্থায়। মনে করা যাক—

$(111011)_2$ কে সাধারণ সংখ্যারূপে লিখতে হবে।

$(10)_{10} = (1010)_2$

```
1010) 111011 (101        1010) 101 (0
      1010                     101
      -----                    ---
      10011
       1010
      -----
       1001
```

প্রথম ভাগশেষ $(1001)_2 = (9)_{10}$, দ্বিতীয় ভাগ শেষ $(101)_2 = (5)_{10}$। অতএব $(111011)_2 = (59)_{10}$।

দ্বিগুণোত্তরা প্রণালীতে সাধারণ দশমিক ভগ্নাংশের (সসীম, অসীম, পৌনঃপুনিক) মত ভগ্নাংশ লেখা যায় যেমন—

$$(1.11)_2 = 1 + \tfrac{1}{2} + (\tfrac{1}{2})^2$$

$$1.\dot{0}\dot{1} = 1 + (\tfrac{1}{2})^2 + (\tfrac{1}{2})^4 + \cdots \text{ (অনন্ত)}$$

ইত্যাদি।

এখন কেউ এই প্রশ্ন করতে পারেন যে, পাটিগাণিতিক ক্রিয়াগুলি না হয় সহজে করা গেল তবে সংখ্যাগুলি লিখতে অনেক স্থানের প্রয়োজন হচ্ছে—লাভটা কি রইল ? তার উত্তরে বলতে পারা যায় যে, বর্তমানে যত ইলেকট্রনিক ডিজিট্যাল কমপিউটার (Electronic Digital Computer) চলছে তার প্রায় সবগুলির ভিতরেই এই প্রণালীতে অঙ্ক কষা হয়ে থাকে এবং এর কারণ দুটি স্থিত অবস্থার (Stable State) সৃষ্টি করা প্রযুক্তি বিদ্যার দিক থেকে অনেক সহজ। একটি স্থিত অবস্থা হলো 0-এর প্রতীক অপরটি 1-এর প্রতীক। এখন দেখা যাক, আমরা এই প্রতীকের সাহায্যে কিভাবে

দ্বিগুণোত্তর প্রণালীতে সংখ্যা নির্দেশ করতে পারি। মনে করা যাক একটি সারিতে 6টি বাল্‌ব বসান আছে। যে বাল্‌বটি জ্বলছে (*) তাকে আমরা ধরব 1 এবং যে বাল্‌বটি জ্বলছে না (•) তাকে আমরা ধরব 0। এইভাবে

* • * • • *

দিয়ে $(101001)_2=(41)_{10}$ সংখ্যাটি নির্দেশ করতে পারি। এখন এক একটি বাল্‌বের বদলে আমরা মনে করতে পারি যে, ঐ জায়গায় একটি তারের (বর্তনীর—Circuit-এর) শেষ প্রান্ত রয়েছে এবং যে বাল্‌বটি জ্বলছে তার জায়গায় আমরা মনে করব যে, একটি নির্দিষ্ট বিভব (Voltage) আছে এবং যে বাল্‌বটি জ্বলছে না তার জায়গায় আমরা মনে করব অপেক্ষাকৃত কম বিভব বা কোন বিভবই নেই তারের শেষ প্রান্তে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কতকগুলি তারের শেষ প্রান্তগুলিতে বিভব আছে কিংবা নেই তাই দিয়ে সংখ্যা নির্দেশ করা যেতে পারে। এই নীতিই ইলেক্ট্রনিক ডিজিট্যাল কমপিউটারে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। তবে প্রশ্ন হলো এইভাবে নিরূপিত সংখ্যা দিয়ে যোগ বিয়োগ ইত্যাদি ক্রিয়া কি ভাবে হয়?—এরূপভাবে তো সংখ্যা টেলিগ্রামেও পাঠান হয়। এই সব কমপিউটার-এর মধ্যে অঙ্ক কষার জন্যে যে সব বর্তনীর ব্যবহার হয় তার প্রান্তে বিভবের মাত্র দুটি স্থিত অবস্থা থাকে—যেমন উপরে বলা হয়েছে। মনে করি x এবং y দুটি সুইচ (switch)। সুইচ দুটি শ্রেণীবদ্ধভাবে (in series) বা সমান্তরালভাবে (in parallel) থাকতে পারে।
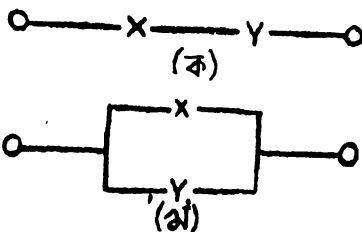
ক—শ্রেণীবদ্ধ সুইচ দুটি
খ—সমান্তরাল সুইচ দুটি

মনে করা যাক, প্রতিটি সুইচের দুটি স্থিত অবস্থা আছে—একটি সুইচ দেওয়া অবস্থা ('on' position) এবং অপরটি সুইচ বন্ধ করা অবস্থা ('off' position)। প্রথম অবস্থার প্রতীক রূপে লেখা যাক 1 এবং দ্বিতীয় অবস্থার প্রতীক রূপে লেখা যাক 0। শ্রেণীবদ্ধ সমবায়ে সুইচ দুটি দেওয়া থাকলে বর্তনীর দুই প্রান্তের বিভব একই থাকবে, আর যে কোন একটি বন্ধ থাকলে দুই প্রান্তের বিভব বিভিন্ন হবে, এক প্রান্তে দেওয়া বিভব অন্য প্রান্তে যাবে না।

আবার যখন সুইচ দুটি সমান্তরাল সমবায়ে থাকে তখন সুইচ দুটির মধ্যে যে কোন একটি দেওয়া থাকলে বর্তনীর দুই প্রান্তের বিভব সমান থাকে, অন্যথায় দুই প্রান্তের বিভব পৃথক হয়—এক প্রান্তে দেওয়া বিভব অন্যপ্রান্তে যায় না। সমবায় দুটির প্রত্যেকেই যেন একটা সুইচের মত কাজ করতে থাকে। তাই বর্তনীর দুই প্রান্তের বিভব এক থাকে এমন অবস্থার প্রতীক রূপে নিই 1 এবং দুই প্রান্তের বিভব শূন্য এমন অবস্থার প্রতীক রূপে লিখি 0। এখন $x \wedge y$ এবং $x \vee y$ দ্বারা জ্ঞাপন করা যাক x, y সুইচ দুটি যথাক্রমে শ্রেণীবদ্ধ ও সমান্তরাল অবস্থায় আছে। তাই—

$$1 \wedge 1=1 \qquad 1 \vee 1=1$$
$$1 \wedge 0=0 \quad \text{ও} \quad 1 \vee 0=1$$
$$0 \wedge 1=0 \qquad 0 \vee 1=1$$
$$0 \wedge 0=0 \qquad 0 \vee 0=0$$

যদি আমরা x' বলতে এমন একটি সুইচ বুঝি যার অবস্থা সব সময়েই x সুইচটির বিপরীত, তাহলে পাই—

$$x \wedge x'=0, \qquad x \vee x'=1$$

উপরে যে সূত্রগুলি দেওয়া হলো তাদের ভিত্তি করে একটি বীজগণিত (Algebra) গড়ে তোলা হয়েছে, সেটি হলো সুইচ দেওয়ার বীজ-গণিত (Switching Algebra) যার বিস্তৃত

রূপ বুলির বীজগণিত (Boolean Algebra)। এই বীজগণিতের সাহায্যে নানাবিধ বর্তনীর পরিকল্পনা করা হয় ছোট এবং বড় জিনিষের, যথা স্বয়ংক্রিয় লিফটের এবং ইলেক্ট্রনিক ডিজিট্যাল কমপিউটারের। তবে এই বীজগণিত শুধু সুইচের জন্যেই নয় যুক্তিবিদ্যারও (Logic) এর প্রয়োগ আছে। যদি কোন বাক্য p সত্য হলে তার সত্যতার মান (Truth Value) দিই 1, মিথ্যা হলে তার সত্যতার মান দিই 0, এবং দুটি বাক্য p, q দেওয়া থাকলে $p \wedge q$ (p এবং q) সত্য হয় যদি p ও q উভয়েই সত্য হয় এবং $p \vee q$ (p অথবা q) সত্য হয় যদি p অথবা q-এর অন্ততঃপক্ষে একটি সত্য হয় এই বুঝি তাহলে সুইচের বীজগণিত ও বাক্যের বীজগণিতের রূপ একই হয় এবং বর্তনীর সাহায্যে যুক্তিবিদ্যার সিদ্ধান্তে পৌঁছান যেতে পারে। কার্যক্ষেত্রে কমপিউটারে মধ্যে এরূপ বর্তনী থাকে এবং সেইজন্যে এই যন্ত্রের পক্ষে যুক্তিবিদ্যাসম্মত কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব। এখন দেখা যাক বর্তনীর সাহায্যে আমরা কি ভাবে দুটি সংখ্যার যোগ করতে পারি।

$$\begin{array}{r} a \\ +b \\ \hline cd \end{array}$$

$d=1$ শুধু যদি $a=0, b=1$

বা $a=1, b=0$

বা $d=(a' \wedge b) \vee (a \wedge b')$

$c=1$ শুধু যদি $a=1, b=1$

বা $c=a \wedge b$

d-এর জন্যে বর্তনী, c-এর জন্যে বর্তনী এবং একত্রে c, d-র জন্যে সংক্ষিপ্ত বর্তনী হলো যথাক্রমে
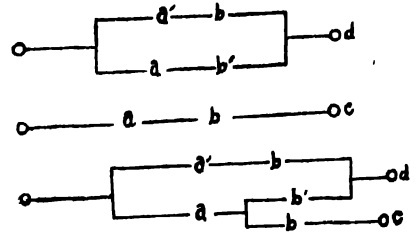
এখন a, b-র অবস্থা বসিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে—বর্তনীগুলি ঠিক হয়েছে কিনা। সুইচগুলির জায়গায় ইলেক্ট্রনিক ভাল্‌ভ বা ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহার করা হয়—তার গ্রিড (Grid)-এর উপর বিভব প্রযুক্ত হলেই তা একটি স্থিত অবস্থায় উপস্থিত হয়।

আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে এরূপ বর্তনী-জালের (Network) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যে কোন স্নায়ুর দুটি স্থিত অবস্থা আছে—উত্তেজিত অবস্থা, যখন স্নায়ুটি সংকেত বহন করছে এবং শান্ত অবস্থা যখন স্নায়ুটি কোন সংকেত বহন করছে না। স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাপারেও তাই শূন্য আর একের খেলা এবং এই কারণে কমপিউটার দিয়ে অনেক অংশে আমাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়ার অনুকরণ করা যায়। এই জন্যে এই সব কমপিউটারকে বলা হয় ইলেক্ট্রনিক মস্তিষ্ক (Electronic Brain)। আজকাল স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব রাখবার জন্যে, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্যে এবং যন্ত্রপাতির কাজ নিয়ন্ত্রণের জন্যে কমপিউটারের ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে, কি যুদ্ধের জন্যে, কি শান্তির জন্যে এবং এর ব্যবহারের বিস্তার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

বহির্বিশ্বের বুদ্ধিমান জীবের সন্ধানে

মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

উনিশ-শ' উনষাট সালের কথা। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক জি. ককোনি জড্রেল ব্যাঙ্কের সুবিখ্যাত বেতার মানমন্দিরের অধ্যক্ষ সার বার্ণার্ড লভেলকে একখানি চিঠি সত্যি বিশ্বের অন্য কোন স্থানের প্রাণী বেতারের মাধ্যমে আমাদের কাছে কোন সঙ্কেত-বাণী পাঠাচ্ছে কিনা। অধ্যাপক তাঁর চিঠিতেই সহজ আঁক কষেও দেখিয়েছেন যে, এর সম্ভাবনা রয়েছে
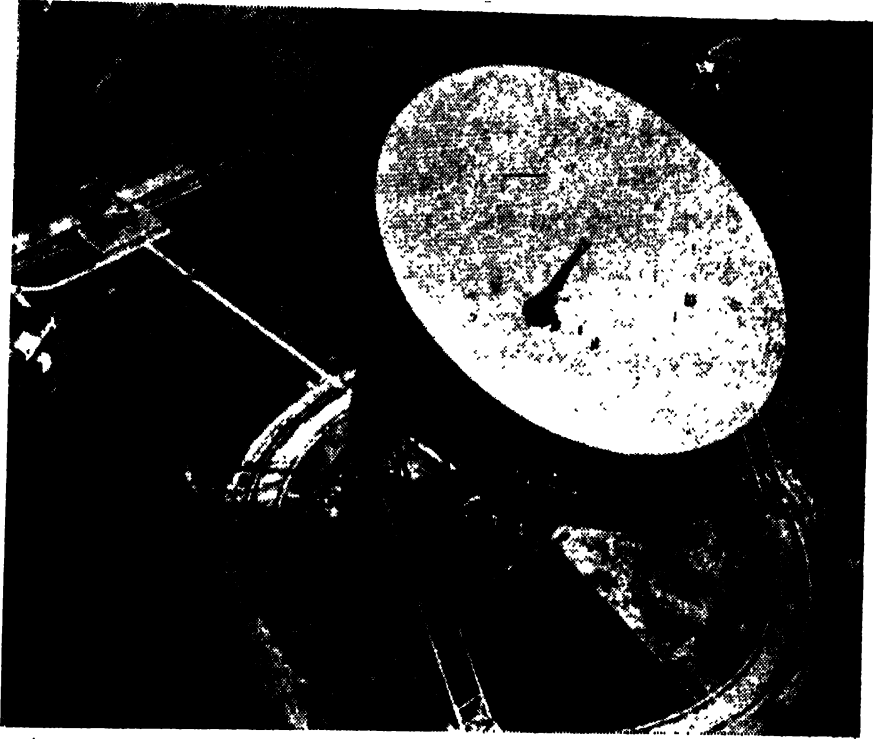
১নং চিত্র

বৃটেনে জড্রেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরের অতিকায় বেতার দূরবান (ব্যাস 250 ফুট)। স্বয়ংক্রিয় বেতার দূরবীনগুলির মধ্যে এটি পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ। এটিকে যে কোন সময়ে আকাশের যে কোন দিকে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছন্দে ঘোরানো যায়। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ সম্পর্কিত গবেষণায় এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সুবিদিত। হেলিকপ্টার সাহায্যে (উপরে ডান দিকে) যন্ত্রপাতি স্থানান্তরিত করা হয়।

লিখলেন। চিঠিতে একটি অনুরোধ ছিল—আপনাদের অতিকায় বেতার দূরবীন দিয়ে ভাল করে খুঁজে দেখবার সময় আজ এসেছে যে, সত্যি প্রচুর। সার বার্ণার্ড প্রথমটায় এই চিঠির কোন গুরুত্ব দেন নি—উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত বৈজ্ঞানিক রহস্য রচনার সামিল বলেই একে তখনকার মত এড়িয়ে

গেলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—দু'বছরের মধ্যেই ঘটনাপ্রবাহ এমনি ধারায় এগিয়ে গেল যে, স্যার বার্ণার্ড, ডক্টর ককোনির প্রস্তাবটি বিশেষ সম্মান ও গুরুত্বের সঙ্গে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন। এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানুষ বা মানুষের চেয়েও উন্নত ধরণের কোন জীব বিশ্বের অন্যত্র কোথাও আছে কিনা—এই প্রশ্ন বহুদিনের। বহুকাল থেকেই বিজ্ঞানীরা এই প্রসঙ্গে নানাপ্রকার জল্পনা-কল্পনা করে এসেছেন। বিজ্ঞানীরা কল্পনার স্তর অনেক দিন পেরিয়ে গেছেন এবং বর্তমানে 'বুদ্ধিমান জীব সন্ধানের' কাজ উদ্ভট বা অবিশ্বাস্য কিছু নয়, উন্নত ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়বস্তু।

বুদ্ধিমান জীব খোঁজবার আগে আমাদের কতকগুলি বিষয় বিশদভাবে জানতে হবে। মানুষ বা যে কোন জীব কি কি মৌলিক উপাদানে গঠিত, জীব-সৃষ্টি ও অভিব্যক্তির উপযোগী কি পরিবেশ থাকা দরকার এবং ঠিক তেমনি পরিবেশ বিশ্বের কোথায় থাকতে পারে—এগুলি হলো মূল প্রশ্ন। প্রশ্নগুলির সমাধান করতে পারলেই সর্বশেষে উঠবে খোঁজবার প্রশ্ন অর্থাৎ কেমন করে এবং কি উপায়ে আমরা পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবো যে, বিশ্বে আমরা নিঃসঙ্গ কি না। যে প্রশ্ন-গুলির অবতারণা করা হলো সে সবের অনেক রহস্যই আজ বিজ্ঞানীদের কাছে পরিজ্ঞাত। অতি আধুনিক জৈব-রাসায়নিক গবেষণার ফলে প্রাণ কি, কি উপাদানে গঠিত, কি পরিবেশে এবং কেমন ধারায় এর অভিব্যক্তি ঘটেছে—এ সবকিছুই বহুলাংশে জানা গেছে। সে প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা না করে বহির্বিশ্বের 'বুদ্ধিমান জীব খোঁজবার' ব্যাপারটা দেখা যাক। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে যে, কোথায় খুঁজতে হবে।

প্রথম আমাদের বাসস্থান এই পৃথিবীকে চিনতে হবে এবং বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সঠিকভাবে জানতে হবে। পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ—সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। অতি আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে, এর আকৃতি ঠিক গোলাকার নয়, অনেকটা যেন ন্যাসপাতির মত—গড়ে ব্যাস ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রায় আট হাজার মাইল। নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পাক খাচ্ছে, আর সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে তিন-শ' পঁয়ষট্টি দিনে একবার ঘুরে আসছে। এই দুটি গতি আছে বলে আমরা পাই যথাক্রমে দিনরাত্রি ও বিভিন্ন ঋতু। পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল, যার বিস্তৃতি মাটি থেকে কয়েক-শ' মাইল—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওজোন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ধূলা, ধোঁয়া, বাষ্প প্রভৃতি উপাদানে গড়া। উচ্চতার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি, যথা—এর গঠন, চাপ তাপ প্রভৃতি কেমন করে বদলায় তা বিশদভাবে জানা গেছে। একথা আজ সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আছে বলেই মানুষরূপী জীবের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। প্রয়োজন মত শ্বাসপ্রশ্বাসের উপযোগী বায়ু, বায়ুর চাপ ও তাপ, খাদ্যোৎপাদনের জন্যে ঝড়-জল-বৃষ্টি প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের দৌলতেই সম্ভব হচ্ছে। উপরন্তু বহিরাগত শত্রু—যেমন, বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন পদার্থ-কণিকার সংঘাত থেকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে এই বায়ুসমুদ্রের আবরণ। আবার এই বায়ুমণ্ডল আমাদের প্রয়োজনমত আলো ও তাপকে আসতে দিয়ে প্রাণঘাতী আর সবকিছুকেই নিজের ভিতরে শুষে নিচ্ছে অথবা বহির্বিশ্বেই আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে। আজ যদি কোন কারণে অদৃশ্য এই আবরণ বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বুক থেকে হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যেও উধাও হয়ে যায়, তাহলে মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর কোন অস্তিত্বই আর থাকবে না। জীবের বাসোপযোগী পরিবেশ সম্বন্ধে

কিছুটা বোঝা গেল। পরের প্রশ্ন দাঁড়াবে—এমনি পরিবেশের সন্ধান আর কোথাও পাওয়া গেছে কিনা ?

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা বলতে গেলে প্রায় নিঃসন্দেহ যে, সূর্যের অপরাপর গ্রহগুলির, যথা—মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতির কোনটিতেই পৃথিবীর মত মনুষ্য-বাসোপযোগী আবহাওয়া নেই। অনেকের মতে, একমাত্র মঙ্গলগ্রহে হয়তো কোন প্রাণীর অস্তিত্বের সম্ভাবনা থাকতে পারে, তবে ঠিক আমাদের পৃথিবীর বাসিন্দাদের মত কিছু হয়তো সেখানে নেই। এই বিষয়ে গবেষণা চলছে খুবই এবং আশা করা যেতে পারে যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই এই সমস্যার একটা সমাধান হয়ে যাবে। সংক্ষেপে তাহলে দাঁড়ালো এই যে, মানুষরূপী জীবের অস্তিত্ব সৌরজগতের আর কোথাও নেই এবং মানুষকে বুকে রাখবার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত তাহলে পৃথিবীই একমেব অদ্বিতীয়ম্।

বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে এবার সূর্যকে দেখা যাক। সূর্য আমাদের প্রাণধারণের এবং সর্ববিধ শক্তির উৎস। যুগ যুগ ধরে সম্ভবতঃ তাই মানুষ সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে আসছে। সূর্য একটি তারা—শুধুমাত্র তাই নয়, সে একটি অতি সাধারণ তারা—আকারে বা প্রকৃতিতে এর কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। রাতের আকাশে আমরা যে অগুণ্তি তারা দেখতে পাই, সূর্য তাদেরই একজন। খালি চোখে আমরা যে সকল তারা দেখতে পাই, সেগুলি জোটবেঁধে রয়েছে এক অপরূপ রাজ্যে। এই তারার রাজ্যকে আমরা বলি গ্যালাক্সি। দূরবীন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন গ্যালাক্সির বিশাল আকৃতির কথা—এর প্রকৃতি, গঠন-বিন্যাস প্রভৃতি অনেক কিছুই জানা গেছে। দেখতে অনেকটা ডিম্বাকৃতি—সুবিশাল একখানা চাকার মত বলা যেতে পারে। লম্বা দিকটা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত প্রায় এক-শ' হাজার আলোক-বছর আর খাটো দিকটা বিশ হাজার আলোক বছর। (আলোক-বছর হলো বিশ্বের আঙিনায় দূরত্বের একক। প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিবেগে চলে আলো এক বছরে যতটা পথ যেতে পারে, সেই দূরত্ব হলো এক আলোক-বছর। এক বছরে যত সেকেণ্ড অর্থাৎ ৩৬৫×২৪×৬০×৬০কে ১,৮৬০০০ দিয়ে গুণ করলে পাবো এক আলোক-বছর, প্রায় ৬×১০^{১২} মাইল)। দূরত্বের এই এককে আমাদের কাছ থেকে সূর্যের দূরত্ব মাত্র ৮ মিনিট, কারণ সূর্য-পৃথিবী দূরত্বটুকু আলো ৮ মিনিটেই পৌঁছে যায়। আমাদের কাছাকাছি যে সব তারা রয়েছে, তাদের দূরত্ব চার আলোক-বছরের বেশী। সুবিশাল এই তারার রাজ্যে কেন্দ্রস্থল থেকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দূরে রয়েছে আমাদের সূর্য, যার চারপাশে ঘুরছে আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ। পৃথিবী থেকে আমরা যখন এই তারার রাজ্যের লম্বা দিকটা বরাবর চেয়ে দেখি—অসংখ্য তারা আমাদের দৃষ্টি পথে ধরা দেয়, আমরা দেখতে পাই এদের সম্মিলিত আলো—আকাশের গায়ে তাই উদ্ভাসিত দেখতে পাই সাদা আব্‌ছা আলোর পথ—যাকে আমরা ছায়াপথ নামে জানি। আমাদের গ্যালাক্সি বলতে বুঝি ঐ ছায়াপথ এবং অপরাপর এলোমেলো বিন্যস্ত অসংখ্য যত তারা আমরা দেখতে পাই, সে সবকিছুর গড়া বিরাট একটি তারার রাজ্য, যার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেতে আলোর লাগবে এক-শ' হাজার বছর। 'আমাদের গ্যালাক্সি' —এই কথাটার একটু তাৎপর্য আছে। কারণ শক্তিশালী দূরবীনের কাছে বহু বহু দূরে এমনি অসংখ্য সব তারার রাজ্য বা গ্যালাক্সি ধরা দিয়েছে। একথা আজ সুপ্রমাণিত যে, আমাদের গ্যালাক্সির মত এরাও কোটি কোটি তারা দিয়ে গড়া। তাছাড়া সব গ্যালাক্সিগুলির মধ্যে রয়েছে

হাইড্রোজেন পরমাণু আর ধূলিকণা—কোথাও হাল্কা মেঘের মত জমাটবেঁধে এবং কোথাও মুক্ত অবস্থায়। আমাদের গ্যালাক্সির কাছাকাছি যে সব গ্যালাক্সি রয়েছে, তাদের দূরত্ব দশ-বারো লক্ষ আলোক-বছরের কম নয়। বিশ্বের পরিচয় তাহলে এই দাঁড়ালো—প্রায় দশ হাজার কোটি তারা দিয়ে গড়া একটি গ্যালাক্সি এবং এমনি প্রায় এক হাজার কোটি গ্যালাক্সি দিয়ে গড়া বিশ্ব। আমাখের প্রাণ ও শক্তির উৎস সূর্য একটি অতি সাধারণ তারা, মিট্ মিট্ করে জ্বলছে 'আমাদের গ্যালাক্সি'র এক প্রান্তে, আর সেই গ্যালাক্সি সমগ্র বিশ্বের এক হাজার কোটি গ্যালাক্সির মধ্যে একটি।

শুধুমাত্র যদি আমাদের গ্যালাক্সির কথাই ধরা যায়, তাহলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসে যাচ্ছে এবং এই প্রশ্ন নিয়ে বহুকাল থেকেই বিজ্ঞানীরা জল্পনা-কল্পনা করে আসছেন। প্রশ্নটি হলো এই দশ হাজার কোটি তারার মধ্যে মাঝারী ধরণের তারা আমাদের সূর্যেরই একমাত্র গ্রহমণ্ডলী থাকবে এবং তারই মধ্যে মাত্র একটি মাঝারী ধরণের গ্রহ আমাদের পৃথিবীই জীবসৃষ্টি ও লালন-পালনের গৌরবাধিকারী হবে—সূর্য এবং তৎসান্নিধ্যে পৃথিবীর এই একক সত্তা মেনে নেওয়া কঠিন। গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীরা এখন নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, আকারে ও প্রকৃতিতে হুবহু আমাদের সূর্যের মত তারা, কয়েক কোটি আমাদের গ্যালাক্সিতেই রয়েছে এবং তাঁরা অনেকেই মনে করেন যে, এদের প্রত্যেকটির সঙ্গেই যুক্ত রয়েছে নিজ নিজ গ্রহমণ্ডলী। বর্তমান যুগের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন যে, এই সব গ্রহগুলির মধ্যে আকারে, প্রকৃতিতে এবং নিজ নিজ তারার সঙ্গে যোগসূত্র ও সম্পর্কে ঠিক ঠিক আমাদের পৃথিবীর মত অসংখ্য গ্রহ বিরাজ করছে। যদি সত্যি তাই হয়, তবে আমাদের গ্যালাক্সিতেই অন্তত কয়েক লক্ষ গ্রহে মানুষের মত বা মানুষের চেয়েও বেশী বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব নিশ্চয়ই রয়েছে! খুব কম করে ধরলেও কয়েক লক্ষ গ্রহে বুদ্ধিমান জীব যে রয়েছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা বলতে গেলে নিঃসন্দেহ। তাদের আকৃতি, প্রকৃতি, বুদ্ধির মাপকাঠি, হাবভাব, চাল-চলন হয়তো বা আমাদের অজানা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। তাদের প্রাণের জৈব-রাসায়নিক ভিত্তিও হয়তো বা সম্পূর্ণ বিভিন্ন অন্য কোন কাঠামোয় গড়া। যুক্তি-তর্ক যাই হোক না কেন, গবেষণালব্ধ তথ্যকে অস্বীকার করা যায় না। প্রশ্ন উঠবে—প্রমাণ চাই। সরাসরি কোন প্রমাণ কেউ কোন দিন দিতে পারবেন বলে মনে হয় না, কারণ এদের দূরত্বের কাছে বিরাটাকার সব দূরবীনও হার মেনেছে এবং মানুষের পক্ষে অন্য তারার কোন গ্রহ দর্শন কোন দিনই সম্ভব হবে না।

গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে বিভিন্ন দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিজ্ঞানী বুদ্ধিমান জীব সন্ধানের গবেষণায় মেতে উঠেছেন অভিনব উপায়ে। বর্তমানের নব্যবিজ্ঞান বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানাবিধ শক্তিশালী যন্ত্রপাতিকে এঁরা হাতিয়ার করে নিয়েছেন। তাঁদের যুক্তিটা হলো এই—আমরা যদি ধরে নিই যে, মানুষের চেয়েও উন্নত ধরণের জীব যদি বিশ্বের কোথাও বিদ্যমান থাকে, তবে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় তারা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়েও বেশী পারদর্শী হবে। তাদের প্রয়োজনে বেতার-বিজ্ঞানকে তারাও নিশ্চয়ই কাজে লাগাচ্ছে। তাদের দেশে টেলিভিশন, রেডার, বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান উন্নতির ধাপে হয়তো আরও বেশী এগিয়ে গেছে। তাদের অনুসন্ধিৎসায় তারাও জানতে চাইবে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য, তারাও হয়তো সন্ধান করে চলেছে বিশ্বের দরবারে বুদ্ধিমান জীবকে। এই ধরণের চিন্তাধারার বশবর্তী হয়েই অধ্যাপক কক্কোনি সার বার্ণার্ড

লভেলকে উল্লিখিত চিঠিখানা লিখেছিলেন। গবেষণা কতটা কি হয়েছে, সে প্রসঙ্গে আলোচনা করবার পূর্বে নব্যবিজ্ঞান বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

বিশ্বের যে চেহারার সঙ্গে আমরা আজ পরিচিত, সে জ্ঞানাহরণ সম্ভব হয়েছে আলোর দৌলতে। বিরাটাকার সব দূরবীন এবং অন্যান্য নিখুঁত যন্ত্রপাতির সাহায্যে আলোর বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা তন্নতন্ন করে দেখেছেন অসংখ্য তারা, গ্যালাক্সি প্রভৃতিকে—অবতারণা করেছেন নানা তথ্যের—আমাদের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অনেক রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ হলো গড়ে উঠেছে আর একটি বিজ্ঞান —বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা। এই নব্যবিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরাও দেখেছেন—সূর্য, গ্রহ, তারা, গ্যালাক্সি সব কিছুকেই; তবে তাঁদের দেখাটা একটু আলাদা ধরণের। আলোর ঢেউয়ের বদলে এঁরা কাজে লাগাচ্ছেন রেডিওর ঢেউকে। রেডিওর চোখ দিয়ে যেন এঁরা বিশ্বকে দেখছেন। আকাশের বিভিন্ন দিক থেকে বহিরাগত ছোট-বড় নানা ধরণের রেডিওর ঢেউকে এঁরা ধরছেন বিরাটাকার সব রেডিও বা বেতার-দূরবীনের সাহায্যে, লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছেন সূক্ষ্ম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে। বিশ্লেষণ করে জানতে পারছেন রেডিও-সূর্য, রেডিও-গ্রহ, রেডিও-তারা, রেডিও-গ্যালাক্সিকে—সন্ধান এনে দিয়েছেন রেডিও-বিশ্বের। এমন সব তথ্য জানা গেছে, যা আলোর মাধ্যমে জানা কোন দিনই সম্ভব হতো না।

ব্যাপারটা আর একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

২নং চিত্র
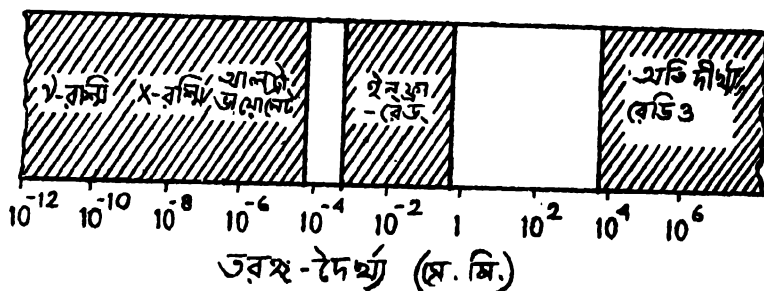
বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের বিস্তার এবং বায়ুমণ্ডলের ভূমিকা। সাদা অংশ দুটা যথাক্রমে আলো-জানালা এবং রেডিও-জানালা। সাদা অংশের উল্লিখিত তরঙ্গগুলি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে বহির্জগৎ থেকে পৃথিবীতে আসতে পারে, কালো অংশে উল্লিখিত তরঙ্গগুলি আসতে পারে না।

একথা আজ সুস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে—আলো, তাপ, আলট্রাভায়োলেট, রঞ্জেন-রশ্মি এবং বেতার-তরঙ্গ প্রভৃতি সবই হলো বিরাট এক পরিবারের বিভিন্ন সভ্য—পরিবারটির নাম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। ঢেউগুলির দৈর্ঘ্য কত বড় বা কত ছোট, তারই উপর নির্ভর করছে এদের প্রকৃতি। সবচেয়ে ছোট হলো গামা-রশ্মি আর সবচেয়ে বড় রেডিও-ঢেউ—দুয়ের মাঝামাঝি হলো আলোর ঢেউ। যে সব রেডিও-ঢেউয়ের দৈর্ঘ্য তেরো-চৌদ্দ মিটার থেকে কয়েক-শ' মিটার পর্যন্ত,

সেগুলিকে আমরা সংবাদ আদান-প্রদান এবং বেতার-অনুষ্ঠানের কাজে ব্যবহার করি। বেতার-জ্যোতির্বিদেরা ব্যবহার করেন ক্ষুদে মাপের রেডিও-ঢেউগুলিকে—যাদের দৈর্ঘ্য কয়েক সেন্টিমিটার থেকে কয়েক মিটার পর্যন্ত। এর কারণ হলো এই যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ক্ষুদে মাপের রেডিও-ঢেউগুলিকেই শুধুমাত্র ভেদ করে চলে আসতে দেয়, বড়দের আসতে দেয় না। ব্যাপারটা তাহলে এই দাঁড়ালো—পৃথিবীর বুকে বসে যেন আমরা দুটি মাত্র জানালা দিয়ে বিশ্বের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি। একটি আলো-জানালা, অপরটি রেডিও-জানালা (চিত্র-২)। বায়ুমণ্ডল এই দুটিকে খুলে রেখেছে বলেই গড়ে উঠতে পেরেছে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান। বহির্বিশ্ব থেকে যে রেডিও-ঢেউ আসছে, অতি মূল্যবান এই তথ্যটি এই যুগের একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার—১৯৩২ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ইয়ানস্কির অবদান। সেই থেকে গড়ে উঠেছে নব্যবিজ্ঞান—রেডিও বা বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান—রেডিও-ঢেউয়ের মাধ্যমে বিশ্বের নবপরিচিতি। বিভিন্ন আবিষ্কার সম্বন্ধে এখানে আলোচনা না করে বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়-বস্তুর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত উল্লেখযোগ্য একটি আবিষ্কার প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। ১৯৪৫ সালে ডাচ বিজ্ঞানী ভ্যান্‌ডে হুলষ্ট্‌ একটি মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করেন। তথ্যটি এই—হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন-বিন্যাসে (চিত্র ৩) বিশেষ একটি পরিবর্তন ঘটলে তাথেকে ২১ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ক্ষীণ রেডিও-ঢেউ বিকিরিত হতে পারে; তবে এই ঘটনার সম্ভাবনা এত কম যে, পরীক্ষাগারে কখনও এই ধরণের বিকিরণ ঘটানো এবং তা নিয়ে গবেষণা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভ্যান্‌ডে হুলষ্টের আগে প্রায় বছরখানেক পূর্বেই আমাদের দেশের বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহাও অন্য একটা গবেষণা প্রসঙ্গে এই তথ্যটির অবতারণা করেছিলেন। ভ্যান্‌ডে হুলষ্ট্‌ বললেন যে, ২১ সেন্টিমিটারের রেডিও-ঢেউয়ের উৎস সারা বিশ্ব হতে পারে, কারণ সারা বিশ্বে তারা গ্যালাক্সি ছাড়াও ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য হাইড্রোজেন পরমাণু—বিশ্বের

৩নং চিত্র

হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে আছে একটি প্রোটিন, তারই চারদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে একটি ইলেকট্রন, দুই-ই লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে। বাঁয়ে দেখানো হয়েছে তারা একই দিকে পাক খাচ্ছে, ডানে খাচ্ছে উল্টোদিকে। প্রথম অবস্থায় পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বিতীয় অবস্থা থেকে সামান্য কিছু বেশী। যদি কখনও প্রথম অবস্থা থেকে পরমাণু দ্বিতীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হয়, তবে বাড়্‌তি শক্তিটুকু ২১ সে. মি. রেডিও-ঢেউ বিকিরণের মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে। (শক্তি $= h\nu$, $h =$ প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক $6{\cdot}62 \times 10^{-27}$ erg. sec., ν কম্পন-সংখ্যা, এস্থলে ν-র মান হয় 1420 মেগাসাইকেল্‌স্/সেকেণ্ড অর্থাৎ ২১ সে. মি. তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য)

সবকিছুর মূল উপাদান। তাঁর মতে, শক্তিশালী বেতার-দূরবীন এবং সূক্ষ্ম বেতার-গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে বহির্বিশ্ব থেকে আগত ২১ সে. মি. রেডিও-ঢেউ লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। এই মতবাদ প্রচারের দু-বছরের মধ্যেই মার্কিন, ডাচ্ এবং অষ্ট্রেলিয়ান বিজ্ঞানীরা এই কাজে সফল হলেন। ২১ সে. মি. রেডিও-ঢেউ লিপিবদ্ধ করে বিজ্ঞানীরা আমাদের গ্যালাক্সির গঠন-রহস্য বিশদভাবে জানতে পেরেছেন—আলোর ঢেউয়ের মারফৎ এসব জানা কিন্তু কোন দিনই সম্ভব হতো না।

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিশেষ করে ২১ সে. মি-এর গবেষণা বিজ্ঞানীদের 'বুদ্ধিমান জীবের' সন্ধান-কার্যে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁদের যুক্তি—অপরাপর তারার আওতায় অবস্থিত অসংখ্য গ্রহলোকের সম্ভাব্য 'বুদ্ধিমান জীব'ও নিশ্চয়ই চেষ্টা করছে, তাদের সমতুল্য জীবের সন্ধান করতে। ২১ সে. মি-এ গবেষণায় তারাও নিশ্চয়ই উন্নত ধরণের বেতার-দূরবীন এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে—বিশ্ব-রহস্য হয়তো তারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের চেয়ে আরো বিশদভাবে জেনে গেছে। বিচিত্র নয় তাদের শক্তিশালী যন্ত্র সাহায্যে তারা হয়তো ২১ সে. মি রেডিও-ঢেউয়ের পিঠে চাপিয়ে সহজ সরল কোন বেতার সঙ্কেত পাঠাচ্ছে—তাদের গ্রহলোকে ব্যবহৃত বেতার অনুষ্ঠান, টেলিভিশন, রেডার প্রভৃতি হয়তো পৃথিবীতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী ও নিখুঁত। এই সব বহুবিধ চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করেই বর্তমানের 'বুদ্ধিমান জীবের সন্ধান' প্রসঙ্গ কল্পনার স্তর পেরিয়ে বাস্তব রূপ গ্রহণ করেছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, মার্কিন এবং রুশ বিজ্ঞানীরা গত পাঁচ বছর ধরে বর্তমান প্রসঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে আসছেন। ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়ায় গ্রীনব্যাঙ্ক অবস্থিত জাতীয় বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা মানমন্দিরে সম্মিলিত হলেন কয়েকজন সেরা মার্কিন বিজ্ঞানী—এঁদের মধ্যে ছিলেন অটো স্ট্রুভে, মেলভিন্ কেলভিন্, ফ্রাঙ্ক ড্রেক্, গুসেপি কক্কোনি, ফিলিপ মরিসন, কার্ল স্যাগান্ প্রভৃতি। এঁদের বিবেচ্য বিষয় ছিল, 'বহির্বিশ্বে সম্ভাব্য বুদ্ধিমান জীব' প্রসঙ্গ। ঠিক তিন বছর বাদে ১৯৬৪ সালে বুরাকান মানমন্দিরে আর্মেনিয়ান বিজ্ঞান সংস্থার আহ্বানে মিলিত হয়েছিলেন কয়েকজন প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী, অ্যাম্বারৎসুমিয়ান, স্লভ্স্কি, কারদাসেভ্ প্রভৃতি—বিবেচ্য বিষয় 'বহির্বিশ্বের সভ্যতা'। বলা বাহুল্য উভয় সম্মেলনেই বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে একমত হলেন যে, বিশ্বে মানুষ নিঃসঙ্গ নয়। অনুসন্ধান প্রসঙ্গেও তাঁদের অভিমত যে, বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং ২১ সে. মি. সংক্রান্ত গবেষণাই হয়তো একদিন না একদিন আলোক সম্পাত করতে পারবে।

কক্কোনির প্রস্তাব এবং উল্লিখিত সম্মেলন দুটির সাফল্যে সর্বপ্রথম পরীক্ষার কাজে আত্ম-নিয়োগ করলেন গ্রীনব্যাঙ্ক মানমন্দিরে ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক্। তাঁর প্রচেষ্টাকে তিনি 'Project Ozma' নামে আখ্যা দিলেন।—রূপকথার Oz নামক বিচিত্র দেশের অপরূপ রাজকন্যা Ozma-র উদ্দেশ্যে। তিনি কাছাকাছি দুটি তারা, (১০—১১ আলোক-বছর দূরত্ব) টাউ ছেটি এবং এপ্সাইলন এরিদানিকে কড়া নজরে রাখলেন, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে কয়েকমাস ক্রমাগত লিপিবদ্ধ হতে লাগলো সেখান থেকে আগত ২১ সে. মি. দৈর্ঘ্যের রেডিও-ঢেউ। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখলেন, লিপিবদ্ধ বেতার তরঙ্গের কোথাও কোন সুসঙ্গত সঙ্কেত লুকিয়ে আছে কিনা। তিনি বিফল মনোরথ হলেন, কিন্তু তিনি বা অন্য কোন বিজ্ঞানী এই বিফলতায় দমেন নি। চেষ্টা চলছে আরো উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভবিষ্যৎ গবেষণা

চালিয়ে যাওয়া। হ্যারলো সেপ্‌লী, ইয়ান্‌ স্তক্লির মত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের অভিমত হলো এই যে, Project Ozma শুধুমাত্র প্রথম ধাপ, সফলতার জন্তে সুসংবদ্ধভাবে এমনি ধরণের আরো বিরাটাকার Project Ozma-র অবতারণা করতে হবে। তাঁরা নিঃসন্দেহ, সফলতা একদিন অর্জন করা যাবেই। ঠিক একই সময়ে নিকোলাই কারদাসেভের একটি ঘোষণা কিছুটা সাময়িক চাঞ্চল্য এনেছিল। তিনি তাঁর যন্ত্রে লিপিবদ্ধ সঙ্কেতকে বহির্বিশ্বের বুদ্ধিমান জীবের প্রচেষ্টা বলতে চাইলেন, কিন্তু বিজ্ঞানীমহল এখন পর্যন্ত নিঃসন্দেহে তাঁর অভিমত গ্রহণ করেন নি।

সমস্তাটা খুবই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যদিও বা বহির্বিশ্ব থেকে কোন সঙ্কেত বেতারের মাধ্যমে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে কোন দিন ধরা দেয়, তাথেকে বোধগম্য কিছু উদ্ধার করা কি সম্ভব হবে? তাদের ভাষা, সংখ্যা গণনা যা কিছুই ভাবি না কেন, সবই তো হবে মানুষের অজ্ঞাত সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। একমাত্র আশা, যদি তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন কোন সঙ্কেত না পাঠিয়ে 'টরে-টক্কা' বা 'বীপ্‌ বীপ্‌' ধরণের কোন সঙ্কেত-বাণী পাঠান। বোধগম্য কোন খবর আহরণ না করতে পারলেও এটা অন্ততঃ বোঝা যাবে যে, 'বহির্বিশ্বের বুদ্ধিমান জীবেরা' অপরাপর জীবের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন আরো জটিল। সত্যি যদি কোন দিন প্রমাণিত হয় যে, বহির্বিশ্বে বুদ্ধিমান জীব রয়েছে—তাদের সঙ্গে সঙ্কেত আদান-প্রদানের সম্ভাবনাই বা কতটুকু? হয়তো বা নেই বললেই চলে, কারণ সূর্যের মত হুবহু একই প্রকৃতির তারা যাদের গ্রহলোকে থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে—তাদের কারুর দূরত্বই ১০-১২ আলোক-বছরের কম নয়। কাজেই যোগাযোগ ব্যবস্থায় বেতার-সঙ্কেতকে এই দূরত্ব পারাপারে কম করেও প্রায় বিশ বছর লেগে যাবে; অর্থাৎ অজ্ঞাত গ্রহলোকের অধিবাসীদের কাছে আজ যদি বেতার-সঙ্কেত পাঠানো হয় এবং তারা সেটা বুঝে নিয়ে যদি সত্যি পাল্টা জবাব পাঠায়—সেই আশা নিয়ে বিশটি বছর প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। অবশ্য বর্তমান গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামাচ্ছেন না। বিজ্ঞানীদের যুক্তি হলো এই যে, আমরা যদি কোন উপায়ে শুধুমাত্র এটুকু নিঃসন্দেহে জানতে পারি যে, বিশ্বে আমরা নিঃসঙ্গ নই—বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেই জ্ঞানটুকুই এনে দেবে নববিপ্লব। অগ্রগতির যে ধারার সঙ্গে আমরা নিত্য নতুন পরিচিতি লাভ করছি, তাতে নিরাশ হবার কারণ নেই, পাঁচ-দশ বছরের মধ্যেই হয়তো পৃথিবীর একক সত্তা ঘুচে যাবে—পৃথিবীবাসী জানবে বিশ্বে তারা নিঃসঙ্গ নয়! যে চিঠির কথা উল্লেখ করে প্রবন্ধের অবতারণা করেছিলাম, ভবিষ্যতের বিজ্ঞান-ইতিহাস রচয়িতা হয়তো সেইটিকেই তাঁর রচনার ভিত্তি করে নেবেন।

যাঁরা এই বিষয়ে আরো বিশদভাবে জানতে চান, নিম্নলিখিত বইগুলি পড়ে দেখতে পারেন।

1. We Are Not Alone
—Walter Sullivan
2. The Exploration of Outer Space
—Sir Bernard Lovell
3. Of Men and Galaxies
—Fred Hoyle
4. Life on Other Worlds
—Sir Harold Spencer Jones
5. Exploring the Secrets of Space
—I. M. Levitt & D. M. Cole.

ম, গড়ে জ্যো

দুরন্তগতি রকেট

অনিলকুমার ঘোষাল

অজানাকে জানবার ঔৎসুক্য চিরকালই মানুষকে অনেক নতুন আবিষ্কারে নিয়োজিত করেছে। তাই আজকের দিনে রকেট আর শুধু হাউইবাজী নয়। বিংশ শতাব্দীতে অভূতপূর্ব কারিগরী বিদ্যার উন্নতির ফলে, বর্তমানে রকেটের ব্যবহার সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্ররূপে (মিসাইল), আবহবিদ্‌গণের কাছে অপরিহার্য যন্ত্র, আর মহাশূন্য অভিযানের একমাত্র অনুমতিপত্র। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাসের যাত্রার ফলাফল যেমন আগেই ঘোষিত করা সম্ভব হয় নি, তেমনি রকেটকে আরও কত প্রকারে ব্যবহার করা সম্ভব হবে, তার ভবিষ্যদ্বাণীও করা যায় না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে সমস্ত জাতি যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই রকেট যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে বহুল ব্যবহার করেছে। বস্তুতঃ রকেট-অস্ত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে রকেট মারাত্মক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে, তা সহস্র সহস্র বৈজ্ঞানিকের বহু বছরের গবেষণার ফল। তারপর থেকে রকেট যে সফলতার সঙ্গে অন্য কাজেও, বিশেষ করে মহাশূন্য অভিযানে ব্যবহার করা হচ্ছে—তাতে মনে হয়, রকেট-বিজ্ঞান দিন দিন প্রগতির পথেই এগিয়ে যাবে।

ইতিবৃত্ত

একটি ছোট বেলুন খুব উচ্চ চাপে হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে ভর্তি করলাম। হাইড্রোজেন গ্যাস বেলুনের ভিতরের সব দিকে সমান চাপ দেবে। বেলুনের কোন এক স্থানে পিনের সাহায্যে একটি ছোট ছিদ্র করে দিলে ঐ ছিদ্র দিয়ে গ্যাস জোরে বাইরে বেরোতে সুরু করবে। ঐ স্থানে গ্যাসের চাপ কম হবে, বিপরীত দিকের চাপ বেশী হবে এবং বেলুনটিকে ঠেলে দেবে। রকেটেও ঠিক এই তত্ত্বটিই ব্যবহার করা হয়। রকেটে বিশেষ জ্বালানীর দহনে অত্যন্ত উচ্চ চাপের গ্যাস সৃষ্টি করা হয়। এই গ্যাস পিছন দিকের একটি গর্ত দিয়ে জোরে নিষ্কাশিত হলে রকেটকে সম্মুখের দিকে ঘাত (Thrust) দেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে যত তাড়াতাড়ি রকেট-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, এমন আর আগে হয় নি। এর আগে রকেটের খুব ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছিল। তার কারণ উপরে বর্ণিত রকেটের তত্ত্ব যত সরল, প্রয়োগ ক্ষেত্রে তাই অত্যন্ত জটিল এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

রকেট যে ঠিক কে আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর নাম জানা যায় নি। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি খৃষ্ট-জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে জন্মেছিলেন।

রকেটের ধারণা চীন জাতির কাছ থেকে পাওয়া। চীনারাই প্রথম সোরা, গন্ধক আর কাঠকয়লার গুঁড়া মিশিয়ে বারুদ তৈরি করে। ১২৩২ খৃষ্টাব্দে কাইফুং-ফুতে চীনারা আক্রমণকারী মঙ্গোলদের বারুদ দিয়ে তৈরি 'উড়ন্ত-আগের তীর' ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে এরূপ প্রাচীন রকেট এরপর ভারতবর্ষ, আরব, গ্রীস, ইতালি এবং ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে প্রায় সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকেও যুদ্ধে

রকেট ব্যবহারের বিবরণ পাওয়া যায়। বন্দুক আবিষ্কৃত হওয়ার পর পাশ্চাত্যে রকেটের প্রচলন ক্রমশঃ কমতে থাকে, কিন্তু প্রাচ্যদেশগুলিতে তখনও রকেট ব্যবহৃত হতো। ভারতবর্ষে বৃটিশ সৈন্য মহীশূরের মহারাজা হায়দার আলির কাছে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এবং তার পুত্র টিপু সুলতানের কাছে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পরাজয় বরণ করে। উভয় যুদ্ধেই ভারতীয় সৈন্য রকেট ব্যবহার করে ইংরেজদের হারিয়ে দেয়। এরপর সামরিক কাজে রকেটের ব্যবহার সম্বন্ধে বৃটিশ সৈন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়।

এই সময়ে যুদ্ধ-রকেটের বেশ কিছুটা উন্নতি হয়। ঐ সময়কার গ্রেট বৃটেনের সার উইলিয়াম কংগ্রীভের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি কঠিন জ্বালানী ব্যবহার করে রকেট বানিয়েছিলেন, যা কয়েকটি বড় বড় যুদ্ধে ব্যবহার করে ইংরেজ সৈন্য জয়লাভ করে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৮১২ খৃষ্টাব্দের বৃটিশ-আমেরিকান যুদ্ধ। ব্লাডেন্স্বার্গে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অগাষ্ট যে যুদ্ধ হয়, তাতে আমেরিকান সৈন্য এত ঘাব্ড়ে গিয়েছিল যে, বৃটিশ ফৌজ অত্যন্ত সহজে ওয়াশিংটন সহর দখল করে। এই কংগ্রীভ রকেটের পরে অসামরিক ব্যবহারও হয়েছিল।

রকেট-বিজ্ঞানের উন্নতির মাঝে আরও এক শতাব্দী পার হয়ে যায়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্তিন জিওল্কভস্কি নামক রাশিয়ার একজন শিক্ষক কিভাবে তরল জ্বালানী ব্যবহার করে মহাকাশ ভ্রমণে যাওয়া যায় তার তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই তত্ত্ব রাশিয়াতেই সীমিত থাকে এবং রাশিয়াতেও ইহা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি বা আগ্রহের সৃষ্টি করতে পারে নি। জিওল্কভস্কির তত্ত্ব অবজ্ঞাত থাকাকালীন ইউরোপের হেরম্যান ওবার্থ এবং আমেরিকার রবার্ট. এইচ. গডার্ড আধুনিক রকেট-যুগের সূচনা করেন। অধ্যাপক ওবার্থ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে 'The Rocket Into Interplanetary Space' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকটি প্রকাশের পর জার্মেনীতে রকেট সংক্রান্ত গবেষণায় বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। বস্তুতঃ অধ্যাপক ওবার্থ এই পুস্তকে মহাকাশ অভিযানের যে সমস্ত সমস্যার ইঙ্গিত দেন, তার অনেকগুলিরই এখনও সমাধান হয় নি।

ডাঃ গডার্ড ছিলেন মাসাচুসেট্স্-এর ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান। কয়েক বছর গবেষণার পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং বলেন কঠিন জ্বালানীর রকেটের চেয়েও তরল জ্বালানীপূর্ণ রকেটের দক্ষতা অনেক বেশী। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তিনি একটি তরল-জ্বালানীর রকেট উৎক্ষেপণ করেন। রকেটটি যদিও বিশেষ উচ্চে (১৮৪ ফুট মাত্র) ওঠে নি, তবু তা প্রমাণ করেছিল, তরল জ্বালানীর রকেটই হবে ভবিষ্যতের রকেট। ১৯৩৫ সালে গডার্ডের রকেট ঘণ্টায় ৭০০ মাইল বেগে ৭৫০০ ফুট উপরে ওঠে। গডার্ডকে আধুনিক রকেটের জনক বলা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানরা তরল জ্বালানী ব্যবহার করে ভি-২ নামক পথনির্দেশক যন্ত্রসহ বহু রকেট অস্ত্র নিক্ষেপ করেন।

প্রথম যন্ত্রসহ রকেট উৎক্ষেপণ করেন ডাঃ গডার্ড ১৯২৯ সালের ১৭ই জুলাই। এই রকেটে থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার এবং উচ্চতম স্থানে ছবি তোলবার জন্যে একটি ক্যামেরা ছিল।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েট রাশিয়া স্পুটনিক-১ নামক কৃত্রিম উপগ্রহ রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করে। ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র যে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে, তার নাম এক্সপ্লোরার-১।

এই সময় থেকেই মহাকাশ-যুগের (Space Age) সুরু।

উপগ্রহ কক্ষে স্থাপন

কোন উপগ্রহ কক্ষে স্থাপন করা বলতে বোঝায়—উপগ্রহটি ভূপৃষ্ঠের অন্ততঃ ১০০ মাইল উপরে ঘণ্টায় প্রায় ১৭,২৫০ মাইল বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবে। কিভাবে উপগ্রহটি ঢিল বা কামানের গোলার তফাৎ এই যে, এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে উপরে উঠে যায় এবং এর যাত্রার অনেকটা সময় বায়ুমণ্ডলের বাইরে কাটায়। বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০ মাইল উপর অবধি বিস্তৃত ধরে নেওয়া যেতে পারে। এর বক্রতা আরও কম হয় এবং শেষ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। এখন যদি এই রকেটের গতি বাড়িয়ে যাওয়া
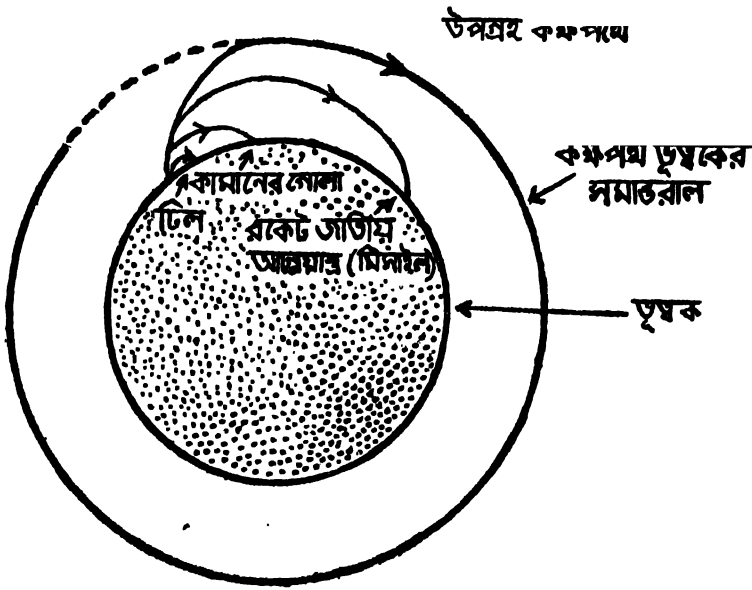
১নং চিত্র

কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ

কক্ষে স্থাপন করা যায় তা দেখা যাক। প্রথম চিত্রটি লক্ষ্য করুন। একটি ঢিল ছুঁড়লে তা বাঁকা পথে কিছু দূর গিয়েই মাটিতে পড়ে যায়। ঢিলটি ছোঁড়বার পর, এর উপর দুটি শক্তি একই সময়ে কার্যকরী হয়; অর্থাৎ যে শক্তিতে ঢিলটি ছোঁড়া হলো এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ। একটি কামানের গোলাও অনুরূপ ভাবেই আরও কিছুটা দূরে গিয়েই মাটিতে পড়ে. কিন্তু এক্ষেত্রে বক্রতা কম হয়। এর পর একটি রকেটজাতীয় আগ্নেয়াস্ত্র। এই অস্ত্রের সঙ্গে যায়, তবে এমন একটা গতি আসবে যখন যানটির বক্রতা প্রায় ভূপৃষ্ঠের বক্রতার মত হবে। এখানেও যানটির উপর দুটি শক্তি একই সময়ে কাজ করে—একটি কেন্দ্রাতিগ বল, অপরটি মাধ্যাকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধ করবার জন্যে প্রয়োজনীয় কেন্দ্রাতিগ বল যানটির গতি থেকে পায়। এরূপ অবস্থায় রকেটটি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে, কিন্তু কখনও ভূপৃষ্ঠে পতিত হবে না অর্থাৎ যানটি পৃথিবীর উপগ্রহরূপে স্থাপিত হবে। এর জন্যে সর্বনিম্ন গতি প্রয়োজন হয় ঘণ্টায় ১৭,২৫০ মাইল।

বাস্তবক্ষেত্রে উপগ্রহের কক্ষপথ কখনও বৃত্তাকার হয় না। তা হয় সাধারণতঃ বিস্তৃত বৃত্ত অথবা উপবৃত্ত। পৃথিবী থেকে কোন যান যতই দূরে যায়, ততই তার গতি কমে, কারণ তাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়, যদিও কেন্দ্র থেকে দূরত্বানুসারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমে। কিন্তু যদি প্রথমেই রকেটের গতি অধিক করা হয়, যাতে যে উচ্চতায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি খুব কম, সেখানেও রকেটটির কিছু গতি থাকে, তবে যানটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সীমার বাইরে চলে যাবে। এর জন্যে সর্বনিম্ন গতি প্রয়োজন ঘণ্টায় প্রায় ২৫,০০০ মাইল এবং এই গতিকে বলে পলায়নী গতি (Escape Velocity)।

এবং সচল বস্তু সমবেগে সরলরেখায় চলতে থাকবে।

২। কোন বস্তুতে বল প্রযুক্ত হলে, যে দিকে বল প্রযুক্ত হয় বস্তুটি সেই দিকে ত্বরণ পায়। এই ত্বরণ প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বস্তুটির ভরের ব্যস্তানুপাতিক।

৩। প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

নিউটনের তৃতীয় সূত্রে নিহিত আছে জেট-চলন-তত্ত্ব। যে কোন প্রকার জেট-চলনে, বস্তু (সাধারণতঃ গ্যাস)-প্রবাহ একটি নিঃশেষ নলে সবেগে মুক্ত হয়। এই প্রবাহে বিপরীত দিকে একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং যানটি ঐ

২নং চিত্র
রকেটের ক্রিয়া
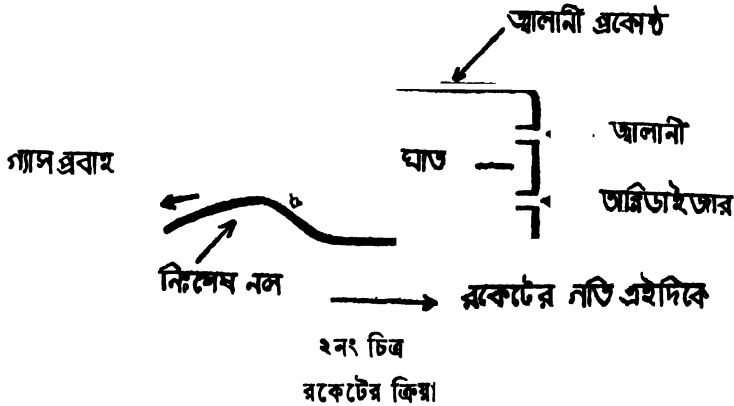
যান্ত্রিক কৌশল

যে কোন মহাশূন্যযানের সফলতার জন্যে চারটি বিশেষ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন—চালন, পথনির্দেশ, সংবাদ আদান-প্রদান এবং গতিপথ সম্পর্কিত তথ্য। রকেটের কাজ যানটিকে নির্দিষ্ট গতিপথে পৌঁছে দেওয়া। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্যার আইজাক নিউটন কোন পদার্থ চলমান থাকাকালীন যে নিয়ম মেনে চলে, তার তিনটি সূত্র দেন।

১। বাইরে থেকে বল প্রয়োগ না করলে অচল বস্তু চিরকাল অচল অবস্থাতেই থাকবে

দিকে ধাবিত হয়। এই প্রতিক্রিয়ায় যে বলের উদ্ভব হয়, তাকে 'ঘাত' বলে এবং পাউণ্ড বা কিলোগ্রাম এর একক।

বর্তমানে উড়োজাহাজে যে জেট-ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়, তার নাম টারবো জেট। এক্ষেত্রে গ্যাস-প্রবাহ নিঃশেষ নলে মুক্ত হয়ে বাতাসের সংস্পর্শে জ্বলে। বাতাস গ্যাস জ্বলবার জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে। রকেটের জেট ইঞ্জিনে কিন্তু গ্যাস জ্বলনের জন্যে বাইরের বাতাসের প্রয়োজন হয় না। রকেট জ্বালানী ও অক্সিজেন সরবরাহকারক (অক্সিডাইজার)

উভয়ই নিজে বহন করে। জ্বালানী একটি নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে জ্বলে এবং প্রচণ্ড তাপে (কয়েক হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) গ্যাস নিঃশেষ নলে মুক্ত হয়। গ্যাস মুক্ত হওয়ার সময় যে 'জেটে'র সৃষ্টি হয়, তা রকেটটিকে ঘাত দেয় এবং রকেটটি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী ত্বরণ পায় (২ নং চিত্র)।

রকেটের জ্বালানী তরল বা কঠিন হতে পারে। সাধারণতঃ তরল জ্বালানীতে দুটি তরল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, যেমন—গ্যাসোলিন বা অ্যালকোহল জ্বালানীরূপে এবং নাইট্রিক অ্যাসিড বা তরল অক্সিজেন অক্সিডাইজার হিসাবে। কঠিন জ্বালানীতে জ্বালানী এবং অক্সিডাইজার এক সঙ্গে মিশিয়ে রাখা হয়। এখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। যদিও তরল জ্বালানীর রকেট কঠিন জ্বালানীর রকেট অপেক্ষা জটিল, তরল জ্বালানীর রকেটে জ্বলন-ক্রিয়া এবং রকেটের গতি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

যে বেগে জেট গ্যাস প্রবাহিত হয় তাকে 'নিঃশেষ-বেগ' বলে। এই বেগ নির্ভর করে রাসায়নিক জ্বালানীর বৈশিষ্ট্যের উপর এবং ইঞ্জিনের দক্ষতার উপর। সমস্ত জ্বালানী নিঃশেষিত হলে রকেটের যে ওজন হয়, তার দ্বারা রকেট ছাড়বার সময় যে ওজন তা ভাগ করলে আমরা পাই 'বস্তু অনুপাত' (Mass Ratio)। রকেট-বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য কিভাবে উচ্চ বস্তু অনুপাত এবং নিঃশেষ বেগ পাওয়া যায়, কারণ এদের উপরই নির্ভর করে রকেটের গতি এবং পাল্লা (Range)। মাধ্যাকর্ষণ এবং বায়ুর প্রতিরোধ বাদ দিলে একটি রকেটের বস্তু অনুপাত যদি ২'৭২ : ১ হয়, তবে রকেটটির গতি হবে নিঃশেষ বেগের সমান, তা ৭'৪ : ১ হলে গতি হবে নিঃশেষ বেগের দ্বিগুণ; আবার ২০ : ১ হলে যদিও রকেটের গতি নিঃশেষ বেগের তিনগুণ হবে, তথাপি এরূপ রকেট তৈরির কারিগরী অসুবিধা খুবই বেশী এবং এক্ষেত্রে উপগ্রহটির ওজন সম্পূর্ণ রকেটের ওজনের শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র হতে পারে। আবার রকেট যতই উপরে ওঠে, জ্বালানীও ততই খরচ
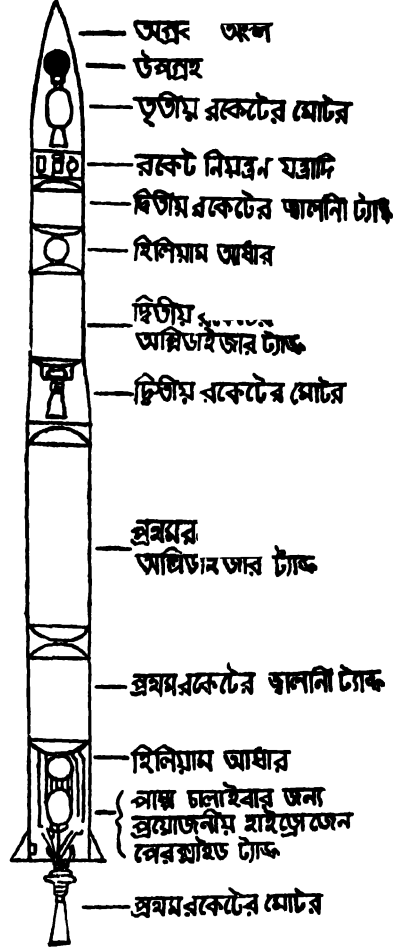
৩নং চিত্র

হয়। রকেটের ওজন কমতে থাকে, ফলে গতি বাড়তে থাকে। এখন যে আধারে জ্বালানী ছিল, তার ওজন অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। যদি এই ওজন রকেট থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া যায় তবে রকেটের দক্ষতা বাড়বে এবং বস্তু অনুপাতও অনেক বেশী হবে। এই

যুক্তিতেই পর্যায়ী রকেটের ব্যবহার। বহুপর্যায়ী রকেট তৈরি সম্ভব, কিন্তু সাধারণতঃ ত্রিপর্যায়ী রকেটই ব্যবহার করা হয়। তিনটি রকেট একটার সঙ্গে আর একটা পরপর জোড়া থাকে। একটি ত্রিপর্যায়ী রকেটের কাঠামো দেখানো হয়েছে ৩ নং চিত্রে রকেট ভূপৃষ্ঠ ছাড়বার পর কিছু উপরে উঠে পর্যায়ী রকেটের প্রথম রকেটটি পড়ে যায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রকেট আরও উপরে ওঠে। তারপর দ্বিতীয় রকেটটি খসে পড়ে। তৃতীয় রকেটের সঙ্গে উপগ্রহটি থাকে। উপ-গ্রহটিকে কক্ষে স্থাপন করেই তৃতীয় রকেটটির কাজ শেষ হয় (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

উপসংহার

সত্যি কথা বলতে কি, রকেট-বিজ্ঞান অতি জটিল এবং সবচেয়ে উন্নত কারিগরী বিদ্যা প্রয়োগ করেও অনেক সমস্যার সমাধান এখনও করা সম্ভব হয় নি। তাই আরও উন্নত রকেট তৈরির কাজে ব্যস্ত আছেন পৃথিবীর সহস্র সহস্র বৈজ্ঞানিক। প্রথম যে উপগ্রহটি পৃথিবী পরিক্রমা করেছিল, তার ওজন ছিল মাত্র ১৮৪ পাউণ্ড। এখন রকেট ২০,০০০ পাউণ্ডের উপগ্রহও অনায়াসেই কক্ষে স্থাপন করে। গত দশকের শেষার্ধে এবং এই দশকে রকেট-বিজ্ঞান যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে প্রকৃতিকে

৪নং চিত্র

ত্রি-পর্যায়ী রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ

কোন উপগ্রহ রকেটে স্থাপন করবার পর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে রকেটের যাত্রাপথের উপর। তাই রকেটের পথনির্দেশ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। উপগ্রহ বহনকারী প্রত্যেক রকেটেই মানুষ থাকে না পথনির্দেশের জন্যে। তাছাড়া রকেট এত বেগে ধাবিত হয় যে, কোন মানুষ রকেটের ভুল সংশোধন করবার আগেই হয়তো যানটি সংশোধনের বাইরে চলে যেতে পারে। তাই প্রায় প্রত্যেক রকেটেই স্বয়ংক্রিয় সংশোধনকারী যন্ত্র বসানো থাকে।

জয় করা এখন আর কল্পনা বলে মনে হয় না। গ্রহান্তরের সঙ্গে রকেটের সাহায্যে নিয়মিত যোগাযোগ মানুষের দৃষ্টিসীমার মধ্যে। কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষে স্থাপন করে তার সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মধ্যে খবর, ছবি, কথা প্রভৃতির আদান-প্রদান বা উচ্চ বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কোন নতুন কথা নয়। তবে মারণাস্ত্র হিসাবেও রকেটের অস্বাভাবিক উন্নতি হয়েছে। মানুষ নিশ্চয়ই পৃথিবীর কোন কিছু ধ্বংসের জন্যে রকেট ব্যবহার করবে না—এ আশা করা যায়।

মানব-দেহের কর্মক্ষমতা ও পারদর্শিতা নির্ধারণ

পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

মানবদেহের কর্মক্ষমতা ও পারদর্শিতা নির্ধারণ

যন্ত্র কাজ করে, আর মানুষ তার চালনাকে নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা—মানবদেহ নিজেই একটি যন্ত্র, আর এই যন্ত্রকে চালনা করে সে নিজেই। শ্রম-শারীরবিদ্গণ এই মানব-যন্ত্রের কাজ করবার ক্ষমতা (Capacity) ও পারদর্শিতাকে (Efficiency.) নির্ধারণ করেন নানা কৌশলে। পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে তারই একটি নমুনা দেখানো হয়েছে।

মানবদেহের কোষে অক্সিজেনের সঙ্গে গ্লুকোজের মৃদু দহনের ফলে কিছু শক্তির উৎপত্তি হয়। এই শক্তিই যোগায় কাজের ইন্ধন, অর্থাৎ রূপান্তরিত হয় কাজে। তাই মানব-যন্ত্রটির কাজ করবার ক্ষমতা ও পারদর্শিতা জানতে হলে সবচেয়ে আগে জানতে হবে নির্দিষ্ট কোন কাজের জন্যে ব্যবহৃত অক্সিজেনের পরিমাণ। এই উদ্দেশ্যে গবেষণাগারে সাধারণতঃ বাইসাইকেল-আর্গোমিটারের সাহায্যে মানব-যন্ত্রটিকে শ্রমে নিয়োগ করা হয়। পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রে এক ভদ্রমহিলাকে ঐরূপ একটি আর্গোমিটারে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মহিলাটির সামনে মেট্রোনম্ নামে যে ত্রিভুজাকৃতি যন্ত্রটি রয়েছে, তার পেণ্ডুলামের তালে তালে উনি সাইকেলের প্যাডেল ঘোরাচ্ছেন। সেজন্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উনি যে পরিশ্রম করছেন, তার পরিমাণও নির্দিষ্ট। এদিকে, মহিলাটির নাক বন্ধ করে মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুখের উপর রয়েছে এমন একটি যন্ত্র যা দিয়ে প্রশ্বাসের বায়ু গিয়ে পৌছচ্ছে পিঠের উপরকার রেস্পিরেটরি-মিটারে, অর্থাৎ প্রশ্বাসের বায়ুর পরিমাণ নির্ধারণের যন্ত্রে ; আর এই প্রশ্বাসের বায়ু থেকে অক্সিজেনের পরিমাণ জানা হচ্ছে অপর একটি যন্ত্রের সাহায্যে। শ্বাসের বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ জানা থাকায় মানব-যন্ত্রটি একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্যে কতটুকু অক্সিজেন নিয়ে নিচ্ছে, তা জানতে পারা যাচ্ছে। পাশ্চাত্যদেশে মানব-যন্ত্রটির কাজ করবার ক্ষমতা ও পারদর্শিতা এইভাবে নির্ধারণ করে কলকারখানায় শ্রমিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে তাদের নিয়োগ করার ব্যবস্থা আছে।

চিত্রে যে বাইসাইকেল আর্গোমিটারটি দেখানো হয়েছে, সেটি ব্যবহৃত হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্ব বিভাগের গবেষণা কার্যে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সাহায্যে যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে।

উত্তুঙ্গ শিখর এভারেস্ট

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ"
—কালিদাস

প্রকৃতি-দত্ত প্রাচীরের মতই হিমালয় ভারত-ভূখণ্ডকে এশিয়ার অন্য সব দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক করে রেখেছে। কিন্তু শুধু তাই—

'... ... ... জনক যেমন
স্নেহদানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমনি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে
জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহধারা দানে,
পালিছেন সযতনে।'

দৈর্ঘ্যে (পশ্চিম থেকে পূর্বে) হিমালয় পর্বত-মালা ১৫০০ মাইল (প্রায় ২৪১৫ কিলোমিটার); আর গভীরত্বে, উত্তর-দক্ষিণে কোথাও ১০০ এবং অন্যত্র ১৫০ মাইল। যে হিমালয় অতীতে পর্বত-প্রাচীররূপে বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করতো, বর্তমান যুগে তাই আবার হয়ে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কের সেতুস্বরূপ। সাম্প্রতিক কালে এই হিমালয় লঙ্ঘন করেই গগন-মার্গে বিমান চলাচল করে থাকে।

হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে, হিমগিরির সঙ্গে বাঙ্গালীদের পরিচয় ও সম্পর্ক প্রাচীন। কবির ভাষায়—

"বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।"

সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে হিমগিরির সঙ্গে প্রাচীন সংযোগ মাঝে এক রকম ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস সি. আই. ই. (১৮৪৯-১৯১৭) হিমালয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। এককালে শরচ্চন্দ্র দাসের জন্যে বহু তিব্বতীকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করা হয়েছিল। তাদের অপরাধ ছিল, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শরচ্চন্দ্র দাসকে আশ্রয়দান বা অন্যান্য প্রকারে সহায়তা করা। শরচ্চন্দ্র তাঁর গবেষণামূলক তথ্যাদি Indian Pandits in the Land of Snow শ্রেণীর পুস্তকে সন্নিবেশিত করে গিয়েছেন। বইখানি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। যে সমস্ত ভারতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ সে যুগে তিব্বতে হয়েছিল, এতে তারই বিবরণ পাওয়া যায়।

পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেস্ট
(Mount Everest)

হিমালয় বিস্তৃতিতেই শুধু যে বিশাল তা নয়, উচ্চতায়ও তা এক মহান গৌরবের অধিকারী। এর উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেস্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর। এর উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট।

সর্বশ্রেণীর মানব-গোষ্ঠীর পক্ষে যুগে যুগে হিমালয় হয়ে এসেছে প্রেরণার উৎস। দেদীপ্যমান সে প্রেরণা শুধু মুনি-ঋষি-যতিদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে নি। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান-সাধনার নতুন ক্ষেত্র পেয়েছেন হিমালয়ে। চিত্রামোদীর তুলিতে হিমালয় জুগিয়েছে নতুন আঙ্গিক। হিমালয়কে কেন্দ্র করে কবি করেছেন কবিতার বিষয়বস্তু সৃষ্টি। আর দুঃসাহসিকতায় পটু অভিযাত্রীরা চালিয়ে যাচ্ছেন অভিযান এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা জীবনের বিনিময়ে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এভারেস্টে আরোহণ-অবরোহণের অদম্য নেশা মানব-মনকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে নি তার দুঃসাহসিকতা বর্জন করতে।

সাময়িক নিষ্ফলতা হয়তো অভিযাত্রীর মনে আপাতদৃষ্টিতে এনেছে অস্থায়ী প্রতিনিবৃত্তি। কিন্তু পরেই দেখা দিয়েছে প্রবলতর প্রয়াস। বিফলতার মধ্যেই মানব-মন অভিনব এষণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এই খানেই রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত উক্তির সার্থকতা —"যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, যাহা অনায়াসের—তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না। যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে, সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়।"

কেনই বা বার বার মানুষের প্রচেষ্টা পরাভব স্বীকার করেছে এই শিখরটির শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছাতে? সমতল ভূমির অধিবাসীরা মনে করেন, পাহাড় অর্থে পাথর, মাটি বা শিলার ঢিবি; আর হিমালয় বুঝি তারই একটা রাজকীয় সংস্করণ। কিন্তু হিমালয় মানে একটা শিখর অথবা শিখররাজির সমাহার নয়—তাছাড়া আরও অনেক কিছু। এটি শৃঙ্খলাকার বিরাট পর্বতশ্রেণী।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পর্বত-শিখরগুলি বহুবার মানব-প্রচেষ্টার কাছে পরাভব স্বীকার করেছে। কিন্তু ইদানীং কাল পর্যন্ত হিমালয়ের বহু শিখরেই আরোহণ এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্যান্য দেশের শিখরগুলি যখন মানুষের পদানত হলো, তখন এভারেস্টের বেলাই বা কি এমন বিশেষ বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো, তা জানতে কার না ইচ্ছা হয়?

এভারেস্ট শৃঙ্গটির * আবিষ্কার শতবর্ষাধিক † কাল হয়েছে। অনেকেই হয়তো শুনে আশ্চর্য বোধ করবেন যে, পার্থিব এই তুঙ্গ-বিন্দুর সঙ্গে মানুষের সর্বপ্রথম পরিচিতি যিনি করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি একজন বঙ্গ সন্তান রাধানাথ শিকদার। আর যাঁর নামে এই শিখরটির নামকরণ হয়েছিল তিনি হলেন Sir George Everest। (উভয়েই বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, তবে এভারেস্ট সাহেবের নিকট শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন তরুণ রাধানাথ।) এই শ্রুতকীর্তি মানবের সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস এখানে সন্নিবেশিত হলো।

* এভারেস্ট শিখরকে 'গৌরীশঙ্কর' নামের সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেলা না হয়। "Gauri-Sankar (23, 400 ft) was for many years confused with Mount Everest, which is still misnamed Gauri-Sankar in German maps"—Mount Everest: The Reconnaissance, 1921 by Lt. Col. C. K. Howard—Bury C. I. E. 1922 (পৃঃ ২৮৮)। Harmsworth's Universal Encyclopedia (চতুর্থ খণ্ড) লিখিত হয়েছে —Everest……has often been confused with the neighbouring peak, Gouri-sankar, (পৃঃ ৩০২৬)

† "……অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিযানকারী স্বেন্ হেডিন এভারেস্ট শৃঙ্গ সম্বন্ধে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় একখানা পুস্তক রচনা করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

* * *

স্বেন্ হেডিন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এভারেস্ট আবিষ্কারের কৃতিত্ব উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রাপ্য নহে; পরন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পিকিং নগরীস্থ যেসুইট মিশনারীগণই গৌরবের প্রকৃত অধিকারী।

অতঃপর এভারেস্ট শৃঙ্গের প্রথম আবিষ্কর্তা কে, সেই সম্পর্কে ডাঃ ভ্যান মেনেন বলেন, যেসুইট মিশনারীগণ শুধু এভারেস্টের নিকটবর্তী কোন একটা পর্বতের 'নাম' মাত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেই পর্বত ঠিক কোন্ স্থানটিতে অবস্থিত এবং উহাই সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কিনা সে বিষয়ে তাঁহারা কোন কথা বলিতে পারেন নাই। সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সভ্যগণই সর্বপ্রথমে উহার অবস্থান ও উচ্চতা নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং এভারেস্ট আবিষ্কারের গৌরব ও যশ তাঁহাদেরই প্রাপ্য।" —প্রকৃতি, পৌষ-মাঘ, ফাল্গুন-চৈত্র, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা ৭ম বর্ষ, ১৩৩১, পৃঃ ৩৭৯-৩৮০।

জরিপের ফলে এভারেস্ট আবিষ্কৃত হলো। তবে বাঙালী কর্মবীরের আশ্চর্য রকমের কৃতিত্বের দরুণ একদিকে যেমন সহানুভূতিশীল অনেকেই উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন, অপর দিকে তেমনি অসূয়াপরবশ হয়ে এই সরল সত্য ঘটনাটিকেও বিকৃত করবার চেষ্টায় অনেকেই ব্যর্থ প্রয়াস করতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

কিন্তু জরিপ-গণনায় ধরা পড়বার আগেও শিখরটি আবহমান কাল সমুন্নত শিরে সকল ঘাত-প্রতিঘাত-সঙ্ঘাত সহ্য করে দাঁড়িয়েছিল। 'চোমোলুঙমা' ছিল তিব্বতীদের দেওয়া শিখরটির অভিধা, অর্থ 'জগতের মা ভগবতী'। সঠিক বলতে এভারেস্ট-মকালু পার্বত্য ভূখণ্ডকে তিব্বতীগণ কর্তৃক এই নামে অভিহিত করা হতো।

জরীপের কাজের আগে এই চোমোলুঙমাই "শিখর-১৫ (Peak-xv)" রূপে নির্দেশিত হতো। আর Schlagintweit নামে জার্মান ভ্রাতারা ১৮৫৫ সাল নাগাদ শিখর গৌরীশঙ্করকে ভুলক্রমে এভারেস্ট মনে করেছিলেন। বহু বছর ধরে এই ধারণা অনেকেরই ভ্রমের সঞ্চার করেছিল। আসলে দুটি শৃঙ্গের মধ্যে ব্যবধান ত্রিশ মাইলেরও বেশি।

এভারেস্ট শিখরের নামকরণের পিছনে রয়েছে একজনের ব্যক্তি-সত্তা। আগেই বলা হয়েছে যে, ইনি হলেন সার জর্জ এভারেস্ট। একথা অনেকেরই কাছে হয়তো নতুন ঠেকবে। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশার শেষভাগে দু-জন ফরাসী যুবক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে একজন (নাম Gaeta Fouquet) "টেগোর" বিষয়ক বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন। ভূমধ্যসাগরীয় কোন এক দ্বীপে জনৈক ফরাসী কন্‌সাল যখন জানতে পারেন যে, যুবকদ্বয় টেগোর দর্শনে যাচ্ছেন, তখন কন্‌সাল মহোদয় বলেছিলেন "টেগোর! টেগোর, কলকাতা, বারাণসী, মহীশূর—ঐ সব সুন্দর নগর-নগরী! বেশ, বন্ধুগণ তোমরা টেগোরে উপভোগ কর!" বিশ্ববিশ্রুত রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁর ব্যক্তি-সত্তার কথা একজন শিক্ষিত লোকের যদি অজানা থাকে, তবে অনুরূপভাবে এভারেস্ট নামে একজন মানুষ ছিলেন, একথা অনেকে না জানতেও পারেন।

সার জর্জ এভারেস্ট (১৭৯০-১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ)

সার জর্জ এভারেস্টের জন্ম জুলাই ৪, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ। জন্মস্থান Gwerndale। প্রথম শিক্ষা মারলো বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে উলউইচের সামরিক অ্যাকাডেমিতে পাঠকালে সেখানকার গণিত শিক্ষকের বিশেষ নজরে পড়েন। অতঃপর এভারেস্ট এত সুষ্ঠুভাবে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন যে, তিনি কমিশন প্রাপ্ত হবার যোগ্য বিবেচিত হন, যদিও তখন তাঁর বয়ঃসীমা পৌঁছায় নি। ইনি বঙ্গদেশে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে আসেন। কর্মব্যপদেশে ১৮১৪-১৬ পর্যন্ত জাভায় অতিবাহিত হয়। ভারতে বিভিন্ন কারিগরী প্রতিষ্ঠানে কাজ করবার পর তিনি কর্নেল লাম্বটনের (যিনি Great Trigonometrical Survey of India-এর প্রতিষ্ঠাতা) সহকারী নিযুক্ত হন। ক্রমে পদোন্নতি হতে থাকে এবং (লাম্বটনের মৃত্যুতে) ১৮৩০ খৃষ্টশতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ তাঁকে ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত করেন। সার্ভেয়ার জেনারেল হবার আগে ১৮২৫-৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি ইংল্যাণ্ডে জরীপ বিষয়ক তৎকালীন সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি বিষয়ক গবেষণা ও জ্ঞানানুশীলনে রত ছিলেন। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে ১১ই মার্চ, ১৮৩১ তারিখে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় এভারেস্ট সাহেব এই বিষয়ে কিছু আলোক সম্পাত করেন। এভারেস্ট ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ইনি জীবনের শেষভাগ ইংল্যাণ্ডে অতিবাহিত

করেন এবং রয়াল সোসাইটির সদস্যভুক্ত হন। অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টশতকে ‘সার’ উপাধি ভূষিত হন এবং পর বৎসর রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। রাধানাথ শিকদারের প্রতি এভারেস্ট বরাবরই উচ্চ মতবাদ পোষণ করতেন এবং বদরিনাথ যাবার প্রাক্কালে তিতুরাম শিকদারকে ব্যক্তিগত যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিতুরাম-পুত্র রাধানাথের প্রতি এভারেস্ট সাহেবের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা প্রকটিত হয়েছে এবং অন্য দিকে হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রাদির কথা শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করতে দেখা যায়।

এভারেস্ট সাহেব-রচিত পুস্তকাবলীর নাম—

An Account of the measurement of the arc of the meridians between the parallels of 18°3′ and 24°7′ (being a continuation of the Grand Meridional Arc of India as detailed by Lt. Col Lambton.) London 1830.

An Account of the measurement of the two sections of the Meridional Arc of India bounded by the parallels of 18°3′15″, 24°7′11″ and 29°30′48″ London 1847.

এছাড়া Memoirs of the Royal Astronomical Society-এর প্রথম খণ্ডে একটি গবেষণা-কার্য প্রকাশিত হয়। এটি তিনি উত্তমাশা অন্তরীপে অসুস্থতা নিবন্ধন ছুটিতে থাকাকালীন লিখিত।

Asiatick Researches [খণ্ড ১-২০] (১৮৩২-১৯০৪) এভারেস্ট দুটি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেন—

(১) On the formulae for calculating Azimuth in Trigonometrical Operations.

(২) On the compensation measuring apparatus of the Great Trigonometrical Survey of India (with figures).

এভারেস্ট শিখরের অবস্থিতি

মানচিত্রে হিমালয় পর্বতকে ধনুর আকারে ভারতের উত্তরে বিস্তৃত দেখতে পাওয়া যাবে। আর তারই দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে-পড়া বাঁকা অংশের অদূরে এভারেস্ট শৃঙ্গের অবস্থিতি। এভারেস্ট শিখরের দক্ষিণার্ধ নেপাল ও ভারতের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর উত্তরার্ধ যেন শীতল নিরানন্দ তিব্বতের মালভূমির দিকে দৃক্‌পাত করে রয়েছে। এভারেস্ট থেকে প্রায় এক শত মাইল দূরে দার্জিলিং (প্রায় ৭,০০০ ফুট)।

এভারেস্ট—শৃঙ্গে আরোহণের অসুবিধা

“সম্ভবতঃ আধ ঘণ্টা পরে আমি এক ভীষণ শব্দে চমকে উঠলাম।…যা দেখতে পেলাম তা আমার স্মৃতিপটে দুরপনেয়ভাবে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

তুষার-প্রাচীরের এক বিপুলভাগ ভেঙে পড়েছিল। অতিকায় গির্জা-ঘরের মত বিশালাকার তুষারখণ্ডগুলি তখনও ভেঙে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছিল। এক বিপুল কলেবর তুষারস্তূপ (বা হিমানী-সম্প্রপাত); এর পুরোভাগে জমাট হিমকণিকার তরঙ্গ-সমাকুল মেঘপুঞ্জ ঊর্ধ্বে ও বহির্ভাগে প্রধাবিত হচ্ছিল। নীচে ঢালু জায়গায় দলটি ছিল, শুধু কতকগুলি কৃষ্ণ বিন্দু…।

…পর মুহূর্তে হিমানী-সম্প্রপাত তাঁদের উপর সবেগে চলে এসে পড়েছিল; তাঁরা অতিকায় তরঙ্গের নীচে কীটের ন্যায় অভিভূত ও নিশ্চিহ্ন হয়েছিলেন।

…চরণযুগল তুষারের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে ডুবে যাচ্ছিলো, ঐ উন্নতিতে (২০,০০০ ফুট) প্রতিটি পদবিক্ষেপ হচ্ছিল পরিশ্রমসাপেক্ষ। অতি কষ্টে-সৃষ্টে বুঝিবা বিশ গজ গিয়েছিলাম, তাতেই হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্‌ কষ্ট জানান দিতে লাগল, আর আমাদের কেউই চলতে পারি নি।

…আমরা দ্রুত চলবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এ উন্নতিতে তা অসম্ভব, ধীরে এবং নিয়মিত মাত্রায় চলা প্রকৃষ্টতর ছিল—আর কত আস্তে তো ছিল!

…দশ মিনিট আগে বা পরে হলে কোনো কিছুই তাঁদের নিরাপত্তা দিতে পারত না।… আর পথটি এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুছে গিয়েছিল।

…অপর একটি হিমানী-সম্প্রপাতের সম্ভাবনা ছিল…সম্ভবতঃ তা তাঁবুকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারত। এক নম্বর তাঁবুতে দ্রুতপদে প্রত্যাবর্তন করাই সঙ্গত ছিল।

…এক নম্বর তাঁবুতে আর্দ্র ও ভিজিয়ে-দেওয়া তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে আমরা অবতরণ করলাম, তুষার-ঝঞ্ঝা পরে তা বাতাস ও তুষারের নেত্রান্ধকারী ঝটিকায় পরিণত হয়েছিলো এফ. এস. স্মাইথ (F. S. Smythe).

পর্বতে আরোহণ করতে হলে আরোহণকারীকে কতকগুলি সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন বরাবরই হতে হয়েছে। এভারেস্টের বেলায় আরও কয়েকটি গুরুতর সমস্যার সমাধান প্রথমতঃ করাই যাচ্ছিল না। এতো আর সমতল ভূমি নয় যে, সাইকেল বা অন্য কোন যানবাহনের সাহায্যে পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে অবিলম্বে আরোহণ সুরু করা যাবে। একমাত্র শিখরের চরণমূলে পৌঁছাতেই প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়। কোন বাঁধা-ধরা পথ তো নেই। উপরন্তু রয়েছে অতিমাত্রায় বিপদসঙ্কুল পার্বত্য প্রান্তর। তুষার, তুষারের ভিতর ফাটলময় অঞ্চল, আল্‌গা-ভাবে সংলগ্ন পাথরের চাঙর, হিমাচ্ছাদিত শিলা ও হিমবাহ।

বর্ষের সব সময়ে আবার অভিযান পরিচালনা করা প্রশ্নের বাইরে। মে মাস ও জুন মাসের প্রথম কয়টি সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত অভিযানটি সমাধা করে নিতে হবে। একবার যদি মৌসুমী বৃষ্টির সূত্রপাত হয়, তবে অভিযান তৎক্ষণাৎ সীমিত রেখে ফিরে আসতে বাধ্য হতে হয়। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে যদি প্রকৃতি তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করে—বাতাস উদ্দাম, চঞ্চল গতিতে বইতে থাকে, মুহুর্মুহুঃ তুষার পাত, তুষার-ঝঞ্ঝা ইত্যাদির কবলে পড়লে আর জীবন নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। সে জন্যে তখন সমগ্র প্রয়াস অগত্যা অচিরে পরিত্যাগ করতে হয়। ১৯৩৬-এর অভিযান এই রকম প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুণই পরিত্যক্ত হয়েছিল।

১৫,০০০ ফুটের অধিক উর্ধ্বে শ্বাসগ্রহণের অসুবিধা, তুসার-ঝঞ্ঝাজনিত অন্ধতা, সর্বোপরি দৈহিক কাঠামোর উপর নানারকম অপ্রীতিকর অপপ্রভাবের কথাও তো ভেবে দেখতে হয়। ললাটের চতুর্দিকে একটা পটী আঁটভাবে চেপে বাঁধা রয়েছে বোধ হয়। আর পদচালনা হয়ে আসে শ্লথ ও মন্থর। পরিশেষে উর্ধ্বদেশে ঘন্টায় এক-শ' ফুট চলতে পারা খুবই ভাগ্যের কথা। সমতল ভূমির বাসিন্দারা এরকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বিষয় কল্পনাও করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। সু-উচ্চ মার্গে যে-কোন সামান্য কাজও হয়ে দাঁড়ায় সাধ্যাতীত ও অতীব পরিশ্রম-জনক, জুতার ফিতা লাগানোও সেখানে এক ছোটখাটো সমস্যা বললেই চলে—আহার্য প্রস্তুত বা তাঁবুর পেরেক প্রোথিত করা তো দূরের কথা। তবে সমতল ভূমির অধিবাসীদের চেয়ে স্বভাবতঃই পাহাড়ী শেরপা জাতির লোকেরা হয় পর্বতারোহণে বিশেষ রকমে দক্ষ। তাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

এক স্বতন্ত্র ঢঙের; পর্বতক্ষেত্রে তা বিশেষ রকমে কার্যকর।

এতাবৎ অধিকাংশ অভিযানই চালানো হয়েছে উত্তর কোল (North Col) থেকে। দার্জিলিঙের ১৫০ মাইল উত্তর-পূর্বে রঙবাক মঠ (১৫,০০০ ফুট)। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে বাঁক নিতে হবে এবং প্রায় পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে যেতে হয়। অংশতঃ রঙবাক হিমবাহ (যাকে এভারেস্টগামী রাজপথ বলা যেতে পারে) এবং তারপর হিমবাহের মাথা থেকে তুষারাস্তীর্ণ শিলাস্কন্ধ (যা উত্তর কোল নামে জ্ঞাত) বেয়ে যেতে হয়। সুতরাং উত্তর কোলের উপর (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২.০০০ ফুট) পৌঁছানো মানে হলো গগন-বিসর্পী এভারেস্ট-শৃঙ্গের বেদীমূলে পৌঁছানো। বেদীমূলটি চিরতুহিনাবৃত ৬০০০ ফুটের ভারি স্তম্ভ—সদা ধবলিমাময়, নিরন্তর তুষার-ঝটিকার কবলে ভয়াবহ ভয়ঙ্কর, গুরুগম্ভীর ও অনিন্দ্যসুন্দর। অভিযাত্রীরা বারে বারে উত্তর কোলের শীর্ষে অধিরোহণ করেছেন। আরো ৬,০০০ ফুটও তাঁরা উঠতে সমর্থ হয়েছেন; কিন্তু বহু যুগ ধরে শেষ ৮০০ ফুট উর্ধ্বভাগ, মনে হতো চিরতরে মানব-প্রচেষ্টাকে এড়িয়ে যেতে চায়।

এভারেস্ট-শিখরে ব্যর্থ অভিযান

এভারেস্ট-শৃঙ্গ আবিষ্কারের পর প্রায় ৪০ বছর অতিবাহিত হলো। এরই ভিতর এই শৃঙ্গে আরোহণের ইচ্ছা মানব-মনে একটু একটু করে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। তাছাড়া শৃঙ্গটি যখন আবিষ্কৃত হয়েছিল, তখন পর্বতারোহণ-অবরোহণ পদ্ধতিও নিঃসন্দেহে প্রারম্ভিক অবস্থায় ছিল। একথা অনস্বীকার্য যে, চলমান দিনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বহুমুখী অগ্রগতির তালে তালে পর্বতারোহণ-কৌশলও অনগ্রসর রয়ে যায় নি।

প্রথম, প্রথম দু-একটি অভিযানকে ঠিক পর্বতারোহণের প্রচেষ্টার প্রথম সোপান বলা চলে। কারণ, এই ধরণের অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এভারেস্ট-শিখরে ওঠবার পথ খুঁজে বের করা। কোন্ দিক দিয়ে অভিযান চালানো অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক, তাই বিবেচনা করে দেখা। তারপর যখন পথ-ঘাট অনেকটা রপ্ত হয়ে এলো, তখন থেকে যথার্থ অভিযান চালানো হয়। বারে বারে বহু অভিযাত্রীদল শৃঙ্গে আরোহণের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু বাধা যত বেশি বোধ হতে থাকে, শৃঙ্গ-জয়ের আকাঙ্ক্ষাও উত্তরোত্তর তত প্রবল হয়ে ওঠে। কত অমূল্য জীবন এই প্রচেষ্টায় অকালে অসহায়ভাবে বিনষ্ট হলো, তা মনে করলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয় নি এবং শেষ পর্যন্ত মানুষেরই জয় হয়। এভারেস্ট-শৃঙ্গে আরোহণের প্রথম খবর যখন প্রকাশিত হলো, তখন সমগ্র বিশ্বে এক উল্লাসধ্বনি গুঞ্জরিয়ে উঠল। প্রথম সফল প্রচেষ্টার পর আরো কয়েকবার বিভিন্ন অভিযাত্রীদল বিভিন্নমুখী অভিযান চালিয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। শৃঙ্গে আরোহণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার বিষয় সংক্ষেপে নীচে দেওয়া হলো।

যতবার এভারেস্ট অভিযান চালানো হয়েছে, ততবারই দলভুক্ত কোন না কোন সদস্য বই লিখে, দিনলিপি সংগ্রহ করে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে গিয়েছেন। স্তূপাকার না হলেও এভারেস্ট বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী বেশ বিস্তারিত ও বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ। সকল লেখকের

এক রকমের নয়। কোন বইয়ে লেখকের প্রতি এভারেস্ট-শৃঙ্গের বিরূপ শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। কোন কোনটিতে এভারেস্টের বন্ধুভাবাপন্ন স্বীকৃতি রয়েছে। আবার Wilfrid Noyace-এর মত অভিযাত্রীর পক্ষে এভারেস্ট না বন্ধু, না শত্রু। কারো সমক্ষে এভারেস্ট হলো দুর্দান্ত প্রকৃতির চিরমূর্তরূপ,

পক্ষান্তরে অপর সকলের কাছে তার বিপরীত বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

১৮৯৩ খৃস্টশতক। ক্যাপ্টেন সি. জি. ব্রুশ (C. G. Bruce) এভারেস্ট 'আক্রমণের' কথা সর্বপ্রথম চিন্তা করেন। আক্রমণই বলতে হয়, কেন না, এর আগে এভারেস্ট শত সহস্র বছর ধরে স্বীয় মহিমময় শিখর গগনমার্গে বিস্তার করে রেখেছিল নির্বিঘ্নে।

ব্রুশ আনুষঙ্গিক অনুমতির জন্যে সংশ্লিষ্ট দেশ দুটির (ভারত ও নেপাল) কাছে আবেদন করলেন। মালোরি (Leigh-Mallory) যুক্ত ছিলেন। পথের সন্ধান, জীবজন্তুর খোঁজ, গাছপালার খবর ইত্যাদি নেবার জন্যেই মুখ্যতঃ এই অভিযান চালানো হয়েছিল। ২৩,০০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণান্তে দলটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শিখরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ।

পরের বছরে (১৯২২) যে অভিযান চালানো হলো তার নেতৃত্ব করলেন পূর্বোক্ত ব্রুশ এবং হাওয়ার্ড-বেরি প্রদর্শিত পথেই শিখর অভিমুখে

মাউন্ট এভারেস্ট (মধ্যস্থলে)

কিন্তু দুটি দেশই তাঁর আবেদন নাকচ করে দেয়। সুদীর্ঘ কয়েক বছরের পর যখন অনুমতি পাওয়া গেল (১৯২১), তখন ব্রুশকে আর নেতৃত্ব করবার জন্যে পাওয়া গেল না—তিনি তখন সৈনাধ্যক্ষ (ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল)।

নেতৃত্বপদে ব্রুশের স্থলাভিষিক্ত হলেন লেঃ কর্ণেল হাওয়ার্ড বেরি (Lt. Col. Howard Bury)। দলটি ভারত সরকারের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। ১০০টি রসদবাহী অশ্বতর সরকারের কাছ থেকে ধার পাওয়া গিয়েছিল। এই দলের সঙ্গে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিযানকারী লে- যাত্রা করা হয়। এবারও মালোরি অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।

অভিযান চালাবার অব্যবহিত পূর্বে ব্রুশ রঙবাক মঠের প্রবীণ লামার সঙ্গে সৌজন্য-মূলক সাক্ষাৎ করেন। ব্রুশকে লামা জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, কি জন্যে বৃটিশেরা এভারেস্ট শিখরে ওঠবার জন্যে উদগ্রীব? ব্রুশের জবাব ছিল খুবই বাকচাতুর্যপূর্ণ ও সময়োচিত এবং তাতেই মুখ্য লামা প্রীত হয়ে দলটিকে অনুমতি দান করেন। (ব্রুশ জবাবে লামাকে বলেছিলেন যে, তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত যাঁরা পর্বত-

উপাসক ; সে জন্যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে আসা তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক)।

সেবার দর্পভরে শিখররাজ আক্রমণ প্রতিহত করলো, কিছুটা রোষভরেও বটে।

তৃতীয় অভিযানের (১৯২৪) নেতা ছিলেন লে: ক: নর্টন (Lt. Col. Norton)। মাল্লোরি তৃতীয় বারের মত দলভুক্ত সদস্য ছিলেন। পরিতাপের বিষয়, আবহাওয়া সেবার ভয়াবহ রকমের হয়ে দাঁড়ালো—অবিরাম তুষার পাত হচ্ছিল। কিন্তু তবুও চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা হয়ে দাঁড়ালো মারাত্মক—মাল্লোরি সমেত চারজন পর্বতারোহীর প্রাণাহুতি পড়লো। (৪ঠা জুন তারিখে নর্টন ও সমারভেল (Somervell) ২৮,১৩০ ফুট পর্যন্ত উঠে বিনাশ-প্রাপ্ত হন। চার দিন পরে মাল্লোরি ও আরভিন (Irvine) আরো অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন। শেষ অবধি ২৮,০০০ ফুট উন্নতিতে তাঁদের দেখা যায়—তারপর আর দেখা গেল না। তাঁরা কি শিখরে পৌঁছুতে পেরেছিলেন ? এই প্রশ্নের জবাব মেলা সম্ভব নয়, একমাত্র শিখরই তা জানে। সমারভেল-এর 'After Everest' শীর্ষক বই এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পথের নিশানা তো কিছু কিছু ইতিমধ্যেই জানা গিয়েছিল। ১৯২১ ও ১৯২২-এর অভি-যানকারীরা শিক্ষণীয় যা কিছু সংগ্রহ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল উচ্চ অঞ্চলে জীব-জন্তু ও উদ্ভিদাদির খবর। জানা যায় যে, নেকড়ে, খেঁকশিয়াল, খরগোস ও বুনো ভেড়া ১৯০০০ থেকে ২০০০০ ফুট উচ্চতায় দেখা যায়। অবশ্য পাখীদের অবাধে সুউচ্চে উড়ে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। দাড়িবিশিষ্ট শকুন (Lammergeier) ২৫,০০০ ফুট উচ্চে আর কাক গোষ্ঠীর Jackdaw ২৬,০০০ ফুটেরও উপরে দেখা যায়।

১৯২৪-এর মর্মান্তিক ঘটনার পর এভারেস্টে আরোহণ প্রয়াসে নয় বছরের মত যবনিকাপাত হলো।

এর পরের অভিযান (১৯৩৩) বিস্তারিতভাবে পরিকল্পিত এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালিত। যাঁর নেতৃত্বাধীনে দলটি ছিল, তিনি হলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রাক্তন সদস্য হিউ রাটলেজ (Hugh Ruttledge)। সেবারে উল্লেখযোগ্য অন্যতম সদস্য ছিলেন স্মাইথ—ইনি ১৯৩১-এর কামেট শৃঙ্গে আরোহণে সমর্থ হন। ২৮,০০০ ফুটেরও কম উন্নতি (Altitude) পর্যন্ত ওঠা সম্ভব হয় এবং তারিখটি ছিল ১৯শে মে। অতঃপর প্রতিকূল পরিবেশের দরুণ পশ্চাদপসরণ করতে হয়। দলভুক্ত জনৈক সদস্যের ভাষায়—"চতুর্দিক-ব্যাপী স্তব্ধতা ছিল, পূর্ণ স্তব্ধতা ছিল, আর সেই ভূধর অঞ্চলে সর্বব্যাপী শৈত্য..." ১৯৩৬ এর অভিযানের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। ১৯৩৮-এর অভিযান-নেতা টিলমান (Tilman)। এবারও অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেখে দলের সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করা স্থির করেন। টিলমান Mount Everest নামে একখানা বইও লিখে গিয়েছেন।

১৯৩৮-এর পর থেকে বেশ কিছু বছর এভারেস্ট শিখর নিরালায় রয়ে গেল। তার স্বাভাবিক জীবনধারায় ক্ষণেকের জন্যেও ছেদ পড়ে নি। উষার রক্তিমাভা তার উপর প্রতিভাত হলো, দিনান্তে অস্তগামী সূর্যরশ্মিতে তা রাগ-তপ্ত হয়ে উঠতো এবং রাত্রি কদাচিৎ পূর্ণমাত্রায় তার ধবলিমা মুহূর্তের জন্যে ত্যাগ করেছিল। তার গা ভাসিয়ে হিমবাহ গড়িয়ে বেয়ে চলেছে, আর পাদমূলে ফাটলের পর ফাটল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ব্যবধানের সৃষ্টি করেই চলেছিল। তুষার-হিম-বরফ সবেরই ঘূর্ণি চলেছিল অব্যাহত গতিতে।

১৯৩৮-এর অভিযান আর এক দিক থেকে

স্মরণীয়। কারণ এরপর যখন অভিযান সুরু করা হয়, তখন এশিয়ার পটভূমিকায় বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তিব্বত অধিকৃত হয়ে গিয়েছে—এভারেস্ট আরোহণের উত্তর দিকের পথ রুদ্ধ হলো। একদিকের দ্বার যেমন রুদ্ধ হলো, সৌভাগ্যক্রমে অপর দিকের দরজা উন্মুক্ত হলো। কাল পর্যন্ত নেপাল সরকার এভারেস্টে আরোহণের অনুমতি দান করতেন না। এ বিরোধিতা নেপাল সরকার তুলে নিলেন—দক্ষিণের ঢালু অংশ থেকে এভারেস্ট আরোহণের দ্বার উন্মোচিত হলো।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উপরের সব কয়টি অভিযানই ইংরেজদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার অভিযানকারীরাও অভিযান চালাতে এগিয়ে এলেন।

তারপর উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা (১৯৫১) এরিক শিপটনের (Eric Shipton) নেতৃত্বে বৃটিশ দলটি কর্তৃক। এ-দলের ভাবীকালের প্রথম যুগ্ম বিজয়ীদের মধ্যে অন্যতম নিউজিল্যাণ্ডের এডমণ্ড ই. হিলারি (Edmund E. Hillary) ছিলেন। সেবার ১৮,০০০ ফুটের উপর তুষার-মানবের পদচিহ্ন দেখা গেল। তারপর এই তুষার-মানবের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্যে এর সন্ধানের হিড়িক পড়ে যায়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, বহু অর্থব্যয়ে পরিচালিত পরের একটি অভিযানকারী দল তুষার-মানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দের সুইস দলটিতে ভাবী-বিজয়ী তেনজিং তুঙ্গ বিন্দু থেকে ৮০০ ফুটের ব্যবধানে বিফল হন।

এভারেস্ট-শৃঙ্গে একক অভিযান

মরিশ উইলসন (Maurice Wilson) ছিলেন বৃটিশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ক্যাপ্টেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, একখানা উড়োজাহাজ নিয়ে কোন রকমে পাহাড়ের গায়ে উঁচুতে অবতরণ করে শিখর পর্যন্ত বাকী উর্ধ্বাংশটুকু পায়ে হেঁটে চূড়ায় উঠবেন। এর জন্যে তিনি বিমান চালনা শিক্ষা করলেন, একখানা ছোট বিমানও কিনে নিয়ে ভারতে এলেন, কিন্তু পূর্ণিয়ায় তা এসে পৌঁছালে বাজেয়াপ্ত হলো। উইলসন দমে গেলেন না। ১৯৩৪-এর বসন্তকাল। আগ্রহাতিশয্যে একাকী এগিয়ে চললেন। এই বিপদসঙ্কুল কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে অনেক মহল থেকেই তাঁকে নিষেধ করা হলো। কিন্তু উইলসন তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে ছদ্মবেশে শেষ পর্যন্ত শিখর মূলে পৌঁছালেন। তিনি অটল, স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিছুদূর উঠলেনও। পথে (পাহাড়ের উপর) তাঁর পূর্ব-সূরী "রাটলেজ" দলের পরিত্যক্ত বহু খাদ্যসামগ্রীর ভাণ্ডারের সন্ধান কুলিরা তাঁকে দেখিয়ে দিল। উইলসনের নিজের সঙ্গে সম্বল ছিল ভাতের ফেন জাতীয় জিনিষ।

উইলসন অবশেষে কিছুদূর পর্যন্ত উঠে একদিন নিদ্রিতাবস্থায় শীতে জমে গেলেন। তাঁর ঘটনা-

I will climb Everest alone পুস্তকে Robert Dennis (১৯৫৭) লিপিবদ্ধ করেছেন।

এককভাবে মরিশের পর আরো দু-জন অভিযাত্রীর নামোল্লেখ করতে হয়। এঁরা হলেন ক্যানাডার ডেনমান (Denman) (১৯৪৭) ও ডেনমার্কের পর্বতারোহী আর. বি. লারসেন (R.B. Larsen) (১৯৫১)।

প্রথমোক্ত ২৪,০০০ ফুট পর্যন্ত উঠে ঠাণ্ডা ও অপর্যাপ্ত সরঞ্জামের দরুণ ফিরতে বাধ্য হন। আর দ্বিতীয়োক্ত গোপনে নেপাল অতিক্রম করে শিখরের তিব্বত-অংশে পৌঁছালেন। তবে কিছু-দূর আরোহণ করবার পর শৈত্য প্রভৃতি কারণে কুলিরা ফিরে এলো এবং অগত্যা তিনিও তাদের অনুসরণ করলেন।

এভারেস্টের উপর দিয়ে বিমান চলাচল

গোড়ার দিকে যখন এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা হয়, তখন বিমান চালনা ছিল না বললেই চলে। ক্রমে বিমান চলাচল সুরু হওয়ায় শিখরের উপর দিয়ে বিমান চালাবার অনুমতি চেয়ে পাঠানো হলো নেপাল সরকারের কাছ থেকে এবং ১৯৩৩-এ অনুরোধ রক্ষা করা হলো।

বিমান চালনাকালে বাধাও প্রচুর পেতে হয়, তবু এভারেস্টের উপর দিয়ে বিমান চালনা করে যে সাফল্য অর্জন করা গিয়েছিলা, তার জন্যে বৃটিশ বিমান চালকদের গর্ববোধের অধিকার রয়েছে।

এরপর অবশ্য বিমান বহুবার এভারেস্ট ডিঙিয়ে উড়েছে।

এভারেস্ট বিজয় (১৯৫৩)—বিজয়ী হিলারী ও তেনজিং

"উঠিয়া পর্বতচুড়ে ধরণীরে হেরি দুরে—
পথের ত দুখ-ক্লেশ ভ্রম মনে হয়।"
—অক্ষয়কুমার বড়াল

অবশেষে সুদীর্ঘ তমিস্রার পর আশ্বাস ও আলোক ফুটে উঠলো। সঠিক পরিকল্পনা, অক্লান্ত পরিশ্রম, অপরিসীম নিষ্ঠা, দূরদর্শিতা এবং ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে অবশেষে এভারেস্ট শৃঙ্গ পরাজিত হলো। মানবের বিজয়-নির্ঘোষ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ। ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সিংহাসনে আরোহণ উৎসব। জন হাণ্টের (John Hunt) নেতৃত্বে বৃটিশ অভিযাত্রীদলে এডমণ্ড হিলারি ও তেনজিং নোরগে এভারেস্ট শিখরে আরোহণে সমর্থ হয়ে বিশ্বে এক অভূতপূর্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। আদি প্রচেষ্টার পর থেকে বত্রিশ বছর পর এভারেস্ট শৃঙ্গ মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই ঘটনার স্মারক হিসেবে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে দার্জিলিঙে পর্বতারোহণ শিক্ষায়তন (Himalayan Mountaineering Institute) প্রতিষ্ঠিত হলো। সংস্থাটির অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখা গিয়েছে। এই সংস্থারই একটি দল এভারেস্ট শিখরে আরোহণের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

এডমণ্ড হিলারী

এভারেস্ট আবিষ্কারের স্মারক হিসেবে ইতিমধ্যেই ভারতে ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে ও পরদিন একটি

তেনজিং নোরগে

জার্মান-সুইস অভিযাত্রীদল আবার এভারেস্ট শিখরে দু-বার আরোহণের গৌরব অর্জন করেন।

এই দলের সকল দুজন অভিযানকারী মিঃ মার্মেট (Marmet) ও মিঃ রিইস (Reiss)

সাংবাদিকদের বলেন যে, ঐ উন্নতিতে তাঁরা অস্বাভাবিক কোন অনুভূতি পান নি, তবে তাপ ও চাপের তারতম্য হেতু একটু অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। মানুষের উন্নতিতে স্বাভাবিক অনুভূতির বিলোপসাধন ঘটে, একথা তাঁরা অস্বীকার করেন। আর এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন যে, উন্নতিতে অক্সিজেন যদিও অত্যাবশ্যক নয়, তবু শ্বাসকষ্টের সময় বিশেষ সহায়ক হয়।

১৯৬৩-এর আমেরিকান অভিযাত্রীদের তিন দফায় এভারেস্ট আরোহণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, অভিযাত্রীদের একজন দক্ষিণ কোলের (South Col) (১লা মে), ২২শে মে আরো দু-জন শৃঙ্গে আরোহণ করেন এবং একই দিনে পশ্চিম কোল থেকেও দু-জন শীর্ষে আরোহণ করেন। এপর্যন্ত পশ্চিম প্রান্ত (West ridge) থেকে কোন প্রচেষ্টা হয় নি।

স্মরণ থাকতে পারে যে, প্রথম এভারেস্ট বিজয়ীদ্বয়ের মধ্যে একজন ছিলেন ভারতীয়—তেনজিং নোরগে। তারপর দু-বার ভারতীয় অভিযাত্রীদল বিফল হন (১৯৬০ ও ১৯৬২)।

ভারতীয় তৃতীয় অভিযাত্রীদল গঠিত হয় লেঃ কঃ কোহলীর নেতৃত্বে। ২০শে মে, ১৯৬৫ এক স্মরণীয় দিন। ঐদিন দু-জন সদস্য এভারেস্ট শৃঙ্গে সকাল সাড়ে ন'টার সময় পৌঁছান। বিশ্বব্যাপী উল্লাস আর একবার শোনা গেল সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় দলের অভূতপূর্ব সাফল্যে।

এই সংবাদ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন, "প্রথম যে ব্যক্তি দুর্জয় হিমালয় শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন তিনি ভারতীয়। তবে তিনি নিউজিল্যাণ্ড দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই দলটি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। সে জন্যে এই বিজয়-সংবাদ আরও রোমাঞ্চকর।"

উনিশ জন সদস্যযুক্ত এই অভিযাত্রীদল নেপাল প্রান্ত থেকে শিখরে পৌঁছান। বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে তাঁরা সেখানে চার ফুট উঁচু আমেরিকান পতাকাদণ্ড দেখতে পান। এই দণ্ডের সঙ্গে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা বেঁধে দেন এবং নেপালী পতাকাও উত্তোলন করেন। শিখরে তাঁরা আধ ঘন্টাকাল অবস্থান করেছিলেন।

এভারেস্ট বিজয়ের ঘটনাটি তখনও সকলের স্মৃতিতে সতেজ হয়ে রয়েছে। ২৪শে মে-র সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় অভিযাত্রীদল তৃতীয়বার এভারেস্ট জয় করবার দুর্লভ গৌরব অর্জন করেছেন। জয়ী দু-জনের নাম পি, পি, ভোহরা ও আংকামি। ১০ দিনের মধ্যে অভিযাত্রীদল চারবার শৃঙ্গে আরোহণ করতে সমর্থ হন।
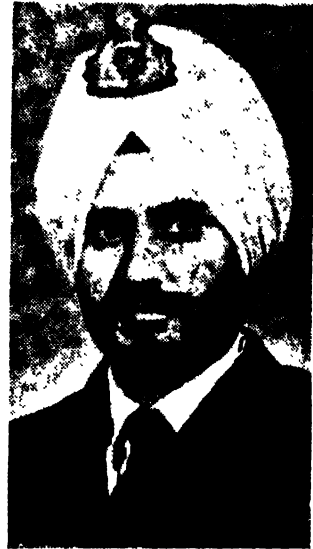
লেঃ কঃ কোহলী

"আমাদের এভারেস্ট জয়ের মূলে বাংলার অবদান অনেকখানি এবং বাংলার অভিনন্দন শাশ্বতকাল আমাদের জীবনভর সুখস্মৃতি হয়ে রইলো"—এমনিভাবেই অভিভূতচিত্তে প্রত্যভিভাষণ দেন কোহলী রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে আয়োজিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে। মুগ্ধ শ্রদ্ধায় তিনি বাংলার দেহান্তরিত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাম স্মরণ করেন, তাঁরই উদ্যোগে দার্জিলিং পর্বতারোহী সংস্থা গড়ে উঠেছে।

এভারেস্ট আরোহণকালে পুঞ্জীভূত আপদ-বিপদ সত্ত্বেও বিপুল উৎসাহী ও বলিষ্ঠ হৃদয়বান মানুষের অভাব পরিলক্ষিত হয় নি। এই সুবিশাল, অসম্ভবমাফিক সুউচ্চ শীর্ষে আরোহণ করবার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির প্রতি নিঃসন্দেহে আবহমানকাল শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হতে থাকবে।

বুদ্বুদ-কক্ষ

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

আজ এই পরিবর্তনশীল যুগে নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন আবিষ্কৃত জিনিষের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বুদ্বুদ-কক্ষ বা Bubble chamber—যার জন্যে ডোনাল্ড আর্থার গ্লেজার ১৯৬০ সালে নোবেল পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যায় এই যন্ত্রটির আবিষ্কার এক বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ।

বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে বিভিন্ন মৌলিক কণার সম্পর্কে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কণার আচরণ ও প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হবার পর পদার্থ থেকে যে সব কণিকা বেরোয়, তাদের গতিপথের বৈশিষ্ট্য কি, তাদের তেজ কত—এসব নিয়ে বিরাট সমস্যা দেখা দিল। এছাড়াও মহাজাগতিক রশ্মি থেকে প্রতিনিয়ত যে সমস্ত কণিকা ভেসে আসছে, তাদের স্বরূপ জানবার ব্যাপারেও বেশ সমস্যা ছিল।

১৯১২ সালে সি. টি. আর. উইলসন মেঘ-কক্ষ নামক এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র দিয়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত কণিকা ও মহাজাগতিক রশ্মি থেকে প্রাপ্ত কণিকার গতিবিধি ও তাদের অন্যান্য অণু-পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপাদি করা যায়। মেঘ-কক্ষে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে আয়ননকারী কণিকার গতিপথ বেঁকে যায়। আয়ননকারী কণিকার গতিবেগ বেশী হলে পথের বক্রতা কম হয়। কাজে কাজেই চৌম্বক শক্তি ও পথের বক্রতা থেকে গতিবেগের তারতম্য বোঝা যায়। বক্রতার পরিমাপ থেকে কণিকার ভরবেগও জানা যায়।

মৌলিক কণার স্বরূপ জানবার ব্যাপারে ব্রিষ্টলে পাওয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আয়ননকারী কণিকার গতিপথ দেখবার জন্যে ফটোগ্রাফিক অবদ্রব (Emulsion) আবিষ্কার করেন। আয়ননকারী কোন কণিকা অবদ্রবের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তার গতিপথে আয়নের সৃষ্টি করে। অবদ্রবের প্লেটটি ডেভেলপ করবার পর কণিকার পথটি কালো হয়ে যায়। প্লেটে কালো কণিকার ঘনত্বের পরিবর্তনের হার ও সংঘাতজনিত পথের বক্রতা থেকে মৌলিক কণার অনেক খবর জানা যায়।

দেখা গেছে যে, সাধারণতঃ উচ্চ শক্তিবিশিষ্ট কণার গতিপথ নির্ধারণে সাধারণ অবদ্রবের ব্যবহার উপযোগী। কিন্তু কণার গতিপথ এক্ষেত্রে ফটোগ্রাফিক প্লেটের সমান্তরাল হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে, নিউক্লীয় অবদ্রবে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের ব্যবহারেও গতিপথের বক্রতা থেকে কণার আগমনের স্বরূপ বোঝা যায় না; অর্থাৎ বিক্ষেপণের প্রভাব এত বেশী যে, বাহ্যিক চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন ক্রিয়াই লক্ষিত হয় না।

মেঘ-কক্ষে ব্যবহৃত সম্পৃক্ত গ্যাসের ঘনত্ব কম থাকায় উচ্চ গতিশীল কণার গতিপথের নির্দেশ অনেক সময় পাওয়া যায় না। তাছাড়া সাধারণ মেঘ-কক্ষে একটা ছবি নেবার পর ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম ভর্তি এবং কক্ষের আয়নগুলিকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিয়ে বহিষ্কৃত করে নতুন ছবির জন্যে কক্ষটিকে প্রস্তুত করতে সময়ের দরকার হয়।

মহাজাগতিক রশ্মি থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন কণিকার শক্তি প্রচণ্ড। এই সকল কণিকা পৃথিবীর বুকে আসবার সময় মাধ্যমের সঙ্গে সংঘাতে নতুন নতুন কণিকার জন্ম হয়। ১৯৪৯ সালে পাওয়েল ও তাঁর সহকর্মীরা অবদ্রবের ছবিতে এক ভারী মৌলিক কণার সন্ধান পান, যা ভেঙ্গে তিনটি পাই (π) মেসন তৈরি হয়। এই কণিকার নাম দেওয়া হলো টাউ (τ)। এই সব কণিকার জন্ম হতে গেলে কমপক্ষে বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট তেজের সংঘাত হওয়া চাই। মহাজাগতিক রশ্মিতে এরকম তেজ রয়েছে বলেই এরকম কণিকার সন্ধান পাওয়া গেল।

পরীক্ষামূলক পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক কণাগুলিকে প্রচণ্ড শক্তিশালী করবার বিষয়টা ছিল একটা বিরাট সমস্যা। ১৯৫১-৫২ সালে পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেল যে, অতি উচ্চ তেজসম্পন্ন কণিকাগুলির সংঘর্ষে প্রচুর নতুন মৌলিক কণার সৃষ্টি হয়। এখন মৌলিক কণাকে উচ্চ বেগে চালিত করতে পারলে তার শক্তি বেড়ে যায়। যে সব যন্ত্রে কোন কণাকে যান্ত্রিক কৌশলে ক্রমশঃ বেশী বেগে চালিত করা হয়, সেগুলিকে কণা-ত্বরক যন্ত্র বলে। এই যন্ত্রে তড়িৎ-শক্তি কণাকে অধিকতর শক্তিশালী করে ও চৌম্বক শক্তি গতিপথকে অল্প স্থানের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। এই শক্তিশালী কণা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে পরমাণুর রাজত্বে হানা দিয়ে পরমাণুর ভিতরকার খবর বলে দেয়। বিভিন্ন কণা-ত্বরক যন্ত্রে আধান-বিশিষ্ট বিভিন্ন কণাকে শক্তিশালী করে তোলা হয়। ১৯৫৩ সালে ব্রুকহাভেন জাতীয় গবেষণাগারে কস্‌মোট্রন নামক উচ্চ তেজসম্পন্ন কণা সৃষ্টির যন্ত্র তৈরি হওয়ায় মহাজাগতিক রশ্মি ছাড়াও গবেষণাগারে এসব মৌলিক কণার দেখা পাওয়া গেল।

সুতরাং প্রয়োজন হলো উচ্চ শক্তিসম্পন্ন তড়িৎ-কণার স্বরূপ বিস্তৃতভাবে জানবার, যেটা সম্ভব হচ্ছিল না মেঘ-কক্ষে, গাইগার-মুলার কাউন্টারে বা অবদ্রবের পথে। এখন অসুবিধা দাঁড়ালো, অধিকাংশ নবাগত কণিকার গতিপথ মেঘ-কক্ষে অত্যন্ত কম হয় এবং তাদের সংখ্যাও বড় কম। তার উপর মেঘ-কক্ষে গ্যাসের ঘনত্ব অত্যন্ত কম হওয়ায় পর্যবেক্ষণযোগ্য যথেষ্ট ঘটনা এখানে ঘটে না। স্বভাবতঃই এমন এক পর্যবেক্ষণ-কক্ষের প্রয়োজন, যার ঘনত্ব বেশ বেশী হবে।

এই ধারণাটা ডোনাল্ড আর্থার গ্লেজারের মাথায় ঢুকেছিল ১৯৫০ সালে, যখন তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজিতে অধ্যাপক এণ্ডারসনের কাছে মৌলিক কণা নিয়ে কাজ করছিলেন। এই সময় তিনি একটা মজার ঘটনা লক্ষ্য করেন। বোতলের মধ্যে হুইস্কি ভরা থাকে অধিক চাপে, তার ছিপি খুললেই বুদ্বুদ ওঠে। তিনি একদিন হুইস্কির বোতলের ছিপি খোলবার সময় দেখলেন, ছিপি খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্বুদ ওঠে না—কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগে। কেন না, বুদ্বুদ তৈরি হতে কিছু সময় লাগে। তখন তিনি ভাবলেন যে, যদি ঐ সময়ের মধ্যে তরলের মধ্য দিয়ে আয়ননকারী কণা পাঠানো হয়, তবে ঐ কণা মাধ্যমের সঙ্গে সংঘাতে যে আয়নের সৃষ্টি করবে—সেই আয়ন তরল পদার্থটিতে বুদ্বুদ জন্মাবে এবং ফটোগ্রাফে কণিকার গতিপথ ধরা পড়বে।

এই ধারণা থেকেই উৎপত্তি হলো বুদ্বুদ-কক্ষের। মৌলিক কণার গবেষণা-ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সম্ভাবনা দেখা দিল। এবার একটু বিস্তৃতভাবে এর গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

আমরা জানি, কোন তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক নির্ভর করে বাইরের চাপের উপর। চাপ যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তরলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যাবে। এভাবে অত্যন্ত উচ্চ চাপে এবং উচ্চ তাপমাত্রায় কোন তরল পদার্থের উপরে চাপ যদি হঠাৎ কমিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার

স্ফুটনাঙ্ক স্বভাবতঃই অনেক কমে যায় এবং তরলের তৎকালীন তাপমাত্রা স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে অনেক বেশী হওয়ায় তরলের মধ্যে স্বতঃই স্ফুটন আরম্ভ হয়। তরলের ঐ অবস্থাটাকে বলা হয় অতি উত্তপ্ত অবস্থা (Superheated state)। দেখা গেছে অতি উত্তপ্ত অবস্থায় তরল পদার্থের স্ফুটন সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় না। স্ফুটন আরম্ভ হতে একটু সময় কণিকা অতি উত্তপ্ত তরলের (স্বতঃস্ফুটন আরম্ভ হবার পূর্বে) ভিতর দিয়ে চলে গেলে এর গতিপথে মাধ্যম-অণুর আয়ন জমা হয়। এই আয়নগুলি সমতড়িৎযুক্ত। এই আয়নগুলি এখন স্ফুটন আরম্ভ করবার উত্তেজক হিসেবে কাজ করে। এই সকল আয়নকে কেন্দ্র করে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য বুদ্বুদের সৃষ্টি হয়। এই বুদ্বুদগুলি
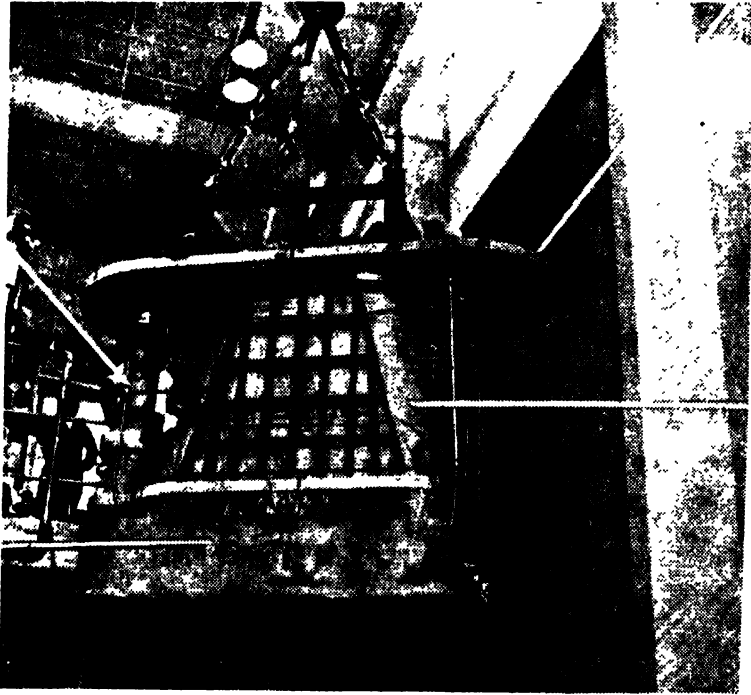
১নং চিত্র

১২ ইঞ্চি লম্বা হাইড্রোজেন বুদ্বুদ-কক্ষ। উপরের বামদিকে সাদা সরল রেখা—সম্প্রসারণ পথ, উপরের ডানদিকে সাদা সরল রেখা—ভ্যাকুয়াম ট্যাঙ্কের ঢাকনি, ডানদিকের নীচের সাদা সরলরেখা—হাইড্রোজেন শীল্ড, বামদিকের নীচে সাদা সরল রেখা—কক্ষ।

লাগে। ঐ সময়ের মধ্যে অতি উত্তপ্ত তরলের মধ্যে কোন উচ্চ তেজসম্পন্ন আয়ননকারী কণা প্রবেশ করলে যে আয়নের সৃষ্টি হয়—সেই আয়নে তরল পদার্থটির বুদ্বুদ জন্মায় ও ফটোগ্রাফে কণিকার গতিপথ ধরা পড়ে।

বুদ্বুদ তৈরির ব্যাপারটা আর একটু বিস্তৃতভাবে বলে নেওয়াই ভাল। একটি আয়ননকারী

পরস্পরের টানের ফলে আয়তনে অতি তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং দৃশ্যমান বুদ্বুদে পরিণত হয়। এই অবস্থায় আয়নের পুরা পথের ছবি তোলা হয়। এইবার তরলটিতে পুনরায় চাপ প্রয়োগ করে আবার নতুন করে ব্যবহার করবার জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়। এতে সময়ও খুব কম লাগে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে, মূলতঃ মেঘ-কক্ষ

ও বুদ্বুদ-কক্ষের মধ্যে নীতিগতভাবে কোন প্রভেদ নেই। মেঘ-কক্ষে ব্যবহার করা হয় গ্যাস আর বুদ্বুদ-কক্ষে ব্যবহার করা হয় তরল পদার্থ, যার ঘনত্ব গ্যাসের চেয়ে অনেক বেশী। ঘনত্ব বেশী হবার ফলে আয়ননকারী কণিকার সঙ্গে মাধ্যমের কণিকাগুলির সংঘাত হয় খুব তাড়াতাড়ি এবং প্রচুর পরিমাণে আয়ন তৈরি হয়। অবদ্রব থেকে বুদ্বুদ-কক্ষের সুবিধা এই যে, এখানে প্রস্তুত আয়নগুলিকে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে বিক্ষিপ্ত করা কক্ষে চাপ হ্রাস-বৃদ্ধির অত্যন্ত দ্রুত ও সূক্ষ্ম ব্যবস্থা রয়েছে। নীচে চৌম্বক ক্ষেত্রের একটা মেরু দেখানো হয়েছে। বাঁ-দিক থেকে আয়ননকারী কণিকা-স্রোত তরলের মধ্যে প্রবেশ করে। তরলের মধ্যে ঐ কণিকার গতিপথের ফটোগ্রাফ উপরের ক্যামেরার সাহায্যে নেওয়া হয়। সমস্ত কক্ষটিকে একটা বায়ুশূন্য আধারে ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং কক্ষটিকে চারদিক থেকে প্রথমে তরল হাইড্রোজেন ও পরে তরল নাইট্রোজেন
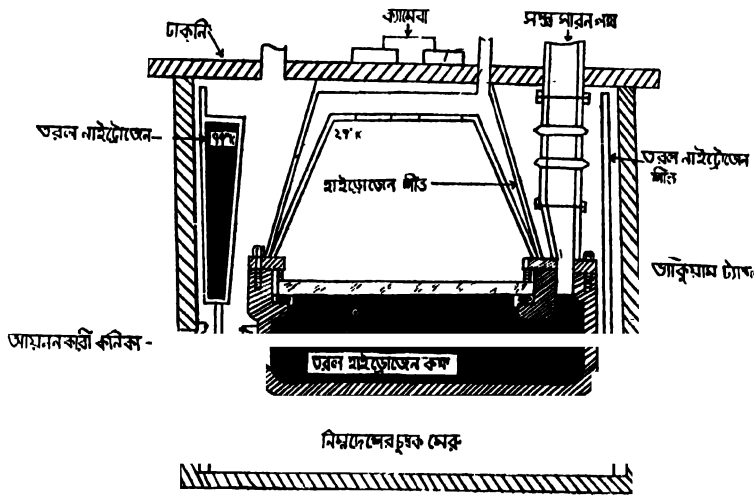
২নং চিত্র

সম্ভব হয় এবং তা হয় বলেই মাধ্যমের অণুর কেন্দ্রীনের খবর অনেক ভালভাবে পাওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং বুদ্বুদ-কক্ষে, মেঘ-কক্ষ ও অবদ্রব—এই উভয়েরই কিছু কিছু সুবিধা আমরা পাচ্ছি।

১৯৫৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় বিজ্ঞানী অ্যালভারেজ একটা ৭২ ইঞ্চি লম্বা ১৫০ গ্যালন তরল পদার্থবিশিষ্ট যে বুদ্বুদ-কক্ষটি তৈরি করতে সক্ষম হন, তার ছবি ১নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

২নং চিত্রে ৭২ ইঞ্চি লম্বা বুদ্বুদ-কক্ষের লম্বালম্বি প্রস্থচ্ছেদ দেখানো হয়েছে। তরল হাইড্রোজেন দিয়ে ঘিরে (Shield) রাখা হয়েছে—যাতে তরল হাইড্রোজেনের তাপের পরিচলন, পরিবহন ও বিকিরণ ক্রিয়ার মাত্রা সবচেয়ে কম থাকে।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে বুদ্বুদ-কক্ষে ব্যবহৃত তরলের কোন বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন কি? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তরলকে হতে হবে প্রথমতঃ অপরিবাহী, যাতে আয়নগুলি তাদের বৈদ্যুতিক আধান বজায় রাখতে পারে; দ্বিতীয়তঃ তরলের উপরিতলের টান (Surface Tension) খুব কম হতে হবে, যাতে তৈরি বুদ্বুদ-

গুলি ভেঙ্গে না যায়; তৃতীয়তঃ তরলের বাষ্পচাপ খুব বেশী হবে—এতে তৈরি বুদ্বুদগুলি খুব তাড়াতাড়ি আয়তনে বৃদ্ধি পাবে; চতুর্থতঃ বিভিন্ন ক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্যে তরলের ঘনত্বের দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সাধারণতঃ তরল হাইড্রোজেন: ডয়টেরিয়াম, হিলিয়াম, প্রপেন, ফ্রেয়ন ও জেননই বুদ্বুদ-কক্ষে ব্যবহৃত হয়।

হয়, তাদের জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি নির্দিষ্ট হদিশ বের করেছেন।

আরও কতকগুলি পরীক্ষায় তিনি বিভাট্রন থেকে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণিকার দ্বারা কক্ষের পরমাণুকে আঘাত করেন। এই আঘাতে মিউ-মেসন (μ-meson) উৎপন্ন হয়। তিনি এদের গতিপথের ছবি তুলতে সক্ষম হন। এই রকম একটা ছবি ৩নং
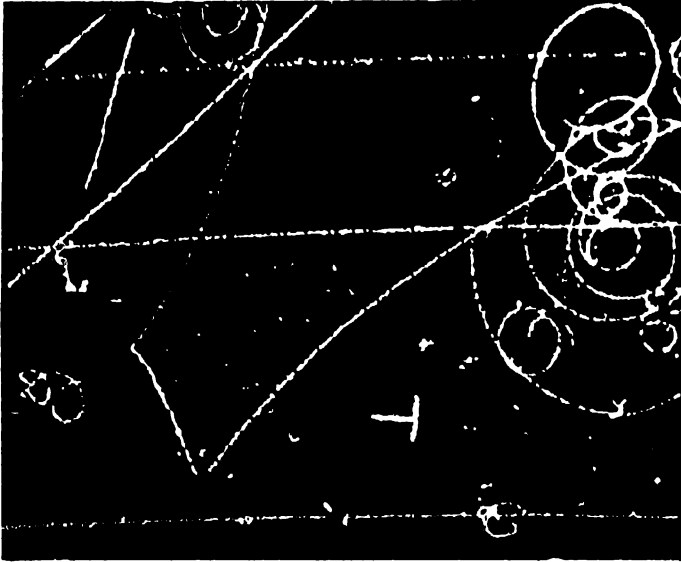
৩নং চিত্র

বুদ্বুদ-কক্ষ এখনও এর বাল্যবস্থায়; কিন্তু উচ্চশক্তি কণিকার গবেষণা-ক্ষেত্রে এবং মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় বুদ্বুদ-কক্ষ নিয়ে এসেছে একটা বিরাট সম্ভাবনা।

বিজ্ঞানী অ্যালভারেজ তাঁর বুদ্বুদ-কক্ষে ছয় বিলিয়ন ভোল্ট বিভাট্রন থেকে অত্যন্ত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অ্যান্টিপ্রোটন কণিকা পাঠিয়ে পদার্থের ভিতরকার অনেক রহস্যের সমাধান করেছেন। উচ্চ শক্তির প্রোটন স্থির অবস্থার কোন প্রোটনকে আঘাত করলে যে অ্যান্টিল্যামডা কণিকা উৎপন্ন

চিত্রে দেখানো হয়েছে। ছবিটি হঠাৎ দেখলে বেশ জটিল বলে মনে হয়। বিজ্ঞানী অ্যালভারেজ এর খুব সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। মিউ-মেসনগুলি ঋণ আধানযুক্ত এবং ইলেকট্রনের ওজনের প্রায় ২০০ গুণ বেশী ভারী। এই মেসনগুলি ধন আধানযুক্ত হাইড্রোজেন কেন্দ্রীনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় ও তাদের চারদিকে ইলেকট্রনের মত ঘুরতে থাকে। এখন যেহেতু মেসনগুলি ইলেকট্রনের চেয়ে ২০০ গুণ বেশী ভারী, সেহেতু তাদের কক্ষপথ ইলেকট্রনের কক্ষপথের তুলনায় ২০০

গুণ ছোট—সুতরাং তারা কেন্দ্রীনের কাছাকাছি ঘুরবে। মেসন-কণা হাইড্রোজেন-কেন্দ্রীনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় যে পরমাণু তৈরি হলো, সেগুলিকে মেসিক পরমাণু বলা হয়। এই অবস্থায় মেসনগুলি কোন বুদ্বুদ তৈরি করে না। ৩নং চিত্রে মিউ মেসনটি ডানদিকের উপর থেকে কক্ষে প্রবেশ করে এবং বেশ কিছুদুর গিয়ে (দীর্ঘ মোটা গতিপথ, একটু নীচের দিকে বাঁকা) মেসিক পরমাণু তৈরি করে। এই অবস্থায় কোন বুদ্বুদ তৈরি হয় না। তাই কিছু অংশ বুদ্বুদবিহীন। এই শক্তি বহন করে। এই মেসনটি আবার ইলেকট্রনে ভেঙ্গে যায়। ৩নং চিত্রে বুদ্বুদবিহীন জায়গার বাঁদিকে সংযোজিত হিলিয়াম-৩ থেকে উৎপন্ন মেসনটির গতিপথ দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ভেঙ্গে গিয়ে ইলেকট্রনে রূপান্তরিত হয়ে উপরের দিকে বাঁকা সরু পথ রচনা করেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মেসন কণিকা এখানে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে। এই মেসন তৈরি করতে শক্তিশালী বিভাট্রন যন্ত্রের প্রয়োজন। তা না হলে এই সংযোজন-পদ্ধতি বিরাট শক্তির উৎস
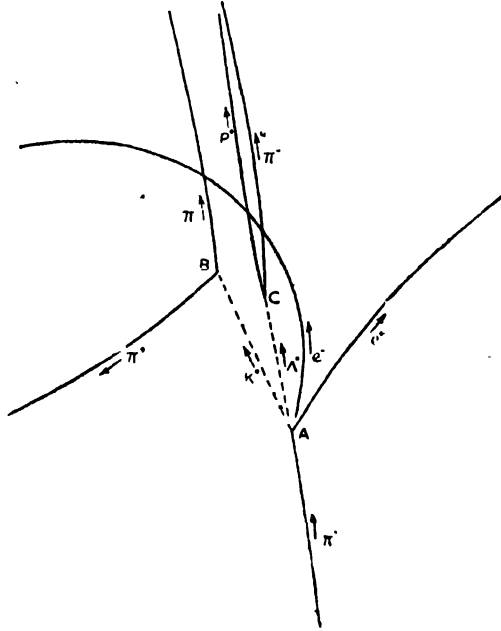
৪নং চিত্র

মেসিক পরমাণু সাধারণ হাইড্রোজেনের পরমাণুকে আঘাত করে। তখন উভয় কেন্দ্রীন সংযোজিত হয়ে একটা হিলিয়াম-৩ পরমাণু জন্ম নেয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর শক্তি (প্রায় 5·4 Mev) বেরিয়ে আসে। হিলিয়াম থেকে যে মেসনটি বেরিয়ে আসে, তার গতিবেগই ঐ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। আর এই পদ্ধতিতে দামী জ্বালানী লাগতো না, তেজষ্ক্রিয়তারও ভয় থাকতো না।

৪নং চিত্রে দেখানো হয়েছে একটা π^--মেসন বুদ্বুদ-কক্ষের হাইড্রোজেনের সংঘাতে বিভিন্ন কণিকার জন্ম হয়েছে। এটাও ১২ ইঞ্চি

হাইড্রোজেন বুদ্বুদ-কক্ষ থেকে তোলা ছবি। A বিন্দুতে সংঘাতের ফলে একটা Σ°-মেসন ও একটা K°-মেসন উৎপন্ন হয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই Σ°-মেসনটি একটা ল্যামডা-মেসন (Λ°) ও একটা π°-মেসনে ভেঙ্গে যায়। π°-মেসনটি তৎক্ষণাৎ গামারশ্মি ও একটা ইলেকট্রন জোড়ায় ($e^{\pm}$) পরিণত হয়। উভয় প্রক্রিয়াই এত তাড়াতাড়ি হয় যে, ছবিতে মনে হচ্ছে ইলেকট্রন জোড়াটাও যেন A বিন্দু থেকে বেরিয়ে আসছে। K° মেসনটি গতিপথে আয়ন তৈরি করে না, তাই কিছু অংশ ফাঁক রয়েছে। এটা B বিন্দুতে একজোড়া π-মেসনে ভেঙ্গে যায়। ল্যামডা-মেসনটিও গতিপথে আয়ন সৃষ্টি করতে পারে না এবং C বিন্দুতে একটা প্রোটন ও একটা π^{-}-মেসনে ভেঙ্গে যায়; অর্থাৎ এভাবে লেখা যেতে পারে :

$$\pi^{-} + p^{+} \xrightarrow{(A)} \Sigma^{\circ} + K^{\circ}$$

$$\Sigma^{\circ} \xrightarrow{(A)} \Lambda^{\circ} + \pi^{\circ} \rightarrow \gamma + e^{+} + e^{-}$$

$$\Lambda^{\circ} \xrightarrow{(c)} \pi^{-} + p^{+}$$

$$K^{\circ} \xrightarrow{(B)} \pi^{-} + \pi^{+}$$
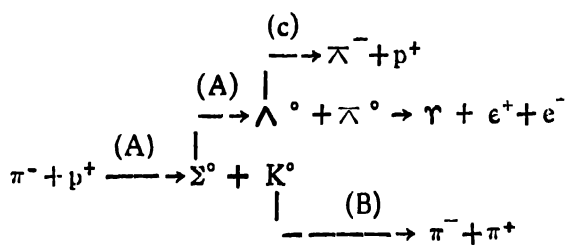
প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে ধনতড়িৎ ও ঋণতড়িৎযুক্ত কণাগুলি পরস্পর বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে দেখা যাচ্ছে। প্রচলিত অন্যান্য কণাবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে এর উপযোগিতা কতগুণ বেশী তা নীচের তথ্যগুলি থেকেই স্পষ্ট হবে।

(১) ব্রুকহাভেন লেবরেটরীতে দেখানো হয়েছে যে, একটা ১৪০ ফুট মেঘ-কক্ষে যতগুলি ঘটনা ধরা সম্ভব, মাত্র ছয় ইঞ্চি বুদ্বুদ-কক্ষ ব্যবহার করেই ততগুলি ঘটনার নজির পাওয়া সম্ভব।

(২) বিভিন্ন ধরণের গবেষণা-ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা অনেক বেশী। কক্ষকে অত্যন্ত হাল্কা তরলে ভর্তি করা যেতে পারে, যাতে কণিকাগুলি বিক্ষিপ্ত না হয় এবং বিভিন্ন ঘনত্বের তরলে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে—ঠিক যেমন করে মেঘ-কক্ষে করা হয়।

(৩) গ্যাসে পরিচলন-স্রোতের জন্যে গতিপথ ঠিক থাকে না, কিন্তু বুদ্বুদ-কক্ষে এটা এড়ানো যায়।

মৌলিক কণার রহস্যের শেষ নেই। আধুনিক নিউক্লীয় যন্ত্রমন্দিরে বুদ্বুদ-কক্ষের জয় জয়কার। এর মাধ্যমে অনেক কিছুই জানা গেছে—ভবিষ্যতেও অনেক অজানা রহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

ভারতের প্রথম সাইক্লোট্রন

১নং চিত্র
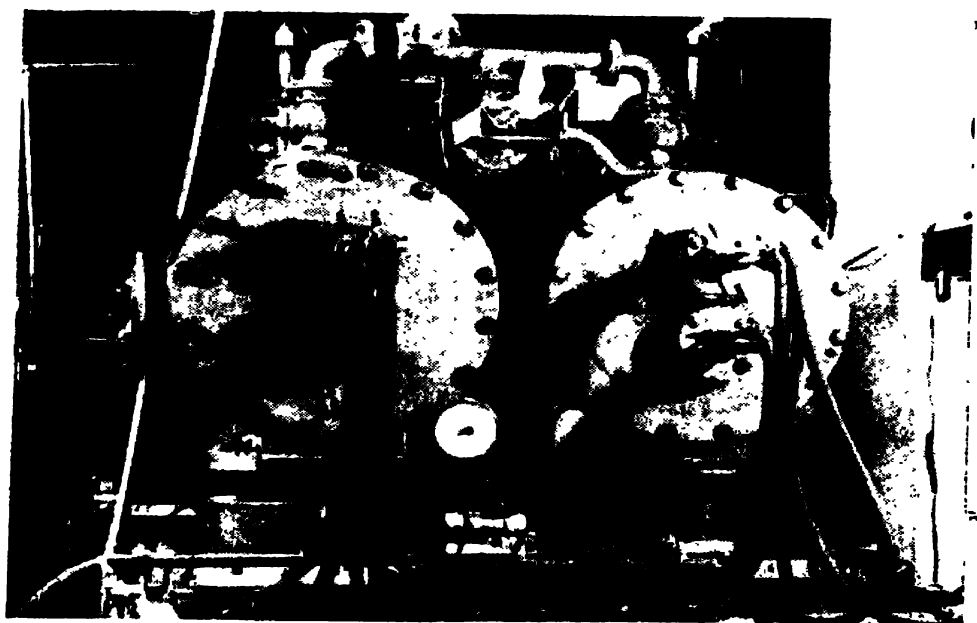
২নং চিত্র

পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভারতের প্রথম সাইক্লোট্রন

পরমাণু-কেন্দ্রক সংক্রান্ত গবেষণায় সাইক্লোট্রন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত ভারী আয়ন কণিকার গুচ্ছকে ত্বরান্বিত করে ঈপ্সিত পদার্থের উপর নিক্ষেপ করলে সেই পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য জানতে পারা যায়; নতুন নতুন আইসোটোপও ঐ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা চলে।

পূর্বপৃষ্ঠায় যে সাইক্লোট্রন যন্ত্রের দু'টি আলোকচিত্র দেখানো হয়েছে, সেই যন্ত্রটি স্বর্গতঃ অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৪০ সাল থেকে কলকাতার বিজ্ঞান কলেজে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। যন্ত্রটি রয়েছে বিজ্ঞান কলেজের ভিতর সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নামক গবেষণা-কেন্দ্রে

সাইক্লোট্রন যন্ত্রটিতে একটা বিরাট চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে প্রায় ৩৮ ইঞ্চি ব্যাসের তামার তৈরী একটি বৃত্তাকৃতি কক্ষ আছে। কক্ষটি দুই সমান অংশে বিভক্ত; এক-একটি অংশের আকৃতি ইংরেজি D (ডি) অক্ষরের মত। কক্ষটিকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ও উচ্চমানের বায়ুশূন্য অবস্থায় ($১০^{-৫}$ মিলিমিটার) রাখার ব্যবস্থা আছে। 'ডি' দু'টির মধ্যে সামান্য যে ফাঁক থাকে, সেখানে প্রোটনের উৎস রাখা হয়। 'ডি' অংশ দু'টি ও তাদের দীর্ঘ দুই বাহু নিয়ে বৈদ্যুতিক অনুনাদের একটি ব্যবস্থা রয়েছে। ঐ বাহুদ্বয়ের মধ্যে উচ্চ কম্পাঙ্কের বৈদ্যুতিক বিভব প্রয়োগ করা হয় (কম্পাঙ্কের পরিমাণ সেকেণ্ডে ১ কোটি ৭ লক্ষ সাইক্‌ল্; বিভবের পরিমাণ ন্যূনাধিক ৮০ হাজার ভোল্ট)। সেই ক্রমাগত দিক-পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র এবং (৮ থেকে ১০ হাজার গাউসের) স্থির চৌম্বক ক্ষেত্রের যৌথ ক্রিয়ায় উৎস থেকে নিঃসরিত প্রোটনগুচ্ছ 'ডি' দুটির মধ্যে ক্রমাগত আবর্তিত হ'তে থাকে; এই আবর্তনচক্রের পরিধি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে প্রোটন-কণিকাগুলির শক্তি। এইভাবে যন্ত্রটিতে একটা নির্দিষ্ট সীমা (৪০ লক্ষ ইলেকট্রন-ভোল্ট) পর্যন্ত শক্তিসম্পন্ন প্রোটন পাওয়া যায়।

১নং চিত্রে বিরাট চুম্বকের দুই মেরু, মেরুদের মধ্যকার কক্ষ ও শক্তিশালী প্রোটন-গুচ্ছের নিষ্ক্রমণ-পথ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ২নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে, 'ডি' অংশের দীর্ঘ বাহু দু'টি, যাদের মধ্যে উচ্চ কম্পাঙ্কের বৈদ্যুতিক বিভব প্রয়োগ করা হয়।

আলোচ্য সাইক্লোট্রন যন্ত্রে শক্তিশালী প্রোটনগুচ্ছের সাহায্যে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা হয়েছে; যেমন, ক্রোমিয়াম ৫০ থেকে ম্যাঙ্গানিজ ৫১, রুথেনিয়াম ৯৬ থেকে রোডিয়াম ৯৭, প্যালেডিয়াম ১০২ থেকে রৌপ্য ১০৩, ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা

মহাদেব দত্ত ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীনকালে ভারতের গৌরবে বাংলাও অংশীদার ছিল। শিল্প-বাণিজ্য, সাহিত্য-বিজ্ঞানে বাংলার অবদানের স্বাক্ষর ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে। আবার যখন পাল ও সেন বংশের রাজারা বাংলাদেশের বাইরে ভারতের এক বিরাট অংশে নিজ আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প-কলায় বাংলা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারেও বাঙালী ও বাংলার বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারে বাঙালী অতীশ দীপঙ্করের অবদান ঐতিহাসিক ঘটনা। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালী অধ্যক্ষ শীলভদ্রের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্। সিংহলে বাংলার রাজপুত্র বিজয়সিংহ আধিপত্য স্থাপন করেন। মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ায় বাংলার ঐতিহ্যের সাক্ষ্য শিলালিপির মধ্যে পাওয়া যায়। তাম্রলিপ্তের বণিকেরা জাহাজে করে দেশবিদেশে বাণিজ্য চালাতেন। এই বিজ্ঞান ও শিল্প-সমৃদ্ধির সাধনা ও গবেষণার পরিচয় বর্তমান ভারতের অসম্পূর্ণ ইতিহাসের মধ্যে মেলে না। বাংলার সম্পূর্ণ ইতিহাস এই দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা হলে এবিষয়ে সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে—ঐ যুগে বিজ্ঞান-গবেষণার পরিচয় পাওয়া তখনই সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণাধারার শতবর্ষ পূর্ণ হয় নি বলে মনে হয়। গত শতাব্দীতে ও এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপীয় শাসকদের রাজ্যশাসন ও রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করতে কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ভূ-বিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী ও বাস্তুকার এদেশে আসেন। এসময়ে ইউরোপীয় মিশনারীরা ধর্ম-প্রচার ও নিজস্ব সংস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন। এঁদের কেউ কেউ এদেশের বিশেষ বিশেষ রোগ, ভূতত্ত্ব, প্রাণী, উদ্ভিদ ইত্যাদি সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেন। এঁদের কেউ কেউ এদেশের সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করেন। এই সব গবেষণার কিছু কিছু পরে বিশেষ মূল্যবান বলে স্বীকৃত হয়। এঁদের মধ্যে ডাঃ রোনাল্ড রস্ প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে তাঁর ম্যালেরিয়া সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে পরে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু এসব গবেষণার ভাষা বিদেশী, প্রকাশের স্থান বিদেশী পত্রিকায়। একারণে এই সকল প্রচেষ্টায় লাভবান হন বিদেশী সরকার এবং ঐসব বিদেশী বিজ্ঞানী নিজেরা। ঐ সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে এদেশের নাড়ীর যোগ ছিল না। তাই এদেশের তরুণদের মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারে নি। ভারতীয় গবেষণার ইতিহাসে এঁদের মূল্যায়ন করবেন ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকেরা।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার, বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা এবং বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণার জন্যে ১৮৭৬ সালে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতি (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স) স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরের মধ্যেই অধ্যাপক রামনের আবিষ্কারে এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করে। এখানে কৃষ্ণানও গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

যতদূর মনে হয়, শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই প্রথম ভারতীয়, যিনি বিদেশে না গিয়ে এখানে

মৌলিক গবেষণার চেষ্টা করেন। কলেজীয় শিক্ষার শেষে মাত্র ৩।৪ বছরের জন্যে তিনি গণিতে নিজ চেষ্টায় গবেষণা করেন। তাঁর গবেষণা-নিবন্ধে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় তাঁর গবেষণা সে সময়ের ইউরোপীয়দের গবেষণার বিষয়বস্তুর তুলনায় পুরনো ধরণের ছিল। আইন ব্যবসা নিষ্ঠার সঙ্গে শুরু করায় আশুতোষের গবেষণা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রায় এই সময়েই পদার্থবিদ্যায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও রসায়নে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ইংল্যাণ্ডে শিক্ষা গ্রহণ করে গবেষণা শুরু করেন। তাঁরা উভয়ে এদেশে সরকারী অধ্যাপকের উচ্চ পদ লাভ করার পর গবেষণা শেষ না করে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে গবেষণা চালিয়ে যান। তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সম্বন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণা দেশবিদেশে উচ্চ প্রশংসিত হয়। মারকিউরাস নাইট্রাইট বিষয়ে আচার্য রায়ের গবেষণা উল্লেখযোগ্য মৌলিক অবদানরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। এঁদের সাফল্যে প্রমাণিত হলো, ভারতের কারুশালায় ভারতীয়েরাও মূল্যবান আবিষ্কার করতে পারেন। আর এই সাফল্য বাংলার তরুণ বিজ্ঞানীদের মনে জাগিয়ে তোলে আত্ম-বিশ্বাস, এনে দেয় অনুপ্রেরণা। এভাবেই এদেশে প্রবর্তিত হয় বিজ্ঞান-গবেষণার নতুন ধারা।

এই শতাব্দীর প্রথম দশকে আইনজ্ঞ হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর আশুতোষ ব্রতী হন এদেশে শিক্ষা ও গবেষণা সংগঠনে। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯০৮ সালে গণিত বিজ্ঞান গবেষণায় প্রেরণা দেবার জন্যে কলিকাতা গণিত সমিতি (ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি) স্থাপিত হয়। বিজ্ঞানের সকল শাখার গবেষণায় উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে ১৯১৩-১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি। পরে এই দৃষ্টান্তে আচার্য রায়ের উৎসাহে ১৯৩৪ সালে স্থাপিত হয় ভারতীয় রসায়ন সমিতি; দেবেন্দ্রমোহন বসু, শিশির মিত্র, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ অধ্যাপকদের চেষ্টায় ভারতীয় পদার্থ-বিজ্ঞান সমিতি স্থাপিত হয়। এরপর বিভিন্ন শাখার পৃথক পৃথক সমিতি স্থাপিত হয়। এসব সমিতি বক্তৃতা, আলোচনা সভা, পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করে বিজ্ঞান-গবেষণার প্রভূত সাহায্য করছেন। অবশ্য এগুলি স্থাপিত হবার পূর্বে কলিকাতার বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটিতে বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষতঃ পুরাতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়। আচার্য বসু এবং আচার্য রায়ও প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান-গবেষণার একটি কেন্দ্র গড়ে তোলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পরই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপন করে জীবনের শেষ কুড়ি বছর এখানে গবেষণা করে এটিকে একটি বিশিষ্ট গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত করেন।

১৯১৪ সালে সার আশুতোষের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং ১৯১৫ সাল থেকে এখানে বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন ও মৌলিক গবেষণার কাজ শুরু হয়। বিজ্ঞান-গবেষণায় তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি বিজ্ঞান কলেজে মৌলিক গবেষণার জন্যে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন এবং তরুণ বিজ্ঞানীদের নিজস্ব ধ্যানধারণার মত স্বাধীন অথচ নিরলসভাবে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলাদেশে সর্ব-ক্ষেত্রে যে জাগরণের জোয়ার এসেছিল, সব দিক থেকে দেশকে মহৎ ও শক্তিশালী করবার যে বাসনা সকলের মনে তীব্র হয়ে উঠেছিল, সেই জাগরণ সেই বাসনা তরুণ বাঙালী বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান-গবেষণার প্রগতির জন্যেও প্রেরণা জুগিয়েছিল। তারই ফলস্বরূপ আমরা দেখি, বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন তাঁর নামে সুপরিচিত 'রামন বিকিরণ' আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তড়িৎ রসায়নে 'ঘোষ তত্ত্ব' প্রকাশ করেন এবং মেঘনাদ সাহা জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে 'তাপ আয়নন সূত্র' উদ্ভাবন করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। বিজ্ঞান কলেজেই সত্যেন বোস, শিশির মিত্র, গণেশপ্রসাদ, নিখিলরঞ্জন সেন, নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়দারঞ্জন রায়, পুলিনবিহারী সরকার, যোগেশচন্দ্র বধ ন, বীরেশচন্দ্র গুহ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেন। এই বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হবার কুড়ি বছরের মধ্যেই এই সব তরুণ বিজ্ঞানীরা এই কলেজেই বা পরে নিজের নিজের কর্মস্থলে গবেষণা করে বিজ্ঞানকে যেসব অবদানে সমৃদ্ধ করেন, তা পৃথিবীর যে কোনও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব অনুভব করবার মত। ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণার ইতিহাসে এই বিজ্ঞান কলেজের অবদান সমধিক। পরবর্তীকালে ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখের গবেষণাও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। সাম্প্রতিক কালে জৈব রসায়নে অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা এবং ভৌত রসায়নে সাধন বসুর গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের পার্শ্বে অবস্থিত এবং প্রায় সমসাময়িক কালে স্থাপিত বসু-বিজ্ঞান মন্দির বাংলাদেশে বিজ্ঞান-গবেষণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ১৯১৭ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্র এই বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিজ্ঞান মন্দিরের কারুশালাতেই জড় ও জীবের সাড়া সংক্রান্ত পরীক্ষার যন্ত্রাদি তিনি এদেশীয় কারিগরদের দিয়ে তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে এখানকার গবেষণা পদার্থ-বিজ্ঞান, ও জীব পদার্থ-বিজ্ঞান; জৈব, ভৌত ও প্রাণ রসায়ন, বিশুদ্ধ ও ফলিত উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ও প্রাণী শারীরতত্ত্বের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে। এদেশে মহাজাগতিক রশ্মি (কস্‌মিক-রে) সংক্রান্ত গবেষণায় বসু-বিজ্ঞান মন্দিরকে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। ফটোগ্রাফিক অবদ্রবের সাহায্যে মহাজাগতিক রশ্মি-কণিকার তরঙ্গ পরিমাপের যে নতুন পদ্ধতি এখানে উদ্ভাবিত হয়, তা বিজ্ঞানীমহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই পদ্ধতির ভিত্তিতে অধ্যাপক পাওয়েল পাই-মেসনের আবিষ্কার সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে পরবর্তী কালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রসায়ন, জীব-রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, আণুবীক্ষণিক জীববিজ্ঞান এবং প্রাণী শারীরতত্ত্বের ক্ষেত্রেও এখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান ঘোষ ও সত্যেন বোসকে ঘিরে একদল তরুণ বিজ্ঞানী গবেষণা শুরু করেন। অধ্যাপক বোস ঢাকায় থাকা কালে (১৯২৪) তাঁর সুবিখ্যাত 'বোস সংখ্যায়ন' গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

প্রায় ১৯৩০ সালে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ স্থানীয় বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় কলকাতার কাছাকাছি বরানগরে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিট্যুট প্রতিষ্ঠা করেন। শুধু ভারতে নয়, সমগ্র এশিয়ায় এই ধরণের প্রতিষ্ঠান বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। জনসংখ্যা, খাদ্যশস্য উৎপাদন, জীবনযাত্রার মান, শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন, কর্মবিনিয়োগ ইত্যাদি সামাজিক ও অর্থনীতিক বিষয়ে এই গবেষণাগারের জাতীয় নিদর্শন সমীক্ষা (ন্যাশন্যাল স্যাম্পেল সার্ভে) ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানকার রাজচন্দ্র বসু, সি. আর. রাও প্রমুখ সংখ্যায়ন-বিজ্ঞানীদের মৌলিক গবেষণা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

বাংলাদেশের ঐতিহ্যমণ্ডিত আর একটি

গবেষণাকেন্দ্র হচ্ছে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স। এখানকার গবেষণাগারে কাজ করে অধ্যাপক সি. ভি. রামন তাঁর 'রামন বিকিরণ' সংক্রান্ত অশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত হন। রামনের সময় থেকে এটি একটি বিশিষ্ট গবেষণাকেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করে। এখানে অধ্যাপক কে. এস. কৃষ্ণান কেলাসের চুম্বকত্ব বিষয়ে গবেষণা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহার প্রভাবে সরকারের অর্থানুকূল্য পেয়ে এটি বর্তমানে যাদবপুরে একটি বৃহত্তর গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশে চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর ভূমিকা অনন্য। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ, পরজীবীতত্ত্ব এবং ভেষজ উদ্ভিদের গবেষণাকেন্দ্র হিসাবে এটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করেছে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয়, কলেরা, চর্ম ও কুষ্ঠরোগ, রক্ততত্ত্ব এবং পরজীবী সম্পর্কে এখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে এবং এখনও হয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার বাংলা দেশের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণা-কেন্দ্র। এই বিজ্ঞান-কেন্দ্রের গবেষণা কাচ ও মৃৎবিজ্ঞান এবং তার প্রযুক্তিবিদ্যার মৌলিক বিষয়-সমূহের মধ্যে সীমিত। সাম্প্রতিক কালে এই গবেষণাগারে যে ফোম গ্লাস, ফায়ার ব্রিকস্ ও অপটিক্যাল গ্লাস উদ্ভাবন করা হয়েছে, তা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদ-নদীর সমস্যা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা কতখানি, তা সহজেই অনুমেয়। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ সালে মেঘনাদ সাহা ও সতীশচন্দ্র মজুমদারের উদ্যোগে নদীবিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপিত হয়। বর্তমানে এর প্রধান কেন্দ্র কলকাতার উপকণ্ঠে হরিণঘাটায় অবস্থিত। দামোদর ও অন্যান্য নদ-নদীর বন্যা-রোধে এই গবেষণাগার যে সকল প্রকল্প রচনা করেছে, তা ক্রমান্বয়ে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে পশ্চিম-বঙ্গের মানুষের জীবনে আশীর্বাদরূপে দেখা দিয়েছে।

এই সকল গবেষণাগার ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আরও বহু গবেষণা-কেন্দ্র আছে, যেখানে বিজ্ঞানের নানা শাখায় গবেষণা হয়ে থাকে। কিন্তু এই স্বল্পপরিসর নিবন্ধে যে সবের সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। আলিপুর আবহতত্ত্ব বীক্ষণাগার, আলিপুর টেষ্ট হাউস, অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিট্যুট অফ হাইজিন অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ; ভারতীয় নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সাহা ইনষ্টিট্যুট অফ নিউক্লিয়র ফিজিক্স, ইনষ্টিট্যুট অফ রেডিওফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ, শেঠ সুখলাল করনানী হাসপাতাল, কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগার, কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ ফরেনসিক সায়েন্স লেবরেটরী, চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিট্যুট ফর বায়োকেমিষ্ট্রি অ্যাণ্ড এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন, পাট গবেষণা-কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বিবিধ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়ে থাকে। এছাড়া কলকাতায় অবস্থিত কয়েকটি বিশিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানও তাঁদের নিজস্ব গবেষণাগারে শিল্প সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা পরিচালন করে থাকেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর—১৯৬৬

১৯শ বর্ষ ঃ ১০ম সংখ্যা
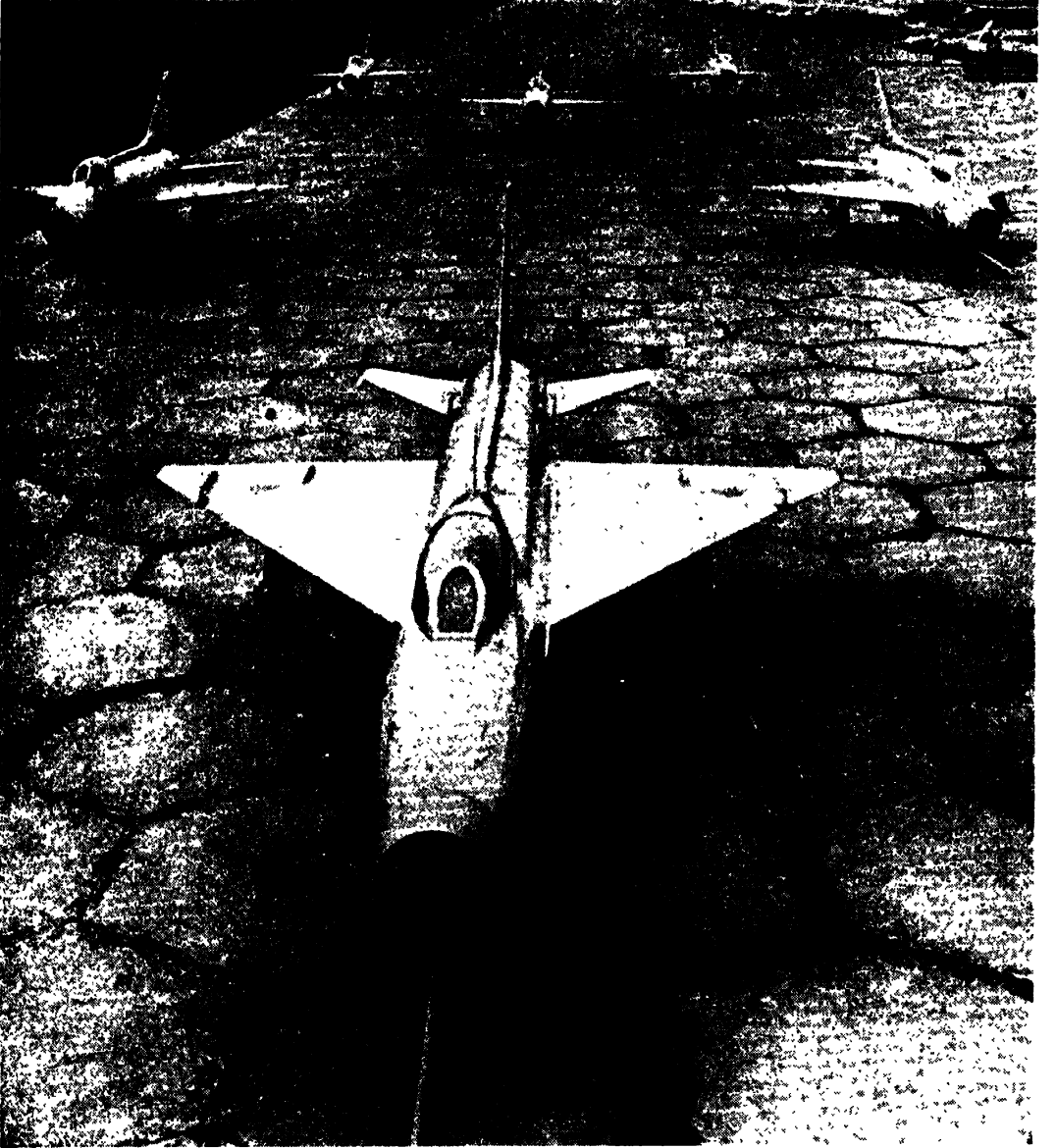
রানওয়েতে সোভিয়েট ফাইটার ও বম্বার

করে দেখ

সহজ ব্যবস্থায় টেলিফোন

তোমরা যদি এক ঘর থেকে আর এক ঘরে অথবা কাছাকাছি এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ীতে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে চাও, তাহলে সহজ উপায়ে একরকম টেলিফোন তৈরি করে নিতে পার।

এরকমের টেলিফোন তৈরি করতে হলে কয়েকটি জিনিষ যোগাড় করে নিতে হবে; যথা—খালি একটা সিগারেটের বাক্স, দাড়ি কামাবার দুখানা ব্লেড, দুটি ড্রাই সেল (টর্চের ব্যাটারী), প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা একটা উড পেন্সিল এবং কানে দিয়ে
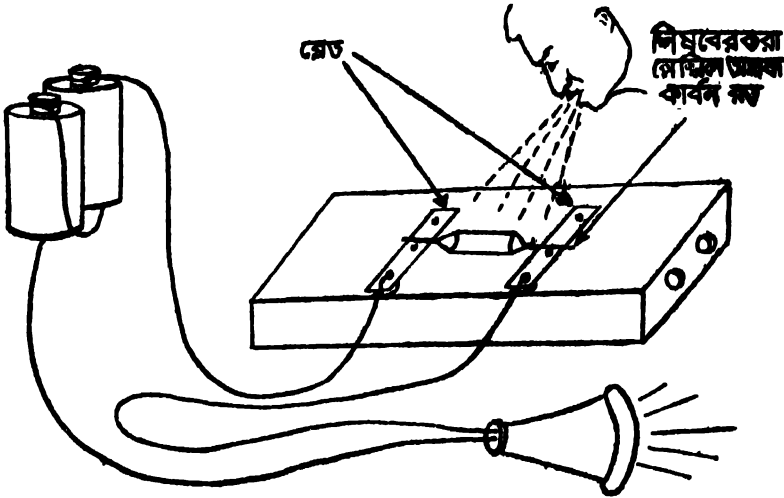
শোনবার জন্যে একটা ফোন। পুরনো বাতিল মালের দোকান থেকে একরকম একটা ফোন অনায়াসেই সংগ্রহ করতে পারবে। এছাড়া দরকার হবে প্রয়োজনমত কয়েক গজ ইলেক্‌ট্রিকের সরু তার।

জিনিষগুলি যোগাড় করবার পর বাক্সটার উপরের দিকে ছুরি দিয়ে প্রায় দেড় ইঞ্চি তফাতে সমান্তরালভাবে ব্লেডের লম্বা দিকের সমান দুটি জায়গায় চিরে দাও।

এই চেরা ফাঁকের মধ্যে ব্লেড দুখানা বেশ চেপে বসাতে হবে। চেরার মধ্যে ব্লেড দুখানা শক্তভাবে এঁটে না থাকলে সিলিং ওয়াক্স গরম করে চেরার ফাঁকে লাগিয়ে দাও। তারপর ব্লেড দুখানা গরম করে ঐ সিলিং ওয়াক্সের ভিতর দিয়ে চেপে বসিয়ে দিলেই শক্ত হয়ে এঁটে যাবে। তার দিয়ে ড্রাই সেল দুটাকে সিরিজে যোগ করে দাও। এবার ড্রাই সেল-এর একপ্রান্ত থেকে একটি তার নিয়ে একখানা ব্লেডের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বেশ শক্ত করে জুড়ে দাও। অপর ব্লেডখানার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আর একটি লম্বা তারের একপ্রান্ত জুড়ে দিয়ে অপর প্রান্তটাকে ফোনের একটি পয়েণ্টের সঙ্গে যোগ কর। ড্রাই সেল-এর আর একপ্রান্ত থেকে লম্বা তার নিয়ে ফোনের অপর পয়েণ্টের সঙ্গে যোগ করে দাও। উড পেন্সিলটার দু-দিক কেটে দু-দিকেই বেশ লম্বা শিষ বের কর। এবার পেন্সিলের দু-দিকে বের করা শিষ ব্লেডের উপর বসিয়ে দাও (পেন্সিলের পরিবর্তে সরু একটা কার্বন রড বসিয়ে দিলেও চলতে পারে)। এখন ফোনটাকে কানের উপর চেপে ধরে পেন্সিলটাকে একটু উঁচু-নীচু বা এদিক-ওদিক সরিয়ে নিলেই নানা রকম আওয়াজ শুনতে পাবে। বাক্সটার উপর একটা পকেট ঘড়ি রাখলে বেশ জোরে টিক্ টিক্ শব্দ শুনতে পাবে। বাক্সটার কাছে কথা বললে, বাক্সটাকে ঘষলে বা টেবিলটাকে নাড়লে ফোনে তার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাবে। এর কারণ হচ্ছে—বাক্সটার কাছে কথা বললে বাতাসে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেটা বাক্সটাকে কাঁপিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্লেডের উপর স্থাপিত পেন্সিল বা কার্বন রড্‌টাও তদনুযায়ী কাঁপতে থাকে। ফলে ড্রাই সেল থেকে যে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়, তার মধ্যেও একটা ওঠা-নামা চলে। এই তড়িৎ-স্রোত ফোনের ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটের মধ্য দিয়ে চলবার সময় ফোনের ভিতরের ডায়াফ্রামটাকে (পর্দা) অনুরূপভাবে কাঁপিয়ে শব্দ উৎপন্ন করে।

—গ—

চাঁদে প্রথম মানুষ

এই শতাব্দীর সুরুতে বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও ঔপন্যাসিক এইচ. জি. ওয়েলস্ "চাঁদে প্রথম মানুষ" নাম দিয়ে একটি বড় গল্প লেখেন, যেটির আবার সম্প্রতি ফিল্মও তোলা হয়েছে। ১৯০২ সালে এই গল্প ফাঁদবার কালে মানুষ বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে মহাকাশে যাওয়া দূরের কথা, এমন কি এরোপ্লেনের আবিষ্কার করে আকাশে ভালো করে উড়তেও শেখে নি। ওয়েলস সাহেব কল্পনা করেছিলেন এমন একটি পদার্থের (অনেকগুলি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে তৈরি) যার ভিতর দিয়ে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব কোন কাজ করতে পারবে না; সাধারণ আলো যেমন লোহার পাত ভেদ করে যেতে পারে না, সেই রকম আর কি। এই পদার্থের দ্বারা নির্মিত একটি বাসোপযোগী গোলক (যেন একটি ছোটখাটো ব্যোমযান) তৈরি করে বৈজ্ঞানিক ক্যাভর ও তাঁর বন্ধু শেষ অবধি চাঁদে পৌঁছলো।

অবশ্যই এক রকমের কোন পদার্থ মানুষের বিজ্ঞান আজও আবিষ্কার করতে পারে নি; আর পারলেও মাধ্যাকর্ষণ-শূন্য সেই গোলকের মধ্যে প্রবেশ করতে যে শক্তির খরচ হতো, সেটা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবমুক্ত হয়ে গ্রহান্তরে পৌঁছানোর সমান। অর্থাৎ হরেদরে সেই হাঁটু জল। ওয়েলস সাহেবের কিন্তু এই গল্পের মাধ্যমে কোনো বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা উপস্থিত করা উদ্দেশ্য ছিল না। পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও শ্লেষই ছিল তাঁর "চাঁদে প্রথম মানুষ" গল্পের প্রধান উপজীব্য।

ওয়েলস সাহেবের ঐ গল্প লেখবার পর মাত্র ষাট বছর পেরোবার আগেই মানুষ যেমন আকাশে উড়াকে একেবারে আয়ত্ত করেছে, তেমনি চাঁদে মানুষ পাঠাবার পরিকল্পনাও আজ তার প্রস্তুত এবং সেই পরিকল্পনা মাফিক কাজও অনেক দূর এগিয়েছে। আমরা এখানে চাঁদে পাড়ি জমাতে মূল যে সমস্যাগুলি দেখা দেবে এবং তাদের কিভাবে সমাধান হবে—সেটাই এখানে আলোচনা করবো।

* * *

পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব গড়পড়তা হিসাবে হলো ২,৪০,০০০ মাইল। চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় চার ভাগের এক ভাগ, মাত্র ২,১৬০ মাইল।

চাঁদ মোটেই স্থির বস্তু নয়, ঘণ্টায় ৩,৬০০ মাইল বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে, পৃথিবীও স্থির নয়—ঘণ্টায় ৬৬,০০০ মাইল বেগে সূর্য প্রদক্ষিণরত।

তাহলে পৃথিবী থেকে চাঁদকে রকেট বা ব্যোমযান দিয়ে আঘাত করতে হলে

অবস্থা দাঁড়াবে যেন একটি দ্রুতবেগে ধাবমান মোটর গাড়ীর উপর বসে শিকারী একটি উড়ন্ত পাখীকে গুলি করবার চেষ্টা করছেন। মহাভারতে আছে, উপরে টাঙ্গানো মাছের চোখের প্রতিবিম্ব তলাতে জলের থালাতে দেখে অর্জুনকে সেই জলের থালার দিকে চোখ রেখে মাছের চোখকে লক্ষ্যভেদ করতে হয়েছিল। আধুনিক যুগের রাশিয়ান ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা যথাক্রমে প্রথম ১৯৫৯, তারপর ১৯৬৩-৬৪-তে উড়ন্ত চাঁদের লক্ষ্যভেদ করলেন চলন্ত পৃথিবী থেকে স্বয়ংক্রিয় রকেটের সাহায্যে।

সামান্য অঙ্কের হিসাবে বোঝা যায় যে, চন্দ্রগামী রকেটটি তার পূর্ব-নির্ধারিত গতিমুখ থেকে মাত্র অর্ধডিগ্রির বেশী বিচ্যুত হলে আর চাঁদে আঘাত করা সম্ভব হতো না। স্বয়ংক্রিয় রকেটের দ্বারা যখন চাঁদকে আঘাত করা গেছে, তখন চাঁদে পৌঁছানোর মূল সমস্যার নিশ্চয়ই সমাধান হয়েছে।

* * *

চাঁদের ভর পৃথিবীর তুলনায় একাশী ভাগের এক ভাগ; নিউটনের আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে দুটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে থাকে তাদের নিজস্ব ভরের বর্গমূলের অনুপাতে। তাহলে ৮১-র বর্গমূল ৯, অর্থাৎ পৃথিবী ও চাঁদের ২,৪০,০০০ মাইল দূরত্বকে ১০ ভাগ করে পৃথিবীর দিকের ৯ ভাগ (২,১৬,০০০ মাইল) থাকবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আধিপত্যে, আর শেষ ১ ভাগ (২৪,০০০ মাইল) থাকবে চাঁদের।

পৃথিবী থেকে চন্দ্রগামী ব্যোমযান যাত্রা সুরু করে যখন প্রথম ২,১৬,০০০, মাইল অতিক্রম করছে তখন প্রতিমুহূর্তেই তাকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছে এবং তার গতিবেগ তখন ক্রমশঃই কমছে। এ যেন উঁচু পাহাড়ী পথের চড়াইতে আরোহণ। এইভাবে চড়াই পথে আরোহণ করতে করতে তার গতিবেগ ক্রমশঃ কমতে থাকলেও যদি গোড়াতেই ব্যোমযানকে যথেষ্ট পরিমাণের গতিবেগ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে শেষ অবধি ব্যোমযানটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে পড়বে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে ২,১৬,০০০ মাইল দূরে গিয়ে পড়বে।

ঘণ্টায় মোটামুটি ২৫,০০০ মাইল গতিবেগ নিয়ে যাত্রা করলে ব্যোমযানটি পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে পড়তে পারবে। এর চেয়ে কম হলে (ঘণ্টায় ২৪,৯০০ মাইল হলেও) ভয় আছে যে, পাহাড়ের শীর্ষদেশ অবধি ছুঁই ছুঁই করেও শেষ অবধি গতিবেগে সামান্য ঘাট্‌তি পড়াতে আবার হড়কে নেমে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল গতিবেগে যে কোন বস্তুকে ছুঁড়ে দিলে সে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে বরাবরের মত মুক্ত হয়ে যাবে।

একটা কথা বলে রাখা ভালো—পৃথিবী থেকে ২,১৬,০০০ মাইল দূরে যে পয়েণ্টে

পৃথিবী ও চাঁদের পারস্পরিক টান নাকচ হয়ে যাচ্ছে বলে যাকে আমরা ঢালু পাহাড়ী পথের শীর্ষদেশ বলছি, সেই পয়েন্ট বা শীর্ষদেশটির কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই স্থান পরিবর্তন হচ্ছে—কখনও কিছুটা পৃথিবীর দিকে, কখনও বা চাঁদের। কারণ পৃথিবী ও চাঁদের স্থান পরিবর্তন হচ্ছে প্রতিনিয়ত—কেবলমাত্র গড়পড়তা হিসাবেই পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব দাঁড়ায় ২,৪০,০০০ মাইল। কাজেই সামান্য কিছু বাড়তি গতিবেগ হাতে নিয়ে, অর্থাৎ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে একেবারে মুক্ত হবার গতিবেগ (ঘণ্টায় ২৫,০০০ মাইল—এস্কেপ ভেলসিটি) নিয়ে যাত্রা করাই ভাল।
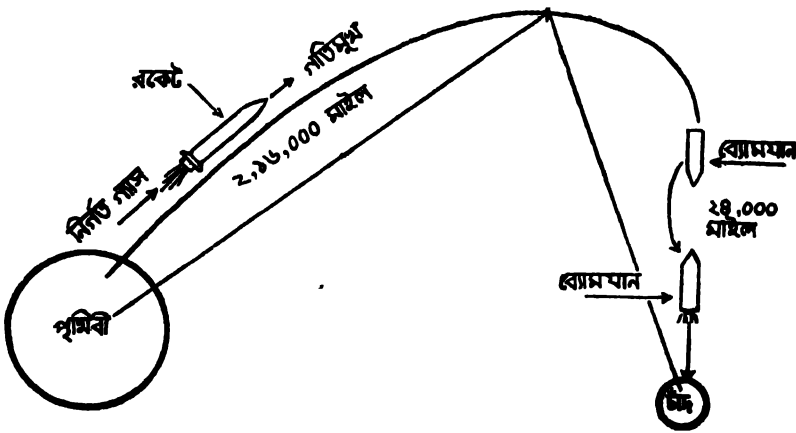
উৎরাই পথে অবতরণ

ব্যোমযানটি ২,১৬,০০০ মাইল পথ আরোহণ করে পাহাড়ের শীর্ষদেশ (বা নিউট্রাল পয়েন্ট, যেখানে পৃথিবী ও চাঁদের পারস্পরিক টানাটানি নাকচ হয়ে যাচ্ছে) অতিক্রম করে এবারে চাঁদের দিকে শেষ ২৪,০০০ মাইল অবতরণ করতে লাগলো। এবার নিশ্চয়ই ব্যোমযানের গতিবেগ ক্রমশঃই বাড়ছে।

ধরা যাক, শীর্ষদেশ অতিক্রম করবার সময় ব্যোমযানের গতিবেগ ছিল প্রায় শূন্য। তারপর চাঁদের জমির দিকে অবতরণ করতে করতে তার গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে চাঁদের জমি ছোঁবার মুহূর্তে তার গতিবেগ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঘণ্টায় ৫,২৫০ মাইল। আর শীর্ষদেশ পার হবার সময় যদি কিছু বাড়তি গতিবেগ হাতে থাকে, সেটাও এর সঙ্গে যোগ হবে। এই ভাবেই ১৯৫৯ সালে দ্বিতীয় লুনিক, পরে আরও কয়েকটি ব্যোমযান চাঁদের বুকে ঘণ্টায় ৬,০০০ মাইলের কিছু বেশী গতিবেগ নিয়ে আছড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়েছিল।

চাঁদে মানুষ পাঠাতে হলে তাহলে এই ৫,২৫০ মাইল বা তার কিছু বেশী গতিবেগকে একেবারে নাকচ করে দিতে হবে।

ধীরে অবতরণ

কী করে করা যাবে? চাঁদের দিকে অবতরণের একটা বিশেষ নির্দিষ্ট মুহূর্তে ব্যোমযানের মুখকে একেবারে ১৮০° ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেওয়া হলো। অর্থাৎ তার মুখটা ঘুরে সে লেজের দিকে যেন পেছু হেঁটে অবতরণ করতে লাগলো। এটা করতে রকেটের দু-ধারে ছোট গ্যাস নির্গত করবার জেট বসানো আছে—যার একদিকের ধাক্কায় রকেটটা উল্টো দিকে যেন পাশ ফিরবে। অবশ্য জাড্যের নিয়মানুসারে একবার পাশ ফিরে ঘুরতে আরম্ভ করলে সে ঘুরেই চলবে। সেটাকে বন্ধ করে রকেটটাকে আবার স্থির করে তার মুখকে লেজের দিকে আনতে (১৮০° ডিগ্রি পাশ ফেরা) রকেটের অভ্যন্তরে তিনটি তলে তিনটি ঘূর্ণমান চাকা বা জাইরোস্কোপ বসানো আছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে তার পাশ ফেরাকে আবার স্থির করা যেতে পারে।

এবারে রকেট ইঞ্জিনগুলিকে আবার চালিয়ে দিয়ে নির্গত গ্যাসের ধাক্কা চাঁদের জমির দিকে থাকাতে ব্যোমযানের চাঁদের জমি ছেড়ে পালিয়ে যাবার ঝোঁক দেখা যাবে। এর নাম দেওয়া হয়েছে বিপরীতমুখী রকেট বা রেট্রোরকেট।

তাহলে এবারে চাঁদ টেনে ব্যোমযানকে চাঁদের জমির দিকে নামাচ্ছে, আর ব্যোমযানটি বিপরীতমুখী রকেটের ক্রিয়াতে উল্টো দিকে (অর্থাৎ চাঁদের জমির উল্টো দিকে) পালাবার চেষ্টা করছে।

এই টানাপোড়েনে সমগ্র ব্যোমযানটি আস্তে আস্তে একেবারে যেন হাল্কা পালকের মতো চাঁদের জমিতে নেমে পড়বে।

রাশিয়ার নবম লুনিক ও আমেরিকার সার্ভেয়ার ব্যোমযান এইভাবেই চাঁদের জমিতে নিরাপদে অবতরণ করেছে।

চোরাবালি

চাঁদের কোন বায়ুমণ্ডল নেই। অতএব বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, মহাকাশে পৃথিবী-চাঁদের অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে সমস্ত উল্কাপিণ্ড, তারা সরাসরি চাঁদের জমি অবধি নেমে এসে ভেঙ্গে ছাই হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু নেই বলে সে ছাই উড়িয়ে নিয়ে যাবারও কোন ব্যবস্থা নেই। অতএব উল্কাপিণ্ডের ছাই চাঁদের জমিতে যুগ যুগ জমে হয়তো উঁচু চোরাবালির পাহাড় জমে আছে, যাতে ব্যোমযান অবতরণ করে একেবারে তলিয়ে যাবে।

নবম লুনিক ও সার্ভেয়ার ব্যোমযান মারফৎ যা খবর পাওয়া গেছে, তাতে আমরা এখন বেশ নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি যে, চাঁদের বুকে ব্যোমযানের নিরাপদে অবতরণের শক্ত জমি পাওয়া যাবে।

চাঁদ সম্পর্কে এই রকমের আরও অনেক তথ্য আগে থেকে সংগ্রহ করে তারপর আমরা চাঁদে সশরীরে হাজির হবো। সেটা ঘটবে আর কয়েক বছরের মধ্যেই—এটা আমরা আজ জোর করেই বলতে পারি।

দিলীপ বসু

হাওয়া বদলের খবর

বায়ুমণ্ডলরূপী এক বিরাট অদৃশ্য সমুদ্রের তলায় আমরা বাস করি। এ সমুদ্র আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। মৃদুমন্দ বাতাসের দোলা শুধু জানিয়ে দেয় আমাদের চারপাশেই এর রাজত্ব চলছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এ সাগর চঞ্চল হয়ে ওঠে, উদ্দাম ঝড়ো হাওয়ার পাখায় ভর দিয়ে আকাশ কালো করে উড়ে আসে মেঘের দল, ঝড়বৃষ্টির মাতনে চারদিক ভরে ওঠে। পৃথিবীর সাগরগুলির ধার ঘেঁষে যাদের বসতবাড়ী, ঝড়ের দৌরাত্ম্যের ঝক্কিটা তাদের পোহাতে হয় আরো অনেক বেশী।

এমনিতে হয়তো আকাশের সঙ্গে তোমাদের মুখ দেখাদেখির পালা নেই। কিন্তু ফুটবলের মরশুম এলে হয়! সকাল থেকে বারবার দেখা চাই আকাশের কি হালচাল। আকাশপথে যে বিমানেরা এবং সাগরে যে সব জাহাজ পাড়ি জমাচ্ছে, তাদের কাছেও এই খবরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, আজকাল আবহাওয়ার খবরটা সব কাগজেরই প্রথম পাতায় ছাপা হয়। তাতে এও বলা হয়, বৃষ্টি হবে কি হবে না, হলে সকালে হবে, না সন্ধ্যায় হবে; ঝড় উঠবে কি না। বাতাস, মেঘ, ঝড়, জল—এদের কলকাঠির নড়াচড়ার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আবহাওয়ার চেহারাটা পাল্‌টে চলে।

হাওয়া অফিস

আবহাওয়ার চেহারাটা পাল্টানোর খবর আসে হাওয়া অফিস থেকে। সেই অফিসের দুটি প্রধান যন্ত্র হচ্ছে ব্যারোমিটার আর থার্মোমিটার। প্রথমটিতে বাতাসের চাপ আর দ্বিতীয়টিতে বাতাসের তাপ মাপা হয়।

খানিকটা পারা-ভর্তি ঘরকাটা কাচের একটি লম্বা নল, পারা-ভর্তি আর একটি পাত্রে বসানো থাকে। এই হলো ব্যারোমিটার যন্ত্র। বাতাস সব সময় চারদিক থেকে চাপ সৃষ্টি করছে। সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রতি বর্গইঞ্চি ক্ষেত্রের উপর বাতাসের এই চাপের মাপ হলো সাত সেরের মত। এই চাপ বেশী হলেই ব্যারামিটারে পাত্রের পারার উপর চাপ পড়বে ও তার ফলে নলের পারার মাত্রা উপরের দিকে উঠবে। চাপ কমলেই পারার মাত্রা নীচের দিকে নেমে আসবে। পারার এই ওঠা-নামা থেকে আমরা কি বুঝব? সূর্যের তাপে কোথাও বাতাস গরম হলে হাল্কা হয়ে তা উপরে উঠে যায়। ফলে, সেখানে বাতাসের চাপ কমে আর তখন অন্য জায়গা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এসে সেই জায়গা দখল করে। পথে ঝড়ো মেঘের সঙ্গে দেখা হলে সেই মেঘকেও সে টেনে আনে। কাজেই ব্যারোমিটারে পারার মাত্রা উঠলেই যত ভয়।

থার্মোমিটারে যদি দেখা যায়, বাতাসের তাপমাত্রা বেড়েছে, তাহলেও বুঝতে হবে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আর্দ্রতা, মেঘের ঘনত্ব ও জলধারণের ক্ষমতা, বাতাসের গতি এবং কোন্ দিক থেকে তা বইছে—এ সব মাপবার জন্যেও হাওয়া অফিসে আলাদা যন্ত্র রয়েছে। অনেক সময় উপর আকাশের খবর নেবার জন্যে ভিতরে যন্ত্রপাতি ভরে গ্যাস-ভর্তি বেলুন ওড়ানো হয়।

এভাবে নানা যন্ত্রপাতির কাছ থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আবহাওয়াবিদেরা আন্দাজ করেন আগামী দু-একদিনের মধ্যে আবহাওয়ার অবস্থা কি দাঁড়াবে।

আবহাওয়ার কলকাঠি

আবহাওয়ার কলকাঠির মালিক হলেন সূর্য। সূর্য থেকে যে বিকিরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে প্রবেশ করে, তারা হলো ছোট মাপের (তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের) তরঙ্গ। পৃথিবীর জমিতে বাধা পেয়ে এরা বড় মাপের তাপীয় তরঙ্গে রূপ পাল্টে বসে। বায়ুমণ্ডল থেকে বেরিয়ে যাবার ছাড়পত্র এদের কপালে আর জোটে না, এরা বন্দী হয়ে পড়ে। এই তাপশক্তি যেমন প্রাণধারণের পক্ষে প্রয়োজন, তেমনি আবহাওয়ার পরিবর্তনের মূলেও এর ভূমিকাটি সবচেয়ে বড়।

সূর্যের তাপে দিনের বেলায় জল যত না গরম হয়, তার চেয়ে বেশী গরম হয় মাটি। মাটির উপরকার বাতাস গরম আর হাল্কা হয়ে উপরে উঠে যায়। সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তার জায়গা দখল করে। রাত্রে হয় উল্টো ব্যাপার। জলের চেয়ে মাটি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় বলে হাওয়া মাটি থেকে সমুদ্রের দিকে বইতে থাকে। এভাবে পৃথিবীর নানা জায়গায় বিভিন্ন ধরণের বায়ুস্রোতের সৃষ্টি হচ্ছে।

সারা পৃথিবী জুড়ে বায়ুস্রোতগুলিকে চালু রাখবার জন্যে কি বিপুল পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয়, তার পরিমাণের একটা হিসেব শুনলে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। প্রতিদিন প্রায় দশ লক্ষ করে বেশ বড় আকারের পারমাণবিক বোমা যদি ফাটানো যায়, তাহলে ঐ শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেবার মত একটা শক্তি তোমার হাতে এল। আবার মনে কর, কলকাতার আকাশে কালবৈশাখীর দিনে এক বিরাট ঝড়ের মাতন চলছে। গোটা ছয়েক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের শক্তি রয়েছে ঐ ঝড়ের মুঠোর মধ্যে। গড়পড়তা হিসেবে পৃথিবীতে প্রতিদিন নাকি এই মাপের পঞ্চাশ হাজার করে ঝড় ঘটছে। একবার ভেবে দেখ ব্যাপারটা। আর বায়ুমণ্ডলে এই সব শক্তির উৎস হলেন সূর্যদেব।

সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে জমে মেঘ হয়। মেঘ আছে নানা জাতের। সব মেঘেই কিন্তু বৃষ্টি হয় না। মেঘগুলিকে যদি কেউ চিনে ফেলতে পারে, তাহলে মেঘ দেখেই সে বলতে পারবে, সে মেঘে বৃষ্টি হবে, কি হবে না।

সাধারণতঃ যে দুটি মেঘে বৃষ্টি হয়, তার একটির নাম আস্তর (ষ্ট্র্যাটাস), আর একটির নাম পুঞ্জ (কিউমিউলাস) আস্তর মেঘের রং হয় ধূসর বা নীলচে। দেখে

পুঞ্জমেঘ

মনে হয়, কেউ যেন এদের গায়ে লম্বা আঁশের একটি পোষাক পরিয়ে দিয়েছে। এই মেঘের দল দু-হাজার থেকে সাত হাজার ফুট উঁচু আকাশে ভেসে বেড়ায়। পুঞ্জ মেঘের রং ধূসর—কোথাও খানিকটা কালো কালো ছোপ। দেখতে গোল গোল পেঁজা তুলোর মত। এরা চার থেকে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু আকাশপথে ভেসে বেড়ায়।

অলকমেঘ

আস্তর বা পুঞ্জ মেঘে উত্তরের আকাশ ঢাকা পড়লেই বুঝবে, ঝড়-বৃষ্টির আর দেরি নেই।

আরও দু-জাতের মেঘ আছে—অলক (সিরাস) আর অলকাস্তর (সিরোষ্ট্র্যাটাস)। অলক মেঘেরা খুব হাল্কা পেঁজা তুলোর মত দেখতে—এরা আস্তানা জমায় জমির পাঁচ থেকে দশ মাইল উঁচুতে। এদেরই যে দলটা ছাড়াছাড়াভাবে ভেসে বেড়ায় তাদেরই নাম অলকাস্তর। সাধারণতঃ দক্ষিণ দিক থেকে এই দুই মেঘের দলকে ভেসে আসতে দেখা যায়। এদের দেখলেই বুঝতে হবে আবহাওয়া শান্ত হবার মুখে।

খবরটা কেন ভুল হয়

হাওয়া অফিসের সব অনুমানই যে সব সময় ঠিক হবে, এমন কোন কথা নেই। যেদিন বৃষ্টি হবে বলা হলো, সেদিন হয়তো বৃষ্টিই হলো না, শুধু শুধু আমরা ছাতা বয়ে বেড়ালাম। আর দোষ দিলাম হাওয়া অফিসকে।

আবহাওয়ার হালচাল সঠিকভাবে জানবার ব্যাপারে এখনও মুশকিলটা কোথায়, সেটাই আমাদের বুঝতে হবে।

পৃথিবীর জমির উপর বায়ুমণ্ডল মোটামুটি ২৫০ থেকে ৩০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। অবশ্য বায়ুর গ্যাসীয় উপাদানের ছিটেফোঁটার সন্ধান এর উপরেও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৯৯ ভাগ বস্তু রয়েছে তার প্রথম ৩০ মাইলের মধ্যেই। বায়ুমণ্ডল শুধু অক্সিজেন দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, তাই নয়, মহাকাশের বিভিন্ন প্রাণঘাতী রশ্মি এবং উল্কাদের সরাসরি সংঘাত থেকেও সে আমাদের রক্ষা করছে।

এই বায়ুমণ্ডলের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে যে সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে, পৃথিবীর কোন একটি জায়গা থেকে তার একটি টুক্‌রো ছবিই আমাদের চোখে পড়বে। যেমন একটি আবহাওয়া ষ্টেশন দশ বর্গ মাইল পরিমিত একটি জায়গার আবহাওয়ার তথ্য মোটামুটি সঠিকভাবে আমাদের জানাতে পারে; এরোপ্লেনের সাহায্যে পর্যবেক্ষণের এই জায়গার পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০ থেকে ১০০ বর্গ মাইলের মত। আবহাওয়া তৈরির সমগ্র অঞ্চলের তুলনায় আমাদের পরীক্ষার নাগালের মধ্যে পাওয়া জায়গাটুকু খুবই ছোট। আমাদের অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে অনেকটা গল্পের সেই অন্ধ লোকটির মত, একটি হাতীর শুধু লেজটা ধরেই যে গোটা হাতীর চেহারাটা আন্দাজ করবার চেষ্টা করেছিল। আবহাওয়াবিদ্‌দের সব সময়ে দোষ ধরাটা তাহলে ঠিক নয়, কি বল?

আবহাওয়া স্পুট্‌নিক

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় মহাকাশে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুট্‌নিক পাড়ি জমিয়েছিল। তার পর গত নয় বছরে রুশ ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা এপর্যন্ত প্রায় চারশ-র মত

স্পুটনিক মহাকাশে পাঠিয়েছেন। স্পুটনিকেরা হলো এক একটি উড়ন্ত গবেষণাগার। এদের পেটের ভিতরটা বোঝাই করে দেওয়া হয়েছে নানা ধরণের যন্ত্রপাতি দিয়ে। এই যন্ত্রপাতিদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে নতুন নতুন দিগন্তকে খুলে দিচ্ছে।

এমনি ধারার কিছু স্পুটনিক বিজ্ঞানীরা তাঁদের দূত করে পাঠিয়েছেন মহাকাশে—পৃথিবীর আবহাওয়া সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হলো এদের কাজ। পৃথিবীর জমির ৪৫০ মাইল দূর দিয়ে ঘণ্টায় প্রায় ১৮০০০ মাইল গতিবেগ নিয়ে
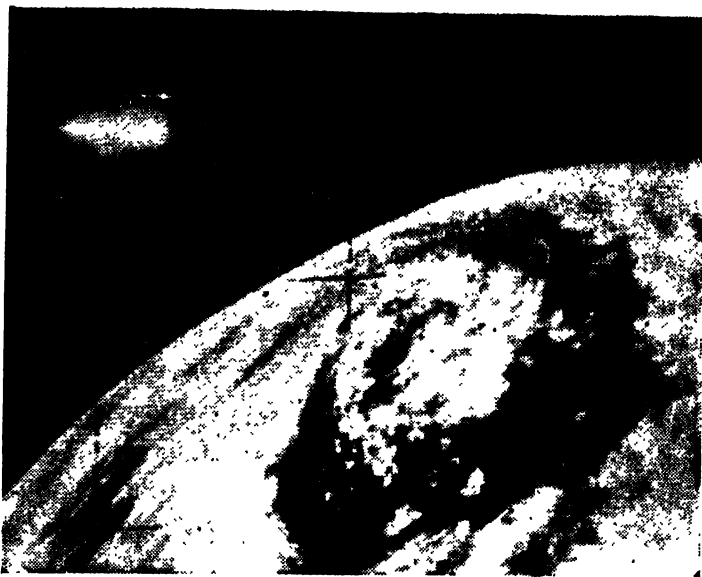
মহাকাশ থেকে আবহাওয়া স্পুটনিকের সাহায্যে তোলা পৃথিবীর এক টুকরো ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ঝড়ো মেঘেরা এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে।

এরা পাড়ি জমাচ্ছে। গোটা পৃথিবীটাকে একচক্কর ঘুরে আসতে এরা সময় নিচ্ছে মাত্র দেড় ঘণ্টা। একনজরে পৃথিবীর প্রায় ৫০০,০০০ বর্গমাইল জায়গা এদের স্বয়ংক্রিয় সন্ধানী যন্ত্রের নাগালের মধ্যে ধরা পড়ছে। যন্ত্রগুলো যে সব প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে, সেগুলো তারা সঙ্কেতের আকারে লিখে রাখছে। তারপর পৃথিবীর কোন গ্রাহক ষ্টেশনের উপর দিয়ে যাবার সময় সেই তথ্যগুলোকে বেতার-তরঙ্গে রূপ পাল্টে তার হাতে তুলে দিচ্ছে। সেখানকার বিজ্ঞানীরা সেই তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় খবরগুলো জমা করে রাখছেন।

চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীকে সতেরো বার চক্কর মারবার মধ্যে দিয়ে একটি স্পুটনিক গোটা পৃথিবীর সমগ্র অঞ্চলগুলোর উপর দিয়ে পাড়ি জমাচ্ছে। ফলে পৃথিবীর কোথায়

মেঘের দল জটলা বেঁধে ঝড়-তুফানের ষড়যন্ত্র আঁটছে, তার ছবিগুলো স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা যন্ত্রের সাহায্যে চট্‌পট্‌ তুলে ফেলতে তার একটুও দেরী হয় না। এই সব ছবির দৌলতে মেঘের গঠন, আকৃতি ও বিস্তৃতির বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ জানানোর এক নতুন পদ্ধতিই (নেফ্যান্যালিসিস) গড়ে উঠছে। প্রকৃতি আকাশে মেঘের যে আল্পনা রচনা করেন, সেগুলো আসলে হলো তার নিজেরই আবহাওয়ার একটি মানচিত্র। এদের বিন্যাসের মধ্যেও একটি চমৎকার শৃঙ্খলার সন্ধান পাওয়া যায়।

আজকাল সাগরের বুকে ঝড় দানা বাঁধবার আগেই আবহাওয়া স্পুট্‌নিক তার ছবি তুলে আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে সেই ঝড় মহাদেশের জমির উপর এসে আছড়ে পরবার আগেই সে সব অঞ্চলের লোকেরা সাবধান হবার সুযোগ পাচ্ছেন। ক্ষয়ক্ষতি আগের তুলনায় অনেক কম হচ্ছে। আরবের মরুভূমির উপর ধুলোর ঝড়ের ছবি, মধ্য এশিয়ার উপর দিয়ে পঙ্গপালের উড়ে যাবার ছবি এবং ভারতের দিকে মৌসুমী বায়ুর এগিয়ে আসবার ছবিও আবহাওয়া স্পুট্‌নিকের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি।

থুম্বা রকেট

তোমরা বোধহয় অনেকেই জান যে, ১৯৬৩ সালের ২১শে নভেম্বর ভারতের মাটি থেকে ঊর্ধ্বাকাশে প্রথম রকেট ছোঁড়া হয়েছিল। ছোঁড়বার জায়গাটি ছিল কেরালার ত্রিভান্দ্রাম শহর থেকে ১৩ মাইল দূরে আরব সাগরের ধারে, নাম হলো থুম্বা। তারপরেও বেশ কয়েকবার এই থুম্বা থেকে আবহাওয়া রকেট ছোঁড়া হয়েছে। রকেটের যন্ত্রপাতির কাজ ছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ১৯ থেকে ১২৫ মাইল, এই অঞ্চলের মধ্যে বায়ুর গতি এবং দিক নির্ণয় করা ও তার তাপমাত্রা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। থুম্বা পৃথিবীর চৌম্বক বিষুবরেখার উপর অবস্থিত হওয়ার জন্যে ঊর্ধ্বাকাশে বিদ্যুৎ-স্রোতের প্রবাহ সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করাও ছিল ঐ সব রকেটের আর একটি প্রধান কাজ।

থুম্বা একটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণাকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। সেখানে একসঙ্গে কাজ করছেন ভারতবর্ষ, সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা।

সাড়ে তিনশ' বছর আগে দূরবীন যন্ত্রের আবিষ্কার জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে যে নতুন দিগন্তকে খুলে দিয়েছিল, আবহাওয়া স্পুট্‌নিকেরা আবহ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে গ্রহণ করেছে। হিসেব করে দেখা গেছে, এরকম একটিমাত্র স্পুটনিক প্রতি ছ' ঘণ্টায় ২৫ কোটির মত তথ্যের সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। ফলে বৈজ্ঞানিক তথ্যের এক বিপুল বোঝার চাপে বিজ্ঞানীরা প্রায় হিমসিম খেতে বসেছেন।

অদূর ভবিষ্যতে আবহাওয়ার কলকাঠির ঠিকানাগুলো আমরা অনেক সঠিকভাবে এবং অনেক দিন আগেই পেতে সুরু করবো। এ এলাকাটায় প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক টেক্কা দিয়ে ওঠা যাচ্ছিল না এতদিন। কিন্তু এবারে প্রকৃতির কারিজুরীটা কমবে আর আমাদের মাতব্বরীটাও বাড়বে।

শঙ্কর চক্রবর্তী

জেনে রাখ

আবিষ্কারের কাহিনী—উড়োজাহাজ

উড়োজাহাজ বলতে বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা ও বাতাসের চেয়ে ভারী—এই উভয় রকমের উড়ন-যন্ত্রকেই বোঝায়। বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা উড়ন-যন্ত্র হলো বেলুন, ডিরিজিবল, এয়ারসিপ ইত্যাদি আর বাতাসের চেয়ে ভারী উড়ন-যন্ত্র হলো বিমান, এরোপ্লেন, উড়ন্ত কেল্লা ইত্যাদি। আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্যে মানুষ প্রথম থেকেই বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে আসছিল। কিন্তু গ্লাইডার ছাড়া আর কিছু উদ্ভাবন করতে পারে নি। কেউ কেউ হাল্‌কা গোলকের সাহায্যে আকাশে ওঠবার কল্পনা করলেও সেটা ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব—কল্পনা মাত্র—বেলুনের সাহায্যে আকাশে ওঠবার কথা কারোরই মাথায় আসে নি। পাখীর মত ডানা মেলে গ্লাইডারের সাহায্যে আকাশে বিচরণের কথাই সবাই চিন্তা করছিলেন। কিন্তু যত উন্নত ধরণেরই হোক না কেন, গ্লাইডারে চেপে উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে পড়ে হাঁস-মুরগীর মত কিছুক্ষণ বাতাসে ভেসে থাকা যায় মাত্র—আকাশে ওড়া যায় না।

অবশেষে সত্য সত্যই আকাশে ওড়া সম্ভব হলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যোসেফ মঁগোলফিয়ে এবং এটনে মঁগোলফিয়ে নামে দু-জন ফরাসী যুবকের চেষ্টায় প্রথম বেলুন আকাশে উঠলো। এঁরা ছিলেন দুই ভাই। ছোটবেলায় খেলাচ্ছলে বড় একটা কাগজের ঠোঙার খোলা মুখটা উনুনের উপর ধরতেই ঠোঙাটা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেল। ছেড়ে দিতেই সেটা লাফিয়ে উঠে সিলিং-এ গিয়ে ঠেকলো। দুই ভাই তো ব্যাপার দেখে অবাক! তবে তো এভাবেই আকাশে ওঠা যায়!—তাঁরা ভাবতে লাগলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্যারাসুটের সাহায্যে উপর থেকে লাফানোর ব্যাপারে মনোযোগ দিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন যোসেফের নজর পড়লো একটা ঝুলনো সার্টের উপর। সার্টটা ঝুলছিল খানিকটা উপরে, উনুনের পাশেই। উনুনের গরম ধোঁয়া ঢুকে মাঝে মাঝে সেটা ফুলে ফুলে উঠছিল।

এই ব্যাপার দেখেই বেলুন তৈরির কথা তাঁদের মনে ওঠে। দুই ভাই মিলে কাগজ দিয়ে বেলুন তৈরি করে পরীক্ষা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৩ সালে কাপড় দিয়ে একটা বেশ বড় বেলুন তৈরি হলো। বেলুনের নীচে ঝোলানো একটা লোহার ঝুড়িতে খড়কুটা ভর্তি করে আগুন জ্বালিয়ে দিতেই অজস্র ধোঁয়া উঠে বেলুনের ভিতর ঢুকতে লাগলো। দেখতে দেখতে বেলুনটা ফুলে উঠে বিরাট আকৃতি ধারণ করলো। তামাসা দেখবার জন্যে বহুলোক জমায়েৎ হয়েছিল। ছেড়ে দেওয়া মাত্রই বেলুনটা সকলের চোখের সামনে শাঁ শাঁ করে উপরে উঠে মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

প্রায় সাত হাজার ফুট উপরে উঠে মিনিট কয়েক পরে প্রায় দেড় মাইল দূরে বেলুনটা আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে পড়লো।

এ খবর ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই নানা স্থানে বেলুন ওড়াবার পরীক্ষা সুরু হয়ে গেল। প্যারিস অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স বিরাট একটা বেলুন তৈরি করে তাতে হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে ভর্তি করে ছেড়ে দেওয়া মাত্রই উপরে উঠে গিয়ে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। ৪৪ মিনিট পরে সেটা ১৫ মাইল দূরে একটা মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে আর হাওয়া লেগে বিচিত্র ভঙ্গীতে এদিক-ওদিক দোল খেতে থাকে। স্থানীয় কৃষকেরা এই অদ্ভুত আকৃতির বস্তুটাকে আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখে সেটাকে দানা বা দৈত্য বলে ভেবেছিল। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তারা সমস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করে মাঠটাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না দেখে একজন সাহসী লোক এগিয়ে এসে সেটাকে গুলি করে। গুলির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে বেলুনটা চুপ্‌সে গেল। তারা তখন সেটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করে ছিঁড়ে নিয়ে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এলো।

ঐ বছরেই ফ্রান্সের রাজা ও রাণীর উপস্থিতিতে একটা ভেড়া, একটা হাঁস ও একটা মুরগীকে বেলুনে করে আকাশে পাঠানো হয়। বেলুনটা প্রায় দেড় হাজার ফুট উপরে উঠে ধীরে ধীরে নেমে আসে। এই কয়টি প্রাণীই হলো প্রথম আকাশযাত্রী। এই বেলুন থেকেই ক্রমে ক্রমে ডিরিজিবল এবং গ্রাফজেপেলিন, হিণ্ডেনবুর্গ, আর-১০১ প্রভৃতি অতিকায় এয়ারসিপগুলির আবির্ভাব ঘটেছিল।

বেলুনে চড়ে মানুষ যখন ইচ্ছামত আকাশে বিচরণ করছিল, সেই সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্লাইডার থেকে সর্বপ্রথম এরোপ্লেনের আবিষ্কার হয়। ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর—অরভিল এবং উইলবার রাইট নামে আমেরিকার অধিবাসী দুই ভাই সর্বপ্রথম এরোপ্লেনে করে আকাশে ওঠেন। কিটিহকের মাঠে সে দিন বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে ওড়া দেখবার জন্যে তাঁরা অনেককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র পাঁচজন ছাড়া আর কেউ সেখানে উপস্থিত হন নি। অরভিলকে নিয়ে প্রবল বাতাসের মধ্যেই প্লেনখানা আকাশে উঠে গেল এবং মাত্র বারো সেকেণ্ডে ৫৪০ গজ উড়ে গিয়ে ভূমিতে অবতরণ করলো। এরপর উইলবার প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করে প্রবল বাতাসের ধাক্কায় প্লেন সমেত মাটিতে পড়ে যান। এরপর ক্রমে ক্রমে তাদের ওড়বার পাল্লা অনেকখানি বাড়িয়ে ছিলেন। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এরোপ্লেনের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এর অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়। এখন শতাধিক যাত্রী নিয়ে জেট-বিমান শব্দের চেয়েও দ্রুততর গতিতে সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে যাচ্ছে। এদের রোমাঞ্চকর কাহিনী তোমরা পরে জানতে পারবে।

—গ—

শব্দের ধাঁধা

বিজ্ঞানের সঙ্গে তোমার পরিচয় কেমন, এই ধাঁধাটির উত্তর থেকে তা জানতে পারবে। নীচের ছকটিতে ৫০টি খালি ঘর আছে। প্রত্যেকটি ঘরের জন্যে ২ নম্বর। যতগুলি ঘর তুমি ঠিকভাবে ভর্তি করতে পারবে, সেই হিসেবে হবে তোমার মোট নম্বর। ৮০ বা তার বেশি হলে 'খুব ভাল', ৬০ থেকে ৭৯ পর্যন্ত 'ভাল', ৪০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত 'চলনসই', আর ৪০-এর নীচে—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। উত্তরের জন্যে ৬৯৯নং পৃষ্ঠা দেখ।

১ বি	জ্ঞা	নে	২ র	■	৩		৪	৫
৬		■	৭			■	৮	
৯		■	১০		■	১১		■
	■	১২	■	■	১৩	■	■	১৪
■	১৫			■	১৬			
■		■	■	১৭		■	■	
১৮	■	১৯			■	■	২০	
	■	২১		■	■	২২	■	
২৩				■	২৪		■	

বাঁ দিক থেকে ডান দিক

১। বর্তমান যুগ——যুগ। (৪)

৩। এই খনিজ পদার্থ থেকে অধিকাংশ অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশিত হয়। (৪)

৬। ——সংক্রান্ত ব্যাপারে কপিকলের ব্যবহার। (২)

৭। আঠারো মাসেও নয়, আমাদের প্রায় তেইশ মাসে এর এক বছর। (৩)

৮। একটা কাপড়ের যতখানি একবারে বোনা যায়। (১)

৯। ভারতে পারমাণবিক গবেষণার কেন্দ্রস্থল। (২)

১০। জাহাজের চলাচলে দূরত্বের একক হিসেবে যা ব্যবহৃত হয়, তার সংক্ষিপ্ত নাম। (২)

১১। ওজন। (২)

১৫। এই মৌলিক পদার্থটির উপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে জীবদেহ গড়ে উঠেছে। (৩)

১৬। এরা বুকে হেঁটে চলে। (৪)

১৭। ১ ফুট×২ ফুট×৩ ফুট=৬ —ফুট। (২)

১৯। এর মাধ্যমে গর্ভস্থ শিশুর রক্তে মাতার দেহ থেকে খাদ্য-রস গিয়ে মেশে। (৩)

২০। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে গ্রহদের দিকে তাকালে এইটিকেই সবথেকে সুন্দর দেখায়। (২)

২১। ——পদার্থে কি করে জীবনের লক্ষণ আনা যায়, আণবিক জীববিদ্যায় তারই অনুসন্ধান চলেছে। (-)

২৩। রসায়নাগারে দ্রবণের প্রকৃতি নির্ধারণে এর সাহায্য পাওয়া যায়। (৪)

২৪। গতি না থাকলে——। (২)

উপর থেকে নীচে

১। ইলেকট্রন কণাকে দ্রুতগতিসম্পন্ন করার যন্ত্র। (৪)

২। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তিনি হলেন অধ্যাপক——। (৩)

৪। এর মাধ্যমে বিভিন্ন শক্তি-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় বলে এক সময় বিজ্ঞানীরা মনে করতেন। (৩)

৫। ওজনের একক। (২)

১২। উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখার অংশবিশেষ। (২)

১৩। এক শ্রেণীর মৌল কণার এই নামকরণ ভারতীয় একজন বিজ্ঞানীর নামানুসারে। (৩)

১৪। মৌলিক ধাতব পদার্থ; পদার্থটি তেজস্ক্রিয়। (৬)

১৫। স্থান ও—, এই দুটি যথাযথভাবে বিধৃত হয়েছে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বে। (২)

১৭। সময়ের একক। (২)

১৮। প্রতিটি পদার্থের—হচ্ছে তার স্বকীয়তার স্বাক্ষর। (৩)

১৯। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। (৩)

২২। বিজ্ঞানীদের মতে — ক্রিয়ারই —ক্রিয়া আছে। (২)

জয়ন্ত বসু

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১ (ক) সোলার করোনা এবং সোলার প্রমিনেন্স সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।
(খ) বাব্‌ল্‌ চেম্বার কি? এ দিয়ে কি হয়?
(গ) গেগেন্‌শাইন কাকে বলে?

শচীন্দ্রনাথ মাহাতো

প্রঃ ২। (ক) ট্র্যানজিষ্টর রেডিও দিক বিশেষে আস্তে বা জোরে বাজে কেন?
(খ) আধুনিক ভারতে ট্রানজিষ্টার গবেষণাগার আছে কি?
(গ) একটি রেডিওতে সবচেয়ে বেশী কয়টি ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহৃত হতে পারে?

মনোরঞ্জন শিকদার

প্রঃ ৩। (ক) প্রেসবায়োপিয়া এবং অ্যাষ্টিগ্‌ম্যাটিজম (Presbyopia and Astigmatism) কাকে বলে? এই রোগ দুটির সৃষ্টি হয় কিরূপে? এদের প্রতিকার কি?
(খ) আলোর পোলারাইজেশন বলতে কি বোঝায়? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার সাহায্যে কি উপকার হয়?

বিকাশরঞ্জন বিশ্বাস

প্রঃ ৪। (ক) ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম কি ভাবে হলো?
(খ) কোয়াসার কি?

নীহারেন্দু দাস

উঃ ১। (ক) দৃশ্য আলোতে সূর্যকে একটা প্রকাণ্ড থালার মত দেখায়। আসলে সূর্য কিন্তু তার থেকেও অনেক বড় (১নং চিত্র)। এটি হচ্ছে সূর্যের সব থেকে ভিতরের অংশ—নাম আলোকমণ্ডল বা ফটোস্ফীয়ার, এর পৃষ্ঠদেশের উত্তাপ ৬০০০°। আলোকমণ্ডলের বাইরের অংশকে বলা হয় বিশোষণ মণ্ডল বা রিভার্সিং লেয়ার। এখানে সূর্যালোকের কিছু কিছু অংশ শোষিত হয়ে যায়। এরা ছাড়া সূর্যের আরও দুটি প্রধান অংশ আছে। আলোকমণ্ডলের উপরে প্রায় ৬০০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের নাম

বর্ণমণ্ডল বা ক্রমোস্ফীয়ার, উত্তাপ প্রায় ৩০,০০০°। এর পরের অংশকেই বলা হয় করোনা বা ছটামণ্ডল। এটা অত্যন্ত সুবিস্তীর্ণ, উত্তাপ কোন কোন অংশে ১,০০০,০০০°। করোনাও শেষ কোথায় বলা মুস্কিল। বস্তুতঃ আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী পৃথিবী পর্যন্ত করোনা বিস্তৃত। অর্থাৎ আমরা প্রকৃত পক্ষে সূর্যের মধ্যেই ডুবে আছি। করোনা প্রধানতঃ বিদ্যুৎ-কণিকাদ্বারা গঠিত। এদের ঘনত্ব বাইরের দিকে ক্রমশঃ কমে আসে। ক্রমোস্ফীয়ার এবং করোনা থেকে ক্ষীণ আলো ছাড়া অতি শক্তিশালী বেতার তরঙ্গ বিকিরিত হয়ে থাকে।
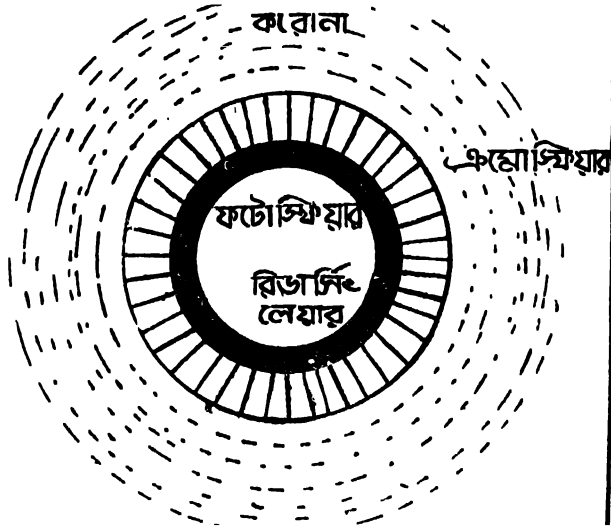
১নং চিত্র—সূর্যের বিভিন্ন স্তর

পৃথিবী থেকে খালি চোখে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আলোকমণ্ডলকে দেখলে এর ভিতরের কাণ্ডকারখানা কিছুই দেখা বা বোঝা যায় না। সূর্যের অভ্যন্তরটা কিন্তু মোটেই ওরকম শান্তশিষ্ট নয়। সেখানে সর্বদাই চলেছে প্রচণ্ড আলোড়ন। প্রায়ই সেখানে প্রলয়ঙ্কর ঝড় ওঠে। তখন দেখা যায় সূর্যের দেহের উপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে হঠাৎ আলোকিত হয়ে ওঠে। একে বলে সৌরবিক্ষোভ বা সোলার ফ্লেয়ার। আবার কখনও কখনও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লেলিহান অগ্নিশিখা সূর্যের পৃষ্ঠদেশের

উপর বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এরই নাম সোলার প্রমিনেন্স বা সৌরশিখা (২নং চিত্র)। সৌরকলঙ্কের কাছাকাছি অঞ্চলেই সাধারণতঃ এদের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

২নং চিত্র—সৌরশিখা বা সোলার প্রমিনেন্স সূর্যপৃষ্ঠের উপর সোজা উপরের দিকে উঠে যায়। এরা লম্বায় ২০,০০০ থেকে ২০০,০০০ কিঃ মিঃ এবং উচ্চতায় ২০,০০০ থেকে ৫০,০০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত হতে পারে। প্রস্থ প্রায় ৫০০০ কিঃ মিঃ হয়ে থাকে

(খ) কাচের জানালাসমন্বিত ধাতব আধার। এর মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা একটি তরল পদার্থকে অতি উত্তপ্ত অবস্থায় অর্থাৎ তার স্ফুটনাঙ্কেরও বেশী তাপমাত্রায় রাখা হয়। এ অবস্থায় যদি একটি বিদ্যুৎ-কণা এই তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে চলে যায়, তবে সে যে পথে যাবে সেই সেই স্থানের তরল পদার্থ ফুটতে আরম্ভ করবে। ফলে কণিকাটির গতিপথে বুদ্বুদের সারির সৃষ্টি হবে। এইভাবে বিদ্যুৎ-কণিকাটির গতিপথকে দৃষ্টিগোচর করা যায়। চৌম্বকক্ষেত্রের মাধ্যমে গতিপথ সাধারণতঃই বক্ররেখাকৃতি হবে এবং তার থেকে আগত কণিকাটির শক্তির পরিমাপ করা যেতে পারে। বাব্‌ল্ চেম্বার আবিষ্কারের ফলে দ্রুতগামী ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ-কণিকাদের পরীক্ষা করা অনেক সুবিধাজনক হয়েছে। তাই এর আবিষ্কর্তা আমেরিকান বিজ্ঞানী ডোনাল্ড আর্থার গ্লেজারকে ১৯৬০ সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

(গ) সূর্যের আপাত গতিপথের উপর অবস্থিত রাত্রির আকাশে সূর্যের ঠিক বিপরীত দিকে একটি ক্ষীণ আভা কখনও কখনও দেখা যায়। এরই নাম গেগেন্‌শাইন।

একে দেখতে হলে খুব ভাল দৃষ্টিশক্তি, চন্দ্রবিহীন মেঘমুক্ত পরিষ্কার অন্ধকার রাত্রি এবং গ্রাম্য পরিবেশ দরকার। উজ্জ্বল গ্রহ বা নক্ষত্র বা ছায়াপথের কাছে হলে গেগেন্‌শাইন দৃষ্টিগোচর হওয়া খুব মুস্কিল। উত্তর গোলার্ধ থেকে গেগেনশাইন সবচেয়ে ভাল দেখা যায় ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে। এর উৎপত্তি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। পৃথিবীর কক্ষ-পথের বাইরে দিয়ে সূর্যের চার দিকে প্রদক্ষিণরত উল্কাজাতীয় বস্তু কণিকার ঝাঁকের দ্বারা এর সৃষ্টি হয় বলে অনেকেই মনে করেন। প্রত্যেক কণা থেকেই সূর্যালোক বিচ্ছুরিত হয়। কয়েক কোটি কণিকার যুক্ত প্রভাবেই সম্ভবতঃ গেগেন্‌শাইনের উৎপত্তি।

উঃ ২। (ক) যে কোন রেডিও বাজবার জন্যেই এরিয়াল অপরিহার্য। সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে, বাড়ীর ছাদের উপর দুটি বাঁশের সঙ্গে বাঁধা একটি তার দিয়ে তৈরী যে এরিয়ালের সঙ্গে আমরা এতদিন পরিচিত ছিলাম, ট্র্যানজিষ্টর রেডিও আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, তার প্রয়োজন নেই। তাই অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, এই রেডিওতে বুঝি এরিয়ালের দরকারই হয় না। কিন্তু আসলে তা নয়। ট্র্যানজিষ্টর রেডিওতেও এরিয়ালের প্রয়োজন এবং তা আছেও। মিডিয়াম ওয়েভ সেটের রেডিওই দিক বিশেষে আস্তে বা জোরে বেজে থাকে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরণের এরিয়াল ব্যবহার করা হয়। মিশ্র ধাতুর তৈরী লম্বা রডের মত দেখতে—এর নাম ফেরাইট রড। এটি থাকে রেডিও সেটের ভিতরেই। এই এরিয়ালের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে—দিক সম্বন্ধে এ অত্যন্ত সচেতন। সব দিক থেকে আগত বেতার-তরঙ্গ এতে সমানভাবে সাড়া জাগাতে পারে না। যে সব তরঙ্গ ফেরাইট রডের লম্বালম্বি দিকের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আসে, তাদের ক্ষেত্রেই সাড়া সবচেয়ে বেশী। এর সঙ্গে সমকোণে আগত তরঙ্গের বেলায় সাড়া সবচেয়ে কম। অন্য যে কোন কোণে আগত তরঙ্গের ক্ষেত্রে অবস্থা এ দুই-এর মাঝামাঝি। তাই ট্র্যানজিষ্টর রেডিও দিক বিশেষে আস্তে বা জোরে বাজে।

(খ) আধুনিক ভারতে বেশ কিছু সংখ্যক গবেষণাগারে ট্র্যানজিষ্টর সংক্রান্ত গবেষণা করা হচ্ছে। এদের মধ্যে ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ভারত ইলেকট্রনিক্স (ব্যাঙ্গালোর), কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স গবেষণাগার (পিলানী) ও পারমাণবিক শক্তিসংস্থার ইলেকট্রনিক্স শাখা (ট্রম্বে) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় গবেষণাগার ইত্যাদির পদার্থবিদ্যা বিভাগেও এ বিষয়ে গবেষণা চলছে।

(গ) একটি রেডিওতে অনেকগুলি অংশ থাকে। প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সংখ্যক ট্র্যানজিষ্টার ব্যবহার করা হয়। Audio অংশে দরকার হলে ৬টি পর্যন্ত ট্র্যানজিষ্টর ব্যবহার করা যেতে পারে। I. F-এ ২টি, Mixer-এ ১টি,

Oscillator এ ১টি এবং R. F অংশে ১টি লাগানো হয়। ফলে সবচেয়ে বেশী ১১টি ট্র্যানজিষ্টর পর্যন্ত একটি রেডিওতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

উঃ ৩।.(ক) ছুটিই চোখের রোগ বিশেষ। প্রেসবায়োপিয়া বার্ধক্যজনিত দৃষ্টির অসুবিধা। আমরা যখনই কোন কাছের জিনিষ দেখি, দেখবার সুবিধার জন্যে চোখের পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতপক্ষে চোখের স্বাভাবিক লেন্সকে অধিকতর উত্তল (Convex) করা হয়। এভাবে সাধারণ অবস্থায় চোখের সামনে দশ ইঞ্চি দূরে পর্যন্ত জিনিষ দৃষ্টিগোচর হয়। এটাই হচ্ছে ন্যূনতম দৃষ্টিসীমা। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চোখের পেশীগুলি ক্রমশঃ শক্ত হতে থাকে। ফলে এক সময়ে তাদের আর সঙ্কুচিত করা যায় না। এই অবস্থায় বৃদ্ধ ব্যক্তি কাছের জিনিষ দেখতে অসুবিধা বোধ করেন। তাই দ্রষ্টব্য বস্তুকে দূরে নিয়ে গিয়ে দেখতে হয়। এই কারণেই বয়স্ক লোকদের প্রায়ই দেখা যায়—কোন কাগজ চোখের থেকে অনেকটা দূরে নিয়ে গিয়ে পড়ছেন। এরই নাম প্রেসবায়োপিয়া। যাই হোক, বেশী দূরে নিয়ে গেলে আবার স্বাভাবিক কারণেই দেখা যাবে না। প্রেসবায়োপিয়া সারাতে হলে উত্তল কাচের চশমা ব্যবহার করতে হয়।

আমাদের চোখের সামনে যা থাকে তার প্রতিচ্ছবি চোখের ভিতরে রেটিনার উপর পতিত হয়। এর ফলেই আমরা দেখতে পাই। সুস্থ চোখের ক্ষেত্রে একটা বিন্দুর প্রতিচ্ছবি রেটিনার উপর বিন্দু আকারেই পড়বে। বিন্দুটি থেকে আলোক রশ্মিকে রেটিনাতে যাবার পথে চোখের উপরিস্থিত কয়েকটি প্রতিসরণকারী স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সাধারণ চোখে এই সব বিভিন্ন স্তরের সকলেরই বক্রতা সমান থাকে। কিন্তু কোন কারণে চোখের এইসব স্তরের বক্রতা যদি অসম হয়, তবে রেটিনার উপর বিন্দুর প্রতিচ্ছবি বিন্দু না হয়ে কিছুটা ছড়িয়ে পড়বে। এজাতীয় চোখ সব কিছুই ঝাপ্‌সা দেখে। এই অবস্থাকে বলে অ্যাষ্টিগম্যাটিজম। এর প্রতিকার হচ্ছে সিলীণ্ড্রিক্যাল লেন্সের চশমা ব্যবহার করা।

(খ) একথা আমাদের জানা আছে যে, আলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রবাহিত হয় তরঙ্গের আকারে। তরঙ্গ-প্রবাহ দু-ভাবে হওয়া সম্ভব। যে মাধ্যমের ভিতর দিয়ে তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, তা তরঙ্গের গতিপথের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অথবা লম্বভাবে সঞ্চালিত হতে পারে। আলোক-তরঙ্গের ক্ষেত্রে মাধ্যম লম্বভাবে সঞ্চালিত হয়ে থাকে। এখন, সাধারণ আলোকের বেলায় গতিপথের সঙ্গে লম্বভাবে এই সঞ্চালন যে কোন দিক বরাবর অর্থাৎ যে কোন তলে হতে পারে। কিন্তু আলোককে বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে সঞ্চালনের দিক ও তল বহুমুখী থেকে একমুখী করে দেওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে আলোক-তরঙ্গের সঞ্চালন একটি বিশেষ তলে মাত্র অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রক্রিয়ার নাম আলোকের একমুখীকরণ বা পোলারাইজেশন

এবং এই জাতীয় আলোককে বলা হয় বা পোলারাইজড্ আলোক। টুরমালীন জাতীয় কৃষ্টাল বহুমুখী আলোকে একমুখী করতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের চোখ আলোকের এই বিশেষ ধর্মের প্রতি সচেতন নয়। কিন্তু মৌমাছির চোখ একমুখী ও বহুমুখী আলোকের মধ্যে তফাৎ বুঝতে পারে। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বহুমুখী আলোককে বিভিন্ন পরিমাণে একমুখী করতে পারে। এছাড়া এরা একমুখী আলোক তরঙ্গ সঞ্চালনের তলও বেঁকিয়ে বা ঘুরিয়ে দিতে পারে। ফলে এদের মধ্য দিয়ে আগত আলোক-তরঙ্গকে বিশ্লেষণ করে রাসায়নিক দ্রব্যের গুণাবলী বিচার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই পোলারিমিটার, পোলারিস্কোপ প্রভৃতি যন্ত্র নির্মিত হয়েছে। এইভাবে আলোকের এই বিশেষ ধর্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সাহায্য করছে।

উঃ ৪। (ক) আধুনিক জ্যোতির্বিদদের বিশ্বাস, ব্রহ্মাণ্ড একটা বেলুনের মত স্ফীত হচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডের স্ফীতি যদি সত্য হয়, তবে আমরা ক্রমশঃ অতীতের দিকে পিছিয়ে গেলে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাব, যখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হয়তো একটা জমাট ক্ষুদ্র পিণ্ডের অবস্থায় মাত্র ছিল, বিজ্ঞানীদের ধারণা সেই পিণ্ডাবস্থাতে কোন কারণে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে এবং তার ফলেই এই প্রসারণ সুরু হয়েছে ও ব্রহ্মাণ্ডের রূপ ক্রমশঃ বদলাচ্ছে। এই মতবাদ অনুসারে বিশ্বের জন্ম হয় বিস্ফোরণের ফলে। তাই ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্তনশীল। প্রসারণের হার থেকে হিসাব করে দেখা গেছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের এই দশা ছিল আজ থেকে দশ হাজার কোটি বছর পূর্বে।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণকে স্বীকার করে নিয়ে অপর যে মতবাদ দেওয়া হয়েছে, তা প্রথমটির ঠিক বিপরীত। এর সমর্থকরা মনে করেন যে, বিশ্বের জন্ম বলে কিছু নেই।
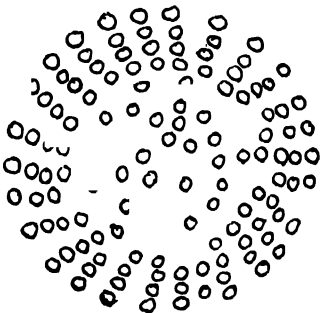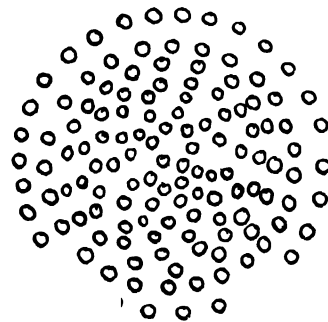
৩নং চিত্র—ব্রহ্মাণ্ডের চেহারা। (ক) পরিবর্তনশীল ব্রহ্মাণ্ড—এক্ষেত্রে দূরের ছায়াপথগুলি অপেক্ষাকৃত বেশী পরস্পরের কাছাকাছি রয়েছে। (খ) স্থিতিশীল মতবাদ অনুযায়ী অপরিবর্তনীয় ব্রহ্মাণ্ড—নিকটে ও দূরে ছায়াপথের ঘনত্ব সমান

ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব চিরকালই ছিল। সুবিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, ব্রহ্মাণ্ড অপরিবর্তনশীল বা স্থিতিশীল। প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ছায়াপথগুলি দূরে সরে যাচ্ছে বটে; কিন্তু এর ফলে সৃষ্ট শূন্যস্থানগুলিতে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ছায়াপথ গঠিত হচ্ছে। তাই সামগ্রিকভাবে বিশ্বের কোথাও পরিবর্তন হচ্ছে না। সব কিছুই যেন একই অবস্থায় থেকে যাচ্ছে (৩নং চিত্র)।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উপরিউক্ত দুটি মতবাদ যাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সেই ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ সম্বন্ধেই সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে। ব্রহ্মাণ্ড যদি স্ফীত না হয় তবে মতবাদ দুটির কোনটাই টিকবে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম কি ভাবে হলো তা এখনও সঠিকভাবে আমরা কিছুই বলতে পারি না। তবে জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে যে বিপুল উদ্যমে কাজ চলেছে, তাতে ভবিষ্যতে এ রহস্যের সমাধান হবে সন্দেহ নেই।

(খ) 'কোয়াসার' কথাটি কয়েকটি ইংরেজী শব্দের সংক্ষিপ্তকরণ--Quasi Stellar Radio Source। আমাদের থেকে বহুদূরে অবস্থিত এগুলি আকাশের গায়ে কতকগুলি রহস্যজনক জ্যোতিষ্ক। রহস্যজনক এই জন্য যে, এরা প্রকৃতপক্ষে কি—অর্থাৎ নক্ষত্র, নীহারিকা না ছায়াপথ বা অন্য কিছু—তা এখনও নির্ধারিত হয় নি। তবে এই নতুন ধরণের জ্যোতিষ্ক জ্যোতির্বিদমহলে সম্প্রতি বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। অত্যন্ত জোরালো শক্তিবিশিষ্ট বিভিন্ন তরঙ্গের বিকিরণ হচ্ছে কোয়াসারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এদের অবস্থান পৃথিবী থেকে অনেক দূরে, যেমন একটির দূরত্ব ৫৩০০ লক্ষ আলোক-বর্ষ। এরা প্রচণ্ড বেগে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একটি কোয়াসারের ক্ষেত্রে এই নিরুদ্দেশ যাত্রার বেগ আলোকের বেগের শতকরা ৮১'২ ভাগ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। এদের বেলায় দেখা গেছে—বেতার পর্যবেক্ষণের দ্বারা নির্ধারিত অবস্থানের সঙ্গে দৃশ্যবস্তুর অবস্থান নিখুঁতভাবে মিলে যায়। আলোক-দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখলে কোয়াসারকে দেখায় ছায়াপথ থেকে অনেক ছোট। কিন্তু আলোক বেতার ও অতিবেগুনী রশ্মির মাধ্যমে এগুলি থেকে যে বিপুল শক্তি বিকিরিত হয়, তা যে কোন বড় ছায়াপথ বা নীহারিকা থেকে নির্গত শক্তির ১০০ গুণ এবং সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্রের কয়েক লক্ষ গুণ বেশী। বিস্ময়ের ব্যাপার আরও আছে। কোয়াসার থেকে বিকিরিত আলোকের ঔজ্জ্বল্য কয়েক মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। এখন পর্যন্ত প্রায় ৯০টি কোয়াসারের সন্ধান পাওয়া গেছে। জ্যোতিষ্ক থেকে শক্তির বিকিরণের যে সব প্রক্রিয়ার কথা বিজ্ঞানীদের জানা আছে, তাঁর কোনটা দিয়েই এত ক্ষুদ্র আয়তনের বস্তু থেকে এত অধিক পরিমাণ শক্তি নির্গমনের ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় না। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এ-নিয়ে বর্তমানে মাথা ঘামাচ্ছেন। অদূর ভবিষ্যতেই কোয়াসারের রহস্য উন্মোচিত হবে আশা করা যাচ্ছে।

বলতে পার ?

১। একজন অভিযাত্রী যাত্রা সুরু করলেন। তিনি এক মাইল দক্ষিণে গেলেন—তারপর গেলেন এক মাইল পূর্বে। আবার এলেন এক মাইল উত্তরে। আশ্চর্য হলেন, যেখানে যাত্রা সুরু করেছিলেন, সেখানেই ফিরে এসেছেন তিনি। সেইখানে ছিল একটা ভাল্লুক, গুলি করে মারলেন। ভাল্লুকের গায়ের রং কি ছিল বলতে পার ? স্বভাবতঃই উত্তর হবে সাদা—সাদা ভাল্লুক, কেন না অভিযাত্রী যাত্রা সুরু করেছিলেন উত্তর মেরু থেকে। কিন্তু এ বাদেও পৃথিবীতে জায়গা আছে, যেখানে ঐ ভাবে চললে, যেখানে যাত্রা সুরু সেখানে ফিরে আসা যায়। বলতে পার কোথায় সে জায়গা ?

২। ধর তোমার কাছে তিনটে বাক্স আছে। একটায় আছে দুটো সাদা বল, একটায় দুটো কালো বল, আর একটায় একটা সাদা ও একটা কালো বল। বাক্সর গায়ে লেখা থাকবার কথা কার মধ্যে কি রংয়ের বল আছে। কিন্তু লিখতে গিয়ে সব গেছে উল্টেপাল্টে। কোন বাক্সর গায়েই তার ভিতরের বলের সঠিক খবর লেখা নাই। একবারে একটা বাক্স থেকে একটা মাত্র বল তুলে নিয়ে, কত বারে বলতে পারবে কোন্ বাক্সে কি রংয়ের বল আছে।

৩। তোমাকে দশ তাড়া দশ পয়সা দেওয়া হলো। প্রতি তাড়ায় দশটা করে দশ পয়সা আছে। এই দশ তাড়ার মধ্যে এক তাড়া আছে নকল দশ পয়সা। আসল দশ পয়সার ওজন তুমি জান, আর জান নকল দশ পয়সা, আসল দশ পয়সা থেকে এক গ্র্যাম হাল্কা। একটা পয়েণ্টার দেওয়া দাঁড়িতে সবচেয়ে কম কতবার ওজন করে বলতে পারবে কোন্ তাড়াটা নকল দশ পয়সার ?

৪। ছবিতে (চিত্র নং ১) দেখ ১৬টা ঘর আছে। ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত সংখ্যা সাজানো রয়েছে—একমাত্র ১৪ ও ১৫ নিজেদের জায়গা পাল্টে নিয়েছে। সংখ্যা লেখা

১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২
১৩	১৫	১৪	

১নং চিত্র

ঘরগুলিকে পাশে, উপরে বা নীচে ঘর খালি থাকলে সরানো যায়। ১৪ আর ১৫-কে কি তাদের নিজেদের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে পারবে ?

৫। পুকুরের বড় মাছ সুযোগ পেলেই ছোট মাছকে মেরে ফেলে। কিন্তু তিনটে ছোট মাছ একজোটে একটা বড় মাছের সমান হয়ে যায়। চারটে ছোট মাছ একত্রে হলে, একটা বড় মাছকে ৩ মিনিটে মেরে ফেলে। আর তার থেকে বেশী সংখ্যায় ছোট মাছ একত্র হলে, একটা বড় মাছকে আনুপাতিক কম সময়ে মেরে ফেলে (৫টা ছোট মাছ একটা বড় মাছকে মারে ২ মিঃ ২৪ সেকেণ্ডে, ৬টা ছোট মাছ ২ মিনিটে ইত্যাদি)।

চারটে বড় মাছের সঙ্গে তেরটা ছোট মাছের যুদ্ধ বাঁধলো। বলতে পার কারা জিতবে, আর কত সময়েই বা এক পক্ষ অপর পক্ষকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ?

৬। দুটো গ্লাস আছে—একটায় এক লিটার (১০০০ সি. সি.) জল, আর একটায় এক লিটার দুধ। জলের গ্লাস থেকে ১০ সিঃ সিঃ জল নিয়ে দুধের গ্লাসে দিলে। তারপর দুধের গ্লাস থেকে ১০ সিঃ সিঃ নিয়ে জলের গ্লাসে দিলে। এখন বলতে পার জলের গ্লাসে যে অনুপাতে দুধ আছে, তার থেকে কত অনুপাতে বেশী জল দুধের গ্লাসে আছে।

৭। একই সময়ে দুটো নৌকা নদীর দু-পাড় থেকে পারাপার করবার জন্যে ছাড়লো। দুটিরই গতি ত্বরণহীন, কিন্তু একটি আর একটির থেকে একটু বেগবান। তারা সবচেয়ে নিকটবর্তী পাড় থেকে ৭২০ মিটার দূরে একে অপরের পাশ দিয়ে চলে গেল। পার হয়ে যাবার দশ মিনিট বাদে আবার তারা ফেরার যাত্রা সুরু করলো। এবার অপর পাড়ের ৪০০ মিঃ দূরে তাদের দেখা হলো। নদী কত চওড়া ছিল ?

৮। একটি বৃত্তের কোয়াড্রাণ্টের মধ্যে একটি আয়তক্ষেত্র ক খ গ ঘ আঁকা হলো (চিত্র নং ২) বলতে পার খ ঘ কর্ণটি কত বড় ?
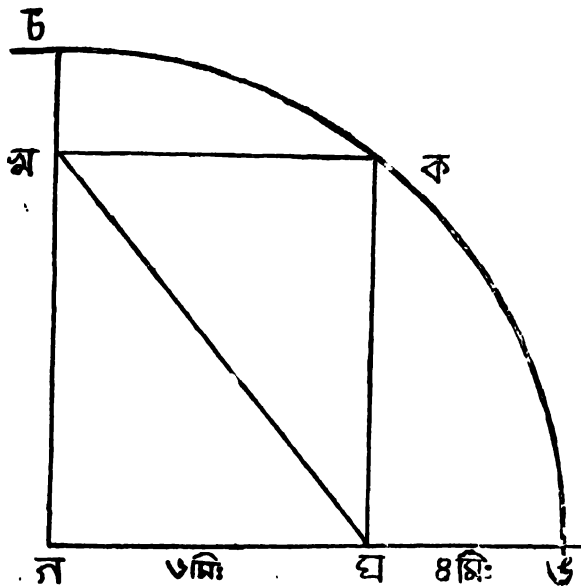
৪নং চিত্র

৯। এক বিদ্যুৎ-মিস্ত্রী, অদ্ভুত এক সমস্যার সামনে এসে দাঁড়ালো। একটা বারোতলা বাড়ীর একতলার দেয়ালের গায়ের গর্ত দিয়ে ১১ গাছা তারের মাথা বেরিয়ে আছে, আর ওই ১১ গাছা তারের অপর মাথা রয়েছে ছাদের উপরে। তারগুলি এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে তাদের আলাদা আলাদা করে চেনা মুস্কিল। যদি ব্যাটারী আর আলোর সাহায্যে এদের প্রত্যেকটিকে খুঁজে বার করতে হয়, তবে বার বার উপর নীচে যাতায়াত করে খাটুনি পড়বে অনেক—একার পক্ষে সম্ভব নয়। তার মাথায় তখন এক মতলব এল, সে খুব সহজেই এগার গাছা তারকে আলাদা আলাদা করে ফেললে। বলতে পার কি মতলবটা সে কাজে লাগিয়েছিল ?

১০। একটা নিরেট বলের মাঝখান দিয়ে একটা এফোঁড়-ওফোঁড় গর্ত করা হলো। বলের কত অংশ পড়ে রইলো ?

(উত্তর ৬৯৯ নং পৃষ্ঠা থেকে দেখ)

শুভেন্দুকুমার দত্ত

আকস্মিক আবিষ্কার

'সেফ্‌টি গ্লাস' অর্থাৎ নিরাপদ কাচ কেমন করে আবিষ্কৃত হয়েছিল—জান ?

১৯০৩ সালে একদিন এডোয়ার্ড বেনিডিক্‌টাস নামে এক তরুণ বয়স্ক রসায়নবিদ্‌ তাঁর লেবরেটরি পরিষ্কার করছিলেন। হঠাৎ তাঁর হাত থেকে একটা কাচের ফ্লাস্ক মেঝের উপর পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। কিন্তু ভাঙা কাচের টুক্‌রাগুলি ছড়িয়ে না গিয়ে এক সঙ্গেই লেগে রইলো। ফ্লাস্কটা তুলে নিয়ে দেখলেন—গায়ে লেখা রয়েছে—অ্যাসিটোন মিশ্রিত সেলুলয়েড সলিউসন। অ্যাসিটোন উবে গিয়ে সেলুলয়েডের পাত্‌লা একটা ফিল্ম কাচের গায়ে লেগে থাকায় ভাঙা টুক্‌রাগুলি ছড়িয়ে যেতে পারে নি। এরপর একটা দুর্ঘটনায় ভাঙা কাচের টুক্‌রায় কতকগুলি লোককে গুরুতরভাবে আহত হতে দেখে সেই ভাঙা কাচের ফ্লাস্কটার কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাজে লেগে যান এবং ঐ প্রণালী অনুসরণ করে 'সেফ্‌টি গ্লাস' উদ্ভাবন করেন।

শব্দের ধাঁধার উত্তর

বি	জ্ঞা	নে	র		ব	ক্সা	ই	ট
টা	ন		ম	ঙ্গ	ল		ম্যা	ন
ট্রি	প্লে		ন	ট		ভা	র	
ন		প			বো			নে
	কা	র্ব	ন		স	রী	সৃ	প
	লে			ঘ	ন			চু
ব		প্লা	সে	ন্টা			জ্ঞ	নি
র্না		জ	ড়			প্র		য়া
লি	ট	মা	স		স্থি	তি		ম

বলতে পার ?-র উত্তর

১। এই অঞ্চলটাও পড়বে মেরু প্রদেশে—দক্ষিণ মেরু প্রদেশে। দক্ষিণ মেরু থেকে $\frac{১}{২π}$ মাইল (=১'১৬ মাইল প্রায়) দূরে একটা বৃত্ত আঁকলে, ঐ বৃত্তের যে কোন জায়গা থেকে
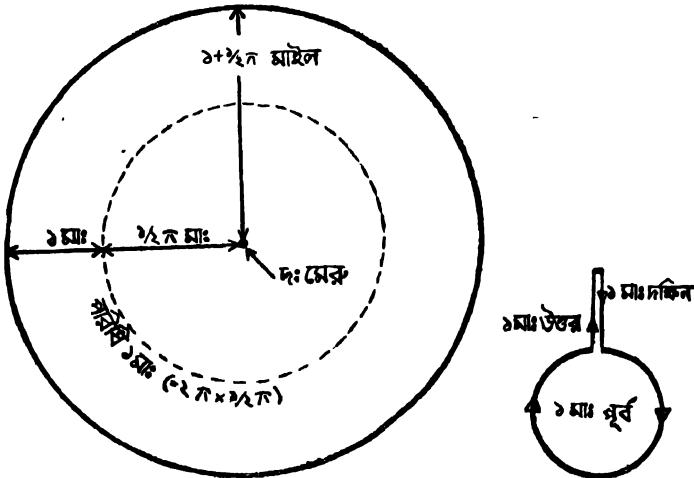
১নং চিত্র

১ মাইল উত্তরে, ১ মাইল পূর্বে ও ১ মাইল দক্ষিণে গেলে, আবার আগের জায়গায় ফিরে আসা যায়। ছবিতে দেখলে এটা ভাল বোঝা যাবে (চিত্র নং ১)।

২। একটা বাক্স থেকে একটা মাত্র বল টেনে, ঐ একবারেই বলে দেওয়া যায় কোন্ বাক্সে কি রংয়ের বল আছে। আমাদের জানা আছে, বাক্সের গায়ে যা লেখা আছে তা ভুল, অর্থাৎ লেখার রং বাদে অন্য রংয়ের বল বাক্সের মধ্যে আছে। এখন সাদা-কালো লেখা বাক্সটা ধরা যাক। এর মধ্যে নিশ্চয়ই সাদা-কালো বল নেই. আছে নয় সাদা বল নইলে কালো বল। এখন এর থেকে একটা বল বের করলেই বোঝা যাবে কি রংয়ের বল এই বাক্সে আছে। ধর একটা বল এই বাক্স থেকে বের করলে তার রং সাদা। তাহলে ঐ বাক্সে সাদা রংয়ের বল আছে। এখন বাকী বাক্সের মধ্যে একটায় সাদা আর একটায় কালো লেখা বাক্সে নিশ্চয়ই নয় সাদা বল থাকবে নইলে সাদা-কালো বল থাকবে। কিন্তু সাদা বল সাদা-কালো বাক্সটায় রয়েছে, তাই কালো বাক্সটায় সাদা-কালো বল থাকবে। বাকী সাদা বাক্সটায় কালো বল থাকবে।

যদি সাদা-কালো বাক্সটা থেকে কালো রংয়ের বল বের হয়, তবে এভাবেই বাকী বলগুলি বের করা যায়।

৩। একবার মাত্র ওজন করলেই বোঝা যাবে, কোন্ তাড়াটা নকল দশ পয়সার। প্রথম তাড়া থেকে একটা, দ্বিতীয় তাড়া থেকে দুটা, তৃতীয় তাড়া থেকে ৩টা, চতুর্থ তাড়া থেকে ৪টা, এই ভাবে দশম তাড়ার ১০টাই নিয়ে এই ৫৫টা (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮+৯+১০=৫৫) দশ পয়সাকে ওজন কর। আমরা যেহেতু আসল দশ পয়সার ওজন জানি ও নকল দশ পয়সার ওজন আসলের থেকে ১ গ্র্যাম কম তাও জানি, তাই এই ৫৫টা আসল নকল মেশানো দশ পয়সার ওজন, ৫৫টা আসল দশ পয়সার ওজনের থেকে কত কম হচ্ছে ওজন দাঁড়ির কাঁটায় সেটা দেখে নিলেই বলা যাবে কোন্ তাড়াটা নকল দশ পয়সার। ধর এ ৫৫টা দশ পয়সার ওজন আসল ৫৫টা দশ পয়সার ওজনের থেকে ৭ গ্র্যাম কম, অর্থাৎ ৭টা নকল দশ পয়সা আছে। ঐ সাতটা দশ পয়সা নেওয়া হয়েছে সপ্তম তাড়া থেকে। অতএব সপ্তম তাড়াটা নকল দশ পয়সার।

৪। কোন মতেই ১৪ ও ১৫-কে তাদের নিজেদের জায়গায় আনা সম্ভব হয় না।

৫। ছোট মাছের দল নিজেদের কাউকে না হারিয়ে এই যুদ্ধে জিতবে। কেন না, তিনটে ছোট মাছ একত্রে বড় মাছের সমকক্ষ হওয়ায়, চারটে বড় মাছের সঙ্গে তিনজন তিনজন করে জোট পাকিয়ে ১২ ছোট মাছ লড়বে। বাকী একটা ছোট মাছ যে কোন দলে যোগ দিলে, সে দলের সংখ্যা হবে চার ও ঐ চারজন একটা বড় মাছকে ৩ মিনিটে মেরে ফেলবে। এখন এই চারটে ছোট মাছ বাকী তিনটে দলের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবে। এবারে দুটি দল হবে চারটে ছোট মাছের ও একটা দল হবে ৫টা ছোট মাছের। এই ৫টা ছোট মাছ ২ মিঃ ২৪ সেকেণ্ডে আর একটা মাছকে মেরে ফেলবে।

এ কথা ঠিক যদি বাকী দুটো দলেও আর একটা করে ছোট মাছ থাকতো, তবে ঐ

২ মিঃ ২৪ সেকেণ্ডে একই সঙ্গে তিনটে বড় মাছ মারা যেত। কিন্তু বাকী দুটো দলে চারটে করে ছোট মাছ আছে, আর তাদের সময় লাগা উচিত ৩ মিনিট, তাই দ্বিতীয় বড় মাছটি মারা যাবার পরও বাকী দুটো বড় মাছের যুদ্ধ ক্ষমতার কিছুটা আছে। এখন যে কোন একটা ছোট মাছ এই একটা দলে যোগ দিলেই, তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫ ও তারা ২ মিঃ ২৪ সেকেণ্ডে একটা বড় মাছ মেরে ফেলবে। ২টা ছোট মাছ দলে যোগ দিলে আনুপাতিক ভাবে সময়টা কমবে অর্থাৎ মারবার সময় হবে ১ মিঃ ১২ সেকেণ্ড। ৬টা ছোট মাছ দলে যোগ দিলে এই সময় দাঁড়াবে ৪৮ সেকেণ্ড, আর দলের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭।

দ্বিতীয় বড় মাছ মারা যাবার পর ঐ দলের ৫টা ছোট মাছ ভাগাভাগি হয়ে বাকী দুটো দলের একটার সংখ্যা দাঁড়াবে ৭ ও আর একটার ৬। ৭টা ছোট মাছের দল ৪৮ সেকেণ্ডে তৃতীয় বড় মাছকে মারবে। বাকী চতুর্থ মাছকে এখন আক্রমণ করবে ১৩টা ছোট মাছ একই সঙ্গে। আগের মত যুক্তি দিয়ে দেখানো যায় ৪র্থ বড় মাছ মারা যাবার সময় লাগবে ৬$\frac{৬}{১৩}$ সেকেণ্ড।

পুরো যুদ্ধটা শেষ হতে সময় লাগবে—৩ মিঃ (১ম বড় মাছের মৃত্যু) + ২ মিঃ ২৪ সেঃ (২য় বড় মাছের মৃত্যু) + ৪৮ সেকেণ্ড (৩য় বড় মাছের মৃত্যু) + ৬$\frac{৬}{১৩}$ সেঃ (৪র্থ বড় মাছের মৃত্যু) = ৬ মিঃ ১৮$\frac{৬}{১৩}$ সেঃ।

৬। দুধের গ্লাসে যে অনুপাতে জল আছে ঠিক একই অনুপাতে দুধ আছে জলের গ্লাসে। যখন জলের গ্লাস থেকে ১০ সিঃ সিঃ জল দুধের গ্লাসে দেওয়া হলো, তখন দুধের গ্লাসে জল ও দুধের অনুপাত হলো $\frac{১০}{১০১০} = \frac{১}{১০১}$. আর জলের গ্লাসে পরে রইলো ৯৯০ সিঃ সিঃ জল। এখন জল-দুধ গ্লাস থেকে ১০ সিঃ সিঃ নিলে তাতে থাকবে $\frac{১০}{১০১}$ সিঃ সিঃ জল ও বাকী $\frac{১০০০}{১০১}$ সিঃ সিঃ দুধ, আর জল-দুধ গ্লাসে পড়ে থাকবে $৯৯০\frac{১০}{১০১}$ সিঃ সিঃ দুধ ও $৯\frac{৯১}{১০১}$ সিঃ সিঃ জল। এখন জল-দুধ ১০ সিঃ সিঃ, ৯৯০ সিঃ সিঃ জলে মেশালে, হাজার সিঃ সিঃ জলের গ্লাসে ৯৯০ + $\frac{১০}{১০১}$ = $৯৯০\frac{১০}{১০১}$ সিঃ সিঃ জল ও $৯\frac{৯১}{১০১}$ সিঃ সিঃ দুধ থাকবে, অর্থাৎ দুধের গ্লাসে যে অনুপাতে জল আছে, সম অনুপাতে দুধ জলের গ্লাসে আছে। দুটির পরিমাণও সমান।

৭। যখন প্রথমবার দুটো নৌকা একে অন্যের পাশ দিয়ে গেল, তখন তাদের যাত্রা দূরত্বের সমষ্টি নদীর চওড়ার সঙ্গে সমান (চিত্র নং ২ক)। নৌকা দুটি যখন নদীর দুপাড়ে পৌঁচেছে, তখন তাদের সমষ্টিগত যাত্রা পথের দূরত্ব নদীর চওড়ার দ্বিগুণ। নৌকা ফেরবার সময় যখন তারা অপর পাড়ের কাছাকাছি একে অন্যের পাশ দিয়ে গেল, তখন তাদের সমষ্টিগত যাত্রা পথ নদীর চওড়ার তিনগুণ (চিত্র নং ২খ)। যেহেতু নৌকা-গুলির গতি স্বরণহীন ও তারা একই সময়ের জন্য চলেছে, অতএব প্রথমবারের দেখা হওয়া ও তৃতীয়বারের দেখা হওয়ার মধ্যে তাদের প্রত্যেকে, প্রথম বার দেখা হওয়ার সময় যে

দূরত্ব গিয়েছিল তার তিনগুণ দূরত্ব গেছে। অতএব চ নৌকাটি গেছে ৩×৭২০ মিঃ বা ২১৬০ মিটার চিত্র ২খ থেকে এটা বোঝা গেছে এই ২১৬০ মিটার নদীর চওড়া থেকে ৪০০

-৭২০মিঃ→
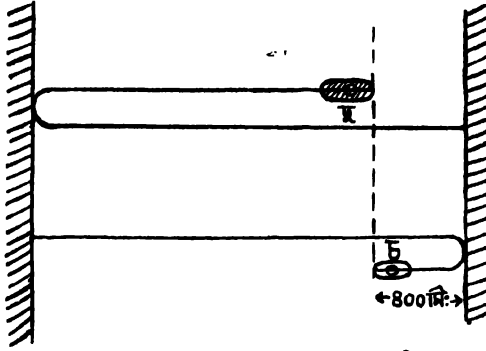
২নং চিত্র-ক (উপরে), ২নং চিত্র-খ (নীচে)

মিটার বেশী অর্থাৎ নদীটি (২১৬০—৪০০) মিটার বা ১৭৬০ মিটার চওড়া। নৌকাগুলি পাড়ে যাবার পর ১০ মিনিট অপেক্ষা করেছিল, এ খবরের কোন দরকার নেই।

৮। ক গ কর্ণটি আঁকলেই এ সমস্যার সমাধান হবে। খ ঘ=ক গ=বৃত্তের ব্যাসার্ধ=১০ মি.।

৯। ছাদের উপর মিস্ত্রী ৫ জোড়া তারকে জোড়া লাগান, একমাত্র একগাছা

ছাদ

একতলা

ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড

৩নং চিত্র

তার একা রইলো (চিত্র নং ৩)। এবার একতলায় নেমে গিয়ে ব্যাটারী ও আলোর সাহায্যে কোন্ কোন্ তার জোড় বাঁধা আছে ও কোন্টা নেই বের করে নিলে ও ছবির মত করে মার্কা দিয়ে নিলে। তারের নীচের অংশগুলি এবার ছবিতে যেভাবে দেখানো আছে ঐভাবে জোড় লাগালে। ছাদে গিয়ে আগের জোড়গুলি খুলে ফেললে, তবে কোন্ তারটা কোন্ তারের সঙ্গে জোড় বাঁধা হয়েছিল, বোঝবার জন্যে আগের জোড় বাঁধাগুলি অপরিবাহী অংশে বেঁধে রাখলে। এবার ব্যাটারী ও আলোর সাহায্যে আগের বারে যে তারটা জোড় বাঁধা ছিল না (সে জানে এটাও তারের উপরের দিকে) তার সঙ্গে অন্য তারের সংযোগ খুঁজে বের করলে—এটা হলো ঠ তারের উপরের দিক ও তার সঙ্গে আগের বার জোড় বাধা হয়েছিল ট তারটা। এবার ট তারের সঙ্গে আর একটা তারের সংযোগ খুঁজে বের করলে, সেটা হলো ঝ ও তার আগের বারের জুটি জ। এইভাবে এগারোখানা তারই আলাদা করা যায়।

যদি বিজোড় সংখ্যার তার না হয়ে জোড় সংখ্যার তার হতো তা হলেও উপরের পদ্ধতিতে সব আলাদা আলাদা করা যেত। ভেবে দেখ বের করতে পার কিনা।

১০। ধর নিরেট বলের ব্যাসার্ধ ক। এখন ছবিতে (চিত্র নং ৪) দেখে সহজেই
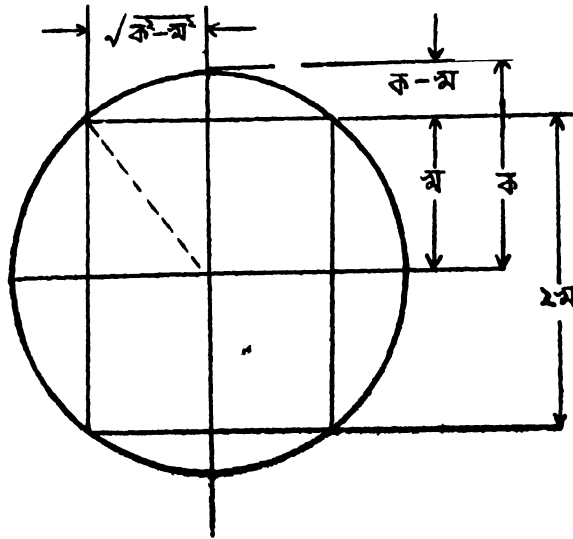
৪নং চিত্র

বোঝা যায় চোঙাকৃতি গর্তটির ব্যাসার্ধ $\sqrt{ক^২-খ^২}$, আর দু'দিকের গোল টুপীর উচ্চতা (ক—খ)।

চোঙাকৃতি গর্তটির ঘন $= ২\pi খ\ (ক^২\ খ^২)$

গোলটুপীর ঘন $= \dfrac{\pi(ক-খ)\{৩(ক^২-খ^২)+(ক+খ)^২\}}{৬}$

নিরেট বলের ঘন $= \frac{৪}{৩}\pi ক^৩$

$\therefore$ গর্ত করার পর পরে থাকা অংশের ঘন = নিরেট বলের ঘন—চোঙাকৃতি গর্তের ঘন—২ × গোলটুপীর ঘন $= \frac{৪}{৩}\pi খ^৩$, অর্থাৎ গর্তটি যত লম্বা তাকে ব্যাস ধরে নিরেট বলের ঘন।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। সত্যেন্দ্রনাথ বসু
২২, ঈশ্বর মিল লেন,
কলিকাতা-৬

২। নির্মলকুমার বসু
৩৭/এ, বোস পাড়া লেন,
কলিকাতা-৩

৩। শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
"স্বস্তিক"
৫০/১, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯

৪। রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৫/৪, বালিগঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা-১৯

৫। সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

৬। দ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
মনোবিদ্যা বিভাগ
বিজ্ঞান কলেজ,
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

৭। জয়ন্ত বসু
সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

৮। পরিমলকান্তি ঘোষ
গণিত বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ,
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

৯। মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড
ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ,
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

১০। অনিলকুমার ঘোষাল
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড
ইলেকট্রনিক্স. বিজ্ঞান কলেজ।
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

১১। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর
বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস লিঃ
২৭, অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৩৬

১২। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড
ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ।
কলিকাতা-৯

১৩। মহাদেব দত্ত
এ/৩১, সি. আই. টি. বিল্ডিংস
সিংঘী বাগান,
কলিকাতা-৭
ও
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ,
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড,
কলিকাতা-২৯

১৪। দিলীপ বসু
২০০/এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-২৬

১৫। শঙ্কর চক্রবর্তী
৬৪/বি, প্রতাপাদিত্য রোড,
কলিকাতা-২৬

১৬। শুভেন্দুকুমার দত্ত
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড
ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ।
কলিকাতা-৯

১৭। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড
ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ।
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

উনবিংশ বর্ষ | নভেম্বর, ১৯৬৬ | একাদশ সংখ্যা

ধাতু ও জীবদেহ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসচৌধুরী

আমাদের দেহের পরিপুষ্টির জন্য শ্বেতসার, শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহপদার্থের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আমাদের খাদ্যে ঐসব উপাদান থাকা সত্ত্বেও আমরা মৃতপ্রায় হইয়া যাইব, যদি খাদ্যে ভিটামিন না থাকে। আর ভিটামিন ছাড়াও লৌহ, তাম্র, দস্তা প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু আমাদের খাদ্যে থাকা প্রয়োজন। ভিটামিন অপেক্ষা অল্পমাত্রায় প্রয়োজনীয় ঐ ধাতুগুলি আমাদের দেহপুষ্টির জন্য অপরিহার্য। ভাত, ডাল, মাছ ইত্যাদি দৈনন্দিন খাদ্যের মাধ্যমে কতকগুলি ধাতু আমরা পাইয়া থাকি বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা যথেষ্ট নয়। আজকাল তাই অনেকে ধাতু ও ভিটামিনযুক্ত ট্যাবলেট প্রত্যহ খাইয়া থাকেন। উহা যে একটি অতি উত্তম অভ্যাস, তাহা বলাই বাহুল্য।

জীবদেহে ধাতুর প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, তাহা উদ্ভিদের দৃষ্টান্ত হইতে অতি সহজেই বুঝা যাইবে। একটা বটের বীচির ওজন এক রতিও নয়; অথচ ঐ বীচি হইতে যখন বিশাল বটবৃক্ষ হইল, তখন তার ওজন হয়তো এক শত মণ হইবে। গাছের এই ওজনটা কি করিয়া হইল? মাটি হইতে রস শোষণের মাধ্যমে এক রতি ওজনের বীচি হইতে যদি একশত মণ ওজনের বটগাছ হইয়া থাকে, তবে শত মণ ওজনের মাটি কমিয়া যাইবার কথা। কিন্তু বট গাছটা কাটিয়া ফেলিলে দেখা যাইবে, যে মাটি ছিল সেই মাটিই রহিয়া গিয়াছে। গাছ সূর্যালোকের মাধ্যমে বাতাস হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে। মাটি হইতে রসশোষণের মাধ্যমে যাহা আসে তাহা ধাতু। শত মণ ওজনের একটা বটগাছ মাটি হইতে

সবশুদ্ধ মাত্র কয়েক আউন্স ধাতু শোষণ করিয়া থাকে। গাছের আসল ওজনটা আসে খাদ্যের মাধ্যমে বাতাস হইতে। কিন্তু মাটি হইতে ঐ কয়েক আউন্স ধাতু না আসিলে গাছের ওজন শত মণ হওয়া তো দূরের কথা, গাছের জীবিত থাকিবারই কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।

প্রোটিন, শ্বেতসার, স্নেহপদার্থ ও ভিটামিন আমরা যতই খাই না কেন, খাদ্যে ধাতু ভিন্ন আমাদের জীবনধারণ অসম্ভব। মানবদেহে প্রায় কুড়ি রকমের ধাতু আছে। তাহার মধ্যে লৌহ, তাম্র, দস্তা, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। দেহের পেশী, রক্ত, মস্তিষ্ক, অস্থি ও মজ্জা হইতে সুরু করিয়া থুথু, চোখের জল, চুল ও ঘামের মধ্যে পর্যন্ত ধাতুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। দেহে প্রায় কুড়িটি ধাতু থাকিলেও মাত্র ছয়-সাতটা ধাতুর ক্রিয়া জানা গিয়াছে। বাকীগুলি কি জন্য দরকার, তাহা পরিষ্কারভাবে জানা যায় নাই। তবে দেহে সেই সব ধাতুগুলির যে দরকার আছে, সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই।

মানবদেহের যাবতীয় ধাতুগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে আছে লৌহ। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে যতটুকু লৌহ আছে, তাহার দ্বারা একটা মাঝারি গোছের আলপিন মাত্র তৈয়ারী হইতে পারে। ব্যায়াম করিয়া যাঁহারা 'আয়রন ম্যান' হইয়াছেন, তাঁহাদের দেহেও একটা মাত্র আলপিনের ওজনের সমান লৌহ আছে। আমাদের রক্তের মধ্যে অতি ক্ষুদ্রাকৃতির লোহিত কণিকা আছে বলিয়া রক্তকে লাল দেখায়। ঐগুলি জীবন্ত দেহকোষ—এক ফোঁটা রক্তে কয়েক লক্ষ লোহিত কণিকা আছে। হিমোগ্লোবিন নামক লাল রঙের পদার্থের (প্রোটিন) সাহায্যে গঠিত বলিয়া লোহিত কণিকাকে লাল দেখায়। ঐ হিমোগ্লোবিনে লৌহ আছে—যদিও হিমোগ্লোবিনের অণুতে লৌহের পরমাণু মাত্র একটি।

লোহিত কণিকাগুলি ত্রিশ দিনের বেশী বাঁচে না এবং প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোহিত কণিকার মৃত্যু হইতেছে। এখন প্রশ্ন এই যে, মৃত লোহিত কণিকার লৌহের অংশটুকু কোথায় যায়? বিধির এমনই বিধান যে, লোহিত কণিকাগুলি মরিয়া গেলেও তাহাদের লৌহের ভাগটুকু নষ্ট হয় না—নূতন লোহিত কণিকা গঠনের সময় ঐ লৌহ কাজে লাগে। কাজেই মানবদেহের ভিতরে লৌহের অপচয় হয় না। ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তদান করিলে বা স্ত্রীদেহে মাসিক হইলে দেহে লৌহের পরিমাণ ঈষৎ কমে বটে, তবে উহা পূরণের জন্য আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন খাদ্যই যথেষ্ট। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈনিক সাত মিলিগ্র্যাম (১ গ্র্যাম=১০০০ মিলিগ্র্যাম) লৌহের প্রয়োজন। বাল্যকালে দেহে লৌহের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। দুগ্ধপোষ্য শিশুরা যে দুধ খায়, তাহাতে লৌহের ভাগ একটু কম থাকিলেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। তাহার কারণ এই যে, শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে, তখন মাতৃদেহ হইতে প্রাপ্ত লৌহ এবং তাম্র শিশুর যকৃতে সঞ্চিত হইয়া থাকে। কাজেই একজন বয়স্ক লোকের যকৃতে যতটুকু লৌহ ও তাম্র আছে, মাতৃগর্ভস্থ শিশুর যকৃতে ঐ ধাতুগুলি আছে তার কুড়ি গুণ বেশী।

দেহে ধাতুর প্রয়োজন আছে বিবেচনা করিয়া কেহ যদি ধাতুচূর্ণ ভক্ষণ করে, তবে তাহাতে কোনই সুফল হইবে না; কারণ দেহ সেই ধাতু গ্রহণ করিতে পারিবে না। খাদ্যে ধাতুর পরিমাণ এমন ভাবে থাকা দরকার, যাহাতে দেহ উহা গ্রহণ করিতে পারে। জৈব বা অজৈব উভয় প্রকার বস্তুর মধ্যেই ধাতু থাকিতে পারে। কিন্তু এর কোন্‌টা হইতে দেহ সহজেই ধাতুটাকে টানিয়া নিতে

পারে, তাহা বৈজ্ঞানিকদের নিকট একটা সমস্যার বিষয়। একটা খাদ্যবিশেষের সবটুকু ধাতু দেহ টানিয়া নিতে পারে না। যেমন, পালং শাক ও কিসমিসে লৌহ আছে—শুধু এর একটা হইতে যদি আমাদের দৈনন্দিন লৌহের প্রয়োজন মিটাইতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে খাইতে হইবে আধসের পালং শাক নয়তো কয়েক সের কিসমিস। সেই জন্য পাঁচমিশালী খাদ্য গ্রহণ করা বিজ্ঞানসম্মত।

মানবদেহে লৌহের ক্রিয়ার বিষয় আমরা যতটা জানি, অন্যান্য ধাতুর ক্রিয়ার বিষয় ততটা জানি না—অনেকগুলি ধাতুর ক্রিয়া একেবারেই জানা নাই। দেহে রক্তের লোহিত কণিকা তৈয়ারী হইবার সময় লৌহ ও তাম্রের প্রয়োজন হয়—লৌহের ক্রিয়া সম্পাদনে তাম্র সাহায্য করে ঢাকের বায়ার মত তাম্র ও দস্তা দেহ-কোষের (মানবদেহ কোটি কোটি কোষের সমষ্টি) শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সাহায্য করে বলিয়া মনে করা হয়। জীবদেহে দস্তার ক্রিয়া রীতিমত বিস্ময়জনক। উহা দেহের প্রায় সর্বাংশেই আছে—মস্তিষ্কে বিশেষ করিয়াই আছে। দস্তা ভিন্ন কতকগুলি উদ্ভিদের বৃদ্ধি বন্ধ থাকে, দস্তা প্রয়োগ করিলে পুনরায় বৃদ্ধি সুরু হয়। উদ্ভিদের বেলায় ধাতুগত সার প্রয়োগ করিয়া গাছের বর্ণের ঔজ্জ্বল্যের রকমফের করা যায়। পাশ্চাত্য দেশে মাঠে ও বাগানে ধাতুগত সার দিয়া গাছের সবুজ রংকে ইচ্ছামত গাঢ় সবুজ বা পাত্‌লা সবুজ করা হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর ধাতু গ্রহণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়, এমন ধাতু যদি মানবদেহে প্রবেশ করে, তবে উহা দেহটাকে তোলপাড় করিয়া ফেলিতে পারে। পারা খাইয়া কতজন উহা হজম করিতে পারিয়াছে? কিন্তু উদ্ভিদ এই বিষয়ে কিছুটা নির্বিকার। উদ্ভিদের দেহপুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় নয়, এমন ধাতুও যদি উদ্ভিদের ভিতরে প্রবেশ করে, তাহাতে উদ্ভিদের বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু মানুষ বা জীবজন্তু যদি উহা খায়, তখন ভক্ষক অসুস্থ হইবে। মলিবডিনাম নামক ধাতু উদ্ভিদে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাণীর পক্ষে উহা বিষ বলিয়াই মনে করা হয়। জীবদেহে ধাতুর ক্রিয়া রহস্যময়। আমাদের রক্তের মধ্যে অন্ততঃ বারটা ধাতু আছে—ভাবিলে অবাক হইতে হয়! মাতৃদুগ্ধে লৌহ, তাম্র, দস্তা প্রভৃতি প্রায় দশটি ধাতু বর্তমান। খাদ্যের মাধ্যমে যে পরিমাণ ধাতু আমাদের দেহে প্রবেশ করে, তার সবটা দেহ গ্রহণ করে না বা করিতে পারে না। দেহের গ্রহণ করিবার ব্যাপারটা অতি সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়। ফুলকপি খাইলে দেহ তখন খাদ্যস্থ আয়োডিন গ্রহণ করিতে পারে না। কোন্ জিনিষ খাইলে কোন্ ধাতু কি পরিমাণে দেহে গৃহীত হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গবেষণার বস্তু।

যাহা হউক—ঘর্ম, অশ্রু ও চুলের মধ্যে ধাতুর অস্তিত্ব দেখিয়া বুঝা যায় যে, ঐগুলি দেহ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইতেছে। কথ্য ভাষায় পুরুষের শুক্রকে লোকে ধাতু বলে বটে; কিন্তু আসলে তাহার মধ্যে মাত্র ছয়-সাতটি ধাতুর অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। ঘর্মের শতকরা নিরানব্বই ভাগই জল, বাকী শতকরা এক ভাগের মধ্যে আছে নয়টি ধাতু। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, ঐ ধাতুগুলি (অর্থাৎ ধাতুগঠিত পদার্থগুলি) ঘর্মের মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। দেহের ভিতরেও ধাতু-গঠিত পদার্থগুলি দ্রবীভূত অবস্থায়ই থাকে। আমাদের শরীরের শতকরা সত্তর ভাগই জল, বাকী শতকরা ত্রিশ ভাগ ঐ জলের সহিত নানাভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। জলের মধ্যে আমরা যখন লবণ গুলিয়া ফেলি, তখন তাহা জলের অপেক্ষা গাঢ় হয়—বেশী লবণ গুলিলে বেশী গাঢ় হয়। দেহনিঃসৃত মূত্রের

গাঢ়ত্ব আর মুখনিঃসৃত লালার গাঢ়ত্ব সমান নহে। তদ্রূপ মাংসপেশীর মধ্যে যে সকল জলসমন্বিত দ্রব্য আছে আর মস্তিষ্ক বা রক্তের মধ্যে যে সকল জলসমন্বিত দ্রব্য আছে, তাহাদের গাঢ়ত্ব সমান নহে। ধাতব লবণগুলি দেহের কোন অঙ্গবিশেষের বা সমগ্র দেহের জলীয় অংশের গাঢ়ত্ব নির্ণয়ে সহায়তা করে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহার করিতে পারিলে বলিতাম যে, ধাতুঘটিত লবণগুলি দেহের অভ্যন্তরস্থ আস্রাবণ প্রক্রিয়ার (Osmosis) সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

ধাতুঘটিত লবণগুলিকে উপযুক্ত পরিমাণে জলে গুলিতে পারিলে তাহার মধ্যে দেহের কোন অংশকে অনেকক্ষণ ধরিয়া জীবিত রাখা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি—অনেকেই জানেন যে, প্রাণিদেহের ভিতরে অন্ননালী ক্রমাগত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। কোন একটা প্রাণীকে মারিয়া ফেলিলে বা তাহার অন্ননালী কাটিয়া বাহির করিয়া ফেলিলে অন্ননালীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম—এই তিনটা ধাতুর লবণ (ক্লোরাইড লবণ) জলে পরিমাণমত গুলিতে পারিলে এবং তাহার মধ্যে অন্ননালীটা রাখিলে ঐ সঙ্কোচন-প্রসারণকে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া বজায় রাখা যায়। আমি নিজে একটা মশার বাচ্চার অন্ননালীকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমার এক বন্ধু একটা পতঙ্গের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নয় ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। উপরে যে তিনটা ধাতুর নাম দিলাম, সেগুলির প্রত্যেকটারই নিজস্ব ক্রিয়া আছে বিভিন্ন রকমের, আবার ইহাদের সমন্বয়ের ক্রিয়া অন্য রকমের। অনেক ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানীরা ক্যালসিয়াম ধাতুর বিকল্প হিসাবে ষ্ট্রনসিয়াম ধাতু ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ধাতুগুলির এককভাবে ক্রিয়া আর তাহাদের সমন্বয়ের ক্রিয়া যে আলাদা রকমের, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। সোডিয়াম ধাতু রক্তের গাঢ়ত্ব নির্ণয়ে সহায়তা করে, কিন্তু উহার বিষ-ক্রিয়াও আছে। উহা জীবকোষের বাহিরের পর্দাটাকে ক্ষরিত করে। ক্যালসিয়াম সেই ক্ষর-ক্রিয়াকে বন্ধ রাখে এবং উহাতে জীবকোষের বাহিরের পর্দার ভেদ্যতা (Permeability) বজায় থাকে। ক্যালসিয়াম স্বয়ং প্রাণপঙ্কের (Protoplasm) উপর বিষক্রিয়া করে; তখন পটাসিয়াম ঐ বিষক্রিয়া দূর করে। সমন্বিত-ভাবে ঐ তিনটা ধাতু জীবকোষের ক্রিয়া সম্পাদনের রাসায়নিক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ক্ষেত্রভেদে ও মাত্রাভেদে ধাতু উপকারী ও অপকারী উভয়ই হইতে পারে। পারা বিষ বটে, কিন্তু জারিত পারা দিয়া আমাশয় বা পুরাতন গ্রহণী রোগের যে স্বর্ণপর্পটি চিকিৎসা আছে, তাহার অপেক্ষা উত্তম চিকিৎসা আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানও উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। লৌহপর্পটি এবং রৌপ্যপর্পটি ধাতুঘটিত ঔষধ। আমাদের দেহে লৌহ থাকিলেও স্বর্ণ, রৌপ্য বা পারদ নাই—সুস্থ দেহের পক্ষে এই সকল ধাতু অবাঞ্ছিত। মলিবডিনাম ধাতুর কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। মটর শুঁটি জাতীয় গাছের (ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম লেগুমিনোসি) শিকড়ের মধ্যে অবস্থিত জীবাণুকে মলিবডিনাম সতেজ করিয়া থাকে এবং ঐ জীবাণুগুলি বাতাস হইতে সোজাসুজি নাইট্রোজেন টানিয়া লইয়া গাছকে দেয়। তাহাতে কৃষিকার্যের অনেক সাহায্য হয়—অথচ মলিবডিনাম স্বয়ং প্রাণীর পক্ষে বিষ। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে, গাছে যদি মলিবডিনাম থাকে, তবে তাহার দশ লক্ষ ভাগের পাঁচ ভাগও যদি গরু-বাছুরের ভিতরে প্রবেশ করে, তবে তাহাতেই তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়িবে। প্রাণিদেহের পক্ষে তীব্র বিষ, এমন ধাতু শরীরে প্রবেশ করিয়া নানারকম উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি করিতে পারে। নূতন তৈয়ারী

কোন একটা ফার্মে গরুর মড়ক দেখা দেয়। রোগের লক্ষণগুলি মারাত্মক রকমের; যেমন—রোম খসিয়া পড়া, দাঁতের মাড়ি ফুলিয়া উঠা, শিং-এর অংশ খসিয়া পড়া, ওজন কমিয়া যাওয়া—ইত্যাদি। রোগের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য নিযুক্ত বিশেষজ্ঞেরাও প্রথমটাতে কোন কূলকিনারা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া ও ছত্রাক ইত্যাদি যে সকল জিনিষ রোগের সম্ভাব্য কারণ হইতে পারে, তাহার কোনটাই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পরে বহু চেষ্টার পর রোগের কারণ নির্ধারিত হইল মাটিতে। দেখা গেল যে, মাটিতে এমন দুই-একটা ধাতু রহিয়াছে, যাহা গাছপালার মাধ্যমে গরুর দেহে প্রবেশ করিয়া ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছে। এই ধরণের ধাতুঘটিত ব্যাধিগুলির কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বিশেষজ্ঞেরাও অনেক সময় গোলকধাঁধায় পড়িয়া যান। কারণ এই ধরণের ব্যাধি জীবাণুঘটিত না হওয়ার দরুণ আদৌ সংক্রামক নহে।

মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর ধাতুসমূহ কেমন করিয়া খাদ্যের মধ্য দিয়া দেহে প্রবেশ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার কোন এক সহরে মুরগীর ডিম খাইয়া বহু লোক হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ে। খোঁজ লইয়া জানা গেল—মুরগীর ডিমের চালানটা আসিয়াছিল সীসার খনির নিকটস্থ কোন ফার্ম হইতে। অনুসন্ধানের পর বুঝা গেল যে, মাটির মাধ্যমেই সীসা মুরগীর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে মুরগীকে মলিবডিনাম, সীসা ও সেলেনিয়াম ধাতু খাওয়াইয়া দেখা গেল যে, ঐ ধাতুগুলি পরিণামে ডিমে আসিয়া জমা হয়। সীসার পাইপ দিয়া সহরের জল সরবরাহের ব্যবস্থা বিপজ্জনক—জলের মাধ্যমে সেই সীসা মানুষের পেটে গিয়া মানুষকে অসুস্থ করিয়া ফেলিতে পারে। মুরগীর ডিমে গোটা সতেরো ধাতুর অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে এবং ঐ ধাতুগুলির মধ্যে কতকগুলি ধাতু, যেমন—রুথেনিয়াম, টিটানিয়াম, ভেনেডিয়াম ও বেরিয়াম মানবদেহের পক্ষে ক্ষতিকর। মুরগীর ডিমে এই সকল ধাতু অবশ্য কদাচিৎ পাওয়া যায়। স্তন্য-প্রাণীর মধ্যে কোন কোন সময় সীসা ও রৌপ্য পাওয়া যায় বটে, তবে উহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। ঐ ধাতুগুলি মাটি, তথা গাছের মাধ্যমে জীবজন্তুর দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে মাটি সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বিবর্তিত হইতেছে—নূতন নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া মানুস মাটির সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইবার চেষ্টা করিতেছে।

খাদ্যের মাধ্যমে আমরা ধাতু আর ভিটামিন দুই-ই পাইয়া থাকি—আর তাহাতেও না কুলাইলে ধাতু ও ভিটামিনযুক্ত ট্যাবলেট খাই। ভিটামিন আর ধাতুর মধ্যে সম্পর্কটা কোথায় তাহা এখনও গবেষণার বিষয়। বি-১২ নামক ভিটামিনের শতকরা চারি ভাগ কোবাল্ট ধাতুর সাহায্যে গঠিত। কিন্তু ইহা ছাড়া খুব কম ভিটামিনেই ধাতু আছে। প্রোটিনেও ধাতু নাই বলিলেই চলে। যে সকল প্রোটিনে ধাতু আছে, তাহাদের নাম ক্রোমোপ্রোটিন (ক্রোমো=রং), এইগুলি সংখ্যায় বড়জোর চারি-পাঁচটি। নিম্নে কয়েকটি ক্রোমোপ্রোটিনের নাম দেওয়া হইল:—

ক্রমোপ্রোটিন	প্রাপ্তব্য	ধাতু	বর্ণ
হিমোগ্লোবিন	রক্তের লোহিত কণিকা	লৌহ	লাল
হেলিকোরুব্রিন	শামুকের রক্ত	ম্যাগ্নেসিয়াম	সবুজ
হিমোসায়ানিন	শামুক, অক্টোপাস, চিংড়ি, কীট-পতঙ্গের রক্ত	তামা	নীলাভ

সম্প্রতি আলুর মধ্যেও তাম্রযুক্ত প্রোটিনের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উপরে যে তিনটি ধাতুযুক্ত প্রোটিনের নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার সবগুলি আছে রক্তের মধ্যে। ধাতুর মাধ্যমে রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। ধরা যাক হিমোসায়ানিনের কথা—উহা শম্বুক পর্বের প্রাণীদের মধ্যে বিশেষভাবে বর্তমান। অক্টোপাস ও শামুক—দুইটিই শম্বুক পর্বের প্রাণী। অক্টোপাসের রক্তে তামার পরিমাণ শামুকের রক্তের তামার পরিমাণ অপেক্ষা চারি গুণ বেশী। তাই অক্টোপাসের শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষমতা শামুকের ক্ষমতা অপেক্ষা চারি গুণ বেশী। তাম্রযুক্ত হিমোসায়ানিনের অক্সিজেন গ্রহণ করিবার ক্ষমতা লৌহযুক্ত হিমোগ্লোবিনের অপেক্ষা কম।

সামুদ্রিক প্রাণীরা সমুদ্রের আগাছা বা সোজাসুজি সমুদ্রের জল হইতেও দেহ-পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু সংগ্রহ করিয়া থাকে। মাতৃগর্ভস্থ মানবশিশু যেমন ভ্রূণাবস্থায় মাতৃদেহ হইতে লৌহ ও তাম্র সঞ্চয় করিয়া রাখে, তদ্রূপ কোন কোন সামুদ্রিক প্রাণীর ভ্রূণেরা সোজাসুজি সমুদ্রের জল হইতেই নিজেদের দেহে ধাতু সঞ্চয় করিয়া রাখে। অক্টোপাস জাতীয় প্রাণীর ভ্রূণ সমুদ্রের জল হইতে লৌহ, তাম্র, দস্তা প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় ধাতুগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি জীবদেহে দুর্লভ ধাতু, যথা—লিথিয়াম, ভেনাডিয়াম, মলিবডিনাম, টিটানিয়াম ইত্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখে। সামুদ্রিক প্রাণীদের দেহে এই সকল দুর্লভ ধাতুর অস্তিত্ব দেখিয়া মনে হয় যে, ধাতুর দৃষ্টিকোণ হইতে উদ্ভিদ আর নিম্নস্তরের সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে যেন একটা সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যের কোন অর্থ আছে কি না, তাহা কে বলিবে? কোন্ কোন্ প্রাণীতে কি কি ধাতু আছে, তাহার তালিকা তৈয়ার করা সবে মাত্র সুরু হইয়াছে। প্রাণীদের দেহের জলীয় অংশে ধাতব লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় আছে। এই বিষয়ে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সার আংশিকভাবে নিম্নে দেওয়া হইল :—

লৌহ—শুক্তি, কৃমি, মথ

তাম্র—শুঁয়াপোকা, মাছি

দস্তা—রেশমকীট, মাছি, শুক্তি ও কৃমি

ম্যাগ্নেসিয়াম—মৌমাছি, শুঁয়াপোকা, গুব্‌রে-পোকা, কৃমি, ফড়িং ও প্রজাপতি

ভিটামিন ও ধাতুগুলি দেহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া এন্‌জাইম নামক বস্তুর সৃষ্টি করে, যাহার মাধ্যমে দেহের রাসায়নিক ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন হয়। লৌহ, তাম্র, দস্তা, কোবাল্ট ইত্যাদি ধাতু দেহের ভিতরে বিভিন্ন রকমের এন্‌জাইম সৃষ্টি করে। তাই এন্‌জাইমগুলিকে বিশ্লেষণ করিলেই ধরা পড়িবে, তাহাদের মূলে কোন্ ধাতু বা কোন্ ভিটামিন আছে। কিন্তু ধাতু ও ভিটামিনগুলি সত্যই সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ক্রিয়া করে অথবা সম্মিলিতভাবে জটিল এন্‌জাইম সমষ্টির সৃষ্টি করে—তাহা এখনও রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে। জীবদেহে ধাতুর ক্রিয়া বুঝিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ইহার যতটুকু রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, জীবদেহে ধাতু সম্পর্কিত নূতন রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। যেমন - মুরগীর ডিমে দস্তা ও তামা পাওয়া যাইবার পর প্রশ্ন উঠিল, উহারা ডিমের ভিতরে কোন্ জায়গায় কিভাবে আছে? দেখা গেল সদ্যপ্রসূত ডিমের মধ্যে তামাটা আছে কুসুমের মধ্যে আর দস্তা আছে ডিমের জেলীর মত সাদা অংশটার মধ্যে। ডিমটাকে কিছুদিন রাখিয়া দিলে দেখা যায়, কুসুমের তামা কিছুটা সাদা অংশে চলিয়া গিয়াছে আর সাদা অংশের দস্তা কিছুটা কুসুমে আসিয়াছে। রক্তে লৌহ ও তাম্র শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় সাহায্য করে, ইহা বুঝা যায়—কিন্তু মস্তিষ্কে দস্তা থাকিবে কেন, তাহা বুঝা দায়। এই সকল কারণে জীবদেহে ধাতুর ক্রিয়াকে এখনও গূঢ় রহস্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

মানবদেহের ধাতব উপাদানের আংশিক তালিকা (সঙ্কলক—লেখক)

	রক্ত	পেশী	অস্থি	হৃৎপিণ্ড	ফুসফুস	যকৃৎ	প্লীহা	মূত্রাশয়	চক্ষু	দন্ত	চুল	চর্ম	লালা	ঘর্ম
লৌহ	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+		+
তাম্র	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
দস্তা	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+		
ক্যালসিয়াম	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
সোডিয়াম	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+
পটাসিয়াম	+	+	+	+	+	+		+	+				+	+
ম্যাগ্নেসিয়াম	+	+	+	+	+	+		+	+				+	+
ম্যাঙ্গানিজ	+	+	+	+		+	+	+		+	+	+		
ক্রোমিয়াম		+		+	+	+	+	+			+			
সীসা	+			+		+		+		+	+	+		
কোবাল্ট											+		+	
নিকেল											+			
টিন	+													
ষ্ট্রনসিয়াম			+											
অ্যালুমিনিয়াম	+										+			
আর্সেনিক														
লিথিয়াম	+													
ইউরেনিয়াম											+			

সাগরে শব্দের গতি

গোপীনাথ সরকার

ভূপৃষ্ঠের তিন ভাগের দুই ভাগকেই সাগর-মহাসাগর, নদ-নদী ঘিরে রেখেছে। এই সব অজানা সাগর-মহাসাগরের গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটনে গবেষণার শেষ নেই। তার ফলেই মানুষ জেনেছে সাগরের বিভিন্ন গভীরতায় শব্দের গতি-প্রকৃতি, যার সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করবো।

লিওনার্ডো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) জলের মধ্যে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে তা শোনবার গৌরব সর্বপ্রথম লাভ করেন। তারপর মানুষ কৌতূহলের বশে সাগরের জল পরীক্ষা করা সুরু করেছে। বহু দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় জানা গেছে যে, সাগরের বিভিন্ন গভীরতায় শব্দের গতিও বিভিন্ন। গতির এই পার্থক্যের কারণও নির্ণীত হয়েছে। জানা গেছে, কোন নির্দিষ্ট গভীরতায় শব্দের গতি নির্ভর করে সেই স্থানের জলের তাপমাত্রা, লবণের পরিমাণ এবং গভীরতার উপর। যদি কোন নির্দিষ্ট গভীরতায় শব্দের গতি হয় প্রতি সেকেণ্ডে c মিটার, জলের তাপমাত্রা হয় t ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, লবণের পরিমাণ হয় প্রতি হাজার ভাগে s ভাগ এবং গভীরতা হয় h মিটার, তাহলে শব্দের গতিকে মোটামুটি এই ভাবে প্রকাশ করা যায়:

$$c = ১৪১০ + ৪\ ২১t - ০·০৩৭t^2 + ১\ ১৪s + ০·০১h$$

দেখা গেছে যে, সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে (৩৫০-৫৫০) মিটার পর্যন্ত গভীরতায় শব্দের গতি মোটামুটি-ভাবে অপরিবর্তিত থাকে। তারপর গভীরতা বাড়বার সঙ্গে শব্দের গতিও দ্রুত কমতে থাকে। শেষে প্রায় সব সাগরেই ৭২৮ থেকে ১২৭৪ মিটার গভীরতার মধ্যে শব্দের গতি সবচেয়ে কম হয়। তারপর ঘটে গতির আশ্চর্য পরিবর্তন। গভীরতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গতিও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, এক সময় সমুদ্র-পৃষ্ঠের গতির সমান হয় এবং অবশেষে একেও অতিক্রম করে।

১৯৪৮ সালে ইউয়িং ও ওরজেল আটলান্টিক মহাসাগরে বিভিন্ন গভীরতায় বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শব্দের গতি নির্ণয় করেন। তাঁরা গতি-গভীরতার যে লেখচিত্র অঙ্কন করেছেন, তা ১নং চিত্রে দেখানো হলো।

১নং চিত্র থেকে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে,

(১) সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ৫৫০ মিটারের কাছাকাছি গভীরতায় শব্দের গতি প্রায় ১৫১৬ মিটার থাকে।

(২) ৫৫০ মিটার গভীরতা থেকে শব্দের গতি কমে প্রায় ১২৭৫ মিটার গভীরতায় সর্বনিম্ন গতি হয় ১৪৭৮ মিটার।

(৩) ১২৭৫ মিটার গভীরতা থেকে শব্দের গতি বেড়ে গিয়ে ৩৬৪০ মিটার গভীরতায় আবার ১৫১৬ মিটারে ফিরে আসে।

(৪) ৩৬৪০ মিটার থেকে তলদেশ পর্যন্ত গভীরতায় শব্দের গতি ১৫১৬ মিটারের কিছু বেশী থাকে।

১৯৫৩ সালে ডাইক ও সোরেনসন প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন গভীরতায় শব্দের গতি পরীক্ষা করেন। এই ক্ষেত্রে দেখা গেল—শব্দের গতি সবচেয়ে কম হয় ৯০০ মিটার গভীরতায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—শব্দের গতির এই পরিবর্তন হয় কেন? সূর্যের বিকিরিত রশ্মি সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে (৩৫০-৫৫০) মিটার গভীরতায় জলরাশিকে সমানভাবে উত্তপ্ত করে; ফলে জলের তাপমাত্রার বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সে জন্যে

এই স্তরে শব্দের গতি মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু এই স্তরের নীচে গভীরতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জলের তাপমাত্রাও দ্রুত কমতে থাকে। দেখা গেছে যে, আটলান্টিক মহাসাগরে প্রায় ১২১৫ মিটার নীচে আর প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায় ৯০০ মিটার নীচে এই ক্ষীয়মান তাপমাত্রা ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি এসে পৌঁছায়; ফলে শব্দের গতিও ক্রমশঃ কয়েকটি পরীক্ষা করেন। তার ফলে আবিষ্কৃত হলো সমুদ্রে বহুদূরে শব্দ প্রেরণের এক চমকপ্রদ অভিনব পন্থা। তাঁরা দেখলেন ০'২২৫ কিলোগ্র্যাম চার্জের বিস্ফোরণ ১২৮৮ কিলোমিটার দূর থেকে শোনা যায়, ১৮ কিলোগ্র্যাম চার্জের বিস্ফোরণ ৩৭০৩ কিলোমিটার দূর থেকে, আর ২৭ কিলোগ্র্যাম চার্জের বিস্ফোরণ ৪৯৯০ কিলোমিটার দূর থেকে শোনা যায়।
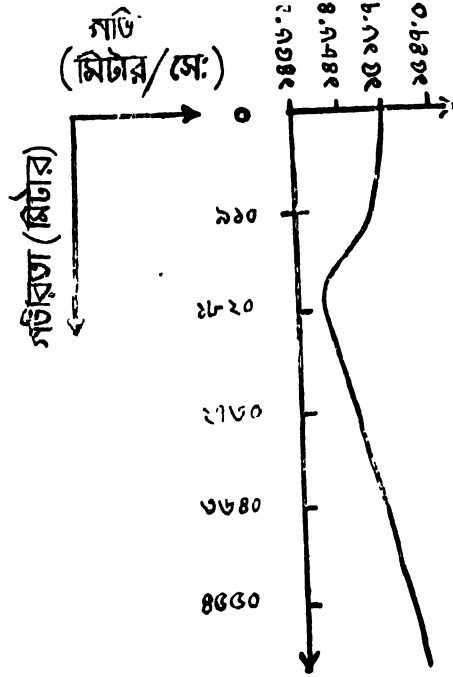
১নং চিত্র

হ্রাস পেয়ে সবচেয়ে কম মানে আসে। এই গভীরতা থেকে সুরু করে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত তাপমাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু জলের চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় শব্দের গতি সেখানে সর্বনিম্ন মানে এসে পৌঁছায়, তাকে বলা হয় সাউণ্ড চ্যানেল। এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৮ সালে ইউয়িং ও ওরজেল সাউণ্ড চ্যানেলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে

কেন এমন হয়? এর কারণও ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয়েছে। যদি শব্দ-প্রবাহের গতি অবিরত পরিবর্তিত হয়, তাহলে শব্দ-তরঙ্গ প্রতিসরণের জন্যে 'বক্র রশ্মি-পথ' অনুসরণ করে। ফলে যে শব্দ-রশ্মি সাউণ্ড-অ্যাক্সিসের সঙ্গে অল্প কোণ করে উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তবে তা নীচের দিকে বেঁকে যায় এবং যে রশ্মি নীচু দিয়ে প্রবাহিত হয়, তা উপর দিকে

২

বেঁকে যায়। দেখা গেছে—শব্দ-রশ্মি যদি সাউণ্ড-অ্যাক্সিসের 0° থেকে ১২°-এর মধ্যে থাকে, তাহলে তা সমুদ্রের উপরিভাগে বা তলদেশে পৌঁছুতে পারে না বা তা জলেও বেশী পরিমাণে বিশোষিত হতে পারে না এবং তার ফলে শব্দ সাউণ্ড চ্যানেল বরাবর বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারে। একেই শব্দের 'সোফার প্রোপেগেশন' বলা হয়।

এই সোফার প্রোপেগেশনের গুরুত্ব অনেক। এর আশ্চর্য ক্ষমতাকে কাজে লাগাবার জন্যে প্রশান্ত মহাসাগরে সোফার সিষ্টেম নামে কয়েকটি ষ্টেশন খোলা হয়েছে। এদের প্রত্যেকটিতে আছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, যার সাহায্যে সমুদ্রে শব্দের উৎপত্তি-স্থল ও শব্দের গতি-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমুদ্রে সোফার সঙ্কেতের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

(১) সোফার প্রোপেগেশন বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারে। ছোটখাটো বোমা বিস্ফোরণ থেকে ১৬১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

(২) সোফার সঙ্কেতের স্থায়িত্ব-কাল ০.০৫ সেকেণ্ডেরও বেশী নির্ভুলতায় নির্ণীত হতে পারে।

(৩) সঙ্কেত স্থায়িত্বের মোট সময়ের সাহায্যে শব্দের উৎপত্তি-স্থানের দূরত্ব প্রায় ৩% নির্ভুলতায় নির্ণীত হতে পারে।

এর ফলে সমুদ্রে পতিত প্লেন অথবা জাহাজের অবস্থান নির্ণয়ের কাজে সোফার প্রোপেগেশনের ব্যবহার করা যায়। আবার চঞ্চলা প্রকৃতির খেয়ালখুশীতে যখন সাগরে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে বা সাগরতলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়, যার ফলে বিশাল তরঙ্গরাশি প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলে, তখন সোফার সিষ্টেমের সাহায্যে তার পূর্বাভাস জানা যায়। ১৯৫৪ সালে ডায়েজ ও শীহি (Dietz ও Sheehy) প্রশান্ত মহাসাগরের সাউণ্ড চ্যানেল থেকেই সাগরতলে মায়োজিন (Myojin) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সন্ধান পেয়েছিলেন।

"বিজ্ঞান শিক্ষা এখন শুধু আমাদের জ্ঞানের উন্নতির জন্য নহে। আমাদের জাতীয় জীবন মরণ ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশের সমৃদ্ধশালী লোকেরা কবে উন্নত বিজ্ঞান সাহায্যে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ইহলোকে দশজন নিরন্নকে প্রতিপালন পূর্ব্বক অপার কীর্ত্তি ও পরলোকের জন্য অপার পুণ্য সঞ্চয় করিবেন ?"

—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

রোগোৎপত্তি সম্পর্কে আয়ুর্বেদের ধারণা

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

দেহ, মন ও আত্মার রহস্যময় ও জটিলতাপূর্ণ সম্মেলনকে আশ্রয় করে মানুষের প্রাণের অধিষ্ঠান। সম্মেলনটি কোন কারণে ভেঙ্গে পড়লে, আশ্রয়চ্যুত হওয়ায় মানবের প্রাণবিয়োগ ঘটে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক নামক পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দেহ প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। মন অপ্রত্যক্ষ ও ও অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য—তার তৎপরতা মানবের আপন আপন স্বভাবে প্রকাশ পায়। আত্মা এই সকল ইন্দ্রিয়ের অতীত অথচ এই সকলের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। আত্মা যে কি ও কিভাবে তৎপর, সে বিষয়ে প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তা-ধারার অন্ত ছিল না। আত্মাকে সাধারণভাবে বাক্যে ও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না বলে অনির্বচনীয় ও অতীন্দ্রিয় স্বরূপ, কেবলমাত্র উপলব্ধির যোগ্য। প্রাচীন ভারতীয়দের নিকট আত্মোপলব্ধি করা চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল। তাদের জীবনের সকল প্রকার সাধ্য-সাধনা, ধ্যান-ধারণা সেদিকেই নির্দিষ্ট থাকতো। তারা স্বীকার করেছিল, আত্মা অক্ষয় ও অব্যয় এবং অজর ও নির্বিকার অথচ সর্বকালব্যাপী। কিন্তু তাদের মতে, দেহ ও মনের বিকার সততই ঘটে চলেছে। ফলে, যখন প্রতিকূল পরিবেশের উদ্ভব হয়, তখন দেহ ও মনের মধ্যে রোগোৎপত্তির কারণ সঞ্চারিত হয়। মূলতঃ আয়ুর্বেদ মতে তাই দ্বিবিধ রোগের সাক্ষাৎ মেলে, যথা—দেহবিকারগত শারীরিক রোগ এবং মনো-বিকারগত মানসিক রোগ। আত্মোপলব্ধির জন্যে নীরোগ হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। সেই জন্যে প্রাচীন ভারতীয়েরা রোগের উৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করবার বিপুল সাধনা এবং লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগে রোগ প্রতিকারের মহান ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

শারীরিক রোগ

দেহের গঠন : রোগোৎপত্তি সম্পর্কে তাদের যে সব ধারণা ছিল, সে সবের আভাস পেতে হলে প্রথমেই জানতে হবে, তাদের ধারণায় মানবদেহ কি কি উপাদানে ও কিভাবে গঠিত। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় চেতন-অচেতন সব কিছুই কতকগুলি মৌলিক উপাদানে গঠিত। সেই মৌলিক উপাদান-গুলিকে বলা হতো "ভূত" এবং সেগুলি সংখ্যায় পাঁচটি; যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। প্রত্যেকটি ভূতেরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়; যেমন—ব্যোম বা আকাশ শব্দ, মরুৎ বা বায়ু বা পবন স্পর্শ, তেজ বা অগ্নি রূপ, অপ্ বা জল রস (বা স্বাদ) এবং ক্ষিতি বা মৃত্তিকা গন্ধ গুণের দ্বারা স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে ভূষিত। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকগণ এই পাঞ্চভৌতিক মতবাদের আলোকে দেহকে এই ভাবেই দেখেছিলেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্—এই পাঁচটি ভূতের রূপান্তরসমূহের সমন্বয়ে মানবদেহ গঠিত

দেহ ধারণ ও পোষণ : মাতৃজঠরে থাকবার সময় ভ্রূণের দেহ মাতার দেহ থেকে পুষ্টিলাভ করে ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে পৃথকভাবে নিজেকেই দেহ ধারণ ও পোষণের ব্যবস্থা করতে হয় প্রত্যেক মানুষকে। সে জন্যে খাদ্য ও পানীয় আহরণের ব্যবস্থা করতে হয়। এই জন্যে খাদ্য ও পানীয়কে আহার্য বস্তু বলা হয়। আহার্য বস্তুর গঠন পাঞ্চভৌতিক। সুতরাং আহার্য গ্রহণ করাতে দেহের মধ্যে পাঞ্চভৌতিক উপাদানসমূহ আনীত হয়। সে সব যথাযথ

দেহসাৎ করবার যে ব্যবস্থা, তাকে পরিপাক-ক্রিয়া বলা হয়। পরিপাককালে ভুক্ত আহার্য বস্তু থেকে একটি অংশ বিশুদ্ধ বা সারাংশে রূপান্তরিত হয়। তাকে বলা হয়, আহার-প্রসাদ। অপর অংশ অসার হিসাবে পরিত্যক্ত হয়। তাকে বলা হয় কিট্ট। আহার-প্রসাদ দেহ গঠনের প্রাথমিক উপকরণ। এই প্রাথমিক উপকরণ থেকে সাতটি পৃথক পৃথক উপকরণের উদ্ভব হয়, যথা—রস (অন্ন রস), রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র। এই উপকরণসমূহকে ধাতু বলা হয়। যেহেতু এগুলি পরস্পরের সহ-যোগিতায় দেহ ধারণের কারণ, সেহেতু এগুলি একত্রে সপ্ত-ধাতু নামে পরিচিত।

বিবর্তনমূলক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ধাতু-সমূহের উৎপত্তি। ভুক্ত ও জীর্ণ আহার্য বস্তু রস-ধাতু থেকে সুরু করে ক্রমান্বয়ে শুক্র-ধাতুতে পরিণতি লাভ করে। জীর্ণ আহার্য থেকে রস-ধাতু উৎপন্ন হয়, রস-ধাতু থেকে রক্ত ধাতু, রক্ত ধাতু থেকে মাংস-ধাতু, মাংস-ধাতু থেকে মেদ-ধাতু, মেদ-ধাতু থেকে মজ্জা-ধাতু এবং সর্বশেষে মজ্জা-ধাতু থেকে শুক্র-ধাতু। শুক্র-ধাতুর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রজনন-সংক্রান্ত দেহ-ধাতুর ইঙ্গিত আছে। পরিপাকক্রিয়ার ফলে এরূপ ক্রমিক রূপান্তর নিয়ত চলতে থাকে এবং একই সময়ে ভুক্ত আহার্য বস্তু থেকে একটি সার ভাগ (আহার-প্রসাদ) ও অবশিষ্ট অসার ভাগ (কিট্ট) বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।

সপ্ত-ধাতু যেমন দেহ ধারণ বা অবলম্বন (Support) করে, তেমনি আবার পোষণও (Nourish) করে। ফলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে এবং নানাভাবে দেহের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়, সে সব পূরণ হয়ে যায়।

পরিপাককালে উদ্ভূত ভুক্ত আহার্যের অসার ভাগ দেহগঠনের অনুপযোগী বলে বর্জিত হয় ও তা কিট্টে পরিণত হয়। তাকে সে জন্যে মলও বলা হয়। এছাড়া ধাতুসমূহের উৎপত্তি-কালে কিছু কিছু অংশ দেহগঠনের অনুপযোগী হিসাবে বর্জিত হয় মলরূপে; সে জন্যে তাদের বলা হয় ধাতু-মল। আহার্য-বস্তুর বর্জনীয় অবিশুদ্ধ অসারভাগ থেকে মল ও মূত্র, স্বেদ ও বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক মলেরও উৎপত্তি হয়। সাধারণভাবে আহার্যের অসার ভাগজাত মল এবং ধাতু-মল সবই মলের অন্তর্গত। এই সব বর্জনীয় মলের মধ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। দেহ-ধারণ বা অবলম্বনের জন্যে এই তিনটি মলের অবদান কিছু কম নয়। স্বাভাবিক বাঞ্ছনীয় মাত্রায় তৎপর থাকবার সময়ে এই তিনটি মল দেহধারণে বিশেষ সাহায্য করে বলে এদের মল-ধাতু বলা হয়। কিন্তু সপ্ত-ধাতুর মত মল-ধাতু দেহের কোনরূপ পোষণ করে না এবং সপ্ত-ধাতুর সঙ্গে সেখানেই তাদের পার্থক্য, বরং দেহের প্রাথমিক রুগ্ন দশার মূলে মল-ধাতুর উপস্থিতি কাজ করে থাকে। বিকারগ্রস্ত মল-ধাতুর প্রকোপ রোগের কারণ ঘটায়। সুতরাং কিছু বিশদভাবে এদের সম্পর্কে জানা উচিত।

ত্রিদোষ

বায়ু, পিত্ত ও কফ সপ্ত-ধাতুকে দূষিত করতে ও রুগ্ন দশার সৃষ্টি করতে পারে এই জন্যে এদের দোষ বলা হয়—একত্রে ত্রিদোষ নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে সপ্ত-ধাতু ত্রিদোষের সাহায্যে দূষিত হয়ে যেতে পারে বলে তাদের দূষ্য বলা হয়। মল, মূত্র ও স্বেদাদি দেহাভ্যন্তরস্থ অন্যান্য আবর্জনাও এভাবে ত্রিদোষের সাহায্যে দূষিত হতে পারে বলে তারাও দূষ্য নামে পরিচিত।

অবস্থিতি:—বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক দোষত্রয় দেহের সর্বস্থানে ছড়িয়ে থাকে সত্য, কিন্তু এগুলি হৃদয় ও নাভির নিম্ন, মধ্য ও

ঊর্ধ্বদেশে বিশেষভাবে অবস্থান করে। সুশ্রুতের মতে, বায়ু বিশেষভাবে নাভির নিম্নদেশে নিতম্ব (Hipbone) ও পায়ুর (Anus) মধ্যবর্তী স্থানে (Pelvic cavity) বিরাজ করে, হৃদয় ও নাভির মধ্যদেশে পিত্তের অবস্থিতি এবং অস্ত্র কফের বিশেষ স্থান। চরকের মতে, কফ বিশেষভাবে হৃদয়ের ঊর্ধ্বদেশে অবস্থান করে।

হ্রাস-বৃদ্ধি: ত্রিদোষ সব সময়েই বিরাজ করছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ কালে তাদের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। দেহীর বয়স এবং দিন, রাত্রি ও আহারের শেষ, মধ্য ও আদিতে বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ লক্ষ্য করা যায়; অর্থাৎ আহার করবার সময়ে প্রথমভাগে কফের, মধ্যভাগে পিত্তের এবং শেষভাগে বায়ুর প্রাধান্য ঘটে। অনুরূপভাবে বয়স, দিন ও রাত্রির সঙ্গে সম্পর্ক বর্তমান, যেমন—বয়সের প্রথমভাগে অর্থাৎ শৈশব অবস্থায় কফ, মধ্য বয়সে পিত্ত এবং অন্তিম বয়সে বায়ু অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

লক্ষণ ও তৎপরতা: অবিকৃত ও বিকৃত অবস্থায় ত্রিদোষের লক্ষণ ও তৎপরতার পরিচয় থেকে বায়ু, পিত্ত ও কফের স্বরূপ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হতে পারে। অবিকৃত ও স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ুর প্রভাবে শ্বাস-কার্য, বাক্ ও চিন্তাশক্তি সংক্রান্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যথাযথ ক্রিয়াকলাপ এবং যথাযথ-ভাবে মল-মূত্রাদির বহির্গমন হয়ে থাকে। যখন পিত্ত অবিকৃত ও স্বাভাবিক থাকে, তখন দর্শন, পরিপাক, দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহের কোমলতা ও লাবণ্য, মনের প্রফুল্লতা এবং বুদ্ধির উদ্ভব ঘটে। অবিকৃত কফের স্বাভাবিক প্রভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সন্ধিসমূহের যথাযথ সচলতা, দেহের গঠনবিন্যাস, দেহের সাধারণ দৃঢ়তা, বল ও ক্ষমতা, সহিষ্ণুতা, সাহসিকতা এবং অলোভের লক্ষণ দেখা যায়। তাছাড়া অন্যান্য যে সব লক্ষণ সাধারণভাবে ত্রিদোষের অস্বাভাবিক অবস্থার প্রভাবে উদ্ভূত হতে দেখা যায়, সেগুলি দোষানুসারে সংক্ষেপে বিবৃত করা হচ্ছে:—

বায়ু—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির স্খলনভাব, স্থানচ্যুতি, প্রসারতা ও বৃদ্ধি, অপ্রসন্নতা, তৃষ্ণা, বিমর্ষতা, এবং সর্বদেহে যন্ত্রণাবোধ, ত্বকের রুক্ষতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কাঠিন্য ভাব, কর্মে অনিচ্ছা, দেহবর্ণের রক্তাভা ধারণ, কষায় স্বাদানুভূতি, স্বেদ নিঃসরণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পক্ষাঘাত, সঙ্কোচন ইত্যাদি। এই সব লক্ষণ দেখলে চিকিৎসক বুঝতে পারেন যে, রোগীর ব্যাধি বায়ুর প্রকোপে সৃষ্টি হয়েছে

পিত্ত—জ্বালা ভাব, উষ্ণতা বোধ, দেহে গভীর ক্ষত-ধারা ও রক্তাভা ইত্যাদি। দেহের যে যে অংশে পিত্তের অবস্থিতি, সেই সেই অংশে ঐরূপ ভাবের প্রকোপ নিরীক্ষণ করা যায়। পারদর্শী চিকিৎসক এরূপ অবস্থাগত লক্ষণ দেখে জানতে পারেন যে, রোগ পিত্তের প্রকোপে উদ্ভূত হয়েছে।

কফ—দেহবর্ণের শ্বেতাভা ধারণ, শীতলতা বোধ, ক্ষীণতা বোধ, গুরুভার বোধ, অসাড় ভাব, তৈলাক্ত বোধ, মিষ্টি স্বাদের অনুভূতি এবং কাজ করবার ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রী ভাব। কোন রোগে এই প্রকার লক্ষণ দেখা গেলে চিকিৎসক সাধারণ ভাবে সিদ্ধান্ত করেন যে, কফের প্রকোপ ঘটেছে।

প্রকারভেদে লক্ষণ

বায়ু:—চরক পাঁচ প্রকার বায়ুর উল্লেখ করেছেন। অথর্ববেদেও এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায়; যথা—(১) উদান বায়ু—কণ্ঠস্থিত উদান বায়ুই বাক্, গীত প্রভৃতির কারণ ও তা ঊর্ধ্বদিকে গমন করে থাকে। এই বায়ুর প্রকোপে যে সব রোগ হয়, সেগুলি কণ্ঠদেশ ও তার উপরের দিকেই ঘটে। (২) প্রাণবায়ু—হৃদয়দেশে অব-

স্থিতি করে, মুখদেশ থেকে শ্বাসত্যাগ ঘটিয়ে থাকে এবং আহার্য বস্তুকে অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিয়ে দেয় ও আভ্যন্তরীণ স্থানের উদ্ভব ঘটায়। অস্বাভাবিক অবস্থায় হিক্কা, হাঁপানি ও তজ্জাতীয় রোগের জন্ম হয়। (৩) সমান বায়ু—পাকস্থলী ও অন্ত্রাদিতে আহার্য বস্তু পাচক রসের সাহায্যে পরিপাক করিয়ে থাকে এবং সেই সময় ভুক্তবস্তু থেকে অন্নরস, বর্জনীয় মল-মূত্রাদি বিশ্লেষণ করে দেয়। (৪) অপান বায়ু—দেহের নিম্নতর ভাগ থেকে মল, মূত্র, শুক্র, ঋতুস্রাব ও ভ্রূণকে নিম্ন দিকে পরিচালিত করে এবং অস্বাভাবিক দশাতে পড়লে তাথেকে বায়ু, শুক্র, মূত্রাধারের গুরুতর ব্যাধি হতে দেখা যায়। (৫) ব্যান বায়ু—সর্বদেহে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে থাকে, স্বেদ নিঃসরণ ঘটায় এবং চোখের পাতা খোলা-বন্ধ প্রভৃতি গতির কারণ হয়ে থাকে।

পিত্ত—চরক পিত্ত ও কফের প্রকারভেদ করবার কোনরূপ চেষ্টা করেন নি। কিন্তু সুশ্রুতে দেখা যায়, পাঁচ প্রকার পিত্ত ও পাঁচ প্রকার কফের কল্পনা করা হয়েছে। পিত্তগুলি এই প্রকার, যেমন – (১) পাচক পিত্ত—পাকস্থলী ও অন্ত্রাদির মধ্যস্থলে অবস্থান করে পরিপাক, অন্নরস, মূত্র ও মলাদির নিঃসরণ ঘটিয়ে থাকে। অস্বাভাবিক দশায় অজীর্ণ ও অম্ল, হৃদয়, কণ্ঠ ও পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ ঘটে। তৃষ্ণারও অনুভূতি হয়। (২) রঞ্জক পিত্ত—যকৃৎ ও প্লীহা বা পাকস্থলীতে থেকে অন্নরসকে রাঙিয়ে রক্তে পরিণত করে। অস্বাভাবিক দশায় পড়লে রক্ত-পিত্তের উদ্ভব হয় এবং যকৃৎ ও প্লীহাতেও গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। (৩) সাধক পিত্ত—হৃদয়ে অবস্থিত থেকে দৃষ্টি, স্মরণ ও কোন কিছু নির্ধারণ করাতে সাহায্য করে। অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটলে চিন্তাশক্তি লোপ পায় এবং হতভম্ব ভাব ও সন্ন্যাস রোগ ঘটে। (৪) আলোচক পিত্ত—লোচন বা নয়নের মধ্যে থেকে দৃষ্টি ঘটায়; কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় দৃষ্টিক্ষমতা লোপ পায়। (৫) ভ্রাজক পিত্ত—ত্বকে অবস্থিত থেকে কান্তি প্রদর্শন করে ও মলম শোষণ করে। কিন্তু অস্বাভাবিক দশায় ত্বকের রোগ দেখা দেয় এবং সেখানকার বর্ণান্তর পরিলক্ষিত হয়।

কফ—কফকে পাঁচ প্রকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যথা—(১) ক্লেদক কফ—পাকস্থলীতে আহার্য বস্তুকে সিক্ত করে এবং দেহের অন্যান্য যে সব স্থানে তার অবস্থিতি, সে সব স্থানকেও সিক্ত করে থাকে। অস্বাভাবিক দশায় ক্ষুধাহীনতা, মল-মূত্রাদির শ্বেতাভা ধারণ প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। (২) অবলম্বক কফ—হৃদয়ে অবস্থান করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির দৃঢ়তা রক্ষা করে; কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় শৈথিল্যের লক্ষণ উপস্থিত হয়। বোধক কফ—জিহ্বায় স্বাদানুভূতি ঘটায়, কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থা ঘটলে স্বাদানুভূতি বিঘ্নিত হয়। (৪) তর্পক কফ—মস্তিষ্কে অবস্থান করে সর্বপ্রকার বোধ-সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিকে তৈলসিক্ত করে সজীব রাখে। অস্বাভাবিক অবস্থায় স্মৃতি লোপ পায় এবং সকল প্রকার বোধ-সহায়ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিকার ঘটায়। (৫) শ্লেষ্মক কফ—সন্ধিস্থলসমূহে সচলতা সম্পাদন করে। কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় সচলতা বিঘ্নিত করে জড়তা আনয়ন করে।

রোগের উৎপাদনে ত্রিদোষের ভূমিকা

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, দেহ ধারণের তিনটি মৌলিক উপকরণ—দোষ, ধাতু এবং মল পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। রোগোৎপাদনে তাদের মধ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক ত্রিদোষের ভূমিকা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাও ঐ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে। আয়ুর্বেদের মতানুসারে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, তাদের সঙ্গে একই প্রকার বা সমান ধর্ম-বিশিষ্ট দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সংযোগ হলে দোষ,

ধাতু ও মলের বৃদ্ধি ঘটে এবং তাদের বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সংযোগে তাদের ক্ষয় হয়। এছাড়াও নানাবিধ কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকার ঘটে। দেহের বিভিন্ন স্থানে এরূপ ঘটতে পারে নানাপ্রকারে বায়ু, পিত্ত ও কফ তখন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এই সকল সম্মিলিত ব্যাপারের উপর নির্ভর করে রোগ নানারূপে প্রকাশ পায়। যে দোষ ধাতুকে দূষিত করে, তার প্রভাব অনুসারে রোগকে কয়টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; যেমন—বায়ুর দোষে যে সব রোগের উৎপত্তি হয় সেগুলি বায়ুজ রোগ, পিত্তের দোষে পিত্তজ রোগ এবং কফের দোষে কফজ রোগ।

বিকৃত দোষ দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। দোষের সংস্পর্শে দেহের যে তন্তু প্রভাবিত হয়, সেখানেই রোগের সূত্রপাত হয়। বিকার সামান্য মাত্রায় ঘটলে তা চলাচলের পথেই থেকে যায়। কালক্রমে যদি সেই বিকারটুকু কোন কারণে উত্তেজিত হয় এবং অন্য কোন ভাবে সেই উত্তেজনাকে প্রশমিত করা না যায়, তবে দোষটি অধিক মাত্রায় বিকৃত হয়ে পড়ে।

দেহের মধ্যে বায়ু, পিত্ত ও কফ তিন প্রকার অবস্থায় বিরাজ করতে পারে—(১) তাদের মাত্রা ক্ষীণ হতে পারে, স্বাভাবিক মাত্রায় থাকতে পারে, মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বা উত্তেজিত হতে পারে। (২) তারা উপরের দিকে বা নীচের দিকে বা আড়াআড়িভাবে পরিচালিত হয়ে যেতে পারে (৩) তারা পাকস্থলী বা দেহের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশে গিয়ে প্রবেশ করতে পারে। কেবলমাত্র স্বাভাবিক অবস্থা ও বাঞ্ছনীয় মাত্রাতে বিরাজ করতে থাকলেই বায়ু, পিত্ত ও কফ দেহ-ধারণ কার্যে সহায়ক হয়, নতুবা নয়। ত্রিদোষের স্বাভাবিক অবস্থা ও বাঞ্ছনীয় মাত্রা এতদূর গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় যে, তখনই ত্রিদোষকে প্রকৃতপক্ষে ত্রিধাতু বলা হয়ে থাকে। যেমন থামের উপর নির্ভর করে বাড়ী দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তেমনি ত্রিদোষরূপ তিনটি থামের উপর দেহ-প্রাসাদ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তখন। অথচ বিকৃতি ঘটলে বাঞ্ছনীয় মাত্রার তারতম্যানুসারে ত্রিদোষের বিষম অবস্থায় দেহ-প্রাসাদের অবস্থানচ্যুতি ঘটে এবং নানারূপ রুগ্নদশার কারণ ঘটে। বায়ু, পিত্ত ও কফের সুষম বা বাঞ্ছনীয় মাত্রা নির্ভর করছে দোষ, ধাতু ও মলসমূহের সাম্যাবস্থার উপর। পূর্বে লক্ষ্য করা গেছে যে, আহার্য বস্তু থেকে ধাতু, দোষ ও মলের উদ্ভব ঘটে। সুতরাং আহার্য বস্তুই সুস্থতা বা অসুস্থতার মূলে নিহিত। চরক সে জন্যে মন্তব্য করেছেন, "দেহ আহার্য সামগ্রী থেকে বৃদ্ধি ও পুষ্টি লাভ করে। পুষ্টির দোষে রোগের উৎপত্তি। সুস্থ দেহ ও রুগ্ন দেহের প্রভেদ, পুষ্টিকারক ও অপুষ্টিকারক আহার্য সামগ্রীর প্রভেদ।"

সুতরাং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কেবলমাত্র দোষের হ্রাস-বৃদ্ধিতেই রোগের উৎপত্তি হয়, বলা চলে না; কিংবা সেই হ্রাস-বৃদ্ধি আপনা-আপনি ঘটে তাও নয়। সে জন্যে মুখ্যতঃ দুই প্রকার কারণ বর্তমান। যথা—'নিজ' বা দেহের ভিতরকার অন্তর্নিহিত কারণ এবং 'আগন্তুজ' বা বহিরাগত কারণ। কারণানুসারে রোগকে আবার 'নিজ রোগ' এবং 'আগন্তুজ রোগ'—এই দুই ভাগেও শ্রেণীভুক্ত করা হয়। নিজ রোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রথমে প্রকোপিত বা বিকৃত হয়, তারপরে রোগোৎপত্তি হয়। কিন্তু আগন্তুজ রোগে প্রথমে রোগের উৎপত্তি হয়, পরে দোষের প্রকোপ হয়ে থাকে।

যে ব্যাপারের উপর নির্ভর করে রোগের উৎপত্তি হয়, তা এইভাবে ব্যক্ত করতে চাওয়া হয়েছে। নিদান বা পূর্বকারণ, দোষ এবং দুষ্যের পারস্পরিক সম্পর্কই রোগোৎপত্তির হেতু বলা চলে। যখন নিদান, দোষ ও দুষ্য পরস্পরের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে জড়িত, তখন রোগের সূত্রপাত

হয়। তাদের মধ্যে সেরূপ ক্রমান্বয়-গত পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান না থাকলে কোন রোগের জন্ম হয় না। আবার ক্রমান্বয়-গত ও পারস্পরিক সম্পর্ক যদি নিবিড় না হয় বা সম্পূর্ণ না হয় অথবা কারণগুলি দুর্বল হয়, তবে ক্ষীণমাত্রায় রোগের উদ্ভব হয় এবং রোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় না।

রোগোৎপত্তির বিভিন্ন পর্যায়

রোগোৎপত্তির বিভিন্ন পর্যায় সুশ্রুতে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। পাঁচটি পর্যায়ে বা ধাপে রোগের ক্রমবিকাশ ঘটতে দেখা যায়। যেমন, প্রথম পর্যায় বা ছায়া—সাধারণভাবে দোষের সঞ্চয় বা একত্র সমাবেশ ঘটে। দ্বিতীয় পর্যায় বা প্রকোপ—দেহতন্ত্রের ভিতর সঞ্চিত দোষ চলাচল করে ছড়িয়ে পড়ে। তৃতীয় পর্যায় বা প্রসার—দোষের পচন-জাতীয় একটি ব্যাপার ঘটে। বায়ুর প্রভাবে দেহের ভিতর দোষ চলাচল করে থাকে। কোন স্থানে যেমন বিপুল পরিমাণে জল জমলে বাঁধ ভেঙ্গে চারদিকে তা ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি-ভাবে সঞ্চিত দোষ পচনের পর এককভাবে, দুইটিতে মিশে বা তিনটি একত্রে দেহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে যায় এবং মেঘ থেকে বারিবর্ষণের মত রোগের লক্ষণসমূহ ছড়িয়ে দেয়। চতুর্থ পর্যায় বা পূর্বরূপ—এই বারে রোগের প্রাক-লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে একে একে। পঞ্চম বা চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিপূর্ণ রোগের বিকাশ ঘটে ও এটিকে বলা হয় রূপ। রোগের বিশেষ লক্ষণগুলি এই পর্যায়ে প্রকটিত হয়।

ত্রিদোষ তত্ত্বের সূত্রপাত ও বিকাশ

নিছক কল্পনা বা অনুমানের উপর ভিত্তি করে ত্রিদোষ তত্ত্বের উদ্ভব হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকেরা প্রকৃতির মধ্যে যে সব ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করতেন, সে সব থেকে প্রকৃত সত্য বোঝবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যাবলীর সুপরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা থেকে ক্রমে ক্রমে এই তত্ত্বের বিকাশ হয়েছিল, তার ইঙ্গিত আয়ুর্বেদ গ্রন্থাদি পড়লে বেশ বোঝা যায়। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রাণধারণের জন্যে বায়ু, তরল পানীয় এবং কঠিন আহার্য—এই তিনটি মৌলিক উপকরণের প্রয়োজন সকল প্রাণীই অনুভব করে থাকে। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন, অতিরিক্ত তাপ ও শীতলতা উভয়ই প্রাণধারণের পক্ষে মারাত্মক। আহার্য বস্তু পরিপাকের জন্যে তরল পদার্থের বিশেষ আবশ্যকতা আছে এবং রক্ত জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে সম্পর্কিত। এই সকল সাধারণ ও সরল তথ্যগুলি তদানীন্তন দার্শনিকদের বিবিধ তত্ত্বের আলোকে ব্যাখ্যাত হতো। নানারূপ মত এবং ঐ সকল পর্যবেক্ষণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সতত পরিবর্তন-শীল প্রকৃতির রাজ্যে অপরিবর্তনীয় যে সত্য নিহিত আছে, তার সমতুল সত্য মানুষের সারসত্তার মূলেও বর্তমান—এইরূপ একটি ধর্মীয় মত প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাঁদের ধারণা ছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে একই সারসত্তা বিরাজ করছে। বিশ্বজগৎকে চালিত করছে সূর্য, চন্দ্র ও অনিল বা পবন। এই সত্য তাঁদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ছিল। সূর্যে অগ্নি বা তাপ, চন্দ্রে শীতলতা বা সিক্তভাব এবং অনিলে বায়ুর প্রভাব প্রত্যক্ষ। সুতরাং অনিল, অগ্নি ও জলের প্রভাবে মানুষের জীবনযাত্রা যে সমভাবে পরিচালিত, তাতে অবাক হবার কি আছে? অনিল, অগ্নি ও জলের প্রভাবে রোগের উৎপত্তি যে নির্ভরশীল হবে, সে মৌলিক চিন্তার বীজও এইভাবে মানুষের মনে উপ্ত হয়ে যায়। চিন্তা ভাবনার বিবর্তনে অনিল, অগ্নি ও জল যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত ও কফের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে সুরু করে।

অনিল, অগ্নি ও জলকে প্রাকৃতিক শক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছিল। তাঁদের তৎপরতার মধ্যে গতিশীলতা লক্ষ্য করে তা ভাবা হয়েছিল। বায়ু, পিত্ত ও কফের উদ্ভব ও তাদের তৎপরতায় লক্ষ্য করা গেছে যে, তারাও গতিশীল অবস্থায় বর্তমান। আহার্য বস্তুর পরিপাককালে তারা যেভাবে প্রতিনিয়ত উদ্ভূত হয়, তা পূর্বে বলা হয়েছে। সেই সময়ে সপ্ত-ধাতুর সৃষ্টি সচল প্রক্রিয়াতেই ঘটে থাকে, সে ব্যাপারও লক্ষ্য করা গেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব সচল ও গতিশীল প্রক্রিয়ায় আনীত আহার্য বস্তুর পরিণামের উপর যে দেহ ধারণ ও পোষণ সম্ভব, তা বলাই বাহুল্য। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সাধারণভাবে সমার্থক 'দেহ', 'শরীর' ও 'কায়' শব্দ তিনটিকে পৃথক পৃথক অর্থে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। উপরিউক্ত গতিশীল প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক লক্ষণীয়। সংস্কৃত দিহ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন দেহ শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। আহার্য বস্তুর পরিপাকে রচিত সপ্ত-ধাতুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মানুষের গঠন-বিন্যাস দেহের রূপ পরিগ্রহ করে এবং তা বহিরঙ্গের চেহারায় প্রতিভাত হয়। শরীর শব্দটি 'শৃ' ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন; "শীর্যতে অনেন ইতি শরীরম্" বলতে বোঝায় অংশে অংশে বিভক্ত হয়ে যাওয়া। দেহের অভ্যন্তরদেশে পরিপাক সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলির দিকেই শরীর শব্দটি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। পরিপাক-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারের গোলযোগ থেকেই রোগের উদ্ভব হয় বলে দৈহিক না বলে শারীরিক বলা হয়। 'কায়' শব্দটি 'চি' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন—চয়ন বা সংগ্রহ অর্থে 'চি' ধাতুর প্রয়োগ হয়। 'চীয়তে অন্নাদিভিঃ' অর্থাৎ ভুক্ত আহার্য-বস্তু থেকে জীবনধারণের উপযোগী উপকরণসমূহ সংগ্রহ করবার মধ্যে দেহ-বৃদ্ধি ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়াগুলি সমবেতভাবে বোঝাচ্ছে। দেহ ও শব্দ দুটির মিলিত অর্থে 'কায়' শব্দের কল্পনা। শারীরিক রোগ চিকিৎসার নিমিত্ত আয়ুর্বেদের যে অংশে আলোচনা করা হয়েছে, তাকে 'কায়তন্ত্র' বলা হয়েছে সে জন্যে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ গতিশীল অবস্থায় বিরাজমান থাকায় তাদের আপন আপন স্বভাবে থাকবার ব্যাপারটিও স্থির নয়। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক গতিশীলতার মধ্যে একটি সাম্যভাব আনতে পারলে অবশ্য অন্য কথা। প্রাকৃতিক নিয়মে যখন বায়ু, পিত্ত ও কফ সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ স্ব স্ব ভাবে যথাযথভাবে অবস্থান করে, তখন তাদের বলা হয় 'স্ব-স্থ'। সেইরূপ 'স্ব-স্থ' (আপনভাবে বর্তমান থাকা) থাকাই হলো স্বাস্থ্যের কারণ। কিন্তু কোন কারণবশতঃ সাম্যাবস্থা বিচলিত, বিঘ্নিত বা পীড়িত হলে স্বস্থভাব লোপ পেতে পারে এবং অস্বাস্থ্যের হেতু ঘটায়; ফলে রোগের কারণ সঞ্চারিত হয়। সাম্যাবস্থা পীড়িত হওয়ায় রোগোৎপত্তি হয় বলে সেই অবস্থা বৈগুণ্যকে পীড়া বলা হয়। ইংরেজিতে রোগকে বলা হয় ডিজিজ (Dis-ease), যার সাধারণ অর্থ আরামের অভাব। সাম্যাবস্থা বিচলিত হওয়ায় স্বাভাবিক স্বস্থভাবের তিরোভাবে স্বাচ্ছন্দ্য (আপনাতে আপনভাবে থাকার যে ছন্দ আছে) ও আরামের যে ব্যাঘাত ঘটবে, তা আর বিচিত্র কি? সে জন্যে ইংরেজি ডিজিজ কথাটির প্রতিশব্দ 'রোগ' না করে 'ব্যারাম' (বিগত আরাম) বলা বেশী সমীচীন মনে হয় না কি?

মানসিক রোগ

মনের স্বরূপ: মানুষের মন রহস্যে আবৃত। সেই আবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করা যায় নি এখনও পর্যন্ত। বিভিন্ন দিক থেকে তা ভেদ করবার নানারূপ চেষ্টা হয়েছে মাত্র। ফলে মনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানা পণ্ডিত নানা মত প্রকাশ করে থাকেন। একশ্রেণীর পণ্ডিত

দার্শনিকদের মতে, মন সর্বব্যাপী নয় অথবা পারমাণবিকও নয়। সুতরাং তা চিরন্তন নয়, তার আরম্ভ আছে ও বিস্তার সীমিত; অর্থাৎ মন একটি সীমিত মাত্রাবিশিষ্ট পদার্থ বিশেষ। সূর্যকিরণের মত মন বিকিরণময়, স্বচ্ছ ও লঘু-স্বভাব এবং সচল। বেদান্তে মনকে ভৌতিক রূপে বর্ণনা করেছে—যেহেতু অবিমিশ্র সূক্ষ্ম ভূত-সমূহের সমবায়ে তা গঠিত হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে, ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্মতম অংশসমূহ থেকে মনের গঠন সম্পাদিত হয়। মনকে অন্তঃকরণও বলা হয়। মনের গঠন বা সজ্জা সব সময়ে একপ্রকার নয়। মন সঙ্কোচন ও বিকাশশীল বা Elastic ধর্মবিশিষ্ট। বস্তুতঃপক্ষে রশ্মির আকারে মন দেহ থেকে নির্গত হয়ে মনোগ্রাহ্য বস্তু বা বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, তাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করে ও সেটির রূপ পরিগ্রহ করে বলেই বস্তু বা বিষয়টিকে মনের মধ্যে ধারণ বা গ্রহণ করা যায়। চতুর্দিকে কত শত বস্তু ও ঘটনারাশি বিরাজ করছে, কিন্তু সব কিছুকেই আমরা এক সময়ে মনের মধ্যে ধারণ করতে পারি কি? যতক্ষণ কোন একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা ঘটনার প্রতি মন যুক্ত না হয় বা মনোনিবেশ না করি, ততক্ষণ সেটি অমনোযোগিতার দরুণ আমাদের মনের গোচরীভূত হয় না, তা সকলেরই জানা আছে। অতএব মনের সঙ্কোচন বা বিকাশশীলতা ধর্মটিও সকলের অবিদিত থাকবার কথা নয়। মোটামুটিভাবে দেখা যায়, জড় পদার্থের সঙ্গে মনের সম্পর্ক সুনিবিড়। সুতরাং আহার ও মনের মধ্যে সম্পর্ক যে নিকট হবে, তা বলা বাহুল্য মাত্র।

মনের অবস্থিতি—মন ইন্দ্রিয়ের পথে চলাচল করে থাকে। সে জন্যে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক নামক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাহনে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় বিশ্বপ্রকৃতি মনের গোচরে আনীত হয়। মন শক্তিরূপে বিশ্বপ্রকৃতিকে জানতে সাহায্য করে। মস্তিষ্কের মধ্যে মনের সেই শক্তি অবস্থান করছে। মন মস্তিষ্কের ভিতর দেহের আবরণের মধ্যে নিহিত। তাই মনকে বহির্বিশ্বের সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন বলে কল্পনা করবার একটা প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তা ঠিক নয়। রহস্যপূর্ণ উপায়ে মন বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সতত সংস্পর্শ রেখে চলেছে। অচেতন-ভাবে বোধ হয় মন এইরূপ সংস্পর্শ বজায় রেখে চলে। কখনও কখনও সেই অচেতন অবস্থা থেকে চৈতন্যময় অবস্থার বিকাশ ঘটে। ভারতীয় দার্শনিকদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে একটি মত বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয় যে, মনের তৎপরতা যে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ, তা নয়, বরং মন অদ্ভুত উপায়ে রশ্মির মত সেই সীমানা ছাড়িয়ে বহির্দেশেও বিকিরিত হয়ে পড়ে এবং সেখানে আপন তৎপরতার এলাকাও রচনা করে থাকে। টেলিপ্যাথি বা চিন্তাভাবনার চলাচল, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, মনের জোরে রোগ-নিরাময় প্রভৃতি ব্যাপার সেরূপ এলাকার অন্তর্গত। মন মস্তিষ্কের সীমানার মধ্যে অবস্থান করলেও তার তৎপরতা তার বাইরেও প্রকট হতে পারে—এই বিশিষ্ট মতটি সাধারণভাবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানী-দের নিকট এখনও সর্বাংশে গ্রাহ্য হতে পারে নি। তবে, দেহের বাইরে অবস্থিত বস্তু ও ঘটনারাশি মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং করেও থাকে, সে কথাটা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অস্বীকার করেন না। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের উপরের মতটিকে এভাবে পরোক্ষে স্বীকার করেন। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য পরিবেশ যেমন মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তেমনি মনও আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে, প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের নিকট এটি একটি মৌলিক স্বীকার্য।

মনের হাবভাব বা মেজাজ—আভ্যন্তরীণ বা বাহ্য পরিবেশের অবস্থার উপর মনের

হাবভাব বিশেষভাবে নির্ভর করে। কোন প্রিয়জনকে শীঘ্রই দেখতে পাব, কোন আকাঙ্খিত বস্তু লাভ করা যাবে ইত্যাদি শুভ ভাবনায় মগ্ন থাকলে অন্তঃকরণে যে প্রফুল্লতার সঞ্চার হয়, তা কার না জানা আছে? কোন বিপদের আশঙ্কা, কোন বস্তু লাভ করতে পারবো কি পারবো না—এমন সব অশুভ চিন্তা-ভাবনার ফলে মনের বিষণ্ণতা স্বতঃই পরিলক্ষিত হয়। মেঘলা দিনে নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন আকাশের শোভায় কবি মনে যেমন অনেক ক্ষেত্রে উল্লাসের সঞ্চার হয়, তেমনি অনেকের মনে আবার একটা বিষাদের ছায়াপাতও ঘটতে দেখা যায়। প্রভাতের সূর্যোকরোজ্জ্বল প্রকৃতিদেবীর সস্মিত ছবি দর্শন করলে প্রায় সকলেরই মন অত্যন্ত পুলকিত হয়ে ওঠে। মনের হাবভাব, ভাব-গতিক ভাল কি মন্দ, সে বিষয়টি যে পরিবেশের উপর নির্ভর করে, তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। চলিত ভাষায় মনের হাবভাব, ভাব-গতিককে মেজাজও বলা হয়। তাদের বাড়ীর দুর্ঘটনায় পরিবারের সকলের মন-মেজাজ ভাল নেই, এরূপ কথা সচরাচর বলতে শোনা যায়।

অবস্থাভেদে মনের ত্রিগুণময় সত্তা—পারিপার্শ্বিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থানুসারে মনের যে সকল গতিবিধি, হাবভাব বা মেজাজ লক্ষ্য করা যায়, সেগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীগত প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। মনের এই তিনটি প্রকৃতিগত অবস্থাকে তার ত্রিগুণময় সত্তা বলা হয়। মনের যে অবস্থা-বশে সচল ভাবাবেগসমূহ ও কর্মতৎপরতা সঞ্চারিত হয়, সেটিকে বলা হয় রজঃ গুণ। যে অবস্থাবশে সাধারণ ভাবে নিষ্কর্মা বা আলস্যভাবের উদয় হয় তার নাম তমঃ গুণ। মনের যে অবস্থাবশে রজঃ ও তমঃ এই দুটি গুণের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হয়, তাকে বলা হয় সত্ত্ব গুণ। রজঃ গুণের আধিক্যে প্রধানতঃ এই ভাবগুলি পরিলক্ষিত হয়; যথা—লোভ, কামনা, হিংসা, ঘৃণা, অহমিকা, হিংস্রতা, অধীরতা প্রভৃতি, যার প্রভাবে ব্যক্তি সতত অতিরিক্ত কর্মচঞ্চলতার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়। তমঃ গুণের আধিক্যে প্রধানতঃ এই ভাবগুলি লক্ষ্য করা যায়, যথা—মূর্খতা, বুদ্ধিহীনতা, জড়তা, আলস্য, বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি যার প্রভাবে ব্যক্তি সতত পরম নিশ্চেষ্টতার ভারে নিপীড়িত হতে থাকে। অথচ ব্যক্তির জীবনে শান্তি ও সুস্থতা আনতে হলে অতিরিক্ত তৎপরতা বা অতি আলস্য কোনটির প্রভাবেই পড়া চলে না। সুতরাং রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে সাম্যবিধান করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা করা সম্ভব সত্ত্ব গুণের আধিক্য-বশে। যে ব্যক্তির মধ্যে সত্ত্ব গুণের আধিক্য বিরাজ করে, তার মধ্যে রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্য ও সামঞ্জস্য স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান থাকে বলে সুস্থ ও অবিকৃত মনের রাজত্ব চলে। পক্ষান্তরে রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে সাম্য ও সামঞ্জস্য বিচলিত হলে মনের নিজস্ব সত্তার বিকার ঘটে এবং মানসিক রোগের কারণ সঞ্চারিত হতে দেখা যায়।

ত্রিগুণ ও ত্রিদোষের সম্পর্ক—বায়ুর প্রধান কার্যাবলী গতিশীলতার মধ্যে প্রকাশিত। উৎসাহ, উদ্দীপনা প্রভৃতি কর্মতৎপরতা প্রদর্শনের মধ্যে বায়ুর প্রভাব বুঝতে হবে। সুতরাং রজঃ গুণ ও বায়ু-প্রভাবিত তৎপরতার মধ্যে একটি সমভাবাপন্ন সম্পর্ক সহজেই ধরা পড়ে।

কফের কার্যাবলী রক্ষণশীলতার মধ্যে মূলতঃ প্রকটিত। স্থিতিশীল অবস্থার দিকে যাবার একটি ঝোঁক স্বভাবতঃই কফ-প্রকৃতিসম্পন্ন লোকের মধ্যে দেখা যায়। অতএব কফ-প্রভাবিত কার্যাবলী ও তমঃ গুণের মধ্যে সগোত্রীয়তা লক্ষণীয়।

পিত্তের প্রভাব মূলতঃ সাম্যবিধায়ক। দেহা-

ত্যন্তরস্থ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের সামঞ্জস্য বিধান ও রূপান্তর সাধন করা হচ্ছে পিত্তের অন্যতম কাজ। সত্ত্ব গুণ ও পিত্তের প্রভাবের মধ্যে মিল স্বতঃই এই ভাবে ধরা পড়ে।

মনের পীড়ন ও মানসিক রোগের কারণ—যা চাই তা পেলে এবং যা চাই না, তা না পেলে মনে আনন্দ আর ধরে না—একথা সকলেরই অভিজ্ঞতা-প্রসূত। কিন্তু ঘটনাস্রোত এমনি যে, যা চাই তা সব সময়ে পাওয়া যায় না বা যা চাই না, তা সব সময়ে সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে যা চাই তা না পেলে এবং যা চাই না, তা পেলে মন বিষণ্ণ ভাব ধারণ করে। আকাঙ্খিত বস্তু বা বিষয়ের অলাভ এবং অনভিপ্রেত বস্তু বা বিষয়ের লাভ মনের উপর এমন বলপ্রয়োগ বা প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে মনের স্বাভাবিক গতিবিধি ব্যাহত হয় এবং মনের উপর পীড়ন সুরু হয়। এরূপ অবস্থায় পড়লে মানসিক রোগ বা মানসিক পীড়ার কারণ ঘটে।

রজঃ গুণ বা তমঃ গুণের প্রভাবে মন যখন কোন কার্যের ফল আকাঙ্খা করে অথচ সেটি লাভ করতে পারে না, মনের উপর তখন পীড়ন সুরু হওয়া স্বাভাবিক। রজঃ গুণের বশে কোন ব্যক্তি যদি কখনও আকাঙ্খা করে যে, কোন একটি কার্য সে করবে অথচ কোন কারণে সেটি সম্পন্ন না হতে পারে, তবে তার কর্মক্ষমতায় বাধা উপস্থিত হওয়াতে স্বাভাবিকভাবে সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। আবার তমঃ গুণের বশে যদি কোন একটি কাজ করতে ইচ্ছা না করে, অথচ ঘটনাস্রোতে সেটি ঘটে যায়, তবে তার ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হওয়ায় সে আহত বোধ করে। এরূপ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক ইচ্ছার পরিপন্থী পরিবেশে মনের অভিলাষ পূর্ণ হতে পারে না এবং বিরূপ পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাব কাটিয়ে ওঠবার শক্তিরও অভাব ঘটতে থাকে। তখন সাধারণতঃ সত্ত্ব গুণের বাঞ্ছনীয় মাত্রাধিক্য হ্রাস পেতে থাকে। রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্য বিঘ্নিত হয় এবং তজ্জনিত বিরূপ প্রভাব অতিক্রম করবার ক্ষমতাও সেই সঙ্গে লোপ পেতে থাকে। ফলে মানসিক বিকার ঘটতে থাকে। পরিণামে মানসিক রোগের কারণ ক্রমশঃ উপস্থিত হয়।

মনের ত্রিগুণাতীত অবস্থা

সাধারণ মানুষের মধ্যে মনের ত্রিগুণময় সত্তার সাক্ষাৎ সচরাচর মিলে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি মনের গুণময় সত্তা গভীরভাবে অনুধাবন করে গুণত্রয়ের প্রভাব অতিক্রম করবার চেষ্টা করে সফল হতে পেরেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে মনের সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলা যায়। ত্রিগুণাতীত অবস্থায় আসীন ব্যক্তির মন কোন প্রকার ভাবাবেগ বা আলস্যের বশে বশীভূত হয় না এবং তাঁকেই প্রকৃত স্বস্থ ব্যক্তিরূপে বর্ণনা করা চলে। সেরূপ ব্যক্তি সত্য সত্যই আপনাতে আপনি মগ্ন হয়ে থাকেন এবং মনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করবার ফলে জ্ঞানকে স্থির রাখতে পারেন। সেই জন্যে ঐরূপ ব্যক্তিকে স্থিতপ্রাজ্ঞ বলা হয়। নির্বিকার মনের অধিকারী স্থিতপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত সুস্থ। চরকে উল্লেখ আছে, সেরূপ ব্যক্তির নিকট সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও বিমর্ষ ভাব এবং সোনা ও পাথরের টুক্‌রা সমান অর্থ বহন করে থাকে। আয়ুর্বেদের চরম লক্ষ্য ঐরূপ স্বস্থ অবস্থা লাভ করা।

প্রাণীদের পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া

রমেন দেবনাথ

রূপকথায় অনেক দৈত্যদানবের গল্প আছে, যাদের মাথা কেটে দিলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মাথা গজিয়ে ওঠে। আমাদের পৌরাণিক শাস্ত্রেও এই ধরণের গল্প আছে। রূপকথা এবং পৌরাণিক শাস্ত্রের এই সব ঘটনাবলীর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কিনা, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু কতকগুলি প্রাণীর বেলায় সত্য সত্যই কাটা মাথার জায়গায় আর একটি মাথা বা বিনষ্ট অঙ্গের স্থানে আর একটি নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রাণীর কোন কর্তিত অংশ থেকে আর একটি নতুন প্রাণীর জন্ম হওয়া বা বিনষ্ট অঙ্গের জায়গায় আর একটি নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হবার প্রক্রিয়াকে পুনরুৎপাদন (Regeneration) বলা হয়।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই পুনরুৎপাদনের বিষয় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অ্যারিষ্টটল, প্লিনী প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের বিবরণ থেকে পুনরুৎপাদনের কথা জানা যায়। তবে পরীক্ষা-মূলকভাবে প্রাণীদের মধ্যে এই প্রক্রিয়ার বিষয় সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে। আব্রাহাম ট্র্যাম্‌ব্লে হাইড্রার (একনালী-দেহী প্রাণী) উপর সর্বপ্রথম পুনরুৎপাদনের পরীক্ষা করেন। তিনি এই প্রাণীকে কয়েকটি অংশে কেটে দেখেন যে, প্রত্যেকটি কর্তিত অংশ থেকেই এক-একটি নতুন হাইড্রার জন্ম হয় (১নং চিত্র)। ট্র্যাম্‌ব্লের এই আবিষ্কার তখনকার বৈজ্ঞানিক মহলে এক কৌতূহলের সৃষ্টি করে। তারপর ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে মি. বনেট কেঁচোর উপর এবং

১নং চিত্র

হাইড্রার পুনরুৎপাদন।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে স্প্যালানজেনী উভচর জাতীয় প্রাণী স্যালামাণ্ডারের উপর পুনরুৎপাদন সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করেন। বর্তমানে পুনরুৎপাদন নিয়ে প্রাণী-বিজ্ঞানীরা নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা বেশী দেখা যায়। প্রাণী-জগতের যতই উপরের স্তরে ওঠা যায়, এই ক্ষমতা ততই কম হতে দেখা যায়। যেহেতু পুনরুৎপাদন একটি ক্রমবৃদ্ধির প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়া নিম্নস্তরের প্রাণীদের জ্রূণ ও কীড়ার মধ্যেই ঘটে থাকে।

একনালী-দেহী প্রাণী—এই পর্বের অন্তর্গত হাইড্রা নামক প্রাণীদের পুনরুৎপাদন-ক্ষমতার বিষয় অনেকেরই জানা আছে এবং এই প্রাণীতেই পুনরুৎপাদনের বিষয় সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়।

হাইড্রা নাম দেওয়া হয়েছে গ্রীক শব্দ Hydra থেকে। গ্রীকদের পৌরাণিক কাহিনীতে হাইড্রা নামক একটি ৯-মাথাবিশিষ্ট সামুদ্রিক সর্পের কথা আছে, যার একটি মাথা কেটে ফেললে সেখানে দুটি মাথা গজিয়ে উঠে। আমাদের এই হাইড্রার ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই হয়। এর
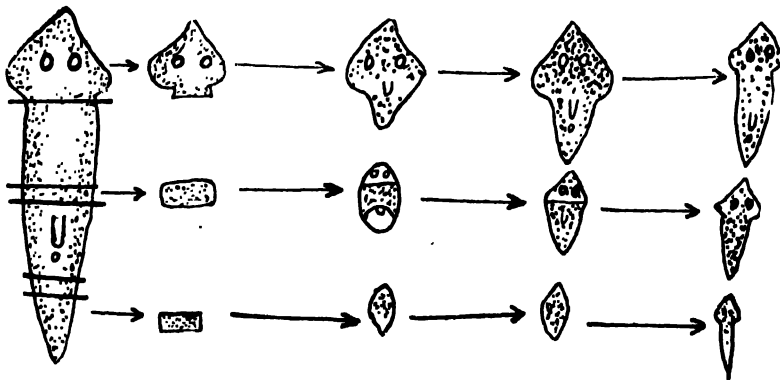
২নং চিত্র
প্ল্যানেরিয়ার পুনরুৎপাদন।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে আদ্যপ্রাণী (Protozoa), ছিদ্রালো প্রাণী (Porifera, Sponge), একনালী-দেহী প্রাণী (Coelenterata), চ্যাপ্টা কৃমি জাতীয় প্রাণী (Platyhelminthes), অঙ্গুরীমাল প্রাণী (Annelida), সন্ধিপদ প্রাণী (Arthropoda) এবং কণ্টকাত্মক প্রাণী (Echinodermata) প্রভৃতি প্রাণীদের মধ্যেই পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া দেখা যায়। এদের মধ্যে আবার একনালী-দেহী, চ্যাপ্টা কৃমি এবং কণ্টকাত্মক প্রাণীদের পুনরুৎপাদন-ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

শরীরের যে কোন অংশ কেটে দিলে সেই কাটা অংশ থেকে নতুন হাইড্রার জন্ম হয়। এজন্যেই হাইড্রা নাম দেওয়া হয়েছে।

চ্যাপ্টা কৃমি—এই পর্বের অন্তর্গত প্ল্যানেরিয়া নামক প্রাণী পুনরুৎপাদন-ক্ষমতার জন্যে বিখ্যাত। হাইড্রার মত এদের শরীরের যে কোন অংশ কেটে দিলে সেই অংশ থেকে নতুন প্রাণী পুনরুৎপাদিত হয় (২নং চিত্র)।

হাইড্রা এবং প্ল্যানেরিয়ার ক্ষেত্রে এক প্রকার সংরক্ষিত কোষ থাকে। জ্রূণাবস্থায় এই কোষগুলি পৃথক হয়ে যায় এবং ঐগুলির আর কোন পরিবর্তন হয় না। প্রয়োজনমত যে

কোন রকমের কোষ ঐ সংরক্ষিত কোষ থেকে তৈরি হয়। হাইড্রা ও প্ল্যানেরিয়ার পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ঐ সংরক্ষিত-কোষ থেকেই নতুন প্রাণী বা নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই জন্যে সংরক্ষিত কোষকে পুনরুৎপাদক কোষও বলা হয়।

উপরে বর্ণিত হাইড্রা এবং প্ল্যানেরিয়ার পুনরুৎপাদনে দেখা গেছে যে, কর্তিত অংশ থেকে যে নতুন প্রাণীর জন্ম হয়—তার উপরের দিকে মাথা এবং নীচের দিকে লেজ তৈরি হয়—যেমন আসল প্রাণীটির থাকে। উপরের দিকে মাথা এবং নীচের দিকে লেজ—এই বিপরীত-ধর্মিতা (Polarity)—শরীরের একটি সামান্য কর্তিত অংশ কেমন করে রক্ষা করে, সে সম্পর্কে স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে। এই বিষয়ে প্রাণী-বিজ্ঞানী চাইল্ডের একটি থিওরি আছে, তাকে বলা হয় "অক্ষসংক্রান্ত মাত্রা-বিন্যাস থিওরি" (Axial Gradient Theory)। এই থিওরি অনুযায়ী পোলারিটি বা বিপরীত-ধর্মিতা হলো প্রাণীর অক্ষরেখা বরাবর বিপাকীয় কর্ম-তৎপরতার (Metabolic activity) মাত্রা-বিন্যাস। তাঁর মতে, মাথা বা উপরের দিকে বিপাকীয় কর্মতৎপরতা সর্বাপেক্ষা বেশী এবং লেজ বা নীচের দিকে সর্বাপেক্ষা কম থাকে। সে জন্যেই প্রাণীর কোন কর্তিত অংশ যখন পুনরুৎপাদিত হয়, তখন তার উপরের দিকে মাথা এবং নীচের দিকে লেজ বেরোয়, কারণ নীচের দিকের চেয়ে উপরের দিকের বিপাকীয় কর্মতৎপরতা বেশী।

কণ্টকাত্মক প্রাণী—এই পর্বের তারা মাছের (Star fish—এরা মাছ নয়) মধ্যে পুনরুৎপাদন-ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী। তারকাকৃতির এই প্রাণীদের যে কোন একটি বাহু কেটে ফেললে সেই বাহু থেকে আর একটি তারা মাছের জন্ম হয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে পুনরুৎপাদন-ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। শুধুমাত্র উভচর এবং সরীসৃপ প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া দেখা যায়। তাও আবার এখানে কর্তিত অংশ থেকে নতুন প্রাণীর জন্ম হয় না—কোন অঙ্গ বিনষ্ট হয়ে গেলে সেই অঙ্গটিরই শুধু পুনরুৎপাদন হয়। অবশ্য সরীসৃপদের খোলস পাল্টানো, পাখীদের পালক পাল্টানো, স্তন্যপায়ীদের নখ-চুল কেটে দিলে সেখানে আবার নতুন নখ-চুলের জন্ম হওয়া—এগুলিও এক রকমের পুনরুৎপাদন। কিন্তু এর জন্যে কোন দুর্ঘটনা, আঘাত বা অঙ্গবিলুপ্তির দরকার হয় না (যেমন সাধারণ পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে হয়)—এটা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার অংশবিশেষ। এই ধরণের পুনরুৎপাদনকে শারীরবৃত্তিক (Physiological) বা পৌনঃপুনিক পুনরুৎপাদন বলা হয়। উভচর এবং সরীসৃপদের পুনরুৎপাদনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি।

উভচর প্রাণীদের পুনরুৎপাদন :—উভচর প্রাণীদের মধ্যে স্যালামাণ্ডার জাতীয় প্রাণীতেই পুনরুৎপাদন সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে স্যালামাণ্ডারেই পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় বিখ্যাত জ্ঞাণতত্ত্ববিদ স্প্যালানজেনি কর্তৃক। তারপর এই প্রাণীর উপর পুনরুৎপাদন-সংক্রান্ত অনেক পরীক্ষা হয়েছে। এই সব পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, স্যালামাণ্ডারের যে কোন একটি অঙ্গ—এমন কি, চোখ কেটে ফেললেও সেখানে আর একটি অঙ্গের জন্ম হয়—তবে এই প্রাণীর বাহুর পুনরুৎপাদনেরই বেশী পরীক্ষা হয়েছে।

ব্যাঙের পুনরুৎপাদন-ক্ষমতা ব্যাঙাচির মধ্যেই সীমাবদ্ধ—পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের এই ক্ষমতা নেই। ব্যাঙাচির লেজ বা একটি পা কেটে দিলে সেই স্থলে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হয়।

সরীসৃপের পুনরুৎপাদন :—সরীসৃপ প্রাণীদের মধ্যে টিকটিকি, গিরগিটির মধ্যেও পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া দেখা যায়। তবে এই ক্ষেত্রে লেজ ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুনরুৎপাদন হয় না।

আক্রান্ত টিকটিকির লেজ খসে যাবার ঘটনা সর্বজন-বিদিত। খসে যাবার পর সেখানে আবার নতুন লেজ উৎপন্ন হয় পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়ার সাহায্যে। একটি টিকটিকির অনেক বার লেজ খসে যেতে পারে এবং প্রত্যেক বারই সেই স্থলে নতুন লেজের সৃষ্টি হয়। ইচ্ছানুযায়ী লেজ খসাবার জন্যে টিকটিকির একটি বিশেষ গঠনমূলক অভিযোজন (Special structural adaptation) আছে। এদের লেজের গোড়ার দিকে একটি বিচ্ছেদ বিন্দু (Breaking point) আছে, যে স্থানে লেজটি দেহ থেকে খসে যায়। ঐ বিচ্ছেদ বিন্দুতে ২।৩টি কশেরুকা (Vertebra) লেজের সঙ্গে এমন আলগাভাবে যুক্ত থাকে যে, পেশীর একটু সঙ্কোচনের ফলেই কশেরুকার গ্রন্থন স্থল (Articulating surface—যার সাহায্যে কশেরুকা লেজের সঙ্গে যুক্ত থাকে) লেজ থেকে পৃথক হয়ে আসে—ফলে লেজটি খসে যায়।

উভচর সরীসৃপদের পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানে নতুন তন্তুর সৃষ্টি এবং পরে শঙ্কু আকৃতির বিশিষ্ট একটি পুনরুৎপাদক কোড়ক (Regeneration bud) বা ব্লাষ্টেমার (Blastema) জন্ম হয়। এটি ভ্রূণকোষ দিয়ে তৈরি। এই অংশ থেকেই উপবৃদ্ধি এবং কোষ-পৃথকীকরণের সাহায্যে নতুন অঙ্গের পুনরুৎপাদন হয়।

এবারে পুনরুৎপাদন সম্পর্কে কিছু সাধারণ আলোচনা করা যাক। উপরে বর্ণিত অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের পুনরুৎপাদনের উদাহরণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই প্রক্রিয়া দুই ভাবে সম্পন্ন হতে পারে—

(১) ক্ষত বা বিনষ্ট স্থানের অবশিষ্টাংশের রূপান্তর এবং পুনর্গঠনের ফলে এই ক্ষেত্রে দেহের সংরক্ষিত কোষের বৃদ্ধির ফলেই নতুন অংশের জন্ম হয়, নতুন কোষের জন্মের দরকার হয় না—যেমন হাইড্রা, প্ল্যানেরিয়ার পুনরুৎপাদন। এই ধরণের পুনরুৎপাদনকে মরফোল্যাক্সি (Marpholaxy) বলা হয়।

(২) ক্ষতস্থলে নতুন কোষের জন্ম, পুনরুৎপাদক কোড়ক গঠন এবং তার উপবৃদ্ধির ফলে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই পুনরুৎপাদনকে এপিমরফিক (Epimorphic) পুনরুৎপাদন বলা হয়—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপার দেখা যায়।

যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে ক্ষতস্থানে নতুন অঙ্গের যোজনা হয়, ভ্রূণের পরিস্ফুরণের অবস্থার সেই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি

৩নং চিত্র
অপ্রতিসাম্য পুনরুৎপাদন

তৈরি হয়। সেই দিক থেকে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়াকে প্রাণীর পরিস্ফুরণ ক্ষমতার পুনরুজ্জীবন বলা যেতে পারে অর্থাৎ পুনরুৎপাদনের সময় প্রাণী শারীরবৃত্তিক দিক দিয়ে অনেকটা ভ্রূণাবস্থায় ফিরে যায়।

অপ্রতিসাম্য পুনরুৎপাদন—পুনরুৎপাদিত অঙ্গ সাধারণতঃ আসল অঙ্গের (যে অঙ্গ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে) অনুরূপ, কিন্তু অনেক সময় মূল অঙ্গের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা অঙ্গের জন্ম হয়। এই ধরণের পুনরুৎপাদনকে অপ্রতিসাম্য (Heteromorphosis) পুনরুৎপাদন বলা হয় এবং সন্ধিপদ প্রাণীদের মধ্যেই এটি বেশী দেখা যায়। এই সব প্রাণীদের যে উপাঙ্গ থাকে, তার যে কোন একটি বিনষ্ট হয়ে গেলে সেখানে আর একটি ভিন্ন ধরণের উপাঙ্গের সৃষ্টি হয়। যদি প্রাণীটির পুঞ্জাক্ষি বিনষ্ট করে ফেলা হয়, তাহলে সেখানে আর একটি পুঞ্জাক্ষি না হয়ে একটি শুঁড়ের (Antena) পুনরুৎপাদন হয় (৩নং চিত্র)।

চরম বা বহুল পুনরুৎপাদন (Super Regeneration)—বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, একটি অঙ্গের জায়গায় একাধিক অঙ্গের পুনরুৎপাদন ঘটানো যেতে পারে। প্ল্যানেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, যদি এর শরীরের মাঝ বরাবর লম্বালম্বিভাবে ছেদন করে নিয়ে পরে মস্তকটি কেটে ফেলা হয় (৪নং চিত্রে যে ভাবে দেখানো হয়েছে), তাহলে দুই মাথাবিশিষ্ট একটি প্ল্যানেরিয়ার জন্ম হয়। এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে দশ মাথাবিশিষ্ট প্ল্যানেরিয়া জন্মানো সম্ভব হয়েছে। স্যালামাণ্ডারেও একটি বাহুর জায়গায় একাধিক বাহুর পুনরুৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

৪নং চিত্র
প্ল্যানেরিয়ার চরম পুনরুৎপাদন।

পুনরুৎপাদনের প্রারম্ভিক উদ্দীপক :—দুর্ঘটনা-জনিত আঘাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিলুপ্তি ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়া চালু হয়ে যায়। আঘাত বা ক্ষত পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়াকে চালু করবার জন্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে; যেমন—নিষিক্তকরণ-প্রক্রিয়া (Fertilization) ডিমের ক্রমপরিবর্তনকে সক্রিয় করে তোলে। সে জন্যে আঘাতকে পুনরুৎপাদনের প্রারম্ভিক উদ্দীপক বলা হয়। ক্ষতস্থানে শারীর-বৃত্তিক এবং বিপাকীয় ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যায়; ফলে আহত কোষ থেকে এক প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে,

এই অজ্ঞাত রাসায়নিক পদার্থটিই উদ্দীপকের কাজ করে এবং পুনরুৎপাদন-প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে।

পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে স্নায়ু এবং উত্তেজক রসের (Hormone) ভূমিকাও খুব মূল্যবান। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, পুনরুৎপাদনের সময় যদি ক্ষতস্থানের সমস্ত স্নায়ু নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে উত্তেজক গ্রন্থিও (পিটুইটারী) যদি সরিয়ে ফেলা হয়, তাহলে পুনরুৎপাদন বিঘ্নিত হয়।

সঞ্চয়ন

গ্লোকোমা

এ. দিমিত্রিয়েভা লিখেছেন—গ্লোকোমাকে লোকে বলে হলুদ জল ও সবুজ জল। চোখের এই পুরনো ব্যাধিতে অনেক বয়স্ক ব্যক্তি ভুগে থাকেন। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হলো চোখের ভিতরকার চাপ বৃদ্ধি। এই রোগকে উপেক্ষা করা যায় না—কেন না, উপেক্ষা করলে দৃষ্টিশক্তি খারাপ হয়, এমন কি, অন্ধতাও আসতে পারে।

প্রায়শঃই তথাকথিত "বদ্ধ গ্লোকোমার" সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। লোকের দৃষ্টিশক্তি মাঝে মাঝে কমে আসে, তার মনে হয় যেন তার চোখ ভারি হয়ে গেছে, দূর থেকে ভালভাবে কোন কিছু চিনতে পারে না এবং সন্ধ্যায় তার মনে হয় যেন আলোর চারপাশে রামধনুর মত বলয় দেখছে। এই রোগের সুরুতে সাধারণতঃ এরূপ ঘটে কোন নিরানন্দকর অভিজ্ঞতা অথবা মানসিক বা শারীরিক ক্লান্তির পর কিন্তু শীঘ্রই এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। তারপরেই আবার আরও ঘন ঘন এই রোগের আক্রমণ ঘটতে থাকে।

কিন্তু আর এক ধরণের গ্লোকোমা সচরাচর দেখা যায় না। এক্ষেত্রে এই রোগ চাঞ্চল্য না ঘটিয়ে অলক্ষ্যে কোন ব্যক্তির উপর এসে চড়াও হয়। রোগী প্রায়ই সন্দেহও করতে পারে না যে, তার একটি চোখ আক্রান্ত হয়েছে এবং এটা সে আবিষ্কার করে অপ্রত্যাশিতভাবে, যখন সে ভাল চোখটিকে বুজিয়ে কিছু দেখবার চেষ্টা করে।

কখনও কখনও গ্লোকোমার সুরু হয় অকস্মাৎ ভয়াবহ আক্রমণ দিয়ে। আক্রান্ত ব্যক্তি চোখে, অক্ষি-কোটরে এবং মাথায়ও তীব্র যন্ত্রণা বোধ করে প্রায়শঃই রাত্রে বা প্রত্যুষের দিকে। প্রায়ই মাথা ধরবার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয় দুর্বলতা-বোধ হয় এবং তাপ বাড়ে। চোখের পাতা ফুলে ওঠে, চোখ থেকে জল পড়ে এবং চোখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী রক্তবর্ণ ধারণ করে ও ফুলে যায়। স্বচ্ছ পটল ঘোলাটে হয়, চোখের মণি বেড়ে যায় এবং দৃষ্টিশক্তির যথেষ্ট অবনতি ঘটে।

চিকিৎসার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে, কত শীঘ্র রোগী চিকিৎসকের পরামর্শ নেয় তার উপর। যত শীঘ্র চিকিৎসা সুরু হবে, ফল হবে তত বেশী কার্যকরী। সে জন্যেই দৃষ্টিশক্তির কোন গোলমাল লক্ষ্য করা মাত্রই চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়া উচিত।

একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, গ্লোকোমা অলক্ষ্যে আক্রমণ করতে পারে।

সে জন্যেই ৪৫ থেকে ৫০ বছর বয়সের লোকদের মাঝে মাঝে চক্ষু-চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

চোখের মধ্যেকার চাপ কমাবার জন্যে রোগীকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত চিকিৎসকের বিধান মত প্রতিদিন চোখে ওষুধ ব্যবহার করা উচিত। এই ওষুধ কিলোকার্পিন সলিউসন বা অন্য ওষুধও হতে পারে।

গ্লোকোমা শরীরের অংশবিশেষের স্থানীয় ব্যাধিমাত্র নয়। এটি কার্ডিও-ভাস্কুলার ব্যবস্থা ও নার্ভাস সিস্টেমের বিভিন্ন অংশের অবস্থার সঙ্গে যুক্ত। সে জন্যেই সুপারিশ করা যাচ্ছে যে, স্থানীয় চিকিৎসা ছাড়াও সাধারণ কার্ডিও-ভাস্কুলার ও নিউরোলজিক্যাল গোলযোগেরও চিকিৎসা করতে হবে। যে সব ওষুধ সাধারণভাবে কার্যকরী, তার মধ্যে ভিটামিন ক, খ$_১$, খ$_২$, খ$_৬$, গ এবং অন্যান্য ব্রোমিনঘটিত ওষুধ বিশেষভাবে ফলপ্রদ।

রোগীকে একটি নির্দিষ্ট তালিকা মেনে চলতে হবে। তাকে উত্তেজিত কিম্বা শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্লান্ত হলে চলবে না। ভারী কাজ কিম্বা কাপড় কাচা, মেঝে ঘষা, জমি খনন করা প্রভৃতি যে সব কাজে দেহ নোয়াতে হয়, সে সব কাজ এবং ভারী বোঝা তোলা চলবে না।

অন্য দিকে হাল্কা শারীরিক পরিশ্রম ও মাঝে মাঝে বিশ্রাম এবং মুক্ত বায়ু সেবন বিশেষ মূল্যবান। ভাল আলোতে পড়া, লেখা বা সেলাই করা রোগীর ক্ষতি করে না। গ্লোকোমা রোগীকে বিশেষ পথ্য গ্রহণ করতে হবে। দিনে তার ৫-৬ গ্লাসের বেশী তরল পানীয় গ্রহণ করা চলবে না এবং প্রধানতঃ দুধ, মাখন ও শাকসব্জী প্রভৃতি খেতে হবে। মাঝে মাঝে সেদ্ধ করে মাছ ও মাংস খাওয়া যেতে পারে। মশলাযুক্ত, লবণযুক্ত খাদ্য প্রভৃতি পথ্য থেকে বাদ দিতে হবে। অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় (বীয়ার সমেত) ও ধূমপান একেবারেই নিষিদ্ধ।

গ্লোকোমা রোগীকে দিনে অন্ততঃ সাত ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। উঁচু বালিশে শোওয়া দরকার। অনিদ্রার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বিধান অনুসারে ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। এই ধরণের রোগীদের পক্ষে উষ্ণ জলে স্নান, বিশেষ করে বাষ্প-স্নান ক্ষতিকর। অন্ধকারে অধিক সময় থাকা চলবে না।

রোগীকে নিয়মিত পরীক্ষার জন্যে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে—দেড় থেকে দু-মাসে অন্ততঃ একবার। চোখের অবস্থা খারাপ হচ্ছে লক্ষ্য করলেই চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। তা সম্ভব না হলে চিকিৎসকের বিধান অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে ও জোলাপ নিতে হবে। উষ্ণ জলে পা ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং মাথার পিছনদিকে সরষের প্লাস্টার লাগিয়ে রাখতে হবে।

সময়মত চিকিৎসা সুরু হলে গ্লোকোমা রোগীর দৃষ্টিশক্তি ও কর্মক্ষমতা অব্যাহত থাকবে।

হরমোন ও ক্যান্সার

আনাতোলি লাজারেফ লিখেছেন—ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এমন এক ব্যাপক রূপ নিয়েছে যে, সম্ভবতঃ চিকিৎসা ও জীববিদ্যার এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষকেরা এই সমস্যার সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করছেন না। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ক্রমেই করে এই মত দিচ্ছেন যে, ক্যান্সার ব্যাধির কারণ অসংখ্য ও বিচিত্র এবং সে জন্যেই সাফল্য সুনিশ্চিত হতে পারে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার যৌথ প্রয়াসের ফলে।

হরমোন বিজ্ঞানও সাধারণ প্রচেষ্টায় তার অবদান রচনা করছে এবং হরমোনঘটিত ওষুধ এই ব্যাধির চিকিৎসাকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করছে।

ষষ্ঠ দশকেই প্রমাণিত হয়েছিল যে, পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড থেকে যে বৃদ্ধির হরমোন তৈরি হয়, তা শুধু মাত্র স্বাভাবিক শারীরিক অংশ এবং মাংস-তন্তুর বৃদ্ধি ও বিকাশই ঘটায় না, ক্যান্সারের বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। বিজ্ঞানীরা প্রকাশ করেছেন যে, ক্যান্সারে আক্রান্ত প্রাণীর দেহ থেকে পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড সরিয়ে নিলে টিউমার আর বৃদ্ধি পায় না। সম্প্রতি পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃদ্ধির হরমোন টিউমার বৃদ্ধিও ত্বরান্বিত করে এবং শরীরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রোগের সঞ্চার বাড়িয়ে দেয়। এটা কৌতূহলের বিষয় যে, পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড সরিয়ে নেবার পর কোন প্রাণীর দেহে আবার এই হরমোন কৃত্রিমভাবে প্রবেশ করিয়ে দেবার পর ক্যান্সার ফিরে আসবার লক্ষণ দেখা গেছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, হরমোনের ভাগ্যনির্ধারক ভূমিকা সবার কাছেই পরিষ্কার। কিন্তু পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড অপসারিত না করেও কি হরমোনকে নিষ্ক্রিয় করা যায় না? রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের তৎপরতা নিবারণের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু উভয় পদ্ধতিই স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড অন্যতম প্রধান নালীহীন গ্ল্যাণ্ড এবং এই গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধির হরমোন ছাড়াও দেহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য হরমোন তৈরি করে।

প্রাণীদের উপর অনেকগুলি পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, বৃদ্ধির হরমোনকে নিষ্ক্রিয় করা যায় এই হরমোনে অ্যান্টিসিরাম ইনজেকশন করে।

পরীক্ষা করবার জন্যে বিজ্ঞানীর কাছে ছিল ৭৭টি ইঁদুর। এগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়। কতকগুলিকে ক্যান্সার টিকা দেবার এক ঘণ্টা পর অ্যান্টিসিরাম ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং পরে এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন ইনজেকশন দেওয়া হয়। অন্যগুলিকে ক্যান্সার টিকা দেবার দু-ঘণ্টা পর অ্যান্টিসিরাম ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং পরে দু-সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন এই ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। আর দুই দল ইঁদুরকে কণ্ট্রোল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এক দলকে ক্যান্সার টিকা দেওয়া হয়, কিন্তু অ্যান্টিসিরাম ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় নি।

এই পরীক্ষার ফলাফলের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বিবেচনার মধ্যে রেখেছিলেন—ইঁদুরের আয়ুষ্কাল, টিকা দেবার পর কোন্ সময় টিউমার লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং ওজন ও টিউমারে পরিবর্তন।

প্রথম দুটি সিরিজের পরীক্ষায় যখন অ্যান্টিসিরাম ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল—টিকা দেবার এক সপ্তাহ পরে ইঁদুরের দেহে টিউমার দেখা দিয়েছিল আর কণ্ট্রোল ইঁদুরগুলির দেহে দু-তিন দিন আগে টিউমার দেখা দিয়েছিল। এই ভাবে গোড়া থেকেই অ্যান্টিসিরামের দ্বারা টিউমারের উদ্ভব বিলম্বিত হয়েছিল। যে সব ইঁদুরকে অ্যান্টিসিরাম ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল, সেগুলির কোনটির ক্ষেত্রে টিউমারের কোন কোন অংশ ২২ দিন পরে আলসারে পরিণত হয়। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, টিউমার হীনাবস্থা-প্রাপ্ত হতে সুরু করেছিল। কণ্ট্রোল ইঁদুরের দেহে এরকম কোন কিছু লক্ষিত হয় নি। ক্যান্সার ব্যাধির গতি ছিল অব্যাহত।

পরীক্ষা সুরু হবার দু-সপ্তাহ পর গবেষকেরা ইঁদুরের দেহে টিউমারের আকারে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। যে সব ইঁদুরকে অ্যান্টিসিরাম ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল, সেগুলির দেহে টিউমার বৃদ্ধি বিলম্বিত হয়েছে। এই পার্থক্য অধিকতর প্রকট হয় সেই মুহূর্তে, যখন প্রাণীগুলি মরতে সুরু করে। যেখানে অ্যান্টিসিরাম ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় নি—এমন ইঁদুরের গড় ওজন ছিল দশ গ্র্যাম, সেখানে যে সব ইঁদুরকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল, তাদের ওজন ছিল এর অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ। চিকিৎসা যত দীর্ঘ হয়েছে, টিউমার তত ছোট হয়েছে। এক সপ্তাহ চিকিৎসা-প্রাপ্ত

ইঁদুরের টিউমারের ওজন ছিল সাড়ে চার গ্র্যাম এবং দু-সপ্তাহ ধরে চিকিৎসিত ইঁদুরের টিউমারের ওজন ছিল আড়াই গ্র্যাম।

অ্যান্টিসিরাম ইঞ্জেকশনের টিউমার-বিরোধী কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে এই ঘটনা থেকেও—যে সব ইঁদুরকে এই ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছে, সেগুলির আয়ুষ্কাল দীর্ঘ হয়েছে। কন্ট্রোল গ্রুপের সবগুলি ইঁদুর ২৪ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে মারা গেছে অথচ চিকিৎসিত ইঁদুরের অনেকগুলিই টিকা দেবার ৫৮ দিন পরেও মরে যায় নি।

দুর্ভিক্ষ তরাবার ঘুম

জিতেন্দ্রকুমার রায় ও অলোকা রায়

কিছুদিন আগে কলকাতার একটি সুবিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকায় জীববিজ্ঞানের কোন বিষয়ের উপর একটি আন্তর্জাতিক আলোচনার খবর বের হয়। খবরটি বিশেষ করে এই আলোচনা চক্রে পাঠ-করা একটি প্রবন্ধকে নিয়ে। প্রবন্ধ-লেখক কোন জীববিজ্ঞানী বলেন—মানুষ যদি হাইবার-নেশন বা শীতঘুমের কলা-কৌশল আয়ত্তে আনতে পারে তবে বিনা খাদ্যে দুর্ভিক্ষের সময়টা পাড়ি দেওয়া তার পক্ষে খুব মুস্কিল হবে না। কয়েক মাস শীতঘুমে সংজ্ঞাহীন হয়ে থাকলে খাদ্যের কোন প্রয়োজন হবে না বা খাদ্য না নেবার জন্যে দেহের কোন ক্ষতি হবে না।

মানুষ না পারলেও এমন অনেক প্রাণী আছে, যারা শীতঘুমে অচেতন হয়ে শীতকালটা কাটিয়ে দেয়। এই সময়ে তাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয় না বা মাঝে মাঝে গভীর সুপ্তির ছেদ পড়লে অতি সামান্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় মাত্র। শীত-কালে সাধারণতঃ এসব প্রাণীর খাদ্যাভাব ঘটে। খাদ্যাভাবের জন্যে যে বিরোধী পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার তাগিদেই তারা ঘুমে অচেতন হয়ে থাকে।

আমরা একনাগাড়ে দিনের পর দিন ঘুমাতে পারি না। পারলেও সাধারণ ঘুম অনাহারের মৃত্যুকে দশ-বিশ দিনের বেশী ঠেকিয়ে রাখতে পারতো না। কেমন করে শীতঘুমের অচেতন অবস্থা অনাহারী জীবজন্তুকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখে? কেমন করে হাইবারনেশনের সুপ্তিমগ্ন দেহ অনাহারের বিধ্বংসী আক্রমণ থেকে রেহাই পায়? শীতঘুমে দেহের কাজকর্ম ও ধরণ-ধারণ কি এমনভাবে বদ্‌লে যায়, যার জন্যে ওই সময়টাতে বাইরে থেকে কোন খাদ্য গ্রহণ করবার প্রয়োজন হয় না বা খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে? মানুষকে শীতঘুমে আচ্ছন্ন করবার কল্পনা বা পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এসব প্রশ্ন। শীতঘুমে স্তন্যপায়ী জন্তুদের দেহের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম ও মানুষের সম্ভাব্য শীতঘুম—এই সম্পর্কে কিছু আলোচনার জন্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। কিন্তু মূল বিষয়ের আলোচনার আগে জীবদেহের শক্তির প্রয়োজনীয়তা ও তা সরবরাহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। তাছাড়া শীতল ও উষ্ণ শোণিত সমন্বিত প্রাণী বলতে কি বোঝায়, সে সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

জীবদেহে শক্তির প্রয়োজনীয়তা ও খাদ্য

জীবের শক্তির প্রয়োজন হয় দেহের বাইরের কাজ ও আভ্যন্তরীণ কাজের জন্যে। বাইরের কাজ করা হয় বাইরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত করে—হাত নেড়ে, পা নেড়ে, ঠোঁট নেড়ে, ঘাড় নেড়ে, জিভ নেড়ে। আমরা হাঁটি, দৌড়াই, কথা বলি, বোঝা তুলি। যেমন কাজ তেমন শক্তিব্যয়। পাঁচ মিনিট আস্তে আস্তে হাঁটলে যতটা শক্তি ব্যয়িত হয়, পাঁচ মিনিট দৌড়ালে তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তি খরচ হয়। কাঠ-বিড়ালী বাদাম গাছের তলায় ঝরে-পড়া বাদাম খুঁজতে যে হারে শক্তি ব্যয় করে, তার অনেক গুণ বেশী ব্যয় করে ভয় পেয়ে তর তর করে বাদাম গাছের মগ ডালে উঠে পড়তে। পাখা মেলে আকাশে ওড়বার সময় বালিহাঁস যে হারে শক্তি ব্যয় করে, তা তার জলায় সাঁতারকাটবার শক্তি খরচের হারের চেয়ে ভিন্ন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন ভাবে সঞ্চালিত না করে আরামে শুয়ে থাকলেই যে শক্তি ব্যয় বন্ধ হয়, তা নয়। বাইরের কাজ বন্ধ থাকলেও দেহের ভিতরের কাজ চলতেই থাকে। হৃৎপিণ্ড চলে, ফুস্‌ফুস চলে, দেহে অবিরত তাপের সৃষ্টি হয়। দেহের এই যে আভ্যন্তরীণ কাজ, তা সব সময় মোটামুটি একই ভাবে চলতে থাকে—আরামে শুয়ে থাকাই হোক বা ফুটবল খেলাই হোক। বাইরের কাজ করবার সময় আভ্যন্তরীণ কাজের জন্যে উপরি শক্তি ব্যয়িত হয়। আমরা ধরে নিতে পারি, মাছরাঙা যখন মাছ ধরবার আশায় একদৃষ্টিতে ঠায় বসে থাকে, তখন তার যে শক্তি খরচ হয়, তা শুধু দেহের আভ্যন্তরীণ কাজের জন্যে; অথবা টুনটুনি পাখী সন্ধ্যাবেলায় যখন ঘুমের জন্যে ডুমুর পাতার নীচে চুপটি করে বসে থাকে, তখন তার দেহেও শুধু ভিতরের কাজের জন্যেই শক্তি খরচ হয়।

সকলেই জানেন, সব রকমের জীবই তাদের খাদ্য থেকে দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি পায়—খাদ্য না বলে বলা যায় খাদ্যের প্রোটিন, কার্বো-হাইড্রেট ও ফ্যাট প্রভৃতি। শস্য, ফলমূল, কীট-পতঙ্গ, মাছমাংস, লতাপাতা—এক কথায় প্রায় সব রকম জীবের খাদ্যেই কম-বেশী পরিমাণে খাদ্যের এই তিনটি উপাদান রয়েছে। আর খাদ্য-শক্তির উৎস হচ্ছে খাদ্যের এই তিনটি উপাদান। এক গ্র্যাম প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট থেকে যথাক্রমে চার, চার ও নয় ক্যালোরী শক্তি পাওয়া যায়। এক কিলোগ্র্যাম জলে এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ উঠাতে হলে জল যতটা তাপ শুষে নেয়, তাই হচ্ছে পুষ্টি-বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী এক ক্যালোরী শক্তি। কোন খাদ্যে শতকরা হিসাবে কতটা প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট আছে, তা জানতে পারলে আমরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য থেকে কতটা শক্তি পেতে পারি, তা হিসাব করে বের করা যায়। উপরের হিসাব থেকে দেখা যায়, ফ্যাট বা চর্বিতে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে, তার পরিমাণ সমওজনের কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিনের দ্বিগুণেরও বেশী। এই কথাটা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। শক্তি সঞ্চয়ের ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্বোহাই-ড্রেট বা প্রোটিনের চেয়ে ফ্যাটের কর্মপটুত্ব অনেক বেশী।

দেহের শক্তির খরচ কেমন করে মাপা হয়?

আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন নেই ভুক্ত খাদ্যের (আসলে খাদ্যের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট হজম হবার পর যে সব বস্তু পাওয়া যায়) দহন-ক্রিয়ার জন্যে, যার ফলে শক্তি মুক্ত হয়। দেহ যত বেশী কাজ করবে, তত বেশী শক্তির প্রয়োজন হবে, খাদ্যের দহনও সে অনুপাতে বেড়ে যাবে এবং আনুপাতিকভাবে দেহের অক্সি-জেনের চাহিদাও বেড়ে যাবে। বিভিন্ন কাজে, সম্পূর্ণ বিশ্রামে বা শীতঘুমের সময়ে প্রাণীরা যে

হারে অক্সিজেন ব্যয় করে, তা জানতে পারলেই বিভিন্ন অবস্থায় দেহে কি হারে শক্তি ব্যয়িত হয়, তা বের করা যায়। খাদ্যের শক্তি মাপা হয় ক্যালোরীতে। খাদ্যের শক্তি মুক্ত হয়ে আমাদের দেহে তাপের সৃষ্টি করে, আমাদের কাজ করবার ক্ষমতা দেয়। তাই দেহের বিভিন্ন কাজে যে শক্তি ব্যয়িত হয়, তাও আমরা ক্যালোরীতেই মেপে থাকি।

বেসাল মেটাবলিজম

দেহের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মের জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে বেসাল মেটাবলিজমের শক্তির প্রয়োজনীয়তা বলা হয়। সংক্ষেপে একে বেসাল মেটাবলিজমের প্রয়োজনীয়তাও বলা চলে। দৈহিক পরিশ্রমভেদে একই জীবের শক্তির প্রয়োজন বিভিন্ন হতে পারে। যে রিক্সা চালায়, সেই লোকই যদি জুতা সেলাই করতে যায়, তবে তার শক্তির প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় পূর্ণবয়স্ক লোকের দুই-এক বছরের ভিতর বেসাল মেটাবলিজমের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। মানুষের ক্ষেত্রে বলা চলে, যারা মোটামুটি শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করে, তাদের দৈহিক কাজের শক্তির প্রয়োজনীয়তা আর বেসাল মেটাবলিজমের শক্তির প্রয়োজনীয়তা মোটামুটি সমান।

বেঁচে থাকবার তাগিদে রকমারী প্রাণী রকমারী কাজ করে। কেউ সাঁতারকাটে, কেউ দিনের বেশ খানিকটা সময় উড়ে বেড়ায়, কেউ বা গাছের ডালে লাফালাফি করে' ঘোরাফেরা করে। বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন প্রাণী কতটা শক্তি ব্যয় করে, তা বের করা অনেক সময়েই খুব কঠিন। বাজপাখী যখন উঁচু আকাশ থেকে ঘুঘু পাখীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন সেকেণ্ডে বা মিনিটে তার অক্সিজেন খরচ কতটা, তা বের করা যাবে কি করে অথবা বাঘের তাড়া খেয়ে হরিণ যখন ছুটে পালায়, তখন প্রতি একক সময়ে দেহের কাজে হরিণের অক্সিজেন ব্যয়ের পরিমাণ কি, তাও জানবার উপায় নেই অন্ততঃ উপায় বের করা হয় নি। তাছাড়া চব্বিশ ঘণ্টায়, মানে প্রতিদিনে কোন প্রাণী গড়ে কতটা সময় কিভাবে কাটায়, যেমন—বাজপাখী কতটা সময় শিকারের পিছনে উড়ে উড়ে ব্যয় করে, কতটা সময় চুপচাপ বসে থাকে বা কতটা সময় শিকার-করা প্রাণী ছিঁড়ে খায়, তাও জানবার উপায় নেই। কাজেই বিভিন্ন কাজে শক্তি ব্যয়ের হার জানা থাকলেও চব্বিশ ঘণ্টায় বিভিন্ন প্রাণী, বিশেষ করে বন্য প্রাণীরা মোট কতটা শক্তি ব্যয় করে, তা জানা যায় না। মানুষের গতিবিধি গবেষকের আয়ত্তের ভিতর থাকে বলে এবং পরীক্ষার জন্যে মানুষের উপর বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার সহজ বলে বিভিন্ন কায়িক শ্রমের কাজে লিপ্ত মানুষের চব্বিশ ঘণ্টায় মোট শক্তিব্যয়ের পরিমাণ বের করা সম্ভব এবং তা করাও হয়েছে।

বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন প্রাণীদের শক্তিব্যয়ের পরিমাণ বের করা দুঃসাধ্য হলেও একটা অল্প-পরিসর আবদ্ধ জায়গায় অক্সিজেনের সরবরাহ করে এবং সেখানে কোন প্রাণী রেখে সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময় প্রাণীটি কোন নির্দিষ্ট সময়ে কতটা অক্সিজেন ব্যয় করে, তা জানবার উপায় আছে। তার অর্থ হচ্ছে—বেসাল মেটাবলিজমের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে কোন্ প্রাণী কি হারে শক্তি ব্যয় করে, তা বের করা যায়। বিভিন্ন প্রাণীর বেসাল মেটা-বলিজমের হার তুলনা করলে আভ্যন্তরীণ কাজের জন্যে তাদের দেহে যে হারে শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে—জীবনদীপ যে হারে জ্বলছে—তার একটা তুলনা-মূলক ছবি পাওয়া যায়। আর যেহেতু প্রাণীদের বেসাল মেটাবলিজমের প্রয়োজনীয় শক্তি দেহের মোট প্রয়োজনীয় শক্তির প্রধান বা অন্যতম প্রধান

অংশ, সেহেতু বেসাল মেটাবলিজমের প্রয়োজনীয়তা জানতে পারলে প্রাণীদের মোট শক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অন্ততঃ খানিকটা ধারণা করা সম্ভব।

বেসাল মেটাবলিজমের হার হচ্ছে, প্রতি একক দেহ-ওজনে (যেমন—প্রতি গ্রাম দেহ-ওজনে) বেসাল মেটাবলিজমের জন্যে শক্তির প্রয়োজনীয়তা। প্রতি একক দেহ-ওজনে যদি বেসাল মেটাবলিজমের প্রয়োজনীয়তা হিসাব না করা যায়, তবে বিভিন্ন প্রাণীর বেসাল মেটাবলিজমের তুলনা করা বেসাল মেটাবলিজমের হার বের করা হয়েছে। নিম্নে প্রদর্শিত রেখাচিত্রে কয়েকটি প্রাণীর দৈহিক ওজন ও বেসাল মেটাবলিজমের হারের সম্পর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে। বেসাল মেটাবলিজমের হার ক্যালোরীতে না দেখিয়ে প্রতি ঘণ্টায় দেহ-ওজনের গ্রাম প্রতি কত ঘন সেণ্টিমিটার অক্সিজেন ব্যয়িত হয়, সেই হারে দেখানো হয়েছে। রেখাচিত্রে লক্ষ্য করলেই দেহ-ওজনের সঙ্গে বেসাল মেটাবলিজমের বিপরীত সম্পর্কটা ধরা পড়বে। রেখাচিত্র থেকে
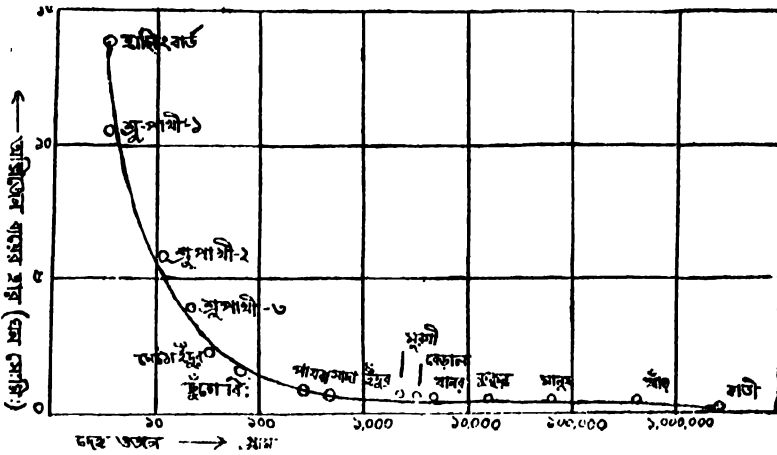
চলে না। হাতীর মোট বেসাল মেটাবলিজমের পরিমাণ ইঁদুরের মোট বেসাল মেটাবলিজমের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু প্রতিগ্রাম দেহ-ওজনে অর্থাৎ বেসাল মেটাবলিজমের হার হাতীর বেশী, না ইঁদুরের বেশী? দেখা গেছে, উষ্ণ রক্ত সমন্বিত প্রাণীদের অর্থাৎ স্তন্যপায়ী ও পাখীদের মধ্যে যে প্রাণী যত ছোট, তার বেসাল মেটাবলিজমের হার তত বেশী—জীবনের গতি তত বেগবান। ইঁদুরের বেসাল মেটাবলিজমের হার হাতীর বেসাল মেটাবলিজমের সাত গুণ বেশী। হাতী থেকে সুরু করে হামিং বার্ডের মত পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পাখীর (যে পাখীর দেহের ওজন মাত্র তিন-চার গ্রাম) মনে হয়, হামিং বার্ডের বেসাল মেটাবলিজমের হার হাতীর বেসাল মেটাবলিজমের হারের শত গুণ বেশী। আর মানুষের হারের প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ গুণ বেশী। একজন পূর্ণবয়স্ক স্বাস্থ্যবান লোকের মোট বেসাল মেটাবলিজম ১৫০০ ক্যালোরীর মত। শুধু চাল বা আটা থেকে এই পরিমাণ শক্তি পেতে হলে এরকমের একজন লোককে ১৫ আউন্স চাল বা আটা খেতে হবে। যদি লোকটির বেসাল মেটাবলিজমের হার হামিং বার্ডের মত হতো, তবে তাকে বেসাল মেটাবলিজমের প্রয়োজন মিটাবার জন্যে খেতে হতো ১৫×৫০ আউন্স বা একুশ কেজির মত চাল বা

আটা। আর দেহের মোট ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তা বেসাল মেটাবলিজমের দ্বিগুণ হলে লোকটিকে দৈনিক ৪২ কেজি চাল বা আটা খেতে হতো। ছোট ছোট পাখীদের বেসাল মেটাবলিজমের হার এত বেশী বলেই তাদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। টুনটুনি বা চড়ুই পাখীদের আমরা দিনভরই খেতে দেখি, যদিও তাদের বেসাল মেটাবলিজমের হার হামিং বার্ডের চেয়ে অনেক কম হবারই কথা। আর হামিং বার্ডকে তো পাঁচ-দশ মিনিট পর পরই খেতে হয়। এত খেয়েও তার দিন চলে না—মানে রাত কাটে না। রাতের দশ-বারো ঘণ্টা সময় যে না খেয়ে থাকতে হয়! সাধারণভাবে রাতের দশ-বারো ঘণ্টা সময় না খেয়ে থেকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পাখীটি বাঁচতে পারতো না। কিন্তু দশ-বারো ঘণ্টা একনাগাড়ে না খেয়েও তাকে বাঁচতে হচ্ছে। কি ভাবে? সে আলোচনা আমরা পরে করছি।

অনাহারের সুরুতেই দেহ-দীপ কেন নিবে যায় না

তেল ফুরাবার সঙ্গে সঙ্গেই তেলের বাতি নিবে যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ অনাহারে থাকলেও দেহ-দীপ কি করে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত জ্বলতে পারে? আমরা জানি, অনাহারে থাকলেও দেহ অন্ততঃ কিছুদিন পর্যন্ত সচল থাকে। বেসাল মেটাবলিজম চলতে থাকে অবিরত, যদিও তা স্তিমিত হারে হতে থাকে। বিজ্ঞানের একটি মূল সূত্র হচ্ছে—শক্তি শূন্য থেকে সৃষ্টি করা করা যায় না। দেহে খাদ্যশক্তির যোগান থাকে না অথচ দেহ ভিতর আর বাইরের দিক থেকে কাজ করেই যায়। তা কেমন করে হয়?

বাইরে থেকে খাদ্যের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন না এলেও সেই শক্তি মেটাবার প্রয়োজনে দেহবস্তুর কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন ধ্বংস করতে থাকে অর্থাৎ দেহবস্তুর কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন শক্তি সরবরাহ করতে থাকে। প্রথমে হাত পড়ে যকৃতের গ্লাইকোজেনে। গ্লাইকোজেন একটি কার্বোহাইড্রেট। যকৃতের গ্লাইকোজেন মাত্র দু-একদিনের জন্যে শক্তির যোগান দিতে পারে। যকৃতের গ্লাইকোজেন বেশ কমে এলে হাত পড়ে প্রধানতঃ ফ্যাট বা চর্বির উপর। ফ্যাট বা চর্বিই হচ্ছে অনাহারে শক্তি জোটাবার বৃহত্তম ব্যাঙ্ক। আমরা যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাই, তবে অতিরিক্ত খাদ্য দেহের নানাস্থানে চর্বির আকারে জমা থাকে। আর সেই চর্বির শক্তিই অভাবের সময় শক্তির ঘাট্তি পূরণের চেষ্টা করে। সকলেই জানেন, উট কয়েক দিন না খেয়েও মরুভূমির দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে পারে। উটের কুঁজে প্রচুর চর্বি জমা থাকে। এই চর্বির শক্তি মুক্ত হয়েই উটের পথ চলবার শক্তি যোগায়, আর কুঁজের আকার ছোট হতে থাকে। কয়েকটি খরগোসকে উপর্যুপরি তের দিন না খাইয়ে রেখে দেখা যায়, খরগোসগুলির দেহের আটষট্টি ভাগ চর্বি ধ্বংস হয়ে গেছে, অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে অনাহারী দেহের শক্তি জুগিয়েছে।

মানুষের দেহে সাধারণতঃ শতকরা বারো-তের ভাগ চর্বি থাকে। রোগা বা মোটা লোকদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। অন্যান্য জীবের মত মানুষের অনাহারের সময় এই চর্বিরই খানিকটা ধ্বংস হয়ে দেহে শক্তি সরবরাহ করে।

অনাহারে দেহের শক্তি সরবরাহের বিষয়ে চর্বির পরেই দেহের প্রোটিনের স্থান। অনাহারের প্রথম দিকে শক্তি সরবরাহের ব্যাপারে প্রোটিনে তেমন হাত পড়ে না।

অনাহারেই নয়, অল্পাহারেও দেহের ফ্যাট ও প্রোটিন ধ্বংস হয়ে ঘাট্তি-পড়া শক্তি জোটাতে চেষ্টা করে। আসলে শক্তির আয়-ব্যয় নিয়ে কথা। খাদ্য থেকে যে শক্তি আসছে, তার চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী হলেই দেহবস্তুর উপরে

হাত পড়বে। ঘাট্তি-পড়া শক্তির চাহিদা মিটাতে দেহের চর্বি প্রধান স্থান গ্রহণ করায় দেহের একটা মস্ত সুবিধা হয়। দেহের চর্বির বেশীর ভাগই যদি ক্ষয়ে যায়, তবুও দেহের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। দেহের চর্বি কমাবার জন্যে মোটা লোকদের কম খেতে আর শারীরিক শ্রম করবার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা।

উষ্ণ ও শীতল রক্তের প্রাণী

শুধু শব্দগত অর্থ ধরে নিয়ে যদি উষ্ণ ও শীতল রক্তের প্রাণী কাদের বলে তা বুঝতে চেষ্টা করা হয় তবে ভুল করা হবে। অর্থাৎ উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের রক্ত উষ্ণ আর শীতল রক্তের প্রাণীদের রক্ত শীতল, ঠিক তা নয়।

শীতল রক্তের (Cold blooded) প্রাণী হচ্ছে তারা, যাদের দেহের তাপাঙ্ক পরিবেশের তাপাঙ্কের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। মানে, দেহের অভ্যন্তরের তাপাঙ্ক পরিবেশের তাপাঙ্কের উপর নির্ভরশীল। নানা জাতীয় কীট-পতঙ্গ, সাপ, ব্যাং, কচ্ছপ, মাছ ইত্যাদি প্রাণী হচ্ছে এই শ্রেণীর। আর যে সব প্রাণীর দেহের তাপ পরিবেশ-নির্ভর নয়, অর্থাৎ পরিবেশের তাপাঙ্ক উঠা-নামা করলেও দেহের আভ্যন্তরীণ তাপাঙ্কের পরিবর্তন হয় না, তাদের বলে উষ্ণ রক্তের (Warm blooded) প্রাণী। পাখী এবং স্তন্যপায়ীরা (Mammals) এই দলে পড়ে। শীতল রক্তের প্রাণীদের চেয়ে উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের বেসাল মেটাবলিজমের হার, তথা দেহের তাপ উৎপাদনের হার বেশী। আর এই তাপ সংরক্ষণের আয়োজনও আছে নানারকম; যেমন—দেহের লোম, পালক, চামড়ার নীচের চর্বি ইত্যাদি তাপ সংরক্ষণের সহায়তা করে। কিন্তু দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণের আসল কেন্দ্র থাকে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কের এই তাপ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রই (Heat regulating centre) উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের দেহ-তাপের সাম্য রক্ষা করে। যেমন, ঠাণ্ডা পরিবেশের শীতলতার বার্তা মস্তিষ্কের তাপ-নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রে পৌঁছুলেই চর্মের রক্তপ্রবাহের নালীগুলি সঙ্কুচিত হয়ে যায়, ফলে চর্মে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ কমে গিয়ে রক্ত থেকে তাপ বিকিরণের সুযোগ কমিয়ে দেয়। বিপরীত কারণে চর্মে রক্তপ্রবাহের পরিমাণ বেড়ে যায়, রক্ত তথা দেহের আভ্যন্তরীণ তাপ বিকিরণের সুবিধা হয়। পরিবেশের তাপাঙ্ক বেশী হবার দরুণ তাপ-নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের অ্যালার্ম যখন বেজে ওঠে, তখন আমরা ঘামতে থাকি। ঘাম শুকাবার সময় দেহ থেকে খানিকটা তাপ (লীন তাপ) চলে যায়—দেহের তাপাঙ্ক বাড়বার পথে বাধার সৃষ্টি হয়। শীতের কড়া আমেজে তাপ-নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র উদ্দীপ্ত হলে মাংসপেশীতে কাঁপুনি ধরে, পেশীর সঙ্কোচনের ফলে দেহে অতিরিক্ত তাপের সৃষ্টি হয়, তাপাঙ্ক কমতে পারে না। মোটামুটিভাবে বলা যায়, উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের দেহের তাপাঙ্ক ৯৮° ফারেনহাইট থেকে ১০৯° ফারেনহাইটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন:—

৯৮° ফাঃ থেকে ১০১° ফাঃ—মানুষ, বানর, ঘোড়া, ইঁদুর, হাতী ইত্যাদি প্রাণীর দেহের তাপাঙ্ক।

১০০° ফাঃ থেকে ১০৩° ফাঃ—গরু, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল, খরগোশ, শূকর ইত্যাদি প্রাণীর দেহের তাপাঙ্ক।

১০৪° ফাঃ থেকে ১০৬° ফাঃ—হাঁস, রাজহাঁস, প্যাঁচা প্রভৃতি পাখীর দেহের তাপাঙ্ক।

১০৭° ফাঃ থেকে ১০৯° ফাঃ—মুরগী, কবুতর, এবং বহু রকম ছোট ছোট পাখীর দেহের তাপাঙ্ক।

শীতল রক্তের প্রাণীদের দেহে তাপাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার অভাব রয়েছে বলেই পরিবেশের তাপাঙ্ক ওঠা-নামা করবার সঙ্গে সঙ্গে দেহের তাপাঙ্কও ওঠা-নামা করে। গরম পড়লে এসব প্রাণীদের বেসাল মেটাবলিজমের হার এবং দেহের চঞ্চলতা অর্থাৎ দেহের বাইরের কাজের

পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে দেহে বেশী করে তাপের সৃষ্টি হয়, দেহের তাপাঙ্ক বেড়ে যায়। পরিবেশের তাপাঙ্কের সঙ্গে দেহের তাপাঙ্ক খাপ খাইয়ে চলে। দেহে তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব রয়েছে বলে শীতকালের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বহু শীতল রক্তের প্রাণী (যেমন কীট-পতঙ্গ) ঠাণ্ডায় জমে মারা যায়।

আলোচ্য বিষয় ভাল করে বুঝতে গেলে যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, তা আমাদের হয়ে গেছে। এখন মূল বিষয়ে ফিরে যাওয়া যাক।

শীতঘুম

শীতকালে কয়েক রকম জীবজন্তু দিনের পর দিন বিশেষ ধরণের সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এই দীর্ঘ ঘুমকে শীতঘুম বা হাইবারনেশন বলে। যে সব প্রাণী শীতঘুমে অভ্যস্ত, তাদের সাধারণতঃ শীতপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই দেখা যায়। পরিবেশের তাপাঙ্ক খুব নেমে এলে এসব প্রাণীদের দেহে নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যার ফলে এরা গভীর সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। শীতঘুমে আচ্ছন্ন হলে খাদ্য-শক্তির প্রয়োজনীয়তা খুবই কমে যায়। কেন কমে যায়, তা একটু পরেই আলোচিত হচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে—শীতকালে এসব প্রাণীর খাদ্যের খুব অভাব হয়। খাদ্যাভাব যে প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে তাল রেখে চলবার তাগিদেই শীতসুপ্ত প্রাণীরা (Hibernators) শীতঘুমের কৌশলটা আয়ত্ত করে নিয়েছে। আয়ত্ত করতে পেরেছে বলেই তারা জীবনসংগ্রামে টিকে আছে। শীতসুপ্ত প্রাণীরা উষ্ণ রক্ত এবং শীতল রক্ত—এই দুই শ্রেণীরই হতে পারে। আমরা উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের শীতঘুমের কথাই শুধু আলোচনা করবো, কারণ মানুষ উষ্ণ রক্তের প্রাণী। উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের সম্ভাব্য সম্পর্ক নিবিড়তর হবার কথা। শীতঘুমের সম্পর্কে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে তা সাধারণতঃ করা হয়েছে উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের নিয়েই।*

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে যে সব প্রাণী শীতঘুমের জন্যে বিশেষরূপে পরিচিত, তারা হচ্ছে—কয়েক জাতীয় মেঠো কাঠবিড়াল (European and Arctic ground squirrel), কয়েক রকম বড় বড় ইঁদুর জাতীয় প্রাণী (Rodents—Marmot, Woodchuck, European and Golden hamster etc.), সজারু ইত্যাদি। পাখীরা শীতঘুমে আচ্ছন্ন হতে পারে না। পরিবেশের তাপাঙ্ক খুব নেমে যাবার আগেই তারা সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে চলে যায়। তবে হোমিং বার্ড এবং আরও দু-এক রকম ছোট পাখী বিচিত্র ধরণের শীতঘুমে আচ্ছন্ন হয়। এসম্বন্ধে দু-চার কথা পরে বলা হবে।

শীতঘুমে অভ্যস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীরা শীতঘুমের জন্যে বিশেষ আশ্রয় খোঁজে। সেই আশ্রয়ের তাপাঙ্ক সাধারণতঃ বাইরের বাতাসের তাপাঙ্কের চেয়ে কিছুটা বেশী থাকে। এক জাতীয় মারমট শীতঘুমের জন্যে যে গর্তে আশ্রয় নেয়, তার গভীরতা ত্রিশ ফুট পর্যন্ত হতে পারে। মারমটেরা শীতঘুমের আগে খড়, পাথরের টুকরা ইত্যাদি দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়।

শীতঘুমে দেহযন্ত্রের কাজ

শীতকালে শীতসুপ্ত উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের দেহের তাপ, তথা তাপাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটা

*প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে—গবেষণাগারের তাপাঙ্ক প্রয়োজনমত কমিয়ে এবং আরও নানাভাবে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে শীতঘুমে অভ্যস্ত এরকম বহু প্রাণীকে বছরের যে কোন সময়ে শীতঘুমে আচ্ছন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

ভেঙ্গে পড়ে। শীতকালে এসব উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের দেহের তাপাঙ্ক শীতল রক্তের প্রাণীদের মতই পরিবেশের তাপাঙ্কের উপর নির্ভর করে। শীতঘুমে দেহের তাপাঙ্ক ৩৯° ফারেনহাইটে, এমন কি ৩১° ফারেনহাইটে নেমে আসতে পারে। কিন্তু দেহের তাপাঙ্ক নীচের দিকে নামারও একটা সীমা আছে। পরিবেশের তাপাঙ্ক হিমাঙ্কের নীচে (৩২° ফাঃ) নীচে নেমে এলে মস্তিষ্কের তাপাঙ্ক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেহের তাপাঙ্ক উঠতে সুরু করে ৩৯° ফারেনহাইটে এসে দাঁড়ায়। অনেক প্রাণীর শীতঘুম ভেঙ্গে যায়। হিমাঙ্কের শীতলতা যদি সুপ্তিমগ্ন প্রাণীদের তাপ-নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রে সাড়া জাগাতে না পারে, তবে প্রাণীরা শীতঘুমের মধ্যেই প্রাণ হারায়।

বলা বাহুল্য শীতঘুমে দেহের বাইরের কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। দেহের অভ্যন্তরের কাজও খুব কমে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অতি অনিয়মিত ও স্তিমিত হয়ে পড়ে। হৃৎপিণ্ড আর দ্রুতগতিতে লাপ-ডুপ লাপ-ডুপ করে চলে না। স্বাভাবিক অবস্থায় মেঠো কাঠবিড়ালদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হচ্ছে মিনিটে তিন-শ' বার। শীতঘুমে এই স্পন্দন মিনিটে আট-দশে নেমে আসে। রক্তের চাপও বেশ নেমে যায়। দেহের তাপাঙ্ক একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে নেমে এলে স্নায়ু বহুদিক থেকে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

এক কথায় বলা চলে শীতঘুমে বেসাল মেটাবলিজমের হার খুবই নেমে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, শীতঘুমে বেসাল মেটাবলিজমের হার স্বাভাবিক বেসাল মেটাবলিজমের হারের $\frac{1}{১০০}$ ভাগ থেকে $\frac{১}{৬০}$ ভাগে এসে দাঁড়ায়। জীবনধারা কি স্তিমিত গতিতে চলে? তবে মাঝে মাঝে এই চৈতন্যহারা সুপ্তির ছেদ পড়ে—প্রাণীরা কিছু সময়ের জন্যে জেগে ওঠে। জেগে উঠলেই বেসাল মেটাবলিজম, তথা শক্তি ব্যয়ের হার বেড়ে যায়। অনেক সময় এই ঘুম ভাঙ্গার মধ্যে একটা ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায়; যেমন—একজাতীয় মেঠো কাঠবিড়ালের শীতঘুম প্রতি একাদশ দিনে ভেঙ্গে যায়। একাদশ দিনে জেগে থাকবার সময় তার দেহে যে শক্তি ব্যয়িত হয়, তার পরিমাণ আগের দশ দিনের মোট বেসাল মেটাবলিজম বা মোট শক্তি ব্যয়ের চেয়েও বেশী। আবার এমন প্রাণীও (Dormouse) দেখা গেছে, যারা গবেষণাগারের প্রয়োজনে সৃষ্ট শীতল পরিবেশে একনাগাড়ে ১১৪ দিন ঘুমিয়েছে, মাঝে শীতঘুমের কোন ছেদ পড়ে নি। দীর্ঘ সুপ্তির পর জাগবার সময় এলে দেহের ঘুম ভাঙ্গার কাজ দ্রুতগতিতে সুরু হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তিন-চার ঘণ্টার ভিতরেই দেহের তাপাঙ্ক ৮৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত বেড়ে যায়, হৃৎপিণ্ড নিয়মিত স্পন্দিত হতে থাকে।

শীতঘুমে দেহের প্রয়োজনীয় শক্তির উৎস

আমরা জানি অনাহারে, বিশেষ করে অনাহারের প্রথম দিকে প্রধানতঃ দেহের চর্বিই দেহের শক্তি যুগিয়ে থাকে। শীতঘুমের সময়েও এই চর্বি বা ফ্যাটই দেহের শক্তি যুগিয়ে থাকে। শীতঘুমের আগে অনেক প্রাণী খেয়েদেয়ে দেহে প্রচুর চর্বি জমা করে। খেয়েদেয়ে দেহে চর্বি জমাবার কাজে এসব প্রাণীরা বেশ পটু। প্রকৃত পক্ষে দেহের চর্বি জমাবার কাজটা হচ্ছে শীতঘুমের পূর্বপ্রস্তুতি। গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গেছে, চর্বিপুষ্ট ভূ-কাঠবিড়ালেরা রোগা ভূ-কাঠবিড়ালের আগে শীতঘুমে আচ্ছন্ন হতে পারে। শুধু তাই নয়, রোগা ভূ-কাঠবিড়ালদের চেয়ে মোটাসোটা কাঠবিড়ালেরা শীতঘুমে বেশী দিন কাটাতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে, শীতসুপ্ত প্রাণীদের দেহে চর্বি কি করে চার-পাঁচ মাস বা তারও বেশী সময় দেহের শক্তি সরবরাহের কাজ চালায়? এত দীর্ঘদিন ধরে শক্তি সরবরাহের কাজ চালাবার মত যথেষ্ট চর্বি দেহে থাকে কি করে?

একটা উদাহরণ দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা হবে। ধরা যাক, ভূ-কাঠবিড়ালের দেহের ওজন পাঁচ-শ' গ্রাম এবং প্রাণীটির বেসাল মেটাবলিজমের শক্তির প্রয়োজনীয়তা দেহের মোট শক্তির প্রয়োজনীয়তার অর্ধেক। এ শুধু ধরে নেওয়া ভূ-কাঠবিড়ালের বেসাল মেটাবলিজমের শক্তির প্রয়োজনীয়তা, দেহের মোট শক্তির প্রয়োজনীয়তা তার কত ভাগ, তা ঠিক জানা নেই। শীতঘুমে দেহের বাইরের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। যদি ধরে নেওয়া যায়, ঐ সময়ে বেসাল মেটাবলিজমের হার সাধারণ হারের $\frac{১}{৫০}$ ভাগ হয়ে যায়, তবে বলা যায় শীতঘুমের সময় কাঠবিড়ালের যে শক্তির প্রয়োজন, তা তার স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তার $\frac{১}{১০০}$ ভাগ হয়ে যায়। চব্বিশ ঘণ্টায় মানুষের মোট শক্তির প্রয়োজনীয়তা কিলোগ্র্যাম প্রতি ৫০ ক্যালোরী বলে ধরে নেওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় দেহের ওজনের কিলোগ্র্যাম প্রতি ভূ-কাঠবিড়ালের শক্তির প্রয়োজনীয়তা যদি মানুষের দৈনিক শক্তির প্রয়োজনীয়তার দশ গুণও হয় (এও শুধু ধরে নেওয়া, তবে দেহের ওজনের অনুপাতে কাঠবিড়ালের শক্তির প্রয়োজনীয়তা যে অনেক বেশী, তা বেসাল মেটাবলিজমের উপর আলোচনা থেকেই প্রতিভাত হবে), তবে কাঠবিড়ালের দৈনিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা হবে $\frac{৫০}{২} \times ১০$ বা ২৫০ ক্যালোরী। শীতঘুমের সময় তাই কাঠবিড়ালের দৈনিক শক্তির প্রয়োজনীরতা হবে ২.৫ ক্যালোরী। শীতঘুমে চার মাস কাটালে চার মাসে ঘুমের সময় ব্যয়িত হবে ৩০০ ক্যালোরী। ভূ-কাঠবিড়ালের শীতঘুম মাঝে মাঝে ভেঙ্গে যায় এবং তার জন্যে যদি উপরি ৩০০ ক্যালোরী শক্তি ব্যয়িত হয়, তবে শীতঘুমের সময়টাতে মোট ৬০০ ক্যালোরী শক্তি ব্যয়িত হবে। আমরা জানি, প্রতি গ্র্যাম ফ্যাট থেকে ৯ ক্যালোরী শক্তি পাওয়া যায়, তাই ৬০০ ক্যালোরী শক্তি পাওয়া যাবে প্রায় ৬৭ গ্র্যাম ফ্যাট থেকে; অর্থাৎ শক্তি যোগাবার কাজে ভূ-কাঠবিড়ালের দেহ থেকে ৬৭ গ্র্যাম ফ্যাট ধ্বংস হয়ে যাবে। শীতঘুমের আগে কাঠবিড়াল যখন খেয়েদেয়ে মোটাসোটা হয়, তখন তার দেহে অন্ততঃ ২০% চর্বি জমে বলে ধরে নেওয়া চলে। তাই ধরে নেওয়া চলে, ওই সময়ে ভূ-কাঠবিড়ালের দেহে ১০০ গ্র্যাম চর্বি থাকে। তার মানে হচ্ছে, চার মাসে শীতঘুমের সময় শক্তি সরবরাহের প্রয়োজনে ৬৭% চর্বি বা ফ্যাট ধ্বংস হয়ে যায়। গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গেছে, শীতঘুমের সময় বিশেষ জাতের ভূ-কাঠবিড়ালের দেহের ৮৫% চর্বি ধ্বংস হয়ে যায়। শীতঘুমের সময় শক্তি সরবরাহের কাজে দেহের প্রোটিনে যে বিশেষ হাত পড়ে না, তা বিশেষ পরীক্ষায় জানা গেছে।

কোন কোন শ্রেণীর প্রাণী (যেমন—Golden Hamster) শীতঘুমের আগে তাদের আশ্রয়-কুঠুরিতে খাবার জমিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে যখন ঘুমের ছেদ পড়ে, তখন তারা সঞ্চিত খাদ্য খায়। কিন্তু শীতঘুমের সময় শক্তির প্রয়োজনীয়তা যদি বিশেষভাবে না কমে যেত, তবে সঞ্চিত খাদ্য দেহের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রচুর হতো—প্রাণীরা না খেয়েই মারা যেত।

মোট কথা, শীতঘুমের সময় প্রাণীদের শক্তির চাহিদা এত কমে যায় যে, শীতসুপ্ত প্রাণীরা দেহের চর্বির উপর ভরসা করে বা দেহের চর্বি ও সীমিত পরিমাণে সঞ্চিত খাদ্যের উপর ভরসা করেই ঘুমের কয়টি মাস দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারে।

প্রতি রাতের শীতঘুম

আমরা দেখেছি, হামিং বার্ডের বেসাল মেটাবলিজমের হার এত বেশী যে, পাখীটির পক্ষে ঘুমের দশ-বারো ঘণ্টা সময় না খেয়ে কাটানো সম্ভব নয়। দেহে যে চর্বি ও সহজলভ্য গ্লাইকোজেন থাকে,

তা দশ-বার ঘণ্টা বেসাল মেটাবলিজমের শক্তি সরবরাহ করবার মত যথেষ্ট নয় বা যথেষ্ট হলেও তা নিঃশেষ করে আবার পরের দিনই জমা করবার ক্ষমতা হয়তো ছোট পাখীটির নেই। তাই রাতের অন্ধকার নেমে এলেই পাখীটিকে শীত-ঘুম দিতে হয়। ফলে বেসাল মেটাবলিজমের হার কমে যায় এবং দেহের সঞ্চিত শক্তির (চর্বি ও গ্লাইকোজেন) কিছু অংশ খরচ করলেই রাত কেটে যায়। কম তেলে সারা রাত বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হলে পলতেটা ছোট করে দিতেই হবে! যে অঞ্চলে ছোট পাখীটির বাস, সেখানকার রাতের তাপাঙ্ক পাখীটির দেহের স্বাভাবিক তাপাঙ্কের চেয়ে অনেক কম। রাতের অন্ধকার নেমে আসবার আগে হামিং বার্ড খুব একচোট খেয়ে নেয়, তারপর রাতের শীতঘুমের প্রস্তুতি চলে। দেহের তাপাঙ্ক ধীরে ধীরে নামতে থাকে। শীতঘুমে আচ্ছন্ন হলে দেহের তাপাঙ্ক ৭৫° ফাঃ-এ নেমে যায়। বেসাল মেটাবলিজমের হার কমতে কমতে রাত দুপুরে তা দিনের হারের ১/১৫ ভাগ হয়ে যায়। পাখীটির দেহের কোন সাড়া বা চৈতন্য থাকে না - যেন এক টুকরা পাথর হয়ে যায়। পাকা ফলের মত দিব্যি তুলে আনা যায় শীত-সুপ্ত হামিং বার্ডদের। ভোরের দিকে দেহের বেসাল মেটাবলিজমের হার আবার উঠতে থাকে এবং দেহের তাপও স্বাভাবিক হতে থাকে।

মানুষ যদি শীতঘুম দিতে পারতো

মানুষ শীতঘুম দিতে পারে না। কিন্তু মানুষ যদি তা পারতো এবং শীতঘুমের সময় যদি তার বেসাল মেটাবলিজমের হার অন্যান্য শীতসুপ্ত প্রাণীদের মতই কমে যেত, তা হলে তার দেহের চর্বি কত দিনের শীতঘুমের রসদ হতো, হিসাব করা যাক। হিসাবে অনেক গলদ এবং অনেক 'যদির' প্রশ্ন রয়েছে, তবু হিসাবটিতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিও আছে। মানুষের দেহে শতকরা দশ-বারো ভাগ চর্বি আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। একজন সাধারণ আকারের মানুষের দৈহিক ওজন ৫৫ কেজি হলে তার দেহে ৫.৫ কেজি চর্বি রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। যদি ধরা যায় যে দেহের কোন ক্ষতি না করে দেহের ৫০% চর্বি শক্তি সরবরাহের কাজে ব্যয়িত হতে পারে, তবে শীতঘুমের জন্যে ৫.৫/২ বা ২.৭৫ কেজি চর্বি পাওয়া যাবে। যার দেহের ওজন ৫৫ কেজি, তার দৈনিক বেসাল মেটাবলিজমের শক্তির প্রয়োজনীয়তা ১৩০০ ক্যালোরী বলে ধরে নেওয়া যায়। শীত-ঘুমের সময় বেসাল মেটাবলিজমের হার যদি স্বাভাবিক হারের ১/৫০ ভাগ হয়ে যায়, তবে শীত-ঘুমের সময় লোকটির দৈনিক মোট শক্তির প্রয়োজনীয়তা হবে ২৬ ক্যালোরী। ঐ পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় প্রায় তিন গ্র্যাম চর্বি বা ফ্যাট থেকে। তার মানে হচ্ছে, এক কেজি চর্বি তার তিন-শ' তেত্রিশ বা প্রায় এক বছরের শীতঘুমের পক্ষে যথেষ্ট হবে। তাই ২.৭৫ কেজি চর্বি তার আড়াই বছর শীতঘুমের রসদ। অবশ্য মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙ্গার দরুণ অতিরিক্ত শক্তি খরচের প্রশ্ন রয়েছে। তাহলেও ২.৭৫ কেজি চর্বি এক বছর শীতঘুমের রসদ তো হবেই। এক বছর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে এই রকম একজন লোকের যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, তার সবটা চাল বা আটা থেকে নিলে অন্ততঃ ২৫০-৩০০ কেজি চাল বা আটার প্রয়োজন হবে। ছয় মাস সময় শীতঘুমে কাটাতে পারলেও জন প্রতি বছরে ১২৫-১৫০ কেজি খাদ্য বেঁচে যেত বা ওই পরিমাণ খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হতো না। তাই আমরা দেখতে পেলাম, সাময়িক দুর্ভিক্ষে (যেমন—অনাবৃষ্টি বা অন্য কারণে ফসল না জন্মাবার ফলে দুর্ভিক্ষে) ভুক্তভোগীদের যদি শীত-

ঘুমে আচ্ছন্ন করা সম্ভব হতো, তবে বিনা খাদ্যেও তাদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যেত।

মানুষের সম্ভাব্য শীতঘুম

সকলেই জানেন নানারকম ওষুধবিষুধ বা রাসায়নিক বস্তুর প্রয়োগে মানুষের দেহের কাজে নানারকম সাময়িক পরিবর্তন আনা সম্ভব। ঘুমের ওষুধ দিয়ে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায় বা ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে সাময়িকভাবে জ্ঞানহারা করা যায়—এরকম বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তাই প্রশ্ন, এমন কিছু কি আবিষ্কার করা যায় (তা রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগ বা অন্য যে কোন ভাবেই হোক না কেন), যাতে শীতঘুমের দৈহিক পরিবর্তনগুলি ইচ্ছামত মানুষের দেহে আনা যেতে পারে এবং ইচ্ছামতই ওই রকম চৈতন্যহারা ঘুম থেকে সুপ্ত মানুষকে জাগানো যেতে পাবে? অন্ততঃ সে রকম আবিষ্কার সম্ভব হবার বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি?

যদি কোন স্তন্যপায়ী জন্তুকে ঠাণ্ডা পরিবেশে রাখা যায়, তবে মাংসপেশীর সঙ্কোচনের ফলে তার দেহে কাঁপুনি ধরে। কাঁপুনি ধরবার ফলে দেহে তাপের সৃষ্টি হয়। দেহ তার তাপাঙ্ক এভাবে রক্ষা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিবেশের তাপাঙ্ক যদি নামতে নামতে খুব নেমে যায়, তবে দেহ আর তার তাপাঙ্ক রক্ষা করতে পারে না -দেহের তাপাঙ্ক নামতে সুরু করে। তাপাঙ্ক নামতে নামতে এমন একটা সীমায় পৌঁছায়; যার নীচে গেলেই জীবের মৃত্যু ঘটে। পরিবেশের তাপাঙ্ক যদি খুবই নেমে যায়, তাহলে শীতঘুমে অভ্যস্ত প্রাণীদেরও মৃত্যু ঘটে, তবে এসব প্রাণীদের মৃত্যু ঘটবার তাপাঙ্ক অনেক নীচে। যে তাপাঙ্কে শীতসুপ্ত প্রাণীরা শীতঘুমের মধ্যে বেঁচে থাকে, সে তাপাঙ্কে অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের কোন রকমেই বাঁচা সম্ভব নয়—সে তাপাঙ্কে পৌঁছাবার বহু আগেই তাদের মৃত্যু হয় কিন্তু ইথার বা ঐ জাতীয় রাসায়নিক বস্তুতে সংজ্ঞাহারা করে নিলে পরিবেশের শীতলতায় দেহের তাপাঙ্ক নেমে যাওয়ার ব্যাপারে সাধারণ অর্থাৎ শীতঘুমে অভ্যস্ত নয়, এরকম উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের দেহের অবস্থাও অনেকটা শীতল রক্তের প্রাণীদের মতই হয়। একটি বানরকে ইথারে গভীরভাবে সংজ্ঞাহারা করে নিয়ে ঠাণ্ডা ঘরে বহুক্ষণ রেখে দেবার ফলে তার দেহের তাপাঙ্ক ক্রমশঃ কমতে থাকে। দেহের তাপাঙ্ক ৮৭ ফাঃ এ নেমে এলে তাপাঙ্ক নামাবার জন্যে আর ইথারের প্রয়োজন হয় না। শীতল পরিবেশে ইথারের প্রভাবে মস্তিষ্কের তাপ-নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র বিঘ্নিত হয়ে তা ৮৭° ফারেনহাইটে স্থায়িত্ব লাভ করে। মানুষের মেরুদণ্ডের স্নায়ুরজ্জু (Spinal cord)—যার সঙ্গে মস্তিষ্কের তাপ-নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের সরাসরি যোগ রয়েছে—কোন কারণে ছিন্ন হয়ে গেলেও দেহ তাপ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং মানব-দেহের অবস্থা অনেকটা শীতল রক্তের প্রাণীদের মত হয়ে যায়। মোট কথা, শীতল পরিবেশে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা মস্তিষ্কের তাপ-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় বিশৃঙ্খলা আনা যায় এবং এভাবে মানুষের মৃত্যু না ঘটিয়েও দেহের তাপাঙ্ক অনেক নীচে নামিয়ে আনা সম্ভব; অর্থাৎ সাময়িকভাবে মানুষের দেহে অন্ততঃ খানিকটা শীতঘুমের অবস্থা আনা সম্ভব। বলা বাহুল্য, মানুষের এই কৃত্রিম শীত-ঘুমেও বেসাল মেটাবলিজমের হার কমে যায়। প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানের কলা-কৌশলে সৃষ্ট মানুষের এই সাময়িক শীতঘুম শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। ১৯৫০ সালে ইটালীর অধ্যাপক ডগলিয়ট্টি (Dogliotti) সর্বপ্রথম শল্যচিকিৎসায় কৃত্রিম শীতঘুমের প্রয়োগ করেন। গুরুতরভাবে অসুস্থ একটি ছেলেকে কৃত্রিম উপায়ে শীতঘুমে আচ্ছন্ন করে

তার দেহে অস্ত্রোপচার করেন। কৃত্রিম শীতঘুমে মানুষের দেহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা হয়তো পুরাপুরি শীতঘুমের অবস্থা নয়। দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে কৃত্রিম শীতঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখাও হয় নি। তবে একথা ধরে নেওয়া যায় যে, প্রকৃত শীতঘুম অধিগত করবার দিকে মানুষ বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্যে মানুষের দেহের অভ্যন্তরে যে সব কাজকর্ম চলছে, সে বিষয়ে মানুষের জ্ঞান যখন পরিপূর্ণ হবে, তখন হয়তো মানুষ জীবজন্তুর শীতঘুমের অবস্থাটা পরিপূর্ণভাবেই আয়ত্তে আনতে পারবে। তখন হয়তো ইচ্ছামত যে কোন লোককে দীর্ঘদিনের জন্যে শীতঘুমে মগ্ন রাখা অসম্ভব হবে না।

কিন্তু কথা হচ্ছে, দুর্ভিক্ষের সময় ঢালাওভাবে অগণিত লোকের জন্যে শীতঘুমের ব্যবস্থা করতে হলে যে রাজকীয় বৈজ্ঞানিক আয়োজন করতে হবে, যতটা কাঠখড় পোড়াতে হবে, তার দায়িত্ব কে নেবে? তাছাড়া দেশের হাজার হাজার লোককে শীতঘুমে চৈতন্যহারা করে রাখবার সঙ্গে নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নও জড়িত রয়েছে। হাজার হাজার লোককে চৈতন্যহারা ও মৃতপ্রায় করে রেখে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলকে ঘুমন্ত পুরীতে পরিণত করে রাখবার মত হিম্মত হয়তো কোন জনপ্রিয় সরকারেরই হবে না। পাশ্চাত্য দেশের যে সব বৈজ্ঞানিক মানুষের সম্ভাবিত শীতঘুমকে দুর্ভিক্ষ-সাগর তরাবার ভেলারূপে দেখতে চাইছেন, তাঁরা হয়তো ফাঁপা মাটিতে ভিৎ তৈরির স্বপ্ন দেখছেন। তাই একে একটি বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। তবে শল্যচিকিৎসায় যে সাময়িক শীতঘুমের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে, তার ইঙ্গিত আমরা আগেই দিয়েছি। অনেকে মনে করেন, শীতঘুমের কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে পারলে মানুষের জীবনকাল দীর্ঘতর করা সম্ভব হবে। সমস্ত পৃথিবীর জনগণের অবস্থা সামগ্রিকভাবে বিচার করলে তাও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে।

"বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

রবীন্দ্রনাথ

১৯৬৬ সালের 'শান্তির জন্যে পরমাণু' পুরস্কার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু-শক্তি কমিশন ১৯৬৬ সালের এনরিকো ফের্মি 'শান্তির জন্যে পরমাণু' (অ্যাটম ফর পিস) পুরস্কার প্রদান করেছেন প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী অধ্যাপক অটো হান, অধ্যাপক ফ্রিজ স্ট্রাসমান এবং অধ্যাপিকা লিজে মাইটনারকে যৌথভাবে। ইতালীয় প্রখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মির স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে প্রতি বছর বিশ্বের কোন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে অধ্যাপক ফের্মি সেখানকার বিজ্ঞানীদের সহযোগে নিয়ন্ত্রিত পরমাণুর শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া (কন্ট্রোলড্ চেন রিয়্যাকশন) সম্পাদনে সর্বপ্রথম সক্ষম হন এবং সেদিন থেকে মানুষের কাছে পরমাণু-শক্তির স্বর্ণদ্বার খুলে যায়। এই পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ ৫০ হাজার ডলার এবং একটি স্বর্ণপদক। বিশ্ববিশ্রুত পদার্থ-বিজ্ঞানী নীলস্ বোরকে সর্বপ্রথম এই পুরস্কার দেওয়া হয়। এই বছর পুরস্কারের অর্থ তিন জন বিজ্ঞানীকে সমভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকে একটি করে স্বর্ণপদক পাবেন। বিশ্বের মধ্যে অধ্যাপিকা মাইটনারই সর্বপ্রথম মহিলা বিজ্ঞানী যিনি এই পুরস্কার লাভ করলেন।

পরমাণু-শক্তি বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে হান, স্ট্রাসমান ও মাইটনারের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই বিষয়ে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ইতালীতে ফের্মি, জার্মেনীতে হান ও স্ট্রাসমান এবং ফ্রান্সে ফ্রেডরিক জোলিও-কুরী দম্পতি পরমাণু-কণিকার বিভিন্ন মৌল অভিঘাত সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রনের দ্বারা অভিঘাত করে ফের্মি ও তাঁর সহকর্মীরা এমন একটি নতুন মৌলের সন্ধান পেলেন, পৃথিবীতে যার অস্তিত্ব নেই। কৃত্রিম উপায়ে এই মৌল সৃষ্টির সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-জগতে বিশেষ সাড়া পড়ে গেল। কোন কোন মহল ফের্মির সৃষ্ট মৌলকে '৯৩ সংখ্যক মৌল' অর্থাৎ ইউরেনিয়ামের পরবর্তী মৌল বলে অভিহিত করলেন।

জার্মেনীতে হান এবং মাইটনার রোমের গবেষণাগারে ফের্মি সম্পাদিত পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করবার চেষ্টা করলেন। তাঁরা ইউরেনিয়াম পরমাণুকে মন্থরগতি নিউট্রন দিয়ে অভিঘাত করেন। অভিঘাতের ফলে ইউরেনিয়াম থেকে সৃষ্ট পদার্থগুলি তাঁরা পরীক্ষা করলেন। ফের্মির মত তাঁরাও একটি অজ্ঞাত পদার্থের সন্ধান পেলেন। এর দ্বারা ফের্মির পর্যবেক্ষণ সমর্থিত হলো। কিন্তু অভিঘাতের ফলে ইউরেনিয়াম পরমাণুর কি দশা ঘটলো, সে ব্যাপারটা বিজ্ঞানীদের কাছে তখন রহস্যাবৃতই রয়ে গেল।

ইউরেনিয়ামকে অভিঘাত করে ফের্মি তাথেকে যে কয়টি পদার্থের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশী সংখ্যক মৌলের সন্ধান পান হান ও মাইটনার তাঁদের পর্যবেক্ষণে। এর রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় তাঁরা কয়েক বছর ধরে ইউরেনিয়াম অভিঘাত সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যাপৃত রইলেন। এই সময় স্ট্রাসমান এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।

অনেক দিন পর্যন্ত তাঁদের ধারণা ছিল, অভিঘাতের ফলে সৃষ্ট মৌলগুলি হচ্ছে ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌল (ট্রান্স-ইউরেনিয়াম এলিমেন্ট)।

তাঁরা বললেন, কেবলমাত্র ৯৩ সংখ্যক মৌলই তাঁরা সৃষ্টি করেন নি, সেই সঙ্গে ৯৪, ৯৫ এবং সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌল সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

১৯৩৮ সালে তাঁরা জানতে পারলেন, প্যারীতে ফ্রেডরিক ও আইরিন জোলিও কুরী ইউরেনিয়াম-উপজাত এমন একটি নতুন মৌলের সন্ধান পেয়েছেন, যার ধর্ম ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌলের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তেমন মেলে না। একই রকম ফল পাওয়া যায় কি না, তা নিজেরা যাচাই করে দেখবার জন্যে হান, স্ট্রাসমান ও মাইটনার মনস্থ করলেন, জোলিও-রেডিয়ামের মত। তাঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন, এটি রেডিয়ামই।

ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌলগুলি থেকে তাঁরা এই রেডিয়ামকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বেরিয়ামের সাহায্যে পৃথক করবার চেষ্টা করেন। বেরিয়ামের রাসায়নিক ধর্ম অনেকটা রেডিয়ামের মত। যখন এই দুটি ধাতু অন্যান্য মৌলের সঙ্গে কোন তরল পদার্থে থাকে, তখন রেডিয়ামকে টেনে নিয়ে বেরিয়াম তরলের তলদেশে অধঃক্ষিপ্ত হয়। তারপর তরল পদার্থ থেকে এই দুটিকে বের করে নিয়ে পরস্পর থেকে পৃথক করা যায়। এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাঁরা অভিঘাতের দ্বারা

অধ্যাপক অটো হান

অধ্যাপিকা লিজে মাইটনার
(ব্লক: 'অমৃত' পত্রিকার সৌজন্যে)

কুরীর পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করবেন। এই সময় নাৎসীদের অত্যাচারের প্রকোপে মাইটনার জার্মেনী ছেড়ে যেতে বাধ্য হন।

হান ও স্ট্রাসমান তাঁদের তিন জনের গবেষণা চালিয়ে গেলেন। যখন তাঁরা জোলিও-কুরীর পরীক্ষা পুনরাবৃত্তি করলেন, তখন এমন একটি মৌলের সন্ধান পেলেন, যার রাসায়নিক ধর্ম ইউরেনিয়াম-উপজাত পদার্থগুলির সঙ্গে কিছু পরিমাণ বেরিয়াম মিশিয়ে দিলেন। কিন্তু বার বার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁরা কোন রেডিয়াম পৃথক করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা উপসংহারে এলেন, ইউরেনিয়ামকে অভিঘাতের ফলে বেরিয়ামেরই সৃষ্টি হয়েছে, তাই বেরিয়াম ছাড়া অন্য কিছু পৃথক করা যাচ্ছে না।

কিন্তু ইউরেনিয়াম থেকে কিভাবে বেরিয়াম সৃষ্টি হতে পারে, সেটা অদ্ভুত বলে ঠেকলো। কারণ ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ৯২ এবং বেরিয়ামের ক্রমাঙ্ক ৫৬। হান এবং ষ্ট্রাসম্যান তাঁদের অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা সুইডেনে মাইট-নারের কাছে লিখে পাঠালেন, মাইটনার বিষয়টি অনুধাবন করে বুঝতে পারলেন, আসল ব্যাপার কি ঘটেছে—কিছু সংখ্যক ইউরেনিয়াম পরমাণু প্রায় সমান দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। তার একটি অংশ হচ্ছে বেরিয়াম এবং অপর অংশটিকে স্বল্পকালের মধ্যে সনাক্ত করা গেল বিরল গ্যাস ক্রিপটন বলে। ক্রিপটনের পারমাণ-বিক ক্রমাঙ্ক ৩৬। তাহলে ৫৬ ও ৩৬ যোগ করলে দাঁড়ায় ৯২, যা হলো ইউরেনিয়ামের ক্রমাঙ্ক।

লিজে মাইটনার ও তাঁর ভাইপো অটো ফ্রিশ এই ব্যাপারটি গভীরভাবে অনুধাবন করে জানালেন, নিউট্রনের দ্বারা ইউরেনিয়াম পরমাণু অভিঘাতের ফলে প্রকৃতপক্ষে ইউরেনিয়ামের ভাঙন ঘটেছে। তাঁরা এই ঘটনার সংজ্ঞা দিলেন 'ইউরেনিয়ামের বিভাজন' (ইউরেনিয়াম ফিসন)। পরে জানা গেল, এই বিভাজনের ফলে আইন-ষ্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র অনুযায়ী ইউরেনিয়াম পরমাণু থেকে বিপুল শক্তি মুক্ত হয়। এই ভাবে হান, মাইটনার ও ষ্ট্রাসম্যানের গবেষণায় বিপুল শক্তি-ভাণ্ডার উন্মোচনের একটি নতুন উপায় আবিষ্কৃত হলো—যে শক্তি আজ 'পরমাণু-শক্তি' (অ্যাটমিক এনার্জি) নামে সুবিদিত। এর কিছুদিন পরে ফের্মি জার্মান পরীক্ষাটির পুনঃ পরীক্ষা করে দেখেন এবং একই রকম ফল লাভ করেন। এর দ্বারা ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রীনের (নিউক্লিয়াস) প্রত্যাশিত বিভাজন প্রমাণিত হলো।

এর পরবর্তী ইতিহাস আমাদের সকলেরই প্রায় জানা। ফের্মির দু-জন সহকর্মী সিলার্ড ও ভিগ্‌নারের এই নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পর্কে আইনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং আইনষ্টাইন কর্তৃক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে পত্র প্রেরণ, ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরকার টেনিস কোর্টে প্রথম ইউরেনিয়াম পাইলে শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া সম্পাদন, ১৯৪৫-এর জুলাই মাসের এক রাত্রিতে নিউ মেক্সিকোর আলামগর্দোর বিজন প্রান্তরে প্রথম পরীক্ষামূলক পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ এবং অগাষ্টের প্রথম সপ্তাহে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর মার্কিন বাহিনীর পরমাণু বোমা নিক্ষেপ এবং তারপর নানা শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণু শক্তির প্রয়োগ।

বিলম্বে হলেও মার্কিন পরমাণু-শক্তি কমিশন যে এই বছর পরমাণু-শক্তির পথিকৃৎত্রয়ী হান, মাইটনার ও ষ্ট্রাসম্যানকে 'শান্তির জন্যে পরমাণু' পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তাতে বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানানুরাগী মাত্রেই আনন্দিত হবেন।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা প্রসঙ্গ

বর্তমান বিজ্ঞান শিক্ষা-পদ্ধতি

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান বিতরণের যে ব্যবস্থা রয়েছে, সেটা যে ত্রুটিহীন ও সন্তোষজনক নয়, সে কথা আজ আর কারোর অজানা নয়। এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সন্তোষজনক করতে হলে ঐ ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিকে জানতে হবে বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসু চোখ ও মন দিয়ে—জানতে হবে ছাত্রের মনের সঙ্গে শিক্ষকের মনকে মিশিয়ে দিয়ে। আমি কিছুদিন কয়েকটি উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেছি। সেই সময় সবচেয়ে বেদনাদায়ক যে জিনিসটি আমার চোখে পড়েছিল, তা হলো ছাত্রদের না বুঝে মুখস্থ করবার প্রবৃত্তি। আমার জানতে ইচ্ছা গেল, কেন তাদের এই প্রবৃত্তি। অন্যান্য দু-একটি স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সেই একই "না বুঝে মুখস্থ করবার ইচ্ছা"। এই মুখস্থ করবার ইচ্ছার পিছনে রয়েছে অনেক কারণ।

প্রথমতঃ অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীগুলিতে পড়া মুখস্থ করানো আমাদের দেশে একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমেই বর্ণপরিচয় মুখস্থের পালা, তারপর ধারাপাত এবং শেষে কবিতা মুখস্থ। ভূগোল মুখস্থ, ইতিহাস মুখস্থ, ইংরেজী পদ্যাংশ মুখস্থ—এমনি করে কত না মুখস্থ লাইন দিয়ে দাঁড়ালো। এই ভাবে মুখস্থ করতে করতে যখন একটি ছেলে এসে পৌঁছুলো উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে, তখন তাকে যতই বলা হোক বিজ্ঞান মুখস্থ করে পড়বার জিনিষ নয়, সে এই সব উপদেশ শুনতে রাজী নয়। সে ভাবে, লেখা-পড়ার প্রধান অঙ্গ হচ্ছে মুখস্থ করা।

দ্বিতীয়তঃ কে তাকে বুঝিয়ে দেবে যে, বুঝে পড়বার মধ্যে আছে আনন্দ। কে হবে সেই আনন্দের প্রতীক? বেশীর ভাগ শিক্ষক নিজেরাই পড়া মুখস্থ করে এসে ক্লাসে সেটি হুবহু মুখস্থ বলে যান। ছাত্রদের মধ্যে সেটিকে আন্তরিকভাবে প্রবেশ করিয়ে দেবার যোগ্যতা বা ইচ্ছা তাঁদের থাকে না। শিক্ষকদের নিজেদেরই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জ্ঞানের গভীরতা কম।

তৃতীয়তঃ সিলেবাসের বা পাঠ্যসূচীর দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বেশী হওয়ায় ছাত্র ও শিক্ষকদের আসল উদ্দেশ্য হলো ঐ পাঠ্যসূচী শেষ করা। পাঠ্যসূচী যেন একটা বিরাট ভয়ের ব্যাপার। অভিভাবকবৃন্দ প্রথমে যাচাই করেন—কোর্স শেষ হলো কি না, যদি না হয়ে থাকে তাহলেই বুঝতে হবে শিক্ষক ফাঁকিবাজ, কেউ তখন দেখতে যাবেন না যে, কোন্ শিক্ষক কতখানি দরদ দিয়ে তাঁর ছাত্রদের পড়ান। Quality-র সমাদর নেই, Quantity-র সমাদর আছে।

এখন আমি দু-একটি ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। একদিন একপাড়ায় আমার এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গেছি, পাশের বাড়ী থেকে একটি স্কুলের ছেলের পড়বার আওয়াজ আসছে। ছেলেটি ছোট্ট এক লাইনের একটি সমীকরণকে ২০/২৫ মিনিট ধরে মুখস্থ করছে। আমি তো অবাক।

আর একদিন বাড়ীর ছাতে শুনছি, একটা ছেলে প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে নিউটনের গতি সূত্রটি (Newton's Laws of Motion) মুখস্থ করছে। দু-লাইন পড়া তৈরি করতে প্রায় দশ ফোঁটা রক্ত ক্ষয়। এই মুখস্থের প্রবৃত্তি কলেজের ছাত্রদের মধ্যেও কম নয়। এখন দেখতে হবে, ছেলেরা মুখস্থ করছে কেন? এর কারণ হলো প্রশ্নপত্রে কয়েকটি বাঁধা বা Stereotyped প্রশ্ন থাকে। এটা আমাদের দেশের প্রশ্নপত্রের রেওয়াজ। বাঁধা গতে প্রশ্ন থাকলে ছেলেরা মুখস্থ করবেই, কেন শুধু শুধু তারা মাথা ঘামাতে যাবে? প্রশ্ন এমন হওয়া উচিত যার উত্তর হবে ছোট, যার উত্তরের মধ্য দিয়ে ছাত্রের বুদ্ধির অন্তত: কিছুটা প্রকাশ পাবে, যার উত্তর সরাসরি কোন নোট বইয়ে থাকবে না। কিন্তু পাঠ্যসূচী যদি বিশাল হয়, তাহলে বাঁধাধরা প্রশ্ন না দিয়ে উপায় নেই। যদি পাঠ্যসূচী বিশাল হয় তাহলে ছাত্রদের Degree of Cramming-এর পরীক্ষাই হয়, Degree of Intelligence-এর পরীক্ষা হয় না।

আমাদের দেশে ছাত্রদের মধ্যে মুখস্থের প্রবণতা এসেছে বলে প্রশ্নপত্র যদি একটু এদিক-ওদিক হয়, তাহলেই দেখা যায় টেবিল-চেয়ার নিয়ে তাণ্ডব।

আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-পদ্ধতিকে লক্ষ্য করে অনেক মহাপুরুষই অনেক সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু সবই বইয়ের পাতায় বন্দী। সভা-সমিতির সৌন্দর্য বাড়াবার জন্যে মাঝে মাঝে এগুলি উচ্চারণ করা হয়ে থাকে, কাজে কিছুই হয় না।

বিবেকানন্দ বলেছেন—"The present system of education is wrong. The mind is crammed with facts before it knows, how to think. Real education is that which enables one to stand on ones own legs. The education that you are receiving now in schools and colleges is only making you a race of dyspeptics. You are working like a machine merely, and living a jellyfish existance."

কাজেই শিক্ষা-ব্যবস্থার চাই আমূল পরিবর্তন; শুধু কিছু অর্থব্যয় করলেই আসবে না এই পরিবর্তন। অর্থব্যয় যাতে যথাযথভাবে হয়, সেই দিকে নজর রাখতে হবে। কর্তা ব্যক্তিদের নেমে আসতে হবে নীচের তলায়, সেখানে কি হচ্ছে দেখতে হবে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় খুললেই এই প্রাচীন রোগের নিরাময় হবে না। বিদ্যালয়গুলি হয়েছে একটি Spring Board, যতদিন না কেউ ভাল চাকরী পাচ্ছে, ততদিনই তার অস্তিত্ব সেখানে। শিক্ষকতায় যদি সমাদর থাকে, দারিদ্র্যের করালমূর্তি যদি তাদের ভয় না দেখায়, তবে কেন জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হবে না বিদ্যালয়ে বা মহাবিদ্যালয়ে?

সকল বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় হোক পবিত্র জ্ঞান-মন্দির

শ্রীনিশীথকুমার দত্ত

বিজ্ঞান-সংবাদ

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে অভিনব চেয়ার

রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে একটি অভিনব চেয়ার সম্প্রতি আমেরিকায় উদ্ভাবিত হয়েছে। ঐ চেয়ারের সাজসরঞ্জামের মধ্যে আছে, কতকগুলি বৈদ্যুতিক ক্ষুদ্র যন্ত্র। ঐ সকল যন্ত্র দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ বর্ধিত রূপে প্রকাশ করে থাকে।

ঐ চেয়ারের হাতলে হাত রেখে রোগীকে বেশ আরাম করে বসতে হয়। তারপরেই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় তার নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, হৃৎস্পন্দনের মাত্রা গ্র্যাফ কাগজে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। এই সব তথ্য সংগ্রহের জন্যে ডাক্তারের স্টেথোস্কোপ, ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাফ এবং অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয় এবং বেশ সময় লাগে। তাছাড়া এজন্যে একজন সুশিক্ষিত চিকিৎসকেরও প্রয়োজন হয়। এই ব্যবস্থায় এই সকলের প্রয়োজন হয় না। ঐ চেয়ারে রোগীকে বসাবার কিছুক্ষণের মধ্যে চিকিৎসক রোগীর সম্পর্কে তথ্যাদি হাতের কাছেই পেয়ে যান। ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাফের মত এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র যন্ত্রগুলিকে (সেন্সর) ত্বকের সঙ্গে যুক্ত করতে হয় না।

নেভাডার লাসভেগাসে এরোস্পেস মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ৩৭তম বার্ষিক অধিবেশনে এই চেয়ারটি প্রদর্শিত হয়েছে।

রকেটের জন্যে তৈরি নতুন ধরণের ইস্পাত দন্ত চিকিৎসায় ব্যবহার

আমেরিকায় 'ম্যারেজিং ষ্টিল' নামে এক নতুন ধরণের ইস্পাত তৈরি করা হয়েছে। প্রধানতঃ রকেট এবং গভীর সমুদ্রে গবেষণা ও সাবমেরিন নির্মাণ করবার জন্যেই এই ইস্পাত উদ্ভাবিত হয়েছিল। এটি একটি মিশ্রধাতু। লোহা, ক্রোমিয়াম, নিকেল, টাইটেনিয়াম, সিলিকন এবং ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে ধাতুটি তৈরি করা হয়েছে। এই ইস্পাত প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১৯৭০০০ পাউণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে।

নিউইয়র্ক ইউনিভারসিটির ডেন্টিস্ট্রি কলেজের অধ্যাপক কাফম্যান ও তাঁর সহযোগিরা ইতিমধ্যেই দন্ত-চিকিৎসায় এই ইস্পাত ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে দন্ত-চিকিৎসায় স্বর্ণ এবং প্ল্যাটিনাম ব্যবহার করা হয়। ঐ দুটি ধাতুর তুলনায় এই নতুন ধাতুটির ব্যবহারে খরচও খুব কম পড়বে। তাছাড়া এটি অনেক শক্ত এবং পাতলাও। এজন্যে দন্ত-চিকিৎসায় এই নতুন ধাতু ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধাও অনেক বেশী ও খুবই আরামদায়ক।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর—১৯৬৬

১৯শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা
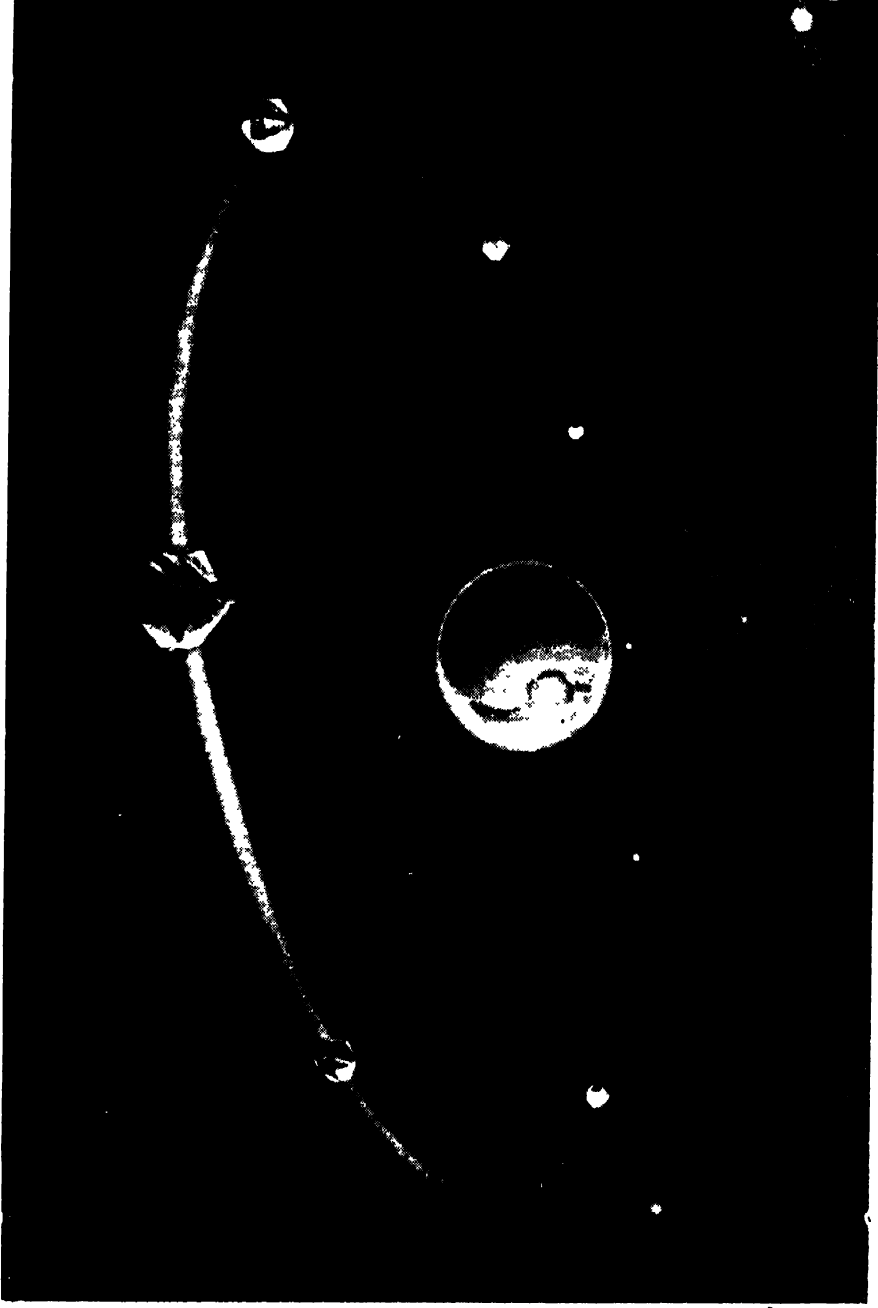
সংবাদ- যোগাযোগকারী কৃত্রিম উপগ্রহের বলয়

পৃথিবীর সর্বত্র সংবাদ আদান-প্রদানের সুব্যবস্থার জন্যে বিষুব রেখার ৩৩,০০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে একই কক্ষ পথে ২২টি কৃত্রিম উপগ্রহ পর পর স্থাপিত হবে। এই উপগ্রহগুলি সৌর ব্যাটারীর সাহায্যে প্রায় ১৫,০০০ কিলোমিটার দূরে দূরে অবস্থিত পৃথিবী-পৃষ্ঠের বেতার স্টেসনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

করে দেখ

শরীরের স্পর্শানুভূতি

মেয়েদের চুলের কাঁটার দুটি বাহুর মধ্যে আধ ইঞ্চিরও কিছু কম ফাঁক থাকে। এরূপ একটা কাঁটার বাহু দুটিকে দু-দিকে টেনে ফাঁকটাকে দেড় ইঞ্চির মত বাড়িয়ে নাও। তোমার বন্ধুদের কাউকে চোখ বুজে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিতে বল। এবার ফাঁক-করা চুলের কাঁটার দুটি মুখই একসঙ্গে তার অগ্রবাহুতে চেপে ধরে বন্ধুকে জিজ্ঞেস কর—সে একটা, না দুটা কাঁটার স্পর্শ অনুভব করছে। আশ্চর্যের বিষয়—দেড় ইঞ্চি তফাতে দুটা কাঁটার স্পর্শকে তার একটা কাঁটার স্পর্শ বলেই মনে হবে, অর্থাৎ দুটি পৃথক স্থানের স্পর্শকে সে একটি স্থানের স্পর্শের মত অনুভব করবে।
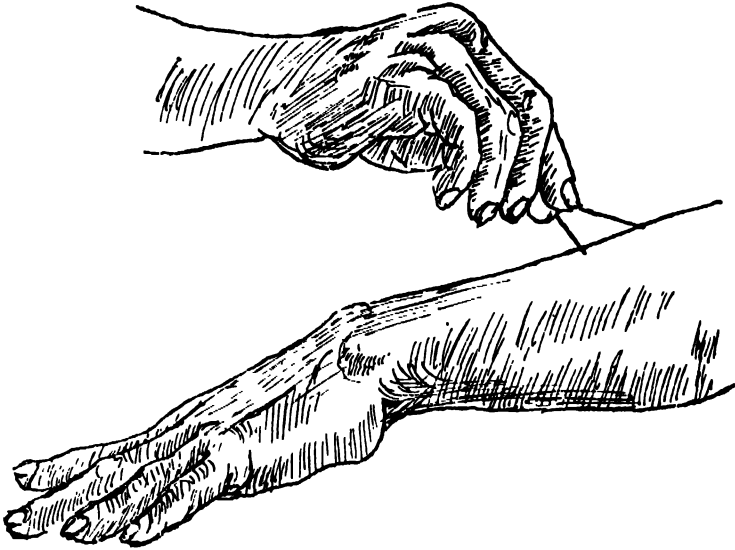
এবার চুলের কাঁটার বাহু দুটাকে চেপে খুব কাছাকাছি করে দাও—ফাঁকটা যেন এক ইঞ্চির ষোল ভাগের এক ভাগের মত হয়। এই ক্ষুদ্র ফাঁকের কাঁটাটাকে এবার বন্ধুর আঙ্গুলের ডগায় চেপে ঠিক পূর্বের মতই পরীক্ষা কর। এবার কিন্তু সে দুটি স্পর্শকেই পৃথকভাবে অনুভব করবে—একটি স্পর্শ বলে ভুল হবে না। আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শানুভূতির অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়। ইচ্ছা করলে তোমরা এই উপায়ে শরীরের বিভিন্ন অংশের স্পর্শানুভূতির পার্থক্য নির্ণয় করে একটা তালিকা প্রস্তুত করতে পার।

সাহারা মরুভূমি

পৃথিবীর বৃহত্তম মরু অঞ্চল হচ্ছে সাহারা মরুভূমি। উত্তর আফ্রিকার অ্যাটলাস পর্বতমালা থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে কঙ্গোদেশের সীমানা ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আরম্ভ করে পূর্বে লোহিত সাগরের পাড় পর্যন্ত—এই বিরাট ভূভাগ বিস্তৃত। সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জুড়ে আছে এই সুবিস্তীর্ণ মরুদেশ। এই ভূভাগের অধিকাংশ স্থানই প্রস্তরময় পর্বতে পূর্ণ, যদিও বালুকাময় প্রান্তরও কিছু কম নেই। এই বালুকারাশি মরুভূমির বাতাসে নিরন্তর বিক্ষিপ্ত হচ্ছে—আজ এখানে হয়তো দেখা গেল বালির পাহাড় অর্থাৎ বালিয়াড়ি, কাল সেখানে দেখা যাবে হয়তো গভীর খাদ।

তাপমাত্রা এর সব জায়গাতেই এক রকম নয়। তবে এক বিষয়ে মিল আছে, তা হচ্ছে সারা মরুভূমিরই তাপমাত্রা দিনের বেলায় অতিশয় উষ্ণ—কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, যদিও শীত বলতে মরুভূমিতে কোন ঋতু নেই, ওটা হয় ওখানকার দিন রাত্রির বিভেদে। দিনে যেমন ত্বক-পোড়ানো গরম, রাত্রিতে তেমনি হাড়-কাঁপানো শীত। দিনের ১২০° ডিগ্রী গরম রাত্রিতে নেমে আসে একেবারে জল-জমানো ৩০° ডিগ্রীতে বা কখনো কখনো তারও নীচে।

মাঝে মাঝে সেখানে এক ধরণের বাতাস বইতে থাকে। সে এক হু-হু করা বাতাস—ধূলাবালি উড়িয়ে যখন ধূলার ঝড় তোলে, তখন দিগন্তবিস্তৃত ধূলার মেঘ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

জল এই মরু অঞ্চলের এক সমস্যাবিশেষ। বৃষ্টি প্রায় হয়ই না, যেটুকু বা হয়, তাও প্রায়ই মাটি স্পর্শ করে না। মাটির কাছে নেমে আসতে আসতেই তা প্রচণ্ড গরমে আবার বাষ্পীভূত হয়ে উঠে যায় আকাশে। সামান্য বৃষ্টির জল যদিও বা মাটি স্পর্শ করবার অবকাশ পায়, তাও ঐ বালি-মাটিতে শীঘ্রই তলিয়ে যায় গভীরে, যাতে কোন গুল্ম বা উদ্ভিদ জন্মাবার কোন সাহায্যই হয় না। এই সামান্য বৃষ্টির পর কখনো কখনো একটুখানি সবুজ ঘাসের বিছানা কয়েক দিনের জন্যে জমে ওঠে, কিন্তু তা প্রখর রবির তেজে কয়েক দিনের মধ্যেই আবার শুকিয়ে মরে যায়।

এই বিরাট শুষ্ক ভূখণ্ডের মধ্যে কোথাও কোথাও রয়েছে মরূদ্যান, যেখানে হয়তো রয়েছে জলাধার কিম্বা মাটির নীচেই রয়েছে জলস্তর। সেখানে সাহারার মরুবাসীরা বাড়ি-ঘর তৈরি করে বাস করে। সেই সব জায়গায় জন্মায় প্রচুর খেজুর

গাছ। কখনো যদি এই মরূদ্যান কোন হ্রদের পাশে বা হ্রদকে ঘিরে হয়, তাহলে তারা সেখানে সেই জলের সাহায্যে কিছু চাষ-আবাদেরও চেষ্টা করে এবং তাতে তারা ভুট্টা, জনার প্রভৃতি ফলায়। সেই সব জায়গাতেই গড়ে ওঠে জনপদ।

এই মরু অঞ্চলে দুই জাতের মানুষ আছে—একটি মরূদ্যানবাসী ও অপরটি যাযাবর। মরূদ্যানবাসীরা সবাই নিগ্রো বংশোদ্ভূত কিন্তু ধর্মে মুসলমান। আর যাযাবরদের মনে হয়, তারা সুদূর অতীতে দক্ষিণ-ইউরোপের বাসিন্দা ছিল। মরূদ্যান-বাসীরা চাষ-আবাদ এবং পশুপালন করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, আর যাযাবরেরা এক মরূদ্যান থেকে আর এক মরূদ্যানের ভিতরে কেনা-বেচা করে।

মরূদ্যানবাসীরা উট, ছাগল ও ভেড়া পালন করে। কিন্তু যাযাবরেরা পালন করে শুধু উট। তাদের এক জনপদ থেকে আর এক জনপদে যাতায়াত করতে এই উটই হচ্ছে একমাত্র বাহন। তাই তারা উটকে বলে 'মরুভূমির জাহাজ'।

মরূদ্যানবাসীরা তাদের বাড়ীঘর তৈরি করে হ্রদের কাদার সঙ্গে বালি আর বিচুলির কুঁচি মিশিয়ে গড়া এক রকম কাঁচা ইট দিয়ে। সেখানে বৃষ্টি না থাকায় তার কোন ক্ষতিই হয় না। উপরন্তু মরুভূমির ঐ খটখটে আবহাওয়ায় কালক্রমে তা শুকিয়ে শক্ত হয়ে ওঠে কংক্রীটের মত। সে দেশে গাছপালা না থাকায় এই সব বাড়ীঘরে দরজা-জানালার কোন কারবার নেই। কোন কারণে বন্ধ করতে হলে তারা তা করে চমড়ার পর্দা দিয়ে।

প্রাণী-জগতের মধ্যে সারা সাহারা অঞ্চলে পাওয়া যায় প্রচুর উটপাখী। দক্ষিণ দিকে, যা আফ্রিকার বন্যঅংশের কাছ ঘেঁষে এসেছে, সেখানে পাওয়া যায় সিংহ, কুডুহরিণ, জেব্রা, জিরাফ এবং এক রকমের বুনো গাধা।

বর্তমানের সাহারায় বিদেশী অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকার লোকরা এসে এই মরুবাসীদের সঙ্গে ব্যবসায়িক কারণে অনেক উপনিবেশ স্থাপন করেছে। তারা সেখানে সুবিধামত রাস্তা-ঘাটও তৈরি করেছে। কাজেই সেখানে এখন মোটর গাড়ী, লরী, বাস, সাইকেল সবই দেখতে পাওয়া যায়। এরোপ্লেনও আসা-যাওয়া করে দু-এক জায়গায়। সভ্যজগতের বহু প্রয়োজনীয় জিনিষই আজ এদের ভিতরেও ঢুকেছে। রেডিও, সিনেমা বা বাইরের দুনিয়া এদের কাছে আজ আর অপরিচিত নয়।

বিনায়ক সেনগুপ্ত

থার্মোফ্লাস্ক

সেদিন ছিল রবিবার। খোকনের কি আনন্দ। সে অনেক বলে কাকামণিকে হাওড়া ময়দানে সার্কাসে নিয়ে যেতে রাজী করিয়েছে। সার্কাসে যাবার আনন্দ যাতে কোন মতেই মাটি হয়ে না যায়, তার জন্যে সে কাকামণির সন্তুষ্টিবিধানে সাধ্যমত চেষ্টা করছে। সার্কাস, যাত্রা, থিয়েটার—এই ধরণের জায়গায় ভাল গরম চা পাওয়া যে কত কষ্টের, তা কাকামণির অজানা নয়। তাই আগে তার মনে হলো চায়ের কথা। খোকনকে কাকামণি প্রশ্ন করলেন—আচ্ছা খোকন, বেশ ভাল চা নিয়ে যেতে পারবি তো? খুসী হয়ে খোকন উত্তর দিল—কেন পারবো না? বললেই মা চা করে দেবেন; আর আমাদের থার্মোফ্লাস্কে করে নিয়ে গেলে সার্কাস শেষ হওয়া অবধি চা বেশ গরম থাকবে।

কাকামণি—আচ্ছা, থার্মোফ্লাস্কের মধ্যে রাখলে গরম চা অনেকক্ষণ গরম থাকে কেন, বলতে পারিস?

খোকন—থার্মোফ্লাস্কের ভিতরে রেখে দিলে গরম জিনিষ অনেকক্ষণ গরম বা ঠাণ্ডা জিনিষ অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা থাকে, তবে কেন এমন হয় তা জানি না। আচ্ছা কাকামণি, থার্মোফ্লাস্কের ভিতরে তো কোন যন্ত্রপাতি নেই, তাহলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে দেবে?

কাকামণি—মন দিয়ে শোন। একটা জিনিষ গরম বা ঠাণ্ডা বলতে আমরা বুঝি যে, ঐ জিনিষের তাপমাত্রা আমাদের শরীরের তাপমাত্রার চেয়ে বেশী বা কম। দুটি আলাদা তাপমাত্রার জিনিষকে একসঙ্গে লাগিয়ে রাখলে উত্তাপ বেশী তাপমাত্রার জিনিষ থেকে কম তাপমাত্রার জিনিষে যেতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত জিনিষ দুটির তাপমাত্রা এক রকম না হয়।

খোকন—ঠিক বোঝলাম না।

কাকামণি—বারান্দার উপর আমাদের যে জলের ড্রামটা আছে, তার কলের সঙ্গে একটা নল লাগিয়ে নলটা নীচে উঠনে একটা বালতির মধ্যে ডুবিয়ে দিলে কি হবে বলতো?

খোকন—উপরের ড্রামের জল আস্তে আস্তে গিয়ে নীচের বালতিতে জমা হবে।

কাকামণি—ঠিক তেমনিভাবে জলের মতই তাপও বেশী উত্তপ্ত জিনিষ থেকে কম উত্তপ্ত জিনিষের মধ্যে চলে যায়।

খোকন—কি ভাবে ?

কাকামণি—তিন রকম উপায়ে তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। যথা :—(১) পরিবহন, (২) পরিচলন এবং (৩) বিকিরণ।

জানিস তো সকল জিনিষই ছোট ছোট অসংখ্য অণুর সমষ্টি। কোন কঠিন জিনিষকে এক দিকে উত্তপ্ত করলে কাছাকাছি অণুগুলি উত্তপ্ত হয়ে তাদের নিজেদের জায়গায় থেকেই পাশাপাশি সকল অণুগুলিতে তাপ চালনা করে দেয়। এভাবে কঠিন জিনিষে তাপ এক দিক থেকে অন্য দিকে চালিত হয়। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই। ধর, তোরা অনেকে মিলে মাঠে খেলা করছিস। তোদের দরকার হলো কয়েকখানা ইট মাঠের ওধারে নিতে হবে। তোরা সবাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পড়লি এবং প্রত্যেকেই নিজের জায়গায় থেকে একখানা করে ইট পাশের ছেলেকে দিয়ে দিলি। কাজেই দেখ, তোরা তো যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছিস, ইট কিন্তু একদিক থেকে আর একদিকে চলে গেল। উত্তাপের পরিবহন অনেকটা এরই মত। উত্তাপ পাশাপাশি অণুর সাহায্যে কোন্ কঠিন জিনিষের এক দিক থেকে অন্য দিকে যায়।

খোকন—পরিবহন প্রণালীতে উত্তাপ কি করে প্রবাহিত হয়, তা বোঝলাম। কিন্তু তাপের পরিচলন ও বিকিরণ বলতে কি বোঝায় ?

কাকামণি—কোন তরল বা বায়বীয় জিনিসকে কোন পাত্রে রেখে উত্তাপ দিলে উত্তপ্ত অংশ অপেক্ষাকৃত হাল্কা হয়ে পাত্রের নীচের দিক থেকে উপরের দিকে উঠে যায়। ফলে উত্তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সঞ্চালিত হয়। কিন্তু মনে রাখিস, এই উপায়ে উত্তাপ কেবল তরল বা বায়বীয় পদার্থের নীচের দিক থেকে উপরের দিকে সঞ্চালিত হতে পারে, অন্য দিকে নয়।

খোকন—আচ্ছা কাকামণি, উত্তাপের পরিচলন সম্পর্কিত কোন সহজ পরীক্ষা কি আমরা করতে পারি ?

কাকামণি—একটা বড় কাচের পাত্রে খানিকটা পরিষ্কার জল নিয়ে এক টুক্‌রা তুঁতে ফেলে দিয়ে পাত্রটাকে গরম করলে দেখতে পাবি, তুঁতের দানাটি গলে গিয়ে রঙীন জল উপরের দিকে উঠছে এবং উপরের দিকের পরিষ্কার জল নীচের দিকে নামছে। এভাবে পাত্রটির সমস্ত জল আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে।

খোকন—কাকামণি, এবার উত্তাপের বিকিরণ প্রণালীটা বুঝিয়ে দাও।

কাকামণি—এক টুক্‌রা গরম লোহাকে উপরে রেখে ওর নীচের দিকে হাত রাখলে গরম বোধ হয়, এটা বোধ হয় জানিস ?

খোকন—হাঁ।

কাকামণি—আগেই বলেছি, পরিচলন প্রণালীতে উত্তাপ উপরের দিক থেকে নীচের দিকে সঞ্চালিত হয় না। তাহলে কি করে তাপ উপরের গরম লোহা থেকে নীচের দিকে এল? উত্তর হচ্ছে, উত্তাপের বিকিরণ প্রণালীতে। এই উপায়ে কোন মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই উত্তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। সূর্য থেকে যে তাপ আমরা পাই, তা এই উপায়েই পৃথিবীতে পৌঁছায়। প্রশ্ন করতে পারিস যে, কোন মাধ্যম ছাড়া তাপ কি করে প্রবাহিত হয়? বৈজ্ঞানিকদের মতে, তাপ তরঙ্গাকারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সঞ্চালিত হয়।

খোকন—এবার বুঝতে পেরেছি, থার্মোফ্লাস্কে এই তিন রকম উপায়ে তাপ প্রবাহ বন্ধ করা হয়। আচ্ছা কাকামণি, ওর মধ্যে তো কোন যন্ত্রপাতি নেই, যার সাহায্যে তাপ সঞ্চালন বন্ধ হয়।

কাকামণি—যন্ত্রপাতির কি দরকার? উত্তাপ চলাচলের এই তিন রকম উপায় বন্ধ হলেই তো হলো। নীচের চিত্র দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারবি।
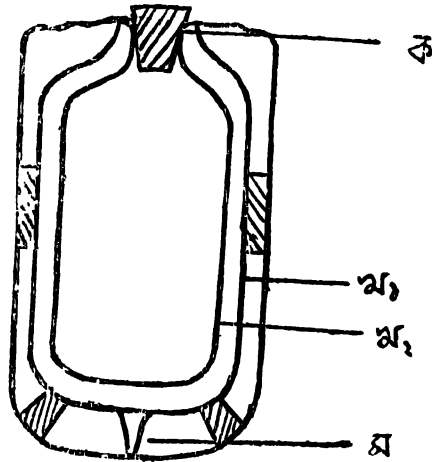
কাকামণি—এটা একটি দুই দেয়ালবিশিষ্ট কাচের পাত্র (খ১, খ২), বাইরের দেয়ালের (খ১) ভিতরের দিক ও ভিতরের দেয়ালের (খ২) বাইরের দিকে পারদের প্রলেপ দেওয়া থাকে। দুই দেয়ালের ভিতরের আবদ্ধ বাতাস বের করে মুখটি (ম) বন্ধ করে দেওয়া হয়। দুই দেয়ালবিশিষ্ট কাচের পাত্রের মুখটি একটি কর্কের ছিপি (ক) দিয়ে বন্ধ করা থাকে। কাচের পাত্রটি স্প্রিংয়ের

সাহায্যে ধাতুনির্মিত খোলের উপর বসানো হয়। পাত্র ও খোলের মধ্যে কোন অপরিবাহী জিনিষের টুক্‌রা বসানো থাকে। পাত্রটি কাচের তৈরী বলে পরিবহন প্রণালীতে খুব অল্প তাপ সঞ্চালিত হয়। পাত্রের দুই দেয়ালের মধ্যে বাতাস থাকে না বলে পরিচলন-প্রণালীও বন্ধ থাকে। পাত্রের দুই দেয়ালের পারদের প্রলেপ বিকিরণ-প্রণালীকে মোটামুটি বন্ধ রাখে। পারদের প্রলেপে প্রতিফলিত হয়ে পাত্রের ভিতরের তাপ ভিতরে এবং বাইরের তাপ বাইরে যায়। ধাতুনির্মিত খোল ও পাত্রের মধ্যে তাপ-প্রবাহ অপরিবাহীর টুক্‌রাগুলি বন্ধ রাখে।

তবে শোন, তাপ সঞ্চালন একেবারে বন্ধ করা কোন রকমেই সম্ভব নয়। কারণ, তিন রকম উপায়ে তাপ সঞ্চালন কিছু না কিছু থাকবেই। ফলে যদি কোন জিনিষ অনেক বেশী সময় থার্মোফ্লাস্কের ভিতর রাখা হয়, তবে আস্তে আস্তে ঐ জিনিষের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গে এক হয়ে যায়; অর্থাৎ গরম জিনিষ আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা ও ঠাণ্ডা জিনিষ আস্তে আস্তে গরম হয়ে যায়।

খোকন—আচ্ছা কাকামণি এই যন্ত্রটি কে আবিষ্কার করেছেন?

কাকামণি—এই যন্ত্রের আবিষ্কর্তা হলেন বৈজ্ঞানিক ডেওয়ার।

সুশীলকুমার কর্মকার

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। পৃথিবীর ভর বাড়িলে তাহার আকর্ষণ ক্ষমতা কি বাড়িবে?

শৈবাল চট্টোপাধ্যায়

প্রঃ ২। মহাজাগতিক রশ্মি কি ও উহার উৎস কোথায়?

দীপককুমার মুখোপাধ্যায়

উঃ ১। আমরা জানি নিউটনের সূত্র অনুসারে দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ শক্তিজনিত বল

$$F = G\frac{MM'}{R^2}$$

এখানে M ও M´ হচ্ছে ছুটি বস্তুর ভর এবং R তাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব। G একটি ধ্রুবক। এখন এই ছুটি বস্তুর একটি যদি পৃথিবী হয়, ধরা যাক—তার ভর M। তাহলে স্পষ্টতঃই উপরের সূত্র অনুযায়ী M বাড়লে বল F-ও বাড়বে। এইভাবে পৃথিবীর ভর বাড়লে তার আকর্ষণ ক্ষমতাও বাড়বে।

উঃ ২। আমাদের সম্পূর্ণ অগোচরে এক জাতীয় রশ্মি অনাদিকাল থেকে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, যুগ যুগ ধরে সর্বদা পৃথিবীতে এসে পড়ছে। এদেরই নাম মহাজাগতিক রশ্মি। এই রশ্মিকে চোখে দেখা যায় না। ইলেকট্রোস্কোপ, ক্লাউড চেম্বার ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে এদের উপস্থিতি ধরা পড়ে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে—অত্যধিক শক্তিসম্পন্ন এই সব রশ্মি পজিটিভ বিদ্যুৎ-কণার দ্বারা গঠিত। কোন কিছুর বাধাই এরা মানে না, প্রায় সব কিছুই ভেদ করে চলে। এদের অন্যান্য গুণাবলী হলো—ভূপৃষ্ঠের যত উপরে ওঠা যায়, তীব্রতা তত বাড়ে। পৃথিবীর অক্ষরেখার উপর এদের তীব্রতা নির্ভর করে। নিরক্ষ বৃত্তের উপর তীব্রতা সবচেয়ে কম, দুই দিকে বেশী।

মহাজাগতিক রশ্মির উৎস সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। গবেষণা এখনও চলছে। অনেকেই মনে করেন, এই মহাবিশ্বের অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের কোন এক অঞ্চলই হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মির উৎসস্থল। আবার ক্রম-বর্ধমান বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল এক অতিকায় বিস্ফোরণের ফলে বলে যে ধারণা আছে, তার উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ বলেন—সেই বিস্ফোরণের ফলেই মহাজাগতিক রশ্মির সৃষ্টি হয়েছিল। কারো মতে, এদের উৎস আমাদের ছায়াপথের মধ্যেই। আবার কারো মতে, মহাজাগতিক রশ্মি আসছে আমাদেরই সৌরজগতের কোন অঞ্চল থেকে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মহাজগতের কোন এক অজ্ঞাত স্থান থেকে এরা আসছে। উৎস সম্বন্ধে এর বেশী আমরা এখনও আর কিছুই জানি না।

দীপক বসু

বিবিধ

১৯৬৬ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

স্টকহোম, সুইডেন, ১৩ই অক্টোবর—ক্যান্সার রোগ গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে ভেষজ-বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কারটি যুক্তভাবে দু-জন মার্কিন বিজ্ঞানীকে দেওয়া হয়েছে। এঁদের একজন হলেন নিউইয়র্কের রকফেলার ইনস্টিটিউটের ডাঃ পেটন রাউস (৮৭) এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ চার্লস বি. হাগিন্স (৬৫)।

রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স প্যারিসের অধ্যাপক আলফ্রেড ক্যাসলারকে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়েছেন বলে রয়টার জানিয়েছেন।

রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট এস. মুল্লিকেনকে রসায়ন-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দিয়েছেন।

বিরাটকায় জেট বিমান

বর্তমান শতকের শেষের দিকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ৪৯০ জন যাত্রীবাহী অথবা ১০০ টন মালবাহী অতিকায় জেট বিমান নির্মিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আমেরিকার প্যান আমেরিকান ওয়ার্লড্ এয়ার ওয়েজ এই ধরণের ২৫টি বিমান তৈরির জন্যে বোইং এয়ার ক্র্যাফ্‌ট কোম্পানীর নিকট অর্ডার দিয়েছেন। এই সকল বিমানে যাতায়াত খরচ বর্তমানের তুলনায় প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম পড়বে। বর্তমানে বোইং-৭০৭ এবং ডি. সি. ৮ নামে মার্কিন জেট বিমান সমগ্র বিশ্বেই চলাচল করে। নির্মীয়মান বিমানটি এদের তুলনায় দ্বিগুণ যাত্রী এবং ৬৮০০০০ পাউণ্ড ওজনের মাল নিয়ে চলাচল করতে পারবে। এই বোইং-৭৪৭ নামে জেট বিমানের ঘণ্টায় গতি হবে ৬২৫ মাইল এবং ভূতল থেকে ৪৫১০০ ফুট উপর দিয়ে এটি যাতায়াত করবে। বোইং-৭০৭-এর তুলনায় এর গতি ও হবে দ্রুততর।

লুব্রিক্যাণ্ট হিসাবে কাচ-চূর্ণ

লুব্রিক্যাণ্ট বা মসৃণকারী উপাদান হিসাবে কাচ চূর্ণের ব্যবহার সাধারণ বিচারে সুপারিশ করা যায় না। কিন্তু আমেরিকায় সম্প্রতি নতুন ধরণের এক মসৃণকারী উপাদান বেরিয়েছে, যার প্রধান উপাদান কাচ-চূর্ণ। এই জিনিষটি বিমানের বল বেয়ারিং-এ ব্যবহার করা হচ্ছে। যে সকল বেয়ারিং প্রচণ্ড তাপের মধ্যে থাকে, তাদের জন্যেই এই নতুন ধরণের লুব্রিক্যাণ্ট। এর নামকরণ করা হয়েছে ভিট্রোলিউব। ইঞ্জিনীয়ারগণ আমেরিকার এক্স্ বি-৭০ বিমানের জন্যে এই ধরণের একটি লুব্রিক্যাণ্টের সন্ধানে ছিলেন। এই সকল বিমানের বেয়ারিং-এর তাপমাত্রা ৬০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের উপরে উঠে থাকে।

ইঞ্জিনীয়ারগণ যখন ঐ তাপমাত্রায় এর উপযোগী কোন লুব্রিক্যাণ্টের সন্ধান পেলেন না, তখন তাঁরা কাচের চূর্ণ নিয়ে পরীক্ষা করেন। অপেক্ষাকৃত অল্প তাপমাত্রায় এই সকল কাচ-চূর্ণ গলে যায়। প্রচলিত অন্যান্য যে সকল মসৃণকারী উপাদান রয়েছে, তাদের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করে তাঁরা বেশ ভাল ফল পেলেন। একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় এদের কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যবস্থা হলো। দেখা গেল, তরলীকৃত কাচের চূর্ণ অন্যান্য উপাদানকে ধরে রাখে এবং মসৃণকারক হিসাবে অন্যান্য উপাদানের পরিপূরক হয়ে থাকে। ক্যালিফোর্ণিয়ার লস এঞ্জেলসে অবস্থিত আমেরিকান অ্যাভিয়েশন কর্পোরেশন কর্তৃক এই জিনিষটি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার সাউথ গেটের ন্যাশন্যাল প্রোগ্রেস ইণ্ডাষ্ট্রীজ এই জিনিষটি বাজারে ছেড়েছেন।

দ্রষ্টব্য—গত সেপ্টেম্বর '৬৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সম্নাবীন বা গাড়ী কলাই' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র জানাইয়াছেন যে, একমাত্র তিনিই উক্ত প্রবন্ধের লেখক। অপর নামটি ভুল।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন, ১৯৬৬

বিজ্ঞান কলেজ
শারীরবৃত্ত বিভাগের বক্তৃতাকক্ষ

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬
সোমবার, অপরাহ্ণ ৫-৩০

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট ৪০ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার কার্যাদি পরিচালনা করেন। অধিবেশনের নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে সভাপতি মহাশয় সভার কার্য আরম্ভ করিয়া কর্মসচিব মহাশয়কে পরিষদের বিগত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিবার জন্য আহ্বান জানান।

১। কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী ঃ

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় তাঁহার লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিতে উঠিয়া প্রথমেই পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ী নিম্নলিখিত তিন জন সুধী ব্যক্তির পরলোকগমনে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত সদস্যবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন :

১। স্বর্গত: অধ্যাপক রমণীমোহন রায়
২। ,, অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বসু
৩। ,, হারীতকৃষ্ণ দেব

পরিষদের পক্ষ হইতে কর্মসচিব মহাশয় উক্ত সুধীবৃন্দের স্বর্গত: আত্মার চিরশান্তি কামনা করিয়া তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট গভীর শোক ও সমবেদনা জ্ঞাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

অতঃপর কর্মসচিব মহাশয় তাঁহার লিখিত বিবরণী প্রসঙ্গে সভায় উপস্থিত সভ্যগণকে স্বাগত জানাইয়া পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁহাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন এবং বিগত বৎসরে পরিষদের কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পরিষদের আদর্শানুযায়ী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ, আলোচ্য বৎসরে নূতন ৩খানা জনপ্রিয় পুস্তক প্রকাশন, গত ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় বক্তৃতা দান প্রভৃতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে মোটামুটি সব বিবরণ দেন। পরিষদের গৃহনির্মাণ বিষয়ে বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনার পরে পরিষদের নিয়মিত আয়-ব্যয়ের উল্লেখ করিয়া বর্বাস্তিক ঘাটতির প্রতি সদস্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রসার ও স্থায়িত্ব বিধানের জন্য আয় বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে কর্মসচিব মহাশয় সভ্যগণের সক্রিয় সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা কামনা করিয়া তাঁহার এই বিবরণী পাঠ শেষ করেন।

অতঃপর পরিষদের এই অষ্টাদশ বার্ষিক বিবরণী উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২। হিসাব-বিবরণী ও ব্যয়বরাদ্দ :

পরিষদের গত ১৯৬৫ সালের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে নির্বাচিত হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর) চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী, গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৬৫-৬৬ সালে পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুশীল-রঞ্জন মৈত্র মহাশয় উপস্থিত সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপিত করেন। এই সকল পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র মন্তব্যাদি সহ মুদ্রিত করিয়া যথানিয়মে সভ্যগণের বিবেচনার জন্য ইতিপূর্বেই প্রেরিত হইয়াছিল। কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে উপস্থিত সভ্যগণ উল্লিখিত হিসাব-বিবরণীগুলি যথোচিত সন্তোষজনক বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন। অবশ্য পরিষদ্ ও পত্রিকার সাধারণ তহবিলে ঘাটতিজনিত সংকট-জনক আর্থিক অবস্থার প্রতিকারের জন্য কয়েক জন সদস্য আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রস্তাব করেন। এই সকল প্রস্তাব সম্পর্কে পরে যথাসময়ে বিবেচনা করা হইবে বলিয়া সভাপতি মহাশয় আলোচ্য হিসাব-বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র সভায় যথোচিতভাবে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন।

অতঃপর পরিষদের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত হইয়া ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বরাদ্দ বা বাজেটপত্রগুলি, যাহা সভ্যগণের বিবেচনার জন্য ইতিপূর্বেই প্রেরিত হইয়াছিল, কোষাধ্যক্ষ মহাশয় আনুষ্ঠানিকভাবে সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপিত করেন। যথোচিত আলোচনা ও বিবেচনার পরে উক্ত বরাদ্দপত্রগুলি সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

৩। কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন :

পরিষদের গঠনতান্ত্রিক বিধিবিধান অনুসারে ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য পরিষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে মনোনয়ন করিয়া সাধারণ সভ্যগণ কর্তৃক প্রেরিত মনোনয়ন-পত্রগুলির প্রস্তাবিত নামগুলি এবং বিদায়ী কার্যকরী সমিতির এতদ্বিষয়ক সুপারিশসমূহের সমন্বয়ে ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য পরিষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যগণের প্রস্তাবিত নামের যে তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, কর্মসচিব মহাশয় তাহা অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপিত করেন। পরিষদের পরবর্তী কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যগণের উল্লিখিত তালিকা মুদ্রিতাকারে সভ্যগণের বিবেচনার জন্য যথানিয়মে পূর্বেই প্রেরিত হইয়াছিল। যাহা হউক, সভায় উপস্থিত সভ্যগণ উক্ত তালিকায় প্রস্তাবিত নামগুলি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন এবং পরিষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির বিভিন্ন পদে নিম্নলিখিত সদস্যগণ যথোচিতভাবে নির্বাচিত হন :

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী :

সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
সহঃ সভাপতি—শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
শ্রীঅসীমা চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুশীলকুমার মুখার্জী
কর্মসচিব—শ্রীজয়ন্ত বসু
সহযোগী কর্মসচিব—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশুভেন্দুকুমার দত্ত

সাধারণ সদস্য :

শ্রীঅমূল্যধন দেব
শ্রীশ্যামসুন্দর দে
শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ
শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীপঙ্কজনারায়ণ রায়
শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষাল
শ্রীদীপক বসু
শ্রীদিলীপকুমার বসু
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীহৃষিকেশ ঘোষ
শ্রীসন্তোষকুমার সেন
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

৪। সারস্বত সংঘ গঠন :

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে সারস্বত কর্তব্যাদি সম্পাদনের জন্য সারস্বত সংঘ গঠনের যে বিধিবিধান আছে, তাহা অনুসরণ করা এই বার্ষিক অধিবেশনে সম্ভব নহে, কর্মসচিব মহাশয় এইরূপ অভিমত জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব করেন যে, পূর্বতন সারস্বত সংঘই আপাততঃ বহাল রাখিয়া পূর্বতন সংঘসচিব শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়কে সংঘের কার্যাদি পরিচালনার জন্য পুনর্নিবাচিত করা হউক। সভায় এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় পরিষদের সংঘসচিব পদে পুনর্নিবাচিত হন। এইরূপ স্থির হয় যে, এই নির্বাচিত সংঘসচিব আলোচ্য বৎসরের জন্য সারস্বত সংঘের কার্যাদি পরিচালনার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করিবেন।

৫। নিয়মাবলী সংশোধন :

পরিষদের কার্যকরী সমিতির গত ২৫.৮.৬৬ তারিখের অধিবেশনে সভাপতি মহাশয়ের সুপারিশক্রমে নিম্নলিখিত যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল, কর্মসচিব মহাশয় নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে রেজেষ্ট্রীকৃত নিয়মতন্ত্রের সংশোধন সংক্রান্ত সেই প্রস্তাবটি এই সাধারণ অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন :

"পরিষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলীতে ছয় জনের স্থলে দশজন সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব পরিষদের রেজিষ্টার্ড নিয়মাবলীর এতদসংক্রান্ত ১১(ক) নং ধারার সংশ্লিষ্ট অংশটি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হউক।"

পরিষদের নিয়মতন্ত্রের উল্লিখিত সংশোধন প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতঃপর এইরূপ স্থির হয় যে, নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে এই সংশোধন প্রস্তাবটি পরবর্তী কোন সাধারণ অধিবেশনে পুনরায় উপস্থাপিত করিয়া পুনরনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে এবং পরে উক্ত সংশোধন প্রস্তাবটি কার্যকরী করিবার যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হইবে।

৬। হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন :

পরিষদের হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য ১৯৬৬-৬৭ সালের হিসাব-পরীক্ষক বা অডিটার নির্বাচন বিষয়ে যথোচিত আলোচনার পরে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে গত বছরের হিসাব-পরীক্ষক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী, গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং-এর পক্ষে ইহার অন্যতম অংশীদার শ্রীপ্রভাসকুমার সরকার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মহাশয় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য পরিষদের হিসাব-পরীক্ষকরূপে পুনর্নিবাচিত হন।

৭। পরিষদের নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও

গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ অনুমোদক হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন :

১। শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
২। শ্রীবিভূতিভূষণ পড়িয়া
৩। শ্রীদীপক বসু
৪। শ্রীহারাণচন্দ্র চক্রবর্তী
৫। শ্রীঅনিলকুমার ঘোষাল

নিয়মানুসারে অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদের কর্মসচিবসহ উপরিউক্ত পাঁচজন নির্বাচিত অনুমোদকের দ্বারা এই অধিশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইলে তাহা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। সভাপতির ভাষণ ঃ

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু পরিষদের সাংস্কৃতিক কর্মপ্রচেষ্টার অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করে উনবিংশ বর্ষ চলছে এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে পরিষদ বিভিন্ন পরিকল্পনায় তার আদর্শানুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে—একথা সবিস্তারে জানিয়ে তিনি পরিষদের সভ্য ও শুভানুধ্যায়ীগণের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির যুগে মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের জনগণকে বিজ্ঞানানুরাগী করে তোলবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি সভ্যগণের অধিকতর সহযোগিতা কামনা করেন এবং এই আশা প্রকাশ করেন যে, পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলে পরিষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার অধিকতর প্রসার ঘটবে। এরূপ বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করে সভাপতি মহাশয় সকলের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

সত্যেন বোস
সভাপতি,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পরিমলকান্তি ঘোষ
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অনুমোদক মণ্ডলীর স্বাক্ষর :

১। দীপক বসু
২। হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী
৩। অনিলকুমার ঘোষাল
৪। শ্রীবিভূতিভূষণ পড়িয়া
৫। মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন

বিজ্ঞান কলেজ,
শারীরবৃত্ত বিভাগের বক্তৃতা-কক্ষ

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬
সোমবার, অপরাহ্ণ ৫-৩০টা

কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত সভ্যবৃন্দ, আজ আমরা আমাদের পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মিলিত হয়েছি। পরিষদের এই সাধারণ সভায় আমরা পরবর্তী নিয়মতান্ত্রিক বছরে পরিষদের কার্য পরিচালনা ও সাংস্কৃতিক কর্তব্যাদি সম্পর্কে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত ও নির্দেশ গ্রহণ করবো। এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করে আপনারা পরিষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রকাশ করেছেন, তার জন্যে পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ-মণ্ডলীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ও স্বাগত জানাচ্ছি।

পরিষদের সাংবিধানিক বিধিবিধান অনুসারে এই অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মুখ্যতঃ চলতি উনবিংশ বছরের জন্যে বিবিধ সাংগঠনিক ও কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত প্রস্তাবাদি আলোচিত ও গৃহীত হবে। এই উপলক্ষে পরিষদের কর্ম-সচিব হিসাবে আমাকে বিগত বছরে পরিষদের বিবিধ সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে একটি বার্ষিক বিবরণী আপনাদের নিকট পেশ করতে হবে, এই রীতি। অবশ্য পরিষদের আদর্শ ও কর্মধারার সঙ্গে আপনারা সকলেই পরিচিত—আপনাদের সর্বাঙ্গীন সাহায্য ও সহযোগিতায়ই পরিষদের কাজকর্ম চলছে; সুতরাং পরিষদ সম্পর্কে আলোচ্য বছরের একটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া ছাড়া আপনাদের কাছে আমার অধিক কিছু বলবার প্রয়োজন দেখি না। তদুপরি গত ফেব্রুয়ারী মাসে পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিগত বছরের কাজকর্মের একটি বিস্তৃত বিবরণী আমরা প্রকাশ করেছি।

এই বার্ষিক অধিবেশন বস্তুতঃ পরিষদের সাধারণ সভ্যগণের একটি নিয়মতান্ত্রিক অধিবেশন। এর নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে সভাপতি মহাশয় অতঃপর এর নিয়মিত কার্যাদি পরিচালনা করবেন। তৎপূর্বে আলোচ্য বছরে পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে পরিষদের বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকাখানা প্রকাশ করাই পরিষদের প্রথম ও প্রধান কাজ, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। পত্রিকাখানা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে এর উনবিংশ বর্ষ, নবম সংখ্যা চলছে। বাংলা ভাষায় কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক এরূপ একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা পরিষদের পক্ষে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। দেশের শিক্ষিত ও বিজ্ঞানানুরাগী জনগণের মধ্যে, বিশেষতঃ ছাত্রসমাজে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা আজ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ধীরে ধীরে হলেও এর প্রচার ও প্রকাশ-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে আমরা ২০৫০ কপি প্রকাশ করছি। এতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিবিধ প্রবন্ধ, আলোচনা, বিজ্ঞান-সংবাদ, কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর প্রভৃতি নিয়মিত বিভাগগুলি

ছাড়াও বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্নোত্তর বিভাগও সংযোজিত হয়েছে।

পত্রিকা সম্পর্কে আমরা সানন্দে জানাচ্ছি যে, এই প্রথম 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা হিসাবে আগামী অক্টোবর ৬৬' সংখ্যাটি একটি বিশেষ সংখ্যারূপে বর্ধিতাকারে ও নবকলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা এতে লিখছেন, তাছাড়া বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর, ধাঁধা, 'জেনে রাখ', 'করে দেখ' প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় থাকবে এবং বহু চিত্রে সুশোভিত হবে। এর মূল্য ধার্য হয়েছে প্রতি কপি ২.৫০ টাকা মাত্র। এই বিশেষ মাসিক সংখ্যাটির মূল্য বৃদ্ধি হলেও পরিষদের সভ্য ও পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহকগণ, যাঁরা বার্ষিক বা যান্মাসিক চাঁদা পূর্বেই অগ্রিম জমা দিয়েছেন, তাঁদের পত্রিকার সাধারণ মূল্যেই এই বিশেষ সংখ্যাটি সরবরাহ করা হবে। এই বিষয়ে সানন্দে জানাচ্ছি যে, এই বিশেষ সংখ্যাটির বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষামূল্য লক্ষ্য করে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা ও মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যাটির মোটামুটি ২০০০ কপি ক্রয় করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের আশ্বাস দিয়েছেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করে যথাসম্ভব স্বল্পমূল্যে বিজ্ঞানানুরাগী জনগণকে পরিবেশন করা পরিষদের সাংস্কৃতিক কর্তব্যের অঙ্গ হিসাবে আমরা গ্রহণ করেছি। এই কাজে আমরা পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে প্রতি পুস্তকের প্রকাশন ব্যয়ের আংশিক অর্থসাহায্য পেয়ে থাকি। এযাবৎ পরিষদ কর্তৃক প্রায় ৩০খানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে ৫।৬ খানা পুস্তক নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরে আর পুনর্মুদ্রিত হয় নি। যাহোক আলোচ্য বছরে আমরা ৩খানা নতুন পুস্তক প্রকাশ করেছি—১। শ্রীজিতেন্দ্র কুমার রায় প্রণীত 'খাদ্য থেকে যে শক্তি পাই' ২। শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার প্রণীত 'রোগ ও তাহার প্রতিকার' এবং ৩। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস রচিত 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র' জীবনী। ছোট বড় প্রতিখানা পুস্তকের মূল্যই পরিষদের আদর্শানু-মাত্র এক টাকা ধার্য হয়েছে। স্বল্প মূল্য হলেও পরিষদের পুস্তকগুলির বিক্রয় তেমন আশানুরূপ নয়; কারণ বিক্রয়ের ব্যবসায়িক ব্যবস্থা ও রীতিপদ্ধতি অবলম্বন করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয়। যাহোক, পরিষদের সভ্যগণকে আমরা পুস্তকগুলির স্বল্প মূল্যের উপরেও ২৫% সভ্য কমিশন বাদ দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছি। আমরা আশা করছি, আপনারা সকলে পরিষদের প্রকাশিত বইগুলি ক্রয় করে ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানের পুস্তক পাঠে উৎসাহিত করে তুলবেন এবং নিজস্ব গ্রন্থাগারের জন্যে সংগ্রহ করবেন।

পরিষদ পরিচালিত বিজ্ঞান-পাঠাগারের কাজ তেমন আশানুরূপভাবে চালানো এখনও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি, কিছু কিছু পাঠক কখন-সখন আসেন মাত্র। বিজ্ঞানের সব রকম পুস্তকের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার ও উপযুক্ত পরিবেশে একটি আধুনিক ধরণের পাঠাগার স্থাপন করতে না পারলে পাঠকসমাজকে আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে না। পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত না হলে এসবের ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। পরিষদের গৃহ নির্মিত হলে কেবল বিজ্ঞান বিষয়ক সাধারণ পুস্তকই নয়, পরিকল্পিত গ্রন্থাগারের একটি পাঠ্য পুস্তক বিভাগও খোলা হবে, যাতে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণ বিজ্ঞানের মূল্যবান পাঠ্য পুস্তকগুলি পাঠের সুযোগ পায়। আপনারা জানেন, এই উদ্দেশ্যে আলোচ্য বছরে আমরা একজন মহানুভব দাতার নিকট থেকে সরকারী ঋণপত্রে মোট এগারো হাজার টাকা দান স্বরূপ পেয়েছি।

দেশের ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের প্রসার সাধনের পক্ষে

বিজ্ঞান প্রদর্শনীর সার্থকতা অপরিসীম, একথা আজ শিক্ষাবিদমাত্রেই স্বীকার করেন। জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে এরূপ একটি স্থায়ী বিজ্ঞান প্রদর্শনী স্থাপন করবার পরিকল্পনা পরিষদের রয়েছে। গৃহ নির্মিত হলে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো বলে আশা করছি। আপনারা সকলেই জানেন, অস্থায়ীভাবে সুযোগ-সুবিধা অনুসারে আমরা সাময়িক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন মাঝে মাঝে করে আসছি। ১৯৬৪ সালে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থানুকূল্যে পরিষদ কর্তৃক একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই বিবরণীর আলোচ্য বছরে ও গত ফেব্রুয়ারী মাসে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া অবলা বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলাম। এই প্রদর্শনীর ব্যয় নির্বাহের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৫,০০০ টাকা সাহায্য দান করেছিলেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রছাত্রীরা এই প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। প্রায় দশ হাজার দর্শক এই প্রদর্শনীতে এসে আধুনিক বিজ্ঞানের বহু জ্ঞাতব্য তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন এবং পরিষদের এই কর্মপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝেই এরূপ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করবার ইচ্ছা আমাদের রয়েছে।

বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা নানা অসুবিধার জন্যে আলোচ্য বছরে তেমন নিয়মিতভাবে করা সম্ভব হয় নি। তৎপূর্ব বছরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সুপরিকল্পিতভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। গত বছর পরিষদের জনসংযোগ সমিতির উদ্যোগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীজয়ন্ত বসু ও শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহিনী' ও 'মানুষের ক্রমবিকাশ' শীর্ষক দুটি বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন। এছাড়া পরিষদের সারস্বত সংঘের সংঘসচিব শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় পরিষদের পক্ষ থেকে বিড়লা মিউজিয়ামে 'বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান' শীর্ষক ও বেলতলা মণিমেলা সংঘে 'বিশ্বরহস্য' শীর্ষক বক্তৃতা দিয়েছেন। এছাড়া সংঘসচিবের আমন্ত্রণে শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয় বিদ্যাসাগর স্ট্রীটস্থ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসে 'মানুষের মহাকাশ যাত্রা' শীর্ষক একটি অতি শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা দিয়েছেন।

পরিষদ কর্তৃক প্রতি বছর 'রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা' নিয়মিতভাবে আয়োজিত হয়ে আসছে। আলোচ্য বছরে এই বক্তৃতা দিয়েছেন অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। বিষয়বস্তু ছিল 'মেঘ ও বিদ্যুৎ'। আমরা সানন্দে জানাচ্ছি যে, এর পরবর্তী বক্তৃতা বর্তমান বর্ষে দেবেন পরিষদের অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় এরূপ স্থির হয়েছে। এই বক্তৃতাটি 'কৃষি ও খাদ্যোৎপাদন' বিষয়ক হবে বলে আমরা আশা করছি।

পরিষদের গৃহ নির্মাণের প্রাথমিক বিধিব্যবস্থা এখনও চলছে। পরিকল্পিত গৃহের নক্সাদি কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক এখনও অনুমোদিত হয় নি। কার্যকরী সমিতি এই বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীহৃষিকেশ ঘোষ মহাশয়কে সভাপতি মহাশয়ের সুপারিশক্রমে গৃহ নির্মাণের সর্বপ্রকার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, আপনারা জানেন। শ্রীঘোষ তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করে গৃহ নির্মাণের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করতে পারবেন বলেই আমরা আশা করছি। পরিষদের বর্তমান অবস্থায় গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন সর্বাধিক জরুরী; কারণ এই প্রতিষ্ঠানের

উন্নতি ও কর্মপ্রসার সর্বই স্থানাভাবের জন্যে ব্যাহত হচ্ছে।

যাহোক, পরিষদের কাজকর্ম ও সমস্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই, কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা হলো মাত্র। এখন পরিষদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে আমি আমার এই বিবরণী শেষ করবো। আলোচ্য ১৯৬৫-৬৬ সালে পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণীর মুদ্রিত কপি যথানিয়মে আপনাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে। এসব বিবরণী থেকে আপনারা পরিষদের বর্তমান আর্থিক অবস্থার বিস্তৃত তথ্যাদি অবগত হয়েছেন এবং আশা করি, লক্ষ্য করেছেন যে, পরিষদ তার নিয়মিত কার্যাদি পরিচালনায় বিশেষ আর্থিক অসুবিধার মধ্য দিয়েই চলছে। বিশেষতঃ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশনে আয় অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ঘাটতি হচ্ছে। প্রকাশনের কাজে সর্বস্তরে মূল্যবৃদ্ধির দরুণ পরিষদের এই আর্থিক অসুবিধা দূর করতে হলে এখন আপনাদের সকলের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের আয় অনিশ্চিত, অথচ ব্যয় নির্দিষ্ট ও ক্রমবর্ধমান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পত্রিকা প্রকাশনের কাজে দশ বছর পূর্বে যেরূপ ৩,৬০০ টাকা অর্থসাহায্য করতেন, বর্তমান আর্থিক সঙ্কট ও মূল্যমানর দিনেও তাই করছেন। এই সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি করবার জন্যে আমাদের বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে সাহায্য আমরা পেয়ে থাকি, তা অতি সামান্য এবং তাও নির্ভর-যোগ্যভাবে প্রতি বছর নিশ্চিত নয়। কলিকাতা কর্পোরেশন থেকে বার্ষিক যে অর্থসাহায্য আমাদের পাওয়ার কথা তাও নিয়মিত নয়, ২-৩ বছরের টাকা বকেয়া পড়ে থাকে। এরূপ অনিয়মিত ও অনিশ্চিত আয়ের উপর চলতে গেলে কোন কোন বছর তীব্র অর্থসঙ্কটের মধ্যে পড়তে হয় এবং ঘাটতি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার বিজ্ঞাপনও সরকারী নানা বিধিবিধানের ফলে ক্রমেই কমে আসছে। একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের কাজে বিজ্ঞাপনের আয়ের উপরেই সমধিক নির্ভর করতে হয়। এই বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আপনাদের অনেকেরই বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিভিন্ন সূত্রে সংযোগ রয়েছে। আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করে কয়েকটি স্থায়ী বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিলে পরিষদের আর্থিক অসুবিধা অনেকটা দূর হবে। পরিষদের সভ্য ও গ্রাহক-সংখ্যা বর্তমানে কিছু বেড়েছে, পত্রিকা বিক্রয়ের পরিমাণও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য, কিন্তু বর্তমান উচ্চ মূল্যমানের দিনে আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্যে আমি আপনাদের সক্রিয় সাহায্য কামনা করছি। আশা করছি, আপনারা সকলে নিজ নিজ পরিচিতের মধ্যে পরিষদের আদর্শ প্রচারে উদ্যোগী হয়ে কিছু নতুন সভ্য সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করবেন।

যাহোক, পরিষদের কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আমি আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা মাত্র নিবেদন করলাম। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে পরিষদের আদর্শানুযায়ী কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে আমাদের সকলের সমবেতভাবে চেষ্টা করতে হবে, গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এরূপ সাংস্কৃতিক আদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের অর্থাভাব ও কাজকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ বা অহেতুক সমালোচনা না করে পরিষদের অগ্রগতির জন্যে গঠনমূলক ও কার্যকরী উপায় উদ্ভাবনের জন্যে আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি। এই ঐকান্তিক কামনা নিয়ে আমি আমার বিবরণী এখানেই শেষ করছি।

স্বাঃ পরিমলকান্তি ঘোষ
কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসচৌধুরী
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
৩৫, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলিকাতা-১৯

২। গোপীনাথ সরকার
গণিত বিভাগ
চন্দননগর কলেজ,
চন্দননগর, হুগলী

৩। শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল
F/7, M. I. G. Housing Estate
37, Belgachhia Road,
Calcutta-37

৪। রমেন দেবনাথ
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
রাণীগঞ্জ কলেজ, বর্ধমান

৫। জিতেন্দ্রকুমার রায় ও অলোকা রায়
১১/৭, কালীচরণ ঘোষ রোড,
সিঁথি, কলিকাতা-৫০

৬। শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ,
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড,
কলিকাতা-২৯

৭। শ্রীনিশীথকুমার দত্ত
বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়,
বর্ধমান

৮। বিনায়ক সেনগুপ্ত
106, Polibon Bazar 3rd Lane
P. O. Triplicane,
Madras-5

৯। সুশীলকুমার কর্মকার
ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকমিউনিকেশন
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা-৩২

১০। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড
ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

উনবিংশ বর্ষ ডিসেম্বর, ১৯৬৬ দ্বাদশ সংখ্যা

ক্যান্সার

সন্দীপকুমার বসু

বিভিন্ন প্রতিজীবক (Antibiotic) পদার্থের আবিষ্কারের ফলে বর্তমানে জীবাণুঘটিত সংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। কিন্তু অন্যান্য ধরণের, বিশেষতঃ বিপাকক্রিয়ার বৈকল্য-জনিত নানা রোগের (যেমন ক্যান্সার, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি) প্রকোপ তো কমেই নি বরং এই জাতীয় রোগে মৃত্যুহার ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। জীবাণুজ রোগের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা যে সব দেশে আছে, সেখানে সাম্প্রতিক কালে ক্যান্সার ও হৃদ্‌রোগে মৃত্যুসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। বস্তুতঃ মধ্যযুগীয় প্লেগ ও বসন্ত রোগের করাল আসনে আজ ক্যান্সারের অধিষ্ঠান। সমগ্র মানবসমাজের দুঃস্বপ্ন এই রোগ আমাদের জীবনে এক অপ্রতিরোধ্য আতঙ্কের ছায়াপাত করেছে।

ক্যান্সার বলতে অবশ্য কোন নির্দিষ্ট একটিমাত্র রোগ বোঝায় না। দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাওয়া এক ধরণের রোগের গোষ্ঠীগত নাম হলো ক্যান্সার। অবশ্য আক্রান্ত দেহকলার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি সব রকম ক্যান্সারেরই মূল লক্ষণ। ক্যান্সার নামটি একটি ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কর্কট। প্রাচীন চিকিৎসক হিপোক্রেটিস ও গ্যালেন বিশ্বাস করতেন যে, এই রোগের কুফলগুলি আক্রান্ত ব্যক্তির শিরাসমূহের মাধ্যমে কর্কটের বক্র দাঁড়ার মত বিস্তৃত হয়। এই বিশ্বাস থেকেই ক্যান্সার নামটির উৎপত্তি। আক্রান্ত দেহকলার নামানুসারে বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের ক্যান্সারের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। ত্বক ও অন্ত্রের ক্যান্সারকে বলে কার্সিনোমা (Carcinoma), যোজক কলার (Connective

tissue) ক্যান্সারের নাম সারকোমা (Sarcoma)। যকৃতের ক্ষেত্রে হেপাটোমা (Hepatoma) এবং শ্বেতকণিকার ক্যান্সারের নাম লিউকেমিয়া (Leukemia) ইত্যাদি।

জার্মান বিজ্ঞানী রুডল্ফ্ ভারখাউ সর্বপ্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্যান্সারগ্রস্ত কলা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, পারিপার্শ্বিক জগতের ক্রমান্বয় উত্তেজনাই ক্যান্সারের উৎপত্তির কারণ। এই ধারণা খুবই স্বাভাবিক—কেন না, তিনি লক্ষ্য করেন যে, দেহের যে সব অংশ বহির্জগতের সংস্পর্শে আসে, সাধারণতঃ সেই অংশগুলিই বিশেষভাবে ক্যান্সারপ্রবণ। কিন্তু সে সময়ে রোগের জীবাণুজনিতা সম্বন্ধে পাস্তরের প্রস্তাবনা বিজ্ঞানীসমাজে স্বীকৃত হওয়ায় রোগতাত্ত্বিক মহলে ভারখাউয়ের মতবাদ আদৌ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। সে যুগের অধিকাংশ রোগতাত্ত্বিক ভাবতেন যে, ক্যান্সার হয়তো কোন অজ্ঞাত জীবাণুঘটিত রোগ। ভারখাউ জীবাণুতত্ত্বের প্রচণ্ড বিরোধী ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে, জীবাণুতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে উঠলে ভারখাউ রোগতত্ত্ব ছেড়ে প্রত্নবিদ্যা ও রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেন।

ভারখাউয়ের এই একগুঁয়েমী সাধারণভাবে যুক্তিসঙ্গত না হলেও অন্ততঃ ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তাঁর ধারণার সত্যতা এখনও অনস্বীকার্য। কয়েকটি বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে ক্যান্সার উৎপত্তির পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অষ্টাদশ শতকে চিম্‌নী পরিষ্কারকদের মধ্যে অণ্ডকোষের ক্যান্সারের আধিক্য দেখা যেত। আলকাত্‌রাজাত রঙের প্রচলনের পর থেকে দেখা গেছে যে, এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ত্বক ও মূত্রস্থলীর ক্যান্সার সাধারণ থেকে অনেক বেশী সংখ্যায় ঘটে। এথেকে মনে হয়, কয়লার কালি ও আলকাত্‌রাজাত অ্যানিলিন শ্রেণীর রঙের কোন কোন পদার্থ বিশেষভাবে ক্যান্সার উৎপাদনক্ষম। ১৯১৫ সালে ইয়ামাগিওয়া ও ইচিকাওয়া নামক দুজন জাপানী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন যে, আলকাত্‌রার একটি অংশ খরগোশের কানে ক্রমাগত প্রয়োগ করলে ঐ প্রত্যঙ্গে ক্যান্সারের উৎপত্তি হয়। ১৯৩০ সালে দুজন বৃটিশ বিজ্ঞানী ডাইবেঞ্জান্থ্রাসিন (Dibenzanthracene) নামক সংশ্লেষণজাত একটি রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে প্রাণিদেহে ক্যান্সার উৎপাদনে সক্ষম হন। উপরিউক্ত যৌগটি পাঁচটি বেঞ্জিন-চক্র (Benzene ring) সমন্বিত একটি হাইড্রোকার্বন। আলকাত্‌রায় এটি না থাকলেও এর সদৃশ গঠনের বেঞ্জপাইরিন (Benzpyrene) নামক একটি ক্যান্সার-উৎপাদক (Carcinogen) যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে বহু বিভিন্ন ক্যান্সার-উৎপাদক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকগুলি উপরিউক্ত যৌগ দুটির মত বহুসংখ্যক বেঞ্জিন-চক্র সমন্বিত হাইড্রোকার্বন জাতীয়। কতকগুলি আবার অ্যানিলিন শ্রেণীর রঙের সমগোত্রীয়। বস্তুতঃ খাদ্যসামগ্রীতে কৃত্রিম রং ব্যবহারের অন্যতম প্রধান বিপদ হলো, এগুলি ক্রমে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

যন্ত্র-সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির ফলে গত দু-তিন শতকে মানুষের পরিবেশে অনেক নতুন ক্যান্সার-উৎপাদক পদার্থের আবির্ভাব ঘটেছে, কয়লার ব্যবহার, খনিজ তৈলের দহন, খাদ্য ও প্রসাধন সামগ্রীতে কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ ইত্যাদির ফলে। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিকিরণও (High energy radiation) ক্যান্সার উৎপত্তির একটি নিশ্চিত কারণ। ১৮৯৫ সালে রঞ্জেন-রশ্মি আবিষ্কারের পর থেকে মানুষ ক্রমাগতই অধিকতর পরিমাণে এই বিকিরণের সম্মুখীন হচ্ছে। রঞ্জেন-রশ্মি ও তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত গবেষণার আদি যুগে সংশ্লিষ্ট গবেষকদের

অনেকেই ক্যান্সারে মারা গেছেন। মেরী কুরি ও ইরিন কুরি-জোলিও দুজনেরই লিউকেমিয়া রোগে মৃত্যু ঘটে। ১৯২৮ সালে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক ফিণ্ড্‌লে প্রমাণ করেন যে, অতিবেগুনী রশ্মিও ত্বকের ক্যান্সার ঘটাতে পারে। সাম্প্রতিক কালে ক্যান্সারের প্রকোপ বৃদ্ধিতে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিকিরণের যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত তেজস্ক্রিয় ভস্ম থেকে যে ষ্ট্রনশিয়াম-৯০ ধীরে ধীরে আমাদের অস্থিতে জমছে, তার ফলে ভবিষ্যতে আরও অধিক সংখ্যক মানুষ অস্থি-ক্যান্সার ও লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হবে কিনা, সে খবর অবশ্য এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি।

উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিকিরণ বা কোন কোন রাসায়নিক যৌগ—আপাতসম্পর্কশূন্য এই সব ক্যান্সার-উৎপাদক কি করে ক্যান্সার ঘটায়, সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠতে পারে। এই সম্বন্ধে একটা যুক্তি-সঙ্গত ধারণা হলো এই যে, এগুলি সবই হয়তো দেহকোষের জিনগত পরিব্যক্তি (Genetic mutation) ঘটায় এবং এই পরিব্যক্তির ফলে সাধারণ সুস্থ কোষ ক্যান্সারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জীবকোষের বংশগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের যে বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়, তা বহুসংখ্যক পরস্পরসংবদ্ধ এনজাইম কর্তৃক প্রভাবিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল। এনজাইমগুলি প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। কোন প্রোটিনের জৈব কার্য-কারিতা নির্ভর করে তার সংগঠক অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহের সজ্জাক্রমের উপর। জীবকোষের ক্রোমোসোমস্থ জিনগুলিতে সমস্ত প্রোটিনের সজ্জাক্রম নির্ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় সঙ্কেত নিহিত থাকে। সাম্প্রতিক কালে প্রমাণিত হয়েছে যে, জীবকোষের প্রত্যেকটি প্রোটিনের জন্যে এক একটি নির্দিষ্ট জিন আছে। অতএব, জিনগুলিই জীব-কোষের বংশগত বৈশিষ্ট্যের মূলাধার। কোন কারণে যদি কোন একটি জিনে কোন পরিবর্তন ঘটে, তাহলে জীবকোষের যে বৈশিষ্ট্যটি ঐ বিশেষ জিনের উপর নির্ভরশীল, সেটিও পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন স্থায়ী হলে ঐ কোষটির সন্তান-পরম্পরাতেও ঐ পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য ব্যাপ্ত হবে। এই ঘটনাটিকেই জিনগত পরিব্যক্তি বলে অভিহিত করা যায়।

উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিকিরণের পরিব্যক্তি ঘটাবার ক্ষমতা সুবিদিত। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের দ্বারাও পরিব্যক্তি ঘটানো যেতে পারে। নাইট্রোজেন মাস্টার্ডগুলি এর দৃষ্টান্ত। এগুলি ক্রোমোসোমের ক্ষতি সাধন করে পরিব্যক্তির হার বাড়িয়ে দেয়। জিনগত পরিব্যক্তির ফলে কিভাবে ক্যান্সারের উৎপত্তি ঘটতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ধরা যাক, কোন ক্যান্সার-উৎপাদকের ক্রিয়ার ফলে এক বা একাধিক জিনে এমন কোন পরিবর্তন ঘটলো, যাতে ঐ এক বা একাধিক জিন-নির্দিষ্ট এনজাইম সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে গেল। এই এক বা একাধিক এনজাইম যদি কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক-তন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই বিশেষ কোষটির বৃদ্ধি হবে অনিয়ন্ত্রিত এবং এই অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যটি ঐ বিশেষ কোষটির সন্তান-পরম্পরায়ও ব্যাপ্ত হবে; অর্থাৎ এমন একদল কোষের সৃষ্টি হতে থাকবে, যারা দেহের যে বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্যে তাদের সৃষ্টি, তার দিকে লক্ষ্য না রেখেই বংশবৃদ্ধি করে চলবে। ফলে দেহের সেই অংশে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হবে। দেহের অংশবিশেষের এই অরাজক অবস্থাই ক্যান্সার।

যে সব রাসায়নিক পদার্থ পরিব্যক্তি ঘটায়, তাদের বলে পরিব্যক্তিজনক (Mutagen)। সমস্ত পরিব্যক্তিজনক অবশ্য ক্যান্সার-উৎপাদক নয় বা সব ক্যান্সার-উৎপাদকই পরিব্যক্তিজনক নয়। কিন্তু ক্যান্সার ও পরিব্যক্তি উভয়ই ঘটাতে সক্ষম, এমন এক যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে যে, মনে

হয় এই দুয়ের মধ্যে. সম্পর্ক নিতান্ত কাকতালীয় নয়।

ক্যান্সার একটি জীবাণুজ রোগ—ভারথাউয়ের সমসাময়িকদের এই ধারণা কিন্তু একেবারে পরিত্যক্ত হয় নি। বস্তুতঃ পরিস্রাবণযোগ্য ভাইরাসের (Filtrable virus) আবিষ্কারের পর থেকেই বহু ক্যান্সারতাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন যে, ক্যান্সার একটি ভাইরাসঘটিত ব্যাধি। এই বিশ্বাসের অনুকূলে অনেক প্রমাণও পুঞ্জীভূত হয়েছে। ক্যান্সার ভাইরাসজনিত হতে পারে, এই ধারণা নিয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন রকফেলার ইনস্টিটিউটের ডাঃ পেটন রু। মুরগীর বুকের মাংসপেশীতে এক ধরণের স্ফোটক (Tumour) হয়। ডাঃ রু এই স্ফোটক থেকে কোষ নিয়ে সুস্থ মুরগীর দেহে বপন করে অনুরূপ স্ফোটকের উৎপত্তি ঘটাতে সক্ষম হন। স্ফোটকটি কোন ব্যাক্টিরিয়া-জনিত নয়, সেটা প্রমাণ করবার জন্যে তিনি রোগগ্রস্ত স্ফোটক থেকে কোষমুক্ত একটি আরক প্রস্তুত করে অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট ফিল্টারের (Filter) মধ্য দিয়ে পরিস্রুত করেন। তাঁর ব্যবহৃত ফিল্টারের ছিদ্রগুলি এত সূক্ষ্ম ছিল যে, ক্ষুদ্রতম ব্যাক্টিরিয়াও তার মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। এই পরিস্রুত কোষমুক্ত আরকটিও সুস্থ মুরগীর দেহে অনুরূপ স্ফোটক উৎপাদন করতে পারে। এথেকে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে, মুরগীর এই স্ফোটকটির সৃষ্টি হয় পরিস্রাবণযোগ্য কোন ভাইরাস জাতীয় কণার দ্বারা। ডাঃ রু-এর নামানুসারে এই ভাইরাসটিকে রু সারকোমা ভাইরাস (Rous sarcoma virus) বলা হয়। পরবর্তী কালে মুরগীর আরও কয়েক ধরণের ক্যান্সারও ভাইরাসজনিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে ১৯৩৬ সালের আগে কোন ক্যান্সার ভাইরাস আবিষ্কৃত হয় নি। ঐ বছরে জন বীটনার এক শ্রেণীর ইঁদুরের স্তন্যে ক্যান্সার-উৎপাদনক্ষম একটি ভাইরাসের সন্ধান পান। পরবর্তী কালে স্তন্যপায়ী প্রাণীর আরও কয়েকটি ক্যান্সার ভাইরাসজনিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। মানবদেহের ক্যান্সারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন ভাইরাস এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং মানুষের ক্যান্সার ভাইরাসজনিত কি না—মানব-সমাজের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধান এখনও দুরাগত।

জিনগত পরিব্যক্তি বা ভাইরাস-ক্যান্সারের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে এই দুই আপাতবিরোধী মতবাদের মিলনের সম্ভাবনা সাম্প্রতিক কালে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। ভাইরাস ও জিন দুয়েরই সাধারণ উপাদান হলো ডিঅক্সিরাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribonucleic acid) বা সংক্ষেপে ডি. এন. এ. (DNA)। উভয়ের বৈশিষ্ট্যই এই ডি এন. এ-র উপর নির্ভর-শীল। ইঁদুরের এক ধরণের স্ফোটক থেকে যে ভাইরাস পাওয়া যায়, ১৯৫৯ সালে তাথেকে ডি. এন. এ. পৃথক করে প্রমাণ করা হয়েছে যে. সম্পূর্ণ ভাইরাসের মত এই ডি. এন. এ-ও সুস্থ ইঁদুরের দেহে সঞ্চারিত করলে সংশ্লিষ্ট কলায় ক্যান্সারের সৃষ্টি হয়। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ক্যান্সারের কারণ সম্বন্ধে পরিব্যক্তিবাদ ও ভাইরাসবাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সামান্যই। প্রথমোক্ত মতবাদ অনুসারে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী নিউক্লিক অ্যাসিডের জন্ম হয় কোষস্থ কোন জিনের পরিব্যক্তির ফলে। ভাইরাসবাদ অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভাইরাস দেহ-কোষের মধ্যে তার নিউক্লিক অ্যাসিড প্রবিষ্ট করালে ক্যান্সারের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং ধারণা দুটি মোটেই পরস্পর বিরোধী নয়, ক্যান্সার দুভাবেই উৎপন্ন হতে পারে।

কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির সময় তার বিপাক-যন্ত্রের কি বৈকল্য ঘটে, তা এখনো নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি। তবে সন্দেহ করা হয় যে

এক্ষেত্রে কতকগুলি হর্মোন, বিশেষতঃ যৌন হর্মোনের ক্রিয়াসাম্য বিনষ্ট হয়। ক্যান্সার উৎপাদনে যৌন হর্মোনগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এই সন্দেহের অনেক কারণ বিদ্যমান। ক্যান্সারাক্রান্ত কোষের প্রধানতম লক্ষণ হলো তার অতি দ্রুত বৃদ্ধি। যৌন হর্মোনের প্রভাবেও দেহের কোন কোন অংশের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। যৌন হর্মোনের ক্রিয়াশীলতা যেখানে সর্বাধিক, নারী-পুরুষের সেই সব দেহাংশগুলিই বিশেষভাবে ক্যান্সারপ্রবণ। যৌন হর্মোনগুলি সমস্তই স্টেরয়েড (Steroid) গোষ্ঠীভুক্ত। মিথাইল-কোলানথি্ন (Methylcholanthrene) নামক একটি তীব্র ক্যান্সার-উৎপাদকের গঠনও স্টেরয়েড জাতীয় যৌগের সদৃশ। সুতরাং কোন যৌন হর্মোনের সামান্য বিকৃতির ফলে সেটি ক্যান্সার-উৎপাদকে পরিণত হতে পারে, এমন অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নয় অথবা জিনগত পরিব্যক্তির ফলে অবিকৃত কোন যৌন হর্মোন হয়তো পরিব্যক্ত কোষের কাছে ক্যান্সার-উৎপাদকরূপে প্রতিভাত হয়ে অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি সূচনা করতে পারে। এই সব ধারণার সত্যতা অবশ্য এখনো সন্দেহাতীত নয়।

ক্যান্সারের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্যে সারা পৃথিবী জুড়ে যে বিপুল বৈজ্ঞানিক তৎপরতা চলেছে, তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত শল্যচিকিৎসাই ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধানতম অস্ত্র। এর আনুষঙ্গিক ত্রুটিগুলিও দূর করা সম্ভব হয় নি। অস্ত্রোপচার করে ক্যান্সারগ্রস্ত কলা বাদ দেবার সময় কিছু সুস্থ কলাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া ক্যান্সারাক্রান্ত কলা অত্যন্ত ভঙ্গুর বলে এর কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ রক্তধারায় বাহিত হয়ে দেহের অন্য অংশে ক্যান্সার উৎপাদন করতে পারে।

উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিকিরণ প্রয়োগ করে ক্যান্সারগ্রস্ত কোষের মৃত্যু ঘটাবার প্রক্রিয়াও দোষমুক্ত নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্যান্সার চিকিৎসায় রঞ্জেন-রশ্মি ও রেডিয়ামের অবদান সামান্য নয়। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার আরও কয়েকটি ফলপ্রদ প্রতিষেধকের সন্ধান দিয়েছে। উচ্চ শক্তির গামা-রশ্মি বিকিরক কোবাল্ট-৬০ এর মধ্যে একটি। এটি প্রায় রেডিয়ামের সমগুণসম্পন্ন অথচ দামে অনেক সস্তা। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্যান্সার নিরোধে তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের ব্যবহারও এই ক্ষেত্রে এক নতুন সংযোজন। নানা ধরণের ক্যান্সারের চিকিৎসায় বিকিরণের ব্যবহারে আংশিক সুফল পাওয়া গেলেও এর ক্ষতিকর দিকটাও চিন্তনীয়। মানব-শরীরের বিকিরণ সহনশীলতা অত্যন্ত সীমিত। ফলে দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত বিকিরণ প্রয়োগের ফলে পুরনো ক্যান্সার সারলেও নতুন করে ক্যান্সারের উৎপত্তি হতে পারে।

আজ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার বা বিকিরণ-চিকিৎসা শুধু সীমিত (Localized) ক্যান্সার প্রশমনেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। যে সব ক্যান্সার দেহের নিভৃত অংশে গভীর ও ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, সেগুলি নিরাময়ের উপায় সন্ধানে বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানী নিযুক্ত আছেন। এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সম্প্রতি ক্যান্সারের চিকিৎসায় দুটি আশাপ্রদ ধারার সূচনা হয়েছে। এর মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তির অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিসমূহের (Endocrine Glands) ক্রিয়াসাম্য পরিবর্তন করে ক্যান্সারগ্রস্ত কলার বৃদ্ধি বন্ধ করবার পদ্ধতিটি বিশেষভাবে আশা-ব্যঞ্জক। দ্বিতীয় ধারাটি হলো, রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে ক্যান্সারগ্রস্ত কোষের বৃদ্ধি নিরোধ।

অ্যান্‌ড্রোজেন (Androgen) শ্রেণীর পুং-হর্মোনগুলি প্রস্টেট গ্রন্থির (Prostate Gland) বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অ্যান্‌ড্রোজেন সরবরাহের অপ্রতুলতার ফলে প্রস্টেটের বৃদ্ধি বন্ধ হয় এবং এটি আকারে ছোট হয়ে যায়। অণ্ডকোষ-

হোমোন বা স্ত্রী-হর্মোন এস্ট্রোজেনের (Estrogen) দ্বারা অ্যান্‌ড্রোজেনগুলিকে প্রশমিত করে প্রস্টেটের বৃদ্ধির জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় অ্যানড্রোজেনের অপ্রতুলতা ঘটানো যায়। এই ভাবে প্রস্টেটের বৃদ্ধি বন্ধ করলে ঐ গ্রন্থির অনেক ক্যান্সারের বৃদ্ধিও বন্ধ হয়। এই ধরণের ক্যান্সারগুলিকে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি-নির্ভর ক্যান্সার বলা যায়। বক্ষ ও থাইরয়েডের অনেক ক্যান্সারও অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি-নির্ভর। উপযুক্ত হর্মোন প্রয়োগ করে বা যে সব গ্রন্থির উপর এই ক্যান্সারাক্রান্ত প্রত্যঙ্গগুলির বৃদ্ধি নির্ভরশীল, সেগুলির কর্মক্ষমতা বিনষ্ট করে এই সব প্রত্যঙ্গের ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এখন পর্যন্ত বক্ষ, থাইরয়েড ও প্রস্টেটের ক্যান্সার প্রশমনে উপরিউক্ত পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে।

রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে ক্যান্সারগ্রস্ত কোষকে বিনষ্ট করবার চেষ্টা বহুদিন ধরেই চলছে। কয়েকটি রাসায়নিকের সাহায্যে নির্দিষ্ট কয়েক ধরণের ক্যান্সারের বৃদ্ধি অল্পকালের জন্যে বন্ধ করা সম্ভব হলেও এখনো পর্যন্ত ক্যান্সারের কোন সার্বিক ও দীর্ঘস্থায়ী রাসায়নিক প্রতিষেধক পাওয়া যায় নি। এক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধা এই যে, ক্যান্সারগ্রস্ত কোষ এবং সুস্থ কোষের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত অল্প বলে ক্যান্সারাক্রান্ত কোষ বিনষ্টকারী রাসায়নিক পদার্থগুলির অধিকাংশই অস্থি, মজ্জা ও আন্ত্রিক ঝিল্লীর দ্রুত বৃদ্ধিশীল সুস্থ কোষের পক্ষেও হানিকর হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সব রকমের ক্যান্সারের পক্ষে মারাত্মক অথচ সুস্থ কোষের পক্ষে আদৌ ক্ষতিকর নয়, এমন একটিমাত্র আদর্শ রাসায়নিক পদার্থের কল্পনা বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে এই ধারায় পৃথিবীব্যাপী গবেষণার প্রগতি লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, ক্যান্সারের রাসায়নিক প্রতিষেধকের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। সব রকমের ক্যান্সারের কোন একটিমাত্র রাসায়নিক প্রতিষেধক না পাওয়া গেলেও ভবিষ্যতে হয়তো এমন বহু রাসায়নিক আবিষ্কৃত হবে, যার প্রত্যেকটি এক নির্দিষ্ট ধরণের কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে উপযুক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করে নির্দিষ্ট প্রত্যঙ্গের ক্যান্সার নিবারণ সম্ভব হবে। এই সম্ভাবনার আংশিক রূপায়ণ হয়েছে লিউকেমিয়ার ক্ষেত্রে।

ক্যান্সারের কারণ ও নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার ফলে সাম্প্রতিক কালে এই সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের যে অভাবনীয় বৃদ্ধি ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অদূর ভবিষ্যতে ক্যান্সার সমস্যার সমাধানের আশা করা অসঙ্গত নয়। জীবনের মত দুজ্ঞের্য় ক্যান্সার কোষের রহস্যভেদই হবেপ্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষের চরমতম জয়।

মহাকাশে হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব

অত্রি মুখোপাধ্যায়

বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক কারণ জ্যোতির্বিদ্‌দের ভান্তঃপ্রদেশে হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী করে তুলেছে। এদের মধ্যে অন্যতম কারণ—এক দিকে নক্ষত্র অভ্যুদয়ের মতবাদ এবং অন্য দিকে বর্ণালী বিশ্লেষণের ফলাফল।

নক্ষত্র অভ্যুদয়ের মতবাদে বলা হয়েছে যে, একটি তারা তার জীবনকালে চারপাশের প্রদেশ থেকে ঠাণ্ডা হাইড্রোজেন সংগ্রহ করতে বাধ্য। তাছাড়া নক্ষত্রসমূহের নিরীক্ষা থেকে একথা সমর্থিত হয়েছে যে, সংযোজিত বস্তুর অধিকাংশই হাইড্রোজেন হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, নীহারিকাস্থিত দূরতর নক্ষত্রের আলোর বর্ণালীতে কতকগুলি শোষণ-রেখা পাওয়া গেছে, যা থেকেই মনে হচ্ছে বিভিন্ন তারার মধ্যস্থিত অঞ্চল, যাকে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়েছে ভান্তঃপ্রদেশ, সেখানে বস্তুর একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে এই হাইড্রোজেন।

কিন্তু হাইড্রোজেনের অস্তিত্বের অনুমান যেখানে বিভিন্ন কারণে অনিবার্য হয়ে পড়ছে, সেখানে বহুদিন পর্যন্ত তার অস্তিত্বের সরাসরি কোন নিরীক্ষামূলক প্রমাণ না পাওয়ায় বিশ্ব-বিজ্ঞানে খানিকটা বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছিল।*

কিন্তু মতবাদ অনুযায়ী ভান্তঃপ্রদেশে যে নিষ্ক্রিয় হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে, তার অধিকাংশই অনুত্তেজিত অবস্থায় থাকবার জন্যে তাথেকে কোন রকম নেত্রগ্রাহ্য বর্ণালী রেখা আশা করা যায় না। আর নির্গত লীম্যান-শ্রেণী পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বেগুনীপারের আলো শোষণ করে নেবার জন্যে চিরদিনই আমাদের চোখে অদৃশ্য থাকবে। কিন্তু বছর পনেরো আগে একজন ডাচ যুবক-জ্যোতির্বিদ ভ্যান ডি হাল্‌স্ট্‌ তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার ভিত্তিতে দেখালেন, বর্ণালীর বেতার-তরঙ্গ অঞ্চলে হাইড্রোজেনের একটি স্পষ্ট বর্ণালী রেখা উৎপন্ন করবার কথা। যে বৈদ্যুতিক দুটি অংশ অর্থাৎ প্রোটন এবং ইলেক্ট্রন দিয়ে একটি সম্পূর্ণ হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরি, তারা প্রত্যেকে নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘোরাতে একটু একটু করে দুটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে থাকে। সাধারণতঃ এই দুটি ক্ষেত্র পরস্পর

---

* অবশ্য ভীষণ গরম তারাগুলির কাছে কিছু কিছু হাইড্রোজেন দেখা গিয়েছিল। তার কারণ, প্রধান শ্রেণীভুক্ত তারাগুলির বিকিরিত আলো চারপাশের ভান্তঃপ্রদেশীয় হাইড্রোজেন শোষণ করে আয়নিত হয়ে পড়ে। এসব মুক্ত আয়ন তাদের পরিভ্রমণ কালে সময়ে সময়ে পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি চলে আসে এবং কিছু কিছু পুনঃসংযোজিত হয়ে পড়ে। এই সময় যে দৃশ্য-আলো বিকিরিত হয় বস্তুতঃ তারই জন্যে নক্ষত্র সন্নিকটস্থ হাইড্রোজেনকে উত্তপ্ত দেখি। (কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এদের পারস্পরিক সংঘাত সংযোজনে পরিণতি লাভ করে না এবং এমন সময়ের বিকিরণ বর্ণালীর কাল নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধও থাকে না। সাধারণতঃ বেগুনীপারের আলো; নীল, সবুজ, হলুদ, লাল ইত্যাদি দৃশ্য আলো, লালউজানী আলো এবং বেতার-তরঙ্গও নির্গত হয়। সত্যিই এই ভাবে যে বেতার-তরঙ্গ নির্গত হয়, তা জানিয়ে এবং কীম্যান দেখিয়েছেন)। যেহেতু নীহারিকাস্থিত হাই-ড্রোজেনের সামান্য অংশই গরম, এদের নিরীক্ষার উপায়টি সর্বত্রই প্রযোজ্য ছিল না। ঠাণ্ডা হাইড্রোজেনের আসল অঞ্চলটিই নির্ধারণ করবার প্রয়োজন ছিল বেশী।

একমুখী বা বিপরীতমুখী হতে পারে। ভ্যান ডি. হাল্‌স্ট্‌ বললেন, যদি কোন পরমাণু হাইড্রোজেনে এই দুই চৌম্বক ক্ষেত্র একই দিকে থেকে থাকে, তাহলে গড়পড়তা হিসাবে কয়েক কোটি বছর পরে এরা স্বতঃই বিপরীত হয়ে পড়তে বাধ্য। উল্টো ঘটনাটিও ঠিক এমনিভাবেই ঘটতে পারে। পরমাণুর এই অবস্থান্তরে যে পরিমাণ বিকিরণ নির্গত হবে, তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে ২১ সে.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গের বিকিরণে; অর্থাৎ প্রত্যেক হাইড্রোজেন পরমাণুর ভাগ্যে এরকম ঘটনা ঘটা অত্যন্ত বিরল। কিন্তু এর সঙ্গে ছায়াপথস্থ হাইড্রোজেনের ঘনত্ব অত্যন্ত কম (ধরুন $১০^{-২৪}$ গ্র্যাম / ঘন সে. মি.), একথা স্বীকার করেও একমাত্র নীহারিকার আভ্যন্তরীণ প্রদেশের অভূতপূর্ব বিস্তৃতি এবং তার সঙ্গে সেখানে হাইড্রোজেনের প্রভুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে আশা করা যেতে পারে যে, বিকিরিত এই রেখা দৃষ্টিসীমার মধ্যেই থাকবে।

হাল্‌স্টের এই ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৫১ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এওয়েন ও পার্সেল, লাইডেন মানমন্দিরে উর্ট ও ম্যুলার এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিশ্চিয়ানসেন ও হিণ্ড্‌ম্যান কর্তৃক পরীক্ষিত হয়ে গেল। জ্যোতির্বিদেরা বর্ণালীবীক্ষণে আমাদের নীহারিকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হাইড্রোজেনের ২১ সে. মি. তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বর্ণালী রেখা দেখতে পেলেন।

এই আবিষ্কারের সুযোগটুকু জাঁ উর্টের নেতৃত্বে লাইডেনের পর্যবেক্ষকেরা কাজে লাগিয়ে ফেললেন। মহাকাশে বিকীর্ণ ধূলাবালির প্রাচুর্য আলোক-নিরীক্ষায় চিরদিন বাধা দিয়ে এসেছিল যার ফলে এবং নীহারিকার এককোণে আমাদের বাস হওয়ায় নীহারিকার সত্যিকারের চেহারাটা আমাদের এতদিন দৃষ্টির অতীতে রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ২১ সে. মি. তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বর্ণালী রেখা থেকে ছায়াপথের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব, তার ঘনত্ব নিরূপণ এবং এসব থেকে ছায়াপথের চেহারাটা জানতে পারা গেল।

দৃষ্টিসীমার মধ্যে নীহারিকার যে ছবি আমরা দেখেছি, তা তার আসল চেহারা নয়। নীহারিকাকে ঘিরে রয়েছে একটা গ্যাসীয় মুকুট, যেখান থেকে বেতার-তরঙ্গ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। এই ধরণের মুকুটের কথা সর্বপ্রথম শ্লোভ্‌স্কি বলেছিলেন এবং কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের পর্যবেক্ষকেরা তা পরীক্ষা করে অভ্রান্ত বলে রায় দিয়েছেন। জড্রেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরের পর্যবেক্ষকেরা আমাদের ছায়াপথের বাইরের কয়েকটি নীহারিকার ক্ষেত্রেও এরকম মুকুট দেখতে পেয়েছেন।

এছাড়াও নীহারিকার আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে হাইড্রোজেনের অস্তিত্বের আবিষ্কার আলোকপাত করেছে। বর্তমানে দেখা গেছে, আমাদের নীহারিকার যে বাহুতে নীল দৈত্যেরা রয়েছে, সেখানে হাইড্রোজেনের প্রচুর সমাবেশ। নীহারিকার মধ্যেই দ্বিতীয় একটি বাহুও আছে বলে অনুমিত হচ্ছে।

হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব দেশের বস্তু-ঘনত্ব নির্ণয় করতেও বিশেষ সাহায্যে লেগেছে। দেশের বস্তু-ঘনত্ব কি হলে কি এমন ঘটনাবলী ঘটতো, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না? এই প্রশ্ন এবং দেশে হাইড্রোজেন রয়েছে—এই অনুমান করে ঘনত্বের একটি উচ্চ সীমা পাওয়া গেল, তা হলো $১০^{-২৫}$ গ্র্যাম / ঘন সে. মি.।

* * *

এতক্ষণ ভান্তঃপ্রদেশে হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা হলো। এই আলোচনার অব্যবহিত পরেই যে প্রশ্ন উঠবে, তা সম্ভবতঃ এই যে, মহাকাশের অন্তত্র—যেমন নীহারিকাদের মাঝের অঞ্চলে কি এই হাইড্রোজেন আছে?

পার্থিব যে সব নিরীক্ষা আন্তঃপ্রদেশে হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব নির্দেশ করেছে, সেগুলির ফলাফল যদি দেশমাত্রার বিচারে বিশ্বের সর্বাংশে সত্য হয়, তবে এই প্রযুক্তি অনুমোদন করা যায়। অন্য কথায় এই সর্ত এই রকম দাঁড়াবে : বিশাল বিশ্বের মধ্যে আমাদের নীহারিকা যদি অদ্বিতীয় না হয়, তাহলে আমাদের নীহারিকা থেকে পাওয়া ফলাফলগুলি বিশ্বের অন্যান্য জায়গাতেও প্রযোজ্য হবে।

এই প্রযুক্তির পক্ষে আমাদের নীহারিকার সঙ্গে অন্যান্য নীহারিকা-দ্বীপের নিরীক্ষাগত মিলটির কথা উল্লেখ করা যায়। দূর নীহারিকার নিরীক্ষায় কিছু সহজাত অসুবিধা থাকে। কাছের নীহারিকা যে বিস্তৃত কোণের আয়ত্তে দূরেক্ষণে ধরা দেয়, দূরতর নীহারিকা যে তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণের কোণ উৎপন্ন করবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ওদের মধ্যেও হাইড্রোজেন আছে কি না, সেটা দেখাতে এই প্রধান অসুবিধা, তাছাড়া আমাদের নীহারিকার বেলায় হাইড্রোজেনের ২১ সে. মি. বেতার-তরঙ্গ রেখা যেমন চরিত্রে বিকিরণ-রেখা, দূরের বেলায় তার দেখা পাওয়া যায় শোষণ-রেখা হিসাবে—এই অসুবিধা মিলে খুবই গোলমাল বাঁধিয়েছে। তবে ১৯৫৪ সালে বাদে এবং মিনকাউস্কি যখন সিগ্‌নাসের অন্তর্বর্তী একটি শক্তিশালী বেতার-প্রভবকে ছুটি ধাক্কা-খাওয়া নীহারিকা হিসাবে সনাক্ত করলেন, তখন মনে হলো, ওই জায়গা থেকে ২১ সে. মি. তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একটি রেখা পেলে পাওয়াও যেতে পারে এবং এই রেখাটি সিগ্‌নাসের দূরত্বের উপযুক্ত লাল-অপসরণ প্রদর্শন করলেও করতে পারে। আলোক-বিজ্ঞান থেকে এই নীহারিকাদ্বয়ের বর্ণালীতে রেখার লাল-অপসরণের পরিমাণ ওদের মহাদৌড়-বেগ সেকেণ্ডে ১৭০০০ কি. মি. বলে নির্দেশ করলো। এখন যদি ওখানে হাইড্রোজেন থেকে থাকে, তাহলে ওই মহাদৌড়-বেগের সমানুপাতে পরিবর্ধিত 'একটি ২১ সে মি. তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বর্ণালী রেখা' বেতার-তরঙ্গ অঞ্চলের বর্ণালীতে পাওয়া উচিত। বর্ণালী ছবিকায় এই রেখা পাওয়া গেল ১৯৫৬ সালে ; শুধু তাই নয়, যে পরিমাণ লাল-অপসরণ এই রেখার বেলায় আশা করা হয়েছিল (Δ = ৮০ মেগাসাইকল / সে.) ঠিক, তেমনই পাওয়া গেল।

এই ঘটনা শুধু মাত্র দূরস্থিত নীহারিকায় হাইড্রোজেনের অস্তিত্বই নির্দেশ করলো না, তারই সঙ্গে দেখালো দূরের এই সিগনাস নক্ষত্র-মণ্ডলীর বর্ণালীতে ১ থেকে ৫০০০০০ সে.মি. তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অঞ্চল জুড়ে লাল-অপসরণের মান ধ্রুবক থাকছে। একথার গুরুত্ব অনেকখানি।

সত্যই যদি লাল-অপসরণের কারণ একমাত্র উৎসের মহাদৌড়-বেগই হয়, তাহলে যে এই ধরণের সঙ্গতি আশানুরূপ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাহলে অনেকখানি বোঝা যাচ্ছে যে, নীহারিকাগুলি পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বেগে সরে চলেছে, অর্থাৎ বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে।

কিন্তু এই সঙ্গতি, লাল-অপসরণের ডপ্‌লার-ক্রিয়াভিত্তিক ব্যাখ্যায় যদিও একটি প্রয়োজনীয় সর্ত, তবু যথেষ্ট নয়। সুতরাং লাল-অপসরণের অন্যান্য ব্যাখ্যা যদি আসে, তা এত সহজেই বর্জনীয় হতে পারে না।

এই হলো দ্বীপ-নীহারিকাগুলির মধ্যে হাই-ড্রোজেনের কথা। এই অনুসন্ধান ম্যাগেলানীয় মেঘের ভিতরেও করা হয়েছে। অষ্ট্রেলীয় জ্যোতির্বিদ কের ও হিণ্ড্‌ম্যান এদের ভিতরে হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব নির্দেশ করেছেন। এথেকে আরও জানা গেছে, দুটি ম্যাগেলানীয় মেঘ পরস্পর পরস্পরকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। ওদের ভিতরকার হাইড্রোজেন বিকিরিত বেতার বর্ণালী রেখার তীক্ষ্ণতা বাড়লো কি কমলো, সেই দেখে এরকম নির্ধারণ সম্ভব।

সে যাই হোক, দ্বীপ-নীহারিকাগুলির মধ্যাকলে যে বিরাট ব্যাপ্তি, সেখানে কি হাইড্রোজেন আছে? বিশ্বের অন্যান্য নীহারিকার সঙ্গে যদিও আমাদের নীহারিকার মিল কিছু কিছু খুঁজে পাওয়া গেছে, তবুও সন্দেহ হয়, বিশ্বের সর্বত্র পার্থিব নিরীক্ষাগত ফলাফলগুলি প্রয়োগ করা যাবে কি না। আন্তর্নীহারিকা দেশের বস্তু-ঘনত্ব এবং গঠন সম্পর্কে আমরা এখনো পর্যন্ত অন্ধকারে। তবে এর ঘনত্ব যদি খুব অল্পও হয়, তাহলেও এই প্রদেশের বিস্তৃতি এত বেশী যে, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুসত্ত্ব এরা অতি স্বল্প আয়াসেই পুরে ফেলতে পারে। যাই হোক, বিশ্ববিজ্ঞান এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, সেখান থেকে মনে হতে পারে, বিশ্বের মোট পদার্থসমূহের কিছুটা অংশও যদি এই আন্তর্নীহারিকা দেশ গ্রহণ করে থাকে তাহলে তা প্রধানতঃ হাইড্রোজেনই। সুতরাং অকুস্থানীয় নিরীক্ষার নির্দেশ ছাড়িয়েই হাইড্রোজেন হয়তো সমগ্র বিশ্ব জুড়ে প্রভুত্ব করছে।

এই ধারণা যদি ভুল বলে প্রমাণিত না হয়, তাহলে বিশ্বে মোট উপাদানের নব্বুই থেকে নিরানব্বুই ভাগই হাইড্রোজেন।

তাহলে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যে মৌল প্রভুত্ব করেছে, তার নাম হাইড্রোজেন। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, অন্যান্য মৌলগুলির মধ্যে এটিই হচ্ছে সরলতম, কেন্দ্রীনে মাত্র একটি প্রোটন, বাইরে মাত্র একটি ইলেক্ট্রন। সুতরাং বিশ্ব-বিজ্ঞানে তথাকথিত সহজিয়া অনুমান বা সিমপ্লিসিটি পস্চুলেট, যা নাকি বলছে এই বিশ্বের যাবতীয় জিনিষ তৈরি হয়েছে সহজতম জিনিষ দিয়ে তাকে এই সিদ্ধান্ত চমৎকারভাবে সমর্থন করেছে।

মনে হয় এর প্রভুত্ব এবং সাংগঠনিক সরলতা থেকেই হয়েলের মনে হয়েছিল, বিশ্বের সর্বপ্রাচীন সত্ত্য এই হাইড্রোজেন, আর তা থেকে, ঠিক তা নয়, তার কেন্দ্রীন থেকে উৎপন্ন হয়েছে অন্যান্য মৌলগুলি। যদিও হাইড্রোজেন সৃষ্টির রহস্য পদার্থ-বিজ্ঞানে আজও অমীমাংসিত, তবু, আশা রয়েছে, অন্যান্য পদার্থসমূহ এই হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন থেকে এমন এক প্রক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে, যা পদার্থ-বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে।

তাই, 'কিছু না' থেকে যেখানে হাইড্রোজেনের সৃষ্টি হচ্ছে বলে তার সৃষ্টি-রহস্যের পথে বেঁশী পা ফেলা হচ্ছে না, সেখানে অন্যদিকে নীউক্লিও-জেনেসিস (কেন্দ্রীন বিদ্যা) দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে: এক হাইড্রোজেন থেকে কিভাবে অন্যান্য মৌল তৈরি হচ্ছে এবং দুই, কোথায় এবং কখন এসব ঘটবার অবস্থা বিরাজ করছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এসেছে মতৈক্য নিয়ে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর একাধিক। কেউ বললেন, নতুন-তারা মতবাদ অনুযায়ী, বিস্ফোরণের পূর্বাহ্ণেই বা অনেকটা ঐ সময়েই বস্তুর এই প্রকার রূপান্তর ঘটবার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিস্ফোরণের সময় এসব সৃষ্ট মৌলগুলি বাইরের মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু প্রত্যেক নতুন-তারা বিস্ফোরণে একটি যুক্তিযুক্ত পরিমাণের ভরকে রূপান্তরিত হতে কল্পনা করলে হিলিয়াম থেকে সুরু করে লোহা পর্যন্ত মৌলগুলির আপেক্ষিক প্রাচুর্য দৃষ্ট তথ্যাবলীর সঙ্গে একতা রাখতে পারছে না। অবশ্য অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলগুলি খাপ খেল ঠিকই।

হয়েলই এই মতবাদ গঠন করেছিলেন। সাম্প্রতিক কালে ক্যামেরন দেখিয়েছেন, তারার বিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় তার ভিতরে নিউট্রনের সৃষ্টি হয়। এই নিউট্রনের উপস্থিতিতে হাল্কা মৌলসমূহ ভারী মৌলে পরিণত হতে পারে। এর উপরে ভিত্তি করে ইদানীং আবার হয়েল, ফাউলার ও বারবিন ভেবে দেখেছেন সহজিয়া অনুমানকে না টলিয়ে

বিশ্বের যাবতীয় মৌলের আপেক্ষিক প্রাচুর্য ব্যাখ্যা করা যায়।

হয়েলের এই ধারণায় বিশ্বের যাবতীয় মৌল এখনো তৈরি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও যে হবে, এমন সম্ভাবনাও রাখছে। কিন্তু অপর যে জ্যোতির্বিদ্ গোষ্ঠী, যেখানকার নেতৃত্ব নিয়েছেন হারম্যান, গ্যামো, আলফার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বিগ ব্যাঙ থিওরীতে প্রস্তাব করেছেন যে, বিশ্বের সম্প্রসারণের প্রথম ঘন্টাতেই এদের তৈরি হবার মত অবস্থা ছিল এবং তখনই এরা তৈরি হয়েছিল। এখান থেকেও আপেক্ষিক প্রাচুর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে।

তাহলে হাইড্রোজেন বিশ্বের সর্বত্র আছে, তার গঠন সরলতম। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন বিশ্বছবি যে গড়ে উঠেছে, তার দুটি নমুনা দেওয়া গেল।

এখন দেখা যাক, মহাকাশে হাইড্রোজেনের অস্তিত্বের আবিষ্কারকে এই দুই বিশ্বছবির পুরনো বিরোধের সমাধানে কতখানি কাজে লাগানো যায়। এই সমাধান আর কিছুই নয়, বিবর্তনবাদী বিশ্বছবি এমন একাধিক সমাধান এনেছে, স্থিরতত্ত্ব তো আর তেমন নয়, তার একটাই সমাধান; সুতরাং সেটা ভুল না ঠিক, তা দেখলেই চলে। এদিক থেকে স্থিরতত্ত্বকে যাচাই করাই সোজা। অবশ্য আপত্তি উঠতে পারে, কোয়াসার আবিষ্কারের পর স্থিরতত্ত্ব যখন বর্জনীয় বলে মনে হচ্ছে, তখন আর তাকে যাচাই করবার কথা উঠছে কেন? কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে, স্থিরতত্ত্বের অন্যতম রচয়িতা বণ্ডি এবং গোল্ড এই সম্পর্কে এখনো নীরব আছেন। সুতরাং একটা পরীক্ষামূলক সমাধানের সম্ভাবনা আলোচনা করা এখনো পর্যন্ত নেহাৎ অবান্তর হবে না।

আন্তর্নীহারিকা প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পাতলা বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান, এদের বণ্টন, ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মাবলী নিরূপণই বোধ হয় স্থিরতত্ত্বকে যাচাই করবার সবচেয়ে সরাসরি উপায়। স্থিরতত্ত্ব যে বিশ্বছবি উপস্থাপিত করেছে, তাতে এই প্রদেশে বস্তুর গড় ঘনত্ব হওয়া উচিত $১০^{-২৯}$ গ্র্যাম / ঘন সে. মি. জ্যোতির্বিদেরা নীহারিকাগুলি মধ্যে এই মানের একশতাংশের বেশী ভর খুঁজে পান নি। স্বভাবতঃই যে সিদ্ধান্ত এখান থেকে অনুসৃত হচ্ছে তা এই যে, স্থিরতত্ত্ব ঠিক হতে গেলে মোটামুটি শতকরা নব্বই ভাগ পদার্থই পাওয়া উচিত আন্তর্নীহারিকা প্রদেশে। যদিও শতকরার এই হিসাবকে খানিকটা কমিয়ে আনতেই হবে, তবু একথা ঠিক যে, হাইড্রোজেন-প্রধান বস্তু এই দেশে প্রায় সমভাবেই বণ্টিত থাকবে। হাইড্রোজেনের এই অংশ প্রধানতঃ আয়নিত এবং নিষ্ক্রিয় থাকবার কথা। কিন্তু পরীক্ষায় নিষ্ক্রিয় হাইড্রোজেনের দরুণ কোন ২১ সে. মি. বর্ণালী রেখা পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য এটা খুব অস্বাভাবিক নয়, তার কারণ বিশ্বজাগতিক সম্প্রসারণ-অনুসৃত ডপলার বিক্রিয়ার জন্যে এই তরঙ্গ যদি নির্গত হয়েই থাকে, পার্থিব বর্ণলিপি-যন্ত্রে একটি ধারালো রেখা উত্তেজিত করবার বদলে একটা ছড়ানো বর্ণালী অঞ্চল সৃষ্টি করবে। অবশ্যই এই ছড়িয়ে-পড়া ভাবটা থাকবে বৃহৎ তরঙ্গের অঞ্চলের দিকে। এখন মনে করা হচ্ছে এই বর্ণালী ঠিকই তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তা আপাততঃ নেত্রায়ত্তের উর্ধ্বে, অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু আশা আছে, আগামী কয়েক বছরের উন্নতি বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানকে এমন এক অবস্থায় উন্নীত করবে, যেখানে আন্তর্নীহারিকা প্রদেশে হাইড্রোজেনের প্রয়োজনানুভূত পরিমাণ সত্যই রয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহাতীত সিদ্ধান্ত পাওয়া নিতান্তই অসম্ভব হবে না।

বিপাক-বিশৃঙ্খলাজনিত বংশগত ব্যাধি

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

মানুষের যে সব ব্যাধি বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সেগুলিকে বংশগত ব্যাধি বলে। বংশগত ব্যাধিকে সাধারণতঃ দুরারোগ্য বলে মনে করা হয়। যদিও বংশগত ব্যাধির মূল সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন করা কঠিন, তথাপি তার কারণ ও উত্তরাধিকার সূত্র জানা থাকলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাধিকে বশে আনা বা তার আবির্ভাবকে রোধ করা সম্ভব। বর্তমান প্রবন্ধে তিনটি বিপাক-বিশৃঙ্খলাজনিত বংশগত ব্যাধির কারণ, উত্তরাধিকার-সূত্র ও নিরাময়ের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

আমরা যে সব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি, তা নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিপক্ক হয়। এই পরিপাকের মূলে আছে অসংখ্য প্রকার এনজাইমের সুসম্বদ্ধ কার্যকারিতা। রাসায়নিক ভাষায় এনজাইমকে জৈব অনুঘটক বলে। এরা নিজেরা অপরিবর্তিত থেকে দেহের যাবতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। জটিল ও অতিকায় অণুবিশিষ্ট পদার্থ ভেঙে সরল অণুবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত করতে অনেক সময় অনেক প্রকার এনজাইমের প্রয়োজন হয় এবং তাদের যে কোন একটির অভাবে শ্রেণীবদ্ধ বিপাকে বিভ্রাট ঘটে। ধরা যাক, 'ক' এনজাইম A পদার্থ থেকে B পদার্থ সংশ্লেষিত করে, 'খ' এনজাইম B পদার্থ থেকে C পদার্থ এবং 'গ' এনজাইম C পদার্থ থেকে D পদার্থ সংশ্লেষিত করে। শরীরে যদি 'ক' এনজাইম না থাকে, তাহলে A পদার্থ থেকে B পদার্থ সৃষ্টি হতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং শরীরে A পদার্থের আধিক্য দেখা যায় অথবা অন্য কোন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এভাবে 'খ' ও 'গ' এনজাইম না থাকলে B থেকে C এবং C থেকে D পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে না। A থেকে D পদার্থে রূপান্তরিত হতে সব রকম এনজাইমের প্রয়োজন। কোন একটা এনজাইমের অভাবে শ্রেণীবদ্ধ বিপাক-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; ফলে নানারকম ব্যাধির উৎপত্তি ঘটে এবং তাদের লক্ষণ বংশানুক্রমিকভাবে সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রকাশ পেতে দেখা যায়।

ফেনিল কেটোনুরিয়া (Phenylketonuria)

ফেনিল কেটোনুরিয়া একটি বিপাক-বিশৃঙ্খলা-জনিত বংশগত ব্যাধি। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে নরওয়ের একজন ডাক্তার এই রোগ প্রথম আবিষ্কার করেন। কোন কোন মানুষের যকৃতে ফেনিল অ্যালেনিন হাইড্রোক্সিলেজ নামে এক এনজাইম না থাকায় প্রোটিন খাদ্যে অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতিতে যে ফেনিল অ্যালেনিন অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, তা টাইরোসিন অ্যামিনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হতে পারে না; ফলে রক্তে ফেনিল অ্যালেনিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিছু পরিমাণ ফেনিল অ্যালেনিন পরে ফেনিল পাইরুভিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। দু-এক ফোঁটা ফেরিক ক্লোরাইড সলিউশন দিলে প্রস্রাবের রং যদি সবুজ হয়, তাহলে তাতে এই অ্যাসিডের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। এই পরীক্ষার দ্বারা সাধারণতঃ ফেনিল কেটোনুরিয়া রোগ নির্ণয় করা হয়। রক্তে ফেনিল এলেনিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে স্নায়ুতন্ত্রে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়—ফলে বুদ্ধিহীনতা বা মস্তিষ্কবিকৃতির উপসর্গ দেখা যায়। ফেনিল কেটোনুরিয়া রোগগ্রস্ত সন্তানদের চুলের রং

কটা ও পাতলা হয়ে পড়ে। তারা সাধারণতঃ দেখতে বেঁটে হয় এবং তাদের মাথার আকৃতি ঈষৎ ছোট হয়ে থাকে।

বর্তমানে জৈব রসায়নের উন্নতির ফলে ফেনিল কেটোহুরিয়া রোগকে কিছুটা আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে। যে সব খাদ্যে ফেনিল অ্যালেনিনের পরিমাণ কম থাকে (যেমন—দুধ, শাকসব্জী ও ডাল জাতীয় খাদ্য), সেগুলি যদি রোগীকে অনেক দিন ধরে খাওয়ানো যায়, তাহলে ফেনিল কেটোহুরিয়া রোগের উপশম হয়ে থাকে। শৈশব অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে রোগের আরোগ্যে আশা করা যায়। বেশী বয়সে চিকিৎসা আরম্ভ করলে উপযুক্ত ফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। কোন দম্পতির কোন একটি সন্তানে এই জাতীয় রোগ দেখা গেলে তাদের পরবর্তী সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার তিন সপ্তাহের মধ্যেই তার প্রস্রাব পরীক্ষা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

ফেনিল কেটোহুরিয়া রোগ প্রচ্ছন্ন (Recessive) জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রতি পঁচিশ হাজার ব্যক্তির মধ্যে একজনের ফেনিল কেটোহুরিয়া রোগের লক্ষণ দেখা যায় এবং প্রতি আশী জনের মধ্যে এক জন এই রোগের জিন প্রচ্ছন্নভাবে বহন করে। রক্ত-পরীক্ষার সাহায্যে রোগের বাহককে সনাক্ত করা সম্ভব। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রোগগ্রস্ত হলে তাদের যাবতীয় সন্ততির মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু এক জন রোগগ্রস্ত ও অপর জন রোগের বাহক হলে, তাদের অর্ধেক সন্ততির মধ্যেরোগের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এই রোগের বাহক হলে, তাদের এক চতুর্থাংশ সন্ততি রোগগ্রস্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

অ্যালকাপ্‌টোনুরিয়া (Alkaptonuria)

গ্যারোড নামে একজন ইংরেজ চিকিৎসক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বংশগত অ্যালকাপ্‌টোহুরিয়া রোগের কথা প্রথম উল্লেখ করেন। প্রোটিন খাদ্যে যে ফেনিল অ্যালেনিন ও টাইরোসিন অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, তা পাকস্থলীতে গিয়ে স্বাভাবিক-ভাবে ভেঙ্গে গিয়ে হোমোজেনটাইসিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। সুস্থ ব্যক্তির যকৃতে হোমো-জেনটাইসিক অ্যাসিড অক্সিডেজ নামে এক প্রকার এনজাইম থাকায় অ্যাসিড ভেঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলে রূপান্তরিত হয়। যদি কোন ব্যক্তির যকৃতে এই বিশেষ ধরণের এনজাইম না থাকে, তাহলে হোমোজেন-টাইসিক অ্যাসিডের বিপাক ব্যাহত হয়। এই অ্যাসিড প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হয় এবং বাতাসে অক্সিজেনের সংস্পর্শে কালো রং ধারণ করে। শিশুদের প্রস্রাবে ভেজা কাঁথা বাতাসের সংস্পর্শে যদি কালো হয়ে ওঠে, তখন তাকে রোগগ্রস্ত বলে সন্দেহ করা হয়। প্রস্রাবে অ্যাসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও রক্তে তার আধিক্য দেখা যায় না। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দাঁতের মাংসপেশী ও কানের কার্টিলেজ কালো হতে থাকে এবং অস্টিও-আরথ্রাইটিসের (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থলে ব্যথা) লক্ষণ দেখা দেয়। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। আধুনিক চিকিৎসার সাহায্যে কার্টিলেজের স্বাভাবিক বর্ণ পুনরুদ্ধার এবং আরথ্রাইটিসের ব্যথা দূরীভূত করা সম্ভব।

অ্যালকাপ্‌টোহুরিয়া রোগ প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে সব সন্তান পিতামাতা উভয়ের নিকট থেকে এই রোগের জিন লাভ করে, তাদের মধ্যে রোগের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। প্রতি দশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক জনের অ্যালকাপ্‌-টোহুরিয়া রোগের লক্ষণ দেখা যায় এবং প্রতি পাঁচ শ' জনের মধ্যে এক জন এই রোগের জিন প্রচ্ছন্নভাবে বহন করে থাকে। কিন্তু এই রোগের বাহককে সনাক্ত করবার পন্থা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি।

গ্যালাক্টোসিমিয়া (Galactosaemia)

ফেনিল কেটোহুরিয়া ও অ্যালকাপ্টোহুরিয়ার মত গ্যালাক্টোসিমিয়া একটি বিপাক-বিশৃঙ্খলাজনিত বংশগত ব্যাধি। যে সব শিশু গ্যালাক্টোসিমিয়া ব্যাধিতে ভুগে থাকে, তারা দুধ হজম করতে পারে না। দুধে যে ল্যাক্টোজ থাকে, তা প্রথমে গ্যালাক্টোজ এবং পরে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। রোগগ্রস্ত শিশুর যকৃতে এক বিশেষ এনজাইমের অভাবে গ্যালাক্টোজ গ্লুকোজে পরিণত হয় না; ফলে রক্তে গ্যালাক্টোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই ধরণের বিপাক-বিশৃঙ্খলায় শিশুদের লিভার ও মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অকাল মৃত্যু ঘটাও অস্বাভাবিক নয়।

গ্যালাক্টোসিমিয়া রোগগ্রস্ত শিশুদের যদি সাধারণ দুধের পরিবর্তে বিশেষভাবে প্রস্তুত ল্যাক্টোজবিহীন কিন্তু গ্লুকোজ সমন্বিত দুধ দেওয়া যায় অথবা তাদের খাদ্য-তালিকা থেকে দুধ বাদ দেওয়া হয়, তাহলে তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তানে পরিণত হয়। শৈশব থেকে এই রোগের চিকিৎসা বাঞ্ছনীয়। যদি একবার স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তবে পরবর্তী কালে চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। রোগ নিরাময় হলেও এনজাইমের অভাব সারা-জীবন থেকে যায় এবং গ্যালাক্টোজ সমন্বিত খাদ্য গ্রহণে এই রোগের পুনরাবির্ভাব হবার সম্ভাবনা থাকে।

রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে রোগের বাহককে সনাক্ত করা যায়। স্বামী স্ত্রী উভয়েই যদি রোগের জিন প্রচ্ছন্নভাবে বহন করে, তাহলে তাদের এক চতুর্থাংশ সন্তান-সন্ততির মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিপাক-বিশৃঙ্খলাজনিত বংশগত ব্যাধির মূল উচ্ছেদ করবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে নানারকম পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে। অস্ত্রোপচারের সাহায্যে রোগগ্রস্ত মানুষের যকৃৎ অপসারণ করে সুস্থ যকৃৎ প্রতিস্থাপন করা যায় কিনা অথবা মানুষের শরীরে যে এনজাইমের অভাবে বিপাক-প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়, সেক্ষেত্রে কৃত্রিম এনজাইম প্রয়োগ করে সুবিধা হয় কিনা—সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করছেন। বংশগত ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে তাঁরা আজ যা চিন্তা করছেন, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তা বাস্তবে রূপায়িত হবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

পশ্চিম বাংলার অপরাধ-জগতের ভাষা প্রসঙ্গে

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

পশ্চিম বাংলার অপভাষা বা অপরাধ-জগতের ভাষা সম্পর্কে চূড়ান্ত ধারণা করতে হলে এই রাজ্যের অপরাধ-জগৎ এবং অপরাধীদের কর্ম-পদ্ধতি জানা প্রথম প্রয়োজন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ইত্যাদি মানব-জীবনের নানাদিক ঘিরে রয়েছে তার ভাষা কোন সমাজের ভাষা নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার অর্থ হলো, সেই সমাজের এসব দিকগুলির সঙ্গে অল্প বিস্তর পরিচিত হওয়া।

আমাদের দেশে অপরাধ-জগতের ভাষা নিয়ে অতীতে কোন আলোচনা হয় নি। কখনো কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয় নি। তবে একমাত্র W. H. Sleeman তাঁর "Ramaseeana or A vocabulary of the peculiar language used by the Thugs (1836)" গ্রন্থে ঠগীদের শব্দ সংকলন করেছিলেন। এ গ্রন্থে ছিল কেবল মাত্র শব্দ সংকলন, যা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার আওতায় আসে না। শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে এই কাজ করা হয়েছিল। অপভাষার উপর ভারতবর্ষে এ-পর্যন্ত কোন গবেষণা হয় নি। জ্ঞানের বিভিন্ন দিক —ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি অপভাষার আলোচনার দ্বারা উপকৃত হতে পারে বলে মনে হয়। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্য অন্যান্য শাখা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারে।

সামাজিক বিবর্তন হচ্ছে জীবনের লক্ষণ, সমাজের অতীতের মানচিত্র বর্তমানের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে; অপরাধ-জগতের চেহারাও অতীতে যা ছিল, বর্তমানে তা আর নেই। স্লীমানের গ্রন্থে পাই, ঠগীরা লুঠ করবার পূর্বে প্রতারিত ব্যক্তিকে হত্যা করতো; বর্তমানে খুন-জখম না করে অপহরণ করবার দিকে লক্ষ্য, কারণ খুন প্রভৃতিতে বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় প্রচুর। তাছাড়া, কলকারখানা, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা ইত্যাদির প্রসারের ফলে অপরাধ-পদ্ধতিরও পরি-বর্তন ঘটেছে। পদ্ধতির পরিবর্তন এনে দিল ভাষার পরিবর্তন। তাই মনে হয়, একটি দেশের বা জাতির অপরাধ-তত্ত্বের ইতিহাস ওই জাতির সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের এক অংশকে উদ্‌ঘাটিত করে। আলো এবং আঁধার নিয়ে যেমন দিন, তেমনি সমাজ-জীবনেরও দুটি দিক রয়েছে—একটি অপরটির দ্বারা পারস্পরিক প্রভাবিত হচ্ছে, আর এই মসিমাখা দিকটির সঙ্গে ঠিকমত পরিচয় না থাকলে আলো কতটুকু পাচ্ছি, তা বুঝে ওঠা সম্ভব হবে না। অজানা রাজ্য থেকে ক্রমাগত আক্রমণ আসছে, আর সে আক্রমণ প্রতিহত করবার একমাত্র উপায় হলো অন্ধকারের পরিধি ধীরে ধীরে কমিয়ে আনবার চেষ্টা করা। এহেন গুরু দায়িত্বের ভার রয়েছে সমাজ-বিজ্ঞানীদের উপর। এই সম্পর্কীয় গবেষণায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সাহায্য করতে পারে। ভাষাতত্ত্ব তারই একটি শাখা মাত্র।

অপরাধ-জগতের ভাষাকে দুই অংশে ভাগ করা যেতে পারে:

(১) এক অংশে রয়েছে একান্ত গোপনীয় শব্দভাণ্ডার, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অপরাধমূলক কার্যকলাপের পদ্ধতি; যেমন, নস্তাই: ছিনিয়ে নেওয়া। পাকা ঢোল: লোহার আলমারি। কাঁচা ঢোল: কাঠের আলমারি, বাক্স। গব্বা ভরা: জুয়াখেলার জন্যে কোন ঘর ভাড়া দেওয়া।

(২) অপর অংশ সাধারণ্যে ব্যবহৃত হয়; যেমন, গরম : মাতাল। গল্‌তা : গলি, আড্ডা। ছপ্পর : ছাতা, লুকানো। টানা : চুম্বন। ডিমা, ডিমু : ইট-পাটকেল।

অপশব্দের গঠন-প্রণালীর ধরণ মোটামুটি এই প্রকার :

(ক) একটি চলিত শব্দকে ভেঙেচুড়ে নতুন রূপ দেওয়া; যেমন, সোটাম : বোতাম। থাম : মেয়েদের উরু (—থাম)। খেচকি : রেজকি।

(খ) অর্থান্তর ঘটানো; যেমন, পেটো : হাতবোমা। বেনী : স্ত্রীলোক। ডাব : মেয়েদের কোমর। ডিম : বিজলী বাতি।

(গ) কখনো কখনো সম্পূর্ণ মনগড়া শব্দ তৈরি করা হয়, যার বুৎপত্তি নির্ণয় করা সম্ভব নয়; যেমন, ইগানি : গরুচোর। আচ্‌কি : ইলেকট্রিক পাখা।

বাঙালী অপভাষীরা বাংলাদেশের নানা স্থান থেকে আসে; বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষার প্রভাব পড়েছে অপভাষার উপর। পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তদের মধ্য থেকেও কিছু লোক এসেছে পশ্চিম বাংলার অপরাধ-জগতে। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে আসে হিন্দী ভাষীরা।

অপরাধী এবং অপরাধ-প্রবণ মানুষেরা অশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত। সন্ধান করলে দুচার জন 'শিক্ষিত' বা 'উচ্চশিক্ষিত'ও পাওয়া বিচিত্র নয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষীর সমবেত চেষ্টায় পশ্চিম বাংলার অপরাধ-জগতে একটি মিশ্র ভাষা এবং সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতা শহর এবং পশ্চিম বাংলার শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলি ভারতের নানা রাজ্যের অপরাধীদের আকর্ষণ করছে। সেই কারণে বাংলা দেশের অপভাষা গবেষণার দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান। অপভাষা এক ধরণের কৃত্রিম কথ্যভাষা, ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী থেকে এর জন্ম, যদিও যে কোন সাধারণ ভাষার গতিও প্রায় একই ভাবে চলে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে, ভাষার বিবর্তনের মতই অপভাষার বিবর্তন অনেক সময়ে একই আইনের দ্বারা চালিত হয়।

অপভাষা গঠনের পিছনে মানুষের মন নানা ভাবে কাজ করে চলেছে। ভয়, অবিশ্বাস, বিবাদ, হাসিঠাট্টা নানা কারণ রয়েছে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টির পিছনে। চোর, ডাকাত, পকেটমার প্রভৃতি পেশাদার অপরাধীদের মনে যদি এই ধারণা জন্মায় যে, তাদের গোপন শব্দের অর্থ সাধারণ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তবে তৎক্ষণাৎ পুরনো শব্দটি ত্যাগ করে তার জায়গায় একটি নতুন শব্দ গ্রহণ করবে। তাছাড়া একই শব্দ কিছু দিন চলন থাকবার পর তার বৈচিত্র্য হ্রাস পায়, মন চায় পুরনো শব্দটি ত্যাগ করে একটি নতুন শব্দ পেতে। এজন্যে অপরাধ-জগতে দেখি প্রতিশব্দের ছড়াছড়ি; যেমন, হাতবোমার প্রতিশব্দ হচ্ছে : অণ্ডা, আম, আলু, কদমা, গন্দা, গুলগুলিয়া, গেণ্ডা, গেদা, গেনা, গিনি ইত্যাদি।

বাঙালীদের হাতে সৃষ্ট অপশব্দের নমুনা দেওয়া যায়—যেমন, অন্ধকার : অমাবস্যার রাত। পাপড়ি : ঠোঁট। খড়পা : চটিজুতা (—খড়ম পা)। গোরা : সুন্দরী মেয়ে।

বাংলা দেশের এবং বহিরাগত অবাঙালীদের হাতে গড়া শব্দ; যেমন, ধুর : প্রতারিত ব্যক্তি। কণ্ডা : জুয়ার আড্ডা, অজযানা : চুরির কাজ।

অপশব্দের শব্দভাণ্ডার থেকে কিছু শব্দ আহরণ করে দেখানো যেতে পারে যে, তাদের রূপের তারতম্য কেমনতরো হতে পারে।

ফার্সি শব্দ :—আওয়াজ : ছুরি। কুত্তো শরীরের পিছন দিক। চরসা : দোকান। চশমা আট।

আরবী :—খালাস : খুন। নগদী : টাকাকড়ি। নাকা : পকেট।

ইংরেজি :—বল : হাতবোমা ; মদের ব্লাডার। সিগারেট : ফাউন্টেন পেন। লাভ : মেয়েদের ঠোঁট। পিস্তল : সাত টাকা।

মিশ্র শব্দ :—বাংলা+ইংরেজি : চোখবল : গাড়ীর হেডলাইট। তিনফি : তিনটাকা। চাকার লাইন : রেল লাইন।

বাংলা+হিন্দী : নীচুকামাল : নীচের পকেটের টাকা পয়সা।

ইংরেজী+বাংলা : ডবলটোন : একজোড়া ছেলেমেয়ে (– – তূণ)। ব্যাণ্ডেল দেয়া : ধাপ্পা দেওয়া (–bunlle)।

ইংরেজী শব্দের ধ্বনি বিকৃতি :—এণ্টি : চোলাই মদ (anti)। কচ : টর্চ (=টর্চ>টচ> কচ)। কল্লা : বোতাম (collar)। কাপ্ত : ধরা পড়া (captured)। বাতলি; সোডার বোতল।

অনুকার শব্দ—: ইপ্নে উপ্নে : এধার ওধার। খাট্টাস : টাইপের যন্ত্র। খিল্লি খাওয়া : হেসে খল খল। চুম্‌কি : ঘুঙুর। ঝনা : বাসনকোসন (ঝঙ্কার)। ঝাঁত্ত : কুকুর। ঝিরি : বর্ষার রাত। ঠাকু : দরোয়ান।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অপরাধ-জগতের মানুষের মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য লক্ষ্য করা যায়, তা যে কত বিস্ময় জাগায় আলোচ্য উদাহরণগুলি তার প্রমাণ দেবে।

অন্ধেরা : অমাবস্যার রাত; E. S.[1] darks ; রাত। আঁখ : চশমা ; G.S.[2] Akh ঐ। আগুন : পিস্তল ; F. S.[3] feu : ঐ। ওঠা : ঘর ; G. S. Absleige : ঐ। কাঁকন : হাতকড়া ; E. S. bracelets : ঐ। কুপিয়া : জেলের মধ্যে সেল ; E. S. can : ঐ। চাপ : পুলিশী তদন্ত ; E. S. pressure : ঐ। দৃষ্টি : চোখ ; E. S. sights : ঐ। বাঁধাকপি : মাথা ; F. S. chou : মাথা। মাছি : পুলিশ ; F. S. mouche : ঐ ; J. S.[4] hachi (মাছি) : ঐ। ঘটক : যে লোক মেয়ে কেনাবেচায় সাহায্য করে ; G. S. Ammenmacher : ঐ। খরচা : ধরা পড়া ; J. S. son-o-suru (খরচা) : ঐ।

1. E. S.=English Slang. 2. G. S. =German Slang. 3. F. S.=French Slang. 4. J. S.=Japanese Slang.

ভাসমান পৃথিবী

শ্রীশিবনাথ মিত্র

এই পৃথিবী সম্বন্ধে কতটুকুই বা আমরা জানি! অতীতের পৃথিবী নিত্য নতুন কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের রূপ ধারণ করেছে এবং ভবিষ্যতে কি রূপ ধারণ করবে, তার সঠিক অনুমান করা কঠিন। আজকের পৃথিবীর সঙ্গে বিগত পৃথিবীর ছিল অনেক তফাৎ। আজ যেখানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা হিমালয় অবস্থিত, অতীতে সেখানে ছিল টেথিস সমুদ্র। পুরাতন সজ্জা ত্যাগ করে পৃথিবী নবরূপে ভূষিত করেছে নিজেকে, কিন্তু এই রূপও তার পছন্দ নয়। নিজেকে অজানা বেশে সজ্জিত করবার জন্যে সে সদা প্রয়াসী। কিন্তু কেন তার এই অভিলাষ?

আজও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে পরিবর্তনশীল ইচ্ছার প্রকাশ ধরা পড়ছে। মস্কো ও লেলিনগ্র্যাড সহর বছরে ৩·৭ মি. মি. অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভারতবর্ষের মাদ্রাজ সহর প্রতি বছর ১·২ মি মি. করে বসে যাচ্ছে। অপর দিকে দেখা যায়, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া সহর প্রতি ১০০ বছরে ১ মিটার করে উপরের দিকে উঠছে। এই অলঙ্কার পরিবর্তনের কারণ কি?

ভূ-বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থবিদ্যার সাহায্যে এর কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

ভূ-বৈজ্ঞানিকদের মতে, পাহাড়-পর্বত, নদী, উপত্যকা, সমতল ভূমি সব কিছুই পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত গলিত পদার্থের উপর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। কাঠ যেমন জলের উপর ভাসে, সেই রকম পৃথিবীর বহিরাংশ, অভ্যন্তরে অবস্থিত কঠিন ঘনাঙ্কবিশিষ্ট পদার্থের উপর ভাসছে। কতকগুলি বিভিন্ন মাপের কাঠের টুক্‌রা জলের মধ্যে ফেলে দিলে দেখা যাবে, কতকগুলি টুক্‌রার জলের উপরকার অংশ অন্যগুলির চেয়ে বেশী, কিন্তু কোন অংশই সমান নয়। যে টুক্‌রাটির জলের উপরে অবস্থিত অংশ সবচেয়ে বেশী, অর্থাৎ জলের উপর বেশী মাথা উঁচু করে ভাসছে, তার জলের তলার অংশটিও তত বেশী। জলের উপর যেটির খুব অল্প অংশ রয়েছে, জলের নীচেও তার অল্প অংশ নিমজ্জিত। ঠিক এই রকম ব্যাপার ঘটে পৃথিবীর ক্ষেত্রে। যেখানে সুউচ্চ পর্বতমালা অবস্থিত, তার নীচের অংশও বহুদূর পর্যন্ত ভূ-নিম্নে প্রবেশ করেছে। সমতল ভূমির ক্ষেত্রে এই প্রবেশ অল্প। কাঠের টুক্‌রার সময় যেমন জলতলকে কাঠের টুক্‌রার জলের উপরের অংশ এবং নীচের অংশ মাপের মধ্যক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, সেই রকম পৃথিবীর মধ্যক হিসাবে সমুদ্র-জলতলকে কাজে লাগানো হয়। কোন বস্তুর সমুদ্র-জলতলের উপর অংশ যত উঁচু হবে, ভূ-নিম্নে অবস্থিত অংশটিও তার তত বেশী হবে।

১৮৮৫ সালে ভূ-বৈজ্ঞানিক এয়ারি ধারণা করেছিলেন যে, সমস্ত মহাদেশ একই ঘনাঙ্কের পাথরের দ্বারা তৈরি এবং এই মহাদেশগুলি উচ্চ ঘনাঙ্কবিশিষ্ট গলিত পাথরের উপর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। বরফখণ্ড যেমন জলের উপর ভাসে, ঠিক সেই রকম এই মহাদেশগুলিও ভাসছে।

এই ধারণার ৪ বছর পরে ভূ-বৈজ্ঞানিক প্র্যাট (Pratt), এয়ারির ধারণার কিছু পরিবর্তন করেছিলেন। তাঁর মতে, মহাদেশগুলির তল সমান, কিন্তু তাদের ঘনাঙ্ক ও আয়তন সমান নয়।

এই সমস্তরের মহাদেশগুলি উচ্চ ঘনাঙ্কবিশিষ্ট পদার্থের উপর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে এবং এই গলিত তলের উপরে অবস্থিত ভাসমান অংশ তার ঘনাঙ্কের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক (Inversely proportional) অর্থাৎ বেশী ঘনাঙ্কসম্পন্ন বস্তু গলিত তলের উপর অল্প উঁচু হয়ে ভাসবে।

এই ধারণা থেকে বোঝা যায়, পর্বতমালা যে পাথরের দ্বারা তৈরি তার ঘনাঙ্ক সমুদ্রতল যে পাথর বা বস্তুর দ্বারা গঠিত, তার ঘনাঙ্কের চেয়ে অনেক কম। এই জন্যে পর্বতমালা এত উঁচু হয়ে সমচাপসম্পন্ন তলের উপর ভাসছে। এই ভাসমান অবস্থায় তার একটা সাম্য বজায় রেখেছে, নতুবা ধ্বংস ও ক্ষয়ের তাণ্ডবলীলা দেখতে পেতাম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে—পর্বত, নদী, সমুদ্র সবই গলিত পদার্থের উপর ভাসছে এবং সাম্যাবস্থায় রয়েছে। প্রত্যেক ভাসমান পদার্থ এমন এক অবস্থায় পৌঁছুবে, যখন তার উচ্চ চাপ ও নিম্ন চাপ সমান হবে। এই অবস্থাকে সমচাপ-সম্পন্ন অবস্থা বলা হয়। পৃথিবীর সব অঞ্চলই এই সমচাপসম্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু যদি এই সমচাপসম্পন্ন অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে, তবে সেই পরিবর্তিত পদার্থ পুনরায় সমচাপ-সম্পন্ন অবস্থায় ফিরে আসতে চেষ্টা করবে। তার ফলে সে যে কোন প্রকারেই হোক, তার অবাঞ্ছিত অবস্থার লাঘব করবে। ভাসমান তা সূত্রের নিয়ম অনুসারে কোন ভাসমান পদার্থের উপর চাপ প্রয়োগ করলে বা তার আয়তনের পরিবর্তন হলে, সেই পদার্থের সমান আয়তনের তরল বা গলিত বস্তু অপসারিত হবে। কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই চাপের পরিবর্তন কিরূপে হতে পারে?

যদি কোন অঞ্চলে স্তরীভূত শিলা জমে উচ্চ ভূমির সৃষ্টি করে অথবা বরফ জমতে সুরু করে বা ঐ অঞ্চল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন পূর্বাবস্থার মত উচ্চ ও নিম্ন আঞ্চলিক চাপ নিশ্চয়ই সমান হবে না, ঐ সমচাপসম্পন্ন তলের অদল-বদল হবে। কারণ নবসৃষ্ট অঞ্চলের চাপ পূর্বচাপের সমান হবে না। যেমন—ধরা যাক, এক জায়গায় বরফ জমতে সুরু করলো। সেই জমার কাজ বছরের পর বছর চলতে থাকলো। ফলে সেই জায়গার আঞ্চলিক চাপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেল। চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গা ধীরে ধীরে বসে যেতে লাগলো। জলের উপর ভাসমান কাঠের টুক্‌রার উপর চাপ দিলে সেই টুক্‌রাটি যেমন ধীরে ধীরে চাপের অনুপাতে ডুবে যায়, ঠিক সেভাবেই বরফ-জমা জায়গাটাও ডুবে যেতে থাকবে। এভাবে ডুবে যাওয়ার ফলে ভূগর্ভস্থ গলিত পদার্থের উপর চাপ পড়বে। কারণ আর্কিমিডিসের সূত্র অনুসারে নিমজ্জিত বস্তুটির আয়তন যত হবে, ঠিক সেই পরিমাণ গলিত পদার্থ অপসারিত করবে। এই অপসারণের ফলে গলিত পদার্থের উপর যে পার্শ্বচাপ পড়বে। সেই চাপ তরল পদার্থ বহন করে নিয়ে যাবে এবং বহুদূরবর্তী বা নিকটবর্তী কোন জায়গার তলায় সেই চাপ প্রয়োগ করবে। কোন ভাসমান বস্তুর তলদেশ থেকে ঊর্ধ্বচাপ প্রয়োগ করলে, সেই বস্তুটি নিশ্চয়ই উপরের দিকে উঠতে থাকবে। পৃথিবীর ক্ষেত্রেও তাই হয়। ফলে অঘটন ঘটে—হঠাৎ দেখা যায়, কোন দেশ আস্তে আস্তে উপরে উঠছে আবার কোন দেশ নীচে নেমে যাচ্ছে। যে জায়গায় বরফ জমে ছিল, কয়েক কোটি বছর পরে সেই বরফ যদি গলতে সুরু করে, তখন নিশ্চয়ই চাপ হ্রাসের ফলে সেই জায়গা আবার উপরে উঠতে সুরু করবে—যেমন উপরে উঠতে সুরু করে কাঠের টুক্‌রাটি। ফলে দেখা যায়, যে দেশ ছিল নীচু, সেই দেশ আস্তে আস্তে মাথা উঁচু করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে,

বর্তমানের ক্যাণ্ডিনেভিয়া দেশটির কথা। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন, এই দেশ আগে বিশাল বরফস্তূপে আবৃত ছিল। সেই বরফ গলে যাবার ফলে দেশটি উপরে উঠছে। এই ওঠবার গতি ১ মিটার প্রতি ১০০ বছরে। সুতরাং কোন মানুষের পক্ষে এটা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়, কেবল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যেই এটি ধরা পড়ে। পৃথিবীর সর্বত্রই এই ওঠা-নামার কাজ চলছে। কিন্তু আমরা কয়জনেই বা তার হিসাব রাখি?

সঞ্চয়ন

সমুদ্রের গভীরে খাদ্য ও খনিজ সম্পদের সন্ধান

বিশ্বের মহাদেশসমূহের উপকূলের নিকটবর্তী সমুদ্র অঞ্চল খাদ্য ও খনিজ সম্পদে খুবই সমৃদ্ধ। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সমগ্র বিশ্ববাসীর যে পরিমাণ প্রোটিন খাদ্যের প্রয়োজন, তার শতকরা ৮৫ ভাগই ঐ অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। পৃথিবীর সমুদ্রতলবর্তী এলাকার ঐ অঞ্চল হচ্ছে ১৪ শতাংশ এবং ঐ এলাকাটি প্রায় সমগ্র আফ্রিকার সমান। ঐ অঞ্চলে নানা প্রকার মাছ এবং সামুদ্রিক গাছ-গাছড়া প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তাছাড়া আছে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়াম এবং নানা রকম ধাতব সম্পদ।

ঐ এলাকা সম্পর্কে তথ্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে গত বছর আমেরিকার ২৮ জন তথ্যসন্ধানী দ্বিতীয় সীল্যাব নামে একটি সামুদ্রিক তথ্য-সন্ধানী জাহাজে সমুদ্রের ২০৫ ফুট নীচে ৪৫ দিন কাটিয়ে এসেছেন। তাঁরা ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের স্যানডিয়াগোর নিকটস্থ সমুদ্র-অঞ্চলে। বিজ্ঞানীরা ঐ এলাকাটি তথ্য সংগ্রহের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন। কারণ ঐ এলাকার সমুদ্রতল নানা রকম আঠালো ধাতব দ্রব্যে পরিপূর্ণ। আর সামান্যতম স্পর্শেই সেখানে এই পরিমাণ বুদ্বুদ উঠতে থাকে যে, তথ্যসন্ধানীর পক্ষে ৫-৬ ইঞ্চি দূরের কোন কিছু দেখা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ঐ অঞ্চলের জলের তাপমাত্রাও খুবই কম—৪৯ থেকে ৫১ ডিগ্রী ফারেনহাইটের কাছাকাছি। এই ঠাণ্ডা থেকে ডুবুরীদের আত্মরক্ষা করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাপ-নিয়ন্ত্রিত ঐ সীল্যাব নামক জাহাজে ২৮ জন তথ্যসন্ধানী তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে মোট ৪৫ দিন সমুদ্রের নীচে ছিলেন। সামুদ্রিক জীবজন্তু গাছ-গাছড়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং জাহাজ বা জাহাজের লোকজনকে সঙ্কট থেকে রক্ষা করবার কৌশল সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে তারা মাঝে মাঝে সীল্যাবের বাইরে এসেও কাটিয়েছেন। সুদীর্ঘ কাল সমুদ্র-গর্ভে অবস্থান করবার মত তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে কি না, তারও পরীক্ষা হয়েছে। অতি উচ্চ চাপের মধ্যে ও বিরুদ্ধ পরিবেশে তাদের কাটাতে হয়েছে। এর পরে আরও উন্নত ধরণের সীল্যাবের সাহায্যে উপকূলের নিকটবর্তী সমুদ্রের আরও গভীরে ৬০০ থেকে ৮০০ ফুট নীচে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এর পরেই সমুদ্র অতল গভীরতায় নেমে গিয়েছে।

এর আগে প্রথম সীল্যাব নামে ঐ ধরণের আর একটি জাহাজ কিছুদিন পূর্বে সমুদ্রের গভীরে প্রেরণ করা হয়েছিল। ঐ জাহাজের

সাহায্যে বিজ্ঞানীরা বারমুডার নিকটবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের ১৯৩ ফুট নীচে ১১ দিন অবস্থান করে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

দ্বিতীয় সীল্যাব দেখতে অনেকটা সাবমেরিন ও বড় চোঙের মত—তবে এর কোন ইঞ্জিন নেই। সমুদ্রের উপরিস্থিত একটি জাহাজ থেকে এই সীল্যাবকে ২০৫ ফুট জলের নীচে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং দড়িদড়ার সাহায্যে জাহাজের সঙ্গে সীল্যাবের যোগাযোগ থাকে। এটি লম্বায় ৫৭ ফুট এবং প্রস্থে ১২ ফুট। প্রতি বর্গইঞ্চিতে যাতে ১২৫ পাউণ্ড পর্যন্ত চাপ সহ্য করতে পারে, সেভাবেই এটি তৈরি হয়েছে। এর তাপমাত্রা ৮০ থেকে ৯০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের মধ্যে রাখা হয় আর আর্দ্রতা থাকে ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশের মধ্যে।

সীল্যাবের ভিতরের বাতাস অক্সিজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের মিশ্রণে তৈরি এবং এর চাপ সমুদ্রের উপরিস্থিত চাপের সমমাত্রায়ই রাখা হয়। তথ্যসন্ধানীরা একটি বিশেষ ধরণের ক্যাপসুলের মধ্যে থেকে সীল্যাবে যাওয়া-আসা করেন। এই ক্যাপসুলটি চাপ ও তাপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষের মত। ডুবুরীদের পোষাকে সমুদ্রের গভীরে চাপ কমানো-বাড়ানোর যে বিপদ রয়েছে, সেই বিপদ এই ক্যাপসুলে নেই।

তথ্যসন্ধানীদের সমুদ্রের উপর থেকে ঐ সীল্যাবের দশ ফুটের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে সাঁতার দিয়ে তাঁরা সমুদ্রতলস্থিত ঐ সীল্যাবে উঠে আসেন। আর যাঁরা সমুদ্রতলের ঐ সীল্যাব থেকে উপরে উঠে আসতে চান, তাঁদের উপরিস্থিত ঐ জাহাজের ডেকে নিয়ে আসা হয় এবং ঐ ক্যাপসুলের চাপ কমিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়।

চিকিৎসকবর্গ ঐ সকল তথ্যসন্ধানীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বলেছেন যে, সমুদ্রতলে দীর্ঘকাল বিশেষ চাপ ও অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে থাকবার ফলে কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া তাঁদের মধ্যে দেখা যায় নি। তবে ঐ অতল জলে প্রথম যে তথ্যসন্ধানী দলটি গিয়েছিল, তাদের পরীক্ষা করে মনোবিজ্ঞানীরা কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন, সীল্যাবের মধ্যে যাবার পর তারা তো হেসেই অস্থির। ঐ আবহাওয়ায় ছিল অতিরিক্ত পরিমাণে হিলিয়াম। এ তারই প্রতিক্রিয়া, হিলিয়াম গলার স্বরেরও কিছুটা বিকৃতি ঘটায়। সমুদ্রতলে ঐ অবস্থায় থাকবার জন্যে যে আনন্দানুভূতি জাগে, তাতে তারা একে অন্যের কথা বুঝতে পারে নি, গলার আওয়াজও ঠিক ঠিক শুনতে পায় নি—তা শোনা যায় অনেকটা হাঁসের গলার শব্দের মত।

ঐ সীল্যাবের বাইরের দিকে সংলগ্ন একটি খাঁচা আছে। তথ্যসন্ধানীরা সমুদ্রতলে ঐ পরিবেশে যখন তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকেন, তখন সামুদ্রিক জীবজন্তু, হিংস্র মৎস্যকুল তাঁদের আক্রমণ করলে তাঁরা ঐ খাঁচায় আশ্রয় নিয়ে থাকেন। স্করপিয়ন ফিশ নামে এক ধরণের মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। এরা দেখতে ক্ষুদ্র, কিন্তু বিষাক্ত। দ্বিতীয় সীল্যাবের দু-জন তথ্যসন্ধানী এদের কামড় খেয়েছিলেন—এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন নৌবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ স্কট কার্পেন্টার। ১৯৬২ সালের মে মাসে ইনিই মহাকাশযানে তিনবার পৃথিবী পরিক্রমা করেছিলেন।

সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহও ...াবের অন্যতম কাজ। তবে সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানীরা সীল্যাবের দুটি দলের তথ্যসন্ধানীদের মাছ মারা নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কারণ তা মাছ সম্পর্কে পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের পরিপন্থী হতে পারে। কিন্তু তৃতীয় দলটিকে তাঁরা আর একপ নিষেধ করেন নি। তাঁরা তাঁদের শতকরা ৫০ ভাগ খাদ্য সমুদ্র থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন

বিশ্বের জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্যে বিশ্বের খাদ্য-বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের অফুরন্ত ভাণ্ডারকে অন্নাভাব মোচনে নিয়োগ করবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁদের ধারণা, সীল্যাবের সাহায্যে এরূপ তথ্যানুসন্ধান এই সমস্যা সমাধানে খুবই সহায়ক হতে পারে।

মহাকাশ পরিকল্পনা সংক্রান্ত গবেষণা

অনেকেই দাঁত বাঁধানোতে সোনা ও প্ল্যাটিনাম ব্যবহার করে থাকেন। এগুলি খুবই মূল্যবান ধাতু এবং এসব ধাতু দিয়ে দাঁত বাঁধানোতে খরচও বেশী পড়ে। রকেটে আজকাল এক ধরণের মিশ্র ধাতু ব্যবহৃত হয়—লোহা, ক্রোমিয়াম, নিকেল, টাইটেনিয়াম, সিলিকন এবং ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়েই এই ধাতুটি তৈরি হয়েছে। নিউইয়র্কে বর্তমানে অনেকেরই দাঁত বাঁধানোতে এই ধাতুটি ব্যবহৃত হচ্ছে। দামের দিক থেকে সোনা ও প্ল্যাটিনামের তুলনায় এই ধাতুটি অনেক সস্তা।

এই মিশ্র ধাতু ছাড়া তাপ-নি
এক ধরণের প্লাস্টিকের আচ্ছাদন, এক প্রকার অভিনব রং ও অন্যান্য নানা উপকরণ উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই রংটি অদ্ভুত ধরণের। তাপ প্রতিফলিত এবং আত্মসাৎ করবার জন্যে তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই রংটিও বদ্‌লাতে থাকে। যে রংটি সকালে দেখা গেল, দুপুরে আর সেটি দেখা যাবে না। ঘর ঠাণ্ডা বা গরম রাখবার জন্যে বাড়ী-ঘরের ছাদে এই রং ব্যবহৃত হতে পারে।

এক্স-১৫ নামে আমেরিকার একটি অতি-দ্রুতগামী পরীক্ষামূলক রকেট চালিত বিমানে এক ধরণের প্লাস্টিকের আচ্ছাদন ব্যবহৃত হয়। এই আচ্ছাদনের তাপমাত্রা একই অবস্থায় রাখা যায় এবং শিশুদের দোলনার ঢাকা হিসাবে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।

যুদ্ধোত্তর যুগে আমেরিকার মহাকাশ সংক্রান্ত তথ্যসন্ধানী পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে বিশ্বের জনসাধারণ উপকৃত হতে পারে, এই রকম আরও বহু প্রকার জিনিষই উদ্ভাবিত হয়েছে।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আবহাওয়া এবং অন্যান্য বিষয়ে তথ্যসন্ধানী কয়েক প্রকার উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করেছে। তাদের সাহায্যে সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির দ্বারাও মানবসমাজ উপকৃত হয়েছে। কিন্তু এই সকল পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে আরও যে বহু রকমের জিনিষ উদ্ভাবিত হয়েছে, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। শিল্প, ভেষজ-বিজ্ঞান, পরিবহন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে সেগুলি উল্লেখযোগ্য অবদান।

চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ কালে মহাকাশযানে যাতে কোন আঘাত না লাগে, সেই উদ্দেশ্যে মহাকাশযানে এক ধরণের অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি টিউব ব্যবহৃত হয়। এই টিউবগুলি 'শক প্রুফ' বা ধাক্কা-নিরোধক। আজকাল এই সকল টিউব লিফ্‌ট, বিমান এবং হেলিকপ্টারেও ব্যবহার করা হচ্ছে। জরুরী অবস্থায় এবং দ্রুত অবতরণ কালে বিমান, হেলিকপ্টার বা লিফ্‌টে যাতে কোন ধাক্কা না লাগে, দুর্ঘটনা না ঘটে, তারই উদ্দেশ্যে এসব টিউব ব্যবহার করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এসব টিউব মোটর গাড়ীতেও ব্যবহৃত হতে পারে।

তাপ-প্রতিরোধক যে সব ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম মহাকাশযানে থাকে, সেগুলি রেডিও

এবং টেলিভিশন সেটেও লাগানো যেতে পারে। এসব সেটে যে তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে, তা এই সরঞ্জামসমূহ প্রতিরোধ করতে পারে, ফলে সেটটির পরমায়ু অনেকখানি বেড়ে যেতে পারে। মহাকাশযাত্রীদের মহাকাশে অতিরিক্ত তাপ থেকে রক্ষা করবার জন্যেই এই সকল সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়।

মহাকাশযাত্রীরা বহুকাল যাতে মহাকাশে থাকতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের জন্যে এক প্রকার খাদ্যও উদ্ভাবিত হয়েছে। মরুভূমি এবং মেরু অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক তথ্যসন্ধানে নিযুক্ত বিজ্ঞানীদেরও এসব খাদ্য খুবই কাজে লাগবে। এই খাদ্য ওজনের দিক থেকে খুবই হাল্কা, আয়তনে খুবই ছোট, অল্প পরিসর স্থানেই এগুলিকে রাখা যায় এবং যে কোন তাপ-মাত্রায় অটুট ও অবিকৃত থাকে এবং পুষ্টিকর গুণেরও কোন পরিবর্তন ঘটে না।

এসব উপকরণ ছাড়া রকেটের জন্যে এক ধরণের অতি হাল্কা প্লাস্টিকও উদ্ভাবিত হয়েছে। সেগুলি রেলগাড়ীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ঐ প্লাস্টিকে তৈরি গাড়ীর ওজন হবে ইস্পাত-নির্মিত গাড়ীর অর্ধেক। তৈলশোধনাগারে ইস্পাত-নির্মিত ভাল্‌ব্‌ ব্যবহার করা হয়। টাইটেনিয়ামের এক ধরণের নতুন মিশ্রধাতু উদ্ভাবিত হয়েছে। এই ধাতুতে তৈরি ভাল্‌ব্‌ অনেক বেশী মজবুত ও কার্যকরী হবে এবং যে সকল রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে এলে ধাতু ক্ষয়ে যায়, তাদের মধ্যে রাখলেও এই ধাতুটি অটুটই থাকবে।

চন্দ্রলোকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। এটির নামকরণ করেছে 'লুনার ওয়াকার'। সমুদ্র-তীরের বালুকা উপরে এটি হেঁটে বেড়াতে পারবে, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারবে এবং মোড় ঘুরতে পারবে। ওয়াকিং চেয়ারের বদলে এটিকেও নানা কাজে লাগানো যেতে পারে।

এটি পঙ্গু, পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন রোগীদেরও বিশেষ কাজে লাগতে পারে; যেমন—তারা বই পড়ছে, কিন্তু বইয়ের পাতা ওল্টাতে পারছে না, বিছানায় শুয়ে থেকে ঘরের আলো জ্বালানো কি নেবানো, রেডিও বা টেলিভিশন সেট চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। মহাকাশযান সংক্রান্ত গবেষণার ফলে এক ধরণের সুইচ উদ্ভাবিত হয়েছে। ঐ সুইচের দিকে চাইলেই যে কাজের জন্যে যে সুইচটি রয়েছে, সেই কাজটি চালু হয়ে যায়—বিছানায় শুয়ে থেকে কেবল চোখ ঘুরানো-ফিরানোতেই সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আমেরিকার জনৈক ব্যবসায়ী চোখের দৃষ্টির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করবার এই সুইচ মোটর-চালিত হুইল চেয়ারে লাগিয়েছেন।

মহাকাশযান ও মহাকাশযানের যাত্রীরা যাতে এই পৃথিবী থেকে কোন রোগবীজাণু নিয়ে অন্য গ্রহকে সংক্রামিত না করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ধরণের রবার, প্লাস্টিক ও অন্যান্য উপকরণ তৈরি হয়েছে। এসব উপকরণ বর্তমানে শল্যচিকিৎসার দস্তানা প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মহাকাশযানের বৈদ্যুতিক ব্যাটারীতে এক ধরণের উপকরণ ব্যবহার করা হয়, যার জন্যে বহুদিন ঐ সকল ব্যাটারী থেকে আলো পাওয়া যায়। রূপা ও দস্তার যে সকল ব্যাটারী বর্তমানে চালু রয়েছে, তাদের তুলনায় ঐ সকল ব্যাটারীর পরমায়ু হবে পাঁচ থেকে ছয় গুণ বেশী।

মহাকাশযানের বিভিন্ন অংশ জুড়ে দেবার জন্যে যে উপকরণ ব্যবহৃত হয়, তা মেঝে অথবা ছাদে টালি লাগাবার কংক্রিট হিসাবে বা পিচের রাস্তাঘাট নির্মাণেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

মহাকাশযানগুলির মহাকাশ সফর শেষে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসবার সময়ে বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে যে অতিরিক্ত তাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেই তাপ প্রতিরোধের যে সব ব্যবস্থা ও উপকরণ উদ্ভাবিত হয়েছে, তাদের কয়েকটি সাংসারিক রান্নাবান্নার কাজে লাগতে পারে। রান্নার বাসনকোশনের উপর টিফ্লন নামে একটি জিনিষের প্রলেপ দিয়ে দিলে তাদের পরিষ্কার করবার কোন অসুবিধা হবে না।

মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণার ফলে উপজাত হিসাবে অসংখ্য রকমের উপকরণই পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে মাত্র কয়েকটির কথাই এখানে উল্লেখ করা হলো।

পুস্তক সংবাদ

শ্রীসুশীলকুমার দেব

The Peaceful Atom in Foreign Policy—Arnold Kramish (Student Edition), Published by Dell Publishing Co. Inc., 750 third Avenue, New York, N. Y. 10017.

মার্কিন পারমাণবিক অনুশাসন

আর্নল্ড ক্রামিসের এই নাতিবৃহৎ, ২৮৭ পৃষ্ঠার গ্রন্থখানি বিশেষ করে নব শিক্ষার্থীদের জন্যে লেখা। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, জীব-বিজ্ঞান, ভূ-বিদ্যা প্রভৃতির বিবরণ এতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাতে বর্ণনীয় বিষয় তিনটি ভাগে ও চৌদ্দটি অধ্যায়ে এবং ততোধিক প্রকরণে বিভক্ত হয়ে এমন পরিপাটিরূপে পারমাণবিক বিজ্ঞানের তাৎপর্য বোঝাতে সহায়ক হয়েছে যে, বিশেষজ্ঞ ও অজ্ঞ কারোর কাছে দুর্বোধ্য মনে হবে না। বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত হবার পক্ষে গ্রন্থখানির এই বৈশিষ্ট্য হয়তো গ্রন্থ প্রকাশকদের অভিপ্রেত।

এই রচনার বিষয় সংক্ষেপে—বৈদেশিক নীতিতে মনুষ্যসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে পারমাণবিক শক্তির প্রাযুক্তিকতা। হেনরি এ. কিসিংগার এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তঃরাজ্য সম্বন্ধ পরিষদের সৌজন্যে এক অতি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন—"নিউক্লিয়ার অস্ত্রসজ্জা ও বৈদেশিক নীতি"। পারমাণবিক শক্তি যেন একই কালে অস্তিমান ও নাস্তিমান। এর অর্থ, মনুষ্য সমাজে সংগ্রামের সৃষ্টি, নয়তো সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি—এই দুটি বিপরীত ধর্ম তার সত্তাগত। পারমাণবিক শক্তি কি সর্বগুণাধার দৈব সম্পদ, না হঠকারী, নিষ্ঠুর আসুর সম্পদ? মানুষকে এর জবাব দিতে হবে। তাই রাজনীতিজ্ঞ ও বিজ্ঞানীর মধ্যে বাগবিতণ্ডা। পারমাণবিক শক্তি নিয়ে কোন বিষয়ে পরিমাণ লঙ্ঘন করা হলো কিনা, এর বাচবিচার প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক বা কারিগরি চেষ্টার দৃষ্টিতে এবং দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্র পরিচালনার তরফ থেকে হওয়া সমীচীন। কার্যতঃ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণে তারতম্য বা পৌর্বাপর্য ও ঘাত-প্রতিঘাত মেনে নিতেই হয়।

অহিংস নীতিতে অব্যবস্থিত পারমাণবিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করবার কণ্টকাকীর্ণ পথে পূর্বসূরীরাও অগ্রসর হয়েছিলেন। যেখানে ছিল আবছা আশঙ্কা, সেখানে ক্রমে সত্যান্বষ্টাই

ভয়ের উদ্রেক হচ্ছে। আন্তঃরাজ্য সহযোগিতার তুলাদণ্ডে বর্তমান কর্তব্য নির্ধারণ কি বকাণ্ড প্রত্যাশা? আয়ুধীয় আস্ফালন বহাল রেখেও সমানুপাতে বিশ্বে শান্তিকল্পে নিউক্লিয়ার শক্তিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রয়োগ করা কি নিরাপত্তা রক্ষার উপায়? যে সব আন্তর্জাতিক সংস্থা পারমাণবিক শক্তি সাধনার পতাকা বাহক, তাদের কীর্তিই বা কতটুকু, ভ্রম-প্রমাদই বা কেন? উন্নয়নকামী জাতি-পুঞ্জের মধ্যে কয়টিই বা দেশ পারমাণবিক বিজ্ঞান-চর্চায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার মত অর্থবল লাভ করেছে? পারমাণবিক অস্ত্রবর্জিত এলাকা প্রতিষ্ঠায় কূটনীতির সঙ্গে মিশ্রিত আর্থিক সমস্যাগুলির সমাধান কি অত্যন্ত দুঃসাধ্য নয়? গ্রন্থকার নিজের বইয়ের নামকরণ করবেন ভেবেছিলেন—"ব্যর্থ উদ্যোগ" (The Unfulfilled Promise)। কেন? এই প্রশ্নের উত্তরই তাঁর মূল বক্তব্য, মন্তব্য।

রাষ্ট্রপ্রধান আইজেনহাওয়ার ১৯৫৩ সালে ডিসেম্বর মাসে তাঁর স্বরাচরণীয়, বিশ্ববিখ্যাত, অহিংসধর্মী 'পারমাণবিক শক্তির পরিকল্পনা' ঘোষণা করেছিলেন। পরিকল্পনাটির দশান্তর ঘটেছে, অনেকে এই বক্রোক্তি করে থাকেন। এখানে একটি অজুহাত: রাষ্ট্রপ্রধানের পরিকল্পনার নির্বিশেষ অনুবর্তী না হলেও আধুনিক মনীষীদের সঙ্গে পদক্ষেপের তাল মিলিয়ে ১৯৫৭ সালে 'আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংগঠন' আইনের উৎপত্তি হয়েছে। এই আইনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের ভাবার্থ—পারমাণবিক শক্তিকে শান্তি প্রকল্প ছাড়া কোন সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার করা অন্যায়। রাষ্ট্রপ্রধানের কাম্য ছিল এমন প্রতিষ্ঠান গঠন করা, যার কর্তব্য হবে বিশ্বে অনুসন্ধান করা, যাবতীয় বিভাজনক্ষম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সুষ্ঠু প্রয়োগের কি কি উপায় হতে পারে, যাতে মানুষ নিরবচ্ছিন্ন শান্তির জীবন যাপন করতে পারে? IAEA—আইনের শব্দার্থে তাঁর পরিকল্পনার মর্মার্থ যে অনেকাংশে সীমিত ও ব্যাহত হয়েছে, ক্রামিশ সেটা স্পষ্ট করে বলেছেন। তাঁর মতে, বর্তমান নিয়মে পরিকল্পনাটির রূপান্তর ঘটেছে; বাধাবিঘ্ন ডিঙিয়ে এর মূল্যবান গূঢ় সত্যটিকে পুনরুদ্ধার করা চাই। প্রথমতঃ আইনের উপরিউক্ত বিপ্রলাপের ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। IAEA-র কার্যভার গ্রহণের সর্ত—সামরিক উদ্দেশ্যে কোন কার্যে আদৌ হস্তক্ষেপ করবে না—প্রভাবক বা সহায়ক হবে না। তবে সামরিক উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেওয়া হলো না কেন? তাতে ব্যঞ্জনায় অনির্দেশ্যতা দূর হতো। ছিদ্রান্বেষীর চোখে তো বটেই, আপামর সাধারণের কাছেও ধরা পড়বে—IAEA-এর আদর্শোচিত কাজের হেনস্তা হলো, টালবাহনা করবার পথঘাট খোলা রইলো।

কোন একটা সার্বরাষ্ট্রিক আকলোদয় চেষ্টা না চালিয়েও কতিপয় দেশে রাজনীতি ও বিজ্ঞান পৃথক পৃথক অথবা আংশিকভাবে একজোটে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন ও প্রযুক্তির ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে চলেছে। যে সব দেশ অনুন্নত অথচ প্রগতিকামী তারা কেউ কেউ বহুশ্রমে আহৃত জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী উন্নত জাতিগুলির বিজ্ঞান-মন্দিরের দ্বারস্থ হয়ে পূর্বসূরীদের পন্থায় পুরোবর্তী হতে প্রস্তুতি জানাচ্ছে। ক্রামিশ বলেছেন, এটা হলো অকৃতকাম, পরছন্দানুবর্তী. পরশ্রীকাতর জাতিদের বিপ্রলব্ধ হবার দুর্ভাবনা—পারমাণবিক শক্তি লাভের স্পর্ধা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও যারপর নাই আয়াসী—বড়জোর এরা উন্নয়নকামী। ধৈর্যধারণ করলে উত্তম ফল লাভ করবে।

ক্রামিশ যে শুধু আমেরিকার পারমাণবিক শক্তি কমিশনের ফিরিস্তিগুলির বিষয়েই সচেতন, তা নয়। ওয়াশিংটন থেকে প্যারিস, আবার পোর্টদাই

আক্রান্ত সীমা পর্যন্ত—নানা প্রতিষ্ঠানের যোগসূত্রে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত। অগত্যা তাঁর মতামত মৌলিক ও প্রাদেশিকতাবর্জিত নব কর্মপদ্ধতির ইঙ্গিতে গভীর অর্থপূর্ণ।

রাষ্ট্রপ্রধান আইজেনহাওয়ারের পরিকল্পনার রূপায়ণে IAEA-আইনের উৎপত্তির ফলে সমস্যা দাঁড়িয়েছে, বিশ্বের বিভাজনক্ষম পদার্থসমূহ বা পারমাণবিক দ্রব্য সংগ্রহের যেমন তেমন একটা খতিয়ান বা জমা খরচের একুনে হিসাব তৈরি করা। IAEA-কে পারমাণবিক ধন-ভাণ্ডারের সঞ্চয় ও পরিরক্ষণের খোদ কর্তা হতে হবে—নয়তো এই বিবাদী সম্পত্তি নিয়ে হামলা নির্মূল করবার নিয়ম নিরূপণে আজ্ঞাদাতা হতে হবে। যত্তপি ভাণ্ডারী বা স্বত্বস্বামীর ক্ষমতা না থাকে, অন্ততঃ দালালরূপে IAEA-এর কর্তব্য দাঁড়াবে দ্বিপাক্ষিক একরারনামার মাধ্যমে পারমাণবিক পণ্যসম্ভারের বিনিময় বা ব্যবহার-বিধির সংস্থান করা। যুক্তরাষ্ট্রের এই আন্তর্জাতিক প্রকল্প সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছেও গ্রাহ্য হলো। এতে উভয় দলে কোন্দলের অজুহাত থাকে না এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তির প্রায়োগিক মানও বাড়বে, বোঝা গেল। কিন্তু IAEA-এর ভাগ্যে প্রকৃতপক্ষে স্বত্বস্বামী বা দালাল—এই দুই-এর কোন একটি পদেও অভিষিক্ত হবার জো রইলো না।

IAEA-এর অন্যতম স্রষ্টা বিজ্ঞানী অধ্যাপক গানার রেনডার্গ 'বুলেটিন অব দি অ্যাটমিক সাইন্টিস্ট' পত্রিকায় 'বিজ্ঞানীর দৃষ্টি' নিবন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা IAEA-এর ব্যবহারিক মূল্য নির্ধারণের জন্যে যা করতে পারতেন অথচ করেন নি, সে বিষয়ে খেদ করে অভিমত প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্র। IAEA-এর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের অধিনায়কদের দায়িত্ব। বস্তুতঃ IAEA সোজা জবাবদিহি সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (U. N. O.) সাধারণ পরিষদের খাস দরবারে।

পারমাণবিক দ্রব্যসমূহের বিনিময় ও ব্যবহার ব্যপদেশে IAEA-এর আয়-ব্যয়কে বার্ষিক এক মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ। তাতে খরচ কুলিয়ে ওঠা যায় না, সার্বরাষ্ট্রিক কল্যাণ সুসম্পন্ন হয় না। নানা দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র উৎপাদ্যমান পারমাণবিক দ্রব্যসম্পদ মনুষ্যের সমৃদ্ধির জন্যে সামান্যই প্রয়োগ করছে। নানা দেশের উপার্জিত, পৃথকীভূত যুদ্ধের উপকরণ একত্রিত হলে তার মূল্য যদি সহস্র সহস্র বিলিয়ন ডলার হয়, সেগুলি ধ্বংসকার্যে খোয়া গেলে সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ হবে মোক্ষম এক-শ' গুণ বেশী।

অস্ত্রশস্ত্র

লণ্ডভণ্ডকারী অস্ত্রের সেরা পারমাণবিক বোমা। ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভাঙ্গন থেকে এই বোমার প্রথম উৎপত্তি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে হিরোসিমায় বিস্ফোরিত করে এর যাথার্থ্য যাচাই করা হয়েছে। যে প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রককে নিউট্রন কণিকার দ্বারা ক্রমশঃ ভেঙ্গে বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়, সেই প্রক্রিয়ার নাম নিউক্লিয়ার বিভাজন। পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের অনাসৃষ্টি অনুরূপ অপরিমেয় বিস্ফোরণ-ধারার যোগফল। ভঙ্গপ্রবণ পরমাণুর শক্তিকে বোমা বিস্ফোরণ বা বিষাক্ত শস্ত্র নির্মাণে অপব্যয় না করে শিল্প ও বাণিজ্যে, আর্ট ও বিজ্ঞানে, দৈনন্দিন জীবন ও মনুষ্য সভ্যতার উন্নয়নে প্রয়োগ করাতেই বিশ্বের কল্যাণ। বিশ্বে উচ্চ পর্যায়ের অহিংস রাজ্যশাসন বলবৎ হলে বিজ্ঞান-জগতে অমানুষিকতার উচ্ছেদ হবে এবং বিজ্ঞান ও রাজনীতির দ্বন্দ্বের সম্বন্ধ অপসৃত হয়ে এই উভয় বিদ্যা ইতরেতরাশ্রয়ীরূপে বিশ্বের পরম কল্যাণের নিদান হবে। রাষ্ট্রপ্রধান আইজেনহাওয়ারের প্রকল্পে রাজনীতি ও বিজ্ঞানের

সমুচ্চয়ের মধ্যে চরম সিদ্ধির সন্ধান দেওয়া রয়েছে।

ইউরেনিয়ামের সঙ্গে প্লুটোনিয়ামের প্রতীত্য-সমুৎপাদ ধরণের একটা অদ্ভুত গোছের জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক। দ্বিতীয়োক্ত এই মৌলিক ধাতু প্রাকৃতিক কোন খনিজ পদার্থে নেই—মানুষের হাতে গড়া: ইউরেনিয়াম নচেৎ অন্যবিধ প্রাকৃতিক তত্ত্ব যেমন থোরিয়াম থেকে অনুসম্ভূত। পাতালিক দেবতা প্লুটোর দোষ ও গুণ—একাধারে বিনষ্টি ও বরদান। দেখা যাচ্ছে, প্লুটোনিয়ামে এই সব বর্তায়। প্লুটোনিয়ামের শক্তি অশেষ। তার নজির প্রথম ১৯৪৫ সালে ১৬ই জুলাই আলমগর্দে পাওয়া গেছে। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিতীয়বার নাগাসাকিতে। পারমাণবিক বোমার উপাদান, পারমাণবিক বোমা ভাণ্ডারের মূলধন বিশেষ এই প্লুটোনিয়াম; বিচিত্র নিউক্লিয়ার কার্যপ্রণালীতে এর চাহিদা।

পরমাণু-চুল্লিতে পক্ক ইউরেনিয়াম থেকে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া ঘটে। এর মধ্যে ইউ-রেনিয়াম-২৩৮ কিছু নিউট্রনকে আত্মসাৎ করে এবং অখণ্ড অবস্থায় এক নতুন ধাতুতে পরিবর্তিত হয়—তথাকথিত প্লুটোনিয়াম। প্লুটোনিয়াম-২৩৯ উক্ত ধাতুর বৃহদংশ—ইউরেনিয়াম-২৩৫ সদৃশ ভঙ্গপ্রবণ। সুলভ প্লুটোনিয়াম নিউক্লিয়ার শক্তির ক্রিয়ায় সর্বক্ষণ প্রয়োজনীয়। ইউরেনিয়াম-পারতন্ত্র্য-রাহিত্য প্লুটোনিয়ামের গুণ। সমস্থানিক (Isotope)-২৩৫ অথবা ২৩৩-এর দৌলতে প্লুটোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম 'পারমাণবিক শক্তি সংবিধানের' সংজ্ঞায় বিশিষ্ট নিউক্লিয়ার উপাদান রূপে গণ্য। এদের ব্যবহার করতে কঠিন আইন শিরোধার্য করতে হবে। নতুবা ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম 'রূঢ় অর্থাৎ অমিশ্র বা মূল উপাদান-গুলির' শ্রেণীভুক্ত। এদের ব্যবহারে আইনের কড়াকড়ি কম।

প্লুটোনিয়াম বিষাক্ত দ্রব্য। মনুষ্যশরীরে এক গ্র্যামের অতি ক্ষুদ্রাংশ কোনমতে সহ্য হয়। প্লুটোনিয়ামের হাত থেকে বাঁচতে, স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তা রক্ষার বেহদ্দ খরচা। ধাতু-বিজ্ঞান বিভাগীয় গবেষণায় প্লুটোনিয়ামের কাজে খরচা-বরদারী ব্যবস্থা অনেকখানি—কর্মী-সংখ্যাও অনেক না হলে চলে না।

পরমাণু-বিভাজন ও অন্তর্মিশ্রণ

প্লুটোনিয়াম-২৪০-এর গুণবৈষম্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। প্লুটোনিয়াম-২৩৯ সমস্থানিকের সঙ্গে মিশে থাকা তার অভ্যাসগত। প্লুটোনিয়াম-২৪০ দিয়ে যে বোমা প্রস্তুত হয়, তাতে একটা দোষ অসে—প্রাকবিস্ফোটন-প্রেরণা (Predetonation)। এই দোষে বোমাকে পেড়ে ফেলে। প্লুটোনিয়াম-২৪০ সমস্থানিক থেকে নিউট্রন বিচ্ছুরিত হয় এবং বিস্ফোরণের আগেই বোমা হয়ে পড়ে উনপাঁজুরে, নিস্তেজ। প্রাকবিস্ফোটন-প্রেরণা থেকে শক্তিহ্রাস। সুতরাং প্লুটোনিয়াম-২৪০-এর বোমা ফল পাকাস্ত হয় না। এই গলদ সারাতে সমর দপ্তরের বিজ্ঞানীরা ফ্যাসাদে পড়েছেন।

অহিংস রাজনীতিগতভাবে বোমা বিস্ফোরণ-তৎপরতা আদৌ বরদাস্ত করা চলে না। পার-মাণবিক বোমা বিস্ফোরণ একেবারে রদ হওয়াই উচিত। পারতপক্ষে প্রাণান্তকর আয়ুধ পরীক্ষা বা নির্মাণ না করা তত্রাচ জীবনযুদ্ধে পুরামাত্রায় টিকে থাকা অহিংস, শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রার আদর্শ। রাশিয়ার এই আদর্শে প্লুটোনিয়ামের মূল্যায়ন করবার সঙ্কল্প জেগেছে, তাতে বিজ্ঞানোচিত প্রয়োগবিস্তার উৎকর্ষই সাধিত হবে। যদি এই চেষ্টা অর্থশাস্ত্রের মাপকাঠিতে অপচয়িত প্রতিপন্ন না হয়, তবে শুধু প্লুটোনিয়াম-২৪০ কেন, সর্ববিধ প্লুটো-নিয়াম জ্বালানি পুড়ে—বিশেষত 'প্রজনন পরমাণু-চুল্লিতে' (Breeder reactor) এর সুষ্ঠু ব্যবহার চালিয়ে রাশিয়ার পারমাণবিক শক্তি-চর্চার এক

অতুলনীয় মান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা। রাশিয়ার আয়-ব্যয়কে নিউক্লিয়ার ক্রিয়াদি বাবদ ব্যয়-কর্তন ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে। যে দেশ—রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্য—প্রতিপন্ন করবে, প্লুটোনিয়ামের উৎপাদন ও প্রায়োগিক মান অর্থের সদ্ব্যবহারের নিদর্শন, সে দেশই বিজ্ঞানের দিগন্তকে বিস্তৃততর করবার পদমর্যাদা লাভ করবে, সন্দেহ নেই।

পরমাণু-বিস্ফোরণ বনাম তেজস্ক্রিয় রশ্মি-বিচ্ছুরণের উভয়মুখী ফল: শুভ এবং অশুভ। এক গ্রাহ্য, অপর অগ্রাহ্য। ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ভারী মৌলিক পদার্থের অস্থায়িত্বের জন্যে তাদের পরমাণু-কেন্দ্রীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙ্গে গিয়ে বিদ্যুতাবিষ্ট তেজস্ক্রিয় কণিকাধারার বিচ্ছুরণ ঘটায়। বিচ্ছুরিত তেজরশ্মি বা কণিকাধারা আল্‌ফা, বীটা ও গামা। রেডিয়াম প্রভৃতি বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের রশ্মি-বিচ্ছুরণের উপযোগিতা ক্যান্সার প্রভৃতি অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ। অপর দিকে ধীরগতি নিউট্রন-কণিকার সংঘাতে প্লুটোনিয়ামের কেন্দ্রীন বিভাজনের মাধ্যমে পারমাণবিক বোমা তৈরির কৈফিয়ৎ।

থোরিয়ামের শুভ ফল: যেমন—ভারতবর্ষে এই পারমাণবিক দ্রব্য সুপ্রচুর, তাই এই আধি-ভৌতিককে সমাদর করে ফলাও কারবারে লাগাবার স্বপ্ন। পারমাণবিক শক্তিতে এদেশকে স্বাবলম্বী হতে হলে থোরিয়াম-ইউরেনিয়াম-২৩৩-এর উৎপত্তির দ্বারা সেটা সম্ভব। ক্রামিশের বর্ণনায় একস্থলে আছে: তিনটি ধাপে সর্বভারতীয় পারমাণবিক শক্তিকে ফলন্ত করা যায়। সর্বাগ্রে দেশীয় স্বল্প ইউরেনিয়াম পুঁজিটিকে জ্বালানি বানানো, যাতে খনিজ ইউরেনিয়ামের পরমাণু-চুল্লিতে এর পাক হয় তুষ্টিজনক। এতে যে প্লুটোনিয়াম জন্মালো, তাকে দ্বিতীয়বার এমন প্রক্রিয়ায় লাগানো যে, এক গ্রাম প্লুটোনিয়াম পোড়ালে প্রায় অর্ধ গ্রাম U-২৩৩ জন্মে। এই ধাপে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ দগ্ধ হয়, তদনুপাতে সৃষ্ট হয় কম। তৃতীয় ধাপে পরমাণু-চুল্লিতে থোরিয়ামযুক্ত ইউরেনিয়াম-২৩৩ এমন প্রক্রিয়ায় পুড়বে—যেটুকু পুড়লো, সেই অনুপাতে যেটুকু নতুন জন্মায় তার পরিমাণ হয় বেশী। এই তিনটি ধাপের অভিব্যক্তিতে পনেরো-কুড়ি বছরে ভারতবর্ষে পারমাণবিক শক্তির বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ভরে উঠবে।*

উন্নত জাতিপুঞ্জের সৌজন্যে অনুন্নত দেশে স্বল্পব্যয়ে রশ্মি-বিচ্ছুরণের যন্ত্র-তন্ত্র শিক্ষণ সহজ। তেমনি উপযাচক দেশে আবশ্যিক পারমাণবিক সরঞ্জাম বন্টন বা দানও সহজ। ভারতবর্ষে - পাঞ্জাবে এক মার্কিন সদাগরি প্রতিষ্ঠানের দাক্ষিণ্যে ভারী জল ও রাসায়নিক সার উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠার সমীক্ষা চলেছে। এই উভয় দ্রব্যের উৎপত্তিতে বিশ্ব-বাণিজ্যে স্বদেশী মালের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়বে। মার্কিন রাসায়নিক সারের বর্তমান সঞ্চয়ের সমান বা বেশী সার উন্নয়নকামী ভারতবর্ষেও উৎপাদিত হতে পারে। স্বদেশী কাঁচা ও গৌণ নিউক্লিয়ার পণ্য বিদেশে রপ্তানী করবার এই সুযোগ।

সমস্থানিকের উৎপাদকরূপে ভারতবর্ষ, তথা অন্য অনুন্নত রাষ্ট্রের নিউক্লিয়ার শক্তির বাহুর খেলায় হাতেখড়ি হতে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ বিঘ্ন নেই। কিরণিত খাদ্য-বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে ভারতবর্ষে পারমাণবিক শক্তি-চর্চার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। উর্বরক বা সারে বহু পরজীবী কীট-পতঙ্গের উদ্ভব। এসব ধ্বংসের নিমিত্ত কিরণন (Irradiation), তথা তড়িতাবিষ্ট তেজস্ক্রিয় কণিকাধারার ব্যবহার। কিরণিত, তথা বিশোধিত সার কৃষিকর্মে নিত্য ব্যবহার্য। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উদ্যোগী দল পরীক্ষা করে

---

*এশিয়া ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পারমাণবিক শক্তিধর অন্যান্য দেশ পাকিস্থান, চীন, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া।

দেখেছেন—এক ধরণের সুবহ পরমাণু-চুল্লি ঘণ্টায় ৬০৭ মাইল বেগে ক্ষেতে ঘুরে ঘুরে একর প্রতি ৭০ ডলার খরচে রশ্মি-বিচ্ছুরণের দ্বারা জীবাণু-নাশের কাজ করতে পারে। অবশ্য পরমাণু-চুল্লির বদলে বৃহৎ-কুরি কোবাল্ট—৬০ (Large-curie cobalt-60 Source) কল চালালে তাতে ফল হয় অধিক। ক্ষেত্রকে বিশুদ্ধ করবার আরেক উপায়—পরাঙ্গপুষ্ট জীবপ্রসূ অণ্ডরাশির ধ্বংস। এই চেষ্টা উদ্ভিদাদির মড়ক আরম্ভ হবার আগেই করা যুক্তিযুক্ত।

অন্তর্মিশ্রণ বা গলনের (Fusion) দ্বারা শক্তি উৎপাদন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আরেকটি প্রণালী। একথা স্বীকার্য যে, দেদার সস্তা তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপাদনে অন্তর্মিশ্রণ চুল্লির উপযোগিতা যথেষ্ট, বিদ্যুৎ সোজাসুজি ফলানো তার তেমন জুতসই কাজ নয়। কতকগুলি কেন্দ্রকের (Nuclei) সমাবেশ বা অন্তর্মিশ্রণে প্রচুর শক্তির সৃষ্টি হয়। অল্প ওজনের কেন্দ্রক, যেমন—ভারী হাইড্রোজেন এবং ট্রাইটিয়ামকে অন্তর্মিশ্রণ পদ্ধতির বাঁধুনিতে একত্রিভূত করলে প্রচুর শক্তি হবে। এতে যে উচ্চ তাপ কড়ার করতে হয়, সে একটা নতুন জিনিষ, 'জড়ের চতুর্থ অবস্থা' প্লাজমা। এর কূটতত্ত্বে এখনও বিজ্ঞানীদের বুদ্ধি পাকে নি। তাপকেন্দ্রকীয় (Thermonuclear) শক্তির পাত্তা পেতে বিজ্ঞানীকে প্লাজমার জ্ঞান ঢের বেশী আয়ত্তে আনতে হবে। চুম্বকীয় দ্রব-গতিবিজ্ঞান (Magneto-hydrodynamics) গবেষণায়ও প্লাজমার গুণধর্মের তত্ত্ব অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের অন্তর্মিশ্রণ যোজনায় ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ সালের খরচ যথাক্রমে ২৮'৭ ও ৩৮ মিলিয়ন ডলার। ইউরোপ ও সোভিয়েট দেশেও স্বতন্ত্র গবেষণা আধুনিকদের দেখতা ব্যাপার। পরস্পরের মধ্যে বার্তা-বিনিময় ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা বহাল হলে এই বিভাগীয় তত্ত্বাবধানের চাড় বাড়বে। অন্তর্মিশ্রণ-চুল্লিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপন্ন হলে সেগুলি বিভাজন-চুল্লিতে শক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হতে পারে। অন্তর্মিশ্রণ প্রণালীর যুগেও চিরাগত বিভাজন-চুল্লির মাধ্যম বাদ দেওয়া যায় না। অন্তর্মিশ্রণ প্রণালীতে তাপকেন্দ্রকীয় শক্তির অনুধাবন বিজ্ঞান-চর্চার এক অভিনব অধ্যায়। এই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক অভিযানে রাজনীতির কোন নালিশ ওঠে নি।

ইন্ধন

গ্রহণ ও বর্জনের দ্বারা অনেক জিনিষকে নিজে-দের উপযোগী করে নিতে হয়। জীবাশ্ম-ইন্ধন ও নিউক্লিয়ার ইন্ধনের বেলায়ও এই কথা। বাছ ছাটাই করে কখন কোন্‌টা দরকারী, সেটা ঠিক করতে হবে। নিউক্লিয়ার ইন্ধনের সুবিধা: প্রথমতঃ, পারমাণবিক শক্তির কলে একবার ইন্ধনের যোগান দিলে কম হোক, বেশ কিছুক্ষণ জ্বলে। ইন্ধনের পরিবহন ও খরচের হয়রানি থাকলেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, এই ইন্ধন পরমাণু-চুল্লির পাকে, আবহাওয়ার অদ্ভুত পরিবর্তনে, খরা কিংবা রৌদ্রাভাবে তরতাজা থাকে। তৃতীয়তঃ, চুল্লির কাজ কতে করতে জল সরবরাহের অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকতে হয় না। চতুর্থতঃ, এমনই এর ছাঁদ, একে ঠাণ্ডা করতে গ্যাস নয়তো চোস্ত তরল পদার্থ কিছু হলেই যথেষ্ট। সর্বশেষে, পরমাণু-উনুন খাটাতে ভৌগলিক উচ্চতা, উচ্চ ও নিম্ন অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমান্তর ইত্যাদি মাপজোখের জের টানাটানি নেই।

জীবাশ্ম-ইন্ধন সরবরাহ ইদানীং উত্তর আফ্রিকায়, পশ্চিম এশিয়ায় ও অন্যত্র যে মাত্রায় চলেছে, তাতে পারমাণবিক শক্তির সহজে আট-পৌরে হবার আশা অল্প। রুশ দেশের তেল চলাচলের নলগুলি নির্মিত ও খোলা হলে পূর্ব ইউরোপে পারমাণবিক শক্তির কলকারখানা কিছুকেই পরোয়া না করবার ভাব জাগা আশ্চর্য নয়। অদূর প্রাচ্য, ক্যানাডা ও দক্ষিণ আমেরিকায়

তেলের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সোভিয়েট তেল রপ্তানীর হিড়িকে বিভিন্ন দেশের অন্তঃরাজ্য সম্বন্ধ পণ্ড হবার লক্ষণও আছে।

কয়লা পশ্চিম ইউরোপের ডাকসাইটে জ্বালানি। সহজ পরিবহন ও ব্যবহার-পটুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এই আঙরার গুণগরিমাও কমবে। আঙরার শক্তির অবধি নেই। তাই দায়ে পড়ে মেনে নিয়ে এর কাছে মাথা নত করতে হয়। ওহিওতে জলো আঙরা-চূর্ণ জ্বালানি খনি থেকে নলযোগে এক-শ' মাইলেরও বেশী দূরের কারখানায় চালান যাচ্ছে। পেট্রোলিয়ামের মত জলো আঙরার বেসাতি সামান্য খরচে সমাধা হচ্ছে।

পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে মিশ-খাওয়া স্বাভাবিক গ্যাসও তরলায়িত নির্মল জ্বালানিরূপে নলযোগে স্বল্পতর ব্যয়ে পরিবাহিত হতে পারবে। দ্রব-ইন্ধনরূপে মিথেনও প্রচুর পরিমাণে জাহাজে পরিবহন আর্থিক দৃষ্টিতে অনায়াসসাধ্য।

মামুলি জ্বালানিগুলি বাড়তির মুখে। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারমাণবিক শক্তির জয় কখন হবে ঠিকানা নেই। পারমাণবিক ইন্ধনের বাজার চড়া না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জ্বালানির অদলবদল করবার আগে সোভিয়েট বিজ্ঞান ক্লবল ও কোপেকের খুঁটিনাটি হিসাব খতিয়ে দেখছে। ধনতন্ত্রী দেশেও একই সমস্যা—কাঞ্চন মূল্যের নিরিখে ঠিক করা, কোন্ জ্বালানিতে মুনাফা কত।

মামুলি বা পারমাণবিক ইন্ধন মাত্রেই যে শক্তি উৎপাদন করে, তাতে বহুলাংশে ব্যয় ছাঁটাই করতে যে কারিগরিবিদ্যা অপরিহার্য—সেটা ঋণ তড়িৎ-কণিকা (ইলেকট্রন) বা স্থূলাণুর (Ion) নিমিত্ত যে অভাবনীয় বিপ্লব বিজ্ঞান-জগতে এসেছে, তারই মধ্যে রূপ নেবে মনে হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে ছিমছাম বা অবিঘ্নিত অর্থাৎ সরল—ব্যয়বহুল বাষ্প ও টারবাইন যন্ত্রের নিয়োগ থাকবে না।

অবিঘ্নিত বিদ্যুৎ উৎপত্তির অন্ততঃ পাঁচটি প্রণালী : (১) তাপ-বৈদ্যুতিক (Thermo-electrical)—শতাধিক বছর পূর্বেকার নিয়ম-কানুনের উপর এর ভিত্তি। অধুনাতন অপূর্ব অর্ধপরিবাহী দ্রব্যের বিবর্তনে প্রণালীটি চিত্তাকর্ষক। (২) তাপায়নিক (Thermionic)—১৮৮৩ সালে টমাস এডিসনের চোখে গুটিকতক তথ্য ধরা পড়লো। তাঁরই প্রেক্ষিত তথ্য পরখ করে এই তাপায়নিক বিদ্যুৎ উৎপত্তির বিবর্তন। (৩) জ্বালানি কোষ (Fuel cell) শতাধিক বছরেও আগে এই প্রণালীর প্রথম প্রচলন। (৪) চুম্বকীয় দ্রব-গতিবিজ্ঞান (Magneto-hydrodynamics)—১৮৩১ সালে মাইকেল ফ্যারাডে ডায়নামোতে যে তারের কুণ্ডলী আছে, তৎস্থলে গরম গ্যাসের ধারা ছোটান। (৫) অংশিত পরমাণু থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ আহরণ। বিচ্ছিন্ন বা ভগ্ন কোষ (Fission cell) নামীয় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় যিনি সর্বাগ্রে তাত্ত্বিক ও প্রাযুক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তিনি ডক্টর জর্জ সাফ্‌লফ। পরমাণুর আবেশিত ভগ্নাংশ (Charged particles) থেকে অবিঘ্নিত বিদ্যুৎ প্রজনন প্রণালীটি যেমন নতুন, তেমনি নতুন অগ্নিশিখা থেকে বিদ্যুৎ উৎসৃজন। অগ্নিশিখা স্থূলাণুতে আকারান্তরিত গ্যাস। স্থূলাণুতে আকারান্তর অর্থে বিদ্যুৎ-গুণধর্মিতা বোঝায়। তবে অগ্নিশিখাকে চৌম্বক ক্ষেত্রে আকর্ষণ করে ধরে রাখবার তত্ত্বটি জটিল। বিজ্ঞানীরা নামকরণ করেছেন, চুম্বকীয় দ্রব-গতিবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের এলাকা মামুলি ও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন—উভয়তঃ বিস্তার লাভ করবে, লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

যানবাহন ও আকাশপথ

সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ অথবা উপরিচর রকেট বা বিমান পারমাণবিক শক্তিতে সামরিক ও অসামরিক প্রয়োজনে আনাগোনা করছে। রকেট

প্রস্তুত ও পরীক্ষাদির দাপাদাপিতে দারুণ খরচ—পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের খরচারও বেশী। ইউরোপে, বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক যানবাহন-বিশেষের তোড়জোড় ছাড়া সাধারণতঃ আকাশ পরিক্রমায় নিউক্লিয়ার বিমানের দাপট বিশেষভাবে অনুভূত হয় নি। কিন্তু 'আন্তর্জাতিক মহাকাশ সমিতির' সদস্য পদবী লাভের উচ্চাশা ইউরোপে নেই বলা ভুল। এই সম্পর্কে ইউরোপে উন্নতির ধীরোদাত্ত গতি অবশ্যই সকলের নজরে পড়বে। মোটকথা বলা যায়, ইউরোপীয় যানবাহন প্রগতি সংস্থা (European Launcher Development Organisation—ELDO) এবং ইউরোপীয় ব্যোম অনুসন্ধায়ক সংস্থার' (European Space Research Organisation—ESRO) মধ্যে একটা সহযোগিতার ইশারা আছে। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সৌজন্যে ইউরোপে উপরিচর রকেটের যাথার্থ্য নির্ধারণ ও শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা রচনার আকিঞ্চন বাড়বে। সোভিয়েট দেশে মহাকাশ যুগের সূচনায় হয়তো বা স্থূলাণু শক্তি-চালিত নিউক্লিয়ার রকেট দরাজ শূন্যে পাড়ি দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতা হাতেনাতে প্রমাণ করবে। নিউক্লিয়ার শক্তির প্রাযুক্তিকতায় (Nuclear Propulsion) এই দেশের হাতযশ। বরফ-ভাঙবার জাহাজ 'লেনিন' সর্বপ্রথম নিউক্লিয়ার শক্তিচালিত সমুদ্রযান। প্রাযুক্তিক বিদ্যার পরাকাষ্ঠা লাভের উদ্যোগ মস্কোর ৭০ মাইল উত্তরে ডাব্‌নায় দেখা যায়। ১৯৫৬ সালে ঐস্থানে সোভিয়েট-পন্থীদের গবেষণা-কেন্দ্র কায়েমী করা হলো। উক্ত কেন্দ্র 'যৌথ নিউক্লিয়ার গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে'র অঙ্গীভূত হয়েছে। গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের সদস্যরূপে রাশিয়ার অবদান শতকরা ৪৭·২৫, চীনের ২০ (অন্ততঃ সুরুতে) পূর্ব জার্মেনী ও পোল্যাণ্ড প্রত্যেকের ৬·৭৫, হাঙ্গেরী ৪, বুলগেরিয়ার ৩·৬, চেকোশ্লোভেকিয়া ও রুমানিয়া প্রত্যেকের ৫·৭৫, আলবানিয়া, উত্তর কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়া প্রত্যেকের ·০৫; সদস্যদের অন্যতম ভিয়েৎনামের অবদান শূন্য। গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য সোভিয়েট-কেন্দ্রিক দেশগুলির স্বদলানুগত্য বা সমাজতন্ত্রের পুষ্টি। ENEA, Euratom, CERN প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সমকক্ষ হওয়া—সেটাও লক্ষ্য। CERN-এর সঙ্গে সোভিয়েটের সহযোগিতার প্রমাণ আছে। ১৯৬০ সালে IAEA-র বৈঠকের অব্যবহিত পরেই মস্কোতে সোভিয়েট দলীয় সদস্যেরা এক নিউক্লিয়ার ঔদ্যোগিক সভ্যুসমুত্থানের উদ্বোধন করেন। ডাব্‌নার কৃতিত্বও এর কাছে তুচ্ছ। IAEA-এর প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনরূপে 'শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের স্থায়ী কমিশনের' (The Permanent Commission on Peaceful Uses of Atomic Energy) গোড়াপত্তন হলো। এই কমিশনের ঘটকতায় দলীয় দেশগুলির দ্বিপাক্ষিক আদান-প্রদানের চুক্তিগুলিকে দায়রায় সোপরদ্দ হতে পারবে। দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলির অপ্রাপ্তবস্তু প্রাপ্তির ছড়াছড়ি না থাকলেও দলীয় অনেক দেশেরই বরাতে অনেক জিনিষ জুটবে। এদের পাওনা হবে প্রথমতঃ নিউক্লিয়ার গবেষণার ২০০০ কিলোওয়াট পরমাণু-চুল্লি ও নাতিবৃহৎ সাইক্লোট্রোন—এতদ্ব্যতীত দরকারী খবর, প্রায়োগিক শিক্ষায় সাহায্য এবং বুনিয়াদী বৈজ্ঞানিক বিদ্যা।

পরিরক্ষণ ও তদন্ত

পারমাণবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ ও সরেজমিনে তদন্তের মারফৎ আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তি বজায় হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের দিক থেকে স্বাধীনতার অন্যথাভাব যাতে না হয়, ভারতবর্ষের পক্ষে ডক্টর হোমি জে. ভাবার মতও অনেকটা এই রকম। ভিন্ন দেশের সঙ্গে দেনা-পাওনার মাধ্যম ব্যতিরেকে পারমাণবিক শক্তিচর্চা অসম্ভব। সুতরাং আন্তর্জাতিক প্রশাসন ও তদন্তের অবশ্যম্ভাবিতা। নষ্ট তালীম

এই চর্চিত পারমাণবিক বিত্তায় একবার কাবিল হলে প্রতিষ্ঠান্বিত দেশে পরদেশী তদন্তের কড়া নিয়মে আটকা পড়বার ঝকি কেন পোহাতে হবে? নিদেন, সামরিক প্রয়োজনে কোন দেশে পারমাণবিক শিল্পোদ্যোগ যদি নিশানা না হয় এবং অহিংস নীতিতে এই উদ্যোগ চলে, তাহলে পারমাণবিক সরঞ্জাম পাচার অথবা পারমাণবিক শক্তির অসদ্‌গতি করবার অপবাদ তাকে কে দেবে?

১৯৫৪ সালের 'পারমাণবিক শক্তি সংবিধান' যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিস্বরূপ। তখনকার দিনে যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিলে পারমাণবিক শক্তির ঔদ্যোগিকী (Technology) গুটিকয়েক দেশে মাত্র সুজানিত ছিল। শুধু কয়েকটা দেশে অত্যাবশ্যক পারমাণবিক মালমশলার কাট্‌তি ছিল। যুক্তরাষ্ট্রই তখন U-২৩৫ পণ্যের সেরা সওদাগর। আশা জাগলো, যুক্তরাষ্ট্রের দেখাদেখি অন্যান্য দেশেও পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের অবলম্বন হবে বিশ্বশান্তি এবং পারমাণবিক শিল্প-বাণিজ্যে কালক্রমে আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমূলক প্রশাসন এবং তদন্তের রীতি ও কানুন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে—মোটামুটি অস্ত্রনিয়মণ, নিরস্ত্রীকরণ ও পারমাণবিক শক্তির নিমিত্ত আশঙ্কিত দুর্ভোগ থেকে মুক্ত থাকবার আন্তঃরাষ্ট্রীয় আইনের চলন হবে। আন্তর্জাতিক তদন্তের রেওয়াজ যে বাড়ছে, তার প্রমাণ—১৯৫৭ সালের মে মাস থেকে ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত এক কুড়িরও অধিক দেশে অন্যূন এক শত তদন্ত হয়েছে। ভারতবর্ষে—তারাপুরে যুক্তরাষ্ট্র-প্রদত্ত ৩৮০mw পরমাণু-চুল্লির দানপত্রে কখন-সখন তদন্তের বিধান আছে। ক্যানাডার চুক্তিনামায় ট্রম্বে ও রাণাপ্রতাপসাগরের পরমাণু-চুক্তি সংক্রান্ত পারমাণবিক মালের তদন্তের অনিবার্যতা স্বীকৃত হয় নি। IAEA-এর আইন লিপিবদ্ধ করবার কালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সম্মেলনে ভারতীয় পারমাণবিক শক্তি সংস্থার নেতৃস্থানীয় ডক্টর হোমি জে. ভাবা তদন্ত ও কর্তৃত্বের ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন। তার তাৎপর্য এই—এশিয়া, আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকার অনুন্নত দেশে পারমাণবিক প্রতিরক্ষা-বিধি গৃহীত হলে IAEA-এর পারমাণবিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষমতাহরণমূলক নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষমতা চূড়ান্ত বেড়ে যাবে। আর্নল্ড ক্রামিশ তাঁর বইয়ে নিরস্ত্রীকরণ পর্যায়ক্রমে কিসে বাস্তবে পরিণত হবে, তার বিশদ আলোচনা করেছেন এবং IAEA-এর প্রার্থিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার প্রণালী কি, তদ্বিষয়ক একটা উত্তম খসড়াও প্রস্তুত করেছেন।

পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণে অগ্রণী ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অনেকগুলি আন্তর্জাতিক সংস্থা; প্রমাণতঃ—'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা', 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা', 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও কৃষ্টি সংস্থা', 'আন্তর্জাতিক বিকিরণ বিজ্ঞান কমিশন', 'আন্তর্জাতিক বিকিরণ সম্মেলন', 'আন্তর্জাতিক মানকীকরণ সংস্থা', 'ইউরোপীয় পারমাণবিক শক্তিদল' (Euratom), 'ইউরোপীয় অর্থসমবায় সংস্থা' 'আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংগঠন' প্রভৃতি। জাতীয় সংস্থা ও গোটাকতক—ইতালীয় SENN, ইংল্যাণ্ডের DRAGON, ফ্রান্স-সুইজারল্যাণ্ড সীমান্তে CERN প্রভৃতি। বেলজিয়ামের গীম নামক স্থানে এক গবেষণা-চুল্লি Euratom-এর কাজের সহায়ক। নেদারল্যাণ্ডসের পেটেনে পরমাণু-চুল্লি-উদ্যোগের একটা ঘাঁটি স্থাপিত আছে।

অর্থ ও রাজনীতির উদ্যোগে বখরাদারিতে প্রচুর পরস্মৈপদী লাভ। সে জন্যে পশ্চিম মহাদেশে 'ইউরোপীয় কয়লা ও ইস্পাত সংগঠন' 'এজমালি বাজার' ও 'ইউরোপীয় পারমাণবিক শক্তিদল' (Euratom) এক নির্দেশালয়ের কর্তৃত্ব মেনে চললে কয়লা তেল ও পারমাণবিক শক্তির যৌথ বাণিজ্যে মুনাফা হবে বেশী। 'আর্থিক সমবায় উন্নয়ন সংস্থার'

মোট প্রধান কর্তব্য—উন্নয়নকামী দেশে সাহায্য বণ্টন। পারমাণবিক শক্তির কল্যাণকর প্রয়োগের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা এই খয়রাতী কাজের অন্তর্গত।

অপর পক্ষে, 'ছয়' (The Six) নামে ছয়টি ইউরোপীয় দেশের জোট—OECD-এর এখ-তিয়ারের মধ্যে। OECD-এর সদস্য দেশের সংখ্যা একুশ: অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ক্যানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মেনী, গ্রীস, আইসল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ইটালী, জাপান, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্, নরওয়ে, পর্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র। OECD-এর পারমাণবিক কর্মসূচী রূপায়িত করা যাদের দায়িত্বে ঘটে, তারা 'ইউরোপীয় নিউক্লিয়ার শক্তিদল' ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। ছয়ের বোলচাল রাজনীতির পথে মোড় নিয়েছে। OECD-এর তা নয়। সপ্তক (The seven)—অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড ও যুক্তরাজ্য—OECD-এর এলাকায় আরেকটি জোট। ছয়ের সঙ্গে এদের জোড় মেলে না। এরা স্বতন্ত্র, প্রতিপক্ষ বণিকগোষ্ঠী—'ইউরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সংসদ' সংজ্ঞায় এদের পরিচয়।

গ্রীস, আইসলাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড ও অন্যান্যদের—ENEA, OECD-এর সদস্য দেশগুলির অনেকের বিশেষ আর্থিক কল্যাণের হেতু। কি দেশের সঙ্গে ENEA-এর সংস্রব সাধারণতঃ সংযোগচ্যুত ও পৃথক। যৌথ কার্য উপরোধে ENEA-এর আড়েহাতে লাগবার দৃষ্টান্ত বিরল। অনেক দেশে নিউক্লিয়ার উদ্যোগ ও গবেষণার মতলব কাঁদতে ENEA মধ্যস্থরূপে কাজ করে, অর্থের সংস্থান করে দেয়। এদের দালালির বাহাদুরির দৃষ্টান্ত, যেমন—১৯৫৯ সালের জুলাই মাসের চুক্তি। এই চুক্তিমতে ENEA-এর এলাকাভুক্ত যৌথ উদ্যোগে যাবতীয় মালমশলা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য রসদ সামরিক কোন ব্যবহারে লাগানো অবিধেয়। ENEA-কৃত যৌথ উদ্যোগের প্রথম প্রমাণ—১৯৫৯ সালের নরওয়ে দেশীয় হলডেন প্রকল্প: এক ভারী জলের পরীক্ষার পরমাণু-চুল্লি; আন্তর্জাতিক যৌথ উদ্যোগের দ্বিতীয় প্রমাণ—ইংল্যাণ্ডের উইনফ্রীথ হীথের উচ্চ তাপের বাষ্প-শীতল পরমাণু-চুল্লি। তৃতীয়তঃ, বেলজিয়ামের মল নামক স্থানে বিরণিত ইন্ধনের রাসায়নিক সংসাধনের নিমিত্ত 'ইউরোকেমিক কারখানা'। এতে আন্তর্জাতিক যৌথ সেবা-চর্যার সুরাহা হবে। এর আগে ব্যষ্টিগতভাবে কেবলমাত্র ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড দুটি দেশে এই রাসায়নিক উপজাত বস্তু লভ্য ছিল।

১৯৫০ সালে UNESCO-এর প্রস্তাবনায় জেনিভার উপকণ্ঠে ফ্রান্স-সুইজারল্যাণ্ড সীমান্তে মেরীনে 'ইউরোপীয় নিউক্লিয়ার অনুসন্ধান সংস্থা' (CERN)-এর পত্তন। ১৯৫৯ সালে পৃথিবীর অতুলনীয় শক্তিশালী ত্বরিত্রগুলির (Accelerator) একটি এখানে বসানো হলো। এখানকার শিল্পসাধিত্র ব্যবহার করবার অভিসন্ধানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জোট-বাঁধা কর্মিবৃন্দ ইটালী, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মেনী ও বার্লিন, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসতে লাগলো। CERN-এর সদস্য ১৩টি দেশ। যুক্তরাষ্ট্র এই শ্রেণীর না হলেও বৈজ্ঞানিক বিবিধ প্রকল্পে যোগদানে পরাঙ্মুখ নয়। সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও CERN-এর ভাব আছে; এদের মধ্যে দেনা পাওনা সুরু হলো ১৯৬০ সাল থেকে। আন্তঃরাষ্ট্রীয়করণের পরিস্থিতিতে কূট রাজনীতির তোয়াক্কা না রেখে বিজ্ঞানের গবেষণা এগিয়ে চললো।

রাজধর্ম ও পারমাণবিক বিজ্ঞান, এই উভয়ের মধ্যে দস্তুরমত বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক। তাতে 'ইউরোপীয় পারমাণবিক শক্তিদলের' উদ্ভব। ইউরোপে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঐক্য রচনার প্রথম ধাপে ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মূল প্রস্তাব অনুযায়ী কয়লা ও ইস্পাতের মালিক বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মেনী,

ইটালী, লুক্সেমবুর্গ এবং নেদারল্যাণ্ডসকে নিয়ে উপরিউক্ত 'ছয়ে'র জন্ম। Euratom যে যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছে, তার কারণ পারমাণবিক শক্তিকে ইউরোপীয় ঐক্যের অন্যতম অবলম্বন বলে স্বীকার করে নেওয়া। ১৯৫৭ সালে রোমে 'ইউরোপীয় পারমাণবিক শক্তিদল' ও 'ইউরোপীয় আর্থিক সমবায়'—(EEC) দুটি চুক্তি একই সময়ে স্বাক্ষরিত হলো। Euratom EEC-এর শাখা। এর চুক্তিপত্র বা আমলানামা পক্ষপাত-দোষে অসম্পূর্ণ; দৃষ্টান্ত—ফ্রান্সে দেশের প্রতিরক্ষাকল্পে তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ Euratom-এর তাবের বাইরে রাখা হয়েছে। তবে একটা স্পষ্ট নিষেধ ইউরেটম কমিশনের ইস্তাহারে পাওয়া যাচ্ছে: EEC-তে যাবৎ পদার্থ আমদানী হবে, তা প্রতিরক্ষার্থ ব্যবহার বিগর্হিত।

১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে Euratom-এর সহায়ে ইউরোপের ছয়টি দেশে উৎপাদ্য পারমাণবিক শক্তির পরিমাণ ও উৎপাদন-নীতি নির্ধারণে প্রবৃত্ত হতে দেখা যায়। Euratom-এর বিরোধী দলের মনে একটা খট্‌কা বাধলো এই জন্যে যে, মার্কিন সংগঠন IAEA-এর সঙ্গে এই নিয়ে যে মোকাবিলা বা বোঝাপড়া করা উচিত ছিল, তা হয় নি। তাই এই খাতিরনাদারৎ দলের মধ্যে একটা বিক্ষোভের ভাব জাগলো। যাহোক, যৌথ বিবৃতি মতে Euratom-কে মার্কিন দেশের উপরোধে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ১ মিলিয়ন মেগাওয়াট শক্তি প্রজননের ছয় থেকে আটটি পরমাণু-চুল্লি ১৯৬৩ সালের মধ্যে চালু করতে হবে, ধার্য হলো। যৌথ বিবৃতিমত সমস্ত যোগান দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠলো না। ইটালীর SENN, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম দেশীয় SENA এবং জার্মানীর তটস্থ KERB কারখানাগুলি যৌথ বিবৃতির অনুরূপে একেবারে লক্ষ্যে পৌঁছুতে না পারলেও Euratom-এর ভিৎ পাকা করতে অবশ্য সহায়তা করলো।

শান্তির পথ বিপদাত্মক

কৃষি, শিল্প ও ভৈষজ্যের সাবেক রূপ আর থাকছে না। উঠতি কারবারে বিকিরণ সমস্থানিকের ব্যবহারের মাত্রাও সীমা ছাড়িয়ে চললো। তেজস্ক্রিয় কণিকার অবাধ গতিবিধির বিভীষিকা প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বাড়ছে। ছিটিয়ে-যাওয়া তেজের কণার ঝাঁজ সামান্য হলে, অনিষ্ট বলতে হয়তো স্বল্পসংখ্যক মানুষের বা জীবিতের প্রাণ বা স্বাস্থ্যহানি ঘটবে। চতুর্দিকে ভূরি পরিমাণ উন্মার্গগামী তেজস্কণার আমেজে বহুসংখ্যক জীব ও জনাকীর্ণ ভূভাগ বিযক্লিষ্ট হবে। ১৯৫৭ সালে বৃটেনের উইণ্ডস্কেলে প্লুটোনিয়ামের পরমাণু-চুল্লির কলে এমনি তেজ-বিচ্ছুরণের দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ঐ অঞ্চলের দুধে তেজস্ক্রিয়তা-দোষ ধরা পড়বার পর দুধ বিতরণ স্থগিত রাখা হলো। পরমাণু-চুল্লিও বেদুরস্ত হয়ে পড়লো। উত্তর মেরু থেকে অ্যান্টার্টিকা, ইন্দোনেশিয়া থেকে কঙ্গো—নানাস্থানে তেজস্ক্রিয় দ্রব্যের পরীক্ষাগার গড়ে উঠছে। বিস্তৃত ভূখণ্ড অপঘাতের এলাকায় প্রবেশ করছে। ক্ষুদ্রাকার নিউক্লিয়ার পরমাণু-চুল্লি তো অগুণতি; পক্ষান্তরে বৃহত্তর উনুনের সংখ্যা ধরাপৃষ্ঠে ও শূন্যে ক্রমাগত বেশী হবে বই কমবে না। বিপদ-গণ্ডীর মধ্যে দুর্ঘটনায় আকস্মিক তেজ-বিচ্ছুরণের যাচ্ছেতাই ফল স্বতঃই সহজরূপে প্রতিভাত হবে। ইজরেইলে যখন রেহভতে ভাইজম্যান ইনস্টিটিউটের ৫০০০ কিলোওয়াটের গবেষণা-চুল্লি অর্থাৎ ঐ দেশের প্রথম পারমাণবিক উনুনের শিলান্যাসের কথা উঠলো, অধিনায়কেরা অবিলম্বে স্থান নির্বাচনের পরিকল্পনা বদ্‌লে ফেললেন; কারণ রেহভতে আকস্মিক তেজোদ্দীরণ নিবন্ধন দেশবাসীর

যাবতীয় জলের উৎস বিষাক্ত কণিকায় ভরে যেতে পারে। শেষে রেহভতের উত্তর-পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে নেবিরুবিনে উনুন বসানো গেল। ইজরেইলের যুক্তি অকাট্য: যদি মিশর উপরচড়া বিবাদে তেজের ঢেলা ছুঁড়ে পারমাণবিক আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়—শূন্য ও সমুদ্রপথে সুদূরব্যাপী তেজস্ক্রিয় পদার্থগত তেজঃস্পন্দন মিশরকেও আহত করবে। অতএব সমুদ্রোপকূলের উনুনে মিশরের বোমা নিক্ষেপের পক্ষে কোন সুযুক্তি ছিল না। দুর্ঘটনা বা যুদ্ধ ছাড়াও সম্প্রতি পারমাণবিক জ্যোতিষ্কণার অধিকতর বিকিরণ হবার হেতু একাধিক। বিশেষতঃ পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণাদি উপচারে সংযম আবশ্যক।

আদিম প্রকৃতিগত তড়িতাবিষ্ট তেজের ধারাপাতে আমাদের বিশ্ব ও পৃথিবী নিরন্তর স্নাত হয়ে এসেছে। এই তেজোধারার স্বরূপ কি অথবা বিশেষ বিশেষ মৌলিক পদার্থের স্বয়ংক্রিয়তার মূল কোথায়—অনুসন্ধান করে যাঁরা সর্বাপেক্ষা বেশী কীর্তি অর্জন করেছেন, তাঁরা পিয়ের এবং মেরি কুরি। এই দম্পতির নামে কতিপয় পারিভাষিকের প্রচলন হয়েছে। তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ একক বা তেজস্ক্রিয়তা এককের প্রতিশব্দ কুরি (The curie)। তেজস্ক্রিয় বস্তুর এক কুরি সক্রিয়তা অর্থে বোঝায়, এই বস্তুর পরমাণুগুলির প্রতি সেকেণ্ডে ৩৭ বিলিয়ন নিউক্লিয়ার পরিবর্তন ঘটছে। কুরিদের আবিষ্কৃত রেডিয়াম এক গ্র্যাম যখন ভাঙে, অনেকটা এই উপরিউক্ত হারে খণ্ড খণ্ড হয়। এক কুরিতে তেজোদ্গীরণ অথবা বিকিরণের পরিমাণ নিতান্ত অল্প নয়। তবে এতে প্রাণীমাত্রের শরীরে কি পরিমাণ অনিষ্ট হয় তার আঁচ করা যায় না। মুশকিল এই যে, মানুষের অনিষ্ট উৎপত্তির হেতু অন্য গুটিকতক ব্যাপারের মধ্যে: যেমন—বিকিরণের ধরণ কি, ক্ষমতা কতখানি ও শরীরের অবস্থাভেদে এর প্রয়োগে কীদৃশ ফল ইত্যাদি বিচার চাই। কোন কোন অবস্থায় হয়তো এক কুরির মিলিয়নাধিক অংশ তেজস্ক্রিয়তায় অনিষ্টোৎপত্তি দেখা যায়; আবার সাময়িক অনেক কুরি তেজোদ্গীরণেও জীবদেহে অনিষ্টপাত দর্শে না। বিকিরণ বা তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা যেমন-তেমন হোক—যথাযথ যোগাড়যন্ত্রের দ্বারা মোটামুটি এর প্রায়োগিক ফল জীবদেহে হিতকারী। দৃষ্টান্ত স্থলে—ক্যান্সার রোগে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট ধাতু-ঘটিত বিকিরণ-চিকিৎসা; তদ্রূপ Angina pectoris-রোগে বিকিরণের মাধ্যমে চিকিৎসা।

নানা বিকিরণ সমস্থানিকের প্রয়োগ-বিধিতে শুধু এক কুরির সহস্র বা মিলিয়নাংশই প্রশস্ত। নিউক্লিয়ার উনুন আবিষ্কৃত হবার আগে প্রাকৃতিক পদার্থ থেকে ভৈষজ্য ও শিল্পের প্রয়োজনে মাত্র গুটিকয়েক কুরি তেজস্ক্রিয়তা কষ্টেসৃষ্টে উৎপাদিত হতো। এখন নিউক্লিয়ার উনুন ধরানোর দরুণ লক্ষ লক্ষ কুরি অনায়াসে পাওয়া যাচ্ছে। এই উনুনের পাকে অযাচিত লক্ষাধিক কুরি উপচিত হয়। সমস্তই পারমাণবিক বিভাজন-সঞ্জাত—ফালতু জিনিষ।

হালে তেজস্ক্রিয় বস্তুর বেআব্রু হবার ধাঁজ অত্যদ্ভুত। নিউক্লিয়ার উনুনের বর্জ্য বা অখাদ্যে-অবস্তের (Waste product) পেটিকা ভূগর্ভে কিংবা সমুদ্রের তলদেশে গোর দেওয়া হলে তারপর অতর্কিতে খোয়া গেলে বিষম বিঘ্ন-বিপদ। বলা বাহুল্য তেজস্ক্রিয় বস্তুর বেআব্রুতা হেতু অঘটনের ভয়ে পারমাণবিক শিল্পকর্মে অলসগমনে যাত্রার চেষ্টা আক্কেল-সেলামি বই আর কিছুই নয়। পরিণাম যাই হোক, শান্তি প্রতিষ্ঠার-উদ্যোগে অবিশ্রাম ব্রতী থাকাতেই ইষ্টাপত্তি। তেজোগর্ভ পরমাণুকে বেসামাল হতে না দেওয়াই বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অপরিহার্য প্রভাবের লক্ষণ। ভাবগতিকে বোধহয় মানুষ প্রাযুক্তিক পারমাণবিক

শক্তিকে বিজ্ঞানের মূল্যায়ন ও মান উন্নয়নের উপযুক্ত মাধ্যমের ছাঁচে ঢালাই করে নেবে।

১৮৯০ সাল নাগাদ বিশ্বের নিউক্লিয়ার শক্তি শিল্পের বাড়ন্ত অবস্থায় লক্ষ লক্ষ গ্যালন বর্জ্য পদার্থ তৈরির সম্ভাবনা। সামরিক উপাদান উৎপাদনের তাগিদে যে পরিমাণ বর্জ্য জমা হয়, তার তুলনায় এ নিতান্তই অল্প। ২০০০ সালে কিন্তু অসামরিক নিউক্লিয়ার শক্তি থেকে ন্যূনাধিক ১০০ মিলিয়ন গ্যালন বর্জ্য উৎপন্ন হতে পারে। এই উভয় সঙ্কটে সচরাচর সামরিক রাজসংসারের উপর বিকিরণের যে দোষ চাপানো হতো, তারও বেশী দোষ তখন অহিংস পারমাণবিক শিল্প-বিজ্ঞানীদের গায়ে লাগবার কথা। উল্লিখিত সুপ্রচুর বর্জ্যের বিনষ্টি বা বিলিবন্দেজ সামরিক ও অসামরিক পারমাণবিক শক্তির বৈরাজ্য হেতু প্রয়োগ-বিদ্যা ও নিরাপত্তার সমস্যাকে অসংশয়িতভাবে ঘনীভূত করে তুলবে।

পনেরো বছরেরও অধিক কাল ধরে ওয়াশিংটনের হ্যানফোর্ডস্থিত প্লুটোনিয়াম নির্মাণশালার বহু মিলিয়ন কুরি তেজস্ক্রিয় আবর্জনা বিভিন্ন স্থানে রসাতলে পৃথক পৃথক বিরাট গহ্বরে সমাধিস্থ করা রীতি। পৃথিবীর অতি-তেজস্ক্রিয় আবর্জনাসমষ্টির শতাংশের অন্ততঃ ৯৯ অংশ—বা গুচ্ছের নিউক্লিয়ার অস্ত্র নির্মাণ কারখানায় ইস্তক নাগাদ জমছে—সবই ঐরূপ গহ্বরে নিকাশ দেওয়া হয়েছে। এই ঢঙের কবরখানায় গোর দেবার ক্রিয়া স্বল্পব্যয়ে সমাধা হয়। ভূগর্ভে পোঁতবার জন্যে স্থানাভাবের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মাটির তলায় সমাধি-গৃহের অধিক কাল স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হওয়া কঠিন। এমন ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাতে কবরখানা কোন প্রকারে বেগোছ হয়ে পড়লে তেজস্ক্রিয়তার কলুষ বিশাল ভূখণ্ডে ও অন্তর্ভৌম নদী-নালায় সংক্রামিত না হয়। এই মুস্কিল-আসানের জন্যে গোর দেবার নিরাপদ স্থান নির্বাচনের কর্তব্যে ঢিলা দেওয়া চলবে না। আতালে-পাতালে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের ডাঁইর দফানিকাশ কিসে পুরাদস্তুর হবে, তা আন্তর্জাতিক নীতিগতভাবে পরীক্ষা করা দরকার। উইণ্ডস্কেলের বৃটিশ প্লুটোনিয়াম কারখানার মাসিক জমা হাজার হাজার কুরি তেজস্ক্রিয় বর্জ্য আইরিস সাগরে নস্যাৎ করা হয়। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে প্রধানতঃ গবেষণার পরমাণু-চুল্লি ও সমস্থানিকের প্রকরণাগার থেকে এক বিশেষ প্রকারের প্রায় ৮০০০ কুরি তেজস্ক্রিয় ওঁচলা শুধু এক আতলান্তিক উপকূলে ফেলা হয়েছে। এই ওঁচলার পরিমাণ আরও বাড়বে। সমুদ্রে আবর্জনা ফেলাছড়ার তল্লাট বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রিক এখতিয়ারের মধ্যে নয়। সমুদ্রের সব গোরস্থান যাতে মারাত্মক বর্জ্য বস্তুতে কলুষিত না হয়, তদর্থে আন্তর্জাতিক সংবিধানে ফাঁক থাকা শ্রেয়স্কর নয়। সমুদ্রে বর্জ্যের হিল্লে লাগাবার বিড়ম্বনা এই যে, নিরাপত্তা বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা নেবার পৈঠা শেষ হলো কিনা, সে সম্বন্ধে লেশমাত্র ইঙ্গিত আগেভাগে পাওয়া যায় না। একটা কথা—আন্তর্জাতিক ভূ-ভৌত বর্ষে সামুদ্রিক গবেষণায় আন্তঃরাজ্য পারমাণবিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচীতে আন্তঃরাজ্য সহযোগিতার খুঁটিটা আঁট করবার স্থির সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

একবার এমন হয়েছিল—ফরাসী সরকারের জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের মত উপেক্ষা করে রিভিয়ারা ও কর্সিকার রাজপুরুষেরা জবাব দিলেন যে, সমুদ্রজলে ওঁচলা ফেলবার পরীক্ষা চালালে অদূরে তাঁদের নিজেদের অঞ্চলে দেশপর্যটকদের সংখ্যা-বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবে এবং দেখতে দেখতে বাজারে মন্দা বাড়বে। এই অভিযোগ খণ্ডন নিয়ে সওয়াল-জবাব বেশ বিদ্‌ঘুটে ভাব ধারণ করলো। ভূমধ্যসাগরের এই ঘটনার পর পারমাণবিক শক্তি দফতরের অধিকর্তাদের তরফে অনুগ্র তেজস্ক্রিয় বর্জ্য জুরা পাহাড়ে নর্দমা খুঁড়ে সমাহিত করবার প্রস্তাব করা হয়। এতেও তাঁদের জবাবদিহি হতে হয়েছে। পশ্চিম গোলার্ধে

১৯৫৯ সালের জুন মাসে মেক্সিকো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মনোবিবাদ বাধলো—যুক্তরাষ্ট্রের এক ব্যবসায়ী দলের মেক্সিকো উপসাগরে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের অন্তর্জলি বিষয়ক অনুজ্ঞাপত্র লাভের বৈধতা নিয়ে। পারমাণবিক শক্তি কমিশন অনুজ্ঞাপত্র না দেওয়াই সাব্যস্ত করলেন। যদি বর্জ্য-ভাণ্ড সমুদ্রগর্ভে খালাস করা হয়ে গেলে ধসকে যায়, তাহলে তো নিস্তার নেই, এই অভিযোগ অখণ্ডনীয়, এই কারণে।

উঠ্তির মুখেই অভ্যুদিত নানাদেশ পরমাণু-চুল্লি প্রসূত তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের দুষ্টগুণ নিয়ে গোলে পড়েছে। উন্নয়নকামী জাতিদের পারমাণবিক বোমা তৈরির তাড়া না হয় নেই। পারমাণবিক সমরাঙ্গনে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের ব্যবহারের দ্বারা অনবরত ধ্বংসের বিভীষিকা সৃষ্টির ক্ষমতা লাভের আকিঞ্চন থাকবে—সেটা আশ্চর্য নয়। পারমাণবিক বোমার তেজোগর্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাবের কাছে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের শক্তি আর কতটুকু সাংঘাতিক? নেহাৎ পরমাণু-চুল্লির উচ্ছিষ্ট এই বর্জ্যস্তূপ—একত্র করে তেজের ঢেলা মারবার কাজে লাগিয়ে—অথবা তেজস্ক্রিয় রদ্দী মাল দূরে যেখানে অন্যেরা গোর দিয়েছে, সে সব জায়গা থেকে নেপথ্যে কুড়িয়ে এনে ঐ এক হানা দেওয়ার উদ্দেশ্যে লাগিয়ে বৈরীদেশের যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতি, আর কিছু না হোক, মনের মধ্যে ত্রাসসঞ্চার করা যায়। এমতাবস্থায় আপদ্ধর্ম রক্ষার্থ তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের সার্বরাষ্ট্রিক হিসাবনিকাশের আটঘাট বাঁধা কায়দাকানুনের আবশ্যকতা দেখা যাচ্ছে। হেলায় ছড়িয়ে-যাওয়া, আঢাকা তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের কণা দৈবাৎ যুদ্ধের অছিলায় অহেতুক অনিষ্টাচরণের জন্যে, যে কারণেই হোক—স্বদেশে ও পরদেশে বিভীষিকার হাওয়া ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পোক্ত। ধারাবাহিকভাবে তেজস্ক্রিয় আবর্জনাপূর্ণ গোরস্থানসমূহ সার্বরাষ্ট্রিক আলোচনা ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার পরিধিগত করতে পারলে সুফল। যে সব দেশের সেলাখানায় বিস্তর নিউক্লিয়ার জঙ্গী হাতিয়ার আমানত রাখা হয়েছে, তাদের কাছে তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের ভার নজ্জার পদার্থের আণ্ডিলের সামরিক দুষ্টগুণ সামান্য। এদের পক্ষে দ্বিধান্দোলিত না হয়ে যাবতীয় বর্জ্য উচ্ছিষ্টের সৎকারের ব্যাপক সংবিধান মেনে নেওয়া ও সার্বরাষ্ট্রিক তদন্তের ক্ষেত্র বিস্তৃত করে অনুশাসন ও ফিরিস্তি তৈরি করা আদৌ বিসদৃশ নয়। তদ্দরুণ পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পকে দস্তুরমত অগ্রাধিকার দেবার রেওয়াজও বাড়বে।

তেজস্ক্রিয় কণিকা-স্রোতের দূরব্যাপী দীর্ঘগতি ও সংক্রামণ-ক্ষমতাকে খর্ব করবার একটা উপায় রাসায়নিক পদার্থের রূপ ও গুণ পরিবর্তনের কার্যক্রম বদ্লানো। করিতকর্মা বিজ্ঞানীর কাছে এ সুস্পষ্ট সত্য।

রাসায়নিক কাঁচা ধাতুর রূপপরিণামের (Ore processing) সময় নির্মাণশালায় ইউরেনিয়াম জমা হতে থাকলে এই ধাতুজ বর্জ্যের দফানিকাশ করতে হয় কাছকাছি স্রোতস্বতীর জলে বিসর্জন দিয়ে। এই বর্জ্যের মধ্যে যে পরিমাণ রেডিয়াম ও অন্য তেজস্ক্রিয় বস্তু আছে, জীবজগতের দৈনন্দিন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে তা নেই। শক্তির আঘাত-প্রতিঘাতে উপজাত তেজস্কণা বা তার আমেজ ঐসব বর্জ্য ওরকে বিসর্জিতের মধ্যে ঢের বেশী। তাই দরিয়ার জলে তেজের তাড়নার জোর এমন হয়, যা মানুষের ধাত ছেড়ে যায়। আশেপাশের আবাসিকেরা ঐ জল খেলে ধাতসহ হবে না। ঐ জলসিক্তি তটভূমির কৃষিজাত ফসলে পারমাণবিক তেজ অস্বাভাবিকরূপে ঠিকরে বেরোবে। বাস্তবিকই, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম কলের কাজ-কর্মে নিরাপত্তার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংবিধান অত্যন্ত আবশ্যক। পারমাণবিক বোমা ফাটাবার

মহড়া দেওয়ায় স্ফুলিঙ্গ বর্ষণের বিপদ যেটুকু, রঞ্জী বর্জ্যের অন্ত্যেষ্টিতে শৈথিল্য বা গাফিলতিতে তাদৃশ আশঙ্কা অধিকতর।

ক্রমিক বিকাশের সোপান-পরম্পরা অবলম্বন করে শুধু ভূলোকে নয় বিশাল শূন্যে, তথা সৌরজগতের নানা গ্রহ-উপগ্রহে তেজস্ক্রিয় অপবস্তুর প্রবল অভিঘাত একনাগাড়ে বেড়েই চলবে। আকাশ-পরিক্রমায় প্রযুক্ত বিজ্ঞানের কেরামতিতে বিমানযানে নিউক্লিয়ার শক্তি বা ব্যাটারী প্রভৃতির নিযোগ নিয়ে বিজ্ঞানীরা মনে কত তোলাপাড়া করছেন। বিমানযান মারফৎ অপর্যাপ্ত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে ও সৌরলোকে গ্রহাদিতে কোথায় কোথায় আনীত ও বিসর্জিত হবে, সে বিষয়েও জল্পনার শেষ নেই। নভোমণ্ডলে রকেটের নিউক্লিয়ার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির তেজ বিকিরণের আদিখ্যেতা যদি হয়, তারও টাল সামলানো দরকার। আকাশে দুষিত তেজের জমট গাঁথনির রহস্যভেদ করতে বিজ্ঞানী বদ্ধপরিকর হচ্ছেন, আকাশের শালীনতা ও স্বাস্থ্য অটুট রাখবার জন্যে। এদিক থেকেও বিরাট পরমাণুলোকে অভিনব মহাকাশ যুগের সূচনা দেখা যাচ্ছে।

এখনি নিউক্লিয়ার শক্তিতে বহু জলযান সমুদ্রে ভাসছে। তাতে বিভিন্ন রাজ্যের রাজকর্মচারীদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কম নয়। বেলজিয়াম সরকার একটা প্রথা প্রচলিত করেছেন—আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমুদ্রযাত্রার দলিলপত্রের মুসাবিদা যথোচিত সমালোচনা ও অনুমোদনের জন্যে ভারপ্রাপ্ত আমলাবর্গের কাছে পেশ করা। দৈবাধীন দুর্ঘটনায় যাতে IAEA ক্ষতিপূরণার্থে বাদী-প্রতিবাদী রাজ্যবৃন্দের কাজে নিজেদের মোতায়েন রাখতে কসুর না করে, তদুপলক্ষে যাই হোক চেষ্টার ত্রুটি নেই। এমতাবস্থায় IAEA-র করণীয় খেসারতি চুক্তির আইন প্রণয়ন, আন্তঃরাষ্ট্রীয় দাবী নিষ্পত্তি ইত্যাদি। জলে-স্থলে সর্বত্র পরমাণু-চুল্লির দুর্ঘটনায় উচিত সাহায্য বন্টনের ক্ষমতা IAEA-এর হস্তে অর্পিত হওয়া প্রয়োজন। ফলে পারমাণবিক শক্তির পরিরক্ষক ও নিকাশী রূপে IAEA-এর আন্তর্জাতিক খেতাবও অক্ষুণ্ণ থাকবে। পরমাণু-চুল্লির সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা IAEA-এর নিরাপত্তা প্রকল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সমীচীন। মনে রাখতে হবে, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে, ভৈষজ্যবিদ্যায় বা অন্যত্র পরমাণু-চুল্লি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় শিল্পসাধিত্র ও অন্য তেজস্ক্রিয় সরঞ্জামকে বিষমুক্ত রাখা মানুষের সাধ্যায়ত্ত বটে। যে সব শক্তিশালী রাষ্ট্র নিরাপত্তা রক্ষার চেষ্টায় কামাই করেন না, তাঁদের সহযোগে IAEA এতৎসংক্রান্ত প্রশাসন-নিয়মকে অমোঘ করতে পারে। একতম সার্বরাষ্ট্রিক সংগঠনের দায়িত্ব সর্বতোভাবে স্বীকৃত হলে IAEA নিরাপত্তা প্রকল্পের প্রধান পথিকৃৎ রূপে গণ্য হবে।

নিউক্লিয়ার ইন্ধনের পশার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত না হলে ভরসা হয়, আগামী কালে স্বর্ণমানের চেয়ে এই ইন্ধনের মূল্যায়ন ক্ষমতা দাঁড়াবে বেশী। রাষ্ট্রীয় প্রগতির কাঞ্চনমূল্য ঠিক করতে নিউক্লিয়ার ইন্ধনের নামডাকের তুলনা মিলবে না। তথা, ‘প্লুটোনিয়াম মান’ যদি আর্থিক জগতে চালু হয়, সভ্যতায় একটা অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দেবে। এমনিতে সোনার দামের দশ গুণ নিউক্লিয়ার ইন্ধনের দাম। ভবিষ্যতে সার্বত্রিক বহুল প্রয়োগ হলে এই জ্বালানি সোনার দরে সস্তায় বিকোবে। সোনার সঙ্গে সমতা রক্ষার সামর্থ্য এই জ্বালানির আরেক দিক থেকে। মনে করা যাক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব কটা বৈদ্যুতিক কারখানা পরমাণু-শক্তিতে সঞ্চালিত করা হলো এবং পরমাণু-চুল্লি যত সব আজীবন চালু থাকলো—তাহলে যে পরিমাণ নিউক্লিয়ার জ্বালানি লাগবে, তার ওজন মাপে আজকাল মার্কিন দেশের তহবিলে যে সোনা-সমষ্টি আছে তার ওজনের প্রায় সমান হবে।

অর্থকরী ইন্ধন কোন্টা. এইটাই মোদ্দা কথা নয়। আসলে ভয়, প্রাণী-জগতে ও রাষ্ট্রে পারমাণবিক শক্তির দোষ সামলাতে চেষ্টা হিসাবে কড়াক্রান্তির এদিক-ওদিক হচ্ছে কি না। এক দিকে পারমাণবিক অস্ত্রাদির উন্নতির পরীক্ষা, অন্য দিকে পারমাণবিক হিংসাত্মক হামলায় আট্‌কা না পড়বার হদিস খুঁজে পাওয়া। এই দুই বিপরীত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পারমাণবিক অস্ত্রবর্জিত সর্বজনমান্য এলাকা অঙ্কিত করা IAEA ও সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থাসমূহের কর্তব্য। ইতানুসারে এদের রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় কর্মপদ্ধতির ইন্তিজাম হওয়া উচিত।

জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের সমন্বয় এক নতুন চেতনা বা শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে ফুটিয়ে তোলবার কথা। অণু-পরমাণুর সঙ্গে জীয়ন্ত মানুষের মনের ভয়াবহ নেতিবাচক সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের অবসান নিউক্লিয়ার শক্তিকে শান্তি, মৈত্রী ও সভ্যতার খাতে উৎসর্গীকৃত করেই সম্ভব। নানা বিদ্যা ও ভাষায় পণ্ডিত বিজ্ঞানী, অর্থশাস্ত্রবিদ্, রাজনীতিজ্ঞ ও অপরাপর বিশেষজ্ঞদের নব শিক্ষণ-প্রণালীতে শিক্ষিত করে এক নতুন পর্যায়ের তুখোড় জ্ঞানী-গোষ্ঠী গঠিত করবার চেষ্টা হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি কমিশনের আদর্শ—অহিংস সভ্যতার ছত্রচ্ছায়ায় পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন ও প্রসার এবং আন্তঃ-রাষ্ট্রীয় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে ইতিকর্তব্য স্থিরীকরণ। এই বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সচিবের কার্যাকার্য উল্লেখযোগ্য। একচেটিয়া বিধান ও সামন্ততন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্রের ফয়সালা দেশের নিঃসংশয়িত কল্যাণ আনয়নে অপারগ। ক্রামিশের ভাষায়—'পারমাণবিক যুগধর্ম অবোঝার কলঙ্ক আমাদের ঘুচলো না। অনেকটা কারণ: রাজধর্মের লজ্‌ঝড় কাজে অভিজ্ঞ না হয়েও উপর-পড়া হয়ে বিজ্ঞানীরা হস্তক্ষেপ করছেন—অব্যাপারেষু ব্যাপারম। আবার প্রতিকূল উদাহরণস্বরূপ, নানা ছাঁদের বৈজ্ঞানিক ফরমান দিচ্ছেন অনেকে, যাঁদের হয়তো রাজনীতিতে ব্যুৎপত্তি প্রশংসনীয় অথচ ভ্রমক্রমে ভাবেন অণু-পরমাণুর নিগূঢ়তম তত্ত্ব জানতে গেলে বেকুব হবেন, নয়তো ভেবে বসেন তাঁরা সবজান্তা।'

ফলকথা, ক্রামিশের সিদ্ধান্ত যদি সমর্থিত হয়, তাহলে বিজ্ঞান ও রাজ্যশাসনকে আড়াআড়ি ভাবে না দেখে তুল্যমূল্য জেনে, বর্তমান যুগে পরিচালন ক্ষমতা শিক্ষাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান মেধাবী, চৌকস ও কর্মী-ব্যক্তিবর্গের হস্তে গচ্ছিত করা উচিত। যাঁরা বিচক্ষণ, বহু বিদ্যায় পারদর্শী, বহুজ্ঞ ও বিধিব্যবস্থা প্রণয়নে কুশলী, রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক বিজ্ঞানের পরিচর্যায় রত, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নির্বিচারে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে খিদমদগার (International civil servant) বা স্বাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতামুক্ত বিশ্ব-নাগরিক, তাঁরাই অপরের সঙ্গে যুক্তভাবে শান্তিরক্ষার ব্রত উদ্‌যাপনের অধিকারী। বিজ্ঞানবাদী যুদ্ধনীতিকে গণতান্ত্রিক পথে চালনা করবার জন্যে প্রয়োজন পারমাণবিক শক্তিধর ছোট-বড় সব রাষ্ট্রেই নতুনতর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত করা। যাহোক, এই কঠিন কর্তব্যের দিশ্‌পাশ নেই, মনে করা অন্যায় হবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক প্রমুখ কর্তৃপক্ষীয়দের সাহায্যের জন্যে লেখক কৃতজ্ঞ।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

বর্তমান শিক্ষা

শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি ছাত্রের শরীর, মন, অন্তর্নিহিত শক্তির যা কিছু ভাল, তার পূর্ণবিকাশ। এই বিকাশ সাধনের ভার রয়েছে সমাজের প্রত্যেকটি হিতকামী মানুষের উপর। তাই শুধু শিক্ষককে দোষী করে অন্যের দূরে সরে দাঁড়ালে চলবে না। বর্তমান শিক্ষার দোষগুণ বিচার করে ছাত্রের মঙ্গলময় সুপ্ত শক্তির পূর্ণবিকাশের পথে একজনকে আর একজনের পাশে এসে সহায়তা করতে হবে। বর্তমান শিক্ষার চিত্র যে কত ভয়াবহ, তা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলবো। একটি অনার্সের ছাত্র পরীক্ষা দিয়ে এসে বললো, সার! আমি যদি অন্য কয়েক জন ছাত্রের মত দেখাদেখির পথ বেছে নিতাম, তাহলে বোধ হয় আমার ফল অনেক ভাল হতো। আমার চোখের সামনে দেখলাম, যাদের পড়াশুনা একেবারেই হয় নি এবং যারা পরীক্ষায় ভাল করতে পারবে না বলে জানতাম, তারা ঐ পথ ধরে আমার চেয়ে খুব ভালভাবে উত্তর দিয়ে চলে গেল। আর একটি পাশ কোর্সের ছাত্র প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিয়ে এসে বললো, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখলাম যে, মোটা টাকা দিলে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা সহজেই পাশ করা যায়। তাহলে কি বর্তমান শিক্ষায় ছাত্রের অন্তরের অকল্যাণকর বৃত্তির বিকাশ হয়েছে? তা না হলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসৎ উপায় অবলম্বন করে পাশ করা যায় এবং প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় শুধু অর্থের বলে সব কিছু হাতের কাছে পাওয়া যায়, এই ধারণা এলো কোথা থেকে? আবার অভিযোগ ওঠে—পড়ানো হলে তো ছাত্রেরা পাশ করবে! যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অসাধু উপায় স্থান পেয়েছে, সে দেশের ছাত্রদের পড়ানো হলেই কি তারা মন দিয়ে পড়া শুনবে? বাজারে চালু পরীক্ষার সমাধান, সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি বই তো তারা স্কুল-কলেজে ভর্তির সময়েই কেনে, কোন শিক্ষকের দেওয়া নোট বোধ হয় পরীক্ষার সময় কাছে থাকেও না। আবার অনেক সময় কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন পেলেই তারা তৃপ্ত হয়। সময় সময় তাদের নির্দেশ শিক্ষকের শান্তি বিপর্যস্ত করে—এই নির্দেশ অমান্যে শিক্ষকের জনপ্রিয়তা হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়, কর্তৃপক্ষের বিবেচনার স্তরে। সুতরাং তথাকথিত যোগ্য ও প্রিয় শিক্ষক গুরু বিষয়ের ধার দিয়েও যান না এবং যাঁরা অতটা লঘু হতে পারেন না, তাঁরা দিনে দিনে যোগ্যতা হারান। সময় সময় শিক্ষকের যোগ্যতা ও চরিত্র সম্বন্ধে এমনই মনোভাব ছাত্রের মনের মধ্যে কোন অশিক্ষক জাগিয়ে দেন, যার ফলে ছাত্রের শিক্ষকের উপর কতটুকু নির্ভরশীলতা ও শ্রদ্ধা থাকে, তা বলা কঠিন। তাই দার্শনিক শিক্ষক অশিক্ষকের কাছে এক অসুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নন। অথচ প্রকৃত শিক্ষক বলতে আমরা তাঁকেই বুঝি, যিনি স্বভাবসিদ্ধ, যিনি নিজগুণে জ্ঞান দান

করেন, যিনি নিজের অন্তরের শিক্ষাকে অন্তরের সামগ্রী করেন, যাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে সকল শক্তির সঞ্চার হয়। সুতরাং কোন বিষয়ের প্রতি ছাত্রের অনুরাগ জাগানোই শিক্ষকের কাজ। কিন্তু বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে ছাত্রের এই অনুরাগ জাগানো এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ যেখানে ছাত্রের বিরাট সমাবেশ, সেখানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কোথায়? ছাত্রের পাঠের অগ্রগতি সম্বন্ধে শিক্ষকের মন্তব্যে যদি গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তবে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কোথা থেকে আসবে? এখানে যে অনুরাগ জাগাবার কথা বললাম, তার জন্যে শিক্ষককে ধরে-বেঁধে নিয়মের অধীন করে রাখলে কোন ফল হবে না। এর জন্যে প্রয়োজন পরিবেশ এবং এই পরিবেশ থেকে জাগে শিক্ষকের কর্তব্যবোধ। সুতরাং এই কর্তব্যবোধ বাস্তব অবস্থা নিরপেক্ষ নয়। অভাব-অনটনের মধ্যে থেকে কর্তব্যবোধকে কি বাঁচিয়ে রাখা যায়? শুধু কথায় শিক্ষক সমাজের মেরুদণ্ড, সমাজের অগ্রগণ্য বললে তো আর শিক্ষকের কর্তব্যবোধ জাগবে না! তাঁকে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবার সুযোগ দিতে হবে। তার সচ্ছল ও আদর্শ জীবনযাত্রা দেখেই তো ছাত্রের শ্রদ্ধা বাড়বে। সুতরাং শিক্ষকের সচ্ছল জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের শ্রদ্ধা না বাড়লে শুধু মন্তব্য বা অভিযোগের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে না। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, শিক্ষক যন্ত্র নন, তাঁর অবসর চাই। কারণ বিদ্যার জমানো ফসলে কি শিক্ষকের চলে? তাঁকে বিদ্যার ফসল ফলাবার ভারও নিতে হবে। তাই শিক্ষকের চাই যথাযোগ্য মর্যাদা, অর্থ এবং উপযুক্ত অবসর।

শ্রীশান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান-সংবাদ

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাকাশের উল্কাকণা সম্পর্কে তথ্য-সংগ্রহ

মহাকাশে অতি দ্রুতগতিতে ধাবমান উল্কাকণার আঘাতে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত তিনটি মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহের সুদীর্ঘ পাখ্‌নায় ১১০০টিরও বেশী ছিদ্র হয়েছে। উল্কাকণার আকৃতি ক্ষুদ্র বালিকণা থেকে সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের মত হয়ে থাকে। মহাকাশযানের যেখানে মহাকাশযাত্রীরা বসেন, সেখানে অথবা ইন্ধনাধারে ছিদ্র হলে তার পরিণতি গুরুতর হতে পারে। এজন্যেই ভবিষ্যতে যে সকল মহাকাশযান নির্মিত হবে, বিশেষ করে মহাকাশযানের ঐ সকল অংশ যাতে উল্কাকণার আঘাত থেকে রক্ষা পেতে পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখেই নির্মাণ করতে হবে। তারই জন্যে এই সকল উল্কাকণা এবং আঘাত সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। মহাকাশযান যত বড় হবে, এই আশঙ্কাও থাকবে তত বেশী।

উল্লিখিত তিনটি মহাকাশ যানের পেগাসাস-১ ১৯৬৫ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী, পেগাসাস-২ ২৫শে মে এবং পেগাসাস-৩ ঐ বছরেরই ৩০শে জুলাই মহাকাশে প্রেরিত হয়। প্রত্যেকটিতেই অ্যালুমিনিয়ামের পাতে মোড়া পাখ্‌না আছে। এগুলি দৈর্ঘ্যে ৯৬ ফুট এবং প্রস্থে ১৪ ফুট। এই সকল ডানায় বিদ্যুৎ-শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে। কোন উল্কাকণা যখন ঐ পাখ্‌নাকে আঘাত

করে এবং এর অংশবিশেষে ছিন্ন হয়ে যায়, তখন ছিন্ন অংশটি বাষ্প ও বিদ্যুৎ-পরিবাহী গ্যাসে পরিণত হয়। ঐ গ্যাস বিদ্যুৎ সঞ্চারণে বাধা সৃষ্টি করে। পেগাসাসে নথিবদ্ধ এসব তথ্য ভূতলস্থিত বিজ্ঞানীদের নির্দেশে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাধীনে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়। গত বারো মাসে পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণের পথে কোটি কোটি মাইল ভ্রমণ করেছে। ঐ সময়ের বহু তথ্য এই তিনটি উপগ্রহ সংগ্রহ করেছে ও করছে এবং তিনটিই পৃথিবীতে এই সকল তথ্য পাঠিয়ে যাচ্ছে। পেগাসাস পরিকল্পনা রূপায়িত করছেন আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা।

সৌরশক্তি-চালিত লেসার মহাকাশ গবেষণায় উপযোগী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সূর্যালোক থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে লেসার কার্যকরী করা হচ্ছে। লেসার প্রক্রিয়ায় একটি অতি সূক্ষ্ম অথচ তীব্র আলোক-রশ্মি বিকিরিত হয়, তবে সাধারণ আলোক-রশ্মির মত এই রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে না। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ভবিষ্যতে মহাকাশে বার্তা আদান-প্রদানের কাজে লেসার একটি আদর্শ মাধ্যম হবে। এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেছেন মাসাচুসেট্‌স্-এর সাউথব্রিজের আমেরিকান অপ্‌টিক্যাল কোম্পানীর ডাঃ গিলবার্ট ইয়ং। তিনি বলেন, পরীক্ষার দ্বারা আরও উন্নতি হলে এই প্রক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রটির ওজন হবে মাত্র কয়েক পাউণ্ড এবং মাত্র এক ঘনফুট জায়গা অধিকার করবে। অতি আধুনিক বিমানে অনায়াসে এই যন্ত্রটি সন্নিবিষ্ট করা যাবে। প্রাথমিক যে শক্তি অন্যান্য লেসার সঞ্চয় করে চিরাচরিত আলোক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি থেকে, এই লেসার তা সংগ্রহ করবে সূর্যালোক থেকে। সূর্যালোককে সংহত করলে তা সহজেই একখণ্ড কাঠকে প্রজ্বলিত করতে পারে। কিন্তু লেসার থেকে যে রশ্মি নির্গত হয় তা আরও তীব্র, আরও কার্যকরী। এই বিচ্ছুরিত আলোক এমন ধরণের যে, তা একটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে অপর একটিতে বার্তা বহন করে নিয়ে যেতে পারে। লেসার পাঁচ মাস সূর্যালোকে কাজ করে এক ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। বর্তমানে লেসার যে রশ্মি বিকিরণ করে, তা অদৃশ্য অতিবেগুনী আলোক। ভবিষ্যতে মহাকাশে যে লেসার কাজ করবে, তা যে আলোক বিকিরণ করবে, তা চোখে দেখা যাবে।

নতুন ধরণের বাল্‌ব উদ্ভাবিত

বৈদ্যুতিক আলো যে বিদ্যুৎ-শক্তিতে জ্বলে, তার বেশীর ভাগই আলোতে রূপান্তরিত না হয়ে তাপ-শক্তিতে পরিণত হয়। এই অপচয় কিভাবে নিবারণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে এই ধরণের আলো আবিষ্কারের পথ ধরেই বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা কিছুটা এগিয়ে গেলেও আসল সমস্যা সমাধানের দিক থেকে এখনও তেমন কিছু করা যায় নি।

এই বছরের প্রথম দিকে আমেরিকার জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী এক ধরণের বাল্‌ব তৈরি করেছেন। এতে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে যে পরিমাণ আলো পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ আলো অন্য কোন বাল্‌বে পাওয়া যায় না। এই নতুন ধরণের বাল্‌ব ফ্লোরেসেন্ট বাল্‌ব থেকে তিন গুণ, মার্কারী ভেপার টিউব থেকে দ্বিগুণ এবং সাধারণ ইন-ক্যাণ্ডেসেন্ট বাল্‌ব থেকে ছয় গুণ বেশী আলো দিয়ে থাকে।

ওয়েষ্টিং হাউস ইলেট্রিক কর্পোরেশন এবং সিলভ্যানিয়া ইলেট্রিক প্রোডাক্টস কোম্পানী নামে আরও দুটি প্রখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠান একাজে ব্রতী হয়েছেন।

লিউকালক্স নামে নতুন এক প্রকার সিরামিক বা মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত উপাদান উদ্ভাবিত হবার

ফলে এই নতুন ধরণের আলো তৈরি সম্ভব হয়েছে। এই জিনিষটি উদ্ভাবিত হয় ১৯৫৯ সালে। বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডই হচ্ছে এর মূল উপাদান। মিহি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড চূর্ণকে চাপের দ্বারা কেলাসিত বস্তুতে পরিণত করা হয়। লম্বা ধরণের এই নতুন আলোর বাল্বটি দেখতে অনেকটা বড় শসার মত। এই লম্বা কাচের আধারের মধ্যেই থাকে সিগারেট বাক্সের মত বড় লিউকাল্কে তৈরি বিদ্যুৎ-আলোর আধারটি।

এই ধরণের বাল্বের বিদ্যুৎ-আলোকচ্ছটার আধারটির মধ্যেই থাকে সোডিয়াম বাষ্প। ঐ বাষ্পের মধ্য দিয়ে অতি উচ্চ তড়িৎ-শক্তি প্রেরণ করা হয়। সোডিয়াম বাষ্পের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ প্রেরণ করে আলোর সৃষ্টি পূর্বেও করা হয়েছে। কিন্তু সেই আলোর রং সাদা নয়, হরিদ্রাভ কমলা রঙের। লিউকাল্ক বাল্বে তা হয় না, কারণ সেখানে সোডিয়াম বাষ্পকে অতি উচ্চ তাপে উত্তপ্ত করা হয়। ঐ পরিমাণ তাপে অন্যান্য বাল্বের আধারের কাচ ও স্ফটিক গলে যায়।

লিউকাল্ক বাল্বের পরমায়ু ৬০০০ ঘণ্টা। ফ্লোরেসেন্ট ও মার্কারী বাষ্পের বাল্বের তুলনায় অনেক কম। ফ্লোরেসেন্ট বাল্বের পরমায়ু ১৩০০০ ঘণ্টা এবং মার্কারী বাষ্পের বাল্বের পরমায়ু ১৬০০০ ঘণ্টা। তবে পরমায়ু বাড়াবার জন্যে গবেষণা চলছে।

পৃথিবীতে চাঁদের আলোকচিত্র প্রেরণের বিশেষ ধরণের ক্যামেরা

চন্দ্রলোক থেকে পৃথিবীতে আলোকচিত্র প্রেরণের এক বিশেষ ধরণের টেলিভিশন ক্যামেরা সম্প্রতি আমেরিকায় নির্মিত হয়েছে। এই ধরণের ক্যামেরা এর আগে আর কোন দেশে তৈরি হয় নি।

মার্কিন মহাকাশচারীরা চন্দ্রলোকে গিয়ে যে ধরণের ক্যামেরার সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠাবেন, এটি ঠিক সেই ধরণেরই ক্যামেরা। সুদীর্ঘ যাত্রায় ও চন্দ্রলোকের প্রতিকূল পরিবেশে এটি টিকে থাকবে কিনা, সে সব বিষয়ে বর্তমানে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তাপমাত্রায় পরিবর্তনে এর যন্ত্রপাতির যাতে কোন পরিবর্তন না ঘটে, সেভাবেই এটিকে তৈরি করা হয়েছে। চাঁদে দিনের বেলায় ২৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় যেমন এই ক্যামেরার যন্ত্রপাতির কোন পরিবর্তন হবে না, রাত্রিবেলায় তেমনি তাপমাত্রা -৩০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে নামলেও এর যন্ত্রপাতি অটুট থাকবে।

এই ক্যামেরাটির ওজন মাত্র সাত পাউণ্ড। হাল্কা হওয়ার ফলে মহাকাশ সফরে এবং চন্দ্রলোকে এই ক্যামেরা নিয়ে চলাফেরার পক্ষে কোন অসুবিধাই হবে না।

মহাকাশচারীদের আরও বহু রকমের যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। বেশী ভারী হলে ক্যামেরাটি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। তাছাড়া এটি খুব শক্তিশালীও বটে। চাঁদে আলোর মাত্রা পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। পৃথিবীর উপরে সূর্যের যে আলো পড়ে, তার প্রতিফলিত অল্প আলোতেই উৎকৃষ্ট ছবি এই ক্যামেরার সাহায্যে তোলা যেতে পারে।

চাঁদে দিনে এবং রাত্রিতে ছবি তোলবার জন্যে এই ক্যামেরায় বিশেষ ধরণের দুই প্রকার লেন্সের ব্যবস্থা আছে। দিনে ছবি তোলবার জন্যে আছে সেকেণ্ডারী ইলেকট্রন কণ্ডাকশন ব্যবস্থা। আর একটি লেন্স আছে, যার সাহায্যে মহাকাশযানের ভিতরের দিকের যন্ত্রপাতি এবং কর্মরত মহাকাশ-যাত্রীর ছবি তোলা যাবে। চলন্ত মহাকাশযান অথবা চন্দ্রলোক থেকে পৃথিবীর ছবি তোলবার জন্যে আছে টেলিফটো লেন্স। একমাত্র লেন্স

বদল করা ছাড়া এই ক্যামেরার সব কাজকর্মই সম্পাদিত হবে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়।

মহাকাশচারীদের চন্দ্রলোকে ভ্রমণের সময় এই ক্যামেরার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্যও সংগৃহীত হবে। মহাকাশযাত্রীদের চন্দ্রলোকযাত্রায় দুটি মহাকাশযান ব্যবহৃত হবে। বৃহৎ মহাকাশযানে তাঁরা চাঁদের কক্ষে গিয়ে পৌঁছুবেন। সেখান থেকে আবার ক্ষুদ্রতর মহাকাশযানে তাঁরা চাঁদে অবতরণ করবেন। ক্ষুদ্রতর মহাকাশযানের টেলিভিশন ট্র্যান্সমিটারের সঙ্গে ঐ ক্যামেরার সংযোগ থাকবে ৮০ ফুট দীর্ঘ একটি রজ্জুর মাধ্যমে।

মাত্র ছয় ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তিতেই এটি চালু হবে। মেরিল্যাণ্ডের বাল্‌টিমোরে অবস্থিত ওয়েষ্টিং হাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশন এটি তৈরি করেছেন। জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার টেক্‌সাস রাজ্যের হিউষ্টন কেন্দ্রে এর গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

বসন্তরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

এই বিষয়ে এ. লেভিনা লিখেছেন—৩১০০ বছর আগেকার মিশরের এক পেপিরাসে ভয়াবহ এক মহামারীর বর্ণনা পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বসন্তরোগে গোটা দেশকে দেশ ধ্বংস করে দিত এবং আজকালও এই রোগে বছরে ৩০,০০০ লোকের প্রাণহানি ঘটে।

মস্কো ভাইরাস গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণের একেবারে কেন্দ্রস্থলে একটি সাধারণ ভবন রয়েছে। বসন্তরোগের বিরুদ্ধে আক্রমণের কেন্দ্রস্থল হলো এটি। এখানে ইনস্টিটিউটের বসন্তরোগ বিভাগে বছরে তৈরি হচ্ছে ১৪ কোটি মাত্রা বসন্তরোগের টিকা। এই টিকার অধিকাংশই ভারতকে দেওয়া হয়ে থাকে।

বীজাণুমুক্ত পোষাক পরেই মাত্র আপনি কাচের আড়ালের পিছনে কুঠুরিগুলিতে ঢুকতে পারেন। ডাঃ ইনা নস্কোভা রেফ্রিজারেটর থেকে একটি কাচের পাত্র বের করে আনলেন। এরূপ প্রতিটি পাত্রে থাকে শত শত কোটি ভাইরাস। কিন্তু এগুলি থেকে তখনও বহু বিজাতীয় মাইক্রোবোরা অপসারিত করতে হয়। পরিষ্কার করবার প্রক্রিয়াটি বহুবার চালানো হয়—শেষবার সেণ্ট্রিফিউজে। 'পরিষ্কৃত' ভাইরাসকে একটি বিরাট বোতলের মধ্যে টেনে নিয়ে আসা হয়। তারপর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে একে পেপটোনের সঙ্গে মিশ্রিত করে টিকা তৈরি হয়।

উৎপাদন সংগঠিত করবার পরেও কনভেয়ার যন্ত্র অনর্গল চালু করে রাখা অসম্ভব। শততম বা সহস্রতম যাই হোক, প্রতিটি লটের টিকা প্রথমটির মতই অখণ্ড মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। শুদ্ধকরণ বিভাগের প্রধান বি. এম. পারিঝ বলেন—আমাদের মাল ৯৯.৯ শতাংশ নিরাপদ হলেও তা নষ্ট করে দিতে হবে। ১০০ শতাংশ নিরাপত্তা চাই। সে জন্যে টিকার ব্যাপারে আমাদের কাজের মূল চাহিদা হলো বীজাণুমুক্তিকরণ।

একটি হলে রয়েছে বিরাট হার্মেটিক শুদ্ধকরণের যন্ত্র। এখানে টিকা শুকানো হয়। উচ্চ বায়ুশূন্য অবস্থায় অ্যামপিউল থেকে তরল পদার্থের বাষ্পীভবন করা হয়। তারপর যা থাকে, তা সাদা শক্ত বড়ি—শুক্‌নো টিকা। এই শুষ্ক করা টিকা +৪৫° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায়ও সংরক্ষণ করা যায় এবং এর কার্যকারিতা হ্রাস পায় না। এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই টিকা গরমের দেশ ভারতে ব্যবহার করা হয়।

পরবর্তী পদক্ষেপ হলো অ্যাম্‌পিউলগুলিকে সীল করা। এগুলিকে একটির পর একটি করে সাজানো হয় এবং নিরাপদভাবে সীল করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, যখন পৃথিবীর সমগ্র জনসমষ্টিকে বসন্তরোগের টিকা দেওয়া যাবে, তখন অশুভ ব্যাধিসমূহের তালিকা থেকে এই ব্যাধির নাম কেটে দেওয়া সম্ভব হবে। আজ হোক কাল হোক—এ ঘটবেই।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর—১৯৬৬

১৯শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

বুনো রাজহাঁসেরা দীর্ঘ পথযাত্রার সময় এরকম দীর্ঘ লাইন করে চলে এবং পরস্পরের মধ্যে সর্বদা একই ব্যবধান রক্ষা করে।

করে দেখ

স্বয়ংক্রিয় সাইফন

সাইফনের কথা এর আগেও তোমাদের বলেছি। এবার আর এক রকম সাইফনের কথা বলছি। প্রায় আড়াই সেণ্টিমিটার ব্যাসের ৮ কি ১০ সেণ্টিমিটার লম্বা দু-মুখ খোলা একটা প্লাষ্টিক অথবা কাচের চোঙ যোগাড় কর। এই চোঙের দু-মুখ এঁটে দেবার জন্যে দুটা কর্ক্‌ও যোগাড় করতে হবে। একটা কর্কের মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র কর, অপর কর্ক্‌টাতে পাশাপাশি দুটা ছিদ্র করতে হবে। মাঝখানে ছিদ্র করা কর্ক্‌টার মধ্যে ছোট্ট একটা কাচের নল ঢুকিয়ে দাও। নলের দু-দিকের খানিকটা
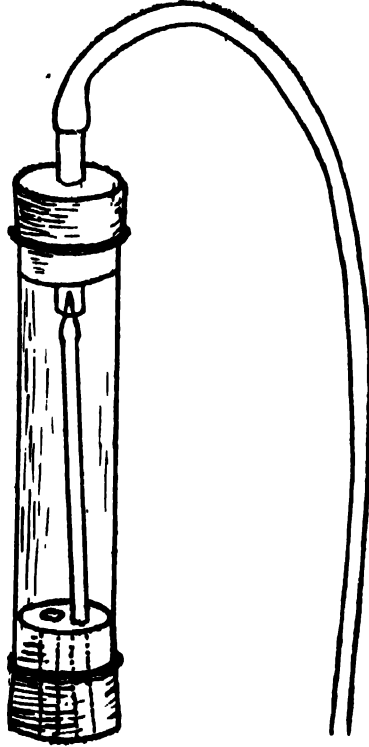
যেন কর্কের বাইরে বেরিয়ে থাকে। এই কাচের নলের উপরের প্রান্তে বেশ লম্বা একটা রবারের নল পরিয়ে দাও। এবার নল সমেত কর্ক্‌টাকে মোটা কাচের চোঙটার উপরের মুখে বেশ করে এঁটে বসিয়ে দাও। দুটি ছিদ্রযুক্ত কর্ক্‌টার একটা

ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পিপেটের মত সরু মুখের একটা কাচের নল এমনভাবে বসাও যেন সরু মুখটা উপরের কর্কের মধ্য দিয়ে বের-করা নলের কিছুটা ভিতরে ঢুকে যায়। এই কর্কের অপর ছিদ্রটা যেমন আছে, তেমনই থাকবে।

এবার জল ভর্তি একটা বালতি টেবিলের উপর রাখ এবং কর্ক্-আঁটা চোঙটাকে বালতির জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। রবারের নলটা মেঝেতে রাখা একটা পাত্রের মধ্যে নামিয়ে দিতে হবে। দেখবে, বালতির সবটুকু জলই কানার উপর দিয়ে রবারের নলের সাহায্যে নীচে চলে আসবে। ছবিটা ভাল করে দেখে নাও—কি করতে হবে সহজেই বুঝতে পারবে। ডুবিয়ে দেওয়া মাত্র সাইফনের কাজ আরম্ভ না হলে চোঙটাকে একটু নেড়েচেড়ে ঠিকভাবে বসিয়ে দিলেই হবে।

—গ—

প্রজাপতি

প্রাণিজগতের ইতিহাসে প্রজাপতি এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। পৃথিবীতে জীবনের প্রারম্ভ থেকে একটি সুর বেজেছে—সংখ্যা বৃদ্ধির দুর্দম কামনা—সুন্দর এই পৃথিবীকে উপভোগ করবার দুর্জয় অভিলাষ—যার ফলে হয়েছে সংখ্যাধিক্য। আর তারই দরুণ জীবনসংগ্রামের অধ্যায় হয়ে উঠলো জটিল। সেই সন্ধিক্ষণে এগিয়ে এলো সন্ধীপদী প্রাণীরা। যাদের জীবনে এলো স্বচ্ছন্দ বিহার—গতি হলো সহজ, সাবলীল। তাদেরই এক শ্রেণী হলো পতঙ্গ। তারা মাটি ছেড়ে আকাশে পাখ্‌না মেললো। প্রাণীদের মধ্যে এরাই জুগিয়েছিল আকাশে-বাতাসে বিচরণের প্রেরণা, আর আজ তার সার্থক রূপায়ণ বিহঙ্গকুলে। প্রজাপতি এই পতঙ্গ শ্রেণীরই একটি প্রজাতি।

পৃথিবীর সব মহাদেশেই এরা অল্প-বিস্তর ছড়িয়ে আছে। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ অথবা পাতা-ঝরা শীত ছাড়াও বসন্তের অভিসারে এদের আমন্ত্রণ বাদ পড়ে নি। গভীর গহন অরণ্যানী, পর্বতের শিখরদেশ, হ্রদ ও উপত্যকার মনোরম পরিবেশ অথবা প্রান্তরের সবুজ ঘন ঘাসে ঘাসে কিংবা পঙ্কিল এবং কুয়াসা-ঘেরা পরিবেশে প্রজাপতি পাখ্‌নার বর্ণাঢ্যের পরিপাটিতে ধরিত্রীকে করে তোলে রঙ্গময়ী। রামধনুর বর্ণালী আমাদের মনে দোলা দেয়—পৃথিবীর সকল রঙের সমন্বয় দেখি সেখানে। ফুলের আসরে প্রজাপতির বর্ণচ্ছটা যেন রামধনুকেও ম্লান করে দেয়।

আর্জিনিসের ঘন সবুজ রং, মরফিনী সম্প্রের আসমানী নীল, ক্লিফডেন ও বেড-ফোর্ডের ঘন নীল, সেথোসিয়ার গোলাপী বাহার, রেড অ্যাডমিরালের রক্ত-গাঢ়

রং, ডিউক অব ব্যারগ্যাণ্ডির গায়ের হলুদে সাজ, ব্লাক ম্যাজোর মিশমিশে কালো ভূষণ, অপর দিকে ল্যাথোনিয়া—অপর নামে স্পেনের রাণীর মুক্তা-বসানো বেশ, মিনা-করা পাখ্‌নার পেন্টেড লেডি, পিকক্‌ এবং পোরসেলিয়ন্স নানান রঙের মনমাতানো কৌটা পরে পরীদেরও হার মানায়। এদের এই পাখ্‌নাগুলির সঙ্গে কিন্তু পাখাদের ডানার কোন মিল নেই—যদিও উভয় অঙ্গই উড়ে বেড়াবার কাজে লাগে। পাখ্‌নাটা তৈরি হয় ত্বকের একটা স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে। তার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে শিরা-উপশিরা—যারা খাবার জুগিয়ে চলে সমান তালে। এই পাখ্‌নার উপরে একটা আস্তরণ আছে। সেটা অসংখ্য আঁশের সমন্বয়ে তৈরি। আর এই আঁশগুলি লোমেরই রূপান্তর মাত্র—সেগুলি পাত্‌লা, চওড়া এবং চ্যাপ্টা আকারে আঁশে পর্যবসিত হয়।

পাখ্‌নার রূপের সাজ ছাড়া চেহারার দিক দিয়েও এদের বৈচিত্র্য বড় কম নয়। সবুজ ঘাসে ঘাসে লাফিয়ে বেড়ায় ছোট ছোট কয়েক মিলিমিটারের স্কিপারের দল বা মেডো ব্রাউন্স। আবার হিমাচল অঞ্চলে তাদেরই জ্ঞাতি ভাই আর্জিনিস ৫ ইঞ্চি দেহ নিয়ে উড়ে বেড়ায়। আর অবাক করে দেয় এক ফুট চেহারার চাতক-পুচ্ছ (Swallow-tailed) গোত্রের প্রজাপতি কাশ্মীরে এবং উত্তর ভারতের ক্যালিমাস।

গঠন-কারুকার্যের বৈভবেও এরা তুলনাহীন। কূর্মাকৃতির ভ্যানেসা—ইউরোপ, আমেরিকা, ভারত, সিংহল, মালয় ও মেক্সিকোতে ছড়িয়ে আছে। উত্তর-পূর্ব ভারতে শম্বুকাকৃতির সেথোসিয়াকে দেখা যায়। ময়ূর-পক্ষী প্রজাপতির দল উত্তর আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই চাকচিক্যের পরিপাটিতে ভরা।

এই শান্ত, সুন্দর প্রাণীদেরও শত্রুর সংখ্যা প্রচুর। হরেক রকম পোকা-মাকড় থেকে পাখী পর্যন্ত। জীবনের সুরু থেকেই মৃত্যুর করাল গ্রাস তাদের দিকে এগিয়ে আসে—তাদের ডিম্বক, শূককীট, মূককীট অবস্থাতে—এমন কি পরিণত বয়সেও। শত্রুর আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে তারা যে হাতিয়ার ব্যবহার করে, তা এক দিকে যেমন চমকপ্রদ, অপর দিকেও বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তারা পাখ্‌নার রং দিয়েই তৈরি করে আত্মরক্ষার বর্ম। পাতার ছাঁদে গা মিলিয়ে সবুজ রঙে ভরে থাকে, কখনও বা ধূসর রঙের গুঁড়ি বা কাণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বহুরূপী সেজে বসে থাকে। উত্তর ভারতের ক্যালিমাস শুকনো পাতার সঙ্গে গা মিলিয়ে আত্মরক্ষার প্রয়াস পায়। কখনও কখনও তীব্র গন্ধে ভরিয়ে তোলে চতুর্দিক—এও শত্রু বিতাড়নের আর এক প্রচেষ্টা। এই ধরণের প্রয়াসকে প্রাণিজগতে বলা হয় আত্মরক্ষার্থে অনুকরণ লিপ্সা বা Mimicry।

বৈচিত্র্যের আর একটা দিক প্রজাপতির জীবন-কাহিনীতে। ডিম থেকে জীবন সুরু করে পর্যায়ক্রমে শূককীট, মূককীটে দৈহিক রূপান্তরের মাধ্যমে পরিণতি ঘটে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতিতে। প্রতিটি পর্যায় পেরিয়ে আসতে বারে বারে তারা দেহের

আবরণ পরিবর্তন করে। স্ত্রী-প্রজাপতি ডিম পাড়ে ফলের গাছে বা পাতাতে। ডিমগুলি দেখতেও হরেক রকমের—গোল, চ্যাপ্টা, নল বা চুঙির মত অথবা বোতলের মত, আর সঙ্গে প্রলেপ থাকে চকচকে রূপালী সাদা, পাতার রঙের মতই সবুজ অথবা ধূসর বর্ণের। ১০।১২ দিনের মধ্যেই ডিম থেকে হামাগুঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে সরু সরু লম্বা শূককীট বা শোঁয়াপোকা। তাদের দেহে কোন খোলস বা আবরণ থাকে না। পিঠে আর পাশে থাকে অসংখ্য শোঁয়া বা কাঁটা। এই কাঁটাগুলি আত্মরক্ষার কাজে সাহায্য করে থাকে। মাথার কাছেই রয়েছে চোয়াল। এই চোয়ালের সাহায্যে পাতা খেয়ে চলে অবিরাম। পরে এই চোয়ালই মধু আহরণের শুঁড়ে পরিণত হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ শিউলি, শিমূল বা সজনে গাছে এদের বেশী দেখা যায়। এই শূককীটের দল এই সময় এত বেশী খেয়ে চলে যে, গাছগুলি অনেক সময় পত্রহীন হয়ে পড়ে। শোঁয়াপোকার মস্তকের অংশে থাকে ১ জোড়া শুঁড় ও ১ জোড়া চোখ। মাথার পিছনে আছে ১১টি অংশ, তার প্রথম তিন খণ্ডকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে বক্ষ। বক্ষের প্রত্যেক খণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে ১ জোড়া সন্ধিযুক্ত পা। এরাই পরে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতির বক্ষের তিন জোড়া সন্ধিপদে পরিণত হয়। এর পরের খণ্ডগুলিকে উদর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। উদরাংশে ৫ জোড়া পা থাকে, তারা পাতা বা অন্য আশ্রয়স্থলকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এই শোঁয়াপোকার অবস্থা কাটিয়ে উঠতে এদের প্রায় এক মাস লেগে যায়। শোঁয়াপোকার বর্ণবৈশিষ্ট্যে লাল, কালো বা সবুজ রং দেখা যায়। এই রঙের সাহায্যে তারা পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের এমনভাবে মিশিয়ে ফেলে যে, শত্রুরা সহজে খোঁজ পায় না। এর পরের অবস্থা মূককীট। শূককীট পর্যায়ে প্রচুর আহার-বিহারের পরে আসে ক্লান্তি। তার আগেই শোঁয়াপোকার সর্বাঙ্গে একটি আবরণ তৈরি হয়ে যায় মুখের লালায় এবং তারা গুটির মধ্যে থাকে ঘুমন্ত অবস্থায়। তখন রাক্ষুসে শোঁয়াপোকা স্থির, নিশ্চল ও নিস্পন্দ অবস্থায় এসে জীবনের সমস্ত লক্ষণ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর করে তোলে। গুটিগুলি সাদা বা সবুজ রঙের গোলকের মত সাধারণতঃ করবী গাছের পাতা বা ডালে আটকানো থাকে। ইতিমধ্যে দেহের ভাঙ্গাগড়ার কাজ সুরু হয় পুরাদমে গুটির মধ্যে। মধু আহরণের নালী তৈরি থেকে আরম্ভ করে পাখনা, পা, শুঁড় ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতির সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাস হয় এই কঠিন আবরণে ঘেরা গুটির মধ্যে। ১০ থেকে ১২ দিনের মধ্যেই গুটির পিঠের দিকটা ফাটিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বেরিয়ে আসে। প্রজাপতি তাদের ভিজা নরম ছোট পাখনাগুলি ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই বাতাসে শুকিয়ে নেয় এবং তারপরেই বিচরণ সুরু হয় ফুলে ফুলে, পাতায় পাতায়।

শ্রীকমল সরকার

পলিথিনের কথা

আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। ইংল্যাণ্ডে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজের গবেষণাগারে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা তরল ইথিলিন ও পেট্রোলিয়ামের উপজাত মিশ্রিত করে এক নতুন ধরণের সিন্থেটিক পদার্থ উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, উচ্চ তাপে এই দুই পদার্থের অণুগুলি সংযোজিত হবে এবং এক নতুন ধরণের প্লাষ্টিক পাওয়া যাবে। কিন্তু মুস্কিল হলো সেখানেই—অর্থাৎ এই দুই পদার্থ কিছুতেই মিলিত হলো না। একটি যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে রসায়নবিদেরা দেখলেন যে, অ্যালডিহাইড অপরিবর্তিত রয়েছে আর ইথিলিন সম্পূর্ণ এক নতুন পদার্থে পরিণত হয়েছে। এই পদার্থটিই পলিথিন।

পলিথিন—আধুনিক যুগে এই আশ্চর্য পদার্থটি যে কতশত রকমে ব্যবহার করা হচ্ছে, তোমরা তার সব খবর বোধ হয় রাখ না। পলিথিনের তৈরি শক্ত ব্যাগের কথা কে না জানে! এই ব্যাগ সাধারণ কাজ থেকে আরম্ভ করে জলের প্রচণ্ড গতিকেও রোধ করতে সক্ষম; অর্থাৎ এই ব্যাগের মধ্যে বালি ভর্তি করে খরস্রোতা নদীতে বাঁধ তৈরি ক'রে জলের প্রচণ্ড গতিও রোধ করা যায়।

পলিথিনের তৈরি এমন সব খাবার পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে—যা মজবুত ও চিরস্থায়ী। তোমরা শুনলে আশ্চর্য হবে যে, এগুলি হাতুড়ি দিয়ে পিটলে, কঠিন জায়গায় আছাড় মারলে, বাঁকালে, গরম জলে ফেলে দিলে কিংবা চরম শৈত্যের মধ্যে রেখে দিলেও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থেকে যায়। এখন তোমরাই বল, পৃথিবীতে কোন্ পদার্থটি আছে—যা এতগুলি গুণের অধিকারী?

এছাড়া শাকসব্জি টাট্‌কা রাখতে আসবাবপত্রের উপর সৌখিন আবরণ রূপে পলিথিন আজকাল বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার নানা রকম ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থা ও রাসায়নিক প্রকল্পে উত্তপ্ত তরল পদার্থ পলিথিনের নল দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

পলিথিন বিদ্যুৎ-অপরিবাহী বলে টেলিভিশন কেন্দ্রে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জে, শক্তি-উৎপাদন কেন্দ্রে ও সমুদ্রগামী জাহাজে ইন্সুলেটররূপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এছাড়া তুষারপাতের হাত থেকে শস্য বাঁচিয়ে রাখা, উন্মুক্ত স্থানে মেসিনপত্র রক্ষা করা, স্যাঁতসেঁতে খনির ভিতরে বিস্ফোরক পাউডার শুক্‌নো রাখা এবং তথ্যানু-

সন্ধানী বেলুনরূপে ঊর্ধ্বাকাশ থেকে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পলিথিন আশ্চর্য রকম কাজ করে।

পলিথিন প্রবেশ করেছে খেলনার রাজ্যে। খেলনার রাজ্যে পলিথিনের আবির্ভাব বেশ দেরীতে ঘটলেও আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই আশ্চর্য পদার্থটি খেলনার রাজ্যেও আধিপত্য বিস্তার করবে। তখন শিশুরা খুসীমত খেলনাগুলিকে দুমড়ে, মুচড়ে, বাঁকিয়েও সায়েস্তা করতে পারবে না।

এখন তোমরাই বল, পলিথিন রসায়ন-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার কি না?

শ্রীসুনীল সরকার

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। (ক) নক্ষত্রের সৃষ্টি হয় কি ভাবে?

(খ) বিশ্বের কি শেষ আছে?

দীপককুমার মুখোপাধ্যায়
ও
বিভাবসু মুখোপাধ্যায়

উঃ ১। (ক) এক কথায় বলতে গেলে গ্যাস ও ধূলিকণা ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্র সৃষ্টি করে। আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী নক্ষত্রগুলি আলাদা আলাদা ভাবে সৃষ্টি হয় না। পক্ষান্তরে একটা বিরাট মেঘপুঞ্জ থেকে এক সঙ্গে বহুসংখ্যক নক্ষত্র জন্ম নেয় বলেই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। প্রধানতঃ হাইড্রোজেন গ্যাস ও ধূলিকণা দিয়ে তৈরি এই জাতীয় মেঘখণ্ডের মধ্যস্থিত কণিকাগুলি পারস্পরিক মাধ্যাকর্ষণের ফলে গ্যাসরাশির মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়, সহজে বাইরে যেতে পারে না। প্রথম অবস্থায় এই গ্যাসস্তূপের ঘনত্ব খুবই কম থাকে। ক্রমশঃ পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ও মাধ্যাকর্ষণের ফলে গ্যাস অতি ধীরে ধীরে ঘনীভূত হতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় দুটি পরস্পর বিরোধী প্রক্রিয়া চলে। সঙ্কোচনের ফলে মেঘস্তূপের অভ্যন্তর উত্তপ্ত হতে থাকে। এই তাপ আবার মেঘস্তূপকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করে। কিছুটা উত্তাপ বিকিরণের আকারে বেরিয়ে যায় ও তখন আবার সঙ্কোচন ঘটে এবং এইভাবে চলতে থাকে। অত্যধিক উত্তপ্ত অবস্থায় গ্যাসরাশি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না—অসংখ্য টুক্‌রাতে বিভক্ত হয়ে যায়। এই টুক্‌রাগুলি তখন নিজেদের দিকে গ্যাস ও ধূলিকণা আকর্ষণ করে বড় হতে থাকে। এদিকে

গ্যাসস্তূপের অভ্যন্তরে পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে তাপও বাড়তে থাকে। এই-ভাবে আস্তে আস্তে প্রত্যেক টুক্‌রা এক একটি নক্ষত্রে পরিণত হয়। এই সমস্ত ঘটনা ঘটতে কয়েক কোটি বছর সময় লাগে। তাই মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ ঘটনাটা দেখা একেবারেই অসম্ভব। বহুদিন ধরে বিভিন্ন অবস্থায় বহু নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের ফলেই উপরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) বিশ্বের শেষ আছে বললে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে—তার পরে কি? বস্তুতঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনও খুব স্পষ্ট নয়। সর্বাধুনিক মতবাদ অনুযায়ী বিশ্ব ক্রমবর্ধমান—একটা বেলুনকে ক্রমশঃ ফোলালে যে রকম হয়, অনেকটা সেই রকম। ছায়াপথগুলি পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। ছায়াপথের এই নিরুদ্দেশ যাত্রার বেগ মোটেই কম নয়। যত দূরের ছায়াপথ, গতিবেগও ততই বেশী। এই বেগ যেখানে আলোর বেগের সমান, সেখানেই ব্রহ্মাণ্ডের শেষ দৃষ্টিসীমা। তারপর অর্থাৎ যেখানে উপরিউক্ত বেগ আলোর বেগের বেশী, যা কিছু আছে, সবই চিরকালের জন্যে আমাদের দৃষ্টির অগোচরে। কারণ সে সব স্থান থেকে বিকিরিত তরঙ্গ অনন্তকাল ধরে উন্মত্ত বেগে ছুটে কখনও পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে পারবে না। অপর পক্ষে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোন বস্তুর বেগ আলোর বেগের চেয়ে বেশী হতে পারে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ মতবাদকে মেনে নিয়ে বিশ্বের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কিছু বলা যেতে পারে, কিন্তু তারপর কি আছে, সে জটিল প্রশ্নের সমাধান এখনও হয় নি।

দীপক বসু

বিবিধ

চাঁদের আকার পৃথিবীর মতই

ওয়াশিংটন থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—পৃথিবীর মতই চাঁদের আকৃতিও কমলা লেবু বা ন্যাসপাতির মত খানিকটা চ্যাপ্‌টা। মার্কিন উপগ্রহ অরবিটারের কাছ থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

মহাকাশ গবেষণা সংস্থার একজন মুখপাত্র এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, অরবিটার চাঁদে তিনটি সুস্পষ্ট মালভূমি ও একটি বড় গহ্বর আবিষ্কার করেছে। বিষুব বৃত্ত আঙ্গুর ফলের মতই গোল।

অরবিটারের গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল দিয়ে মুখপাত্র বলেন, চাঁদের উত্তর মেরুতে সিকি মাইল লম্বা মালভূমি ও দক্ষিণ মেরুতে সিকি মাইল আয়তনের গহ্বর রয়েছে।

তাছাড়াও চাঁদে এক মাইলের এক অষ্টমাংশ আয়তনের অন্ততঃ আরও দুটি মালভূমি রয়েছে।

মুখপাত্র আরও বলেন, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যাচ্ছে, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের ছয় ভাগের এক ভাগ। চাঁদে মানুষের অবতরণ সম্পর্কে এটা একটা প্রধান তথ্য।

যান্ত্রিক হৃদ্‌যন্ত্র আবিষ্কার

ইণ্ডিয়ানাপোলিস (ইণ্ডিয়ানা) থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা একটি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক হৃদ্‌যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। ঐ হৃদ্‌যন্ত্র বসালে জীবন রক্ষা পেতে পারে, এমন ক্ষেত্রেই ঐ হৃদ্‌যন্ত্র রোগীর দেহে বসানো হবে। যান্ত্রিক হৃদ্‌যন্ত্র কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র থেকে পৃথক।

রোগীর দেহ থেকে হৃদ্‌যন্ত্র সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে যান্ত্রিক হৃদ্‌যন্ত্রটি বসানো হবে।

যান্ত্রিক হৃদ্‌যন্ত্রটি স্বাভাবিক হৃদ্‌যন্ত্রের চেয়ে সামান্য একটু বড়। ১'৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৩ ইঞ্চি চওড়া একটি বিদ্যুৎ-চালিত মোটরের সাহায্যে হৃদ্‌যন্ত্রটি চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই হৃদ্‌যন্ত্র ব্যবহারে কোন কুফল দেখা দেবে না বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

সোনালী বিড়াল

নয়া দিল্লী থেকে পি. টি. আই কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—দিল্লী চিড়িয়াখানায় সম্প্রতি নতুন এক জোড়া সোনালী বিড়াল আমদানী করা হয়েছে। সাধারণতঃ আসাম, সিকিম, ভুটান, নেপাল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলের বনে এই বিড়াল দেখা যায়। ইদানীং এই বিড়াল দুষ্প্রাপ্য।

সোনালী বিড়াল দেখতে বেশ পরিপুষ্ট। গায়ের রং সোনালী থেকে গাঢ় বাদামী, ক্বচিৎ কালো। তবে এখানে যে দুটি এসেছে, তারা ষোল আনা সোনালী।

সোনালী বিড়ালের খাদ্য হাঁস, মুরগী, ভেড়া, ছাগল, বাচ্চা হরিণ ইত্যাদি।

যোধপুর থেকে ইউ এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ, রাজস্থানের মরুভূমি শনৈঃ শনৈঃ তার এলাকা বাড়িয়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, এতে বালির পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে এর উষ্ণতা। ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলে মানুষের বাসের এবং যোগাযোগ রক্ষার সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

গাইয়ে পাহাড়

মস্কো থেকে রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ—কাজাকস্থান মরুভূমির এক 'গাইয়ে পাহাড়'কে রাষ্ট্রীয় রক্ষণাবেক্ষণে আনা হয়েছে।

জোরে হাওয়া বইলে অথবা মানুষ বা পশু এর গা বেয়ে চলতে থাকলে পাহাড়টি গুড় গুড় শব্দ করে ওঠে। বাদলা আবহাওয়ায় কিন্তু চুপচাপ।

এই পাহাড়ের বালি থলিতে রেখে নাড়ালে জোরালো শিসের মত আওয়াজ হয়। অবশ্য কিছুক্ষণের জন্যে।

বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটা লক্ষ্য করে দেখছেন।

জাতিস্মর বালিকা

কোপেনহেগেন থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—রডারস্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক এইচ. এন. ব্যানার্জি আমেরিকা রওনা হয়েছেন। নিউইয়র্ক আর বোষ্টনে গিয়ে তিনি একটি ভারতীয় মেয়ের কথার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখবেন। মেয়েটির দাবি, পূর্বজন্মে সে আমেরিকান ছিল। মেয়েটির নাম মনিনী। সে তার আমেরিকান নামও বলে দিয়েছে। কাকার নাম বলেছে ম্যাগনাস। তাঁর কাছেই সে থাকতো। বোষ্টনের বাইরে ভদ্রলোকের একটি বড় হোটেল আছে। পূর্বজন্মে ১৬ বছর বয়সে মেয়েটি মারা যায়।

অধ্যাপক ব্যানার্জি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না। তবে গত বার বছরে এসম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার জন্যে এই ধরণের প্রায় পাঁচ শত ঘটনা তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন।

কম্পিউটার দিয়ে কার্টুন ফিল্ম

টোকিও থেকে পি. টি. আই কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে জানা যায়—জাপানী নিউজ এজেন্সি কিওদো সংবাদ দিয়েছেন: হিটাচির কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে সবাক কার্টুন ফিল্ম তৈরি করেছেন।

ডাঃ তাকেও মিউরার পরিচালনায় গত এপ্রিল মাস থেকে এই নিয়ে ঐ সংস্থায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল।

সম্প্রতি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল দেখান হয়। দুটি আঁকা কার্টুন চরিত্র দিয়ে চব্বিশটি চিত্র তৈরি হয়। মূল অঙ্কন দুটিই ফিল্মের প্রথম ও শেষ চিত্র এবং ফিল্ম চললে সময়ের মাপে এর স্থায়িত্ব এক সেকেণ্ড মাত্র।

মূল দুটি চিত্রের মাঝের পারম্পরিক ঘটনাবলী তৈরি করে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। কম্পিউটারকে 'শূন্য ও রেখা ফরমূলা' দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল।

অবশ্য সবাক কার্টুন চিত্রটি একটু অসংলগ্ন মনে হয়েছে। কিন্তু ডাঃ মিউরা মনে করেন, আরও রেখা ও শূন্য দিয়ে সাহায্য করলে কম্পিউটার কার্টুন চরিত্রগুলির চলাফেরা আরও স্বাভাবিক করে তুলবে।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। সন্দীপকুমার বসু
ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি
৩৫, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলিকাতা-১৯

২। অত্রি মুখোপাধ্যায়
রাধাবাজার
নবদ্বীপ, নদীয়া

৩। অরুণকুমার রায়চৌধুরী
বসুবিজ্ঞান মন্দির
৯৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৪

৪। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক
সংস্কৃত কলেজ
কলিকাতা-১২

৫। শ্রীশিবনাথ মিত্র
ষ্টেশন রোড
পোঃ ব্যারাকপুর,
২৪ পরগণা

৬। শ্রীসুশীলকুমার দেব
১২৩, নন্দননগর
পোঃ বেলঘরিয়া,
২৪ পরগণা

৭। শ্রীশান্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়
২৮/১/বি, সার্পেনটাইন লেন,
কলিকাতা-১৪

৮। কমল সরকার
নেতাজী মহাবিদ্যালয়
আরামবাগ, হুগলী

৯। শ্রীসুনীল সরকার
বি. পি. সি. জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল স্কুল
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া

১১। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড
ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত